দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

[প্রথম খণ্ড]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

নবপত্র প্রকাশন / কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম নবপত্র-প্রকাশ ঃ ১লা জুলাই, ১৯৫৫

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ আশীষ কোঙার
শ্রীগুরু প্রেস
৯১ হরি ঘোষ স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

DITIYA MAHAJUDDHER ITIHAS Vol. I

By Vivekananda Mukherjee

মুখবন্ধ

সম্ভবতঃ আমার পক্ষে একথা উল্লেখ করা অনাবশ্যক যে আমি প্রচলিত অর্থে কোন ঐতিহাসিক নই, গবেষকও নই। কিন্তু সাংবাদিক হিসাবে পৃথিবীর দৈনন্দিন ইতিহাসের আমি একজন অংশীদার। ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যদিও আমি একজন গ্রাম্য বালক মাত্র ছিলুম, তবু সেই মহাযুদ্ধের অস্পষ্ট প্রভাব আমার বালকচিত্তকে কিছুটা নাড়া দিয়েছিল। তারপর যখন আমি সংবাদপত্রে প্রবেশ করলুম, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমার সাংবাদিক ও সম্পাদকীয় জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে যুদ্ধবিগ্রহ এবং আন্তর্জাতিক জগতের ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এবং তার পরবর্তীকালে দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে আমার অজস্র লেখা বেরিয়েছিল। 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী' এবং 'রুশ জার্মান সংগ্রাম' সেই দূরবর্তী কালেরই রচনা। সেই বইদুটি পাঠক মহলে যথেষ্ট সমাদৃত হওয়ার পর আমি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটি সামগ্রিক ইতিহাস রচনার সংকল্প করেছিলুম। কেন না, আমাদের বাংলা ভাষার বহু শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও এই ভাষায় তেমন কোন 'সামরিক সাহিত্য' গড়ে উঠেনি। অথচ সমগ্র মনুষ্য জাতির ইতিহাসে এতবড় মহাযুদ্ধ এবং সামগ্রিক যুদ্ধ (টোট্যাল ওয়ার) আর কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। এই মহাযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ৬১টি দেশ এবং ৭০ কোটি মানুষ জড়িয়ে পড়েছিল এবং যুদ্ধের সঙ্গে লিপ্ত ছিল ১১ কোটি সৈন্য, আর মারা পড়েছিল সাড়ে ৫ কোটি মানুষ। বর্তমান পৃথিবীর যুগান্তকারী বহু পরিবর্তন এই মহাযুদ্ধেরই ফলশ্রুতি মাত্র। অথচ মানুষের ইতিহাসের এই প্রলয়ংকর ঘটনা নিয়ে বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত কোন বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ ইতিহাস রচিত হয়নি এবং তথ্যনিষ্ঠ কোন নির্ভরযোগ্য আলোচনাও হয়নি। বাংলা সাহিত্যের এই অভাব-বোধ থেকেই আমার এই সামগ্রিক ইতিহাস রচনার উদ্যম।

বহু বছর ধরে আমি এই চেষ্টা করে আসছি, সেই দূরবর্তী ১৯৪৭ সাল থেকে। অসংখ্য বাধা-বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধকতার জন্য এই ইতিহাস সম্পূর্ণ করতে ও প্রকাশ করতে পারিনি। বলা বাহুল্য যে, অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারতের মত এই মহাযুদ্ধের কাহিনী বিরাট ও বিশাল। সুতরাং একটি মাত্র খণ্ডে এই কাহিনী শেষ করা সম্ভব নয়। আগাকরি দ্বিতীয় খণ্ডে এর সম্পূর্ণতা বিধান সম্ভব হবে।

আসলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রথম মহাযুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি মাত্র। সুতরাং আমার এই ইতিহাসের আলোচনার আরম্ভও প্রথম মহাযুদ্ধের একটি রেখাচিত্র থেকে, যাতে পাঠকবর্গ একটা ধারাবাহিকতার সন্ধান পেতে পারেন এবং এই গ্রন্থ (প্রথম পর্ব) শেষ হয়েছে স্ট্যালিনগ্রাডে হিটলারী বাহিনীর ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের পরাজয়ের এবং মহাযুদ্ধ অবসানের শুরু সেখান থেকে।

এই গ্রন্থ কেবলমাত্র কতকগুলি সামরিক ঘটনার বর্ণনা মাত্র নয়। বরং রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও মানবিক দিকগুলি এর মধ্যে প্রাধান্য অর্জন করেছে এবং এমন সমস্ত নাটকীয় ও রোমাঞ্চকর কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলি আমাদের দেশে ইতিপূর্বে আর কখনও প্রকাশিত হয়নি। অথচ বড় বড় ঐতিহাসিক যুদ্ধগুলির যথাসম্ভব

রণনৈতিক ও রণকৌশলগত বিশ্লেষণের চেষ্টাও করেছি এবং এই বইয়ের প্রায় সমস্ত উপাদান সংগৃহীত হয়েছে বৃটেন, আমেরিকা, জার্মানী ও সোভিয়েট রাশিয়া এবং ভারতে প্রকাশিত নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক গ্রন্থাবলী ও পত্র-পত্রিকা থেকে।

কিন্তু এই মহাযুদ্ধের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক দিক হলো চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতা, কিম্বা বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার হিটলার বিরোধী মহামৈত্রী কিম্বা ফ্যাসি-বিরোধী মহাজোট, অপর দিকে আবার হিটলার মুসোলিনী ও তোজো কিম্বা জার্মানী, ইতালী ও জাপানের জোটবদ্ধতা, এই দুই মহাজোটের কাহিনী আধুনিক কালের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিকতর নাটকীয়, রোমাঞ্চকর এবং জীবন্ত।

কিন্তু এই মহাজোটের মধ্যে বিরোধ, মতভেদ ও মতাদর্শগত সংঘাত কখনও কখনও এত তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, এই মহাজোট প্রায় ভেঙে যাওয়ার জো হয়েছিল। তথাপি উদারতাবাদী রুজভেল্ট, সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল এবং সাম্যবাদী স্ট্যালিন মহাযুদ্ধের অনিবার্য প্রয়োজনে এবং ফ্যাসিজমকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে শেষ পর্যন্ত যথাসম্ভব ঐক্য বজায় রেখে ও আপোষ রফা করে চলেছিলেন। পাঠকবর্গের কাছে এই সমস্ত কাহিনী নিশ্চয়ই গভীর কৌতুহল উদ্রেক করবে বলে আমার ধারণা।

যাঁরা আমাকে মূল্যবান পুস্তক দিয়ে এই গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য আমেরিকা-প্রবাসী শ্রী শুভেন্দ্রমোহন পাল। বহু পরিশ্রম করে ইনি বিদেশ থেকে বই যোগাড় করে আমাকে পাঠিয়েছেন। অন্যান্য যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বন্ধুবর শ্রী পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দিল্লীর শ্রী নিখিল চক্রবর্তী (সম্পাদক, মেইন স্ট্রীম), অধ্যাপক শ্রী রবুবীর চক্রবর্তী, মনীষা গ্রন্থালয়ের শ্রীদিলীপ বসু এবং মিঃ হলব্রুক ব্রাডলে (ইউ. এস. আই. এস.-এর ডিরেক্টর, যিনি তাঁর স্বদেশ থেকে আমাকে রেফারেন্স বই এনে দিয়েছিলেন) প্রভৃতি। এঁরা প্রত্যেকেই আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদের পাত্র।

বহুপ্রকার বাধাবিঘ্ন এবং অসুবিধার জন্যে এই পুস্তক প্রকাশে খুব বিলম্ব হয়ে গেল এবং নানা ঝামেলার জন্য কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতিও ঘটে থাকতে পারে—বিশেষতঃ অপরিচিত বিদেশী নামের উচ্চারণে। সেজন্য পাঠকদের কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে রাখছি।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

'চলমান জীবন'-এর সংগ্রামী পথিক

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়-এর

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মূলসূত্র

[১৯১৯-১৯৩৯]

দ্বিতীয় পর্ব

দিগ্বিজয়ের পথে জার্মানী

[১৯৩৯-৪০]

তৃতীয় পর্ব

মানুষের ইতিহাসের বৃহত্তম আক্রমণ

[১৯৪০-৪১]

চতুর্থ পর্ব

পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের বিস্তার

[ডিসেম্বর ১৯৪১—অক্টোবর ১৯৪২]

পঞ্চম পর্ব

স্ট্যালিনগ্রাদের চরম যুদ্ধ ঃ আফ্রিকা পুনরুদ্ধার

[১৯৪২ গ্রীষ্ম—১৯৪৩ শীত]

প্রথম খণ্ড

পর্বসূচী

অ্যাডলফ হিটলার

বেনিতো মুসোলিনি

উইনস্টন চার্চিল

রুজভেল্ট

জোসেফ স্তালিন

চার্লস দ্য গল

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

চিয়াং-কাই-সেক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মূলসূত্র

প্রথম অধ্যায়

১৯১৯—১৯৩৯ সালের পৃথিবী

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালে পৃথিবীর চেহারটা ভালই দেখাইতেছিল। তখনও প্রথম মহাযুদ্ধের শক্তিশেল বসুন্ধরার বুকে বিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু নূতনতর শিল্পবিপ্লবের গতিশীল বাহনেরা একে-একে দেখা দিতেছিল। ভূমিপথে আসিল মোটর গাড়ী, আকাশে পক্ষবিস্তার করিল এরোপ্লেন এবং বায়ুতরঙ্গে স্পন্দিত হইল বেতারযন্ত্রের ধ্বনি! শিল্প-বিপ্লবের সুখস্বপ্ন দেখিতেছিল পাশ্চাত্য জগৎ। সারা পৃথিবীতে তাদের আধিপত্য—রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। সমুদ্রে-সমুদ্রে তাদের জাহাজ, দেশে-দেশে তাদের বাণিজ্য—দিগন্তব্যাপী সাম্রাজ্য, উপনিবেশ ও কাঁচা মালের ঐশ্বর্যে পশ্চিমের জড়বাদী সভ্যতা অপরিসীম শক্তিশালী। আর এশিয়া ও আফ্রিকার 'নেটিভেরা' দরিদ্র, বঞ্চিত, পরাধীন এবং নিরস্ত্র। প্রাচ্যের বৈরাগ্য ও নেতিবাচক জীবনদর্শন পরকালের স্বর্গসুখ প্রচার করিয়াছিল, আর পশ্চিমের উগ্র জীবনরসের ভোগবাদ জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিকে করায়ত্ত করিয়া নূতন শিল্পসম্ভারের দ্বারা পৃথিবীকে জয় করিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াটারলু যুদ্ধে দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর থেকে একশো বছরের মধ্যে বৃটেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যে পরিণত হইল এবং সেই সঙ্গে ইউরো-মার্কিন রাষ্ট্রশক্তিগুলিও আগাইয়া চলিল।—তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যুগ শুরু হইবার মুখে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ—এই দুই ঐতিহাসিক যুদ্ধের মধ্যবর্তী শতবর্ষে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি বা বিপ্লব ঘটিল। বিজ্ঞান নিয়োজিত হইল মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এবং সেই সম্পদ সভ্যমানুষের জীবনযাত্রার মানদণ্ড বাড়াইয়া চলিল। পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন যে, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর মূল পণ্যদ্রব্যের (বেসিক কমডিটিস্) বার্ষিক উৎপাদন ১০ গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল এবং সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইল জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য। আর শ্বেতকায় মানুষের সংখ্যাও বাড়িয়া গেল—১৭৭০ খৃষ্টাব্দে সারা পৃথিবীতে শ্বেতকায় মানুষের সংখ্যা ছিল ১৫ কোটি, আর ১৯৩৭ সালে এই সংখ্যা বাড়িয়া হইল ৭৫ কোটি। এই বর্ধিত জনসংখ্যা পশ্চিম ইউরোপের শিল্পপ্লাবিত দেশগুলি আপন সীমারেখায় ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সুতরাং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৩ কোটি লোক অতলান্তিক মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া গেল পশ্চিম দিকে—আমেরিকার স্বর্ণোপকূলের সন্ধানে। যুদ্ধ তখনও ছিল এবং বরাবরই ছিল। উনবিংশ শতকের যুদ্ধগুলি ঘটিল প্রধানত উপনিবেশ বিস্তারের জন্য আফ্রিকায় ও এশিয়ায়। এই দুই মহাদেশ নূতন যুদ্ধাস্ত্র ও নূতন বিজ্ঞানের কাছে পরাজয় স্বীকার করিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুদ্ধ ছাড়াও 'জাতীয়তাবাদের' সংগ্রাম চলিল বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে।

জনৈক সামরিক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, ১৮৭০-১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ যেভাবে পররাজ্য আক্রমণ ও জয় করিয়াছিল, তাহা একমাত্র চেঙ্গিস খাঁর আমলের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গ্রেটবৃটেন ৪৭,৫৪,০০০ হাজার বর্গমাইল ভূমি দখল করিল এবং উহার জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হইল আট কোটি আশি লক্ষ লোক। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্স দখল করিল ৩৫,৮৪,৫৮০ বর্গমাইল ভূমি, আর জনসংখ্যা তিন কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার এবং ঐ একই সময়ে জার্মানী লাভ করিল ১০,২৬,২২০ বর্গমাইল ভূমি, আর এক কোটি ছেষট্টি লক্ষ সাতাশি হাজার একশ' জন লোক। সাম্রাজ্যবাদের এই দিগ্বিজয়ে পৃথিবী যেন আচ্ছন্ন হইল। তথাপি বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংঘর্ষ ও সংঘাতের অবধি ছিল না এবং সেই সঙ্গে দেখা দিল সমাজজীবনে নূতন আলোড়ন শিক্ষা ও সমৃদ্ধি বিস্তারের জন্য। সারা ইউরোপের শ্রমজীবী সম্প্রদায় অকস্মাৎ দেখিতে পাইল যে, তারা মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাইয়াছে বটে, কিন্তু যন্ত্রশিল্পের নূতন শৃঙ্খলের মধ্যে আটকা পড়িয়াছে। এই অর্থনৈতিক নিদারুণ বৈষম্য হত মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য আন্দোলন আরম্ভ হইল এবং সেদিনের ইউরোপীয় সংবাদপত্রে প্রথম 'সোসিয়েলিজম' বা সমাজবাদ এবং পরে 'কমিউনিজম' বা সাম্যবাদ—এই শব্দগুলি ধীরে-ধীরে দেখা দিতেছিল। ইংলণ্ডে অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এবং রাশিয়ায় জারের (সম্রাট) বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দিল। পশ্চিম ইউরোপের তথাকথিত গণতন্ত্রের শাসনে সাধারণ মানুষ সুখী ছিল না, আর রাশিয়ায় জারের অতি-স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লববাদীরা মাথা তুলিয়া খাঁড়াইল।

উনবিংশ শতকের পর বিংশ শতাব্দীর উষাকাল এভাবে আসিয়া দাঁড়াইল ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মে, যখন পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী চেহারাটি মোটামুটি ভালোই দেখা যাইতেছিল। কিন্তু সেই সুখের দিনে অকস্মাৎ ২৮শে জুন তারিখ সেরাজেভোতে অস্ট্রিয়ার আর্চ ডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড সস্ত্রীক নিহত হইলেন আততায়ীর গুলিতে। বলকান রাজ্যের অতি নগণ্য শহর সেরাজেভো, আর হত্যাকারীরা ক্ষুদ্র সার্ভিয়া রাজ্যের ষড়যন্ত্রকারী, কিন্তু নিহত ব্যক্তি সামান্য লোক নহেন—তিনি অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের হ্যাপসবুর্গ রাজবংশের উত্তরাধিকারী। সুতরাং বারুদাগারে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ পড়িবার মত সারা ইউরোপ জ্বলিয়া গেল। কাইজারের জার্মানী দাঁড়াইল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর পক্ষে, জারের রাশিয়া সমর্থন করিল সার্ভিয়াকে, ফ্রান্স গেল রাশিয়ার দলে এবং বৃটেন দাঁড়াইল জার্মানীর বিপক্ষে,। অস্ট্রিয়া অগ্রসর হইল 'জাতীয়তাবাদী' সার্ভিয়াকে সমুচিত শিক্ষা দিতে, আর জার্মানী আক্রমণ করিল বেলজিয়মের ভিতর দিয়া ফ্রান্সকে। ১৯১৪ সালের জুন মাসে সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড ১৯১৪-১৮ সালের পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের হত্যাকাণ্ডে পরিণত হইল এবং ইউরোপ বিধ্বস্ত হইল।

সামান্য ঘটনা থেকে আগ্নেয়গিরির প্রলয়কাণ্ডের মত এত বড় একটা সর্বনাশ ঘটিল কিরূপে ? এবং এর দ্বারা কি এ কথারই প্রমাণ হয় না যে, সেদিনের বাহ্যিক সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র ও সমাজের ভিতরে-ভিতরে ঘুণ ধরিয়া গিয়াছিল ? রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের

(১) War and Western Civilization—by Major General J. F. C. Fuller.

ছিল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংঘাত, আর মানুষের সঙ্গে মানুষের ছিল সামাজিক সংঘর্ষ। রাষ্ট্রগতভাবে দেখা যায় ১৯১৪ সালের পৃথিবী ৪০টি হইতে ৫০টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল এবং এইগুলির পরস্পরের সম্পর্ক কি হইবে, তার কোন রাজনৈতিক মানদণ্ড ছিল না। অথচ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সূত্রে সারা পৃথিবী একটা মোটা রকম আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্রে পেঁছিয়াছিল। স্বর্ণমান ছিল আন্তর্জাতিক মুদ্রানীতির মাপকাঠি এবং গোটা দুনিয়া একটা বৃহৎ বাজারে পরিণত হইয়াছিল। ডাক ও তার এবং জাহাজের সূত্রে পৃথিবীর দূরবর্তী প্রান্তগুলি একত্র গ্রথিত হইয়াছিল। যদিও ইহা ছিল আন্তর্জাতিকতার শৈশব দশা, তথাপি বাণিজ্য, মূলধন ও অর্থনীতি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মধ্য দিয়া পৃথিবীকে একটা বাহ্যিক ঐক্যের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল। কিন্তু পারস্পরিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে ইহার ভিত্তিভূমি ছিল কাঁচা, আবার আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংঘাত ইহার কাঠামোকে করিল দুর্বল। বিশেষত সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক স্বার্থ পরস্পরের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ ডাকিয়া আনিল। সুতরাং একটি আঘাতেই এই সাজানো তাসের ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড ছিল একটি উপলক্ষ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কিংবা রক্ষার কোন যোগসূত্র ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার' নামে যে কূটনৈতিক তত্ত্ব প্রচলিত হইয়াছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের আগেও তাই চলতি ছিল। 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার' বা 'শক্তির ভারসাম্য' কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে এই ধারণা হইতে যে, জাতীয় রাষ্ট্রগুলি স্বভাবতঃই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে গ্রাস করিয়া রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়া থাকে। সুতরাং যদি এমন একটা পন্থা অবলম্বন করা যায়, যদ্দারা এক বা একাধিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কতকগুলি মৈত্রী বন্ধনের দ্বারা দলবদ্ধ হইতে পারা যায় এবং সেই দলবদ্ধতার ফলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করা যায় যে, কেহই সহসা অপরের উপর জয়লাভ করিতে পারিবে না, তা হইলে শান্তি রক্ষা হইতে পারে। এই ধারণা হইতেই 'অ্যালায়েন্স' বা মৈত্রীর সৃষ্টি এবং সেই মৈত্রীর দ্বারা ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা হইল। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধে 'মিত্রপক্ষ' ও শত্রুপক্ষের দুই দল লক্ষ্য করিলেই এই তথ্যের সম্যক রূপ উপলব্ধি হইবে। ১৯১৪ সালে ফ্রান্স ও জারের রাশিয়া জার্মানী ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মিত্রতায় আবদ্ধ ছিল। বৃটেনের মিত্রতা ছিল ফ্রান্সের সঙ্গে এবং এক গোপন সামরিক ও নৌচুক্তি ছিল। এই সমস্ত রাষ্ট্রের আবার পরস্পরের সঙ্গে নিদারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। জার্মানী চাহিতেছিল নূতন রাজ্য ও উপনিবেশ। সুতরাং জার্মানীর এই রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় বৃটেন ছিল ভীত ও শঙ্কিত। রাশিয়া চাহিতেছিল বলকান রাজ্যে প্রভুত্ব খাটাইতে এবং কনস্টান্টিনোপল দখল করিতে। জার্মানীর কাছ হইতে আলসেস ও লোরেন প্রদেশ পুনরুদ্ধারের জন্য উৎসুক ছিল ফ্রান্স এবং সেই সঙ্গে আগেকার যুদ্ধের (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে) প্রতিশোধ নিতে। রাশিয়ার মত অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীও বলকান রাজ্যে প্রভুত্ব খাটাইতে ব্যগ্র ছিল। এভাবে সারা ইউরোপে প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রসমূহের লোভ ও দুর্নীতি যে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। কেবল শক্তির ভারসাম্য নীতির দ্বারা এই যুদ্ধের তারিখটা স্থগিত ছিল। রাজ্যগত এই লিপ্সার সঙ্গে যুক্ত হইল বাণিজ্যগত লোভ। কিন্তু তারা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, ঊনবিংশ

শতকের রাজনৈতিক জাতীয়তার[১] সঙ্গে কিংবা ন্যাশন্যাল স্টেটের উগ্র জাতীয়তাবাদের বিংশ শতকের আন্তর্জাতিক ধারণা ও বাণিজ্য খাপ খাইতে পারে না। হয় কোন রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য ঘটাইতে হইবে, কিংবা অনিবার্যরূপে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্যে পড়িতে হইবে। আবার সেই সঙ্গে তাঁরা একথাও ভুলিয়া গেলেন যে, যুদ্ধের দ্বারাও প্রকৃতপক্ষে কোন লাভ হইতে পারে না। কেননা সমগ্র জগতে তাঁরা প্রত্যেকে এবং সকলে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। প্রথম মহাযুদ্ধের বহু বছর পর সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব মিঃ লিটভিনোফ (পরলোকগত) বলিয়াছিলেন, **'Peace is one and indivisible'**—'শান্তি এক ও অবিভাজ্য।' এই বিখ্যাত উক্তি ১৯১৪ কিংবা ১৯৩৯ সাল—দুই মহাযুদ্ধের কোন সন্ধিক্ষণেই ধনিক রাষ্ট্রগুলির মাথায় প্রবেশ করে নাই। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত—এই শত বৎসরের 'যুগে' পৃথিবীর জাতিগুলি পরস্পরের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যুদ্ধের মধ্যেও নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে পারিত। কিন্তু ১৯১৪ সালের পর তাহা আর সম্ভব ছিল না—শিল্প-বিপ্লব ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক যোগসূত্রের জন্য।

প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে অন্তত দুই কোটি মানুষের মৃত্যুর[২] মধ্যে পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিল—১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর। যুদ্ধ শেষ হইল বটে, কিন্তু সন্ধি ও শান্তি লইয়া বিষম টানা-হেঁচড়া চলিল। ১৯১৭ সালে প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নেতৃত্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল এবং ইউরোপীয় সংগ্রামে মিত্রপক্ষের প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। সম্ভবতঃ আমেরিকার সাহায্য ছাড়া সেই যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়লাভ করাও সম্ভব হইত না। 'যুদ্ধের দ্বারা চিরতরে যুদ্ধ শেষ' ও 'গণতন্ত্রকে রক্ষার' উদ্দেশ্য লইয়া প্রেসিডেণ্ট উইলসন সংগ্রামে যোগ দেন এবং ১৯১৮ সালে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে ১৪ দফা সর্তের প্রস্তাব করেন ইতিহাসে উহাই 'ফোর্টিন পয়েণ্টস্' নামে বিখ্যাত। কিন্তু ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্লেমেঁস বহু প্রকার প্যাঁচ কষিয়া প্রেসিডেণ্ট উইলসনের আসল উদ্দেশ্য মাটি করিয়া দেন। কিন্তু আমেরিকাকে একেবারে উপেক্ষা করা ফরাসী বা ইংরাজ রাজনীতিকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং সন্ধির মধ্যে জোড়াতালি সত্ত্বেও উইলসনের পরিকল্পিত বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের (লীগ অব নেশন্স্) প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইল, যদিও স্বয়ং উইলসন সেই সন্ধির বহু সর্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইলেন। ১৯১৯ সনের ২৮শে জুন ফ্রান্সের

১। ১৯১৭ সালে এশিয়া মহাদেশ থেকে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এই উগ্র জাতীয়তাবাদের তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন।

২। কমাণ্ডার কিংহালের পুস্তকে (দি ওয়ার্লড সিন্স্ দি ওয়ার) প্রথম মহাযুদ্ধের মৃত্যুর সংখ্যা ২কোটি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু যুদ্ধ ও যুদ্ধজনিত অন্যান্য সমস্ত কারণ বিবেচনা করিলে এই সংখ্যা ৪ কোটিরও বেশী দাঁড়াইবে। বিখ্যাত কমিউনিস্ট লেখক মিঃ আর পাম দত্ত তাঁর 'ওয়ার্লড পলিটিক্স' গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন যে, ১৯৩১ সালে 'ইণ্টার পার্লামেণ্টারী ইউনিয়ন অব এনকোয়ারি' বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে সামরিক ও অসামরিক মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৪ কোটি, ১৪ লক্ষ, ৩৫ হাজার। অর্থাৎ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় প্রতি ৪০ জনে ১ জন। ১৯৪৬ সালে আমেরিকায় প্রকাশিত 'দি গ্রেট কন্সপিরেসি এগেনস্ট্ রাশিয়া' নামক চাঞ্চল্যকর গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের রণক্ষেত্রে ৯ কোটি লোক মারা গিয়াছে, ২ কোটি লোক মারাত্মকরূপে বিকলাঙ্গ হইয়াছে, দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ মারা পড়িয়াছে এবং আরও লক্ষ-লক্ষ মানুষ গৃহশূন্য ও সর্বস্বান্ত হইয়াছে।

ভের্সাই শহরে এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, যার জন্য ইহা ভের্সাই সন্ধি নামে ইতিহাস-খ্যাত[১]। এই সন্ধির দলিল একটি প্রকাণ্ড পুস্তকবিশেষ। তবে, উহার মূলকথা এই যে,

(১) একটি বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ গঠন করিতে হইবে।

(২) জার্মানী নগদ টাকায় ও পণ্যদ্রব্যের দ্বারা যুদ্ধের জন্য মিত্রপক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে। (এই ক্ষতিপূরণের মোট দাবী ছিল ৬৫০ কোটি পাউণ্ড)।

(৩) জার্মানীর সমস্ত উপনিবেশ হাতছাড়া করিতে হইবে। 'নেটিভ'দের উপর শাসনের যোগ্যতা জার্মানীর নাই এবং ভবিষ্যতের জন্য জার্মানীর কোন সমুদ্রপারবর্তী ঘাঁটিও থাকিবে না।

(৪) জার্মানীকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করা হইবে।

(৫) জার্মান রাষ্ট্রের সীমানা পুনরায় নির্ধারিত করিতে হইবে। আলসেস ও লোরেন প্রদেশ ফ্রান্সকে দিতে হইবে।[২] এবং পোল্যাণ্ডকেও উত্তর সাইলেশিয়ার একাংশ ও পূর্ব প্রুশিয়ার অংশ, আর চেকোশ্লোভাকিয়াকেও উত্তর সাইলেশিয়ার একটি ক্ষুদ্র অংশ দিতে হইবে।

এই সন্ধির ফলে জার্মানীর যে ভয়াবহ ক্ষতি হইল তাহা বুঝিতে হইলে উল্লেখ করা দরকার যে, একমাত্র ইউরোপেই জার্মানী ২৭ হাজার বর্গমাইল ভূমি হারাইল এবং সেই সঙ্গে ৬৫ লক্ষ লোক। ডানজিগ 'স্বাধীন নগরী'তে (ফ্রি সিটি) পরিণত হইল এবং মেমেল রাষ্ট্রসংঘের শাসনাধীনে আসিল। রাইনল্যাণ্ড নিরস্ত্রীকৃত হইল এবং ডেনমার্ক ও বেলজিয়মকেও কিছু-কিছু রাজ্যাংশ দিতে হইল। আর ১৯২৩ সালে লিথুয়ানিয়া মেমেল বন্দর দখল করিয়া নিল। ইহা ছাড়া জার্মানী সমুদ্রপারবর্তী সমস্ত উপনিবেশ হারাইল—যার মোট আয়তন ১০ লক্ষ বর্গমাইলেরও বেশী। এবং মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ। এই সমস্ত উপনিবেশ ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ও পূর্ব আফ্রিকায়, —আর ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, যার কতকগুলি গেল জাপানের অধীনে, আর কতকগুলি বৃটিশ সাম্রাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার দখলে। বলাবাহুল্য যে, জনসংখ্যা ভূমিসম্পদ ও কাঁচা মালের প্রভূত ঐশ্বর্য হারাইয়া জার্মানী অতিদুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হইল। জার্মানীর সমগ্র নৌবহর ও অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইল এবং অভ্যন্তরীণ শাসনকার্যের জন্য মাত্র ১ লক্ষ 'পুলিশী সৈন্য' রাখার অধিকার দেওয়া হইল।

এভাবে যে ভের্সাই সন্ধিপত্র রচিত এবং স্বাক্ষরিত হইল, উহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল মিত্রশক্তি কর্তৃক জার্মানীর উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। অবশ্য বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘ সৃষ্টির দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার একটা প্ল্যানও ইহার মধ্যে ছিল, কিন্তু উহা যেন ছিল প্রেসিডেণ্ট উইলসনের চাপে পড়িয়া

১। মহাযুদ্ধজয়ী ফ্রান্সের অধিনায়ক মার্শাল ফস্ ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরের কথা শুনিয়া যে কথা বলিয়াছিলেন, ভবিষ্যদ্বাণীর মত তা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে। তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'This is not Peace. It is an Armistice for twenty years'. অর্থাৎ এটা শান্তি চুক্তি নয়, এটা বিশ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতি মাত্র।

—চার্চিলের 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭

২। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জার্মানী ফ্রান্সকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এই প্রদেশ দুইটি হস্তগত করিয়াছিল।

ঔষধ গিলিবার মত চেষ্টা। ইহার দ্বারা কখনও শান্তি আসিল না, যদিও রাষ্ট্রসংঘ স্থাপনের প্রস্তাবের মধ্যে যথেষ্ট অভিনবত্ব ছিল। জার্মানী সম্পর্কে মিত্রপক্ষ সেই চিরন্তন বিজিত ও বিজেতার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। প্রতিশোধ ও ক্ষতিপূরণ সেই পুরানো পৃথিবীর আরণ্যক পদ্ধতিই স্মরণ করাইয়া দিল কিন্তু সেদিনের বিজয়ী-পক্ষ ইহা খেয়াল করিলেন না এবং তাঁরা ভুলিয়া গেলেন যে, আধুনিক পৃথিবীতে ইহা অচল। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের আগে এভাবে পরাজিত শত্রুর কাছ হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা বিজেতার পক্ষে বোধহয় লাভজনক ছিল।

কিন্তু যুদ্ধের আদিম ইতিহাস হইতে শুরু করিয়া নেপোলিয়নের যুদ্ধ পর্যন্ত যাহা সম্ভব ছিল, আধুনিক পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বানিজ্য, অর্থনীতি, শ্রমশিল্প এবং দ্রুত যোগাযোগের অগ্রগতির জন্য তা আর সম্ভব ছিল না। কেননা পৃথিবী একটি বৃহৎ পণ্যশালায় পরিণত হওয়ায় একপক্ষের নিকট কাড়িতে হইলে অন্যপক্ষের নিকট ঠকিতে হইবে এবং পরস্পরের নির্ভরশীলতা বাড়িয়া যাওয়ায় 'যুদ্ধের ব্যবসায়' আর 'লাভজনক' হওয়া সম্ভব ছিল না। ভের্সাই সন্ধির এই সমস্ত মূলগত গভীর ত্রুটির জন্যই ১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ সাল আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র তৈয়ার করিতেছিল।

যে গরু দুর্বল এবং রোগা তাকে দোহন করিয়া নিশ্চয়ই দুধ আদায় করা যায় না। প্যারিসের বড় বড় শান্তিকর্তারা পরাজিত জার্মানী সম্পর্কে এই সাধারণ বুদ্ধির কথাটা ভুলিয়া গেলেন। সুতরাং একদিকে ক্ষতিপূরণ ও নানাভাবে জার্মানীর উপর প্রতি-হিংসা চরিতার্থ করা এবং অন্যদিকে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বিতা বজায় রাখিয়া বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘ মারফৎ শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা—এই বিচিত্র

পরস্পরবিরোধী মনোভাব ও নীতি দেখা দিল ভের্সাই সন্ধির পরবর্তী যুগে। অবশ্য তখন সদ্যসমাপ্ত মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর সর্বনাশের গভীরতর আঘাতের দ্বারাই সন্ধি রচয়িতাগণ মানসিক সুস্থতা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন! কিন্তু উহা নিশ্চয়ই রাষ্ট্রনীতি-জ্ঞান ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল না। এই জটিল অবস্থা আরও ঘোরাল হইল বিক্ষুব্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা। তাঁরা ইউরোপীয় রাজনীতিক চালবাজীতে বিরক্ত হইলেন এবং শান্তিসন্ধিগুলি অনুমোদনে অস্বীকৃত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশ করিতেও তাঁরা রাজী হইলেন না। এবং সমগ্র ইউরোপীয় রাজনীতি হইতে হাত গুটাইয়া তাঁরা তাঁদের সনাতন 'আইসোলেশনিস্ট পলিসি' বা নির্লিপ্ততার নীতি অনুসরণের দিকে ঝুঁকিলেন। তথাপি তাঁরা একেবারে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না, বর্তমান পৃথিবীতে তাহা সম্ভবও নহে। বিশেষত মার্কিন নৌশক্তির বিরুদ্ধে আর একটি শক্তি তখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল প্রশান্ত মহাসমুদ্রে। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদের নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিয়া তখন জাপান পূর্ব গগনে 'উদীয়মান সূর্যের' রক্তোজ্জ্বল ছটা প্রকাশ করিতেছিল। দীর্ঘকালের সামন্ততন্ত্র হইতে জাগ্রত হইয়া তখন জাপান অনেকটা পশ্চিমী রাষ্ট্রতন্ত্রের অনুরূপ একটা রাজতন্ত্রবাদী সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জাপান চীনকে পরাজিত করিয়া ফরমোজা দ্বীপ কাড়িয়া লইল এবং ১৯০৪-১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিশাল জারের রাশিয়াকে পরাজিত করিয়া সমগ্র এশিয়া, এমন কি সারা পৃথিবীকে চমকিত করিল। সে কোরিয়া দখল করিল এবং মাঞ্চুরিয়ার ভিতর প্রবেশ করিল। ১৯১৪ সালে মিত্রপক্ষের দলে যোগ দিয়া জাপান জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং প্রশান্ত মহাসমুদ্রের জার্মান দ্বীপ ও চীনে জার্মান অধিকৃত সিংচাউ কাড়িয়া লইল। এই সময় হইতেই সমগ্র চীন দখলের ইচ্ছাও তার ছিল, কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয় নাই।

প্রাচ্য ভূখণ্ডে জাপানের এই নূতন শক্তি লাভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। বিশেষত প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সমুদ্রপথে তাহার ব্যবসাবাণিজ্য সমস্তই নির্ভর করিতেছিল বৃটিশ নৌবহরের উপর—অন্তত গোড়ার দিকে। এই নৌবহর জার্মানীকে অর্থনৈতিক অবরোধের মধ্যে আটকা রাখিতেছিল বলিয়া তখনকার নিরপেক্ষ আমেরিকার বাণিজ্যও বৃটিশ অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল। সুতরা আমেরিকা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ নৌবহর নির্মাণের জন্য উদ্যোগী হইল এবং বৃটেনও সেই অবস্থাটা মানিয়া লইল। কারণ, তখন যুদ্ধক্ষত বৃটেনের পক্ষে নূতন নৌবল নির্মানে পাল্লা দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু এদিকে প্রাচ্যখণ্ডে জাপানের অগ্রগামিতায় আমেরিকা বিচলিত হইয়া ওয়াশিংটনে এক আন্তর্জাতিক বৈঠক আহবান করিল এবং ১৯২১-২২ সালে নৌবল নিয়ন্ত্রণ চুক্তি সম্পাদন করিল। এই চুক্তির দ্বারা স্থির হইল যে, বৃটেন, আমেরিকা ও জাপান, নৌবল প্রধান এই তিন রাষ্ট্র ৩৫ হাজার টনের বেশী কোন সর্ববৃহৎ যুদ্ধজাহাজ 'ক্যাপিটাল শিপ' নির্মাণ করিবে না। অন্যান্য যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ তালিকা অবিলম্বে বন্ধ হইবে এবং ১০ বৎসরের মধ্যে কোন নূতন যুদ্ধজাহাজ তৈয়ার করা হইবে না। আর গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানের নৌবলের আনুপাতিক হার হইবে ৫ : ৫ : ৩। নৌবল নিয়ন্ত্রণের এই চুক্তি ছাড়া কতকগুলি রাজনৈতিক সন্ধিও হইল এবং উহার দ্বারা বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও জাপান প্রশান্ত মহাসমুদ্রে প্রত্যেকের 'দখলের সীমানা ও

স্বার্থ' অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি দিলেন। অবশ্য সেই সঙ্গে চীনের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার গ্যারাণ্টিও দেওয়া হইল।

প্রশান্ত মহাসাগরে আপন স্বার্থের খাতিরে আমেরিকা একটা আন্তর্জাতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইল বটে, কিন্তু ইউরোপ সম্পর্কে নির্লিপ্ত হইল। এমন কি ভাবী জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে কোন গ্যারাণ্টি দিতেও সম্মত হইল না। তখন জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের নীতি আরও কড়া এবং উগ্র হইয়া পড়িল।

ফ্রান্সের এই উগ্রতার জন্য বিরক্ত বোধ করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু একথাও বুঝা দরকার যে, ফ্রান্সের পক্ষে নির্বিঘ্নতার প্রশ্ন সর্বদাই উদ্বেগজনক ছিল। ইংলণ্ড বা আমেরিকার মত সমুদ্রের ব্যবধান তার ছিল না এবং তার পূর্বে সীমানা সর্বদাই আক্রমণের আশংকার মধ্যে ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সর্বপ্রকার অত্যাচার, ক্ষয় ও ক্ষতি তার উপর দিয়া গিয়াছে এবং তার সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিপন্ন হইয়াছে। 'অথচ হাজার বৎসর ধরিয়া ফ্রান্স ছিল ইউরোপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সভ্য জাতি এবং জাতীয় স্বাধীনতাও তারাই সর্বপ্রথম অর্জন করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সভ্যতার মানদণ্ডরূপে পরিচিত হইয়াছিল ফ্রান্স, তার ভাষা ইউরোপের প্রত্যেকটি রাজ-দরবারের ভাষায় পরিণত হইল, পোশাক-পরিচ্ছেদ, কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারের শালীনতায় ফরাসী রীতিনীতিই যে কোন ব্যক্তির সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্নরূপে গৃহীত হইল।[১] ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়া সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর যে সংগ্রাম ফরাসীরা করিয়াছিল, তাই ঊনবিংশ শতকে অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে প্রভাবান্বিত করিল। কৃষিতে ও শ্রমশিল্পে এমন সামঞ্জস্য বিধান ফ্রান্সের মত আর কেহই করিতে পারে নাই। তার অর্ধেক লোক ছিল উৎকৃষ্ট কৃষিতে এবং বাকি অর্ধেক কলকারখানা ও কুটির-শিল্পে। মোটামুটি ফরাসীরা সুখেই ছিল। কিন্তু যুদ্ধের ফলে সমাজের মধ্যে ভাঙন ধরিয়া গেল এবং উলটপালট ঘটিল। বিশেষত বৃহৎ কলকারখানার মালিকরা লোভার্ত হইয়া উঠিলেন। তৃতীয় নেপোলিয়ানের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে ফ্রান্সে বৃহৎ কলকারখানার পত্তন এবং এদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সাম্রাজ্যবাদী। লৌহ, ইস্পাত ও অন্যান্য বড় বড় শিল্পের মালিকরা মহাযুদ্ধের ফলে আরও উগ্র হইয়া পড়িলেন এবং তাঁরা চাহিলেন জার্মানীর লোরেন, সার ও রুর অঞ্চলের খনিগুলি দখল ও শোষণ করিতে। সুতরাং তাঁরা পিছন হইতে ফরাসী রাজনীতির সূত্র ধরিয়া টানিতে চাহিলেন। তাঁরা জার্মানীর রক্তমোক্ষণ করিয়া যেমন টাকা আদায় ও শোষণ করিতে চাহিলেন, তেমনই ফ্রান্সের সাধারণ মনোভাব ঝুঁকিয়া পড়িল আত্মরক্ষার নির্বিঘ্নতার দিকে, ভাবী জার্মানীর বিন্দুমাত্র শক্তি সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে। ফলে দাঁড়াইল এই:

"Germany, in French opinion, must be weakened beyond recovery ; she must be guarded and watched ; she must be made to pay. As part of this policy France contracted a ring of alliances with the countries bordering in Germany. She helped to weld the 'succession states' (Czechoslovakia, Jugoslavia and Rumania) into the organization known as 'The Little Entente' and bound them to her interests by treaties and loans. She made an alliance with

১। 'The Between War-World'—by J. Hampden Jackson' Page 63.

Poland, which together with her close alliance with Belgium, completed the ring of warders rounds the body of prostrate Germany."[১]

সহজ কথায় ফ্রান্সের মতে জার্মানীকে এতটা দুর্বল করিতে হইবে যেন ভবিষ্যতে সে আর মাথা তুলিয়া না দাঁড়াইতে পারে। তাকে পাহারা দিতে হইবে এবং তার উপর নজর রাখিতে হইবে—ক্ষতিপূরণ তার কাছ হইতে অবশ্যই আদায় করিতে হইবে। এই নীতিরই অংশস্বরূপ ফ্রান্স জার্মানীর সীমান্তবর্তী চারদিকের রাষ্ট্রগুলির সহিত মৈত্রী-বন্ধন সৃষ্টি করিল। চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া এবং রুমানিয়ার সঙ্গে আঁতাত সৃষ্টি হইল। পোল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামের সঙ্গেও ফ্রান্স মৈত্রী স্থাপন করিল। এভাবে পরাজিত ও পদদলিত জার্মানীর চতুর্দিকে ফ্রান্স দৃঢ় বেষ্টনীর সৃষ্টি করিল।

কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বৃটেন চাহিল মাঝামাঝি পন্থা অনুসরণ করিতে। ফ্রান্সকে জার্মানী ও ইউরোপীয় ব্যাপারে এতটা ইচ্ছামত চলিতে দিলে বৃটেন 'শক্তির খেলায়' পিছনে পড়িয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভবিষ্যতের এই আশঙ্কায় বৃটেন 'উদারতা' দেখাইতে লাগিল এবং ভের্সাই সন্ধির কঠোর সর্তগুলি প্রয়োগ করিতে গিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে তার মতবিরোধ ঘটিতে লাগিল। এই মতবিরোধ চরমে উঠিল ১৯২৩ সালে, যখন ফ্রান্স জার্মানীর খনিসমৃদ্ধ রুর অঞ্চল 'আক্রমণ' ও দখল করিল। বৃটেন এই ব্যাপারে ফ্রান্সের সহিত সহোযোগিতা করিতে রাজী হইল না। কিন্তু ফ্রান্স চাহিল রুর অঞ্চল দখলের দ্বারা জার্মানীকে ক্ষতিপূরণে বাধ্য করিতে—যে ক্ষতিপূরণ জার্মানীর পক্ষে দেওয়া কোনমতেই সম্ভব ছিল না। রুর দখলের পর জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হইল এবং উহার উল্টা প্রতিক্রিয়া ঘটিল ফ্রান্সের অর্থনীতির উপর। অবস্থা ক্রমশ ঘোরালো হইয়া উঠিল।

এদিকে আমেরিকায় স্বর্ণযুগ আরম্ভ হইয়াছিল। মার্কিন অর্থ, মার্কিন শিল্প, এবং মার্কিন যন্ত্র ও সভ্যতা পৃথিবী ছাইয়া ফেলিতেছিল। উনবিংশ শতকে বৃটিশ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স এবং ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন যেমন পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তেমনই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য সর্বত্র অনুভূত হইতে লাগিল। এমন কি সোভিয়েট রাশিয়া পর্যন্ত মার্কিন যন্ত্র ও মার্কিন বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হইল। কারণ কাঁচামাল ও যন্ত্রশিল্পের এতবড় উৎপাদক পৃথিবীতে আর কেহ ছিল না। পৃথিবীর মোট কয়লার এক-তৃতীয়াংশ আসিত মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র হইতে, লৌহ ও কার্পাসের অর্ধেক এবং খাদ্যশস্য ও পেট্রোলের তিন-চতুর্থাংশ। একমাত্র রবার ও টিনের ঘাটতি তার ছিল, কিন্তু তাও পূর্ণ হইতে লাগিল এশিয়াখণ্ড হইতে। সুতরাং কাঁচামালের ঐশ্বর্যে আমেরিকা ছিল জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং এই কাঁচামাল হইতে 'মাস্ প্রোডাকসন' বা 'গণ উৎপাদন' শব্দটি প্রথম আবিষ্কৃত হইল মার্কিন শিল্প প্রতিভায়, যার পথপ্রদর্শক ছিলেন মোটরগাড়ীর রাজা হেনরি ফোর্ড। মহাযুদ্ধের আবর্তে শত্রু-মিত্র উভয়ে যখন লড়াইতে বিরত, তখন মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকায়, সুদূর প্রাচ্যে এবং ইউরোপে যুধ্যমান, অযুধ্যমান অর্থাৎ সকলকে 'সমান নিরপেক্ষতার' (!) সহিত খাদ্য, বস্ত্র ও সমরসম্ভার জোগাইয়া যাইতে লাগিল। আড়াই বৎসর ধরিয়া এই উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবসায় চলিল এবং পরে

১। 'The World Since the War'—by Stephen King-Hall. Page 40.

মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া জার্মানীর পরাজয়ে সাহায্য করিল। ১৯১৪ সালে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন পৃথিবীর নিকট আমেরিকার ঋণ ছিল ৩০০ কোটি ডলার, আর যখন মহাযুদ্ধের অবসান হইল, তখন সমস্ত মার্কিনী ঋণ শোধ হইয়া গিয়া পৃথিবীর নিকট আমেরিকার পাওনা দাঁড়াইল ১০০০ কোটি ডলার। সুতরাং অবস্থাটা চিন্তা করিবার মত।

মহাযুদ্ধে মার্কিনী উৎপাদনে যে গতিবেগ সঞ্চার হইল, তার ফলে পৃথিবীর কতকগুলি শ্রমশিল্পের উপর তার একচেটিয়া দখল প্রতিষ্ঠিত হইল, যথা মোটরগাড়ী, রেডিও এবং সিনেমাফিল্ম। ১৯২০ সালে আমেরিকায় প্রায় ৭০ লক্ষ মোটরগাড়ী (যাত্রীবাহী) নির্মিত হইয়াছিল, আর ১৯২৯ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়াইল ২ কোটি ৩০ লক্ষ মোটরে! অর্থাৎ প্রতি পাঁচজন বাসিন্দার জন্য একখানি করিয়া মোটরগাড়ী ছিল। (এই তুলনায় ভারতবাসীর আজও একখানি করিয়া কাপড় পর্যন্ত নাই!) প্রত্যেকটি গ্রামে একটি সিনেমা, প্রত্যেকটি গৃহে ও হোটেলের প্রতি কক্ষে একটি একটি টেলিফোন এবং প্রত্যেক মানুষের জন্য চকচকে জুতো ও জামা তৈয়ার হইল। এই উৎপাদনের কোন সীমা সংখ্যা ছিল না। মার্কিন ব্যাঙ্কগুলি ভাবিয়া পাইল না এত টাকা দিয়া তারা কি করিবে এবং উৎপাদকেরা ভাবিয়া পাইল না এত দ্রব্য সামগ্রী কোথায় চালান দিবে। গভর্নমেণ্ট সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডার লইয়া ফাঁপরে পরিলেন—যখের ধন সন্ধান করিতে গিয়া বন্দী হইবার মতন! ফলে, সংক্ষেপে অবস্থাটা দাঁড়াইল এই ঃ

"Europe was in debt to America. America paid the piper and America called the tune. The piper was High Finance and the tune More Production ; the industrialists of the world followed the piper like the children in Browning's poem, and he led them into a cave and they were engulfed in the crisis of 1929."[১]

মার্কিন অর্থ ও মার্কিন শিল্প ধীরে ধীরে পৃথিবীকে এভাবে নিশ্চিত পতনের গহ্বরের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'উত্তমর্ণ রাষ্ট্রে' পরিণত হইল। অর্থাৎ মহাযুদ্ধের সমস্ত মিত্রই তার নিকট ঋণগ্রস্ত ছিল এবং এই ঋণের পরিমাণ ২০০ কোটি পাউণ্ড। ইহার মধ্যে বৃটেনের ঋণের পরিমাণ ছিল ৯২ কোটি পাউণ্ড, আর ফ্রান্সের ৮০ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। এদিকে ইউরোপীয় মিত্র শক্তিবর্গের নিকট বৃটেনের পাওনা ছিল ২২০ কোটি পাউণ্ড এবং রাশিয়ার নিকট ফ্রান্সের পাওনা ছিল ৫ কোটি পাউণ্ড। আবার সমস্ত ইউরোপীয় মিত্রশক্তি জার্মানীর নিকট ক্ষতিপূরণ বাবদ ৬৫০ কোটি পাউণ্ড পাওনা দাবী করিল। ভারতীয় মুদ্রা টাকার হিসাবে এই অঙ্কগুলি আকাশের নক্ষত্রের মত লক্ষ কোটিতে দাঁড়াইবে। বিস্ময়ের কথা এই যে, সেই সময়কার বড় বড় রাষ্ট্রপতিও একথা ভুলিয়া গেলেন যে এত টাকা আদায় করা কেবল অসম্ভই নহে, তেমন চেষ্টা করিতে গেলেও পৃথিবীর অর্থনৈতিক বাজারে বিপর্যয় দেখা দিবে। এবং সেই বিপর্যয় সত্যই দেখা দিল।

আমেরিকার পাওনার জবাবে মিত্রশক্তি উত্তর দিলেন যে, জার্মানী ক্ষতিপূরণের টাকা না দিলে তাঁরাই বা কি প্রকারে আমেরিকার ধার শোধ করিবেন? আর বৃটেন

১। "The Between-War World"—by J. Hampden Jackson, Page 335.

সেই সঙ্গে 'পুনশ্চ' স্বরূপ বলিলেন যে, তাঁর মিত্রবর্গের নিকট যে পাওনা আছে, তা আদায় না হইলে তিনিই বা কিভাবে ঋণমুক্ত হইবেন ?

এভাবে পরস্পরের পাওনা টাকা লইয়া পরস্পরের ঝগড়া চলিল এবং অর্থনীতির বড় বড় পক্ককেশ পাণ্ডা মাথা ঘামাইয়া জার্মানীর কাছ হইতে পাওনা আদায়ের ফন্দী বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন। ১৯২৪ সালে এজন্য 'ডয়েস প্ল্যান' এবং ১৯২৯ সালে 'ইয়ং প্ল্যান' তৈয়ার হইল। আমাদের দেশে যেমন গরুকে ফুকা দিয়া দুধ আদায় করা হয়, এই প্ল্যানও অনেকটা তাহাই ছিল। অর্থাৎ ব্যবস্থা এই ছিল যে, আমেরিকা ও মিত্রশক্তিবর্গ জার্মানীকে টাকা ধার দিবে তার শ্রমশিল্প ও বহির্বাণিজ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য এবং এভাবে জার্মানীর যে অতিরিক্ত রপ্তানী বাণিজ্যের সৃষ্টি হইবে, তাহা হইতে মিত্রশক্তিবর্গ অল্প কিস্তিতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করিবেন।

পাওনা টাকা সম্পর্কে এভাবে একটা জোড়াতালি দিয়া ভার্সাই সন্ধির রচয়িতাগণ আর্থিক জগৎ হইতে রাজনৈতিক জগতের শান্তি রক্ষায় মনোযোগী হইলেন। সন্ধির সর্তানুসারে জার্মানীকে সর্বপ্রকার পঙ্গু, বঞ্চিত ও নিরস্ত্র করিয়া তারপর তাকে রাজনীতির ভদ্রসমাজে গ্রহণ করিতে চাহিলেন। ১৯২৫ সালে লোকর্নোতে (সুইজারল্যাণ্ড) এক সন্ধিচুক্তি হইল এবং এই সন্ধি অনুসারে ইউরোপীয় মিত্রশক্তি ও জার্মানীর মধ্যে নিম্নলিখিত চুক্তি হইল :—

(১) জার্মানী বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগদান করিবে এবং কাউন্সিলের একজন সদস্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) যদি ফ্রান্স জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে বৃটেন ও ইতালী একযোগে ফ্রান্সকে রক্ষা করিবে, আর যদি জার্মানী ফ্রান্স কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে তারা জার্মানীকে রক্ষা করিবে।

ভার্সাই হইতে লোকার্নো পর্যন্ত ইউরোপীয় ইতিহাস এভাবে আবর্তিত হইল। কিন্তু বড় বড় রাজনীতিবিদগণের মূর্খতার ইহাই শেষ পরিচয় ছিল না। মধ্য ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপ লইয়াও মিত্রপুঞ্জের শিরঃপীড়া দেখা দিল। অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য বিদীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং সেখানে অসাধারণ আর্থিক দৈন্য ও জনগণের দুরবস্থা আরম্ভ হইল। জার্মানীর মত সেখানেও কমিউনিস্ট বিদ্রোহ দেখা দিল। আর পূর্ব দিকে রুশ সাম্রাজ্যের পতন হইল। রাশিয়ার সম্রাট বা জার সপরিবারে নিহত হইলেন নিজ প্রজাপুঞ্জের হাতে। গণ-বিপ্লবের অগ্নিশিখা রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র এবং সর্বপ্রকার স্বেচ্ছাচারিতা ও কায়েমী স্বার্থকে গ্রাস করিল। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে বলশেভিকরা লেনিনের নেতৃত্বে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইলেন, উহার ফলে ক্রেনেস্কির অস্থায়ী গভর্নমেন্টের উচ্ছেদ হইল এবং শ্রেণীহীন এক অভূতপূর্ব রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইল। শান্তি, রুটি ও জমি—এই শ্লোগানের দ্বারা রুশ জনগণ উদ্বুদ্ধ হইল। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে রাশিয়া জার্মানীর সহিত প্রভূত ক্ষয় ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে সন্ধি করিল, 'ব্রেস্টলিটোভেস্কের সন্ধি' নামে সেটা ইতিহাসে খ্যাত।

কিন্তু মিত্রশক্তি রাশিয়াকে এত সহজে রেহাই দিলেন না। তারা কমিউনিস্ট বিপ্লব ধ্বংসের জন্য নানা চক্রান্ত করিলেন এবং রাশিয়ার পাল্টা বিপ্লবী জেনারেল ডেনিকিন ও জেনালের কোলচাক প্রভৃতিকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য ও উস্কানি দিলেন। কিন্তু রুশ বিপ্লবের গতি কিছুতেই রুদ্ধ হইল না। একদিকে রণক্লান্ত ইউরোপ এবং অন্যদিকে

'কমিউনিস্ট দৈত্য' এই দুইয়ের পাল্লায় পড়িয়া ভার্সাই সন্ধির রচয়িতাগণ হিমসিম খাইতে লাগিলেন। বহুপ্রকার চেষ্টার দ্বারাও বিপ্লবের গতি ঠেকাইতে না পারিয়া অবশেষে ইঙ্গ-ফরসী মিত্রবর্গ হাল ছাড়িয়া দিলেন এবং ১৯২৫ সালের মধ্যে রাশিয়াও তাল সামলাইয়া উঠিয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাইল। মিত্রপুঞ্জ রাশিয়ার চারিদিকে ফিনল্যান্ড, এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং পোল্যান্ড— এই সমস্ত নূতন রাষ্ট্রের বন্ধনী সৃষ্টি করিয়া নিশ্চিত হইতে চাহিলেন। অন্তত এই কৌশলে তাঁরা কমিউনিজমের সংক্রামক ব্যাধি খাস রাশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে উৎসুক হইলেন। অবশ্য ক্রমে ক্রমে শক্তিবর্গ সোভিয়েট রাশিয়াকে স্বীকার করিয়া নিতে বাধ্য হইলেন। ১৯২৪ সালে বৃটেন তাকে প্রথম স্বীকৃতি দিল এবং পরে অন্যান্য শক্তি বৃটেনকে অনুসরণ করিল। এভাবে ১৯২৫ ও ১৯২৬ সাল লোকার্নো চুক্তির আবহাওয়ায় ইউরোপের বাহ্যিক শান্তি ডাকিয়া আনিল।

কিন্তু স্থায়ী শান্তি ঘটিল না। যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতি আবার দ্রুত ঘটিতে লাগিল এবং প্রথম মহাযুদ্ধের গতিপথে এইদিক দিয়া আর একটা বিপ্লব দেখা দিল। এতদিন পর্যন্ত ভূগর্ভের যে কয়লা ছিল যন্ত্রজগতের অধিপতি উহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হইল পেট্রোল ও বিদ্যুৎ। বড় বড় এবং উৎকৃষ্টতর যন্ত্রপাতি তৈয়ার হইতে লাগিল, কৃষিকার্যে যান্ত্রিকতা প্রবর্তিত হইল এবং কৃত্রিম দ্রব্য তৈয়ারির এক নূতন যুগ আরম্ভ হইল। পৃথিবীর মোট উৎপাদন শক্তি বহুগুণে বাড়িয়া গেল, কিন্তু এই উৎপাদনে সমতা রক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বরং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা এই বর্ধিত সম্পদের বিপরীত পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য লাভের আশায় বহু রাষ্ট্র শুল্ক প্রাচীর তুলিয়া অবাধ বাণিজ্য বা 'ফ্রি ট্রেড'-এর গতি রুদ্ধ করিয়া দিল। মহাযুদ্ধের অসম্ভব খরচ বহু রাষ্ট্রকে ঋণ করিয়া চালাইতে হইয়াছিল। ফলে, তাদের আর ক্রয়ক্ষমতা রহিল না। বৃটেন স্বর্ণমান ত্যাগ করিল (১৯৩১)। আর পরাজিত রাষ্ট্রগুলির দুর্দশা হইল অবর্ণনীয়, অবিশ্বাস্য রকমের মুদ্রাস্ফীতি (ইনফ্লেশন) সর্বব্যাপী অর্থনৈতিক পতন ডাকিয়া আনিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এতদিন ধরিয়া আন্তর্জাতিক অর্থনীতির যে প্রভুত্ব ছিল লণ্ডনে, তার হাত বদল হইল নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রীটে। যুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক ধনকুবের দানবে পরিণত হইল এবং ধনবণ্টনের কোন সমতা ছিল না। ফলে যুদ্ধের রাক্ষুসে ঋণ, অভূতপূর্ব ক্ষতিপূরণের দাবী এবং অসম্ভব মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি মিলিয়া দুনিয়ার অর্থনৈতিক বাজারে ওলোটপালোট সৃষ্টি করিল। ১৯১৯ সালের শরৎকালে নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রীট হইতেই উহার শুরু—যেন যখের ধন মৃত্যু ডাকিয়া আনিল। ১৯২৮ এবং ১৯২৯ সালের প্রথম নয় মাসে নিউইয়র্কের স্টক এক্সচেঞ্জে ফাটকাবাজীর ধুম পড়িয়া গেল। শেয়ারবাজারে এমন পাগলামি দেখা দিল যে, অল্পমেয়াদি ঋণের (সর্ট টার্ম লোন) জন্য শতকরা ২০ টাকা পর্যন্ত সুদ দেওয়া হইতে লাগিল। কিন্তু এমন অসুস্থ উত্তেজনা ও ফাটকাবাজীর পাগলামী কতক্ষণ টিকিতে পারে? সুতরাং অতিদ্রুত শেয়ার বাজারে ভয়াবহ মন্দা এবং ত্রাস দেখা দিল:

"Then panic set in, share values fell so rapidly that on one day alone, in the month of October, 16½ million shares were unloaded

in one day......and the repercussions of the Wall Street crash were felt in the banks and stock-exchanges of all countries.[১]

সোজা কোথায় নিউইয়র্কের শেয়ার বাজারে যে পতন আরম্ভ হইল পৃথিবীর সর্বত্র তাহা ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি করিল। বহু ব্যাঙ্ক উঠিয়া গেল এবং জার্মানীর ব্যাঙ্কগুলি দরজা বন্ধ করিল, বৃটেনে স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হইল, জার্মানী ক্ষতি পূরণ দিতে অস্বীকৃত হইল এবং উপায়ান্তর না পাইয়া মিত্রবর্গকে তাহাই মানিয়া লইতে হইল। এই অবস্থা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুইটি বৃহৎ চেষ্টা হইল। ১৯৩২ সালে জেনেভায় পৃথিবীর সমস্ত রাষ্টের অস্ত্র সীমাবদ্ধ করিবার জন্য একটি বিশ্ব সম্মেলন ডাকা হইলে এবং ১৯৩৩ সালে লণ্ডনে আন্তর্জাতিক সমস্যা মিটাইবার জন্য আর একটি বিশ্ব সম্মেলনের উদ্বোধন হইল। কিন্তু দুইটি সম্মেলনই শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হইল পারস্পরিক স্বার্থ, অবিশ্বাস, দ্বন্দ ও বিরোধের জন্য। রাজনীতি ও অর্থনীতি উভয় দিক দিয়া যে শোচনীয় দৈন্য আরম্ভ হইল, ১৯৩৩ সাল হইতে তাহা একদিকে ডিক্টেটরির যুগ ও নাৎসীবাদ এবং অন্যদিকে যবনিকার অন্তরালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রচনা করিল। জেনেভায় বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘের দপ্তরে বহু কমিটি ও কনফারেন্সের পর্বতপ্রমাণ কাগজপত্র স্তূপীকৃত হইল—নিরস্ত্রীকরণ হইতে আর্থিক সমস্যা প্রতিকারের চেষ্টা পর্যন্ত বহুপ্রকার সাধু প্রস্তাব বানচাল হইয়া গেল। ওদিকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট 'নিউ ডিল' মারফৎ আমেরিকার আর্থিক শক্তি পুনর্গঠন ও সংহত করিতে লাগিলেন। আর জার্মানী, ইতালী ও জাপানে ফ্যাসিজম ও সামরিকবাদ মাথাঝাড়া দিয়া উঠিল। ১৯৩৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত এই অবস্থা চলিল।

ডিক্টেটরির যুগ

রাষ্ট্রের একচ্ছত্র নায়কতন্ত্র বা ডিক্টেটরি অনেকটা আমাদের দেশের অবতারদের মত। কিন্তু অবতারদের ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা, সুতরা উহার মধ্যে খুনখারাপি ও হিংসার প্রশ্ন নাই, আছে ধর্মগত বিশ্বাস ও সংস্কার। কিন্তু রাজনৈতিক অবতারবাদ হিংসা, ক্ষমতা ও লোভের উৎস। মহাযুদ্ধের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত এবং বিকলাঙ্গ ধনতন্ত্রবাদ ইউরোপে এই নূতন রাজনৈতিক অবতারবাদ ডাকিয়া আনিল একটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া—তাঁর নাম বেনিটো মুসোলিনী এবং পরে তাঁকে ছাড়াইয়া গেলেন এডলফ হিটলার। অবশ্য আমাদের দেশেও মুসোলিনী ও হিটলার অনেক দিন পর্যন্ত নূতন রাজনৈতিক অবতার-রূপে পূজিত হইয়াছিলেন। এমন কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলেও কোন কোন মহলে এদের জন্য যথেষ্ট দরদ ছিল। এর মূলে ছিল ভারতবর্ষের পরাধীনতা এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর স্বাভাবিক ক্ষোভ। আর পরাজিত জার্মানীর জন্য দরদ বোধ। সেই সময়কার কোন কোন জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে, পুস্তকে ও বক্তৃতায় মুসোলিনী ও হিটলারের যথেষ্ট বন্দনা হইয়াছে আমাদের দেশে এবং কিভাবে তাঁরা স্ব স্ব দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ, উন্নত ও শক্তিশালী করিয়াছেন, বারবার সেই দৃষ্টান্ত দেখানো হইয়াছে।

১। 'The World Since the War'—by Stephen King Hall. Page 53.

কিন্তু মুসোলিনী বা হিটলারের ক্ষমতা লাভের পিছনে ছিল ধাপ্পাবাজী, হিংসা ও জবরদস্তি। আর তথাকথিত গণতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রসমূহের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যা পূরণে শোচনীয় ব্যর্থতা ও কমিউনিজমের প্রতি বিদ্বেষ। মহাযুদ্ধের দ্বারা বিধ্বস্ত ইউরোপীয় জনগণের একাংশকে তাঁরা বুঝাইতে পারিলেন যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা কোন সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না, জাতীয়তাবাদের শক্তি পুষ্টিলাভ করিতে পারে না, আর ইঙ্গ-ফরাসীর প্রভুত্ব দমিত না হইলে জাতীয় রাষ্ট্রের উন্নতিও সম্ভব নহে। তাঁরা বার বার পুঁজিপতি, জমিদার ও কায়েমী স্বার্থের বাহকদের দৃষ্ট আকর্ষণ ও সমর্থন লাভ করিলেন কমিউনিজমের বিরোধিতার দ্বারা এবং বেকারদিগকে তাঁরা আকৃষ্ট করিলেন নূতন কর্মের সন্ধানের দ্বারা। ইতালী ছিল এ বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক। ১৯১৫ সালে ইতালী মিত্রপক্ষের 'ঘুষের' প্রলোভনে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। নূতন ভূমি লাভে প্রলুব্ধ হইয়া ইতালী অস্ত্রধারণ করিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের শেষে ফ্রান্স ও বৃটেন সেই প্রতিশ্রুতি তেমনিভাবে রক্ষা করিল না। প্রেসিডেণ্ট উইলসন শান্তি সম্মেলনে ইতালীকে উৎকোচ দেওয়ার দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়িলেন। কারণ একমাত্র যুগোশ্লাভদিগকে বলি দিয়াই ইতালীর তৃপ্তি বিধান সম্ভব ছিল। এদিকে ১৯১৭ সালে ক্যাপোরেটোর যুদ্ধে ইতালীর বিষম পরাজয় হইয়াছিল। সেই পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া এবং যুদ্ধশেষে মিত্রবর্গ কর্তৃক 'বঞ্চনা' মিলিয়া ইতালীকে পাগল করিয়া তুলিল। ভয়ংকর রাজনৈতিক বিরোধ, শ্রমিক ধর্মঘট ও আর্থিক দুর্গতি ইত্যাদি ইতালীর সমাজজীবনে নিদারুণ তাণ্ডব ঘটাইল। এই সময় দেখা দিলেন বেনিটো মুসোলিনী। তিনি ছিলেন একজন কর্মকারের (ব্লাকস্মিত) পুত্র। যুদ্ধের সময় সৈন্যদলে তিনি ছিলেন একজন কর্পোরেল এবং আহত হইয়াছিলেন। পরে তিনি একটি বামপন্থী পত্রীকার সম্পাদক হন। কিন্তু তিনিই গঠন করলেন ফ্যাসিস্ট পার্টি—কমিউনিজমের একান্ত বিরোধীরূপে। যুদ্ধের ফল লাভে বঞ্চিত হইয়া এবং ইতালীর রাজনৈতিক ও আর্থিক দৈন্যের ফলে হতাশ হইয়া উগ্রপন্থীর দল মুসোলিনীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। তারা ইউনিফর্ম হিসাবে কালো-কুর্তা ব্যবহার করিল—এজন্য ইহাদের নাম ছিল ব্ল্যাকসার্টস। তারা পুরানো রোমক সাম্রাজ্যের কতগুলি চিহ্ন প্রবর্তন করিল এবং সেই পুরানো কায়দাই হাত তুলিয়া অভিবাদন বা 'স্যালিউট'-এর রীতি অনুসরণ করিল। প্রকৃতপক্ষে মুসোলিনী বুঝাইলেন যে, পুরাতন রোমক সম্রাজ্য আবার নবীন ইতালী স্থাপন করিবে। তার দলে ৪০ হাজার লোক জুটিল এবং যখন উত্তর ইতালীতে ব্যাপক ধর্মঘট চলিতে লাগিল এবং গভর্নমেণ্ট তাহা 'দমন' করিতে ব্যর্থ হইলেন, তখন ১৯২২ সালের ২৮শে অক্টোবর মুসোলিনী তাঁর ফ্যাসিস্ট দলসহ রোমে অভিযান করিলেন। ইতালীর অক্ষম রাজা ভিকটোর ইমানুয়েল তাঁকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ১৯২৪ সালে গভর্ণমেণ্ট দখল করিয়া মুসোলিনী ক্রমে সমস্ত বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক দলকে উৎপাটন করিলেন। তিনি রাষ্ট্রের একচ্ছত্র নায়কত্ব করায়ত্ত করিয়া 'ডুসে' (লিডার বা নেতাজী) সাজিলেন। ইতালী মুসোলিনীর সম্পূর্ণ কুক্ষিগত হইল এবং ফ্যাসিস্ট পার্টি ছাড়া আর কোন দল ও প্রতিষ্ঠান রহিল না। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সর্বপ্রকার মতবাদের স্বাধীনতার জবাব হইল—বিরুদ্ধবাদীরা হয় নিহত, না হয় বন্দী বা নির্বাসিত হইল। ইতালীতে পীড়নের স্রোত বহিল। কিন্তু অপরদিকে মুসোলিনী ইতালী রাষ্ট্রকে

শক্তিশালী ও পুনরুজ্জীবিত করিলেন এবং যুবকদিগকে সামরিক মতবাদ এবং রোমক সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠায় মাতাইয়া তুলিলেন। ফলে, ১৯৩৫ সালের ৩রা অক্টোবর আফ্রিকার শেষ স্বাধীন রাজ্য আবিসিনিয়া মুসোলিনীর সৈনদল কর্তৃক আক্রান্ত হইল এবং ১৯৩৬ সালের মে মাসে আবিসিনিয়া ইতালীর দখলে গেল। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গ মুসোলিনীকে বাধা দিতে পারিলেন না। বরং তাঁরা তোষণ ও প্রশ্রয় দানের নীতি শুরু করিলেন, যাহা ১৯৩৯ সালে বিপজ্জনক সীমারেখায় গিয়া পেঁীছিল।

হিটলার এবং জার্মানীর ইতিহাসও কিছুটা মুসোলিনীর ইতালীরই মত। কিন্তু পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও জার্মানীর অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল ইতালীর তুলনায় অনেক বেশী। সুতরাং মুসোলিনীর তুলনায় হিটলার অনেক বেশী বিপজ্জনক বলিয়া প্রতিভাত হইলেন পৃথিবীর শান্তির পক্ষে। সেই কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফ্যাসিজিমের জয়যাত্রা : দুঃসময়ের আসুরিক দাওয়াই ?

১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কায় সারা ইউরোপের সমাজজীবন ও অর্থ-নৈতিক জীবন এমনভাবে নড়িয়া গেল যে, ঊনবিংশ শতকের গণতন্ত্র ও পার্লামেণ্টারি প্রথা যেন ভাঙ্গিয়া পড়ার যো হইল। এর ফলে একদিকে দেখা দিল ফ্যাসিজম এবং অন্যদিকে কঠোর ডিক্টেটরি শাসন। ইতালীতে বেনিটো মুসোলিনী সর্বপ্রথম এই এই পথ দেখাইলেন এবং তিনি প্রায় বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিলেন :

'There is a vacant thorne in every country in Europe waiting for a capable man to fill it.[১]

অর্থাৎ ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশেই একটি করে সিংহাসন খালি পড়ে আছে, যে কোন উপযুক্ত লোকের দ্বারা পূর্ণ হওয়ার আশায়। সত্যি সত্যি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করার ধুম পড়িয়া গেল এবং স্পেন, পোল্যান্ড যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, বুলগেরিয়া, পর্তুগাল, হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়া, ইতালীতে একনাকতন্ত্র বা ডিক্টেটরি প্রতিষ্ঠিত হইল। এক ধরনের ফ্যাসিস্ট শাসন প্রায় সর্বত্র দেখা দিল, যার গুরুরূপে প্রথম আবির্ভূত হইলেন বেনিটো মুসোলিনী (জন্ম ১৮৮৩ সালে এবং মৃত্যু ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে পার্টিসান যোদ্ধাদের হাতে।) যিনি ছিলেন একজন কর্মকারের পুত্র। কিন্তু পিতা ছিলেন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, ছোট বেলা পিতার এই রাজনৈতিক আদর্শ পুত্রকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। অবশ্য পরে তিনিই সমাজতন্ত্রকে হত্যা করিয়া ইতালীতে ফ্যাসিজমের প্রতিষ্ঠা দেন। কিন্তু ফ্যাসিজমের কোন উচ্চতর তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কারণ, এই ধরণের ক্রুর রাষ্ট্রসর্বস্ব মতবাদ, যাহা কমিউনিজম, লিবারেলইজম, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের একান্ত বিরোধী, অথচ ধনতন্ত্রের পাহারাদার ও পৃষ্ঠপোষক। একজন লেখক বলিতেছেন :

Once in power the Fascists must follow certain inevitable steps : first destory the working class organisation, secondly muzzle the organs of democratic opinion, thirdly guarantee the profits of big business by organising commerce and industry on lines of monopoly capitalism, fourthly give employment to the workers and dividend to the shareholder by giganatic schemes of rearmament.[২]

সম্ভবত এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই ফ্যাসিজমের চেহারা ও চরিত্র বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট এবং সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে শ্রমশিল্পে অনুন্নত ও অর্থনীতিতে বিপর্যস্ত দেশগুলিতেই এই মতবাদ শিকড় গাড়িয়া বসে।

1। Glimses of World History—Jawaharlal Nehru. p. 820

2। The Between War-world—by J. Hampden Jackson. p. 84

'যুদ্ধের পুরস্কার' লাভে বঞ্চিত এবং ক্ষত-বিক্ষত ইতালীই প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্র-পক্ষের দোসর হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপে ফ্যাসিজমের প্রতিষ্ঠা দেয় এবং মুসোলিনীকে কেন্দ্র করিয়াই ফ্যাসিস্ট আন্দোলন নানা দেশে ঢেউ তুলতে থাকে। প্রায় একযুগ পরে জার্মানীতে হিটলার ইহার অনুসরণ করেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, পরাজিত জার্মানীতে আগে ইহার প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু ১৯১৮ সালের নভেম্বরে জার্মানীতে যে বিপ্লব অন্ততঃ বাহ্যত অনুষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল, ইতালীতে সেই বৈপ্লবিক তরঙ্গ দেখা দিয়া থাকিলেও উহা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে প্লাবিত কিংবা দখল করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করিবার জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব ও দল ছিল না। জার্মানীতে শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লব ঘটাইয়া থাকিলেও সাম্যবাদী লেখকগণের মতে সমাজতান্ত্রিক বা সোসিয়েল ডেমোক্রাট দল উহার উপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বজায় রাখেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরাই সেই বিপ্লবকে পাল্টা-বিপ্লবীদের যূপকাষ্ঠে বলি দেন। কিন্তু ইতালীতে সমাজ-তন্ত্রী দল বিপ্লবের উপর কোন কর্তৃত্ব খাটাইতে পারিলেন না কিংবা জার্মানীর মত ইতালীর শ্রমিকের প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্রুরতার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধও চালাইতে পারিলেন না। সুতরাং ইতালীতে ফ্যাসিজম অতি দ্রুত আত্মপ্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিল।

১৯১৯ ও ১৯২০ সাল ধরিয়া ইতালীতে বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট চলিতে লাগিল। কিন্তু সোসিয়েলিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ছিল দুর্বল এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তর ইতালীতে এক ব্যাপক ধর্মঘটের অনুষ্ঠান হইল। ৬০০ কারখানার মোট ৫ লক্ষ শ্রমিক ইহাতে জড়াইয়া পড়িল। তারা প্রায় একাধিপত্য স্থাপন করিল এবং গভর্নমেণ্ট ও মালিক, উভয়পক্ষই অসহায় হইয়া পড়িল। এমনকি, সৈন্যবাহিনীকে পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারা গেল না। অর্থাৎ বিপ্লবী দল কর্তৃক রাষ্ট্র দখলের একান্ত সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেই সন্ধিক্ষণে সোসিয়েলিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘ-গুলি কেবলমাত্র 'অর্থনৈতিক সমস্যার' উপর জোর দিলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের প্রশ্ন উপেক্ষা করিলেন—গভর্নমেণ্ট দখল ও গঠনের পক্ষে যাহা ছিল অপিরহার্য। সুতরাং গভর্নমেণ্টের সঙ্গে এই মর্মে আপোষ হইল যে, দখলীকৃত কারখানাগুলি শ্রমিকেরা অবিলম্বে ছাড়িয়া দিবে, শতকরা ২০ টাকা হারে তাদের মজুরী বৃদ্ধি ঘটিবে এবং সেই সঙ্গে কারখানা পরিচালনায় শ্রমিকদের একটা অংশের কথাও ছিল, যাহা পরবর্তীকালে কোন কাজেই আসে নাই। এভাবে শাসকবর্গ ও মালিকশ্রেণীর সহিত আপোষের দ্বারা গণবিপ্লবের আরম্ভকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এই সময় মুসোলিনী ও তাঁর ফ্যাসিস্ট দলের বিশেষ কোন পাত্তা-ছিল না, তাঁরা সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের স্রোতেই গা ভাসাইয়া চলিতেছিলেন। কিন্তু বৈপ্লবিক শ্রমিক সংহতি আপোষ-রফার দ্বারা ভাঙ্গিয়া পড়িবার পর মুসোলিনী ক্রমশ গা-ঝাড়া দিতে লাগিলেন। লিবারেল নেতা গিওলিট, মডারেট সোসিয়েল ডেমোক্রাট নেতা বোনামি, পপুলার পার্টি নেতা স্টারজো প্রভৃতির প্রধান মন্ত্রিত্বের আমলে একদিকে চলিতে লাগিল আপোষ ও বাহ্যিক শ্রমকল্যাণ নীতি, কিন্তু অন্য দিকে চলিতে লাগিল ধনিক ও প্রতিক্রিয়াশীলদের হিংস্রনীতি পরিপোষণের জন্য প্রস্তুতি। জার্মানীতে হিটলারের মত ইতালীতে মুসোলিনীকেও এই কার্যে ব্যবহার করা হইতে লাগিল কিংবা তাঁকে প্রশ্রয় দেওয়া

হইতে লাগিল। ১৯২০ সালের পর হইতে বড় বড় জমিদার এবং কল-কারখানার মালিক ও পুঁজিপতিগণ নবগঠিত ফ্যাসিস্ট দলকে কৃষক ও মজুরদের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেওয়ার জন্য প্রভুত সাহায্য করিতে লাগিলেন। এবং ফ্যাসিস্ট সদস্য সংখ্যা ১৯২০ সালে ২০ হাজার হইতে ১৯২১ সালে ২৪৮ হাজারে দাঁড়াইল। সামরিক কর্তৃপক্ষ অস্ত্র সরবরাহ করিলেন, পেশাদার অফিসারেরা ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে ট্রেনিং ও 'রণ-ক্রিয়ার' শিক্ষা দিলেন। জেনারেল স্টাফ বা সেনামণ্ডলী নির্দেশ দিলেন ফ্যাসিস্ট সংঘগুলিকে সমর্থনের জন্য। কৃষক ও শ্রমিকদিগকে কঠোরভাবে নিরস্ত্র করা হইল এবং ফ্যাসিস্টদিগকে অস্ত্র বহন করিতে দেওয়া হইল। হত্যা, হিংসা ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট হয় নিরপেক্ষ না হয় উদাসীন সাজিল। কিন্তু সোসিয়েলিস্ট ও শ্রমিকদিগকে কঠোর সাজা দেওয়া হইল। ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে বলোগনা শহর হইতে ফ্যাসিস্টদের পার্টির বিবৃতিতে দেখা যায় যে, ১৯২১ সালে জানুয়ারী এবং মে মাসের মধ্যে ফ্যাসিস্টরা ১২০টি শ্রমিক হেড কোয়ার্টার ধ্বংস, ২৪৩টি সোসিয়েলিস্ট কেন্দ্র ও গৃহ আক্রমণ, ২০২জন শ্রমিককে খুন ও ১,১৪৪ জনকে জখম করে। এই সময় ধৃত শ্রমিকের সংখ্যা ২,২৪০ জন।

তথাপি ১৯২১ সালে সাধারণ নির্বাচনে দেখা গেল যে, সোসিয়েলিস্ট ও কমিউনিস্টরা অনেকে বেশী ভোট ও সদস্য পদ পাইয়াছেন—সোসিয়েলিস্ট ১২২টি এবং কমিউনিস্টরা ১১৬টি আসন কিন্তু ফ্যাসিস্টরা মাত্র ৩৫টি সদস্যপদ দখল করিয়াছে। সুতরাং সমাজতন্ত্রীপক্ষ দলে অনেক গুণ ভারী ছিল। কিন্তু নিয়ম-তান্ত্রিকতা, আপোষরফা ও ভ্রান্তবুদ্ধির পাল্লায় পড়িয়া তাঁরা এই শক্তি নষ্ট করিলেন। ১৯২১ সালের ৩রা আগস্ট ফ্যাসিস্ট ও সোসিয়েলিস্ট দলের সহিত এক চুক্তি স্থাপিত হইল এবং উহার দ্বারা সর্বপ্রকার হিংসাত্মক কার্যের অবসান ঘোষণা করা হইল। স্বয়ং মুসোলিনী এবং তাঁর সহকর্মীরা ছিলেন এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী। কিন্তু এই স্বাক্ষরিত ঘোষণা কাগজপত্রেই রহিয়া গেল, ফ্যাসিস্ট দলের সন্ত্রাসবাদে কোন মন্দা পড়িল না। তারপর ১৯২২ সালের জুলাই মাসে টুরাটির নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রীদল এক কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করিতে চাহিলেন। কিন্তু সর্তে বনিবনা হইল না। তখন তাঁরা 'জেনারেল স্ট্রাইক' সর্বজনীন ধর্মঘট আহবান করিয়া গভর্নমেন্টের উপর চাপ দিতে চাহিলেন। ১লা আগস্ট এই আহবান জানান হইল। কিন্তু ইহার জন্য কোন প্রস্তুতি, সংঘশক্তি ও লড়াইয়ের আয়োজন সম্পূর্ণ করা ছিল না। সুতরাং ইহা ব্যর্থ হইল, অধিকন্তু ইহার ফলে ফ্যাসিস্টরা তাঁদের হিংসাত্মক অভিযানের অধিকতর সুযোগ পাইল এবং রক্ষণশীল ও কায়েমী স্বার্থের বাহকেরা তাহাই চাহিতেছিল।[১]

এর পর ফ্যাসিস্টদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের শেষ 'পর্ব'। রাজা, সেনানায়ক ও মন্ত্রীসভা সকলে মিলিয়া ইহার ভূমিকা রচনা করিলেন অক্টোবর মাসে। ২৮শে অক্টোবর ফ্যাসিস্টরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে 'মার্চ অন রোম' বা রোম অভিযানের এক প্রাহসনিক আয়োজন করেন। প্রকৃতপক্ষে সেনাবিভাগের ৬ জন সেনাপতি এই 'মার্চের' প্রস্তুতি করিয়াছিলেন এবং আগের দিন সন্ধ্যায় স্বয়ং সেনাপতি এক উৎসাহী ফ্যাসিস্ট

১। ১৯২১ সাল পর্যন্ত ইতালীতে কমিউনিস্টদের কোন পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। ঐ বৎসর জানুয়ারী মাসে তাঁরা নূতন পৃথক দল গঠন করেন।

২। আর পাম দত্ত প্রণীত 'ফ্যাসিজম অ্যান্ড সোস্যাল রেভল্যুশান' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন। মন্ত্রীসভা বাহ্যত এক সামরিক আইন জারী করেন। ফলে, অসামরিক কতৃপক্ষের সমস্ত ক্ষমতা গিয়া পড়িল মিলিটারির হাতে এবং তারা ফ্যাসিস্টদিগকে সমস্ত সরকারী ভবন ও দপ্তর রেলওয়ে ডাক ও তার বিভাগ ইত্যাদি দখল করিতে দিল। ইহার পর ২৮শে অক্টোবর সকালে রাজকীয় নির্দেশে সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হইল, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলা হইল যে, ফ্যাসিস্টদের আক্রমণের বিরুদ্ধে রোম নগরী রক্ষা করা সম্ভব নহে। সুতরাং মুসোলিনীকে ডাকা হইল মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য। তিনি কোন 'মার্চ' করিয়া আসিলেন না, বরং ৩০শে অক্টোবর তিনি রোমনগরীতে আসিলেন 'ঘুমের গাড়ী'তে বা 'স্লিপিং কারে'। ইহাই মুসোলিনীর বিপ্লব এবং ফ্যাসিস্ট জয়যাত্রার মর্মকথা। ১৯২৩ সালে ইহার শুরু এবং ১৯২৬ সালে মুসোলিনী পুরপুরি ডিক্টেটররূপে ইতালীর একচ্ছত্র শাসক হইয়া বসিলেন এবং সমস্ত বিরোধিতাকে হিংস্রতা, কঠোরতা ও বর্বরতার দ্বারা নিশ্চিহ্ন করিলেন।

এরপর জার্মানীর পালা এবং নাৎসী জার্মানীই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বপ্রধান হোতা।

জার্মানীতে ফ্যাসিজিমের প্রতিষ্ঠা

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে জার্মানীতে বিপ্লব আরম্ভ হইল এবং এই বিপ্লব[১] শুরু করিল সৈন্য, নাবিক ও শ্রমিকের দল। যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার এক পক্ষকাল পূর্বে তারা বিদ্রোহ বাধাইল এবং সম্রাট ও অভিজাতবর্গের রাজত্বের অবসান ঘটাইল। উইলহেলমস্যাভেনের নৌবহরে প্রথম এই বিদ্রোহ দেখা দিল এবং অতি দ্রুত ইহা কিয়েল, হ্যাম্বুর্গ, ব্রেমেন ও বাল্টিক সমুদ্রতীরে ছড়াইয়া পড়িল। বন্দরে-বন্দরে সৈন্য, নাবিক ও শ্রমিকেরা লাল ঝাণ্ডা উড়াইল এবং নিজেদের 'সোভিয়েট' গঠন করিয়া ক্ষমতা হস্তগত করিল। জার্মানীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধ্বনিত হইল। কাইজার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দেশত্যাগী হইলেন। ৯ই নভেম্বর বার্লিনে প্রায় বিনা রক্তপাতে যে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইল তাতে সারাদিনে মাত্র ১৫ জন নিহত হইল এবং সেই ১৫ জনের জীবনের বিনিময়ে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হোহেনজোলার্ন রাজবংশের পতন হইল, যে রাজবংশ পাঁচশ বছর ধরিয়া প্রুশিয়ার উপর শাসন চালাইয়াছিলেন (প্রকৃতপক্ষে প্রুশিয়ায় ছিল অনেক জার্মান এবং এখানকার আভিজাতরা জার্মানীতে সামরিক ও অসামরিক নেতৃত্বের উৎস ছিল) এবং যাঁদের অধীনে সমগ্র জার্মানী ক্রমে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। এর সঙ্গে জার্মান সাম্রাজ্যের ২০টি উপরাজবংশেরও পতন হইল এবং জার্মানী সোসিয়েলিস্ট পার্টি নেতা ইবার্টের অধীনে রিপাবলিক রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

এই সমাজতন্ত্রী দল বা ডেমক্রেটিক পার্টি দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দুই অংশে বিভক্ত ছিল এবং প্রেসিডেণ্ট ইবার্ট ছিলেন প্রথম অংশের দলভুক্ত এবং তাঁরাই ছিলেন বৃহত্তম মেজরেটি। তাঁরা গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারী শাসন চাহিতেছিলেন, কিন্তু অপরাংশ স্বতন্ত্র সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ শাসনের উপর সোভিয়েট

১। জওহরলাল নেহরুর মতে এই বিপ্লব ছিল অবাস্তব। কারণ, কাইজার অপসৃত হইলেন বটে, কিন্তু সেই পুরোনো রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই বজায় রহিল—লেখক। (Glimpses of World History, Page 912)

রিপাবলিক স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। আর চরমবাদী কমিউনিস্টপন্থী দল, যাঁদের নেতা ছিলেন কার্ল লিয়েবনেক্‌ট, অবিলম্বে সশস্ত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটরি স্থাপন এবং মূলধনওয়ালা ও পুঁজিপতিদিগকে উচ্ছেদ করিতে চাহিতেছিলেন। সুতরাং রাজবংশের পতনের এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবসানের পর সোসিয়েলিস্ট মেজরিটি (মাইনরিটিদের কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব রহিল না) ও কমিউনিস্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা দিল।[১]

এক পক্ষ গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টারী শাসন প্রবর্তন এবং মিত্রপক্ষের সহিত মৈত্রীর দ্বারা জার্মানীর আশু সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহিলেন। আর অপর পক্ষ অবিলম্বেই ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটাইয়া শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটরি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন।

১৯১৯ সালের ৬ই জানুয়ারী কমিউনিস্টরা ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্যে বার্লিনের কয়েকটি সংবাদপত্র অফিস এবং সরকারী ভবন দখল করিলেন। কিন্তু সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল রাজতন্ত্রী সৈন্যবাহিনীর (ইম্পিরিয়াল আর্মি) সাহায্যে তাঁদের বিতাড়িত করিলেন এবং এই বিদ্রোহ দমনের পর শুরু হইল রাজধানী বার্লিনে 'টেরার' বা ত্রাস সৃষ্টির পালা। কমিউনিস্টরা দমিত এবং নেতারা ধৃত হইলেন। জার্মান কমিউনিস্ট দলে রোজা লাক্সেমবুর্গ ছিলেন সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও প্রভাবশালী নেত্রী। এই বীর নেত্রী এবং কার্ল লিয়েবনেক্ট ধৃত হইলেন এবং কারাগারে নীত হইবার পথে পুলিশেরা তাঁদেরকে বর্বরের মত খুন করিল। বলাবাহুল্য যে, ১৯১৭ সালের সোভিয়েট বিপ্লবের প্রেরণায় কয়েক মাসের মধ্যেই পরাজিত জার্মানীতে ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরীতে বিপ্লবের তরঙ্গ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু সেই বিপ্লব হাতে-কলমে রূপায়িত হইতে পারে নাই, বরং অঙ্কুরেই তার বিনাশসাধন হইয়াছিল প্রতিক্রিয়াশীলদের ও বিরুদ্ধবাদীদের হাতে এবং তখন জনসাধারণের মধ্যেও তেমন কোন ব্যাপক সমর্থন ছিল না, যদিও জার্মানীতে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ই লিয়েবনেক্ট ও রোজা লাক্সেমবুর্গের নেতৃত্বে বামপন্থী দলের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং এই দল স্পার্টাকাস লীগ নামে যে সংগঠন গড়িয়াছিল, ১৯১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সেই সংগঠন থেকেই জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসের সাত দিন ধরিয়াই সরকারী সামরিক নেতারা স্পার্টাসিস্ট (কমিউনিস্ট) ও বাম সোসিয়েল ডেমক্রেটদের এবং সেই সঙ্গে হাজার হাজার শ্রমিককে হত্যা করে। এরপর সমাজতন্ত্রী দল এবং অন্যান্য দল মিলিয়া জার্মানীতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করিলেন এবং ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁরা ভেইমার শহরে মিলিত হইলেন নূতন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য। ইতিহাসে ইহাই ভেইমার শাসনতন্ত্র বা 'ভেইমার কনস্টিটিউশান' নামে পরিচিত। পার্লামেণ্টারী প্রথার ভক্তেরা দাবী করেন যে, ভেইমার শাসনতন্ত্রের মত এমন চমৎকার গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র পৃথিবীতে খুব কমই রচিত হইয়াছে। কিন্তু শাসনতন্ত্র চমৎকার হইলে কি হইবে, রাজতন্ত্রী, সাম্যবাদী এবং অন্যান্য চরমবাদীদের নিকট ইহা অস্পৃশ্য ছিল। ১৯২০ সালের ১২ই মার্চ বার্লিনের রাজতন্ত্রবাদী প্রবীণ সেনাপতি ব্যারন ফন লুৎভিৎস আট হাজার সৈন্যের সাহায্যে রাজধানী দখল করিলেন এবং ফন ক্যাপ নামক এক ব্যক্তিকে প্রেসিডেণ্ট

১। 'The Beteen War-world', 1947 by J. Hampden Jackson, Page 32

বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইবার্টের হাতে কোন সৈন্য ছিল না, সুতরা তিনি নিরুপায় ছিলেন। কিন্তু সেই দুর্দিনে জার্মান শ্রমজীবিরা অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিলেন, তাঁরা তাঁদের ইউনিয়ন নেতাদের কোন হুকুমের অপেক্ষা না রাখিয়াই সর্বজনীন ধর্মঘট ঘোষণা করিলেন। হঠাৎ বার্লিনের সমগ্র জীবনযাত্রা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল—জল নাই, আলো নাই, ট্রাম নাই, ট্রেন নাই, সমস্ত কিছুই বন্ধ। তখন ফন ক্যাপ ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকেরা পলায়ন করিলেন এবং এভাবে জার্মান শ্রমিকেরা ভেইমার শাসনতন্ত্রকে রক্ষা করলেন। কিন্তু এদিকে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় র্জামানীতে খাদ্যাভাব, দুর্নীতি ও অরাজকতা লাগিয়াই ছিল। যুদ্ধবিরতির এক বৎসর পর অন্ততঃ ৭ লক্ষ লোক মারা গেল পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এবং শিশুমৃত্যুর সংখ্যা দ্বিগুণ দাঁড়াইল। তারপর আসিল ভের্সাই সন্ধির অভাবনীয় নির্দয়তার এবং অসম্ভব ক্ষতিপূরণের দাবী। এমনকি তখনকার দিনের জার্মান-বিরোধী বৃটিশ গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত মনে করিলেন যে, জার্মানী ক্ষতিপূরণস্বরূপ বড় জোর ২০০ কোটি পাউণ্ড দিতে পারে, কিন্তু জার্মানীর নিকট দাবী করা হইল এর চেয়ে তিনগুণেরও বেশী। এরপর ১৯২৩ সালে ফ্রান্স জোর করিয়া দখল করিল রুর খনি অঞ্চল, ১০ লক্ষ বেকার এবং অর্ধভুক্ত জার্মান শ্রমিক ইহাতে বাধা দিল সত্যাগ্রহের দ্বারা। ক্ষুধার্ত শিশুসন্তানসহ রুরের অনশনক্লিষ্ট শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্তগণ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ জাগাইয়াছিল, সেদিনের ইউরোপীয় ইতিহাসে তার তুলনা ছিল না।

এরপর জার্মানীর প্রতি মিত্রশক্তির নীতি ও মনোভাবের কিছু পরিবর্তন ঘটিল পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং ইউরোপের শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যের জন্য। ১৯২৪ হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত চলিল এই বাহ্যিক শান্তির যুগ এবং প্রেসিডেণ্ট স্ট্রেটম্যানের আমলে জার্মানীও এই বাহ্যিক শান্তি ও উন্নতি বজায় রাখিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার অবস্থা ছিল ইনজেকশান দেওয়া রোগীর মত, যার ফলে তার অসুস্থ রাষ্ট্রদেহের ব্যাধি নিরাময় না হইয়া চাপা পড়িতেছিল মাত্র। জার্মানীর আসন্ন দুরবস্থার কোন প্রতিকার সোসিয়েল ডেমোক্রাট গভর্নমেণ্ট করিতে পারিতেছিলেন না। ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রক্ষণশীল হইতে কমিউনিস্ট এবং ন্যাশনাল সোসিয়েলিস্ট (হিটলারী দল) পর্যন্ত সকলেই এই গভর্নমেণ্ট ধ্বংসের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ১৯২৪-২৮ সালে সমগ্র ইউরোপের মত জার্মানীও কেবলমাত্র ঋণের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছিল। এই ঋণ ছাড়া তার পক্ষে কলকারখানা ও ব্যবসা-বানিজ্য গড়িয়া তোলা সম্ভব ছিল না এবং এই সমস্ত শিল্প-বাণিজ্য হইতে যে মুনাফা হইত, তা দিয়া মিত্রপক্ষের ক্ষতিপূরণ বাবদ কিস্তির টাকা শোধ দিতে হইত। ডয়েস প্ল্যান অনুসারে জার্মানীকে এজন্য প্রতি সেকেণ্ডে ৮০ মার্ক (জার্মান মুদ্রা) এবং প্রতি ঘণ্টায় ২,৮৮,০০০ হাজার মার্ক শোধ দিতে হইত এবং তাহাও অপারিমিত কাল পর্যন্ত। ১৯২৯ সালে ইয়ং প্ল্যান অনুসারে এই 'অপারিমিত কাল'কে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল, অর্থাৎ ৫৯ বৎসর ধরিয়া জার্মানীকে ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে হইবে। তারপর ১৯২৯ সালের অক্টোবরে ঘটিল নিউইয়র্কের স্টক এক্সচেঞ্জের পতন এবং পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দার যুগ। জার্মানী দেউলিয়া হইয়া গেল। হিটলারী দলের শক্তিবৃদ্ধি ঘটিতে লাগিল এবং যে মতবাদ তাঁর 'জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল' প্রচার করিতে লাগিল তার মূল কথা হইল :

—'anit-Jew, anti-profiteer, anti-foreigner, anti-Weimar, anti-Versailles.'

জার্মানীর পক্ষে এই শ্লোগান নূতন মুক্তিমন্ত্ররূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। জনৈক গ্রন্থকার মন্তব্য করিতেছেন,

'It is a wonder that any German could resist what Hitler offered at this time. A doctrine combining Nationalism and Socialisms is enough to go to the head of any hungry and humiliated country.[১]

'এই সংকটের ফলে হিটলার যে সমস্ত প্রস্তাব করিলেন, তাতে কোন জার্মানের পক্ষে বাধা দেওয়াও বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইতে পারে। কেননা, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র, এই দুইয়ের সংমিশ্রণে যে মতবাদ প্রচারিত হইল, তা যে কোন ক্ষুধার্ত ও অপমানিত দেশের মাথা ঘুরাইয়া দেওয়ার পক্ষেই যথেষ্ট ছিল!' এবং হিটলার জার্মানীর মাথা সত্যই ঘুরাইয়া দিলেন।

কিন্তু সোসিয়েল ডেমোক্রাট (যাঁদের হাতে গভর্নমেণ্ট ছিল) এবং কমিউনিস্ট এই দুই শক্তিশালী দল থাকিতে হিটলার ও তাঁর ন্যাশনাল সোসিয়েলিস্ট পার্টি সমগ্র জার্মান রাষ্ট্রকে কুক্ষিগত করিলেন কিভাবে এবং কেনই বা নাৎসীবাদ জয়যুক্ত হইল?

সাম্যবাদী লেখকগণের মতে এর মূল কারণ ছিল জার্মান বিপ্লবের প্রতি সোস্যাল ডেমোক্রাট দলের বিশ্বাসঘাতকতা অর্থাৎ সৈন্য ও শ্রমিক সাধারণ ১৯১৮ সালে যে বিপ্লব ঘটাইলেন এবং রাজতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করিলেন, তা যেমন সোসিয়েল ডেমোক্রাট দলের অনভিপ্রেত ছিল না, তেমনি তাঁরা বার্লিনে 'সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট' প্রতিষ্ঠিত হইতে দিলেন না। তাঁরা একদিকে নূতন সাম্যবাদী দলকে (মাত্র ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হইয়াছিল) প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন এবং অন্যদিকে ধনিক, অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গেই হাত মিলাইয়া চলিতে লাগিলেন। আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামো হিসাবে বর্ণিত 'ভেইমার শাসনতন্ত্র' প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া সমাজের সহিত মিলনের ভিত্তিতেই রচিত হইয়াছিল। সুতরাং নূতন বিপ্লবের বনিয়াদ এর মধ্যে ছিল না। যদিও জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির ইতিহাস একদা গৌরবমণ্ডিত ছিল, এমনকি ইউরোপের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর উপর এই পার্টির আধিপত্য ছিল সর্বাধিক। এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক কর্মধারা গ্রহণ করিয়া তারা দীর্ঘকাল বিসমার্কের পীড়ননীতির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আসিতেছিল, তথাপি, বিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী আবহাওয়ায় এই দল সুবিধাবাদী, নীতিভ্রষ্ট এবং সংশোধনী মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইয়া পড়িল। ফলে, জনসাধারণের সংকটের দিনে কঠোর সংকল্পের দ্বারা তারা কোন বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা দৃঢ়তার সহিত কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিল না। তারা অতিরিক্ত রকম আইন ও নিয়মতন্ত্রবিলাসী হইয়া পড়িল, যদিও শ্রমিক মহলে তাদের প্রতিষ্ঠা ছিল সর্বাধিক। রাজতন্ত্রী, রক্ষণশীল, ন্যাশনালিস্ট এবং ন্যাশনাল সোসিয়েলিস্ট—এই সমস্ত দলের উগ্রতা, এমনকি বেআইনী কার্যাবলীও তারা সহ্য করিয়া যাইতে লাগিল।[২] একদিকে তাদের এই দুর্বলতা এবং অন্যদিকে জার্মানীর জটিল সমস্যা প্রতিকারে

১। পূর্ব উল্লেখিত পুস্তক।

২। রজনী পাম দত্ত প্রণীত 'Fascim and Social Revolution'—দ্রষ্টব্য।

ব্যর্থতা ক্রমশঃ প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানগুলিকে শক্তিশালী করিতে লাগিল এবং ফ্যাসিজম মাথা চাড়া দিতে লাগিল। ১৯২৩-২৪ সালে মধ্যবিত্ত শ্রেণী মুদ্রাস্ফীতির জন্য সর্বনাশগ্রস্ত হইল এবং বৈপ্লবিক শ্রমিকশক্তি রাষ্ট্রক্ষমতা লাভে ব্যার্থ হইল। এর ফলে, ১৯২৪ সালের মে মাসে নাৎসী দল সাধারণ নির্বাচনে ১০ লক্ষ ৯০ হাজার ভোট পাইল, আর সোসিয়েল ডেমোক্রাট দল ৬০ লক্ষ এবং কমিউনিস্ট দল ৩০ লক্ষাধিক ভোট পাইল। কিন্তু ইউরোপের তথাকথিত শান্তির যুগ ও জার্মানীর বাহ্যিক উন্নতির জন্য এবং সোসিয়েল ডেমোক্রাটগণ কর্তৃক 'নূতন স্বর্গরাজ্য' স্থাপনের রঙীন আশার জন্য নাৎসীদলে ভোট কমিয়া গিয়া ডিসেম্বর নাগাদ ৯ লক্ষে দাঁড়াইল, চারি বৎসর পর উহা আরও হ্রাস পাইয়া মাত্র ৮ লক্ষে দাঁড়াইল, আর সোসিয়েল ডেমোক্রাটরা পাইল ৯০ লক্ষাধিক ভোট। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দার যুগে জার্মানী যখন সর্বস্বান্ত হইল, তখন নাৎসী দলের নূতন শক্তি বৃদ্ধি ঘটিল এবং ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তারা ৬০ লক্ষাধিক ভোট পাইল। আর ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং জুলাই মাসে সাধারণ নির্বাচনে ১ কোটি ৩০ লক্ষাধিক ভোট পাইল। ১৯৩০-৩২ সালে ফ্যাসিস্ট দলের এই আকস্মিক শক্তিবৃদ্ধির কারণ কি? প্রত্যেক দেশেই যখন সংকট দেখা দেয়, গভর্নমেণ্টের প্রতিভা ও বুদ্ধির তখনই সত্যকার অগ্নিপরীক্ষা হইয়া থাকে। পরাজিত জার্মানীর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হইতে লাগিল পৃথিবীব্যাপী আর্থিক সংকট এবং আভ্যন্তরীণ শোচনীয় অবস্থার জন্য। সোসিয়েল ডেমোক্রাট গভর্নমেণ্ট এর উপযুক্ত ছিলেন না। সুতরাং তাঁরা অপসৃত হইলেন এবং শ্রমিকদের যতটুকু সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, আর্থিক দুর্গতির চাপে ধনিক সম্প্রদায় তাও কাড়িয়া লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এই সময় ১৯৩০ সালে হেনরিক ব্রুনিং গভর্নমেণ্টের ভার গ্রহণ করিলেন এবং তিনি পার্লামেণ্টারী শাসনের বদলে ডিক্টেটরি চালাইতে লাগিলেন। তিনি প্রভূত পরিমাণে করভার বৃদ্ধি করিলেন এবং জনস্বার্থ-বিরোধী কতকগুলি বিসদৃশ আইন-কানুন প্রবর্তন করিলেন কিন্তু এদিকে আর্থিক দুর্গতি বাড়িয়াই চলিল এবং বেকারের সংখ্যা দাঁড়াইল ৮০ লক্ষ। সুতরাং ব্রুনিং মন্ত্রিসভাও নেপথ্যে অপসারিত হইল এবং প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ ব্যারন বা অভিজাতদের মধ্য হইতে নূতন চ্যান্সেলার বা প্রধানমন্ত্রীর সন্ধান করিলেন। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা জাতীয় সমাজতন্ত্র ইত্যাদি সমস্তই এদের কাছে অস্পৃশ্য ছিল। কারণ এরা ছিলেন রাজতন্ত্রবিলাসী এবং হিণ্ডেনবুর্গও তাহাই। সুতরাং ফন প্যাপেনের ডাক পড়িল। তিনি ছিলেন ন্যাশনালিস্ট দলপতি এবং তিনিও ডিক্টেটরি শাসন চালাইতে লাগিলেন এবং হিটলারের নাৎসীদলের (যারা নূতন নির্বাচনে রাইখস্ট্যাগে ২৩০টি সদস্যপদ পাইয়াছিল) উপর এক-হাত লইবার জন্য রাইখস্ট্যাগের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিলেন। সংবাদপত্রের উপর খবরদারি ও বেতারের উপর কণ্ট্রোল প্রতিষ্ঠিত হইল এবং প্রুশিয়ার সোসিয়েলিস্ট পার্লামেণ্টের উচ্ছেদ হইল। বহু কমিউনিস্টকে বন্দী এবং ইহুদীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইল। কিন্তু ইহাতেই যখন শেষ রক্ষা হইল না, তখন প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ জেনারেল ফন শ্লেইচারকে প্রধানমন্ত্রী পদে আহ্বান করিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, শ্লেইচার সমাজতন্ত্রীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ায় ট্রেড ইউনিয়নের উপর তাঁর প্রভাব ছিল এবং সেনানায়ক বলিয়া সরকারী সৈন্যদলের উপর

তাঁর কর্তৃত্ব ছিল। এদিকে গদিচ্যুত ফন প্যাপেন হিটলারী দলের সহিত প্যাক্ট করিয়া বসিলেন এবং দুই দল একত্রে রাইখস্ট্যাগে মেজরিটি হইয়া পড়িল। সুতরাং ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী হিটলারের ডাক পড়িল চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণের জন্য। এর আগেই বড় বড় ধনপতি ও শিল্পপতিগণ হিটলারের পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়িয়াছিলেন কমিউনিস্ট অধিপত্যের আশঙ্কায়।

এই সময়ের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া মিঃ আর পাম দত্ত বলিতেছেন ঃ

The class-conscious workers who became disillusioned with Social Democracy passed to Communism. The politically backward elements passed to Facism'.[১]

সোসিয়েল ডেমোক্র্যাসি সম্পর্কে যাদের মোহ ভাঙিয়া গেল, সেই সমস্ত শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক চলিয়া গেল কমিউনিজমের দিকে, আর রাজনীতিতে যারা অনগ্রসর তারা গেল ফ্যাসিজমের দিকে। এর প্রমাণ এই যে, ১৯৩০-৩২ সালের গৃহীত ভোটে সোসিয়েল ডেমোক্রাটরা ১৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ভোট হারাইল, আর কমিউনিস্টরা ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ভোট বেশী পাইল। অর্থাৎ জার্মান শ্রমিকসাধারণের উপর এই দুই দলের যে আধিপত্য ছিল, যদি তার উপর ভিত্তি করিয়া ইউনাইটেড ফ্রন্ট গঠিত হইত, তা হলে হিটলার ও জার্মানীর প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি জয়যুক্ত হইতে পরিতেন না। কিন্তু সাম্যবাদী নেতাদের অভিযোগ এই যে, সোসিয়েল ডেমোক্রাটরা ব্রুনিং-প্যাপেন-হিটলার প্রভৃতির কুশাসন, স্বেচ্ছাচার ও পীড়ননীতিকে সমর্থন করিয়াই চলিলেন এবং কমিউনিস্টদের সহিত হাত মিলাইতে অস্বীকৃত হইলেন। ১৯৩২ সালে দুইবার এবং ১৯৩৩ সালে আরও দুইবার কমিউনিস্টরা ইউনাইটেড ফ্রণ্ট গঠনের যে আবেদন জানাইলেন, সোসিয়েল ডেমোক্রাট দল তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফলে, ধনিকসমাজ ও ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধশক্তি কার্যকরীভাবে দানা বাধিতে পারিল না। তথাপি কমিউনিস্টদের আওতায় পরিচালিত বার্লিন সহরের যানবাহনের কর্মীরা ১৯৩২ সালের নভেম্বর এক ধর্মঘট করিলেন। ফলে, সমস্ত যানবাহন বন্ধ হইয়াও গিয়াছিল, কিন্তু সরকারী হিংস্রনীতি এই ধর্মঘট ভাঙিয়া দেয়। এর পর হিটলারী ডিক্টেটরি ও পীড়ননীতির বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট দল এক সর্বজননী ধর্মঘটের জন্য আহ্বান জানান, কিন্তু সেই আবেদনে সোসিয়েল ডেমোক্রাটদল ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা কোন সাড়া দিলেন না, অথচ সঙ্ঘশক্তির দিক দিয়া এবং কার্যকরীভাবে কলকারখানার শ্রমিকদের উপর এঁদেরই ছিল সর্বাধিক আধিপত্য।

এভাবে দল ও উপদলগত তীব্র বিরোধ, প্রতিক্রিয়াশীলদের জোটপাকানো শক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে বাধাদানে অনিচ্ছা, হিংস্রতা ও বর্বরতার বিরুদ্ধে পাল্টা-অ ঔদাসীন্য এবং চারিদিকে কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত ও শ্রমিকশ্রেণী এবং জন-সাধারণকে ভুল পথে পরিচালনার জন্য হিটলার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভ প্রতিরুদ্ধ হইতে পারিল না। নাৎসীদলের জয়যাত্রা শুরু হইল। তারা বে-পরোয়া, দুর্ধর্ষ এবং গুণ্ডামীতে সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিল। আর হিটলার জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের বুলি আওড়াইয়া এবং সন্ত্রাসবাদীয় নীতি অনুসরণ করিয়া জনসাধারণকে বিমূঢ় ও কুক্ষিগত করিয়া ফেলিলেন। তিনি 'মেঠো বক্তৃতার' বাকচাতুর্যে জনসাধারণকে ডাকিয়া বলিলেন,

১। পূর্ব উল্লিখিত পুস্তক

'আমি তোমাদিগকে সমগ্র জার্মানীর ঐক্য আনিয়া দিব, ঐশ্বর্য দিব এবং অন্যান্য রাজ্যের সহিত সমান মর্যাদার অধিকার দিব। যদি চারি বৎসরের মধ্যে আমি তাহা না করিতে পারি, তবে দেশদ্রোহীর মত আমার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিও।' আর সমস্ত বিরুদ্ধবাদীর বিরুদ্ধে ত্রাস সৃষ্টির জন্য গোয়েরিং পুলিশ বাহিনীকে ডাকিয়া বলিলেন,

'Shoot first and inquire afterwards, and if you make mistakes I will protect you'.[১]

'আগে গুলী চালাও এবং পরে তদন্ত করিও। যদি দেখ যে, ভুল হইয়াছে, তবে আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব।'

এভাবে হিটলারী রাজত্ব আরম্ভ হইল এবং দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণকে যুদ্ধপরবর্তী সর্বপ্রকার শাসনের ব্যর্থতায় গণতন্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া যে কোন আসুরিক দাওয়াইকেই রাষ্ট্রীয় ব্যাধির পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে করিতে লাগিল। সুতরাং ১৯১৮ সালের বিপ্লব যেমন বানচাল হইয়া গেল, তেমনই নাৎসী বর্বতার বিরুদ্ধেও কোন ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটিল না।

বিদ্রোহ দূরের কথা, সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধও ঘটিল না। কারণ, সোসিয়েল ডেমোক্রাট পার্টি, যাঁরা ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী, তাঁরা ক্রমাগত পিছু হটিলেন, কোন ঐক্যবদ্ধ বাধাদানে অস্বীকৃত হইলেন এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে শত্রুতা করিতে লাগিলেন। অথচ হিটলারী ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাঁদের সমর্থক ও প্রভাবাধীন শ্রমিক সংগঠনগুলি, আর কিছু কিছু বিবেকবান বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, জার্মান জনগণের বৃহত্তম অংশ হিটলারকে সমর্থনই জানাইয়াছিলেন এবং ভের্সাই সন্ধির অবমাননা ও দুর্গতি হইতে ত্রাণ লাভের আশায় হিটলারকে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁর বক্তৃতার চাতুর্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, হিটলার আইনসঙ্গতভাবেই জার্মান রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে।

১। The Between-War World—by J. Hampden Jackson—Page 135.

তৃতীয় অধ্যায়

জার্মানীর মহানায়ক এ্যাডলফ হিটলার

পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মত এমন প্রলয়কাণ্ড আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। প্রাকৃতিক জগতে যেমন ভূমিকম্প, তেমনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তুলনা একমাত্র সেই অবিমিশ্র ধ্বংসের সঙ্গেই দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই মহা-প্রলয়ের মহানায়ক কে? কে সমগ্র মনুষ্যজাতিকে এমন সর্বনাশের কিনারায় নিয়া আসিয়াছিল? তাঁর নাম এ্যাডলফ হিটলার, প্রকৃতপক্ষে যাঁকে কেন্দ্র করিয়া সারা পৃথিবী এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আবর্তিত হইয়াছিল। যদিও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি-ভঙ্গির বিচারে এমন কথা বলা উচিত নয় যে, একটিমাত্র ব্যক্তির জন্যই সমগ্র পৃথিবী এভাবে আলোড়িত হইয়াছিল, বরং বলা উচিত যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সম-সাময়িক পৃথিবীর রাজনৈতিক এবং ঔপনিবেশিক ও সামাজি প্রচণ্ড সংঘাতগুলির জন্যই মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল এবং হিটলারের মত এক অবিশ্বাস্য অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল—যেমন সময়-সময় সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গাঘাতে রাক্ষুসে ধরনের অতিকায় তিমি মৎস্য পৃথিবীর তটপ্রান্তে ছিটকাইয়া পড়ে! তথাপি এই 'একক' মানুষটি—স্ত্রী-পুত্র পরিবারহীন 'নিঃসঙ্গ' বিচিত্র এই মানুষটি ইতিহাসের এক অত্যাশ্চর্য এবং হতবুদ্ধিকর ব্যতিক্রমের মত। আলেকজান্দার বা সীজার, নেপোলিয়ন বা স্ট্যালিন কারুর সঙ্গেই এঁর তুলনা দেওয়া যায় না। কারণ, হিটলারের মধ্যে কোন অনন্যসাধারণ মনীষা, কোন গভীর অন্তর্দৃষ্টি কিংবা মানবিকতা ও মমত্ববোধ ছিল না—যদিও কূটনৈতিক বুদ্ধির তীক্ষ্নতা ও সামরিক বিষয়ে তাঁর স্বাভাবিক জ্ঞান ও বক্তৃতা দানের আশ্চর্য শক্তি ছিল। এই অদ্ভুত লোকটি সমগ্র ইউরোপকে এবং সমসাময়িক পৃথিবীকে যেন পাগল করিয়া দিয়াছিল। এমনকি, অতীতের সমস্ত রণনায়ককে যেন অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। একথা নিঃসন্দেহ যে, তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ছিল—কিন্তু শয়তানের প্রতিভা! সুতরাং এই অদ্ভুত মানুটির জীনকথা একটু বিস্তৃত আকারে আমাদের জানা দরকার—যে জীবনের সঙ্গে কোটি-কোটি মানুষের জীবন-মৃত্যু জড়াইয়া পড়িয়াছিল।

অস্ট্রিয়া ও ব্যাভেরিয়ার সীমান্তে যেখানে ইন্ নদী প্রবাহিত, তারই তটবর্তী ব্রায়ু-নাউ নামক একটি ক্ষুদ্র শহরের এক পান্থশালায় হিটলার ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময়। সন্ধ্যালগ্নে যাঁর জন্ম, তিনি যে পৃথিবীতে অন্ধকার ডাকিয়া আনিবেন, তা আর বিচিত্র কি? অথচ সেদিনের ইউরোপে অন্ধকার ছিল না,—(যদিও সেই ইউরোপকে তিনিই ধ্বংস করিয়াছিলেন) বরং ছিল চারিটি সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য গরিমায় ও রাজকীয় মহিমায় উজ্জ্বল—হ্যাপসবুর্গ বা ইউ-রোপের প্রাচীনতম রাজবংশের অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, হোহেনজোলার্ন বা কাইজারের জার্মানী, রোমানোভ বা জারদের রুশ সাম্রাজ্য এবং অটোম্যান বা তুর্কি সাম্রাজ্য। হিটলার যখন জন্মগ্রহণ করেন লেনিন তখন ১৯ বছরের ছাত্র মাত্র, এবং সে বয়সে

থেকেই তিনি সরকারের সঙ্গে সংগ্রামী, আর মুসোলিনী ৬ বছরের শিশু মাত্র, যাঁর জন্ম দরিদ্র কামারের ঘরে। বড় হইয়া হিটলার লেনিনের 'বর্বর বলশেভিক' রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল এবং 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃতুল্য' মুসোলিনীকে তিনি মনে-মনে অবজ্ঞা করিতেন, যদিও উভয়ে ছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সহযাত্রী!

পারিবারিক ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে, হিটলার বা তাঁর বংশ ও পূর্বপুরুষ আসলে জার্মানীর নাগরিক বা প্রজা ছিলেন না। এমনকি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের দুই-এক বছর আগে পর্যন্ত তিনি জার্মানীর নাগরিকও ছিলেন না। এমনকি 'হিটলার' নামক পারিবারিক পদবীটি পর্যন্ত নূতন-ভাবে পরিবর্তিত। অর্থাৎ হিটলারের পূর্ব-পুরুষ ছিলেন 'হিয়েডলার' Hiedler। এঁরা ছিলেন ভিয়েনা থেকে মাইল পঞ্চাশেক উত্তর-পশ্চিমে একটি দূরবর্তী নগণ্য ও দরিদ্র গ্রামের বাসিন্দা। হিটলারের পিতামহ-রূপে যিনি পরিচিত, সেই যোহান জর্জ হিয়েডলার নামীয় ব্যক্তিটির কাহিনী কিঞ্চিত গোলমেলে। তিনি ছিলেন ভবঘুরে গোছের লোক। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি মারিয়া এ্যানা শিকলগ্রুবার নাম্নী একটি কৃষক স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। কিন্তু পাঁচ বছর আগে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এই কৃষক রমণীর 'এ্যালয়েস' নামে একটি জারজ ছেলে জন্মিয়াছিল। কিন্তু এই জারজের জন্মদাতা কে, তা নিশ্চতরূপে প্রমাণিত হয় নাই, যদিও হিটলারের পিতামহ বলিয়া বর্ণিত যোহান হিয়েডলারই পরবর্তীকালে তাঁর পিতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। অর্থাৎ হিটলারের পিতা এ্যালয়েস হিয়েডলারের আসল জন্মদাতা কে, (তিনি যে প্রথমে জারজ সন্তানরূপেই কৃষক রমণীর গর্ভে জন্মিয়া ছিলেন তাতে সন্দেহ নাই।) তা আজও নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয় নাই। কেউ কেউ সন্দেহ করেন যে, একজন ইহুদীই এই অবৈধ সন্তানের (অর্থাৎ হিটলারের পিতার) জন্মদাতা ছিলেন। এজন্যই কি হিটলার অল্প বয়স হইতেই ইহুদী-বিদ্বেষী ছিলেন এবং ইহুদীদিগকে চরিত্রহীন বলিয়া গালাগালি দিতেন? সেকথা যাউক। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে 'এ্যালয়েস হিয়েডলার' নিজেকে 'হিটলার' নামে পরিচয় দিতে লাগিলেন (এই পদবী পরিবর্তনও রহস্যজনক) এবং এ্যালয়েস হিটলারের তৃতীয় স্ত্রীর তৃতীয় সন্তান হইতেছেন এ্যাডলফ হিটলার। একটিমাত্র বোন ছাড়া হিটলারের আর ভাই-বোনেরা ছোটবেলাতেই মারা গিয়াছিল। তবে হিটলারের বৈমাত্র ভাই-ভগ্নীও ছিল।*

মোটকথা হিটলার কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান নন। শিক্ষা ও চিন্তাধারার কোন পারিবারিক ঐতিহ্য নাই। বরং পিতামহীর দিক থেকে কিছু চরিত্রঘটিত কেলেঙ্কারি ছিল, পিতার দিকের ইতিহাসও সম্মানজনক ছিল না। এবং পারিবারিক জীবনও সুখের ছিল না। কারণ, হিটলারের পিতা এ্যালয়েস হিটলারের প্রথমা স্ত্রী ছিলেন স্বামীর চেয়ে ১৪ বছরের বড় এবং অসুস্থ। (তিনি নিজেও অপরের পালিতা কন্যা ছিলেন) তাঁর মৃত্যুর পর হিটলারের পিতা একটি হোটেলের চাকরানীকে বিয়ে করেন। এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর বিবাহের আগেই একটি ছেলে হইয়াছিল (অবশ্য জন্মদাতা ছিলেন হিটলারের পিতাই) এবং বিবাহের তিন মাস পরেই একটি মেয়ে হইয়াছিল (অর্থাৎ দ্বিতীয় সৎমা বিয়ের আগেই দুইবার গর্ভবতী হইয়াছিলেন)—মেয়েটির নাম অ্যাঞ্জেলা। এই সৎ বোনের সঙ্গে হিটলারের সম্পর্ক ভাল ছিল এবং পরবর্তীকালে এই সৎ বোনের

* সম্প্রতি হিটলারের পূর্ণাঙ্গ বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য জীবনী বাহির হইয়াছে ১৯৬২ সালে। বইটি 'পেলিকান' কর্তৃক প্রকাশিত নাম 'হিটলার', লেখক প্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক Allan Bullock.

সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে হিটলার 'প্রেমে' পড়িয়াছিলেন। কিন্তু হিটলারের পিতার দ্বিতীয়া স্ত্রীও মারা যান এবং তারপর আবার তিনি বিবাহ করেন নিজের আত্মীয় পরিমণ্ডলের মধ্যেই। এই তৃতীয় স্ত্রীই ছিলেন এ্যাডলফ হিটলারের জননী এবং তিনি স্বামীর চেয়ে ২৩ বছরের ছোট ছিলেন। হিটলারের পিতা সাধারণ এক কাস্টমস অফিসের চাকুরী করিতেন। অবস্থা ছিল চলনসই—নিম্নমধ্যবিত্তের অনুরূপ। অর্থাৎ খুব দরিদ্র ছিলেন না, যদিও হিটলার তাঁর আত্মজীবনীতে এই দারিদ্রের বড়াই করিয়াছিলেন। বালক হিটলার পাঁচবছর প্রাইমারী স্কুলে পড়িয়াছিলেন, তারপর এগার বছর বয়সে তাঁকে একটি সেকেণ্ডারী স্কুলে (টেকনিক্যাল ও কমার্সিয়েল) ভর্তি করান হইয়াছিল। কিন্তু এখানে পড়াশুনায় তাঁর মন ছিল না। বাধ্য হইয়া তাঁকে অন্য একটি স্কুলে ট্রান্সফার নিতে হইয়াছিল এবং এখানে ১৬ বছর বয়সেই তাঁর লেখাপড়া খতম! 'স্কুল লার্নিং সার্টিফিকেট' পর্যন্ত তিনি পান নাই। অর্থাৎ লেখাপড়ায় তিনি মোটেই ভাল ছিলেন না এবং সেজন্যই বোধহয় পরবর্তী জীবনে তিনি ডিগ্রীধারী ও ডক্টরেট এবং স্পেসালিস্ট-দের প্রতি অত্যন্ত বিতৃষ্ণ ছিলেন, আর ভদ্র শিক্ষিত সমাজের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা পোষণ করিতেন। ১৯০৩ সালে হিটলারের পিতা মারা যান, কিন্তু তাঁর বিধবা মাতা যে পেন্সন পাইতেন, তাতেই তাঁদের সংসার চলিয়া যাইত।

স্কুলের লেখাপড়ায় হিটলার ব্যর্থ হইলেন বটে, কিন্তু ওই ছোটবেলাতেই তিনি একজন আর্টিস্ট বা চিত্রশিল্পী হওয়ার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। ১৯০৭ সালে তিনি অস্ট্রিয়ার সুবিখ্যাত ও ঐশ্বর্যশালী রাজধানী ভিয়েনার আকাদেমী অব ফাইন আর্টসে-এ ভর্তি হওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু এখানেও হিটলার সুবিধা করিতে পারিলেন না, চিত্রশিল্প শিক্ষার উপযুক্ত বলিয়া তিনি বিবেচিত হইলেন না। এই ঘটনায় হিটলার নিদারুণ আঘাত পাইলেন। এদিকে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর মাতাও মারা গেলেন। মায়ের সামান্য যা টাকাকড়ি ছিল (অনাথ বালক হিসাবে হিটলারের পেন্সনও প্রাপ্য ছিল) তা সম্বল করিয়া হিটলার পুনরায় ভিয়েনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি 'আকাদেমী অব আর্টস'-এ ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর এবারের ব্যর্থতা আরও মারাত্মক। কারণ, এবার ভর্তি হওয়ার জন্য কোন পরীক্ষাতে পর্যন্ত তাঁকে গ্রহণ করা হইল না। ডাইরেক্টর তাঁকে উপদেশ দিলেন, "তোমার আর্টে কিছু হইবে না, 'আর্কিটেকচার-এ (স্থাপত্যবিদ্যায়) চেষ্টা করিয়া দেখ!" কিন্তু স্থাপত্য বিদ্যালয়েও তিনি ভর্তি হইতে পারিলেন না। কারণ স্কুল লার্নিং সার্টিফিকেট তাঁর ছিল না। নিদারুণ হতাশায় ও মানসিক ক্ষোভে হিটলার পাঁচ বছরের জন্য গা ঢাকা দিলেন। কিন্তু এই পাঁচ বছর তাঁর অত্যন্ত কষ্টে কাটিল। কখনও কখনও দিন-মজুরের কাজ করিয়া কখনও বা সাধারণ গোছের ছবি আঁকিয়া এবং সময় সময় তাঁর চেহারা এমন হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁকে দেখিলে ভদ্র যুবক বলিয়াও মনে হইত না। তবে, ছবি আঁকার জন্য এবং চিত্রশিল্পী হওয়ার জন্য তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য যে, এই দিক দিয়াও কোন সাফল্য তিনি অর্জন করিতে পারিলেন না। এই সময় তিনি অত্যন্ত নিঃসঙ্গ, বিমর্ষ ও উদাসীন ছিলেন। এমন কি ভিয়েনার সুন্দরী যুবতীরাও তাঁকে আকর্ষণ করিতে পারিল না।

* * *

এভাবে যৌবনের প্রথম দিনগুলি হিটলারের কাটিল ভিয়েনা শহরে তীব্র জীবন-

সংগ্রামে, উদাসীন ও বাউণ্ডলীবৃত্তিতে। এই পর্যন্ত হিটলার তাঁর পরিচিত মহলের নিকট 'ভ্যাগাবণ্ড' বা ভবঘুরে ছাড়া আর কোন যোগ্যতার দ্বারা চিহ্নিত হইতে পারিলেন না। এমন কি তাঁর একজন বন্ধু পর্যন্ত জুটিল না। শেষ পর্যন্ত ১৯১৩ সালের বসন্ত-কালে হিটলার চিরদিনের জন্য ভিয়েনার আশ্চর্য নগরী (যেখানে তাঁর জীবন ও জীবিকার কোন মীমাংসা হইল না) ত্যাগ করিয়া গেলেন এবং জার্মানীর মিউনিক শহরে গিয়া হাজির হইলেন। এখান হইতেই হিটলারী জীবনের নূতন ইতিহাসের সূচনা—যদিও ভিয়েনার মত মিউনিক শহরেও তিনি কপর্দকশূন্য ছিলেন। কিন্তু মহাযুদ্ধ তাঁকে বাঁচাইয়া দিল, ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালে (আগষ্ট) পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভ। হিটলার ছোটবেলা থেকেই যুদ্ধের উত্তেজনা অনুভব করিতেন। সুতরাং তিনি সাগ্রহে এবং তীব্র আবেগের সঙ্গে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, স্বেচ্ছায় দরখাস্ত করিয়া একটি ব্যাভেরিয়ান রেজিমেণ্টে যোগ দিলেন। কিন্তু ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে কর্পোরাল হিটলারকে দেখা গেল পোমেরুনিয়ার একটি হাসপাতালে শায়িত অবস্থায়—যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি জখম হইয়াছিলেন, ক্লোরিন গ্যাস বা বিষবাষ্প (কোমিন্সের নিকট বৃটিশ আক্রমণের ফল) লাগিয়া তাঁর চোখ অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। অবশ্য সেই অন্ধত্ব ছিল সাময়িক, পরে তিনি সারিয়া উঠিয়াছিলেন। (প্রথম মহাযুদ্ধের এই অন্ধত্বই কি তাঁকে পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রাজনৈতিক অন্ধত্ব আনিয়া দিয়াছিল ?) কিন্তু হাসপাতালে শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকিবার সময়েই তিনি জার্মানীর পরাজয়ের কথা শুনিয়াছিলেন। এই হৃদয়-বিদারক সংবাদে অসুস্থ হিটলার প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, তাঁর কাছে ইহা অবিশ্বাস্য মনে হইল। সমগ্র জার্মানীতে তখন বিপর্যয়, পরাজয়ের আঘাতে সকলে মুহ্যমান—দেশে বৃষ্টি নাই, আইন ও শৃঙ্খলা নাই, চতুর্দিকে দুর্দিন ও অন্ধকার। আর জার্মানীর 'চিরশত্রু' ফ্রান্স জয়ী। এই চিন্তা 'ক্ষুদে সিপাহী' হিটলারকে পাগল করিয়া তুলিল। তাঁর নিজস্ব বিদ্যা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—নিশ্চয়ই কোথাও কোন মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতা ঘটিয়াছে। অন্যথা জার্মানীর পরাজয় ঘটিতে পারে না। কারা কোন্ দুষমনরা এই পরাজয়ের জন্য দায়ী ?—এই চিন্তা তাঁর মাথায় ঢুকিল। কারণ, জার্মানী ও জার্মান জাতি তাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল। তিনি নিজে জার্মানীতে জন্মান নাই, জার্মান নাগরিকও তিনি নন, (অস্ট্রিয়াতে তাঁর জন্ম) অথচ জার্মানী ও জার্মান জাতি বলিতে তিনি যেন অজ্ঞান। হিটলারের জীবনে যেমন অন্যান্য ব্যাপারে বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত আছে, তেমনি জাতিপ্রেম ও জাতিবিদ্বেষেরও ভয়ঙ্কর বাড়াবাড়ি আছে, তাঁর ইহুদীবিদ্বেষ ও নর্ডিক-প্রীতি কিংবা জার্মানীর প্রতি প্রেমবোধ একই অনুভূতির দুই বিপরীত দিক মাত্র।

হিটলার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাইলেন। কিন্তু তখনও সৈন্যের ইউনিফর্ম তাঁর পরনে। নতুন জামার প্রতি একটা ছোট ছেলের যেমন গভীর মমতা থাকে, তেমনি মমতা ও আগ্রহ ছিল তাঁর সৈনিকের ইউনিফর্মের প্রতি। তাঁর এই আগ্রহ থেকেই বুঝা যায় যে, যুদ্ধের জন্য তাঁর যেন একটা স্বাভাবিক তৃষ্ণা ছিল। অবশ্য তিনি নিজেও তা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন তাঁর আত্ম-জীবনীতে এবং পরবর্তীকালে তাঁর পার্শ্বচর ও সেনাপতিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাকালে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাইয়া হিটলার কি দেখিলেন তাঁর চারিদিকে ? তখন

১৯১৮ সালের শীতকাল। জার্মানীতে বিপ্লবের নামে বিপর্যয় চলিতেছে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ জার্মান সম্রাট বা কাইজার দেশত্যাগী হইয়াছেন (হল্যাণ্ডে আশ্রয় নিয়াছিলেন)। রাজতন্ত্রের বিলোপসাধন করিয়া রিপাবলিক ঘোষণা করা হইয়াছে বটে কিন্তু মূলত সেই পুরাতন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই চলিতেছিল। অর্থাৎ ১৯১৬ সালের বিপ্লবটা আসলে বিপ্লবের ফাঁকা আওয়াজ ছিল মাত্র—যদিও 'লাল বিপ্লবের' আতঙ্ক চারিদিকে ঘণীভূত ছিল। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর হিটলারের চোখের সামনে জার্মানীর কি চিত্র ভাসিয়া উঠিল? চার্চিলের ভাষায়:

"Around him in the atmosphere of despair and frenzy glared the lineaments of Red Revolution. Armoured cars dashed through the streets of Munich scattering leaflets or bullets upon the fugitive wayfarers. His own comrades with defiant red arm-bands on their uniform, were shouting slogans of flurry against all that he cared for on earth. As in a dream everything suddenly became clear.

Germany had been stabbed in the back and clawed down by the Jews, by the profiteers and intriguers behind the Front, by the accursed Bolsheviks in their international conspiracy of Jewish intellectuals. Shining before him he saw his duty, to save Germany from these plagues, to avenge her wrongs and lead the master race to their long-decred destiny".[১]

সোজা কথায় এবং সংক্ষেপে হিটলারের ধারণা ছিল যে, ইহুদীরাই জার্মানীকে পিছন হইতে ছুরিকাঘাত করিয়াছে, আর আঘাত করিয়াছে মুনাফাবাজ লুঠেরার দল এবং চক্রান্তবাজরা। সেইসঙ্গে তিনি জার্মানীর এই পতনের জন্য 'অভিশপ্ত বলশেভিকদের'ও দায়ী করিলেন—ইহুদী বুদ্ধিজীবিদের আন্তর্জাতিক চক্রান্তে যে বলশেভিকরা অংশীদার। হিটলার তাঁর কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন—জার্মানীকে এই অধঃপতন থেকে উদ্ধার করিতে হইবে, তার প্রতি এই সমস্ত অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে হইবে এবং দীর্ঘকাল যাবৎ জার্মানীর জন্য যে ভাগ্যলিপি অপেক্ষা করিয়া আছে তাকে সেই 'মাস্টার রেস'-এর বা পৃথিবীর সেরা জাতির শীর্ষমর্যাদায় উন্নীত করিবার মহৎ ব্রত পালন করিতে হইবে। পরাজিত জার্মানীর আহত হিটলারের ইহাই হইল নূতন সংকল্প।

এই সংকল্প সাধনের প্রথম সুযোগ আসিল মিউনিকের এক ভাটিখানায় জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির সভায় যোগদানের ফলে। হিটলার যে রেজিমেণ্টের অধীনে সৈনিকের চাকুরি নিয়াছিলেন সেই রেজিমেণ্টের অফিসারেরা মিউনিকের বৈপ্লবিক ও অরাজক আবহাওয়া জন্য প্রমাদ গনিলেন। তাঁরা হিটলারের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলেন যে, এই লোক দিয়া তাঁদের কার্যোদ্ধার সম্ভব হইবে অর্থাৎ কোথায় কে চক্রান্ত করিতেছে, কারা সাবোটাজ করার জন্য তৈয়ারী হইতেছে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কোথায় কি করিতেছে, এই সমস্ত গোপন কার্যকলাপ সন্ধানের জন্য হিটলারকে নিয়োগ করা হইল।

১। উইনস্টোন চার্চিল রচিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড—"The Gathering Storm". পৃঃ—৪২।

বাহ্যতঃ পদটির নাম হইল 'পলিটিকাল এডুকেশন অফিসার', কিন্তু কার্যত রাজনৈতিক গোয়েন্দাগিরি মাত্র। ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক সন্ধ্যায় 'কর্পোরাল হিটলার' এই গোয়েন্দাগিরি কার্যের ব্যাপদেশেই গিয়া হাজির হইলেন জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির এক সমাবেশে। কিন্তু সেখানে গিয়া প্রথম তিনি তাঁর মনের মত কথা শুনতে পাইলেন। অর্থাৎ কারা জার্মানীর সর্বনাশ করিয়াছে কারা সেই 'নভেম্বর ক্রিমিনাল' (১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর জার্মানী পরাজয় স্বীকারে ও যুদ্ধবিরতিতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিল) যারা জার্মান বাহিনীর এই অসম্মানের জন্য দায়ী, আর দুষমন ইহুদী, ইহাদের সাবাড় করিতে হইবে—এই ধরনের রুদ্ধ চাপা কথা হিটলার শুনিতে পাইলেন সেই সভায়। ১৬ই সেপ্টেম্বর তিনি এই পার্টিতে যোগ দিলেন এবং যোগ দিয়া তিনি ছোটবেলা হইতেই বক্তৃতাবাজীতে তাঁর অভ্যাস ছিল, এই পার্টিতে প্রপাগাণ্ডার স্রোত বহাইতে লাগিলেন। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মিউনিকে জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির প্রথম জনসমাবেশ ঘটে এবং এই সমাবেশে হিটলার ২৫ দফা কর্মসূচি পেশ করলেন, তিনিই সমগ্র সভার উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেন এবং সেদিনের সমাবেশেই তিনি একজন রাজনৈতিক নেতা বনিয়া গেলেন। জাতীয় 'মুক্তির অভিযান' তিনি শুরু করিলেন। এপ্রিল মাসে তিনি সরকারীভাবে রেজিমেণ্ট হইতে ছাড়া পাইলেন এবং তখন হইতে তাঁর সমস্ত শক্তি ও সমগ্র জীবন পার্টি ও রাজনৈতিক কর্মে নিয়োজিত হইল। পরের বছর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই তিনি দলের সমস্ত পুরানো নেতাদের হটাইয়া দিলেন, আর নিজের প্রতিভা ও শক্তির দ্বারা সমগ্র পার্টির উপর যেন ইন্দ্রজাল বিস্তার করিলেন, তাঁর ব্যক্তিগত নেতৃত্বের মোহের দ্বারা পার্টি ইতিমধ্যেই আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং বলা যাইতে পারে যে, তখন হইতেই তিনি 'ফুরার'-রূপে দেখা দিলেন।

জার্মানীর তখন ঘোরতর দুর্দিন। সেই দুর্দিনে হিটলারের প্রচণ্ড উত্তেজক বক্তৃতাগুলি যেন অগ্নিকণা ছড়াইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত জার্মান জনগণ তাঁর কথা শুনিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিতে লাগিল। ১৯২৩ সালে ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানীর খনিসমৃদ্ধ বিখ্যাত রুর অঞ্চল দখলের ফলে সারা জার্মানীতে ক্রোধ ও ক্ষোভের ঝড় বহিয়া গেল। সেই সঙ্গে জার্মানীর মার্ক মুদ্রার পতন জার্মানীর মধ্যবিত্ত সমাজকে একেবারে পথে বসাইয়া দিল। এই দুর্দশা হইতে ত্রাণ পাইবার আশায় ১৯২৩-২৪ সালের মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিটলারের দলে যোগ দিল এবং যারা বেকার (সংখ্যায় অজস্র) দরিদ্র ও বঞ্চিত তারাও হিটলারী মতবাদের ভক্ত হইয়া উঠিল। জার্মানীর সামরিক ঐতিহ্যবাদী পুরাতন আর্মি বা সেনাবাহিনীর এক শ্রেণীর অফিসারও হিটলারের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এভাবে নবগঠিত হিটলারী দল কিংবা '**Natanal Sozialist Party**' সংক্ষেপে Nazi বা নাৎসী শক্তিশালী হইয়া উঠিল। কার্যত মিউনিকের সেই ওয়ার্কার্স পার্টিই ১৯২০ সালের ১লা এপ্রিল নাৎসী পার্টিতে পরিণত হইল। 'স্টর্ম ট্রুপার্স' বা ঝটিকাবাহিনী নামে 'প্রাইভেট আর্মি' (ভের্সাই সন্ধিকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য) গঠিত হইল, তাদের ইউনিফর্ম হইল বাদামী রংয়ের শার্ট, এজন্য নাৎসীদিগকে 'ব্রাউন শার্ট'ও বলা হইত, যেমন ইতালীয় ফ্যাসিস্টদিগকে 'ব্লাকশার্ট' বলা হইত। আর স্বস্তিক চিহ্ন হইল নাৎসী পার্টির সুপরিচিত প্রতীক চিহ্ন—যে চিহ্ন ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মে ও সংস্কৃতিতে পবিত্রতার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইত,

সেটা এখন ভয়ের ও নৃশংসতার চিহ্ন হইয়া উঠিল। একে একে হিটলারের চারিদিকে আসিয়া জুটিল সেই সমস্ত ধুরন্ধর নাৎসী নেতা যাদের একত্র সমবায়ে জার্মানী এবং ইউরোপ কাঁপিয়া উঠিল। গোয়েরিং, হেস্, রোজেনবার্গ, রোয়েম, গোয়েবেলস্ প্রভৃতি ধুমকেতুর মত উদয় হইতে লাগিলেন। হিটলার ও তাঁর সঙ্গীরা স্থির করিলেন যে, ব্যাভেরিয়া রাজ্যের রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করিতে হইবে। এজন্য তাঁরা 'পুশ' বা ক্ষমতা দখলের অভিযান সংগঠন করিলেন। কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ সেদিনের জার্মানীর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সামরিক নেতা জেনারেল লুডেনডর্ফ হিটলারকে সমর্থন জানাইলেন এবং এই বেআইনী 'অভিযানে' নিজে যোগ দিলেন। কিন্তু মহাযুদ্ধের আগে হইতেই জার্মানীতে একটা চলতি কথা ছিল—

'In Germany there will be no revolution, because in Germany all revolutions are strictly forbidden.'

অর্থাৎ জার্মানীতে কোন বিপ্লব হইতে পারিবে না। কারণ, জার্মানীতে সমস্ত বিপ্লবই অন্তত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সুতরাং এই সূত্র অনুসারে হিটলারী বৈপ্লবিক অভিযানে মিউনিকের পুলিশ ও মিলিটারী বাধা দিল। তারা গুলি চালাইল, কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে জেনারেলকে বাঁচাইয়া। এদিকে জেনারেল লুডেনডর্ফ সোজা মার্চ করিয়া সৈন্যদের সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। সৈন্যরা তাঁকে স্যালুটপূর্বক সসম্ভ্রমে স্বাগত জানাইল।[১] আর এদিকে হিটলার গুলির মুখে মাটিতে একেবারে শুইয়ে পড়িয়া আত্মরক্ষা করিলন। কিন্তু এই বিক্ষোভকারীদের মধ্যে প্রায় ২০ জন নিহত হইল। হিটলার পালাইলেন, কিন্তু পরে ধৃত হইয়া ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে চারি বছরের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কিন্তু হিটলারকে জার্মানীর একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক সুসন্তান বলিয়া মনে করা হইল। সুতরাং কর্তৃপক্ষ তাঁর দণ্ডাদেশ কমাইয়া ১৩ মাস করিলেন। তিনি ল্যাণ্ডসবার্গ দুর্গে বন্দী হইলেন এবং এই কারাবাসের সময়েই তিনি তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনী 'Mein Kampf' লিখিলেন। যাহা পরবর্তীকালে নাৎসীদের কাছে নতুন বাইবেলে পরিণত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে হিটলারী জার্মানীতে বাইবেলের পর আর কোন বইয়ের এত বিক্রি হয় নাই। একটি নাৎসী প্রকাশক কোম্পানী যখন এই বই প্রকাশ করেন, তখন ১৯২৫ সালে এই বইয়ের প্রথম বিক্রি হইয়াছিল ৯৪৭৩ কপি। পরবর্তী তিন বছরে বিক্রি আরও অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু নাৎসী দলের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের বিক্রি বাড়িতে থাকে এবং ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসার পর মেইন ক্যাম্পের বিক্রি দাঁড়াইল ১০ লক্ষ কপি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইবার পর একমাত্র জার্মানীতেই এই বই ৬০ লক্ষেরও বেশী কপি বিক্রি হইয়াছিল ১৯৪০ সালে। ব্যক্তিগতভাবে হিটলার এই বই বিক্রির টাকায় একজন ক্রোরপতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। কারণ একমাত্র ১৯৩৩ সালেই তিনি রয়েলটি বাবদ ১০ লক্ষ মার্ক বা ৩ লক্ষ ডলার পাইয়াছিলেন।[২]

১। কিন্তু এই ঘটনা সম্পর্কে কিছু কিছু মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে, লুডেনডর্ফও মাটিতে শুইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

২। মহাযুদ্ধের পর ধৃত জার্মানীর কাগজপত্র হইতে এই কথা জানা গিয়াছে। প্রত্যেক বিয়ের বাসরে এই বই উপহার দেওয়া এবং প্রত্যেক বাড়ীর টেবিলে এই বই রাখা যেন বাধ্যতামূলক ছিল উইলিয়াম শাইরার প্রণীত 'দি রাইজ এণ্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ'। পৃঃ ১০৯

এই বই পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে, হিটলার একজন জাতিবিদ্বেষপরায়ণ যুদ্ধোন্মাদ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও মনীষা ছিল না, ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ন সহজাত বুদ্ধি, যুক্তিতর্কের স্বাভাবিক ক্ষমতা আর সাধারণ লোককে বা জনতাকে ভুলাইবার জন্য খুব বড় বড় চটকদার কথার এবং মেঠো বক্তৃতার আশ্চর্য শক্তি—যে মেঠো বক্তৃতার উন্মাদিনী শক্তি সেদিনের জার্মান জনতাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই বইতে তাঁর ভবিষ্যৎ রণপরিকল্পনারও (এবং সোভিয়েটভূমি আক্রমণের) আভাস ছিল। হিটলার মনে করিতেন ঃ

'Man is a fighting animal, therefore the nation, being community if fighters, is a fighting unit. Any living organism which ceases to fight is equally doomed. The fighting capcity of race depends on its unity.'

সুতরাং অল্পবয়স হইতেই হিটলারের যুদ্ধে অচলাভক্তি ছিল। কারণ, মূলতঃ মানুষ হইতেছে 'লড়িয়ে জন্তু' মাত্র। এই মনোভাব ইতালীর ডিক্টেটর মুসোলিনীরও ছিল। মুসোলিনীও মনে করিতেন ঃ

'War is to the male what child bearing is to the female.'

অর্থাৎ মেয়েদের পক্ষে যেমন সন্তানধারণ স্বাভাবিক, তেমনি পুরুষের পক্ষে যুদ্ধও স্বাভাবিক। হিটলার কেবল যুদ্ধেই বিশ্বাস করিতেন না, তাঁর আরও বিশ্বাস ছিল যে, জার্মানেরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আর্যজাতি এবং নর্ডিকরাই তাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি—খাঁটি বিশুদ্ধ রক্তের জার্মানরাই নর্ডিক। হিটলার ও নাৎসী দলের এই বিকৃত বিশ্বাসের মূলে অবশ্য প্রেরণা জোগাইয়াছিলেন তদানীন্তন জার্মানীর এবং পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী ও দার্শনিক ওসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার (Oswald Spengler)—যে কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্পেঙ্গলার একদিকে জার্মান জাতির 'আর্যামির' শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্য-দিকে ভায়োলেন্স বা হিংসা ও যুদ্ধের মহিমা প্রচার করিলেন। হিটলারী মতবাদ হিংসা ও জাতিবিদ্বেষ এবং স্বজাতি দাম্ভিকতার মদিরায় আচ্ছন্ন হইয়া শেষ পর্যন্ত যে মাতাল হইয়া গিয়াছিল, স্পেঙ্গলারের মত একজন সেরা দার্শনিকও তার জন্য কম দায়ী ছিলেন না। কারণ, তিনি প্রচার করিলেন ঃ

"Man is a beast of prey, brave and crafty and cruel···Ideals are cowardice···The animal of prey is the highest form of mobile life···

Man should be like the lion never tolerating an equal in his den, and not like the meek cow living in herds and driven hither and thither. For such a man, war is of course the supreme occupation and joy."[১]

সুতরাং হিটলার এবং তাঁর অনুগামীদেরও ধারণা হইল যে, জার্মানরা গৃহপালিত শান্ত গরুর মত ভীরু জাত নয়। তারা সিংহের মত শক্তিশালী, এতএব হিংসা ও যুদ্ধের দ্বারা অপরকে 'শিকার' করিয়া বড় হইতে হইবে এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ আর্যজাতিকে কারা নষ্ট ও কলুষিত করিতেছে ?—হিটলারের ধারণা এই

১। জওহরলাল নেহরু প্রণীত—"Glimses of World History", পৃঃ ৯১৩

শ্রেষ্ঠ জাতি পৃথিবীব্যাপী ইহুদীদের চক্রান্তে ধ্বংস হইতেছে। এই ইহুদীরা জার্মানীতে বণিক ও ধনিক শ্রেণীরূপে জনসাধারণকে শোষণ করিতেছে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার বলশেভিকগণ (যাঁদের মধ্যে বহু ইহুদী ছিলেন) বিপ্লব ও যুদ্ধের দ্বারা জার্মান্ জাতিকে বিপন্ন করিতেছে। এজন্য হিটলারের ক্ষমতা লাভের আগেই যেমন হিংসা ও সন্ত্রাসবাদ শুরু হইয়াছিল ক্ষমতালাভের পর উহা বর্বর অভিযানে পরিণত হইল। ইহুদীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, জঘন্য এবং পৈশাচিক অত্যাচার শুরু হইল, যার ভয়াবহ পরিণতি ঘটিল যুদ্ধের সময় বন্দী শিবিরগুলিতে; যেখানে লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে পাইকারি হারে হত্যা করা হইল।

হিটলারের জার্মানীতে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো নিভিবার উপক্রম হইল এবং শিক্ষায় নূতন নাৎসীবাদ প্রচার হইতে লাগিল। অন্যদিকে ইহুদী সন্দেহে, কিংবা একমাত্র জাতিতে ইহুদী এই অপরাধে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী ও মনীষীরা নির্যাতিত হইতে থাকিলেন, অনেকে জার্মানী হইতে পলায়ন করিয়া (যেমন, আইনস্টাইন) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নাৎসীরা যে সমস্ত রচনা ও বই পছন্দ করিতেন না সেগুলি নিষিদ্ধ হইল কিংবা পুড়াইয়া ফেলা হইল। এমনকি কোন জার্মানের দেহে ইহুদী রক্তের সামান্য মিশ্রণের সন্দেহ হইলেও তাঁকে নির্যাতন ভোগ করিতে হইত। যে সমস্ত রাষ্ট্র জার্মানীকে যুদ্ধে হারাইয়াছিল, হিটলার তাদের বিরুদ্ধে অনবরত বিদ্বেষ প্রচার ও আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন।

"Two myths he persuaded many Germans, perhaps the majority to believe : that their armies were not defeated on the field of battle in 1918, but suffered betrayal by a 'stab in the back' from cowardly politicians at home, and that the Versailles Treaty which the betrayers signed was the severest peace ever dictated to a nation, reducing Germany to an ignominious position in Europe. Hitler Proposed to break the fetters of the treaty, rearm Germany, crush France, and curve an empire out of Communist Russia. For this mission he demanded that Nazis be made master of Germony'.[১]

অর্থাৎ হিটলার অধিকাংশ জার্মানকে বুঝাইলেন যে, ১৯১৮ সালের রণক্ষেত্রে (প্রথম মহাযুদ্ধ) জার্মান সৈন্যবাহিনীর কোন পরাজয় হয় নাই। কিন্তু তাদের স্বগৃহের কাপুরুষ রাজনীতিকেরা তাদের পিছন হইতে ছুরি মারিয়া তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। এই বিশ্বাসঘাতকদের দলই ভের্সাই সন্ধি স্বাক্ষর করিয়াছে। এমন কড়া সন্ধিসর্ত পৃথিবীতে আর কখনও হয় নাই, ইহার ফলে ইউরোপে জার্মানীর কলঙ্কজনক দুরবস্থা ঘটিয়াছে। সুতরাং এই সন্ধিসর্তের শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে হইবে, ফ্রান্সকে ধ্বংস করিতে হইবে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার দেশগুলি কাড়িয়া লইয়া এক নূতন সাম্রাজ্য গঠন করিতে হইবে। সুতরাং এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নাৎসী পার্টিকে জার্মানীর উপর একচ্ছত্র অধিকার দিতে হইবে।

গোড়ার দিকে নাৎসী দল তেমন সমর্থক পায় নাই এবং নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট

১। 'The World At war'—Published by the 'Infantry Journal' Washington, P— ২০

হইতেও মোট ১০ লক্ষের বেশী ভোট পায় নাই। কিন্তু ১৯৩০ সাল হইতে পৃথিবী-ব্যাপী বাজার মন্দা শুরু হইল এবং ১৯৩৩ সালে তাহা চরমে উঠিল। জার্মানীর দুর্গতির অবধি রহিল না। সেই সময়কার গভর্নমেণ্ট ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না। এদিকে হিটলার ও নাৎসী দল 'ঝটিকা বাহিনী', 'এস এস গার্ড' ইত্যাদি নামে কতকগুলি 'প্রাইভেট আর্মি' গঠন করিয়া বিরুদ্ধ দল ও গভর্নমেন্টকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। অপরদিকে জার্মানীর অর্থনৈতিক দুর্দশা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, জনসাধারণও ততই চরমবাদীদের প্রতি ঝুঁকিতে লাগিল। কমিউনিস্ট দলও জার্মানীতে বেশ শক্তিশালী ছিল এবং তাদের সঙ্গে নাৎসীবাহিনীর অনবরত সংঘর্ষ হইতে লাগিল। উভয় দলই জনগণের দুর্গতি মোচনের জন্য বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রোগ্রামের উপর জোর দিতে লাগিলেন। তাঁরা তদানীন্তন গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধবাদীরূপে রাখইস্ট্যাগ বা পার্লামেণ্টে অচল অবস্থার সৃষ্টি করিলেন। এই সঙ্কটের সময় মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গ, যিনি প্রথম মহাযুদ্ধের অন্যতম নায়ক ছিলেন, তিনি হিটলারের চেয়ে ৪০ লক্ষাধিক ভোট বেশী পাইয়া পুনরায় প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হইলেন, ১০ই এপ্রিল, ১৯৩২। এই সময় রাইনল্যাণ্ডের শক্তিশালী শ্রমশিল্পের মালিকগণ কমিউনিস্টদের ভয়ে আতঙ্কিত হইলেন। তাঁরা হিটলারকে সমর্থন জানাইলেন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সহায়তা পাইবার আশায়। অন্যদিকে সমরবাদী জার্মানীর 'মেরুদন্ড স্বরূপ' প্রুশিয়ার বড় বড় জমিদার, যাঁরা ছিলেন অভিজাত শ্রেণী, তাঁরা হাত মিলাইলেন রাউনল্যাণ্ডের শিল্পপতিদের সঙ্গে। প্রুশিয়াতে এঁদের জমিদারীতে তখন প্রবল কিষাণ আন্দোলন চলিতেছিল। এই সমস্ত জমিদার ও শিল্পপতি, উভয় শ্রেণী মিলিয়া বয়োবৃদ্ধ হিণ্ডেনবুর্গের উপর চাপ দিলেন হিটলারকে 'চ্যান্সেলর' বা প্রধান মন্ত্রীপদে নিয়োগের জন্য। ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী হিটলার প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গের আমন্ত্রণে এই পদ লাভ করিলেন। হিটলারের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন অতি সহজেই চরিতার্থ হইল।

কিন্তু চার্চিলের মতে মার্শাল হিণ্ডেবুর্গের উপর সবচেয়ে বেশী চাপ আসিয়াছিল জার্মানীর জেনারেল স্টাফ বা সেনানীমণ্ডলীর পক্ষ হইতে। জার্মান রাষ্ট্রে, পার্লামেণ্টে, মন্ত্রিসভায় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সংস্থাগুলিতে এই জেনারেল স্টাফের প্রভাব প্রতিপত্তি বরাবরই অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাঁরা ছিলেন মূলতঃ রাজতন্ত্র ও জমিদারতন্ত্রের সমর্থক এবং ঘোরতর কমিউনিস্ট বিরোধী। সুতরাং তাঁরা হিণ্ডেন-বুর্গের উপর প্রথম চাপ দিলেন হিটলারকে গ্রহণের জন্য। হিণ্ডেনবুর্গ তখন বৃদ্ধ, বয়স ৮৫ বছর। গভীর বিবেচনা ও মস্তিষ্কের শক্তি তখন তাঁর জোরদার ছিল না। কাজেকর্মেও তেমন উদ্যোগ ও উৎসাহ ছিল না। প্রকাশ যে, তিনি যখন প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হন, তখন তাঁর ছেলে ভোর ৭টার সময় তাঁকে সেই সংবাদ দিলে তিনি বিরক্ত হন এবং বলেন, 'এই সংবাদ দেওয়ার জন্য এক ঘণ্টা আগে আমার ঘুম ভাঙ্গাবার কি দরকার ছিল? এক ঘণ্টা পরেও কি এই খবর সত্য হত না?'—এই মন্তব্য করিয়া তিনি পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু হিটলারকে প্রথম দেখিয়া হিণ্ডেনবুর্গ নাকি আদৌ খুশী হইতে পারেন নাই। তিনি বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মন্তব্য করিয়াছিলেন—'এই হিটলার? এঁকে তো আমি ডাকটিকেটে সীল মারার জন্য পোস্টমাস্টারের কাজ দেওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না!' কিন্তু যাঁকে হিণ্ডেনবুর্গ এত তুচ্ছ ভাবিয়াছিলেন, তিনি শেষ পর্যন্ত হিণ্ডেনবুর্গের আসনে বসিয়া

সারা জার্মানীর একচ্ছত্র ডিক্টেটর হইলেন। অবশ্য হিটলার রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ, তিনি মনে করিতেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিতে না পারিলে রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া লাভ নাই এবং দল গঠনের মূল উদ্দেশ্যই হইতেছে সরকারী ক্ষমতা লাভ। সেজন্য তিনি প্রত্যেকটি সুযোগ গ্রহণ করিলেন এবং প্রত্যেককে কৌশলে ধাপ্পা দিলেন। যেমন, জার্মান জেনারেল স্টাফকে তিনি বুঝাইলেন যে তাঁকে সরকারী ক্ষমতায় বসানো হইলে তিনি সমস্ত প্রাইভেট আর্মির উপর পূর্ণ ক্ষমতা জার্মান সেনানীমণ্ডলীর হাতে (হিটলারী ঝটিকাবাহিনীর সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর বিরোধ ছিল।) তুলিয়া দিবেন, এমনকি ওই সমস্ত আর্মি বিলোপ করিয়া দিবেন। এভাবেই তিনি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গেও নানা ছল-চাতুরি খেলিলেন। বলাবাহুল্য যে, ক্ষমতা হাতে পাইয়া হিটলার তাঁর স্বাভাবিক হিংস্রমূর্তি ধারণ করিলেন। যদিও তাঁর পার্টি ন্যাশনাল সোসিয়েলিস্ট নাম ধারণ করিয়া একদিকে জাতীয়তাবাদীদিগকে (ধনিক ও রাজতন্ত্রবাদীদিগকে) এবং অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতিদিগকে (গরীব, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক প্রভৃতিকে) আকৃষ্ট করিতে চাহিলেন, তথাপি নাৎসীবাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের নামগন্ধও ছিল না। বরং আসলে ইহা ছিল সমাজতন্ত্র-বিরোধী, কমিউনিস্ট-বিরোধী, ট্রেড ইউনিয়ন-বিরোধী, ইহুদী-বিরোধী—এমনকি বুদ্ধিজীবী-বিরোধী (হিটলার বুদ্ধিজীবিদের সহ্য করিতে পারিতেন না) এক ভয়ংকর বিকৃত মতবাদ। সুতরাং হিটলার সরকারী ক্ষমতা হাতে পাইয়াই ধাপে ধাপে সমস্ত জার্মান রাষ্ট্রকে নিজের হাতের মুঠোয় আনিলেন এবং বিরোধীদিগকে একেবারে নির্মূল করিলেন। ভেইমার রাষ্ট্রতন্ত্র বাতিল হইয়া গেল। তৃতীয় রাইখের উদ্ভব হইল এবং নাৎসীদের বাহু অক্টোপাশের মত চারিদিকে বিস্তৃত হইল। নাৎসী দালালদের সাহায্যে রাতে রাইখস্ট্যাগ বা পার্লামেণ্টভবনে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইল এবং ইহা 'কমিউনিস্টদের ধ্বংসাত্মক কার্য', এই অজুহাত তুলিয়া গোটা কমিউ-নিস্ট পার্টিকে উচ্ছেদ করা হইল। (ভ্যানডার লুব নামক এক ব্যক্তিকে রাইখস্ট্যাগে আগুন ধরাইবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই নাৎসীদের সাজানো বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল। অবশ্য ভ্যানডার লুবের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।) মাত্র এক বছরের মধ্যে হিটলার ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ট রাষ্ট্র জার্মানীর উপর তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা, প্রভাব ও শক্তি প্রয়োগ করিয়া সমগ্র রাষ্ট্রকে যেন নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে আনিয়া ফেলিলেন। এমন কাণ্ড জার্মানীর ইতিহাসে আর ঘটে নাই। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বা জুড়ি আর কেহ রহিল না। গর্বে ও আনন্দে হিটলার জার্মান ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া নিজেকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মান' বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

তিনি কেবল নিজেকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মান বলিয়া অভিহিত করিলেন না, ৩০শে জানুয়ারী ১৯৩৩, জার্মানীতে তাঁর নেতৃত্বে যে তৃতীয় রাইখের জন্ম হইল, হিটলার গর্বের সঙ্গে দাবী করিলেন যে, এই রাইখ হাজার বছর টিকিয়া থাকিবে এবং তাঁর নাৎসী চেলাচামুণ্ডরা কাগজেপত্রে 'হাজার বছরের রাইখ' বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিলেন—যদিও এই রাইখ কার্যত বার বছরের বেশী (১৯৩৩-১৯৪৫) টিকে নাই। তথাপি একথা সত্য যে, হিটলারী নেতৃত্বে এই অল্প সময়েই মধ্যেই জার্মানীর হাজার বছরের ইতিহাস অতিক্রান্ত হইল এবং জার্মান জাতি অভুতপূর্ব ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ

করিল। হিটলারী সৈন্যেরা যেন সমগ্র ইউরোপ মুঠির তলায় আনিয়া ফেলিল। অতলান্তিকের উপকুল থেকে ভল্গানদীর তীর পর্যন্ত এবং নরওয়ের উত্তরবর্তী প্রান্ত থেকে ভুমধ্যসাগরের উপকুল পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হইয়াছিল নাৎসী জার্মানী।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। কেননা, নাৎসী প্রচারকার্যের দৌলতে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে যে জার্মানজাতির এক ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের ফলেই হিটলার জার্মান রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ধারণা ভুল। কোন প্রচণ্ড জাতীয় আন্দোলন, কোন বৈপ্লবিক-অভ্যুত্থানের ফলে হিটলার ক্ষমতায় আসেন নাই। এমনকি নির্বাচনে জয় বা নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার দ্বারাও তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন নাই। বরং সাদা কথায় বলা যাইতে পারে যে, জার্মানীর পুরাতন রাজনৈতিক ঘুঘুদের (ওল্ড গ্যাংগ) সঙ্গে এবং যে ঘুঘুদের বিরুদ্ধে তিনি এতদিন গর্জন করিতেছিলেন, পর্দার আড়ালে তাদের সঙ্গেই চক্রান্ত ও চালবাজির চুক্তির দ্বারা তিনি ক্ষমতায় আসিয়াছিলেন। আরো মনে রাখা দরকার হিটলার জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করেন নাই, বরং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ও রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদিদের বোকামি ও বেহিসাবি কার্যকলাপের জন্যই তিনি গদি দখল করিতে পারিয়াছিলেন। এমনকি, এটা তাঁর বরাতজোরও বলা যাইতে পারে ![1]

সোজা কথায় বলা যাইতে পারে যে, হিটলারের ক্ষমতালাভের পিছনে সংবিধান-বিরোধী কোন বে-আইনি কার্যকলাপ ছিল না—যদিও সমগ্র জার্মানীর বিপুলতম অংশের জনচিত্তকে তিনি বিমূঢ় করিয়াছিলেন নাৎসী আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদের দ্বারা।

তাঁর ক্ষমতালাভের মুহূর্তটা কম নাটকীয় ছিল না। তৃতীয় রাইখের জন্মের সন্ধিক্ষণে রাজধানী বার্লিন যেন প্রসব বেদনায় অধীর ছিল। সমগ্র শহরে প্রচণ্ড উত্তেজনার ঝড়। কেননা, ৫৭ দিন শাসনকার্য চালাইবার পর চ্যান্সেলার জেনারেল শ্লেইচার হঠাৎ বয়োবৃদ্ধ প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গ কর্তৃক পদচ্যুত হইলেন। (আগের অধ্যায়ে 'ফ্যাসিজমের জয়যাত্রা' শীর্ষক প্রবন্ধের জার্মানীর অংশ দ্রষ্টব্য) এদিকে ন্যাশনাল সোসিয়েলিস্ট পার্টির নেতা হিটলার, যিনি রাইখস্টাগের নির্বাচনে একক দল হিসাবে সর্বাপেক্ষা বেশী আসনের অধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি চ্যান্সেলার বা প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করার জন্য ক্রমাগত দাবীদাওয়া জানাইয়া আসিতেছিলেন। অথচ যে গণতান্ত্রিক রিপাবলিককে তিনি ধ্বংস করার জন্য প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ ছিলেন, সেই রিপাবলিকের গদী লাভের জন্যই তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন।

রাজধানী বার্লিনে তখন গুজবের উত্তাল তরঙ্গ চলিতেছিল। একদল গুজব রটনা করিতেছিল যে, সদ্য পদচ্যুত জেনারেল শ্লেইচার সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল হ্যামারস্টিনের যোগসাজসে এবং পটস্ডাম দুর্গ-বাহিনীর সমর্থনে এক অভিযান চালাইতে উদ্যত হইয়াছেন এবং এই অভিযানের লক্ষ্য হইতেছে প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গকে গ্রেপ্তার ও সাময়িক একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা। আর একদল প্রচার করিতে-ছিল যে, নাৎসীরা অভ্যুত্থান ঘটাইবে—বার্লিনের ঝটিকা বাহিনী পুলিশী সংগঠনের নাৎসী পক্ষপাতীদের সহায়তায় উইলহেলম স্ট্রাসি (যেখানে প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদ ও

১। 'Hitler'—Allan Bullock পৃঃ ২৫৩

মন্ত্রিভবনগুলি অবস্থিত) দখল করিয়া নিবে। আবার একটা জেনারেল স্ট্রাইক অবিলম্বেই ঘটিবে বলিয়া মুখে মুখে প্রচার হইয়া গেল। ২৯শে জানুয়ারী, রবিবার, বার্লিনের এক লক্ষ শ্রমিক সহরের মর্মকেন্দ্রে সমাবিষ্ট হইলেন এবং তাঁরা হিটলারের সম্ভাব্য ক্ষমতালাভের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ-আন্দোলন ঘটাইলেন। এমনকি, একজন শ্রমিক নেতা প্রধান সেনাপতি জেনারেল হ্যামারস্টিনের নিকট এমন প্রস্তাবও করিয়া পাঠাইলেন যে, যদি হিটলারকে চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত করা হয়, তবে 'আসুন একত্রে সেই নতুন গভর্নমেণ্টকে প্রতিরোধ করি'—১৯২০ সালে একবার অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

এদিকে হিটলার তাঁর কাইজার হফ্ হোটেলের কক্ষে অস্থিরচিত্তে পায়চারি করিতেছিলেন—রবিবার ২৯শে জানুয়ারী থেকে পরদিন সোমবার সারাদিন তাঁর এই অস্থিরচিত্ততা ছিল। চ্যান্সেলার পদ লাভের আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে তিনি গভীরভাবে আন্দোলিত হইতেছিলেন। কেননা, মাত্র দিন তিনেক আগে বৃদ্ধ প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ প্রধান সেনাপতি জেনারেল হ্যামারস্টিনের নিকট মন্তব্য করিয়াছিলেন—'ঐ অস্ট্রিয়ান কর্পোরালটাকে আমি কিছুতেই মিনিস্টার অফ ডিফেন্স কিংবা চ্যান্সেলার পদে নিয়োগ করব না।'

সুতরাং হিটলার সংশয়াচ্ছন্ন ও উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে হিটলারের বরাত খুলিয়া গেল। ৩০শে জানুয়ারী দ্বিপ্রহরের কিছু আগে প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ চ্যান্সেলারী ভবনে হিটলারকে সাক্ষাতের জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার কেবল ব্যক্তিগতভাবে হিটলারের কিংবা রাষ্ট্রগতভাবে জার্মানীর পক্ষেই চূড়ান্ত ভাগ্য নিয়ামক ছিল না, প্রকৃতপক্ষে সারা পৃথিবীর পক্ষেই এটা যেন ছিল অদ্ভুত নিয়তির মত।

কাইজার হফ্ হোটেলের জানালা থেকে গোয়েবলস, রোয়েম প্রমুখ বড় বড় হিটলারী চেলারা চ্যান্সেলারী ভবনের দরজার দিকে ব্যগ্রভাবে ও স্পন্দিত বক্ষে তাকাইয়াছিলেন—কখন হিটলার চ্যান্সেলারের শপথ গ্রহণের পর বাহির হইয়া আসেন এবং তাঁদের এতদিনের স্বপ্ন, লড়াই ও আশা সত্যই সার্থক হয় কি না।

অবশেষে সত্যসত্যই যেন মিরাক্যাল বা দৈবব্যাপার ঘটিল। সেই অখ্যাতনামা অস্ট্রিয়ান কর্পোরাল মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গের নিকট চ্যান্সেলারের শপথ গ্রহণ-পূর্বক বাহির হইয়া আসিলেন। চ্যান্সেলারী ভবন থেকে মাত্র ১০০ গজ তিনি মোটরে চড়িয়া কাইজার হফ্ হোটেল আসিলেন। সেখানে গোয়েবলস, গোয়েরিং, রোয়েম প্রমুখ ভক্তেরা অপেক্ষা করিতেছিলেন এই ঐতিহাসিক ঘটনার পর তাঁকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য। কিন্তু আনন্দে তাঁদের কাহারো মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না। কেবলমাত্র হিটলারের চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।[১]

সেদিন সন্ধ্যা থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত নাৎসী ঝটিকা বাহিনীর সৈন্যরা হাজারে হাজারে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল এই বিজয় উৎসব পালনের জন্য এবং বার্লিনের বিখ্যাত ব্রাণ্ডেনবুর্গ গেট দিয়া যে বিরাট মশাল শোভাযাত্রা বাহির হইল, তাদের জয়ধ্বনিতে বার্লিনের রাত্রির রাস্তাঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল।

এই উপলক্ষে একটা গল্প প্রচারিত হইয়াছিল। নাৎসী ঝটিকা বাহিনীর এই

১। William L. Shirer. P, 16—17

প্যারেডে আকৃষ্ট হইয়া প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং শোভাযাত্রার দিকে তাকাইয়া জনৈক বৃদ্ধ জেনারেলের নিকট মন্তব্য করিলেন—

'আমরা যে এত রুশ বন্দী আটক করেছি একথা তো আগে জানতাম না।'...

আর হিটলার আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেই মশাল-শোভাযাত্রার উদ্দেশ্যে নর্তন-কুর্দন শুরু করিয়া দিলেন এবং ক্রমাগত নাৎসী স্যালুট্ বা অভিবাদন জানাইতে লাগিলেন।...

কিন্তু হিটলার অসাধারণ ধূর্ত ও কূটবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। পাছে তাঁর এভাবে ক্ষমতালাভের ফলে রাজতন্ত্রবাদী, রক্ষণশীল ও প্রুশিয়ান অভিজাত বর্গ এবং ইম্পিরিয়াল জার্মানীর শক্তির উৎস সেনানীমণ্ডলী, আর জাতীয়বাদিগণ নাৎসী দলনায়ককে জার্মানীর ঐতিহ্যধ্বংসকারী বলিয়া সন্দেহ করেন, এইজন্য রাইখস্ট্যাগের অনুষ্ঠানিক সরকারী উদ্বোধন দিবসে তিনি দুই দিক রক্ষা করিয়া এবং নতুন ও পুরাতন যুগের মধ্যে সমন্বয় ঘটাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া এমন এক বক্তৃতা দিলেন যে, সকলেই চমৎকৃত হইলেন। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইল হোহেন জর্মান রাজবংশের পুরাতন রাজকীয় মহিমামণ্ডিত পটস্‌ডাম সহরের গ্যারিসন চার্চে—যেখানে জার্মানীর বিশ্রুতকীর্তি সম্রাট ফ্রেডারিক দি গ্রেটের সমাধি রহিয়াছে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সনামধন্য বিসমার্ক জার্মান সাম্রাজ্যের প্রথম রাইখস্ট্যাগ বা পার্লামেণ্টের বোধন করিয়াছিলেন ২১শে মার্চ তারিখ। ঐ ঐতিহাসিক তারিখটি হিটলার কর্তৃক তৃতীয় রাইখের প্রথম রাইখস্ট্যাগ বোধনের দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হইল। এই অনুষ্ঠান বিপুল আড়ম্বর জাঁকজমকের মধ্যে সম্পন্ন হইল। এবং ঐ দিন উৎসবে ইম্পিরিয়াল জার্মানীর বড় বড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ঠ প্রতিনিধিবৃন্দ, নাগরিকবৃন্দ এবং সামরিক জগতের খ্যাতিমান মার্শাল, জেনারেল ও এডমিরালগন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন ফিল্ড মার্শাল ফন্ ম্যাকেনসান। প্রাক্তন সম্রাট বা কাইজারের জন্য যে আসনটি সংরক্ষিত ছিল সেটি খালি ছিল, কিন্তু ঠিক তারপরের আসনটিতেই অধিষ্ঠিত ছিলেন প্রাক্তন ক্রাউন-প্রিন্স বা যুবরাজ। আর স্বয়ং বিপুলায়তন প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শালের জমকালো ইউনিফর্মে সজ্জিত ছিলেন।

এমন একটি অপূর্ব সমাবেশে বুদ্ধিমান হিটলার দুইদিক রক্ষা করিয়া চমৎকার বক্তৃতা দিলেন এবং প্রেসিডেণ্টের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া 'জার্মানীর পুরাতন মহত্ব' ও 'জাতির নূতন শক্তির' মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার দায়িত্বের উপর জোর দিলেন।

* * *

হিটলার কোন বিপ্লবের দ্বারা ক্ষমতা দখল করেন নাই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের পর তিনি 'বিপ্লব' (?) ঘটাইলেন এবং সমস্ত কিছুর ওলট-পালট ঘটাইতে শুরু করিলেন। কিন্তু এই সমস্ত কার্যও তিনি যথাসম্ভব 'আইন অনুসারে' নিষ্পন্ন করিতে চাহিলেন। পটস্‌ডামে পার্লামেণ্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দুই দিন পর বার্লিনে রাইখস্ট্যাগের নিয়মমাফিক যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল, তাতে হিটলার অসাধারণ ধূর্তবুদ্ধি সহকারে এমন একটি আইন পাশ করাইয়া লইলেন যে, যাতে তিনি সংবিধান ও প্রেসিডেণ্টকে ডিঙাইয়া তাঁর ইচ্ছামত রাজত্ব চালাইতে ও কায়েম করিতে পারেন। এই আইনের নাম হইল Enabling Law অর্থাৎ যে আইনের ক্ষমতা বলে 'জনগণের ও রাষ্ট্রের দুরবস্থা' দূর করা যায়।

হিটলারী রাজত্ব আরম্ভের এটাই ছিল মৌলিক আইন এবং তিনি নানাপ্রকার কৌশল খাটাইয়া ও ধাপ্পা দিয়া রাইখস্ট্যাগে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের জোরে এই বিলটি পাশ করাইয়া নিলেন। ক্রমে সমগ্র জার্মানীর উপর তিনি একচ্ছত্র শাসন ও ডিক্টেটরি প্রতিষ্ঠা করিলেন এই আইনের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া। সুতরাং হিটলার নিজেকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মান' বলিয়া দাবী করিতে পারেন বৈকি ?

৩০শে জুনের রক্তস্নান

কিন্তু ইতিহাসের এই 'সর্বশ্রেষ্ঠ জার্মান'ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছিলেন না। তাঁর নিজস্ব নাৎসী দলের কৃপায় যে সমস্ত সামরিক ও আধা-সামরিক প্রাইভেট আর্মি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং যাদের সাহায্যে নাৎসীদল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাইতেছিলেন, তাদের দলপতিরা ছিলেন নিষ্ঠুর ও উচ্চাভিলাষী। এই সমস্ত ও আধা-সামরিক বাহিনী ইংরাজীতে এস-এ, এস-এস, স্টর্ম ট্রুপার্স, ব্রাউন সার্টস্ ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। আমাদের দেশের সংবাদপত্রে তখন এই সমস্ত প্রাইভেট বাহিনী মোটামুটি 'ঝটিকা বাহিনী' নামেই প্রচারিত হইয়াছিল। এই ঝটিকা বাহিনী এস-এস-এর সেনানীমণ্ডলীর প্রধান অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন আর্নেস্ট রোয়েম—ইনি একজন দক্ষ ও সাহসী সামরিক পুরুষ ছিলেন, কিন্তু সেইসঙ্গে একজন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিও ছিলেন। আর সেই সময় নাৎসী পার্টিতে এবং ঝটিকা বাহিনীর বিভিন্ন পদে এমন অনেক অফিসার ছিলেন যাঁরা নিষ্ঠুর, ধর্ষকাম এবং যৌন কদাচারে লিপ্ত ছিলেন। সমকামিতা (হোমোসেক্সুয়ালিটি) ছিল তাদের যৌন চরিত্রের প্রধান বিকৃতি। ক্যাপ্টেন রোয়েমও এই দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত হিটলারের ক্ষমতার শীর্ষারোহণে তাঁর সাহায্য, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের প্রয়োজন ছিল, ততদিন এই যৌন কদাচার লইয়া হিটলার কোন মাথা ঘামান নাই। কিন্তু বিরোধ বাধিল রোয়েমের রাজনৈতিক মতবাদ ও উচ্চাভিলাষের প্রশ্ন নিয়া। কারণ, ইতিমধ্যে ঝটিকা বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ২০ লক্ষ ছাড়াইয়া গেল। অর্থাৎ জার্মানীর সরকারী সৈন্যবাহিনীর মোট সংখ্যার থেকে ২০ গুণ বেশী ! (ভের্সাই সন্ধির চুক্তি অনুসারে সরকারী বাহিনীর সংখ্যা এক লক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।) সুতরাং জার্মান সেনানীমণ্ডলী বিচলিত হইলেন। এদিকে ২০ লক্ষ ঝটিকা সৈন্যের অধিনায়ক প্রচার করিতে লাগিলেন যে, হিটলার ও নাৎসী পার্টির ক্ষমতা দখলের দ্বারা প্রথম বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু 'দ্বিতীয় বিপ্লব' এখনও বাকী। এই দ্বিতীয় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইবে সমগ্র দক্ষিণপন্থী দলকে উচ্ছেদের দ্বারা, অর্থাৎ হিটলারের নাৎসী পার্টিতে দুইটি শক্তিশালী গ্রুপ ছিল—দক্ষিণ ও বাম। শ্রমশিল্পের মালিক, বড় ব্যবসায়ী এবং রণপতিদের প্রতিনিধি ছিলেন দক্ষিণপন্থী গ্রুপে আর বামপন্থী অংশে ছিলেন মধ্যবিত্ত, গরীব ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি। দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রচারক ক্যাপ্টেন রোয়েম, ডঃ গোয়েবেলস প্রভৃতির নাৎসীদের মধ্যেও কট্টর চরমবাদী বলিয়া পরিচিত হইলেন। তাঁরা 'বিগ বিজনেস' থেকে শুরু করিয়া প্রুশিয়ান জেনারেলদের পর্যন্ত উচ্ছেদ করিতে চাহিলেন। কিন্তু হিটলার ইহার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি অনুভব করিলেন যে, বড় বড় জেনারেলসহ সমস্ত জুঙ্কার, জমিদার, শিল্পপতি প্রভৃতিকে উচ্ছেদ করিতে গেলে অবিলম্বেই সরকারী বাহিনী বাঁকিয়া দাঁড়াইবে এবং হিটলার ও নাৎসীদলকে ক্ষমতাচ্যুত

করিবে। সুতরাং রোয়েমের প্রস্তাবে ও সংকল্পে তিনি বাধা দিলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে চরমপন্থীদের কার্যকলাপ চলিতে লাগিল এবং প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ এক সময় সমগ্র জার্মানীর ভার আর্মির হাতে তুলিয়া দেওয়ারও ভয় দেখাইলেন (জেনারেল ব্লুমবার্গই প্রেসিডেণ্টকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন)। এবার হিটলার সত্য সত্যই শঙ্কিত হইলেন এবং ক্ষমতা হারাইবার ভয়ে ভীত হইলেন। এদিকে গোয়েরিং এবং হিমলার ক্যাপ্টেন রোয়েমের প্রতি ছিলেন ঈর্ষান্বিত। তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য নানা ছলচাতুরি তাঁরা অবলম্বন করিতেছিলেন এবং হিটলারের কানে কানে এই মন্ত্র দিলেন যে, ক্যাপ্টেন রোয়েম তাঁর ঝটিকাবাহিনীসহ এক আকস্মিক অভ্যুত্থান ঘটাইয়া হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত ও বার্লিন দখলের চক্রান্ত করিতেছে। তখন ১৯৩৪ সালের জুন মাস। সরকারী সৈন্যবাহিনীর নেতারা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন এবং এস-এ বা ঝটিকা-বাহিনীকে দমন করিবার জন্য দাবী তুলিয়াছেন। এই সময় বার্লিন ও মিউনিকে হইতে হিটলার নাকি দুইটি গোপনবার্তা পাইলেন (কিন্তু সেই সূত্র কোন দিন প্রকাশ করা হয় নাই) এবং মনে করিলেন প্রকাশ্য বিদ্রোহ আরম্ভ হইতে আর বাকি নাই। (কিন্তু ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, 'রক্তস্নানের' সাফাই গাহিবার জন্য হিটলার সমস্ত ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়াছেন।) হিটলার তৎক্ষণাৎ তাঁর মন স্থির করিলেন, ৩০শে জুন রাত্রি ২টার সময় কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ বিমানযোগে মিউনিক রওনা হইলেন। হিটলার যখন রওনা হইলেন তখন ক্যাপ্টেন রোয়েম প্রভৃতি মিউনিক হইতে কয়েক মাইল দূরে 'wiessee' নামক শহরের এক হোটেলের কক্ষে ঘুমাইতেছিলেন। ৩০শে জুন শনিবার ভোর চারিটার সময় হিটলার তাঁর ক্ষুদ্র দলসহ মিউনিকে পেঁৗছিয়া দেখিলেন যে, কয়েকজন এস-এ নেতাকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। হিটলার মিউনিক থেকে মোটরগাড়ীযোগে রোয়েমের সন্ধানে wiessee-এর দিকে যাত্রা করিলেন এবং 'হ্যান্সব্যানর হোটেল'-এ পেঁৗছিয়া দেখিলেন যে, রোয়েম এবং তাঁর বন্ধুরা গভীর ঘুমে মগ্ন। ঘরে ঢুকিয়ে দেখা গেল হেইন্স নামক একজন এস-এ নেতা এক যুবক সঙ্গীর সঙ্গে শুইয়া আছে। (পূর্বেই বলা হইয়াছে ইহাদের অনেকেই সমকামিতায় এবং মাত-লামিতে অভ্যস্ত ছিল।) তাদের দুইজনকে বিছানা হইতে টানিয়া হিঁচড়াইয়া হোটেলের বাইরে নিয়া গিয়া সোজাসুজি গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হইল। এভাবে ৩০শে জুনের রক্তস্নান শুরু হইল। ফুরার নিজে ক্যাপ্টেন রোয়েমের ঘরে গেলেন। তাঁকে বিছানা হইতে তুলিয়া পরিবার জন্য একটি ড্রেসিং গাউন দেওয়া হইল এবং তারপর তাঁকে বন্দী করিয়া মিউনিকে ফিরাইয়া নেওয়া হইল, সেখানে অ্যাডমহেইস কারাগারে তাঁকে আটক করা হইল, কিন্তু হিটলার সরাসরি নিজে তাঁকে হত্যা করিলেন না। আজীবনের পুরাতন বন্ধু, সুখ-দুঃখের সঙ্গী এবং যাঁর সহায়তায় তিনি জার্মানীর শীর্ষস্থান দখল করিয়াছেন; শেষ সময়ে তাঁর প্রতি একটু 'উদারতা' দেখাইতে চাহিলেন। হিটলারের আদেশে আত্মহত্যার জন্য রোয়েমকে একটি পিস্তত দেওয়া হইল। কিন্তু রোয়েম সেই পিস্তল ব্যবহারে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন—

'If I am to be killed, let Adolf do it himself',

অর্থাৎ 'যদি আমাকে মরিতেই হয়, তবে হিটলার নিজ হাতে গুলী করুন।' তখন হিটলারের আদেশে দুইজন এস-এ অফিসার রোয়েমের সেলে প্রবেশ করিয়া এবং তাঁর বুকের কাছে রিভলভার ধরিয়া তাঁকে গুলী করিল। রোয়েম মৃত্যুর আগে কিছু

বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু হত্যাকারীরা তাঁকে থামাইয়া দিল। রোয়েম স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁর গায়ের জামা খুলিয়া নেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তখন তাঁর মুখে ছিল অপরিসীম ঘৃণার অভিব্যক্তি। এভাবে হিটলারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও সহযোদ্ধা হিংস্র মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

মিউনিকে যার শুরু হইল বার্লিনেও এবং অন্যত্র তাহা ছড়াইয়া পড়িল। গোয়েরিং হিমলার প্রভৃতি 'সন্দেহভাজন' ব্যক্তিদের একটি লিস্টি নাকি তৈয়ার করিয়াছিলেন। এই তালিকা অনুসারে কোন আইন আদালত ও বিচার ইত্যাদি ছাড়াই নৃশংসভাবে তাদের গুলী করিয়া হত্যা করা হইল। জেনারেল শ্লেইচার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারাইলেন। ৩০০ হইতে ১১০০ পর্যন্ত লোক খুন হইয়াছিল। সম্পূর্ণ নির্দোষ ব্যক্তি, অর্থাৎ রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বহু ব্যক্তি নিহত হইয়াছিলেন। ১লা জুলাই, রবিবার, অপরাহ্নে এই নরমেধ যজ্ঞ থামিল। বিস্ময়ের কথা এই যে, প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ এবং দেশরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল ব্লোমবার্গ এভাবে 'জার্মানীকে এক ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে রক্ষার জন্য' হিটলারকে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং তাঁর দৃঢ়তা ও সাহসিকতার প্রশংসা করিলেন। বিমূঢ় জনসাধারণও এই হত্যাকাণ্ড মানিয়া লইল।

চৌদ্দ দিন পর ফুরার রাইখস্ট্যাগে এই হত্যাকাণ্ডের স্বপক্ষে দুই ঘণ্টা ধরিয়া যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে কেবল তাঁর বাগ্মীতার সম্মোহিনী শক্তিই নয়, তার গভীর যুক্তিজ্ঞান এবং জার্মানীর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর আশ্চর্য উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। (স্বয়ং চার্চিলের এই অভিমত)। হত্যাকাণ্ডের সাফাই গাহিয়া তিনি বলিলেন —'কেন আমি আইন-আদালতের আশ্রয় নিলাম না ?'—জবাবে নিজেই বলিলেন ঃ

"Mutinies are suppressed in accordance with laws of iron which are eternally the same. If anyone reproaches me and asks why I did not resort to the regular Courts of Justice for conviction of the offenders, then all that I can say to him is this : In this hour I was responsible for the fate of the German people and thereby I became the supreme Justiciar of the German people."

হিটলারের বক্তব্য এই যে, বিদ্রোহ চিরকালই লৌহকঠিন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করা হইয়া থাকে। যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাতে আমার পক্ষে এই পথ গ্রহণ করা ছাড়া জার্মানীকে বাঁচান যাইত না এবং জার্মান জাতির ভাগ্যবিধাতারূপে আমি নিজেই চরম বিচারক হিসাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলাম।

এভাবে ৩০শে জুন তারিখের চরম বর্বরতার সাফাই গাহিয়া হিটলার সেদিনের জার্মান পার্লামেণ্টের সম্মতি আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু জার্মানীর অবস্থা কি দাঁড়াইল ? চার্চিল বলিতেছেন ঃ

"This massacre, however explicable by the hideous forces at work, showed that the New Master of Germany would stop at nothing, and the conditions in Germany bore no resemblance to

১। 'The Rise and Fall of the Third Reich' by Willam L. Shirer. পৃষ্ঠা ২৬৭-২৭৩

those of a civilised state. A Dictatorship based upon terror and reeking with blood had confronted the world….

অর্থাৎ এই হত্যাকাণ্ডের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, জার্মানীর নতুন প্রভু কোন কিছুতেই থামিবেন না এবং জার্মান রাষ্ট্র আর সভ্যপদবাচ্য রহিল না। রক্তসিক্ত এবং ত্রাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এক ভয়ঙ্কর ডিকটেটরি পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াইল।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে হিটলার

এর পর হিটলারের পথ একেবারেই খুলিয়া গেল। এতদিন তিনি ছিলেন চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী, এবার তিনি খোদ রাষ্ট্রপ্রধানের পদে বসিলেন। বৃদ্ধ মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছিল, ২রা আগস্ট (১৯৩৪) সকাল ৯টায় ৮৭ বছর বয়সে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আর দুপুর বারোটার সময়েই ঘোষণা করা হইল যে, আগের দিন ক্যাবিনেটের গৃহীত এক আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পদ এক করা হইল এবং এ্যাডলফ হিটলার রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদেও (কমাণ্ডার ইন চিফ্ অব দি আর্মড ফোর্সেস) বৃত হইলেন। প্রেসিডেণ্ট পদটি বিলোপ করা হইল। এখন হইতে হিটলার ফুরার ও রাইখ চ্যান্সেলর নামে অভিহিত হইবেন। এভাবে হিণ্ডেলবুর্গের শূন্য পদের জন্য কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল না। সুতরাং সংবিধান অগ্রাহ্য করিয়াই হিটলারকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে 'মনোনীত' করা হইল। কিন্তু এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতালাভের মধ্যেও যাতে কোথাও কোন ছিদ্র না থাকে, এজন্য হিটলার সৈন্যবাহিনীর অফিসার ও সদস্যদের নিকট হইতে আনুগত্যের শপথ আদায় করিয়া ছাড়িলেন। এই শপথ জার্মানীর নামে নয়, সংবিধানের নামেও নয়, ব্যক্তিগতভাবে হিটলারের নামে গ্রহণ করিতে হইবে।

ইহাও এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই শপথবাক্য ইতিহাসের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য এবং তাহা এই ঃ

'I swear by God this sacred oath, that I will render unconditional obedience to Adolf Hitler, the Fuehre of the German Reich and people, supreme commander of the Armed Forces, and will be ready as a brave soldier to risk my life at any time for this oath'

এই শপথবাক্যটি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে কিরূপ সতর্কতা ও কৌশলের সঙ্গে ইহা রচিত। ইহার মধ্যে কোথাও ফাঁক রাখা হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্যমণ্ডিত জার্মানবাহিনী এই প্রকার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিগতভাবে হিটলারের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন মাত্র। পরবর্তীকালে অনেক জার্মান অফিসার এই আনুগত্যের দোহাই দিয়া যুদ্ধাপরাধ হইতে রেহাই পাইতে চাহিয়াছিলেন। যে জার্মান বাহিনী ও সেনানীমণ্ডলী ইচ্ছা করিলে হিটলারকে ১৯৩৪ সালেই ক্ষমতাচ্যুত বা খতম করিতে পারিতেন, তাঁরাই যেন স্বেচ্ছায় হিটলারী ডিকটেটরির ফাঁদে ধরা দিলেন। কিন্তু প্রুশিয়ান সামরিক আভিজাত্যে গর্বিত জার্মান সেনানীমণ্ডলী যাঁর ফাঁদে ধরা দিলেন, তিনি কি চরিত্রের এবং কি ধরনের লোক ছিলেন? সেই লোকটি অর্থাৎ হিটলার সম্পর্কে অক্সফোর্ডের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ ট্রেভর-রোপার মন্তব্য করিয়াছেন ঃ

'A terrible phenomenon, imposing indeed in its granite harshness and yet infinitely squalid in its miscellaneous cumber—like some huge barbarian monolith, the expression of giant strength and savage genious, surrounded by a festering heap of refuse—old tins and dead vermin, ashes and eggshells and ordure—the intellectual detritus of centuries.'

এ হেন ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোকটিকে নিয়া সেনাপতিরাও কিন্তু অনেক ভোগান্তি ও বিরোধের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। এমনকি, হিটলারকে অপসারণের ও হত্যার চেষ্টাও কয়েকবার হইয়াছিল। কিন্তু সেদিনের জার্মানীতে হিটলার অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিলেন, সুতরাং এর পরের ইতিহাস সোজা। হিটলার ও নাৎসী দলকে বাধা দেওয়ার ও প্রতিরোধ করার আর কিছু রহিল না। একে একে তিনি জার্মানীর দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করিতে লাগিলেন। হিটলারের ব্যক্তিত্বের দ্বারা ইউরোপীয় বণিক ও বণিকসমাজের এক সুবৃহৎ অংশ মোহাচ্ছন্ন হইয়া গেল। এমন কি যে ইতালীর ডিকটেটর মুসোলিনী এতদিন সিংহের মত গর্জন করিতেছিলেন রোমের সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশায়, তিনি পর্যন্ত পিছনে পড়িয়া গেলেন।

অত্যন্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হিটলার বিনা রক্তপাতে কেবলমাত্র হুমকির দ্বারা এবং সন্ত্রাসবাদ ও যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া জার্মানীর পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি দখল করিয়া ফেলিলেন। ১৯৩৬ সালে রাইনল্যান্ড হইতে ১৯৩৮ সালে চেকোশ্লাভাকিয়া পর্যন্ত হিটলারের মুঠির তলায় আসিয়া গেল। জার্মানী, জাপান ও ইতালী কর্তৃক বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ পরিত্যক্ত হইল। সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি ভাঙ্গিয়া পড়িল, তারা কমিণ্টার্ন বিরোধী চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে জোট পাকাইল এবং ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তারের নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। হিটলার ভার্সাই সন্ধি, লোকার্নো চুক্তি, কেলগ চুক্তি ইত্যাদি সমস্ত আন্তর্জাতিক সন্ধি বাতিল করিয়া দিলেন এবং জার্মানীকে এক সর্বগ্রাসী যান্ত্রিক যুদ্ধের দিকে টানিয়া নিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে ১৯৩৭ সালে জাপান পুনরায় চীন আক্রমণ করিল, ১৯৩৬-৩৯ সালে স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কো কর্তৃক গৃহযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল, ১৯৩৮ সালে মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল এবং পরের বৎসর এপ্রিল মাসে মুসোলিনী আলবানিয়া দখল করিলেন। তারপর ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে অকস্মাৎ হিটলার ঐতিহাসিক রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। ইহাই ছিল তাঁর সেদিনের ডিপ্লোম্যাসির সবচেয়ে চতুরতাপূর্ণ কাজ। ইহার দ্বারা তিনি দুই রণ াঙ্গণের দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইলেন। ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গ কমিউনিজমের আশঙ্কায় হিটলারকে কোন বাধা দিলেন না। একটিমাত্র ব্যক্তি এবং সেই একক ব্যক্তির অধিনায়কত্বে ইউরোপীয় মহাদেশ ক্রমে ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের প্রান্তসীমায় আসিয়া দাঁড়াইল। পৃথিবী যেন নিঃশব্দ উৎকণ্ঠায় হিটলারী বিভীষিকার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।"*

* [১৯৩৩ সালের পর ইউরোপীয় রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত ও ঘটনাবলী পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। এখানে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ইতিহাসের প্রধান-প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করা হইল মাত্র।—লেখক]

চতুর্থ অধ্যায়

সোভিয়েট বিদ্বেষ ও আন্তার্জতিক সঙ্কট

ফ্যাসিস্ট তোষণনীতির পরিণাম

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েট বিপ্লব অনুষ্ঠানের পর হইতে গোটা পৃথিবী ধীরে ধীরে দুই শিবিরে বিভক্ত হইয়া যাইতেছিল। একদিকে ছিল কমিউনিস্ট রুশিয়া ও পৃথিবীর পরাধীন এবং দরিদ্র জনগণ এবং অন্যদিকে ধনতন্ত্রবাদী বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি। অবশ্য তখনও এই বিভেদ আজিকার মত এতটা স্পষ্ট ছিল না এবং বাহিরে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী আন্দোলিত হইতেছিল ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জকে কেন্দ্র করিয়া—যে শক্তিপুঞ্জের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিলেন হিটলার। হিটলার ও মুসোলিনী দুঃসময়ের ত্রাতারূপে যাঁদের নিকট প্রতিভাত হইলেন, তাঁদের রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা ছিল দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত, যে ব্যাধির হাতুড়ে দাওয়াইরূপে দেখা দিল ফ্যাসিজম।—যাহা ধনতন্ত্রবাদেরই চরম বিকৃতরূপ এবং যে মতবাদ ছিল জনগণের মুক্তি ও সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদের ঘোরতর বিরোধী। অথচ ইহা ধনতন্ত্রবাদী বৃটেন ও আমেরিকারও বিরোধী, কেননা ফ্যাসিজম এই 'তথাকথিত' ও 'দুর্বল' পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রকে স্বীকার করিল না, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনায়ককে করিল সর্বময় প্রভু, আর জাতীয়তাবাদকে টানিয়া আনিল চরম সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিক মতবাদের মধ্যে। ব্যক্তিগত পুঁজিবাদকে স্বীকার করিয়া তাহা আনা হইল রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে, আবার শ্রেণীসংগ্রামকে দমন করিয়া শ্রমিকদের ধর্মঘট বা মালিকদের 'লক-আউট'ও বন্ধ করিয়া দিল। সোজা কথায় মূলধনওয়ালা এবং পুঁজিপতিদের এক সঙ্ঘবদ্ধ নির্মম শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল, যার নায়কত্ব পাইলেন একজন ডিক্টেটর এবং যে ডিক্টেটরের অধীন একটা রাষ্ট্র হইল সর্বপ্রকারে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এজেণ্ট। সুতরাং সাধারণ ধনতন্ত্রের চেয়েও এই ফ্যাসিস্ট মতবাদ অধিকতর নগ্ন, ক্রূর এবং জাতিবিদ্বেষ ও গণবিদ্বেষের বাহন ছিল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ক্যাপিটালিজম শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার বেপরোয়া তাগিদে ফ্যাসিজমকে আশ্রয় করিতেই বাধ্য।

১৯৩৩ সালে হিটলার জার্মান রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব হাতে পাইলেন এবং তাঁর আত্মজীবনীতে নাৎসীবাদী রাষ্ট্রের যে সমস্ত নীতি ও লক্ষ্য ঘোষণা করিলেন, সেগুলি পূরণের জন্য এক নিয়মিত কর্মপন্থা অনুসরণ করিলেন। সেগুলির প্রথমেই যুদ্ধকে মানবজাতির সবচেয়ে বড় আদর্শ এবং শান্তিকে ধ্বংসের পথ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। যথা,

(১) চিরন্তন সংগ্রামে মানুষ হইয়াছে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর চিরন্তন শান্তিতে মানুষ হইবে ধ্বংস।

(২) যদি যুদ্ধের উদ্দেশ্য লইয়া কোন মৈত্রী অনুষ্ঠিত না হয়, তবে, উহা নিতান্ত বাজে এবং অর্থহীন।

(৩) ইউরোপে কখনও দুইটি রাষ্ট্রশক্তিকে মাথা তুলিতে দিও না। জার্মানীর

পার্শ্বে ইতিমধ্যেই এমন কোন রাষ্ট্রশক্তি থাকিলে, অথবা ভবিষ্যতে গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকিলে উহাকে ধ্বংস করাই হইবে মহত্তম কর্তব্য।

(৪) বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ বা ঈশ্বরের নিকট আবেদন করিয়াও জার্মানীর হৃতরাজ্যগুলি ফেরত পাওয়া যাইবে না, একমাত্র সশস্ত্র বলপ্রয়োগ ছাড়া। তীব্র প্রতিবাদের দ্বারাও নহে, একমাত্র তরবারির শক্তিতেই এই সমস্ত দেশের পুনরুদ্ধার সম্ভব। সুতরাং পররাষ্ট্রীয় নীতিতে এই তরবারির সহযোগিতা খুঁজিতে হইবে।

(৫) পররাষ্ট্রীয় নীতির মূল লক্ষ্য হইল জার্মানীর সমস্ত ভূমি ও দেশগুলি পুনরায় ফেরত পাওয়া।

(৬) কেবলমাত্র ১৯১৪ সালের জার্মান রাষ্ট্র সীমানার উদ্ধারই জার্মানীর দাবী নহে। ভুগোল, রণনীতি, নিরাপত্তা বা জার্মান জনগণের সংখ্যা, এর কোন দিক দিয়াই সেই সীমানা ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসম্মত ছিল না।

(৭) পূর্ব ইউরোপ ও বিশেষভাবে সোভিয়েট রাশিয়া হইতে নূতন দেশ কাড়িয়া লইয়া জার্মান সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে হইবে।

(৮) বর্তমানে বৃটেন ও ইতালীকে হাতে রাখিয়া ফ্রান্সকে ধ্বংস করিতে হইবে। ইহা দ্বারা ইঙ্গ-ফরাসী 'আঁতাত' বা মৈত্রী ভাঙ্গিয়া যাইবে। ফলে, জার্মানীর গতি স্বচ্ছন্দে, পার্শ্বদেশ সুরক্ষিত (সামরিক দিক হইতে) এবং কাঁচামাল সরবরাহের পথ সুগম হইবে।

(৯) যে রাষ্ট্র জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশের উপদানগুলিকে এভাবে পরিপুষ্ট করে, সেই রাষ্ট্র একদা পৃথিবীর প্রভু হইতে পারিবে।

নূতন জার্মান রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়কের উদ্দেশ্য ও নীতির ইহাই নিখুঁত, স্পষ্ট এবং নগ্নচিত্র। এই চিত্রকে কার্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত করিবার জন্য তিনটি মূল পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হইল। যথা—

(১) ফ্রান্সকে কাবু করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সমর্থনের সুযোগ লইয়া ইউরোপের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতে হইবে।

(২) জার্মানীর সীমান্তবর্তী সমস্ত রাজ্যের অভ্যন্তরে নাৎসী আন্দোলন সংগঠন করিতে হইবে এবং বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে হত্যা ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।*

(৩) যথাযোগ্য অস্ত্রসজ্জা সম্পূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক অবস্থা অনুকূল হইলেই যুদ্ধায়োজন করিতে হইবে। কিন্তু ইহা সার্থক করিতে হইলে আগে ইউরোপের সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।

হিটলারের নেতৃত্বে নূতন নাৎসী জার্মান রাষ্ট্র যে নীতি, লক্ষ্য এবং পদ্ধতির কথা প্রচার করিল, তাহা এত নির্লজ্জ ক্রূর এবং নগ্ন যে, নিতান্ত নির্বোধেরও সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকা উচিত ছিল না। ভের্সাই সন্ধি ভঙ্গ, নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার, পরের

* এই সন্ত্রাসবাদ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছিল। যথা: অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রনায়ক ডলফাস, পরবর্তীকালে ডাঃ সুশনিগ, যুগোস্লাভিয়ার রাজা আলেকজান্দার, রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডুকা (রুমানিয়ায় পরেও হত্যাকাণ্ড হইয়াছে) এবং ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বার্থো বার্লিনের সহিত চক্রান্তকারী বিভিন্ন দেশের ফ্যাসিস্ট সঙ্ঘের দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন। ডানজিগ, অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ায় এবং পোল্যাণ্ডে বহু আভ্যন্তরীণ অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল নাৎসী চরদের দ্বারা।

রাজ্য আক্রমণ, সাম্রাজ্য বিস্তার, ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি এবং হিংসা ও সশস্ত্র যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদি কোন 'সাধু মতলবই' হিটলার গোপন করেন নাই। সুতরাং আজিকার তরুণ পাঠকের দল বিস্মিত হইয়া ভাবিতে পারেন যে, নাৎসী জার্মানীর এই সমস্ত ভয়াবহ অভিসন্ধির কথা জানিয়া শুনিয়াও বৃটেন ফ্রান্স ও অন্যান্য শক্তিবর্গ হিটলারকে বাধা দিলেন না কেন এবং কেনই বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইতে দিলেন ? ইহার প্রধান কারণ ইউরোপে নূতন প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট রাষ্ট্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক শক্তির নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ।

রাশিয়ার সাম্যবাদ যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে, এজন্য গোড়া হইতেই শক্তিবর্গ চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন প্রথম মহাযুদ্ধের অত্যন্ত দুর্দিন ও সঙ্কট চলিতেছিল। সুতরাং যুদ্ধের মধ্যেই (১৯১৭, নভেম্বর) রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় এবং পরে রাশিয়া জার্মানীর সহিত সন্ধি করায় রাশিয়া কেবল 'দলত্যাগকারী' বলিয়াই প্রতিভাত হইল না, এই 'রক্তপিপাসু' সোভিয়েটেরা মিত্রপক্ষের নিকট বিশ্বাসঘাতকের মত ভয়াবহ বলিয়াও বিবেচিত হইলেন। সুতরাং বৃটিশ ফরাসী, আমেরিকান ও জাপ সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই সোভিয়েট রাশিয়াকে জব্দ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। লয়েড জর্জ স্বীকার করিয়াছেন যে, একমাত্র বৃটিশ গভর্নমেণ্টই তখন ১০ কোটি পাউণ্ড খরচ করিয়াছিলেন সোভিয়েট শাসন অবসানের জন্য। কিন্তু তাহা যখন সম্ভব হইল না, তখন রাশিয়াকে 'একঘরে' করিয়া রাখা হইল দীর্ঘকাল ভদ্র রাষ্ট্রসমাজের বাহিরে। কিন্তু রুশ বিপ্লবের দৃষ্টান্ত জার্মানী, হাঙ্গেরী ও ইতালীতে শ্রমিক সাধারণ ও জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চার করিতেছিল। ইতালী পড়িল মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরির পাল্লায়। হাঙ্গেরী ও অস্ট্রিয়ায় ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গ বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘের মারফৎ (প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আসল কর্তাই ছিলেন বৃটেন ও ফ্রান্স) কর্তৃত্ব স্থাপন করিলেন প্রচুর ঋণদানের দ্বারা। বাকি রহিল জার্মানী—এখানকার শ্রমিক-সাধারণ ও কমিউনিস্ট পার্টি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে বৃটিশ, ফরাসী ও জার্মান ধনিকদের চক্রান্তের ফলে ১৯৩০-৩৩ সালের চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিনে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে 'ইউনাইটেড ফ্রণ্ট' গঠনের চেষ্টা ভাঙ্গিয়া যায়। সেই সুযোগে হিটলারের নাৎসী দল যেমন জার্মান রাষ্ট্র দখল করিয়া লইল, তেমনই পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা জার্মানীকে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে কাজে লাগাইতে আরম্ভ করিল।

১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লয়েড জর্জ এক বক্তৃতায় স্পষ্টই বলিলেন যে যদি শক্তিবর্গ জার্মানীতে নাৎসীদের পতন ঘটায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রক্ষণশীল, সমাজ-তান্ত্রিক কিংবা উদারনৈতিক কোন শাসক প্রতিষ্ঠিত হইবে না—হইবে চরম সাম্যবাদ বা 'এক্সট্রিম কম্যুনিজম'-এর প্রতিষ্ঠা। কমিউনিস্ট রাশিয়ার চেয়ে কমিউনিস্ট জার্মানী অনেক বেশী বিপজ্জনক হইবে। সুতরাং বৃটিশ গভর্নমেণ্টের উচিত সতর্কতার সঙ্গে চলা। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে লয়েড জর্জ কমন্সসভার বক্তৃতায় আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, ইউরোপে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বৃটিশ রক্ষণশীলের একমাত্র বড় আশ্রয় জার্মানী এবং দুই এক বৎসরের মধ্যেই এজন্য জার্মানীর দিকে আমাদের তাকাইতে হইবে। জার্মানী ইউরোপের ঠিক মধ্যস্থলে। সুতরাং জার্মানীর আত্মরক্ষা

প্রাচীর যদি ভাঙ্গিয়া যায় এবং কমিউনিস্টগণ তাকে পাইয়া বসে, তবে গোটা ইউরোপ সাম্যবাদী হইয়া পড়িবে। সুতরাং জার্মানীকে নিন্দা না করিয়া বরং বন্ধুর মত তাকে সাদর আহ্বান জানানো উচিত।

হিটলারী জার্মানীকে এভাবে বন্ধুর মতই বৃটেনের রক্ষণশীল এবং ধনতন্ত্রবাদী সমাজ গ্রহণ করিলেন। এমনকি তাঁরা অকস্মাৎ ভের্সাই সন্ধির 'অবিচার' সম্পর্কে পর্যন্ত সচেতন হইয়া উঠিলেন এবং জার্মানীকে আর্থিক সাহায্য ও কূটনৈতিক সমর্থন দিতে লাগিলেন। লণ্ডন সহরের মূলধনওয়ালাগণ হিটলারের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন, 'ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড' জার্মানীর অস্ত্রসজ্জার জন্য অর্থ জোগাইতে লাগিলেন এবং 'ভিকার্স আর্মস্ট্রং' কোম্পানী (বৃটিশ সমরাস্ত্র নির্মাণের কারখানা) জার্মানীকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য দিলেন।

জার্মানীকে কেন্দ্র করিয়া বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতি দ্বিধার তরবারির মত ব্যবহৃত হইতে লাগিল। একদিকে ফ্রান্সকে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তি হিসাবে খুব বাড়িতে না দেওয়া ও জার্মানীকে লোকর্নো চুক্তির মত প্রকাশ্য বন্ধুতা মারফৎ পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী দলে টানিয়া আনা এবং অন্যদিকে তাকে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধতার দিকে ঠেলিয়া দেওয়া।

"This British support of Hitler and of German re-armament has been governed by general considerations of British foreign policy. Continuously since Versailles Britain has given general support to the restoration of German power in order to counterbalance French power in Europe, and has sought in the same time to draw Germany into a Western orientation in opposition to the Soviet Union."[১]

এদিকে জার্মানীও দেখিল যে, বৃটেনের সহায়তায় পশ্চিম ইউরোপে যদি সে 'গ্যারাণ্টি' পায়, তবে, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের দিকে ইচ্ছামত চলিবার তার কোন অসুবিধা নাই। সুতরাং বৃটিশ নীতি হিটলারের লক্ষ্য পূরণেই সহায়তা করিল। আর মিঃ চার্চিলের মতে ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে হিটলার জার্মানীর অস্ত্রসজ্জার জন্য ১৫০ কোটি পাউণ্ড খরচ করিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা ইহা দেখিয়াও দেখিলেন না, বরং হিটলারের ক্ষমতালাভের পর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ছুটিলেন জেনেভায় বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে জার্মানীর পক্ষে ওকালতির জন্যে। ভের্সাই সন্ধিতে জার্মানীর প্রতি যে ঘোরতর অবিচার হইয়াছে, সেকথা বুঝাইবার দায়িত্ব লইলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি ফরাসী বাহিনীর সংখ্যা হ্রাস (বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণের বৃটিশ প্ল্যান অনুসারে) ও জার্মান বাহিনী দ্বিগুণ করিবার পক্ষে যুক্তি দেখাইলেন। তারপর মুসোলিনীর সহযোগিতায় ইতালী, জার্মানী, ফ্রান্স ও বৃটেনের মধ্যে এক চতুঃশক্তির মৈত্রী প্রস্তাব আনিলেন। অর্থাৎ পশ্চিমের সকল রাষ্ট্রকে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে জোট পাকাইবার জন্য উৎসাহ দিলেন। অন্যথা ইউরোপে শান্তি রক্ষা করিতে হইলে রাশিয়াকে বাদ দিয়া এই সমস্ত প্রস্তাবের অন্য কোন অর্থ হয় না।

কেবল বৃটেনেই যে নাৎসী জার্মানীর পক্ষপাতী ধনিক ও শাসক সম্প্রদায় ছিল, এমন নহে। ফ্রান্সের বহু কমিউনিস্ট বিদ্বেষী রাজনীতিক ও পুঁজিপতি হিটলারের

১। 'World Politics', 1918-1936, by R. Palme Dutta, Page 257

পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। অথচ ফ্রান্স ও জার্মানীর সঙ্গে অহি-নকুলের চিরবৈরিতার সম্পর্ক। কিন্তু এই ক্ষেত্রে শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী-বিদ্বেষ সাম্যবাদের ভয়ে 'চিরশত্রু' জার্মানীকে পর্যন্ত ফ্রান্সের মিত্র বলিয়া বিবেচনা করা হইল। একদল ফরাসী ধনিক ও রাজনীতিবিদের এই মনোভাব ও চক্রান্তের জন্যই হিটলারের হাতে ফ্রান্স দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এত দ্রুত পরাজিত হইয়াছিল। অবশ্য ফ্রান্সের সামরিক কর্তৃপক্ষ বা জেনারেল স্টাফ এর পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁদের মতে রাশিয়ার সহিত মৈত্রীই ছিল আত্মরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং এর বিপরীত পন্থা ছিল ফ্রান্সের পক্ষে আত্মহত্যার সমান। কিন্তু মঃ লাভাল[১], কর্নেল ডি লা রোক, মঃ তারদিউ প্রভৃতি হিটলারের সহিত সহযোগিতার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের ইচ্ছা ছিল জার্মানীকে পূর্ব ইউরোপে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইতে দেওয়া। এজন্য ফ্রান্সের নিরাপত্তাও তাদের নিকট বড় প্রশ্ন ছিল না। মঃ ক্লেমেঁস, মঃ পঁয়েকার প্রভৃতি ফ্রান্সের রক্ষণশীল নেতারা ইতিপূর্বে যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অনুসারে জার্মানীর বিরুদ্ধতা করিয়া আসিতেছিলেন, বর্তমান ক্ষেত্রে সাম্যবাদী রাশিয়ার ভীতি সেই পুরাতন নীতিকে পর্যন্ত অস্বীকার করিতে চাহিল।

"Even in France which is directly menaced by Hitler the reactionary Fascist and pro-Fascist sections of the bourgeoise have openly supported Hitler……The Comite des Forges, the most powerful element of France finance-capital and the main backer of Fascism in France has continuously supplied the iron ore of Lorraine to Hitler which has made possible his re-armament."[২]

অর্থাৎ ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় মূলধনওয়ালার দল হিটলারকে সমর্থন করিলেন এবং লোরেন খনির লৌহধাতু তাঁকে সরবরাহ করিলেন, যে লৌহের দ্বারা হিটলার তাঁর অস্ত্রসজ্জা অনুসরণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু কেবল ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ঋণ ও লগ্নীর নাম করিয়া ১৯২৫-৩০ সালের মধ্যে প্রভূত অর্থ জার্মান শিল্পপতি ও মূলধনওয়ালাদিগকে সহায়তা দিলেন, এই সাহায্যর দ্বারাই আবার হিটলার ও নাৎসী পার্টিকে পুষ্ট করা হইতে লাগিল। বড় বড় মার্কিন প্রাইভেট ব্যাঙ্ক মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মোট ১৮২ মিলিয়ন ডলার জার্মান শিল্পসংস্থাগুলিকে ঋণ দিয়াছিল—

"The big American Bankers financed the German cannon-kings who in turn financed Hitler".

সুতরাং হিটলারের ও নাৎসী পার্টির শক্তি বৃদ্ধিতে অর্থের কোন অভাব দেখা দিল না এবং ক্ষমতা লাভের পর হিটলার কর্তৃক অস্ত্র বা জার্মানীব্যাপী সামরিক সড়ক নির্মাণেও (এর দ্বারা সেই সময়ে বেকার সমস্যার যথেষ্ট প্রতিকার হইয়াছিল) হিটলারের খুব বেগ পাইতে হইল না। জার্মান শিল্পসংস্থাগুলিকে ঋণদান ছাড়াও মার্কিন মূলধনওয়ালাগণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত জর্মানীতে মোট ১০০ কোটি

১। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ফ্রান্সের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে এর প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।
২। 'World Politics' by R. Plame Dutta.

ডলার লগ্নী করিয়াছিলেন। সোজা কথায় ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন পুঁজিপতিদের ক্রমাগত আনুকূল্য ও সাহায্যদানে এবং জার্মান শিল্পপতিদের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতার ফলে হিটলার ও নাৎসী দল এত অভুতপূর্ব সাফল্য অর্জন করিতে পারিয়াছিল।[১]

আসলে ধনপতি ও শিল্পপতিদের পক্ষে সত্যকার দেশপ্রেমিক ও জনপ্রেমিক হওয়া যে কঠিন এই সমস্ত কাহিনী তারই প্রমাণ বহন করিয়া আনে। অধ্যাপক নরডেন এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের বিখ্যাত শ্রমিক নেতা ও লেখক মিঃ ফেনার ব্রকওয়ের 'ডেথ পেইজ এ ডিভিডেণ্ট' নামক পুস্তক থেকে চাঞ্চল্যকর উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাইয়াছেন কিভাবে জার্মানীর জগদ্বিখ্যাত অস্ত্রনির্মাণ কারখানা ক্রুপ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মান রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সন্ধিক্ষণে জার্মানীর ক্রুপ কোম্পানী ইংলণ্ডের বিখ্যাত ভিকার্স এণ্ড আর্মস্ট্রং কোম্পানীকে একটি নব আবিষ্কৃত হাতবোমা ফাটাইবার কৌশল প্যাটেণ্ট হিসাবে বিক্রি করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর বৃটিশ কোম্পানীর বিরুদ্ধে জার্মান কোম্পানী এই বলিয়া নালিশ ঠুকিয়া দিল যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রতি হাতবোমা ব্যবহারের জন্য বৃটিশ কোম্পানী মাত্র ১ শিলিং করিয়া দাম দিতেছে, অথচ ক্রুপের নির্মিত ১২ কোটি ৩০ লক্ষ হাতবোমা রণক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য বৃটিশ কোম্পানীর নিকট জার্মান কোম্পানীর পাওনা ৬১ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং। অর্থাৎ ক্রুপ কোম্পানীর যে হাতবোমা (হ্যাণ্ড গ্রেনেড) তাদের শত্রুপক্ষ বৃটিশ পশ্চিম রণাঙ্গণে ব্যবহার করিয়াছে ১৯১৪-১৮ সালে এবং যার ফলে হাজার হাজার জার্মান সৈন্য হতাহত হইয়াছে, তার জন্য ক্রুপ কোম্পানী মূল্য ও মুনাফা দাবী করিতেছে। এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার বা দেশদ্রোহিতার জন্য ক্রুপের কোন দণ্ড হইল না, বরং পুরস্কারস্বরূপ বৃটিশ কোম্পানীর অংশীদারত্ব জুটিল।[২]

১৯১৯ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ২০ বৎসরের ইউরোপীয় ইতিহাস সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে বৃটেন ও পশ্চিমী শক্তিবর্গ ক্রমাগত সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধতার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, যে নীতির ফলে ইউরোপে জার্মানী এবং এশিয়ায় জাপান সাম্রাজ্য বিস্তার ও যুদ্ধায়োজনে প্রকৃত সহায়তা পাইয়াছিল, অবশ্য কেবল বৃটেনই এই ব্যাপারে একা দোষী নহে।

অন্যান্য রাষ্ট্রশক্তিও সোভিয়েট বিরোধিতার তায় সহযোগী ছিল এবং ১৯১৯ সালে পৃথিবীর ১৪টি রাষ্ট্র, যথা, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানী, ইতালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চেকোশ্লাভাকিয়া, সার্ভিয়া, চীন, ফিনল্যাণ্ড, গ্রীস, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং তুরস্কের সৈন্যদল রাশিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। অথচ মিত্রশক্তিবর্গ মুখে এই আক্রমণের কথা স্বীকার করিলেন না, তারা নানা ছুতা দেখাইলেন—তাঁরা বলিলেন যে রাশিয়ার কোন দ্রব্যসম্ভার যাতে জার্মানীর হাতে না পড়ে, এজন্যই তাঁরা সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। কখনও বা তাঁরা বলিলেন যে, 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' স্থাপনে রুশদিগকে সাহায্য করাই তাঁদের লক্ষ্য। পরবর্তীকালে মিঃ চার্চিল তাঁর গ্রন্থে (দি ওয়ার্ল্ড ক্রাইসিস : দি আফটারমথ্) বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, মিত্রপক্ষ কি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ?—অবশ্যই না। তবে, তাঁদের সৈন্য সোভিয়েট রুশদিগকে

১। পূর্ব জার্মানীর অধ্যাপক এ্যালবার্ট নরডেন রচিত 'Thus Wars Are Made', 1970, ৫৮-৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে।

২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃঃ ৭৩।

দেখিবামাত্র গুলি করিয়াছে ! সোভিয়েটের বিরুদ্ধবাদীগকে অস্ত্র জোগাইয়াছে। বন্দর-গুলি অবরোধ এবং যুদ্ধ জাহাজগুলি ডুবাইয়া দিয়াছে। অন্যান্য মিত্রশক্তি নিরপেক্ষ ছিলেন। এবং এই 'নিরপেক্ষতার যুদ্ধ' ও রাশিয়ার আপন গৃহযুদ্ধ চলিল আড়াই বৎসর। যার ফলে মোট ৭০ লক্ষ নরনারী ও শিশু মারা পড়িল—দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে ও যুদ্ধে। আর সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের মতে বৈষয়িক ক্ষতি রাশিয়ার হইয়াছিল ৬ হাজার কোটি ডলারের সমান। মিত্রপক্ষ রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই টাকার কোন হিসাব নাই। তবে মিঃ চার্চিলের মতে ১৯১৯ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃটেন খরচ করিয়াছিল ১০ কোটি পাউণ্ড এবং ফ্রান্স একমাত্র জেনারেল ডেনিকিনের সাহায্যের জন্যই ব্যয় করিয়াছিল ৩ কোটি হইতে ৪ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে। উত্তর রাশিয়াতে বৃটিশ সৈন্যদের অভিযানের জন্য খরচ হইয়াছিল ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড এবং জাপান সাইবেরিয়াতে ৭০ হাজার সৈন্য রক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছিল ৯০ কোটি ইয়েন।

কিন্তু এই সমস্ত ব্যয়বহুল অভিযান ব্যর্থ হইবার পর ১৯২৫-২৬ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশে ও পরাধীন দেশে রুশ বিপ্লবের দৃষ্টান্তে সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন দেখা দিল। আর সেই সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে অতি জঘন্য নিন্দাবাদ, বিদ্বেষ ও নিদারুণ মিথ্যার অভিযানে ধনতন্ত্রবাদীগণ সারা পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল। সুতরাং ১৯২৬ সালের বসন্তকালে চীনের যে রাষ্ট্রবিপ্লব, কুমিণ্টাং ও কমিউনিস্টদের সম্মিলিত ফ্রণ্টের দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল, তাহাও 'মস্কোর চক্রান্ত' বলিয়া প্রতিভাত হইল। পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ জাপানকে উস্কানি দিল এবং জাপ-সম্রাটও এশিয়াকে 'বলশেভিক বর্বরতা' হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। জাপানী প্রধানমন্ত্রী জেনারেল টানাকা হইলেন সম্রাটের প্রধান সহায়। তিনি রাশিয়াসহ গোটা বিশ্বজয়ের এক প্ল্যান ফাঁদিয়া বসিলেন—যাহা 'টানাকা মেমোরিয়াল' নামে খ্যাত। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে মাঞ্চুরিয়ায় কুখ্যাত 'রণপ্রভু' জেনারেল চ্যাং সো-লিন জাপানী গভর্নমেণ্টের ক্রীড়ানকরূপে পিকিংয়ের সোভিয়েট দূতাবাসে হানা দিলেন এবং তিনি চীনের বিরুদ্ধে এক 'বলশেভিক চক্রান্ত' আবিষ্কার করিলেন। আর জেনারেল চিয়াং কাইশেক জাপান, বৃটেন ও ফ্রান্সের 'সাহায্য' ও উৎকোচে বশীভূত হইয়া কুমিণ্টাং ও কমিউনিস্টদের ইউনাইটেড ফ্রণ্ট ভাঙিয়া দিলেন এবং সাংহাই, পিকিং ও অন্যত্র হাজার হাজার কমিউনিস্ট কিংবা কমিউনিস্ট সন্দেহে ধৃত উদারনৈতিকপন্থী যুবক, ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকদিগকে বিনাবিচারে আটক, গ্রেপ্তার কিংবা গুলী করিয়া হত্যা করিলেন। চীন গৃহযুদ্ধে উচ্ছন্ন যাইতে লাগিল, আর চীন-বিপ্লব ও রুশ-বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং গণবিক্ষোভ দেখা দিল।

এই অবস্থার মধ্যে ইউরোপে লোকার্নো সম্মেলন—১৯২৬-২৭ সালে ইঙ্গ-ফরাসী রাজনীতিকগণ চাহিলেন জার্মানীকে দলে টানিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে। বৃটেনের গোঁড়া রক্ষণশীল দল ও ফ্রান্সের মঃ পয়েঁকার ও মার্শাল ফস্ প্রভৃতি এই চক্রান্তে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এবং ১৯২৭ সালের ২৭শে মে বৃটিশ পুলিশ ও গোয়েন্দাগণ লণ্ডনের সোভিয়েট বাণিজ্য দূতাবাসে (আরকট হাউস) হানা দিল এবং বার্লিন ও প্যারিসেও অনুরূপ হানা চলিল। যদিও কোথাও সোভিয়েট

চক্রান্তের কোন দলিল বা প্রমাণ পাওয়া গেল না, তথাপি বৃটিশ গভর্নমেণ্ট রাশিয়ার সহিত সমস্ত প্রকার কূটনৈতিক ও বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। এমনকি ১৯২৯ বা ১৯৩০ সালের গ্রীষ্মকালে বাহ্যতঃ পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের সহায়তায় সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের এক বিরাট চক্রান্ত হইল। পলাতক রুশ ধনিকগণ বৃটেন ও ফ্রান্সের রক্ষণশীলদের সহায়তায় এই ষড়যন্ত্র করিলেন। কিন্তু ১৯৩০ সাল হইতে পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুর্গতি অকস্মাৎ বোমার মত ফাটিয়া পড়িল (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এবং সর্বত্র বেকার সমস্যা, দুর্ভিক্ষ ও অনশন দেখা দিল। বড় বড় ব্যাংক ও সওদাগরী অফিস কারবার গুটাইতে বাধ্য হইল। ফলে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ধনিকদের সশস্ত্র অভিযানের প্ল্যান মাটি হইয়া গেল। কারণ, সারা সভ্য পৃথিবীর সমগ্র ধন-তান্ত্রিক ব্যবস্থাই ভাঙ্গিয়া পড়িবার জো হইল—ব্যাংক অফ ইংলণ্ডের গভর্নর স্যার মন্টেগু নরম্যানের মতে। কিন্তু এশিয়া-খণ্ডে ধূর্ত জাপান দেখিল এই তার সুযোগ, সুতরাং ১৯৩১ সালের ১৯ই সেপ্টেম্বর জাপ সৈন্যেরা মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল চীনকে 'বলশেভিক মতবাদ' হইতে রক্ষার জন্য। আমেরিকা প্রতিবাদ জানাইল এবং বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘে চীন আবেদন জানাইল। কিন্তু বৃথা, বৃটেন ও ফ্রান্স জাপানী আক্রমণকে নিঃশব্দে অনুমোদন করিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভূমিকা রচিত হইল।

এই সময় কেবল বাহিরের শত্রু নহে, ভিতরের গৃহশত্রুরাও সক্রিয় হইল। ১৯৩৩ সালে হিটলার কতৃক জার্মান রাষ্ট্র দখলের পর সারা ইউরোপে হত্যাকাণ্ড, বিশ্বাস-ঘাতকতা, নাশকতা এবং ষড়যন্ত্রের এক ঢেউ বহিয়া গেল। রাশিয়ার অভ্যন্তরে ট্রট্স্কি এবং তাঁর দলবল এক নিদারুণ 'বিশ্বাসঘাতকতার' ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হইলেন, যাহা শেষ হইল ১৯৩৬ সালে ইতিহাস বিখ্যাত মস্কো ষড়যন্ত্র মামলার বিচারে এবং বড় বড় ট্রট্স্কিপন্থী নেতাদের প্রাণদণ্ডে। ট্রট্স্কি রাশিয়া হইতে পরিত্রাণ লাভপূর্বক দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকোতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন এবং পরে আততায়ীর হাতে নিহত হইয়াছিলেন। রাশিয়ার ভিতরে ও বাইরে—ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, এস্থোনিয়া প্রভৃতি দেশে নাৎসী গুপ্তঘাতকেরা বহু লোকের প্রাণনাশ করিল। এই সমস্ত চক্রান্ত এত ব্যাপক এবং ভয়াবহ ছিল যে, ১৯৩৭ সালে রেড আর্মির কয়েক জন সেরা জেনারেল ও মার্শাল পর্যন্ত দেশদ্রোহিতার অভিযোগে প্রাণ হারাইলেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের সোভিয়েট-বিদ্বেষের জন্য ১৯৩৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকা ক্রমশঃ নিবিড় হইয়া আসিতে লাগিল। জার্মানী ও জাপান গোপনে চক্রান্ত করিতে লাগিল সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণের জন্য। জার্মান হাইকম্যাণ্ড পোল্যাণ্ডের ফ্যাসিস্ট পক্ষ-পাতী রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের সহিত শলাপরামর্শ করিতে লাগিলেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে। বাল্টিক রাজ্য, বলকান রাজ্য এবং অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় নাৎসী আন্দোলন ও বিশ্বাসঘাতকতা দানা বাঁধিতে লাগিল। আর ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঃ লাভাল এবং বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব স্যার জন সাইমন ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে (১৯৩৫) ঘোষণা করিলেন, জার্মানীকে ভার্সাই সন্ধির কয়েকটি ধারা হইতে মুক্তি দিতে। জার্মানীও তাহাই চাহিতেছিল। ঘটনার গতি দ্রুত আগাইয়া চলিল। ১লা মার্চ হিটলার ফ্রান্সের নিকট হইতে কয়লাখনির রাজ্য সারজেলা ফেরত পাইলেন এক গণ-ভোটের দ্বারা এবং এই ভোটগ্রহণের পিছনে ছিল নাৎসী সন্ত্রাসবাদের ভীতি। তারপর ১৬ই মার্চ নাৎসী জার্মানী যথারীতি ভার্সাই সন্ধি বাতিল

বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং জার্মানীতে 'সর্বজনীন বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি' প্রবর্তন করিলেন এক হুকুমনামার দ্বারা। ফারাসী, বৃটিশ, পোল এবং ইতালীর রাজদূতদিগকে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেওয়া হইল। ১৩ই এপ্রিল জার্মানী বৃহৎ বোমাবর্ষী বোমারুবহর সৃষ্টির এক কর্মতালিকা প্রচার করিল। এবং ১৮ই জুন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ বলডুইন (রক্ষণশীল) বৃটেন ও জার্মানীর মধ্যে এক নূতন নৌ-চুক্তির কথা ঘোষণা করিলেন। তখন বৃটিশ নৌবহর ছিল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। নূতন চুক্তি অনুসারে জার্মানী বৃটিশ নৌবলের শতকরা ৩৫ ভাগের সমান নৌবল বৃদ্ধি করিতে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমগ্র সাবমেরিনবহরের সমান সাবমেরিন তৈয়ারীর অধিকারী হইল। অক্টোবর মাসে (১৯৩৫) ফ্রান্সের মঃ লাভাল এবং বৃটেনের স্যার স্যামুয়েল হোর (যিনি এককালে ভারতসচিবরূপে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন)—এই দুইয়ের আশীর্বাদ পাইয়া মুসোলিনী আবিসিনিয়া বা আফ্রিকার শেষ স্বাধীন রাজ্য আক্রমণ এবং ১৯৩৬ সালের মে মাসে উহা দখল করিলেন। ৫ লক্ষ ফ্যাসিস্ট সৈন্য এই অভিযানে যোগ দিল এবং আধুনিক বিজ্ঞানে অনগ্রসর হাবসীদের উপর বোমাবর্ষণ ও বিষাক্ত গ্যাস পর্যন্ত ব্যবহার করিল।

১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে যেমন চীন আবেদন জানাইয়াছিল বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের দরবারে, এক্ষেত্রেও তার পুনরাবৃত্তি হইল। ইতালী, জাপান ও জার্মানীর দৃষ্টান্তে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি শংকিত হওয়ায় জেনেভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটা বৈঠকও বসিল এবং মৌখিক আদর্শ রক্ষার খাতিরে ইতালীকে 'আক্রমণকারী' বলিয়া ঘোষিত এবং তাঁর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি হইল—৭ই অক্টোবর, ১৯৩৫। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইতালী যথারীতি বৃহৎ শক্তিবর্গের নিকট হইতে সমরসম্ভারের প্রাণবস্তু লৌহ, কয়লা এবং পেট্রোল সরবরাহ পাইতে লাগিল। এই প্রহসনের শেষ অঙ্কে দেখা গেল যে, ফ্রান্স মুসোলিনীর সঙ্গে আপোষ করিয়া ফেলিয়াছে এবং বৃটেন 'সাম্রাজ্যের প্রাণপ্রবাহের পথ' ভূমধ্যসাগরে ইতালীর সঙ্গে যুদ্ধের আশংকায় 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' নীতি অবলম্বন করিয়াছে।

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি সদস্য রাষ্ট্রকে মুসোলিনী যখন এভাবে হত্যা করিতেছিলেন, তখন তাঁরই দোসর হিটলার সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন রাইনল্যাণ্ডে—১৯৩৬ সালের ৭ই মার্চ। ১৯২৫ সালের লোকার্নো চুক্তি অনুসারে জার্মানীসহ সমগ্র পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ রাইনল্যাণ্ডকে নিরস্ত্রীকৃত রাখিবার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এজন্যই লোকার্নো চুক্তিকে ইউরোপের একটা শান্তির যুগ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল। বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী ও ইতালী—এই সমস্ত পশ্চিমী শক্তি এই চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা ইউরোপে শান্তি নিশ্চিত করিলেন, এমন একটা ধারনার সৃষ্টি করা হইয়াছিল। কারণ, এই চুক্তির স্বাক্ষরকারিরা পরস্পরের রাজ্যসীমা মানিয়া চলিবে এবং বলপ্রয়োগের নীতি পরিহার করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার এই যে, ইউরোপে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলেও সোভিয়েট রাশিয়াকে কিন্তু সযত্নে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে হিটলার ভার্সাই সন্ধির মত লোকার্নো চুক্তিপত্রও বাজে কাগজের টুকরার মত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ফরাসী সৈন্যেরা সীমান্তে দাঁড়াইয়া দেখিল, কিন্তু বাধা দেওয়ার হুকুম পাইল না। যদি হুকুম পাইত

তাহা হইলে হিটলারের পক্ষে রাইনল্যাণ্ড পুনর্দখল করা সম্ভবই হইত না। কিন্তু বৃটেন ফ্রান্সের সহায়তায় এমন কোন কাজ করিতে রাজী হইল না, যা দ্বারা যুদ্ধ বাধিতে পারে। অর্থাৎ ফ্রান্সকে বলপ্রয়োগ করিতে দেওয়া হইল না। আর হিটলার ঘোষণা করিলেন যে, তিনি রাইনল্যাণ্ড আবার দখল করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহাকে 'দুর্গায়িত' (ফরটিফাই) করা হইবে না এবং ইউরোপে' তাঁর আর কোন ভূমিগত দাবি নাই। তাঁর মতে 'বিস্ময়ের যুগ' শেষ হইয়াছে।

১৯৩৩ সালের ১৪ই অক্টোবর জার্মানী রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়াছিল, জাপান উহার আগেই (২৭শে মার্চ) মাঞ্চুরিয়া অভিযানের পর রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করিয়াছিল এবং ইতালীও পরে সেই একই পন্থা অনুসরণ করিল, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭। ইউরোপে শান্তিরক্ষার জন্যে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি ভাঙ্গিয়া গেল এবং ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খ্যাতিমান রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিট্‌ভিনোভ এই সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি অনুসরণের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিষদে বার বার আবেদন জানাইলেন। কিন্তু সাম্যবাদ-ভীত পশ্চিম ইউরোপের শক্তিপুঞ্জ ইহা বুঝিয়াও বুঝিলেন না—ফ্যাসিস্ট ব্যাঘ্র রুশ ভল্লুকের ঘাড় মটকাইবে, ইহাই ছিল তাঁদের ইচ্ছা এবং মতলব। সুতরাং জার্মানী, ইতালী এবং জাপানকে কোন প্রকার বাধা দেওয়া হইল না। ইঙ্গ-ফরাসী নেতারা এক সর্বনাশা তোষণনীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন যে, এভাবে তাঁরা যুদ্ধের ফ্যাসাদ হইতে রক্ষা পাইয়া যাইবেন। ডিক্টেটরগণও এই তোষণনীতির আসল কারণ উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁরা পরস্পরের সহিত চক্রান্ত করিয়া যেমন সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি ব্যর্থ করিয়া দিলেন, তেমনই পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিয়া আরও সোভিয়েট বিদ্বেষ প্রচার করিতে লাগিলেন। জার্মানীর নিকট সমগ্র ইউরোপ, ইতালীর নিকট ভূমধ্যসাগর ও উত্তর আফ্রিকা এবং জাপানের নিকট পূর্ব এশিয়া রাজ্য বিস্তার ও প্রভুত্ব স্থাপনের স্ব স্ব এলাকা বলিয়া প্রতিভাত হইল। আর পশ্চিম ইউরোপের শক্তিবর্গ যেন পরস্পরের সহিত পাল্লা দিয়া ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জকে তোষণ করিতে লাগিলেন। ১৯৩৬ সালের ২৫শে নভেম্বর জার্মানী ও জাপান কমিণ্টার্ন-বিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করিল এবং ১৯৩৭ সালের ৬ই নভেম্বর ইতালীও সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর দিল। এই ত্র্যহস্পর্শ যোগের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের বিরোধিতা করা। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ মনে মনে খুশী হইলেন। কিন্তু তাঁরা ভুলিয়া গেলেন যে, এই তিনের সহযোগিতায় যে শক্তি সঞ্চিত হইতেছে, একদিন সেই শক্তি তাঁদের বিপদ ঘটাইতে পারে।

১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই জাপান আবার চীনদেশ আক্রমণ করিল এবং পিকিং টিয়েনসিন ও সাংহাই দখল করিল। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ উদাসীন রহিলেন। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরে জাপ আধিপত্যের ভয়ে আমেরিকা আগের মতই প্রতিবাদ জানাইল, যদিও বিশেষ কোন ফল হইল না।

তারপর শুরু হইল স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের শোচনীয় নাটক, যাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে আরও এক ধাপ অগ্রসর করিয়া আনিল।

স্পেনের নূতন রিপাবলিকান গভর্নমেণ্ট ভূমি-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের কতকগুলি আইন প্রবর্তন করিলেন। ফলে, রক্ষণশীল দল, কায়েমী স্বার্থের বাহকগণ

এবং বড় বড় ভুস্বামী আতংকগ্রস্ত হইলেন এবং ইহা কমিউনিস্টদের কাণ্ড বলিয়া চীৎকার শুরু করিলেন, যদিও স্পেনে কমিউনিস্ট বেশী ছিল না এবং পপুলার ফ্রণ্ট গভর্নমেণ্টও আদৌ সাম্যবাদী ছিলেন না। কিন্তু তাতে কি যায় আসে? ফ্যাসিস্ট দলপতি জেনারেল ফ্রাঙ্কো দেখিলেন এই তাঁর সুযোগ। প্রায় সমগ্র সৈন্যদলের এবং মুর সৈন্যদের সহযোগিতায় তিনি রিপাবলিকান গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ১৮ই জুলাই (১৯৩৬) তারিখে বিদ্রোহ করিলেন স্পেনীয় মরক্কো হইতে। এই গৃহযুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া অক্ষশক্তিবর্গ তাঁদের শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন। তাঁরা দেখিলেন যে, স্পেনে ফ্যাসিস্ট রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে দক্ষিণ দিকে ফ্রান্স কাবু হইবে, আর ইংলণ্ডের জিব্রাল্টার প্রণালীর জলপথ বিপন্ন হইবে। সুতরাং ইতালী ও জার্মানী জেনারেল ফ্রাংকোকে সাহায্য দিতে লাগিল। দুই বৎসরে ইতালী লক্ষাধিক সৈন্য পাঠাইল ফ্রাংকোর সাহায্যের জন্য, আর জার্মানী দিল ট্যাংক, গোলাগুলি, কামান এবং বিমানবহরের সাহায্য ও সুশিক্ষিত স্বেচ্ছাসৈনিক। কেবল তাহাই নহে, তারা নূতন যান্ত্রিক যুদ্ধের পদ্ধতি এবং অস্ত্রগুলিও স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের রণাঙ্গনে পরীক্ষা করিতে লাগিল। ফ্রান্স এই ব্যাপারে শঙ্কিত হইল এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সহযোগিতায় তারাও রিপাবলিকান গভর্নমেণ্টের আত্মরক্ষার জন্য সৈন্য ও বিমান পাঠাইতে লাগিল। কিন্তু এভাবে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের ফলে পাছে মহাযুদ্ধের প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া যায়, এই আশংকায় ফ্রান্স ও রাশিয়া অধিকতর সাহায্যদান ও হস্তক্ষেপে বিরত হইল এবং অক্ষশক্তিবর্গও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াই ইতালী ও জার্মানী প্রকাশ্যে পূর্ববৎ ফ্রাংকোকে সাহায্য দিতে লাগিল। বৃটেন ও ফ্রান্স 'নন-ইণ্টারভেনসন'-এর দোহাই দিয়া দূরে সরিয়া রহিল এবং তাদের ফ্যাসিস্ট পক্ষপাতপুষ্ট নীতি এই ভ্রান্ত বুদ্ধির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হইল যে, ইহা দ্বারা স্পেনে সাম্যবাদের গতি রুদ্ধ এবং ইউরোপে যুদ্ধ নিবারিত হইতেছে।

প্রায় তিন বৎসর তীব্র লড়াই এবং প্রায় আড়াই বৎসর রাজধানী মাদ্রিদ অবরোধের পর ৫ লক্ষ লোকের প্রাণের বিনিময়ে ১৯৩৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল জেনারেল ফ্রাংকো পূর্ণ জয়লাভ করেন। ইউরোপে ফ্যাসিস্ট জয়যাত্রা অপ্রতিহত হইল।

কিন্তু স্পেনের এই ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ সেদিন সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কারণ, উহাই ছিল প্রথম ফ্যাসিজম বনাম গণতান্ত্রিক শক্তির যুদ্ধ। সুতরাং স্পেনের রিপাবলিকান সরকারকে সাহায্য করার জন্য পৃথিবীর নানা দেশের প্রগতিবাদী ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী লোকেরা স্বেচ্ছাসৈনিকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এজন্য যে বিখ্যাত ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড গঠিত হইয়াছিল, তাতে ১০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক যোগ দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেই সময় স্পেনের বার্সিলোনা রণক্ষেত্রে গিয়াছিলেন এবং শহরের উপকণ্ঠে স্বয়ং সেই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির ভণ্ডামী ও ফ্যাসিজমের ক্রূরতা নেহরুকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আরও বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিয়াছিল।

ইতিমধ্যে ক্ষমতামত্ত এবং তোষণনীতিতে পুষ্ট হিটলার আরও দুঃসাহসী হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রমাগত সৈন্যবল ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। জার্মান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যে সমস্ত রক্ষণশীল জেনারেল তাঁর সহিত একমত হইলেন না, তিনি তাঁদের বিতাড়িত করিলেন—১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তখন হইতে হিটলারের

ভাষা ও কণ্ঠস্বর আরও উগ্র হইতে লাগিল। তিনি কেবল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সহিত জার্মানীর সমান মর্যাদা ও অধিকার দাবী করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, পার্শ্ববর্তী সমস্ত রাজ্যের সমস্ত জার্মান বাসিন্দাদিগকে একত্র করিয়া বৃহত্তর জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচারকার্য চালাইতে লাগিলেন। অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের জার্মান অধিবাসীদের একত্র করিবার উদ্দেশ্যে তিনি Lebensram বা 'বাসভূমির' জন্য দাবী করিলেন। এজন্য পূর্ব সংকল্প অনুযায়ী তিনি এই সমস্ত দেশের অভ্যন্তরে নাৎসী আন্দোলন সংগঠন করিলেন এবং ভিতর হইতে সন্ত্রাসবাদ ও নানাপ্রকার গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া এই সমস্ত গভর্নমেণ্টকে বিপাকে ফেলিবার নির্দেশ দিলেন। পরে 'আভ্যন্তরীণ গোলযোগ' ও 'জার্মানদের উপর অকথ্য পীড়নে'র ছুতা ধরিয়া হিটলার ও তাঁর দলবল 'নির্যাতিত জার্মানদের উদ্ধারের' জন্য বলপ্রয়োগ ও অন্যান্য কৌশল খাটাইতে লাগিলেন। ডাঃ গোয়েবলসের প্রচারবিভাগ উগ্র হইয়া উঠিল।

এই কৌশলের প্রথম বলি হইল অস্ট্রিয়া। হিটলারী চক্রান্তের প্ররোচণায় সেখানকার নাৎসীদল Anschluss বা জার্মানীর সহিত 'মিলনের' আন্দোলন চালাইল। তখনকার অস্ট্রিয়ার গভর্নমেণ্ট ছিল অত্যন্ত দুর্বল এবং তাঁরা আবার সোসিয়েলিস্ট পার্টিকে দমন করিয়া বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং একদিকে তথাকথিত ফ্যাসিস্ট আন্দোলন এবং অন্যদিকে দুর্বল গভর্নমেণ্ট, এই উভয়ের সুযোগ পাইয়া হিটলার তাঁর পল্লীভবন বিখ্যাত বার্সেটস্ গার্ডেনে (ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত) অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ডাঃ সুশনিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং জোর পূর্বক তাঁর কাছ থেকে অস্ট্রিয়ায় জার্মানীর প্রবেশের এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া লইলেন—১৯৩৮ সালের সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী। ডাঃ সুশনিগ নাৎসীদের হাতে বন্দী হইলেন। ঠিক একমাস পর ১২ই মার্চ জার্মান সৈন্যেরা অস্ট্রিয়া আক্রমণ ও দখল করিল। এই ঘটনায় সারা ইউরোপ স্তম্ভিত হইল, কিন্তু হিটলারের বিরুদ্ধে কেহ অঙ্গুলি তুলিল না, পাছে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। রাইনল্যাণ্ড দখলের পর হিটলার যেমন বলিয়াছিলেন, অস্ট্রিয়া দখলের পরও তেমনই তিনি ঘোষণা করিলেন যে ইউরোপে আর তাঁর কোন ভূমিগত দাবী নাই। এমনকি, তাঁর দক্ষিণহস্ত গোয়েরিং বৃটেনের নিকট হিটলারের নামে এই 'পবিত্র' প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, চেকোশ্লোভাকিয়া বা অন্য কোন দেশ আক্রমণের কোন ইচ্ছা তাঁদের নাই।

কিন্তু বরাবরের মত ইহাও ছিল নিতান্তই ধাপ্পাবাজী। অস্ট্রিয়া দখলের পরেই জার্মানীতে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে এক আন্দোলন আরম্ভ হইল। আর নাৎসী দলের পূর্ব-চক্রান্ত অনুসারে চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জেলার জার্মানরা হেনলেইনের নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসনের দাবী ও মাইনরিটি হিসাবে তাদের উপর 'অত্যাচার ও পীড়নের' অভিযোগ করিতে লাগিল। চেক গভর্নমেণ্ট বৃটেনের 'মধ্যস্থতায়' বাধ্য হইয়া সুদেতেন জার্মানদিগকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিলেন। কিন্তু এই অধিকার পাইবামাত্র তারা জার্মানীর সহিত 'মিলনের' আন্দোলন আরম্ভ করিল। ইহার ফলে চলিল গুণ্ডামী ও বিশৃংখলার অভিযান। হিটলার যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া সুদেতেনল্যাণ্ড জার্মানীর পক্ষ হইতে ফেরৎ চাহিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়া দৃঢ়তা দেখাইতে লাগিল, ফ্রান্সের সঙ্গে ছিল তার আত্মরক্ষার চুক্তি এবং ফ্রান্সের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ারও ছিল মৈত্রী বন্ধন। সীমান্তের দুর্গাবৃত অঞ্চলে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত চেক সৈন্যরা

দণ্ডায়মান হইল, ফ্রান্স তার রিজার্ভ বাহিনীকে ডাকিয়া পাঠাইল এবং গ্রেট বৃটেন বাধ্য হইয়া হিটলারকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিল যে, ফ্রান্স যদি চেকোশ্লোভাকিয়ার রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়, তবে তারাও ফ্রান্সকে সাহায্য করিবে। কিন্তু এবারও সোভিয়েট বিদ্বেষের জন্য সমস্ত ভণ্ডুল হইল। রাশিয়া বরাবরই ইউরোপীয় সংকট লক্ষ্য করিয়া সকলের সঙ্গে একত্রে সমষ্টিগত নিরাপত্তা-নীতি অবলম্বেনের জন্য প্রস্তাব করিয়া আসিতেছিল। বিশেষতঃ চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে তার পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি ছিল। কিন্তু বৃটেন তাতে রাজী হইল না এবং ১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মকালে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ফ্যাসিস্ট তোষণনীতির চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হইলেন।

এদিকে হিটলার ইঙ্গ-ফরাসী-চেক প্রতিরোধের মুখে দাঁড়াইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। কেননা, তিনি জানিতেন যে, সাম্যবাদে ভীতিগ্রস্ত এই সমস্ত শক্তিবর্গ তাঁকে বাধা দিবেন না এবং যুদ্ধকেও তাঁরা এড়াইয়া চলিবেন। সুতরাং ১৯৩৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর হিটলার আবার ধাপ্পা দিলেন এবং আগের মতই ভূমিগত 'বৈরাগ্যের' (?) পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, এই সুদেতেনল্যাণ্ড ছাড়া ইউরোপে তাঁর আর কোনো দাবী নাই, ইহাই শেষ এবং ইহা ফেরৎ পাইলেই তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত এবং সুখী।

"This is the last territorial claim I have to make in Europe. I have assured Mr. Chamberlain and I emphasise it now that when this problem is solved Germany has no more territorial problems in Europe···We do not want any Czechs···I shall not be interested in the Czech State any more".

চেম্বারলেনের বৃটেন ও দালাদিয়েরের ফ্রান্স সোভিয়েট বিদ্বেষে অন্ধ ও বুদ্ধিভ্রষ্ট ছিল—আবার হিটলালের প্রতিশ্রুতিকে তাঁরা বেদবাক্য মনে করিলেন। বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী চেম্বারলেন দুইবার বিমানযোগে ছুটিলেন হিটলারের সকাশে, তাঁকে খুশী করিবার জন্য। বৃটেন ও ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর বিষম চাপ দিতে লাগিল নাৎসী জার্মানীকে আপোসের দ্বারা সন্তুষ্ট করার জন্য। এদিকে হিটলার-দোস্ত মুসোলিনীও ছুটিয়া গেলেন আপোষ মীমাংসার দাবীতে। বৃটেন ও ফ্রান্স হিটলারের দাবীতে সম্মত হইল এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে বাদ দিয়াই চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হইল ১৯৩৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর মিউনিক সম্মেলনে। হিটলারের দাবী অনুসারে সোভিয়েট রাশিয়াও অবশ্য এই সম্মেলন হইতে বাদ গেল এবং মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা সুদেতেনল্যাণ্ড জার্মানীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল।

অক্ষশক্তিবর্গ কূটনীতির ধাপ্পাবাজীতে জয়যুক্ত হইল। কিন্তু হিটলার মিউনিক চুক্তি মারফৎ জার্মান-অধ্যুষিত সুদেতনেল্যাণ্ড কুক্ষিগত করিয়াই থামিলেন না। পরের বৎসর মার্চ মাসে অস্ট্রিয়ার অনুকরণে চেক প্রেসিডেণ্ট হাচাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন বার্লিনে এবং জোরপূর্বক সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মানীর 'আশ্রিত রাজ্যে' পরিণত করিবার এক দলিলে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন।

নাৎসী সৈন্যেরা চেকোশ্লোভাকিয়ায় মার্চ করিল এবং গোটা দেশ দখল করিল। কয়েকদিন পর লিথুয়ানিয়ার জার্মান-অধ্যুষিত মেমেল বন্দরও (যাহা ভার্সাই সন্ধি অনুসারে জার্মানীর হাতছাড়া হইয়াছিল) তিনি কাড়িয়া লইলেন। আবার হিটলার

ঘোষণা করিলেন যে, ইউরোপে তাঁর ভূমিগত আর কোন দাবী নাই—ভার্সাই সন্ধির ক্ষতিপূরণ-ধারার এখানেই খতম।

ইহার দুই সপ্তাহ পর ইতালীর পালা। মুসোলিনী আক্রমণ করিলেন আড্রিয়াতিক উপসাগরের উপকূলবর্তী আলবানীয়া রাজ্য। হিটলার তাঁকে সমর্থন জানাইলেন। ১৯৩৯ সালের ৭ই এপ্রিল ক্ষুদ্র ও অসহায় আলবানিয়া রাজ্য মুসোলিনীর দখলে চলিয়া গেল—ফ্যাসিস্ট পক্ষপাতী ইউরোপীয় শক্তিবর্গ নীরব দর্শকমাত্র রহিলেন।

সাম্যবাদী রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষকে কেন্দ্র করিয়া এভাবে ইউরোপ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সন্ধিক্ষণে আসিয়া পেঁাছিল। ফ্যাসিস্ট তোষণনীতি হিটলার ও মুসোলিনীকে শক্তি-মত্ততায় ও দিগ্বিজয়ে প্রলুব্ধ করিল এবং সোভিয়েট রাশিয়া সমষ্টিগত নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া একক ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু বুদ্ধিমান স্ট্যালিন বোকা বনিবার পাত্র ছিলেন না। সুতরাং সমগ্র জগৎ আর একটি বিস্ময়কর নাটকীয় ঘটনার সম্মুখীন হইল।—উহার নাম রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের উহাই ছিল শেষ ভূমিকা।

পঞ্চম অধ্যায়

মিউনিক চুক্তির কলঙ্ক

১৯৩৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল এবং বৃটেনের প্রধান-মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ফিরিয়া আসিলেন লণ্ডনে। ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীটে মন্ত্রিভবনের সম্মুখে এক উদ্বিগ্ন জনতা ইউরোপের ভাগ্য জানিবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। মিঃ চেম্বারলেন সেই জনতার উদ্দেশ্যে একখানি কাগজের টুকরা বিজ্ঞাপনের ভঙ্গীতে আন্দোলিত করিয়া বলিলেনঃ 'I believe it is peace in our time'. অর্থাৎ এর দ্বারা আমাদের আমলে শান্তি সুনিশ্চিত হইল।

সেই কাগজের টুকরায় মিঃ চেম্বারলেন ও হের হিটলারের স্বাক্ষর ছিল। অপেক্ষমান জনতা ইউরোপের আসন্ন দুর্বিপাক নিবারিত হইল অনুমান করিয়া বিপুল করতালি-ধ্বনির দ্বারা চেম্বারলেনকে অভিনন্দন জানাইল। কিন্তু সেই উৎসুক জনতা জানিত না যে, সেই স্বাক্ষরিত কাগজের টুকরা শীঘ্রই নাৎসী ঝটিকাঘাতে দিগন্তে উড়িয়া যাইবে।

* * *

ইউরোপের বিগত ১০০ বছরের ইতিহাসে মিউনিক চুক্তির মত এত বড় কলঙ্কিত চুক্তি আর কখনও স্বাক্ষরিত হয় নাই। কারণ এই চুক্তির দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়ার মত একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রকেই শুধু হিটলারী জার্মানীর নিকট বলি দেওয়া হইল না, চেক গভর্নমেণ্ট ও জনগণের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করা হইল। অবশ্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার উদ্ভব প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি অনুসারে। কিন্তু ১৯১৯ সালে যেভাবে এই রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল, তাতে এর সংগঠনের মধ্যেই গভীর ত্রুটি ও দুর্বলতা ছিল। কারণ, কতকগুলি ন্যাশন্যাল মাইনরিটির সমবায়ে এই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। যেমন, শ্লোভাক, হাঙ্গেরিয়ান, রুথেনিয়ান ও জার্মান ইত্যাদি। অর্থাৎ একমাত্র চেকদের দ্বারা গঠিত কোন ন্যাশন্যাল স্টেট বা জাতীয় রাষ্ট্র নয়। বরং ওটা ছিল বিভিন্ন অধিজাতিবহুল রাষ্ট্র। বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার দুইটি প্রাক্তন প্রদেশ, অস্ট্রিয়ার সাইলেসিয়া এবং হাঙ্গেরির শ্লোভাকিয়া ও রুথেনিয়া—এই রাজ্যখণ্ডগুলিকে নিয়া যে চেকোশ্লোভাক রাষ্ট্র (মোট আয়তন ৫২ হাজার বর্গমাইল) গঠিত হইল, তার মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে চেক ও শ্লোভাক ছাড়া ছিল ৩৩ লক্ষ জার্মান, ৭ লক্ষ ৬০ হাজার ম্যাগিয়ার, ৪ লক্ষ ৮০ হাজার রুথেনিয়ান এবং বহু পোলিশ ও ইহুদী। কিন্তু এই রাষ্ট্র মাইনরিটি বহুল হইলেও টমাস ম্যাসাইরিক ও এডোয়ার্ড বেনেসের নেতৃত্বে সুশাসিত ছিল এবং পশ্চিমী গণতন্ত্রের বিচারে পূর্ব ইউরোপের সবচেয়ে উন্নত, উদার ও সেরা রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু গোল বাধাইল সুদেতেন জেলার জার্মান সংখ্যালঘুরা, যারা নির্যাতিত সুদেতেন জার্মানরূপে হিটলারী প্রচারকার্যের দৌলতে সেদিনের আন্ত-র্জাতিক জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। গোড়া থেকেই জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে ওরা কলরবমুখর ছিল এবং হিটলার কর্তৃক অস্ট্রিয়া গ্রাসের পর (যে অস্ট্রিয়াতে

অনুরূপ জার্মান সমস্যা ছিল) এই সুদেতেন জার্মানরা খাস জার্মানীর সহিত মিলিত হওয়ার জন্য বিরাট হট্টোগোল সৃষ্টি করিল এবং চেক গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত অত্যাচারের (যেমন, সমান অধিকার নাই, চাকুরির সুযোগ নাই, ব্যক্তিস্বাধীনতা নাই, উপযুক্ত মর্যাদা ও স্বাধীনতা নাই ইত্যাদি) অভিযোগ আনিয়া তীব্র আন্দোলন গড়িয়া তুলিল—যদিও আসলে এদের অভিযোগের সত্যকার কোন ভিত্তি ছিল না। কারণ, বৃটিশ ইনস্টিটিউট অব ইণ্টারন্যাশনাল এফেয়ার্সের (১৯৩৮, এপ্রিল) এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, সুদেতেন জার্মানরা রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রচার করা সত্ত্বেও চেক গভর্নমেণ্ট এঁদের সহ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দৃঢ় সংকল্প-বদ্ধ এবং একগুঁয়ে মাইনরিটিরা একটা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জীবন কেমন অসহ্য করিয়া তুলিতে পারে বৃটিশ আমলের ভারতবর্ষে মুসলিম লীগের আন্দোলন তার প্রমাণ, যার ফলে শেষ পর্যন্ত আপোষ রফা হিসাবে ভারতবর্ষকে (১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে) পার্টিশান করিতে হইয়াছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জার্মানদের আন্দোলনেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মহম্মদ আলী জিন্নাকে নিশ্চয়ই হিটলারের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। কিন্তু জিন্না সাহেবের অনুরূপ নেতৃত্বের কঠোরতা, কূটবুদ্ধি ও চতুরতা হিটলারের ছিল—যে নেতৃত্বের প্ররোচনা সুদেতেন জার্মানদের প্রায় পাগল করিয়া তুলিল। হিটলার এমন একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ওত পাতিয়া ছিলেন। কারণ, ভৌগলিক সংস্থানের বিবেচনায় অস্ট্রিয়া গ্রাসের পর চেকোশ্লোভাকিয়া যেন নাৎসী নেকড়ের থাবার মধ্যে আসিয়া গেল—যে চেক রাষ্ট্রকে কোন মতেই আঘাত করা হইবে না বলিয়া নাৎসী নেতারা মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালের ১১ই মার্চ সন্ধ্যায় বার্লিনের এক উৎসব অনুষ্ঠানে দুই নম্বর নাৎসী নেতা স্বয়ং হেরমন গোয়েরিং চেক রাষ্ট্রদূত মিঃ মাস্টনির হাতে হাত দিয়া বলেন :

'I give you my word of honour and speak also in the name of Fuhrer—

—অর্থাৎ আমি আপনাকে আমার পক্ষ থেকে এবং স্বয়ং ফুরারের নামে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, অস্ট্রিয়া দখলের ফলে জার্মান-চেকোশ্লোভাক সম্পর্কের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করা হইবে না।

কিন্তু মুখে গোয়েরিং এই প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করিলেন বটে, কিন্তু তার অনেক আগেই চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের পরিকল্পনা হইয়াছিল। কারণ, গোপন দলিল—যাতে দেখা যায় যে, ভেরমাখটের (সৈন্যবাহিনীর) সুপ্রিম কমাণ্ডার ও সমরমন্ত্রী মার্শাল ফন ব্লুমবার্গ হিটলারের সঙ্গে আলোচনার পর ১৯৩৭ সালের ২৪শে জুন এই মর্মে এক নির্দেশ জারী করিয়াছিলেন যে, আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হইতেছে চেকো-শ্লোভাকিয়া আক্রমণ করা। এই আক্রমণের প্রস্তুতি হইবে শান্তির সময়ে এবং অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা চেক সৈন্য ও জনগণকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া এবং চেকোশ্লো-ভাকিয়াকে কাবু করা হইবে।

১৯৩৭ সালের ৫ই নভেম্বর হিটলার রাইখ চ্যান্সেলারিতে বড় বড় সমর নেতা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর (তখন ফন নিউরাথ্) বৈঠকে চার ঘণ্টার অধিক কাল ধরিয়া যে বক্তৃতা দেন, তাতে অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং এর রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল নিজের ধারণা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করেন।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অস্ট্রিয়া দখলের পাঁচ সপ্তাহ পরে ১৯৩৮, ২৯শে এপ্রিল, জেনারেল কাইটেলের সঙ্গে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য ও অজুহাত সৃষ্টির জন্য স্থির করেন—

"A lighting action on the basis of an incident (for example the murder of the German envoy following an anti-German demonstration)".

অর্থাৎ চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে জার্মানবিরোধী বিক্ষোভ সংগঠন করিয়া সেই হট্টগোলের সুযোগে জার্মান রাষ্ট্রদূতকে খুন করা হইবে এবং সেই খুনের অজুহাত ধরিয়া বিদ্যুৎগতিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

একবার কল্পনা করুন, নিজেদের রাষ্ট্রদূতকে নিজেরাই খুন করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন অপর একটি স্বাধীন দেশ দখলের অজুহাত সৃষ্টির জন্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীভৎসতার আগেই নাৎসী নীতি ও নৈতিকতার এই ক্রূর দৃষ্টান্ত! ১৯৩৮, ৩০শে মে হিটলার পুনরায় জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাপতিগণের নিকট এই মর্মে এক স্বাক্ষরিত 'গোপন হুকুমনামা' পাঠাইলেন—

'It is my irrevocable decision to destroy Czechoslovakia before long through a military action'

অর্থাৎ সামরিক আক্রমণের দ্বারা অনতিকাল পূর্বেই চেকোশ্লোভাকিয়াকে ধ্বংস করাই আমার অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত। (এই উদগ্র সামরিক পরিকল্পনায় চেকোশ্লোভাকিয়ার সাঙ্কেতিক নাম রাখা হইয়াছিল গ্রীনল্যান্ড)।[১]

এদিকে সুদেতেন জার্মান নাৎসী নেতা কোনরাড হেনলেইন বার্লিনের হিটলারী চক্রান্তের প্ররোচনায় চেক গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে নানা ধ্বংসাত্মক আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন (১৯৩৮, এপ্রিল) এবং আরও বুদ্ধি ও পরামর্শের জন্য ১লা ও ২রা সেপ্টেম্বর খোদ হিটলারের কাছে গিয়া হাজির হইলেন। বার্লিন থেকে ফিরিয়া আসিয়াই তাঁর পার্টির সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা চেক সরকারের নিরাপত্তা সংগঠনগুলির উপর আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন এবং এভাবে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল, সেই অজুহাত ধরিয়া হেনলেইনের দল প্রাগ সরকারের সঙ্গে আপোষ আলোচনা ভাঙ্গিয়া দিল—৭ই সেপ্টেম্বর। এদিকে হিটলার আবার এই ঘটনার সূত্র ধরিয়া ১২ তারিখ নুরেমবার্গের পার্টি কংগ্রেসে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে বিষম তর্জন গর্জন করিলেন। এভাবে একদিকে চেকোশ্লোভাকিয়ার অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধ সংগঠন করিয়া অপরদিকে দুনিয়াব্যাপী এই মর্মে প্রচারকার্য চালাইলেন যে, চেক সরকারী অত্যাচারে সুদেতেন জার্মানদের জীবন অতিষ্ঠ। অথচ ২৮শে মার্চ সুদেতেন জার্মানদের নেতা ও হিটলারের নিযুক্ত 'ভাইসরয়' হিসাবে হেনলেইন চেক সরকারের নিকট এমন সমস্ত দাবী পেশ করার মতলব আঁটিয়াছিলেন যে সে দাবী কোন সরকারই মানিয়া লইতে পারে না। হেনলেইন নিজেই এই বিষয়ে বলিয়াছিলেন—

'We must always demand so much that we can never be satisfied.'

১। অধ্যাপক এলবার্ট নরডেন প্রণীত 'Thus Wars Are Made' এবং উইলিয়াম এল শাইরার প্রণীত 'End of a Berlin Diary' চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

এভাবে ধাপ্পাবাজী ও জোর-জবরদস্তি দ্বারা যে অবস্থার সৃষ্টি করা হইল, তার প্রতিকারে বার্লিন থেকে দাবী করা হইল যে, সুদেতেন অঞ্চল জার্মান রাষ্ট্রকে হস্তান্তর না করিলে কিছুতেই শান্তি আসিবে না। নাৎসী সংবাদপত্রগুলিও জার্মান মাইনরিটিদের উপর চেক সরকারের অত্যাচার সম্পর্কে কাল্পনিক কিংবা অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচার করিতে লাগিল এবং হিটলারের আগ্রাসী মনোভাবও ক্রমশঃ চড়া ডিগ্রীতে উঠিতে লাগিল। যদিও চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারী রণনৈতিক পরিকল্পনা কাগজপত্রে প্রস্তুত ছিল, তথাপি তাঁর এমন একটা অস্পষ্ট আশা ছিল যে, স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের হট্টগোল থেকে ভূমধ্যসাগর নিয়া বৃটিশ-ফরাসী-ইতালী একটা প্রকাণ্ড বিরোধে জড়াইয়া পড়িবে কিংবা ফ্রান্সে এমন একটা অভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল পাকাইয়া উঠিবে যে, সেই সুযোগে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়াকে পাকা ফলটির মত পাড়িয়া আনিতে পারিবেন! কিন্তু ভূমধ্যসাগরে কোন বিরোধ বাধিল না বটে, তথাপি হিটলার অস্ট্রিয়ার মত চেকোশ্লোভাকিয়াও বিনাযুদ্ধে কাড়িয়া আনিতে পারিলেন এবং এই কার্য তিনি করিতে পারিলেন তাঁদেরই হাত দিয়া—অর্থাৎ বৃটিশ ও ফরাসী গভর্নমেন্টের হাত দিয়া যাঁদের কাছ থেকে বাধা ও বিপত্তির তিনি এত ভয় করিতেছিলেন।

* * *

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রশ্নে হিটলার যেভাবে ক্রমশঃ উগ্রমূর্তি ধারণ করিতেছিলেন, তাতে ইউরোপে যুদ্ধ লাগিয়া যাইতে পারে এই আশঙ্কায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি একা নন, সঙ্গী জুটাইলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মঃ দালাদিয়েরকে, যিনি মুখে তোষণনীতির বিরোধী ছিলেন, কিন্তু কাজে সেই নীতিই অনুমোদন করিয়া চলিতেন। আর তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঃ বনেৎ ছিলেন তোষণনীতি বা appeasment-এর মূর্তিমান বিগ্রহ। সেই সময় বৃটিশ ও ফরাসী মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য কেবল সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিই বিরূপ ছিলেন না,—নাৎসী-ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলিকে তোয়াজ করিয়া তাঁদের খুশী করিবার জন্যও ব্যগ্র ছিলেন। কারণ তাঁদের ধারণা ছিল যে এভাবে যুদ্ধ এড়ানো যাইবে এবং হিটলারী রাজ্য-পিপাসাকে পূর্বদিকে ঠেলিয়া দেওয়া যাইবে। এই তোষণনীতির সবচেয়ে বড় পাণ্ডা ছিলেন বৃটেনের নেভিল চেম্বারলেন, মিউনিক চুক্তির কুকীর্তির জন্য যাঁর নাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে মসীলিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মত বৃটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হ্যালিফাক্স্ (বৃটিশ ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলনের যুগে যিনি লর্ড আরুইন নামে ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন এবং গান্ধী-আরুইন প্যাক্টের স্বাক্ষরকারীরূপে সেই সময় 'সাধু-খৃষ্টানরূপে' গান্ধীবাদীদের কাছে বাহবা পাইয়াছিলেন), বার্লিনের বৃটিশ রাজদূত স্যার নেভিল হেণ্ডার্সন এবং লর্ড রান্সিম্যান প্রভৃতি এই তোষণনীতি নাটকের এক একজন ছোটবড় নায়ক ছিলেন। হিটলার কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখলের (১৯৩৮, ১২ই মার্চ) মুহূর্ত থেকেই বৃটিশ সরকার চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে 'সজাগ' হইলেন এবং তখনই এই বিষয়ে ফ্রান্সের মতামত জানিতে চাহিলেন। কারণ বৃটিশ সরকার অনুধাবন করিলেন যে, লোকার্নো চুক্তি (১লা এপ্রিল, ১৯২৫) অনুসারে ইউরোপে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব তাঁদের আছে। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনের জন্য বলপ্রয়োগ বা যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। অতএব জার্মান

সংখ্যালঘুদের সমস্যা মীমাংসার জন্য চেকোশ্লোভাক গভর্নমেণ্টের উপর চাপ দিতে হইবে।[১]

কিন্তু কাগজে-পত্রে চেকোশ্লোভাকিয়ার অবস্থা আদৌ খারাপ ছিল না। তার সামরিক শক্তি যেমন ভালো ছিল, তেমনি ফ্রান্সের সঙ্গে পারস্পরিক আত্মরক্ষার চুক্তি (১৯২৫) এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি (১৯৩৫) ছিল। আবার ফ্রান্স এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যেও পারস্পরিক আত্মরক্ষার চুক্তি ছিল (২রা মে, ১৯৩৫)। অর্থাৎ চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষার জন্য ফ্রান্স ও রাশিয়া চুক্তিবদ্ধ ছিল, কিন্তু তার সর্ত ছিল এই যে, ফ্রান্স প্রথমে যুদ্ধের জন্য আগাইয়া গেলে সোভিয়েট রাশিয়া পরে তার অনুসরণ করিবে।

অবশ্য এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি বৃটেনের কোন চুক্তি বা আইনগত দায়-দায়িত্ব ছিল না, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গেও তার এই ধরনের কোন দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে পরস্পর যে সমস্ত চুক্তি ছিল, যদি প্রয়োজন মত সেগুলি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইত, তবে মিউনিক চুক্তির কেলেংকারি ঘটিত না। কারণ, হিটলার এই সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করিতেন না এবং তাঁর সেনাপতিমণ্ডলী তখন পর্যন্ত ফ্রান্সের সামরিক শক্তিকে ভয় করিয়াই চলিতেন—যদিও সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে সকলেরই সংশয় ছিল। এবং এই সংশয়ের বড় কারণ ছিল রাশিয়ার বিখ্যাত ষড়যন্ত্র মামলাসমূহ ও স্ট্যালিন কর্তৃক নিষ্ঠুর 'পার্জ'-এর জন্য। যার জন্য বাইরে এমন ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, সোভিয়েট সামরিক শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মিউনিক চুক্তি ও চেকোশ্লোভাকিয়ার বলিদান ঘটিল সম্পূর্ণরূপে সোভিয়েট রাশিয়াকে এড়াইয়া কিংবা তাকে সম্পূর্ণরূপে 'একঘরে' করিয়া। এমনকি চেক রাষ্ট্রপতি বেনেস এবং চেক পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যই (৩০০ জনের মধ্যে মাত্র ৩০ জন ছিলেন কমিউনিস্ট) ছিলেন সোভিয়েট রাশিয়ার বিরোধী। অতএব রাশিয়ার সাহায্য তো দূরের কথা তার সঙ্গে বিশেষ কোন পরামর্শের প্রয়োজনও অনুভূত হইল না।

অবশ্য অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রশ্নে ফ্রান্স ও বৃটেন যেন গোড়া থেকেই হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বিশেষভাবে বৃটেনের শাসকমহল হিটলারী ক্ষুধা তৃপ্তির জন্য যেন মানসিকভাবে প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে, ভার্সাই সন্ধির সর্তগুলি অন্যায়, অযৌক্তিক ও নীতিবিগর্হিত। সুতরাং এগুলির পরিবর্তন ঘটাইলে ইউরোপে যদি শান্তি রক্ষা করা যায়, তবে ক্ষতি কি এবং সেদিক থেকে হিটলারের দাবী নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। বিশেষতঃ সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং প্রত্যেক জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারও মানিয়া চলিতে হইবে। তারপর যুদ্ধ করিবার মত সামরিক প্রস্তুতিও তখন ছিল না। বৃটিশ সেনাপতিমণ্ডলী ফ্রান্স বা অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির সহযোগিতায় এখন যুদ্ধযাত্রার বিরোধী ছিলেন। কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৃটিশ ঐতিহাসিক যেমন, এ জে পি টেলর এবং মিঃ পি কে কেম্প এই সমস্ত যুক্তি দেখাইয়া চেম্বারলেন ও অন্যান্যের দোষ স্খালনের কিংবা তাঁদের সাফাই গাহিবার চেষ্টা করিয়াছেন।[২]

১। 'The Origins of the Second World War'—by A. J. P. Taylor চেকোশ্লোভাকিয়া অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক এবং 'The War'—by Louis L. Snyder; p. 89-90.

কিন্তু ব্যাপারটা কি সত্যই অত সহজ এবং ভার্সাই সন্ধির কবলিত জার্মানীর প্রতি ন্যায়-বিচারের জন্য ফরাসী বা বৃটিশ সরকারী মহলের কি এতটা গরজ ছিল? কারণ মহাযুদ্ধের পর ধৃত বার্লিনের পররাষ্ট্র দপ্তরের কাগজপত্রে দেখা যায় যে, হিটলার কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখলের আগেই ১৯৩৭ সালের ১৯ শে নভেম্বর লর্ড হ্যালিফাক্স (তখন তিনি বৃটেনের লর্ড চ্যান্সেলার, পরে তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হইয়াছিলেন) ওবারস্যালসবার্গে হিটলারের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন এবং সেই বৈঠকে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ফুরার তাঁর নিজ দেশে কমিউনিজম ধ্বংস করিয়া পশ্চিমদিকে এই মতবাদের অগ্রগতি রোধ করিয়াছেন। সুতরাং বৃটিশ সরকার মনে করেন যে, পশ্চিম ইউরোপে বলসেভিজম প্রতিরোধের পক্ষে জার্মানী একটি দুর্গস্বরূপ। লর্ড হ্যালিফাক্স 'সরলভাবে' আরও স্বীকার করিলেন যে, আজ হোক কাল হোক ইউরোপীয় ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আসবেই এবং পরিবর্তনের এই প্রশ্নগুলির মধ্যে রহিয়াছে ডানজিগ, অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া……

"…changes in the European order…which sooner or later probably would come about. These questions include Danzig and Austria and Czechoslovakia". —(অধ্যাপক নরডেন কর্তৃক উদ্ধৃত)

অর্থাৎ চেম্বারলেনের সরকার এই দেশগুলির জন্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার হিটলারের হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য যেন আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। ইহার একমাত্র সর্ত ছিল এই যে হিটলারের পক্ষ থেকে যেন বলপ্রয়োগ করা না হয় অর্থাৎ যুদ্ধ না লাগে। সুতরাং চেকোশ্লোভাকিয়া নিয়া যখন বিরোধ গভীরতর বিপদ ডাকিয়া আনিবার সূত্রপাত করিতেছিল তখন গোড়াতেই সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিটভিনোভ পররাজ্য আক্রমণ ও তাতে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া এই চতুঃশক্তির একটি সম্মেলন ডাকার জন্য এবং যৌথ নিরাপত্তার নীতি অবলম্বনের জন্য ১৭ই মার্চ (১৯৩৮) এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু বৃটিশ সরকারের পক্ষে মিঃ চেম্বারলেন তা অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন। এই সমস্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সুদেতেন জার্মানদের নেতা হেনলেইন হিটলারের নির্দেশে ২৪শে এপ্রিল তারিখে এমন ৮টি দাবী চেক সরকারের কাছে উত্থাপন করিলেন, যেগুলি মানিয়া লইলে স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব থাকিত না। এর ফলে ফ্রান্সের সরকারী মহলও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং দালাদিয়ের ও বনেৎ ২৮শে এপ্রিল তারিখে লণ্ডনে গেলেন বৃটিশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শের জন্য—বিশেষভাবে বার্লিনে ও প্রাগে একই সঙ্গে দুই গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে কোন যুগ্ম ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য (…Dealadier urged strong joint and parallel action) কিন্তু চেম্বারলেন সাফ জানাইয়া দিলেন যে, ফ্রান্স বা চেকোশ্লোভাকিয়া কাহারও সাহায্যের জন্যই বৃটেন অবিলম্বে আগাইয়া যাইবে না!

কারণ কি? কারণ এই যে, চেকোশ্লোভাকিয়া ভাগবাঁটোয়ারা সম্পর্কে চেম্বারলেন আগেই একটি প্ল্যান ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১০ই মে ইংলণ্ডের বিখ্যাত মহিলা লেডি এ্যাস্টারের গৃহে একদল মার্কিন ও কানাডীয় সাংবাদিকদের নিকট চেম্বারলেন এই তথ্য প্রকাশ করিলেন ঃ

"On May 10, Chambarlain revealed his plans for the break up of Czechoslovakia in Germany's behalf to a group of American and Canadian newspapemen at Lady Astor's home. Neither France, Russia nor Britain would fight for Czechoslovakia, said the prime Minister who also advocated his plan for a Four Power Pact, including Britain, France, Germany and Italy from which Russia would be excluded,"[১]

এই সংবাদ বিখ্যাত মার্কিন সংবাদপত্র নিউইয়র্ক টাইমস ও নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৪ই মার্চ এবং পরে কমন্স সভায় সমালোচনার জবাবে কিংবা ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে আলোড়ন সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও চেম্বারলেন এই সংবাদের কোন প্রতিবাদও করেন নাই।

চেকোশ্লোভাকিয়া নিয়া যখন উত্তেজনা ক্রমেই বাড়িতেছিল তখন চেক গভর্নমেন্ট নাৎসী ভীতি প্রদর্শনের জবাবে ২০শে মে তারিখ হঠাৎ সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের নির্দেশ জারি করিলেন। ফলে, ইউরোপে যুদ্ধ লাগে লাগে এই আশংকায় প্যারিস ও লণ্ডনের সরকারী মহলে আতংক দেখা দিল—যদিও চেক সরকারের এই আকস্মিক সৈন্য সমাবেশে হিটলারী দল কিছুটা ভড়কাইয়া গেল। কিন্তু বৃটেনে ও ফ্রান্সে এই গুঞ্জন উঠিল যে, যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত নয় অর্থাৎ হিটলারকে প্রতিরোধের জন্য হাতেকলমে কিছু ঘটিল না। কিছুদিন অবস্থা এভাবে চলিবার পর জুলাই মাসে হিটলার আবার গর্জন করিলেন এবং ভয় দেখাইলেন যে, যদি একজন সুদেতেন জার্মানও চেকদের হাতে নিহত হয়, তবে তিনি সসৈন্যে মার্চ করিবেন। তখন চেম্বেরলেন লর্ড রান্সিম্যানকে একজন 'স্বাধীন সালিস' হিসাবে নিযুক্ত করিয়া প্রাগে পাঠাইলেন (৪ঠা আগস্ট, ১৯৩৮)। রান্সিম্যান ছিলেন বোর্ড অব ট্রেডের প্রাক্তন সভাপতি। রাজনীতি, বিশেষভাবে ইউরোপীয় রাজনীতির টানাপোড়েন সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। সুতরাং তাঁর এই দৌত্যের আসল অর্থ ছিল চেম্বারলেনীয় তোষণনীতির পরিপোষকতা করা, তিনি সুদেতেন জার্মানদের খুশী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন এবং তাদের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব করিলেন। যদিও তিনি 'নিরপেক্ষ' সালিস ছিলেন, তথাপি তিনি প্রাগে কয়েকজন ধনী নাৎসী জার্মানদের প্রাসাদে বাস করিয়া তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ায় আসল সংকটের মাস দেখা দিল সেপ্টেম্বরে। সুদেতেন জার্মানদের বশে আনবার জন্য প্রেসিডেণ্ট বেনেস ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে তাদের সমস্ত দাবীই মানিয়া লইলেন—যদিও হেনলেইনের দল এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু বেনেস জানিতেন যে, সুদেতেন জার্মানদের যত দাবীই মানিয়া লওয়া হোক না কেন, তারা কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। এই সময় ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখ সুবিখ্যাত লণ্ডন টাইমস পত্রিকা, যার সম্পাদক মিঃ জিওফ্রে ডসন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেই পত্রিকাতে সুদেতেন অঞ্চল জার্মানীর নিকট অর্পণের জন্য এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সুপারিশ করা হইল। একই সময়ে প্যারিসের একটি পত্রিকাতেও (পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখপাত্র) অনুরূপ প্রস্তাব করা হইল। আর ১২ই

সেপ্টেম্বর নাৎসী পার্টি কংগ্রেসে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া ও বেনেসের বাপান্ত করিয়া ছাড়ালেন। অর্থাৎ সুদেতেন জার্মানদের ক্ষেপানো হইল। ফলে ১৩ই সেপ্টেম্বর তারা এক প্রকাশ্য বিদ্রোহ বাধাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু চেক সরকার অতি দ্রুত এবং অত্যন্ত তাৎপরতার সঙ্গে সেই বিদ্রোহ দমন্ করিয়া ফেলিল। সারাদেশে সামরিক আইন জারী হইল।

হিটলার ও চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রশ্নে প্যারিসে ফরাসী সরকার স্নায়বিক দৌর্বল্য রোগে ভুগিতেছিলেন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের ১৩ই-১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রে চেম্বারলেনের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁকে জানাইলেন যে, যদি হিটলারকে 'ব্যক্তিগত-ভাবে' আবেদন করা যায়, তবে, এই সংকটের একটি সুমীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন তৈয়ার হইয়াই ছিলেন এবং নিজের দায়িত্বেই (মন্ত্রিসভার অনুমোদনের আগেই) হিটলারের নিকট তারযোগে প্রার্থনা করিলেন এক সাক্ষাৎকারের জন্য। হিটলার তাঁর এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন এবং চেম্বারলেন ৬৯ বৎসর বয়সে এই প্রথম বিমানযোগে যাত্রা করিলেন মিউনিকে এবং সেখান থেকে ট্রেনযোগে তিনি বার্সেটসগ্যাডেনে উপস্থিত হইলেন—হিটলারের এই সেই কুখ্যাত পল্লীভবন যেখানে ইউরোপের একাধিক রাষ্ট্রনেতা স্বাধীনতার মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হইয়াছেন। চেম্বারলেন সেখানে চা-পান করিলেন এবং হিটলারের সম্মুখে ধূমপান করিতে পারিয়াছেন বলিয়া কিছুটা গর্ব অনুভবও করিলেন। (হিটলার নিজে ধূমপান করিতেন না। বোধহয় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রির পক্ষে এটাই ছিল গর্বের কারণ।) কিন্তু আলোচনার প্রথমেই হিটলার তাঁর স্বভাব অনুযায়ী কড়া মেজাজ দেখাইলেন, কিন্তু চেম্বারলেন তাঁর তোষণনীতিতে অটল রহিলেন এবং সুদেতেন জেলা পৃথকীকরণের দাবীকে তিনি নীতি হিসাবে মানিয়া লইলেন। কিন্তু হিটলার এত অল্পে খুশী হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি দাবী করিলেন যে, অবিলম্বে সমগ্র সুদেতেন অঞ্চল জার্মান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, অন্যথা যুদ্ধ বাধিতে পারে। তবে, এই বিষয়ে তাঁর ক্যাবিনেট সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে দেওয়ার জন্য হিটলার চেম্বারলেনকে সময় দিতে রাজী আছেন। পরদিন তিনি ফিরিয়া আসিলেন লণ্ডনে।

এভাবে বারবার চেম্বারলেনকে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ছুটিয়া যাইতে হইল, যদিও হিটলার একবারের জন্যও লণ্ডনে আসিয়া বৃটিশ প্রধানমন্ত্রির সঙ্গে সাক্ষাতের (অন্তত কূটনৈতিক শিষ্টাচার অনুযায়ী) প্রয়োজন মনে করেন নাই এবং এভাবে বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারকে (যাঁদের গুঁতায় পৃথিবীর বৃহত্তম ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য—ভারতবর্ষসহ কম্পমান ছিল) হিটলারের কাছে বার বার অসম্মান ও নতিস্বীকার করিতে হইল। লণ্ডন ও প্যারিসে বৃটিশ ও ফরাসী মন্ত্রিসভার তোষণনীতির পক্ষপাতী মন্ত্রীগণ একযোগে চেকোশ্লোভাকিয়ার উপর চাপ দিলেন জার্মান সংখ্যাধিক্য এলাকাগুলি অবিলম্বে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য। অবশ্য খণ্ডিত চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমানা সম্পর্কে বৃটিশ সরকার গ্যারেণ্টি দিতে রাজী আছেন, যদি হিটলারের আপত্তির কারণ না ঘটে এবং যদি চেকোশ্লোভাকিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তার সামরিক মৈত্রীচুক্তি বাতিল করিয়া দেয়। ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রেসিডেণ্ট বেনেসকে এই অদ্ভুত অসম্মানজনক ও রাষ্ট্রের অঙ্গহানিকর প্রস্তাব গ্রহণের জন্য জানাইয়া দেওয়া হইল। প্রেসিডেণ্ট বেনেস তাঁর মন্ত্রিসভা ও সামরিক উপদেষ্টাদের সঙ্গে ক্রমাগত দেড়দিন ধরিয়া

পরামর্শ করিলেন এবং অবশেষে জানাইলেন যে, ১৯২৫ সালের জার্মান-চেক সন্ধি অনুযায়ী তাঁরা সমগ্র চেক বিরোধের প্রশ্নটি সালিসি মীমাংসায় দিতে রাজী আছেন। কিন্তু এর জবাবে বৃটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রদূতেরা তৎক্ষণাৎ জানাইয়া দিলেন যে, এই সমস্ত প্রস্তাবের উপর বেশী জোর দেওয়া হইলে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগ্য সম্পর্কে বৃটেন ও ফ্রান্স কোন দায়িত্ব নিতে পারিবেন না। এমনকি, ২০শে সেপ্টেম্বর দ্বিপ্রহর রাতে যখন তিন রাত্রির অনিদ্রার পর প্রেসিডেণ্ট বেনেস ঘুমাইতে গেলেন, তখন ঘণ্টাখানেক বাদেই বৃটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রদূতদ্বয় তাঁকে এক চরম পত্র দিয়া জানাইয়া দিলেন যে, বিনাসর্তে এবং অবিলম্বে ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে। তখন সারা রাত ধরিয়া চেক মন্ত্রীরা পরামর্শ করিলেন, কিন্তু লণ্ডন থেকে সেই রাত্রে ধৈর্যহীন ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর টেলিফোনে ভাসিয়া আসিল—'এত দেরী হচ্ছে কেন? এখনও কি বেনেস নতিস্বীকার করেনি?'[১]

পরদিন অপরাহ্ন পাঁচটার সময় চেক সরকার নতিস্বীকার করিলেন। কিন্তু এই সংবাদ রাষ্ট্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'একটা গোটা জাতি চোখের জলে ভাঙিয়া পড়িল'। চেক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলেন এবং সোভিয়েট বিদ্বেষী ও জার্মান পক্ষপাতী জেনারেল সিরোভি নূতন চেক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ার নতিস্বীকার সম্পর্কে ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের এই সমস্ত প্রস্তাব লইয়া চেম্বারলেন দ্বিতীয়বার হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রওনা হইলেন। এবার রাইনল্যাণ্ডের অন্তর্গত গডেসবার্গের একটি হোটেলে হিটলারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ—চার বছর আগে এই হোটেল থেকেই হিটলার অতর্কিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন ক্যাপ্টেন রোয়েম প্রভৃতিকে খতম করার জন্য। এবার সেই হোটেলেই হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়াকে 'আপোষে' খতম করার জন্য চেম্বারলেনের সঙ্গে মিলিত হইলেন। কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর দুর্ভাগ্য, আগেরবারের চেয়েও ফুরারের মেজাজ ও জঙ্গীমূর্তি কঠোরতর হইয়া দেখা দিল। তিনি তাঁর দাবীর মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, ১লা অক্টোবরের মধ্যেই তিনি প্রস্তাবিত ও তাঁর নিজস্ব মানচিত্রে চিহ্নিত জেলাগুলি দখল করিয়া লইবেন এবং অন্যান্য এলাকাগুলি সম্পর্কে গণভোট গ্রহণ করিতে হইবে। ১লা অক্টোবরের আগেই এগুলি হওয়া চাই। তবে, সেই সঙ্গে তিনি বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রিকে এই আশ্বাস দিতে পারেন যে, ইউরোপে এটাই তাঁর শেষ ভূমিখণ্ড দাবী।

"This is the last territorial claims I have to make in Europe.

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া চেম্বারলেন কমন্স সভার বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছিলেন যে হিটলারের এই নূতন দাবীর বহরে তিনি প্রথমে চমকাইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁর কাছে এটা গভীর আঘাতের (প্রোফাউণ্ড সক) মত ছিল। এবার বৃটিশ মন্ত্রিসভা ও ফরাসী মন্ত্রিসভার তোষণপন্থীরাও অন্তত সাময়িকভাবে পিছু হটিতে বাধ্য হইলেন। কারণ, হিটলারের বাড়াবাড়িতে ইতিমধ্যে জনমত—বিশেষভাবে বৃটেনে প্রতিবাদ মুখর হইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং হিটলার গডেসবার্গে চেম্বারলেনের নিকট যে সমস্ত সর্ত দিয়াছিলেন, সেগুলি প্রত্যাখ্যাত হইল এবং চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরামর্শ দেওয়া হইল তার সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করিবার জন্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে চেক সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। তার সমরশিল্প এবং সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যূহ অত্যন্ত

১। The Cold War—by D. F. Fleming. Vol. I. P. 78

উচ্চশ্রেণীর ছিল। ১৫ লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য রণক্ষেত্রে আগাইবার জন্য তৈয়ার হইয়াই ছিল। ফ্রান্সের সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার যে চুক্তি ছিল, ফরাসী সরকার 'অনিচ্ছা সত্ত্বেও' তা পালনে অগ্রসর হইলেন। ফরাসী সৈন্যবাহিনীর আংশিক সমাবেশ ঘটানো হইল। ২৮শে সেপ্টেম্বর সকাল ১২-২০ মিনিটে বৃটেনের নৌবহর সমাবেশের হুকুম জারী হইল। নৌমন্ত্রী মিঃ ডাফ কুপার মিঃ চার্চিলের মতই তোষণনীতির বিরোধী ছিলেন এবং এর অনেক আগেই ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৮) তারিখ মিঃ এন্থনি ইডেন চেম্বারলেনের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে পররাষ্ট্রমন্ত্রির পদে ইস্তফা দিয়াছিলেন। চার্চিলের মতে মিঃ চেম্বারলেন নিজ হাতে সমগ্র নীতি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ পরিহার করার উদ্দেশ্যে তিনি তোষণনীতির লজ্জাজনক ও অনিষ্টকর পন্থার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং ২৬শে সেপ্টেম্বর পুনরায় চেম্বারলেনের পক্ষ থেকে হিটলারের নিকট স্যার হোরেস উইলসনের মারফৎ একটি ব্যক্তিগত আবেদন পাঠানো হইল। জবাবে হিটলার জানাইলেন যে, ২৮শে বুধবার বেলা দুটোর মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া যদি তাঁর দাবীগুলি গ্রহণ না করে, তাহলে ১লা অক্টোবর, শনিবার তিনি সসৈন্যে মার্চ করিবেন—এই মর্মে যে চরমপত্রের কথা তিনি গডেসবার্গে চেম্বারলেনকে বলিয়াছিলেন, সেই কথা থেকে তিনি কিছুতেই বিচ্যুত হইবেন না। সেদিন সন্ধ্যায় হিটলার বার্লিনের এক তীব্র বক্তৃতায় ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেণ্ট বেনেস ও চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করিলেন, কিন্তু বৃটেন ফ্রান্সের প্রতি নরম মনোভাব দেখাইলেন—বোধহয় সেই মুহূর্তে ইঙ্গ-ফরাসী মনোভাবের আকস্মিক পরিবর্তন দেখিয়া। এদিকে জার্মান জেনারেলদের সঙ্গেও হিটলারের মতবিরোধ চলিতেছিল বলপ্রয়োগের প্রশ্নে। কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ২৭শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় যে রেডিও বক্তৃতা দিলেন, আজও তা স্মরণযোগ্য। এই বক্তৃতায় তিনি বলিলেন :

"How horrible, fantastic, incredible, it is that we should be digging trenches and trying on gas masks here because of a quarrel in a far-away country between people of whom we know nothing ! ...I would not hesitate to pay even a third visit to Germany if I thought it would do any good...[১]

অর্থাৎ কী ভয়ঙ্কর, কী আজগুবী এবং অবিশ্বাস্য এমন কথা যে, কোথায় কোন্ দূরবর্তী অচেনা দেশে কোন্ অজানা লোকদের মধ্যে কী ঝগড়া হইতেছে, আর তারই জন্য আমাদের ট্রেঞ্চ কাটিতে ও গ্যাসমুখোস পরিতে হইবে। এর চেয়ে আমি বরং তৃতীয়বার জার্মানীতে যাইতেও প্রস্তুত আছি, যদি এর দ্বারা কিছু মঙ্গল হইবে বলিয়া আমি মনে করি।

অতএব চেম্বারলেন তৃতীয়বার জার্মানীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। স্যার হোরেস উইলসনের মারফৎ প্রেরিত হিটলারের চিঠির জবাবে চেম্বারলেন লিখলেন :

'আপনার চিঠি পড়ে আমার নিশ্চিত মনে হলো আপনি বিনা যুদ্ধেই এবং অবিলম্বেই আপনার মুখ্য দাবীগুলির সবই পেতে পারেন। এজন্য আমি অনতিবিলম্বেই বার্লিনে এসে আপনার সঙ্গে ও চেক প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভূমিগুলি হস্তান্তর করা সম্পর্কে

১। চার্চিল রচিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ২৪৬-৪৭ পৃঃ।

আলোচনা করতে রাজী আছি। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে ইতালী ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা একটা মীমাংসায় পেঁছুতে পারব।'

এই সঙ্গে তিনি ইতালীর ডিক্টেটর মুসোলিনীর নিকট এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাঠাইলেন যে, তিনি যেন তাঁর (চেম্বারলেনের) প্রস্তাবিত হিটলারের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে যোগ দিতে রাজী হন। কারণ এর দ্বারা আমাদের জনগণ যুদ্ধের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে।[১]

হিটলারের বন্ধু মুসোলিনী এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রে ফরাসী রাষ্ট্রদূত যখন বার্লিনে হিটলারের সঙ্গে সুদেতেনল্যান্ডের আরও এলাকা হস্তান্তরের জন্য আলোচনা করিতেছিলেন, তখন মুসোলিনীর বার্তা আসিয়া হাজির হইল। চেম্বারলেন যে সম্মেলনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এই বার্তায় তা সমর্থন করিয়া হিটলারকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, ইতালীও এতে যোগ দিতে প্রস্তুত আছে। সুতরাং ২৮শে সেপ্টেম্বর বেলা ৩টায় হিটলার চেম্বারলেন ও দালাদিয়েরকে জানাইয়া দিলেন যে, পরদিন মিউনিকে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে এবং এতে মুসোলিনীও উপস্থিত থাকিবেন।

অতএব চেম্বারলেন তৃতীয়বার বিমানপথে ছুটিলেন হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য।

২৯শে সেপ্টেম্বর দুপুরবেলা মিউনিক শহরে চেম্বারলেন, দালাদিয়ের এবং হিটলার ও মুসোলিনী একত্র হইলেন। লক্ষ্য করিবার এই যে, যে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য এই 'ঐতিহাসিক সম্মেলন' ডাকা হইল, সেখানে চেকোশ্লোভাকিয়ার একজন প্রতিনিধিকেও আমন্ত্রণ করা হইল না এবং ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ শক্তি সোভিয়েট রাশিয়াকেও ডাকা হইল না। বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা মনস্থির করিয়াই আসিয়াছিলেন। অর্থাৎ চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা বলি দেওয়া হইবে। সুতরাং সিদ্ধান্তে পেঁছিতে বিলম্ব হইল না। চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তর আগে হইতেই একটা দলিল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বৈঠক আরম্ভ হওয়ার আগে বার্লিনের ইতালীয় রাষ্ট্রদূত সেটি মুসোলিনীর হাতে দিলেন এবং মুসোলিনীও নিরপেক্ষ মধ্যস্থের ভান করিয়া সেটি বৈঠকে পেশ করিলেন। আর হিটলারও শান্তিরক্ষার নাম করিয়া প্রস্তাবগুলিতে সম্মতি জানাইলেন। চেম্বারলেন এবং দালাদিয়েরও রাজী হইয়া গেলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বৈঠকের কাজ শেষ হইয়া গেল। কিন্তু রাত্রি দুটোর সময় এই চারজন রাষ্ট্রনেতা যখন মিউনিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার জন্য কলম হাতে নিলেন, তখন বৃহৎ দোয়াতদানিতে কলম ডুবাইতে গিয়া দেখিলেন কালি নাই![২]

কিন্তু কালিশূন্য সেই দোয়াতদানি সত্ত্বেও মিউনিক চুক্তির কলঙ্ক কালিমা ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে কোনদিন মুছিয়া যাইবে না।

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিরা পাশের ঘরে উপস্থিত ছিলেন। রাত্রি দুটোর সময় তাঁদের ডাকা হইল চেম্বারলেন ও দালাদিয়েরের নিকট। দালাদিয়ের তাঁদের হাতে সেই চুক্তিপত্র দিয়া পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন যে,—

১। Mr. Feilling প্রণীত চেম্বারলেনের জীবনচরিত থেকে চার্চিলের উদ্ধৃতি।

২। The origins of the Second World War—by A.J.P. Taylor. P. 229.

"...this was a sentence without right of appeal and without possibility of modification...[১]

অর্থাৎ এটি একটি দণ্ডাজ্ঞা, এর বিরুদ্ধে কোন আপীল করা চলিবে না, এর সংশোধন করাও চলিবে না এবং আগামীকল্য বিকেল পাঁচটার মধ্যে এটি গ্রহণ করিতে হইবে!

চেম্বারলেন কোন মন্তব্য করিলেন না, তিনি হাই তুলেতেছিলেন এবং ক্লান্ত ছিলেন তবে আরামদায়ক ক্লান্তি—(tired but pleasantly tired)[২]

হিটলারের চরমপত্র অনুযায়ী ১লা অক্টোবর, ১৯৩৮ থেকেই জার্মানী সুদেতেন জেলাগুলি দখল করিতে শুরু করিবে এবং যে সমস্ত এলাকায় জার্মানরা মেজরিটি নয়, সেগুলিতে একটা আন্তর্জাতিক কমিশনের তত্ত্বাবধানে গণভোট গ্রহণ করা হইবে। জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স ও বৃটেন চেকোশ্লোভাকিয়ার নূতন সীমানার গ্যারাণ্টি দিবে এবং চেক কর্তৃক পরিত্যক্ত সমস্ত এলাকাগুলির কল-কারখানা, অস্ত্রাগার, জিনিসপত্র ইত্যাদি বজায় রাখা হইবে।

চেকোশ্লোভাকিয়াকে এভাবে দ্রুত বলিদানের পর চেম্বারলেন হিটলারের সঙ্গে এক প্রাইভেট সাক্ষাতের জন্য মিলিত হইলেন তাঁর মিউনিকের ফ্ল্যাটে—৩০শে সেপ্টেম্বর সকালে এবং বৃটেন ও জার্মানী পরস্পরের বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ করিবে না—এই মর্মে এক প্রতিশ্রুতিপত্রে দুইজনে সানন্দে স্বাক্ষর দিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই প্রতিশ্রুতি পত্রটি চেম্বারলেন আগেই তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরের পর দালাদিয়ের ও চেম্বারলেন স্ব স্ব রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা ইউরোপে যুদ্ধ নিবারিত হইল মনে করিয়া প্যারিসে ও লণ্ডনে উৎফুল্ল জনতা দুই রাষ্ট্রনেতাকে অভিনন্দন জানাইলেন। (প্যারিসে এই উপলক্ষে নৃত্যগীত ও ভোজ উৎসবেরও অনুষ্ঠান হইয়াছিল, যেটা ছিল ফ্রান্সের আসন্ন দুর্বিপাকের সংকেত তুল্য।) সন্ধ্যাবেলা ডাউনিং স্ট্রীটের জানালা থেকে প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন হিটলারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিপত্রটিকেই উৎসুক জনতার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনের ভঙ্গীতে আন্দোলিত করিয়া বলিয়াছিলেন—

"I believe it is peace for our time".[৩]

অর্থাৎ আমার বিশ্বাস এর দ্বারা আমাদের আমলে শান্তি সুনিশ্চিত হইল।

১। এবং (২) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ঐ
৩। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৩১।

ষষ্ঠ অধ্যায়
মিউনিক চুক্তির প্রতিক্রিয়া

মিউনিক চুক্তির অনেক আগেই উইনস্টোন চার্চিল ইউরোপের আসন্ন সর্বনাশ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। চেম্বারলেনের নীতি ও কার্যাবলী লক্ষ্য করিয়া পররাষ্ট্র-মন্ত্রির পদ থেকে ইডেনের পদত্যাগের (২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮) সংবাদ শুনিয়া চার্চিল রূঢ় আঘাত পাইয়াছিলেন এবং এই সম্পর্কে তাঁর স্বরচিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, জীবনে কোন অবস্থাতেই কোনদিন তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হয় নাই। এমনকি, মহাযুদ্ধের কঠিনতম দিনগুলিতেও যখন তাঁর নিজের স্কন্ধেই প্রচণ্ডতম দায়িত্ব ছিল, তখনও রাত্রে বিছানায় শুইয়া পড়িলেই তাঁর ঘুম আসিয়া যাইত এবং পরদিন ভোরবেলা তিনি বেশ সতেজ ও সুস্থ দেহমনে জাগিয়া উঠিতেন। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটিল ঐদিন—

'But now on this night of February 20, 1938 and on this occasion only, sleep deserted me. From mid-night till dawn I lay in my bed consumed by emotions of sorrow and fear···I watched the daylight slowly creep in through the windows, and saw before me in mental gaze the vision of Death.'

অর্থাৎ ২০শে ফেব্রুয়ায়ী রাত্রি বেলা এবং একমাত্র ঐ দিনই নিদ্রা আমাকে ত্যাগ করিল। রাত দুপুর থেকে ভোরবেলা পর্যন্ত আমি বিছানার উপর জাগিয়া পড়িয়া রহিলাম, ভয় এবং দুঃখের ভাবাবেশ যেন আমাকে গ্রাস করিতেছিল।···ভোরবেলা দেখিলাম জানালা দিয়া সূর্যের আলো প্রবেশ করিতেছে এবং সেই অবস্থায় মানসিক দৃষ্টির সম্মুখে আমি দেখিলাম দৃশ্য—মৃত্যুর দৃশ্য।[১]

ঘটনাটা অত্যন্ত অদ্ভূত, সন্দেহ নাই এবং এক হিসাবে ঐতিহাসিকও বটে, কারণ, কয়েক মাস পরে চার্চিলের দেখা 'মৃত্যু' ইউরোপে হানা দিল।···

মিউনিক চুক্তির কালি না শুকাইতেই হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার এক-তৃতীয়াংশ দখল করার পর নূতন নূতন দাবী তুলিতে লাগিলেন। সুযোগ বুঝিয়া হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ডও চেকোশ্লোভাকিয়ার কয়েকটি অংশ—শ্লোভাকিয়া ও রুথেনিয়া দাবী করিল। হিটলার নিজেই এই দাবীর সালিস বিচারক সাজিলেন। তখনকার চেক প্রেসিডেণ্ট এমিল হাচা এর প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু হিটলার তাঁকে বার্লিনে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং নাৎসী কায়দায় তাঁর শরীর ও স্নায়ুর উপর এমন পীড়ন ঘটাইলেন যে, হাচা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। পড়ে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তাঁকে দিয়া বলপূর্বক এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া নিলেন—১৯৩৯, ১৫ই মার্চ তারিখের স্বাক্ষরিত এই চুক্তিপত্র দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়াকে জার্মানির আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করা হইল। হিটলার নিজেকে বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার রক্ষক (প্রোটেকটর) বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং শ্লোভাকিয়াকেও 'আশ্রিত রাজ্যরূপে গ্রহণে সম্মত হইলেন'। জার্মান সৈন্যরা চেক রাজধানী প্রাগে প্রবেশ করিল। এভাবে স্বাধীন চেকোশ্লোভাকিয়ার অস্তিত্ব মানচিত্র

১। চার্চিল রচিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০১।

থেকে মুছিয়া গেল। পরে নাৎসী বর্বরেরা সারা দেশব্যাপী পীড়ন ও সন্ত্রাসের তাণ্ডব জুড়িয়া দিল।

"Czech university students were to be herded wholesale to the public squares of Prague, the youngmen to be beaten to death while the girls were publicly raped".

অর্থাৎ চেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে দলে দলে একত্রে প্রাগের প্রকাশ্য স্কোয়ারে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে যুবকদিগকে পিটাইতে পিটাইতে মারিয়া ফেলা হইল, আর যুবতীদিগকে প্রকাশ্যে বলাৎকার করা হইল![1]

ফ্যাসিস্ট তোষণনীতির পরিণাম ১৯৩৯ সালে ইউরোপীয় সংকটকে ক্রমশঃ চরম ডিগ্রীতে লইয়া যাইতেছিল। খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ ও ফরাসী গভর্নমেণ্ট বিদ্রোহী জেনারেল ফ্রাংকোর ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরিকেই স্পেনের আইনসম্মত গভর্নমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। এবং মার্চ মাসের শেষে স্পেনের রিপাবলিকান গভর্নমেণ্ট রাজধানী মাদ্রিদে প্রায় আড়াই বৎসর অবরোধ যুদ্ধের পর ফ্রাংকোর হাতে চূড়ান্ত পরাজয় মানিয়া লইল। ফ্রান্সের পশ্চাদ্‌দেশে এভাবে ফ্রাংকোর বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হইল। ১৫ই মার্চ চেকোশ্লোভাকিয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল এবং উহার বিখ্যাত স্কোডা সমরাস্ত্রের কারখানা ও আরও ২৩টি অস্ত্র-নির্মাণশালা, যেগুলি একত্রে ফ্যাসিস্ট ইতালীর সমগ্র সমরাস্ত্রের কারখানার চেয়ে তিনগুণ বড়, সেগুলি সমস্তই হিটলারের সম্পত্তিতে পরিণত হইল। ফ্যাসিস্ট পক্ষপাতী চেক জেনারেল সিরোভি জার্মান হাইকম্যাণ্ডের নিকট সমগ্র অস্ত্রাগার, দ্রব্যসম্ভার, এক হাজার এরোপ্লেন এবং সৈন্যবাহিনীর সমস্ত প্রথম শ্রেণীর সামরিক মালমশলা সমর্পণ করিলেন।

মিউনিক চুক্তির দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়াকে এভাবে বলি দিয়া ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গ জার্মানীর রণনৈতিক অবস্থানের প্রভুত পরিমাণে শক্তিবৃদ্ধি করিলেন। ভুমির দিক দিয়া যেমন জার্মানীর প্রত্যক্ষভাবে প্রচুর লাভ হইল, তেমনই তার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার—এর মধ্যে তিন লক্ষ ছিল উৎকৃষ্ট সৈন্য, যারা চেকবাহিনীতে উত্তম প্রশিক্ষণ পাইয়াছিল। সমরাস্ত্রের কারখানা ছাড়াও শ্রমশিল্পে সমৃদ্ধ বহু অঞ্চল তার হাতের মুঠোয় আসিল, আর রণনীতির দিক হইতে তার নিকট মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দ্বার খুলিয়া গেল। অস্ট্রিয়া দখলের দ্বারা হিটলার ইতিপূর্বে চেকোশ্লো-ভাকিয়ার পার্শ্বদেশ বিপন্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু চেকরাষ্ট্র যদি মিউনিক মারফৎ নিশ্চিহ্ন না হইত, তবে পূর্বে রাশিয়া ও পশ্চিমে ফ্রান্স—এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র থাকিত এবং এই তিনটি রাষ্ট্রই সন্ধিসূত্রের দ্বারা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ ছিল।

১৯৩৮ সালে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিচারে চেকোশ্লোভাকিয়া সামরিক শক্তি হিসাবে মোটেই উপেক্ষণীয় ছিল না। চেক গভর্নমেণ্ট অনায়াসে রণক্ষেত্রে ৪০ ডিভিসন সৈন্য নিয়োগ করিতে পারিতেন। সাজসজ্জায়, বিশেষভাবে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে, ট্যাঙ্ক, বিমানবহর ও গোলন্দাজি শক্তিতে চেক-বাহিনী যেমন উৎকৃষ্ট ছিল, তেমনই তার শিক্ষা-দীক্ষাও ভাল ছিল। আত্মরক্ষার সুদৃঢ় ঘাঁটিগুলির পিছনে দাঁড়াইয়া তারা যথেষ্ট বাধা দিতে পারিত এবং তেমন অবস্থায় জার্মানীকে অন্ততঃ ৬০ ডিভিসন সৈন্য নিয়োগ করিতে

১। THE COLD WAR,—by Fleming. Vol. I, P. 79

হইত। সরকারী মতে তখন জার্মানীর ৩০ ডিভিসন প্রথম সারির সৈন্য ছিল চেক-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য।[১]

ফ্যাসিস্ট তোষণনীতির দুর্বুদ্ধির বদলে যদি ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে কোয়ালিশন হইত তা হইলে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে চেকোশ্লোভাকিয়ার জন্য জার্মানীর সহজে ঘাঁটি পাওয়া কিংবা অগ্রগতি লাভ সম্ভব হইত না। জার্মানীর যে সীমান্ত সবচেয়ে দুর্বল, চেক সামরিক শক্তি ছিল সেখানে অত্যন্ত প্রবল এবং সাইলেশিয়া, মধ্য জার্মানী ও পূর্ব ব্যাভেরিয়ার চাবিকাঠি ছিল তাদের হাতে। ম্যাক্স ভার্নার বলিতেছেন যে, জার্মান রণ-পণ্ডিতদের মতেও চেকোশ্লোভাকিয়া ছিল পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে একটি শক্তিশালী সামরিক সেতুর মত। ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে রাশিয়া বা ফ্রান্সের এত নিকটে কোন যোগসূত্রের এলাকা ছিল না। সুতরাং মধ্য ইউরোপে চেক রাষ্ট্র উভয়ের মধ্যে ছিল শক্তিশালী মিত্রের মতন। ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে সংক্ষিপ্ততম যোগাযোগের রাস্তা ছিল মধ্য ও দক্ষিণ জার্মানীর মধ্য দিয়া। পূর্ব দিক হইতে লালফৌজ এবং পশ্চিম হইতে ফরাসী বাহিনী মধ্য ইউরোপ ও দক্ষিণ জার্মানীতে প্রবেশ করিতে পারিত এবং সোভিয়েট বিমানবহর বার্লিনে হানা দিয়া লণ্ডনকে জার্মান বোমারু অভিযান হইতে রক্ষা করিতে পারিত।[২]

কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়াকে বলিদানের দ্বারা ফল দাঁড়াইল উল্টো। ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গ এই সমস্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইলেন তো বটেই, অধিকন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানী ইচ্ছামত তার বৃহৎ সৈন্যদল সমাবেশের সুযোগ পাইল এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে রুমানিয়া, উক্রাইন কিংবা পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে অগ্রগতিরও অপরিমিত সুবিধা পাইল। সুতরাং ভাবীযুদ্ধে হিটলারের প্রস্তুতির পথ মিত্রশক্তিই তৈয়ার করিয়া দিলেন কুখ্যাত মিউনিক চুক্তির মারফৎ। জার্মানীর অর্থনৈতিক লাভও তার যুদ্ধযাত্রার পক্ষে সহায়ক হইয়া উঠিল। এককথায় মিউনিক চুক্তি ইউরোপের শান্তি নিশ্চিত করা দূরের কথা, বরং সামরিক বিপর্যয় ডাকিয়া আনিল।

কিন্তু ফ্রান্স ও বৃটেনের সোভিয়েট বিদ্বেষী একদল রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী এই গুরুত্বর পট-পরিবর্তনের কথা স্থিরভাবে চিন্তা করিয়াও দেখিলেন না। বরং তাঁরা বিপরীত পথে চলিতে লাগিলেন। কমন্সসভায় প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের সমর্থক স্যার আর্নল্ড উইলসন বলিলেন, (১৯৩৮, ১১ই জুলাই) 'ঐক্য অপরিহার্য এবং আজিকার পৃথিবীর আসন্ন বিপদ জার্মানীর বা ইতালীর কাছ হইতে আসিতেছে না, সেই বিপদ আসিতেছে রাশিয়া হইতে।' 'লণ্ডন টাইমস' মন্তব্য করিলেন যে, রাশিয়ার সহিত কোন ধরাবাঁধা মৈত্রী করিলে অন্যান্য আলোচনার পথ ব্যাহত হইবে। এই 'অন্যান্য আলোচনা' কি ?—যেদিন নাৎসী বাহিনী চেক রাজধানী প্রাগে প্রবেশ করিল, সেদিন 'ফেডারেশন অফ বৃটিশ ইণ্ডাস্ট্রিজের' একদল প্রতিনিধি জার্মানীর ডুসেলডর্ফ সহরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জার্মানীর বৃহৎ ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর সঙ্গে একটি বিস্তৃত চুক্তিপত্রের চূড়ান্ত সর্তাবলী স্থির করিতেছিলেন। আর জুলাই মাসে (১৯৩৯) বৃটিশ সংবাদপত্রে এই চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হইল যে, বোর্ড অব ট্রেডের পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারি রবার্ট এস হডসন হিটলারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ হেলমুথ উইনটের

১। The Military Strength of the Powers—by Max Warner.

২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক।

সঙ্গে নাৎসী জার্মানীকে ৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণদান সম্ভব কিনা সেই বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল।

এদিকে যখন এই অবস্থা চলিতেছে এবং হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার ভিতর অগ্রসর হইতেছেন, তখন মস্কো হইতে মঃ স্ট্যালিন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সোভিয়েট বিদ্বেষী ও তোষণনীতি বিলাসীদের উদ্দেশ্যে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন যে, এই নীতি তাঁদের নিজেদেরই কবর রচনা করিবে। ১৯৩৯ সালের ১০ই মার্চ কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে স্ট্যালিন ঘোষণা করিলেন, 'ইউরোপে ও এশিয়ায় অক্ষশক্তিবর্গ ইতিমধ্যেই যে অ-ঘোষিত সংগ্রাম শুরু করিয়াছে এবং যাহা কোমিণ্টার্ন বিরোধী চুক্তির মুখোসে আড়াল করা হইয়াছে, তাহা কেবল যে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধেই পরিচালিত হইতেছে এমন নহে, বরং এক্ষণে কার্যতঃ মূলগতভাবে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইতেছে।

'এই যুদ্ধ চালানো হইতেছে আক্রমণকারী রাজ্যগুলির দ্বারা, যারা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত অনাক্রমণকারী রাজ্যগুলির স্বার্থের উপর সর্বতোভাবে আঘাত হানিতেছে, কিন্তু ইহারা পিছু সরিয়া দাঁড়াইতেছে, পশ্চাদপসরণ করিতেছে এবং আক্রমণকারিদিগকে কেবল সুবিধার পর সুবিধা দিয়া যাইতেছে···প্রতিরোধের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিতেছে না, অধিকন্তু কিছুটা পরিমাণ জোট পাকাইয়াও চলিতেছে। ইহা অবিশ্বাস্য মনে হইতে পারে, কিন্তু একান্ত সত্য।

পশ্চিমের গণতন্ত্রীবাদী দেশগুলির, বিশেষভাবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকগণ যৌথ নিরাপত্তার নীতি অগ্রাহ্য করিয়াছে। এর বদলে তারা এখনও সোভিয়েটবিরোধী কোয়ালিশনের স্বপ্ন দেখিতেছে এবং এই মনোভাবকে তারা 'appeasement, non-intervention'—এই সমস্ত কূটনৈতিক শব্দের দ্বারা গোপন করিতেছে।'

মঃ স্ট্যালিন আরও বলেন যে, এই আত্মঘাতী নীতি ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। এখন পর্যন্ত জার্মানী কেন সোভিয়েট উক্রাইনের দিকে মার্চ করিতেছে না?—একথা ভাবিয়া কোন কোন ইউরোপীয় এবং মার্কিন রাজনীতিক ও সংবাদপত্র লেখকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছে—তারা প্রকাশ্যেই বলিতে শুরু করিয়াছে—'এটা কিরূপ হইল? জার্মানী পূর্বদিকে অভিযান করার বদলে পশ্চিমদিকে মুখ করিয়াছে এবং উপনিবেশ দাবী করিতেছে। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়া কি এজন্যই জার্মানীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল? যে সর্তে ইহা করা হইয়াছে, তার পাওনা মিটানো হইতেছে কই?···যে বিপজ্জনক রাজনীতির খেলা চলিয়াছে, তাহা এক মারাত্মক প্রহসনের মধ্যে শেষ হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে এখনও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং যৌথ নিরাপত্তার বাস্তব নীতি চাহিতেছেন। কিন্তু সহযোগিতা সম্পূর্ণরূপে অকৃত্রিম ও আন্তরিক হওয়া চাই। ইঙ্গ-ফরাসী রাজনীতিকগণের তোষণ-নীতির ক্রীড়নক হইতে লালফৌজ প্রস্তুত নয়। তবে শেষ পর্যন্ত যদি যুদ্ধই বাধে, তখন দেখা যাইবে যে, অন্য যে কোন দেশের চেয়ে সোভিয়েট বাহিনীর সম্মুখ ও পশ্চাদভাগ অনেক বেশী শক্তিশালী—রুশসীমানার বাহিরের সমরবিলাসীরা একথা স্মরণে রাখিলে উপকৃত হইতেন'।

১। The Great Conspiracy Against Russia.—by Sayers & Kahn—Page 115.
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক।

জার্মানী, ইতালী, জাপান ও স্পেনকে কেন্দ্র করিয়া যে সর্বনাশা তোষণনীতি অনুসৃত হইতেছিল, উহার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সোভিয়েট নায়ক স্ট্যালিন যে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, তাহা উপরি উদ্ধৃত বক্তৃতাতেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে স্ট্যালিন গভীর দূরদৃষ্টি সহকারে ইঙ্গ-ফরাসী রাষ্ট্রনেতাদিগকে সতর্ক করিয়াই দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সতর্কবাণী তাঁরা গ্রাহ্য করিলেন না।

বসন্ত ও গ্রীষ্মের সংকট

এমনকি রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড ও তুরস্ককে নিয়া ১৮ই মার্চ (১৯৩৯) সোভিয়েট সরকার একটি শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠানের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাও অগ্রাহ্য করা হইল।

এবার পোল্যাণ্ডের পালা। ১৫ই মার্চ প্রাগ দখলের এক সপ্তাহের মধ্যেই হিটলারের ভুমিগত ক্ষুধা আবার জাগিয়া উঠিল। ২১শে মার্চ তারিখ হিটলার পোল্যাণ্ডের নিকট ডানজিগ বন্দর ফেরৎ চাহিলেন এবং পোলিশ করিডোরের ভিতর দিয়া একটি সড়ক ও রেলপথ (যার উপর পোল্যাণ্ডের কোন কর্তৃত্ব ও অধিকার থাকিবে না) নির্মাণের দাবী করিলেন। এর বদলে হিটলার পোল্যাণ্ডের সহিত ২৫ বৎসরের জন্য একটি অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব করিলেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে এই সীমানাই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। পোলিশ গভর্নমেণ্ট এই দাবী সরাসরি অগ্রাহ্য না করিয়া ডানজিগের স্বাধীন সত্তা ও করিডোরে জার্মানযাত্রী ও যানবাহন ইত্যাদি চলাচলের আপোষ মীমাংসা করিতে চাহিলেন। কিন্তু হিটলার মীমাংসা চাহিতেছিলেন না, যে কৌশলে তিনি রাইনল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করিয়াছেন, সেই কৌশলেই—অর্থাৎ বিনাযুদ্ধে কেবলমাত্র হুমকি ও বিশৃংখলা সৃষ্টির দ্বারা তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে চাহিতেছিলেন।

এবার ইঙ্গ-ফরাসী তোষণ-বিশারদদের মধ্যে পর্যন্ত আতঙ্ক সৃষ্টি হইল এবং ফ্যাসিস্টনীতির ক্রূরতা ও কৌশল সম্পর্কে তাঁদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতে লাগিল। তাঁরা অনুভব করিতে লাগিলেন যে, যুদ্ধ ঠেকাইবার নাম করিয়া হিটলারকে এভাবে তুষ্ট করিতে গেলে শেষ পর্যন্ত গোটা ইউরোপই নাৎসী জার্মানীর হাতে তুলিয়া দিতে হইবে। সুতরাং মার্চ মাসের বা বসন্তকালের এই সংকটে প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হ্যালিফাক্সের বক্তৃতার সুর ও মনোভাবের বদল হইল। 'আর কোন ভুমিগত দাবী নাই' বলিয়া হের হিটলার যে প্রতিশ্রুতি বার বার দিয়াছিলেন তার কি হইল?

'Is this end of an old adventure, or is it the beginning of a new? ...Is this, in fact a step in the direction of an attempt to dominate the world by force?'

—১৭ই মার্চ মিঃ চেম্বারলেন হিটলারের বিরুদ্ধে এই মন্তব্য করিলেন।[১] কেবল তাহাই নহে, ডানজিগ ও কোরিডোর লইয়া জার্মানীর নূতন দাবী সম্পর্কে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে, পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা কোনভাবে বিপন্ন হইতে পারে, এমন কোন কাজ বরদাস্ত করা হইবে না এবং পোল্যাণ্ড যদি সশস্ত্রভাবে উহার বিরুদ্ধে বাধা দেয়, তবে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁদেরকে সাহায্য করিবেন। ফারাসী গভর্নমেণ্টও

১। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট প্রকাশিত 'How Hitler made the War' পুস্তিকা।

তাঁদের সহিত একমত হইলেন এবং ৬ই এপ্রিল ইঙ্গ-পোলিশ সম্মিলিত ইস্তাহারে বৃটেন ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে নূতন মৈত্রী ও পারস্পরিক সাহায্যদানের কথা ঘোষিত হইল।

কিন্তু হিটলার বিচলিত হইলেন না। বরং ইঙ্গ-পোলিশ মৈত্রীর জবাবে তিনি ১৯৩৪ সালে অনুষ্ঠিত জার্মান-পোলিশ অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল করিয়া দিলেন এবং ১৯৩৫ সালে ইংলণ্ডের সহিত যে নৌচুক্তি হইয়াছিল, তাহাও অগ্রাহ্য করিলেন। এরপর শুরু হইল পোল্যাণ্ডের আবেদন ও জার্মানীর ভীতি প্রদর্শন এবং যুদ্ধ এড়াইবার জন্য ইংলণ্ডের শেষ চেষ্টা—কখনও মিষ্টবাক্য, কখনও বা তিরস্কারমূলক কড়া কথা। কিন্তু এদিকে অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিলে এবং ডানজিগ বন্দর ও কোরিডোর[১] লইয়া বিরোধ চরমে উঠিতে লাগিল। জুন ও জুলাইয়ের পর আগস্ট মাস আসিয়া পড়িল, যাহা ইতিহাসে ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালীন সংকট নামে পরিচিত।

এই সময় ইউরোপীয় যুদ্ধ অনিবার্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু রণনীতি ও কূটনীতি উভয়ের বিচারে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গ বেকায়দায় পড়িলেন। সর্বাত্মক যুদ্ধ ও যান্ত্রিক সংগ্রামের আয়োজন যেমন তাঁদের ছিল না, তেমনই কুটনীতিকে রণনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেও খাটাইতে পরিলেন না। এই সময়ে হিটলারি প্রভাবে বেলজিয়ামের রাজা তৃতীয় লিওপোল্ড অকস্মাৎ বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিলেন। ফলে, ফ্রান্সের পক্ষে বেলজিয়ামের সঙ্গে একত্রে কোন সামরিক আত্মরক্ষার প্ল্যান করা সম্ভব হইল না। স্পেন চলিয়া গেল ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর দখলে, ফলে ইতালী-জার্মান কুটনীতি ও রণনীতি পশ্চিমভূমধ্যসাগর এলাকায় প্রভাব বিস্তার করিল। আর চেকোশ্লোভাকিয়া হিটলারের কুক্ষিগত হইল। সুতরাং মধ্য ইউরোপের সীমান্তবর্তী শক্তিশালী ঘাঁটিও মিত্রপক্ষের হাতছাড়া হইয়া গেল। এই অবস্থায় একমাত্র বুদ্ধিমানের কার্য ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে পূর্ণ সামরিক চুক্তি ও মৈত্রী বিধান। কেননা সেই অবস্থায় মিত্রপক্ষের তিন প্রকার সামরিক সুবিধা হইত। প্রথমতঃ পোলিশ-জার্মান সীমান্ত হইতে জার্মানীর অভ্যন্তরে রুশ আক্রমণ ও অগ্রগতি। দ্বিতীয়তঃ জার্মানীর বিরুদ্ধে দুই রণাঙ্গন সৃষ্টির দ্বারা পশ্চিমে মিত্রপক্ষের আত্মরক্ষার শক্তিবৃদ্ধি এবং তৃতীয়তঃ জার্মানীর বিরুদ্ধে কোয়ালিশন বা সম্মিলিত শক্তির দ্বারা নাৎসী সামরিক শক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ।[২]

কিন্তু এখানেই শুরু হইল ইউরোপীয় বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অংক। মিউনিক চুক্তির দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়ার হত্যার পর সোভিয়েট রাশিয়া পশ্চিমের রাষ্ট্রপুঞ্জ

১। ডানজিগ বন্দর ও পোলিশ করিডোরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বালটিক সমুদ্র তীরে ভিশ্চুলা নদীর মোহনায় ইহা স্থাপিত। এর ৪ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৯৭ জন জার্মান ছিল এবং এই বন্দর লইয়া পোল্যাণ্ডের সঙ্গে দীর্ঘকাল মারামারি হইয়া আসিয়াছে, কেননা নদীপথে সমুদ্রে যাইবার ইহাই একমাত্র বন্দর। ১৯১৯ সালের ভার্সাই সন্ধি অনুসারে ইহা জার্মানীর নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় এবং পোল্যাণ্ডের কর্তৃত্বে ও বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের আওতায় ইহা 'স্বাধীন নগরীতে' পরিণত হয়। এই বন্দরের সঙ্গে যুক্ত হইবার জন্য পোল্যাণ্ডকে একটি অন্তর্পথ বা কোরিডোর দেওয়া হয়—যাহা কোথায়ও ১০ মাইল এবং কোথাও বা ৬০ মাইল চওড়া। ইহা দ্বারা খাস জার্মানভূমি ও প্রুশিয়ার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু পোলদের দাবী এই যে, বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহা তাহাদেরই ছিল। এই এলাকার বাসিন্দাদের শতকরা ৯০ জনই ছিল পোলিশ (১৯৩৯, আগস্ট) এবং এই পথ দিয়া পোল্যাণ্ডের শতকরা ৮০ ভাগ বহির্বাণিজ্য প্রবাহিত ছিল। সুতরাং উভয়ের বিরোধের কারণ সুস্পষ্ট। —লেখক

২। 'Battle For the World' by—Max Werner .p. 35-40

হইতে বিচ্ছিন্ন ও একক হইয়া পড়িল। যৌথ নিরাপত্তার নীতি যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িল তেমনই রুশ-ফরাসী বা চেক-রুশ চুক্তিও অকেজো হইয়া পড়িল। এদিকে হিটলার কর্তৃক পোল্যাণ্ডের বলিদান আসন্ন মনে করিয়া ইঙ্গ-ফরাসী গভর্নমেন্টদ্বয় চঞ্চল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহারা পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়াকে রক্ষা ও সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। অথচ সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী ছাড়া এইপ্রকার প্রতিশ্রুতি যে বৃটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে সামরিক দিক হইতে আত্মহত্যার তুল্য এই সাধারণ বুদ্ধির কথাটা ইঙ্গ-ফরাসী শাসক মহলের মাথায় ঢুকিল না। কিন্তু কমিউনিজমের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও ইংলণ্ডের চার্চিল, মিঃ লয়েড জর্জ (যাঁরা ইতিপূর্বে ক্রমাগত রাশিয়ার বিরুদ্ধে শত্রুতা করিয়াছেন) ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট, ইডেন, ডাফ কুপার এবং ফ্রান্সের পিয়ের কট, পল রেনো, পার্টিনাক্স, হেনরী দ্য কেরিলি প্রভৃতি তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, রাশিয়ার সহিত মৈত্রী ছাড়া পোল্যাণ্ডকে কোন গ্যারাণ্টি দেওয়া বা সেই উপলক্ষে যুদ্ধযাত্রায় বাহির হওয়া নির্বুদ্ধিতাব্যঞ্জক ও সর্বনাশকর হইবে। এঁরা সকলেই ছিলেন কূটনীতি ও রণনীতি, উভয় প্রশ্নে বিশেষজ্ঞ। সুতরাং তাঁরা বিপদ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এখানে ঝানু লয়েড জর্জের পার্লামেণ্টারি বক্তৃতার সামান্য কয়েক লাইন তুলিয়া দিতেছি। পোল্যাণ্ডকে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যে গ্যারাণ্টি দিলেন, তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন,—

"I cannot understand why, before committing ourselves to this tremendous enterprise we did not secure beforehand the adhesion of Russia···Apart from that we have undertaken a frightful gamble, a very risky gamble. With Russian you have overwhelming forces which Germany with her inferior army cannot stand against. I appeal with all the earnestness I can command to the Government to take steps immediately".[১]

লয়েড জর্জের মত ফ্রান্সেও এই ধরনের মর্মস্পর্শী আবেদন উত্থিত হইল। অবশ্য মিউনিক চুক্তির পরিণাম দেখিবার পর লণ্ডন, প্যারিস ও মস্কোর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইল। আসন্ন সংঘর্ষ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সোভিয়েট রাশিয়া প্রস্তাব করিল যে, বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, তুরস্ক এবং রুমানিয়া—স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট এই কয়টি রাষ্ট্রকে লইয়া একটি সম্মিলিত বৈঠক ডাকা উচিত এবং একত্রে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বিত হউক। কিন্তু ১৯৩৯ সালের বসন্ত কালের সংকটে রাশিয়ার এই প্রস্তাব বৃটিশ সরকার গ্রহণ করিলেন না। ইহার বদলে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট পাল্টা এই প্রস্তাব করিলেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন কোনমতে পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়াকে গ্যারাণ্টি দিক। অর্থাৎ পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার সহিত কোন সামরিক চুক্তি নহে, রাশিয়া কেবলমাত্র গোলাবাড়ির মত এই দুই দেশকে তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী সমরসম্ভার জোগাইয়া যাইবে। ১৫ এপ্রিল সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট আর একবার প্রস্তাব করিলেন যে, বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে এক চুক্তি হউক এবং এই তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তি একদিকে পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও বালটিক রাজ্য এবং অন্য-দিকে হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও সুইজারল্যাণ্ডকে গ্যারাণ্টি দিবেন। কিন্তু ২রা মে (১৯৩৯) তারিখ ফ্রান্স ও বৃটেন, উভয়েই এই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করিলেন।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক

বসন্তকাল হইতে রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের এই বিসদৃশ টানা-হেঁচড়া চলিতে লাগিল। আর ইউরোপীয় দুর্বিপাকের আশঙ্কায় জনমত প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে বৃটিশ জনসাধারণের এক ভোট গ্রহণের দ্বারা দেখা গেল যে শতকরা ৮৭ জন ইংরাজ নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংগ-রুশ মিতালীর পক্ষপাতী। আর বিশেষজ্ঞরা তো চিৎকার করিতেছিলেনই। সুতরাং চেম্বারলেনের গভর্নমেণ্ট মুখরক্ষার খাতিরে আর একবার মস্কোতে 'দূত' পাঠাইলেন। তখন অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল এবং 'আগস্ট ক্রাইসিস' বা গ্রীষ্মকালের সঙ্কট আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু সেই চরম মুহূর্তেও ইংগ-ফরাসী কর্তারা ত্বরান্বিত ও আন্তরিক হইলেন না। ইহার আগে এত বড় ঐতিহাসিক আলোচনার জন্য বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের উইলিয়ম স্ট্রাং নামক একজন সামান্য অফিসারকে, মিঃ লয়েড জর্জ যাঁকে 'কেরাণী' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাঁকে মস্কোতে রাখা হইয়াছিল। এরপর ১১ই আগস্ট তারিখে একটি বৃটিশ মিলিটারি মিশন মস্কোতে পেঁাছিলেন। কিন্তু তাঁরা রওনা হইয়াছিলেন দ্রুতগামী ট্রেনে বা এরোপ্লেনে নয়, সর্বাপেক্ষা মন্দগামী একটি পোতে, সমুদ্রপথে যার ঘণ্টায় গতি ছিল মাত্র ১৩ নট (বা সামুদ্রিক মাইল)!

কিন্তু এই আলোচনাও ফাঁসিয়া গেল। প্রধানত বালটিক রাজ্য ও পোল্যাণ্ড এবং কার্যক্ষেত্রে সামরিক চুক্তি প্রয়োগের উপায় ও পদ্ধতি লইয়া। অর্থাৎ বালটিক রাজ্যে 'অপ্রত্যক্ষ' জার্মান আক্রমণ ঘটিলে কি হইবে এবং সামরিক চুক্তি অনুযায়ী কবে কোথায় ও কিভাবে সৈন্য ও অস্ত্রের সমাবেশ করিতে হইবে—ইহা লইয়া বিপুল বিতর্ক ও কথার পাহাড়ের সৃষ্টি হইল। কেবল তাহাই নহে, পোল্যাণ্ড এবং রুমানিয়া রাশিয়ার সহিত সামরিক মৈত্রীর প্রস্তাবে সমস্ত হইল না। কেননা, এই চুক্তি অনুযায়ী লালফৌজ সেই দেশে দেখা দিবে এবং উহার পথ ধরিয়া আসিবে শ্রেণীসংগ্রামের বার্তাবাহী 'সাম্যবাদ'। পোল্যাণ্ডের বেক-স্মিগলি-রিজ গভর্নমেণ্ট এবং রুমানিয়ার রাজা ক্যারলের মন্ত্রিসভা ইহাতে রাজী হইলেন না। মার্শাল পিলসুদস্কির আমল হইতেই পোল্যাণ্ডে ডিক্টেটরি শাসন প্রবর্তিত ছিল এবং বড় বড় ভূম্যধিকারী ছিলেন ইহার পিছনে ১৯৩৫ সালে পিলসুদস্কির মৃত্যুর পরও সেই একই শাসন চলিতে থাকে। সুতরাং মনে-প্রাণে ইহারাও কায়েমী স্বার্থের বাহক নাৎসীতন্ত্রের ভক্ত এবং সাম্যবাদের শত্রু ছিলেন। রণপণ্ডিত ম্যাক্স ভার্নার ইংরাজ ও ফরাসী ঐতিহাসিকগণের মন্তব্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, পোল্যাণ্ড এবং রুমানিয়ার মত চেম্বারলেনের মন্ত্রিসভাও রাশিয়ার সহিত পূর্ণ সামরিক মৈত্রীর সামাজিক বিপদের ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং কেবল দ্বিধা, দ্বন্দ্ব এবং সন্দেহ ও বিতর্কের মধ্য দিয়া আগস্টের চরম সঙ্কটের দিনগুলি চলিয়া যাইতে লাগিল। বৃটিশ ও ফরাসী মিলিটারি মিশন চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারিও ছিলেন না—মঃ মলোটোভ তাঁর ৩১শে আগস্টের বক্তৃতায় একথা স্পষ্টরূপেই ঘোষণা করিয়াছিলেন; এই সমস্ত টালবাহানার ফলে কথাবার্তা বানচাল হইয়া গেল এবং এদিকে পোল্যাণ্ড আক্রমণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চতুর হিটলার পাঠাইলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপকে মস্কোতে—২২শে আগস্ট তারিখ। সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইল আকস্মিক রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির বার্তা শুনিয়া। এই অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল ১০ বৎসরের জন্য।

সপ্তম অধ্যায়

রুশ-জার্মান চুক্তির বজ্রাঘাত

১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালে যখন সমগ্র ইউরোপ অগ্নিগর্ভ হইয়া উঠিতেছিল, তখন হঠাৎ একদিন রুশ-জার্মান চুক্তির বজ্রাঘাতে সারা পৃথিবী যেন কাঁপিয়া উঠিল। হিটলারের জার্মানী এবং স্ট্যালিনের রাশিয়া পরস্পরের সহিত হাত মিলাইতে পারে, এমন আজগুবী ঘটনা যেমন অবিশ্বাস্য ছিল, তেমনি পশ্চিমী শক্তিবর্গের (বৃটেন ও ফ্রান্স) সঙ্গে অসমাপ্ত আলোচনার অন্তরালে নাৎসী-জার্মানী ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে আচম্বিতে অনাক্রমণ চুক্তি ঘটিয়া যাইতে পারে, এমন সম্ভাবনাও বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। সুতরাং চার্চিলের মত ঝানু কূটনীতিবিদও সেই চুক্তির কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই দুঃসংবাদ যেন সারা পৃথিবীর উপর বোমার মত ফাটিয়া পড়িল (The sinister news broke upon the world like an explosion)। আজ বহু বছর পর যখন মহাযুদ্ধের বহু ভয়াবহ স্মৃতিই ম্লান হইয়া গিয়াছে, তখন সেদিনের উত্তেজনা, এমনকি আতংক আজ কল্পনা করাও যাইবে না। আতংক এজন্য যে, রুশ-জার্মান চুক্তির বজ্রাঘাতে ইউরোপীয় বারুদখানায় যেন আগুন ধরাইয়া দিল এবং তার আট দিন পর সত্য সত্যই যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল—হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এই চুক্তি কেবল হিটলারের শয়তানি বুদ্ধিকেই উগ্র করিল না, আন্তর্জাতিক জগতে প্রচণ্ড বিস্ময় ও বিহ্বলতারও সৃষ্টি করিল। কারণ, ফ্যাসিজম ও কমিউনিজম ছিল পরস্পরের বিঘোষিত শত্রু এবং এই দুইয়ের মধ্যে আপোষমীমাংসার কোন প্রশ্নই ছিল না। বিশেষতঃ হিটলারের নাৎসী জার্মানী 'বলশেভিক বর্বরদের' ঘাড় মটকাইবার জন্য যখন মাংস লোলুপ হায়নার মত চিৎকার করিতেছিল, এবং যখন দেশে দেশে সাম্যবাদী পার্টিগুলি নাৎসীবাদের ক্রূরতার বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের বিবেক জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন সেই নরঘাতক নাৎসী নেতাদের সঙ্গে লেনিনের 'সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য' স্ট্যালিন সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এমন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারেন, এই অদ্ভুত ডিগবাজির সহসা যেন কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছিল না। সুতরাং আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী মহলেও বিষম কুজ্ঝটিকা দেখা দিল এবং ভারতবর্ষ, বৃটেন, আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীর কমিউনিস্ট মহলে প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড় বহিয়া গেল। কমিউনিস্টদের মধ্যে যেমন বিহ্বলতার বান ডাকিল, তেমনি ক্যাপিটালিস্ট দুনিয়া স্ট্যালিন ও রাশিয়ার নিন্দায় আকাশ বিদীর্ণ করিল এবং আর একদল পশ্চিমী পণ্ডিত তখন থেকেই হিটলারের কূটনৈতিক ও রণনৈতিক প্রতিভার 'সফলতা' সম্পর্কে জয়গান করিতে লাগিলেন। এমনকি, হিটলারের 'বড়দাদা' ও মিতা মুসোলিনী পর্যন্ত ঘটনার নাটকীয়তায় চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু সেদিনের জরুরী অবস্থায় পশ্চিমী শক্তিবর্গের ভণ্ডামী এবং রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার কপট নীতিই ছিল এই আকস্মিক বজ্রপাতের মূল কারণ।

* * * *

১৯৩৯ সালের এপ্রিল থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়টা তখনকার ইউরোপীয়

ইতিহাসে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের সংকট নামে পরিচিত ছিল। কারণ, সেই সময় হিটলার কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ ও যুদ্ধ অনিবার্য বলিয়া মনে হইতেছিল। আগের অধ্যায়েই বর্ণনা করা হইয়াছে কিভাবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নাৎসী তোষণকারী শাসকগোষ্ঠী জনমতের চাপে পড়িয়া এই যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত আলোচনা শুরু করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই আলোচনা কার্যতঃ ফাঁসিয়া গেল পোল্যাণ্ড ও বাল্টিক রাজ্যগুলির নিরাপত্তার প্রশ্নে। অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনায় চেম্বারলেনের মন ছিল না। যদিও কোন কোন বৃটিশ ঐতিহাসিক (যেমন, এ জে পি টেলর) চেম্বারলেনীয় নীতির সাফাই গাহিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট 'ইউরোপীয় শান্তি রক্ষার' জন্যই চেষ্টা করিতেছিলেন, কোন 'যুদ্ধ জয়ের জন্য' নয় এবং তাঁদের নীতি রণনৈতিক হিসাবনিকাশের বদলে মর‍্যালিটি বা নৈতিকতার দ্বারাই উদ্বুদ্ধ ছিল, এবং চেম্বারলেন হিটলার বা স্ট্যালিন কাউকেই বিশ্বাস করিতেন না। তথাপি আসলে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের এই ভয় ছিল যে, ইউরোপে কোন যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিলে বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যে সেই শিখা ছড়াইয়া পড়িতে পারে এবং সেই অবস্থায় জার্মানী বা সোভিয়েট রাশিয়ার চেয়ে বৃটেনের বেশী বিপদ ঘটিতে পারে। সুতরাং সোভিয়েট রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করুক এবং তার দ্বারা জার্মানী খুব কাবু হইয়া পড়ুক এটাও যেমন বৃটিশ সরকার চাহিতেছিলেন না, তেমনি পূর্বদিকে জয়াভিযানের ফলে জার্মানী ইউরোপের মধ্যে সেরা শক্তিতে পরিণত হোক এবং শেষপর্যন্ত ফ্রান্স ও বৃটেনের পক্ষে আরও বিপদস্বরূপ হইয়া উঠুক, এটাও ইঙ্গ-ফরাসী নেতাদের কাম্য ছিল না। 'জলের কল ঘুরাইয়া যেমন ইচ্ছামত জল পাওয়া যায় বা বন্ধ করা হয়' বৃটিশ সরকার সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য পাওয়ার আশায় তেমন মনোভাব পোষণ করিতেছিলেন। হ্যালিফ্যাক্সের ভাষায় বলা যাইতে পারে—

"It was desirable not to estrange Russia, but always to keep her in play."

রাশিয়াকে দূরে সরাইয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু তাকে দিয়া সর্বদাই খেলাইয়া নিতে হইবে।[১]

অর্থাৎ রাশিয়ার প্রতি বৃটিশ কূটনীতির যে কপটতা ছিল, নৈতিকতা নয়, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হ্যালিফ্যাক্সের এই মন্তব্যই তার প্রমাণ। অপরপক্ষে সোভিয়েট নেতারাও সন্দেহ করিতেছিলেন যে, বৃটিশ-নীতির আসল মতলব হইতেছে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধাইয়া দেওয়া এবং নিজেরা দূরে থাকিয়া নিরপেক্ষতার ভান করা।

ইউরোপের সেই সংকটের দিনে দুই পক্ষের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসজনিত যে কূটনৈতিক আবহাওয়া দেখা দিল, বলা বাহুল্য যে, সেই আবহাওয়ার মধ্যে এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য পশ্চিমী নেতাদের কোন মানসিক প্রস্তুতি ছিল না—যদিও হিটলারি আগ্রাসী নীতি প্রতিরোধের জন্য সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের আন্তরিক ইচ্ছার কোন অভাব ছিল না। সুতরাং 'অনিচ্ছুক' চেম্বারলেন মন্ত্রিসভা সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাইতে গিয়া যে 'গো শ্লো' মনোভাব (এবং যে মনোভাব ইদানীং কালের কলকারখানায় অসন্তুষ্ট শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে

(১) মিঃ টেলর প্রণীত 'The Origins of the Second World War'. P. 278.

দেখা যায়) অবলম্বন করিলেন কূটনীতির ইতিহাসে তেমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ। প্রকৃত-পক্ষে মার্চ-এপ্রিল থেকে আগস্ট—প্রায় পাঁচ-ছয় মাস ধরিয়া এই বিরক্তিকর আলোচনা চলিল—যদিও তখন ইউরোপে খুব জরুরী অবস্থা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েট পক্ষ এই আলোচনা যে ত্বরান্বিত করিতেই চাহিয়াছিলেন, সে-কথা বৃটিশ ঐতিহাসিক মিঃ টেলর পর্যন্ত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, এই সমস্ত কূটনৈতিক আদানপ্রদানে যে বিলম্ব হইতেছিল, তার জন্য দায়ী পশ্চিমী পক্ষ, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া প্রায় 'নিঃশ্বাসরোধকারী দ্রুততার সঙ্গে' জবাব দিতেছিলেন। মিঃ টেলর হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন—১৫ই এপ্রিল প্রথম বৃটিশ সরকার তাঁদের প্রস্তাব সাময়িকভাবে উত্থাপন করেন। কিন্তু মাত্র দু' দিন পরেই ১৭ই এপ্রিল সোভিয়েট পক্ষ পাল্টা প্রস্তাব দেন। তারপর বৃটিশ সরকার ৯ই মে পর্যন্ত তিন সপ্তাহ লাগাইলেন জবাব দিতে। কিন্তু সোভিয়েটের দেরি লাগিল মাত্র পাঁচ দিন। তারপর বৃটিশ সরকারের সময় লাগিল ১৩ দিন, আর সোভিয়েটের পাঁচ দিন। আবারও বৃটিশ সরকার ১৩ দিন দেরি করিলেন, আর সোভিয়েট সরকার জবাব দিলেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। তারপর থেকে কিছু দ্রুততা শুরু হইল। বৃটিশ সরকার যদিও পাঁচ দিন সময় নিলেন, কিন্তু সেভিয়েট পক্ষ ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উত্তর দিলেন। এরপর বৃটিশের লাগিল ৯ দিন, আর সোভিয়েটের দুই দিন। বৃটিশের আরও পাঁচ দিন, রাশিয়ার একদিন। বৃটিশ আবার ৮ দিন, আর সোভিয়েটের জবাব সেই দিনেই। পুনরায় বৃটিশের দেরি হইল ৬ দিন, আর সোভিয়েটের জবাব সেই দিনেই। এর পরেই আলোচনা খতম। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বৃটিশ পক্ষ যেন ইচ্ছা করিয়াই আলোচনায় বিলম্ব ঘটাইতেছেন, আর রাশিয়া উপসংহার ঘটাইবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। এমনকি মিঃ এণ্টনি ইডেন যখন একটা বিশেষ মিশন নিয়া মস্কো যাওয়ার জন্য প্রস্তাব করিলেন, তখন চেম্বারলেন সেই প্রস্তাব পর্যন্ত বাতিল করিয়া দিলেন এবং এই আলোচনার একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, এগুলি আদৌ গোপন থাকিতে-ছিল না। অথচ কূটনৈতিক পর্যায়ের এই সমস্ত আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষা করা যখন স্বাভাবিক ছিল, তখন এগুলি সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট পেঁৗছিবার আগেই সংবাদ-পত্রে প্রকাশ হইয়া যাইতেছিল কিংবা সংবাদপত্রে প্রকাশের সঙ্গে জার্মানদের নিকট পেঁৗছিতেছিল।[১]

এই শম্বুক গতি কূটনৈতিক আলোচনার ফলে কোন বাস্তব লাভ হইতেছে না দেখিয়া সোভিয়েট সরকার জুলাই মাসের শেষে বৃটিশ ও ফরাসী উভয় সরকারের কাছে প্রস্তাব করিলেন রণনৈতিক আলোচনার উদ্দেশ্যে সামরিক মিশন পাঠাইবার জন্য। সুতরাং ১০ই আগস্ট তারিখ এডমিরাল ড্রাক্স বৃটেনের পক্ষ থেকে এবং জনৈক জেনারেল ফ্রান্সের পক্ষ থেকে মস্কোতে প্রেরিত হইলেন বটে, কিন্তু আলোচনা চালাইবার কোন লিখিত কর্তৃত্ব তাঁদের দেওয়া হইল না। অথচ সোভিয়েটের পক্ষ থেকে এই আলোচনায় যোগ দিলেন স্বয়ং মার্শাল ভরোশিলোভ। কিন্তু পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্র তাঁদের দেশের মধ্য দিয়া সোভিয়েট সৈন্য চলাচল করিতে দিতে অস্বীকৃত হইলেন। অর্থাৎ পূর্ব ইউরোপে জার্মান আক্রমণ নিবারণে

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা ২৮২-৮৩

তাঁরা সোভিয়েট সামরিক সাহায্য নিতে গররাজী ছিলেন। কারণ, পোল্যাণ্ডের মনোভাব ছিল এই রকম—

"With the Germans we risk losing our liberty ; with the Russian our soul."

অর্থাৎ জার্মানীর হাতে আমাদের স্বাধীনতা হারাইবার মত বিপদের ঝুঁকি আছে বটে, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার হাতে আমরা আমাদের আত্মাকে হারাইব।

সুতরাং বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে সোভিয়েট সামরিক বৈঠক ভাঙ্গিয়া গেল। ১৯৩৯ সালের সঙ্কটে সোভিয়েট সামরিক সাহায্যের প্রস্তাব স্মরণ করিয়া মিঃ চার্চিল তাঁর ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, পরবর্তীকালে (১৯৪২ আগস্ট) ক্রেমলিনে যখন শেষ রাত্রির দিকে স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হইতেছিল, তখন তিনি (স্ট্যালিন) এই সময়কার ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া বলেন যে, পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইলে বৃটিশ ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে এমন বিশ্বাস আমাদের ছিল না। কিংবা বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার একত্র কূটনৈতিক সমাবেশের দ্বারাও জার্মানীকে রোখা যাইত না। সুতরাং স্ট্যালিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'জার্মানীর বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করিতে গিয়া ফ্রান্স কত ডিভিসন পাঠাইবে?' উত্তর পাওয়া গেল—'প্রায় একশ ডিভিশন।' 'আর ইংলণ্ড কত ডিভিসন, পাঠাইবে?' উত্তর পাওয়া গেল—'প্রথমে দুই ডিভিসন, পরে আরও দুই ডিভিসন।' স্ট্যালিন পুনরাবৃত্তি করিলেন—'আঃ, প্রথমে দু' ডিভিসন, পরে আরও দু' ডিভিসন?' কিন্তু আপনারা কি জানেন যে, যদি জার্মানীর সহিত আমাদের যুদ্ধ করতে হয়, তবে রুশ সীমান্তে আমাদের কত ডিভিসন সৈন্য সমাবেশ করতে হবে?' ঈষৎ থামিয়া স্ট্যালিন নিজেই জবাব দিলেন—'তিনশ ডিভিসনের বেশী।'[১]

চার্চিলের এই বর্ণনাই প্রমাণ করিতেছে যে, ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মের সংকটের দিনেই স্ট্যালিন হিটলারী আক্রমণ ঠেকানো ও যুদ্ধ নিবারণের জন্য প্রয়োজন হইলে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে একত্রে সামরিক বলপ্রয়োগ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী সহযোগিতা তো পাওয়া গেলই না, উপরন্তু সামরিক মৈত্রী সম্পাদন এবং পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও বালটিক রাজ্যগুলির সত্যকার নিরাপত্তা বিধানের প্রশ্নে (লেনিনগ্রাদ ও সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিরক্ষার জরুরী প্রয়োজনে) পর্যন্ত আলোচনা চালাইবার নামে একদিকে কালহরণ এবং অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে ধোঁকাবাজি করা হইতেছিল।

ইতিমধ্যে মে মাসেই সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছিল। কারণ, ৩রা মে হঠাৎ মস্কোর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইল যে, পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে মঃ লিটভিনোফকে তাঁর 'নিজের অনুরোধেই' অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে এবং প্রধানমন্ত্রী ভি এম মলোটভ নিজে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

পশ্চিম ঐতিহাসিকরা বলিতেছেন যে, লিটভিনোফের চেয়ে মলোটভ স্ট্যালিনের অনেক বেশী বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯১৮ সালের গোড়ার দিকে পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর পদ থেকে ট্রটস্কির বিদায়ের পর মিঃ চিচেরিন বা লিটভিনোফ যাঁরাই ঐ পদে বসিয়া থাকুন না কেন, তাঁরা কেউ সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম শ্রেণীর বা পলিট-

---

১। চার্চিল কৃত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৫.

ব্যুরোর সদস্য ছিলেন না এবং বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা তখন পর্যন্ত এতটা গুরুত্ব অর্জন করে নাই। চার্চিল বলিতেছেন যে, হিটলারী জার্মানীর সহিত কথাবার্তা চালাইবার পক্ষে লিটভিনোফকে তেমন উপযুক্ত মনে করা হয় নাই। কারণ তিনি ছিলেন জাতিতে ইহুদী, অতএব হিটলারের কাছে অপাংক্তেয়। বিশেষতঃ লিটভিনোফ বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘে সোভিয়েট প্রতিনিধি হিসাবে যৌথ নিরাপত্তার নীতি ও পশ্চিম শক্তিবর্গের সঙ্গে শান্তি রক্ষার ব্যাপারে আলোচনার অংশীদার ছিলেন। কিন্তু মলোটোভ এই সমস্ত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়ায় তাঁর স্থান ছিল স্বয়ং স্ট্যালিনের পরেই। চার্চিলের বর্ণনা অনুসারে মলোটভ একজন উঁচু দরের কূটনীতিবিদ ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে ছিল 'হিমরক্তের নির্মমতা'—কামানের গোলার মত তাঁর মাথা, কালো গোঁফ, চ্যাপ্টা মুখ ও চোখের দৃষ্টিতে বোধশক্তির তীক্ষ্ণতা অথচ বাইরের অবয়বে নির্বিকার এই মানুষটি তাঁর কৃতিত্ব ও গুণের উপযোগী ছিলেন সন্দেহ নাই। 'তবে, সারা জীবনে আমি নিখুঁত রবোটের তুল্য এমন মানুষ দেখি নাই'—তাঁর হাসি ছিল সাইবেরিয়ার শীতের মত ঠাণ্ডা, তাঁর কথাবার্তা ছিল সযত্নে মাপজোক করা, তবে কথাগুলি প্রায়শঃই জ্ঞানীর মতই ছিল' ইত্যাদি।

"I have never seen a human being who more perfectly represented the modern conception of a robot···

His smile of Siberian winter, his carefully measured and often wise words, his affable demeanour combined to make him the perfect agent of Soviet policy in a deadly world".

চার্চিল বর্ণিত 'এই ভয়ঙ্কর পৃথিবীতে সোভিয়েট নীতির এই খাঁটি এজেন্ট' ভিতরে ভিতরে জার্মানীর সহিত আলোচনার সূত্রপাত করিলেন মে মাস থেকে। (কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, মস্কোর সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য বার্লিনের নাৎসী নেতারা মার্চ কিংবা তারও আগে থেকেই উৎসুক ছিলেন।) প্রথমে বাণিজ্যিক লেনদেনের কথা দিয়াই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে এই কথাবার্তার শুরু হইয়াছিল। কিন্তু জার্মানীর সহিত কোন চুক্তি সম্পাদনে সোভিয়েট রাশিয়ার কোন উৎসাহ ছিল না। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ইউরোপে শান্তি রক্ষা ও হিটলারী আগ্রাসী মনোভাবকে বাধা দেওয়ার জন্য ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গের সঙ্গে সামরিক চুক্তি সম্পাদনে উৎসুক ছিলেন বটে, কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ ও মাসের পর মাস লণ্ডন—প্যারিস ও মস্কোর মধ্যে বৃথা আলোচনার একঘেয়েমিতে সোভিয়েট পক্ষ শেষ পর্যন্ত হতাশ হইলেন। কেবল হতাশ নয়, সোভিয়েট নায়কদের সন্দেহ হইল যে, জার্মানীকে পূর্ব দিকে লেলাইয়া দেওয়াই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের আসল মতলব। অথচ ৪ঠা আগস্ট পর্যন্তও সোভিয়েট সরকার দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ঐদিন মস্কোস্থিত রাষ্ট্রদূত শুলেনবুর্গ বার্লিনে যে তারবার্তা পাঠাইয়াছিলেন, তাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদি ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সোভিয়েট রাশিয়ার ইচ্ছা পূরণ করে, তবে রাশিয়া তাদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনেই কৃতসংকল্প। কিন্তু রাশিয়া ইংলণ্ডকেও বিশ্বাস করে না, অতএব তাদের পারস্পরিক আলোচনা দীর্ঘকাল চলিবে। 'সুতরাং আমাদের পক্ষ থেকে প্রচুর চেষ্টা ছাড়া সোভিয়েট সরকারের মনোভাব এই দিকে ঘুরানো যাইবে না।'

কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী আলোচনার ধোঁকাবাজির জন্য সোভিয়েট সরকারের মনোভাব

শেষ পর্যন্ত ঘুরিয়া গেল এবং ২১শে আগস্ট স্ট্যালিন জার্মানীর সহিত আলোচনার উদ্দেশে বার্লিন থেকে প্রেরিত প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। সেই 'শুভ সংবাদ' পাইয়া হিটলার আনন্দে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হইলেন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়াছেন যে, হিটলার তাঁর হাতের দুই মুঠি দিয়া দেওয়ালের উপর আঘাত দিয়া বাজাইতে লাগিলেন এবং মুখে দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে চীৎকার করিয়া বলিলেন—

'Now I have the world in my pocket"—

—অর্থাৎ 'এক্ষণে গোটা দুনিয়া আমার পকেটে আসিয়া গেল!'

* *

জনৈক মার্কিন ঐতিহাসিক এই সময়কার সোভিয়েট-জার্মান সম্পর্কের যে সংক্ষিপ্ত দিনপঞ্জী তাঁর যুদ্ধ সংক্রান্ত পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন, পাঠকদের পক্ষে ঘটনার গতি সহজে বুঝিবার জন্য এখানে তা উদ্ধৃত করা গেল—

১৯৩৯, ১০ই মার্চ—বলশেভিক পার্টির অস্টাদশ কংগ্রেসে স্ট্যালিনের বক্তৃতা এবং বৃটেন ও যুদ্ধবিলাসীদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি। বার্লিনে এই বক্তৃতার জন্য

" ৪ঠা এপ্রিল—হিটলার কর্তৃক একটি 'টপ সিক্রেট' নির্দেশনামা প্রচার—পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণের সাংকেতিক নাম 'কেস হোয়াইট'। আক্রমণের তারিখ ১লা সেপ্টেবর। ১৯৩৪ সালে স্বাক্ষরিত পোল্যাণ্ডের সঙ্গে ১০ বছরের চুক্তির প্রতি উপেক্ষা।

" ২৮শে এপ্রিল—হিটলার কর্তৃক নীতিবিষয়ক একটি গুরুত্বসম্পন্ন বক্তৃতা। কিন্তু এই বক্তৃতায় 'ক্রেমলিনের অমানুষ দৈত্যদের' বিরুদ্ধে জঘন্য বিশেষণ প্রয়োগের উল্লেখযোগ্য বিরতি।

" ৩রা মে—জার্মান নীতিবিরোধী লিটভিনোফের পদচ্যুতি ও মলোটোভের পররাষ্ট্রমন্ত্রীপদে নিয়োগ। বার্লিনে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি।

" ২০শে মে—মলোটোভ জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি বিধানে ইচ্ছুক।

" ২৩শে মে—গোয়েরিং, কাইটেল, ব্রাউসিটস্, রায়েডার প্রভৃতি শীর্ষ সামরিক নেতাদের বৈঠকে হিটলারের ঘোষণা—ডানজিগ কোন বিতর্কের বিষয়ই নয়। আমরা যথাশীঘ্র পোল্যাণ্ড আক্রমণে কৃতসংকল্প, পোল্যাণ্ড যদি ধ্বংস হয় তাতে রাশিয়ার কোন মাথাব্যথা নাও হইতে পারে।

" ৩রা আগস্ট—হিটলার স্ট্যালিনকে জানাইলেন যে, জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক পুনরায় গড়িয়া তুলিতে* জার্মানী এক্ষণে প্রস্তুত।

" ১০ই আগস্ট—মস্কোতে ইঙ্গ ফরাসী সামরিক মিশনের উপস্থিতি। কিন্তু আলোচনায় রহস্যজনক মন্থরতা, বিলম্ব ও বিঘ্ন ইত্যাদি।

" ১২ই আগস্ট—স্ট্যালিন হিটলারকে জানাইলেন যে, তিনি পোল্যাণ্ডসহ যাবতীয় রাজনৈতিক বিষয় 'ধাপে ধাপে আলোচনা' করিতে প্রস্তুত।

" ১৪ই আগস্ট—হিটলার ধাপে ধাপে আলোচনার বদলে স্ট্যালিনকে অনুরোধ

* এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৪ সাল থেকে হিটলারী জার্মানীর সহিত রাশিয়ার কোন সম্পর্ক ছিল না।

করিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপকে অবিলম্বে আলোচনার উদ্দেশ্যে গ্রহণের জন্য। "পূর্ব ইউরোপে উভয়ের মিলিত ভূমিগত সমস্যা"র (পোল্যাণ্ড পার্টিশান) কথা এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৯৩৯, ১৫ই আগস্ট—জার্মান রাষ্ট্রদূত ক্রেমলিনকে জানাইলেন যে, 'মতাদর্শগত বিরোধিতার' জন্য যুক্তিসঙ্গত সহযোগিতা ও নূতন ধরনের বন্ধুতার কথা আলোচনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়।

" ১৬ আগস্ট—হিটলার সোভিয়েট গভর্নমেণ্টকে জানাইলেন যে, জার্মানী একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরে সম্মত আছে।

" ১৮ই আগস্ট—রিবেনট্রপ মস্কোতে একটি জরুরী তারবার্তা পাঠিয়ে স্ট্যালিনের নিকট কাকুতি-মিনতি করিলেন অবিলম্বে তাঁকে সাক্ষাতের ও আলোচনার অনুমতি দেওয়ার জন্য।

" ১৯শে আগস্ট—স্ট্যালিন সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির পোলিট ব্যুরোকে জানাইলেন যে, তিনি জার্মানীর সঙ্গে আলোচনা করিবেন।

" ২০শে আগস্ট—মস্কো থেকে অবিলম্বেই কোন সাড়া না পাইয়া হিটলার অধৈর্য হইলেন এবং স্ট্যালিনের নিকট একটি ব্যক্তিগত বার্তা পাঠাইলেন রিবেনট্রপের সঙ্গে আলোচনার জন্য। "পোল্যাণ্ড ও জার্মানীর মধ্যে উত্তেজনা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।"

(এইদিন রাত্রি ২টায় জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর)।

" ২১শে আগস্ট—স্ট্যালিনের সম্মতিসূচক বার্তা এবং হিটলার আনন্দে আত্মহারা ও উল্লাসভরে চীৎকার!

" ২৩শে আগস্ট—মস্কোতে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে ১০ বছরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর।[১]

" ২৪শে আগস্ট—রিবেনট্রপ যখন চুক্তি স্বাক্ষরের পর বার্লিনে ফিরিয়া গেলেন, তখন বার্সেটগ্যাডেন থেকে হিটলার আনন্দে প্রায় উন্মাদ হইয়া বার্লিনে ফিরিয়া আসিলেন এবং রিবেনট্রপকে অভিনন্দনে অভিভুত করিয়া ঘোষণা করিলেন—"তুমি জার্মানীর দ্বিতীয় বিসমার্ক!"*

* *

২৩শে আগস্ট তারিখ উভয় গভর্নমেণ্টের মধ্যে ক্রেমলিনে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি অনুসারে যে পাঁচটি সর্ত স্থির হইল, তাতে, ঘোষণা করা হইল—

(১) জার্মানী ও রাশিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিবে না।

(২) কোন তৃতীয় পক্ষ এই দুইয়ের কাউকে আক্রমণ করিলে সেই পক্ষকে এদের কেউ কোন সাহায্য দেবে না।

(৩) প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি ওদের কাহারও বিরুদ্ধে জোট

১। The War—by Louis L. Snyder, P. 95-94.

* ইউরোপীয় কূটনীতির ইতিহাসে চাণক্যতুল্য খ্যাতির অধিকারী বিসমার্ক (১৮১৫-১৮৯৮) জার্মান সাম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠা দেন এবং তাকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করেন। তবে, রিবেনট্রপকে হিটলার কর্তৃক 'বিসমার্ক'রূপে অভিনন্দিত করা নিতান্তই বাগাড়ম্বর মাত্র।—লেখক।

পাকাইলে বা দলবদ্ধ হইলে (এনি গ্রুপিং অব পাওয়ার্স) সেই দলে এরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যোগ দিবে না।

(৪) পরস্পরের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সর্বদা সংযোগরক্ষা ও পরামর্শ করা হইবে।

(৫) কোন বিষয়ে বিরোধ বা মতভেদ উপস্থিত হইলে পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুতাপূর্ণ আলোচনার দ্বারা কিংবা সালিসির দ্বারা উহার মীমাংসা করা হইবে।

কিন্তু এই চুক্তির মধ্যে যে গোপনীয় অংশ বা 'সিক্রেট প্রোটোকল' ছিল, সেই গোপন সর্তগুলি সেদিনের পৃথিবীতে প্রকাশিত হয় নাই। মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে প্রথম সেই গোপন তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যার ফলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আর এক দফা নিন্দা ও গ্লানি সমালোচকদের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল।* রুশ-জার্মান চুক্তির এই গোপনীয় অংশে দেখা যায় যে বালটিক রাজ্যগুলি (ফিনল্যান্ড, এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া) এবং পোল্যান্ডের পূর্বাংশ 'জার্মানীর স্বার্থের বাহিরে' এবং 'সোভিয়েট স্বার্থের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছিল কিংবা সোজা কথায় পোল্যান্ডের আর একবার পার্টিশানে উভয়ের সম্মতি ছিল।'

কিন্তু এই চুক্তি নিয়া যত আলোড়নই ঘটিয়া থাকুক না কেন, এখানে বিশেষভাবে স্মরণে রাখা দরকার যে, এই চুক্তির মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে কোন বন্ধুতা বা মৈত্রীর প্রশ্ন ছিল না, এটা নিতান্তই ছিল 'অনাক্রমণ চুক্তি'—'নন্ এগ্রেসন প্যাক্ট'। অর্থাৎ পরস্পরের রাজ্য আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি। পরবর্তীকালে প্রকাশিত গোপনীয় দলিলে দেখা যায় যে, রিবেনট্রপ রুশ-জার্মান চুক্তির মুখবন্ধে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে দূরপ্রসারী বন্ধুতা সম্পর্কে একটি প্রস্তাবের বয়ান ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু স্ট্যালিন তাতে আপত্তি জানাইয়া বলেন যে, ছয় বছর ধরিয়া (১৯৩৩-১৯৩৯) নাৎসী গভর্নমেণ্ট যেভাবে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'বালতি ভর্তি কাদা' ছিটাইয়াছে, তাতে হঠাৎ সোভিয়েট জনগণের কাছে নিশ্চয়ই সোভিয়েট-জার্মান বন্ধুতার কথা ঘোষণা করা যায় না।

স্ট্যালিনের এই আপত্তির পর প্রস্তাবিত বয়ানটি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু সেজন্য উভয়পক্ষে খানাপিনা ও উৎসবের কমতি ঘটে নাই। ক্রেমলিনের কনফারেন্স কক্ষে সদিচ্ছামূলক বক্তৃতার ও 'স্বাস্থ্যপানের' এক বিচিত্র বান ডাকিল। এমনকি, জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ, যাঁর কথাবার্তায় কোনদিন হিউমার বা রসরসিকতার নামগন্ধ ছিল না, তিনিও স্ট্যালিনের সঙ্গে দুই একটা রসিকতার কথা পর্যন্ত বলিতে চাহিলেন। এমনকি, এই সদ্যস্বাক্ষরিত চুক্তি সম্পর্কে ফুয়ারের 'স্বাস্থ্য কামনা' করিয়া স্ট্যালিন প্রস্তাব করিলেন—

'I know how much the German nation loves its Fuehrer. I should therefore like to drink his health',

কিন্তু এই সমস্ত শিষ্টাচার ও আনন্দব্যঞ্জক কথাবার্তা নিশ্চয়ই পরবর্তীকালের ঘটনাবলী স্মরণ করিলে খুব হাস্যকর মনে হইবে। কারণ, ইতিহাসের নৃশংসতম

---

* এই সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার বক্তব্য ও অন্যান্য তথ্য হিটলার কর্তৃক রুশ জার্মান অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

যুদ্ধ এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করার মুহূর্তেও স্ট্যালিনের মনে সম্ভবত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশয় ও অবিশ্বাস ছিল। কেননা, ক্রেমলিনের পানভোজন শেষে পরিতৃপ্ত এবং উৎফুল্ল রিবেনট্রপ যখন বিদায় নিতেছিলেন, তখন স্ট্যালিন তাঁকে হঠাৎ এক ধারে ডাকিয়া নিয়া গিয়া বলিলেন—

'The Soviet Government take the new pact very seriously. He could guarantee on his word of honour that the Soviet Union would not betray its partner',

অর্থাৎ সোভিয়েট সরকার রুশ-জার্মান চুক্তিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করিতেছিলেন। সুতরাং স্ট্যালিন এই প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট তাঁদের চুক্তির অংশীদারের প্রতি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না।[১]

* * *

বলা বাহুল্য যে, পোল্যাণ্ড আক্রমণে কৃতসংকল্প হিটলার প্রধানতঃ একসঙ্গে দুই রণাঙ্গনের (পূর্ব ও পশ্চিমে) দায়িত্ব এড়াইবার জন্যই রশিয়ার সঙ্গে এই চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং স্ট্যালিনও প্রায় অনুরূপ কারণেই—অর্থাৎ পূর্বদিকে জাপান (১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালে মাঞ্চুকু ও বহির্মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার হাতে-কলমে যুদ্ধ হইয়াছিল) ও পশ্চিম দিকে জার্মানীর সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই এমন অভাবনীয় চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষরের সংবাদে ফ্রান্স ও বৃটেনের নাৎসী তোষণকারী নেতারা হতভম্ব হইয়া গেলেন। অবশ্য এর পরেও চেম্বারলেন আর একবার হিটলারের নিকট চিঠি দিয়াছিলেন এবং পোল্যাণ্ড আক্রমণে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, রুশ-জার্মান চুক্তি সত্ত্বেও বৃটেন পোল্যাণ্ডের প্রতি তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করিবে। কিন্তু হিটলার তাঁর জবাবে জানাইলেন যে, পোল্যাণ্ডের প্রতি চেম্বারলেনের এই প্রতিশ্রুতির দ্বারা পোল্যাণ্ডের ১৫ লক্ষ জার্মান বাসিন্দার প্রতি টেরোরিজমের মাত্রা চরমে উঠিবে মাত্র, আর কিছু লাভ হইবে না!

অর্থাৎ চেম্বারলেনের শেষ আবেদনও প্রত্যাখ্যাত হইল।

রুশ-জার্মান চুক্তির নীতিগত তত্ত্ব লইয়া একশ্রেণীর রাজনৈতিক মহলে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে মার্কিন অভিমত নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। মস্কোস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূত জোসেফ ডেভিস ১৯৪১ সালের ১৮ই জুলাই তারিখ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের উপদেষ্টা হ্যারি হপকিনসের নিকট যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই—

"১৯৩৬ সাল হইতে আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি এবং যতটুকু ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছি, তাতে আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্নমেণ্ট এবং উহার প্রেসিডেণ্টের পর পৃথিবীতে একমাত্র সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ছাড়া আর কেহই শান্তির ব্যাপারে হিটলারি বিপদ সম্পর্কে এত সচেতন ছিলেন না এবং অনাক্রমণকারী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সমষ্টিগত নিরাপত্তা ও মৈত্রী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও তাঁদের মত

১। উইলিয়াম শাইরার প্রণীত, The Rise and Fall of the Third Reich, P. 654-55

আর কেহই এতটা স্পষ্ট অনুভব করেন নাই। তাঁরা চেকোশ্লোভাকিয়ার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং এজন্য মিউনিক চুক্তির আগেই পোল্যাণ্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। কেননা, সন্ধিসর্ত অনুযায়ী চেকোশ্লোভাকিয়া রক্ষার্থ অগ্রসর হইতে হইলে পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া সৈন্য পাঠাইবার জন্য রাস্তা পরিষ্কার রাখা দরকার।···মিউনিকের পরেও ১৯৩৯ সালের সারা বসন্তকাল তাঁরা বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে সামরিক চুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার আপত্তি এবং বৃটেন কর্তৃক রাশিয়াকে গ্যারাণ্টি দানে অস্বীকারের জন্য ইহা সম্ভব হয় নাই। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট উপলব্ধি করিলেন (এবং এই উপলব্ধির মূলে যথেষ্ট যুক্তি আছে) যে, ফ্রান্স ও বৃটেনের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ, কার্যকরী এবং বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভব নহে। সুতরাং তাঁরা হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হইলেন।"[১]

১। Mission to Moscow—by Joseph E. Davies. P. 435-36,

অষ্টম অধ্যায়

পর্দার আড়ালে কূটনৈতিক নাটক

১৯৩৯ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকাল বহু বিদ্যুৎগর্ভ ঘটনায় সমাকীর্ণ ছিল এবং এই সময় লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, রোম ও মস্কো—এই সমস্ত রাজধানীর পররাষ্ট্র দপ্তর ও দূতাবাসগুলিতে বহু চমকপ্রদ সলাপরামর্শ, চক্রান্ত ও কূটনৈতিক কৌশল চলিতেছিল, যেগুলি তখনকার দিনের বাইরের জগতে অধিকাংশই অজ্ঞাত ছিল। যবনিকা-অন্তরালবর্তী এই বৃহৎ চাঞ্চল্যকর নাটকের অনেকখানিই প্রকাশ পাইয়াছে মুসোলিনীর জামাতা ও ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউণ্ট চিয়ানোর ডায়েরীতে, যিনি ১৯৪৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী মুসোলিনী কর্তৃক পদচ্যুত, পরে ভেরোনা জেলে বন্দী এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মৃত্যুবরণে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই প্রামাণিক ঐতিহাসিক দলিল ১৯৩৯ সালের আভ্যন্তরীণ চিত্রকে যেমন জীবন্ত করিয়াছে, তেমনই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফ্যাসিস্ট নায়কদের চিন্তা ও চরিত্র, ঘটনা ও পরিস্থিতির উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে। এই আলোক ইতিহাসের পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয় তেমনই জনসাধারণের পক্ষেও শিক্ষণীয়। এই ডায়েরী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ১৯৩৯ সালে বাইরের জগতে রোম-বার্লিন-টোকিও যতই ঢক্কানিনাদিত হইয়া থাকুক না কেন, আসলে অক্ষশক্তিবর্গের পরস্পরের মধ্যে মনের কোন মিল এবং গাঢ়তর কোন বিশ্বাস ছিল না। তবে, বাহ্যিক মতির মিল ছিল এই হিসাবে যে, যুদ্ধের দ্বারা লুঠতরাজের অংশ পাওয়া যাইবে, বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকাকে জব্দ করা যাইবে এবং সাম্যবাদের অগ্রগতিতেও বাধা দেওয়া যাইবে। কিন্তু যে মহৎ উদারনৈতিক মনুষ্যত্বের দ্বারা মানুষ জনকল্যাণের দিকে অগ্রসর হয় এবং বৃহত্তর সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য মহত্তর লক্ষ্যের দ্বারা চালিত হয়, অক্ষশক্তিবর্গের রাষ্ট্র গঠনে কিংবা উহার নায়কদের মানসিক সংগঠনে, এমনকি চরিত্রের মধ্যেও উহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। ফলে, লুণ্ঠনের অংশীদার ডাকাতদের মধ্যে যেমন সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিরোধ থাকে, রোম-বার্লিন-টোকিওর মধ্যেও তাহাই ছিল। মুসোলিনী ফ্যাসিজমের গুরু হওয়া সত্ত্বেও 'শিষ্য' হিটলারের দিগ্বিজয় যাত্রায় ও অপরিমিত ক্ষমতালাভে এবং ইউরোপে জার্মানীর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য ছিলেন অত্যন্ত ঈর্ষাকাতর। তাঁর অব্যবস্থিত চিত্ততা, দাম্ভিকতা এবং জনসাধারণের প্রতি অবজ্ঞাও ছিল প্রচুর। ব্যক্তিগত জীবনে মুসোলিনী যেমন ক্লারা পেটাসি নাম্নী এক রক্ষিতার প্রতি আসক্ত ছিলেন, (তাছাড়া বহু স্ত্রীলোকের সঙ্গে মুসোলিনীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল) হিটলারেও তেমনই একাধিক নারীর প্রতি আসক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এমনকি মুসোলিনী সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, শ্বশুর সম্পর্কে জামাতা এমন আভাসও দিয়াছেন।[১] সুতরাং

১। 'Ciano's Diary'—Published June. 1947 by William Heinemann Ltd. London, Page 189.

হিটলারেরও এই রোগ ছিল বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন। 'Hitler'—by Allan Bullock দ্রষ্টব্য।

এককালে যাঁরা আমাদের দেশে হিটলার মুসোলিনীর জয়গানে মুখরিত হইয়াছিলেন, তাঁদের সেই ধারণা যে নিতান্ত অজ্ঞাতপ্রসূত ছিল, তাতে সন্দেহ নাই।

চিয়ানোর ডায়েরী হইতে ১৯৩৯ সালের যবনিকা উত্তোলন করিলে দেখা যায় যে, মিউনিক চুক্তির পর ইউরোপে যে একটা বিষম দুর্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, এই অনুভূতি বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে আদৌ অস্পষ্ট ছিল না। সুতরাং জানুয়ারী মাসে মুসোলিনী প্রস্তাব করিলেন রোম-বার্লিন-টোকিওর কমিউনিস্টবিরোধী চুক্তিকে ত্রিশক্তির মৈত্রীবন্ধনে পরিণত করিতে। কিন্তু ১লা এপ্রিল জাপানী রাজদূত প্রস্তাব করিলেন যে, এই মৈত্রীতে আপত্তি নাই, তবে, জাপানের পক্ষে ইহা যে নিতান্তই একমাত্র মস্কোর বিরোধিতা, একথা লণ্ডন, প্যারিস ও ওয়াশিংটনে জানাইয়া দেওয়া হউক। (চিয়ানোর ডায়েরী পৃষ্ঠা ৬১)। কিন্তু ইতালী ও জার্মানী পশ্চিমের ইঙ্গ-ফরাসী ইত্যাদির বিরুদ্ধে মৈত্রী ও সঙ্ঘবদ্ধতা চাহিতেছিল, জাপানের মত কেবল মস্কোর বিরোধিতার মধ্যে ইহার লক্ষ্যকে সীমাবদ্ধ রাখাই সেই সময় তাদের উদ্দেশ্যের পরিপূরক ছিল না। প্রকৃতপক্ষে জাপানের দ্বিধা ও সংশয়ের জন্য এই মৈত্রীবন্ধনে বিলম্বও হইয়া গেল এবং মুসোলিনী এক সময় বিরক্ত হইয়া মন্তব্য করিলেন যে, জাপানীরা ইহাতে যোগ দিলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হইবে! (পৃষ্ঠা ৭৭)। সুতরাং শেষ পর্যন্ত জাপানকে বাদ দিয়াই নূতন রোম-বার্লিন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে গিয়া কাউণ্ট চিয়ানো দেখিতে পান যে, হিটলার রাত্রিবেলা বেশী ঘুমান না, বরং বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে আড্ডা দেন এবং সেই নৈশ আড্ডায় গোয়েবলসের স্ত্রী সর্বদাই উপস্থিত থাকেন। সেখানেই প্রথম তিনি শোনেন যে, হিটলার বড্ড বাজে বকেন এবং সিগরিড্ ফন ল্যাপাস নাম্নী একটি সুন্দরী তরুণীর প্রতি তিনি আকৃষ্ট এবং তাঁরা উভয়ে প্রায়ই ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া থাকেন। (পৃষ্ঠা ৯১)।

১৫ই মার্চ হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ায় মার্চ করিলে ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং চিয়ানো পর্যন্ত মন্তব্য করেন যে, জার্মানীর চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি বাক্যে বিশ্বাস কি? ফুরার অবশ্য পরে একটি 'বাণী' পাঠান এবং চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাসের নানা ছুতো দেখান। কিন্তু চিয়ানো মন্তব্য করিতেছেন যে, এই সমস্ত অজুহাত গোয়েবলসের প্রচারকার্যের পক্ষে ভালো হইতে পারে, কিন্তু 'বিশ্বস্ত ইতালীকে' এগুলির দ্বারা ধাপ্পা দিয়া লাভ কি? এদিকে মুসোলিনী অত্যন্ত বিমর্ষ হন, কেননা হিটলার আগাইয়া যাইতেছেন এবং তাও তাঁকে না জানাইয়া। সুতরাং গভীর ক্ষোভের সঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন—

The Italians would laugh at me; every time Hitler occupies a country he sends me a message! (পৃঃ ৪৬)।

অর্থাৎ যখনই হিটলার কোন দেশ দখল করেন, তখনই তিনি আমার কাছে একটা বাণী পাঠান।—এতে ইতালীয়ানরা আমার প্রতি হাসিবে! সমগ্র ইতালীর নিকট মুসোলিনী যে এভাবে হাস্যাস্পদ হইতেছেন, ইহার জবাবে কি করা যাইতে পারে? —আলবেনিয়া দখল এবং ইঙ্গ-ফরাসীর নিকট কর্সিকা, টিউনিস, জিবুতি ও সুয়েজ খাল দাবী। অথচ চিয়ানো লিখিতেছেন সমগ্র পৃথিবীর জনমত বিরূপ হইয়া পড়িতেছে এবং সমস্ত রাজধানী হইতেই তাঁর পররাষ্ট্র দপ্তরে উদ্বেগজনক টেলিগ্রাম আসিতেছে।

মুসোলিনী ভাবিতেছেন শেষ পর্যন্ত জার্মানী বলকান অতিক্রম করিয়া অ্যাড্রিয়াতিক উপসাগর ও ভূমধ্যসাগরে না পৌঁছায় এবং ইতালীর বদলে উহা 'জার্মান হ্রদে' পরিণত না হয়। কিন্তু জার্মান রাষ্ট্রদূত ফন ম্যাকেনসন ২০শে মার্চ তারিখ চিয়ানোর নিকট প্রতিশ্রুতি দেন যে ইহা নিতান্তই অসম্ভব। তখন 'সকালবেলার জার্মান বিদ্বেষী' মুসোলিনী অকস্মাৎ 'সন্ধ্যাবেলা' জার্মানীর প্রতি দরদী হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, 'এক্ষণে আর নীতি বদলাইতে পারি না। হাজার হউক, আমরা তো আর বেশ্যা নই।' (পৃষ্ঠা ৫২)

মুসোলিনীর এই অব্যবস্থিতচিত্ততা, একবার ঈর্ষাকাতর ক্ষোভ ও অন্যবার লোভার্ত মনোভাব আগাগোড়া ফুটিয়া উঠিয়াছে ইউরোপে জার্মানী ও হিটলারের দাপটের মুখে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্কোকে বাগে পাইয়া তাঁর এবং চিয়ানোর উল্লাসের অবধি ছিলনা। ১৬ই জানুয়ারী কাটালোনিয়ায় অগ্রগতি এবং বার্সিলোনার বিপদ আসন্ন দেখিয়া চিয়ানো বৃটিশ রাজদূত লর্ড পারথ্‌কে বলেন, "খবরদার, ফরাসীরা যদি বার্সিলোনার রেডদিগের (কমিউনিস্ট) পক্ষে হস্তক্ষেপ করে, তবে আমরা কিন্তু ভ্যালেন্সিয়া আক্রমণ করিব।... ইহার ফলে ইউরোপীয় যুদ্ধ বাধিলেও আমরা পশ্চাৎপদ হইব না।" এর আগের সপ্তাহে ফ্রাঙ্কোর কাছ হইতে মুসোলিনীর নিকট একটি বার্তা আসিয়াছিল এবং তাতে জয়ের আভাস ছিল। কিন্তু যে ভাষা ও ভঙ্গীতে বার্তাটি রচিত ছিল, তাহা পড়িয়া মুসোলিনী খুব খুশী হইয়া উঠেন এবং 'দি রিপোর্ট অফ এ সাব-অর্ডিনেট'— 'একজন অধস্তন কর্মচারীর রিপোর্ট'—নিজেই এই মন্তব্য করিয়া খুব আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী স্পেন হইতে আরও জয়লাভের সংবাদ আসে এবং জানা গেল যে কাটালোনিয়ায় জেনারেল ফ্রাঙ্কো বহু লোককে কচুকাটা করিয়া সাফ করিয়াছেন। অনেক 'এনার্কিস্ট এবং কমিউনিস্ট' ইতালীয়ানও ধরা পড়িয়াছে। এই রিপোর্ট পাইয়া 'ডুসে' হুকুম দিলেন, 'সবাইকে গুলী করিয়া হত্যা করো। মৃত ব্যক্তিরা গল্প বলিবার জন্য ফিরিয়া আসে না' (পৃষ্ঠা ৩৪)।

ইতিমধ্যে জার্মানীর প্রচারমন্ত্রী ডাঃ গোয়েবলসকে লইয়া বার্লিনে একটা কেলেঙ্কারি ঘটে। মুসোলিনী শুনিয়া বলেন, 'গোয়েবলসেরই অন্যায়, সে ফ্রোয়েলিকের (সিনেমা অভিনেতা) স্ত্রীকে ফুসলাইয়াছে বলিয়াই অন্যায়, এমন নহে। কিন্তু মুখ বাড়াইয়া চড় খাইতে গেল কেন?' (পৃষ্ঠা ২৯)। অবশ্য এই ঘটনার পর হতভাগ্য ফ্রোয়েলিককে বন্দীনিবাসে যাইতে হয়।...

কিন্তু জার্মানীর ক্রমবর্ধমান শক্তির জবাবে ইতালীরও কিছু না করিলে চলে না। সুতরাং আলবানিয়া দখলের প্ল্যান চলিতে লাগিল, বিশেষত ১৫ই মার্চ হিটলার কর্তৃক চেক রাজ্য গ্রাসের পর। ফ্যাসিস্টদের চিন্তাধারা কত ক্রূর, তাহা বুঝা যাইবে চিয়ানোর মনোভাব হইতে। ২৫শে মার্চ তারিখে তিনি লিখিতেছেন যে, আলবেনিয়ার ঘটনাবলী কোনদিকে যাইবে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। তবে মনে হইতেছে আলবেনিয়ার রাজা জোগ বশ্যতা স্বীকারই করিবে। 'কারণ, একটা বিষয়ে আমি খুবই হিসাব করিতেছি এবং তাহা এই—জোগের শীঘ্রই সন্তান লাভ হইবে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে, বস্তুতপক্ষে সমগ্র পরিবারকেই খুব ভালবাসেন। আমার বিশ্বাস, তিনি তাঁর প্রিয়-জনদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথাই সর্বাগ্রে বিবেচনা করিবেন। সুতরাং সরলভাবেই আমি স্বীকার করি যে, রাণী জিরালদিন (জোগের স্ত্রী) তাঁর নয় মাস গর্ভ লইয়া

পাহাড় জঙ্গল ডিঙ্গাইবার জন্য দৌড়াইতে থাকিবেন—একথা আমি ভাবিতেই পারি না।' (পৃষ্ঠা)

কিন্তু অনুন্নত ও অনুর্বর আলবেনিয়ার ৪টি পাহাড় গ্রাসের জন্য ইতালীর রাজা উৎসুক ছিলেন না। তিনি ইউরোপীয় সংকটের জন্য ভয় পাইতেছিলেন। তথাপি আলবেনিয়া অভিযানের হুকুম দেওয়া হইল এবং একটা বাহ্যিক চরমপত্রও পেশ করা হইল। ২রা এপ্রিল অপরাহ্ণ ৪টার সময় জানা গেল যে, রাজা জোগ আত্মসমর্পণ বা প্রতিরোধের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অর্পণ করিয়াছেন তাঁর মন্ত্রিসভার উপর। এদিকে মুসোলিনী হুকুম দিলেন ইতালীয় সৈন্যদিগকে আলবেনিয়ায় অবতরণ ও আক্রমণের জন্য। সেই মুহূর্তের কথা উল্লেখ করিয়া চিয়ানো লিখিতেছেন, টেলিগ্রাফ অফিস জানা গেল যে, আলবেনিয়ার রাজধানী টিরানা হইতে বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের অফিসে দীর্ঘ সাংকেতিক বার্তা প্রেরিত হইতেছে। আমরা এগুলিকে বন্ধ করিতে পারি না। তবে আমি আদেশ দিলাম যে, বার্তাগুলি পাঠাইতে বিলম্ব করা হউক এবং সাংকেতিক শব্দগুলি মধ্যে স্বেচ্ছায় কতকগুলি ভুল শব্দ বার বার যোগ করিয়া দেওয়া হউক। কারণ ইহার দ্বারা সময় পাওয়া যাইবে, যদিও আমি জানি যে, চেম্বারলেন ঘোষণা করিয়াছেন যে, আলবেনিয়ায় বৃটেনের কোন সুনির্দিষ্ট স্বার্থ নাই। সন্ধ্যা ৭টার সময় ইতালীয় প্রতিনিধি টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলেন, সাংকেতিক তারবার্তা পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে।···রাত্রি ৯টায় জার্মান রাষ্ট্রদূত ও যুগোশ্লাভ রাজদূতকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়া দেওয়া হইল। তাঁরা প্রসন্নচিত্তেই ইহা অনুমোদন করিলেন এবং একজন মন্তব্য করিলেন, শেষ পর্যন্ত জোগের অদৃষ্টও বেনেসের (চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট) মতই ঘটিতেছে।···রাত্রি সাড়ে দশটায় ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। ভোররাত্রে জোগের পুত্রলাভ হইল। কিন্তু এই পুত্র আর কতক্ষণ আলবেনিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী থাকিবে? (পৃষ্ঠা ৬২-৬৩)

তার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। রাজা জোগ রাজ্য ছাড়িয়া গ্রীসে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। আলবেনিয়ার মুকুট ভিক্টোর তৃতীয় ইমানুয়েলের শিরে শোভা পাইতে লাগিল এবং ১২ই এপ্রিল এই উপলক্ষে আলবেনিয়ার রাজধানীতে যে উৎসব হইল, তাতে সিয়ানো দেখিতে পাইলেন 'কয়েকজন দেশপ্রেমিকের চক্ষু ক্রোধে জ্বলিতেছে এবং কাহারও কাহারও চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। স্বাধীন আলবেনিয়ার আর অস্তিত্ব নাই!'[১]

হিটলারের দৃষ্টান্তে চেকোশ্লোভাকিয়ার মত মুসোলিনী আলবেনিয়া রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। কিরূপ সহজে ও নির্বিকারচিত্তে ইঁহারা অপরের স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে, তাহা এই আভ্যন্তরীণ চিত্রের বর্ণনা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

* * *

১৯৩৯ সালের বসন্তকাল হইতে পোল্যাণ্ড লইয়া সংকটের শুরু হইয়াছিল। চিয়ানোর ডায়েরীতে দেখা যায় যে, ইতালী এই ব্যাপারে জার্মানীর সহিত ভাগ্য মিলাইতে প্রস্তুত ছিল না। তবে, মুসোলিনী এই প্রশ্নেও ছিলে অস্থিরচিত্ত এবং অব্যবস্থিতচিত্ত, যদিও ইহাদের সকলের মনোভাবই জার্মানদের প্রতি বিরূপ ছিল। ১৬ই এপ্রিল রোম

১। সম্ভবত এই অতীত পটভূমিকার জন্যই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আলবেনিয়া চরম মতবাদী কমিউনিস্ট দখলে গিয়াছে।—লেখক।

নগরীতে হিটলারের দক্ষিণহস্ত গোয়েরিংয়ের সঙ্গে চিয়ানোর দুইবার সাক্ষাৎ ও আলাপ হইল। চিয়ানো লিখিতেছেন যে, গোয়েরিংয়ের মুখে তখন হইতেই যুদ্ধের কথা লাগিয়াছিল এবং অতি সতর্কতা সহকারে যুদ্ধের অয়োজনও চলিতেছিল। 'কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় সবচেয়ে বিশ্রী আমার লাগিতেছিল পোল্যান্ড সম্পর্কে তাঁর কথা বলার ভঙ্গী। এই যেন সেই সুর—যে সুর শুনিয়াছিলাম অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সময়।'

১৭ই এপ্রিল গোয়েরিং রোম ত্যাগ করিলেন এবং চিয়ানো তাঁকে স্টেশনে বিদায় দিয়া আসিলেন। কিন্তু চিয়ানোর মনে হইল বিপদের সংকেত আসিতেছে পোল্যান্ড হইতে। তবে, একথা ঠিক যে, পোলরা বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিবে না। 'ডুসেরও এই মত।' ২০শে এপ্রিল বার্লিন হইতে ইতালীর রাজদূত এটোলিকো জানাইলেন যে, 'পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে জার্মানীর আক্রমণ আসন্ন। ইহার অর্থ যুদ্ধ। জার্মানদের উচিত আমাদের সময় থাকিতে জানাইয়া দেওয়া। কারণ আমাদেরও প্রস্তুতি দরকার।' (পৃষ্ঠা ৭৩)

২৭শে এপ্রিল বার্লিন হইতে চিয়ানো জানিলেন যে, ফুরার পোল্যান্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি ও বৃটেনের সঙ্গে নৌচুক্তি বাতিল করিয়া দিবেন। ঘটনাটা অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া মনে হইল। ২৯শে এপ্রিল ইতালীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির প্রস্তাব হইল। কিন্তু ইতালীর সামরিক অবস্থা যে সন্দেহজনক ছিল, চিয়ানোও তা গোপন করেন নাই। তিনি লিখিতেছেন, 'মিলিটারি সর্বদাই নামের বাহার দেখাইয়া থাকে। তারা কেবল ডিভিসনের সংখ্যা বাড়ায়, কিন্তু আসলে এগুলি এত ক্ষুদ্র যে, একটা রেজিমেন্টের চেয়ে বেশী শক্তি কোন ডিভিসনের নাই। গোলাধারগুলিতে গোলাগুলীর অভাব। গোলন্দাজী শক্তি সেকেলে। বিমান মারা ও ট্যাঙ্ক মারা অস্ত্রের একেবারেই অভাব। সামরিক মহলে ধাপ্পা চলিতেছে, এমন কি ডুসেকে পর্যন্ত ধাপ্পা দেওয়া হইয়াছে। একজন বলিতেছেন, ইতালীর প্রথম সারির বিমান রহিয়াছে ৩০০৬; অপরজন বলিতেছেন মাত্র ৯৮২টি।' (পৃষ্ঠা ৭৯)

২৭শে মে তারিখ রোমের নবনিযুক্ত বৃটিশ দূত স্যার পার্সি লোরেন মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করিলেন ক্রমবর্ধমান ইউরোপীয় সংকট সম্পর্কে, কিন্তু মুসোলিনী 'প্রাচ্যের খোদাই করা পাথরের মূর্তির মত স্থির রহিলেন।' তিনি চেম্বারলেনকে এই বলিয়া আক্রমণ করিলেন যে, পোল্যান্ডের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে গ্যারান্টি দেওয়ায় বৃটেন এক বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। লোরেন প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু মুসোলিনীর মেজাজ ও কণ্ঠস্বর ভাল ছিল না। তিনি ইঙ্গ-রুশ মৈত্রী আলোচনার উপর তীব্র কটাক্ষ করিলেন। এই ব্যর্থ সাক্ষাৎকারের পর মুসোলিনী তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিয়ানোকে বলিলেন যে, তিনি একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। হিটলারের সহিত দেখা করিয়া এই স্মারকলিপি তাঁকে দেওয়া হউক এবং যুদ্ধ বাধিলে অক্ষশক্তিবর্গের পক্ষে যে মধ্য ইউরোপ ও বলকান অবিলম্বে দখলের প্রয়োজন, সে কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হউক।

৭ই জুলাই বৃটিশ দূত পার্সি লোরেন প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের একটি 'ব্যক্তিগত বাণী' বহন করিয়া আবার মুসোলিনী সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। এই বাণীতে ডানজিগ সম্পর্কে জার্মান দাবীর বিরোধিতা ছিল। কিন্তু মুসোলিনী যেন চটিয়াই ছিলেন।

তিনি বৃটিশ রাজদূতকে বলিলেন, 'চেম্বারলেনকে বলিবেন যে, যদি ইংলণ্ড পোল্যাণ্ড রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয় তবে ইতালীও তার মিত্র জার্মানীর পক্ষে অস্ত্রধারণ করিবে। (পৃষ্ঠা ১১৫)

কিন্তু বৃটিশ রাজদূতের নিকট এই সকল বাহবাস্ফোট করিলেও চিয়ানো এবং মুসোলিনী উভয়েই স্বীকার করিতেছেন যে, ইতালীর পক্ষে যুদ্ধযাত্রা সম্ভব নহে। এদিকে আগস্ট মাসের সংকট আগাইয়া আসিতে লাগিল। সুতরাং ১১ই আগস্ট স্যালজবার্গে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফন রিবেনট্রপ ও হিটলারের সঙ্গে কাউণ্ট চিয়ানো সাক্ষাৎ করিলেন। এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে চিয়ানোর ধারণা হইল যে, 'জার্মান নীতি সম্পর্কে রিবেনট্রপ কখনও তাঁর নিকট মন খোলেন নাই। বরং সর্বদাই এড়াইয়া গিয়াছেন। তাঁর বিবেক তাঁকে তাড়না করিতেছিল। কেননা, পোল্যাণ্ড সম্পর্কে জার্মানীর উদ্দেশ্য লইয়া রিবেনট্রপ এতবার মিথ্যা কথা বলিয়াছেন যে, তিনি চিয়ানোকে ঠিক ঠিক কি বলিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। তাঁরা যুদ্ধ করিতেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এমন কি জার্মানরা পোল্যাণ্ড সম্পর্কে যাহা চাহিতেছে, তার চেয়ে বেশী পাইলেও তারা যুদ্ধ করিবে। কেননা ধ্বংসের নেশা তাদের পাইয়া বসিয়াছে। চিয়ানো খুব সরলভাবে কথা বলিলেও অপরপক্ষ তাতে বিচলিত হয় নাই। চারিদিকে গম্ভীর আবহাওয়া ছিল। ডিনার টেবিলে বসিয়াও পরস্পরের মধ্যে কথা ছিল না। কেননা দুইপক্ষের কাহারও মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ছিল না।'

'হিটলারের ব্যবহার সহৃদয়তাপূর্ণ কিন্তু তাঁরও ভাবভঙ্গী অটল ও সংকল্প অটুট। তাঁর গৃহের বৃহৎ ড্রয়িং রুমে একটা টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া তিনি কথা বলিতেছিলেন—টেবিলের উপর কতকগুলি মানচিত্র বিছানো ছিল। তাঁর সামরিক জ্ঞান অত্যন্ত গভীর মনে হইল। ...কিন্তু তিনিও আঘাত করিতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোন যুক্তির দ্বারাই তাঁকে রোধ করা যাইবে না। তিনি ও মুসোলিনী তরুণ বয়স্ক থাকিতে থাকিতেই এই যুদ্ধ নিশ্চিতরূপ করা উচিত।" (পৃষ্ঠা ১২৪)

চিয়ানোর কাছ হইতে হিটলার ও রিবেনট্রপের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণী পাইয়া মুসোলিনী বিমর্ষ হইলেন। তিনি জার্মানীর নূতন জয়যাত্রায় হিটলারের হাতের যন্ত্র হইতে চাহিতেছিলেন না। চিয়ানোর মনে হইল যে, পোলিশরা নির্দোষ এবং জার্মানী পোল্যাণ্ডের পর হাঙ্গেরী গ্রাস করিয়া ইতালীকে বিপন্ন করিবে। মুসোলিনীর মনেও নানা সংশয় এবং দ্বিধা, আবার যুদ্ধজনিত লুণ্ঠনের লোভও আছে। ১৫ই আগস্ট উভয়ের মধ্যে ৬ ঘণ্টা ধরিয়া এই সমস্ত আলাপ হইল। এবং ১৬ই আগস্ট মুসোলিনী দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স নিশ্চিত যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। "যদি না করে, তবে আমিই ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সের কাছে এক চরমপত্র পাঠাইব এক তাল সোনা চাহিয়া—ফরাসীদের কাছে অন্য কিছুর তুলনায় সোনাই একান্ত প্রিয়!" (পৃষ্ঠা ১২৭)

ইতিমধ্যে ২০শে আগস্ট তারিখে চিয়ানো যখন স্টীমারযোগে সমুদ্রে হাওয়া খাইতে-ছিলেন তখন অকস্মাৎ এক জরুরী টেলিগ্রাম পাইয়া ফিরিয়া গেলেন রোমে এবং গিয়া দেখিলেন মুসোলিনী জার্মানীর দলে ভিড়িয়া পড়িবার জন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। চিয়ানো ক্রুদ্ধ হইলেন এবং খোলাখুলিভাবেই বলিলেন যে, ইতালী জার্মানীর সহযোগী এবং অংশীদার, কিন্তু হুকুম মানিবার চাকর নয়। 'এই চুক্তি ছিঁড়িয়া ফেলুন, এবং

হিটলারের মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারুন, তা'হলে জার্মানীর বিরুদ্ধে জেহাদের স্বাভাবিক নেতা হিসাবে ইউরোপ আপনাকে মানিবে। আপনি কি আমাকে আবার সালসবুর্গে যাইতে বলেন ?—আমি তাহাতেও প্রস্তুত। কিন্তু আমি জার্মানদিগকে উচিত কথা বলিব।

'Hitler will not tell me to put out my cigarette as he did Schuschnigg—

—হিটলার নিশ্চয়ই আমাকে সুশনিগের মত সিগারেট নিভাইতে বলিবার সাহস পাইবে না।'

পোল্যাণ্ড আক্রমণোদ্যত জার্মানীকে কেন্দ্র করিয়া ফ্যাসিস্ট শ্বশুর-জামাতার এই নাটকীয় কথোপকথনের পর স্থির হয় যে, রিবেনট্রপকে ব্রেনার গিরিবর্ত্মে আসিয়া চিয়ানোর সঙ্গে দেখা করিতে বলা হইবে এবং অক্ষশক্তির সহযোগী হিসাবে ইতালীরও যে সমান মর্যাদা ও সমস্ত কথা জানিবার সমান অধিকার আছে উহার উপর জোর দেওয়া হইবে।

চিয়ানো রিবেনট্রপকে টেলিফোন করিলেন (২১শে আগস্ট), কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। অবশেষে বৈকাল সাড়ে পাঁচটার সময় তাঁকে ফোনে পাওয়া গেল। চিয়ানো ব্রেনার গিরিবর্ত্মে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু রিবেনট্রপ বলিলেন যে, তিনি অবিলম্বেই সঠিক জবাব দিতে পারেন না। কেন না, মস্কো হইতে একটা জরুরী বার্তার জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছেন এবং সন্ধ্যাবেলা তিনি চিয়ানোকে টেলিফোন করিবেন।···

২২শে আগস্ট চিয়ানো লিখিতেছেন যে, গতকল্য রাত্রি সাড়ে দশটায় এক নূতন অঙ্ক (ইউরোপীয় নাটকের ?) আরম্ভ হইয়াছে। ফন রিবেনট্রপ তাঁকে টেলিফোনে জানাইয়াছেন যে, সীমান্তের গিরিবর্ত্মে দেখা করা অপেক্ষা ইন্সব্রাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎই ভালো। কেননা, সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য তাঁকে মস্কো যাইতে হইতেছে।

অতঃপর মুসোলিনীর সঙ্গে চিয়ানোর দীর্ঘকাল টেলিফোনে কথা হইল এবং চিয়ানো মন্তব্য করিলেন—

'There is no doubt the Germans have struck a master blow. The European situation is upset···'

নিঃসন্দেহে জার্মানী এক জবরদস্ত চাল চালিয়াছে এবং ইউরোপের পরিস্থিতি একেবারে উল্টাইয়া গিয়াছে।···মস্কোকে দিয়া অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সমতা রক্ষার চেষ্টা বানচাল হইয়া গিয়াছে। রাশিয়ার কার্যে কূটনৈতিক মহলে ধাঁধার সৃষ্টি হইয়াছে।

"২৩শে আগস্ট। দিনটা বিদ্যুৎগর্ভ ও বিপদে পরিপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্স নাকি হস্তক্ষেপ করিবেই। এদিকে টোকিওর টেলিগ্রামে প্রকাশ যে, জাপান রুশ-জার্মান চুক্তিতে অসন্তুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু জাপানের আর দোষ কি ? তাঁদের জার্মানরা এই পর্যন্ত কিছুই জানায় নাই।"

মুসোলিনীর নিকট চেম্বারলেনের শান্তিবার্তার সূত্র ধরিয়া চিয়ানো আর একবার আপোষের চেষ্টা করিলেন। ডুসে এই সর্ত দিলেন যে, ডানজিগ জার্মানীকে ফিরাইয়া দিতে হইবে এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই আপোষ-আলোচনা ও বৃহৎ শান্তি সম্মেলন

ডাকা হইবে। সুতরাং ডানজিগ ফেরৎ দেওয়ার ভিত্তিতে আপোষের প্রস্তাব লইয়া চিয়ানো বৃটিশ দূত লোরেনের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। "কিন্তু উত্তেজনার জন্য কিংবা উত্তাপের জন্য, যে কোন কারণেই হউক, একথা সত্য যে পার্সি লোরেন মূর্ছিত হইয়া চিয়ানোর কোলে পড়িয়া গেলেন! তিনি 'ল্যাভেটরিতে' (পাইখানা?) বিশ্রামের জায়গা পাইলেন!" (পৃষ্ঠা ১৩০-২)

ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে চিয়ানো সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু তিনিও নৈরাশ্যবাদী। বার্লিন হইতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টেলিফোনে জানাইলেন যে হিটলার বৃটিশ রাজদূতকে এক 'কর্কশ জবাব' দিয়াছেন। সুতরাং আর একবার শান্তির আশা নষ্ট হইল।

২৪শে আগস্ট মুসোলিনীও স্বীকার করিলেন যে, ইতালীর সামরিক অবস্থা অতি শোচনীয়। সুতরাং ছয় মাস পর্যন্ত 'নিরপেক্ষ' থাকা ছাড়া উপায় নাই। তথাপি ঘণ্টায় ঘণ্টায় মুসোলিনীর মত বদলাইতে লাগিল এবং কখনও কখনও "রণং দেহি" মূর্তিতে তিনি দেখা দিতে লাগিলেন। তাঁকে সামলানো চিয়ানোর পক্ষে এক কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। ২৫শে আগস্ট বেলা ২টার সময় হিটলার ডুসের নিকট এক বাণী পাঠাইলেন। বাণীটি যদিও তত্ত্বমূলক ভাষার আবরণে রচিত, তবু একথা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, শীঘ্রই পোল্যান্ডের উপর আক্রমণ আরম্ভ হইবে। এবং হিটলার চাহেন ইতালী যেন সমগ্র অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারে। হিটলারের এই বার্তার সূত্র ধরিয়া আপাততঃ ইতালীর পক্ষে যুদ্ধ এড়াইবার জন্য চিয়ানো বলিয়া পাঠাইলেন যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় সমরসম্ভার সরবরাহ করিলেই ইতালী যুদ্ধে যোগ দিবে। চিয়ানো এই জবাব পাঠাইলেন বার্লিনের ইতালীয় রাজদূত মারফৎ টেলিফোনযোগে।

রাত্রি সাড়ে ছটায় জার্মান রাষ্ট্রদূত চিয়ানোর সঙ্গে দেখা করিলেন এবং জানিতে চাহিলেন ইতালীর কি কি সমরসম্ভার প্রয়োজন। একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়ার জন্যই অনুরোধ করা হইল। জার্মান রাষ্ট্রদূতের (যিনি যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন) ধারণা যে এই তালিকা পাইলে হিটলারের উৎসাহে ভাঁটা পড়িবে।

২৬শে আগস্ট আবার বার্লিন হইতে তাগাদার পর তাগাদা আসিতে লাগিল—ইতালীর কি কি দ্রব্য চাই, জানিবার জন্য। মুসোলিনী ও সমর বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে একটা লিস্ট তৈরি হইল। —এতবড় তালিকা যে একটা ষাঁড়েরও ইহাতে প্রাণ যাইত, যদি সেই ষাঁড় পড়িতে জানিত।

'It is enough to kill a bull, if a bull could read it!'

(চিয়ানোর মন্তব্য, ১৩৫ পৃঃ) মোট সরবরাহের যে দাবী জানান হইল উহার পরিমাণ এক কোটি সত্তর লক্ষ টন এবং সতের হাজার মোটর লরী।

হিটলার অতি দ্রুত জবাব পাঠাইলেন এবং বলিলেন যে, আপাততঃ কেবল লোহা, কয়লা ও কাষ্ঠ এবং কয়েকটি বিমান-মারা ব্যাটারি দেওয়া যাইতে পারে। তবে, তিনি ইতালীর অসুবিধা বুঝিতেছেন এবং ইতালী বন্ধুভাবাপন্ন থাকিলেই চলিবে। অপরের সাহায্য ছাড়াই তিনি পোল্যান্ডকে সংহার এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে পরাজিত করিতে পারিবেন।

২৭শে আগস্ট বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব লর্ড হ্যালিফাক্স ইতালীকে জানাইলেন যে, হিটলার ইংলণ্ডের সঙ্গে একটা মৈত্রী গোছের চুক্তি করিতে চাহেন। কিন্তু চিয়ানো

এই সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না, সুতরাং হ্যালিফাক্সকে তিনি টেলিফোন করিলেন এবং জানিতে পারিলেন যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট হিটলারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতেছেন না, কিন্তু পোল্যাণ্ডকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা পালন না করিলেও চলিবে না।

ইতালীর অজ্ঞাতসারে বার্লিন ও লণ্ডনের মধ্যে এই সমস্ত ঘটায়, চিয়ানো ও মুসোলিনী উভয়েই জার্মানীর উপর চটিয়া গেলেন এবং তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত করিলেন।

২৯শে আগস্ট জার্মান ও পোল সৈন্যেরা বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল…

৩০শে আগস্ট বৃটিশ রাজদূত চিয়ানোকে সারাদিন টেলিফোনে খুঁজিলেন আপোষের সূত্র আবিষ্কারের জন্য…

৩১শে আগস্ট সকালবেলা বিশ্রী নিদ্রাভঙ্গ! বার্লিন হইতে ইতালীয় দূত নয়টার সময় টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলেন যে, পরিস্থিতি সাংঘাতিক, যদি অবিলম্বে নূতন কিছু না করা হয়, তবে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধ অনিবার্য। চিয়ানো মীমাংসার সন্ধানে তাড়াতাড়ি গেলেন মুসোলিনীর নিকট এবং তাঁর সহিত পরামর্শক্রমে হ্যালিফাক্সকে টেলিফোনে জানানো হইল যে, হিটলারকে যদি ডানজিগের মত একটা 'মোটা ঘুষ' দেওয়া হয়, একমাত্র তা হইলে ডুসে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন, 'খালি হাতে' কিছু করা সম্ভব নয়। বার্লিনের ইতালীয় দূতকেও একথা জানাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু সেখানেও নিরাশার মনোভাব। কিছুক্ষণ পর বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব জানাইলেন যে ডানজিগ সম্পর্কে ইতালীর প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আকাশ অন্ধকার হইতে গভীর অন্ধকার হইতে লাগিল…অন্তিম ব্যবস্থা হিসাবে প্রস্তাব করা হইল যে, ফ্রান্স ও বৃটেন ইত্যাদি মিলিয়া ৫ই সেপ্টেম্বর এক সম্মেলন ডাকা হউক। ভের্সাই সন্ধির যে সমস্ত ধারা ইউরোপীয় শান্তি নষ্ট করিতেছে, তাহা এই সম্মেলনে বিবেচনা করা হইবে। ফরাসী রাষ্ট্রদূতও প্রস্তাবটি সমর্থন করিলেন এবং বৃটেনকেও ইহা জানাইয়া দেওয়া হইল। তাড়াতাড়ি জবাব পাইবার জন্য চিয়ানো তাগিদ দিলেন। কিন্তু সারা দিন বৃটিশ গভর্নমেণ্টের কাছ হইতে কোন সংবাদই আসিল না। অবশেষে রাত্রি ৮-২০ মিনিটের সময় সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস ইতালীর পররাষ্ট্র সচিবকে জানাইলেন যে, লণ্ডন রোমের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। মুসোলিনী মন্তব্য করিলেন, ইহার অর্থ যুদ্ধ!…

বার্লিন হইতে হিটলারের ইস্তাহার পৌঁছিল। ইহাতে গত কয়েকদিনের পোল্যাণ্ড সংক্রান্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে। বুঝা গেল সমস্ত আলোচনাই নিষ্ফল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে বার্লিনের ইতালীয় দূতাবাস হইতে জানানো হইল, যে, বার্লিনে সংবাদপত্রের বিশেষ সংস্করণ বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে এবং সংবাদগুলির শিরোনাম এই—

'Poland refuses! Attack about to begin!'

ভোর রাত্রি ৫-২৫ মিনিটের সময় সত্যসত্যই আক্রমণ আরম্ভ হইল।…

এই অবস্থায়ও ২রা সেপ্টেম্বর আর একবার আপোষের কথা হইল, কিন্তু বৃথা।

বার্লিন দূতাবাস

১৯৩৯ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের ইউরোপীয় সঙ্কটের যে চিত্র আমরা রোম হইতে পাইলাম, নিঃসন্দেহে বার্লিনেও উহার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাইবে। সেখানকার ইঙ্গ-ফরাসী দূতাবাসের যে বিবরণী পররাষ্ট্রীয় দপ্তরে সঞ্চিত হইয়াছে, সেগুলি অনুসন্ধান করিলেও কাউণ্ট চিয়ানোর অনুরূপ কৌতুহলকর নাটিকার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

হিটলার কিভাবে যুদ্ধ বাধাইলেন, সেই সম্পর্কে ফরাসী গভর্নমেণ্টের সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯৩৮ সাল হইতেই রাইখ গভর্নমেণ্ট ফ্রান্স ও বৃটেনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া নিজেদের যুদ্ধযাত্রার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ফরাসী রাষ্ট্রদূত মঃ ফ্রাঁকয়েস-পসেঁট ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে বার্লিন দূতাবাস হইতে বিদায় লইয়া রোমের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বার্লিন হইতে বিদায় লইবার আগে তিনি বার্সেটসগ্যাডেনে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় হিটলার তাঁর নিকট গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় অভিযোগ করেন, কিন্তু ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য ঔৎসুক্য দেখান। পরে তিনি মন্তব্য করিতেছেন যে হিটলারের চরিত্র সম্পর্কে তাঁর কোন মোহ নাই। তাঁর মেজাজ অদ্ভুত, মতিগতি অত্যন্ত অস্থির। যে ব্যক্তি প্রকৃতির শোভা দেখিয়া মুগ্ধ, সেই ব্যক্তিই আবার বর্বরতার চরম পাগলামি দেখাইতে পটু—(capable of worst frenzies of the most savage exaltations !) কখনও কখনও দেখা গিয়াছে তাঁর পৃথিবী-জয়ের নেশা, কখনও বা আবার গভীর শান্তি। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁকে নিশ্চিত বুঝা গেল এবং তাহা এই যে, তিনি ইঙ্গ-ফরাসী ব্লকের মধ্যে কীলক প্রবেশ করাইয়া পশ্চিমের শান্তি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন, যাতে পূর্ব ইউরোপে তিনি স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইতে পারেন।*

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্সের সহিত চুক্তি করিতে গিয়াও জার্মান পররাষ্ট্রসচিব রিবেনট্রপ ফরাসী পররাষ্ট্রসচিব মঃ বনেতের নিকট অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় দেন। ইতিমধ্যে মঃ কলোন্দ্রে বার্লিনের ফরাসী রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন যে, 'ইতিমধ্যে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়া যায় এবং জার্মানী সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত একটা আপোষ মীমাংসার চুক্তি করিবে এবং হের ফন রিবেনট্রপের মতে পোলিশ রাষ্ট্রের মূলগতভাবেই কোন স্থায়ী রূপ নাই। বার্লিন ও মস্কোর মধ্যে আপোষের পথে পোল্যাণ্ডের ভাগ বাটোয়ারা অনিবার্য।'

ফ্রান্সের সরকারী বিবরণীতে আরও প্রকাশ যে, পোল্যাণ্ড উপলক্ষে বৃটেন এই প্রকার ইউরোপীয় যুদ্ধে নামিবে না, এই বলিয়া ৩০শে জুন তারিখ ফরাসী রাষ্ট্রদূতের মারফত ফ্রান্সকে ভয় দেখাইবারও চেষ্টা হইয়াছে। আবার ১৩ই জুলাই তারিখ ফরাসী গভর্নমেণ্টকে জানানো হইল যে পোল্যাণ্ড উপলক্ষে যদি কোন যুদ্ধ বাধে, তবে, উহার জন্য সম্পূর্ণরূপে ফ্রান্সই দায়ী হইবে।

আগস্ট মাসের আরম্ভে বার্লিনের ফরাসী দূতাবাস রিপোর্ট দিলেন যে সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইবে। ২৫শে আগস্ট তারিখ ফরাসী রাষ্ট্রদূত হিটলারের সঙ্গে দেখা করিলেন। কিন্তু দেখা গেল হিটলার অনমনীয়। তিনি বলিলেন,

* 'লণ্ডন টাইমস' ও 'স্টেটসম্যানে' প্রকাশিত ফরাসী সরকারের রিপোর্ট। ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪০।

"I shall not attack France, but if she enters into the conflict, I shall go on to the end. I have as you know, just concluded with Moscow an agreement which is not only theoritical but which I may describe as positive".*

হিটলার এভাবে সকল পক্ষকেই কূটনৈতিক ধাপ্পা দিতে ও ভয় দেখাইতে ছিলেন। কিন্তু জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণে কৃতসংকল্প ছিল বলিয়াই সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি অকস্মাৎ পররাষ্ট্রীয় নীতির এই ডিগবাজী ঘটিয়াছিল। যে কোন মূল্যে সোভিয়েট রাশিয়াকে পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে, হিটলারের ইহাই ছিল আসল উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যের মূল কারণ ছিল রণনৈতিক। ১লা জুন বার্লিনের ফরাসী রাষ্ট্রদূত মঃ কলোন্দ্রে তার গভর্নমেণ্টকে এই মর্মে রিপোর্ট দিলেন যে, তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, হিটলার জার্মান সেনাবাহিনীর সুপ্রীম কম্যাণ্ডের প্রধান অধ্যক্ষ জেনারেল কাইটেল এবং প্রধান সেনাপতি জেনারেল ব্রাউসিৎসের নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছেন—জার্মানী যদি অবিলম্বে ব্যাপক কোন যুদ্ধে নামে, তাহলে তাঁর পক্ষে জয়লাভ সম্ভব কিনা? উভয়েই এই প্রশ্নের জবাবে বলিয়াছেন যে, উহা নির্ভর করিতেছে রাশিয়ার যুদ্ধে যোগদান করা বা না করার উপর। জেনারেল কাইটেল জবাব দিয়াছেন—"হাঁ, যদি রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকে।" আর জেনারেল ব্রাউসিৎস উত্তর দিয়াছেন—'সম্ভবতঃ'। কিন্তু উভয়েই বলিয়াছেন যে, যদি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানীকে লড়িতে হয়, তা হইলে যুদ্ধে জয়লাভের আশা অত্যন্ত কম।[১]

সুতরাং আগস্ট মাসে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তির অনিবার্যতা হিটলার অনুভব করিলেন। কিন্তু মার্চ মাস হইতে বৃটেনের সঙ্গে যে টানাহেঁচড়া চলিল, তাতে দেখা যায় যে, জার্মানী যেন ইচ্ছা করিয়াই সংকটের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বার্লিনের বৃটিশ রাজদূত স্যার নেভিল হেণ্ডার্সন যুদ্ধ এড়াইবার এবং হিটলারকে 'যুক্তি সম্মত আপোষের' পথে আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজদূত হেণ্ডার্সন বার্লিন হইতে ২৮শে মে তারিখ বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে এই মর্মে রিপোর্ট দিলেন যে, গতকল্য তিনি ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিকট হের হিটলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও যেভাবে মিউনিক চুক্তি ভঙ্গ করিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করা হইয়াছে উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোয়েরিং এই বলিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিলেন যে, চেক প্রেসিডেণ্ট হাচা বার্লিনে আসিয়াছিলেন। সুতরাং চেক গভর্নমেণ্টের 'স্বাধীন' ইচ্ছানুসারেই ইহা ঘটিয়াছে। হেণ্ডার্সন তখন গোয়েরিংকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, ডাঃ হাচা যদি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরে সম্মত না হন, তবে, চেক রাজধানী বোমারুর দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া হইবে, এই ভীতি তিনি নিজেই দেখাইয়াছিলেন। গোয়েরিং অবশ্য একথা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এমনও বলিলেন যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারটা তিনি নিজেও জানিতেন না। কিন্তু সেই সময়েই তিনি গোয়েরিং-এর সঙ্গে কথাবার্তায় পোল্যাণ্ডের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সন্দেহাতুর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

হেণ্ডার্সন এই রিপোর্টের শেষে একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন, যা দ্বারা

---

* 'লণ্ডন টাইমস' ও 'স্টেটসম্যান' রিপোর্ট, ১৯৪০।

১। 'Battle of the World'—by Max Werner. Page 43.

নাৎসী নেতাদের মনোবৃত্তির আরও স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি লিখিতেছেন—

"আমি যখন বিদায় লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমাদের কথাবার্তা কিছুটা হৃদ্যতার দিকে মোড় ফিরিল। যদিও আমার চলিয়া আসার তাড়াহুড়ো ছিল, তথাপি গোয়েরিং আমাকে আরও অপেক্ষা করিবার জন্য তাগিদ দিলেন এবং ক্যারিনহলে তাঁর বাসগৃহের নূতন করিয়া যে প্রকাণ্ড কাঠামো তৈয়ার হইতেছে, অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে উহার নক্সা আমাকে দেখাইলেন। এক বিরাট ভোজনাগার তৈয়ারীর পরিকল্পনা হইয়াছে এবং উহাতে অবিশ্বাস্য রকমের অসংখ্য অতিথির বসিবার জায়গা করা হইয়াছে। সমস্ত বাড়ীটাই মার্বেল পাথরে তৈয়ারী হইবে এবং দামী পর্দা ঝুলানো হইবে। তিনি প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলিলেন যে, নভেম্বরের আগে বাড়ীটা সম্পূর্ণ হইবে না। যে সমস্ত পর্দা ঝুলানো হইবে, সেগুলিতে কি ধরনের চিত্র থাকিবে, তাহাও তিনি গর্বের সঙ্গে দেখাইলেন। এগুলি সমস্তই ছিল সম্পূর্ণ উলঙ্গ রমণীর ছবি, যদিও ঐগুলির নাম দেওয়া হইয়াছিল 'দয়া' 'পবিত্রতা' 'করুণা' ইত্যাদি। আমি মন্তব্য করিলাম যে, চিত্রগুলির অন্ততঃ বাহ্যিক চেহারা শান্তিপূর্ণ, কিন্তু এগুলির মধ্যে 'সংযম' কোথাও দেখিতেছি না!"[১]

জার্মান গভর্নমেণ্টের কর্ণধারগণের সহিত বৃটিশ দূত এভাবে ঘন ঘন দেখা করিতে লাগিলেন এবং ডানজিগ ও করিডোর সমস্যা লইয়া হিটলার যে সংকট সৃষ্টি করিতেছেন, উহার ফলে বৃটেনের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য এমন কথাও বার বার জানানো হইল। কিন্তু তাতে কোন ফল হইল না। ইতিমধ্যে ২২শে আগস্ট তারিখ ফন রিবেনট্রপের মস্কো যাত্রা ও রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের কথা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের কর্ণগোচর হইল। তখন চেম্বারলেন হিটলারের নিকট একটি ব্যক্তিগত পত্র লিখিলেন এবং তাতে স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন যে, সোভিয়েট-জার্মান চুক্তি সত্ত্বেও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট পোল্যাণ্ডের প্রতি তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন।

২৩শে আগস্ট স্যার নেভিল হেণ্ডার্সন হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন যে, হিটলার অত্যন্ত উত্তেজিত এবং আপোষের বিরোধী। তাঁর ভাষাও ইংলণ্ড এবং পোল্যাণ্ড সম্পর্কে অত্যন্ত উগ্র ও অতিরঞ্জিত ছিল। তিনি হেণ্ডার্সনের নিকট পোলদের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে, পোল্যাণ্ড হইতে এক লক্ষ জার্মান আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে, জার্মানদের উপর ভীষণ নির্যাতন হইতেছে। প্রত্যহ তিনি শত শত টেলিগ্রাম পাইতেছেন। হেণ্ডার্সন জবাবে বলিলেন যে, এই সমস্ত অত্যাচারের সংবাদ অতিরঞ্জিত। হিটলার বলিলেন যে, জার্মানদের ধরিয়া ধরিয়া পুরুষাঙ্গে অস্ত্রোপচার পূর্বক যৌন-ক্ষমতা রহিত করিয়া দেওয়া হইতেছে। স্যার নেভিল উত্তর দেন যে, তিনি অবশ্য একটি ঘটনার কথা জানেন। কিন্তু এই লোকটি (জার্মান) কামুকতা রোগগ্রস্ত ছিল। সুতরাং তাঁকে উপযুক্ত চিকিৎসাই করা হইয়াছে। হিটলার বলিলেন, 'একটি নয়, ছয়টি!'...

নেভিল হেণ্ডার্সন হিটলারকে জানাইলেন যে, জার্মানী যদি পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তবে যুদ্ধ অনিবার্য। হিটলার জবাব দেন যে, জার্মানীর তাতে কিছু যায় আসে না বরং ইংলণ্ডেরই ক্ষতি হইবে। জনমত তাঁর পিছনে এবং পোল্যাণ্ডকে

১। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত 'হাউ হিটলার মেড ওয়ার' নামক পররাষ্ট্রীয় দলীল সম্বলিত পুস্তিকার ১৪ পৃষ্ঠা।

এভাবে 'সাদা চেক' দেওয়ার ফলে যদি যুদ্ধ লাগে, তবে উহার জন্য ইংলণ্ডই দায়ী হইবে। কথাবার্তার শেষে হিটলার মন্তব্য করেন যে, তাঁর বয়স এক্ষণে ৫০ বৎসর হইয়াছে। সুতরাং ৫৫ বা ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ হওয়ার আগেই তিনি যুদ্ধ পছন্দ করেন।[১]

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ২২শে আগস্টের চিঠির জবাবে হিটলার জানাইলেন যে, পোল্যাণ্ডকে প্রতিশ্রুতি দান ও বৃটিশ কর্তৃক সামরিক সতর্কতা অবলম্বনের ফলে জার্মানীও তার সৈন্য সমাবেশ করিবে।...

আগস্টের সংকট আরও ঘনীভূত হইতে লাগিল। শান্তিরক্ষার জন্য পৃথিবীর চারিদিক হইতে আবেদন প্রচারিত হইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নায়ক প্রেসিডেণ্ড রুজভেল্ট, হল্যাণ্ডের রাণী উইলহেলমিনা, বেলজিয়মের রাজা এবং ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড লুক্সেমবুর্গ, নরওয়ে ও সুইডেনের রাষ্ট্রকর্ণধারগণ, মুসোলিনী এবং খৃস্টান ধর্মগুরু পোপ আপোষ মীমাংসা ও শান্তির জন্য আবেদন করিলেন।

তখন ২৫শে আগস্ট সকালে হিটলার বৃটিশ দূত হেণ্ডারসনকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁকে বিমানযোগে লণ্ডনে উড়িয়া গিয়া 'জার্মানীর বক্তব্য' বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট পেশ করিতে বলিলেন। এই 'বক্তব্য' হইতেছে— একবার পোল্যাণ্ডের প্রশ্নের মীমাংসা হইলেই বৃটেনের সহিত স্থায়ী বন্ধুত্ব হইবে। হিটলার এ বিষয়ে 'ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশ্রুতি দিতেও সম্মত আছেন এবং 'বৃটিশ সাম্রাজ্যও অক্ষুণ্ণ রাখা হইবে', যদি জার্মানীর উপনিবেশ সংক্রান্ত দাবীগুলি মানিয়া লওয়া হয়।

হেণ্ডার্সন 'আলোচনার দ্বারা মীমাংসার' উপর জোর দিলেন, কিন্তু হিটলার তাতে সম্মত হইলেন না। 'কেন না পোল্যাণ্ডের উস্কানির ফলে যে কোন মুহূর্তে জার্মানীর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হইতে পারে।' তিনি উল্লেখ করিলেন যে, আর একজন জার্মানেরও অস্ত্রোপচারের দ্বারা যৌনক্ষমতা রহিত করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে হিটলার আরও মন্তব্য করিলেন যে, আর একটি ইউরোপীয় যুদ্ধ বাধিলে একমাত্র লাভ হইবে জাপানের। তিনি স্বভাবতই একজন আর্টিস্ট (শিল্পী), পলিটিসিয়ান বা রাজনীতিক নহেন। যদি এই পোল্যাণ্ডের সমস্যা মিটিয়া যায়, তবে বাকী জীবনটা তিনি আর্টিস্ট হিসাবেই কাটাইবেন, যুদ্ধলিপ্সু হিসাবে নহে।

'...that he was by nature an artist, not a politician, and that once the Polish question was settled he would end his life as an artist and not as an warmonger—[২]

২৫শে আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় হেণ্ডার্সনের নিকট হইতে রিপোর্ট পাওয়ার পর রাত্রি ১১টার সময় বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব পোলিশ গভর্নমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন আপোষ নিষ্পত্তি আলোচনার জন্য 'নিরপেক্ষ মধ্যস্থ' নিয়োগ করিতে এবং প্রয়োজন হইলে অধিবাসী বিনিময়ের প্রস্তাবও আলোচনা করিতে।

বার্লিনেও ইহা জানাইয়া দেওয়া হইল এবং ২৮শে আগস্ট হিটলার ও হেণ্ডারসনের মধ্যে আর একবার সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু উভয়পক্ষে একই কথা ও একই নীতির পুনরাবৃত্তি ঘটিল। হিটলার বলিলেন তাঁকে জনমতের দাবী পূরণ করিতে হইবে,

১। পূর্বোক্ত পুস্তিকা, পৃষ্ঠা ১৯।
২। পূর্বোক্ত পুস্তিকা।

তাঁর সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত এবং যুদ্ধের জন্য উৎসুক এবং জনমত তাঁর পিছনে ঐক্যবদ্ধ।

তখন হেণ্ডার্সন হিটলারকে সোজা প্রশ্ন করিলেন যে, তিনি পোলদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলোচনায় রাজী কিনা এবং অধিবাসী বিনিময়ে প্রস্তুত কিনা? ইহার জবাবে তিনি নির্দিষ্ট কিছু বলিলেন না, রিবেনট্রপের দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন যে, ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং-এর সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে।… ২৯শে আগস্ট সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটের সময় হেণ্ডারসন হিটলারের নিকট হইতে এই জবাব পাইলেন যে, পোল্যাণ্ডের সঙ্গে 'প্রত্যক্ষ আলোচনার' জন্য ৩০শে আগস্ট অর্থাৎ পরদিনই একজন পোলিশ প্রতিনিধির বার্লিনে আসা চাই। বৃটিশ রাজদূত মন্তব্য করিলেন যে, ইহা চরমপত্রের মত শুনাইতেছে।…

রাত্রি ২টার সময় লর্ড হ্যালিফাক্স হেণ্ডার্সনকে জানাইলেন যে, অবিলম্বেই একজন পোলিশ প্রতিনিধিকে বার্লিনে হাজির করা কার্যত সম্ভব নহে। হেণ্ডার্সন উত্তর দিলেন যে, একথা স্থিরভাবে তিনি আগেই জানাইয়াছিলেন। কিন্তু হিটলার জবাব দিয়াছেন যে, ওয়ারশ' হইতে এরোপ্লেনে উড়িয়া আসিতে দেড় ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না।…

৩০শে আগস্ট রাত্রি দ্বিপ্রহরে ও ভোর রাত্রে লণ্ডন ও বার্লিনের মধ্যে দূতাবাস মারফত অনুরূপ বার্তা বিনিময় চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মধ্যরাত্রে রিবেনট্রপ হেণ্ডার্সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পোল্যাণ্ডের প্রতি জার্মান সর্তাবলীর এক দীর্ঘ ফিরিস্তি জার্মান ভাষায় ঝড়ের গতিতে পাঠ করিয়া গেলেন এবং উহার কোন নকলও বৃটিশ দূতকে দিতে সম্মত হইলেন না। কেননা, ৩০শে আগস্ট মধ্যরাত্রির মধ্যেও কোন পোলিশ প্রতিনিধি বার্লিনে আসেন নাই বলিয়া।

৩১শে আগস্ট রাত্রে বার্লিনস্থিত পোলিশ রাষ্ট্রদূত ওয়ারশ'র সঙ্গে বার্তা বিনিময় করিতে চাহিলেন। কিন্তু জার্মানরা ততক্ষণে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। হিটলার ঘোষণা করিলেন যে, যখন কোন পোলিশ প্রতিনিধি আপোষ আলোচনার জন্য বার্লিনে আসিলেন না, তখন বুঝিতে হইবে, তাঁর মীমাংসার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।…

১লা সেপ্টেম্বর ভোরবেলা জার্মান সৈন্যেরা পোলিশ সীমান্ত অতিক্রম এবং আক্রমণ করিল। অপরাহ্নে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন কমন্সসভায় সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিবৃত করিলেন এবং জার্মানীর প্রতি 'সতর্কবাণী' উচ্চারণ করিয়া এই ঘোষণা জারী করিলেন যে, যদি জার্মান গভর্নমেণ্ট অবিলম্বে পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সমস্ত আক্রমণাত্মক কার্যাবলী বন্ধ করিবার এবং সৈন্য প্রত্যাহারের সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি না দেন, তা হইলে পোল্যাণ্ডের প্রতি বৃটেনের যে দায়িত্ব রহিয়াছে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট দ্বিধাহীন চিত্তে তাহা পালন করিবেন।

ফরাসী গভর্নমেণ্টের সহিত একমত হইয়াই বৃটেন বার্লিনের রাষ্ট্রদূত মারফৎ হিটলারকে ইহা জানাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে ইতালী হইতে মুসোলিনী প্রস্তাব করিলেন ৫ই সেপ্টেম্বর এই মীমাংসা-সম্মেলন আহ্বানের জন্য। হিটলার ইহা বিবেচনার জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় চাহিলেন। কিন্তু তারপর আর কোন জবাব বার্লিন হইতে আসিল না।

তখন ওরা সেপ্টেম্বর ভোর পাঁচটায় বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বার্লিনের রাষ্ট্রদূতে স্যার নেভিল হেণ্ডার্সনকে নির্দেশ দিলেন যে, জার্মান গভর্নমেণ্টকে জানাইয়া দেওয়া হউক যে, যদি তাঁরা অবিলম্বে শত্রুতা বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি না দেন এবং যদি সকাল ১১টার মধ্যে সেই প্রতিশ্রুতি লণ্ডনে না পৌঁছে, তা হইলে 'উভয় রাষ্ট্র যুদ্ধনিরত' বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এই চরমপত্রের মেয়াদ ফুরাইয়া গেল বেলা ১১-১৫ মিনিটের সময়, প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন রেডিয়োযোগে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ফরাসী গভর্নমেণ্টও অনুরূপ ঘোষণা দিলেন। সমগ্র পৃথিবীতে এক নিদারুণ চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠা পরিব্যাপ্ত হইল এবং আমাদের কলিকাতায় সেই সংবাদ অপরাহ্ন বেলা পৌঁছিল। কলিকাতার দৈনিক পত্রিকাগুলির (অমৃতবাজার, যুগান্তর, আনন্দবাজার, স্টেটসম্যান ইত্যাদির) বিশেষ সংস্করণ এমন উত্তেজনার সৃষ্টি করিল যে, চারি পয়সার কাগজ আট আনায় পর্যন্ত বিক্রী হইল এবং হকার ও ক্রেতাদের মধ্যে মারামারি হইয়া গেল।

৪ঠা সেপ্টেম্বর সকালে বৃটিশ রাজদূত স্যার নেভিল হেণ্ডার্সন বার্লিন ত্যাগ করিয়া লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁদের যাত্রার আগে বৃটিশ দূতাবাসের চারিদিকে একটি ক্ষুদ্র জনতা জড়ো হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১৪ সালের (প্রথম মহাযুদ্ধ) মত কেহই শত্রুতার ভাব দেখায় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূত মিঃ কার্ক তাঁর মোটরে করিয়া স্যার নেভিল হেণ্ডার্সনকে স্টেশনে পৌঁছাইয়া দিলেন। হেণ্ডার্সন দেখিলেন যে, বার্লিনের রাস্তা জনশূন্য, যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া কোথাও কোন লক্ষণ দেখা গেল না।···

* * *

অথচ যে ডানজিগ বন্দর উপলক্ষে বাহ্যত এই যুদ্ধের শুরু, সেই ডানজিগও কিন্তু ভের্সাই সন্ধি অনুসারে জার্মানীর কাছ থেকে কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছিল এবং পোল্যাণ্ডের কর্তৃত্বে আনা হইয়াছিল। সুতরাং ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালে অবস্থাটা দাঁড়াইল এই ঃ জার্মানীর ডানজিগ ফেরৎ চাই, কিন্তু পোল্যাণ্ডও কিছুতেই ফেরত দিবে না। আবার পশ্চিমের তিন শক্তি ইতালী, বৃটেন ও ফ্রান্স ডানজিগ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট পন্থা গ্রহণে ইতস্তত করিতেছিল। কারণ, কোন শক্ত নীতির তাঁরা পক্ষপাতী ছিলেন না। অথচ তাঁদের নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, ডানজিগ নিয়া যুদ্ধ করার কোন অর্থ হয় না। কারণ, ডানজিগ যে জার্মানীরই প্রাপ্য এবং তাকেই ফেরৎ দেওয়া উচিত (অবশ্য পোল্যাণ্ডকে বাণিজ্যের রক্ষাকবচসহ) এই বিষয়ে তিন পশ্চিমী শক্তির কোন দ্বিমত ছিল না। আবার তিন রাষ্ট্রশক্তিই উপলব্ধি করিলেন যে, বিনাযুদ্ধে পোল্যাণ্ড ডানজিগের এক ইঞ্চিও ছাড়িয়া দিবে না, অপরপক্ষে আবার হিটলারও শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আশায় অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিবেন না। অথচ ইতালীর সঙ্গে জার্মানীর ছিল ইস্পাতের মত কঠিন চুক্তিবন্ধন, আর পোল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্স ও বৃটেন ছিল প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। সুতরাং ডানজিগ নিয়া খুব বিচিত্র অবস্থার উদ্ভব হইল। কারণ, তিন পশ্চিমী শক্তির কেউ ডানজিগ নিয়া যুদ্ধে যাইতে রাজী ছিলেন না। আবার বিবাদমান দুই পক্ষও ডানজিগ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই অবস্থাটা লক্ষ্য করিয়া বৃটিশ ঐতিহাসিক মিঃ টেলর মন্তব্য করিতেছেন যে, ডানজিগের আপদ না থাকিলেই শক্তিবর্গ খুশী হইতেন, তাঁরা নিজেরা এই সমস্যা উপেক্ষা করিতে চাহিলেন

এবং অন্যেরাও যদি উপেক্ষা করিতেন, তবে, তাঁরা বাঁচিয়া যাইতেন। কোন ফুস মন্তরে যদি ডানজিগ উড়িয়া যাইত, তবে, আরও ভালো হইত! সুতরাং পশ্চিমী শক্তিবর্গের অবস্থাই দাঁড়াইল নীচের এই মজাদার কবিতার ধাঁধার মত:

"As I was going up the stair,
I met a man who wasn't there
He was'nt there again today
I do so wish he'd go away;;".[১]

১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালে ইউরোপীয় কূটনৈতিক নাটকের এই ছিল ট্রাজিক প্রহসন এবং এই অবস্থার মধ্যেই ডানজিগ উপলক্ষে পোল্যাণ্ড আক্রমণ আরম্ভ হইল।

১। 'The Origins of the Second World War'—by A. J. P. Taylor—P. 306

নবম অধ্যায়

সামরিক চক্রান্তের গুপ্ত কাহিনী

যুদ্ধ বাধাইবার নাৎসী ষড়যন্ত্র

যদিও ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে জার্মানী হাতে-কলমে যুদ্ধ আরম্ভ করিল, প্রকৃতপক্ষে উহার আয়োজন চলিতেছিল অনেকদিন আগে হইতেই। ইউরোপে জার্মান 'মিলিটারিজম' বা সামরিকবাদ দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছিল। জার্মানী যখন ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত হয় নাই, তখনও প্রুশিয়ার ফ্রেডরিক দি গ্রেটের আমল হইতেই ইহার পত্তন (অষ্টাদশ শতাব্দী) এবং বিসমার্কের আমলে ইহার ভিত্তি দৃঢ় হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে প্যারিস দখলের দ্বারা জার্মান জিগীষা যে চরিতার্থতা লাভ করে, তাতে প্রুশিয়ার অভিজাত শ্রেণীর সামরিক উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তা অতীত ইতিহাসের কথা। জাপানে যেমন নির্দিষ্ট সামরিক গোষ্ঠীই রাষ্ট্রের প্রধান নিয়ামক ছিল, জার্মানীতেও তাই। এজন্যই জার্মানীর অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাসে ক্লাউসেভিৎস হইতে শুরু করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের লুডেনডর্ফ পর্যন্ত বহু খ্যাতনামা রণ-পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ ও সমরবিশারদ দেখা দেন, যাঁদের শিক্ষা ও প্রভাব ইউরোপ ছাড়াইয়া বহু দূরবর্তী জাপান পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় এবং ভের্সাই সন্ধির কঠোরতা যে নিদারুণ ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছিল, জার্মান রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে প্রভূত আলোড়ন আনিয়া তা কেবল হিটলারের শক্তিবৃদ্ধির পথই প্রশস্ত করে নাই, কাইজারের আমলের বিখ্যাত 'জেনারেল স্টাফ' বা সেনানীমণ্ডলীকেও প্রতিশোধ লইবার দিকে প্ররোচনা দিতেছিল। সুতরাং ১৯১৯ সালের পরেও প্রভাবশালী জার্মান সমরনেতা, শ্রমশিল্পের মালিক ও প্রুশিয়ার অভিজাত শ্রেণী কখনও মনেপ্রাণে শান্তি কামনা করেন নাই। অর্থাৎ ১৯১৮ সালের পরাজয় সত্ত্বেও জার্মান সামরিকবাদের মৃত্যু হয় নাই। যদিও ১৯৩৩ সালে হিটলারের নাৎসী দল কর্তৃক ক্ষমতালাভের পর জার্মানীকে লইয়া প্রকাশ্যে প্রভূত আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক জগতে হই-চই চলিতে থাকে, প্রকৃতপক্ষে প্রাক-হিটলারী যুগ হইতেই জার্মান সমর-নেতাদের মনে যুদ্ধের তৃষ্ণা ছিল। ফিল্ড মার্শাল ফন ব্লুমবার্গ, যিনি ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত (ফেব্রুয়ারী মাসে এই পদ হইতে হিটলার কর্তৃক অপসারিত হন) জার্মান সেনানীমণ্ডলীর বড়কর্তার পদে ছিলেন, তিনি মৃত্যুর আগে একটি স্বাক্ষরিত দলিলে এই মর্মে স্বীকারোক্তি করিয়া গিয়াছেন যে, হিটলারের ক্ষমতা লাভের পূর্ব হইতেই জার্মান সেনাপতিগণ আক্রমণাত্মক যুদ্ধের কথা চিন্তা করিয়া আসিতেছিলেন এবং নাৎসীবাদের মূল নীতিগুলির সহিত একমত ছিলেন। তাঁর মতে জার্মানীর সম্মুখে তিনটি ভূমিগত সংকটজনক প্রশ্ন ছিল—পোলিশ করিডোর, রুর অঞ্চল এবং মেমেল। 'জার্মান জেনারেল স্টাফের সমগ্র অফিসারবৃন্দ এবং আমি নিজে বিশ্বাস করিতাম যে, একদিন এই প্রশ্ন তিনটির মীমাংসা করিতে হইবে এবং দরকার হইলে ইহার

জন্য সশস্ত্র বলপ্রয়োগ করিতে হইবে। পোলিশ করিডরের প্রশ্নে জনসাধারণের শতকরা ৯০ জন অফিসারদের সঙ্গে একমত ছিলেন। পোলিশ করিডোর সৃষ্টির কলঙ্ক নিশ্চিহ্ন করার এবং পূর্ব প্রুশিয়ার বিপদ দূর করিবার জন্য যুদ্ধকে পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করা হইত, যদিও ইহার প্রয়োজনীয়তা বেদনাদায়ক ছিল। ইহারই মূল কারণস্বরূপ হিটলারের ক্ষমতালাভের ১০ বৎসর পূর্ব হইতেই গোপনে আংশিক অস্ত্রসজ্জা চলিতেছিল এবং নাৎসী শাসনের দ্বারা ইহা আরও ত্বরান্বিত হইয়াছিল'।[১]

ফিল্ড মার্শাল ব্লুমবার্গের মত একজন দায়িত্বশীল সেনানীর স্বীকারোক্তিকে নিশ্চয়ই তুচ্ছ করা যায় না এবং সমসাময়িক ইউরোপ ও জার্মানীর ইতিহাসের লক্ষণ দেখিয়াও ইহা সত্য বলিয়া মনে হয়। হিটলারী আমল হইতে জার্মানীর যুদ্ধায়োজন ও অস্ত্রসজ্জা যে প্রবলভাবে চলিতেছিল, সেই সম্পর্কে সন্দেহের কারণ নাই। কেবল ১৯৩৯ সাল হইতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংগ্রামগুলিই ইহার প্রমাণ নহে। রাশিয়া, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইতালী, ফ্রান্স, বৃটেন ও খাস জার্মানী—এই সমস্ত দেশের ১৯৩০ সালের পরবর্তী সামরিক সাহিত্য, রণশাস্ত্র এবং সমরবিশেষজ্ঞদের মতামতও ইহার জ্বলন্ত প্রমাণস্বরূপ। অবশ্য একমাত্র জার্মানীই যে যুদ্ধায়োজন ও অস্ত্রসজ্জা করিতেছিল, এমন নহে, কম-বেশী সমস্ত দেশেই দেশরক্ষা বাজেটের রাক্ষুসে ব্যয়-বৃদ্ধি এবং সামরিক খরচ প্রতি বৎসর বহুগুণ বাড়িয়া যাইতেছিল। কিন্তু বিশেষভাবে জার্মানী নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার, পররাজ্য গ্রাস ও এক বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য হিটলারের নেতৃত্বে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইতেছিল। জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী রণতৃষ্ণাকে প্রথম মহাযুদ্ধের অন্যতম নায়ক জেনারেল লুডেনডর্ফ একেবারে সার্মাগ্রক রাষ্ট্রধর্মের মধ্যে দীক্ষাদানের জন্য প্রচার করিতে থাকেন এবং রাষ্ট্রধর্ম ও রণধর্মকে অবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন। এই বিষয়ে তিনি রণপণ্ডিত ক্লাউসেভিৎসকেও পিছনে ফেলিয়া যান। 'টোটেলিটারিয়ান স্টেটের' পক্ষে 'টোটাল ওয়ার'ই একমাত্র কাম্য ও চরম লক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইল এবং এই আসুরিক মতবাদ এত ক্রূর যে, ইহা রাষ্ট্রজীবন ও সমাজজীবনের সমস্ত কিছুকে গ্রাস করিতেছিল। সুতরাং এই 'টোটাল ওয়ার'কে 'সর্বগ্রাসী যুদ্ধ' বলাই বাঞ্ছনীয়। ১৯৩৫ সালের জুন মাসের একটি জার্মান সামরিক পত্রিকার কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিলেই ইহার বীভৎস রূপ পরিষ্কার হইবে। ইহাতে বলা হইয়াছে—

"The War of the fututre will be totalitarian not only in the mobilisation of forces for prosecution, but also in the extent of its results, in other words, totalitarian War will end in totalitarian victory. Totalitarian Victory means the utter destruction of the vanquished nation and its complete and final disappearance from historical arena."[২]

অর্থাৎ সর্বগ্রাসী যুদ্ধে জয়লাভের দ্বারা পরাজিত জাতিগুলিকে পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করা হইবে। এই ভয়ংকর মতবাদ, যাহা চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুরলঙের আমলেও কেহ কল্পনা করে নাই, হিটলারের জার্মানী তাহাই গ্রহণ করিল। কেবল

১। 'The Nuremberg Trial'—by R. W. Cooper, Page 242.
২। 'The Military strength of the Powers'—by Max Werner P. 158

গ্রহণ নহে, ভবিষ্যতে অনুসরণেরও চেষ্টা করিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে অন্ততঃ ৫ কোটি লোক প্রাণ হারাইল। ইহার মধ্যে অন্ততঃ ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে ইউরোপীয় রণক্ষেত্রের বাহিরে। সমগ্র মনুষ্যজাতির ইতিহাসের পক্ষে ইহা অভাবনীয় এবং এই সমস্ত বর্বর, নৃশংস এবং বর্ণনাতীত ক্রূরতার জন্যই ১৯৪৬-৪৭ সালে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর যুদ্ধাপরাধের (ওয়ার ক্রাইমস) মামলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, যেগুলির মধ্যে 'নুরেমবার্গের বিচার' ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এই ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের হত্যার পিছনে ছিল নূতনতর নাৎসী সামরিক মতবাদের নৃশংসতা—এক কথায় যার নাম 'টোটাল ওয়ার।'

নুরেমবার্গের মামলার ফলে কেবল এই নিরাপরাধ লোকেদের হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ ঘটনাবলী এবং প্রমাণেরই উদ্ঘাটন হয় নাই, হিটলার ও নাৎসী দল কর্তৃক যুদ্ধ বাধাইবার বিস্ময়কর ষড়যন্ত্রের কাহিনীও প্রকাশিত হইয়াছে।* বার্লিনের পতন ও জার্মানীর আত্মসমর্পণের পর মার্কিন, বৃটিশ ও রুশ সমরকর্তাদের হাতে রাইখ গভর্নমেণ্টের প্রভুত পরিমাণ গুপ্ত দলিল, নথিপত্র এবং সরকারী নির্দেশনামা ও কাগজপত্র ধরা পড়ে এবং নুরেমবার্গের আদালতে এগুলি উত্থাপিত ও পরীক্ষিত হইয়াছিল যার মোট সংখ্যা ৫ হাজারেরও বেশী। এই প্রামাণিক দলিলগুলি (যার রচনা নৈপুণ্যের জন্য মিত্রপক্ষ জার্মানীকে প্রশংসা করিয়াছেন।) জার্মানীর পূর্ব সঙ্কল্পিত যুদ্ধ ও সামরিক চক্রান্তের কেবল জ্বলন্ত দৃষ্টান্তই নহে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসের উপরও অভুতপূর্ব আলোকসম্পাত করিয়াছে। বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য, আসামীদের জবানবন্দী এবং পাথিপত্র ও গুপ্ত দলিল হইতে যে কাহিনী জানা যায়, তাহা যে-কোন শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর।

এই মামলার শুনানী হইতে জানা যায় যে, হিটলারের পাল্লায় পড়িয়া জার্মানীর জনগণ ও যুবকসমাজ এমন পাগলামিতে বিকৃত হইয়াছিল যে, শেষ পর্যন্ত এই শ্লোগান দাঁড়াইল—

'The party is the Fuhrer and Fuhrer is Germany'

অর্থাৎ পার্টি হইতেছে ফুরার এবং ফুরারই জার্মানী! সুতরাং তিনি অবিসম্বাদী ক্ষমতার অধিকারী রূপে রণপ্রস্তুতি ও যুদ্ধায়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন্ তারিখ হইতে হিটলার এই যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন? হিটলারের ক্ষমতালাভের ১৮ মাস পরেই হাতে-কলমে এই আয়োজন শুরু হইল। এই সম্পর্কে নাৎসী জার্মানীর 'অর্থনৈতিক যাদুকর' ডাঃ শাকটের স্বাক্ষরিত একটি রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে এবং উহার তারিখ হইতেছে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ সাল। 'যুদ্ধের অর্থনৈতিক রণপ্রস্তুতির সমাবেশ'—রিপোর্টের ইহাই শিরোনামা এবং ইহাতে কিভাবে জার্মানীর সমগ্র অর্থনীতি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে উহার বিস্তৃত বিবরণী এবং নির্দেশ ও বিধি বিধান রহিয়াছে। ১৯৩৫ সালের ৩রা মে শাকট আর একটি স্মারকলিপিতে 'অস্ত্রসজ্জার জন্য অর্থব্যয় সম্পর্কে বিভিন্ন অসুবিধা ও বিঘ্নের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯৩৬ সালের ২৭শে মে তারিখে গোয়েরিং-এর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার এক

* ১৯৪৬ সালে নুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে ২২ জন প্রখ্যাতনামা (গোয়েরিং, রিবেনট্রপ, কাইটেল প্রভৃতি) নাৎসী প্রধান নায়কদের বিচার এবং অধিকাংশের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। ইহাই 'Nuremberg Trial' নামে অভিহিত।

বৈঠকে কাঁচামালের বদলে কি কি ব্যবহার করা যায়, তাহা লইয়া 'নিশ্চিত যুদ্ধ চালনার' দিক হইতে আলোচনা হইয়াছিল।[১]

সুতরাং ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৯ সাল, এই পাঁচ বৎসর গিয়াছে হিটলারের পক্ষে প্রস্তুতি ও আক্রমণের চক্রান্তজাল বিস্তারের সময় এবং এই সময়টিকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—প্রথমতঃ ১৯৩৪-৩৭ সাল, ভের্সাই সন্ধি ভঙ্গ হইতে রাইনল্যান্ড দখল করা পর্যন্ত এবং তারপর ১৯৩৭-৩৯ সাল সুনির্দিষ্ট আক্রমণাত্মক লক্ষ্য পূরণের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। এই নীতির সাক্ষ্যস্বরূপ ইউরোপীর ঘটনাবলী তো প্রমাণ দিতেছেই অধিকন্তু গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলিও ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। জেনারেল ফন ব্লুমবার্গ যখন দেশরক্ষা মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তখন ১৯৩৭ সালের ২৯শে জুন তিনি একটি দলিলে নির্দেশ দেন কিভাবে যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ আয়োজন করিতে হইবে। এই দলিলের নাম "ডাইরেকটিভ ফর ইউনিফাইট প্রিপারেশন ফর ওয়ার'। হইাতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মোটামুটি চারিদিকের রাজনৈতিক অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে যে, জার্মানীকে কোন দিক হইতে কেহ আক্রমণ করিবে এমন আশঙ্কার কোন কারণ নাই। প্রায় কোন জাতিরই বিশেষভাবে পশ্চিমের শক্তিবর্গের মনে যুদ্ধের কোন ইচ্ছাই নাই এবং কতকগুলি রাষ্ট্রের, বিশেষতঃ রাশিয়ার রণপ্রস্তুতির দৈন্য দেখিয়াও এই সিদ্ধান্তে পেঁছিতে হয়।[২]

কিন্তু লক্ষ্য করিবার এই যে, ১৯৩৭ সালের জুন মাসে ফন ব্লুমবার্গ যে নির্দেশ দেন, তাতে এক বৎসর আগেকার অর্থাৎ ১৯৩৬ সালের ২৬শে জুন তারিখের যুদ্ধ-প্রস্তুতির নির্দেশনামার উল্লেখ আছে এবং এই নূতন হুকুমের দ্বারা আগেকার নির্দেশ বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। এই নূতন বিধানগুলিতে ব্লুমবার্গ '১৯৩৭-৩৮ সালের সমাবেশকালের মধ্যে সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের সম্ভাবনায় প্রস্তুত থাকিবার' কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে বলেন। এমন কি যাহাতে অকস্মাৎ ও অতর্কিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে সেজন্য 'প্রকাশ্য ঘোষণা ছাড়াই সৈন্য সমাবেশের' (সোজা কথায় গোপনে) প্রস্তুতির উপর জোর দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, অস্ত্রসজ্জা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেও এই যুদ্ধ ঘটিতে পারে।

তারপর ব্লুমবার্গ বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাতে দেখা যায় যে অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ফ্রান্স—প্রধানতঃ এই তিনটি দেশ আক্রমণের কথা ১৯৩৭ সালে জুন মাসেই জার্মান হাই-কম্যান্ডের মাথায় ঢুকিয়াছিল। কিভাবে চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করিতে হইবে এবং কিভাবে আকমণের পথ সুগম করিবার জন্য স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক ঝগড়া বাধানো দরকার, অস্ট্রিয়াকে কখন আক্রমণ করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয় বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে বৃটেন, পোল্যান্ড এবং লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনায় জার্মানী যে জড়াইয়া পড়িতে পারে, ফন ব্লুমবার্গ তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। রাশিয়া এবং রুশ বিমানবহরের প্রতিও তিনি নজর রাখিয়াছিলেন। 'ব্লুমবার্গ ডাইরেকটিভ' এর সামরিক পরিকল্পনার ইহাই মর্মকথা।

১। "The Nuremberg Documents—by Peter De. Mendelssohn; Page-16-18

২। "Keesings Contemporary Archives (1946) The Nuremberg Trials; Page-7868-7869 etc.

কিন্তু সামরিক পরিকল্পনায় যাহা বলা হইয়াছে, উহার রাজনৈতিক রূপ কি ছিল? সোজা কথায় হিটলার এই সময় কি চিন্তা করিতেছিলেন এবং তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই বা কি ছিল? এই সম্পর্কে তাঁর একটি 'গোপন বক্তৃতার' পূর্ণ বিবরণী পাওয়া গিয়াছে। ১৯৩৭ সালের ৫ই নভেম্বর বার্লিনের মন্ত্রিভবনে ৬ জন প্রধান নায়কের বৈঠকে হিটলার যে বক্তৃতা দেন, তাঁর এডিকং কর্নেল হসজার উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। হিটলারের মতে তাঁর এই বক্তৃতা ছিল 'সর্বাপেক্ষা গুরুত্বসম্পন্ন' এবং উহা 'সাড়ে চার বৎসরের গভর্নমেণ্ট পরিচালনার অভিজ্ঞতা ও সুগভীর চিন্তার ফলস্বরূপ।' যদি তিনি অকস্মাৎ মারা যান, তবে উহা যেন তাঁর 'লাস্ট উইল অ্যাণ্ড টেস্টামেণ্ট' হিসাবে দেখা হয়।[১]

ইতিহাসের দিক থেকে এটা সত্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এতে তিনি জার্মানীর পররাষ্ট্রনীতি বিস্তারের মূল মর্মের উপর জোর দেন এবং বলেন, জার্মান জাতি ও উহার জনগণের নির্বিঘ্নতাবিধান ও রক্ষণাবেক্ষণই জার্মান নীতির উদ্দেশ্য। সাড়ে আট কোটি লোক লইয়া জার্মান জাতি গঠিত। এমন হোমজিনিয়াস (সম প্রকৃতিসম্পন্ন) জাতি যেমন আর কোথাও নাই, এত ঘনবসতিপূর্ণ দেশও আর নাই। সুতরাং অন্য যে কোন জাতির চেয়ে জার্মানীর বৃহত্তর 'লিভিং স্পেস' বা বাসভূমির দাবী যুক্তিসঙ্গত। রোমক সাম্রাজ্য বা বৃটিশ সাম্রাজ্য, সমস্ত কালের ইতিহাসেই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, কেবলমাত্র প্রতিরোধ চূর্ণ করিয়া এবং বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়াই নূতন নূতন ভূমি বিস্তার সম্ভব। সুতরাং জার্মানীর পক্ষে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, সর্বাপেক্ষা কম মূল্যে সর্ববৃহৎ ভূমি জয় কোথায় সম্ভব?

"Where the greatest possible conquest can be made at lowest cost".

জার্মান অর্থনীতি ও বাণিজ্যের দ্বারা যে ভবিষ্যৎ উন্নতি ও বিস্তার সম্ভব নহে, তাহা হিটলার আগেই বুঝাইয়া দেন এবং আমদানী ও রপ্তানীর সমুদ্রপথও বৃটেনের হাতে শ্রোতৃবর্গকে তাহা স্মরণ করাইয়া এক বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন। সুতরাং তিনি 'সর্বনিম্ন মূল্যে সর্ববৃহৎ জয়ের' কথা চিন্তা করেন এবং বলেন—জার্মানীর দুইটি ঘৃণ্য শত্রু ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কথা স্মরণে রাখিতে হইবে। ইউরোপের মধ্যস্থলে এক শক্তিমান জার্মান রাষ্ট্রকে তারা সহ্য করিবে না। সুতরাং ইউরোপে বা সমুদ্রপারে জার্মানীর বলবৃদ্ধিতে তারা নিশ্চয়ই বাধা দিবে। যখন ইংলণ্ড কোন সংকটে পড়িবে এবং জার্মান রাষ্ট্র শক্তিশালী ও সশস্ত্র, একমাত্র তখনই উপনিবেশ ফেরৎ পাইবার দাবী লইয়া 'গুরুতর আলোচনা' সম্ভব। বৃটিশ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিবে না এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বিজিত দেশগুলিতে হত নাই, তার চেয়ে বেশী আছে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে। সাড়ে চার কোটি বৃটন এই সাম্রাজ্য চিরদিন ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। খাস বৃটেনের তুলনায় সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা বিচার করিলে আনুপাতিক হার দাঁড়াইবে ১ এর অনুপাতে ৯। এই দৃষ্টান্ত হইতে জার্মান সাম্রাজ্য বিস্তার ও লোকসংখ্যা সম্পর্কে সাবধান হওয়া দরকার। জার্মানীর এই সমস্যা বলপ্রয়োগ ছাড়া মিটিতে পারে না এবং উহার জন্য বিপদের ঝুঁকি লইতে হইবে। ফ্রেডারিক দি গ্রেট ও বিসমার্কের যুদ্ধগুলিই ইহার প্রমাণ। অতএব বলপ্রয়োগের

১। The Nuremberg Documents Page-18-28

সমস্যায় প্রশ্ন উঠিতেছে 'কখন' এবং 'কিভাবে' (হোয়েন এ্যাণ্ড হাউ ?)—এই প্রসঙ্গে হিটলার তিনটি সম্ভাবনার ব্যাখ্যা করেন। প্রথম সম্ভাবনার কথা তিনি উল্লেখ করেন ১৯৪৩ হইতে ১৯৪৫ সালের মধ্যে। অর্থাৎ ৬ হইতে ৮ বৎসর পর। কিন্তু তাঁর মতে ১৯৩৭ সালের নভেম্বরের মধ্যেই জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর অস্ত্রসজ্জা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং সমরসম্ভার ও অস্ত্রসজ্জা আধুনিক। কিন্তু ইহার পর এগুলি 'সেকেলে' (আউট অফ ডেট) হওয়ার একান্ত আশঙ্কা রহিয়াছে এবং গোপন অস্ত্রগুলির গোপনীয়তা রক্ষা করা যাইবে না। ইতিমধ্যে অন্যান্য রাষ্ট্রও জার্মানীকে পিছনে ফেলিয়া যাইবে এবং তারা জার্মানীর কথা জানিতে পারিয়া পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। সুতরাং ১৯৪৩-৪৫ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না।

অতএব হিটলার আরও দুইটি সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করিলেন—যথা ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকটে ফ্রান্সের বিপদ এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় অক্ষমতা। দ্বিতীয়তঃ অন্য কোন রাষ্ট্রের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধিলে (ভূমধ্যসাগরে গোলমালের) সেই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ। এই দুই অবস্থার যে কোন একটি ঘটিলেই (ইহার মধ্যে শেষোক্ত অবস্থার সম্ভাবনার প্রতিই হিটলার জোর দেন) জার্মানী কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া ও অস্ট্রিয়া আক্রমণ আসন্ন হইবে। 'পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবার উদ্দেশ্যে আমাদের পার্শ্বদেশ নির্বিঘ্ন করিবার জন্য চেকোশ্লোভাকিয়া ও অস্ট্রিয়াকে নিশ্চয়ই একসঙ্গে আক্রমণ ও দখল করিতে হইবে। রাজনৈতিক ও রণনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য ইহাই হইবে আমাদের প্রথম লক্ষ্য।' চেকোশ্লোভাকিয়া দখল হইলে পোল্যাণ্ডও বেকায়দায় পড়িবে এবং 'পোল্যাণ্ডের সঙ্গে আমাদের চুক্তি ততক্ষণই বলবৎ থাকিবে, যতক্ষণ জার্মানীর শক্তি অটুট থাকিবে।' কিন্তু পোল্যাণ্ডের দিক হইতে আক্রমণের সম্ভাবনার কথাও মনে রাখা দরকার।[১]

ফুরার ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করেন যে, ইংলণ্ড এবং সম্ভবতঃ ফ্রান্সও ধরিয়া লইয়াছে যে, জার্মানীর হাতে ইতিমধ্যেই চেকোশ্লোভাকিয়া খতম হইয়া গিয়াছে। অতঃপর হিটলার পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলির কথা বিবেচনা করিয়া বলেন যে বৃটেন আর একটি যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে ইচ্ছুক নহে এবং বৃটেনের সমর্থন ছাড়া ফ্রান্সও বোধহয় বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে সাহসী হইবে না। অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করিলে জার্মানী যে খাদ্যের দিক হইতেও লাভবান হইবে, হিটলার এই তথ্য বুঝাইয়া দেন।

স্পেনের কথা উল্লেখ করিয়া হিটলার বলেন যে, সেখানে দ্রুত গৃহযুদ্ধের অবসান হইবে না। জেনারেল ফ্রাঙ্কো পূর্ণ বিজয় লাভ করুক, ইহাও হিটলারের ইচ্ছা নহে। তাঁর আসল ইচ্ছা হইতেছে এই যুদ্ধকে জিয়াইয়া রাখা এবং ভূমধ্যসাগরের গোলমাল বজায় রাখা। এই প্রসঙ্গে ইতালীকে শক্তিমান করা ও বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে তার দখল বজায় রাখাও জার্মানীর উদ্দেশ্য। হিটলার বিশ্বাস করেন না যে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ইতালী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পশ্চিম রণাঙ্গনে আত্মরক্ষার নীতি অবলম্বন করিবে, কিন্তু লিবিয়া হইতে উত্তর আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবে। হিটলার ভূমধ্যসাগরীয় যুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার পূর্ণ সুযোগ দেখিতেছেন।

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক

ফিল্ড মার্শাল ফন ব্লমবার্গ, স্থলবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল ব্রাউ-সিটৎস, নৌবাহিনীর এডমিরাল রায়েডার, বিমানবাহিনীর গোয়েরিং, পররাষ্ট্রসচিব ফন নিউর‍্যাথ এবং হিটলারের এডিকং কর্নেল হসব্যাচ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। হিটলার চার ঘণ্টারও বেশী সময় বক্তৃতা ও আলোচনা করেন। ১৯৩৭ সালের ৫ই নভেম্বরের এই ঘটনা—যখন জগতের লোক ফ্যাসিস্ট নায়কদের মতলব সম্পর্কে অজ্ঞতার অন্ধকারে ছিল। যেদিন হিটলার তাঁর সহচরবর্গের বৈঠকে ইংলণ্ড হইতে পোল্যাণ্ড পর্যন্ত যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিতেছিলেন, সেদিনই তিনি বার্লিনস্থিত পোলিশ রাষ্ট্রদূতকে এই নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, ১৯৩৪ সালের পোলিশ-জার্মান চুক্তি তিনি মানিয়া চলিবেন।

ইহার পর ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে বিভিন্ন প্ল্যান বা পরিকল্পনা অনুসৃত হইতে লাগিল এবং ফন নিউর‍্যাথের বদলে রিবেনট্রপ পররাষ্ট্র সচিব এবং ব্লমবার্গের বদলে কাইটেল সুপ্রীম কম্যাণ্ডের প্রধান কর্মকর্তার পদে নিযুক্ত হইলেন। কারণ ইহারা হিটলারী পরিকল্পনার বাড়াবাড়ির বিরোধীরূপে রক্ষণশীল বলিয়া বিবেচিত হইলেন। ইহার পরেই অস্ট্রিয়ার সঙ্গে 'মিলন' অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু কিভাবে বার্লিন হইতে এই 'মিলনের' চক্রান্ত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় জার্মান সমর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে 'প্ল্যান ওটো' নামে এক পরিকল্পনার দলিল হইতে। লালফৌজ কর্তৃক বার্লিন অভিযানের সময় বিমান-সচিবের দপ্তর হইতে এই দলিল ধরা পড়ে। ১৯৩৮ সালের ১১ই মার্চ বার্লিন হইতে গোয়েরিং এবং ভিয়েনা হইতে সেইস ইনকুয়ার্টের মধ্যে যে সমস্ত টেলিফোন-বার্তা বিনিময় হয় তাহা এই সমস্ত দলিলে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐদিন ডাঃ সুশনিগের গভর্নমেণ্ট পদত্যাগ করেন, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট মিকলাস প্রবল চাপ সত্ত্বেও অস্ট্রিয়ান নাৎসী দলনায়ক সেইস ইনকুয়ার্টকে চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করিতে অসম্মত হন। তখন গোয়েরিং সেইস ইনকুয়ার্টকে টেলিফোনযোগে এই হুকুম দেন যে, অবিলম্বে তাঁর অর্থাৎ গোয়েরিংয়ের নিকট যেন নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাঠানো হয়ঃ—

'সুশনিগ গভর্নমেণ্টের পদচ্যুতির পর অস্থায়ী অস্ট্রিয়ান গভর্নমেণ্ট (অর্থাৎ নাৎসী দল) অস্ট্রিয়াতে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন অপরিহার্য কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। সুতরাং জার্মান গভর্নমেণ্টের নিকট এই জরুরী আবেদন করা যাইতেছে তাঁরা এই গভর্নমেণ্টের কর্তব্য সম্পাদনে ও রক্তপাত নিবারণের জন্য যেন অবিলম্বে সাহায্য পাঠান এবং জার্মান সৈন্যদল যেন যথাসম্ভব শীঘ্র প্রেরিত হয়।'

এদিকে অস্ট্রিয়ার সীমান্তে জার্মান সৈন্যরা প্রস্তুত হইয়াই ছিল। সুতরাং এই 'আবেদন' (!) পাইবামাত্র তারা অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরে অভিযান করিল এবং ইহাই জার্মানীর সহিত অস্ট্রিয়ার মিলন বা Anschluss-এর কাহিনী।

কিন্তু এই অদ্ভুত ধাপ্পাবাজীর কাহিনী সম্পূর্ণ হইতে পারে না, লণ্ডন ও বার্লিনের মধ্যে আর একটি টেলিফোন-সংলাপ উল্লেখ না করিলে। ১৯৩৮ সালের ১৩ই মার্চ গোয়েরিং অস্ট্রিয়া দখলের পর বার্লিন হইতে লণ্ডনে রিবেনট্রপকে টেলিফোন করেন। রিবেনট্রপ তখন লণ্ডনে জার্মান রাষ্ট্রদূতের পদে ছিলেন। তাঁরা উভয়ে এমন-ভাবে টেলিফোনে দ্ব্যর্থব্যঞ্জক শব্দ ব্যবহার করিয়া কথাবার্তা বলেন, যাতে রিবেনট্রপ আসল ব্যাপারটা বুঝিতে পারেন, অথচ অস্ট্রিয়ার ব্যাপারে জার্মানী যে সম্পূর্ণ নির্দোষ,

তাহাও যাহাতে প্রচারিত হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবার ইঙ্গিত করেন। এই সমস্ত 'কূটনৈতিক টেলিফোন-বার্তা' সাধারণতঃ প্রত্যেক গভর্নমেণ্টই বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা শুনিয়া থাকেন (যাহাকে 'ট্যাপ' করা বলে)। গোয়েরিং ইহা জানিতেন এবং সেজন্যই কৌশলপূর্বক দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষা ব্যবহার করেন। যেমন, গোয়েরিং বলেন, 'জার্মানীর সহিত মিলনে অস্ট্রিয়ায় আনন্দের বান ডাকিয়াছে, বোধহয় রেডিওতে তুমি ইহা শুনিয়াছ ?' রিবেনট্রপ জবাব দেন, 'হ্যাঁ, অদ্ভুত ব্যাপার বটে।'

অতঃপর গোয়েরিং ও রিবেনট্রপ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে অস্ট্রিয়ার স্বেচ্ছাকৃত মিলনের আনন্দ বুঝাইবার জন্য আলাপ করিতে থাকেন এবং চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে বিন্দুমাত্র বিরোধেরও যে কারণ নাই, তাহাও বৃটেনের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করেন।

এই টেলিফোন সংলাপের শেষাংশ আরও অদ্ভুত এবং দস্তুরমত রোমাণ্টিক। যথা :—

গোয়েরিং—সর্বত্র অগাধ শান্তি। আর মুসোলিনী কি চমৎকার ব্যবহারই না করিয়াছেন।

রিবেনট্রপ—অত্যন্ত সুখবর। আমারও ইহাই ধারণা ছিল।

গোয়েরিং—ওহে, একবার এসো না? এখানে আবহাওয়া কি চমৎকার সুন্দর! আকাশ ঘন নীল। আমি অলিন্দে বসিয়া আছি, ঝিরঝিরে খোলা হাওয়া—বসিয়া বসিয়া কফি খাইতেছি। আর শুনিতেছি রেডিওতে অস্ট্রিয়ার আনন্দোচ্ছ্বাস।···

রিবেনট্রপ—'মার্ভেলাস'—অদ্ভুত।

গোয়েরিং—লিঞ্জ হইতে ফুরারের বক্তৃতা কি তুমি শুন নাই? এই মানুষটির বক্তৃতার শক্তি কি অসাধারণ! ভাষার উপর আশ্চর্য দখল। কিন্তু আনন্দে তাঁর কথা ফুটিতেছিল না। পরে ফুরার আমাকে টেলিফোনে বলেন, 'গোয়েরিং, তুমি কল্পনাও করিতে পারিবে না, আমার জন্মভূমি কি সুন্দর! আমি সেকথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম।'[১]

অস্ট্রিয়া গ্রাসের এই নাৎসী ধাপ্পাবাজীর তুলনা নাই। এই সম্পর্কে বহু দলিলপত্র পাওয়া গিয়াছে। স্বয়ং হিটলার, কাইটেল স্বাক্ষরিত একটি দলিলে অস্ট্রিয়া আক্রমণের সন্দেহাতীত চক্রান্ত ধরা পড়িয়াছে, উহা 'টপ সিক্রেট' বা 'সবচেয়ে গোপনীয়' চিহ্নিত ছিল। ইহার ৩৫টি কপি তৈয়ার হইয়াছিল। 'অটো প্ল্যান' সম্পর্কে সুপ্রীম কম্যাণ্ডের এই হুকুমনামার তারিখ ছিল—'বার্লিন, ১১ই মার্চ, ১৯৩৮—সময় রাত্রি ৮টা ৪৫ মিঃ।'

ইহার পর চেকোশ্লোভাকিয়ার পালা। ১৯৩৭ সালের নভেম্বরের গোপন বৈঠকে হিটলার অস্ট্রিয়ার সঙ্গেই ইহাকে আক্রমণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরে নাৎসী ষড়যন্ত্র সফল হওয়ায় তিনি ছল ও চাতুরীর সাহায্যে আগেই 'মিলন' ঘটাইলেন। ইহার পাঁচ সপ্তাহ পরে চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের জন্য 'প্ল্যান গ্রীন' অনুসৃত হইল এবং ১৯৩৮ সালের ২১শে এপ্রিল হিটলার এক গোপন বৈঠকে কাইটেলের সঙ্গে 'সবুজ নক্সা' লইয়া আলোচনা করিলেন। এই আলোচনার দলিলে দেখা যায় যে, 'কোন যুক্তি ও ছুতা না দেখাইয়া অতর্কিতে চেক দেশ আক্রমণ করিলে বিনামেঘে বজ্রপাতের মত পৃথিবী শুদ্ধ জনমত বিরুদ্ধে যাইবে।' সুতরাং রাজনৈতিক ছুতা

১। 'The Nuremberg Trial'— R. W. Cooper. Page 74—76.

আবিষ্কার করিতে হইবে। এজন্য রাজনৈতিক ও রণনৈতিক উভয় প্রকার প্ল্যান গৃহীত হইল। জেনারেল জড্‌লের ডায়েরী, হিটলারের মিলিটারি এডজুটাণ্ট জেনারেল স্মিডের গোপনীয় নোট এবং অন্যান্য বহু দলিলে ইহার বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। ইহার জন্য যে সাঙ্কেতিক সামরিক প্ল্যান স্থির হইল, সেই 'সবুজ নক্সা' অনুসারে ২নং, ৮নং, ১০নং, ১২নং ও ১৪নং সৈন্যবাহিনীর ফন রুণ্ডস্টেড, ফন বোক, ফন রাইকনাউ, ফন লীব এবং ফন লিস্টের অধীনে আক্রমণ চালাইবার কথা ছিল। মোট ২২টি পদাতিক, ৫টি মোটরায়িত, ৩টি যান্ত্রিক, ৩টি পার্বত্য এবং ৩টি হাল্কা ডিভিসন শক্তিশালী বিমানবহরের সহযোগিতায় এই আক্রমণ চালাইত। আর চেকোশ্লোভাকিয়ার অভ্যন্তর হইতে হেনলেইন ও সুদেতেন জার্মানরা 'আজাদী ফৌজের' সাহায্যে বিদ্রোহ ও নাশকতা ঘটাইয়া আক্রমণের পথ প্রশস্ত করিত। চেকোশ্লোভাক সৈন্যরা যে শক্তিশালী ছিল, একথা দলিলে স্বীকার করা হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের ৩০শে মার্চ হিটলার বলিয়াছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতেই আক্রমণের দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়াকে ধ্বংস করা হইবে এবং তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস যে, বৃটেন ও ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করিবে না। দলিলে প্রকাশ যে, তখনও পশ্চিমদিকে সিগফ্রিড লাইন সম্পূর্ণ হয় নাই এবং সেখানে তখন মাত্র ৫ ডিভিসন সৈন্য ছিল। তথাপি যদি বৃটেন ও ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করিত, তাহা হইলে 'প্ল্যান রেড' নামে যে পরিকল্পনা ছিল, তাহা অনুসরণ করা হইত এবং জার্মান সৈন্যবাহিনী যখন চেকোশ্লোভাকিয়াকে চূর্ণ করিত, তখন নাৎসী বিমানবহরের অধিকাংশই আগে ফ্রান্সকে এবং পরে বৃটেনকে অবশ করিয়া ফেলিত।

মিউনিক চুক্তির বহু আগে এবং তারপর আলোচনার সময়েও এই সমস্ত আক্রমণের নক্সা গৃহীত হইতেছিল, কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার জন্য ৬ মাস বিলম্ব ঘটে। তথাপি সেই সময় (১৯৩৮, ১লা সেপ্টেম্বর) জার্মান নৌ-বিভাগীয় দপ্তর হইতে 'ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধের একটি পরিকল্পনার খসড়া' তৈয়ারী হয় এবং তাতে ইঙ্গ-ফরাসীকে চূর্ণ করিয়া কিভাবে জার্মানীকে একটি সর্ববৃহৎ শক্তিতে পরিণত করিতে হইবে, সেই আলোচনা ছিল।

১৯৩৮ সালের ২৪শে নভেম্বর জেনারেল কাইটেল সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে এই মর্মে গোপনীয় নির্দেশ দেন যে, 'জার্মান সৈন্যদল কর্তৃক অতর্কিতে ডানজিগ দখলের উদ্দেশ্যে আয়োজন করিবার জন্য ফুরার হুকুম দিয়াছেন।' ডানজিগ ও পোল্যাণ্ড আক্রমণের জন্য যে পরিকল্পনা তৈয়ার হইয়াছিল, উহার সাঙ্কেতিক নাম ছিল 'প্ল্যান হোয়াইট' এবং ১৯৩৯ সালের ৩রা এপ্রিল কাইটেল নির্দেশ দেন যে, ১লা সেপ্টেম্বর হইতে যে-কোন সময়ে এই প্ল্যান অনুসারে কাজ করিবার জন্য সকলে যেন প্রস্তুত থাকে। ১১ই এপ্রিল, ১৯৩৯ হিটলার 'যুদ্ধের জন্য সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতির' হুকুম দেন এবং সশস্ত্রবাহিনী যেন ডানজিগ দখল ও 'প্ল্যান হোয়াইট' অনুসরণের জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকে। ২৩শে মে, ১৯৩৯, কাইটেল, গোয়েরিং, রায়েডার প্রভৃতি প্রধানগণের এক বৈঠকে হিটলার বলেন, 'ডানজিগ লইয়া বিতর্কের কোন অবসর নাই। ইহা হইতেছে পূর্বদিকে আমাদের বাসভূমি বিস্তারের প্রশ্ন মাত্র। সুতরাং পোল্যাণ্ডকে রেহাই দেওয়ার প্রশ্নও উঠে না এবং যতশীঘ্র সম্ভব পোল্যাণ্ডকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়া আমাদের উপায় নাই। এখানে আমরা চেকোশ্লোভাকিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটাইতে চাই না। যুদ্ধ অবশ্যই বাধিব

সুতরাং ২২শে আগস্ট, ১৯৩৯, হিটলার ওবারস্যালজবার্গে তাঁর সেনাপতিবৃন্দকে আহ্বান করেন এবং ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ 'প্ল্যান হোয়াইট' কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য হুকুম দেন। অর্থাৎ পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইল।

ধৃত দলিল ও কাগজপত্রে দেখা যায় যে, ঐদিন সেনাপতিবৃন্দের সভায় হিটলার বলেন, 'আমি পোল্যাণ্ডের সঙ্গে একটি গ্রহণযোগ্য সম্পর্ক স্থাপনে ইচ্ছুক ছিলাম। কেননা, প্রথমতঃ পশ্চিমদিকে যুদ্ধ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনার পরিবর্তন করিতে হইল। কারণ, স্পষ্ট বুঝা গেল যে, পশ্চিমদিকে সংঘর্ষ বাধিলে পোল্যাণ্ড আমাদিগকে আক্রমণ করিবে।···জার্মানীর পক্ষে বর্তমানে সময় খুব অনুকূল। ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের রাজনৈতিক জীবনে কোন প্রখর ব্যক্তিত্বশালী লোক নাই।—কোন জবরদস্ত লোক, কোন কাজের লোক নাই। ভূমধ্যসাগরে ইতালীর সহিত নৌ-পাল্লা দিতে গিয়া এই দুই দেশের অবস্থাই কাহিল হইয়াছে। অস্ত্রসজ্জা ও যুদ্ধায়োজন ইহাদের মোটেই উপযুক্ত নহে, পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সহিত ফ্রান্সের চিরাচরিত মৈত্রীর বন্ধন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ফ্রান্সের জন্মের হার অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে এবং প্রাচ্য খণ্ড লইয়া বৃটিশ নাজেহাল হইতেছে। এমন অনুকূল সময় দুই-তিন বৎসরের বেশী নাও থাকিতে পারে। সুতরাং যুদ্ধ বাধাইবার এই তো সুযোগ।···

'চেম্বারলেন এবং দালাদিয়েরের মত অতি তুচ্ছ কৃমি-কীট এত ভীত যে, তারা আক্রমণের সাহস পাইবে না। আমার কেবল একটা মাত্র ভয় আছে—চেম্বারলেন কিংবা তার মত আর কোন নোংরা শূকরের বাচ্চা কোন প্রস্তাব লইয়া আমার নিকট আসিতে পারে কিংবা মত বদলাইতে পারে। কিন্তু দরকার হইলে ব্যক্তিগতভাবে আমি পর্যন্ত তাকে ফটোগ্রাফারদের সামনে পেটে লাথি মারিয়া সিঁড়ি দিয়া ফেলিয়া দিব।··· পোল্যাণ্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল কেবলমাত্র সময় লইবার জন্য এবং রাশিয়ার সঙ্গে সদ্য সদ্য যে অনাক্রমণ চুক্তি হইয়াছে তাহাও—ভদ্রমহোদয়গণ, পোল্যাণ্ডের মত অনুরূপ দশাই ঘটিবে! স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নকেও চূর্ণ করিব।···পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণের নির্ভরযোগ্য কোন অজুহাত সৃষ্টির জন্য পোলিশ ইউনিফর্ম পরিহিত কয়েক কোম্পানী জার্মান সৈন্যকে উত্তর সাইলেসিয়ায় কিংবা বোহেমিয়া-মোরেভিয়ায় (চেকোশ্লোভাকিয়া) আক্রমণের হুকুম দেওয়া হইবে। দুনিয়ার লোক ইহা বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, তাহা আমি থোরাই গ্রাহ্য করি।···ভদ্রমহোদয়গণ, যাহা বহু শতাব্দীতে ঘটে নাই, এমন গৌরব ও সম্মান আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অন্যের চেয়ে অনেক বেশী তাড়াতাড়ি এবং অনেক বেশী নৃশংসতার সঙ্গে আঘাত করুন। পশ্চিম ইউরোপের নাগরিকবৃন্দ যেন ত্রাসে কাঁপিতে থাকে।···গতিবেগ ও নৃশংসতার মধ্যেই আমাদের শক্তি। চেঙ্গিস খাঁ হৃষ্টচিত্তে এবং স্বেচ্ছায় লক্ষ লক্ষ লোককে খুন করিয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস তাঁকে একজন মহান রাষ্ট্রনির্মাতা হিসাবেই দেখে। সুতরাং দুর্বল ইউরোপীয় সভ্যতা আমার সম্বন্ধে কি চিন্তা করে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি হুকুম দিয়াছি যে, যে-কোন ব্যক্তি একটি মাত্র শব্দও সমালোচনাস্বরূপ বলিবে, তাকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইবে। কিছুকালের জন্য আমি পূর্বদিকে কেবল 'মৃত্যুর সেরা ইউনিটগুলিকে' পাঠাইয়া এবং কোনোপ্রকার দয়ামায়া না দেখাইয়া পোলিশ ভাষা ও পোলিশ জাতির স্ত্রী-পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে সকলকে হত্যার জন্য হুকুম দিব।

...বেলজিয়াম ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান রাজ্যগুলি তাদের অতি-ভোজনপুষ্ট প্রজাদের উপর নির্ভরশীল দুর্বল পুত্তলিকা মাত্র। আর রুমানিয়ার রাজা ক্যারল তো কামরিপুর একটা গোলাম মাত্র।'

পোল্যাণ্ড আক্রমণের আগে গুপ্ত বৈঠকে হিটলারের এই বক্তৃতা। নাৎসী সভ্যতা ও রুচিবোধের ইহা নিদর্শন, সন্দেহ নাই। পোল্যাণ্ডের পর নরওয়ে এবং ডেনমার্ক সম্পর্কেও অনুরূপ ধাপ্পাবাজী এবং অপকৌশল অনুসৃত হইয়াছিল এবং ১৯৩৯ সালে বার বার এই দুই দেশের নিরপেক্ষতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪০ সালে হিটলার অতর্কিত আক্রমণের পর এই দুই দেশের উদ্দেশ্যে একটি 'স্মারকলিপি'তে বলেন যে, বৃটেন এবং ফ্রান্স আগেই দেশ দুইটি আক্রমণের সংকল্প করিয়াছিল এবং নরওয়ের গভর্নমেণ্ট তাতে সম্মতিও দিতেন।

হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং লাক্সেমবুর্গ সম্পর্কেও অন্ততঃ ১১-বার নিরপেক্ষতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেই সঙ্গেই এই সমস্ত দেশ আক্রমণের পরিকল্পনা চলিতে থাকে এবং ইহার সাঙ্কেতিক নাম ছিল "প্লান ইয়োলো"। ১৯১৮ সালের ২৫শে আগস্ট জার্মান বিমান-বিভাগের এক স্মারকলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম জার্মানীর হাতে গেলে ফ্রান্স ও বৃটেনের বিরুদ্ধে বিমান-যুদ্ধের প্রভূত সহায়তা হইবে। আর ১৯৩৯, ২৩শে মে রাইখ-চ্যান্সেলারির এক বৈঠকে হিটলার বলেন যে, বেলজিয়াম ও ওলন্দাজ বিমানঘাঁটিগুলি অবশ্যই দখল করিতে হইবে। নিরপেক্ষতা অগ্রাহ্য করিতে হইবেএবং ইংল্যাণ্ড যদি পোলিশ যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে, তবে, এক বিদ্যুৎগতি আঘাতে হল্যাণ্ড দখল করিয়া জুইডারজী পর্যন্ত আত্মরক্ষার লাইন টানিতে হইবে। ১৯৩৯-এর ৯ই অক্টোবর হিটলার এক হুকুমনামায় 'অধিকতর রণক্রিয়া অনুসরণের' উদ্দেশ্যে লাক্সেমবুর্গ, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম অতিক্রম করিয়া পশ্চিম রণাঙ্গনের উত্তর পার্শ্বদেশে আক্রমণাত্মক আয়োজনের' জন্য নির্দেশ দেন। ১৯৩৯-এর ১৫ই অক্টোবর জেনারেল কাইটেল সবচেয়ে 'গোপনীয়' এক নির্দেশে 'প্ল্যান ইয়োলো' অনুসরণের জন্য হুকুম দেন। কেননা, হল্যাণ্ডের যতটা দখল করা হইবে, রুর অঞ্চলও ততটা সুরক্ষিত হইবে।...

১৯৪০ সালের মে-জুন মাসে পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষীয় শোচনীয় পরাজয়ের পর যখন দেখা গেল যে, ইংল্যাণ্ড নতিস্বীকার করিতেছে না, তখন বৃটেন আক্রমণের সংকল্পও হিটলারের মনে উদিত হইয়াছিল। ১৯৪০ সালের ১৬ই জুলাই হিটলার কাইটেল ও জডলকে ইংল্যাণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনার নির্দেশ দেন। ধৃত গোপনীয় দলিলে দেখা যায় যে, ইহার সাঙ্কেতিক নাম ছিল 'Operation Sealion'। এই নির্দেশে হিটলার বলিলেন, 'ইংল্যাণ্ডের সামরিক অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক হওয়া সত্ত্বেও ইংরাজেরা যখন আপোষরফায় সম্মত হইবার কোন লক্ষণ দেখাইতেছে না তখন আমি ইংল্যাণ্ডে অবতরণ ও আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। এবং দরকার হইলে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হইবে। জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার জন্য ইংল্যাণ্ডকে ঘাঁটি হিসাবে যে ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা নষ্ট করাই ইহার উদ্দেশ্য। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই ইংল্যাণ্ড আক্রমণের রণক্রিয়ার সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহার প্রাথমিক সর্তই হইতেছে বৃটিশ বিমানবহরকে ধ্বংস করা, যেন জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে এই বিমানবহর আর শক্তি খাটাইতে না পারে।'

কিন্তু ১৯৪০ সালে বৃটেনের বিরুদ্ধে বিমান আক্রমণ চালাইয়াও জার্মানী তার উদ্দেশ্য পূরণ করিতে পারিল না। অর্থাৎ বৃটিশ বিমানবহরের প্রতিরোধ শক্তি তখনও নষ্ট হইল না। সম্ভবত এজন্যই হিটলার ইংল্যাণ্ড আক্রমণের আশা ত্যাগ করিয়া পূর্ব দিকে মন দেন। এই সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ গুপ্ত দলিল পাওয়া গিয়াছে, উহাতে লেখা ছিল—'ফুরারের হেড কোয়ার্টার, তারিখ ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪০।' এই গুপ্ত দলিলের মাত্র ৯টি কপি তৈয়ার হইয়াছিল এবং তাতে হিটলার, কাইটেল ও জডলের স্বাক্ষর ছিল। এই বিস্তৃত পরিকল্পনার সাঙ্কেতিক নাম ছিল 'ওপারেশন বারবারোশা'। ইহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪১ সালের ১৫ই মে রাশিয়া আক্রমণ করা হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে বলকান রাজ্যের যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের দিকে অভিযান করিতে যাওয়ায় রাশিয়া আক্রমণের তারিখ পিছাইয়া যায়।

এই সম্পর্কে সোভিয়েট-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তিকে নাৎসী নেতারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না। ১৯৪১ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী রিবেনট্রপ বার্লিনে জাপানী রাজদূতের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় বলিয়াছিলেন যে, এই চুক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে দুই রণাঙ্গনের দায়িত্ব এড়ানো।

১৯৪০-এর ৬ই সেপ্টেম্বর জডলের নির্দেশনামায় এবং জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের নথিপত্রে দেখা যায় যে, রাশিয়ার সন্দেহ উদ্রেক না করিয়া পূর্ব দিকে সৈন্য ও সমর-সম্ভার সমাবেশের এবং 'ছদ্মবেশে' বৃহৎ সৈন্য দল চলাচলের হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। বাহিরে দেখান হইতেছিল যে, ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে 'ওপারেশন সীলায়ন' বা বৃটেন আক্রমণ, কিন্তু আসলে তলে-তলে উদ্দেশ্য ছিল 'ওপারেশন বারবারোশা' বা রাশিয়া আক্রমণের আয়োজন। এমনকি ১৯৪০ সালের ১২ই নভেম্বর যখন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঃ মলোটোভ বার্লিনে ছিলেন এবং জার্মান গভর্নমেণ্ট এক সরকারী ইস্তাহারে স্বীকার করিলেন যে, 'রুশ-জার্মান আলোচনার ফলে প্রধান-প্রধান বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়া হইয়াছে', সেদিনই জার্মান বাহিনীকে হুকুম দেওয়া হইয়াছিল—'বৃটেনের সহিত যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই রাশিয়াকে এক দ্রুত অভিযানের দ্বারা পরাজিত করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে।' ১৯১৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী যখন বাইরে রুশ-জার্মান মিতালীর বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতেছিল, তখন হিটলার, কাইটেল ও জডল এক বৈঠকে স্থির করেন যে, 'অপারেশন বারবারোশা'-এর পরিকল্পনা এমনভাবে আরম্ভ হওয়া উচিত, যেন ইহা 'অপারেশন সীলায়ন'-এরই অংশবিশেষ। ১৯৪১-এর মার্চ মাসে রাশিয়াকে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করিয়া রোজেনবার্গের পরিচালনায় জার্মান কমিশনারগণ কিভাবে কিভাবে শাসন চালাইবেন, সেই প্ল্যান পর্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছিল। একটি দলিলে দেখা যায় যে, এডমিরাল রায়েডার স্বীকার করিয়াছেন যে, ইংল্যাণ্ড আক্রমণের শেষ প্রস্তুতির নাম করিয়া 'অপারেশন বারবারোশা'-এর যে পরিকল্পনা চলিতেছিল, লড়াইয়ের ইতিহাসে এত বড় ধাপ্পা আর হয় নাই।

স্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধের জার্মান নায়ক ফিল্ড মার্শাল ভন পাউলাস, যিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এবং পরে মস্কোতে 'স্বাধীন জার্মানী' আন্দোলনের নেতা হইয়াছিলেন, তিনি ন্যুরেমবার্গ আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, রাশিয়া আক্রমণের প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল গোয়েরিং, কাইটেল এবং জডল প্রভৃতির। ১৯৪০ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তিনি সর্বপ্রথম 'অপারেশন বারবারোশা'-এর কথা জানিতে পারিলেন এবং

১৯৪১-এর ৩রা ফেব্রুয়ারী এই সম্পর্কে চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিটলার অনুমোদন করিলেন। বলকান রাজ্যের যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া আক্রমণের পূর্বে জার্মানীর দক্ষিণ পার্শ্বদেশ মুক্ত করা।

আদালতে উত্থাপিত দলিল ও নথিপত্রে দেখা যায় যে, এই সমস্ত আক্রমণের চক্রান্ত এবং পরিকল্পনা ছাড়াও নাৎসী জার্মানীর নজর ছিল জিব্রাল্টার প্রণালী ও স্পেনের উপর। ১৯৪০ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখ হিটলার স্বাক্ষরিত এক গুপ্ত দলিলে 'অপারেশন ফেলিক্স' নামে এক বিস্তৃত পরিকল্পনা তৈয়ার হইয়াছিল এবং তাতে ফ্রাঙ্কোর সাহায্যে জিব্রাল্টার প্রণালী দখলপূর্বক বৃটিশ নৌবহরকে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা হইতে বিতাড়নের এক চক্রান্ত হইয়াছিল।[১]

যুদ্ধ বাধাইবার এই নাৎসী ষড়যন্ত্র কেবল ইউরোপ কিংবা ভূমধ্যসাগর ও অতলান্তিক মহাসমুদ্রের তীরেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ইহা ক্রমশ সুদূরে এশিয়া খণ্ডের প্রশান্ত মহাসাগর ও জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। ন্যুরেমবার্গের আদালতের গোপনীয় দলিলের স্তূপ হইতে সেই কাহিনীর মর্মও পাওয়া গিয়াছে।

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে জাপানের পররাষ্ট্রসচিব মাৎসুয়োকা বার্লিনে উপস্থিত ছিলেন এবং হিটলারের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বিশেষভাবে সিঙ্গাপুর আক্রমণ সম্পর্কে পরামর্শ করিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই যুদ্ধ হইতে তফাৎ রাখা যাইতে পারে কিনা, সেই সম্ভাবনার কথাও আলোচিত হইল। কিন্তু পরামর্শের পর দেখা গেল যে, সেই সম্ভাবনা কম, 'কেননা ৫ বৎসরব্যাপী সমুদ্রপথের নৌ-গেরিলা যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইতে পারে' এবং এ বিষয়ে জার্মান সাবমেরিন-যুদ্ধের কৌশল জাপানী সেনাপতিদের কাজে লাগিতে পারে। হিটলারের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ 'বাঞ্ছনীয় নহে'। তবে সেই অবস্থার উদ্ভব হইলে, আর উপায় কি? সমুদ্রপথে জার্মানীর সংগ্রামের দ্বারা বৃটিশ ও মার্কিন নৌবল প্রভুত পরিমাণে হ্রাস করা হইতেছে এবং 'কোন আমেরিকানই যাহাতে ইউরোপের মাটিতে অবতরণ করিতে না পারে' তেমন ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। সুতরাং জাপান যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জড়াইয়া পড়ে, তবে, জার্মানী সেই অবস্থার জন্যও প্রস্তুত। হিটলারের মতে জার্মানী আঘাত করিতেই অগ্রসর হইয়াছে। কারণ, ত্রিশক্তির (জার্মানী, জাপান ও ইতালী) বল নির্ভর করিতেছে একত্রে সম্মিলিত অভিযানের উপর। আর প্রত্যেকে এককভাবে অগ্রসর হইলে তাদের দুর্বলতার জন্য প্রত্যেকে পরাজিত হইবে। ইহার জবাবে মাৎসুয়োকা এই যুক্তি দেখান যে, তাঁর মতে আজ হউক, কাল হউক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিবেই। সুতরাং জাপানই আগে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিবে না কেন? তবে, জাপানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং 'কোন কোন বিপজ্জনক লোকের' জন্য এই সমস্ত গোপন রাখাই বাঞ্ছনীয়। হিটলার ইহাতে সম্মত হইলেন।

এদিকে জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে হিটলারের যখন এই ধরনের কথাবার্তা হইতেছিল, তখন উহার আগেই জার্মানীর পররাষ্ট্রসচিব রিবেনট্রপ জাপানের রাজদূত ওসিমার সঙ্গে ইউরোপীয় যুদ্ধের জার্মান বিজয়ের এক মনোহর চিত্র আঁকিতেছিলেন।

১। Keesings Contemporary Archives, (1946)—'The Nuremberg Trials' দ্রষ্টব্য।

২। 'The Nuremberg Trial'—by R. W. Cooper.

১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এই আলাপ-আলোচনার দলিলে প্রকাশ যে, রিবেনট্রপ ওসিমাকে বুঝাইলেন যে, দখলীকৃত ইউরোপে জার্মানী মাত্র পুলিশ বাহিনী দিয়াই কাজ চালাইতেছে। আসন্ন বসন্তকালে জার্মানীর ২৪০ ডিভিসন সৈন্য যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইবে। ইংল্যাণ্ডের আর কোন আশা নাই, বিমানযুদ্ধে সে ঘায়েল হইয়াছে এবং 'ফুরার' ইচ্ছা করিলে যে কোন দিন ইংল্যাণ্ড কাড়িয়া লইতে পারে। সেজন্য আক্রমণের নক্সাও হইয়াছে। সুতরাং জাপানের পক্ষে এমন সুবর্ণ সুযোগ ছাড়া উচিত নহে, সুদূরপ্রাচ্যে ইংলণ্ডের মূল্যবান ঘাঁটিগুলি দখলের এই তো সময়। সেখানে এক দ্রুত বিদ্যুৎগতি আঘাত করিলে আমেরিকা আর যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইবে না এবং অক্ষশক্তিবর্গ ইহাই চাহিতেছেন।

জাপানের সঙ্গে সামরিক চক্রান্তের এই গুপ্ত কাহিনীর আরও বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে জাপানী দূত ওসিমা কর্তৃক টোকিওতে প্রেরিত কতকগুলি কূটনৈতিক বার্তা ধরা পড়ায়। ১৯৪১ সালের ২৮শে নভেম্বর, অর্থাৎ পার্ল হারবার আক্রান্ত হইবার কয়েক দিন আগে রিবেনট্রপের সঙ্গে তাঁর আলোচনার রিপোর্টে প্রকাশ যে, জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী তখনও এশিয়াখণ্ডে 'নিউ অর্ডার' স্থাপনের এই সুবর্ণ সুযোগ না হারাইবার জন্য জাপানকে প্ররোচিত করিতেছিলেন। সিঙ্গাপুর আগে আক্রমণের জন্যই তিনি উস্কানী দিতেছিলেন। তখন জাপানী রাজদূত জিজ্ঞাসা করেন যে, ইহার ফলে যদি আমেরিকার সহিত যুদ্ধ বাধে, তবে জার্মানী আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে কি? রিবেনট্রপ এই প্রশ্নের জবাব এড়াইয়া গিয়া বলেন, 'President Rossevelt was a fanatic'—রুজভেল্ট একটা পাগল! সুতরাং নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না, তবে, তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ এড়াইয়া চলিবে।

রাশিয়ায় জার্মান আক্রমণের অবস্থা কি, ওসিমা একথা জিজ্ঞাসা করিলে রিবেনট্রপ জবাব দেন যে, হিটলারের এক্ষণে উদ্দেশ্য হইতেছে সোভিয়েট রাশিয়াকে চূর্ণ করা —আগেকার চেয়েও ব্যাপকতর ধ্বংসের প্ল্যান হইয়াছে। আগামী বসন্তে হিটলার স্ট্যালিনকে সুদূর সাইবেরিয়ায় তাড়াইয়া লইয়া যাইবেন! আর বৃটেন?—ওটা বোধ হয় আর আক্রমণের প্রয়োজন হইবে না। কারণ এক দিকে অন্যান্য রণক্ষেত্রে জার্মানীর জয়লাভ এবং অন্যদিকে চার্চিল ও শ্রমিক দলের (মিঃ বেভিনের নেতৃত্বে) মধ্যে ঝগড়ার ফলেই বৃটেনের পতন হইবে।[১]

বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মম্ভরীতা, দস্যুবৃত্তি ও পররাজ্যগ্রাসের যে জঘন্য নাৎসী চক্রান্তের কাহিনী ন্যুরেনবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতের সাক্ষ্য প্রমাণে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল (১৯৪৬-৪৭ সালে) তাতে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর পাঠক অবাক হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁদের মনে রাখা দরকার যে, ভারতবর্ষ বা প্রাচ্য দেশের মানুষ সম্পর্কে নাৎসী দলপতিদের মনোভাব যেমন হীন ছিল, তেমনই অক্ষশক্তিবর্গের নিজেদের মধ্যেও তেমন আন্তরিকতা ও সততা ছিল না। ইতালী, জার্মানী, জাপান পরস্পরকে বিশ্বাস করিত না, আগের অধ্যায়ে এবং বর্তমানের উদ্ধৃত বর্ণনা হইতেই পাঠক ইহার প্রমাণ পাইয়াছেন। কাউণ্ট চিয়ানোর ডায়েরীর উপসংহার হইতে এই বিষয়ে আরও প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে যখন পোল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া ইউরোপীয় সংকট চরমে উঠিতেছিল, তখন ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিয়ানো

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক।

স্যালজবার্গে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। চিয়ানো লিখিতেছেন, 'আমরা দুইজন বাগানে বেড়াইতে-বেড়াইতে জিজ্ঞাসা করিলাম—'ওহে রিবেনট্রপ, তোমরা কি চাও বলো দেখি ?—করিডোর অথবা ডানজিগ ?'—তিনি তাঁর নিষ্প্রাণ চক্ষু আমার দিকে তুলিয়া বলিলেন, 'এখন আর ওসব কিছু আমরা চাই না, আমরা যুদ্ধ চাই'—'উই ওয়াণ্ট ওয়ার'।

চিয়ানো লিখিতেছেন যে, হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াও কোন ফল হইল না। তাঁরা পোল্যাণ্ডকে সংহারের জন্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং যুদ্ধের জন্য কৃতসংকল্প ছিলেন। কিন্তু পোল্যাণ্ড আক্রমণের আগেও যেমন ইতালীর সঙ্গে পরামর্শ করা হয় নাই, রাশিয়া আক্রমণের আগেও কিছুই আলোচনা করা হয় নাই। 'ইতালীর প্রতি জার্মানীর নীতি ছিল মিথ্যা, ধাপ্পাবাজী এবং ছলনাপূর্ণ চক্রান্ত মাত্র। সমান অংশীদার হিসাবে কখনও আমরা ব্যবহার পাই নাই, পাইয়াছি গোলামের মত।'[১]

নিজেদের বন্ধুজনের প্রতি যাঁদের এই আচরণ ও মনোভাব, তাঁরাই হিটলারের নেতৃত্বে বাহির হইলেন মানুষের ইতিহাসের বৃহত্তম ধ্বংসে। পৃথিবীর ভয়াবহ দুর্দিন আরম্ভ হইল।

১। চিয়ানোর ডায়েরী, পৃঃ ৫৫৮।

দিগ্বিজয়ের পথে জার্মানী

প্রথম অধ্যায়

পোল্যাণ্ডে বিদ্যুৎগতি আক্রমণ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম বলি

ইউরোপে নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর উষালগ্নে হিটলারী সৈন্যবাহিনী পোল্যাণ্ডের সীমা অতিক্রম এবং স্বাধীন পোল রাজ্য আক্রমণ করিল। পৃথিবীতে সেই প্রথম আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের বিস্ময় শুরু হইল। বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে সেই চাঞ্চল্যকর সংবাদ ওয়ারশ' হইতে লণ্ডন হইয়া কলিকাতা নগরীতে পেঁছিল। জনসাধারণ তখনও ইহার দূরপ্রসারী ব্যাপকতা বুঝিতে পারিল না।

বলা বাহুল্য যে, অতর্কিতে এই আক্রমণ শুরু হইল। কোনও প্রকার 'চরমপত্র' দেওয়া বা পূর্বাহ্নে সতর্ক করিয়া দেওয়ার কোন নৈতিক দায়িত্ব নাৎসী নায়ক অনুভব করিলেন না। বোমারুর দ্বারা আক্রান্ত এবং বিধ্বস্ত শহরের অসামরিক পোলিশ জনগণ জানিতেও পারিল না যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। সকল সাড়ে ১০টার সময় লণ্ডনস্থিত পোলিশ রাজদূত বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানাইলেন যে, জার্মান সৈন্যেরা পোলিশ সীমানা চার স্থান দিয়া অতিক্রম করিয়াছে।

এদিকে হিটলার সমস্ত দোষ ইঙ্গ-ফরাসী ও পোলিশ গভর্নমেণ্টের উপর চাপাইতে চাহিলেন। পোল রাজ্য আক্রমণের পর হিটলার ১লা সেপ্টেম্বর রাইখস্টাগে (জার্মান পার্লামেণ্ট) এক বক্তৃতায় বলিলেন, "ভার্সাই সন্ধির হুকুমনামা যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে উহারই যন্ত্রণার পেষণে আমরা মাসের পর মাস পিষ্ট ছিলাম—এই সমস্যা এক্ষণে আমাদের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ডানজিগ ও করিডোর আগেও জার্মানীর ছিল, এখনও উহা জার্মানীর।"

পোলরা জার্মানদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার করিতেছিল, এই অভিযোগ করিয়া তিনি বলেন যে, তথাপি তিনি আপোষ-মীমাংসার চেষ্টায় ছিলেন। 'গত দুইদিন আমি সারাক্ষণ অপেক্ষায় ছিলাম, দেখি পোলিশ গভর্নমেণ্ট কোন প্রতিনিধি পাঠানো সুবিধাজনক বলিয়া মনে করেন কিনা। কিন্তু গতকল্য রাত্রি পর্যন্ত কোন প্রতিনিধিই আসিল না…যদি জার্মান গভর্নমেণ্ট এবং উহার নেতাকে এই ধরনের আচরণ সহ্য করিতে হয়, তবে, রাজনীতির পৃষ্ঠা হইতে জার্মানীর নাম মুছিয়া ফেলাই ভালো। কিন্তু আমার ধৈর্য এবং শান্তির জন্য আমার গভীর দরদকে যদি দুর্বলতা, এমনকি কাপুরুষতা মনে করা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে ভুল বুঝা হইবে। সুতরাং গতকল্য রাত্রে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে জানাইয়া দিয়াছি যে, এরূপ অবস্থায় পোলিশ গভর্নমেণ্ট আপোষ আলোচনার জন্য আন্তরিক ইচ্ছুক বলিয়া আমি মনে করি না।'

পশ্চিমের রাষ্ট্রপুঞ্জ যে কোন ঘোষণাই দিক না কেন, তাতে হিটলারের মতে আর ইতস্ততঃ করিবার সময় নাই। 'জার্মানী পশ্চিমদিকে কিছুই চাহিতেছে না এবং ফ্রান্সের

সঙ্গে তার সীমানা চূড়ান্ত বলিয়াই মনে করে।' ১৯১৪ সালের পুনরাবৃত্তি যাহাতে না ঘটে, তজ্জন্য তিনি সোভিয়েটের প্রতি চুক্তিতে অভিনন্দন জানান এবং প্রতিশ্রুতি দেন।

'স্ত্রীলোক ও শিশুদের বিরুদ্ধে আমি কোন যুদ্ধ করিব না। আমি আমার বিমানবহরকে কেবলমাত্র সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখিবার জন্য হুকুম দিয়াছি। কিন্তু যদি শত্রুপক্ষ মনে করে যে, সে ইহার সুযোগ লইয়া যে কোন
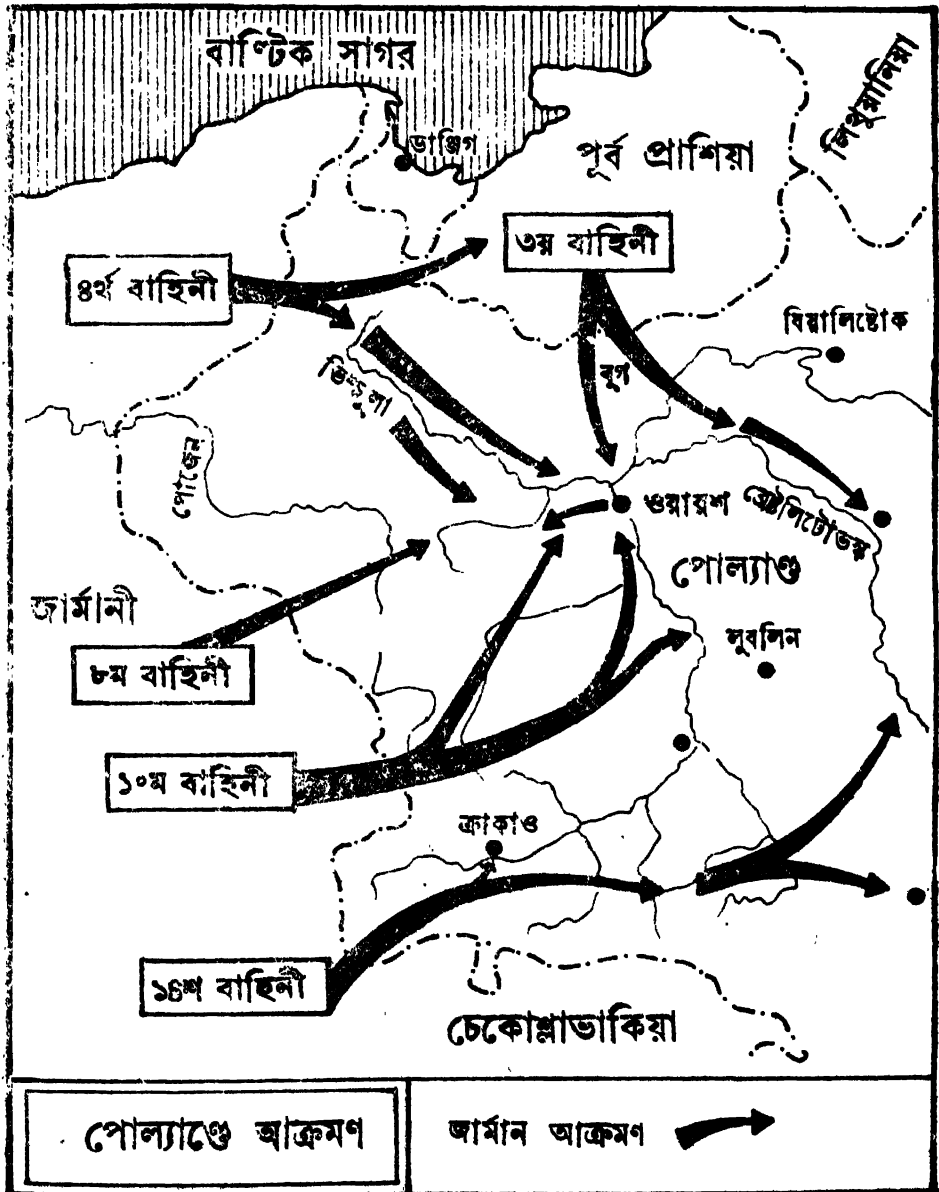
উপায়ে লড়াই চালাইতে পারে, তাহলে উপযুক্ত জবাবই সে পাইবে—যে জবাবের ফলে সে কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইবে না। আজ রাত্রে এই প্রথম পোলিশ সৈন্যরা

আমাদের রাজ্যের উপর গুলী ছুঁড়িয়াছে। সুতরাং ভোরবেলা ৫-৪৫ মিনিট হইতে আমরা গুলীর বদলে গুলী এবং বোমার বদলে বোমা বর্ষণ করিতেছি।'

'আমি কোন জার্মানকে এমন কোন কষ্ট সহ্য করিতে বলিব না, যাহা ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে সহ্য করিব না। এখন হইতে আমার সমগ্র জীবন আরও বেশী করিয়া জার্মান জনগণের জন্য উৎসর্গীকৃত হইল। এখন হইতে আমি জার্মান রাষ্ট্রের প্রথম সৈন্য। আমি আবার সেই কোটটি পরিধান করিয়াছি, যাহা আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং পবিত্র ছিল। যতক্ষণ না পূর্ণ জয়লাভ হয়, ততক্ষণে এই কোট আমি খুলিব না, অথবা ফলাফল দেখিবার জন্য আমি বাঁচিয়া থাকিব না।'[১]

হিটলারের কোন্ প্রতিশ্রুতি ভবিষ্যতে পালিত হইয়াছে, তাহা ইতিহাসের পাঠকেরাই বিচার করিবেন। কিন্তু আপাতত এই বক্তৃতায় দেখা যাইতেছে যে, হিটলারের দৃঢ়বিশ্বাস '১৯১৮ সালের নভেম্বরের আর পুনরাবৃত্তি হইবে না' এবং এই যুদ্ধে যদি তাঁর মৃত্যু ঘটে, তবে, 'কমরেড গোয়েরিং' এবং তারপর 'কমরেড হেস' তাঁর স্থলাভিষিক্ত হইবেন—জার্মান জনগণ যেন তাঁদের প্রতিও 'অন্ধ আনুগত্য ও বশ্যতা' দেখান, এই মর্মে তিনি ঘোষণা করেন। 'পোল্যাণ্ডের পাগলামির অবসানের জন্য' তিনি জার্মান সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যেও এক ঘোষণাবাণী প্রচার করেন।

৩রা সেপ্টেম্বর বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জবাবে হিটলার এক বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য রক্ষার নাম করিয়া বহু শতাব্দী যাবৎ ইংল্যাণ্ড পৃথিবী জয়ের উদ্দেশে ইউরোপীয় জনগণকে আত্মরক্ষার উপায়হীন করিয়া রাখার এক নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসরণ করিতেছে এবং যে কোন ছুতায় আক্রমণ চালাইতেছে। যে ইউরোপীয় রাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক বলিয়া মনে হয়, তাকেই ধ্বংস করা হইতেছে। ইংল্যাণ্ড পর পর স্পেনীয়, ওলন্দাজ ও ফরাসীর মত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে এবং এক্ষণে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে (ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে বিজয়ী জার্মানীর উত্থান) হইতে জার্মানীর বিরুদ্ধে লাগিয়াছে। জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃত্বে যেই জার্মানী ভার্সাই সন্ধির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছে অমনি বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে বেষ্টননীতি শুরু করিয়াছে।...

সুতরাং হিটলার অটুট সংকল্প লইয়া যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইলেন। পৃথিবীব্যাপী আবেদনও তাঁকে নিরস্ত করিতে পারিল না। ২৪শে আগস্ট মাহামান্য পোপ ও মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং ২৩শে আগস্ট বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, লাক্সেমবুর্গ, নরওয়ে ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশের রাজারা বা রাষ্ট্রপ্রধানেরা হিটলারের নিকট এক ঐকান্তিক আবেদন জানাইলেন যুদ্ধ পরিহার ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য।

জার্মান সামরিক শক্তি রণতাণ্ডবে মাতিয়া উঠিল। পুরা ৫টি আর্মি বা সৈন্য-বাহিনী পোল্যাণ্ড আক্রমণে যোগ দিল। তৃতীয়, চতুর্থ, অষ্টম, দশম এবং চতুর্দশ—এই পাঁচটি বাহিনী প্রধানত পোল্যাণ্ডে উত্তর-পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে, এই দুই অংশে দুইটি 'আর্মি-গ্রুপে' বিভক্ত হইয়া পূর্ব-পরিকল্পিত নিখুঁত নক্সা অনুযায়ী অভিযান আরম্ভ করিল। এই সৈন্যশক্তির মোট সংখ্যা ছিল ৪৫টি পদাতিক ডিভিসন, ৫টি প্যাঞ্জার ডিভিসন, ৪টি হাল্কা যান্ত্রিক ডিভিসন, ৬টি মোটরায়িত পদাতিক ডিভিসন এবং ২,৩০০

১। 'How Hitler Made War'—Page 29—31

রণবিমানসহ দুইটি পুরা বিমানবহর—এই মোট ৬০ ডিভিসন সৈন্য ও বিমান নিযুক্ত হইল।[১] কিন্তু পরে মজুত সৈন্যের সহায়তার জার্মানীর এই সংখ্যা ৭০ ডিভিসন পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল।

পোলিশ বিমানঘাঁটিগুলির উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের মধ্য দিয়া জার্মান আক্রমণের উদ্বোধন হইল। বিমানক্ষেত্রগুলি নষ্ট হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে পোলিশ বিমানবহরের এক-পঞ্চমাংশ ধ্বংস হইল। সুতরাং অবিলম্বেই আকাশের উপর জার্মান বিমানশক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। জার্মানীর তুলনায় পোল্যাণ্ডের বিমানশক্তি ছিল সামান্য —মাত্র ৫ শত হইতে ৬ শতের মধ্যে এবং শুরুতেই ১৯টি বিমানক্ষেত্র ধ্বংস হওয়ায় পোলিশ বিমানবহর কার্যত অকেজো হইয়া গেল। উপযুক্ত বিমানঘাঁটি ও বিমান সংখ্যার যেমন অভাব হইল, তেমনই পেট্রোলের অভাবেও গুরুতর অসুবিধা দেখা দিল। সুতরাং জার্মান বিমানবহর প্রায় বিনা বাধায় সংহারকার্য চালাইয়া যাইতে লাগিল। আক্রমণকারী সৈন্যদলের সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য তারা রেলপথ, পশ্চাদ্দিকের সেনানী শিবির, আশ্রয়প্রার্থী দল, খোলা গ্রাম এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করিতে লাগিল। পোলিশ রণক্ষেত্রের পিছনে তারা নিদারুণ বিশৃংখলার সৃষ্টি করিল, সৈন্য সমাবেশ, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং সমস্ত প্রকার চলাচলের উপর তারা বিভ্রাট ডাকিয়া আনিল। ইহা ছাড়া তারা গোলন্দাজদের সংগে সহযোগিতা করিতে লাগিল এবং যেখানে যেখানে প্রতিরোধের লক্ষণ তারা দেখিতে পাইল, সেখানেই তারা যান্ত্রিক সৈন্যদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে লাগিল এবং তাদের রক্ষা ও পাহারার কার্যেও প্রভুত সহায়তা করিল।[২]

পোলাণ্ডের পতন সম্ভাবনা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। কেন? —কেবল কি জার্মান সামরিক শক্তির অতুলনীয় শ্রেষ্ঠতার জন্য?—সেই শ্রেষ্ঠতা তো অনস্বীকার্য বটেই, কিন্তু পোল্যাণ্ডের রাজনীতি ও রাষ্ট্রগঠনের মধ্যেই তার দ্রুত পরাজয়ের বীজ নিহিত ছিল। মার্শাল পিলসুদস্কি যে ডিক্টেটরি শাসন চালাইয়াছিলেন, তা যেমন জনসাধারণের কল্যাণবিরোধী ছিল, তেমনই তাঁর উত্তরাধিকারিগণ সাম্যবাদবিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী এবং আত্মস্বার্থপরায়ণ ভূম্যধিকারী ও কায়েমী স্বার্থের বাহকগণের পক্ষপাতী এক আত্মঘাতী নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন। পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে কর্নেল বেক (১৯৩২-৩৯) এবং স্বরাষ্ট্র ও সামরিক ব্যাপারে মার্শান রিজ স্মিগলি পোল্যাণ্ডকে পূর্ব ইউরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন ও রণনীতিতে একান্ত অসহায় করিয়া ফেলিল। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে জার্মানীর সহিত পোল্যাণ্ডের একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু জার্মানী সেই চুক্তির আড়াল ধরিয়াই তার রণসজ্জা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। পোল্যাণ্ড ইহাতে সতর্ক হইল না, এমনকি পশ্চিমে ফ্রান্স এবং পূর্বদিকে চেকোশ্লোভাকিয়া ও সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত একযোগে আত্মরক্ষার চুক্তি অনুসরণ করিলে পোল্যাণ্ড যে ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তার নেতারা সেই অপরিহার্য প্রশ্ন সম্পর্কেও সচেতন হইলেন না। বরং পোল্যাণ্ড বিপরীত পথ ধরিয়া চলিল। মিউনিক চুক্তির দ্বারা চেকোশ্লোভাকিয়া যখন জার্মানীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল, তখন পোল্যাণ্ড আসন্ন বিপদ ও জার্মান

১। Battle for the World—by Max Werner P.—53

২। 'The Second Great War—Vol. 4. Page 1503

অভিসন্ধির বিষয়ে সাবধান না হইয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল। ফলে দক্ষিণ পোল্যাণ্ড জার্মান রণনীতির গ্রাসে পড়িল। তারপর আগস্ট মাসে ইঙ্গ ফরাসী-রুশ সামরিক চুক্তি আলোচনার সময় পোল্যাণ্ড সোভিয়েট রাশিয়ার প্রস্তাবিত 'গ্যারাণ্টি'তে অস্বীকৃত হইল এবং সাম্যবাদভীত পোলিশ গভর্নমেণ্ট দেশরক্ষার্থ লালফৌজের আগমন বরদাস্ত করিতে রাজী হইলেন না। সুতরাং পোল্যাণ্ড সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। বৃটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে এই অবস্থায় কোন সাহায্য দান যে সম্ভব নহে, এই সাধারণ বুদ্ধির কথাটি পর্যন্ত পোলিশ নেতারা খেয়াল করিলেন না। তাঁরা ইঙ্গ-ফরাসীর গ্যারাণ্টিদানকেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিলেন এবং আশা করিলেন যে, সমুদ্রপথে ও আকাশপথে তাঁরা প্রভূত সাহায্য পাইবেন। আর বৃটেন ও ফ্রান্সের ভ্রান্তবুদ্ধি এবং জার্মান সমরশক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ নেতারা, এমনকি জেনারেল গ্যামেলাঁ পর্যন্ত প্রচার করিলেন যে পোলিশ বাহিনী চমৎকার, পোল্যাণ্ডের আত্মরক্ষার শক্তিও যথেষ্ট।

অবশ্য পোল্যাণ্ডের জনসংখ্যা নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না—সাড়ে তিন কোটি এবং উহার সৈন্যদল ছিল ইউরোপের মধ্যে পঞ্চম সর্ববৃহৎ।[১] কিন্তু জার্মান আক্রমণের সময় এই সৈন্যদল সমাবেশের সুযোগ পর্যন্ত তারা পায় নাই। ১লা সেপ্টেম্বর পোলিশ আর্মি ৪০ হইতে ৪৫ ডিভিসন সৈন্য লইয়া গঠিত ছিল, কিন্তু এগুলির মধ্যে অনেক ডিভিসনই পুরাপুরি রণশক্তি অনুযায়ী গঠিত ছিল না। পদাতিক ডিভিসনগুলি ছাড়া ১০টি অশ্বারোহী ব্রিগেড এবং ১টি মাত্র যান্ত্রিক ব্রিগেড ছিল। পোল্যাণ্ড শ্রমশিল্পে উন্নত ছিল না এবং রণবিদ্যার আধুনিকতার অভাব ছিল। সুতরাং গোলাগুলী, অস্ত্রসজ্জা ও যান্ত্রিকতায় এগুলির দৈন্য ছিল অসাধারণ। সুতরাং পোলিশ সৈন্যের পূর্ণতর সমাবেশ ঘটিলে জার্মানীর হাতে কেবলমাত্র বন্দীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত।

যুদ্ধারম্ভের সময় পোল্যাণ্ডের রণনৈতিক সমাবেশও মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং ম্যাক্সভার্নার ইহাকে নেপোলিয়ানের যুগের সেকেলে রোমাণ্টিক ধারণা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা আধুনিক রণধর্ম এবং জার্মানীর শ্রেষ্ঠতর শক্তির একান্ত অনুপযুক্ত ছিল। রিজ-স্মিগলির নেতৃত্বে পোলিশ সেনাপতিরা পশ্চিম পোল্যাণ্ডকে জার্মানীর বিরুদ্ধে তাদের রণক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং তার 'ব্যাপক মহড়া ও বৃহৎ এলাকাব্যাপী পাল্টা আক্রমণের' তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া চলিলেন এবং আত্মরক্ষার জন্য দুর্গায়িত এলাকার প্রয়োজন বোধ করিলেন না।

কোরিডোর, পোজেন বা পোজনান এবং উত্তর সাইলেশিয়া—এই পশ্চিম অংশই ছিল পোল্যাণ্ডের রণনৈতিক সমাবেশের স্থান। কিন্তু এগুলি ছিল একান্তরূপে জার্মানীর সীমান্তলগ্ন, ভূমি অত্যন্ত সমতল এবং পাহাড়, নদী ও নিবিড় অরণ্য বা প্রাকৃতিক বিঘ্নশূন্য। জনবসতি ছিল এখানে সর্বাধিক, পোলাণ্ডের প্রায় অর্ধেক লোক এখানে বাস করিত এবং শ্রমশিল্পের এলাকাগুলিও ছিল এই পশ্চিমাংশে। অর্থাৎ জার্মানীর থাবার মুঠির মধ্যে এই উৎকৃষ্ট এলাকা ছিল, যাহা পোল নেতারা 'বিনাযুদ্ধে ছাড়িয়া দেওয়া' বুদ্ধিমানের কার্য বলিয়া মনে করিলেন না। সুতরাং পোলিশ সৈন্যের সমাবেশ ঘটিল জার্মান সীমান্তের নিকট—পোজেন হইল এই সমাবেশের মর্মকেন্দ্র, আর সমাবেশ ঘটিল ওয়ারশ'র উত্তরে এবং কোরিডোরের

১। 'The World at War'—published by the Infantry Journal U. S. A. Page 38

সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী এলাকায়। অর্থাৎ বুদ্ধিমান পোলিশ রণনীতিবিদরা তাঁদের সৈন্যদিগকে এমনভাবে আগাইয়া দিলেন, যাতে জার্মানরা এক থাবাতেই তাদের গ্রাস করিতে পারে ! কিন্তু ইহার চেয়ে যদি তাঁরা ভিশ্চুলা, বুগ ও সান নদী এলাকা ধরিয়া বহুদূরে পিছনে সড়িয়া গিয়া আত্মরক্ষার সারি গড়িয়া তুলিতেন, তাহলে প্রাকৃতিক বিঘ্নের স্বাভাবিক আড়াল হইতে তাঁরা অন্তত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল প্রতিরোধ চালাইতে পারিতেন। ইহার বদলে রিজ-স্মিগলি পোল সৈন্যদিগকে হাল্কাভাবে ছড়াইয়া দিলেন, পিছনে তেমন কোন মজুত সৈন্য রহিল না। সুতরাং হতভাগ্য পোল সৈন্যেরা একেবারে জার্মানীর কামানের মুখে পড়িয়া গেল।

আর জার্মানীর পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত এবং পূর্বসংকল্পিত। আগের অধ্যায়ে বর্ণিত শ্বেত নক্সাই তার প্রমাণ। ২৩শে আগস্ট বা রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখের মধ্যেই জার্মানী তার সমস্ত বাহিনী গোপনে সমাবেশ করিল পোলিশ সীমান্তে এবং আঘাতের জন্য সর্বপ্রকারে প্রস্তুত হইয়া রহিল। এদিকে ৩০শে আগস্টের আগে পোল সৈন্যেরা ব্যাপক সমাবেশের হুকুম পাইল না। কারণ তখনও পোলিশ গভর্নমেণ্ট ইংগ-ফরাসীর মারফৎ জার্মানীর সঙ্গে আপোষ আলোচনার আশার মধ্যে ছিলেন, যদিও রাশিয়ার বন্ধুত্ব অস্বীকার করা হইল। ফলে, সৈন্য সমাবেশে দেরী হইয়া গেল এবং ১লা সেপ্টেম্বর জার্মান আক্রমণের পর দেখা গেল, যে, মাত্র ৬ ডিভিসন পোলিশ সৈনা রহিয়াছে রণস্থলে আর মাত্র ১৭ ডিভিসনকে পুরাপুরি সমাবেশ করা হইয়াছে। তারপর ক্রমাগত বোমাবর্ষণে ট্রেন, যানবাহন, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভ্রাট এবং অন্যান্য বহুপ্রকার কারণ একত্র হইয়া পোলিশ বাহিনীর পূর্ণ প্রস্তুতি ও যুদ্ধযাত্রায় অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গেল।

জার্মানীর সর্বপ্রধান সেনাপতি জেনারেল ফন ব্রাউসিৎস চমৎকার সুযোগ পাইলেন। তিনি সমগ্র পোলিশ বাহিনীকে পর পর কতকগুলি বেষ্টন কৌশল অনুসরণ করিয়া চূর্ণ করিবার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। সমগ্র জার্মান বাহিনী দুইটি গ্রুপে বিভক্ত ছিল পোলিশ-জার্মান সীমানার রণনৈতিক অবস্থান অনুসারে দুইদিক হইতে বৃহৎ বেষ্টনী সৃষ্টির জন্য। খাতায়পত্রে পোলিশ সমরকর্তারাও ৫টি আর্মির সমাবেশ পরিকল্পনা করিলেন, যথা ক্রাকাউ, লজ, পোজনান, পোমোরজ ও মডলিন বাহিনীসমূহ। আর জার্মানী সংস্থাপন করিল উত্তরদিকে ফন বোকের অধীনে দুইটি আর্মি-গ্রুপ—পূর্ব প্রুশিয়ায় ফন কুচলারের বাহিনী, তারা পোলিশ মড্‌লিন বাহিনীর এবং আরও পূর্বদিকে ন্যারিউ নদী বাহিনীর (পোলিশ) মুখোমুখি দাঁড়াইল। পোমেরানিয়ায় ফন ক্লুজের বাহিনী পোলিশ-পোমেরেজ বাহিনীর সম্মুখীন হইল। ইহা ছাড়া ডানজিগ এবং ভিলা বন্দরের দিকেও কিছু পোলিশ সৈন্য ছিল। দক্ষিণে ফন রুণ্ডস্টেডের গ্রুপ ৩টি বাহিনী লইয়া গঠিত ছিল। ফন রাইকনাউয়ের সৈন্যরা ছিল মধ্যস্থলে, তাঁর বামদিকে ছিল রাস্কোভিৎসের সৈন্যেরা —ইহাদের মুখোমুখি ছিল পোলিশদের লজ বাহিনী (নামে মাত্র বাহিনী, কিন্তু সংখ্যাশক্তি ৪ ডিভিসন মাত্র, আর ২ টি অশ্বারোহী ব্রিগেড)। ফন রাইকনাউয়ের দক্ষিণে উত্তর সাইলেশিয়ায় এবং শ্লোভাকিয়ায় ছিল ফন লিস্টে বাহিনী—ইহাদের মুখোমুখি ছিল পোলিশদের ক্রাকাউয়ের সৈন্যদল।

পোলিশদের তুলনায় জার্মানীর সৈন্যসংখ্যা এবং রণনৈতিক অবস্থানই যে অনেক

শ্রেষ্ঠ ছিল, এমন নহে। প্রধান সেনাপতি ফন ব্রাউসিৎসের আর একটা সুবিধা ছিল এই যে, তিনি মোটামুটিভাবে উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি আর্মি-গ্রুপ পরিচালনা করিতেছিল। অপরপক্ষে পোলিশ প্রধান সেনাপতি ৫টি পৃথক আর্মিকে পরিচালনার দায়িত্ব লইয়াছিলেন। কিন্তু এই পরিচালনা ব্যাহত হইল উৎকৃষ্ট যোগাযোগের অভাবে, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইন এবং বেতার শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং শেষ পর্যন্ত পোলিশ হাইকমান্ড সমস্ত যোগসূত্র হারাইয়া ফেলিলেন।[১]

পর-পর কতকগুলি মহড়ার চালে বেষ্টন করিয়া সমগ্র পোলিশ বাহিনীকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য লইয়া জার্মান সামরিক নক্সা অত্যন্ত দক্ষতার সহিত তৈয়ার এবং অনুসৃত হইয়াছিল। ওয়ারশ'র পশ্চিমদিকে পোজেন বা পোজেনান এলাকায় এবং করিডোরের দিকে পোলিশ সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছিল সবচেয়ে বেশী—এই সৈন্যদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া সংহার করাই ছিল জার্মান সেনাপতির অন্যতম বিশেষ লক্ষ্য। জার্মান-পোলিশ সীমানা হইতে বুগ নদী পর্যন্ত গড়পড়তা ৩০০ মাইল গভীরতায় এই আক্রমণ ও রণক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবার পরিকল্পনা ছিল।

চারটি পর্যায়ে এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল। প্রথম পর্যায়ে ছিল ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, যাহাকে বলা যাইতে পারে সীমান্ত সংগ্রাম। এই যুদ্ধে পোলিশ সৈন্যদের সীমান্তে আত্মরক্ষার সমস্ত ঘাঁটি, বিশেষত বার্থা নদী বরাবর সমগ্র অবস্থান চূর্ণ হইয়া গেল। জার্মান 'গতিশীল সৈন্যেরা'—ভারী ও হাল্কা যান্ত্রিক ডিভিসনগুলি তৎক্ষণাৎ রণক্রিয়ায় মত্ত হইল, পদাতিক ও বিমানবহরের সহযোগিতায় এবং পোলিশ সৈন্যদের সংহতি ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে পিছনে ঠেলিয়া দিতে লাগিল এবং গভীরতর কীলকাবিদ্ধ করিবার জন্য রাস্তা খুলিয়া দিল। এই অবস্থাতেই পোলিশ করিডোরের সৈন্যেরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং জেনারেল ফন ক্লুজের অধীন পোমেরানিয়ার চতুর্থ জার্মান বাহিনীর মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইল।

৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল, উহাকে দ্বিতীয় পর্যায় বলা যাইতে পারে। এই পর্যায়ে পোলিশ রণাঙ্গনের মধ্যে বহু দিক দিয়া ভাঙ্গন ধরিল, তাদের রণক্ষেত্র টুকরো-টুকরো হইয়া খন্ড রণাঙ্গনে পরিণত হইল এবং একটির সঙ্গে অপরটির কোন যোগ রহিল না এবং পোলিশ বাহিনীগুলিও পরস্পরের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। প্রধানত দক্ষিণ দিক হইতে প্রবলতর জার্মান বাহিনীর আক্রমণে পোলিশ সৈন্যেরা বেষ্টিত হইয়া পড়িল। জেনারেল ব্লাস্কোভিৎস, যিনি ৮ নং জার্মান বাহিনী লইয়া মধ্য রণাঙ্গনে ছিলেন, তিনি পোজেনের (পোলিশ সাইলেশিয়ার অন্তর্গত) পোল বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। আর দক্ষিণ দিকে জেনরেল রাইকনাউ গ্যালিসিয়া হইতে পোলিশ সাইলেশিয়ান বাহিনীর সংযোগ নষ্ট করিলেন। আরও দক্ষিণে (শ্লোভাকিয়া পোল্যান্ডের সীমান্ত) জেনারেল ফন লিস্ট গ্যালিসিয়ার পোল সৈন্যদিগকে উত্তর দিকে পশ্চাদপসরণ করিয়া সাইলেশিয়ান পোল বাহিনীর সহিত মিলিত হইবার পথ বন্ধ করিলেন। সর্বত্র জার্মান গতিশীল সৈন্যেরা রণক্ষেত্রের বহু দূরে প্রবেশ করিল এবং জেনারেল রেইনহার্ডের অধীন যান্ত্রিক সৈন্যেরা (৮ নং বাহিনীর) ৯ই সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ওয়ারশ'র শহরতলীতে পৌঁছিল। ঐ দিনই

১। 'The Second Great War' Vol II

জেনারেল হোয়েপনারের প্যাঞ্জার সৈন্যেরা ১০নং বাহিনীর শাখারূপে র‍্যাডমের দক্ষিণ-পশ্চিমে স্যাণ্ডোমিয়ার্জের নিকট মধ্য ভিশ্চুলার নদীতীরে উপস্থিত হইল এবং ১৪নং যান্ত্রিক সৈন্যেরা গ্যালিসিয়ার সান নদীর দিকে অগ্রসর হইল।

অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেকটি পোলিশ বাহিনীই এভাবে ১০ দিনের মধ্যে পরস্পরের সহিত সংযোগ সূত্র হারাইয়া ফেলিল এবং ইতিমধ্যে জার্মান বাহিনী পোল্যাণ্ডের ১২৫ হইতে ১৭৫ মাইলের মধ্যে অগ্রসর হইল। জার্মানীর বিখ্যাত বেষ্টন কৌশলের মহড়া যেন ছবির মত ফুটিয়া উঠিল। পূর্ব প্রুশিয়া হইতে ৩নং জার্মান বাহিনী ওয়ারশ'র উত্তর-পূর্বে হাজির হইল। ওয়ারশ'র পশ্চিমে সমগ্র পোল রণক্ষেত্র বেষ্টিত হইল। ওয়ারশ'র ও পোজেনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কাটনুর নিকট বাজুরা নদীর ধার দিয়া সমগ্র পোল রণাঙ্গন উত্তর ও দক্ষিণ হইতে বেষ্টিত হইল এবং ১০ সেপ্টেম্বর দেখা গেল যে, পোল সৈন্যেরা যেন একটা প্রকাণ্ড থলির মধ্যে আটকা পড়িয়াছে এবং জার্মানরা সেই থলির মুখে ক্রমশ ফাঁস আটকাইতেছে। দক্ষিণ দিকে ব্রেস্টলিটোভস্ক-ওয়ারশ-লুবলিন—এই ত্রিভুজাকৃতি অঞ্চলও বেষ্টিত হইতেছিল।

এদিকে জার্মান বিমানবহর পোল সৈন্য সমাবেশ, যোগাযোগ, বিমানশক্তি, রেলপথ, সৈন্য ছাউনি, শিবির ইত্যাদির উপর প্রচণ্ডভাবে বোমা মারিয়া সমস্ত কিছুর মধ্যে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা ডাকিয়া আনিল এবং পোলিশ বাহিনীর পক্ষে কোন সঙ্ঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত পশ্চাদপসরণের আর সম্ভাবনা রহিল না। দক্ষিণ দিকে ভিশ্চুলা ও সান নদী ধরিয়া তারা যে নূতন আত্মরক্ষার লাইন গড়িয়া তুলিবে, এমন উপায়ও রহিল না। ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর এই অভিনব যুদ্ধের তৃতীয় পর্যায় শেষ হইল এবং জার্মানরা চূড়ান্ত জয়লাভ করিল। ১৮ই সেপ্টেম্বরের পর এই যুদ্ধের চতুর্থ বা উপসংহার পর্যায় বলা যাইতে পারে। ওয়ারশ' মডলিন ইত্যাদি কয়েকটি বড় শহরে আত্মরক্ষার যে সমস্ত 'পকেট' সৃষ্টি হইয়াছিল, জার্মানরা ঐগুলি নিশ্চিহ্ন করিতে লাগিল।

জার্মান সৈন্যেরা সুশৃংখলার সহিত পোল্যাণ্ডের সংহার কার্যে অগ্রসর হইতেছিল। ওয়ারশ'র পশ্চিমে ভিশ্চুলা নদীর বাঁকে তিনটি জার্মান বাহিনীর সৈন্যেরা একযোগে রণক্রিয়া চালাইয়াছে এবং এখানে পোলিশ কোরিডোর বাহিনী, পোজেন বাহিনী এবং সাইলেশিয়ান বাহিনীর কতকাংশ—পুরা ৯ ডিভিসন এবং আরও ১০ ডিভিসনের কিছু 'খুচরা সৈন্য' বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিল। এখানে পোলিশ সৈন্যেরা অসাধারণ সাহসের সঙ্গে লড়িয়াছিল এবং জার্মান ব্যূহ ভেদ করিতে গিয়া তারা কোন কোন অংশে আক্রমণের ভূমিকাও লইয়াছিল। এখানে প্রভুত বিমানশক্তির সহায়তায় জার্মানরা তাদের কাবু করে, কিন্তু তাতেও সপ্তাহখানেক লাগিয়াছিল। অবশ্য ইহার পর পোলিশ বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয় এবং ১ লক্ষ ৭০ হাজার পোল সৈন্য ধরা পড়ে। র‍্যাডমে ১০নং জার্মান বাহিনী ৫ ডিভিসন পোল সৈন্যকে ঘেরাও করে এবং ৬০ হাজার পোল সৈন্য বন্দী হয়। দক্ষিণ পোল্যাণ্ডে ১৪ নং জার্মান বাহিনী আরও ৬০ হাজার পোল সৈন্যকে বন্দী করে। এই সময় উত্তর-পূর্ব দিক হইতে ৩নং জার্মান বাহিনী ওয়ারশ' ও মডলিন ঘেরাও করে। ১৭ই সেপ্টেম্বর পূর্ব প্রুশিয়া ও দক্ষিণ পোল্যাণ্ড হইতে দুইটি জার্মান সাঁড়াশীর চাপ দুইটি বিশাল বাহুর মত ব্রেস্টের ৪০ মাইল দক্ষিণে বুগ নদীর তীরে আসিয়া মিলিত হয় এবং বাকি পোলিশ সৈন্যেরা পরিত্রাণের পথ না পাইয়া এই ফাঁদে ধরা পড়ে।

মোট কথা জার্মান সৈন্যেরা পর পর কতকগুলি অভুতপূর্ব বেষ্টনকৌশল অনুসরণ করে এবং অধিকাংশ পোলিশ সৈন্যকেই সাঁড়াশীর চাপে ফেলিয়া পিষ্ট করে। মানচিত্রের দিকে তাকাইলে বুঝা যাইবে এই বৃহত্তম সাঁড়াশীর চাপ উত্তর ও দক্ষিণ হইতে কিভাবে গোটা পোল্যাণ্ডকে বুগ নদী পর্যন্ত গ্রাস করিয়াছিল এবং প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জেনারেল গুডেরিয়ানের অধীন যান্ত্রিক সৈন্যেরা পোমেরানিয়ার (কোরিডোরের সীমান্তবর্তী) চতুর্থ বাহিনীর শাখারূপে কোরিডোর বিদ্ধ করিয়া এবং পূর্ব প্রুশিয়া পার হইয়া চলিয়া যায়। তারপর ৩৯নং জার্মান বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া তারা অগ্রসর হইতে থাকে এবং এই যুদ্ধের সর্ববৃহৎ বেষ্টন কৌশল অনুসরণ করিয়া তারা ন্যারেভ নদী পার হইয়া ক্রমে দক্ষিণাভিমুখী অগ্রসর হইয়া ব্রেস্টলিটোভস্কে গিয়া হাজির হয়। দুই সপ্তাহে তারা ৩৫০ হইতে ৪০০ মাইল পর্যন্ত অতিক্রম করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই অদ্ভুত গতিবেগ পোলিশ রণক্ষেত্রে প্রথম অনুসৃত হইল। কিন্তু লণ্ডন বা প্যারিস, কোথাও ইহার মূল্য উপলব্ধি হইল না এবং আমাদের কলিকাতা বা নয়াদিল্লীতে ইহা কোন রেখাপাতও করিল না।

ওয়ারশ'র পতন

কার্যত ১৮ দিনের মধ্যেই পোল্যাণ্ডের যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। কিন্তু রাজধানী ওয়ারশ'র তখনও আনুষ্ঠানিক পতনে কিছুটা বিলম্ব ছিল এবং যদিও জার্মান বাহিনীর সমর শক্তির সহিত পোলিশ বাহিনীর কোন দিক দিয়াই তুলনা ছিল না, তথাপি অসম্ভব বিঘ্ন ও বিপদের মধ্যে পড়িয়াও পোল সৈন্যেরা রাজধানী রক্ষায় যথেষ্ট বীরত্ব ও সাহস দেখাইয়াছে। অন্যান্য রণক্ষেত্রেও তাদের বীরত্ব কম ছিল না, কিন্তু তাহা ছিল দানবের তুলনায় মানবের সাহস দেখাইবার মত।

১৬ই সেপ্টেম্বর একজন জার্মান প্রতিনিধি ওয়ারশ'তে আসিয়া চরমপত্র পেশ করিলেন এবং ১২ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণের দাবী জানাইলেন। জার্মান কর্তৃপক্ষ জানাইলেন যে, যদি এই চরমপত্র অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে শহর ধ্বংস ও লোকক্ষয় হইলে একমাত্র পোলিশ সেনাপতিরাই ইহার জন্য দায়ী হইবেন। তবে ওয়ারশ' নগরী ত্যাগ করিবার জন্য তাঁরা অসামরিক জনগণকে ১২ ঘণ্টা সময় দিতে প্রস্তুত আছেন।

এই চরমপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবা মাত্র জার্মানেরা শহরের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে নগরী চতুর্দিকে বেষ্টিত হইয়া পড়িল এবং অধিকতর বাধাদান বৃথা বলিয়া অনুভূত হইল। তখন ২৭শে সেপ্টেম্বর ওয়ারশ' বিনাসর্তে জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল।

৫ই অক্টোবর তারিখ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম বিজেতা হিটলার বার্লিন হইতে বিমানযোগে সগর্বে ওয়ারশ' পৌঁছিলেন এবং কাইটেল ও ব্রাউসিৎস প্রমুখ সমরনায়কগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাইলেন।

৬ই অক্টোবর তারিখ হিটলার রাইখস্টাগে এক বক্তৃতায় বলিলেন যে, পোলাণ্ডের যুদ্ধে জার্মানীর মোট হতাহত হইয়াছে ৪৪ হাজার[১]। নিঃসন্দেহে ইহা অল্পমূল্যে

১। The Second Great War—Vol. I. Page 145

বৃহৎ জয়লাভ। পোল্যাণ্ডের সরকারী ও সমরনেতারা দেশত্যাগ করিয়া রুমানিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে ইত্যাদি দেশের আশ্রয় লইলেন। কিন্তু স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য পোল জনসাধারণের লড়াই থামিল না। জার্মানীর সংহারলীলা সত্ত্বেও (অসংখ্য ইহুদী ও পোল নাগরিক প্রাণ হারাইয়াছে) তারা গুপ্ত আন্দোলন ও গুপ্ত প্রতিরোধের কৌশল অনুসরণ করিতে লাগিল।

পোল্যাণ্ড বাঁটোয়ারা

কিন্তু পোল্যাণ্ডের শোচনীয় নাটকের এখানেই শেষ নহে। ইহার আর একটি অধ্যায়ও ছিল, যাহা পরবর্তীকালে বৃহৎ ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়াছে।

পোলাণ্ডে জার্মান যুদ্ধ শেষ হইবার আগেই ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখ সোভিয়েট রাশিয়ার লাল ফৌজ পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করিল এবং বিনা বাধায় অগ্রসর হইল। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে, পোলিশ রাজধানী ও পোল রাষ্ট্রের আর অস্তিত্ব নাই এবং অনতিবিলম্বেই এমন অবস্থায় উদ্ভব হইতে পারে, যাহা দ্বারা সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিপদ সম্ভব। সুতরাং রাশিয়ার পক্ষে আর নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব নহে। এ জন্যই রুশ সৈন্যদিগকে পোল্যাণ্ডের সীমা অতিক্রম করিতে এবং পশ্চিম উক্রাইন ও পশ্চিম হোয়াইট রাশিয়ার অধিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি নির্বিঘ্ন করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

অবশ্য রাশিয়ার এই ঘোষণা এবং কার্য সেই সময় 'মিত্রপক্ষীয়' মহলে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। কারণ রুশ-জার্মান চুক্তির গোপন সর্ত তখন জানা ছিল না। এইজন্যই জার্মানী রাশিয়ার এই আকস্মিক আচরণে বিস্মিত হইল না, বরং নিঃশব্দে উহা মানিয়া লইল। ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখ জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে বাঁটোয়ারা সম্পন্ন হইল। পোল্যাণ্ডের ইতিহাসে এই চতুর্থবার পোল্যাণ্ড বিভক্ত হইল। ১৯১৯ সালের কার্জন লাইন অনুযায়ীই এই বিভাগ সম্পন্ন হইল এবং ইহা পূর্বে জারের রাশিয়ারই অন্তর্গত ছিল। পূর্ব পোল্যাণ্ডের অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল হোয়াইট রাশিয়ান, উক্রাইনীয়ান ইত্যাদি। ৩রা নভেম্বর এক গণভোটের দ্বারা জার্মানীর সহিত 'আপোষলব্ধ' ১ কোটি ২০ লক্ষ বাসিন্দাপূর্ণ ৭৫ হাজার বর্গমাইল পরিমিত পূর্ব পোল্যাণ্ড সোভিয়েটের অন্তর্ভুক্ত হইল। বাকি অংশ গেল জার্মানীর দখলে। পূর্বদিকে জার্মান রাজ্য বিস্তারের গতিরোধ এবং হিটলারের বিরুদ্ধে অগ্রবর্তী ঘাঁটি ও 'রণনৈতিক সীমানা' লাভই ছিল পোল্যাণ্ড বাঁটোয়ারার পিছনে সোভিয়েট রাশিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিশুদ্ধ নীতি ও আদর্শের দিক দিয়া পুঁথিগত বিচারে রাশিয়ার এই কার্য নিশ্চয়ই বিতর্কের সৃষ্টি করিতে পারে। কারণ আন্তর্জাতিক আইনে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পোল্যাণ্ড স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল এবং জার্মানী ও রাশিয়াসহ সকল শক্তিবর্গেরই ইহার সঙ্গে চুক্তি, সন্ধি ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। ১৯৩৯ সালের ইউরোপীয় রাজনীতির ঘূর্ণীপাকে জার্মানী ও রাশিয়া পরস্পরের বৈরিতা চাপা দিয়া যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিল, উহার মধ্যে পোল্যাণ্ড বাঁটোয়ারা এবং বাল্টিক রাজ্য সম্পর্কে (একমাত্র লিথুয়ানিয়া ছাড়া) গোপন সর্ত ছিল—একথা গ্রন্থের প্রথম পর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই গোপন সর্ত কেবল যে, রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরের

সময়েই স্থির হইয়াছিল, এমন নহে। প্রায় উহার চারি মাস আগে হইতেই বার্লিন ও মস্কোর মধ্যে পোল্যাণ্ড বাঁটোয়ারার সম্ভাবনা সম্পর্কে শলাপরামর্শ চলিতেছিল। ফরাসী গভর্নমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯৩৯ সালের ২২শে মে তারিখ বার্লিনের ফরাসী রাজদূত মঃ কলোন্দ্রে লিখিয়াছিলেন—

"...But in the view of the German Minister for Foreign Affairs the Polish State can not fundamentally have a durable character. Sooner or later it must disappear, partitioned once more between Germany and Russia...the idea of such a partition is intimately bound with that of a re-approachment between Berlin and Moscow."[১]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পোল্যাণ্ডের ভাগ্য বহু পূর্বেই দুইটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। রণপণ্ডিত ম্যাক্সভার্নারও তাঁর পুস্তকে ('ব্যাট্‌ল্‌ ফর দি ওয়ার্ল্ড"—পৃষ্ঠা ৪৯) উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাশিয়াকে দলে টানিবার জন্য হিটলার পোল্যাণ্ডের অর্ধেক রাশিয়াকে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের কথা আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে ১৯৩৯ সালের ২৪শে অক্টোবর ডানজিগে প্রদত্ত রিবেনট্রপের এক বক্তৃতায়। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

"Russian troops moved forward on the entire front and occupied Polish territory upto the line of demarcation which we had previously agreed upon with Russia.[২]

অর্থাৎ রাশিয়ার সহিত জার্মানীর পূর্বনির্ধারিত সীমানার রেখা অনুসারেই রুশসৈন্যেরা পোলিশ রাজ্যের এলাকা দখল করিয়াছিল। সুতরাং এক হিসাবে উহা কার্জন লাইন নহে, 'রিবেনট্রপ-মলোটোভ লাইন' বলা যাইতে পারে। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হইবার পর হিটলার সোভিয়েটের বিরুদ্ধে অভিযোগপূর্ণ যে বক্তৃতা দেন, উহাতেও তিনি রাশিয়ার সহিত পোল্যাণ্ড সম্পর্কে 'একটি বিশেষ চুক্তির' কথা উল্লেখ করেন এবং তাতে জার্মানী ও রাশিয়া কর্তৃক পোল্যাণ্ড বাঁটোয়ারারই ইঙ্গিত ছিল।[৩]

কাজেই বিশুদ্ধ নীতির দিক দিয়ে ব্যাপারটা সমালোচনা উদ্রেক করিতে পারে বৈকি। আর 'লণ্ডনপ্রবাসী' পোলিশ গভর্নমেণ্ট তো সোভিয়েট বিদ্বেষবশত এই উপলক্ষে প্রভুত প্রচারকার্য চালাইলেন। কিন্তু জার্মানীর সামরিক অভিসন্ধি, নাৎসী রাজ্য লিপ্সার মত্ততা এবং হিটলারী আসল উদ্দেশ্যের বাস্তবতার বিচার রাশিয়ার পক্ষেও এই গোপন চুক্তি ও পারস্পরিক স্বীকৃত বাঁটোয়ারার সুযোগে আত্মরক্ষার জন্য অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

যদিও পোল্যাণ্ড বিভাগের মধ্য দিয়া রাশিয়ার এই রণনৈতিক চাল অনেকেই তখন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তথাপি ইতালীর ডিক্টেটর মুসোলিনীর দৃষ্টি ইহা এড়াইতে পারে নাই। তিনি কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই এই সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা ভবিষ্যদ্বাণীর মত ফলিয়াছিল।

১। 'লণ্ডন টাইমস্' ও 'স্টেটসম্যান'—তারিখ ২৩। ১। ৪০

২। The Great Challenge—by Louis Fisher. Page 31.

৩। Hutchinsons Quarterly Record of the War—Vol. 7. Page 137.

হিটলারী কার্যের ফলে রাশিয়া পোল্যান্ডে হস্তক্ষেপ করায় ২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) মুসোলিনী মন্তব্য করেন—

"It is good thing to make use of small person to kill a large one, but it is a mistake to make use of a large one to liquidate a small one".

'একজন ছোটকে দিয়া বড়কে হত্যা করা ভালো, কিন্তু একজন বড়কে দিয়া ছোটকে সংহার করা অত্যন্ত ভুল।' তারপর মুসোলিনীর মনোভাব সম্পর্কে আরও বলা হইয়াছে যে—

'He is more than ever convinced that Hitler will regret the day he brought the Russians into the heart of Europe'

'আগের চেয়েও মুসোলিনীর এক্ষণে নিশ্চিত বিশ্বাস এই হইয়াছে যে, একদা হিটলার সেই দিনটির জন্য আপশোষ করিবেন, যেদিন তিনি রুশদিগকে ইউরোপের মর্মকেন্দ্রে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন।'[১]

* * *

পোল্যান্ড আক্রমণের দ্বারা হিটলার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 'উদ্বোধন' করিলেন বটে, কিন্তু গোড়াতেই যে শঠতা ও ধাপ্পাবাজির অনুষ্ঠান করিলেন, তার তুলনা নাই। জার্মানী যে প্রথমে পোল্যান্ডকে আক্রমণ করে নাই, বরং 'আক্রান্ত' জার্মানীই বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছে—এই সাফাই গাহিবার জন্য হিটলার ও তাঁর দলবল এক গভীর চক্রান্ত করিলেন। এই চক্রান্তের আভাষ নবম অধ্যায়ে (প্রথম পর্বে) দেওয়া হইয়াছে।

১৯৩৯, আগস্ট মাসের মধ্যভাগে হিটলার ও আর্মি নেতারা চক্রান্ত করিলেন যে পোল্যান্ডকে আক্রমণের অজুহাত সৃষ্টির জন্য পোলিশ-জার্মান সীমান্তে কয়েকটি আক্রমণাত্মক ঘটনা ঘটাইতে হইবে এবং তাঁরা নিজেদের লোক দিয়া এগুলি ঘটাইবেন। এজন্য ঝটিকাবাহিনীর এবং গেস্টাপোর লোকদের সহায়তা নেওয়া হইল। ১৫০টি পোলিশ মিলিটারি ইউনিফর্ম ও আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি গোয়েন্দা বিভাগের মারফৎ সংগ্রহ করা হইল। স্থির হইল যে, পোলিশ সীমান্তের নিকটবর্তী গ্লিভিৎস (Gleiwitz) রেডিও স্টেশনটির উপর আক্রমণ চালান হইবে এবং এজন্য হতাহত দেখাইবার উদ্দেশ্যে বন্দীশালার প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত লোকেদের ব্যবহার করা হইবে। এই গোটা রণক্রিয়ার সাংকেতিক নাম রাখা হইল 'অপারেশন হিমলার' এবং এভাবে জার্মানরা নিজেরাই একটা সাজানো আক্রমণ ঘটাইয়া প্রচার চালাইবে যে, পোল্যান্ড পোল-জার্মান সমঝোতা চায় না, তারা ইংলন্ডের ভরসায় আছে এবং তারা নিজেরাই আগ বাড়াইয়া সীমান্তের জার্মান ঘাঁটির উপর আক্রমণ শুরু করিয়া দিয়াছে। অতএব, এই পোলিশ ঔদ্ধত্য অমার্জনীয় এবং অসহ্য! এজন্য জার্মানী আত্মসম্মান ও আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া পাল্টা আঘাত করিয়াছে।

১লা সেপ্টেম্বর সরকারীভাবে জার্মানী কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণের পূর্ব দিন, অর্থাৎ ৩১শে আগস্ট সন্ধ্যা ৮টা সময় পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম অনুসারে পোলিশ-জার্মান সীমান্তের গ্লিভিৎস নামক স্থানের জার্মান রেডিও স্টেশনটির উপর

১। Cianos Diary—Page 158

ঝটিকাবাহিনীর লোকেরা পোলিশ সৈন্যদের ইউনিফর্ম পরিয়া আক্রমণ চালাইল এবং বন্দীশালার কিছু হতভাগ্যকে নেশায় অজ্ঞান করিয়া সেখানে আনা হইল এবং তাদের উপর গুলী চালাইয়া তাদেরকে হতাহত করা হইল—দেখানো হইল পোলিশরা কিভাবে আক্রমণ করিয়া জার্মানদের হতাহত করিয়াছে।

এই সমগ্র সাজানো ব্যাপারটির এবং ধাপ্পাবাজির সংগঠক ছিল আলফ্রেড নাউজক্স নামক এস-এস বাহিনীর এক ধুরন্ধর। এই ব্যক্তি এই সমস্ত কার্যে খুব হাত পাকাইয়াছিল।

পোলিশ সীমান্তের এই সাজানো আক্রমণ জার্মান সংবাদপত্রে ও রেডিওতে ঘটা করিয়া প্রচার করা হইল এবং দেখানো হইল পোলিশরাই জার্মানীকে আগে আক্রমণ করিয়াছে। এমনকি এই 'আক্রমণের' ঘটনা ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯, বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকা নিউইয়র্ক টাইমস্ ও বিদেশের অন্যান্য পত্রিকায় পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

হিটলার কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণের এই ভয়াবহ শঠতাপূর্ণ কাহিনী যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে জানা যায় নাই। ন্যুরেমবার্গের আদালতে ধৃত নথিপত্র থেকে যেমন এই ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল, তেমনি এই গুপ্ত চক্রান্তের কথা ফাঁস হইয়া গিয়াছিল সেই সাজানো আক্রমণের নাটের গুরু আলফ্রেড নাউজক্সের আদালতের স্বীকারোক্তি থেকে।

পরদিন স্বয়ং হিটলার তাঁর রাইখস্ট্যাগের বক্তৃতায় এই 'পোলিশ আক্রমণের' কাহিনী দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। ধাপ্পাবাজী আর কতদূর যাইতে পারে?…

কিন্তু সেদিনের জার্মানীর উচ্চতম সামরিক মহলেও সামান্য কিছু সংখ্যক হিটলারের বিরোধী ছিলেন, যেমন সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ স্বয়ং এডমিয়াল ক্যানারিস। ৩১শে আগস্ট রাত্রে সামরিক বিভাগের সদর দপ্তরে পোল্যান্ড আক্রমণের বিষম তোড়াজোড় দেখিয়া তিনি জনৈক পদস্থ অফিসারকে স্বল্পালোকিত দরদালানের এক কোণায় ডাকিয়া নিয়া গিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে মন্তব্য করিলেন—

'This means the end of Germany'

—'এর অর্থ জার্মানী খতম্'।

এই ভবিষ্যদ্বাণী কি ইতিহাসে ফলে নাই?[১]

১। The Rise and Fall of the Third Reich—Shirer; P. 719-720

দ্বিতীয় অধ্যায়

নকল যুদ্ধের ফাঁকা আওয়াজ

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর সকাল ১১-১৫ মিনিটে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন লণ্ডন থেকে বেতারযোগে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে গিয়া ক্লান্ত কণ্ঠে (তখন তাঁর বয়স ৭০) বলিলেন ঃ

This morning the British ambassador in Berlin handed to the German Government a final note that unless we heard from them by 11 O' clock that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country is at war with Germany.'

উপসংহারের দিকে তিনি বলিলেন ঃ

Now may God bless you all and may He defend the right. For it is evil thing that we shall be fighting against—brute force, bad faith, injustice, oppression and persecution. And against them I am certain that the right will prevail.'

আর ঐদিন দুপুরবেলা কমন্স সভায় তিনি যে সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা প্রকাশ করিলেন, তাতে সমগ্র ঘটনার এই পরিণতিতে তিনি তাঁর বিষণ্ণ অনুভূতির কথা স্পষ্টরূপেই জানাইয়া দিলেন ঃ

'It is a sad day for all of us. For none is it sadder than for me. Everything that I worked for, everything that I hoped for, everything that I believed in during my public life has crashed into ruins this morning.

'I cannot tell what part I may be allowed to play myself, but trust I may live to see the day when Hitlerism has been destroyed and a restored and liberated Europe has been re-established.'*

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে গিয়া চেম্বারলেনের কণ্ঠে যে ব্যক্তিগত বিষাদ ও হতাশার সুর ফুটিয়া উঠিয়াছিল তা তাঁর পক্ষে আদৌ অস্বাভাবিক ছিল না। কারণ, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীরূপে হিটলারের সমস্ত আগ্রাসী ও বে-আইনী কার্যকলাপে তিনি সায় দিয়া পিছাইলেন এবং সমস্ত প্রকার অনাচার ও অত্যাচার হজম করিলেন এবং শান্তিরক্ষার দোহাই দিয়া ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গেকে তুষ্ট করার জন্য চরম তোষণনীতির পথ ধরিয়াছিলেন। কিন্তু এতেও যখন কুলাইল না, তখন জনমতের চাপে পড়িয়া সেই যুদ্ধের পথেই যাইতে হইল, কিন্তু সেই তাঁর ব্যক্তিগত

*The Second Great War—Vol. I. p. 28

জীবনের সমস্ত 'সাধনা ও স্বপ্ন' যেন চূর্ণ হইয়া গেল। তাঁর ঘোষণাবাণীর মধ্যে সেই হতাশারই সুর।

কিন্তু তথাপি একথাও অস্বীকার করার উপায় নাই যে, তাঁর এই বক্তৃতার মধ্যে মূলগতভাবে যে মর্মান্তিক সত্যগুলি ছিল হিটলারিজমের বিরুদ্ধে এবং অন্যায়, অত্যাচার ও পশুবলের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু হইল সেদিন থেকে, তার পরিণতি চেম্বারলেন দেখিয়া যাইতে পারেন নাই বটে, তবে ইউরোপের শেষ পর্যন্ত মুক্তি ঘটিয়াছিল এবং পুনর্জন্মও হইয়াছিল, কিন্তু চেম্বারলেনের মত সাম্রাজ্যবাদী প্রেমিকদের পথ ধরিয়া নহে।

বৃটেনের যুদ্ধ ঘোষণার (ভারতবর্ষসহ সমস্ত সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের পক্ষ থেকে—একমাত্র কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি ডোমিনিয়নগুলি ছাড়া) ছয় ঘণ্টা পর প্যারিস থেকে ফ্রান্সও হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন. কিন্তু বৃটেনের চেয়েও অনেক বেশী অনিচ্ছার সঙ্গে। কারণ ফ্রান্সের শাসকগোষ্ঠী ও ধনপতি মহলের মনোভাব ছিল—

'—Rather Hitler than Stalin—!'

অবশ্য চেম্বারলেনের তোষণনীতির বিরুদ্ধে বৃটেনের পার্লামেণ্টারি ও সরকারী মহলের এক শক্তিশালী অংশে ক্ষোভ ও অসন্তোষ জমিয়া উঠিতেছিল। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে যখন হিটলারের নিকট চরমপত্র পাঠাইবার সিদ্ধান্ত হইল এবং যুদ্ধ ঘোষিত হইল, তখন কিছু অভিনব প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হ্যালিফাক্স, যিনি তোষণনীতির একজন বড় পাণ্ডা ছিলেন, তিনি পর্যন্ত মন্তব্য করিলেন —'যাক হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেছে, একটা সিদ্ধান্ত তো আমরা নিয়েছি। এরপর আমরা কয়েকজন মিলে ঠাট্টাবিদ্রূপ ও হাস্যকৌতুক করলুম।' আর সরকারবিরোধী দলের পররাষ্ট্রবিষয়ক বক্তা হিউ ড্যালটন সংবাদটা শুনিয়া উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—'খাসা খবর! ভগবানকে ধন্যবাদ!'

কিন্তু চেম্বারলেনের বেতার ভাষণ শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ লণ্ডনের বিমান আক্রমণের সতর্কতাজ্ঞাপক সাইরেনগুলি বাজিয়া উঠিল এবং হুড়মুড় করিয়া লণ্ডনবাসীরা আশ্রয়স্থলে ঢুকিয়া পড়িতে লাগিলেন। স্বয়ং চার্চিল, যিনি সেই সময় লণ্ডনের একটি ফ্ল্যাটে বাস করিতেন, তিনিও আশ্রয়স্থলের দিকে ছুটিলেন। তবে, সঙ্গে 'এক বোতল ব্র্যাণ্ডি ও অন্যান্য আরামদায়ক উপযুক্ত মেডিক্যাল দ্রব্যাদি' নিতে ভুলিলেন না। অবশ্য প্রত্যাশিত বিমান আক্রমণ ঘটিল না, ১০ মিনিটের মধ্যেই 'মুক্তির' সাইরেন বাজিয়া উঠিল। কারণ, বিমান আক্রমণের এই সঙ্কেত ছিল ভুল।[১]

উপরের এই ছোট্ট ঘটনার সঙ্গে পরবর্তীকালের আট মাসের ঘটনার বিচিত্র মিল আছে। কারণ, ঐদিন লণ্ডনে বিমান আক্রমণের ভুল সঙ্কেতের মত গোটা পশ্চিম রণাঙ্গনেই পরবর্তী বসন্তকাল পর্যন্ত যুদ্ধের কেবল ফাঁকা আওয়াজ শুনা গেল। কিন্তু আসল যুদ্ধ কিছুই হইল না। এমনকি, যখন সমগ্র জগৎ উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষায় ছিল কিভাবে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গ তাঁদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পোল্যাণ্ডকে রক্ষার জন্য

১। Britain and the Sceond World War—by Henry Pelling. Collins, 1970. P, 12. এই পুস্তকে চার্চিলের যে ব্র্যাণ্ডির বোতলের কথা বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাঁর মদ্যপানের আসক্তি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

অগ্রসর হন, তখন কিন্তু সবিস্ময়ে দেখা গেল যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও বৃটেনের প্রভুত সৈন্য সমাবেশ সত্ত্বেও একটি গুলীও বর্ষিত হইল না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস—মোট আট মাসকাল সেই বিখ্যাত পশ্চিম রণাঙ্গন এবং রাইন নদীর উভয় তীর স্তব্ধ, ঘুমন্ত ও অলস পড়িয়া রহিল! হিটলারী বিদ্যুৎগতি যুদ্ধে পোল্যাণ্ড অতি দ্রুত খতম হওয়ার পর অক্টোবর মাস থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সুদীর্ঘ দিনগুলি এভাবে কাটিয়া গেল এক অদ্ভুত নকল যুদ্ধের মহড়ায়। এই সময়টাকে চার্চিল বর্ণনা করিয়াছেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে 'টোয়াইলাইট ওয়ার' (যুদ্ধের প্রদোষকাল?) নামে। কিন্তু পশ্চিমের অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা এটার যে বিদ্রূপাত্মক নাম দিয়াছেন, সেটাই সর্বজনের কাছে পরিচিত—পশ্চিম রণাঙ্গনের এই যুদ্ধের নাম 'ফোনি ওয়ার' বা নকল যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধের ফাঁকা আওয়াজ! বার্লিনের রাস্তায় ঘাটে জার্মানরা ব্লিজক্রিগ বা বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের বিপরীত অর্থে এই যুদ্ধকে ঠাট্টা করিয়া বলিত—'সিজক্রিগ' বা 'বসে থাকার যুদ্ধ'! অর্থাৎ 'সিট ডাউন ওয়ার, বোর ওয়ার, ওয়ার অব ওয়ার্ডস্' নামে পরিচিত ছিল।

কিন্তু এই অদ্ভুত 'ফোনি ওয়ার' শব্দটি কে প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন? এই বিষয়ে একেবারে নিশ্চিতরূপে কারুর নাম করা কঠিন। তবে, যতদূর জানা গিয়াছে মার্কিন মহল থেকেই প্রথমে এই নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু একজন ফরাসী ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক 'রোলাঁ ডর্জেলে' দাবী করিয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে রিপোর্ট পাঠাইবার সময় তিনি 'ফোনি ওয়ার' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বৃটিশ রয়েল ইনস্টিটিউটের স্টাফ সদস্য লিখিয়াছেন যে, মার্কিন সেনেটের নামকরা সদস্য উইলিয়াম ই বোরা প্রথম এই শব্দটি 'আবিষ্কার' করিয়াছিলেন এবং তখন থেকেই এই কথাটি চালু হইতে থাকে।[১]

চোখের সামনে পোল্যাণ্ড যখন ধ্বংস হইতেছিল তখনও বৃটেন ও ফ্রান্স তাকে রক্ষার জন্য এক পা অগ্রসর হইলেন না। এমনকি, তার পরেও আট মাস ধরিয়া তাঁরা পশ্চিম রণাঙ্গনে নিষ্ক্রিয় রহিলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে কার্যত সেই সময় পোল্যাণ্ডকে রক্ষা করা কিংবা জার্মানীকে বাধা দেওয়া কি সম্ভব ছিল?—এর উত্তরে বলা হয় যে, ইঙ্গ-ফরাসীর মিলিত সামরিক শক্তির তুলনায় জার্মানীর শক্তি তখন অনেক দুর্বল ছিল এবং সেই সময় পর্যন্ত ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী ইউরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণা ছিল। এমনকি, পরবর্তী কালে বড় বড় জার্মান সেনাপতির স্বীকারোক্তিতে দেখা যায় যে, যদি জার্মানীকে পশ্চিম রণাঙ্গনে সাহস করিয়া আক্রমণ ও আঘাত করা হইত, তবে, হয়তো এই মহাযুদ্ধের ইতিহাস অন্যরকম হইত। প্রসিদ্ধ জার্মান সেনানায়ক জেনারেল আলফ্রেড জড্ল লিখিয়াছেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে ফ্রান্স ও বৃটেনের সম্মিলিত ১১০ ডিভিসন সৈন্য জার্মানীর মাত্র ২৩ ডিভিসন সৈন্যের সম্মুখে একেবারে অলস বসিয়া রহিল। সুতরাং ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ নিবারিত হইতে পারিল না। আর একজন জার্মান সেনাপতি জেনারেল সিগফ্রিড ওয়েস্টফ্যাল লিখিয়াছেন যে, যদি মিত্রশক্তি সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুরু করিতেন, তবে, তাঁরা অনায়াসে রাইন নদী

১। British Foreign Policy During World War II,—by V. Trukhanovsky, 1970 P. 33.

তীরে পৌঁছিতে,এমনকি তা' অতিক্রম করিতে পারিতেন এবং তাহলে যুদ্ধের গতি ফিরিয়া যাইত। এই প্রসঙ্গে বৃটিশ সামরিক ইতিহাস প্রণেতা জেনারেল জে এফ সি ফুলার লিখিয়াছেন ঃ

"পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী প্রতিপক্ষের মাত্র ২৬ ডিভিসন সৈন্যের সম্মুখে ইস্পাত ও কংক্রিটের আশ্রয়ের আড়ালে অলস বসিয়া রহিল, আর তখন তাদেরই একজন সাহসী মিত্রকে (পোল্যান্ড) নিষ্ঠুরভাবে সাবাড় করা হইতেছিল !"

শ্রমিক নেতা হিউ ড্যালটন স্বীকার করিয়াছেন যে, 'পোলদের প্রতি আমাদের (বৃটেনের) আচরণ কোন মতেই সমর্থন করা সম্ভব নয়। কারণ, তাদের আমরা ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাদের মরিতে দিয়াছিলাম এবং তাদের সাহায্যের জন্য আমরা কিছুই করি নাই।'

এমনকি ২৫শে আগস্ট (১৯৩৯) তারিখ যেদিন বৃটেন ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তার আগের দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত কেনেডি ওয়াশিংটনে এই মর্মে রিপোর্ট দিয়াছিলেন যে, চেম্বারলেন তাঁকে বলিয়াছেন যে, 'যাহোক, পোলদের বাঁচাইতে পারিবেন না !'[১]

এই পরাজিতের মনোভাব এবং যুদ্ধের অনিচ্ছা লইয়া বৃটেনের মত ফ্রান্সও পোল্যাণ্ডকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্সের প্রধান সেনাপতি জেনারেল গেমেলাঁ ২৩শে আগস্ট তারিখ (যখন পোল্যাণ্ডের উপর আক্রমণ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল) মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, দু' বছর বা ১৯৪১-৪২ সালের মধ্যে তিনি কোন আক্রমণাত্মক যুদ্ধ সংগঠন করিতে পারিবেন না এবং তাও সম্ভব হইতে পারে যদি বৃটেন সৈন্য দিয়া এবং আমেরিকা মালমশলা দয়া সাহায্য করে !

অথচ জার্মানীর সমর বাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ জেনারেল কাইটেল এবং অপর সেনাপতি জেনারেল হ্যালডার ন্যুরেমবার্গ আদালতে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, পোল্যাণ্ডের যুদ্ধের সময় পশ্চিম রণাঙ্গনে কিছুই ঘটিল না দেখিয়া তাঁরা খুব অবাক হইয়াছিলেন। কারণ, তাঁরা সর্বদাই ভয়ে ভয়ে ছিলেন যে, ফ্রান্সের শক্তিশালী বাহিনী যদি রাইন নদীর দিকে আক্রমণ করে, তবে তাদের ঠেকানো যাইবে না এবং তারা জার্মানীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রমশিল্পের এলাকা রুর অঞ্চল বিপন্ন করিয়া তুলিবে। জার্মানীর তখন আত্মরক্ষার শক্তি সামান্যই ছিল।[২]

আসলে বৃটেনের মত ফ্রান্সের তখন যুদ্ধ করার কোন উৎসাহ বা স্পৃহা ছিল না, বরং চার্চিলের মতে এই যুদ্ধ তাঁরা হারাইয়াছিলেন অনেক আগেই—১৯৩৮ সালের মিউনিকে ও ১৯৩৬ সালের রাইনল্যাণ্ডে এবং তারও আগে যখন হিটলার ভার্সাই সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিলেন।

কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনে 'রক্তপাতহীন' এই অভিনব যুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন হিটলার। তিনি হুকুম দিলেন তাঁর বিনা অনুমতিতে পশ্চিমদিকে যেন কোন আক্রমণ না চালানো হয়। এমনকি একটি প্লেনও যেন উড়িয়া গিয়া বমাবর্ষণ না করে। অর্থাৎ ইঙ্গ-ফরাসী পক্ষকে তিনিও যেন সামরিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে ভুলাইয়া রাখিতে চাহিলেন—যদিও নিজে আদৌ নিষ্ক্রিয় ছিলেন না বরং আক্রমণের পরিকল্পনাগুলি

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ২৮-২৯
২। উইলিয়াম শাইয়ার প্রণীত 'দি রাইজ অ্যান্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ'—পৃষ্ঠা ৭৬২-৬৩

বার বার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এমনকি, আক্রমণের কতকগুলি তারিখও পর পর ঠিক করিয়া আবার পিছাইয়া গেলেন—তখন শীতকাল বা নভেম্বর-ডিসেম্বরের বিশ্রী আবহাওয়ার জন্য। বলা বাহুল্য যে, যে আটমাসকাল নকল যুদ্ধের মহড়ার জন্য সময় পাওয়া গেল, জার্মানী সেই সময়টার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিল জার্মান অর্থনীতিকে পূর্ণতররূপে যুদ্ধের উপযোগী করিয়া তোলার জন্য আর পোল্যাণ্ডের যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতির পূরণ এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের সর্বাত্মক প্রস্তুতির জন্য।

কিন্তু জার্মানীর তুলনায় সেই সময় ফরাসী বাহিনীর অধিকতর সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের ভীরু মানসিকতা এবং আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রতি অত্যধিক ঝোঁক পশ্চিম রণাঙ্গনের "সুবর্ণ সুযোগ" (জার্মান সেনাপতিদের মতে) হাতছাড়া হইয়া গেল। আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিহারের অন্যতম বিশেষ কারণ ছিল ফ্রান্সের সুবিখ্যাত ম্যাজিনো লাইনের (ইস্পাত ও কংক্রিটের নির্মিত দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী —এই সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করা হইবে) উপর নির্ভরশীলতা। অজস্র কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই অদ্ভুত দুর্গশ্রেণী হিটলার আক্রমণ করিতে সাহস পাইবেন না, এমন একটা ধারণা চলতি ছিল। অবশ্য ফ্রান্সের এই ম্যাজিনো লাইনের জবাবে জার্মানীও তাদের পশ্চিম সীমানায় সিগফ্রীড্ লাইন তৈয়ার করিয়াছিল যদিও এই দুর্গশ্রেণী ফ্রান্সের মত উৎকৃষ্ট ও মজবুত ছিল না এবং হিটলার আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে বিশ্বাসও করিতেন না। কিন্তু একদিকে ম্যাজিনো লাইন এবং অন্যদিকে সিগফ্রীড্ লাইন —এই দুই লাইনের কংক্রিটের আড়ালে বসিয়া দুই দিকের সৈন্যরাই যেন যুদ্ধের বদলে আড্ডা দিতে লাগিল। কারণ, একটি কামানের গোলাও নিক্ষিপ্ত হইল না। তখন বৃটিশ অভিযাত্রী দলের ফ্রান্সে আগত সৈন্যরা তো ঠাট্টা করিয়া গান বাঁধিলেন—

"We will hang out our washing on the Siegfried Line—
If the Siegfried Line's still there !'

অর্থাৎ আমরা সিগফ্রীড্ লাইনে আমাদের জামা-কাপড় কেচে মেলে দিব—অবশ্য যদি ততদিন সিগফ্রীড্ লাইন টিকে থাকে।[১]

[নকল যুদ্ধের অভিনব মহড়ার সময় সেদিনের সংবাদপত্রে এমন একটা মুখরোচক গল্পও প্রচারিত হইয়াছিল যে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন পশ্চিম রণাঙ্গন পরিদর্শনে আসিয়া তাঁর বিখ্যাত ছাতাটি ফেলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং পরদিন গোয়েবলসের দপ্তর রেডিও থেকে প্রচার করিল যে, 'চেম্বারলেন সাহেব, আপনার ছাতাটি ফেরৎ নিয়ে যাবেন। আমরা যত্ন করে রেখে দিয়েছি'।

অবশ্য যুদ্ধের কোন ইতিহাসে চেম্বারলেন ছাতা শীর্ষক এই গল্পটি চোখে পড়ে নাই, কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের নাম করিয়া কি হাস্যকর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, বোধহয় সেকথা প্রমাণের জন্যই এই গল্পের সৃষ্টি।]

* * *

পোল্যাণ্ড বা পূর্ব দিকে জার্মান বাহিনীর বৃহত্তম অংশ যখন ব্যস্ত ছিল, তখন ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী পশ্চিম দিক হইতে আক্রমণ করিলে (যান্ত্রিক যুদ্ধের অপ্রস্তুতি সত্ত্বেও) জার্মানী যে বিপদে পড়িত, একথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সে সব কিছুই ঘটিল না, তবে কিছু প্রচার-পুস্তিকার বা প্রোপাগাণ্ডার লড়াই হইয়াছিল।

১। The War—by Louis L. Snyder, P. 134

বৃটিশ বিমানগুলি জার্মানীর উপর কিছু ইস্তাহার বিলি করিয়াছিল এবং জার্মানীর দিক হইতেও ইঙ্গ-ফরাসীর বিরুদ্ধে প্রচুর প্রোপাগাণ্ডা চালানো হইল। বৃটেনের রাজা ষষ্ঠ জর্জ পর্যন্ত এই তাজ্জব ব্যাপার দেখিয়া ৩রা মার্চ, ১৯৪০ তারিখে তাঁর ডায়েরীতে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ছয় মাস যাবৎ আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি কিন্তু একমাত্র কথার লড়াই ও প্রোপাগাণ্ডা ছাড়া আর কিছুই ঘটে নাই।[১]

একথা সত্য যে চেম্বারলেনকে কেন্দ্র করিয়া সেদিন বৃটিশ সরকারী মহলে তোষণ-কারীর সংখ্যাই বেশী ছিল। তথাপি হিটলারী আচরণে ধৈর্য হারাইয়া স্বয়ং চেম্বারলেনই হঠাৎ ২৯শে মার্চ (১৯৩৯) তারিখ পোল্যাণ্ডকে গ্যারাণ্টি দিলেন তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য—যে সংবাদ শুনিয়া হিটলার ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন এবং শ্বেত পাথরের টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন যে, তিনি বৃটিশকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িবেন। (প্রত্যক্ষদর্শী এডমিরাল ক্যানারিসের বর্ণনা থেকে) অবশ্য হিটলার এই 'শিক্ষা' দিয়াছিলেন পোল্যাণ্ডকে ও বৃটেনকে একই সঙ্গে। অর্থাৎ বৃটিশ প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পোল্যাণ্ড বিদ্যুৎগতিতে চুরমার হইয়া গেল। কিন্তু পোল্যাণ্ডের এই দ্রুত পরাজয়ের পর লণ্ডনের এক শ্রেণীর সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক নেতা জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেনের যুদ্ধ ঘোষণা সত্ত্বেও পাল্টা সুর গাহিতে শুরু করিলেন। গোঁড়া রক্ষণশীল নেতা আলফ্রেড ডাফ কুপার এবং সাণ্ডে টাইমস পত্রিকা জার্মানীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, এই যুদ্ধ চালাইয়া লাভ নাই, তবে, জার্মানীতে হিটলার ও নাৎসী শাসনের বদলে অন্য কোন দক্ষিণপন্থী শাসনের প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে এবং সেই অবস্থায় বৃটেনের সঙ্গে বুঝাপড়া সহজতর হইবে।

১৯৩৯ সালের লণ্ডনে রাজনৈতিক মহলের কোন কোন অংশ সত্যই বিশ্বাস করিতেন যে, বার্লিনের শাসকমহলে হিটলারের বিরোধী যে মুষ্টিমেয় লোকের একটি গ্রুপ আছে বিশেষ করে কিছু কিছু অসন্তুষ্ট সেনাপতি আছেন, তাঁদের হাত শক্তিশালী করিয়া ক্ষমতায় আনিতে পারিলে হিটলারের বদলে এই দলের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। এই মনোভাবের প্রতিফলন স্বরূপ দেখা যায় যে, ১৯৩৯ সালের শরৎকালে দুই পক্ষ থেকেই কিছু কিছু শান্তির টোপ ফেলা হইয়াছিল। এজন্য যুক্তি দেখান হইল যে, বৃটেন ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ড রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, কিন্তু রাষ্ট্র হিসাবে পোল্যাণ্ডেরই যখন আর কোন অস্তিত্ব নাই, তখন এই যুদ্ধ চালাইবারও কোন হেতু নাই। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসগুলিতে এজন্য বৃটেন ও জার্মানীর মধ্যে 'শান্তি' প্রতিষ্ঠার কিছু কিছু চেষ্টা হইয়াছিল এবং এই প্রসঙ্গে বৃটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের এজেণ্ট ব্যারণ ডি রপ্ এবং একজন সুইডিশ ব্যবসায়ী 'Birger Dahlerus'-এর কর্মতৎপরতার কথা বিভিন্ন ইতিহাস পুস্তকে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত চেষ্টা সফল হয় নাই। এমন কি এই সময় হিটলারের 'শান্তি প্রস্তাব'ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। এর কারণ চেম্বারলেনের যুদ্ধপ্রীতি নয়, এর বিশেষ কারণ শেষ পর্যন্ত হিটলারের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা ও অবিশ্বাসের মনোভাব। ১৯৩৯ সালের ৮ই অক্টোবর তিনি তাঁর ভগ্নীকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—'মুশকিল কি জানো৷ হিটলারের কোন কথাই বিশ্বাস করা যায় না!'[২]

১। British Foreign Policy During World War II, Moscow, P, 33

২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক।

কিন্তু হিটলারকে বিশ্বাস করা না গেলেও তাঁর 'মিতা' ও 'বড়দা' মুসোলিনীকেও কি বিশ্বাস করা যায় না? যদি এই দুঃসময়ে অন্ততঃ ইতালীকেও দলে টানা যায়, তাহলেও বৃটেনের মস্ত লাভ। এজন্য মুসোলিনীকে তোয়াজ করার যথেষ্ট চেষ্টা হইল। স্বয়ং চার্চিল ১লা অক্টোবরের এক রেডিও বক্তৃতায় বলকান অঞ্চলে ইতালীর বিশেষ স্বার্থের কথা স্বীকার করিলেন এবং যুদ্ধের পর ইউরোপের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ইতালীর অধিকার মানিয়া লওয়া হইবে বলিয়া এক প্রস্তাব দিলেন এবং নভেম্বর মাসে ঘোষণা করিলেন যে, ভূমধ্যসাগরে বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত একত্রে ইতালীরও 'ঐতিহাসিক অংশীদারত্ব' স্বীকার করা হইবে। এর একমাস আগে বৃটিশ সরকার ইতালী কর্তৃক আলবেনিয়া দখলকে 'কার্যতঃ কূটনৈতিক স্বীকৃতি' দিলেন। আর সেই সঙ্গে অনেকগুলি অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাও ইতালীকে দেওয়া হইল।

কিন্তু এই সমস্তই বৃথা গেল। ১৯৪০ মার্চ মাসে পশ্চিম রণাঙ্গনে হিটলারের সংকল্পিত অভিযানের মুখে ফুরার মুসোলিনীর নিকট নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি চাহিলেন যে ইতালী জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করিবে কিনা? ১৮ই মার্চ ব্রেনার গিরিবর্ত্মে হিটলার-মুসোলিনীর মধ্যে সাক্ষাৎকারের পর চূড়ান্তরূপে স্থির হইয়া গেল যে, ফ্যাসিস্ট ইতালীও যুদ্ধযাত্রায় নাৎসী জার্মানীর সঙ্গী হইবে। সুতরাং ইতালীকে দলে টানিবার জন্য বৃটেনের লোভনীয় প্রস্তাবগুলি মাঠে মারা গেল।...

এদিকে যুদ্ধ বাধিবার পর চেম্বারলেন তাঁর মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করিলেন এবং শান্তির সময়কার বৃহৎ মন্ত্রিসভার বদলে (প্রথম মহাযুদ্ধে লয়েড জর্জের অনুকরণে) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্ত্রিসভা কিংবা ওয়ার-ক্যাবিনেট গঠন করিলেন। ২৩ জনের বদলে এই যুদ্ধ-মন্ত্রিসভা চেম্বারলেন বাদে মাত্র আটজন সদস্য নিয়া গঠিত হইল এবং এই মন্ত্রিসভার হাতে সমগ্র যুদ্ধপরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হইল। চেম্বারলেন ছাড়া এই যুদ্ধ-মন্ত্রিসভায় স্থান পাইলেন স্যার জন সাইমন (অর্থমন্ত্রী), ভাইকাউন্ট হ্যালিফ্যাক্স (পররাষ্ট্র মন্ত্রী), স্যার স্যামুয়েল হোর (লর্ড প্রীভি সীল), লর্ড হাঙ্কি (দপ্তরহীন মন্ত্রী), লর্ড চ্যাটফিল্ড (প্রতিরক্ষা বিভাগীয় সংযোগসাধন মন্ত্রী), উইনস্টোন চার্চিল (নৌবিভাগীয় মন্ত্রী), লেসলি হোর বেলিসা (যুদ্ধমন্ত্রী) এবং স্যার কিংসলি উড্ (বিমানসচিব)। লক্ষ্য করিবার এই যে, এই যুদ্ধ-মন্ত্রিসভার মধ্যে একমাত্র চার্চিল ও হোর বেলিসা ছাড়া আর বাকী সকলেই ছিলেন চেম্বারলেনের মিউনিক নীতির একনিষ্ঠ সমর্থক। অথচ চার্চিলের জনপ্রিয়তা ছিল বেশী, এজন্য তাঁকে না নিয়েও উপায় ছিল না।[১] কিন্তু চেম্বারলেন চার্চিলকে মন্ত্রিসভার এমন কোন পদ দিতে চাহিলেন না, যে পদের সুযোগ নিয়া তিনি যুদ্ধের সমগ্র রণনীতির উপর কর্তৃত্ব খাটাইতে পারেন। অর্থাৎ মিনিস্টার ফর কো-অর্ডিনেশন অব্ ডিফেন্স এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি তিনি দিলেন এডমিরাল লর্ড চ্যাটফিল্ডকে আর চার্চিলকে সেই আগেকার (১৯১৪-১৫ সালের অনুরূপ) নৌবিভাগেই ঠেলিয়া দিলেন।[২]

সাধারণতঃ যুদ্ধের সংকটে প্রায় সমস্ত দেশের জাতীয় মন্ত্রিসভা বা কোয়ালিশন, অর্থাৎ সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু চেম্বারলেনের তোষণনীতি

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃ ৪৫
২। Britain and the Second World War—by Henry Pelling; P. 51.

রক্ষণশীলদের বাইরে যথেষ্ট ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। এজন্য লেবর এবং লিবারেল কিংবা শ্রমিক ও উদারনৈতিক উভয় দলই চেম্বারলেনের মন্ত্রিসভায় সদস্যপদ গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু যদিও তাঁরা মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে বিরত রহিলেন, তবু তাঁরা চেম্বারলেনকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানাইয়া যাইতে লাগিলেন। যদি এই সমর্থন না ঘটিত, তবে, সেই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা আরও জটিল হইয়া পড়িত। কারণ, চেম্বারলেনের নীতির বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের একাংশের মধ্যেও মতবিরোধ ছিল।

যদিও ফ্রান্স সেই সময় বৃটেনের একমাত্র সমর-সঙ্গী ছিল, তবু বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, উভয়ের মধ্যে মনের মিল ছিল না। বরং পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল। অবশ্য এর কারণ রহিয়াছে ইতিহাসের গভীরে। ইউরোপীয় কূটনীতিক ও শক্তিদ্বন্দ্বে প্রভাব এবং আধিপত্য খাটাইবার চেষ্টায় ফ্রান্স ও বৃটেনের চিরন্তন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও জার্মানী সম্পর্কে ভীতি ইত্যাদি মিলিয়া ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্ককে অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর উভয়ের পক্ষ হইতে অনিচ্ছার সঙ্গে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইয়া থাকিলেও এই দুই সমরসঙ্গী পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখিতেন। বৃটেনের মনে এই আশংকা ছিল যে, ফ্রান্স জার্মানীর সঙ্গে এক সন্ধিচুক্তি করিয়া ফেলিতে পারে। আর ফ্রান্সের মনে এই সন্দেহ ছিল যে, বৃটেন এই যুদ্ধে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে তার আসল শক্তি নিয়োগ না করিয়া (প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটেনের আসল উদ্বেগ ছিল সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ রক্ষার জন্য, এজন্য মধ্যপ্রাচ্যে যথাসম্ভব বেশী শক্তি সংহত করা হইয়াছিল) অতীতের মতই সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য কৌশল অবলম্বন করিতে পারে। এই মনোভাবের ফলে গোড়ার দিকে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ চালাইবার জন্য ঐক্য ও সংহতি গড়িয়া উঠিল না। জার্মানীর সঙ্গে যাতে পৃথক যুদ্ধবিরতি ও শান্তি চুক্তি সম্পাদিত না হইতে পারে, তেমন প্রতিশ্রুতিমূলক সম্মিলিত ঘোষণাপত্রে (জয়েন্ট ডিক্লারেশন) স্বাক্ষরদানের জন্য বৃটিশ প্রস্তাব সম্পর্কে ফ্রান্সের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড দালাদিয়ের বিশেষ কোন উৎসাহ দেখাইলেন না—১১ই ডিসেম্বর ১৯৩৯। অবশেষে মন্ত্রিসভা থেকে দালাদিয়েরের বিদায় এবং পল রেনোর প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর ফরাসী ও বৃটিশ সরকার ২৮শে মার্চ, ১৯৪০ এই মর্মে এক সম্মিলিত ঘোষণায় স্বাক্ষর দিলেন যে, যুদ্ধ চলাকালীন তাঁরা কেউ পরস্পরের সম্মতি ছাড়া জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতি বা শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিবেন না।…

পশ্চিম রণাঙ্গনে যখন "ভেজাল যুদ্ধের" বিচিত্র কারবার চলিতেছিল আট মাস ধরিয়া তখন কিন্তু রুশ-ফিনিশ যুদ্ধে (১৯৩৯ নভেম্বর—১৯৪০ মার্চ) সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন মহলে উৎসাহের অভাব ছিল না। সুতরাং যুদ্ধের পিছনে রাজনৈতিক মতাদর্শও লক্ষ্য করিবার মত। সেই কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

রুশ-ফিনিশ যুদ্ধ

১৯৩৯ সালের শরৎকাল থেকে ১৯৪০ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত পশ্চিম রণাঙ্গনে যখন নকল যুদ্ধের মহড়া কিংবা 'ভেজাল যুদ্ধ' (রণপণ্ডিত লিডেল হার্টের ব্যাখ্যা অনুসারে) চলিতেছিল, তখন কিন্তু উত্তর-পূর্ব দিকে আর একটি অভিনব যুদ্ধের অনুষ্ঠান হইল। এই যুদ্ধকে যদি দৈত্য ও বামনের লড়াই বলিয়া অভিহিত করা যায়, তবে, নিশ্চয়ই অত্যুক্তি করা হইবে না। কারণ, বিশাল সোভিয়েট রাশিয়ার তুলনায় ফিনল্যাণ্ড নিতান্তই ক্ষুদ্রাকৃতি বামন ছাড়া আর কি? কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, এই বামনের সঙ্গে যুদ্ধে দৈত্যরূপী সোভিয়েট ইউনিয়ন এত নাজেহাল হইয়াছিল যে, উহার ফলে সোভিয়েট সামরিক শক্তি সম্পর্কে বাইরের জগতে অত্যন্ত ভুল ধারণার প্রচার হইয়াছিল। এমনকি উইনস্টোন চার্চিলের মত ধুরন্ধর পর্যন্ত ১৯৪০, ২০শে জানুয়ারীর এক বেতার বক্তৃতায় তাচ্ছিল্যের সুরে বলিলেন, ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার কেরামতি ধরা পড়িয়া গিয়াছে—রেড আর্মি বা লাল ফৌজের সামরিক অক্ষমতা (মিলিটারি ইনক্যাপাসিটি অব দি রেড আর্মি) জগতের সামনে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। চার্চিলের এই মতামতের কিছুটা প্রভাব হিটলারের উপরেও পড়িয়াছিল, যার ফল পরবর্তী বছরে (হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ) অত্যন্ত দূরপ্রসারী হইয়াছিল।[১]

কিন্তু দৈত্য ও বামনের মধ্যে এই লড়াই বাধিল কেন? পোল্যাণ্ডের যুদ্ধে জার্মানীর বিদ্যুৎগতি জয় দেখিয়া স্বভাবতই সোভিয়েট রাশিয়া উদ্বিগ্ন হইল এবং অবিলম্বে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল। পোল্যাণ্ডের পার্টিশানের দ্বারা রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে আপাতত পশ্চিম সীমানার দূরত্ব কয়েক মাইল বাড়ানো গিয়াছে বটে, কিন্তু পশ্চিমদিকের তুলনায় উত্তরদিকের অবস্থা অনেক বেশী বিপজ্জনক ছিল। রুশ-জার্মান চুক্তির গোপন সর্ত অনুসারে অবশ্য বাল্টিক রাজ্যগুলিকে 'সোভিয়েটের প্রভাবাধীন এলাকা' হিসাবে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। সুতরাং প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে, বিশেষভাবে লেনিনগ্রাদের নিরাপত্তার জন্য রাশিয়া উত্তরদিকের এই 'খোলা দরজাগুলি' বন্ধ করিয়া দিতে চাহিল। এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া লিথুয়ানিয়া ও ফিনল্যাণ্ড—এই চারটি বাল্টিক রাজ্য (বাল্টিক সমুদ্রতীরবর্তী বলিয়া এগুলি বাল্টিক রাজ্য নামে অভিহিত ছিল এবং সোভিয়েট বিপ্লবের আগে এগুলি জারের বিশাল রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল) সম্পর্কে সোভিয়েট প্রতিরক্ষার প্রশ্ন দেখা দিল। ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯, পোল্যাণ্ড বাঁটোয়ারার দিন এস্তোনিয়ার সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার যে সন্ধি হইল, তার ফলে এস্তোনিয়াতে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার পাইল রাশিয়া এবং অনুরূপ সন্ধিচুক্তি ল্যাটভিয়া (৫ই অক্টোবর) ও লিথুয়ানিয়ার সঙ্গেও (১০ই অক্টোবর) স্বাক্ষরিত হইল। লিথুয়ানিয়াকে 'পুরস্কারস্বরূপ' ভিলনা শহর ও সন্নিহিত অঞ্চল দেওয়া হইল। এভাবে তিনটি বাল্টিক রাজ্যের সঙ্গে চুক্তির ফলে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের দক্ষিণ তীরের উপর

১। History of the Second World War—Liddell Hart, 1970. P. 45.

সোভিয়েট রাশিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু উপসাগরের উত্তর দিকটা এবং ক্যারেলিয়া যোজকের উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে ভবিষ্যতে কোন শত্রুপক্ষের আক্রমণে লেনিনগ্রাদের সমূহ বিপদ দেখা দিবে। কারণ, উত্তরদিকের ফিনল্যাণ্ডের এই সীমানা থেকে লেনিনগ্রাদের দূরত্ব মাত্র ২০ মাইল। রণনীতির দিক থেকে এই অঞ্চলটা—লাডোগা হ্রদ ও ফিন উপসাগরের মধ্যবর্তী ক্যারেলিয়া যোজক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এই দিকটিতেই বিখ্যাত ম্যানারহাইম লাইন (ফ্রান্সের ম্যাজিনো এবং জার্মানীর সিগফ্রীড লাইনের অনুকরণে) অবস্থিত। ফিনল্যাণ্ডের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল কার্ল ফন ম্যানারহাইমের নামানুসারে এই দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণীর নামকরণ হইয়াছিল (ম্যানারহাইম ১৯১৭ সালে সোভিয়েট বিপ্লবের হাত থেকে ফিনল্যাণ্ডকে 'রক্ষা' করিয়াছিলেন)। এবং এগুলি তৈয়ার হইয়াছিল জার্মান সামরিক কর্তাদের তত্ত্বাবধানে এবং তাঁরাই ফিনিশ সৈন্যবাহিনীকে ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণও দিয়াছিলেন।[1] সুতরাং জার্মান সামরিক মহলের সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের আগেই যোগাযোগ ছিল এবং ফিন গভর্নমেণ্ট অত্যন্ত সোভিয়েট বিরোধী ছিলেন। সুতরাং সোভিয়েট সরকারের মনে এই সন্দেহ দেখা দিল যে, যদি আসন্ন-ভবিষ্যতে জার্মানী ফিনল্যাণ্ড দখল করিয়া নেয়, কিংবা ফিনল্যাণ্ডই যদি স্বেচ্ছায় জার্মানীর মিত্রে পরিণত হয়, তাহলে ফিনিশ সীমান্তের এত নিকটবর্তী লেনিনগ্রাদ প্রতিপক্ষের একেবারে কামানের গোলার মুখে পড়িবে। ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরের কৃপায় ইউরোপে যে অরাজক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গ যেভাবে জার্মানীকে পূর্বদিকে আগাইয়া যাওয়ার উস্কানি দিয়াছে, তাতে সোভিয়েট বিরোধী ফিনল্যাণ্ডকে বিশ্বাস করা কঠিন। সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়নের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী লেনিনগ্রাদের (লোকসংখ্যা ৩২ লক্ষ) নিরাপত্তা নিশ্চয়ই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া রাখা যায় না। এই প্রসঙ্গে চার্চিল লিখিয়াছেন যে, পশ্চিমদিক থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রবেশের যে পথগুলি ছিল সেগুলি বন্ধ করার জন্য রাশিয়া রুশ-জার্মান চুক্তির 'স্পিরিট' বা ভাবধারা অনুসারেই উদ্যোগী হইল। এই দিক দিয়া প্রবেশের তিনটি পথ ছিল—একটি পূর্ব প্রুশিয়ার ভিতর দিয়া বাল্টিক রাজ্যগুলির অভ্যন্তর ভাগের মাধ্যমে। দ্বিতীয়টি ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের প্রবেশপথ দিয়া এবং তৃতীয়টি খাস ফিনল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া ক্যারেলিয়ান যোজকের উপর দিয়া ফিনিশ সীমান্তের এমন এক বিন্দুতে যেখান থেকে লেনিনগ্রাদ শহরতলীর দূরত্ব মাত্র ২০ মাইল ছিল। ১৯১৯ সালে এই দিক দিয়া লেনিনগ্রাদের কি বিপদ ঘটিয়াছিল, সোভিয়েট রাশিয়া তা ভুলিয়া যায় নাই। এমনকি জেনারেল কোলচাকের (সোভিয়েট বিপ্লবের বিরোধী) হোয়াইট রাশিয়ান গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত প্যারিস শান্তি সম্মেলনে এই মর্মে দাবী উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, রুশ রাজধানীর নিরাপত্তার জন্য বাল্টিক রাজ্যগুলির ও ফিনল্যাণ্ডের ঘাঁটি প্রয়োজনীয়। ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালে বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে প্রস্তাবিক চুক্তি আলোচনার সময়েও স্ট্যালিন বাল্টিক রাজ্যগুলির উপর জোর দিয়াছিলেন।

সুতরাং স্বভাবতঃ তিনটি বাল্টিক রাজ্যের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তির পর সোভিয়েট সরকার বাকী বাল্টিক রাজ্য ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গেও বুঝাপড়া করিতে উদ্যোগী হইলেন।

৫ই অক্টোবর থেকে উভয় সরকারের মধ্যে এই সম্পর্কে আলোচনা শুরু হইল এবং ১৪ই অক্টোবর সোভিয়েট সরকারের পক্ষ থেকে তিনটি দাবী উত্থাপিত হইল। যথা—
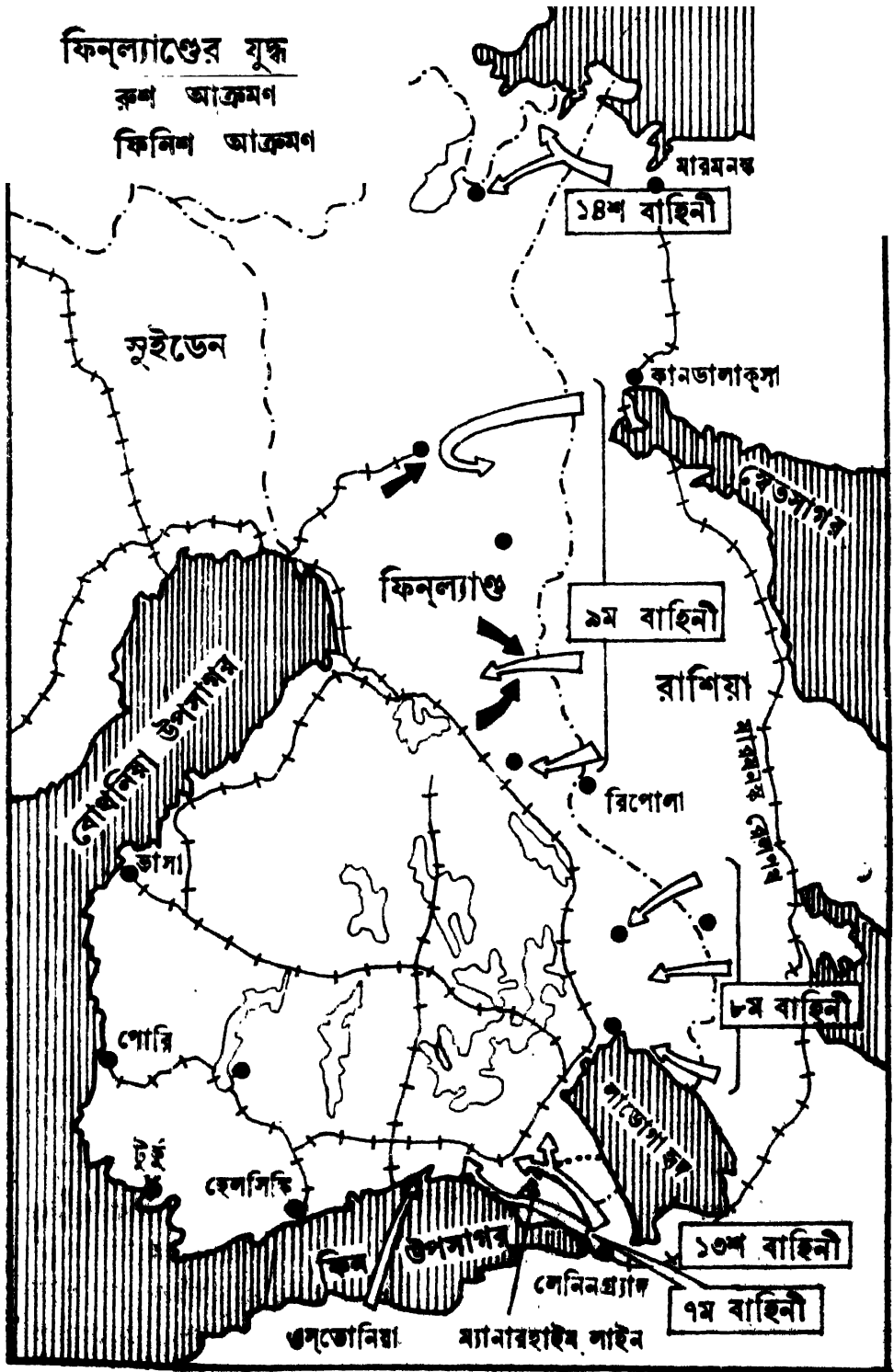
(১) এস্থোনিয়া থেকে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের ওপারে হ্যাঙ্গো বন্দরে একটি নৌ-ঘাঁটি স্থাপনের জন্য বন্দরটি ইজারা দিতে হইবে ৩০ বছরের জন্য। (এর উদ্দেশ্য ছিল কোন শত্রুর পক্ষে ফিন উপসাগরে প্রবেশের মুখ বন্ধ করা।)

(২) উপসাগরের পথে লেনিনগ্রাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য হগল্যাণ্ড, সিয়েসকারি প্রভৃতি ৫টি দ্বীপ রাশিয়ার হাতে অর্পণ করা।

(৩) ক্যারেলিয়ান যোজকের ২৭৬১ বর্গ কিলোমিটার (বা ১০৬৬ বর্গমাইল) পরিমিত ভূমি রাশিয়াকে দিতে হইবে। অর্থাৎ লেনিনগ্রাদের উত্তর সীমানাকে কামানের পাল্লার বাহিরে রাখিতে হইবে এবং এজন্য প্রস্তাবিত নূতন সীমানাকে নিরস্ত্রীকৃত রাখিতে হইবে। এই 'ভূমি দানের' ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সোভিয়েট রাশিয়া অবশ্য ফিনল্যাণ্ডকে উত্তরাংশের পূর্বদিকের মধ্যবর্তী সীমানায় দ্বিগুণ পরিমিত (২১৩৪ বর্গমাইল) জমি অর্পণ করিবে।

কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া এই আলোচনা চলিল বটে, কিন্তু ফিনল্যাণ্ড তার সার্বভৌমত্বের মর্যাদার দাবীতে হগল্যাণ্ড দ্বীপ হস্তান্তর করিতে এবং নিরপেক্ষতার দাবীতে হ্যাঙ্গো বন্দরকে সোভিয়েট নৌঘাঁটিতে পরিণত করিতে দিতে অস্বীকৃত হইল। কিন্তু এই সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইলে সোভিয়েট রাশিয়ার উত্তর দিকের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা যেমন আগের তুলনায় শক্তিশালী হইত, তেমনি ফিনল্যাণ্ডের নিরাপত্তাও ক্ষতিগ্রস্ত হইত না। বরং রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডকে যে পরিমাণ জমি দিতে চাহিয়াছিল, তাতে ফিনল্যাণ্ডের কোমরের মত সরু সীমানা আরও চওড়া হইতে পারিত। অবশ্য এই সমস্ত বিলি-ব্যবস্থার ফলে জার্মানীর পক্ষে রাশিয়াকে আক্রমণের জন্য ফিনল্যাণ্ডকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের তেমন সুযোগ জুটিত না। অপরপক্ষে ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ চালাইবার জন্য রাশিয়ারও তেমন কোন সুবিধা হইত না।

কিন্তু ১৩ই নভেম্বর, ১৯৩৯, ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার আলোচনা ভাঙ্গিয়া গেল এবং তারপর নভেম্বরের শেষের দিকে সীমান্তের একটা ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া রাশিয়া অভিযোগ করিল যে, ফিনিশ সৈন্যেরা গায়ে পড়িয়া গুলী-গোলা চালাইয়াছে এবং সীমান্তরক্ষী কয়েকজন সোভিয়েট সৈন্য মারা পড়িয়াছে। যদিও এই অভিযোগের সত্য-মিথ্যা নির্ণীত হয় নাই (অবশ্য ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছিল), তথাপি রাশিয়া দাবী করিল যে, সীমান্ত থেকে ফিনিশ সৈন্যবাহিনীকে ২০-২৫ কিলোমিটার দূরে সরাইয়া নিতে হইবে। কিন্তু ফিনল্যাণ্ড এই দাবী মানিতে অস্বীকৃত হইল। তখন ২৯শে নভেম্বর মলোটোভ বেতারযোগে যে কথা ঘোষণা করিলেন সাদা কথায় তার অর্থ ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ! কারণ, মলোটোভের মতে দুই মাসের আলোচনায়ও ফিনিশ সরকারের সঙ্গে কোন মীমাংসা তো হলই না, উল্টা ফিনিশ সৈন্যেরা লেনিনগ্রাদ এলাকার সোভিয়েট সৈন্যদের উপর গুলীবর্ষণ করিয়াছে। এই একই ঘোষণায় মলোটোভ 'গায়ে পড়িয়া' আরও উল্লেখ করিলেন যে, ফিনিশ গভর্নমেন্টের রাজনৈতিক চরিত্র যাই হোক না কেন ফিনল্যাণ্ডকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়াই সোভিয়েট ইউনিয়ন মনে করে। অথচ এই অভিনব ঘোষণার তিন দিন বাদেই রাশিয়ার তত্বাবধানে একটি তাঁবেদার ফিনিশ সরকার গঠিত হইল।

একজন ফিনিশ কমিউনিস্ট নেতার অধীনে। তাঁর নাম অটো কুশিনেন, যিনি ২০ বছর ধরিয়া সোভিয়েট রাশিয়াতেই পলাতক ছিলেন এবং এই ব্যক্তির অধীনে তেরিজোকি নামক স্থানে (ফিনিশ সীমান্ত থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে ফিনল্যান্ড উপসাগরের তীরে এই ছোট্ট শহরটি অবস্থিত। যেখানে জারের আমলে পেট্রোগ্রাদের লোকেরা প্রমোদ ভ্রমণে যাইত) এই নূতন তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল। আরও আশ্চর্যের কথা এই তাঁবেদার সরকারকে নাকি সোভিয়েট জনগণ সোল্লাসে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল এবং ৩রা ডিসেম্বর তারিখে 'প্রাভদা' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বৃহদাকারে একটি ফটো ছাপা হইল যাতে দেখা যায় যে, মলোটোভ সোভিয়েট সরকারের পক্ষ থেকে 'ফিনিশ ডেমোক্র্যাটিক রিপাব্লিকে'র সঙ্গে পারস্পরিক মৈত্রী, সহযোগিতা ও সাহায্যের চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতেছেন এবং মলোটোভের পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন ঝদানোভ, ভরোশিলোভ ও স্ট্যালিন প্রমুখ প্রথম সারির সোভিয়েট নেতারা আর সেই সঙ্গে কুশিনেন! কিন্তু প্রকাশিত ফটোতে এই নূতন কুশিনেন সরকারের অন্য কোন মন্ত্রীর চেহারা দেখা গেল না! অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই যেন হাস্যকর এবং সাজানো।

কিন্তু রুশ-ফিনিশ যুদ্ধের সময় আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে যেগুলি আজ দূরবর্তী সময়ের ব্যবধানে অত্যন্ত বিচিত্র, এমন কি তাজ্জব বলিয়া মনে হইবে। যেমন, ১৯৩৯, ২১শে ডিসেম্বর তারিখটি ছিল স্ট্যালিনের ৬০ তম জন্মদিন। বলা বাহুল্য যে, সোভিয়েট নেতারা এই উপলক্ষে স্ট্যালিনের বন্দনায় গগন বিদীর্ণ করিলেন। যেমন কাগানোভিচ বলিলেন—

"Stalin the Great Engine-Driver of History"

মিকোয়ান বর্ণনা করিলেন—

'Stalin is Lenin To-day' ইত্যাদি। কেবল সোভিয়েট নেতারা নন, জার্মানী থেকে নাৎসী অধিনায়ক হিটলার স্ট্যালিনের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন বাণী পাঠাইলেন :

Please accept my most sincere congratulations. I send at the same time my very best wishes for your personal good health and for a happy future for the peoples of a friendly Soviet Union.—'

Adolf Hitler

নাৎসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ এবং অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্রনেতাও শুভেচ্ছা পাঠাইলেন এবং স্ট্যালিন সেগুলির জবাব দিলেন। কিন্তু হিটলারের পরেই বোধহয় এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নতুন 'ফিনিশ গণতান্ত্রিক রিপাব্লিকে'র 'রাষ্ট্রপ্রধান' কুশিনেনের তারবার্তা। এই বার্তায় তিনি 'হোয়াইট গার্ড' ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী দালালদের কবল থেকে ফিনল্যান্ডের মুক্তি বিধানের জন্য লাল ফৌজের সঙ্গে ফিনিশ শ্রমজীবী মানুষের হাতে হাত মিলাইয়া লড়াই চালাইবার' সংকল্প জানাইলেন এবং স্ট্যালিনও যথারীতি 'পিপলস গবর্নমেন্ট অব ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রপ্রধানকে' এই মর্মে শুভেচ্ছা জানাইলেন যে, 'ম্যানারহাইম-ট্যানার গ্যাং'-এর অত্যাচার থেকে ফিনিশ জনগণ যেন পূর্ণ বিজয় লাভ করিতে পারে।'

এই নূতন তাঁবেদার সরকার ফিনিশ সরকারের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার দাবীগুলি পর্যন্ত মানিয়া লইল। বলাবাহুল্য যে, পরবর্তী কালে রুশ-ফিনিশ যুদ্ধের অবসানে কুশিনেন প্রতিষ্ঠিত এবং বহু বিজ্ঞাপিত এই নূতন 'ফিনিশ পিপলস গবর্ণমেণ্টের' কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধে এই সমস্ত ঘটনা যেমন অদ্ভুত, এমন কি ছেলে-মানুষীর পর্যায়ে ছিল, তেমনি এই যুদ্ধের গোড়ার দিকে রাশিয়ার বিপর্যয়ও ছিল মর্মান্তিক। ২৮শে নভেম্বর রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল করিয়া দিল এবং ৩০শে নভেম্বর রুশ আক্রমণ শুরু হইল। ফিনল্যাণ্ডের সীমানা যেখানে উত্তরে পেটসামো বন্দর (মেরু সমুদ্রতীর) থেকে দক্ষিণে ৮০০ মাইল দূরবর্তী লেনিনগ্রাদ এলাকা পর্যন্ত আসিয়া মিশিয়াছে, সেই রুশ-ফিনিশ সীমানা ধরিয়া ৫টি সোভিয়েট বাহিনী (১৪নং ৯নং ৮ং ১৩নং এবং ৭নং আর্মি) কিংবা মোট লক্ষাধিক সৈন্য পাঁচটি স্থানে ফিনল্যাণ্ডকে আক্রমণ করিল। কিন্তু বামনরূপী ফিনল্যাণ্ড দৈত্যরূপী সোভিয়েট ইউনিয়নকে যেভাবে বাধা দিল, তা সত্যই বিস্ময়কর। ক্ষুদ্র ফিনল্যাণ্ডের অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক সৈন্যেরা (মোট সৈন্য সংখ্যা মাত্র ২ লক্ষ ছিল।) বৃহত্তর সংখ্যক সোভিয়েট সৈন্যের বিরুদ্ধে কেবল রণনীতি ও রণকৌশলের চমৎকারিত্বই দেখাইল না, তাদের বীরত্ব এবং সাহসিকতাও ছিল অপূর্ব। সোভিয়েট রাশিয়া এই যুদ্ধকে যেমন গভীরভাবে গ্রহণ করে নাই, তেমনি আয়োজনও ছিল ঢিলে-ঢালা গোছের কিংবা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। তারপর ফিনল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থার খবরও তাদের ভাল জানা ছিল না। সোভিয়েট নেতারা মনে করিয়াছিলেন যে রাশিয়ার মত সুবৃহৎ শক্তির আক্রমণের মুখেই হেলসিংকির গবর্নমেণ্ট ভয়ে হাঁটিয়া যাইবে এবং 'ক্যাপিটালিস্টদের অত্যাচার' থেকে ফিনিশ জনগণ 'মুক্তিলাভের' জন্য আগাইয়া আসিবে। কিন্তু মস্কোর কর্তাদের সমস্ত হিসাবই ভুল ছিল এবং তাঁরা কার্যত গোড়ার দিকে ল্যাজে-গোবরে একাকার হইলেন। যে পাঁচটি স্থানে এই আক্রমণ শুরু হইল, সেগুলি ছিল—(১) একেবারে উত্তরবর্তী পেটসামোর দিকে, (২) যে রেলপথ ও সড়ক কেমিজারভি শহরকে সুইডিশ সীমান্তবর্তী টোরনিয়ার সঙ্গে যুক্ত করিয়াছে, সেই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি, (৩) ফিনল্যাণ্ডকে মধ্যবর্তী অংশে দ্বিখণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ, (৪) চতুর্থ আক্রমণ ঘটিল ম্যানারহাইম লাইনের পাশ কাটাইবার জন্য লাডোগা হ্রদের তীর ধরিয়া—যে হ্রদ ছিল ইউরোপের সর্ববৃহৎ এবং (৫) পঞ্চম আক্রমণ ঘটিল সোজাসুজি ম্যানারহাইম লাইনের সুরক্ষিত ব্যূহগুলির অভিমুখে। কিন্তু এই সমস্ত আক্রমণ সত্ত্বেও ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে একান্ত উত্তরবর্তী পেটসামো বন্দর দখল করা ছাড়া লালফৌজ মধ্যবর্তী রণাঙ্গনে কিংবা দক্ষিণে ক্যারেলিয়ার যোজক এলাকায় কোনই সুবিধা করিতে পারিল না। তখন শীতকাল এবং মেরু অঞ্চলের অন্ধকার দিন, প্রচণ্ড শীত—তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর নীচে ৩০ সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। চারদিকে বরফে ঢাকা কোথাও-কোথাও পাঁচ থেকে ছয় ফুট পর্যন্ত গভীর! প্রকৃতি যেমন বিরূপ, মাটিও তেমন প্রতিকূল—অনেক জায়গা বরফাচ্ছন্ন নির্দয় প্রান্তরের মত, গাছপালা জঙ্গল অরণ্য এবং সেই সঙ্গে ৬৫ হাজার হ্রদ! ফিনল্যাণ্ড হ্রদের দেশ এবং জলে-জঙ্গলে আবৃত। গভীর ঠাণ্ডায় এভাবে লড়াই করিতে লালফৌজ অভ্যস্ত ছিল না। সড়ক, রেলপথ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও তেমন উৎকৃষ্ট ছিল না এবং

যেটুকু ছিল তার কোন সুযোগও আক্রমণকারী সৈন্যেরা নিতে পারিল না। শীতকালীন যুদ্ধের উপযোগী ট্রেনিং তাদের ছিল না। স্কী-সৈন্য ছিল না। অথচ ফিনিশ সৈন্যেরা প্রস্তুত ছিল। তাদের স্কী-সৈন্যেরা শীতকালীন যুদ্ধের বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছিল এবং স্বদেশ রক্ষার জন্য তারা অনুপ্রাণিত ছিল—রাস্তাঘাট ও ভূপ্রকৃতি তাদের জানা ছিল। সুতরাং আত্মরক্ষায় ও পাল্টা আক্রমণে তারা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেছিল এবং রুশ সৈন্যদের ক্রমাগত নাস্তানাবুদ করিতেছিল। অপরপক্ষে বরফাচ্ছন্ন মাটিতে লালফৌজের পক্ষে ভারী সামরিক সম্ভার নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু ফিনরা প্রচুর সংখ্যায় স্বয়ংক্রিয় রাইফেল টমিগানের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। কিন্তু রুশ সৈন্যদের তখন এই সমস্ত অস্ত্র ছিল না। ফলে, ফিনিশ সৈন্যদের আঘাতে তারা জর্জর হইতে-ছিল। তাদের আক্রমণকারী পাঁচটি বাহিনীর মধ্যে সংযোগ ও সংহতি পর্যন্ত গড়িয়া উঠিতে পারিল না। লালফৌজ যে কেবল শীতকালীন যুদ্ধের অনুপযুক্ত ছিল, এমন নয়। ম্যানারহাইম লাইনের (এখানে ৬ ডিভিসন সৈন্য সমবেত ছিল) দুর্ভেদ্য আধুনিক দুর্গশ্রেণী, যেগুলি কংক্রিট ও ইস্পাতের তৈরী, সেগুলি ভেদ করিবার কিংবা ভাঙ্গিবার কোন অভিজ্ঞতা বা শিক্ষাও তাদের ছিল না। ফলে, গোড়ার দিকে (সারা ডিসেম্বর মাস) এই যুদ্ধ রাশিয়ার পক্ষে প্রায় 'সম্পূর্ণ বিপর্যয়কর' হইয়াছিল—পরবর্তীকালে একথা সোভিয়েট সরকারী সামরিক ইতিহাসেও স্বীকার করা হইয়াছে। এমন কি, প্রায় তিন মাস ধরিয়া সোভিয়েট সংবাদপত্রে রুশ-ফিনিশ যুদ্ধের খবর ব্ল্যাক আউট করা হইয়াছিল।[৭] কারণ, এই তিন মাসের মধ্যেও বিশেষ কোন আশাপ্রদ খবর ছিল না। অপর পক্ষে পৃথিবীর চারিদিকে এই অসম যুদ্ধে ফিনল্যান্ডের আশ্চর্য বীরত্বের সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল এবং ফিনিশ সৈন্যদের প্রশংসার বান ডাকিল। এমন কি আমেরিকায় লেখক ও ঐতিহাসিক রবার্ট ই শেরউড ফিনদের প্রশস্তিবাচক একটি নাটক পর্যন্ত লিখিয়া ফেলিলেন—
'দেয়ার শ্যাল বি নো নাইট' নামে ওই নাটকটিকে ১৯৪১ সালে পুলিৎজার প্রাইজ পর্যন্ত দেওয়া হইল।[৮]

জানুয়ারী মাসের আরম্ভে সোভিয়েট সৈন্যদের আক্রমণাত্মক অভিযান থামিয়া গেল এবং সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তাদের ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলি বুঝিতে পারিলেন। মাস খানেক ধরিয়া নূতন উদ্যমে তাঁরা প্ল্যানিং ও ম্যানারহাইম লাইন ভেদ করার প্রস্তুতি করিতে লাগিলেন। মার্শাল টিমোশেঙ্কোকে প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করা হইল এবং জেনারেল মেরেটস্কোভ রণক্রিয়ার ভারপ্রাপ্ত হইলেন। মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারদের সমবেত করা হইল এবং সেই সঙ্গে প্রচুর ট্যাংক, প্লেন ও কামান ইত্যাদি। আর বরফাচ্ছন্ন উত্তর দিকের বা মধ্যভাগের জলা-জঙ্গল নয়। সোজাসুজি ম্যানারহাইম লাইনের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি হইল। কিন্তু তাও ১১ই ফেব্রুয়ারীর আগে শুরু করা গেল না। মার্কিন ঐতিহাসিক স্নাইডারের মতে যখন এই আক্রমণ শুরু হইল, তখন মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ৩ লক্ষ গোলা বর্ষিত হইল। ১৯১৬ সালে ফ্রান্সের ইতিহাসে বিখ্যাত ভার্দুন যুদ্ধের পর তখন পর্যন্ত একটি রণক্ষেত্রে এত গোলা আর বর্ষিত হয় নাই। কিন্তু এত প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও ম্যানারহাইম লাইন সহজে

ভাঙ্গিল না। এর কঠিন কংক্রিটের ব্যূহগুলি ভূগর্ভ পথের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত ছিল এবং এগুলির দেওয়াল তিন ফুট পর্যন্ত চওড়া ছিল। অবশেষে এক সপ্তাহের প্রাণান্তকর চেষ্টার পর এই লাইন ভাঙ্গিল এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী নাগাদ পশ্চিম দিকটা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ও হাজার-হাজার সৈন্য হতাহত হইল। এত ক্ষতি হইল যে, বাহিনী পুনর্গঠন করিতে হইল এবং নূতন মজুত সৈন্য (রিজার্ভ) আনিতে হইল। ২৮শে ফেব্রুয়ারী নূতন করিয়া আক্রমণ শুরু হইল। অবশেষে এত কাণ্ডের পর ভীবোর্গ বন্দর-শহর দখল হইল এবং হেলসিঙ্কি-ভীবোর্গ (বা ভীপুরী) লাইন মুক্ত হইল। তখন ৪ঠা মার্চ তারিখ জেনারেল ম্যানারহাইম ফিনিশ সরকারকে জানাইলেন যে, সৈন্যবাহিনীর পক্ষে আর সাফল্যের সঙ্গে বাধা দান সম্ভব নয়। ১২ই মার্চ, ১৯৪০, এই যুদ্ধের হঠাৎ অবসান হইল এবং মস্কোতে সোভিয়েট-ফিনিশ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।

কিন্তু সোভিয়েট নেতাদের মুখে এই যুদ্ধের কোন প্রশংসা বা রুশ সেনাপতিদের কোন প্রশস্তি শোনা গেল না। বরং মলোটোভ কিছুটা বিষাদের কণ্ঠেই সুপ্রীম সোভিয়েটের নিকট রিপোর্ট দিয়াছিলেন যে, 'সীমান্তের একটা সামান্য সংশোধনের' ব্যাপারে লালফৌজের ৪৮,৭৪৫ জন সৈন্য নিহত এবং ১ লক্ষ ৫৮ হাজার আহত হইয়াছে। (অবশ্য ফিনিশদের মতে সোভিয়েট পক্ষে আরও অনেক বেশী হতাহত হইয়াছে) আর মলোটোভের মতে ৬০ হাজার ফিনিশ সৈন্য নিহত এবং ২ লক্ষ ৫০ হাজার আহত হইয়াছে। (রণপণ্ডিত লিডেল হার্টের মতে দশ লক্ষাধিক রুশ সৈন্য এই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়াছিল।) কিন্তু মলোটভের মুখে এই সংখ্যাতত্ত্ব শুনিয়াও সোভিয়েট জনগণ বিন্দুমাত্র গর্ববোধ করে নাই।[১]

এই অভিনব রুশ-ফিনিশ যুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেস্টিজ ঘরে-বাইরে নষ্ট হইল। সামরিক শক্তির দুর্নাম রটিল এবং পশ্চিমী দুনিয়ায় কুৎসার বান ডাকিল। জেনেভাতে যে রাষ্ট্রসংঘ বা লীগ অব নেশন্সের দপ্তর এতদিন 'অজ্ঞান' অবস্থায় পড়িয়া ছিল, হঠাৎ সেই দপ্তর সজাগ ও সক্রিয় হইয়া উঠিল। ৩রা ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখ ফিনল্যাণ্ড আক্রমণকারী সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘের দরবারে নালিশ জানাইল এবং ১৪ই ডিসেম্বর তারিখ লীগের কাউন্সিল এক প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা সোভিয়েট রাশিয়াকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ হইতে বহিষ্কার করিল। কাউন্সিলের বৈঠকে এই বহিষ্কার প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানাইল বৃটেন, ফ্রান্স, বলিভিয়া, বেলজিয়াম, ডোমিনিক্যান রিপাব্লিক, দক্ষিণ আফ্রিকা ও মিশর। লীগের এসেমব্লীর সভায় সোভিয়েট রাশিয়াকে নিন্দা করা হইল ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি এবং প্যারিস চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য এবং রাষ্ট্রসংঘের চুক্তিনামার ১২নং ও ১৫নং অনুচ্ছেদ অমান্য করার জন্য। বলা বাহুল্য যে, এগুলি ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমী শক্তিবর্গের গায়ের ঝাল মিটানো। কারণ, সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছিল, অনুরূপ অভিযোগের কারণ থাকা সত্ত্বেও জাপান, ইতালী, জার্মানী বা স্পেনের গৃহযুদ্ধে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লীগের পক্ষ থেকে দ্রুত কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই! অধিকন্তু রাশিয়াকে যেভাবে লীগ থেকে

১। আলেকজাণ্ডার ভার্থ প্রণীত 'রাশিয়া এ্যাট ওয়ার'—পৃষ্ঠা ১৬।

বহিষ্কার করা হইল, তার আইনগত বিধিবিধান সম্পর্কেও গভীর বিতর্কের কারণ ছিল।[১]

পশ্চিমী জগতের সরকারী মহলে ও সংবাদপত্রে ফিনল্যাণ্ডের জন্য দরদ একেবারে উথলাইয়া উঠিল। যে সমস্ত শক্তি সেপ্টেম্বর মাসে হিটলার কর্তৃক আক্রান্ত পোল্যাণ্ডের সাহায্যার্থে এক পা অগ্রসর হইল না এবং ইঙ্গ-ফরাসী পশ্চিম রণাঙ্গনে মাসের পর মাস অলস বসিয়া রহিল, তাদেরই সরকারী ও সামরিক কর্তৃপক্ষ হঠাৎ ফিনল্যাণ্ডকে রক্ষার জন্য একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষতা আইনের দোহাই দিয়া অতলান্তিকের ওপারে চুপচাপ ছিল, তারা পর্যন্ত দ্রুত আগাইয়া আসিল। মার্কিন কংগ্রেস অবিলম্বে ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্য দানের জন্য তিন কোটি ডলার মঞ্জুর করিল। বৃটেন পাঠাইল ১১৪টি কামান, ১ লক্ষ ৮৫ হাজার গোলা, ৫০ হাজার হাত-বোমা, ১৫ হাজার ৭ শত বিমান-বোমা এবং শীতের উপযোগী এক লক্ষ বড় কোট পর্যন্ত। বলা বাহুল্য যে, ফ্রান্সও এই ধরনের সাহায্য পাঠাইল প্রচুর—যেমন ১৭৫টি প্লেন, ৪৭২টি কামান, ৫ হাজার মেশিনগান, ২ লক্ষ হাত-বোমা ইত্যাদি। অথচ ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃপক্ষ নাকি উপযুক্ত সামরিক শক্তির অভাবে তখন পশ্চিম রণাঙ্গনে কোন আক্রমণ চালাইতে পারে নাই—এই সাফাই তাঁরা গাহিয়াছিলেন ৮মাসের নিষ্ক্রিয়তার জবাবে।

এদিকে লণ্ডন থেকে চার্চিল এক ঢিলে দুই পাখি মারিতে চাহিলেন। তিনি নরওয়ের নার্ভিক বন্দরের মারফৎ ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্যের জন্য জাহাজযোগে সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। নার্ভিক বন্দর থেকে সুইডেনের লৌহখনি সমৃদ্ধ অঞ্চল দিয়া বাল্টিক সমুদ্র পর্যন্ত রেলপথের সংযোগ ছিল। চার্চিলের মাথায় এই দুষ্টবুদ্ধি খেলিল যে, এর দ্বারা রাশিয়াকে জব্দ, ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্য এবং নরওয়ে-সুইডেনের লৌহখনি অঞ্চলের উপর প্রভুত্ব খাটানো যাইবে। কারণ, জার্মানী এই খনিগুলি হইতে লৌহ সরবরাহ পাইতেছিল। কিন্তু চার্চিলের দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ ১২ই মার্চ রুশ-ফিনিশ যুদ্ধ খতম হইয়া গেল এবং বৃটিশ পরিকল্পনাও মাটি হইয়া গেল। কিন্তু কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক পর্যন্ত এই পরিকল্পনার জন্য চার্চিলকে তীব্র গালাগালি দিয়াছেন এবং মন্তব্য করিয়াছেন যে, সারা যুদ্ধের ইতিহাসে এমন একটা 'নির্বোধ পরিকল্পনা' আর হয় নাই। কারণ, এর দ্বারা বৃটিশ ও ফরাসী গভর্নমেণ্টকে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে হইত এবং নরওয়ে-সুইডেনের সঙ্গেও বিরোধ বাধিত।[২]

কিন্তু মার্কিন ঐতিহাসিক ডি এফ ফ্লেমিং বলিতেছেন যে, ফরাসী ও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে সত্য-সত্যই যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হইতেছিল। ১৯৪০, ১৯শে জানুয়ারী ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের তাঁর নৌ ও সৈন্য বিভাগকে নির্দেশ দিলেন যে, দক্ষিণ রাশিয়ার বাকু তৈলখনি অঞ্চলে এবং কৃষ্ণসাগরে আক্রমণ ও যুদ্ধের পরিকল্পনা করার জন্য। আর ইঙ্গ-ফরাসীর মিলিত সুপ্রীম ওয়ার কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিলেন ফিনল্যাণ্ডকে সৈন্য পাঠাইয়া সাহায্য দেওয়ার জন্য। এই উদ্দেশ্যে ৬ ডিভিশন বৃটিশ সৈন্য এবং ৫০ হাজার ফরাসী সৈন্য জাহাজযোগে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল।[৩]

১। ডি এফ ফ্লেমিং প্রণীত 'দি কোল্ড ওয়ার', পৃষ্ঠা ৯৯-১০০।
২। Britain & the Second World War—by Henry Pelling, P. 63
৩। The Cold War, Vol. I. P. 102.

১৯৩৯-১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ৮ মাস কাল ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গের যেমন 'মিউনিক মনোবৃত্তি'ই প্রবল ছিল এবং জার্মানীকে হাতে-কলমে বাধাদানের বদলে সোভিয়েট রাশিয়াকে জব্দ করার ইচ্ছাই উগ্র ছিল, তেমনি ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধটাও নানা কারণে একটা 'বিশ্রী' ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। তথাপি রাশিয়া-ফিনল্যাণ্ডের লড়াই শেষ পর্যন্ত হিটলারী জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের সময় লেনিনগ্রাদে তথা রাশিয়ার আত্মরক্ষার পক্ষে প্রভূত সহায়ক হইয়াছিল। কারণ, রুশ-ফিনিশ শান্তি চুক্তি অনুসারে রাশিয়া তার প্রতিরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় দাবীগুলি আদায় করিয়া নিতে পারিয়াছিল। এই চুক্তি অনুসারে ফিনল্যাণ্ডকে তার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ভীপুরী (ভাঁবোর্গ)-সহ সমগ্র ক্যারেলিয়ান যোজক রাশিয়াকে দিতে হইল। লাডোগা হ্রদের পশ্চিম ও উত্তর তীর (শহরগুলিসহ) অর্পণ করিতে হইল, ইউরোপের এই বৃহত্তম হ্রদ এক্ষণে পুরোপুরি সোভিয়েট সীমানায় অন্তর্গত হইল। অধিকন্তু ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের দ্বীপগুলি, মেরু বন্দর পেটসামোর উপর কর্তৃত্ব (নিকেল খনিসহ) এবং ৩০ বছরের জন্য হ্যাঙ্গো বন্দরের ইজারা সোভিয়েট রাশিয়ার হাতে অর্পণ করিতে হইল। ফিনল্যাণ্ডের উপর দিয়া সুইডেন পর্যন্ত একটি রেল রোড তৈয়ারীর অধিকারও রাশিয়া পাইল। প্রায় পাঁচ লক্ষ অধিবাসীসহ মোট ১৬ হাজার বর্গমাইল ভূমি সোভিয়েট রাশিয়াকে হস্তান্তর করিতে হইল। এই সমস্ত নূতন অঞ্চল নিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন 'ক্যারেলিয়ান-ফিনিশ-সোসিয়ালিস্ট-ফেডারেটেড রিপাবলিক' নামে একটি নূতন অঙ্গরাষ্ট্র গঠন করিল।[১]

১৯৩৯-৪০ সালের রুশ-ফিনিশ লড়াইয়ের এই ফলশ্রুতি।

১। The War—by Louis L. Snyder, P. 103-4

চতুর্থ অধ্যায়

ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল

১৯৪০ সালের বসন্তকাল আসিল এবং ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানী কর্তৃক অতি দ্রুত পোল্যাণ্ড জয়ের পর সাত মাস অতিক্রান্ত হইতে চলিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ইউরোপীয় রণাঙ্গন কার্যত নিঃশব্দ ছিল, মিত্রপক্ষ জার্মানীর বিরুদ্ধে হাতে-কলমে কোন যুদ্ধ চালাইলেন না। ইঙ্গ-ফরাসী রণনীতি অলস ও নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিল। একমাত্র রাশিয়ার সহিত ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধ ছাড়া ইয়োরোপের স্থলপথে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

ইতিমধ্যে হিটলার 'শান্তিপ্রিয়' হইয়া উঠিলেন। পোল্যাণ্ডকে নিজের কুক্ষিগত করিবার পর ৬ই অক্টোবর তিনি রাইখস্টাগে ইউরোপের অবস্থা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক জগতের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা দিলেন এবং বিশেষভাবে ইঙ্গ-ফরাসীর উদ্দেশে বলিলেন, 'পশ্চিমে যুদ্ধের দরকার কি ?—পোল্যাণ্ডের পুনরুজ্জীবনের জন্য ? ভার্সাই সন্ধিজাত পোল্যাণ্ড আর কখনও দাঁড়াইবে না। একটি নূতন পোলিশ রাষ্ট্র গঠন কিংবা সেই দেশের চেহারা কিরূপ হইবে, এই সমস্ত সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা পশ্চিমের যুদ্ধের দ্বারা সম্ভব নহে, উহা একমাত্র সম্ভব হইতে পারে এক দিকে রাশিয়া এবং অন্য দিকে জার্মানী কর্তৃক।...যুদ্ধের আবশ্যকই বা কি ? জার্মানী কি ইংলণ্ডের উপর এমন কোন দাবী করিয়াছে, যার দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে কোনও ভাবে ভয় দেখান হইয়াছে কিংবা উহার অস্তিত্ব বিপন্ন করা হইয়াছে ?'

অতঃপর হিটলার বলেন যে, রুশ-জার্মান সীমানার পশ্চিমে 'ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা'র দিক হইতে বাঁচিবার মত জায়গা (লিভিং স্পেস) পাইলেই জার্মানী খুশী। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সমস্যাও ইহার মধ্যে পড়ে। হিটলারের মতে ভার্সাই সন্ধি মৃত, সুতরাং সেই সন্ধি অনুযায়ী নূতন করিয়া কোন কিছু পরিবর্তনের দাবী উঠে না—একমাত্র জার্মান রাষ্ট্রের আগেকার উপনিবেশগুলি ছাড়া। কিন্তু এই উপনিবেশের সমস্যাও হিটলার আপোষের দ্বারাই মীমাংসা করিতে রাজী আছেন, কোন বলপ্রয়োগের দ্বারা নহে। হিটলার আর যুদ্ধ, লোকক্ষয় ও রক্তপাত চাহেন না, এমন কি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অস্ত্রহ্রাসেও প্রস্তুত আছেন।[১]

কিন্তু হিটলারের এই শান্তি বাণীর প্রতি কেহ কোন বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। ১০ই অক্টোবর ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের এবং ১২ই অক্টোবর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন হিটলারের শান্তি প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁরা বলিলেন যে, ১৯৩৫, ১৯৩৬ ও ১৯৩৮ সালে হিটলার ইহার চেয়েও অধিক প্রতিশ্রুতিপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছেন। কিন্তু এই পর্যন্ত সমস্ত প্রতিশ্রুতি তিনি ভঙ্গ করিয়াছেন এবং অপরের রাজ্য গ্রাস করিয়াছেন। এক্ষণে জোরপূর্বক পোল্যাণ্ড দখল করার পর আবার সেই একই শান্তির বাণী উচ্চারিত হইতেছে। যদি ইহা স্বীকার করিতে হয়, তবে হিটলার কর্তৃক

১। 'The Second Great war'—Sir John Hammerton & Maj-General Sir Charles Gwynn. Page 151, Vol. 1.

পররাজ্য আক্রমণও অনুমোদন করিতে হয়। কিন্তু ফ্রান্স ও বৃটেন, কেহই আর হিটলারকে বিশ্বাস করিতে পারেন না।

আমেরিকার সরকারী মহলও হিটলারের বক্তৃতার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিলেন না। পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হাল মন্তব্য করিলেন যে, তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে, হিটলারের বক্তৃতা শুনিবার মত সময় পান নাই। আর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মন্তব্য করিলেন যে, তিনি হিটলারের বক্তৃতা শুনিবেন বলিয়া রেডিও খুলিয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু এমন সময় কয়েকজন ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসায় তিনি রেডিও বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।[১]

হিটলারের শান্তির প্রস্তাব ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু মিত্রপক্ষের তরফ হইতে কোন যুদ্ধযাত্রাও ঘটিল না। যুদ্ধরত পোল্যাণ্ডের সংকটের সময় ইঙ্গ-ফরাসী পশ্চিম দিকে আক্রমণ করিয়া কোন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিতে পারিলেন না। মাসের-পর-মাস এভাবে চলিতে লাগিল এবং উভয় পক্ষের রেডিও, সংবাদপত্র ইত্যাদি হাস্যকর প্রচারকার্য চালাইতে লাগিল। আমেরিকা এজন্য ঠাট্টা করিয়া বলিল যে, "ফোনি ওয়ার" চলিতেছে। আর এক দল বলিলেন যে, জার্মান 'ব্লিজক্রিগের' বদলে ইঙ্গ-ফরাসীর 'শ্লিজক্রিগ' অর্থাৎ বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের বদলে শম্বুকগতি লড়াই চলিতেছে। একটি বিখ্যাত জার্মান উপন্যাসের অনুকরণে এই সময় 'অল কোয়াইট ইন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্ট'—এই তথ্য বিদ্রূপের সঙ্গে প্রচারিত হইল। গোয়েরিং ঠাট্টা করিয়া বলিলেন যে, বৃটেনের লক্ষ্য হইতেছে 'উই স্যাল ফাইট টু দি লাস্ট ফ্রেঞ্চম্যান'—অর্থাৎ ফরাসীর শেষ রক্তবিন্দু দিয়া ইংরাজ লড়াই করিবে!

কিন্তু ইউরোপের মাটিতে কোন যুদ্ধ না চলিয়া থাকিলেও ১৯৩৯-৪০-এর শীতকালে সমুদ্রপথে জার্মানীর আক্রমণ খুব তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। জার্মানীর টর্পেডো, চুম্বক মাইন (নূতন আবিষ্কৃত) ও 'পকেট যুদ্ধজাহাজগুলি' বৃটিশ নৌশক্তি ও পণ্যবাহী জাহাজগুলির বিরুদ্ধে হানা দিতে লাগিল। জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষ যে অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালাইতেছিলেন এবং যার জন্য অবরোধ ঘোষিত হইয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিবার জন্যই জার্মানী জলপথের এই আক্রমণ চালাইতেছিল। কিন্তু শীতের শেষে ১৯৪০ সালের বসন্তকালে ইহাও মন্দীভূত হইয়া গেল। এভাবে এপ্রিল মাস আসিয়া পড়িল। সেই সময়ের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বর্তমান গ্রন্থকার 'যুগান্তর' পত্রিকায় যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন, বিস্ময়কর কথা এই যে, তার পরদিনই ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রান্ত হইয়াছিল!

১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসের আরম্ভে বর্তমান গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন, "ইউরোপীয় যুদ্ধের ৭ মাস চলিয়া গেল, কিন্তু এখনও মিত্রশক্তি ও জার্মানীর মধ্যে স্থলপথে কোন যুদ্ধ হয় নাই। তথাপি এই ৭ মাসকাল আমরা অনবরত 'এই লাগে' 'এই লাগে' শুনিয়া আসিতেছি। এক এক ঋতুর পরিবর্তনে সামরিক কর্তাদের মত পরিবর্তনের গুজব শুনিয়াছি। শরৎকাল গিয়াছে, শীতও গিয়াছে এবং বসন্তকালও চলিয়া গেল। এক্ষণে গ্রীষ্মের মুখে কি ইউরোপে প্রচণ্ড সংগ্রাম বাধিবে?...বিগত শীতকালে জার্মানীর সমুদ্রপথ অবরোধের সংগ্রাম খুব তীব্র হইয়াছিল এবং সেই সময় জার্মান

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৫৪।

টর্পেডো ও চুম্বক মাইনের উৎপাতও খুব প্রবল ছিল। ইদানীং টর্পেডো ও মাইনের উৎপাত মন্দীভূত হইয়াছে। সহজ বাঙ্গলায় যাকে 'দম লওয়া' বলে, জার্মানী সম্ভবতঃ কতকটা সেই অবস্থায় পড়িয়াছে।

"বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন স্বীকার করিয়াছেন যে, জার্মানীর বিরুদ্ধে যে অবরোধ অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। ইদানীং এই প্রথার মধ্যে কতকগুলি ছিদ্র আবিষ্কার হইয়াছে। বিশেষভাবে নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের বাণিজ্য জার্মানীর দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য হিটলারী গভর্নমেণ্ট অনেক চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই সমস্ত দেশের পণ্য যাতে বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি নিরপেক্ষ দেশের বন্দর ঘুরিয়া নিজেদের দেশে পৌঁছিতে পারে, তেমন আয়োজনও তাঁরা করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি বলকান অঞ্চলের কাঁচামালের দিকেও জার্মানী মনঃসংযোগ করিয়াছে। যদি জার্মানী উত্তর ইউরোপের নরওয়ে সুইডেন হইতে শুরু করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বুলগেরিয়া পর্যন্ত সমস্ত দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য হাত করিয়া ফেলিতে পারে, তবে মিত্রশক্তির অবরোধ প্রথা কতটুকু কার্যকরী হইবে?...জার্মানীকে এই দিক দিয়া কাবু করিবার জন্য সম্প্রতি বৃটেন ও ফ্রান্স ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।...সংক্ষেপে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, নরওয়ে, সুইডেন, আইসল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও ডেনমার্কের সহিত বৃটিশ গভর্নমেণ্ট সামরিক বাণিজ্য চুক্তি পাকা করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ফরাসী গভর্নমেণ্ট বৃটেনের সহযোগিতায় সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, গ্রীস ও তুরস্কের সহিত জরুরী বাণিজ্যচুক্তি করিতেছেন। তৃতীয়তঃ রুমানিয়া হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া ও বুলগেরিয়া প্রভৃতি বলকান অঞ্চলের প্রত্যেকটি রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের চুক্তি করা হইতেছে। চতুর্থতঃ এই সমস্ত দেশের সহিত কারবার চালাইবার জন্য লর্ড সুইনটনের সভাপতিত্বে 'দি ইংলিশ কমার্শিয়াল কর্পোরেশন' নামে একটি ব্যবসায়ী সংঘ গঠন করা হইয়াছে। এই কর্পোরেশনের সমস্ত মূলধন জোগাইতেছেন বৃটিশ সরকার। যে সমস্ত দেশের সহিত বৃটেন 'সামরিক বাণিজ্য' চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁদের সঙ্গে এই সর্ত করা হইয়াছে যে তাঁরা জার্মানীতে সামরিক পণ্য রপ্তানী করিতে পারিবেন না কিংবা সেই সমস্ত পণ্য অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইবে।...এই সমস্ত ছাড়াও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আর একটি কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁরা বলিতেছেন যে, যে সমস্ত দেশ জার্মানীর সহিত বাণিজ্য করিবে, সেই সমস্ত দেশকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্য হইতে বঞ্চিত করা হইবে। অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা ইতিমধ্যেই এই সম্পর্কে বৃটেনের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। এই বিশাল অর্থনৈতিক বয়কটের প্ল্যান কার্যকরী করিবার জন্য বৃটিশ নৌ-বিভাগ উত্তর সমুদ্র হইতে শুরু করিয়া বহু দূরবর্তী প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সর্বত্র জার্মান পণ্যবাহী জাহাজের সন্ধান করিতেছে। নরওয়ে ও সুইডেনের সমুদ্রপথে যেমন কড়া পাহারা চলিতেছে, তেমনই প্রশান্ত মহাসাগরের পথে ভ্লাডিভোস্টক বন্দর হইয়া যে সমস্ত পণ্য জার্মানীতে রপ্তানীর সম্ভাবনা, সেই সমস্ত পণ্যবাহী জাহাজও আটক করা হইতেছে।'...[২]

২। 'যুগান্তর' সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, এপ্রিল ১৯৪০—সংক্ষেপিত।

'এই অর্থনৈতিক সংঘাতের প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপের সামরিক গতি কোন্ পথে প্রবাহিত হইতে পারে'—সেই সম্বন্ধে নূতন প্রবন্ধ লিখিবার আগেই জার্মানী কর্তৃক ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রান্ত হইল।

নরওয়ে ও ডেনমার্ক আক্রমণ

উত্তর সমুদ্রের পথ ধরিয়া জার্মানী ১৯৪০ সালের ৯ই এপ্রিল ভোরবেলা অতি অকস্মাৎ এক চমকপ্রদ নৌ-অভিযানে বাহির হইল। আবার 'যুগান্তরে'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করা যাউক ঃ—

'ইউরোপের মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে উত্তর সমুদ্র যেন একটা হ্রদের মতন—উহার তিন দিকে নরওয়ে, ডেনমার্ক, জার্মানী, হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ইংলন্ড এবং নরওয়ে ও স্কটল্যান্ডের প্রায় মাঝামাঝি সেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ। ডেনমার্কের উত্তর প্রান্ত ও নরওয়ের দক্ষিণ প্রান্তের মধ্যবর্তী স্কাগারেক, আরও নীচের দিকে নামিলে কাটেগাট—অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং গভীর আবর্তপূর্ণ জলপথ। ভ্রমণকারীরা এই বিপজ্জনক জপথের অনেক রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিয়াছেন। কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ, সঙ্কীর্ণতম প্রণালী, জলে ডুবানো অদৃশ্য পাহাড় এবং পুরানো শহরের অলিগলির মত কত বাঁকাচোরা জলপথ এই জায়গাটি জুড়িয়া রহিয়াছে। নরওয়ের উত্তর প্রান্ত আরও রোমাঞ্চকর, সেখান হইতে মেরু সমুদ্রের শুরু, জনমানবহীন বরফাবিস্তীর্ণ পৃথিবীর যেন জীবজগতের বাহিরে যাত্রা! কিন্তু নরওয়ের সূর্যোদয় বা মেরুজ্যোতির মহিমার জন্য আজিকার সংবাদপত্র ব্যস্ত নহে, উত্তর সমুদ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে রক্তগঙ্গার শুরু, সমস্ত পৃথিবীতে তাহা লইয়া তোলপাড়। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধেও উত্তরসাগর নৌ-নাট্যের চমৎকার আসর ছিল। বৃটেনের গ্র্যান্ড ফ্লীট বা 'বৃহত্তম নৌবহর' সেখানে পাহারায় রত ছিল, আজিকার মত সেদিনও জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্লকেড বা অবরোধ ঘোষিত হইয়াছিল। বৃটেনের তুলনায় জার্মানীর নৌশক্তি প্রবল নহে, সেদিনও ছিল না এবং আজও নয়। সুতরাং জার্মান নৌ-বিভাগ বারংবার সম্মুখ যুদ্ধ এড়াইয়া চলিতেছিল। তথাপি একদা অপরাহ্ন বেলা 'গ্র্যান্ড ফ্লিট'-এর পাল্লায় জার্মান নৌবহরকে পড়িতে হইয়াছিল, ইংরাজ নৌ-সেনানী এডমিরাল জেলিকো এবং জার্মান নৌ-সেনানী এডমিরাল সীয়ার পরস্পরের মুখোমুখী হইয়াছিলেন। জুটল্যান্ডের সেই বিখ্যাত যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে কে হারিয়াছিল বা কে জিতিয়াছিল, তাহা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ আছে। কয়েক ঘণ্টা বিষম যুদ্ধের পর জার্মান নৌবহর পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসে এবং নিজেদের মাইন-ঘেরা এলাকার মধ্যে আশ্রয় লয়। সমর-বিদগণ বলেন যে, বৃটিশ নৌবহর জার্মান জাহাজগুলিকে অনুসরণ না করিয়া বুদ্ধিমানের কার্য করিয়াছিল। কারণ, মাইনের জালে পড়িতে হইত। আজও সেই উত্তর সমুদ্রে যুদ্ধের নাটক জমিয়াছে এবং বৃটিশ নৌ-বিভাগ ঘোষণা করিতেছেন যে, ১০ই এপ্রিল ভোরবেলা নার্ভিকের অনতিদূরে বৃটিশ ডেস্ট্রয়ারসমূহ শত্রুকে আক্রমণ করে, কিন্তু প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। 'হান্টার' ডুবিয়াছে, 'হার্ডি" চড়ায় আটকাইয়া গিয়াছে এবং বাকি ডেস্ট্রয়ারখানা সরিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য জার্মানীরও কিছু ক্ষতি হইয়াছে, তবে সঠিক বিবরণ এখনও জানা নাই। সুতরাং উত্তর সমুদ্রের উদ্বোধন পর্বটা মন্দ হয় নাই।'

নরওয়ের পতন
জার্মান নৌ-আক্রমণ
জার্মান ছত্রী বাহিনীর অবতরণ
বিমানবাহিনী
এপ্রিল ১৪, ১৯৪০
বৃটিশ বাহিনীর অবতরণ
নার্ভিক
এপ্রিল ১৬/১৭
বৃটিশ বাহিনীর অবতরণ
এপ্রিল ১৮
বৃটিশ বাহিনীর অবতরণ
সুইডেন
অসলো
বার্জেন
নরওয়ে
লার্ভিক
কাটেগাট
এডিনবার্গ
ডেনমার্ক
কোপেনহেগেন
বাল্টিক সাগর
উত্তর সাগর
বৃটেন
জার্মানী
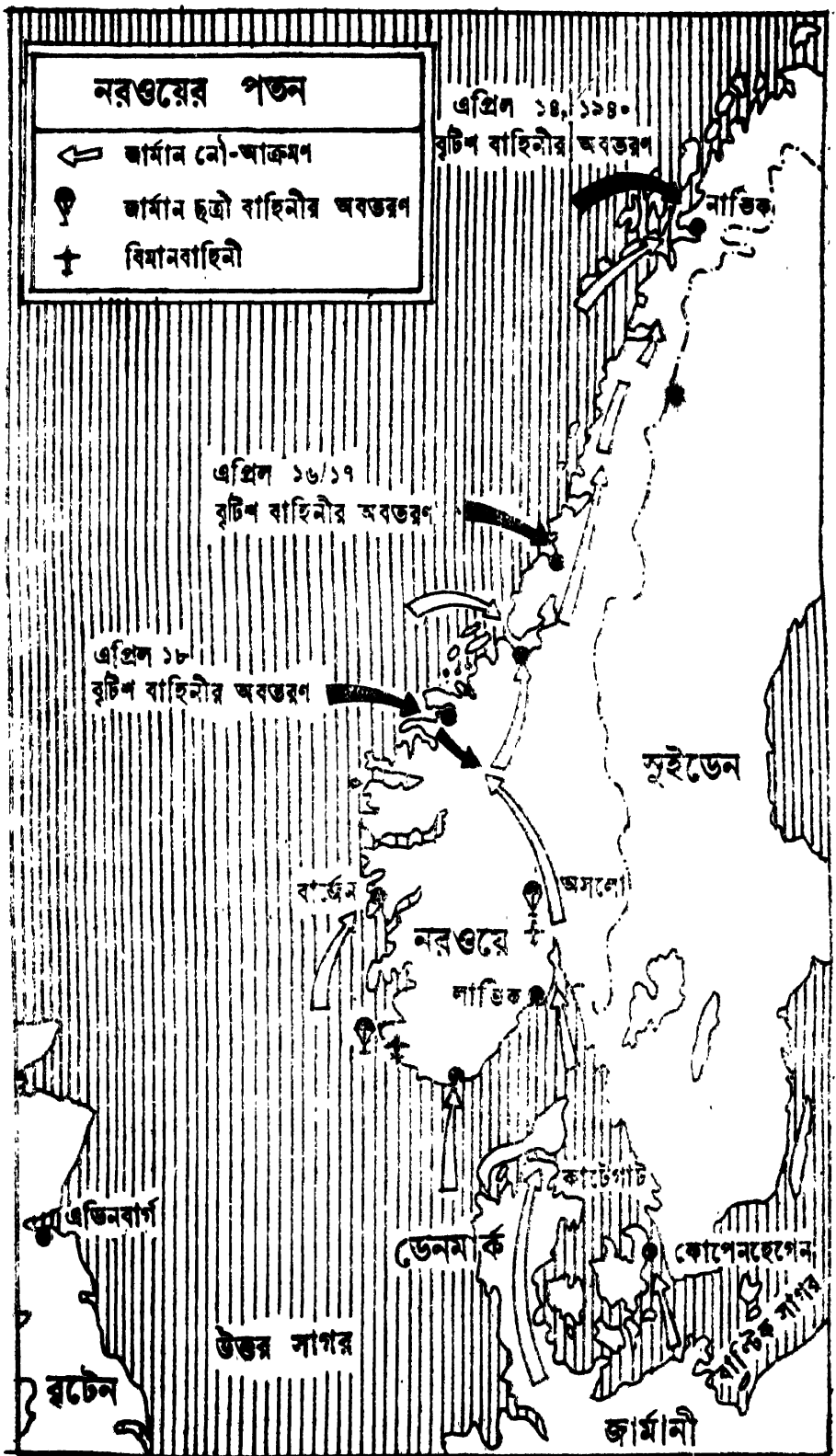
হঠাৎ এই সংঘর্ষটা উগ্র হইল কেন ? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষ জার্মানীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালাইবার জন্য সমুদ্রপথের অবরোধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ল্যাপল্যাণ্ডের খনি হইতে সুইডেনের লৌহধাতু রেলপথে নার্ভিক বন্দর হইয়া এবং নওরয়ের সমুদ্রপথ ধরিয়া জার্মানীতে সরবরাহ হইতেছিল। বৃটেন এবং ফ্রান্স নরওয়ে ও সুইডেনের নিকট ইহাতে আপত্তি জানায়। কিন্তু কোন ফল না হওয়ায় মিত্রপক্ষ শেষ পর্যন্ত ৮ই এপ্রিল সকাল ৬টার সময় নরওয়ের পশ্চিম উপকূলের অদূরে তিনটি এলাকায় মাইন পাতেন। কার্যটা আন্তর্জাতিক আইনের বিচারে যে বিধিসম্মত ছিল না, এ-কথা মিঃ চার্চিল (তখন নৌ-বিভাগীয় বড়কর্তা) ১১ই এপ্রিল তারিখ তাঁর পার্লামেণ্টারি বক্তৃতায় প্রকারান্তরে স্বীকার করেন। অথচ ইঙ্গ-ফরাসীর পক্ষে মুস্কিল ছিল এই যে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে গেলে এই ধরনের কোন প্রতিরোধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন ছাড়াও গতি ছিল না। কিন্তু জার্মানী অকস্মাৎ ঝড়ের বেগে নরওয়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সমস্ত আইনগত তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটাইয়া দিল। মিত্রপক্ষের জাহাজগুলি মাইন পাতিয়া আর ফিরিয়া আসিবার সুযোগ পাইল না। ২৪ ঘণ্টা পার হইবার আগেই জার্মান সৈন্য ও নৌ-সৈন্যেরা ৯ই এপ্রিল ভোরবেলা ঈষৎ আলো-অন্ধকারে নরওয়ের তীরবর্তী বার্জেন, ট্রণ্ডহাইম, স্টাভেঞ্জার, ক্রিশ্চিয়ানসুণ্ড, এমনকি দূরবর্তী নার্ভিক বন্দরে পর্যন্ত হানা দিল এবং অবতরণ করিল। এত অতর্কিতে এবং অদ্ভুত দ্রুততার সঙ্গে তারা নরওয়ের সমুদ্রতীর এবং বহু দূরবর্তী বন্দরগুলিতে হানা দিল যে, বাহিরের জগতে অনেকে এই সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া পর্যন্ত ভাবিতে পারিলেন না।[১]

প্রকৃতপক্ষে বিগত মহাযুদ্ধের অবরোধের লাঞ্ছনা এড়াইবার জন্য জার্মানী পূর্ব হইতে এই সমস্ত প্ল্যান পাকা করিয়া রাখিয়াছিল এবং জাহাজগুলি কয়েকদিন আগেই জার্মানী ত্যাগ করিয়া 'শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যতরীর ছদ্মবেশে' নরওয়ের বন্দরঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল। নির্দিষ্ট সময়ে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র এই সমস্ত জাহাজ হইতে দলে দলে সশস্ত্র সৈন্য বাহির হইয়া আসে এবং তারা অতি দ্রুত সাফল্যের সহিত তীরে অবতরণ করিতে থাকে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ কিছু বাধা দিতে পারেন নাই। অধিকন্তু নাৎসী দলের প্রতি নরওয়েজিয়ানদের মধ্যে যারা সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল, তারা জার্মানদিগকে সাহায্য করিল।

বন্দরগুলি যখন এভাবে বেদখল হইতেছিল, তখন জার্মান সৈন্য ও যুদ্ধ-জাহাজগুলি নরওয়ের রাজধানী অসলো অভিমুখে অগ্রসর হইল। এই সময় অসলোস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূত মিসেস জে বোরডেন হ্যারিম্যান ৯ই এপ্রিল

১। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক মিঃ আর্থার মুর, যিনি ভারতবর্ষের সাংবাদিকদিগের মধ্যে সামরিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, (প্রথম মহাযুদ্ধে পশ্চিম রণাঙ্গনের সামরিক সংবাদদাতা হিসাবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন তিনি করিয়াছিলেন।) তিনি একটি ক্ষুদ্র স্বাক্ষরিত প্রবন্ধে এই ঘটনা অবিশ্বাস করেন এবং বলেন যে, জার্মানী খোলা সমুদ্রের এই দুঃসাহসিক অভিযানে বাহির হওয়ার শীঘ্রই পরাজিত হইবে। সুতরাং যুদ্ধও শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইবে। এখানে একথা উল্লেখ করিলে অশোভন হইবে না যে, বর্তমান গ্রন্থকার 'যুগান্তর' পত্রিকায় এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, জার্মানী বিমানবলের সাহায্যে নরওয়েতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে এবং এই যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইবে না। এই মতবাদ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল।—১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসের 'যুগান্তর' সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।

সকালবেলা ওয়াশিংটনে যে যে বার্তা পাঠান, তাহা হইতেই সর্বপ্রথম জানা গেল যে, নরওয়ে ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছে এবং অস্‌লো খাঁড়িতে ৪ খানি জার্মান যুদ্ধ-জাহাজের উপর গুলী ছোঁড়া হইয়াছে।

শেষ রাত্রি ৩টার সময় জার্মানরা নরওয়েতে অবতরণ আরম্ভ করে এবং ৫টার সময় জার্মানদূত অস্‌লোতে নরওয়ের পররাষ্ট্রসচিব অধ্যাপক কোটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই মর্মে চরমপত্র পেশ করেন যে নওয়েকে অবিলম্বে জার্মানীর সামরিক শাসন মানিয়া লইতে হইবে এবং জার্মানরা যে দখলকার্য আরম্ভ করিয়াছে, উহাতে কোনপ্রকার বাধা দেওয়া চলিবে না। ইহার কারণস্বরূপ বলা হয় যে, জার্মান গভর্নমেণ্ট এমন 'সন্দেহাতীত প্রমাণ' পাইয়াছেন যে, বৃটেন ও ফ্রান্স নরওয়ে দখল করার মতলব করিয়াছিল। সুতরাং পূর্বাহ্নেই তাদের মতলব ব্যর্থ করিবার জন্য জার্মানীর পক্ষে এই ব্যবস্থা অবলম্বন ছাড়া উপায় নাই।

নরওয়ে গভর্নমেণ্ট অবশ্য জার্মানদের এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করেন এবং বাধা দেওয়ার জন্য সৈন্য সমাবেশের হুকুম দেন। কিন্তু তাতে কোনই ফল হইল না। কারণ, জার্মানরা তখন প্রায় রাজধানীর ফটকে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। বেলা দেড়টার সময় অস্‌লো খাঁড়ির পশ্চিমদিকস্থ নৌ-ঘাঁটির তিনখানা নরওয়েজিয়ান জাহাজকে এই মর্মে 'সরকারী হুকুম' দেওয়া হয় যে, অগ্রসরমান জার্মান জাহাজগুলিকে যেন বাধা দেওয়া না হয়। কিন্তু পরে জানা গিয়াছিল যে, ইহা জাল হুকুমনামা ছিল। অস্‌লোর দিকে অগ্রসর হইবার সংকীর্ণ জলপথের যে সমস্ত মাইন পাতা ছিল, জনৈক বিশ্বাসঘাতক সেগুলির বৈদ্যুতিক সংযোগ বিনষ্ট করিয়া দেয় এবং মাইনগুলিকে অকেজো করিয়া ফেলে। সুতরাং সৈন্যবাহী জার্মান জাহাজগুলির অস্‌লোর উপকণ্ঠে পৌঁছিবার আর কোন বাধা রহিল না। এদিকে আকাশপথে দলে দলে নাৎসী সৈন্য উড়িয়া আসিতে লাগিল এরোপ্লেনযোগে।

মন্দভাগ্য নরওয়েজিয়ান নাগরিকেরা এই আকস্মিক অভিনব অভিযানে হতভম্ব হইয়া গেল এবং তারা কিছু বুঝিয়া উঠিবার পূর্বেই তাদের দেশ জার্মানদের দখলে চলিয়া গেল। ঘন্টায় ঘণ্টায় নাৎসী সৈন্যরা নিকটবর্তী হইতে লাগিল, কোথাও কোন বাধা তারা পাইল না। বেলা আড়াইটার সময় জার্মানদের অগ্রবর্তী বাহিনী, যাদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়, তারা শহরের প্রধান সড়কে আসিয়া উপস্থিত হইল। কৌতূহলী জনতা ও উত্তেজিত দর্শকের মধ্য দিয়া তাদের রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিল স্বয়ং নরওয়েজিয়ান পুলিশ! নরওয়ে অভিযানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ফন ফলকেনহোর্স্ট তিন সারি জার্মান সৈন্য লইয়া শোভাযাত্রাসহকারে উপস্থিত হইলেন এবং শহরের পথ দিয়া অগ্রসর হইবার সময়ে নাৎসীবাদী নরওয়েজিয়ানগণ তাঁকে অভিবাদন করিলেন এবং তিনিও হাস্যমুখে প্রত্যভিবাদন জানাইলেন।

উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর এই কাহিনী এবং অবিশ্বাস্য ইহার ঘটনাবলী। জাহাজের ব্যবসায়, মৎস্য শিকার এবং শিল্প ও সাহিত্য লইয়া নরওয়েবাসীরা ভদ্র ও শান্ত জীবনযাপন করিতেছিল। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা মাত্র ৩০ লক্ষ, দীর্ঘকাল তারা যুদ্ধবিগ্রহ হইতে তফাতে ছিল। যুদ্ধক্ষম সমস্ত লোক একত্র করিলে তাদের সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াইতে পারে বড় জোর ১ লক্ষ ১৪ হাজার। কিন্তু যুদ্ধের জন্য তারা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং বিভ্রাট বাধিল অতি সত্বর। মিঃ লীল্যাণ্ড স্টো

নামক জনৈক মার্কিন সাংবাদিক এই অভিনব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন, 'ছোট্ট এবং অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষুদ্র এক সৈন্যদল অস্‌লো সহর দখল করে। মাত্র ৬।৭ মিনিটের মধ্যে তারা মার্চ করিয়া চলিয়া গেল। দু ব্যাটেলিয়ন পুরা সৈন্যও ছিল না—নিশ্চয়ই সবশুদ্ধ দেড় হাজারেরও কম। নরওয়ের ৩ লক্ষ বাসিন্দাপূর্ণ রাজধানী অস্‌লো এই দেড় সহস্রেরও কম সৈন্যের দ্বারা অধিকৃত হইল।" এই প্রসঙ্গে জনৈক গ্রন্থকার মন্তব্য করিতেছেন—

"There was not a hiss, not a jeer not even a noticeable tear on any woman's face. Not a hand or a voice was raised against the invader, surprise ruled supreme".[১]

'কোথাও কোন ছত্রভঙ্গ হইল না, ঠাট্টা বিদ্রূপের কথাও শুনা গেল না, এমন কি কোন স্ত্রীলোকের চোখেমুখে সামান্য অশ্রুজলের রেখা পর্যন্ত দেখা গেল না। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একখানা মাত্র হাতও উঠিল না, কাহারও কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল না। সর্বত্র বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের চরম মাত্রা উদ্ঘাটিত হইল।

জার্মানরা স্বচ্ছন্দে রাজধানীর সমস্ত সরকারী ভবন, রেলপথ, বিমানঘাটি এবং মূলকেন্দ্রগুলি দখল করিয়া ফেলিল। যখন এই দখলকার্য চলিতেছিল, তখন সৈন্যদলের সঙ্গে আগত ব্যাণ্ডবাদকের দল দিব্যি বাজনা বাজাইয়া সরলচিত্ত নাগরিকদের মনোহরণ করিতে লাগিল। কিন্তু পরদিন যখন এই মূঢ়তা ও বিহ্বলতা হইতে তারা জাগিল, তখন দেখিল যে, তাদের স্বদেশ বেদখল হইয়া গিয়াছে এবং রাজা হাকন ও তাঁর মন্ত্রিবর্গ কোনমতে জীবন লইয়া বৃটেন অভিমুখে পলায়ন করিয়াছেন! আর অস্‌লোতে এক নূতন গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যার নায়ক হইতেছেন মেজর ভিদ্‌কুন কুইজলিং—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কুখ্যাত 'পঞ্চম বাহিনীর' প্রধান অধিনায়ক।

কেবল নরওয়ে নহে, সমগ্র পৃথিবী চমকিত হইল জার্মানীর অদ্ভুত সাফল্যে, আর পঞ্চম বাহিনীর সাহায্যপুষ্ট অপকৌশলে। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সময় জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সহকারী জেনারেল মোলা এই পঞ্চম বাহিনীর প্রথম নামকরণ করেন। তিনি অহংকার করিয়া বলেন যে, মাদ্রিদ অভিমুখে চারটি ফ্যাসিস্ট বাহিনী অগ্রসর হইতেছে এবং রাজধানীর অভ্যন্তরে সাহায্যের জন্য আর একটি বা পঞ্চম বাহিনী অপেক্ষা করিতেছে। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের এই ঘটনা হইতেই পঞ্চম বাহিনীর উৎপত্তি এবং নরওয়েতে ইহার পূর্ণবিকাশ দেখা গেল কুইজলিং-এর অধিনায়কত্বে। এই নাৎসী নরওয়েজিয়ানগণ এবং জার্মান বাসিন্দারা পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা দখল করিয়া ফেলিল এবং রেডিও ও টেলিফোনযোগে সর্বত্র আত্মসমর্পণের জন্য জাল হুকুম প্রচার করিতে লাগিল। ১৯৪০ সাল হইতে পৃথিবীর সর্বত্র দেশদ্রোহিতার জন্য কুইজলিং-এর নাম অমর হইয়া রহিল।[২]

১। The Second Great War—vol. 2. Page 784.

২। কুইজলিং স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার করিয়া জার্মানদের হাতে নরওয়েকে তুলিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজেকে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীরূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু জার্মানরা অল্প কয়েক দিন পরেই তাঁকে সেই পদ থেকে তাড়াইয়া দেন। বিশ্বাসঘাতককে কেউ বিশ্বাস করে না।

যুদ্ধের শেষে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে কুইজলিং-এর বিচার হয় এবং তাঁর প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। ১৯৪৫, ২৪শে অক্টোবর এই দণ্ডাদেশ কার্যকার করা হয়।

[চার্চিলের ইতিহাস গ্রন্থে দেখা যায় যে, জার্মান নৌ-বাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ এডমিরাল ফন রায়েডার ৩রা অক্টোবর (১৯৩৯) তারিখেই হিটলারকে নরওয়ের ঘাঁটিগুলি দখলের প্রস্তাব ও পরিকল্পনা দিয়াছিলেন এবং নাৎসী পার্টির তত্ত্ববিদ ও বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ রোজেনবার্গ স্কাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিকে জার্মানীর 'স্বাভাবিক নেতৃত্বে' একটি বৃহৎ নরডিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য উৎসাহী ছিলেন। এজন্য নরওয়ের প্রাক্তন সমর-সচিব ভিদকুন কুইজলিংয়ের সঙ্গে ওস্‌লোর জার্মান দূতাবাসের মারফৎ যোগাযোগ করা হইয়াছিল। ১৪ই ডিসেম্বর কুইজলিং তাঁর সহকারী হেগেলিনের সঙ্গে বার্লিনে আসিলেন এবং রায়েডার তাঁকে হিটলারের কাছে নিয়া গেলেন নরওয়েতে রাজনৈতিক আঘাত হানা সম্পর্কে পরামর্শের জন্য। কুইজলিং এক বিস্তৃত প্ল্যান নিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু হিটলার গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। সুতরাং তিনি এমন ভান করিলেন যে, তিনি আর বেশী বোঝা ঘাড়ে নিতে চান না, সুতরাং নিরপেক্ষ স্কাণ্ডিনেভিয়াই তাঁর কাম্য! অথচ রায়েডারের বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, সেই দিনই হিটলার সুপ্রীম কমাণ্ডকে হুকুম দিলেন নরওয়ে আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হওয়ায় জন্য।

অবশ্য সেই সময় এই ভিতরের কাহিনী জানা ছিল না।]

এদিকে একই সঙ্গে ডেনমার্কও জার্মানীর গ্রাসে চলিয়া গেল। দেশটি ক্ষুদ্র, বাসিন্দার সংখ্যা মাত্র ৪০ লক্ষ, তিন দিকে জলদ্বারা বেষ্টিত এবং বাকি অংশ স্থলপথে জার্মানীর সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং আক্রমণ করা সহজসাধ্য। ৯ই এপ্রিল ভোররাত্রি সাড়ে ৪টার সময় জার্মান সৈন্যেরা সীমান্ত হইতে ডেনমার্ক প্রবেশ করিল এবং ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে সমগ্র দেশ দখল করিয়া ফেলিল। রাজা ক্রিস্টিয়ান ও তাঁর গভর্নমেণ্ট 'প্রতিবাদের সঙ্গে' জার্মানীর বশ্যতা স্বীকার করিলেন। অবশ্য না করিয়াও কোন উপায় ছিল না।

রণনীতি ও রণকৌশল

পোল্যাণ্ডের সমতলভূমির তুলনায় নরওয়ের যুদ্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিল, এমনকি বিপজ্জনক ছিল। নৌবলে জার্মানী কোন দিনই প্রধান নহে। বৃটেনের সঙ্গে এই দিক দিয়া তার তুলনাই হয় না। তথাপি এই দুর্বল নৌশক্তির উপর ভরসা করিয়া জার্মানী এক দুঃসাহসিক সামুদ্রিক অভিযান করিল। ডেনমার্ক হইতে স্কাগারেক ও কাটেগাট প্রণালীর ব্যবধান, উত্তর সমুদ্র ও অতলান্তিক মহাসমুদ্রের তীর, নরওয়ের ১৭০০ মাইল সুদীর্ঘ উপকূল, অধিকাংশ স্থলেই যাহা রুক্ষ্ম খাড়া পাহাড়ের দ্বারা আচ্ছন্ন, তারপর সমুদ্রের অসংখ্য খাঁড়ি—যেগুলি অত্যন্ত বিপজ্জনক গলি ও আবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে, প্রকৃতির এই সমস্ত দুরূহ বাধা জার্মান নৌশক্তিকে অগ্রাহ্য ও অতিক্রম করিতে হইল এবং বাজপাখীর ছোঁ মারিবার মত এক থাবাতেই নরওয়ের সমস্ত বন্দর,

নরওয়ের জগদ্বিখ্যাত ঔপন্যাসিক নুট্ হামসুনের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনিও প্রকাশ্যে জার্মান নাৎসীদের সহযোগিতা করেন এবং তাঁদের প্রশংসা করেন। তাঁর বিরুদ্ধেও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁর বৃদ্ধ বয়স ও ভীমরতির জন্য এই চরম অভিযোগ পরিবর্তন করিয়া অন্য অভিযোগে (নাৎসী শাসনের কাছ থেকে নানা সুবিধা আদায়) তাঁকে দণ্ড দেওয়া হয় এবং ৬৫ হাজার ডলার জরিমানা করা হয়। ৯৩ বছর বয়সে ১৯৫২, ১৯শে ফেব্রুয়ারী তিনি মারা যান।

বিমানঘাঁটি ও সহর কাড়িয়া লইল। কেবল জলপথ অতিক্রম করাই নহে, তীরে অবতরণ এবং বিভিন্ন ঘাঁটি দখল ও প্রত্যাক্রমণ প্রতিরোধ—সামুদ্রিক অভিযানের পক্ষে এই সমস্ত প্রশ্নই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহা সমতল ভূমির উপর দিয়া ট্যাঙ্ক চালাইয়া যাওয়া নহে। সুতরাং জার্মানীর ক্ষিপ্রতা, সঙ্ঘশক্তি, সাহস এবং পূর্বাহ্নে নিখুঁত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইবার বিস্ময়কর শৃঙ্খলাও ভাবিবার মত। অবশ্য নরওয়ের প্রতিরোধ শক্তির অভাব এবং পঞ্চম বাহিনীর সাহায্য মিলিয়া জার্মান সাফল্যকে এত চমকপ্রদ করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার সঙ্গে বৃটিশ তোষণ-নীতির শোচনীয় ব্যর্থতা এবং সুইডেনের নিরপেক্ষতা জার্মান অভিযানকে আরও বেগবান করিয়া তুলিল। নাৎসী সমরকর্তৃপক্ষের কৃতিত্ব এই যে, তাঁরা এই সমস্ত দুর্বলতা এবং ত্রুটিরই সন্ধান রাখিতেন এবং কখন কিভাবে আঘাত হানিতে হইবে, তাহা জানিতেন। সুতরাং রণনৈতিক পরিকল্পনায়, আঘাতের কৌশলে এবং সময়ের পাল্লায় তাঁরা মিত্রপক্ষকে 'বেকুব' বানাইয়া দিলেন। এই অভিযানের জন্য পূর্ব প্রাশিয়ায় তাঁরা শীতকালে প্রস্তুত হইতেছিলেন।

নরওয়ের সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ৬টি বন্দর—অসলো, ক্রিশ্চিয়ানসুন্ড, স্টাভেঞ্জার, বার্জেন, ট্রন্ডহাইম ও নার্ভিক প্রথম আঘাতেই দখল হইয়া গেল। নরওয়ের গভর্নমেন্ট কোন মতে ছয় ডিভিসন সৈন্য জোগাড় করিয়া বাধা দিতে চাহিলেন। কিন্তু জার্মানী সমুদ্রপথে, বিমানপথে ও স্থলপথে একযোগে এমন ক্ষিপ্রতার সহিত আক্রমণ চালাইল যে, নরওয়েজিয়ান সৈন্যরা ছত্রখান হইয়া গেল। অসলো হইতে তিন ডিভিসন জার্মান পদাতিক বর্শাফলকের মত ছড়াইয়া পড়িল এবং দক্ষিণ নরওয়ে দখল করিল, পশ্চিমতীরের বন্দররক্ষী জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিল এবং উত্তরদিকে পাহাড় অঞ্চলের নরওয়েজিয়ান সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে আঘাত হানিল। অসলো খাঁড়ি অঞ্চলের নরওয়েজিয়ান সৈন্যরা দুই দিকে বেষ্টিত হইবার ভয়ে পূর্বদিকে সুইডেনের সীমান্তে পলায়ন করিল। পাঁচ হাজার বিমানবাহী সৈন্য স্টাভেঞ্জার কাড়িয়া লইল। একমাত্র ক্রিশ্চিয়ানসুন্ডে তারা কিছুটা বাধা পাইল এবং এখানে জার্মানীর সুপরিচিত ক্রুজার 'কার্লশ্রু' তীরবর্তী গোলন্দাজদের আক্রমণে ডুবিয়া গেল। তথাপি একদিনের মধ্যেই জার্মানী 'নরওয়ের রাজা' হইয়া বসিল এবং মাকড়সার মত চতুর্দিকে জাল বুনিয়া বিভিন্ন বন্দর ও ঘাঁটির সঙ্গে সংযোগ বিধান এবং বিমানযোগে সৈন্য ও সরবরাহ আনিতে লাগিল।[১]

দুর্বলতর নৌবল লইয়া জার্মানী স্বভাবতঃই খোলা সমুদ্রে বৃটিশ নৌশক্তির সহিত পাল্লা লড়িতে ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু বুদ্ধির কৌশলে এখানে সে উদাসীন বৃটিশ নৌশক্তিকে জব্দ করিল। জার্মানী শ্রেষ্ঠতর বিমানশক্তির সমাবেশ করিল—আকাশে, সমুদ্রপথে ও ভূভাগে জার্মান বিমান আধিপত্য বিস্তার করিল এবং নৌবলের দ্বারা যাহা সে সম্ভব করিতে পারিত না, বিমানশক্তি প্রয়োগের দ্বারা তাহাই সে সফল করিল। ৯ই এপ্রিল তারিখ আকাশ হইতে প্রচণ্ড বোমা মারিয়া বার্জেন বন্দরের এলাকা হইতে বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজগুলিকে বিতাড়িত ও ঘায়েল করিল। তারপর দক্ষিণ নরওয়ে এবং অসলো খাঁড়ির পক্ষে যে জলপথ প্রাণস্বরূপ সেই বিস্তীর্ণ স্কাগারেক প্রণালীকে এক সপ্তাহের তীব্র লড়াইয়ের পর নিজের দখলে আনিল। এজন্য বিমানবহর, সাবমেরিন ও হাল্কা

১। 'The World At War'—Page 44

নৌপোত ব্যবহৃত হইল। কাটেগাট প্রণালী সম্পর্কেও একই কৌশল অনুসৃত হইল এবং এই দুই জলপথ ছিল নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও বালটিক সমুদ্রের প্রবেশের পক্ষে দুর্গদ্বারস্বরূপ। অতি সতর্ক ও সাবধানী বৃটিশ নৌবহর জার্মানীকে বাধা দিয়ে ঘায়েল করিবার বদলে নিজেরাই নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে সরিয়া পড়িল। বিমানশক্তির দাপটের নিকট তারা তিষ্ঠিতে পারিল না। বৃটিশ নৌশক্তি পূর্বাহ্নে যেমন কোন দৃঢ়সংকল্প ও আধুনিক যুদ্ধের প্ল্যান লইয়া অগ্রসর হয় নাই, তেমনই নৌযুদ্ধেও বিমানশক্তির কার্যকারিতা কতখানি এই ধারণাও সম্ভবতঃ তাদের ছিল না।

'It was the first campaign of the war in which air power successfully challenged sea power and proved that aerial cover was essential to ships operating in coastal water'১.

ইঙ্গ ফরাসী গভর্নমেণ্ট যথারীতি নরওয়েকে সাহায্যদান ও রক্ষার ভরসা দিলেন, যেমন তাঁরা দিয়াছিলেন পোল্যাণ্ডকে। তবে, পোল্যাণ্ডকে তাঁরা যেমন একটি কামান বা একটি এরোপ্লেন দিয়াও সহায়তা করিতে পারেন নাই, এক্ষেত্রে অবশ্যই তাঁরা মুখ রক্ষার জন্য কিছু চেষ্টা করিলেন। পশ্চিম উপকূলবর্তী ট্রণ্ডহাইম যাহা ছিল দক্ষিণ ও মধ্য নরওয়ের প্রধানতম রেলওয়ে ও যোগাযোগের কেন্দ্র, তাহা দখলের উদ্দেশ্য লইয়া একটি মিত্রপক্ষীয় অভিযাত্রী বাহিনী প্রেরিত হইল। মাত্র ৩০ হাজার সৈন্য লইয়া এই বাহিনী গঠিত ছিল এবং ১৪ই হইতে ২০শে এপ্রিলের (১৯৪০) মধ্যে তারা ট্রণ্ডহাইম হইতে ১৫০ মাইল উত্তরে ন্যামসস ও ১০০ মাইল দক্ষিণে আন্দালসনেক নামক দুইটি 'ধীবর পল্লীতে' অবতরণ করিল। ইহাকে অভিযান না বলিয়া পাল্টা আক্রমণের পরিহাস বলাই ভালো। কেন না, জার্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার মত কোনপ্রকার সাজসজ্জা, সমরসম্ভার, বিমানবল ও দক্ষতা তাদের ছিল না। বিশেষত সমুদ্র পারবর্তী ইংলণ্ডের বিমানঘাঁটি হইতে এগুলির দূরত্ব ছিল অন্তত ৪০০ মাইল কিংবা যাতায়াতে ৮০০ মাইল। সুতরাং অবতরণ করিবার মুখেই এগুলি জার্মান বোমারুর হাতে প্রচণ্ড মার খাইল। তারপর ভিতরের দিকে ডম্বান, লিলেহ্যামার ও স্টোরেন অভিমুখে অগ্রসর হইবার সময় তারা অসলো হইতে জার্মানীর ত্রিমুখী আক্রমণের সম্মুখীন হইল এবং নাৎসী বিমানবল ও রণশক্তির নিকট তিষ্ঠিতে না পারিয়া ৩০শে এপ্রিল তারিখ ন্যামসস ও আন্দালসনেকসহ সমগ্র মধ্য নরওয়ে হইতে প্রস্থান করিল।

একান্ত উত্তরবর্তী নরওয়ের নার্ভিক বন্দর দখলের জন্য বৃটেন শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিল। ৯টি জার্মান ডেস্ট্রয়ার এবং কিছু পদাতিক সৈন্য (যারা একটি ব্রেইটারযোগে গোপনে আসিয়াছিল) লৌহধাতুর এই বন্দরটি দখল করিয়াছিল। ৫টি বৃটিশ ডেস্ট্রয়ার পরদিন ইহা আক্রমণ করিল এবং ২টি ডেস্ট্রয়ার খোয়া গেল। তখন বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ (ব্যাটলসিপ) 'ওয়ারস্পাইট' ৯টি জার্মান ডেস্ট্রয়ারের উপরেই প্রতিশোধ লইল এবং সমস্তগুলিকে ডুবাইয়া দিল। ইহার পর বৃটিশ সৈন্যেরা নার্ভিকের উত্তরে ট্রমসো এবং দক্ষিণে বোড়োতে অবতরণ করিল। কিন্তু ২৭শে ও ২৮শে মে ট্রণ্ডহাইম হইতে বিমানযোগে প্রেরিত নূতন জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে তারা পারিয়া উঠিল না। বিশেষত তখনও সেখানে গভীর বরফ ছিল। তথাপি ২৯শে মে তারিখ মিত্রসৈন্যেরা নার্ভিক শহর দখল করিল বটে, কিন্তু ১০ই জুন তাহাও পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইল।

১। পূর্বোক্ত পুস্তক—পৃঃ ৪০

এভাবে অভিনব নরওয়ে যুদ্ধের উপসংহার ঘটিল এবং মিত্রপক্ষ উত্তর ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইল।

এই যুদ্ধে জার্মানীর সৈন্যবলের ক্ষতি হইল সামান্য—হতাহতের সংখ্যা ৩৫ হাজার হইতে ৫৫ হাজারের মধ্যে। কিন্তু জার্মান নৌবলের প্রভূত ক্ষতি হইল। 'ব্লুচার' নামক ভারী জার্মান ক্রুজার, ২টি হাল্কা ক্রুজার, ১১টি ডেস্ট্রয়ার ও ৬টি সাবমেরিন নিমজ্জিত হইল এবং আরও কয়েকটি পোত দখল হইল। নরওয়েজিয়ান বাণিজ্যবহরের অন্তত দশ ভাগের নয় ভাগই রক্ষা পাইল এবং যে ১০২৪ খানা পোত তখন সমুদ্রে ছিল, সেগুলি বৃটিশ বন্দরে আশ্রয় লইয়া মিত্রপক্ষীয় নৌবহরকে শক্তিশালী করিল।

বৃটিশ রণনীতির নিন্দা

নরওয়ে অভিযানে মিত্রপক্ষের কেলেঙ্কারী লইয়া চারিদিকে তীব্র সমালোচনার উদ্রেক করিল। মার্কিন ও বৃটিশ পত্রিকাসমূহে জনমতের নিন্দাত্মক ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। এমনকি ৭৮ বৎসরের বৃদ্ধ লয়েড জর্জ (প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৬-১৮ সালে বৃটেনের প্রধান নায়ক) কঠিন তিরস্কারের সুরে বলেন—

"It is a deplorable tale of incompetence and stupidity. It means that the direction of the war of the Allies is hopelessly inferior to that of their formidable foes. The nation is equal to any sacrifice, but that they are all helpless to win victories when the supreme direction is not only faulty but feeble and foolish".

"অযোগ্যতা ও নির্বুদ্ধিতার ইহা এক করুণ কাহিনী, ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মিত্রশক্তির যুদ্ধ পরিচালনা তাদের দুর্দমনীয় শত্রুর তুলনায় নিতান্ত দুর্বল। সমগ্র জাতি যখন যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত তখনও তারা অসহায় বোধ করিতেছে। কারণ যুদ্ধের চরম নেতৃত্ব কেবল ত্রুটিপূর্ণই নহে, ইহা দুর্বলতা ও মূর্খতায় পরিপূর্ণ।"

আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বিগত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ শিক্ষালাভ করেন নাই। কারণ, ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে দার্দানেলিসের যুদ্ধে গ্যালিপোলিতেও প্রায় অনুরূপ ব্যাপারই ঘটিয়াছিল। প্রথমত গ্যালিপোলি অভিযান লইয়াই সময় দপ্তরের মতভেদ ঘটে। মিঃ চার্চিল ও এডমিরাল স্যার জন ফিশারের মধ্যে ঝগড়া বাধে—ইহা আদৌ চালান উচিত কিনা তাহা লইয়া। লর্ড কিচেনারের মধ্যস্থতায় একটা আপোষ হইয়াছিল বটে, কিন্তু যখন কার্যত অভিযান শুরু হইল তখন নরওয়ে যুদ্ধের মতই 'জোড়াতালি দিয়া' সৈন্য পাঠান হইল! স্যার আয়ান হ্যামিলটনকে সেনাপতি পদে বরণ করা হইল বটে, কিন্তু তিনি তাঁর স্টাফ ছাড়াই রওনা হইতে বাধ্য হইলেন। দার্দানেলিস প্রণালীর দুর্গসমূহ, তুর্কী সৈন্যদল ও মানচিত্র ইত্যাদি সম্পর্কেও তিনি 'আধুনিকতম' পুঁথিপত্র জোগাড় করিতে পারিলেন না। তাঁর সহকারিগণ 'গাইড-বুকের' সন্ধানে লণ্ডনের সমস্ত লাইব্রেরী খুঁজিয়া হয়রান হইয়াছিলেন। গোলাগুলী, রসদ ও সৈন্যবাহী জাহাজগুলির যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছান সম্পর্কেও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। গোড়ায় যেখানে ঘাঁটি স্থাপনের কথা ছিল

উহার পরিবর্তন করিয়া আলেকজেন্দ্রিয়ায় প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল। ফলে বিভ্রাট আরও বাড়িয়া গেল। তারপর গ্যালিপোলিতে সৈন্যদলের অবতরণ, অবস্থান ও সন্নিবেশ সম্পর্কেও নানা বিঘ্ন ও অসুবিধা দেখা দিল।[১] নরওয়ের উপকূলের মতই সেখানেও এমন স্থানে সৈন্য নামাইতে হইয়াছিল সেখানে কোন খাদ্যদ্রব্য, পানীয় জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দুরূহ ছিল, সামরিক উপকরণ সরবরাহেও গোলযোগ ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ সহজ কথায় গ্যালিপোলি অভিযানের পরিকল্পনা এবং কার্যক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক ও অব্যবস্থায় পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং ফলাফলও অত্যন্ত মারাত্মক হইল। বহু সহস্র সৈন্যের জীবননাশের পর মিত্রশক্তিকে সেইবার দার্দানেলিস ত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছিল। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসের নরওয়ে যুদ্ধের কাহিনী ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসের গ্যালিপোলি যুদ্ধকে স্মরণ করাইয়া দিবে। বস্তুত ইতালী হইতে এই পুরাতন দৃষ্টান্ত দিয়া বৃটেনকে বিদ্রূপ করাও হইল এবং ৭ই মে কমন্সসভায় সরকার-বিরোধী দলের নেতা মিঃ সি আর এটলি ও স্যার আর্চিবল্ড সিনক্লেয়ার চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়া বলেন যে, নরওয়ে অভিযানে দীর্ঘ দিনের ট্রেনিং পাওয়া অভিজ্ঞ সৈন্যদল পাঠান হয় নাই, হইয়াছে একদল 'বালককে', যারা যুদ্ধবিদ্যায় কাঁচা! ভিন্ন আবহাওয়ায় ও বরফঝড়ের মধ্যে যে ধরনের কোট ও জুতা সৈন্যদিগকে দেওয়া উচিত ছিল, তাহাও সরবরাহ করা হয় নাই। এক জায়গায় মাত্র দুইটি বিমানধ্বংসী কামান তীরে নামানো হইয়াছিল। কামান চালাইবার জন্য কোন ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈন্য পাঠান হয় নাই, কামানের পাল্লা বুঝিবার জন্য ব্যবস্থা করা হয় নাই, এমন জাহাজ পাঠান হইয়াছে যার মধ্যে কোন ক্রোনোমিটার কিংবা আন্তর্জাতিক সাঙ্কেতিক চিহ্নের পুস্তকাবলী (কোড বুক) দেওয়া হয় নাই। কোন-কোন জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, এমন কি রাইফেল পর্যন্ত ছিল না এবং যে খাদ্য সরবরাহ করা হইয়াছিল, তাতে অর্ধেকের বেশী লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না। জাহাজে চিকিৎসার পর্যন্ত ব্যবস্থা ছিল না।

তথাপি মিঃ চেম্বারলেন এই বলিয়া গর্ব অনুভব করিলেন যে, বৃটিশ সৈন্যেরা অতি বীরত্বের সঙ্গে লড়িয়াছে এবং নরওয়ে থেকে প্রস্থানের সময় একটি বৃটিশ সৈন্যও খোয়া যায় নাই।

১। 'A History of the World War'—by Liddell Hart, 1934.

পঞ্চম অধ্যায়

বৃটেনে রাজনৈতিক পরিবর্তন

বার্লিনে আক্রমণের বিতর্ক

১৯40 সালের বসন্তকাল ইউরোপে জীবনের কোন বসন্ত-সৌন্দর্য লইয়া দেখা দিল না, বরং যৌবনের প্রত্যাশা ও আনন্দের মৃত্যুপরোয়ানা লইয়া দেখা দিল। পশ্চিম রণাঙ্গনে তখন যুদ্ধের মহাপ্রলয় আরম্ভ হওয়ার মুখে, আর উত্তর ইউরোপের স্কাণ্ডানেভিয়ান দেশগুলিতে (ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে) তখন যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়াছে এবং নরওয়েতে (বাল্টিক সাগরের মুখ থেকে মেরু সীমানা পর্যন্ত যার দৈর্ঘ্য হাজার মাইল) বৃটেনের অভিযান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। কেবল ব্যর্থ নয়, একটা চরম কেলেঙ্কারিতে পরিণত হইয়াছে। অথচ ১লা এপ্রিল তারিখেই লণ্ডনে এই খবর পেঁছিয়াছিল যে, নরওয়েতে হিটলারী আক্রমণ আসন্ন। মার্কিন সাংবাদিক-ঐতিহাসিক উইলিয়াম শাইরার লিখিয়াছেন যে, সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার এটা বিশ্বাস করেন নাই—যদিও ৩রা এপ্রিল সমর-মন্ত্রিসভায় এটা নিয়া আলোচনা পর্যন্ত হইয়াছিল। আর ৪ঠা এপ্রিল তারিখ রক্ষণশীলদের এক সভায় চেম্বারলেন নির্বিকার চিত্তে ঘোষণা করিলেন যে, এই যুদ্ধের আরম্ভের সময়ের চেয়ে এখন তিনি জয় সম্পর্কে 'দশগুণ বেশী বিশ্বাসী' এবং 'হিটলার বাস ধরিতে পারেন নাই'—'Hitler missed the bus'.

এই শেষোক্ত মন্তব্য—'হিটলার বাস ধরিতে পারেন নাই', যুদ্ধের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে এবং তখনকার দিনে সারা পৃথিবীতে এই মন্তব্য নিয়া নানা বিদ্রূপাত্মক আলোচনা শুনা গিয়াছিল। কিন্তু এমন মানসিকতা কেবল চেম্বারলেনের নয়, যুদ্ধবিশারদ চার্চিলের পর্যন্ত ভুল ধারণা হইয়াছিল এবং এর আগের কয়েক মাস বৃটেনে সমরোৎপাদনের বৃদ্ধি দেখিয়া চার্চিল হর্ষোৎফুল্লভাবে মন্তব্য করিলেন—'যুদ্ধায়োজনের এই অতিরিক্ত মাসগুলি আমাদের কাছে দেবানুগ্রহের মত। হের হিটলার ইতিপূর্বেই তাঁর সর্বোত্তম সুযোগ হারাইয়াছেন।'

কিন্তু নরওয়ের যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর দেখা গেল হিটলার তো 'বাস ধরিয়াছেন' বটেই, বরং ইঙ্গ-ফরাসীই 'খেয়া পার' হইতে পারেন নাই। তখন বৃটেনে (এবং ফ্রান্সেও) রাজনৈতিক ঝড় বহিতে শুরু করিল এবং খাস রক্ষণশীল দলের মধ্যেই যে ক্ষোভ ধূমায়িত হইতে শুরু করিয়াছিল, তা ক্রমশঃ বহ্নিশিখায় পরিণত হইতে লাগিল। কারণ তাঁরা অনুভব করিলেন যে, চেম্বারলেনের নেতৃত্ব শান্তির সময়েই যদি এত খারাপ হইয়া থাকিতে পারে, তবে যুদ্ধের সময়ে নিশ্চয়ই বিপর্যয়কর হইবে। যাঁরা মিউনিক চুক্তি ও নীতির বিরোধী ছিলেন, কমন্স ও লর্ডস সভার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য নিয়া তাঁদের একটা 'পর্যবেক্ষণ কমিটি' ছিল। লর্ড স্যালিসবারির মত প্রবীণ ও সম্মানভাজন রক্ষণশীল নেতা এবং লিওপোল্ড আমেরির মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই সময় নেতৃত্ব পরিবর্তনের কথা গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক

আবহাওয়া উত্তেজনায় ভারী হইয়া উঠিল। এবং ৭ই মে, ১৯৪০ কমন্স সভার অধিবেশনে এই উত্তেজনা সর্বপ্রথম ফাটিয়া পড়িল। রক্ষণশীল দলের যে সমস্ত এম-পি সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়াছিলেন এবং যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নরওয়ের উপকূলে ব্যর্থ অবতরণে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁদের অনেকে এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। লিওপোল্ড আমেরি তাঁদের ক্রুদ্ধ মনোভাবের যে পরিচয় পান তা স্মরণীয় ঃ

Their indignation was expressed by Leopold Amery, who demanded the formation of a genuine coalition Government and made the most dramatic denunciation of Chamberlain repeating Cromwell's address to the Long Parliament ; 'You have sat too long here for any good you have been doing. Depart I say, and let us have done with you. In the name of God, go !'[১]

অর্থাৎ ঈশ্বরের দোহাই, আপনি ভাগুন !—চেম্বারলেনের বিরুদ্ধে এই নাটকীয় আক্রমণ এবং ক্রমওয়েলের প্রসিদ্ধ বক্তৃতার প্রতিধ্বনিতে সভাকক্ষ কাঁপিয়া উঠিল বটে, কিন্তু চেম্বারলেন তখনও তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কিন্তু পরদিন ৮ই মে কমন্সসভার পুনরধিবেশনে যখন চেম্বারলেন মন্ত্রিসভার প্রতি আস্থা জ্ঞাপনের প্রস্তাব উঠিল, তখন দেখা গেল যে, মাত্র ৮১ জন সদস্য তাঁকে সমর্থন করিয়াছেন, অথচ সাধারণতঃ ২০০ জনের মেজরিটি তিনি পাইয়া থাকেন। এর অর্থ এই যে, কেবল বিরোধী লেবর ও লিবারেলই নয়, তাঁর স্বীয় দলের রক্ষণশীলদের মধ্যেও অন্ততঃ ১০০ জনের বেশী সদস্য তাঁর বিপক্ষে ভোট দিয়াছেন, কিংবা তাঁকে সমর্থন জানাইতে বিরত রহিয়াছেন। তখন চেম্বারলেন বুঝিলেন যে, তার পদত্যাগ না করিয়া উপায় নাই। তবু তিনি শ্রমিক দলকে বাগে আনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হইলেন। কিন্তু তাঁর পদত্যাগের পর প্রধানমন্ত্রীর পদে কে বসিবেন ?—চার্চিলকে চেম্বারলেন পছন্দ করিতেন না, কারণ, তোষণ-নীতির তিনি তীব্র বিরোধী ছিলেন। সুতরাং এই বিষয়ে যিনি অন্যতম পাণ্ডা ছিলেন, সেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হ্যালিফ্যাক্সকে গদীতে বসাইবার জন্য চেম্বারলেন চেষ্টা করিলেন, যদিও এই প্রস্তাবের কথা শুনিয়া হ্যালিফাক্সের নাকি 'একটা পেট ব্যথা মোচড় দিয়া উঠিয়াছিল !'

'...he felt a bad stomachache'[২]

তবু চেম্বারলেন পররাষ্ট্রদপ্তরের সহকারী সচিব আর. ও. বাটলারকে বলিলেন হ্যালিফ্যাক্সকে তাঁর মত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করিতে। কিন্তু বাটলার টেলিফোনে জবাব দিলেন—তাঁর কিছুই করিবার নাই, কারণ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর দাঁত দেখাইতে গিয়াছেন ডেন্টিস্টের কাছে !

তখন ১০ মে, ১৯৪০ (ওদিকে পশ্চিম রণাঙ্গনে হিটলারের আক্রমণ শুরু হইয়া গিয়াছে) সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় দেখা গেল একজন বিষণ্ণ ও ভগ্নহৃদয় ব্যক্তি মাথা নীচু করিয়া ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীট থেকে একটা মোটরগাড়ীতে চড়িলেন এবং সোজা বাকিংহ্যাম প্যালেসে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি ২০ মিনিট কাটাইলেন এবং তারপরেই ঘোষিত হইল 'দি রাইট অনারেবল' নেভিল চেম্বারলেনের পদত্যাগের সংবাদ

---

১. British Foreign Policy during world war II. V. Trukhanovsky 1970, p, 88.

২। হেনরি পেলিং প্রণীত 'ব্রিটেন এণ্ড দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার', পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫।

এবং সেই সঙ্গে উইনস্টোন চার্চিলকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য হিজ ম্যাজেস্টির আমন্ত্রণ। কিন্তু রাজা ষষ্ঠ জর্জও চার্চিলকে সুনজরে দেখিতেন না (অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগের ব্যাপারে চার্চিলের পক্ষপাতিত্বের জন্য) বরং তিনি লর্ড হ্যালিফাক্সকেই প্রধানমন্ত্রীরূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। এমনকি স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসের মত রক্ষণশীল বিরোধী লোকও হ্যালিফাক্সের জন্য ওকালতি করিয়াছিলেন।

নরওয়ের বিপর্যয় উপলক্ষে চার্চিলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল বটে, কিন্তু অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তখন তাঁর বিরোধী ছিলেন। ওলিভার স্ট্যানলি, স্যামুয়েল হোর প্রভৃতি মন্তব্য করিলেন যে, যে-ব্যক্তির জন্য নরওয়ের এই কেলেঙ্কারি তাঁকেই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হইল। বিখ্যাত সমরবিশেষজ্ঞ লীডেল হার্ট লিখিয়াছিলেন: 'ইতিহাসের এটা প্রকাণ্ড বিদ্রূপ যে, চার্চিল নরওয়ে উপলক্ষে চরম ক্ষমতালাভের সুযোগ পাইলেন, অথচ নরওয়ের বিপর্যয়ের জন্য তাঁর অবদানই সবচেয়ে বেশী।'

কিন্তু সেদিনের পরিস্থিতিতে যিনি 'ইতিহাসের প্রকাণ্ড বিদ্রূপরূপে নিন্দাভাজন হইলেন, সেই চার্চিল মহাযুদ্ধের তীব্রতম সংকট ও ভয়ংকর দুর্দিনে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে কেবল অপরাজয়ের জাতীয় নেতার আসনেই অভিষিক্ত হইলেন না, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিটলার-বিরোধী নেতৃত্বের অন্যতম মহানায়করূপেও প্রতিভাত হইলেন। তাঁর স্বদেশপ্রেম, তাঁর সাহস, তাঁর তেজস্বিতা, তাঁর দৃঢ়তা এবং বহু বিষয় সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য এবং সর্বোপরি তাঁর অতুলনীয় বক্তৃতা বৃটেনের মরা গাঙে যেন বান ডাকিয়া আনিল। কোন একক ব্যক্তির নেতৃত্বে কিভাবে একটা জাতিকে অনিবার্য পতন থেকে রক্ষা করিতে পারে, উইনস্টোন চার্চিল তার অনন্য-সাধারণ দৃষ্টান্ত।...

৬৫ বছর বয়সে চার্চিল (জন্ম ৩০শে নভেম্বর, ১৮৭৪) বৃটেনের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিলেন এবং ১১ই মার্চ তাঁর সমরমন্ত্রিসভা গঠন করিলেন পাঁচজন সদস্য লইয়া—প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষামন্ত্রীর পদে চার্চিল, চেম্বারলেনও অপেক্ষাকৃত একটি সাধারণ মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিলেন—লর্ড প্রেসিডেণ্ট অব দি কাউন্সিল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড হ্যালিফাক্স, লর্ড প্রীভিসিল সি আর এটলি ও দপ্তরহীন মন্ত্রী আর্থার গ্রীনউড। এছাড়া এ ভি আলেকজাণ্ডার নৌসচিব, এণ্টনি ইডেন সমরসচিব এবং লর্ড বীভারব্রুক বিমান উৎপাদন দপ্তরের নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন (চার্চিল দ্রুত বিমান উৎপাদনের উপর জোর দিয়াছিলেন)। রক্ষণশীল, শ্রমিক ও উদারনীতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়া যুদ্ধকালীন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। অবশ্য চেম্বারলেন তখনও রক্ষণশীল দলের নেতা ছিলেন, এই পদ থেকে তিনি বিদায় নিলেন ৮ই অক্টোবর ১৯৪০, যখন তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং ৯ই নভেম্বর, ১৯৪০, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তখন চার্চিল রক্ষণশীল দলের পুরাপুরি নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

একথা বলা বাহুল্য যে, যুদ্ধের সময় চার্চিলের অনেক বক্তৃতা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং সেই সমস্ত বক্তৃতার সুর এখনও যেন অনেক জীবিত ব্যক্তির কানে বাজিতেছে। বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীরূপে কমন্সসভায় তাঁর প্রথম বক্তৃতা—১৩ই মে, ১৯৪০, চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং এই বক্তৃতাতেই তিনি ঘোষণা করিলেন:

"I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. You ask, what is our policy? I will say: it is to wage war, by sea, land

and air, with all our might and with all the strength that God can give us……you ask, what is our aim ? I can answer in one word : Victory—victory at all costs, victory inspite of all terror, victory however long and hard the road may be".

চার্চিলের এই বক্তৃতার 'রক্ত, শ্রম, অশ্রু ও ঘর্মের' প্রতিশ্রুতি সারা পৃথিবীর বহু বক্তার মুখে প্রবাদ-বাক্যের মত বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তবে চার্চিলের এই উদ্দীপনাময় কথাগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক নয়। তাঁরও বহু আগে ঊনবিংশ শতকে ইতালীর সুপ্রসিদ্ধ দেশপ্রেমিক যোদ্ধা গ্যারিবল্ডি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই রোম নগরীতে এক বক্তৃতায় তাঁর অনুচরদের বলিয়াছিলেন :

"I offer neither pay, nor quarter, nor provisions ; I offer hunger, thirst, forced marches, battles and death."

আর প্রথম মহাযুদ্ধের ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ অধিনায়ক ক্লেমেস বলিয়াছিলেন (২০শে নভেম্বর ১৯১৭) :

"Finally you ask what are my war aims ? Gentlemen, they are very simple : victory."

আর ১৯১৮ সালের ৮ই মার্চ তিনি পুনরায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন :

"My formula is the same everywhere. Home policy ? I wage war. Foreign policy ? I wage war. All the time I wage war".

লক্ষ্য করিবার এই যে, তিনজন ইতিহাসখ্যাত নায়কের এই তিনটি বক্তৃতাই যুদ্ধের সংকটে একই সুরে এবং একই ভঙ্গীতে প্রদত্ত।…

এদিকে বৃটিশ মন্ত্রিসভার অনেক আগেই ফরাসী মন্ত্রিসভারও পরিবর্তন ঘটিয়াছিল এবং ফ্রান্সে রাজনৈতিক সংকট বৃটেনের চেয়েও গভীর ছিল এবং সেই সংকট অনেক দিনের। এজন্য কোন ফরাসী মন্ত্রিসভাই দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। চেম্বারলেনের অনুরূপ দালাদিয়েরের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেও অসন্তোষ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল এবং ২১শে মার্চ ১৯৪০, তোষণনীতি-বিরোধী পল রেনো দালাদিয়েরের পদত্যাগের পর প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ ও মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করিলেন।

* * *

গত কয়েক মাস ধরিয়া লণ্ডনে ও প্যারিসে যখন রাজনৈতিক উঠানামা এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে 'ভেজাল যুদ্ধের' ফাঁকা আওয়াজ চলিতেছিল, তখন কিন্তু বার্লিনে জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা নিষ্কর্মা বসিয়া নাই। হিটলার অবিলম্বেই পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের কথা ভাবিতেছিলেন এবং পোল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা থেকে যান্ত্রিক বাহিনীগুলির সাজসজ্জা, সমাবেশ ও পরিচালনা সম্পর্কে ভুলত্রুটি সংশোধন ও পুনর্গঠনের জন্য সামরিক নেতাদের তাগিদ দিতেছিলেন। কিন্তু জার্মানবাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলীর মধ্যে এমন একটা গ্রুপ ছিল, যাঁরা হিটলারের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং এভাবে পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতেও ইচ্ছুক ছিলেন না। কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল ফরাসী সৈন্যবাহিনীর সামরিক শক্তি জার্মানীর চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। সুতরাং জার্মান-বাহিনীর আগ বাড়াইয়া আক্রমণ করিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কার্য হইবে না। বরং

আত্মরক্ষার বা ডিফেন্সিভ পলিসি অনুসরণ করিয়া যাওয়াই ভালো। কিন্তু ১০ই অক্টোবর, ১৯৩৯ হিটলার শীর্ষ সামরিক নেতাদের এক বৈঠকে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎগতি আক্রমণের এক পরিকল্পনার উপর জোর দিলেন। তিনি বলিলেন যে, এমন গতিশীল যুদ্ধ চালাইতে হইবে যাতে জার্মান সৈন্যরা বেলজিয়ামের শহর ও জনপদের সারিবদ্ধ বাড়ীঘরগুলির মধ্যে হারাইয়া না যায়।…

হিটলারকে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে প্রধান সেনাপতি জেনারেল ব্রাউসিৎস এবং সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল হ্যালডার তখন কতকগুলি টেকনিক্যাল কারণ দেখাইলেন—যেমন, পোল্যাণ্ড থেকে পশ্চিম রণাঙ্গনে সৈন্যদল পাঠানো, সৈন্যদের যান্ত্রিক পুনর্সজ্জা এবং আসন্ন শীতকালের অনেক দিন পর্যন্ত রণক্রিয়ার অসুবিধা ইত্যাদি। আসলে সেনাপতিদের এই ধরনের আপত্তির পিছনে কিছুটা রাজনৈতিক পটভূমিকার প্রভাব ছিল। হিটলারের বিরোধী যে ক্ষুদ্র সামরিক গোষ্ঠী ছিল, যেমন সেনানীমণ্ডলীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ জেনারেল বেক, রোমের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত হ্যাসেল, গোয়েন্দা বিভাগের জেনারেল অস্টার, অস্ত্রপাতি দপ্তরের জেনারেল টমাস প্রভৃতি সেনানীদের বিশ্বাস ছিল যে, কোনও প্রকারে হিটলারকে অপসারণ করিতে পারিলে বৃটেনের সঙ্গে একটা শান্তিসন্ধি ও আপোষরফা করা সহজতর হইতে পারে। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিক সমস্যায় চেম্বারলেনের সঙ্গে হিটলারের প্রস্তাবিত আলোচনার সময় এই সমস্ত সামরিক নেতা হঠাৎ বিদ্রোহ ঘটাইয়া জোরপূর্বক হিটলারকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করার এক চক্রান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অবস্থাবৈগুণ্যে সেই চক্রান্ত ফাঁসিয়া গেল। এবারও সামরিক নেতাদের সেই গ্রুপটি সক্রিয় হইয়া উঠিল। কিন্তু কয়েকদিন চুপচাপ থাকিবার পর হিটলার অক্টোবর মাসের শেষে হুকুম দিলেন যে, ১২ই নভেম্বর পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইতে হইবে। তখন প্রধান সেনাপতি ব্রাউসিৎস বিষম বেকায়দায় পড়িলেন। হয় তাঁকে হিটলারের অদেশ অনুসারে আক্রমণ চালাইতে হইবে, নতুবা বিরোধী গোষ্ঠীর চক্রান্তের সঙ্গে হাত মিলাইয়া হিটলারের বিরুদ্ধে 'অভ্যুত্থান' ঘটাইতে হইবে। কিন্তু হিটলার ছিলেন সুপ্রীম কমাণ্ডার, যুদ্ধের দিনে শীর্ষতম নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটানো কোন দিক দিয়াই যুক্তিসম্মত বা নীতিসম্মত নয়—এই কারণেই ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বরে হিটলারকে অপসারণের চক্রান্তে সামরিক নেতারা বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে সায় দিতে পারেন নাই। এবারও সেই ধরনের সংকটে পড়িয়া জেনারেল ব্রাউসিৎস হিটলারকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করার আশায় ৫ই নভেম্বর, রবিবার হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। কিন্তু সেখানে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হিটলারের কাছে তিনি এমন ধমক ও ধাতানি খাইলেন যে, ব্রাউসিৎসের প্রায় নাড়ী ছাড়িবার জো হইল! তারপর থেকে ব্রাউসিৎস ও হ্যালডার আর হিটলারের বিরুদ্ধে চক্রান্তের ধারকাছ দিয়াও যান নাই।[১]

কিন্তু এই সময় সেনাপতিদের ভাগ্যক্রমে আবহাওয়ার প্রতিকূল রিপোর্টের জন্য ৭ই নভেম্বর আক্রমণের তারিখ (১২ই নভেম্বর) স্থগিত রাখিতে হইল। তথাপি এই টানাপোড়েনের আবহাওয়ার মধ্যে আর একটা ভয়ানক চমকপ্রদ কাণ্ড ঘটিল। হিটলার বরাবরই মিউনিকে তাঁর ১৯২৩ সালের 'পুশ' (জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা) উপলক্ষে বার্ষিকী পালন করিয়া থাকেন। এবারও ৮ই নভেম্বর যখন তিনি তাঁর

১. 'Hitler'—Allan Bullock. P. 566

বক্তৃতা সংক্ষেপ করিয়া নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই চলিয়া গিয়াছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে হলের মধ্যে বোমা বিস্ফোরিত হইল ! নাৎসী পার্টির কয়েকজন সদস্য নিহত হইল এবং অনেকে আহত হইল।

কিন্তু এই বোমা বিস্ফোরণ ছিল একটি সাজানো চক্রান্তের ঘটনা। ডাচাউ বন্দীশালার এলসার নামে একজন দক্ষ ছুতোর মিস্ত্রীকে মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া হিটলারের গোয়েন্দা পুলিশ বা গেস্টাপো এই বোমা ষড়যন্ত্র ঘটাইয়াছিল এবং এর উদ্দেশ্য ছিল হিটলারের মূল্যবান জীবন ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে জনগণকে আরও সচেতন করিয়া তোলা। মিউনিকে বক্তৃতা দেওয়ার পর হিটলার যখন ট্রেনযোগে বার্লিনে ফিরিতেছিলেন, তখন ন্যুরেমবার্গে এই ঘটনার সংবাদ হিটলারের কানে পেঁীছিল। তাঁর সেক্রেটারি বলিয়াছেন যে, এই সংবাদ শুনিয়া হিটলারের চোখ উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করিয়া উটিল এবং তিনি তাঁর আসনে হেলান দিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন—'এক্ষণে আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে, আমি যে আগেই বক্তৃতা শেষ করে উঠে পড়েছিলাম, এটা ভাগ্যবিধাতারই ইচ্ছা, অতএব তিনি নিশ্চয়ই আমাকে আমার লক্ষ্য পূরণ করতে দিবেন।'

বলা বাহুল্য যে, এই ঘটনার পুরো সুযোগ গ্রহণ করিল গোয়েবলসের প্রচারদপ্তর এবং জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহিল যে, হিটলারের যুদ্ধযাত্রা ও জার্মানীর নেতৃত্ব সমস্তই ভগবানের বিধান। অন্যথা হিটলার কিভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাইলেন ?···

পশ্চিম রণাঙ্গনে হিটলারী আক্রমণের তারিখ বার বার পরিবর্তিত হইতে লাগিল। ধৃত দলিলপত্রে দেখা যায় যে, ১০ই জানুয়ারী (১৯৪০) হিটলার হুকুম দিয়াছিলেন যে, ১৭ই জানুয়ারী সূর্যোদয়ের ঠিক ১৫ মিনিট আগে আক্রমণ শুরু হইবে। কিন্তু তিনদিন পর আবার সেই আক্রমণের তারিখ স্থগিত রহিল এবং ২০শে জানুয়ারী সম্ভবতঃ আক্রমণের চূড়ান্ত তারিখরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। ১০ই জানুয়ারী যেদিন হিটলার হুকুম দিলেন ১৭ই তারিখ আক্রমণ শুরু হইবে, সেদিন মুনস্টার থেকে জার্মান বিমান-বাহিনীর একজন অফিসার কলোন অভিমুখে বিমানযোগে যাইতেছিলেন এবং তাঁর হাতব্যাগে (ব্রীফ কেস) পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের সমস্ত নক্সাটি মায় ম্যাপ পর্যন্ত ছিল। কিন্তু বিমানটি মাঝপথে বেলজিয়ামের উপর মেঘের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিল। ফলে বিমানটি বেলজিয়ামের মাটিতে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। তখন জার্মান বিমান-অফিসারটি—মেজর হেলমুট রেইনবার্জার পাশেই জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল, সেই গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণের দলিল ও নক্সা ইত্যাদি পোড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। যখন কাগজপত্রগুলিতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তখন পাহারারত নিকটবর্তী বেলজিয়াম সৈন্যদের দৃষ্টি এই অভিনব 'অগ্নিকাণ্ডের' দিকে আকৃষ্ট হইল, তারা আসিয়া জার্মান অফিসারকে ঘিরিয়া ধরিল এবং আগুন নিভাইয়া ফেলিল এবং আগুনের হাত থেকে দলিলপত্রের যেটুকু বাঁচিয়াছিল, সেগুলি তারা ছিনাইয়া লইয়া গেল। অবশ্য মেজর রেইনবার্জার ব্রুসেলসের জার্মান দূতাবাসের মারফৎ জার্মান বিমানবাহিনীর সদর দপ্তরে দুর্ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট দিলেন যে, সব কাগজপত্রই পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে, আগুনের ফলে সেগুলি নিতান্ত আঙ্গুলের মত ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু হিটলারসহ জার্মান সমরকর্তারা এই রিপোর্টে আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। তাঁরা সন্দেহ করিলেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের নক্সা অপর পক্ষের হাতে পড়িয়াছে। সুতরাং ১৩ই জানুয়ারী বেলা ১টার সময় জেনারেল জড্ল টেলিফোনযোগে জেনারেল হ্যালডারকে হুকুম দিলেন 'All movements to stop' অর্থাৎ সমস্ত সৈন্য চলাচল বন্ধ রাখিতে হইবে।[১]

তথাপি ১৫ই এবং ১৭ই জানুয়ারীর ঘটনাবলীতে দেখা যায় যে, বেলজিয়মের জেনারেল স্টাফ সতর্ক হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁরা বিভিন্ন ঘাঁটিতে সৈন্য সমাবেশের তোড়জোড় করিতেছেন। আর বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল হেনরিক স্পাক জার্মান রাষ্ট্রদূতকে স্পষ্টই বলিলেন যে, জার্মানী যে বেলজিয়াম আক্রমণের তোড়জোড় পাকা করিয়াছিল, সেই দলিলপত্র তাঁদের হাতে ধরা পড়িয়াছে।

যদিও ফরাসী ও বৃটিশ জেনারেল স্টাফকে এই ধৃত দলিলের কপি দেওয়া হইয়াছিল তথাপি তাদের গভর্নমেণ্ট সতর্ক হন নাই। কিন্তু এই ঘটনা বা বিমান দুর্ঘটনার পর হিটলার ১৩ই জানুয়ারী আক্রমণের তারিখ আবার নিশ্চিতরূপে পিছাইয়া দিলেন এবং বসন্তকালের আগে আর আক্রমণের কথাবার্তা শুনা গেল না। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই বিমান দুর্ঘটনার জন্য পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের সমগ্র রণনৈতিক পরিকল্পনারও পরিবর্তন ঘটিয়া গেল।···

অবশ্য এপ্রিল মাসের (১৯৪০) গোড়ার দিকে হিটলার এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনার দ্বারা ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল করিয়া লইলেন এবং ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষকে একেবারে বেকুব বানাইয়া দিলেন। সে-কাহিনী আগের অধ্যায়েই বর্ণনা করা হইয়াছে।

১। The Rise and Fall of the Third Reich. p 307

ষষ্ঠ অধ্যায়

হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের পতন

পশ্চিম রণাঙ্গনের চরম যুদ্ধ—১

১৯৪০ সালের মে মাসে কেবল নরওয়ে ও ডেনমার্ক অতিদ্রুত এবং অতর্কিত দখলের দ্বারাই জার্মানী বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল না, তখনকার দিনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুদূরপ্রসারী এবং চরম যুদ্ধের অনুষ্ঠান হইল পশ্চিম রণাঙ্গনে, যাহা আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসে 'ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' নামে বিখ্যাত। কিন্তু এই যুদ্ধের আগে ইউরোপের আকাশ যদিও সর্বত্র রক্তমেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, তথাপি এর আকস্মিক ভয়াবহ বিস্ফোরণ সম্পর্কে পশ্চিম জগতের রাজধানীগুলিতে তেমন কোন গভীর উৎকণ্ঠা ছিল না, কিংবা তা প্রতিরোধ করার জন্য সতর্ক আয়োজনও ছিল না। অথচ এই বছরের গোড়ার দিকেই ইউরোপের অন্তত ২ কোটি লোককে অস্ত্র ধারণের জন্য আহবান জানান হইল এবং অস্ত্র নির্মাণের কারখানাগুলিতে নূতন করিয়া ধূম উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল। মার্কিন ঐতিহাসিক লুই স্নাইডার তাঁর গ্রন্থে (দি ওয়ার ১৯৩৯-১৯৪৫) বলিয়াছেন যে, মিউনিক চুক্তির বছরে বা ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর সৈন্যবাহিনীগুলিতে ১০ মিলিয়ন বা ১ কোটি সৈন্য বৃদ্ধি পাইল, নৌবহরগুলির বৃদ্ধি পাইল মোট ৮০ লক্ষ টনেজ, মিলিটারী প্লেন প্রায় ৫০ হাজার এবং পৃথিবীব্যাপী মোট সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইল ১৭০০ কোটি ডলারে। এই সংখ্যাগুলি নিশ্চয়ই তুচ্ছ করার নয়। আর ১৯৩৯ সালে হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশন শক্তিগুলির—যেমন বৃটেন ফ্রান্স, রুমানিয়া, গ্রীস, পোল্যান্ড একত্রে ছিল ২৮২ ডিভিসন সৈন্য, অপরপক্ষে জার্মানী, ইতালী, হাঙ্গেরী ও স্পেন বা অক্ষশক্তিবর্গের এই কোয়ালিশনের ছিল ২০১ ডিভিসন সৈন্য। আর যে কোন দুইটি ইউরোপীয় নৌশক্তির তুলনায় একা বৃটিশ নৌবহরই অনেক বেশী শক্তিধর ছিল। সৈন্য শক্তির মত উভয় কোয়ালিশনের রণবিমানের শক্তিও (৬৫০০) বোধহয় সমান ছিল। কিন্তু পোল্যান্ড ও নরওয়ের যুদ্ধের সংকটে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি অপদার্থ ও উদাসীন বলিয়া প্রমাণিত হইল। সুতরাং চারদিকের তুমুল রাজনৈতিক ঝড়ের মধ্যে লন্ডন ও প্যারিসে তোষণবাদী পুরাতন নেতৃত্ব যখন বিদায় নিল, তখন অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। কারণ, হিটলারী জার্মানীর আধুনিকতম যান্ত্রিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসীর যেমন কোন সর্বাত্মক যুদ্ধের আয়োজন ছিল না, তেমনি নেতৃত্বের মধ্যেও কোন দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা ছিল না। সুতরাং ১০ই মে উইনস্টোন চার্চিল যখন ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রীর এবং পল রেনো ফরাসী মন্ত্রিসভার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন, তখন উহার আগেই মিত্রপক্ষ জার্মানীর অভাবনীয় সর্বগ্রাসী যান্ত্রিক অভিযানের সম্মুখীন হইলেন। আর একটি মহাবিপর্যয়ের এবং সর্বনাশের যবনিকা পৃথিবীর সামনে উদ্ঘাটিত হইল।…

হল্যাণ্ড

…৯ই মে, ১৯৪০—হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, লাক্সেমবুর্গ ও ফ্রান্সের উপর নিশীথ রাত্রির নিঃশব্দ অন্ধকার নামিল। নাগরিকেরা নিশ্চিন্তমনে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। ইহার আগে পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা বিশেষভাবে বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী কিভাবে সময় কাটানো যায়, তাহা লইয়া ব্যস্ত ছিল। তাদের আমোদ-প্রমোদ একটা সমস্যা হইয়া পড়িয়াছিল এবং জার্মান রেডিও প্রচার করিতেছিল যে বেলজিয়ান ও ফরাসী মেয়েরা সাবধান! 'ঘর সামলাও'—এই ছিল তাদের রেডিওর বুলি। বৃটিশ সৈন্যরা ঠাট্টা-মসকরা করিয়া সময় কাটাইল।

এই মনোবৃত্তির ৮ মাস কাটিবার পর ৯ই মে গভীর রাত্রি আসিল। এই রাত্রির কথা উল্লেখ করিয়া কাউন্ট চিয়ানো তাঁর ডায়েরীতে লিখিতেছেন[১] :

'জার্মান দূতাবাসে (রোমের) গরীবানাভাবে ডিনার খাইলাম। নৈশভোজের পর দীর্ঘকাল অতিবাজে এবং একঘেয়ে আলাপ—হরেক রকম কথাবার্তা যাহা জার্মানদের সঙ্গে সম্ভব। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি কথাও হইল না। রাত্রি ১২টা ২৫ মিনিটের সময় যখন আমরা দূতাবাস হইতে চলিয়া আসি তখন ফন ম্যাকেনসন (জার্মান রাষ্ট্রদূত) বলিলেন, সম্ভবত রাত্রে তিনি আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইবেন। কারণ বার্লিন হইতে একটা বার্তা আসিবার কথা আছে। সুতরাং তিনি আমার প্রাইভেট টেলিফোন নম্বর টুকিয়া লইলেন।

'রাত্রি ৪টার সময় তিনি আমাকে টেলিফোন করিয়া বলিলেন যে, মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন এবং আমরা দুইজনে মিলিয়া 'ডুচের' সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইব। শেষ রাত্রি ঠিক ৫টার সময় মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে (বার্লিন হইতে)। অকস্মাৎ কেন এই সাক্ষাৎ ?—এই সম্পর্কে তিনি টেলিফোনে কিছু বলিতে অক্ষম। যখন তিনি (ম্যাকেনসন) আমার গৃহে পেঁছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে এক গাদা কাগজপত্র দেখিলাম। নিশ্চয়ই টেলিফোনে এতগুলি কাগজপত্র আসে নাই !…

'দুইজনে মিলিয়া আমরা 'ডুচের' কাছে গেলাম। তাঁকে আমি পূর্বেই সতর্ক করিয়া রাখিয়াছিলাম। সুতরাং তিনি আগেই উঠিরা পড়িয়াছিলেন, তাঁর মুখ হাসি-হাসি এবং তাঁকে স্থির দেখিলাম। তিনি হিটলারের নোটগুলি পড়িলেন। কেন হল্যান্ড ও বেলজিয়াম আক্রমণ করা হইয়াছে, সেই কারণগুলির একটি তালিকা এই সমস্ত নোটে ছিল। উপসংহারে হিটলার সাদর আহবান জানাইয়াছেন মুসোলিনীকে তাঁর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। তারপর 'ডুচে' দীর্ঘকাল ধরিয়া কাগজপত্র পরীক্ষা করিলেন এবং প্রায় দুই ঘন্টা পর ফন ম্যাকেনসনকে বলিলেন যে, তিনি নিশ্চিত উপলব্ধি করিতেছেন যে, ফ্রান্স ও বৃটেন বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে জার্মানীকে আক্রমণের আয়োজন করিতেছিল। সুতরাং তিনি সর্বান্তঃকরণে হিটলারের কার্য অনুমোদন করিতেছেন।'

৯ই মে শেষ রাত্রে রোম নগরীর এই ক্ষুদ্র নাটিকা, যখন নিদ্রামগ্ন ডাচ ও বেলজিয়াম নাগরিকদের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল আকস্মিক বোমা ও গোলাবর্ষণের শব্দে। যুদ্ধের গুজব তারা দীর্ঘকাল যাবৎ শুনিয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু উহার বাস্তবতার দিকে

১। 'Ciano's Diary'—page 245-46

তাদের বিশ্বাস ছিল না। বিশেষত তারা ছিল নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং তাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে হিটলার ইতিপূর্বেই গ্যারাণ্টি দিয়াছিলেন একাধিকবার।

কিন্তু ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ তাদের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের মারফৎ এই সাংকেতিক বার্তা পাইলেন—'টুমরো অ্যাট ডন, হোল্ড টাইট'। তৎক্ষণাৎ হল্যাণ্ডের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এইচ জি উইকলম্যান আত্মরক্ষার পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আকাশ ও সমুদ্রপথ সক্রিয় হইয়া উঠিল—সমুদ্রে বিস্ফোরণ ঘটিতে লাগিল চুম্বক মাইনের জন্য। রাত্রি ৩টার সময় জার্মান বিমান দেখা দিল হল্যাণ্ডের আকাশে এবং বিমান ঘাঁটিতে বোমা বর্ষিত হইল। ইহার পরেই জানা গেল যে, জার্মান সৈন্যেরা সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে এবং ইহার তিন ঘণ্টা পর জার্মান দূত কাউণ্ট ফন জেফ ওলন্দাজ গভর্ন-মেণ্টকে জানাইলেন যে, বৃটেন ও ফ্রান্স হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া এবং তাঁদের সম্মতিক্রমে জার্মানীর রুর অঞ্চল আক্রমণের উদ্যোগী হইয়াছে বলিয়া রাইখ গভর্নমেণ্ট বাধ্য হইয়াই হল্যান্ড দখল করিতেছেন।...

কেবল ওলন্দাজদের দেশই নহে, বেলজিয়াম, লাক্সেমবুর্গ ও ফরাসী সীমান্ত একযোগে আক্রান্ত ও অতিক্রান্ত হইল। সুতরাং ১০ই মে ভোর বেলা শুরু হইল ইতিহাস প্রসিদ্ধ পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধ, যাহা ১৯১৪-১৮ সালে পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিল এবং এবারও সেই ভয়াবহ পরিণতির সূত্রপাত করিল।

পাঁচ দিনের যুদ্ধে হল্যাণ্ড খতম হইয়া গেল, যার আয়তন মাত্র ১২৫০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৮৭ লক্ষ। কিন্তু দেশটা কৃষিকার্য এবং ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের উপনিবেশে ঐশ্বর্যশালী, লোভনীয় এবং সমুদ্রতীরবর্তী ও জলপ্রধান বলিয়া যার নৌবহরও উল্লেখযোগ্য ছিল। আর উত্তর সমুদ্রের উপকূলবর্তী হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম ইংলণ্ড আক্রমণের পক্ষে অনুকূল, অবরোধ ব্যর্থ করিবার পক্ষে উপযোগী এবং ফ্রান্সের পার্শ্বদেশ ছিন্ন করিবার পক্ষে চমৎকার। আর জার্মানীর পশ্চিম সীমান্তের সংলগ্ন বলিয়া দ্রুত আক্রমণের পক্ষেও আদর্শস্থানীয়। সুতরাং হিটলারী বিবেচনায় এই সমস্ত ক্ষুদ্র দেশের নিরপেক্ষতা টিঁকিতে পারে না, জার্মানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হওয়াই ইহাদের একমাত্র অদৃষ্ট।

কাগজ-পত্রে হল্যাণ্ডের ৪ লক্ষ সৈন্য ছিল। কিন্তু তাদের না ছিল অস্ত্রসজ্জা, কিংবা আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের কোন সমরোপকরণ। সুতরাং ঝড়ের বেগে জীর্ণপত্রের মত ওলন্দাজেরা উড়িয়া গেল নাৎসী বোমার মুখে। ১০ই মে ভোরবেলা হইতেই অজস্র বোমারু প্যারাস্যুট সৈন্য, বিমানবাহিত সৈন্য, এমনকি বিভিন্ন জলপথে রবারের নৌকাযোগে আনীত সৈন্যে হল্যাণ্ড যেন ছাইয়া গেল।

কাগজে-পত্রে সৈন্য সংখ্যার মত হল্যাণ্ডের আত্মরক্ষার একটা প্ল্যানও জেনারেল উইকলম্যান ঠিক করিয়াছিলেন। বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডকে একত্রে 'নীচু জমির দেশ' বলা হয় এবং সমুদ্র তীরবর্তী এই দেশগুলি প্রভূত নদী, খাল জলাভূমি ও জলপথের দ্বারা আচ্ছন্ন। ফলে শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই দেশগুলি বরাবরই জপপথের এই প্রতিবন্ধকগুলিকে ব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং উত্তর হল্যান্ডের জুইডার জী জলপথ, যাহা ভিতরের দিকে প্রশস্ত খাড়ির মত অনেক দূর প্রবেশ করিয়াছে, সেই অংশে, ইজেল নদীপথ ধরিয়া (জার্মান সীমান্ত) এবং তারপর

হল্যাণ্ডের পূর্ব সীমানায় গ্রীব্ লাইন এবং দক্ষিণে পীল-র‍্যাস জলাভূমি ধরিয়া আত্মরক্ষার লাইন তৈয়ারীর চেষ্টা হইল। পূর্ব দিকের এই লাইনগুলিকে আত্মরক্ষার প্রথম সীমান্তবর্তী সারি বলা যাইতে পারে। এগুলি ভাঙ্গিয়া গেলে ভিতরের দিকে খাস 'হল্যাণ্ড দুর্গের' লাইন ধরিয়া বাধা দেওয়া হইবে—আমস্টারডাম এলাকায় জুইডার জী জলপথ, মোয়েরডিক জলপথ ও সেতু পর্যন্ত আত্মরক্ষার এই ব্যূহ প্রসারিত ছিল।

কিন্তু জার্মানদের কাছে এই সমস্ত অতিপরিচিত এবং অতিতুচ্ছ ছিল। তারাও তিন অংশ ধরিয়া আক্রমণ চালাইল, যথা—(১) উত্তরে হল্যাণ্ড পূর্ব ও পশ্চিমে জুইডার জলপথের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু জুইডার জী বাঁধের দ্বারা এই দুই অংশকে সংযুক্ত করা হইয়াছিল। পূর্বাংশে গ্রোনিনজোন ও ফ্রিসল্যাণ্ড প্রদেশ ধরিয়া জার্মানরা জুইডার জী বাঁধ অভিমুখে উত্তর হল্যাণ্ড আক্রমণ করিল। (২) হল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী অংশে গ্রীব্ লাইন ধরিয়া এবং তারপর আরও ভিতরের দিকে 'হল্যাণ্ড দুর্গ" অভিমুখে যাকে 'নিউ ডাচ ওয়াটার লাইন'ও বলা হইয়া থাকে, সেখান দিয়া দ্বিতীয় আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল। (৩) তৃতীয় আক্রমণ ঘটিল মিউজ বা ম্যাস নদী এলাকা বা দক্ষিণ হল্যাণ্ডের পীল-র‍্যাস অঞ্চল দিয়া মোয়েরডিক সেতু, জীল্যাণ্ড (সমুদ্রোপকূলবর্তী) এবং বেলজিয়াম অভিমুখে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, হল্যাণ্ড বেলজিয়াম, লাক্সেমবুর্গ ও ফ্রান্স—এই দেশগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত বলিয়া একই রণনৈতিক অবস্থানের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ একটা শিকলের মত ইহারা পরস্পরের সহিত যুক্ত ছিল। আবার হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের উত্তর পার্শ্বদেশ ছিল ডেনমার্ক ও নরওয়ের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং ডেনমার্ক ও নরওয়ে আগেই দখল হইয়া যাওয়ায় হল্যাণ্ডের উত্তর পার্শ্ব ছিন্ন হইয়া গেল, আবার হল্যাণ্ডের দ্বারা বেলজিয়াম এবং বেলজিয়ামের দ্বারা লাক্সেমবুর্গ ও ফ্রান্সের উত্তর পার্শ্ব ছিন্ন হইয়া গেল। এজন্যই জার্মান অভিযানও একই সঙ্গে এই সমস্ত দেশগুলিকে আচ্ছন্ন এবং বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল।

জল, স্থল ও আকাশ, তিন পথেই জার্মান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল এবং সেই প্রবল আক্রমণের মুখে ওলন্দাজেরা কোথাও দাঁড়াইতে পারিল না। ম্যাস নদী মোহনার মোয়েরডিক সেতু ছিল খাস হল্যাণ্ডের আক্রমণের পক্ষে প্রধান যোগসূত্রের মত। এখানকার দুইটি বৃহৎ সেতুই অক্ষত ছিল। জার্মানরা প্রথম দিনেই সেতুগুলি দখল করিয়া লইল এবং উহার আগেই বহু প্যারাসুট সৈন্য ও বিমানবাহী সৈন্য ওয়ালহ্যাভেন, রোজেন, সিফোল, হেগ, রটারডাম, আমস্টারডাম ইত্যাদি বিমানঘাঁটি ও শহর ছাইয়া ফেলিল। নিদারুণ বোমাবর্ষণে ঘাঁটিগুলি ও এরোপ্লেন বিধ্বস্ত বা বেদখল হইয়া গেল। সেই ভয়ঙ্কর বোমাবর্ষণে জনসাধারণ ও ওলন্দাজ হাইকম্যাণ্ড বিহ্বল, বিমূঢ় এবং তাঁদের আত্মরক্ষার নক্সা একেবারে বানচাল হইয়া গেল। এর সঙ্গে আবার পঞ্চম বাহিনী সক্রিয় হইয়া উঠিল। হল্যাণ্ডে বহু জার্মান বাসিন্দা ছিল এবং তারা জার্মানীর সঙ্গে ঐক্যের পক্ষপাতী ছিল। এ ছাড়া হিটলার ও নাৎসীভক্ত লোকও অনেক ছিল। তারা ডাকহরকরা, পুলিশ, ট্রাম কণ্ডাকটার, এমনকি পাদ্রী ও স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশেও জার্মান বিমান ও সৈন্যদিগকে সাহায্য করিয়াছিল। জার্মান পরিচারিকারা কয়েকটি ক্ষেত্রে 'গাইড' হিসাবেও কাজ করিয়াছিল এবং রাত্রিবেলা ছাদ বা বাতায়ন হইতে আলো জ্বালাইয়া বিমান বহরকে 'সিগন্যাল' করিয়াছিল। জেনারেল ফন

স্পোনেক নামে একজন নিহত জার্মান সেনাপতির মৃতদেহে এই সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও পাওয়া গিয়াছিল।[১]

১০ই মে তারিখ জার্মান বিমান ও ছত্রী সৈন্যেরা হেগের রাজপ্রাসাদে বোমাবর্ষণ করিয়া রানী উইলহেলমিনা, প্রিন্সেস জুলিয়ানা এবং রাজপরিবারের অন্যান্যকে ধরিবার চেষ্টা করে। ছত্রী সৈন্যেরা এই উদ্দেশ্য রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করিয়াছিল। কিন্তু রানী উইলহেলমিনা ও অন্যান্য সকলে কোনমতে ত্রাণ লাভ করেন এবং ১৩ই তারিখ একটি বৃটিশ যুদ্ধজাহাজে হল্যাণ্ড হইতে পলায়ন করিয়া ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় লাভ করেন!

এদিকে সর্বত্র আগুনে বোমা, অতিবিস্ফোরক বোমা ও মেসিনগানের গুলী বিমান হইতে বর্ষিত হইতে থাকে এবং যান্ত্রিক সৈন্যদল ওলন্দাজদের প্রতিরোধব্যূহ চূর্ণ করিয়া দ্রুত ধাবমান হইতে থাকে। ১৪ই মে বেলা ১টার সময় জার্মান বোমারু রটারডাম শহরে বোমা মারিয়া শহরটির কেন্দ্রস্থল ধ্বংস করিয়া ফেলে। কয়েক হাজার লোক রটারডামের বোমাবর্ষণে হতাহত হইয়াছিল।

উত্তর হল্যাণ্ডে ওলন্দাজ সৈন্যেরা ১০ই তারিখ রাত্রে জুইডার জী বাঁধ ধরিয়া একবারে উত্তর-পশ্চিম তীরের ডেন হেলডারে পশ্চাদপসরণ করে এবং জার্মানরা তাদের পিছু ধাওয়া করে। দক্ষিণ দিকে তারা ম্যাস বা মিউজ নদী এবং ইজেল নদী পার হইয়া যায়। ১৩ই তারিখ তারা গ্রীব লাইন দখল করিয়া লইল এবং ১৪ই তারিখ জার্মানরা খাস 'হল্যান্ড দুর্গে' প্রবেশ করিল।

১০ই তারিখ দক্ষিণ হল্যাণ্ডের পীলর‍্যাস ব্যূহ পরিত্যক্ত হইল এবং ১১ই তারিখ ওলন্দাজেরা এই অংশেও একবারে পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিল। এদিকে ১৩ই তারিখ জার্মান মোটরারূঢ় সৈন্যদল মোয়েরডিক সেতুপথ দিয়া রটারডাম ও হল্যাণ্ডের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিল। এদিকে বেলজিয়ামের উত্তর পার্শ্বদেশও তখন ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং আর প্রতিরোধ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া ১৪ই তারিখ সন্ধ্যা ৮টার সময় ওলন্দাজ সেনাপতি জেনারেল উইকলম্যান যুদ্ধবিরতির আদেশ দেন এবং ১৫ই মে, বেলা ১১টার সময় হল্যাণ্ড জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিল।

এভাবে মাত্র ৫ দিনের মধ্যে হল্যাণ্ড বিধ্বস্ত, পরাজিত ও পদানত হইল এবং এই যুদ্ধ নিতান্তই ছিল একতরফা। কারণ ওলন্দাজদের পক্ষে সংগ্রাম করার কোন সুযোগ ছিল না।

বেলজিয়াম

হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের আত্মরক্ষা প্রায় একই সূত্রে বাঁধা ছিল। কিন্তু হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম নিরপেক্ষতা ঘোষণা করায় ইঙ্গ-ফরাসীর সঙ্গে ইহাদের সামরিক মৈত্রী এবং আত্মরক্ষা ও রণক্রিয়ার বিস্তৃত কোন পরিকল্পনা পূর্বাহ্নে স্থির করা সম্ভব হয় নাই। ফলে জার্মানী ইহাদিগকে পরস্পরের কাছ হইতে টুকরা-টুকরা করিয়া ফেলিবার অভূতপূর্ব সুযোগ পাইল। নিরপেক্ষতা বা দুর্বল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার

১। The Second Great War—Hammerton & Gwynn, Vol. 3. P. 841

কোন প্রয়োজন নাৎসী জার্মানী অনুভব করিল না। সুতরাং হল্যাণ্ডের মত বেলজিয়ামের অদৃষ্টেও একই দুর্বিপাক ঘনাইয়া আসিল।

বেলজিয়াম ও ফরাসী সীমান্তের লাক্সেমবুর্গ* ১০ই মে তারিখ রাত্রি ভোর হওয়ার আগেই আক্রান্ত হইল। আক্রমণের পর সকাল সাড়ে ৮টার সময় জার্মান রাষ্ট্রদূত বেলজিয়ান পররাষ্ট্রসচিব মঃ স্পাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জার্মান গভর্নমেণ্টের 'ঘোষণাপত্র' পেশ করিতে উদ্যত হইলে মঃ স্পাক প্রথমেই বাধা দিয়া জার্মানীর এই ন্যায় ও নীতিবিরোধী আক্রমণের প্রতিবাদ করেন এবং পূর্বাহ্নে কোনপ্রকার দাবী-দাওয়া বা চরমপত্র পেশ না করিয়া এভাবে বেলজিয়াম রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করার জন্য জার্মানীকে দায়ী করেন।

অতঃপর জার্মান দূত হল্যাণ্ডের অনুরূপ একটি নাৎসী সরকারী ঘোষণা পাঠ করেন এবং মঃ স্পাক আবার মধ্যপথে বাধা দিয়া বলেন, 'দলিলটা আমার হাতে দিন। এত কষ্ট করিয়া ওটা আর পড়িবার দরকার নাই।'[১]

বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিলে বেলজিয়ামের রাজ্য ও উপনিবেশ রক্ষা করা হইবে, এই প্রতিশ্রুতি পত্র যখন পঠিত হইতেছিল, তখন জার্মান বোমারু বিমান বেলজিয়ামের আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছিল এবং দলে দলে নাৎসী সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করিতেছিল। বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড আত্মরক্ষার সংকল্প ঘোষণা করেন এবং মিত্রশক্তির সঙ্গে একত্রে যুদ্ধযাত্রায় বাহির হন। একটা নক্সাও এজন্য কিছুকাল আগে স্থির হইয়াছিল।

১১,৭৭৫ বর্গমাইল পরিমিত ক্ষুদ্র বেলজিয়ামের লোকসংখ্যা ৮৩ লক্ষ এবং ইহা ফ্রান্সের উত্তর পার্শ্বদেশে অবস্থিত। ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধেও বেলজিয়াম জার্মানী কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল প্যারিস অভিযানের পথে। এবারও সেই একই ধ্বংসলীলার পুনরাবৃত্তি হইল। শান্তির সময়ে বেলজিয়ামের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৮৬ হাজার এবং যুদ্ধের সময় ইহা ৬ লক্ষ হইতে সাড়ে ৬ লক্ষে দাঁড়াইল এবং কাগজেপত্রে মোট সমাবেশের সংখ্যা দাঁড়াইল ৯ লক্ষে। নিঃসন্দেহে বেলজিয়ামের পক্ষে সংখ্যাটি সর্ববৃহত্তম। এই সৈন্যবাহিনী নানা শ্রেণীর ২১টি ডিভিসনে বিভক্ত ছিল এবং উহার মধ্যে ১২ ডিভিসন ছিল এলবার্ট ক্যানেল এলাকায়। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধ-যাত্রায় ও যান্ত্রিকতায় ইহারা বহু দূর পিছনে ছিল। সুতরাং কার্যকরীভাবে যে ১২ ডিভিসন সৈন্য মিত্রশক্তির সঙ্গে জার্মানীকে বাধা বাধা দিল, তাদের দশাও ওলন্দাজদের মতই ঘটিল।

আক্রান্ত হওয়ার কিছুকাল আগে বেলজিয়ান সেনানীমণ্ডলী বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এই মর্মে একটি আত্মরক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন যে, আক্রমণের তৃতীয়

---

* ৯৯৯ বর্গমাইল ভূমি ও ৩ লক্ষ বাসিন্দাপূর্ণ লাক্সেমবুর্গ একটি অতি ক্ষুদ্র রাজ্য। জার্মানী, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স—এই তিনটি রাজ্যের সীমানায় ইহা অবস্থিত এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জার্মান যৌথরাষ্ট্র হইতে ইহার উদ্ভব হয়। শক্তিবর্গ ইহার নিরপেক্ষতারও প্রতিশ্রুতি দেন। রণনৈতিক কারণে দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বার্ষিক ৪০ লক্ষ টন লৌহ ধাতু এবং ২০ লক্ষ টন ইস্পাতের উৎপাদনের জন্যও ইহার খ্যাতি রহিয়াছে। ইহা কতকটা জমিদারী রাষ্ট্রের মত—বোধহয় আমাদের দেশের 'দেশীয় রাজ্যের' (প্রাক্তন) সঙ্গে অনেকাংশে তুলনীয়। —লেখক

১। 'দি সেকেণ্ড গ্রেট ওয়ার'—৩য় খণ্ড—পৃঃ ৮৪৭

দিবসে বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী বেলজিয়ামে রণক্রিয়ায় লিপ্ত হইবে। এণ্টোয়ার্প হইতে লীজ পর্যন্ত এলবার্ট ক্যানেল (খাল) ধরিয়া এবং লীজ হইতে নামুর পর্যন্ত মিউজ নদী ধরিয়া বেলজিয়ান বাহিনী, 'বিলম্বিত রণক্রিয়া' অনুসরণ করিবে এবং এভাবে যে সময় পাওয়া যাইবে, উহার মধ্যে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যেরা এণ্টোয়ার্প-নামুর-গিভেট (ফরাসী সীমান্তের) লাইনে দণ্ডায়মান হইবে। তৃতীয় দিবসে ইহা ঘটিবে বলিয়া অনুমান ছিল এবং এই লাইনের এণ্টোয়ার্প হইতে লুভেন পর্যন্ত খণ্ডাংশ বেলজিয়ানদের রক্ষা করার কথা ছিল। ইহা ছাড়া হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম সীমান্তের আত্মরক্ষার বহির্ঘাটি তো ছিলই।

ভোর রাত্রি ৪টার সময় জার্মান বোমারুর দল ঝাঁক বাঁধিয়া বেলজিয়ামের বিমানঘাটি, রেল স্টেশন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলির উপর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ ও মেশিনগানের গুলী চালাইতে লাগিল। বেলজিয়াম বিমানবহরের অর্ধেকের বেশী ভূমিতেই নষ্ট হইয়া গেল এবং সীমান্তের আত্মরক্ষার ব্যূহ জার্মান পদাতিক, ট্যাংক ও ছোঁ-মারা বিমানের প্রবল আক্রমণে ভাঙ্গিয়া গেল।

কিন্তু বেলজিয়ামের আত্মরক্ষার সর্বাপেক্ষা সংকটজনক বিন্দু ছিল ম্যাসট্রিকটের দক্ষিণে, যেখানে বিখ্যাত লীজ দুর্গশ্রেণী মিউজ নদীর পথে সতর্ক প্রহরীর মত দণ্ডায়মান ছিল। ১৯১৪ সালে কাইজারেরর বাহিনীও এই পথ দিয়াই অভিযান করিয়াছিল। কিন্তু সেই দিন দীর্ঘ আত্মরক্ষার যে যুদ্ধ তীব্র ও রক্তাক্ত হইয়াছিল, আজ হিটলার তাহা অতি সহজে বিদ্যুৎগতিতে কাড়িয়া লইলেন। এই দুর্গশ্রেণীর উত্তরবর্তী ইবন-ইমেল নামক আধুনিক কেল্লা দুর্ভেদ্য বলিয়াই পরিচিত ছিল। কিন্তু জার্মানরা অভিনব দুঃসাহসিকতায় ইহাকে চক্ষের নিমেষে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। গ্লাইডার বাহিত জার্মান সৈন্যেরা শেষ রাত্রির অন্ধকারে এই দুর্গের ছাদের উপর নামিল এবং বিস্ফোরক ও বোমা মারিয়া কামানগুলি অকেজো করিয়া ফেলিল, পুরু দেওয়াল বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আর একই সময়ে জার্মান গোলন্দাজ, ট্যাংক ও প্যারাসুট সৈন্যেরা ইহার উপর আক্রমণ (রবারের তৈরী কৃত্রিম প্যারাসুট সৈন্য চারদিকে প্রচুর সংখ্যায় ছড়াইয়া দিয়া প্রকাণ্ড ধাপ্পা দেওয়া হইয়াছিল।) চালাইল এবং পরদিন ১১ই মে এই দুর্ভেদ্য দুর্গ ধরাশায়ী হইল। এলবার্ট ক্যানেল বরাবর যে ৭নং বেলজিয়ান ডিভিসন আত্মরক্ষা করিতেছিল, জার্মানরা ম্যাসট্রিকটের পথে সেখান দিয়া অগ্রসর হইল এবং তাদেরকে হটাইয়া দিল। এই ক্যানেলের দুইটি সেতু জার্মানরা অক্ষত অবস্থায় হস্তগত করিল, আর এগুলির উপর দিয়া দলে দলে জার্মান মোটরারূঢ় ও যান্ত্রিক সৈন্য যেন বন্যাপ্রবাহের মত বেলজিয়ামের ভিতর ঢুকিতে লাগিল। জার্মানরা দ্রুত টংগ্রেস ছাড়াইয়া অগ্রসর হইল এবং ১১ই তারিখ রাত্রে বেলজিয়ানরা এলবার্ট ক্যানেল লাইনের এলাকা (যেখানে জার্মানদিগকে বিলম্বিত রণক্রিয়ায় আটকাইবার কথা ছিল) ত্যাগ করিয়া পিছু হটিল এবং মিত্রবাহিনীর সহিত একত্রে প্রধান আত্মরক্ষার লাইনে আসিয়া দাঁড়াইল।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ১নং ও ৯নং ফরাসী বাহিনী এবং লর্ড গোর্টের অধীন বৃটিশ অভিযাত্রী দল এই লাইন রক্ষার জন্য সন্নিবিষ্ট হইল। ১৩ই মে তারিখ এণ্টোয়ার্প ও লুভেনের মধ্যে দাঁড়াইল বেলজিয়ান সৈন্যরা আর তাদের বামপার্শ্ব রক্ষা করিল আর এক দল ফরাসী বাহিনী—জেনারেল জিরোর অধীন ৭নং ফরাসী আর্মি

শেল্ড নদী মোহনা অঞ্চলে। ৩টি বৃটিশ ডিভিসন ছিল লুভেন ও ওয়েভারের মধ্যে, আরও ৬টি বৃটিশ ডিভিসন ছিল ইহাদের পিছনের দিকে ডাইল ও শেল্ড নদীর মধ্যে। লর্ড গোর্টের দক্ষিণে ওয়েভার ও নামুরের মধ্যে ছিল জেনারেল ব্লাঁশাদের অধীন ১নং ফরাসী আর্মি। খাস নামুর দুর্গ এলাকায় ছিল ৭নং বেলজিয়াম আর্মি কোর এবং আর্দেনেশ এলাকা হইতে পশ্চাদপসরণকারী বেলজিয়ান সৈন্যেরা। নামুর হইতে মিউজ নদী ধরিয়া মেজিয়ার্স পর্যন্ত ছিল জেনারেল কোরাপের অধীন ৯নং ফরাসী বাহিনী, আবার ইহাদের দক্ষিণে ছিল ২নং ফরাসী বাহিনী।

বেলজিয়ামের প্রধান সেনাপতি জেনারল ভ্যান ওভারস্টেটেনের অধীন সৈন্যেরা এবং বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনীগুলি আত্মরক্ষার জন্য মোটামুটি এভাবে দণ্ডায়মান হইলেও তাদের ব্যূহ অতি দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। আকাশপথে জার্মান বিমান একাধিপত্য বিস্তার করিল এবং ভয়াবহ বোমাবর্ষণে শত-সহস্র ভীত আতঙ্কিত ও বিমূঢ় বেলজিয়ান সৈন্যেরা পলাতক অবস্থায় আসিয়া শহরে ভীড় করিল এবং আতঙ্কিত নাগরিকদের ত্রাস আরও বাড়াইয়া তুলিল। এক-একবারে হাজার হইতে দুই হাজার পর্যন্ত বিমান হানা দিতে লাগিল। মিত্র সৈন্যদের পক্ষে ইহা ছিল অপ্রত্যাশিত। সুতরাং বিভ্রাটে বিলম্ব হইল না।

এই বিভ্রাট গুরুতর আকারে দেখা দিল লাক্সেমবুর্গ ও নামুরের মধ্যবর্তী আর্দেনেশ পার্বত্য এলাকা হইতে। গভীর ঘন জঙ্গল কুটীল ও বক্রগতি নদী এবং বন্ধুর পাহাড়িয়া ভূমির দ্বারা আচ্ছন্ন এই এলাকা ভেদ করিয়া জার্মানরা দ্রুত ধাবমান হইবে এই বিশ্বাস মিত্রপক্ষের ছিল না। কিন্তু দুর্ধর্ষ ও গতিশীল যান্ত্রিক জার্মান সৈন্যেরা মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই পার্বত্য প্রদেশ ভেদ করিয়া ফেলিল। তখন ৯নং ফরাসী বাহিনী নামুরের দক্ষিণে মিউজ নদীর ধারে ছিল। ১২ই মে তারিখ জার্মানরা অগ্রসর হইল এবং সবিস্ময়ে দেখিল যে, মিউজ নদীর ৬টি সেতু অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে! এখানে যে ৫০ মাইল চওড়া ও ৫০ মাইল দীর্ঘ বৃহৎ ছিদ্র তারা সৃষ্টি করিল, সেই ছিদ্র পথে মিউজ নদীর অক্ষত সেতুগুলির উপর দিয়া দলে দলে জার্মান যান্ত্রিক সৈন্য প্রবেশ করিল—ঠিক এলবার্ট খালের সেতুর মত। নিঃসন্দেহে মিউজ নদীর এই ৬টি সেতু অক্ষুণ্ণ রাখা অত্যন্ত মারাত্মক ছিল। কেন না শত্রুর আক্রমণমুখে সেতু উড়াইয়া দেওয়া আত্ম-রক্ষাকারী সৈন্যদের একটি প্রাথমিক কর্তব্য মাত্র। (এই সমস্ত সেতুর কাহিনী লইয়া সেই সময় মিত্রপক্ষীয় মহলে তুমুল তোলপাড় হইয়াছে এবং কোন কোন ফরাসী অফিসারের বিরুদ্ধে ইহার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হইয়াছিল।) কিন্তু এই মারাত্মক ত্রুটির ভয়াবহ পরিণতি ঘটিল। যদিও ইহার জন্য ১৫ই মে তারিখ নামুর-মেজিয়ার্স লাইনের ৯নং ফরাসী বাহিনীর নায়ক জেনারেল আন্দ্রে কোরাপ পদচ্যুত এবং তাঁর স্থলে জেনারেল জিরো নিযুক্ত হইলেন, তথাপি শেষ রক্ষা হইল না। ইতিহাস বিখ্যাত সেডান (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাংকো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয়) এলাকায় ২নং ফরাসী বাহিনীর উপর জার্মানরা যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল, উহার ফলে ১৩ই মে অপরাহ্ণ ৫টায় সেডানের ব্যূহ অর্থাৎ ম্যাজিনো লাইন ভাঙ্গিয়া গেল। (প্রকৃতপক্ষে ওটাই ছিল জার্মান যান্ত্রিক বাহিনীর প্রধান আক্রমণ। পরে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করা হইয়াছে।) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ম্যাজিনা লাইনের কেল্লাশ্রেণী সিঙ্গাপুরের

নৌ-দুর্গের মতই পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল এবং ফরাসীদের আত্মরক্ষার একমাত্র ভরসা ছিল এই ম্যাজিনো লাইন, যাহা সুইজারল্যাণ্ডের সীমানা হইতে লাক্সেমবুর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ২০০ মাইল। সেডানে আসিয়া ইহার 'পাকা গাথুনি' শেষ হইয়াছিল এবং সেডানের পর বেলজিয়ামের সীমানা ধরিয়া ইহা ছিল 'কাঁচা গাঁথুনির' লাইন। সেডান ও মণ্টমিডির মধ্যস্থলে ম্যাজিনো লাইনের এই দুর্বল গ্রন্থিতে আঘাত করিয়া জার্মানী ইহাকে বিধ্বস্ত ও বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। কার্যতঃ পশ্চিম রণাঙ্গনের চূড়ান্ত সংগ্রামের বিয়োগান্ত পর্ব এখান হইতে শুরু হইল।

সেডানের ব্যূহ ভেদের পর ৯নং ফরাসী বাহিনী পর্যুদস্ত হইয়া গেল এবং ১৬ই মে তারিখ উহার প্রধান সেনাপতি জেনারেল জিরো লা ক্যাপেলে শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। উত্তর ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের রণক্ষেত্রের মধ্যে বিচ্ছেদ শুরু হইল এবং বেলজিয়ামের মিত্রবাহিনীও বেষ্টিত হইবার জো হইল। ১৫ই মে সন্ধ্যায় জেনারেল জর্জেস এণ্টোয়ার্প-নামুর লাইন ত্যাগ করিয়া শেল্ড বা এস্কোয়াট নদীর পিছনে আশ্রয় লইবার হুকুম দিলেন। ৭নং বেলজিয়ান আর্মি কোরও প্রভৃত সৈন্য বলির পর নামুর শহর ছাড়িয়া আসিল, যদিও নামুর ও লীজ দুর্গগুলি আরও কিছুকাল আত্মরক্ষা করিল। কিন্তু বেলজিয়ামের প্রধান আত্মরক্ষার লাইনই এভাবে চূর্ণ হইয়া গেল।

১৬ই মে তারিখের মধ্যে মিত্রবাহিনীর সর্বত্র পশ্চাদপসরণ ঘটিল। এণ্টোয়ার্পের পশ্চিমে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের জীল্যাণ্ড অঞ্চলে যে ৭নং ফরাসী বাহিনী ছিল, তারা ওলন্দাজ গভর্নমেণ্টের আত্মসমর্পণের পর অতি বিশৃংখলভাবে এণ্টোয়ার্পে পিছু হটিয়া আসিল। আর বেলজিয়ান সৈন্যরাও পর পর তিনটি পর্যায়ে শেল্ড নদীর পিছনে গিয়া আশ্রয় লইল।

এদিকে জার্মানরা সেডানে ব্যূহ ভেদের পর উত্তর ফ্রান্সের (বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী অঞ্চল) অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতে লাগিল। এখানে ছিল ফরাসী বাহিনীগুলির মূল আত্মরক্ষার ব্যূহ, আর বেলজিয়ামে ছিল তাদের দূরবর্তী আত্মরক্ষার ঘাঁটিস্বরূপ। জার্মান যান্ত্রিক সৈন্যদল দুর্বার গতিতে সমস্ত বাধা চূর্ণ করিয়া ১৮ই মে সন্ধ্যাবেলা পেরোন, ২০শে মে ক্যাম্বাই দখল করিয়া একেবারে উত্তর পশ্চিম ফ্রান্সের সমুদ্রতীরবর্তী সুপরিচিত আবেভিল বন্দর বিপন্ন করিয়া তুলিল। অর্থাৎ বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের রণক্ষেত্রের মধ্যে জার্মানী এক বৃহৎ কীলক প্রবেশ করাইয়া দিল এবং এই দুই রণাঙ্গন পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার জো হইল, যার ফলে উভয় রণক্ষেত্রেই মিত্রবাহিনী জার্মান বেষ্টনীর মধ্যে পড়িবার আশংকা জাগাইল।

এই সময় ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পল রেনো তাঁর মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন করিলেন এবং বিগত মহাযুদ্ধের ভার্দুন বিজয়ী বৃদ্ধ মার্শাল পেতাঁকে সহকারী প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিলেন—১৮ই মে, ১৯৪০। পরদিন ১৯শে মে বিগত মহাযুদ্ধের অন্যতম ফরাসী নায়ক 'ওয়ারশ জয়ী' জেনারেল ওয়েগাঁ পশ্চিম রণাঙ্গনের সমগ্র মিত্রবাহিনীর সর্বপ্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন। জেনারেল গ্যামেলাঁ ছিলেন এতদিন পশ্চিম রণাঙ্গনের সর্বাধিনায়ক, ব্যর্থতার অভিযোগে তিনি এই পদ হইতে অপসারিত হইলেন।

২০শে মে তারিখ জার্মানরা শেমিন ডে ডেমুস ও অরেফ-আইনে খাল ধরিয়া অগ্রসর হইল, আমিয়েঁ ও আরাস দখল হইল এবং ক্রমে ক্রমে বলোন, ক্যালে ইত্যাদি বিখ্যাত ফরাসী বন্দরগুলি বিপন্ন হইল। ২১শে মে তারিখ ইপ্রেতে মিত্রপক্ষীয় রণনেতাদের এক

বৈঠক বসিল। বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের মিত্রবাহিনীগুলি পরস্পরের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই 'বিচ্ছেদ' নিবারণের জন্য জেনারেল ওয়েগাঁ উত্তর ও দক্ষিণ অর্থাৎ বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের উভয় দিক হইতে যুগপৎ পাল্টা-আক্রমণের এক পরিকল্পনা করিলেন এবং ইপ্রে বৈঠকে ইহা লইয়া আলোচনা হইল। ইহার ফলে মিত্রবাহিনীগুলির নূতন করিয়া সৈন্য সমাবেশ ও পশ্চাদপসরণ ঘটিল বটে, কিন্তু সেই পরিকল্পিত পাল্টা-আক্রমণ আর অনুষ্ঠিত হইল না। বৃটিশ ও বেলজিয়ান সৈন্যেরা শেল্ড নদীর এলাকা হইতে লাইস নদীর আড়ালে অপসারিত হইল। ইহার আগেই হল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবর্তী ওয়ালচেরেন দ্বীপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল (১৯শে মে)। সেখান হইতে জার্মানী কর্তৃক পশ্চাৎ আক্রমণের আশংকা দেখা দিল। ২৪শে তারিখ জার্মানরা লাইস নদী অতিক্রম করিল কোর্টরাই এলাকায় এবং এক বৃহৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রকাণ্ড জার্মান বোমারুবহর সমগ্র বেলজিয়ান খণ্ডাংশে ধ্বংসলীলা বিস্তার করিতে লাগিল এবং নূতন সৈন্য আমাদনী করিয়া তারা মেনিন হইতে ইপ্রে পর্যন্ত আক্রমণ চালাইল এবং বেলজিয়ান ও বৃটিশ বাহিনীর মধ্যে সংযোগ নষ্ট করিবার চেষ্টা করিল। বৃটিশ ও বেলজিয়ান উভয় সৈন্যদলই ঘোরাও হইবার জো হইল এবং পরিত্রাণের বন্দরগুলির একে একে পতন ঘটিতে লাগিল—২৪শে বোলোন এবং ২৭শে ক্যালের পতন হইল।

পরিত্রাণের পথ ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে থাকায় ইংরাজ সৈন্যদল বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নির্দেশে 'চাচা আপন বাঁচা' নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। এই সময় ২৫শে মে তারিখ জার্মানরা ঘেণ্ট ও কোর্টরাই দখল করিয়া লইল। আর ইঙ্গ-ফরাসী সঙ্কটের জন্য সামরিক নেতৃত্বের বহু পরিবর্তন ঘটিল। ১৫ জন ফরাসী জেনারেল বা সেনাপতি পদচ্যুত হইলেন এবং ইংলণ্ডে ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফের বড়কর্তার পদে জেনারেল স্যার আইরন সাইডের বদলে জেনারেল স্যার জন ডিল নিযুক্ত হইলেন—২৬শে মে।

২৫শে মে বৃটিশ সৈন্যেরা ডানকার্ক হইতে তাদের ইতিহাস বিখ্যাত পলায়নপর্ব শুরু করিল, আর হতভাগ্য বেলজিয়ান সৈন্যেরা পরিত্রাণের পথ হারাইয়া নিরুপায় হইয়া পড়িল। তথাপি এই অবস্থায়ও রাজা লিওপোল্ড আত্মরক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং ২৫শে মে রাত্রিবেলা ও পরদিন দুর্ধর্ষ জার্মান ট্যাঙ্ক বাহিনীর গতিরোধের জন্য রুলার্স হইতে ইপ্রে পর্যন্ত ২০০০ রেল ওয়াগন প্যাসেনডেলের সম্মুখে (যে স্থান বিগত মহাযুদ্ধের রক্তাক্ত বিভীষিকায় স্মরণীয়) সাজাইয়া বাঁচিবার শেষ চেষ্টা করিলেন। এই সময় জেনারেল বিলোট, যিনি বেলজিয়ান রণাঙ্গনের মিত্রবাহিনীগুলির মধ্যে প্রধান সংযোগরক্ষাকারী সেনাপতি ছিলেন, তিনি এক মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হইলেন। ফলে রাজা লিওপোল্ডের জরুরী বার্তা লণ্ডনে পৌঁছিল না এবং ফ্রান্সের সহিত যোগাযোগও নষ্ট হইয়া গেল। ২৬শে মে বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষ বৃটিশ হেড কোয়ার্টারে খবর পাঠাইলেন যে, অধিকতর আত্মরক্ষা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। তখন রাজা লিওপোল্ড তাঁর সদর দপ্তর ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্তী ওস্টেণ্ড বন্দরের নিকট অপসারিত করিলেন। তাঁরা শেল্ড ও লাইস নদীর মধ্যে জার্মানীর পার্শ্ব ও পশ্চাৎ আক্রমণের জন্য বৃটিশ বাহিনীকে অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু বৃটিশ পক্ষ উত্তর দিলেন, তাহা সম্ভব নহে এবং ফরাসীরাও কোন সাহায্য দিতে পারিলেন না।

২৭শে মে জার্মানীর প্রবল আক্রমণের মুখে বেলজিয়ানদের শেষ মজুত সৈন্যদল নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু ইহা ছিল অনলশিখায় শেষ আহুতি দানের মত। বেলা ১২-৩০ মিনিটের সময় রাজা লিওপোল্ড বৃটিশ সেনাপতি লর্ড গোর্টকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলেন যে, অবস্থা সাংঘাতিক, আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় নাই। ফরাসীদের তিনি জানাইলেন যে, বেলজিয়ান রণাঙ্গন ধনুকের জীর্ণ ছিলার মত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

বেলজিয়ামের অন্তিম মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিল। রণক্ষেত্র ভঙ্গ, সৈন্যদল পরাজিত, বিহ্বল ও ছত্রভঙ্গ, আর জনপদ, পল্লী ও নগরে জনসাধারণের মধ্যে সর্বত্র ত্রাস ও আতঙ্ক। হতাহতে রণক্ষেত্র পরিকীর্ণ, হাসপাতালে আহতের স্থান নাই, কামানের গোলাগুলী পর্যন্ত নিঃশেষিত। রণক্ষেত্র হইতে সমুদ্রতীরবর্তী যতটুকু ফাঁক ছিল সেই সংকীর্ণ অংশে পলায়মান উম্মাদ জনতার ভীড়—জার্মাদের হাত হইতে পুরুষের প্রাণ ও মেয়েদের সম্মান বাঁচাইবার জন্য সর্বত্র ধাবমান নরনারী ও শিশু। খাদ্য নাই, আশ্রয় নাই —৩০ লক্ষ নরনারী ৬৫০ বর্গমাইল ভূমিতে মাথা গুঁজিবার জন্য পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল!

এই সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে ২৭শে মে, অপরাহ্ণ ৫টায় রাজা লিওপোল্ড জার্মানীর ১৮নং বাহিনীর সদর দপ্তরে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। রাত্রি ১০টায় হিটলার বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ দাবী করিলেন। রাত্রি ১১টায় সেনানীমণ্ডলীর সহিত পরামর্শক্রমে রাজা লিওপোল্ড সেই দাবী মানিয়া লইলেন এবং ভোর ৪টায় (২৮শে মে) সমগ্র বেলজিয়ান রণাঙ্গনে যুদ্ধ বিরতির ভেরী বাজিয়া উঠিল। ২৮শে মে সকালবেলা আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল।

রাজা লিওপোল্ড বন্দী হইলেন, কিন্তু জার্মানরা তাঁর প্রতি 'রাজোচিত' সম্মান দেখাইবার জন্য তাঁকে পরিবার, ভৃত্যমণ্ডলী ও সামরিক কর্মচারীসহ একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকায় থাকিবার অনুমতি দিলেন। 'সম্মানজনক আত্মসমর্পণের চিহ্ন' স্বরূপ বেলজিয়ান অফিসারদিগকেও অস্ত্র রাখিবার অনুমতি দেওয়া হইল।

বেলজিয়ান সৈন্যবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়করূপে রাজা লিওপোল্ডের আত্মসমর্পণ এবং ৩ লক্ষ সৈন্য কর্তৃক অস্ত্র ত্যাগ ১৯৪০ এবং উহার পরেও মিত্রপক্ষীয় মহলে তীব্র সমালোচনার উদ্রেক করিয়াছিল। বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী পল রেনো এক বেতার বক্তৃতায় ক্রুদ্ধস্বরে তিরস্কায় করিয়াছিলেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল অবশ্যই ধৈর্যের পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন যে, রাজা লিওপোল্ডের কার্য সম্পর্কে রায় দেওয়ার সময় এখনও আসে নাই। তিনি বেলজিয়ান বাহিনীর বীরত্বেরও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

কিন্তু রাজার পক্ষপাতী লোকেরা বলিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে লিওপোল্ডকে দায়ী বা দোষী করা চলে না, বরং ১৮ দিন পর্যন্ত বেলজিয়ান বাহিনী যে অসম্ভব রকম অসহায় অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করিয়াছে, তাতে সৈন্যগণের প্রশংসাই প্রাপ্য। তবে, সমগ্র মিত্রপক্ষের রণনীতি এবং ইঙ্গ-ফরাসী রাজনীতির জন্য যে দুর্বিপাক ঘটিয়াছে, উহার জন্য নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র বেলজিয়াম কিংবা একা লিওপোল্ডই দায়ী নহেন। যে অবস্থায় তিনি পড়িয়াছিলেন, তাতে আত্মসমর্পণ, কিংবা মৃত্যুবরণ ছাড়া উপায় ছিল না।

সপ্তম অধ্যায়

পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধ—২

ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ

পশ্চিম রণাঙ্গণের যুদ্ধ সামরিক ইতিহাসে 'সুপার ব্যাটল' বা চরম যুদ্ধ নামে পরিচিত। কেননা, পশ্চিম ইউরোপের শক্তিগুলি এই যুদ্ধের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া গেল এবং প্রায় চক্ষুর নিমেষে তারা ধরাশায়ী হইল। তখনকার দিনের সামরিক ইতিহাসে এমন অদ্ভুত গতিসম্পন্ন নিখুঁত যান্ত্রিক যুদ্ধ আর হয় নাই। চার্চিল বলিয়াছেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে যখন কোন যুদ্ধ ছিল না সেই ৮ মাস কাল হিটলার তারা সৈন্যবাহিনীগুলি ১৫৫ ডিভিসনে দাঁর করাইলেন এবং যান্ত্রিক-সজ্জা ও ট্রেনিংয়ের দ্বারা আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী করিয়া তুলিলেন। ওদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে প্যাক্ট থাকায় দুই রণাঙ্গনের কোন বিপদও তাঁর ছিল না। সুতরাং ১০ই মে পশ্চিম রণাঙ্গনে উত্তর সাগরের তীর হইতে সুইস সীমানা পর্যন্ত বিশাল সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করিয়া হিটলার ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মারাত্মক আঘাত হানিলেন। এই আক্রমণে ১২৬ ডিভিসন সৈন্য নিয়োগ করা হইল। সেই সঙ্গে পুরা ১০ ডিভিসন প্যাঞ্জার বা যান্ত্রিক সৈনদলের সাঁজোয়া-অস্ত্রশক্তির প্রচণ্ডতা। তিন হাজার আর্মার্ড কার, যার মধ্যে অন্ততঃ এক হাজার ছিল হেভী বা ভারী ট্যাঙ্ক—যান্ত্রিক শক্তির এই বিপুল অস্ত্রসম্ভারসহ হিটলারী সৈন্যদল ৩টি আর্মি গ্রুপে বিভক্ত হইয়া পশ্চিম রণাঙ্গনে নিম্নলিখিত আক্রমণের অংশগুলিতে দাঁড়াইল :

১। আর্মি গ্রুপ-বি—২৮ ডিভিসন সৈন্য, প্রধান সেনাপতি জেনারেল ফন বোক, অবস্থান—উত্তর সমুদ্র তীর থেকে এই-লা-শাপেল্ পর্যন্ত। এদের দায়িত্ব ছিল হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামকে পর্যুদস্ত করা এবং তারপর জার্মান দক্ষিণ (ডান) পার্শ্বরূপে ফ্রান্সের অভ্যন্তরভাগে অগ্রসর হওয়া।

২। আর্মি গ্রুপ-এ—৪৪ ডিভিসন সৈন্য। প্রধান সেনাপতি জেনারেল ফন রুণ্ডস্টেড—এই বাহিনীর আক্রমণই প্রধান। অবস্থান—মধ্যবর্তী রণাঙ্গনের (এই-লা-শাপেল্ আর্দানেস অঞ্চল থেকে মোজেল নদী পর্যন্ত।

৩। আর্মি গ্রুপ-সি—১৭ ডিভিসন সৈন্য। প্রধান সেনাপতি জেনারেল ফন লীব, অবস্থান—মোজেল নদী থেকে সুইস সীমানা পর্যন্ত রাইন নদীর সম্মুখ ভাগ।

এই সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ ছাড়াও সুপ্রীম আর্মি কমাণ্ড বা ও কে এইচ প্রায় ৪৭ ডিভিসন সৈন্য মজুত বা রিজার্ভ রাখিল। এর মধ্যে ২০ ডিভিসন ছিল বিভিন্ন আর্মি গ্রুপের পিছনে হাতের কাছেই প্রস্তুত। আর ২৭ ডিভিসন ছিল সাধারণভাবে মজুত সৈন্যদল।

আক্রমণের যে প্রচণ্ডতা এবং নূতন যন্ত্র ও অস্ত্রসজ্জার যে অভিনবত্ব গোড়াতেই পরিস্ফুট হইল, ইতিহাসে তার কোন তুলনা নাই। চার্চিল তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় সেই ভয়াবহ আক্রমণের স্মৃতি হিসাবে লিখিয়াছেন :

'...after eight months of inactivity on both sides, the Hitler inrush of a vast offensive, led by spear-point masses of cannon-proof of heavily armoured vehicles, breaking up all defensive opposition, and for the first time for centuries and even perhaps since the invention of gunpowder, making artillery for a while almost impotent on the battle field". [Vol. 1 page 374]

চার্চিলের মত বহুদর্শী সমরবিশেষজ্ঞের বর্ণনার মধ্যেও রণক্রিয়া ও আক্রমণের যে পরম বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছে, তা লক্ষ্য করার মত। সোজা বাংলায় তাঁর বক্তব্য দাঁড়ায় এই—বন্যা-স্রোতের মত এই প্রচণ্ড হিটলারী আক্রমণের পুরোভাগে ছিল এমন সমস্ত বর্মাবৃত এবং লক্ষ্যভেদকারী অজস্র যান ও যন্ত্র যেগুলি প্রতিরক্ষার সমস্ত বাধাদানকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং সে-ই সর্বপ্রথম বহু শতাব্দীর মধ্যে—এমনকি, বোধ হয় সেই বহু দূর আগেকার গান্ পাউডার আবিষ্কৃত হওয়ার পর কামানের গোলা-গুলি বা গোলন্দাজী শক্তিকে একেবারে অকেজো করিয়া ফেলিল।

ফন বোক ও ফন রুণ্ডস্টেডের এই আক্রমণের ফল কি দাঁড়াইল? আবার চার্চিলের কথাই উদ্ধৃত করা যাক ঃ

'Complete tactical surprise was achieved in really every case. Out of the darkness came suddenly innumerable parties of well-armed ardent storm troops, often with light artillery and long before the daybreak a hundred and fifty miles of front were aflame.

[Vol. 2. p. 30]

সোজা কথায় আক্রমণের প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই রণকৌশলের দারুণ বিস্ময় অর্জিত হইল। হঠাৎ অন্ধকার থেকে প্রচুর অস্ত্রসজ্জিত এবং অনেক সময় হাল্কা গোলন্দাজী অস্ত্রসমন্বিত যেন অদম্য উৎসাহী অজস্র ঝটিকা সৈন্যদল বাহির হইয়া আসিল এবং রাত্রি প্রভাত হইবার অনেক আগেই দেড়শ মাইল রণাঙ্গন অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিল।

* * *

এভাবে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গের রাজ্য সীমানায় ১০ই মে তারিখ হইতে জার্মানী যে আক্রমণ করিল, তাতে এক সপ্তাহের মধ্যেই সমগ্র পশ্চিম রণাঙ্গনের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িল। উত্তর-পূর্ব হল্যাণ্ডের জুইডার জী হইতে ফরাসী সীমান্তের লাক্সেমবুর্গ, মোজেল ও ম্যাজিনো লাইন পর্যন্ত ২৫০ মাইল রণাঙ্গনে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হইল। এণ্টোয়ার্প দুর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যাসট্রিষ্ট পর্যন্ত এলবার্ট ক্যানেল প্রবাহিত—বেলজিয়ামের আত্মরক্ষার জন্যই ইহা তৈয়ারী লইয়াছিল। ম্যাসট্রিষ্টের অদূরবর্তী নিম্নে লীজ দুর্গ এবং তারও দক্ষিণে নামুর দুর্গ। ম্যাসট্রিষ্টের সোজা পশ্চিমে বেলজিয়াম রাজধানী ব্রুসেলস। মিউজ নদী (ওলন্দাজ ভাষায় ম্যাস) এই স্নায়ুকেন্দ্র ভেদ করিয়া নিম্নাভিমুখে ফ্রান্সের দিকে আর্দেনেস পর্বতের পাশ কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে—৫৭৫ মাইল দীর্ঘ এই নদী হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রবাহিত। জার্মানরা ইহার স্নায়ুকেন্দ্র ম্যাসট্রিষ্ট দখল করিল, এলবার্ট খাল পার হইল এবং লীজ দুর্গ ভেদ করিয়া নামুর দুর্গের প্রান্তে পৌঁছিল ও মিউজ নদী

অতিক্রান্ত হইল। আর ১৭ই তারিখ বেলজিয়ামের ব্রুসেলস, লুভে ও ম্যাসট্রিক্ট এবং ১৮ই তারিখ এণ্টোয়ার্পের পতন হইল। সেই সঙ্গে ১৭ই তারিখ সেডানের দক্ষিণে ফরাসী ব্যূহ বিচ্ছিন্ন হইল। আর মিত্রপক্ষের সর্বপ্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্যামেলাঁ তাঁর নির্দেশনামায় হুকুম দিলেন—মিত্রপক্ষ ও আমাদের স্বদেশ এবং পৃথিবীর ভাগ্য এই যুদ্ধের উপর নির্ভর করিতেছে।...সুতরাং 'মারো, না হয় মরো'—'conquer or die'—কিন্তু এই তেজোদ্দীপ্ত ঘোষণাতেও কুলাইল না। ফরাসী বাহিনী আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। মঃ রেনো এক বক্তৃতায় আর্তনাদ করিয়া বলিলেন যে 'অবিশ্বাস্য রকমের ভুলের' জন্যই মিউজ নদীর সেতুগুলি ভাঙা হয় নাই। জার্মান যান্ত্রিক সৈন্যেরা জেনারেল গুডেরিয়ানের নেতৃত্বে এই সমস্ত সেতু দিয়া দলে দলে ফ্রান্সের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

জার্মান পক্ষ দাবী করিলেন যে, ১০০ কিলোমিটার বা ৬০ মাইল চওড়া স্থানে ম্যাজিনো লাইন বিদীর্ণ করা হইয়াছে। এখান হইতেই পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধে মিত্র-পক্ষের বিপর্যয় শুরু হইল। হল্যাণ্ড দখলের দ্বারা জার্মানী ইংলণ্ডের মুখোমুখি সমুদ্রতীর কাড়িয়া লইল, আর উত্তর ও পূর্ব বেলজিয়াম (এণ্টোয়ার্পের পতনের পর) দখলের দ্বারা মিত্র সৈন্যদিগকে যেমন শেল্ড নদীর দিকে ঠেলিয়া দিল (ফ্লাণ্ডার্সের এলাকা) এবং তাদের দক্ষিণ পার্শ্ব বেষ্টন করিল, তেমনই সেডান ও গিভেটের পথে ম্যাজিনো লাইন ও আর্দেনেশের পার্বত্য এলাকা ভেদ করিয়া জার্মানরা ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলের দিকে ধাবিত হইল।

ইহার পরেই উত্তর ফ্রান্স ও ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধ শুরু হইল, যার পরিণতিতে ঘটিল এক দিকে ডানকার্ক এবং অন্য দিকে প্যারিস অভিযান। কিন্তু জার্মান বাহিনী ১৯১৪ সালের মত আগে প্যারিসের দিকে লক্ষ্য করিল না—তার চেয়েও ভয়াবহ ফাঁদ সৃষ্টি হইল। হিটলার সমগ্র মিত্র বাহিনীকে ধ্বংস করিয়া পশ্চিম রণাঙ্গনকে চূর্ণ করিবার সংকল্প করিলেন। সুতরাং ফরাসী সীমান্তের সেডান ও বেলজিয়ামের নামুর-এণ্টোয়ার্প ব্যূহ ভেদের পর জার্মান বাহিনী এক মারাত্মক সাঁড়াশীর চাপে নিদারুণ বেষ্টন-কৌশল অনুসরণ করিল। জীব্রাগ, অস্টেণ্ড, নিউপোর্ট, ডানকার্ক, ক্যালে ও বোলোন—ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্তী এই সমস্ত ফরাসী ও বেলজিয়ান বন্দর প্রত্যক্ষ বিপদে পড়িল। ১৯শে তারিখ সন্ধ্যাবেলা প্যারিসে ঘোষিত হইল যে জেনারেল গ্যামেলাঁ পদচ্যুত হইয়াছেন এবং বিগত মহাযুদ্ধের খ্যাতিমান জেনারেল ওয়েগাঁকে সর্বপ্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু বিগত যুগের এক বৃদ্ধ সেনাপতিকে নিয়োগ করিয়াও কোন লাভ হইল না। কারণ, পেঁতা বা ওয়েগাঁ দুইজনের চিন্তাধারাই গ্যামেলাঁর চেয়েও সেকেলে ছিল। মিত্রসৈন্যেরা উত্তর ফ্রান্সের সোম ও আইনে নদী ধরিয়া পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইল এবং আইনে নদীতীরস্থ রেথেল দখল হইয়া গেল। জার্মান ট্যাঙ্কবহর আরাস ও পেরোনের মধ্যে দেখা দিল এবং ২১শে মে তারিখ হিটলারের শিবির হইতে দাবী করা হইল যে, পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম আক্রমণের অভিযানে জার্মান সৈন্যেরা জয়ী হইতেছে। বেলজিয়াম হইতে সেডান পর্যন্ত মিউজ নদীর তীর ধরিয়া যে ৯নং ফরাসী বাহিনী জার্মানদিগকে বাধা দিতেছিল, তারা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়াছে। ইহার অধিনায়ক জেনারেল জিরো তাঁর স্টাফসহ বন্দী হইয়াছেন। বিচ্ছিন্ন ফরাসী ব্যূহের নানা অংশ ধরিয়া জার্মান ডিভিসনগুলি

দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং তাদের পুরোগামী ট্যাঙ্ক ও মোটরারূঢ় সৈন্যদল আহা, আমিয়েঁ এবং আবেভিল (সোম নদীর মোহনাস্থিত) বন্দর দখল করিয়াছে। সোম নদীর উত্তরদিকস্থ সমস্ত শত্রুসৈন্য—ফরাসী, বৃটিশ ও বেলজিয়ানদিগকে ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হিটলারের এই দাবী আদৌ অতিরঞ্জিত ছিল না, বরং মিত্রপক্ষের নিদারুণ বিপর্যয়ের বিবেচনায় এই ইস্তাহার ইতিহাসের দিকে হইতে স্মরণীয় ছিল। ২১শে মে তারিখের এই জার্মান অগ্রগতির দ্বারা মিত্রবাহিনী উত্তরে ও দক্ষিণে বিচ্ছিন্ন এবং খণ্ডিত হইয়া গেল। এই দুই অংশের মধ্যে ৩০ মাইল ব্যবধান রচিত হইল—যাকে ইংরাজীতে বলা হইয়াছে দুই অংশের মধ্যবর্তী অন্তঃপথ। উত্তর দিকে ইহা ফ্লাণ্ডার্স এবং দক্ষিণ দিকে ইহা সোম নদী রেখায় বিচ্ছিন্ন। ফ্রান্সের ক্যালে বন্দর হইতে বেলজিয়ামের শেল্ড নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশের নাম ফ্লাণ্ডার্স, যাহা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বহু যুদ্ধবিগ্রহের জন্য পরিচিত ছিল। কেবল ফ্লাণ্ডার্স নহে, উত্তর ফ্রান্সের এই সমস্ত রণক্ষেত্রও প্রথম মহাযুদ্ধে কিংবা আগেকার ইতিহাসের দ্বারা খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ২১শে মে তারিখ আবেভিল বন্দরের পতনের এক সপ্তাহের মধ্যে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম রণক্ষেত্রের মধ্যে যে বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হইল তাহা ৩০ মাইল চওড়া হইয়া জার্মান যান্ত্রিক বাহিনীর যেন প্লাবন ডাকিয়া আনিল। উত্তর দিকে ঘেণ্ট-ভ্যালেন্সিনেস-আহা এবং দক্ষিণ দিকে সোম ও আইন নদী—মোটামুটি এই দুই রেখায় মিত্রবাহিনীর মধ্যে যে বিরাট বিচ্ছেদ ঘটিল, উহা পূর্ণ করিবার জন্য ২৩শে মে তারিখ মিত্র সামরিক কর্তৃপক্ষ জেনারেল ওয়েগাঁর পরামর্শ অনুসারে যুগপৎ উভয় দিকে পাল্টা আক্রমণের প্ল্যান করিলেন এবং ২৬শে মে তারিখ এই পাল্টা-আক্রমণের দিন ধার্য হইল। কিন্তু এই পাল্টা-আক্রমণের কোন সুযোগ জার্মানরা রাখিল না। বিদ্যুৎবেগে তারা শেল্ড পার হইল এবং বেলজিয়ান ও বৃটিশ সৈন্যদের মধ্যে সংযোগ নষ্ট করিয়া তাদের ডানকার্কে পিছু হটিবার পথ বন্ধ করিবার উপক্রম করিল। ২৫শে মে তারিখ অপরাহ্নে জার্মানরা দাবী করিল যে, বেলজিয়ান বাহিনী ১নং, ৭নং ও ৯নং ফরাসী বাহিনীর কতকগুলি অংশ এবং বৃটিশ বাহিনীর অধিকাংশ বেষ্টিত হইয়াছে। ঘেণ্ট ও কোর্টরাই দখল হইয়াছে, লাইস নদী অতিক্রান্ত এবং বোলোন বন্দরের পতন হইয়াছে। ইহার পর অবরুদ্ধ ক্যালে বন্দরেরও অনুরূপ দশা ঘটিল। ১নং ফরাসী বাহিনীর জেনারেল প্রিয়ো সদলবলে বন্দী হইলেন। এই অবস্থার মধ্যে ২৮শে মে তারিখ বেলজিয়ানের রাজা লিওপোল্ড আত্মসমর্পণ করিলেন।

ডানকার্ক

তখন বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী ও মিত্র সৈন্যদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তারা কেবল সমুদ্রতীরের সঙ্কীর্ণ বালুকা ভূমিতেই তাড়িত হইল না, অধিকন্তু তিন দিকে বেষ্টিত হইয়া পড়িল। অস্টেণ্ড, লিলে, ডানকার্ক (প্রকৃতপক্ষে ডানকার্ক ও ক্যালের মধ্যবর্তী ফাঁক)—এই ত্রিভুজাকৃতি অতি অল্প পরিসর ভূমিখণ্ডে সমুদ্রকে পশ্চাতে রাখিয়া মিত্র সৈন্যদিগকে সরিয়া আসিতে হইল। যে অভূতপূর্ব বিপদের মধ্যে বৃটিশ সৈন্যেরা পড়িল, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু ইংরাজ সেনাপতি লর্ড গোর্ট তাঁর সৈন্যদলসহ

পলায়নের বিস্ময়কর শক্তি দেখাইলেন এবং ইতিহাসের এক বৃহত্তম পৃষ্ঠরক্ষার লড়াইয়ের দ্বারা ত্রাণলাভের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিলেন।

লর্ড গোর্টের 'ডেসপ্যাচে' (যাহা ১৯৪১ সালের ১৭ই অক্টোবর প্রকাশিত হইয়াছিল), দেখা যায় যে, মোট ১৩ ডিভিসন সৈন্য লইয়া বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী গঠিত ছিল, তবে ইহার মধ্যে তিন ডিভিসন পুরোপুরি অস্ত্রসজ্জিত সৈন্য ছিল না। ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে এই সমস্ত সৈন্য রাখা এবং ৪৫ হাজার যানবাহন আনিতে ও নামাইতে ১৪টি বন্দর ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু যথেষ্ট পরিমান গোলাগুলি ও যান্ত্রিক সজ্জা ছিল না। লর্ড গোর্ট বৃটিশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হইলেও কার্যত তিনি ছিলেন উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনের জেনারেল জর্জেসের অধীনে এবং জেনারেল জর্জেস ছিলেন মিত্রবাহিনীর সর্বপ্রধান ফরাসী সেনাপতি জেনারেল গ্যামেলাঁর অধীনে। অর্থাৎ বৃটিশ বাহিনী ফরাসী সৈন্যদলেরই একটা শাখা ছিল মাত্র। ১৯৩৯ সালের শরৎকালে মিত্রপক্ষের রণনৈতিক নক্সা স্থির হয় এবং কয়েকবার অদলবদলের পর 'প্ল্যান ডি' অনুসারে ফ্রাঙ্কো-বেলজিয়ান সীমানা হইতে ৬০ মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়া ডাইল নদী ও ব্রুসেলস পর্যন্ত লাইন ধরিয়া জার্মান আক্রমণে বাধা দেওয়ার পরিকল্পনা হয়। কিন্তু জার্মানীর দুর্ধর্ষ আক্রমণে ও বিদ্যুৎগতি অভিযানে এই সমস্ত নক্সা চুরমার হইয়া গেল এবং শেষ পর্যন্ত ফ্লাণ্ডার্স অঞ্চলের বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যেরা ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্তী ডানকার্কের ফাঁদে বা পকেটের মধ্যে গিয়া পড়িল। ২৩শে মে তারিখ পর্যন্তও লণ্ডনের সমর দপ্তরের আশা ছিল যে, লর্ড গোর্ট জেনারেল ওয়েগাঁর পাল্টা-আক্রমণের পরিকল্পনায় যোগ দিতে পারিবেন। কিন্তু এই আশা ছিল ভ্রান্ত ধারণার উপর। ২৬শে মে সকালে লর্ড গোর্ট জেনারেল ব্লাঁশাদের সঙ্গে একযোগে ফরাসী সৈন্যদের সহিত লাইস নদীর পশ্চাতে তাদের সৈন্যদের ঘুরাইয়া সমুদ্রের অভিমুখে নিতে চাহিলেন এবং সেদিনই নিজের শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া লণ্ডনের সমর-দপ্তর হইতে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাইলেন যে, বোধ হয় বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনীকে সরাইয়া আনা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। ইহার পরেই আর একখানা টেলিগ্রাম আসিল—

'Sole task now is to evacuate to England maximum of your force possible'—

—'আপনার একমাত্র কার্য হইতেছে সৈন্যদের যত বেশী সম্ভব ইংলণ্ডে ফিরাইয়া আনা।'[১]

তারপর শুরু হইল ডানকার্কের ফাঁদ হইতে উদ্ধার লাভের আসুরিক চেষ্টা এবং সেই চেষ্টা করিতে গিয়া বৃটিশ সৈন্যেরা পৃষ্ঠরক্ষার-প্রাণান্তকর সংগ্রাম করিল। বৃটিশ নৌবহর ও বিমানবাহিনী (আর. এ. এফ.) তাদের যথাসাধ্য সমগ্র শক্তি এই উদ্ধার কার্যে নিয়োগ করিল। আর জার্মান বোমারুর দল তাদের ডানকার্কের বালুকাতটে ধাওয়া করিল। কিন্তু পলায়নের দৃঢ়-সংকল্প লইয়া যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে, তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব হইল না। বৃটিশ নৌবহরের দুই শতাধিক হাল্কা রণপোত এবং ৬৫০ খানার বেশী বিভিন্ন ধরনের পোত—মোট প্রায় হাজারখানেক জলযান অসংখ্য লস্কর ও স্বেচ্ছাসেবক এই উদ্ধারকার্যে নিযুক্ত হইল! বহু বৃটিশ সৈন্য তীর হইতে

১। 'This Expanding War'—by Liddell Hart, page 199.

ফ্রান্সের পতন
১৯৪০
হল্যাণ্ড
ইংল্যাণ্ড
ডানকার্ক
বেলজিয়াম
ব্রাসেলস
বোলন
জার্মানী
ম্যাজিনো লাইন
সেদান
লুকসমবার্গ
জার্মান পদাতিক এবং সাঁজোয়া বাহিনীর আক্রমণ
প্যানজার বাহিনীর আক্রমণ
জার্মান ছত্রীবাহিনীর অবতরণ

প্যানজার বাহিনীর আক্রমণ
ব্রাসেলস
বেলজিয়াম
জার্মানী
ইংলিশ চ্যানেল
শেরবুর্গ
রুয়েঁ
ম্যাজিনো লাইন
প্যারিস
ফ্রান্স
আলিয়
লোয়ার
সুইজারল্যাণ্ড
জেনিভা
লিঁয়
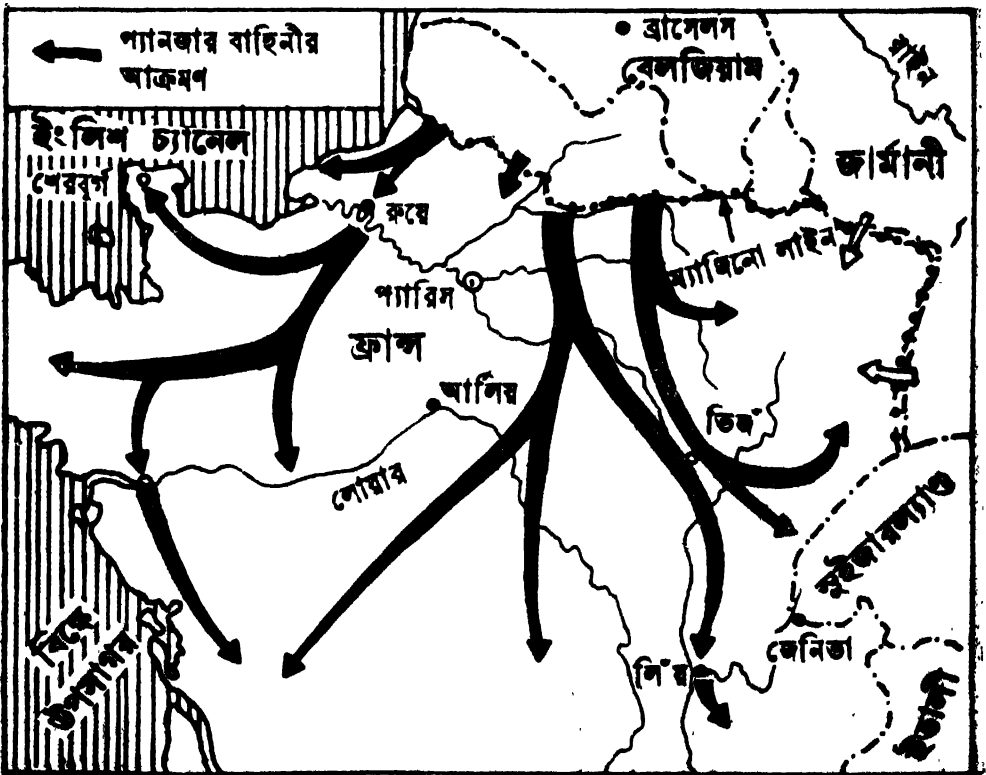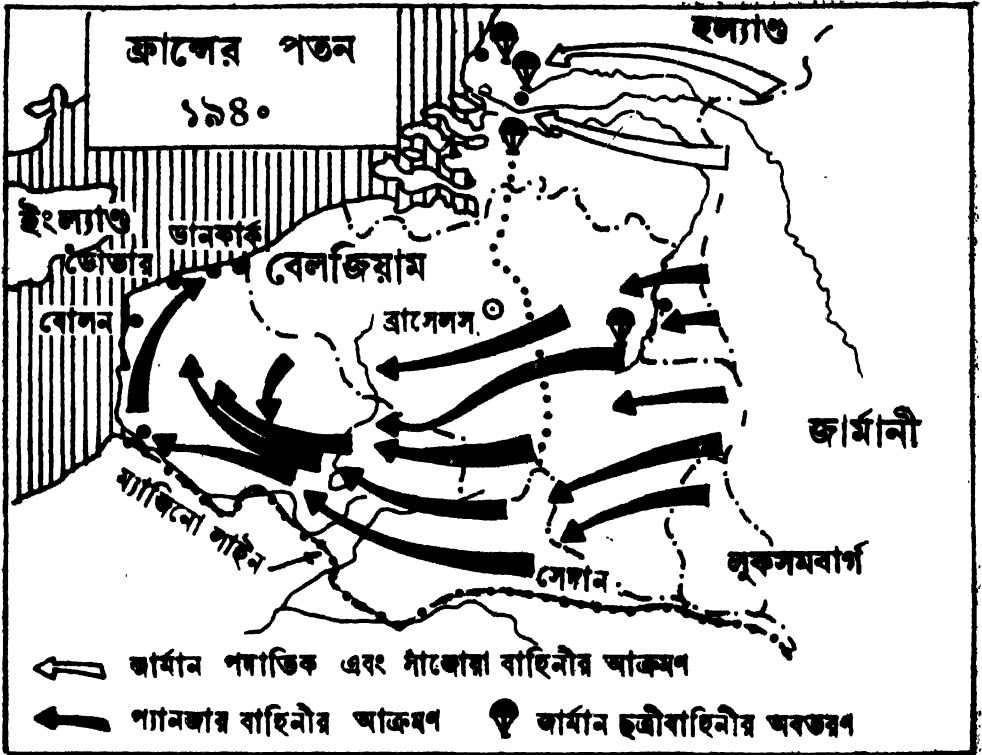
জল সাঁতরাইয়া এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া গিয়া জাহাজে উঠিল। (এই অবস্থায় লজ্জা-সরম না থাকিবারই কথা!) সমস্ত গোলা-বারুদ, কামান, অস্ত্র, দ্রব্য ইত্যাদি ফেলিয়া তারা ছুটিতে লাগিল এবং জার্মানরা এই পলায়ন প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিল না। সত্য-সত্যই ডানকার্ক হইতে এই ত্রাণলাভ সকলকে চমকাইয়া দিল, আর মিত্রপক্ষের নেতা, সংবাদপত্র ও প্রচার বিভাগ মিলিয়া বৃটিশ বাহিনীকে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল। স্বয়ং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কমন্সসভায় এক বক্তৃতায় (৪ঠা জুন, ১৯৪০) ডানকার্ক থেকে এই পরিত্রাণ লাভকে 'miracle of deliverance' বলিয়া ইংরেজের কীর্তি গানে মুখর হইয়াছিলেন। (কিন্তু পাঠকদের জানা উচিত যে, এর মধ্যে মিরাক্যাল্ বা অঘটন কিছু ছিল না, ছিল জার্মান হাইকমাণ্ডের ভ্রান্তি, সে বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।)

২৯শে মে তারিখের রাত্রি হইতে বৃটিশ সৈন্যেরা ডানকার্ক পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে পেঁাছিতে আরম্ভ করে এবং ৪ঠা জুনের মধ্যে ডানকার্ক সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইল। চার্চিল কমন্সসভায় এক জোরালো বক্তৃতায় প্রকাশ করিলেন, যে, মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সেডান ও মিউজ নদীতটে ফরাসী ব্যূহ ভাঙিয়া পড়ায় এবং বেলজিয়াম আত্ম-সমর্পণ করাতেই বৃটিশ সৈন্যেরা বেলজিয়ান রণাঙ্গন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তিনি ডানকার্ক হইতে বৃটিশ সৈন্যদের উদ্ধার লাভের ভূয়সী প্রশংসা করেন—নিয়ম-শৃঙ্খলা, ধৈর্য, সাহস, নৈপুণ্য এবং নিষ্ঠার দ্বারাই পরিত্রাণের এই বিস্ময় সম্ভব হইয়াছে। এই ত্রাণকার্যে ৩০ হাজার সৈন্য হতাহত ও নিখোঁজ হইয়াছে। তবে বৃটেনের ৭ হাজার টন গোলা-বারুদ, ৩০০ কামান, ১ লক্ষ ২০ হাজার যানবাহন এবং সমস্ত সাঁজোয়া গাড়ী, ৯০ হাজার রাইফেল, ৮ হাজার ব্রেনগান, ৪ শত ট্যাঙ্ক-মারা রাইফেল—যেগুলি বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে ছিল, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে খোয়া গিয়াছে। ফলে, বৃটেনের যুদ্ধ সজ্জায় আরও বিলম্ব ঘটিবে। কেবল তাহাই নহে, তিনি স্বীকার করেন যে, ডানকার্ক হইতে ত্রাণলাভই যুদ্ধ জয় নহে—'wars are not won by evacuations' এবং ফ্রান্সে ও বেলজিয়ামে যাহা ঘটিয়াছে, নিঃসন্দেহে তাহা এক নিদারুণ সাময়িক বিপর্যয়—'কোলোস্যাল মিলিটারি ডিজাস্টার' মিঃ চার্চিলের এই মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল এবং ইহার পরেই শুরু হইল খাস ফ্রান্সের যুদ্ধ ও ফরাসী জাতির পতন।

ডানকার্ক হইতে মোট ২,২৪,৫৮৫ জন ইংরাজ এবং ১,১২,৫৪৬ জন মিত্রসৈন্য (অধিকাংশই ফরাসী) উদ্ধার পাইয়াছিল। আর ডানকার্কের দক্ষিণের ক্যালে বন্দরের অবরোধ যুদ্ধে ৩ হাজার বৃটিশ সৈন্যের প্রায় সকলেই নিহত হইয়াছিল।

প্যারিসের পতন

ডানকার্ক হইতে যখন বৃটিশ সৈন্যদের প্রস্থানের নাটক জমিয়া উঠিতেছিল, তখন জেনারেল ওয়েগাঁর নেতৃত্বে ফয়াসী সৈন্যরা ফ্রান্সের আত্মরক্ষার জন্য ব্যূহ রচনা করিতেছিল। সোম নদী যেখানে ইংলিশ চ্যানেলে পড়িয়াছে, সেই মোহনা ম্যাজিনো লাইনের আসল দুর্গমালার মণ্টমিডি পর্যন্ত এই আত্মরক্ষার ব্যূহ তাড়াতাড়ি রচিত হইতেছিল। প্রকৃতপক্ষে জার্মানরা ফ্রান্সকে নিঃশ্বাস ফেলিবারও সময় দিতেছিল না এবং সোম নদী ধরিয়া পাকাপোক্ত কোন ব্যূহও গড়িয়া উঠিল না। কেবল স্থানে স্থানে

কতকগুলি ট্যাঙ্কমারা ফাঁদ তৈয়ারী হইল। তবে, আত্মরক্ষার এই লাইন ছিল প্রায় একটানা নদী ও জলপথের দ্বারা বিঘ্নবহুল, যে-বিঘ্ন যান্ত্রিক যুদ্ধের মুখে বিশেষ কোন কাজে আসিল না।

ফ্লাডোর্সের যুদ্ধেই ফরাসী বাহিনীগুলি কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং লড়াই করিবার ক্ষমতাও বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইহা ছাড়া ফরাসী বাহিনী-গুলির একাংশ ছিল ম্যাজিনো লাইনের দুর্গশ্রেণী আশ্রয় করিয়া এবং অপরাংশ ছিল ইতালী-সুইজারল্যাণ্ডের সীমানায় পাহারারত। সোম নদী মোহনার আবেভিল বন্দর হইতে আমিয়েঁ, সঁন্ত্‌কঁত্যা, লাওঁ হেথেল ইত্যাদি হইয়া মন্তমিদি পর্যন্ত ফরাসীদের ছিল ৪৩টি পদাতিক ডিভিসন (অধিকাংশ দুর্বল) ৩টি সাঁজোয়া ডিভিসন (যাদের ট্যাংক ছিল অতি সামান্য) এবং ৩টি দুর্বল অশ্বারোহী ডিভিসন। আরও ১৭ ডিভিসন ছিল দুর্গশ্রেণীর আড়ালে মন্তমিদি ও সুইস সীমান্তের মধ্যে।[১]

৫ই জুন হিটলার সৈন্যবাহিনীর নিকট এক নির্দেশনামায় ঘোষণা করিলেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে আর একটি বৃহৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা জার্মান জাতির মুক্তি এবং লণ্ডন ও প্যারিসের শত্রু-শাসকের দল ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। আর একটি ঘোষণাপত্র তিনি প্রচার করিলেন জার্মান জাতির উদ্দেশ্যে এবং বলিলেন যে, পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধে জার্মান সৈন্যেরা জয়ী হইয়াছে, মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ১২ লক্ষ শত্রুসৈন্য বন্দী হইয়াছে। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম অত্মসমর্পণ করিয়াছে, বৃটিশ বাহিনীর অধিকাংশ হয় ধ্বংস, না হয় পলায়িত হইয়াছে। শত্রুরা এখনও শান্তির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতেছে। সুতরাং তাদের ভাগ্যে রহিয়াছে সম্পূর্ণ সংহারের সামগ্রিক যুদ্ধ।

হিটলার অবশ্য বৃথা গর্ব করেন নাই। ৫ই জুন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম শুরু হইল এবং যাহা 'ব্যাটল অফ ফ্রান্স' নামে পরিচিত, তাহা অতি দ্রুত সারা ফ্রান্সের বিপর্যয় ডাকিয়া আনিল। ইংলিশ চ্যানেলের উপকূল হইতে লাও-সোঁয়াস সড়ক পর্যন্ত ১২০ মাইল দীর্ঘ রণক্ষেত্রে সোম নদীর তীর ধরিয়া প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যার মত ট্যাংক, গোলাগুলী ও বোমাবর্ষণের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের উদ্বোধন হইল—এই আক্রমণের জার্মান নেতা ছিলেন ফন বোক্। ফরাসী সৈন্যদল যথাসম্ভব বাধা দেওয়া সত্ত্বেও এদিন রাত্রেই সোম নদীর মোহনা হইতে আমিয়েঁ পর্যন্ত ফরাসী ব্যূহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ৬ই জুন আবেভিল হইতে আইন নদী পর্যন্ত জার্মানদের প্রায় দুই হাজার ট্যাংক দলবদ্ধভাবে আক্রমণ চালাইল—এক এক দলে ২। ৩ শত করিয়া ট্যাঙ্ক ছিল। সোম নদীর নিম্নভাগে যে ৫১নং হাইল্যাণ্ড ডিভিসন (বৃটিশ) ছিল, তারাও এই আক্রমণে পিছু হটিয়া গেল। কিন্তু তখনও মঃ রেনো আশাবাদী ছিলেন এবং এক বেতার বক্তৃতায় বলিলেন যে, ওয়েগাঁ যুদ্ধের গতিতে সন্তুষ্ট আছেন! কিন্তু পরদিন ৭ই জুন, অর্থাৎ যুদ্ধের তৃতীয় দিবসেই সমগ্র সোম নদী রণাঙ্গন টুকরা টুকরা হইয়া গেল। আক্রমণের প্রথম হইতেই ফরাসীদের আত্মরক্ষার বিন্দুগুলিতে খাদ্য ও গোলাবারুদ সরবরাহে বিঘ্ন হইতেছিল। সুতরাং ফরাসীদের অবস্থা ভাবিবার মত ছিল। ১০নং ফরাসী বাহিনী সোম নদীর এলাকা ছাড়িয়া পশ্চিম অভিমুখে সরিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু এক ডিভিসন জার্মান সাঁজোয়া সৈন্য সোম অতিক্রম করিয়া

১। 'The Second Great War'—Vol. 3. Page 923

ফরাসীদিগকে ঘিরিবার জন্য অতিদ্রুত সেই দিকে আক্রমণ চালাইল। প্যারিসের উত্তরে ৭ নং ফরাসী বাহিনী ওয়াস নদীর দক্ষিণ-পূর্বে পিছু হটিতে বাধ্য হইল এবং ইহার ফলে তাদের দক্ষিণ পার্শ্বে ৬নং ফরাসী বাহিনীও পশ্চাদপসরণ করিল। ৯ই জুন রবিবার জার্মানদের ভাষায় 'ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধ' আরম্ভ হইল। ইহাই ছিল জার্মান বাহিনীর অন্যতম প্রধান আক্রমণ। প্যারিসের পূর্ব দিকে ওয়াস নদী পার হইয়া এই আক্রমণ আরম্ভ হইল এবং পদাতিকেরা যে সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করিল, জার্মান ট্যাঙ্কবহর অতি দ্রুত সেখান দিয়া ছড়াইয়া পড়িল এবং ফরাসী সৈন্যদিগকে বিখ্যাত মার্ন নদী পর্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া গেল। সমুদ্রতীর হইতে প্যারিসের উত্তরে এবং সেখান হইতে পূর্বদিকের আইন নদী পর্যন্ত সমগ্র রণক্ষেত্রে প্রবল আক্রমণ চলিতে লাগিল এবং এই বিদ্যুতগতি অভিযান ও ভয়াবহ যান্ত্রিক আক্রমণের দ্বারা ফরাসী বাহিনীগুলি অতি দ্রুত ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। তাদের যোগাযোগ ব্যাবস্থা পর্যন্ত বানচাল হইয়া গেল।

এই অবস্থায় পাল্টা আক্রমণের কোন প্রশ্নই ছিল না। সামরিক দিক দিয়া যখন এই বিপর্যয়, তখন শত শত বোমারুবিমানের আক্রমণে বেসামরিক জনগণের মধ্যে ত্রাস, ভীতি ও হতাশা গোটা ফরাসী জাতির মেরুদণ্ড যেন ভাঙ্গিয়া দিল।

একজন মার্কিন লেখক বলিয়াছেন :

'All France degenerated into panic, terror, hysteria, confusion.

There was chaos on the roads. The onrushing Germans, aiming to immobilize the retreating enemy, deliberately induced a mass exodus of the civilian population. Hundreds of thousands of refugees desperately anxious to escape from Paris, Jammed the roads south to Bordeaux for a distance of 400 miles. They used everything they could move—carts, bicycles, taxi cabs, trucks, bakery vans, roadstars, even horses. All these were loaded with human Beings, shouting, wailing, cursing.

সংক্ষেপে প্যারিস থেকে দক্ষিণ দিকে বর্দো পর্যন্ত ৪০০ মাইল দীর্ঘ রাস্তার সর্বত্র হাজার হাজার আর্ত, আতঙ্কিত পলায়মান নর-নারীর ভীড় এবং তারা হাতের কাছে যে-কোন যানবাহন পাইল তাতেই চড়িয়া বসিল, আর চলিতে চলিতে তারা চীৎকার ও আর্তনাদ এবং অভিশাপ দিতে লাগিল…*

কিন্তু এই হতভাগ্য পলায়মান শরণার্থীরা কেবল তাতেই ত্রাণ পাইল না। দ্রুতবেগ-সম্পন্ন জার্মান বোমারুগুলি গাছের মাথার নীচু পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া ভিড়ের মধ্যে বন্দীর মত অসহায় নর-নারীর উপর বোমা ও মেসিনগানের গুলী বর্ষণ করিতে লাগিল। আর রাস্তার উপর রাশি-রাশি মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে বা ঝুলিয়া থাকিতে দেখা গেল :

* ১৯৪০ সালের ফ্রান্সের অগণিত ত্রাসগ্রস্ত নর-নারীর এভাবে পলায়ন প্রসঙ্গে, হয়তো অনেক পাঠকের মনে পড়বে ১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে ইয়াহিয়া খানের আক্রমণের জন্য বিপন্ন ৯০ লক্ষ মানুষের ভারতে পলায়নের কথা।—লেখক

'It seemed to be a field day for Hitler's young Supermen. German pilots in speedy Heinkels roared up and down at tree level over the roads where civlian refugees were trapped and helpless in the traffic jams. Bombs and bullets burst among the automobiles, carts. farm wagons, and bicycles, catching humans and horses in a deadly me lange of flame and smoke. Lining roads leading south from paris were hundreds of bodies spread-eagled in grotesque attitudes of death"[১]

যুদ্ধের নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত সাধারণ ফরাসী নর-নারীর কী ভয়ঙ্কর মৃত্যু এবং কী ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা! একজন প্রত্যক্ষদর্শী* বলিতেছেন যে, যারা ফরাসী বিপ্লবের জন্ম দিয়াছিল, যারা বাঘের মত লড়াই করিয়াছিল স্বাধীনতার জন্য, যারা খালি হাতে ব্যাস্টিল দুর্গ আক্রমণ ও তার পতন ঘটাইয়াছিল, সেই বীর ফরাসী সন্তানদের এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা বিশ্বাস করাও কঠিন।

১০ই জুন মধ্যরাত্রে যখন ইতালী কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার দ্বারা আল্পস পর্বতের এলাকায় নূতন ফ্যাসিস্ট আক্রমণ আসন্ন ছিল, তখন ওয়েগাঁ লাইনের আত্মরক্ষার সমগ্র অঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল এবং ফরাসী জাতির নাভিশ্বাসের তাহা ছিল পূর্ব লক্ষণ। জার্মান সৈন্যেরা জয়দর্পে দ্রুত প্যারিসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সোম, আইন, মার্ন এবং সীন নদী জার্মান যান্ত্রিক সৈন্যের বন্যাপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিল। সোঁয়াস ছাতছাড়া, রুয়েঁ এবং রেইমস প্রায় তাহাই। জার্মানরা প্যারিসের শহরতলী হইতে ২৫। ৩০ মাইলের মধ্যে পেঁৗছিল।

প্যারিসের পতন আসন্ন হইয়া উঠিল এবং ১০ই জুন ফরাসী গভর্মেণ্ট রাজধানী ত্যাগ করিয়া টুর্নে চলিয়া গেলেন। ১১ই তারিখ সমগ্র রণাঙ্গনের অবস্থা আরও খারাপ হইল এবং ৪ঠা জুন যে ৪৩ ডিভিসন পদাতিক সৈন্য ছিল, উহার মধ্যে অন্ততঃ ৯ ডিভিসন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। ১২ ডিভিসনের সংখ্যাগুলি দাঁড়াইল এক চতুর্থাংশে, অর্থাৎ ইহারাও কার্যতঃ অকেজো হইয়া পড়িল এবং ১১ ডিভিসন অর্ধেকে দাঁড়াইল। সুতরাং ফরাসী সৈন্যদলের আর বাকি রহিল কি? ১২ই জুন জার্মানরা প্যারিসের উত্তরে ওয়াস নদী উপত্যকা দিয়া সেনলিকে পেঁৗছিল। পশ্চিমদিকে সীন নদী বরাবর তারা লে হ্যাভার বন্দরের দিকে অগ্রসর হইল এবং এব্রো অঞ্চলে সীন নদী দক্ষিণে অতিক্রান্ত হইল। পূর্ব দিকে তারা মার্ন নদী অতিক্রম করিল এবং আরও পূর্বে মন্তমিদি অঞ্চলে তারা ফরাসী রণাঙ্গনকে ম্যাজিনো লাইন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উপক্রম করিল। এই অবস্থায় আর কতক্ষণ আত্মরক্ষা সম্ভব? ১২ই তারিখই জেনারেল ওয়েগাঁ ফরাসী মন্ত্রিসভাকে জানাইলেন যে, যুদ্ধ-বিরতির প্রার্থনা না জানাইয়া আর উপায় নাই। কিন্তু ইহার এক অক্ষরও এমনকি কানাঘুষাও তখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল না।[২] ১৩ই জুন সকালবেলা প্যারিস খোলা বা অরক্ষিত শহর বলিয়া ঘোষিত

১। 'The War'—L. Snyder. P. 136

* ভার্জিনিয়া কাউলস

২। The Second Great War—Vol. 3, P. 967

হইল এবং দলে দলে নরনারী প্যারিস ছাড়িয়া আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটিতে লাগিল। রাস্তাঘাট জনশূন্য, বিরাট অট্টালিকাসমূহ নিস্তব্ধ, সমগ্র শহর শ্মশানের মত, দৈনিক পত্রিকাগুলির প্রকাশ বন্ধ—কেবল অদূরবর্তী রণক্ষেত্রের ধূম ও অগ্নিশিখা রাত্রির আকাশকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল…

১৩ই জুন সন্ধ্যাবেলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূত মিঃ উইলিয়াম বুলিট টুর্নে অবস্থিত তাঁর সহকর্মীকে প্যারিস হইতে টেলিফোনযোগে জানাইলেন যে, জার্মান সৈন্যেরা প্যারিসের নগরীদ্বারে প্রবেশ করিয়াছে। প্যারিস প্রায় চারিদিকেই বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং ১৪ই তারিখ জার্মান হাইকম্যাণ্ড এক ইস্তাহারে পূর্ণ জয়ের দাবী করিলেন এবং ঐদিন সকাল ৭টায় জার্মান সৈন্যেরা দলে দলে প্যারিস নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজধানী এবং একটি শ্রেষ্ঠ জাতির মর্মকেন্দ্রের পতন হইল।

ইতালীর যুদ্ধ ঘোষণা

১০ই জুন ইতালী সরকারীভাবে ফ্রান্স ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ফ্যাসিস্ট নায়ক মুসোলিনী গোড়া হইতেই সামরিকবাদ প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন এবং দীর্ঘ অতীতের গর্ভে লুপ্ত রোমক সাম্রাজ্যের নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া ইতালীকে এক অদ্বিতীয় রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত করিবার দিবাস্বপ্ন রচনা করিতেছিলেন। জার্মানীতে নাৎসী দল-নায়ক হিটলারের শক্তিলাভে এই দিকে তিনি আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছিলেন এবং হিটলারের সঙ্গে দল পাকাইয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও ডিক্টেটরি করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। উত্তর আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরকে তিনি তাঁর কল্পিত রোমক সাম্রাজ্যের এলাকা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপে হিটলারের অগ্রগতিতে তিনি একবার ক্রুদ্ধ, একবার লুব্ধ এবং অন্যবার ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িতেছিলেন। শক্তি হিসাবে ইতালী কোন দিক দিয়াই জার্মানীর সমকক্ষ ছিল না। মনে মনে তিনি এ-কথা জানিতেন, কিন্তু নিজেকে হিটলারের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর পুরুষ বলিয়া ভাবিতেন। বিশেষতঃ তিনিই ছিলেন ইউরোপে ফ্যাসিজমের পথ-প্রদর্শক। সুতরাং হিটলারের শক্তি ও প্রতিপত্তি তাঁকে অস্থির এবং বিকারগ্রস্ত করিয়া তুলিল। রণসজ্জায় ও যুদ্ধযাত্রায় ইতালী বহু পশ্চাতে ছিল একথা অনুভব করিয়া তিনি সময় সময় আরও বেসামাল হইয়া পড়িতেন। কাউণ্ট চিয়ানোর ডায়েরীতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এই চিত্র চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

হিটলার যখন পোল্যাণ্ড আক্রমণে দৃঢ়সংকল্প হইলেন, তখন মুসোলিনী যুদ্ধ ও শান্তি—এই দুই প্রশ্নের মধ্যে গভীর সংশয়ের দ্বারা আন্দোলিত হইলেন। কিন্তু সামরিক প্রস্তুতির অভাবে তিনি জার্মানীর সহিত গোপন চুক্তির দ্বারা ১৯৪২ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্য বলিয়া ভাবিলেন। ইতিমধ্যে তিনি স্নায়ুর লড়াইয়ের দ্বারা ভূমধ্যসাগরে পার্শ্ববর্তী বলকান অঞ্চলকে, আফ্রিকায় এবং বিশেষভাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে টিউনিস, কর্সিকা, নিস ও স্যাভয় লইয়া গলাবাজীর দ্বারা বাজীমাৎ করিতে চাহিলেন। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বাধিবার পর তিনি ‘নিরপেক্ষতার’

বন্দরে অযধ্যায়ান সাজিয়া হিটলারকে খুশী রাখিলেন এবং ইতালীর বন্দরগুলিকে মিত্রশক্তির অবরোধের বিরুদ্ধে জার্মানীর সাহায্যের জন্য ব্যবহার করিলেন। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না। পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে হিটলারের দিগ্বিজয় যাত্রা ও জার্মান সাম্রাজ্যের জয়ডঙ্কায় তাঁর সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল এবং ইতালীয় জনসাধারণ এই যুদ্ধে উৎসুক নহে, একথা জানিয়াও তিনি ১৯৪০ সালের ১০ই জুন মুমূর্ষু ফ্রান্সকে পিছন হইতে ছুরিকাঘাতে উদ্যত হইলেন!

কাউণ্ট চিয়ানোর ডায়েরীতে দেখা যায় যে, ৩০শে মে তারিখই মুসোলিনী যুদ্ধ-যাত্রার সংকল্প স্থির করেন এবং ৫ই জুন যুদ্ধ ঘোষণার তারিখ নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু হিটলার আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করিতে বলেন। কারণ, ফরাসী বিমানবহর ধ্বংসের যে প্ল্যান হিটলারের ছিল, তাহা ইতালী কর্তৃক পূর্বাহ্নে যুদ্ধ ঘোষণার দ্বারা বানচাল হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং তারিখটা পিছাইয়া গেল।

৪ঠা জুন ইতালীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে সকলেই যখন মুসোলিনীর এত বড় সংকল্প লইয়া প্রকাণ্ড রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ও বাহ্বাস্ফোটের প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তখন তিনি গম্ভীরভাবে শুধু মাত্র বলিলেন—"This is the last council of Ministers during peace-time."—এবং একথা বলিয়াই নাটকীয় কায়দায় কর্ম-তালিকায় হাত দিলেন। 'গত ১৮ বৎসরের মধ্যে এমন শাসনতান্ত্রিক কায়দা' নাকি আর হয় নাই।

১০ই জুন অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটায় ইতালীর পররাষ্ট্রসচিব কাউণ্ট চিয়ানো ফরাসী এবং বৃটিশ রাষ্ট্রদূতকে যুদ্ধ ঘোষণার দলিল পড়িয়া শুনাইলেন। ফরাসী দূত মঃ পসেঁট বিচলিত এবং কাতর হইয়া বলিলেন, "যে লোক পড়িয়া গেছে ইহা দ্বারা তার উপরেই ছোরা মারা হইল। তথাপি আপনাকে ধন্যবাদ যে, আপনার হাতে ভেলভেটের দস্তানা!" কিন্তু বৃটিশ রাজদূত স্যার পার্শি লোরেনের মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হইল না, চক্ষুর পলকও পড়িল না, শুধু যুদ্ধ ঘোষণার দলিলটা তিনি টুকিয়া লইলেন এবং যথোচিত মর্যাদা ও শিষ্টাচারের সঙ্গে বিদায় লইলেন। এমনকি, কাউণ্ট চিয়ানোর সঙ্গে আন্তরিকভাবে দীর্ঘ করমর্দনেও ভুলিলেন না।*

মুসোলিনী মাইক্রোফোনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করিয়া ১০ই জুন ইতালীয় জনগণের উদ্দেশ্যে এক বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন। "পশ্চিমের প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্রীরা, যারা ইতালীর অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন করিয়াছে", তাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধযাত্রা। 'ইতালীয় স্থলভাগের সীমানা নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সমুদ্রপথের সীমানার মীমাংসা হওয়া দরকার।...যদি সমুদ্রপথে অবাধ স্বাধীনতা না থাকে তবে, সাড়ে ৪ কোটি ইতালীয় জনগণের পক্ষে স্বাধীনতা নিতান্তই অর্থহীন। সুতরাং যে ভৌগোলিক ও সামরিক শৃংখলের দ্বারা আমরা আমাদের সমুদ্রে বন্দী হইয়া রহিয়াছি, তাহা আমরা ছিন্ন করিয়া ফেলিতে চাই।'...'যে সমস্ত শোষক জাতি পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য ও স্বর্ণভাণ্ডার লুব্ধের মত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে'

* চিয়ানো তাঁর ডায়েরীতে ইংরাজ জাতির এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একাধিকবার প্রশংসা করিয়াছেন। বার্লিনে বৃটিশ দূতের ভাবভঙ্গীও অনুরূপ মর্যাদাব্যঞ্জক ছিল।—লেখক

তাদেরই বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম এবং 'এই সংগ্রাম দুই শতাব্দী ও দুইটি মতবাদের মধ্যে।'

হিটলারেরই অনুরূপ ভাষায় মুসোলিনীর এই বক্তৃতা এবং 'পৃথিবীর এই যুগান্তকারী ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের জন্য' স্বয়ং হিটলার ঐ দিনই তারযোগে মুসোলিনীকে সাদর অভিনন্দন জানাইলেন এবং এই সংগ্রামে তাঁরা দুইজন এবং দুই রাষ্ট্রই যে একাত্ম, তাহাও প্রকাশ করিলেন। ইহাই তাঁদের 'কমরেডসিপ'।

অতএব প্রথম মহাযুদ্ধের মিত্রপক্ষের সঙ্গী ইতালী, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। চার্চিল, এট্‌লী, রুজভেল্ট প্রভৃতি এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নেতা ও ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহও মুসোলিনীর এই বিশ্বাসঘাতকতা এবং ফ্রান্সের প্রতি কাপুরুষোচিত আচরণের তীব্র নিন্দা করিলেন। চার্চিল তাঁকে শৃগালের মত হীন বলিয়া গালি দিলেন এবং মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট প্রতিবেশীর পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাতের জন্য ধিক্কার দিয়া বলিলেন,

'......the hand that holds the dagger has struck it into the back of its neighbour'.[১]

মুসোলিনীর যুদ্ধ ঘোষণা যেমন অদ্ভুত, ইতালীয় সৈন্যদের লড়াইও ছিল তেমন হাস্যকর। তিনি নিজে ইতালীয় 'সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের' পদ (যদিও শাসনতন্ত্র অনুসারে রাজা এই পদ চাহিয়াছিলেন) গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আসলে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব লইলেন মার্শাল বদোগলিও। ফ্রান্স তখন জার্মানীর হাতে সম্পূর্ণ পরাজিত এবং হিটলারের নিকট সন্ধিপ্রার্থী। কিন্তু সেই অবস্থায়ও ২১শে জুন হইতে ২৪শে জুনের মধ্যে মুসোলিনীর সেনাপতিরা ইতালী-ফরাসী সীমান্তে আক্রমণ চালাইয়া কোন ফললাভ করিতে পারিল না। বোধ হয় অতি কষ্টে ইতালীয় সৈন্যরা ফরাসী রাজ্যের দুই-তিন মাইল অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। কাউণ্ট চিয়ানো তাঁর ডায়েরীতে লিখিয়াছেন, '২১শে জুন তারিখ মুসোলিনীকে অত্যন্ত অপদস্থ বলিয়া মনে হইল। কারণ, আমাদের সৈন্যেরা এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারে নাই। এমনকি, আজও তারা অগ্রসর হইতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ, প্রথম ফরাসী দুর্গের মুখে কিছু বাধা পাওয়ায়, তাদের গতি রুদ্ধ হইয়াছে।' ৯ মাস অপেক্ষা করিবার পর মুমূর্ষু ফরাসীদের সহিত লড়িতে গিয়াও ইতালীর এই অবস্থা। তথাপি মুসোলিনী চাহিয়াছিলেন সমগ্র ফরাসী দেশ দখল করিতে ও সমগ্র ফরাসী নৌ-বহরের আত্মসমর্পণ দাবী করিতে! কিন্তু যুদ্ধটা নেহাৎ হিটলার জিতিয়া গেলেন, সুতরাং সন্ধিসর্তও হিটলার আরোপ করিবেন। মুসোলিনী ইহাতে মর্মাহত। কারণ, রণক্ষেত্রে দীপ্ত গরিমা অর্জনের আজীবন যে স্বপ্ন তাঁর ছিল, তা এভাবে মিলাইয়া গেল। সুতরাং হিটলার, জার্মানী, ইতালীয় সৈন্য ও জনগণ সকলের উপরেই তিনি বিরক্ত হইলেন। ইহাই ইতালীয় যুদ্ধ এবং মুসোলিনীর ব্যক্তিগত জিগীষার রূপ।[২]

১। 'The Second Great War'—Vol, 3. page 959

২। 'Ciano's Diary'—Page 266—67

ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ

১৪ই জুন প্যারিসের পতনের পর ফ্রান্সের প্রতিরোধ কার্যতঃ শেষ হইয়া গেল এবং দুধর্ষ জার্মান বাহিনী তারপর পরাজিত, ছত্রভঙ্গ ও বিশৃঙ্খল ফরাসী সৈন্যদিগকে কেবল তাড়া করিতে লাগিল। পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব ফ্রান্স—মোট ফরাসী রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ পোল্যাণ্ডের অনুরূপ তারা ছাইয়া ফেলিল। উত্তরে সমগ্র ইংলিশ চ্যানেল উপকূল, পশ্চিমে শেরবুর্গ, ব্রেস্ট বন্দর ও নান্‌টেস্‌ (অতলান্তিক মহাসমুদ্রের তীরে) এবং প্যারিস ছাড়াইয়া দক্ষিণবর্তী মধ্য ফ্রান্সের লয়ের নদী ও নেভার্স (২৫শে জুন) পূর্বদিকে ডিজোন, লিয়ঁ ও সুইস সীমানা, আর ম্যাজিনো লাইন দ্বিখণ্ডিত ও দখল হইল মেৎস্‌ ও বেলফোর্টের মধ্যে (১৮ই জুন)। যে ভার্দুন দুর্গ বিগত মহাযুদ্ধের ১৯১৬ সালে ফরাসী দুর্জয় প্রতিরোধের বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা প্যারিসের পতনের পরদিন ১৬ই জুন প্রায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দখল হইয়া গেল। বিদীর্ণ ও বিধ্বস্ত ফ্রান্স আত্মসমর্পণের বার্তা লইয়া হিটলারের দ্বারস্থ হইল। সমগ্র ফরাসী জাতি এবং সারা পৃথিবী স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হইয়া গেল।···

সামরিক বিপর্যয়ের আগেই ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিপর্যয় শুরু হইয়াছিল এবং এক্ষণে রণক্ষেত্রের পরাজয় ফরাসী জাতির সর্বনাশ সম্পূর্ণ করিয়া তুলিল। ১০ই জুন মঃ রেনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের নিকট সাহায্যের জন্য করুণ আবেদন জানাইলেন। ১১ই জুন তিনি চার্চিলের নিকট প্রস্তাব করিলেন বৃটেনের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি হইতে ফ্রান্সকে মুক্তি দিতে, যে প্রতিশ্রুতির দ্বারা বৃটেন ও ফ্রান্স উভয়ে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, পরস্পরের সম্মতি ছাড়া জার্মানীর সহিত পৃথক কোন সন্ধি করা হইবে না এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে এবং যথাসম্ভব সৈন্য ও সমরোপকরণ পাঠাইয়া সাহায্য দিতে প্রস্তুত হইলেন। ১৩ই জুন মঃ রেনো পুনরায় রুজভেল্টের নিকট আবেদন করিলেন, 'অজস্র রণবিমান পাঠাইয়া ইউরোপের দানবীয় শক্তিকে পরাভূত করিবার জন্য' সাহায্য করিতে। ১৫ই জুন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ফ্রান্সের এই ঘোরতর দুর্বিপাকে প্রভূত সহানুভূতি দেখাইয়া এবং যতদিন মিত্র গভর্নমেণ্টসমূহ প্রতিরোধ করিবেন, ততদিন সাহায্য দানের' প্রতিশ্রুতি জানাইয়া টেলিগ্রাম করিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও জানাইলেন যে, সামরিক সাহায্য মঞ্জুরির অধিকার একমাত্র কংগ্রেসের।

১৬ই জুন ফরাসী সৈন্যদলের আর আশা রহিল না এবং লণ্ডনের কর্তৃপক্ষীয় মহলও এই অবস্থা অনুভব করিলেন। তথাপি মিঃ চার্চিল যুদ্ধ চালাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ফরাসী গভর্নমেণ্টের নিকট আফ্রিকা ও সমুদ্র পারবর্তী ফরাসী সাম্রাজ্য হইতে হিটলারের বিরুদ্ধে লড়িবার পরামর্শ দিলেন। তিনি সরকারীভাবে এক চাঞ্চল্যকর নাটকীয় প্রস্তাব পেশ করিলেন, কিন্তু সামরিক অবস্থা আরও খারাপ হওয়াতে উহার দুই দিন আগে ১৪ই তারিখ টুর্স হইতে ফরাসী গভর্নমেণ্ট বর্দোতে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। চার্চিলের এই চাঞ্চল্যকর প্রস্তাবের মর্ম ছিল এই যে, ফ্রান্স ও গ্রেটবৃটেন অতঃপর হইতে একটি মাত্র ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ মিলিত রাষ্ট্রে পরিণত হইবে এবং ফরাসী ও ইংরাজ আর পৃথক দুটি জাতি বলিয়া পরিচিত হইবে না। তাঁরা একত্রে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনৈতিক বিলিব্যবস্থা ইত্যাদি পরিচালিত করিবেন। অতঃপর হইতে

বৃটিশ ও ফরাসী জনগণ পরস্পরের প্রজা ও নাগরিকের পূর্ণ অধিকার পাইবেন। দুইটি পার্লামেণ্টও একটি মাত্র আইনসভায় রূপান্তরিত হইবে এবং একটি মাত্র সমর মন্ত্রিসভা সমগ্র যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন।

জার্মানীর বিরুদ্ধে অব্যাহত যুদ্ধ পরিচালনায় চার্চিলের এই ঐতিহাসিক প্রস্তাব (যাহা আইনের ভাষায় 'অ্যাক্ট অফ ইউনিয়ন' নামে পরিচিত) একটা যুগান্তকারী রাজনৈতিক ঘটনার মত। ফরাসী মন্ত্রিসভায় এই প্রস্তাব লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা প্রত্যাখ্যাত হইল*। ফরাসী মন্ত্রীসভা ১৩-১১ ভোটে (বিরুদ্ধদলের ভোটসংখ্যা লক্ষ্য করিবার মত) অর্থাৎ দুইটি মাত্র ভোটাধিক্যে যুদ্ধবিরতির মারাত্মক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। যদিও প্রধানমন্ত্রী মঃ রেনো এবং তাঁর সমর্থক অন্যান্য মন্ত্রীরা ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ মিলনের প্রস্তাব সমর্থনে এবং যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু বিরোধীরা এই প্রস্তাবের প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন। মার্শাল পেঁতা প্রস্তাবটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলেন না, বরং তাঁরা এর মধ্যে বৃটেনের অভিসন্ধি—অর্থাৎ বৃটেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হাত করার কুমতলব পর্যন্ত আবিষ্কার করিলেন এবং অভিযোগ করিলেন যে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ফ্রান্স বৃটেনের আশ্রিত ও অধীন রাজ্যে পরিণত হইবে। জেনারেল ওয়েগাঁ মার্শাল পেঁতাকে বুঝাইলেন যে, 'হিটলার তিন সপ্তাহের মধ্যেই ইংলণ্ডকে মুর্গীর ছানার (চিকেন) মত ঘাড় মটকাইয়া মারিয়া ফেলিবে!' আর পেঁতা স্বয়ং মন্তব্য করিলেন, বৃটেনের সহিত মিলনের অর্থ 'মৃত দেহের সঙ্গে মিলন'! আর একজন ফরাসী কূটনীতিবিদ বলিলেন, আমরা বরং নাৎসী প্রদেশে পরিণত হইব, তবু ইংলণ্ডের সঙ্গে যাইব না।

এভাবে ফরাসী মন্ত্রিসভার তোষণকামী এবং প্রচ্ছন্ন নাৎসী পক্ষপাতী সদস্যরাই জয়ী হইলেন। তখন প্রধানমন্ত্রী পল রেনোর শরীর ও মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে —ক্রমাগত আঘাতে ও ক্লান্তিতে তিনি অবসন্ন। ঐ দিন রাত্রি ৮টায় তিনি ও তাঁর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলেন। প্রেসিডেণ্ট লেব্রাঁ মার্শাল পেঁতাকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনে আহ্বান করিলেন। ৮৪ বৎসরের বৃদ্ধ মার্শাল পেঁতা প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াই সরকারীভাবে হিটলারের নিকট যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাঠাইলেন স্পেনীয় রাজদূতের মারফৎ। হিটলার সম্মত হইলেন এবং ২২শে জুন ৬-৫০ মিনিটের সময় যুদ্ধবিরতির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। আর ইতালীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল ২৪শে জুন সন্ধ্যাবেলা। মাত্র দেড় মাসের যুদ্ধে সমগ্র পশ্চিম রণাঙ্গন ও তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র চুরমার হইয়া গেল, যেগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটি ছিল পৃথিবীর শক্তির অন্যতম।

কিন্তু এই চুক্তিপত্র যেখানে এবং যেভাবে স্বাক্ষরিত হইল তাহাও এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ২১ বৎসর আগে ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজিত জার্মানীকে মিত্রপক্ষের ফরাসী সর্বাধিনায়ক মার্শাল ফস্ যে কম্পিয়েন্ অরণ্যের যে রেলওয়ে কামরায় নির্দিষ্ট চেয়ারে বসিয়া চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত করিয়াছিলেন, হিটলার সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে সেই অরণ্য এবং সেই রেলওয়ে কামরার একই চেয়ার ও টেবিল (যাহা স্মৃতিচিহ্নরূপে সংরক্ষিত হইয়াছিল) ব্যবহার করিলেন। ২১শে জুন অপরাহ্ণ ৩টায় হিটলার সগৌরবে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং,

* বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ছিল না। ১৬ই মে চার্চিল অতিরিক্ত ৬ স্কোয়াড্রন জঙ্গী বিমানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; ফ্রান্সে তাহা পৌঁছে নাই।—লেখক

জেনারেল কাইটেল, জেনারেল ব্রাউসিৎস, গ্রাণ্ড এডমিরাল র‍্যেডার, ফন রিবেনট্রপ ও ডেপুটি ফুরার রুডলফ্ হেস তাঁকে অভ্যর্থনা করিলেন। জার্মান সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষরূপে কাইটেল যুদ্ধবিরতির ভূমিকা পড়িয়া শুনাইলেন এবং বলিলেন যে, বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়া ফ্রান্স একটি মাত্র শোণিতস্রাবী যুদ্ধেই পরাজিত হইয়াছে। সুতরাং এই প্রকার বীর প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধবিরতির চুক্তিকে তাঁরা কোন 'লজ্জাকর রূপ' দিতে ইচ্ছুক নহেন। (কিন্তু স্বাক্ষরিত চুক্তিতে এই ঔদার্যের কোন প্রমাণ নাই।) পরদিন ২২শে জুন ফ্রান্সের পক্ষ হইতে জেনারল হ্যাণ্টজিগার এবং জার্মানীর পক্ষ হইতে জেনারেল কাইটেল চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত করিলেন।

আত্মসমর্পণের চুক্তি অনুসারে জার্মানী সমগ্র ফ্রান্সের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দখল করিল। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের স্পেনীয় সীমান্ত হইতে টুর্স পর্যন্ত এবং টুর্স হইতে পূর্ব দিকে জেনেভা (সুইজারল্যাণ্ড) পর্যন্ত রেখা টানিলে উপরের দিকে যে সমগ্র অংশ পাওয়া যায়, তাহাই জার্মানীর দখলে গেল। অর্থাৎ জার্মানী ফ্রান্সের প্রায় সমস্ত শ্রমশিল্প ও কৃষিতে উর্বর এলাকা ইংলিশ চ্যানেল ও অতলান্তিক মহাসমুদ্রের সমগ্র উপকূল ও বন্দর এবং ১৭টি প্রধান নগরীর ১০টি দখল করিল। ৪ কোটি ২০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ফরাসী জার্মান শাসনের অধীনে গেল। প্রাক্‌যুদ্ধকালীন ফ্রান্সের লৌহের শতকরা ৯০ ভাগ, বীটের ৯০ ভাগ, কয়লার ৬৬ ভাগ এবং গমের ৫০ ভাগ জার্মানীর অধিকারে গেল। ফ্রান্স দখলের ব্যয়স্বরূপ জার্মানীকে দৈনিক ৮০ লক্ষ ডলার (অঙ্কটা লক্ষ্য করিবার মত) করিয়া দিতে হইবে এবং সমস্ত জার্মান যুদ্ধবন্দী এবং নাৎসীবিরোধী যে সমস্ত জার্মান ফ্রান্সে বা তাঁর সাম্রাজ্যে আশ্রয় প্রার্থীরূপে অবস্থান করিতেছে, তাদের সকলকে জার্মানীর হাতে সমর্পণ করিতে হইবে। নিঃসন্দেহে এমন সর্ত রাষ্ট্রিক মর্যাদার ও অধিকারের বিরোধী। সুতরাং জেনারেল ওয়েগাঁর মত পরাজয়বাদী নেতাও আপত্তি করিলেন, কিন্তু আলোচনার সময় জেনারেল কাইটেল চীৎকার করিয়া বলিলেন—'ওরাই জার্মান জনগণের প্রতি সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, ওদের ফেরৎ দিতেই হইবে।'

এই সমস্ত সর্তের জামীনস্বরূপ হিটলার সমস্ত ফরাসী যুদ্ধবন্দীকে (যাঁদের সংখ্যা ১৫ লক্ষ হইবে) নিজের হাতে রাখিয়া দিলেন। অধিকৃত ফ্রান্সের সমগ্র সামরিক সম্ভার ও দুর্গ ইত্যাদিও জার্মানীর হাতে গেল। স্বাক্ষরিত চুক্তির মধ্যে ফরাসী নৌবহর সংক্রান্ত চুক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই নৌবহর পৃথিবীর অন্যতম সেরা বা চতুর্থ শীর্ষস্থানীয় নৌবহর ছিল। চার্চিল এই নৌবহরের পরিণাম নিয়া অত্যন্ত দুর্ভাবনাগ্রস্ত ছিলেন। কেননা, এই নৌবহরের সঙ্গে যদি ইতালী ও জাপান বা অক্ষশক্তিবর্গের নৌশক্তি একত্রিত হয়, তবে ইংলণ্ডের সমূহ বিপদ ঘটিবে। সুতরাং চার্চিল ফরাসী নৌবহরের প্রধান কর্তা এডমিরাল দারলাঁ এবং ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনেকটা প্যাঁচ কষিয়াছিলেন এই নৌবহর বৃটেনের দখলে বা নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্য। কিন্তু হিটলারও কম ঘুঘু ছিলেন না, তিনি কিছুতেই এটা ঘটিতে দিলেন না এবং ফরাসী নৌবহর সম্পর্কে এই চুক্তি হইল যে, ফরাসী বন্দরে এগুলিকে ফিরাইয়া আনা হইবে। তবে, জার্মানী বা ইতালী কেহই এগুলিকে ব্যবহার করিতে পারিবে না—অবশ্য নৌবহরগুলিকে নিরস্ত্রীকৃত করা হইবে।

(এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ফরাসী নৌবহর সংক্রান্ত এই চুক্তি নাৎসী জার্মানী ভঙ্গ করে নাই। একথা চার্চিলও স্বীকার করিয়াছেন।)

ইতালীর ডুচে মুসোলিনীর খুব সখ ছিল যে, তিনিও হিটলারের সঙ্গে একত্রে ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের দলীলে যৌথ স্বাক্ষরের 'গৌরব' অর্জন করিবেন। কিন্তু মুসোলিনীর কপাল মন্দ, হিটলার রাজী হইলেন না এবং ইতালীর সঙ্গে ফ্রান্সের পৃথক চুক্তি স্বাক্ষরের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ছিল না।

কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ যে, জার্মানীর সঙ্গে স্বাক্ষরিত ফ্রান্সের এই আত্মসমর্পণের দলীল অত্যন্ত কঠোর ছিল। কিন্তু বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের বীর মার্শাল পেতাঁ এই হীন আত্মসমর্পণ স্বীকার করিয়া নিয়া ঘোষণা করিলেন: 'Honour has been saved' অর্থাৎ সম্মান বাঁচিয়াছে!

অষ্টম অধ্যায়

পশ্চিম রণাঙ্গনের চরম যুদ্ধ—৩

একটি বিমান দুর্ঘটনা ও ম্যানস্টাইন প্ল্যান

পশ্চিম রণাঙ্গনের চরম যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে হিটলার সেই আক্রমণের তারিখ বার বার পরিবর্তন করিয়াছেন এবং বার বার ইতস্ততঃ করিয়াছেন! একথা আগেই (পঞ্চম অধ্যায়ের শেষের দিক দ্রষ্টব্য) উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ১০ জানুয়ারী, ১৯৪০ তারিখের একটি অদ্ভুত বিমান দুর্ঘটনার কথা আলোচনা করা হইয়াছে। আমরা জানি বিজ্ঞানের অনেক আশ্চর্য আবিষ্কার আকস্মিক কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা থেকে উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু একটা ঐতিহাসিক যুদ্ধের রণনৈতিক পরিকল্পনাও কোন দুর্ঘটনার জন্য পাল্টাইয়া যাইতে পারে এবং তার ফলাফল অভূতপূর্ব সাফল্যের দ্বারা সুদূরপ্রসারী বা যুগান্তকারী হইতে পারে, এমন ঘটনার কথা কদাচিৎ শুনা যায়। পাঠকবর্গের বোধ হয় মনে আছে যে, জার্মান বিমান বাহিনীর একজন মেজর পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাসহ যখন মুনস্টের থেকে কলোন (মতান্তরে বন্) অভিমুখে যাইতেছিলেন, তখন অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ো আবহাওয়ার জন্য তাঁর বিমান বেলজিয়ামে অবতরণে বাধ্য হয় এবং আক্রমণের দলিলপত্রগুলি মেজর কর্তৃক পোড়াইয়া ফেলার চেষ্টা সত্ত্বেও ঐগুলির অন্ততঃ কিছু অংশ বেলজিয়ান সৈন্যদের হাতে পড়ে এবং বেলজিয়ান ও ডাচ্ কর্তৃপক্ষ সেগুলির মর্ম জানিতে পারেন। এভাবে ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃপক্ষের সেগুলি জানার কথা। কিন্তু সেই সময় জার্মান কর্তৃপক্ষ ঐ দলিলগুলির ভাগ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন না। কিন্তু তাদের গভীর সন্দেহ জাগিয়াছিল। মার্শাল গোয়েরিং তো এই ঘটনায় রাগিয়া টঙ্ হইলেন। কিন্তু হিটলার মাথা ঠান্ডা রাখিলেন। তবে প্রথমে তিনি ভাবিয়াছিলেন অবিলম্বেই আক্রমণ শুরু করিবেন, কিন্তু পরে (১৬ই জানুয়ারী) আক্রমণের মূল পরিকল্পনাই বাতিল করিয়া দিলেন এবং তার পরিবর্তে ম্যানস্টাইন পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। এর ফল একেবারে যুগান্তকারী হইল।[১]

কিন্তু কিভাবে এই ম্যানস্টাইন পরিকল্পনার উদ্ভব হইল?—সেই কাহিনীও কম ঐতিহাসিক ও কম রোমাঞ্চকর নয়। কারণ, সমস্ত প্ল্যানটাই সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল রুণ্ডস্টেডের একজন তরুণ স্টাফ অফিসার এরিক ফন ম্যানস্টাইনের 'উর্বর মস্তিষ্ক সঞ্জাত' ও 'উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত'। পশ্চিম রণাঙ্গনের শ্রেষ্ঠ ট্যাংকযোদ্ধা ও যান্ত্রিক সংগ্রামের কুশলতম সেনাপতি কর্নেল জেনারেল হেইঞ্জ গুডেরিয়ান যিনি এই পরিকল্পনা হাতেকলমে প্রয়োগ করিয়া সামরিক ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন ১৯৫২ সালে তাঁর লিখিত 'প্যাঞ্জার লীডার' নামক বইতে তিনি এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সেখান থেকে কিছুটা উল্লেখ করা হইতেছে:

১। 'History of the Sceone World War'—Liddell Hart ; P. 37

'হিটলারের নির্দেশে আর্মি হাইকমাণ্ড সেই ১৯১৪ সালের বিখ্যাত শ্লিফেন প্ল্যান অনুসারেই পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। পরিকল্পনাটির সারল্যই এর বড় গুণ ছিল। যদিও তেমন অভিনবত্ব ছিল না। এমন সময় একদিন নভেম্বর মাসে (১৯৩৯) ম্যানস্টাইন আমার কাছে এসে হাজির। তিনি আমাকে এই বিষয়ে তাঁর নূতন চিন্তার কথা বলিলেন এবং মোটামুটি তাঁর পরিকল্পনার একটা নক্সা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। এই পরিকল্পনায় তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গের দক্ষিণ দিক দিয়া এক প্রচণ্ড ট্যাঙ্ক আঘাত হানিতে হইবে এবং এই অঞ্চলে ম্যাজিনো লাইনের বর্ধিত দিকটা বিদ্ধ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে এবং এখানকার সমগ্র ফরাসী রণাঙ্গনকে এভাবে বিদীর্ণ করিরা দুই টুকরা করিয়া ফেলিতে হইবে।

'একজন ট্যাঙ্ক-বিশারদ হিসাবে তিনি আমাকে পরিকল্পনটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিলেন। আমি তখন সেই অঞ্চলের মানচিত্র গভীরভাবে অনুধাবন করিলাম এবং বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে এই অঞ্চলের ভুপ্রকৃতি সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা ছিল, তা মিলাইয়া দেখিয়া আমি ম্যানস্টাইনকে এই নিশ্চিত ভরসা দিলাম যে, তাঁর এই পরিকল্পনা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তবে, উহার একমাত্র সর্ত এই যে, যথেষ্ট পরিমাণ সাঁজোয়া এবং মোটরায়িত ডিভিসনগুলিকে এবং সম্ভব হইলে সমস্ত গুলিকেই প্রয়োগ করিতে হইবে।

'আমার এই মতামত শুনিবার পর ম্যানস্টাইন এই বিষয়ে একটা মেমোরেণ্ডাম লিখিয়া ফেলিলেন এবং কর্নেল জেনারেল ফন রুণ্ডস্টেডের স্বাক্ষর ও সম্মতিসহ তিনি এটা আর্মি হাইকমাণ্ডের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৯। বলাই বাহুল্য যে, তাঁরা এই পরিকল্পনা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিলেন না। তাঁরা রণক্ষেত্রের প্রস্তাবিত অংশে মাত্র এক বা দুইটি যান্ত্রিক ডিভিসন প্রয়োগ করিতে চাহিলেন। কিন্তু আমি প্রবল আপত্তি তুলিলাম। কারণ, এই ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বল ট্যাঙ্ক শক্তিকে আরও টুকরা করিরা ফেলিলে মারাত্মক ভুল হইবে। কিন্তু হাইকমাণ্ড কিছুতেই রাজী নন। এদিকে ম্যানস্টাইন জেদ করিতে লাগিলেন। ফলে হাইকমাণ্ড তাঁর উপর এমন চটিয়া গেলেন যে, তাঁকে ট্যাঙ্ক বহিনী থেকে নামাইয়া একটি পদাতিক বাহিনীর (ইনফ্যানট্রি কোর্) কমাণ্ডিং জেনারেল করিয়া দেওয়া হইল। এর ফলে আমাদের রণক্রিয়ার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মস্তিষ্ককে (ফাইনেস্ট অপারেশন্যাল ব্রেন) আক্রমণের তৃতীয় তরঙ্গে অংশ গ্রহণ করিতে হইল, যদিও অনেকাংশে তাঁরই 'অপূর্ব উদ্যোগের' (ব্রিলিয়াণ্ট ইনিশিয়েটিভ্) জন্যই এই প্রস্তাবিত আক্রমণ এক অপূর্ব সাফল্য অর্জন করিয়াছিল।

'কিন্তু একটা দুর্ঘটনার জন্য আমাদের প্রভুরা শ্লিফেন প্ল্যান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইতিমধ্যে ম্যানস্টাইন নূতন কোর্ কমাণ্ডাররূপে হিটলারের নিকট যখন হাজিরা দিলেন, তখন তিনি সেই সুযোগে তাঁর পরিকল্পনার কথা বলিলেন। এভাবে ম্যানস্টাইন প্ল্যান গভীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখার সিদ্ধান্ত হইল। ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০, কোবলেঞ্জে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারী মারানে—পর পর দুইবার এই পরিকল্পনার মহড়া দেওয়া হইল। কিন্তু আর্মি জেনারেল স্টাফের প্রধান জেনারেল হ্যালডার সেডানের নিকট মিউজ নদী জোরপূর্বক পার হওয়া এবং যান্ত্রিক বাহিনীগুলির সাহায্যে

ফরাসী ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া আমিয়েঁর দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টাকে 'নির্বোধ' চিন্তা বলিয়া আপত্তি করিলেন।...

'এভাবে হাইকমাণ্ডের নেতাদের সঙ্গে বহু তর্ক-বিতর্ক এবং প্রভূত আলোচনা হইল। একমাত্র হিটলার, ম্যানস্টাইন ও আমি নিজে ছাড়া এই পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে আর কাহারও বিশ্বাস ছিল না। সমগ্র পরিকল্পনা হিটলারকে বুঝাইয়া দিয়া আমি বলিয়াছিলাম যে, আক্রমণের পঞ্চম দিনে আমি মিউজ নদী পার হইব এবং ঐ দিন সন্ধ্যায়ই নদীর ওপারে সেতুমুখ স্থাপন করিব। তখন হিটলার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিন্তু নদী পার হয়ে তুমি কি করবে?' তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁর মাথায় এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি আসিয়াছিল—

"He was the first person to ask me this vital question!"

'আমি জবাব দিলাম যে, আমি আমার অগ্রগতি বজায় রাখিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া যাইব। তবে, সুপ্রিম কমাণ্ড অবশ্যই স্থির করিবেন আমার লক্ষ্য আমিয়েঁ হওয়া উচিত, কিংবা প্যারিস? তবে, আমার মতে যথার্থ পথ হওয়া উচিত আমিয়েঁ পার হইয়া ইংলিশ চ্যানেলের দিকে চলে যাওয়া।

'হিটলার মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন এবং আর কোন মন্তব্য করিলেন না।'[১]

যে কোন দুঃসাহসিক এবং বেপরোয়া পরিকল্পনাই হিটলারকে আকর্ষণ করিত। সুতরাং ম্যানস্টাইনের এই পরিকল্পনায়ও তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং অনুমোদন করিলেন—যদিও জড্ল, ব্রাউসিৎস প্রমুখ অনেক জেনারেল এর গুরুতর বিপদের ঝুঁকি সম্পর্কে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এতদিনে হিটলার নিজেকে একজন সামরিক প্রতিভা (মিলিটারি জিনিয়াস্) বলিয়া মনে করিতে শুরু করিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াইল যে, এই ম্যানস্টাইন পরিকল্পনাকে তিনি তাঁর নিজের চিন্তপ্রসূত বলিয়াই ভাবিতে লাগিলেন! সোজা কথায় পরের পরিকল্পনা আত্মসাৎ করিয়া নিজের বলিয়া চালাইতে লাগিলেন! (লীডেল হার্ট, উইলিয়াম শাইরার ও আলান বুলক প্রমুখ বিখ্যাত সামরিক ইতিহাস লেখকেরাও একথার উল্লেখ করিয়াছেন।) বলাই বাহুল্য যে, হিটলারের অনুমোদনের পর জেনারেল হ্যালডার, যিনি এটাকে গোড়ার দিকে উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত বলিয়া প্রায় অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তিনিও এই পরিকল্পনাকে এখন লুফিয়া নিলেন এবং জেনারেল স্টাফের অফিসারেরা এর প্রভূত পরিবর্জন-পরিবর্ধন করার পর এটি সরকারীভাবে গৃহীত এবং নির্দেশ হিসাবে প্রচারিত হইল—২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০। এবং এই পরিকল্পনা অনুসারে ৭ মার্চের মধ্যে সৈন্যবাহিনীগুলির পুনর্বিন্যাস করার হুকুম জারী হইল।

অবশ্য বিমান দুর্ঘটনার আগে পশ্চিম রণাঙ্গনের আক্রমণের এই নক্সার সাঙ্কেতিক নাম ছিল 'কেস্ ইয়েলো' এবং বিমান দুর্ঘটনার পর পরিবর্তিত এই পরিকল্পনা লইয়া জার্মান জেনারেলদের মধ্যে বহু বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। সেই বিতর্কের মূল কথা ছিল—এটা কি সেই প্রথম মহাযুদ্ধের বিখ্যাত জার্মান পরিকল্পনা শ্লিফেন প্ল্যানেরই পরিবর্তিত সংস্করণ? হ্যালডার এবং গুডেরিয়ান প্রমুখ সেনাপতিরা সেকথাই বলেন। শ্লিফেন প্ল্যান অনুসারেও জার্মান বাহিনী কর্তৃক বেলজিয়াম ও উত্তর ফ্রান্সের মধ্য

দিয়া আগাইয়া গিয়া ইংলিশ চ্যানেলের বন্দরশহরগুলি দখলের কথা ছিল। কিন্তু তারপর চক্রাকারে ঘুরিয়া গিয়া সীন নদী পার হইয়া পূর্বদিকে প্যারিসের নীচে গিয়ে বাকী ফরাসী বাহিনীগুলিকে ধ্বংস করার কথা ছিল। কিন্তু সেবার অল্পের জন্য শ্লিফেন প্ল্যান সফল হইতে পারে নাই। এবার ম্যানস্টাইন প্ল্যান অনুসারে জার্মানীর প্রধান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হওয়ায় কথা আর্দেনিস পার্বত্য এলাকার মধ্যবর্তী অংশে এবং তারপর সেডানের উত্তরে মিউজ নদী পার হইয়া ফ্রান্সের খোলা প্রান্তরে প্রকাণ্ড সাঁজোয়া ও যান্ত্রিক বাহিনীসহ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এবং ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীকে বিদীর্ণ করিয়া ইংলিশ চ্যানেলের দিকে ধাবমান হওয়া, যে কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। হিটলারের জেনারেলদের মধ্যে পারস্পরিক পেশাগত ঈর্ষা ছিল, ম্যানস্টাইনের (অপেক্ষাকৃত জুনিয়র অফিসার) অভিনব পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচরণের অন্যতম কারণও তাই ছিল। কিন্তু জেনারেল রুণ্ডস্টেড্ এই পরিকল্পনার উপর খুব ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তিনি এটা খুব পছন্দ করিতেন বলিয়াই নয়, বিশেষভাবে এজন্য যে, এই আক্রমণাত্মক অভিযানে তাঁর 'আর্মি গ্রুপ' (যাঁর তিনি সর্বাধিনায়ক ছিলেন) মুখ্য এবং চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করিবে। ফলে, তাঁর নেতৃত্বাধীন আর্মি একটা বড় কীর্তি অর্জনের সুযোগ পাইবে।

এই নূতন পরিকল্পনা হাইকমাণ্ডের আশীর্বাদ লাভ করা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে কিন্তু স্বয়ং সুপ্রীম কমাণ্ডার হিটলারেরও আতঙ্ক হইয়াছিল। গুপ্ত দলিলপত্রে দেখা যায় যে, ১ মে তারিখ তিনি হুকুম দিয়াছিলেন ৫ মে আক্রমণের জন্য, কিন্তু আবহাওয়ার দোহাই দিয়া ৩ মে তারিখ উহা স্থগিত রাখিলেন ৬ মে পর্যন্ত এবং তার পর ৭ মে, গোয়েরিং চাহিলেন অন্ততঃ ১০ মে পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে এবং শেষে ৮ মে 'উত্তেজিত ফুয়ার' স্থির করিলেন ১০ মে আক্রমণ চালাইতেই হইবে, আর একদিনও বিলম্ব না।[১]

ফিনক্কেনক্রুগ থেকে হিটলার হাইকমাণ্ডের কাইটেল, জড্ল প্রমুখ শীর্ষ সামরিক নেতাদের সঙ্গে ৯ মে বিকেল পাঁচটায় ট্রেনযোগে রওনা হইলেন সীমান্তের সদর দপ্তরের দিকে—এই দপ্তরের তিনি নাম দিয়াছিলেন ফেলসেনেস্ট, এটি মুয়েনস্টারইফেল সহরের নিকট। ১০ মে ভোর হওয়ার ঠিক আগে উত্তর সমুদ্র থেকে ম্যাজিনো লাইন পর্যন্ত ১৭৫ মাইল রণাঙ্গনে নাৎসী সৈন্যেরা হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, লাক্সেমবুর্গ তিনটি দেশের বারংবার ঘোষিত ও স্বাক্ষরিত নিরপেক্ষতার চুক্তিকে চূর্ণ করিয়া আক্রমণের তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিল।...

কিন্তু হিটলারের বিরুদ্ধেও গোয়েন্দাগিরি ছিল, বৈরিতা ছিল,। (এমনকি ১০ জানুয়ারীর সেই ঐতিহাসিক বিমান দুর্ঘটনার মূলেও খোদ গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা—এডমিরাল ক্যানারিসের কোন কারসাজি ছিল কিনা, অন্ততঃ রণপণ্ডিত লিডেল হার্ট সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় নন।—তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।) কর্নেল ওস্টার ছিলেন নাৎসীবিরোধী ষড়যন্ত্রের একজন পাণ্ডা। তাঁর সঙ্গে বার্লিনের ওলন্দাজ দূতাবাসের মিলিটারি এ্যাটাসে কর্নেল জি জে সাস্ নামে একজন অফিসারের খুব অন্তরঙ্গতা ছিল এবং তিনিই ৯ মে তারিখ কর্নেল সাসকে বলিয়াছিলেন—"শূকরের বাচ্চাটা পশ্চিম রণাঙ্গনে গিয়াছে।" 'শূকরের বাচ্চা' অর্থে

১। The Rise & Fall of the Third Reich—William L. Shirer ; Page 860-63.

এখানে হিটলার। সুতরাং কিছুক্ষণের মধ্যেই এই গোপন সংবাদ সাসের চেষ্টায় বেলজিয়ান ও ডাচ কর্তাদের কানে পৌঁছিল। অবশ্য এর দ্বারা যুদ্ধের ফলাফলের কোন তারতম্য হইল না।

* * *

১০ মে যে আক্রমণ শুরু হইল, তখনকার দিনের ইতিহাসে এত বড় বিদ্যুৎগতি যান্ত্রিক আক্রমণ আর অনুষ্ঠিত হয় নাই। একেবারে পরিকল্পনা মাফিক, এমনকি তার চেয়েও নিখুঁত এবং দ্রুতগতিতে জার্মান বাহিনীগুলি আগাইয়া যাইতে লাগিল, আর পাঁচ দিনের মধ্যেই ইঙ্গ-ফরাসী বা মিত্র বাহিনীর সংকট চরম আকারে দেখা দিল। ১৫ মে সকাল সাড়ে সাতটায় তখনও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ঘুম থেকে ওঠেন নাই। তাঁর শোয়ার ঘরে বিছানার পাশে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। প্যারিস থেকে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী পল রেনোর আর্ত কণ্ঠস্বর শুনা গেল ঃ

'আমরা পরাজিত হয়েছি, আমরা হেরে গেছি!'—এই কথাগুলি পশ্চিম রণাঙ্গনের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু চার্চিল যেন একথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যে ফরাসী বাহিনী ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির ঐতিহ্যবাহী সেই বাহিনী এত দ্রুত হারিয়া গেল? ১৬ মে চার্চিল প্লেনযোগে উড়িয়া গেলেন প্যারিসে, সেখানে প্রধানমন্ত্রী রেনো এবং প্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্যামেলার সঙ্গে দেখা হইল। জেনারেল মহাশয় চার্চিলকে সেডান রণক্ষেত্রের ছত্রভঙ্গ অবস্থা, যার ফলে ফরাসী বাহিনী বিধ্বস্ত—এই অবস্থায় জার্মান বাহিনী চ্যানেলের দিকে কিংবা প্যারিসের দিকে ছুটিতে পারে—এই গুরুতর কথাগুলি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বলিয়া ফেলিলেন।

খানিক নিস্তব্ধতার পর চার্চিল ফরাসী ভাষায় জেনারেল গ্যামেলাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনার স্ট্র্যাটেজিক্ রিজার্ভ বা রণনৈতিক মজুত বাহিনী কোথায়?'

(চার্চিল লিখিয়াছেন যে, এই আলোচনার সময়েই তিনি জানালা দিয়া দেখিলেন যে মন্ত্রিভবনের বাগান থেকে ধোঁয়া উঠিতেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দলিলপত্র পোড়ানো হইতেছে। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই প্যারিস পরিত্যাগের পরিকল্পনা শুরু হইয়াছে।)

গ্যামেলাঁ চার্চিলের দিকে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'রিজার্ভ কিছু নাই!'

এই উত্তর শুনিয়া চার্চিল 'স্তম্ভিত' হইয়া গেলেন এবং লিখিয়াছেন—

—'আমার জীবনে পরমতম বিস্ময় বোধের এটি ছিল অন্যতম, একথা আমি সরল-ভাবেই স্বীকার করিব।'…

এই 'পরম বিস্ময়' একটির পর একটি করিয়া পশ্চিম রণাঙ্গনে ঘটিয়া যাইতে লাগিল এবং ১৯ মে সকালবেলা চ্যানেলের দিকে ধাবমান ৭টি আর্মার্ড ডিভিসন প্রথম মহাযুদ্ধের সেই বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রগুলি (ফ্লান্ডার্সের) অতিক্রম করিয়া গেল এবং ২০ মে সন্ধ্যাবেলা জেনারেল গুডেরিয়ানের ট্যাংক বাহিনীর হাতে আবেভিল বন্দর দখল হইয়া গেল। আর বেলজিয়ান, বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনীগুলি সেই ফাঁকে বেষ্টিত হইয়া পড়িল।

বিস্মিত হিটলার আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

কিন্তু গুডেরিয়ানের ট্যাঙ্ক অভিযানের জাঁতাকলের মধ্যে পড়িয়া যখন মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা চূর্ণ হইতে লাগিল এবং ইংলিশ চ্যানেলের বন্দরগুলি একে একে পাকা ফলের মত হাতের মুঠায় আসিতে লাগিল, তখন বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনীর ডানকার্ক থেকে পলায়নের সেই অঘটন ঘটিল কিরূপে? যুদ্ধের সেই নাটকীয় মুহূর্তগুলিতে আসল কারণটা জানা যায় নাই। কিন্তু পরে জানা গিয়াছে যে, প্রথমে ১৭ মে উর্ধ্বতন কর্তাদের নিকট থেকে জেনারেল গুডেরিয়ানের নিকট নির্দেশ আসে আর চ্যানেলের দিকে অগ্রসর না হওয়ার জন্য। কিন্তু গুডেরিয়ান এতে একেবারে অবাক হইয়া যান (তাঁর পুস্তকে লিখিত বক্তব্য অনুসারে)। কারণ, তাঁর ধারণা ছিল যে, ম্যানস্টাইন প্ল্যান যখন গৃহীত হইয়াছিল, তখন হিটলারের সঙ্গে তার কথা অনুসারে তিনি চ্যানেলের দিকে অব্যাহত গতিতে আগাইয়া যাওয়ার অধিকারী। সুতরাং প্যাঞ্জার গ্রুপের অধিনায়ক জেনারেল ফন ক্লাইস্টের সঙ্গে এই নিয়া তাঁর বিরোধ দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি পদত্যাগ করেন। পরে অবশ্য আর্মি গ্রুপের সর্বাধিনায়ক জেনারেল রুন্ডস্টেডের হস্তক্ষেপের ফলে তিনি পুনরায় তাঁর সৈনাপত্য (কমান্ড) গ্রহণ করেন। কিন্তু আবার বিভ্রাট দেখা দিল। এবার ২৪ মে একেবারে খোদ সুপ্রীম কমান্ড থেকে হুকুম আসিল আর ডানকার্কের দিকে অগ্রসর না হওয়ার জন্য। স্বয়ং হিটলার এই হুকুম জারি করিয়াছেন। অতএব ডানকার্কের দিকে অগ্রগতি স্তব্ধ করিয়া দিতে হইল।

এই আদেশ পাইয়া গুডেরিয়ান স্তব্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেলেন। কারণ, এমন আদেশের কোন মাথামুণ্ডু বুঝা গেল না। হিটলার অবশ্য পরে বলিয়াছিলেন যে, ফ্লান্ডার্স অঞ্চলের অসংখ্য ক্যানেল ও ডিচ্ (খাদ) ইত্যাদির জন্য ট্যাঙ্কের পক্ষে অগ্রগতি সম্ভব ছিল না। কিন্তু এটা বাজে ওজর বলিয়া প্রতিভাত হইল।

২৬ মে অপরাহ্নে হিটলার অবশ্য আবার অনুমতি দিলেন ডানকার্কের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য। কিন্তু তখন অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। সেই সুযোগে বৃটিশ সৈন্যেরা চ্যানেল পার হইয়া গেল। জার্মান বাহিনী দূর থেকে সেটা দেখিলেন। অর্থাৎ ডানকার্ক থেকে বৃটিশ সৈন্যদের এভাবে পরিত্রাণ মোটেই সম্ভব হইত না, যদি না সুপ্রীম হেড্‌কোয়ার্টার্স ১৯নং আর্মি কোরকে তাদের গতিপথে থামাইয়া না দিতেন। কিন্তু হিটলারের নার্ভাস্‌নেসের জন্যই মূল্যবান সুযোগ নষ্ট হইয়া গেল।[১]

কিন্তু গুডেরিয়ানের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। কারণ, আর্মি গ্রুপের প্রধান অধিনায়ক জেনারেল রুন্ডস্টেডও এর জন্য সমভাবে দায়ী ছিলেন। তিনিই অগ্রসরমান যান্ত্রিক বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতির দিকে তাকাইয়া কিছুটা দম লইবার জন্য এই পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং হিটলার তাতে রাজী হইয়াছিলেন। অবশ্য বিমানবাহিনীর অধিনায়ক গোয়েরিংয়ের আত্মম্ভরিতাও হিটলারের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কারণ, গোয়েরিং চাহিয়াছিলেন উপকূল ভাগের দিকে ফাঁদে পড়া শত্রু-সৈন্যদিগকে তাঁর বিমান বাহিনীর দ্বারা সাবাড় করিতে।

কিন্তু রণপণ্ডিত লিডেল হার্ট বলিয়াছেন যে, এই ঐতিহাসিক ও বিতর্কমূলক নির্দেশের পিছনে একমাত্র সামরিক কারণ ছিল না, আসলে ছিল রাজনৈতিক কারণ। ২৪ মে তারিখ হিটলার ও রুন্ডস্টেডের মধ্যে সাক্ষাতের ব্যাপার সম্পর্কে রুন্ডস্টেডের

১। Decisive Battles of the Second World War—Peter Young ; page 42-43

রণক্রিয়ার প্রধান অধ্যক্ষ জেনারেল গুয়েনথার ব্লুমেনট্রিট্ লীডেল হার্টের নিকট (যুদ্ধের পর) যা বলিয়াছিলেন, তার মর্ম এই :

'হিটলার খুব উল্লসিত ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস এই অভিযানে একটা মিরাক্যাল্ ঘটিয়া গিয়াছে এবং যুদ্ধ ছয় সপ্তাহের মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে। তারপর ফ্রান্সের সঙ্গে একটি যুক্তিসঙ্গত শান্তি-সন্ধি করার পর বৃটেনের সঙ্গে চুক্তি করারও অবাধ সুযোগ পাওয়া যাইবে।

'অতঃপর হিটলার বৃটিশ সাম্রাজ্যের এমন গুণগান করিলেন যে আমরা অবাক হইলাম। তাঁর মতে বৃটেন পৃথিবীতে একটা নূতন সভ্যতা আনিয়াছে।...

'উপসংহারে তিনি বলিলেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য হইতেছে, বৃটেনের সঙ্গে একটা সম্মানজনক সন্ধি করা।'

সুতরাং ইতিহাসের বিচারে ডানকার্ক থেকে বৃটিশ সৈন্যের পরিত্রাণ কোন 'মিরাক্যাল্' ছিল না, জার্মান হাইকমাণ্ডের ভুলের জন্যই এটা ঘটিয়াছে এবং যে ভুল বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক হিটলারী যুদ্ধের একটা 'মেজর মিস্‌টেক্' বা বড় রকমের ভুল বলিয়া স্বীকৃত।

* * *

ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে বিপর্যয় ও প্যারিস নগরীর আত্মসমর্পণের সময় (১৮নং জার্মান বাহিনীর অধিনায়ক জেনালের ফন কুয়েচলার ১৪ জুন এই মহানগরী দখল করিয়া বিখ্যাত ইফেল টাওয়ারের উপর স্বস্তিক পতাকা উড়াইয়াছেন) অনেক নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ হইয়াছিল, যেগুলির বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে, একটি ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে ঐতিহাসিক কারণে। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পর জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম নির্বাসিতরূপে হল্যাণ্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁর কথা বাইরের জগতে কাহারও স্মরণে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ হিটলারী দিগ্বিজয়ে উৎফুল্ল হইয়া হল্যাণ্ডের ডুর্ন শহর থেকে নির্বাসিত কাইজার ১৯৪০, ১৭ জুন তারিখে হিটলারের উদ্দেশ্যে এক উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জ্ঞাপক টেলিগ্রাম পাঠাইলেন—যে হিটলারকে তিনি এতদিন 'একটা ভুঁইফোড় চাষাড়ে' লোক বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন। যুদ্ধের পর এই অভিনন্দন ধৃত নাৎসী কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। অভিনন্দনের ভাষা ছিল নিম্নরূপ :

"Under the deeply moving impression of the capitulation of France I congratulate you and the German Wehrmacht on the mighty victory granted by God, in the words of the Emperor Willhelm the Great in 1870 : what a turn of events brought about by divine dispensation......"

প্রাক্তন জার্মান সম্রাট এই তারবার্তায় সম্ভবতঃ একটু ভুল করিয়াছিলেন। কারণ, জার্মানীর এত বড় জয়ের জন্য তিনি হিটলারী প্রতিভার কোন উল্লেখই করিলেন না, একমাত্র ভগবানের কৃপার উপর দোহাই দিলেন। সুতরাং হিটলার নমো নমো করিয়া যে জবাবের খসড়া তৈয়ার করিয়াছিলেন, তা আদৌ পাঠানো হইয়াছিল কিনা, সন্দেহজনক। কারণ, নথিপত্রে তার কোন প্রমাণ নাই।

১। লীডেল হার্ট—পৃঃ ৮৩

কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম ডুর্ন শহরে মারা যান পরের বছর ৪ জুন, ১৯৪১। কিন্তু তাঁর এই মৃত্যু জার্মানীতে কেউ খেয়াল করেন নাই।

হিটলারের প্রতিশোধ

পশ্চিম রণাঙ্গনে অভূতপূর্ব জয়লাভের পর হিটলার প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের প্রতিশোধ কিভাবে নিয়াছিলেন, আগের অধ্যায়ে তা' খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ঘটনাটা এত ঐতিহাসিক এবং নাটকীয় যে, এখানে সেই রোমাঞ্চকর কাহিনীর কিছুটা উদ্ধৃত করা যাইতেছে···

হিটলার আগেই ঠিক করিয়াছিলেন যে, সেই কম্পিয়ন অরণ্যের ঠিক সেই স্থানেই ফ্রান্সের যুদ্ধবিরতির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে, যেখানে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। স্থানটি হইতেছে প্যারিসের ৪৫ মাইল উত্তরে এবং কম্পিয়ন শহরের ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। মার্শাল ফস্ ১৯১৮ সালের যুদ্ধবিরতির চুক্তিপত্র যে রেলওয়ে কামরায় (ওয়াগন সীট্) বসিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, কম্পিয়ন অরণ্যের একটি জায়গায় সযত্নে নির্মিত মিউজিয়ামের মধ্যে সেটি রক্ষিত ছিল। ১৯শে জুন অপরাহ্ণে জার্মান মিলিটারি ইঞ্জিনীয়াররা সেই মিউজিয়ামের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া রেলওয়ে কামরাটি বাহির করিলেন এবং ঠিক ১৯১৮ সালের যথাস্থানে ওটি পুনরায় স্থাপন করিলেন। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী (বিখ্যাত মার্কিণ সাংবাদিক উইলিয়াম শাইরার) লিখিয়াছেন যে, তখন জুন মাসের চমৎকার গ্রীষ্ম, স্থানটি বড় বড় ওক, সাইপ্রাস, পাইন ইত্যাদি গাছের নিবিড় ছায়ায় বড় রমণীয়। এখানে একটি প্রকাণ্ড রাস্তার শেষে ছিল আলসাস-লোরেনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত একটি মনুমেণ্ট—জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতীকীস্বরূপ দেখানো হইয়াছে একটি খোঁড়া ঈগল পাখী, যাকে বিদ্ধ করিতেছে মিত্রশক্তির প্রতীক-তুল্য একটি বৃহৎ তরোয়াল এবং তাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ ছিল :

"To the heroic soldiers of France, defenders of our country and of right, glorious liberators of Alsace-Lorraine".

১০ জুন অপরাহ্ন ঠিক ৩-১৫ মিনিটে হিটলার গোয়েরিং, কাইটেল প্রভৃতি শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড মার্সেডিজ বেন্ গাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁর পরনে ইউনিফর্ম ও বুকে আইরন ক্রশ ঝুলানো ছিল এবং তিনি ওই মনুমেণ্টের প্রতি তাকাইয়া দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডল গম্ভীর এবং প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় যেন রক্তিম হইয়া উঠিল, বিজয়ীর ঔদ্ধত্য এবং দম্ভও তাঁর প্রতি পদক্ষেপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কিন্তু যখন তিনি আগাইয়া গিয়া আর একটি প্রস্তর ফলকে ফরাসী ভাষায় নিম্নলিখিত কথাগুলি নিঃশব্দে পড়িলেন···

"Here on the eleventh day of November, 1918, succumbed the criminal pride of the German Empire vanquished by the free peoples which it tried to enslave.···"

তখন তাঁর (হিটলারের) মুখে যে ঘৃণার অভিব্যক্তি দেখা গেল, তার কোন তুলনা নাই। তাঁর চোখের দৃষ্টিপাতেও যেন 'মাস্টারপিস অফ কনটেম্পট্'।[১]···

১। উইলিয়াম এল শাইরার প্রণীত—'দি রাইজ্ এণ্ড ফল্ অব দি থার্ড রাইখ'; পৃঃ ৮৮৬

(হিটলারের আদেশে তিনদিন পর সেই প্রস্তর ফলকটি চূর্ণ করিয়া ফেলা হইল ।)

তারপর হিটলার সেই রেলওয়ে কামরায় ১৯১৮ সালের মার্শাল ফসের ব্যবহৃত সেই আসনে গিয়াই বসিলেন। জার্মান ও ফরাসী প্রতিনিধি দলের মধ্যে নিয়মমাফিক কায়দাকানুন অনুষ্ঠিত হইল। তখন হিটলারের নির্দেশে জেনারেল কাইটেল যুদ্ধবিরতি চুক্তির ভূমিকা পড়িয়া শুনাইলেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে ঠিক ২৭ মিনিট সময় লাগিল—যদিও এর পরেও উভয় পক্ষে যুদ্ধবিরতির আলোচনায় ২৭ ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

হিটলার তাঁর মূল্যবান সময় আর নষ্ট করিলেন না। বিজয়ীর দর্পে গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। আর বিমর্ষ ও বিপর্যস্ত ফরাসী প্রতিনিধি দল কাছেই একটি তাঁবু থেকে বিশেষভাবে নির্মিত টেলিফোনের সাহায্যে ফরাসী সরকারের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির কঠোর সর্তগুলি নিয়া কিছুক্ষণ আলোচনা করিলেন।...

এভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের যুদ্ধবিরতির উপর আর একটি কৃষ্ণ যবনিকা নামিয়া আসিল। সামরিক দিক থেকে এর মূলে ছিল ম্যানস্টাইন প্ল্যানের সার্থক প্রয়োগ।

নবম অধ্যায়

পশ্চিম রণাঙ্গনের রণকৌশল

রণক্রিয়ার যুগান্তকারী পরিবর্তন

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মে ও জুন মাসে ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানী বিদ্যুৎ-গতিতে যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করিল এবং যার ফলে ইতিহাসের মোড় ফিরিয়া গেল, উহার পিছনে রণনীতি ও রণকৌশলের কি বৈশিষ্ট্য ছিল, তা সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। যদিও পোল্যাণ্ডে এবং নরওয়েতে জার্মানীর আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের কৌশল ইতিপূর্বেই উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তথাপি সেই দেশগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও দুর্বল ছিল বলিয়া জার্মান রণক্রিয়ার অভিনবত্ব পৃথিবীব্যাপী সামরিক মহলকে ততখানি ব্যগ্র, উৎসুক ও বিস্মিত করিয়া তোলে নাই। কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনের এতগুলি বিখ্যাত শক্তির বিরুদ্ধে মাত্র কয়েকদিনের যুদ্ধের ফলে জার্মানীর এই অভূতপূর্ব জয়লাভ দুনিয়ার লোককে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিল। এখানে স্মরণীয় যে, হিটলার ২৬ দিনে পোল্যাণ্ড, ২৮ দিনে নরওয়ে, ২৪ ঘণ্টায় ডেনমার্ক, ৫ দিনে হল্যাণ্ড, ১৮ দিনে বেলজিয়ান এবং ৩৫ দিনে ফ্রান্স সম্পূর্ণ জয় ও দখল করিয়া নিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত যুদ্ধে পরাজিত পক্ষের মূল প্রতিরোধ মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী যুগে ফ্রান্সের বিখ্যাত ম্যাজিনো লাইনের কথা আজ প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেদিন পৃথিবী ইহার বিজ্ঞাপনে ও প্রচারকার্যে অস্থির ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের কালেই উত্তর সমুদ্রের তীর হইতে সুইজারল্যাণ্ডের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশ ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গন নামে প্রসিদ্ধ। ফ্রান্সের পূর্ব সীমানায় সুইস সীমান্ত হইতে লাক্সেমবুর্গের মন্তমিদি পর্যন্ত ছিল আসল ম্যাজিনো লাইন। তারপর সেখান হইতে ফরাসী-বেলজিয়াম সীমানা ধরিয়া এই লাইন বিস্তৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহা আসল লাইনের মত ততটা পাকা দৃঢ় ও দুর্গায়িত ছিল না। লর্ড গোর্টের 'ডেসপ্যাচে'ও দেখা যায় যে, উহা ছিল কার্যতঃ একপ্রকারের ট্যাঙ্কমারা ফাঁদ মাত্র, এবং গভীর কতকগুলি খাদ যেগুলি 'ব্লক হাউসে'র দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল—

—'an almost continuous anti-tank obstacle in the form of a ditch covered by concrete block houses"[১]

কিন্তু আসল ম্যাজিনো লাইন তৈয়ার হইয়াছিল ১৯২৯-৩৫ সালে, তদানীন্তন ফরাসী সমরসচিব মঃ ম্যাজিনোর নির্দেশে। তারপরেও ক্রমাগত ইহার শক্তিবৃদ্ধি করা হইয়াছে। বহু সহস্র কোটি টাকা ব্যয়ে (মার্কিন সামরিক মহলের মতে প্রতি মাইলে ২০ লক্ষ ডলার!) সামরিক ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার চরম বিস্ময়রূপে ইহা মানুষের ইতিহাসের 'দুর্ভেদ্যতম' দুর্গমালারূপে প্রচারিত হইল। প্রায় ২০০ মাইল লম্বা স্থানে

১। This Expanding War—by Liddell Hart ; Page 196.

স্থানে ইহা ১০ হইতে ৪০ মাইল পর্যন্ত চওড়া ছিল। প্রায় হাজার খানেক কেল্লা লইয়া এই লাইন ভুগর্ভ হইতে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং বলা যাইতে পারে যে, পাতাল-পুরীতে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল শহর। রেলপথ, বৈদ্যুতিক শক্তির আধার এবং সমস্ত প্রকার অস্ত্রসজ্জা দ্বারা এর পূর্ণতা বিধান করা হইয়াছিল। বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজ মাটিতে পুঁতিলে যে অবস্থা দাঁড়ায়, এর কেল্লা, পিলবক্স, ট্যাঙ্কফাঁদ ও কামান সংস্থাপনের বিন্দুগুলিকে সেই অসম্ভব অবস্থার সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায়। এই লাইন সম্পর্কে বহু গল্প ও কাহিনী প্রচারিত হইয়াছিল এবং ফরাসী রাজনীতিবিদ ও রণনীতিবিদগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এই দুর্গমালার ভিতর দিয়া তাঁদের চিরশত্রু জার্মানীর পক্ষে আর পিন ফুটাইবারও সম্ভাবনা নাই! সুতরাং এই মহাদুর্গের আড়ালে আত্মরক্ষা করিলেই যথেষ্ট। ফ্রান্সের এই মনোভাবকেই ম্যাজিনো মনোবৃত্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ম্যাজিনো লাইনের জবাবে রাইন নদীর ওপারে জার্মানীও তাদের পশ্চিম প্রাচীর বা সিগফ্রিড লাইন তৈয়ার করিয়াছিল। ফ্রান্সের অনুকরণে ১৯৩৮ সালে উহা তাড়াতাড়ি নির্মাণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ম্যাজিনো লাইনের মত উহা তেমন জাঁকালো বা দুর্ভেদ্য ছিল না কিংবা জার্মানীর রণচিন্তাও এই সমস্ত কেল্লার উপর নির্ভরশীল ছিল না।

একটিমাত্র আঘাতে পশ্চিম রণাঙ্গনে চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য জার্মনী পূর্বাহ্ণেই সমস্ত আয়োজন ও পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধের ত্রুটিগুলি এবং শ্লিফেন প্ল্যানের ভুলচুক সম্পর্কে জার্মান হাইকম্যান্ড যেমন সতর্ক হইয়াছিলেন, তেমনই পোল্যান্ড ও নরওয়ে যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও তাঁরা কাজে লাগাইলেন। ১৯১৪-১৮ সালের চারি বৎসরের সংগ্রামে জার্মানী যাহা করিতে পারে নাই, এবার ছয় সপ্তাহের মধ্যেই তাহা সম্ভব হইল।

সুতরাং পশ্চিম রণাঙ্গনে এই আক্রমণের সন্ধিক্ষণে হিটলার সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিলেন যে, এই অভিযানের দ্বারা 'আগামী হাজার বৎসরের জন্য জার্মানীর ভাগ্য নির্ণীত হইবে।'—

...'to decide the fate of the German nation for the next thousand year'

বিগত মহাযুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ লওয়া এবং 'চিরশত্রু ফ্রান্সকে' সংহার করার জন্য হিটলার তাঁর সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধজয়ের চেয়েও এক মহাবিজয়ের পরিকল্পনা হইল এবং ১৯৪০ সালে জার্মানী গোটা ইউরোপের মালিক হইয়া 'নিউ অর্ডার' বা 'নূতন রাষ্ট্রনীতি—অর্থাৎ নাৎসী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিল।

ভিসি গভর্নমেন্ট (ফ্রান্সের পরাজয়ের পর মার্শাল পেঁতার অধীনে গঠিত অনধিকৃত ফ্রান্সের গভর্নমেন্ট) সমর দপ্তর হইতে প্রচারিত ১০ই মে হইতে ২৫শে জুন পর্যন্ত পশ্চিম রণাঙ্গনের রণক্রিয়া সংক্রান্ত রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়া ম্যাক্স ভার্নার 'ব্যাটল ফর দি ওয়ার্ল্ড" পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, মিত্রবাহিনীগুলির মোট সংখ্যা ছিল ১০৩ ডিভিসন। ইহার মধ্যে ১০ ডিভিসন বেলজিয়ান, ১৩ ডিভিসন ম্যাজিনো লাইনের রক্ষী এবং ১৬ ডিভিসন ছিল বয়স্কতর শ্রেণীর ফরাসী সৈন্য। আবার ইহাদের একাংশ ছিল ইতালীয়

সীমান্তে। ইহা ছাড়া মিত্রপক্ষের হাতে কোন মজুত সৈন্য বা রিজার্ভ বাহিনী ছিল না। ভিসি গভর্নমেণ্টের রিপোর্ট অনুসারে তাঁরা ১২৫ ডিভিসন জার্মান সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া যে কোন মুহূর্তে রণাঙ্গনে যোগ দেওয়ার জন্য আরও ৫০ হইতে ৭৫ ডিভিসন সৈন্য জার্মান লাইনের পিছনে মজুত বাহিনীরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল। ফরাসী সৈন্যদলের মোট ২০০০ ট্যাংক ছিল এবং ৪২৩টি জঙ্গী বিমান ও ১০০ বোমারু বা মোট ৫২০ রণবিমান এবং জার্মানীর ছিল ৭৫০০ ট্যাংক, ১৫০০ জঙ্গীবিমান ও আড়াই হাজার বোমারু বা মোট ৪ হাজার রণবিমান। কিন্তু সোভিয়েট সামরিক মহলের মতে জার্মান বিমান বহরের সংখ্যা আরও বেশী ছিল—৩৫০০ বোমারু, দেড় হাজার ছোঁমারা বিমান এবং চার হাজার জঙ্গীবিমান। অর্থাৎ মোট ৯ হাজার রণবিমান।

ম্যাক্স ভার্নারের মতে জার্মান বাহিনীর অস্ত্রসজ্জা, সংগঠন ও আঘাত হানিবার শক্তি বিবেচনা করিলে মিত্রবাহিনীর সহিত কোন তুলনা দেওয়াই যায় না। কেবল তাহাই নহে, রণনীতি, সংগঠনশক্তি, রণচাতুর্য এবং সংঘর্ষের উপযোগী মানসিক প্রস্তুতির দিক দিয়াও জার্মান বাহিনী মিত্রপক্ষের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। সুতরাং মিত্রপক্ষ যেন একটা ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

এই মহাযুদ্ধে প্রথমেই জার্মানীর রণনীতি বা 'স্ট্রাটিজির' বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা দরকার। কারণ, সমগ্র রণক্রিয়া এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। জার্মান রণগুরু ক্লাউসেভিৎসের (১৭৮০ খৃঃ—১৮৩১ খৃঃ) শিক্ষানুসারে আক্রমণাত্মক অভিযান ও শত্রুবাহিনীকে নির্মূল করাই ছিল ইহার লক্ষ্য। কেবল তাহাই নহে, যে ইতিহাস বিখ্যাত শ্লিফেন প্ল্যান অনুসারে ১৯১৪ সালে জার্মানী পশ্চিম রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইয়াছিল তাহাও এই অভিযানের নক্সায় গৃহীত হইল। কিন্তু ১৯৪০ সালে ইহা সংশোধিত আকারে অনুসৃত হইল এবং সেখানেই ছিল বর্তমান জার্মান রণনীতির বৈশিষ্ট্য। ১৯১৪ সালে শ্লিফেন প্ল্যান অনুসারেই জার্মানী বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া ফ্রান্সকে আক্রমণ ও সংহারের চেষ্টা করিয়াছিল। এবারও সেদিক দিয়া চেষ্টা হইল বটে, কিন্তু ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল জেনারেল লুডেনডর্ফের ১৯১৮ সালের আক্রমণাত্মক প্ল্যান। এই নক্সা অনুসারে ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে লুডেনডর্ফ চাহিয়াছিলেন বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনীর সংযোগস্থলের ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া ইংলিশ চ্যানেলের তীর পর্যন্ত পৌঁছিতে এবং এভাবে বৃটিশ বাহিনীকে ফরাসীদের কাছ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে। কিন্তু সেবার লুডেনডর্ফের অভিযান আমিয়েঁ হইতে ১৫ মাইল দূরে গোলাবিধ্বস্ত রণক্ষেত্রে ব্যাহত হইয়াছিল। এবার জার্মানী শ্লিফেন ও লুডেনডর্ফ, উভয়ের নক্সা একত্রে মিশাইয়া এক অভিনব পরিকল্পনা অনুসরণ করিল। অর্থাৎ একদিকে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া ম্যাজিনো লাইনের উত্তরবর্তী ফরাসী-বৃটিশ-বেলজিয়ান বাহিনীকে বেষ্টন এবং অন্যদিক দিয়া সেডান ও আর্দেনিস এলাকায় মিত্রব্যূহ বিদারণ, ইংলিশ চ্যানেলের দিকে অভিযান ও খাস ফ্রান্সের যুদ্ধে মূল ফরাসী বাহিনীকে বেষ্টন এবং সংহার।* শুধু তাহাই নহে, শ্লিফেন প্ল্যান অনুসারে বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া জার্মানীর প্রধান ও মূল আক্রমণ অনুষ্ঠিত

* ১৯৪০ সালের ম্যানস্টাইন পরিকল্পনার এটাই ছিল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তখন এটা জানা ছিল না। —লেখক

হইয়াছিল, ইহা ছিল দক্ষিণ পার্শ্ব এবং বাম পার্শ্বের আক্রমণ ছিল গৌণ। কিন্তু ১৯৪০ সালে দক্ষিণ পার্শ্বের আক্রমণই ছিল গৌণ—যার ফলে ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধ এবং সেডানের ব্যূহভেদের দ্বারা বাম পার্শ্বের আক্রমণ দাঁড়াইল প্রধান বা মুখ্য—যার ফলে খাস ফ্রান্সের যুদ্ধ। ইহার সঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বের ব্যূহভেদের দ্বারা মিত্রবাহিনী যেমন ফ্লাণ্ডার্স ও বেলজিয়ামে বেষ্টিত হইল, উত্তর ফ্রান্সের মূল ফরাসী বাহিনী হইতেও (সেডান হইতে আবেভিল বন্দর পর্যন্ত অগ্রগতির দ্বারা) তারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পরস্পরের কাছ হইতে এই বিচ্ছেদের বিস্তৃতি দাঁড়াইল ৩০ মাইল, যাহা সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সামরিক ভাষায় জার্মানীর এই চাল ও চাতুরীকে বলা যাইতে পারে ধাপ্পা আক্রমণ। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গনে তাঁর সেনাপতিবৃন্দের অনুসৃত রণনীতির সাফল্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন,

"I feinted to the north and moved my main mass against the left wing in contrast to the Schliffen Plan (which moved by the right wing in 1914). There feint succeded.'[১]

অর্থাৎ হিটলার উত্তর দিকে বা দক্ষিণপার্শ্বে দিলেন আক্রমণের ধাপ্পা, যাহা শ্লিফেনের প্ল্যানের বিপরীত, আর বামপার্শ্বে চালাইলেন প্রধান আক্রমণ এবং এই ধাপ্পা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

এই ধাপ্পার পাল্লায় পড়িয়া মিত্রবাহিনী দস্তুরমত 'বেকুফ' বনিয়া গেল। তারা ভাবিয়াছিল যে, দক্ষিণ পার্শ্বের কিংবা হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের মধ্য দিয়া জার্মান অভিযানই প্রধান আক্রমণ। সুতরাং মিত্রবাহিনী যতই সেদিকে অগ্রসর হইয়া জার্মানীকে বাধা দিতে চাহিল, ততই তারা বঁড়শির টোপ গিলিবার মত এক কৌশলপূর্ণ ফাঁদে পড়িল। কারণ, বামদিকে ততক্ষণ সেডান ও আর্দেনিস এলাকা দিয়া প্রধান জার্মান বাহিনী ম্যাজিনো লাইন (যেখানে নূতন কাঁচা অংশের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে) ভেদপূর্বক ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের রণক্ষেত্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। উত্তর দিকের বা বেলজিয়াম রণক্ষেত্রের এই ধাপ্পা এত সাফল্যমণ্ডিত হইল যে, সেডানের ব্যূহভেদের পর মিত্রবাহিনীর হাইকম্যাণ্ড বুঝিয়া উঠিতেই পারিলেন না যে, অতঃপর জার্মানী কোন্ দিকে ধাবিত হইবে—ইংলিশ চ্যানেলের দিকে কিংবা প্যারিস অভিমুখে ?

'It masked its decisive break-through at Sedan by the preceding offensive against the Netherlands and Belgium and after this successful break-through it kept the Allied Supreme Command in suspense for several days, as to where the next decisive blow would be struck—whether against the Channel coast or Paris'.[২]

জার্মানীর এই অদ্ভুত রণনৈতিক চালের মধ্যে পড়িয়া মিত্রবাহিনী গোড়ার দিকেই পশ্চিম রণাঙ্গনে তাদের বিপর্যয় ডাকিয়া আনিল। সুতরাং এই যুদ্ধ ছিল কার্যতঃ প্রায় এক-তরফা। অর্থাৎ জার্মান বাহিনীর একটানা আক্রমণ, অগ্রগতি এবং মিত্র-

১। The world At war—Published by Infantry Journal 1945, P. 48—49

২। 'Battle For the world'—by Max werner. 1941, P. 167

শক্তিগুলিকে বেষ্টন ও সংহার। যেখানে উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে শক্তি, কৌশল ও মহড়ার এত বৈষম্য সেখানে পরস্পরের সংঘর্ষের কোন বিস্তৃত ইতিহাস গড়িয়া উঠিতে পারে না। সাধারণ চলিত বাংলায় তুলনা দিয়া বলা যাইতে পারে যে, ধারালো বঁটি দিয়া মেয়েরা যেমন কুমড়ার ফালি কাটিয়া ফেলে, জার্মানীও তেমনই মিত্রবাহিনীকে দ্বিখণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন ও টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। পশ্চিম রণাঙ্গণের এই জার্মান রণনীতি মূলতঃ ছিল তিন পর্যায়ের: (১) মিত্রপক্ষের প্রথম সারির আত্মরক্ষার ব্যূহভেদ; (২) গতিশীল যুদ্ধ ও বিদ্যুৎগতি এবং (৩) শত্রুর দ্রুত পশ্চাদ্ধাবনের পূর্বে সোম ও আইন নদীর ব্যূহভেদ।[১]

প্রথম পর্যায়ে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের আত্মরক্ষার জন্য নির্মিত দুর্গায়িত এলাকাগুলি জার্মানরা বোমারু, ছোঁমারা বিমান, প্যারাসুট সৈন্য ও 'পাইওনীয়ার'দের সাহায্যে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। বোমারুগুলি 'উড়ন্ত গোলন্দাজের' কাজ করিল এবং এভাবে যান্ত্রিক ও মোটর-সাইকেলবাহিত পদাতিকদের জন্য পথ খুলিয়া দিল। মিউজ নদীর সেতু, এলবার্ট ক্যানেল এবং লীজের বিখ্যাত দুর্গগুলির দখলে প্যারাসুট বা ছত্রীসৈন্যেরা প্রধান অংশ গ্রহণ করিল। সেডান ও মন্তমিদি এলাকায় ম্যাজিনো লাইনও যুগপৎ আকাশ ও স্থলপথের প্রচণ্ড 'বিস্ফোরক আক্রমণে' ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল এবং এই সমস্ত দুর্গায়িত এলাকা চূর্ণ করিতে জার্মান বাহিনীর দুই দিনের বেশী সময় লাগিল না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রাইন নদী অঞ্চলবর্তী ম্যাজিনো লাইন এবং খাস রাইন নদী বিচ্ছিন্ন ও অতিক্রান্ত হইল। বেলজিয়ান ও ফরাসী দুর্গগুলি ভাঙ্গিবার পর জার্মানী ট্যাংক ও যান্ত্রিক সৈন্যের সাহায্যে গতিশীল যুদ্ধের বিদ্যুৎগতি সঞ্চার করিয়া স্থিতিশীল যুদ্ধের উপর নির্ভরশীল মিত্রপক্ষকে নিঃশ্বাস ফেলিবারও সময় দিল না। ১০ই মে হইতে ১৮ই মে-র মধ্যে জার্মান বাহিনী বেলজিয়ামের অভ্যন্তরে ১২৫ মাইল অগ্রসর হইয়া গেল। ১৩ই মে হইতে ১৬ই মে-র মধ্যে ফন রাইকনাউয়ের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যান্ত্রিক সৈন্যেরা লুক্সেমবুর্গ ও ফরাসী সীমানা ভেদ করিল এবং ২০শে মে-র মধ্যে পিরোন-ক্যাম্বাই লাইনে পৌঁছিয়া অবিশ্বাস্য গতিবেগের দ্বারা মাত্র তিনদিনের মধ্যে ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্তী আবেভিল বন্দরে পেঁছিল এবং সেখান হইতে উত্তর দিকে ক্যালে বন্দর অভিমুখে ঘুরিয়া ফ্লাণ্ডার্সের মিত্রবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন ও বেষ্টন করিল। অর্থাৎ বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ সীমান্ত হইতে ক্যালে বন্দর পর্যন্ত দখলের যে দুই সপ্তাহ সময় লাগিল, উহার মধ্যে জার্মান বাহিনী গড়পড়তা দৈনিক ২০ মাইল হিসেবে ৩০০ মাইল অতিক্রম করিল। এবং ২১শে হইতে ২৩শে মে-র মধ্যে জার্মান বাহিনীর গতিবেগ ছিল দৈনিক ৪০। ৫০ মাইল।

ফ্লাণ্ডার্সের এই যুদ্ধের পর (যার পরিণতি ডানকার্ক) শুরু হইল জার্মানীর তৃতীয় পর্যায়ের অভিযান, কিংবা প্রধান ফরাসী বাহিনীগুলির সংহার। সোম ও আইন নদীর তীরে ইহাই খাস 'ফ্রান্সের যুদ্ধ' নামে অভিহিত। এখানে সোম নদীর নিম্নভাগে (আমিয়েঁর দক্ষিণে ও পূর্বে) ফরাসী সৈন্যেরা প্রাণপণে লড়াই করিয়া প্রচণ্ডতম বাধা দিয়াছিল। তথাপি বাস্তব অবস্থার বিচারে ফ্রান্সের এই যুদ্ধ হাতেকলমে মাত্র পাঁচদিন টিকিয়া ছিল—৫ই জুন হইতে ১০ই জুন। তারপর পূর্বে ও পশ্চিমে প্যারিস

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক

বেষ্টন এবং ছত্রভঙ্গ ফরাসী সৈন্যদলের পশ্চাদ্ধাবন। সোমনদীর যুদ্ধ বা ওয়েগাঁ লাইন ভাঙ্গিবার ফলে ফরাসী সৈন্যেরা ৩০০ মাইল পিছু হটিয়া গেল।

বোমারু বিমান, ট্যাঙ্ক ও মোটরারূঢ় জার্মান বাহিনীর এই অভাবনীয় যান্ত্রিক যুদ্ধের জন্য ফ্রান্স ও তাঁর মিত্রবর্গ আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। আজ অবশ্য পাঠকবর্গের নিকট এই কৌশল অত্যন্ত পরিচিত, এমনকি পুরাতন। কিন্তু সেদিনের পৃথিবী বর্ণনাতীত কৌতুহল ও বিস্ময়ের সহিত পশ্চিম রণাঙ্গনের এই মহানাটকের অভিনয় লক্ষ্য করিতেছিল। সুতরাং সেদিনের অবস্থা বুঝিবার জন্য 'রয়টারের' টেলিগ্রাম ও সংবাদপত্রের বিশ্লেষণ হইতে কিছুটা উদ্ধৃত করিতেছি। ১৯৪০ সালের ১৭ মে, 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'যুদ্ধের ধারা পরিবর্তন' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম ঃ

"রয়টার জানাইতেছেন যে, বেলজিয়ামের রণক্ষেত্রে কামান ও গোলাগুলীর প্রচণ্ডতায় ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলবর্তী সহরের ঘরবাড়ীগুলি ভূমিকম্পের আলোড়নের মত কাঁপিয়া উঠিতেছে। বেলজিয়ামের রণক্ষেত্র হইতে দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের সমুদ্রতীর কমপক্ষে দেড় শত মাইল দূর হইবে। কামানের নিক্ষিপ্ত গোলার দ্বারা কিভাবে দেড় শত মাইল দূরে ভূমিকম্পনের অনুরূপ আলোড়ন সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা কল্পনা করিয়া জনসাধারণ নিশ্চয়ই ভীতি ও বিস্ময় অনুভব করিবেন। বিগত মহাযুদ্ধের পর অনেক রণপণ্ডিত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ অপরিমেয় ধ্বংস বিস্তার করিবে। সেই ধ্বংসের বার্তাই আজ রণক্ষেত্র হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু সমর-বিজ্ঞানের দিক দিয়া এই যুদ্ধের প্রচণ্ডতাকে বুঝিবার প্রয়োজন আছে। আগেকার প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম যে, যান্ত্রিক-বাহিনী ও বোমারু বিমানের দ্বারা বেপরোয়া আক্রমণ চালাইবার ফলে যুদ্ধের নীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন হইবে। 'রয়টারের' নূতনতম তারবার্তায় এই পরিবর্তনের কথা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

'The enemy is hurling formidable forces into the battle and is attacking the whole front more on the lines of the Polish campaign than on those of 1914. The German attack has changed the war of position behind fortified lines into a war of movement. Enemy attacks now take the form of a spearhead drive of tank corps which try to penetrate the lines with the infantry following. This change in the character of the war, it is announced in Paris to-night has involved reorganisation of French dispositions which the French High Command has now carried out.'

"ইহার সহজ মর্ম এই যে, বর্তমান যুদ্ধ ১৯১৪ সালের অনুরূপ ধারায় চলিতেছে না। পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানী যে ধারায় ও পদ্ধতিতে আক্রমণ চালাইয়াছিল, নামুর-সেডান যুদ্ধেও তাহাই অনুসৃত হইতেছে—'ওয়ার অফ পজিশান' এক্ষণে 'ওয়ার অফ মুভমেণ্ট'-এ পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ ফরাসী সৈন্যেরা দুর্গের আড়ালে থাকিয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবে বলিয়া যে সংকল্প করিয়াছিল সেই সংকল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছে, তাহারা এক্ষণে সচল যুদ্ধের গতিবেগ অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছে। ফলে ফরাসী সৈন্যদিগকে নূতন করিয়া সন্নিবেশ ও সংস্থাপন করিতে হইয়াছে। এই কারণে সমগ্র

যুদ্ধের ধারা বা 'কেরেক্টার'-এর পরিবর্তন হইয়াছে। ফরাসী সামরিক কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছিলেন যে, ম্যাজিনো লাইন ও কেল্লার দ্বারা সুরক্ষিত অঞ্চলের মধ্যে তাঁহারা অবস্থান করিবেন এবং এই অচলায়তন গণ্ডীর নিরাপদ কেন্দ্রে বসিয়া আক্রমণকারীকে কামান ও মেসিনগান ইত্যাদির দ্বারা ঘায়েল করিবেন। কিন্তু জার্মান যান্ত্রিক ও বোমারু-বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের দ্বারা তাহারা দুর্গের 'নিরাপদ গর্ত' হইতে বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন—

'French troops have had to adapt themselves suddenly from a war of position to one of rapid action on land and in the air'. (Reuter)

—ফরাসী বাহিনীকে অকস্মাৎ (অচলায়তন গণ্ডীর যুদ্ধ হইতে স্থলপথে ও আকাশে সচল) ও সক্রিয় যুদ্ধ অবলম্বন করিতে হইয়াছে এবং নূতন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য নূতনভাবে সেনা সাজাইতে হইয়াছে। এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিবার মত।

"যুদ্ধ যদিও আদিমকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তথাপি যুদ্ধের ধারা ও পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন খুব ঘন-ঘন দেখা যায় নাই। এমনকি কাহারও কাহারও মতে তিনশত বা পাঁচশত বৎসরেও যুদ্ধনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু যন্ত্র-বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে রণবিজ্ঞানেরও বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে সাধাধণতঃ নেপোলিয়ানের এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফ্রাংকো-প্রুশিয়ান (ফরাসী ও জার্মান) যুদ্ধের কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, এই প্রকার যুদ্ধনীতি ক্রমশঃ অচল অবস্থায় গিয়া পৌঁছিতেছে। ১৯১৫-১৭ সালের পরিখা শ্রেণীর মধ্যে অর্থাৎ মাটির নীচের অচল গণ্ডীতে পরিণত হইতেছে। একমাত্র কোদালই রাইফেল ও মেসিনগানকে ব্যর্থ করিয়া দিল। ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ সাল, এই ৪৩ বৎসরের মধ্যে সৈন্যবাহিনীর অস্ত্রসজ্জা ও রণসজ্জা সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে ধূমহীন বারুদ, দূরপাল্লার রাইফেল, মেসিনগান এবং অতি দ্রুত গোলাগুলী বর্ষণকারী বহুপ্রকার অস্ত্র আবিষ্কৃত ও প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু অস্ত্রের গতি ও প্রকৃতি যদিও আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল, সমরনীতি ও পদ্ধতি পড়িয়া রহিল পশ্চাৎবর্তী যুগে—নেপোলিয়ান ও ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের আমলে। সুতরাং আধুনিক অস্ত্র ও পুরাতন মনের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিল না—দুই পক্ষই অবশেষে ট্রেঞ্চের মধ্যে আশ্রয় লইয়া দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস অলস মন্থরগতিতে কাটাইতে লাগিল। অবশেষে বৃটেনের আবিষ্কৃত ট্যাংক আসিয়া দুর্বার গতিতে পরিখাশ্রেণী ভাঙ্গিয়াচুরিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাইল। এইভাবে 'ট্যাকটিস' ও 'স্ট্রাটেজি' উভয় দিক হইতে নূতন পরিবর্তন দেখা দিল।

"খুব সংক্ষেপে ইতিহাসের কথা বলা যাইতে পারে যে, সেকালে গ্রীক ও রোমান বাহিনী ঢাল, তারোয়াল ও বর্শা ইত্যাদি লইয়া প্রতিপক্ষের খুব কাছাকাছি যাইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িত, ইহাকে আধুনিক ভাষায় আক্রমণ না বলিয়া সংঘর্ষ বা Assault বলা যাইতে পারে। এই সংঘর্ষ ঘটিত শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ; যাহাদের সাহস, শারীরিক শক্তি ও শৃঙ্খলাগুণ যত বেশী তাহাদের জয়লাভেরও বেশী সম্ভাবনা ছিল। ফ্রেডারিক দি

গ্রেটের আমল পর্যন্তও এই মূল নীতিই অনুসৃত হইয়াছিল, তফাতের মধ্যে এই ছিল যে, গুলীর দ্বারা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা হইত। কিন্তু ক্রমে সমরনেতাগণ ভাবিতে লাগিলেন যে পরস্পরের মুখোমুখি দুই সৈন্যদলের মধ্যে যে দূরত্ব রহিয়াছে এবং যাহাকে সামরিক ভুগোলের ভাষায় 'নো-ম্যানস্-ল্যাণ্ড' বলা যাইতে পারে, সেই দূরত্বের হ্রাস কিভাবে সম্ভব? রাইফেল, মেসিনগান ও উন্নত শ্রেণীর কামান এই দিক দিয়া সাহায্য করিল। কিন্তু শত্রু বা মিত্র, উভয়পক্ষই যেমন নূতন আগ্নেয়াস্ত্রের সুবিধা ও কৌশল গ্রহণ করিল তেমনই আত্মরক্ষার প্রশ্নও নূতন করিয়া দেখা দিল। এই আত্মরক্ষার প্রশ্নই ক্রমশঃ ১৯১৫-১৭ খৃষ্টাব্দের অচল ট্রেঞ্চ যুদ্ধের একঘেঁয়েমিতে পরিণত হইল। তখনকার দিনে সাধারণতঃ আক্রমণ চলিত 'আণ্ডার কভার অফ আর্টিলারি' অর্থাৎ গোলন্দাজ বাহিনী প্রচুর গোলাগুলী বর্ষণ করিয়া আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিত এবং তাহার পিছনে অনুসরণ করিত রাইফেল ও সঙ্গীনধারী পদাতিক। কিন্তু ১৯১৭-১৮ সালে ইহারও পরিবর্তন ঘটিল। তখন সদ্য আবিষ্কৃত ট্যাংককে সম্মুখভাগে রাখিয়া ক্রমে গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনী আক্রমণে অগ্রসর হইত। ইহার সঙ্গে অবশ্য এরোপ্লেনও পর্যবেক্ষণের কার্য করিত। এই নূতন অবস্থার চাপে পড়িয়া ১৯১৮ সালের নভেম্বরে মহাযুদ্ধ শেষ হইল বটে, কিন্তু উহার আগে ১৯১৯ সালের জন্য বৃটিশ সমর-নেতাগণ স্থির করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ট্যাংক বাহিনীর দ্বারা শত্রুর সম্মুখভাগ ও দ্রুতগামী এরোপ্লেন দিয়া পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিবেন। ১৯৩৯-৪০ সালে ইহারই উন্নততর সংস্করণ জার্মানযুদ্ধে দেখা দিয়াছে। এক্ষণে বোমারুবিমান ঝাঁক বাধিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতেছে এবং প্রচুর বোমাবর্ষণের মধ্যে যান্ত্রিক-বাহিনী বড় বড় ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ী ও অন্যান্য যানসহ আক্রমণ চালাইতেছে এবং মোটর সাইকেল বাহিনী উহাদিগকে পদাতিকের মত অনুসরণ করিতেছে। সহজ কথায় গোলন্দাজ বাহিনীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে রোমারু বিমান এবং ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ী। এই আক্রমণ কোথাও চলিতেছে বৃত্তাকারে এবং কোথাও বা বর্শাফলকের মত অর্থাৎ একের উদ্দেশ্য হইতেছে শত্রুকে পরিবেষ্টন এবং আর একটির উদ্দেশ্য হইতেছে শত্রুবাহিনীকে তীরের মত ভেদ করিয়া যাওয়া!"

১৯ শে মে তারিখ আমি লিখিয়াছিলাম ঃ—প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পর্যন্ত তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, এবারের যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য অতর্কিতে আক্রমণ ও বিস্ময়কর গতিবেগ—এমন দ্রুত গতিবেগ খুব কম দেখা গিয়াছে। এই দ্রুত জয়লাভের মূলে রহিয়াছে ট্যাংক ও বোমারুবিমান। এই দুই অস্ত্রের জন্য বর্তমান যুদ্ধের ধারা পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে 'রয়টার' বলিতেছেন—

'The Greman success is mainly due to a new technique of clearing the ground by heavy tank attacks supported by lowflying bombers.'

অর্থাৎ জার্মানীর সাফল্যের প্রধান কারণ হইতেছে এই যে, তাহারা ভারী ট্যাংকের সাহায্যে অভিযান পথের বাধা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং ইহার সঙ্গে বোমারু বিমান খুব নীচু দিয়া বোমা বর্ষণ করিতেছে। ফরাসী-ইংরাজ সৈন্যদের মুস্কিল হইয়াছে যে, জার্মানদের ট্যাংক ও বোমারুবিমান উভয়ই অপেক্ষাকৃত বেশী। যদি এইদিক দিয়া তাহাদের সংখ্যা সমান হইত তাহা হইলে জার্মান অগ্রগতি এত দ্রুত

হইতে পারিত না।...বৃটেনের বর্তমান চীফ অব দি ইম্পিরিয়েল জেনারেল স্টাফ জেনারেল স্যার এডমণ্ড আয়রনসাইড ১৫ বৎসর আগেকার এক বক্তৃতায়* বলিয়াছিলেন যে,

'One of the first principles of war is the maintenance of mobility. An army which can move about quickly always has the advantage over one which is slow and immobile.[১]

অর্থাৎ যুদ্ধের একটি মূল নীতি হইতেছে ক্ষিপ্রতা, এই ক্ষিপ্রতা রক্ষা করিয়া যাহারা চলিবে তাহারা যে কোন অলস মন্থর সেনাদলের উপর জয়লাভের বেশী সুযোগ পাইবে। নেপোলিয়ানের যুদ্ধ এই দিক দিয়া সর্বাগ্রগণ্য ছিল। এই কারণেই দুর্গ-শ্রেণীর আড়াল হইতে ফরাসী সৈন্যেরা বর্তমানে বাহির হইয়া আসিয়াছে।"

* * *

কাঁকড়ার গর্তে লেজ ঢুকাইয়া শিয়াল যেমন কাঁকড়াকে বাহিরে টানিয়া হত্যা করে, জার্মান যান্ত্রিক যুদ্ধের কৌশলও ফরাসী বাহিনীকে সেভাবে দুর্গের গহবর হইতে বাহিরে টানিয়া আনিল এবং স্থিতিশীল 'নিরাপদ' আশ্রয়কে গতিশীল যুদ্ধের বজ্র হানিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিল। পূর্বেও জার্মান বাহিনীর গতিবেগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে এবং এখানে আর একবার উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া জার্মানী ৫ দিনের মধ্যে সমুদ্রতীরে পেঁ'ছিল, কিন্তু ১৯১৪ সালে এই উপকূলে পেঁ'ছিতে জার্মানীর আড়াই মাস সময় লাগিয়াছিল! রণকৌশলের দিক থেকে ট্যাংক ও বিমানশক্তির শ্রেষ্ঠতাই ছিল এই অভুতপূর্ব জয়ের মূল কারণ।

এই সংগ্রামের বহু অভিনব ঘটনার মত আর একটি চমকপ্রদ ঘটনা এই যে, উভয় পক্ষেই হতাহতের পরিমাণ হইয়াছিল অবিশ্বাস্য রকমের সামান্য। (ইহা দ্বারাও অসমযুদ্ধের আর একটি প্রমাণ মিলিতেছে)। জার্মান সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ১০ই মে হইতে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত জার্মান পক্ষে নিহতের সংখ্যা ১৭,০৭৪, নিখোঁজ ১৮৩৪, আহত ১,১১,০৩৪—মোট হতাহত ও নিখোঁজ ১,৫৬,৪৯২ জন। পশ্চিম রণাঙ্গনের মহাসংগ্রামের তুলনায় বিজয়ী পক্ষেরও এই হতাহতের সংখ্যা এত সামান্য যে, ইতিহাসে ইহা অভুতপূর্ব। জার্মানীর বেলা যেমন, ফ্রান্সের পক্ষে ইহা তেমনই অত্যন্ত অভিনব। কেননা ফ্রান্স ছিল পরাজিত পক্ষ। ফ্রান্সের আধা-সরকারী মতে নিহত ফরাসীর সংখ্যা ৭০,০০০ এবং জার্মানদের হাতে বন্দীর সংখ্যা ১৯ লক্ষ (জার্মান সরকারী ইস্তাহারেও এই সংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, ৫ জন বাহিনী অধিনায়ক এবং প্রায় ২৯ হাজার অফিসার ধরা পড়িয়াছেন)। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে অনধিকৃত ফ্রান্সের এক রিপোর্টে (ম্যাক্স ভার্নারের মতে) দেখা যায় যে, নিহত ফরাসীদের সংখ্যা ৮০ হাজার এবং আহত ১ লক্ষ ২০ হাজার। বিশেষজ্ঞ মতে এই সংখ্যাগুলি মোটামুটি ঠিক বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য, ফরাসী আত্মরক্ষার দ্রুত অবনতি এবং জার্মানীর বেষ্টন কৌশলের জন্যই হতাহতের সংখ্যা সংগ্রামের বিশালতার তুলনায় এত সামান্য হইয়াছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, এই পর্যন্ত কোন বড় যুদ্ধের ইতিহাসেই বিজেতা ও বিজিতের এত কম হতাহতের

* লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা—১৯২৫-২৬ সাল।

১। 'The study of war'—edited by Major-General Sir George Aston. Page 130

সংখ্যা দেখা যায় নাই। ইহার আর একটা বড় কারণ এই যে, কতকগুলি ডিভিসন (যেমন, ম্যাজিনো লাইনের ও পূর্ব ফ্রান্সের) বিনাযুদ্ধে ধরা পড়িয়াছে এবং বহু ডিভিসন ঘেরাও হইয়া বন্দী হইয়াছে।

চার্চিল তাঁর ইতিহাসে মন্তব্য করিয়াছেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধে এত কম সৈন্য হতাহত হওয়ার মূল কারণ যান্ত্রিক যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এবং প্রসিদ্ধ বৃটিশ ঐতিহাসিক এ্যালান বুলক্ বলিয়াছেন যে, জার্মান যান্ত্রিক বাহিনী সংগঠনের কৃতিত্ব হিটলারের। তিনিই এর উপযোগিতা প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যদিও আর্মির মধ্যে তীব্র মতবিরোধিতা ছিল।[১]

১। 'Hitler'—Allan Bullock, Pelican. 1962, P. 588

দশম অধ্যায়

ফরাসী সংকটের মূলসূত্র

প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ও রণনীতির পরিণাম

১৯৪০ সালের ২২শে জুন ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হইল। সমগ্র সভ্য জগৎ এতবড় জাতির এত দ্রুত পতনে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ফ্রান্সের প্রায় দুইতৃতীয়াংশ জার্মানীর দখলে গেল এবং অনধিকৃত দক্ষিণ ফ্রান্সের ভিসি সহরে বৃদ্ধ মার্শাল পেঁতা নূতন গভর্নমেণ্টের প্রধান নায়ক হইলেন। এক জো-হুকুম আইনসভা বা পার্লামেণ্ট তাঁর হস্তে রাষ্ট্রের সর্বক্ষমতা অর্পণ করিলেন এবং ফ্যাসিস্ট মতাবলম্বী পেঁতাও ডিক্টেটর-রূপে দেখা দিলেন। যে ফ্রান্সের রিপাবলিক রাষ্ট্রের গৌরবময় ইতিহাস ছিল, তার অবলুপ্তি ঘটিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের স্থাপিত এই তৃতীয় রিপাবলিক রাষ্ট্রের সমস্ত বিধিবিধান লুপ্ত হইল এবং পেঁতা ও তার সহকর্মিগণ ফ্যাসিস্ট অনুকরণে এক নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিলেন, যে শাসনতন্ত্রের অধীনে সর্বপ্রকার গণতান্ত্রিক অধিকারের সমাধি ঘটিল, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদির অবসান হইল। ফরাসী বিপ্লবের যে মূল সূত্র ছিল 'লিবার্টি', ইকুয়্যালিটি এ্যাণ্ড ফ্রেটারনিটি' কিংবা স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী এবং যে মহান মন্ত্র যুগযুগান্তর ধরিয়া ইউরোপ ও সারা পৃথিবীর মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের জন্য প্রেরণা জোগাইয়া আসিতেছিল মার্শাল পেঁতার নির্দেশে তাহা নিশ্চিহ্ন হইল এবং 'ফ্রান্সের ধ্বংসাবশেষ হইতে এক নূতন শক্তিশালী রাষ্ট্র' গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি ফরাসী বিপ্লবের মূলনীতি পালটাইয়া শ্রম, পরিবার ও পিতৃভুমি—এই তিনটি কথার উপর জোর দিলেন। কেননা, তাঁর মতে ফরাসী রাষ্ট্র ও সমাজ বিকৃত, নীতিভ্রষ্ট ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পেঁতার বর্ণিত ফ্রান্সের অবস্থা শোচনীয় ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার কারণ ও প্রতিকারের পথ ছিল অন্যরকম এবং উহার জন্য পেঁতা ও তাঁর সমধর্মিগণই সমধিক দায়ী ছিলেন। (কিন্তু সেকথা পরে আলোচিত হইবে।) সেপ্টেম্বর মাসে ভিসি গভর্নমেণ্ট নূতন করিয়া গঠিত হইল এবং ফ্রান্সের দুষ্ট গ্রহরূপী মঃ লাভাল, মঃ রেঁনো, এডমিরাল দারলাঁ প্রভৃতি কুখ্যাত নায়কেরা হিটলারের সঙ্গে অধিকতর সহযোগিতার পথ খুঁজিতে লাগিলেন। পেঁতা যদিও বাহ্যতঃ এই গভর্নমেণ্টের স্বাতন্ত্র বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তথাপি কার্যতঃ তাহা সম্ভব ছিল না। কারণ, জার্মানীর নিকট বিনাসর্তে আত্মসমর্পণকারী ফ্রান্সের স্বাধীনতা বজায় রাখা স্বাভাবিক কারণেই অসম্ভব ছিল। বিশেষতঃ ভিসি গভর্নমেণ্টের মতে হিটলারের হাতে ১৯ লক্ষ ফরাসী সৈন্য বন্দী ছিল, যারা জার্মানীতে প্রেরিত হইল এবং অর্ধভুক্ত লাঞ্ছিত জীবনের বিড়ম্বনা বহন করিয়া অধিকাংশই শ্রমিকের কার্যের জন্য নিযুক্ত হইল। ৮ সেপ্টেম্বর জার্মানীর সঙ্গে ভিসি গভর্নমেন্ট জেনারেল গ্যামেলাঁ, দালাদিয়ের এবং রেনোকে গ্রেপ্তার ও বন্দীনিবাসে আটক করিলেন। লিও ব্লুম এবং অন্যান্য বহু পূর্বতন নেতা, যাঁরা 'জার্মানীর সহিত ফ্রান্সের' যুদ্ধ বাধাইবার জন্য দায়ী ছিলেন' তাঁদেরকেও গ্রেপ্তার এবং আটক করা হইল। ফ্যাসিস্ট অনুকরণে

ইহুদী পীড়ন চলিতে লাগিল এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অজুহাতে সামান্য কারণের জন্যও মৃত্যুদণ্ডের বিধানগুলি প্রবর্তিত হইতে লাগিল। জেনারেল ওয়েগাঁ উত্তর আফ্রিকায় প্রেরিত হইলেন এবং ২৮শে অক্টোবর লাভাল পররাষ্ট্রসচিবের পদ পাইলেন। কিন্তু জার্মানীর সহিত চক্রান্তে অভ্যস্ত লাভাল মার্শাল পেঁতারও বিশ্বাস অর্জন করিতে পারিলেন না। ১৪ই ডিসেম্বর তিনিও পদচ্যুত এবং ধৃত হইলেন। অবশ্য পরে তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন। এদিকে চার্লস দ্য গল ফ্রান্স হইতে পরিত্রাণ লাভ পূর্বক ইংল্যাণ্ডে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বরাবরাই ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ ও হিটলারের বিরোধী ছিলেন। সুতরাং লণ্ডনে গিয়া ফ্রান্সের প্রতিরোধের জন্য 'স্বাধীন ফরাসী গভর্নমেণ্টের' পতাকা উত্তোলন করিলেন। এবং ফ্রান্সের ভিতরে ও বাহিরে সমস্ত দেশপ্রেমিক ফরাসীকে তিনি হিটলারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ সংগঠনের জন্য আহ্বান জানাইতে লাগিলেন। জেনারেল দ্য গল নূতন ইতিহাসের নায়করূপে দেখা দিতে লাগিলেন।

* * *

উপরে ভিসি গভর্নমেণ্টের যে সামান্য রেখাচিত্র দেওয়া হইল, তাহা ১৯৪০ সালের পরাজিত ফ্রান্সের কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ফ্রান্সের ইহাই ছিল অনিবার্য পরিণতি। কেননা, ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের যেমন প্রচুর রক্ত ক্ষয়িত হইয়াছিল, তেমনই উহার সমগ্র সামাজিক ও আর্থিক জীবনকেও নাড়া দিয়া গিয়াছিল।

ফ্রান্সের ভয়াবহ রক্তক্ষরণের কথা উল্লেখ করিয়া চার্চিল তাঁর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসের গোড়াতেই বলিয়াছিলেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধে প্রায় ১৫ লক্ষ ফরাসী সৈন্য স্বদেশ রক্ষার জন্য নিহত হইয়াছিল এবং ১০০ বছরের মধ্যে পাঁচবার—১৮১৪, ১৮১৫, ১৮৭০, ১৯১৪ এবং ১৯১৮ সালে বীর ফরাসীরা প্রুশিয়ান কামান ও গোলাগুলীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ফ্রান্সের ১৩টি প্রদেশের উপর প্রুশিয়ান মিলিটারি শাসন চারটি ভয়ংকর বছরের বজ্রমুষ্টি বিস্তার করিয়াছিল এবং ভার্দুন থেকে টুলোঁ পর্যন্ত এমন একটি গৃহ বা কুটির ছিল না যেখানে কেউ মারা যায় নাই বা বিকলাঙ্গ হয় নাই। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরিয়া জার্মান সমরশক্তির ত্রাসের মধ্যে ফ্রান্সকে বাস করিতে হইয়াছিল··· কিন্তু মহাযুদ্ধরূপী ভূমিকম্পের আলোড়নের পর রাষ্ট্রজীবনের ফাটলগুলি পূর্ণ করিবার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল, কিংবা পুরাতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বদলে যে নূতন সমাজতান্ত্রিক সৌধ নির্মাণের ঐতিহাসিক দাবী ছিল, ফরাসী রাজনীতি ও অর্থনীতির নেতাগণ সেদিক দিয়া অগ্রসর হইলেন না। তখন পূর্বদিকে সোভিয়েট বিপ্লবের আতংকে ইউরোপ ছিল শংকাম্বিত। সুতরাং ফ্রান্সের জনসাধারণ শাসক ও ধনতন্ত্রবাদী শ্রেণীর দ্বারা উপেক্ষিত এবং ১৯১৮ সালের পরবর্তী জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার দ্বারা নিষ্পেষিত হইতে লাগিল—যদিও মাঝে মাঝে তথাকথিত বাহ্যিক শান্তির যুগও ছিল। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এই অবস্থা চলিতে লাগিল, যখন ফ্রান্সের ধনিক ও শাসক সম্প্রদায় এবং রক্ষণশীল রাজনীতিকগণ ভিতরে ভিতরে ফ্যাসিজিমের দিকে ঝুঁকিতে লাগিলেন। এই সময় শ্রেণী স্বার্থের সংঘর্ষে আভ্যন্তরীণ সামাজিক দ্বন্দ্বও ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে একদিকে শ্রমিক সাধারণের মধ্যে গভীর অসন্তোষ এবং অন্যদিকে বামপন্থী

দলগুলির মধ্যে শক্তি সঞ্চয় ঘটিতে লাগিল। আর আন্তর্জাতিক জগতে ইতালী, জাপান ও জার্মানীর ফ্যাসিস্ট নীতি ও পদ্ধতির অগ্রগতিতে তখনই বামপন্থী দলগুলির মধ্যে শান্তির ব্যাঘাত ও যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে উদ্বেগ দেখা দিল। কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত ও কৃষকশ্রেণী অধ্যুষিত ফ্রান্সের আসল মালিক ছিলেন ২০০ ধনী পরিবার, যাঁদের উদ্ভব হইয়াছিল নেপোলিয়নের আমলের ব্যাংক অব ফ্রান্সের বিধান হইতে। কার্যতঃ তাঁরাই প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী ফ্রান্সের সমগ্র শ্রমশিল্প অর্থ এবং বাণিজ্যের একচেটিয়া মালিকানার অধিকারী ছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁদেরই হাতে ছিল ফরাসী রাজনীতি ও অর্থনীতির চাবিকাঠি। সুতরাং শ্রমজীবী সাধারণ ও দরিদ্র জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য যাঁরা অগ্রসর হইয়া আসিতেছিলেন, সেই বামপন্থী দলগুলির সহিত স্বভাবতঃই তাঁদের বিরোধ বাধিল। এই বিরোধিতা হইতে আত্মরক্ষার ও ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার জন্য ফ্রান্সের সমস্ত বামপন্থী দল (র‍্যাডিক্যাল, সোসিয়েলিস্ট, কমিউনিস্ট ইত্যাদি) একত্রিত হইবার সংকল্প করিলেন। ১৯৩৫ সালের ১৪ই জুলাই ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিক 'ব্যাস্টিল দিবসে' তাঁরা ৫ লক্ষ নরনারীর সমাবেশ ঘোষণা করিলেন ঃ

"We solemnly pledge ourselves to remain united for the defence of democracy, for the disarmament and dissolution of the Fascist Leagues to put our liberties out of reach of Fascism. We suerer on this day which brings to life again the first victory of the Republic, to defend the democratic liberties conquered by the people of France to give bread to the workers, work to the young and peace to humanity as a whole".[১]

ইহাই তখনকার ফ্রান্সের বিখ্যাত 'পপুলার ফ্রন্টের' জন্মকথা ও মর্মবাণী। শ্রমিক সম্প্রদায় ও সংবাদপত্রের অধিকার হইতে ফরাসী উত্তর আফ্রিকা ও ইন্দোচীন পর্যন্ত প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাঁরা এক গণতান্ত্রিক প্রোগ্রাম স্থির করিলেন এবং ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে ফরাসী প্রতিনিধি পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে তাঁরা ৬১৮টি সদস্য পদের মধ্যে ৩৭৮টি দখল করিলেন।* ফরাসী পার্লামেন্টারি নির্বাচনে এই প্রথম সম্মিলিত বামপন্থী দলগুলির জয়জয়কার হইল। কিন্তু যে সমস্ত বামপন্থী দল লইয়া পপুলার ফ্রন্ট গঠিত হইয়াছিল, তাঁদের সকলেই আসলে বামপন্থী মতবাদ কার্যক্ষেত্রে পুরোপুরি অনুসরণে প্রস্তুত ছিলেন না। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সোসিয়েলিস্ট (১৪৬ জন সদস্য), র‍্যাডিক্যাল (১১৬) এবং কমিউনিস্ট (৭২)। ইঁহারা ছাড়া মধ্যপন্থী ও দক্ষিণপন্থী দলে ছিলেন বাকি সদস্যগণ—যাঁদের আবার র‍্যাডিক্যাল, সোসিয়েলিস্ট, ডেমোক্রাটিক ইত্যাদি দল ও উপদলীয় বহু নামের জন্য বাহির হইতে সত্যকার পরিচয় পাওয়া কঠিন ছিল। সর্বাধিক সোসিয়েলিস্ট দলের নেতা হিসাবে মঃ লিঁও ব্লুম পপুলার ফ্রন্টের পক্ষ হইতে ফ্রান্সে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন।

১। The Fall of The French Republic—by D. N. Pritt K. C.

* ফ্রান্সের আইনসভা বা ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি দুটি পরিষদে বিভক্ত ছিল—উচ্চতর পরিষদের নাম সিনেট এবং নিম্নতর পরিষদের নাম ছিল চেম্বার অফ ডেপুটিস—৪ বৎসর পর পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইত।

কিন্তু মঃ থোরেজ-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন না, তবে, সমর্থন ও সহযোগিতা জানাইলেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মূলগত বিরোধ গোড়া হইতে স্পষ্ট ছিল।

তথাপি ১৯৩৬ সালের বসন্তকাল হইতে ফরাসী রাজনীতি নূতন মোড় নেওয়ার জন্য চেষ্টা করিতেছিল এবং পপুলার ফ্রণ্ট উহারই বাহক ছিল। কিন্তু কলকারখানার দুর্গত শ্রমিকসাধারণ ইতিমধ্যে অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং নূতন সোসিয়েলিস্ট গভর্নমেণ্ট যথোচিত শক্তিলাভের পূর্বেই জুন মাস হইতে ফ্রান্সের সর্বত্র কলকারখানায় ব্যাপক ধর্মঘট শুরু হইল। মঃ ব্লুমের নেতৃত্বে শ্রমিক ও মালিকপক্ষ আপোষ করিলেন এবং শ্রমিকশ্রেণী প্রভূত জয়লাভ করিল। তাঁদের খাটুনির সময় নির্দিষ্ট হইল সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা, বৎসরে বেতনসহ ১৪ দিনের ছুটি এবং শতকরা ১০ হইতে ১৫, কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০ ভা গপর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি। মন্ত্রিসভায় ও পার্লামেণ্টে সম্মিলিত বামপন্থী দলের আধিপত্য এবং বাহিরে শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি সঞ্চয়—এই উভয় সংকটে পড়িয়া মালিকশ্রেণী অনিচ্ছা সত্ত্বেও নতিস্বীকারে বাধ্য হইলেন। সুতরাং নিজেদের আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিয়া ফ্রান্সের পুঁজিপতি ও মালিকশ্রেণী এই সময় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন পপুলার ফ্রণ্টকে ভাঙ্গিবার জন্য। ফ্যাসিস্ট, আধা-ফ্যাসিস্ট ও ধনিকের দল চক্রান্ত করিলেন এবং পূর্বেই বলা হইয়াছে তাঁদেরই হাতে ছিল ফরাসী রাজনীতি ও অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি। তাঁরা আবার লণ্ডনের ব্যাংকার ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে জোট পাকাইলেন। সুতরাং ফ্রান্সে মুদ্রানীতি ও বাজেটের বিভ্রাট ঘটিল এবং মঃ ব্লুম ধনপতিদের এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন না হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। ফ্রান্সের উচ্চতর পরিষদ বা সিনেটের গঠন 'প্রতিনিধি পরিষদের' মত ছিল না। সেখানে রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী এবং র্যাডিক্যালদেরই আধিক্য ছিল। ১৯৩৭ সালের জুন মাসে সিনেটের ভোটাধিক্যে ব্লুম মন্ত্রিসভা পরাজিত হন, (যদিও নিম্ন পরিষদে তখনও তাঁদের বিপুল মেজরিটি) এবং মঃ ব্লুম প্রতিরোধের বদলে পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থলে র্যাডিকেল দলভুক্ত মঃ শোঁতা প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ব্যাংকারদের সমর্থন লাভের চেষ্টায় তিনি দক্ষিণপন্থীদের দিকে ঝুঁকিলেন। ফলে, তিনি সোসিয়েলিস্টদের সমর্থন হারাইলেন এবং তাঁর মন্ত্রিসভার পতন হইল। দুই সপ্তাহ ধরিয়া এক অদ্ভুত রাজনৈতিক সংকট চলিল এবং এই সময় ফ্রান্সে কোন "গভর্নমেণ্ট" না থাকায় হিটলার তাঁর পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী (আগের পর্বে 'সামরিক চক্রান্তের' অধ্যায় দ্রষ্টব্য) অস্ট্রিয়া দখল করিলেন। আর ফ্রান্সের রাজতন্ত্রবাদী, ফ্যাসিস্টতন্ত্রবাদী ও অন্যান্য রক্ষণশীলেরা প্রতিক্রিয়াশীলদের শক্তিবৃদ্ধি করিতে লাগিল। কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সশস্ত্র Cagoniard (Horded Men) দল সৈন্যবাহিনী ও ধনিকদের সহায়তায় মাথাঝাড়া দিয়া উঠিল।[১] এই সময় ১৯৩৮ সালের ১২ই মার্চ নূতন সংকট হইতে ত্রাণলাভের জন্য কমিউনিস্ট পার্টিসহ সমস্ত বাম ও মধ্যপন্থীদের সহযোগিতায় মঃ ব্লুম আবার প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন। তখন চেম্বারলেনের নেতৃত্বে বৃটেনেও প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজত্ব চলিয়াছে এবং ইতালী, জার্মানী ও স্পেনের ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির প্রতি তোষণনীতির পালা পুরাদমে চলিয়াছে। এই আন্তর্জাতিক তোষণনীতির ঘূর্ণাবর্তে ফ্রান্সও গভীর-ভাবে জড়াইয়া পড়িল এবং মঃ ব্লুম আবার পদত্যাগে বাধ্য হইলেন। দালাদিয়েব-এর,

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৯৯-১০০।

রাজত্ব শুরু হইল এবং চেম্বারলেনের সহযোগিতায় ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে মিউনিক সংকট ও মিউনিক চুক্তির পালা আরম্ভ হইল। এই সময় ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্টেরও শেষ সমাধি রচিত হইল এবং জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের সমস্ত স্বপ্ন রূঢ় আঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল। তখনও আর একবার শ্রমিক সাধারণের 'জেনারেল স্ট্রাইক' বা সর্বজনীন ধর্মঘট (১৯৩৮, ৩০শে নভেম্বর) আহ্বান করিয়া ফ্যাসিস্ট পক্ষপাতী শাসন অচল করিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু গভর্নমেণ্ট এজন্য পূর্বাহ্ণেই প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া তাঁরা এই 'জেনারেল স্ট্রাইক' ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহার পর ফ্রান্স দালাদিয়েরের নেতৃত্বে চলিল যুদ্ধের দিকে, কতকটা ইচ্ছায় কতকটা বা নিজের অজ্ঞাতসারে। জনসাধারণ ক্ষুব্ধ, বামপন্থী দল রুষ্ট এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ জয়গর্বে উৎফুল্ল—আর সশস্ত্র ও দুর্ধর্ষ হিটলারী বাহিনী ইউরোপ দখলে অগ্রসরমান। এই পটভূমিকার মধ্যে পোল্যাণ্ডের পরাজয়ের পর ১৯৪০ সালের বসন্তকাল আসিল, যখন মঃ রেনো নূতন মন্ত্রিসভার ভার গ্রহণ করিলেন।

ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের এই সংক্ষিপ্ত চিত্র স্মরণে রাখিলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তার পতনের কারণগুলির সহজে বুঝা যাইবে। এখানকার রাজনৈতিক দলগুলিকে মোটামুটি দক্ষিণ, বাম ও মধ্য—এই শ্রেণীতে ভাগ করিলেও একটি সুসংবদ্ধ, শক্তিশালী এবং দৃঢ় নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণের আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা কাহারও ইতিহাসকেই গৌরবান্বিত মনে করা চলে না। কারণ, মূলতঃ কোন দলের সঙ্গেই অপরের আন্তরিক মিল ও যোগ ছিল না—একমাত্র রক্ষণশীলগণের শ্রেণীস্বার্থের লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা ছাড়া। সুতরাং বহু দলে ও উপদলে ছত্রভঙ্গ ফরাসী রাজনীতির ইতিহাসে দেখা যায় যে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রিপাবলিক রাষ্ট্র পত্তনের পর হইতে কোন ফরাসী মন্ত্রীসভার আয়ু গড়পড়তা ৮ মাসের বেশী ছিল না এবং এই সময়ের মধ্যে মোট ১০৬ বার গভর্নমেণ্ট বা মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল।* সুতরাং ফরাসী রাজনৈতিক বিরোধের চেহারা সহজেই অনুমেয়।

স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতিতে ফ্রান্সের এই সংকট ১৯৪০ সালের রণক্ষেত্রে সর্বনাশা মূর্তি লইয়া দেখা দিল এবং ইহার মূল যদিও প্রথম মহাযুদ্ধের গভীর আবর্তের মধ্যে, তথাপি বাহ্যিক বিশ্লেষণে ইহার আরম্ভ অপেক্ষাকৃত আধুনিক—১৯৩৫ সাল হইতে যখন ইউরোপীয় পররাষ্ট্র নীতিতে ফ্রান্স ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। মঃ লাভালের আমল হইতেই ফ্রান্সের আত্মরক্ষার রক্ষণশীল ঐতিহ্যের সমাধি ঘটে। ইহার পূর্বে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত মঃ বার্থো বৃটেন, সোভিয়েট রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির সহিত সখ্যতা ও চুক্তি সম্পাদন করিয়া হিটলারী অগ্রগতির বিরুদ্ধে বেষ্টনীজাল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ফ্রান্সের রক্ষণশীল রাজনীতিকগণ যেমন দ্যক্লস, ক্লেমেশ' এবং পয়েঁকার যদিও 'সেকেলে নীতি' অনুসরণ করিয়াছিলেন, তথাপি বৃটেনের চার্চিলের মত গভীর স্বদেশানুরাগের এবং সাহস ও বুদ্ধির দ্বারা ফ্রান্সের আত্মরক্ষার দিকটা শক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কুক্ষণে লাভাল এই সনাতন নীতি ত্যাগ করিয়া একদিকে যেমন ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল পন্থা অনুসরণ করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে তেমনই আভ্যন্তরীণ জাতীয় শক্তি ও উপাদানগুলিকে দুর্বল করিয়া ফেলিলেন। ইতালীর পক্ষপাতী লাভাল ফরাসী রাজনীতিতে মুসোলিনীর বিষ প্রবেশ

* **Penguin Political Dictionary** ফ্রান্স দ্রষ্টব্য

করাইলেন, আবার মুসোলিনীর মারফৎ হিটলারের সহিত সেতুবন্ধ রচনা করিলেন। ১৯৩৬ সালে অবশ্যই পপুলার ফ্রণ্টের দ্বারা বামপন্থীরা কিছুটা প্রতিষেধক অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু সোসিয়েলিস্ট নেতা মঃ ব্লুমের ভ্রান্ত শান্তিবাদ, যাহা কার্যতঃ দক্ষিণপন্থীদিগকে শক্তিশালী করিল, তাহাই আবার বামপন্থীদের সম্মিলিত অভিযানেরও মৃত্যু ঘটাইল। একদিকে বৃটেনে চেম্বারলেন ইতালী ও জার্মানীকে খুসী করিতে গিয়া মিঃ ইডেনের মত রক্ষণশীল নেতাকে পর্যন্ত পররাষ্ট্র সচিবের পদ হইতে অপসারিত করিলেন এবং বৃদ্ধ লর্ড হ্যালিফ্যাক্সকে সেই গদীতে বসাইলেন। ফ্রান্স ও বৃটেন যেন পাল্লা দিয়া তোষণনীতির দিকে ঝুঁকিলেন এবং লাভাল, ফ্লাঁদ্যা, বনেট, দালাদিয়ের প্রভৃতি একে একে সমস্ত ফরাসী রাজনীতিকই আত্মহত্যার পথ অনুসরণ করিয়া চলিলেন। শান্তিবাদ, তোষণনীতি ও পরাজিতের মনোভাব ফ্রান্সকে এমনভাবে পাইয়া বসিল যে, যুদ্ধায়োজনে ও আত্মরক্ষায় যেমন বিভ্রাট ঘটিল, তেমনই বাম ও দক্ষিণপন্থীর মধ্যেও সীমারেখা ঘুচিয়া যাইতে লাগিল। এই সময় ফরাসী রাজনীতিতে তিন প্রকার প্রধান দলের যে অবস্থা দাঁড়াইল, এককথায় তাঁদের সকলকেই 'পরাজয়বাদী' বলা যাইতে পারে। যথা—(১) প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী যাঁরা ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে মিত্রতার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। (২) যাঁরা পুঁজিপতি ও ধনিকদের পক্ষ হইতে তোষণনীতির দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইবার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন। (৩) বামপন্থী দলগুলির মধ্যে গোঁড়া শান্তিবাদিগণ, যাঁরা যুদ্ধের বিরোধিতা করিতেছিলেন। যদিও এই দলগুলির মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর আদৌ মিল ছিল না, তথাপি ইহাদের সমষ্টিগত ফল গিয়া দাঁড়াইল ফ্রান্সের বিপর্যয়ে। প্রথম দল চাহিলেন ফ্যাসিজমের সহযোগিতায় রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়া রাখিতে, সুতরাং যুদ্ধে হিটলারের পরাজয়ের জন্য তাঁরা শংকাবোধ করিলেন। দ্বিতীয় দল ধনতন্ত্রের নির্বিঘ্নতা ও ব্যবসায়-বাণিজ্য মারফৎ অবাধ শোষণ সুরক্ষিত করার জন্য বৈদেশিক নীতিতে শান্তির দিকে ঝুঁকিলেন এবং তৃতীয় দল গণতন্ত্র ও যুদ্ধ-বিরোধিতার বামপন্থী বুলি আওড়াইয়া শান্তিবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে, ফ্রান্সে দক্ষিণপন্থী হইতে বামপন্থী পর্যন্ত তোষণবাদী ও পরাজয়বাদীদের একটি 'ইউনাইটেড ফ্রণ্ট' গড়িয়া উঠিল।[১] ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে দালাদিয়েরের মন্ত্রিসভা মিউনিক সংকটে গিয়া পেঁাছিলেন এবং তারপর এই শোচনীয় অংকের যেটুকু বাকি ছিল, তার যবনিকাপাত হইল রেনোর মন্ত্রিসভায়।

ফরাসী রাষ্ট্রের আসল মেরুদণ্ড ছিল র‍্যাডিক্যাল পার্টি, যেমন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কংগ্রেস। এই র‍্যাডিক্যাল পার্টি ফ্রান্সের একদিকে বণিক, ব্যাংকার ও ধনিকদের এবং অন্যদিকে গণতন্ত্রবাদী মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যোগসূত্রস্বরূপ ছিলেন। ইহাদিগকে মধ্যপন্থী বলিয়া স্বীকার করিলেও দেখা যাইবে যে দক্ষিণপন্থীদের পাল্লায় পড়িয়া ইঁহারা যে কোন মূল্যে শান্তিরক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। এদিকে সংবাদপত্রের ভ্রান্ত ও অজ্ঞাতপ্রসূত (এবং তাঁরা ছিল ধনিক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক) প্রচারকার্যের ফলে জনসাধারণও আসল বিপদ সম্পর্কে উদাসীন ছিল। ইহার প্রমাণ এই যে ১৯৩৮ সালে মিউনিক চুক্তির পর প্যারিসে প্রত্যাগত দালাদিয়েরের প্রতি জনসাধারণ আনন্দের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত অভিবাদন জানাইল এবং···

১। 'Battle for the World'—by Max Werner, page 127-28

'the crowds almost threw themselves under the wheels of the Premier's car'[১]

অবশ্য বৃটেনেও চেম্বারলেন করতালিধ্বনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু সেখানকার অবস্থা ফ্রান্সের মত এত ভয়াবহ ছিল না। অত্যাসন্ন যুদ্ধের মুখে ফ্রান্সের কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই অপরের বনিবনা ছিল না এবং পররাষ্ট্রীয় নীতিতে কেবল বিতর্কের ঢেউ চলিতে লাগিল। প্রত্যেক দলই স্ব স্ব মতবাদ অনুসারে হিটলারের জয়যাত্রার মধ্যে কিছু কিছু সুবিধা খুঁজতেলাগিলেন। ফলে, সমগ্র ফ্রান্সের পক্ষ হইতে একটি দৃঢ় ও শক্তিশালী নীতির দ্বারা যুদ্ধের রাজনৈতিক পরিচালনা এবং সৈন্য ও জনসাধারণকে উদ্দীপনা জোগাইবার কেহ রহিল না। অর্থাৎ ইংলণ্ডে রক্ষণশীল চার্চিলের মত যেমন একজন সিংহপুরুষ দেখা দিয়াছিলেন, ফ্রান্সের তেমন কেহ ছিলেন না।

মিউনিক চুক্তির পর ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে 'শান্তিরক্ষার' জন্যে একটি চুক্তি হইয়াছিল। কিন্তু বাহ্যতঃ উহা শান্তির নাম করিয়া অনুষ্ঠিত হইলেও হিটলারের চিরন্তন ধাপ্পা নীতির কৌশল যেমন উহাতে ছিল, তেমনই ফরাসী ধনিক গোষ্ঠীর অগ্রণী 'দুইশত পরিবার' পিছন হইতে সমস্ত কলকাটি নাড়িতেছিলেন সোভিয়েটের বিরুদ্ধে। এই বিরোধিতার চরম দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে ফিনল্যাণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের সময় ১৯৩৯-৪০-এর শীতকালে। তখন ফরাসী গভর্নমেণ্ট স্থির করিয়াছিলেন যে তাঁরা ৫০ হাজার সৈন্য পাঠাইবেন ফিনল্যাণ্ডের সাহায্যের জন্য। অবশ্য বৃটেন এবং আমেরিকাও এই মতাবলম্বী ছিলেন। এই সময় ফ্রান্সে যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনের নাম করিয়া আভ্যন্তরীণ শাসনে পীড়ন নীতির অবাধ স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। অথচ আসল যুদ্ধের প্রশ্নে শাসক গোষ্ঠী মনে করিতে লাগিলেন যে, সামাজিক বিপ্লবের চেয়ে বরং হিটলারের জয়লাভ শ্রেয়তর। তাঁরা পর্লামেণ্টের বদলে জরুরী আইনের (আমাদের দেশের অর্ডিনান্সের মত) দ্বারা দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। ১৯40 সালের বসন্তকালে ফরাসী প্রতিনিধি পরিষদের যে সাধারণ নির্বাচন হইবার কথা ছিল, ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালেই তাহা স্থগিত রাখার জন্য সিদ্ধান্ত হইল এবং রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরের পর পররাষ্ট্র সচিব জর্জ বনেতের মত ধূর্ত ও কৌশলী লোক কমিউনিস্ট পার্টিকে দমনের ব্যবস্থা পাকা করিলেন। দুইটি কমিউনিস্ট পত্রিকা হিউম্যানিটি ও উ সন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং স্বাধীন মতাবলম্বী সাংবাদিকগণ দমিত হইলেন। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। তখন ফরাসী সাম্যবাদী দল অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন, তাঁদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ। সাম্যবাদীগণের দ্বারা পরিচালিত সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন ও মিউনিসিপ্যালিটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রো-হিটলার ও অ্যাণ্টিওয়ার—হিটলারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও যুদ্ধের বিরোধিতার অভিযোগ আনা হইল।

যে যুদ্ধের অজুহাতে এই প্রকার পীড়ন নীতি আরম্ভ হইল, সেই যুদ্ধের আয়োজন কি প্রকার ছিল? প্রকৃতপক্ষে সমর সম্ভার উৎপাদনের জন্য 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মোবিলাইজেসন' বা শ্রমশিল্পের সমাবেশ ঘটিল না। বরং রাজনৈতিক আবর্ত ও পীড়ন নীতির ফলে জনসাধারণ ও শ্রমিকগণ হতাশ হইয়া পড়িল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃঃ ১৩১

পারে যে 'রেনল্ট' কারখানাগুলিতে যেখানে শান্তির সময়ে ৩০ হাজারের অধিক শ্রমিক কাজ করিত, যুদ্ধের সময় সেখানে সংখ্যা দাঁড়াইল ৬ হইতে ৮ হাজারে।

কারখানাগুলিতে কাজ এভাবে মন্দীভূত বা অচল হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ মুনাফাবাজী ও ফ্যাসিস্ট সাহায্য দান চলিতেছিল পুরাদমে। এমনকি ফ্রান্স হইতে গাড়ী ভর্তি লোহ ধাতু লাক্সেমবুর্গ ও বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া জার্মানীতে পর্যন্ত যাইতেছিল।[১] এই প্রকার দেশদ্রোহিতা কল্পনাতীত ছিল বটে, কিন্তু সেদিনের ফরাসী রাজনীতিতে ইহাও সম্ভব ছিল।

সমাজের কোন স্তরেই আত্মবিশ্বাস, বলিষ্ঠতা ও শত্রু-প্রতিরোধের দুর্জয় সংকল্প ছিল না। এমনকি বামপন্থী দলগুলিও এই দিক দিয়া দোষমুক্ত ছিলেন না এবং তাঁদের আচরণ সোভিয়েট-বিদ্বেষী ও সোভিয়েট পক্ষপাতি, উভয়েরই সমালোচনার স্থল হইয়াছিল। যে অদ্ভুত, জটিল ও শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, উহার জন্য দক্ষিণ, বাম ও মধ্যপন্থী—প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই দায়ী ছিলেন। তবে, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, তাঁরা সম্ভবতঃ স্বেচ্ছায় ফ্রান্সের এই অধঃপতনে সাহায্য করেন নাই। কিন্তু শান্তিরক্ষার অতিরিক্ত আগ্রহ এবং সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার' সিদ্ধান্ত (বিশেষতঃ ১৯৩৯ সালের রুশ-জার্মান চুক্তির প্রতিক্রিয়া) পৃথিবীর সর্বত্রই কমিউনিস্ট পার্টি মহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতবর্ষ, বৃটেন এবং আমেরিকাও ইহা হইতে বাদ গেল না। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কুজ্‌ঝটিকা তারও গভীর ছিল এই কারণে যে, ইহা বৃটিশ শাসনের অধীন ছিল। তবে, ১৯৩৯-৪০ সালের আন্তর্জাতিক সঙ্কটে কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব মোটামুটি এই প্রকার ছিল—

"This is not our war—this battle between two gangster groups—the British French and the Hitlerite. Let us keep out of it."

—১৯৪০ সালের ১২ই মে, মার্কিন কমিউনিস্ট পত্রিকা 'সানডে ওয়ার্কারের' মন্তব্য।[২]

১৯৪২ সালের রিয়ম মামলার শুনানীর সময় মন্ত্রিদপ্তর, কারখানার মালিক এবং শ্রমিক ও কমিউনিস্টদের সহিত সংঘর্ষ ও বিরোধের বহু তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। তখন আদালতে দালাদিয়ের স্বীকার করিয়াছিলেন যে, স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে ফরাসী সেনাপতিরা স্থির করিয়াছিলেন যান্ত্রিক যুদ্ধ কোন কাজে আসবে না। সুতরাং অর্থসচিবের দপ্তর এই সম্পর্কে ব্যয় মঞ্জুরিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিমান সচিবের দপ্তর অভিযোগ করেন যে কমিউনিস্টরা কারখানায় বিমান উৎপাদনে বাধা দিতেছিল, আর দালাদিয়ের বলেন যে, বিমান কারখানা 'জাতীয় সম্পত্তি'তে পরিণত করার দুর্বুদ্ধি প্রমাণের জন্য মালিকেরাই উৎপাদনের বিভ্রাট ঘটান এবং স্যাবোটাজের চক্রান্ত করেন। ফলে নূতন ট্যাঙ্ক বা বিমানবহর ফরাসী বাহিনীর কিছুই ছিল না।[৩]

১৯৩৬ এবং ১৯৩৮ সালে ধর্মঘট ও শ্রমিক অসন্তোষের কথা উল্লেখ করিয়া আর একজন সমালোচক বলিয়াছিলেন, যে যখন জার্মানীর কারখানাগুলি দিনরাত্রি সমর সম্ভার উৎপাদনে ব্যস্ত ছিল, তখন ফ্রান্সে আরম্ভ হইল সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা খাটুনি, আর

১। The Fall of The French Republic—by D. N. Pritt. Page 125-31

২। The Great Challenge—by Louis Fischer, page 8

৩। পূর্বধৃত পুস্তক—পৃ ১৫

বিমান কারখানাগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার মারাত্মক পরীক্ষা এবং ধর্মঘটের জন্য ১৯৩৮ সালে ফ্রান্সের সমগ্র কারখানাই একসময় অচল অবস্থায় পেঁছিয়াছিল।[১]

সোভিয়েট পক্ষপাতী ম্যাক্স ভার্নার লিখিয়াছেন যে, সোসিয়েলিস্ট ও কমিউনিস্ট এবং র‍্যাডিকেল পার্টির বামপন্থিগণ গোড়াতে হিটলার-বিরোধী ও মিউনিক চুক্তির একান্ত বিরোধী ছিলেন। প্রতিরোধের দিকেই তাঁদের ঝোঁক ছিল। কিন্তু রুশ-জার্মান চুক্তির পর ইহার পরিবর্তন ঘটিল এবং সাম্যবাদী দলও কার্যতঃ পরাজয়বাদী ও তোষণবাদী দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িলেন। আর দক্ষিণপন্থীরা সেই সুযোগে সর্বহারা শ্রেণী ও বামপন্থী দলের উপর সর্বপ্রকার আক্রোশ মিটাইবার সুযোগ পাইলেন।[২]

আর ইংলণ্ডের তো ১৯৩৯ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৪১ সালের জুন মাস পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও সাম্যবাদ অনুরাগীদের মধ্যে প্রবল বিরোধ ও বিতর্ক আরম্ভ হইল। সাম্যবাদীগণ বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কোন তফাৎ দেখিতে পাইলেন না। তাঁরা প্রতিদিন শ্রেণী-বিদ্বেষ প্রচার করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, এই যুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণীর কোন স্বার্থ নাই। হিটলারের চেয়েও তাদের আসল শত্রু বলিয়া প্রচারিত হইল বৃটিশ ধনিকতন্ত্র এবং উহার সমগোত্রী ফরাসী পুঁজিবাদীগণ। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির উপর অত্যাচার ও পীড়ন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাদের যুদ্ধ বিরোধিতার নীতি, আচরণ ও কার্যই সেই সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ফরাসী শাসক গোষ্ঠীর অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল।[৩]

তথাপি শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি এই ভ্রম সংশোধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যদিও তখন অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল এবং রণক্ষেত্রে জার্মান বাহিনীকে আর প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। ১৯৪০ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কমিউনিস্ট পার্টি এক উদ্দীপনাময় ইস্তাহার ও বিবৃতি ফ্রান্সের সর্বত্র প্রচার করিলেন। এই ইস্তাহারে ফ্রান্সের বিপর্যয়ের কারণগুলি এবং শাসকশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—

"The ruling class has brought our country to the brink of the precipice. Today when German imperialism is putting into practice its plan of enslaving France, all that the Erench rulers are concerned with is to save their privileges, their capital, their class domination. They are ready to sacrifice the independence of our country···their regime is one of organized treachery towards our nation.···As ever under all conditions so in present days of severe trials. horror, and boundless calamities, we Communists have been and remain with our people. Their fate is our fate. Our people will not perish".[৪]

১। From Dunkirk to Benghazi—by Strategicus. P. 12
২। Battle For the World—P. 133
৩। 'The Betrayal of the Left'—edited by Victor Gollancz. P. 50-60
৪। The Fall of the French Republic—Page 159-62

ইহার পর প্রধানতঃ ফরাসী সাম্যবাদীগণের চেষ্টাতেই পদানত ফ্রান্সে জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁদের আচরণ পূর্বাপর বুদ্ধিসম্মত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না; বরং অত্যন্ত ক্ষতিকর ছিল।

কিন্তু শাসকগোষ্ঠী সম্পর্কে ফরাসী সাম্যবাদীগণের নিন্দাবাদ আদৌ অতিরঞ্জিত ছিল না। দালাদিয়েরের পর ১৯৪০-এর বসন্তকালে রেনো মন্ত্রিসভাও অক্ষমতার বাহন হইয়া পড়িয়াছিল। আর নাৎসী পক্ষপাতী দল মার্শাল পেঁতা ও জেনারেল ওয়েগাঁর নেতৃত্বে প্রাধান্য অর্জন করিয়া ফ্রান্সকে হিটলারের নিকট আত্মসমর্পণে অগ্রসর করিয়া দিতেছিল। এলেন দ্য পোহ্‌তে নাম্নী একটি ব্যক্তিত্বসম্পন্না স্ত্রীলোক ছিল রেনোর রক্ষিতা। এই স্ত্রীলোকটি মার্সাই হইতে প্যারিসের অভিজাত মহলে আসিয়াছিল জার্মানীর গুপ্তচর বৃত্তি লইয়া এবং নাৎসী স্পাই অ্যাবেটির আড়কাঠি স্বরূপ ছিল এই স্ত্রীলোকটি। এলেন দ্য পোহ্‌তে প্রধানমন্ত্রী রেনোর উপর মায়াজাল বিস্তার করিল এবং হিটলারের নিকট আত্মসমর্পণে প্ররোচনা দিল। বহু দেশের ঐতিহাসিক দুর্দিনে যেমন স্ত্রীলোকের অদৃশ্য হস্তের প্রভাব দেখা যায় (সেই সময়কার ইতালীতে মুসোলিনী, জার্মানীতে হিটলার এবং রুমানিয়ায় রাজা ক্যারলও প্রণয়িনীরূপিনী রক্ষিতাদের প্রতি আসক্ত ছিলেন। তবে, হিটলারের উপর নারীর প্রভাব বিস্তারের কোন নজীর নাই) ফ্রান্সেও ইহার অভাব ছিল না। এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে পল বোদোঁ শনি ও রাহুর মিলনের মত রেনোর ভাগ্যচক্রে দেখা দিল।[১]

আর একটি বিবরণীতে দেখা যায় যে, মাদাম দ্য পোহ্‌তে প্রধানমন্ত্রী রেনোর স্ত্রীর একজন বান্ধবী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে রেনোর ঘনিষ্ঠতা প্রায় স্ত্রীর পর্যায়ে উঠিল এবং প্যারিসের মার্কিন কূটনৈতিক মহলের ডিনার টেবিলে রেনোর সঙ্গে এই দুই মহিলাকে নিয়া সময় সময় অস্বস্তিকর অবস্থা দেখা দিত। মাদাম দ্য পোহ্‌তে হিটলার ও ফ্যাসিজমের পক্ষপাতী ছিলেন এবং রেনোর মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর তাঁরই তাগিদে রেনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রেনো মাদামকে সঙ্গে নিয়া (স্ত্রীকে নয়!) এবং একটি গাড়ীতে মালপত্র বোঝাই করিয়া ওয়াশিংটন যাত্রার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স ত্যাগ করিয়া স্পেনীয় সীমান্তে আসিয়া হাজির হইলেন। মোটর গাড়ী চালাইতে ছিলেন মাদাম নিজে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের আর ওয়াশিংটন যাওয়া হইল না। কারণ, হঠাৎ একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার পথে যে দুর্ঘটনা ঘটিল তার ফলে মাদাম মারা গেলেন এবং মঃ রেনো গুরুতর আহত হইলেন।

সেই সময় ফ্রান্সের নৈতিক অবহাওয়া যে কলুষিত ছিল, তার আর একটা প্রমাণও পাওয়া যায়। ১৯৩৯ সালে মার্শাল পেঁতা মাদ্রিদের ফরাসী রাষ্ট্রদূতের পদে ছিলেন। তখন ফ্রান্সের পতনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকাইয়া পেঁতার কয়েকজন বন্ধু তাঁকে প্যারিসে ফিরিয়া গিয়া এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রকাশ যে, মার্শাল পেঁতা তখন জবাব দেন:

'What would I do in Paris? I have no mistress'!

'আমি প্যারিসে গিয়ে কি করবো? আমার তো রক্ষিতা নেই!'

বিশিষ্ট মার্কিন কূটনীতিবিদ রবার্ট মারফি তাঁর পুস্তকে ('Diplomat Among

১। Truth on the Tregedy of France—by Elie J. Bois. P. 236-241

Warriors') এই সমস্ত ঘটনার কথা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, যে সমস্ত মহিলার সঙ্গে ফরাসী গভর্নমেণ্টের লোকদের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁরা রাজনৈতিক প্রভাব খাটাইতেন এবং জার্মান ও রুশ গুপ্তচরেরা তার সুযোগ নিতেন।···

বৃটেনের সংকটের কারণ

ফ্রান্সের যখন এই অবস্থা তখন বৃটেনের চিত্রও খুব উজ্জ্বল ছিল না। তবে 'চ্যানেল ও চার্চিল' এবং বিমানবহর (লুই ফিসারের ভাষায়) ইংলণ্ড দ্বীপকে রক্ষা করিল। কিন্তু চেম্বারলেনের নেতৃত্বে বৃটেনও ক্রমশঃ ফ্রান্সের অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তবে, সেখানে সাম্রাজ্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শ্রমিকদল ও রক্ষণশীল-দলের (উদারনীতিক দলের শক্তি উল্লেখযোগ্য নহে) মধ্যে মোটামুটি মতের ঐক্য ছিল বলিয়া চেম্বারলেন নরওয়ে যুদ্ধের কেলেঙ্কারির পর বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যদিও ইউরোপীয় তোষণনীতির প্রধান নায়ক এবং উদ্যোক্তাই ছিলেন তিনি। ফ্যাসিস্ট ও বামপন্থী মতবাদের উগ্রতার দ্বারা বৃটেন ফ্রান্সের মত শতধা বিচ্ছিন্ন ছিল না। বরং ফ্যাসিস্ট মতবাদের উদ্যোক্তা স্যার অসওয়াল্ড মোজলে এবং অন্যান্য ফ্যাসিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হইল—২৩শে মে, ১৯৪০ এবং কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'ডেলি ওয়ার্কার'ও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক শ্রেণী-আধিপত্যের চেষ্টা সেখানেও পুরাপুরি বজায় রহিল। অথচ প্রকাশ্যে ফ্যাসিজমকে আস্কারা দেওয়া হইল না। আর সামরিক মতবাদে বৃটেন চিরন্তন রক্ষণশীলতা ও সাম্রাজ্যনীতির অনুসরণ করিল, যার ফলে ১৯৪০-এর পশ্চিম রণাঙ্গন হইতে বৃটিশ সৈন্যরা কোনমতে সমুদ্র সাঁতরাইয়া বাঁচিয়া আসিল।

বৃটেনের সনাতন রণচিন্তা ৬টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এগুলির মধ্যে প্রধান ছিল নৌবহর ও সমুদ্র পথ—কিংবা অর্থনৈতিক অবরোধ সংগ্রাম, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও সাম্রাজ্য রক্ষা এবং ইউরোপীয় ভুভাগে সীমাবদ্ধ সংগ্রাম। সুতরাং বৃটেনের খাস স্থলসৈন্যকে অভিযাত্রী বাহিনী মাত্র বলা যায়। মূলতঃ বৃটেনের সামরিক মতবাদও আত্মরক্ষামূলক ছিল। কারণ, অর্ধ পৃথিবী ব্যাপ্ত এত বড় সাম্রাজ্যের পর তাদের আর নূতন রাজ্য ও কাঁচামাল দখলের প্রয়োজন ছিল না। বরং এগুলিকে রক্ষা করিয়া চলাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং তাদের রণনীতিতে নৌবহর ও সমুদ্রপথের সংগ্রাম বড় হইয়া উঠিল।

ফ্রান্সের মত বৃটেনও ১৯১৬-১৮ সালের সামরিক অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করিল। ফলে, ইউরোপীয় ভুভাগের যুদ্ধকে বাদ দিয়া দ্বীপ ও সাম্রাজ্য রক্ষার মনোবৃত্তি বৃটেনকেও রণক্ষেত্রের সংকটের দিকে লইয়া গেল। সাম্রাজ্যের এবং মিত্র সঙ্গীগণের লোকবল ও সামরিক বলের উপর নির্ভরতাও তাদের রক্ষণশীল বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিল। এখানেও তাদের শোষণনীতির সূক্ষ্ম কৌশল অনুসরণের চেষ্টা বুদ্ধিমানদের দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। ফলে, বৃটেনের দুর্বল স্থলসৈন্য এবং উপযুক্ত ট্যাঙ্ক ও গোলা-গুলীর অভাব তাকে ইউরোপ হইতে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিল। আত্মরক্ষামূলক রণনীতির প্রধান মন্ত্রগুরু ক্যাপ্টেন লীডেল হার্টের মতামতও বৃটিশ রণচিন্তার উপর প্রভুত প্রভাব খাটাইয়াছিল। কিন্তু লীডেল হার্ট আধুনিক যান্ত্রিক সংগ্রাম সম্পর্কে

সচেতন ছিলেন এবং বৃটিশ আর্মিকে সেভাবে গড়িয়া তুলিবারও পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং 'বেগবান আত্মরক্ষা' বা 'ডাইনামিক ডিফেন্স'-এর তিনি পক্ষপাতী ছিলেন—এই ধরনের-অনড় অচল যুদ্ধের নহে। বিশেষতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত মৈত্রী না করিয়া তিনি জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেনের যুদ্ধযাত্রার একান্ত বিরোধী ছিলেন। কিন্তু রণনীতি ও রাজনীতি, উভয়ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণশীলতা বৃটেনকেও ঘোরতর বিপাকে ফেলিল। ইউরোপীয় ভূমিপথের যুদ্ধের গুরুত্ব এবং 'রাইন নদীর তীর পর্যন্ত বৃটেনের আত্মরক্ষার সীমা'—এই প্রচলিত তত্ত্বও উপেক্ষিত হইল। সুতরাং পরাজয় অনিবার্য ছিল।

একাদশ অধ্যায়

বৃটেনের যুদ্ধ

একক আত্মরক্ষার অপূর্ব দৃষ্টান্ত

ফ্রান্সের পতনের পর হিটলারের জার্মানী আনন্দে আত্মহারা হইল এবং বার্লিনের পথে পথে যুদ্ধোন্মাদ নর-নারীর নূতন রণসঙ্গীত শুনা গেল। এবার হিটলার ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন এবং বৃটিশ জাতিকে নতজানু করিয়া সারা ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা সাজিয়া বসিবেন—এই ছিল নাৎসী পার্টি ও তার ভক্তদের আশা। সুতরাং যুবকদের কণ্ঠে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নূতন যুদ্ধের গান We Sail against Englad ধ্বনিত হইল:

Our flag waves as we march along.
It is a symbol of the power of our Reich.
And we can no longer endure
That the Englishman should laugh at it.
So give me thy hand, thy fair white hand,
Ere we sail away to conquer Eng-e-lnad !

বলা বাহুল্য যে, এই ধরনের যুদ্ধের গান আরও শুনা গেল, যেমন:

We challenge the lion of England
For the last and decisive cup
We judge and say
An Empire breaks up…
Listen to the engine singing—get on to the foe !
Listen, in your ears it's ringing—get on to the foe !.
Bombs, oh Bombs, oh Bombs on England ![১]

এখানে উদ্ধৃত শেষ গানটির শেষ লাইন লক্ষ্য করার মত। কারণ, ইতিহাসে 'ব্যাট্‌ল্‌ অফ ব্রিটেন' নামে যে-যুদ্ধ প্রসিদ্ধ, তার মূল কথা ছিল বৃটেনের বিরুদ্ধে জার্মান বিমানবহরের প্রচণ্ড আক্রমণ, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন বোমাবর্ষণের দ্বারা ইংল্যাণ্ডকে কাবু করা এবং তারপর নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর দ্বারা আক্রমণ। বোমাবর্ষণের উপর কিরূপ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল, তারই প্রমাণ গানের শেষ কলিতে 'বোমা বোমা' বলিয়া চীৎকার !

কিন্তু এই বোমাবর্ষণের সাঙ্গীতিক চীৎকারের জবাবে ইংল্যাণ্ডের কাছ থেকেও পাল্টা গান শুনা গেল এবং সেই গানে হিটলারের প্রতি দস্তুরমত চ্যালেঞ্জের সুর এবং অবজ্ঞামিশ্রিত বিদ্রূপও ধ্বনিত হইল:

১। The WAR—by Loui's L Snyder U. S. A. 1960. P. 146 & 151
(মূল জার্মানী থেকে ইংরাজীতে অনূদিত)

Nepolean tried. The Dutch were on the way,
A Norman did it—and a Dane or two.
Some sailor-king may follow one fine day :
But not, I think, a low land-rat like you !

—A. P. Herbert, Sept, 1940.

এই গানে হিটলারকে মাটির গর্তবাসী ঘৃণ্য ইঁদুর (বা মেটে ইঁদুর) বলিয়া গালাগালি দেওয়া হইয়াছে এবং পরিষ্কার বলা হইয়াছে—'ইংল্যাণ্ড জয় করা তোমার মত মেটে ইঁদুরের কর্ম নয় !'

প্রকৃতপক্ষে হিটলারের ইংল্যাণ্ড আক্রমণের অভিযান (১৯৪০) ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল এবং ইতিহাসের দিকে তাকাইয় বলা যায় যে, ১০৬৬ খৃষ্টাব্দের সেই দীর্ঘ বিস্মৃত নরম্যান বিজয়ের পর প্রায় হাজার বছরের মধ্যে আজ পর্যন্ত আর কোন দুঃসাহসী ইংল্যাণ্ড জয় করিতে পারেন নাই। অবশ্য ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপসের অপরাজেয় 'আর্মাডা' ১২৮টি পালে খাটানো জাহাজ নিয়া ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান করিয়াছিল। কিন্তু সেই বিখ্যাত আর্মাডার ৬৩খানা জাহাজ বৃটিশ প্রতিরোধ ও ঝড়ের কবলে পড়িয়া ধ্বংস হইয়া গেল। অতএব ইংলণ্ড জয় আর হইল না। এমন কি, দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নও চাহিয়াছিলেন ইংরাজের নৌ-দর্পকে চূর্ণ করিতে। কিন্তু 'সমুদ্রপীড়ার' অজুহাতে তিনি আর ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে গেলেন না কিংবা ট্রাফালগার যুদ্ধের (১৮০৫ খৃঃ—যে নৌ-যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের পক্ষ থেকে নেলসন বিজয়ীর মাল্য লাভ করিয়া ইতিহাসখ্যাত হইয়াছিলেন) পরাজয়েরও পুনরাবৃত্তি ঘটাইতে চাহিলেন না।[১] অবশ্য হিটলারও নকল নেপোলিয়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে চাহিয়াছিলেন, (বিশেষভাবে ১৯৪১ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণের দ্বারা) কিন্তু তাঁর সেই দুরাশা কিছুতেই পূর্ণ হইল না।

কিন্তু দুরাশা পূর্ণ না হইলেও ইংল্যাণ্ড জয়ের জন্য তাঁর মনে মনে আশা ছিল অনেক দিন আগে থেকেই। অবশ্য সেই আশা একা হিটলারেরই ছিল না, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েও জার্মান জেনারেল স্টাফ ইংল্যাণ্ড আক্রমণের জন্য কাগজেপত্রে একটা পরিকল্পনার কথা ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু 'অবাস্তব' জ্ঞানে সেটা শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হইল। হিটলারের রণনৈতিক চিন্তা গোড়া থেকেই খুব উর্বর। সুতরাং পোল্যাণ্ড আক্রমণের পূর্বেই ১৯৩৯, ২৩শে মে হিটলার তাঁর প্রধান সেনাপতিগণের এক গুপ্ত বৈঠকে বলিলেন—

'England is the main driving force against Germany···our aim will always be to force Britain to her knees.

কিন্তু এই শত্রুকে কিভাবে নতজানু করা যাইতে পারে ? হিটলার বিগত মহাযুদ্ধের কথা বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন—'যদি আমাদের আরও দুইটি ব্যাটলশিপ এবং আরও দুইটি ক্রুজার থাকিত, আর জুটল্যাণ্ডের যুদ্ধ যদি সকালে আরম্ভ হইত তাহলে বৃটিশ নৌবহর পরাজিত এবং ইংল্যাণ্ড নতজানু হইত।'—এই নৌবহরের উপরেই বৃটেন নির্ভরশীল। অতএব হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম দখল এবং ফ্রান্স পরাজিত হইলে পশ্চিম ফ্রান্সের উপকুল থেকে জার্মান বিমান ও নৌবহর ইংল্যাণ্ডকে কাবু করিতে পারিবে।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ১৬১

অবশ্য এই আলোচনায় হিটলার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ ব্লকেড্ বা অবরোধ যুদ্ধের কথাই ভাবিয়াছিলেন। কারণ 'বিদেশ থেকে আমদানি ছাড়া ইংল্যান্ড বাঁচিতে পারে না।' কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনে ফ্রান্সের ও মিত্রপক্ষের এত দ্রুত বিপর্যয় হিটলার যেন নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সুতরাং ডানকার্কের পর তাঁর মনে মনে আশা ছিল যে, ইংল্যান্ড রণে ভঙ্গ দিয়া জার্মানীর কাছে সন্ধি প্রার্থী হইবে। এমন কি, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে (যেমন, লীডেল হার্ট) চার্চিলকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্যই হিটলার ডানকার্ক থেকে বৃটিশ বাহিনীর এভাবে পরিত্রাণে কোন বাধা দেন নাই। কিন্তু চার্চিল অনমনীয় এবং অপরাজেয়। পশ্চিম রণাঙ্গনের সেই ঘোর দুর্দিনে ডানকার্ক থেকে পরিত্রাণের সন্ধিক্ষণে ৪ঠা জুন, ১৯৪০, তিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন ঃ

'We shall fight on the beaches, we shall fight on landing grounds. We shall fight in the fields & in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. And even if, which I do not for a moment believe, this Island or a large part of it were subjugated and starving, then our Empire beyond the seas armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle...'

তাঁর অনেক বক্তৃতার মত এটিও স্মরণীয় হইয়া আছে। কিন্তু কেবল বাগ্মীতার বাগাড়ম্বর নয়, তিনি ইংল্যান্ডের প্রতিরক্ষার জন্য যথাসম্ভব সর্বাত্মক আয়োজন করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেদিনের বৃটেন ফ্রান্সের মত পরাজিতের মনোভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না এবং জনগণের মধ্যে হিটলারের প্রতি কোন প্রীতিও ছিল না। চার্চিলের সন্দেহ ছিল না যে, ফ্রান্সের পতনের পর বৃটেনই হইবে হিটলারের প্রথম আঘাতের লক্ষ্য। অথচ তখন বৃটেন নিঃসঙ্গ, একাকী—হিংস্র ব্যাঘ্রের সামনে প্রায় নিঃসঙ্গ পথিকের মত। কিন্তু চার্চিল দমিলেন না, ভীত হইলেন না, ইতস্ততঃ করিলেন না। ১৮ই জুন (১৯৪০) তারিখ তিনি জাতির উদ্দেশ্যে এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন জার্মানীর আসন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং সেই বক্তৃতার উপসংহারে বলিলেন ঃ

'Let us therefore brace ourselves to our duties and to bear ourselves that, if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will still say : 'This was their finest hour'.

অবশ্য বৃটিশ সাম্রাজ্য হাজার বছর টিকে নাই, টিকিতে পারিত না, তবু একথা সত্য যে, সেদিনের জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেনের একাকী আত্মরক্ষার-সংগ্রাম সত্যি ইংরাজ জাতির পক্ষে সবচেয়ে চমৎকার দিন বা গৌরবের দিন ছিল।

এই আত্মরক্ষার সংগ্রামের জন্য তাঁর স্বভাবতঃই প্রথমে মনে পড়িয়াছিল নৌবল ও নৌবহরের কথা এবং সেই প্রসঙ্গে পরাজিত ফ্রান্সের নৌবহরের প্রশ্ন। বৃটিশ বন্দরে যে সমস্ত ফরাসী জাহাজ ছিল সেগুলি নিয়া কোন সমস্যা দেখা দিল না। ৩রা জুলাই, ১৯৪০, সেই জাহাজগুলি বৃটেন বিনা রক্তপাতেই দখল করিয়া নিল। ফরাসী লস্করেরা রয়েল নেভীতে গিয়া স্বেচ্ছায় যোগ দিলেন, কিংবা জেনারেল দ্য গলের (যিনি ফ্রান্স হইতে পলাইয়া লণ্ডনে চলিয়া আসিয়াছিলেন) ফ্রী ফ্রেঞ্চ ইউনিট গঠন করিলেন এবং

বাকী অন্যান্যরা স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। আলেকজেন্দ্রিয়া (মিশরে) বন্দরের জাহাজগুলি নিয়া অনুরূপভাবে কোন সমস্যা দেখা দিল না। কিন্তু গোল বাঁধিল ফরাসী উত্তর আফ্রিকার আলজেরিয়াস্থিত ওরান বন্দরের জাহাজগুলি নিয়া। ফরাসী নৌবহরের অধিকাংশ যুদ্ধজাহাজই নোঙর করিয়াছিল ওই বন্দরের অদূরে। সেখানকার ফরাসী নৌ-অফিসারেরা বৃটেনের হাতে কোন জাহাজ অর্পণ আত্মসম্মানের বিরোধী বলিয়া মনে করিলেন এবং চার্লস দ্য গলের মত একজন 'অবাধ্য অফিসারকে' লণ্ডনে 'ফ্রী ফ্রান্স' গঠন করিতে দেওয়ার জন্যও তাঁরা বৃটেনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ছিলেন।[১]

কিন্তু বৃটেনের আত্মরক্ষার জরুরী প্রয়োজনে ফরাসী নৌবহর সম্পর্কে বৃটিশ যুদ্ধমন্ত্রিসভা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন—'এই নৌবহর অচল করিতেই হইবে'। চার্চিল লিখিয়াছেন যে, তাঁর জীবনের 'সবচেয়ে অস্বাভাবিক, বেদনাদায়ক ও ঘৃণ্য সিদ্ধান্ত' ছিল এটা। সুতরাং ৩রা জুলাই, ১৯৪০, ভাইস-এডমিরাল স্যার জেমস এফ সমারভিলের নেতৃত্বে তিনখানা বৃহত্তর বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ ওরানের দিকে রওনা হইল। বৃটিশ নৌ-সেনাপতি ফরাসী কমাণ্ডার ভাইস-এডমিরাল মাহুসেল বি গেঁসোউলকে এই মর্মে এক চরমপত্র পাঠাইলেন—(১) হয় তিনি জার্মানদের বিরুদ্ধে বৃটিশের সঙ্গে যোগদান করুন, (২) কিংবা কোন বৃটিশ পোর্টে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করুন কিংবা, (৩) ফ্রেঞ্চ ওয়েস্ট ইণ্ডিজে চলিয়া যাউন এবং সেখানে জাহাজগুলিকে নিরস্ত্রীকৃত করা হইবে কিংবা মার্কিন আশ্রয়ে পাঠানো হইবে।

এই চরমপত্রের উত্তরদানের জন্য মাত্র ৬ ঘণ্টা সময় দেওয়া হইল। ফরাসী সেনাপতি এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করিলেন। তখন বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজগুলির কামান গর্জন করিয়া উঠিল। তিনটি ফরাসী ব্যাটলশিপ, একটি বিমানবাহী জাহাজ ও দুটি ডেস্ট্রয়ার হয় নিমজ্জিত কিংবা অকেজো হইয়া গেল। কেবল একখানা ব্যাটলশিপ 'স্ট্রাসবুর্গ' প্রচণ্ড জখম হওয়া সত্ত্বেও এবং কয়েকটি ছোট ছোট পোত পলাইয়া গিয়া ফ্রান্সের টুলোঁ বন্দরে আশ্রয় নিতে পারিয়াছিল। পশ্চিম আফ্রিকার ডাকার বন্দরে অবস্থিত আর একখানা বৃহৎ ফরাসী যুদ্ধ জাহাজকেও অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা ঘায়েল করা হইল। ওরানে বৃটিশ আক্রমণের ফলে প্রায় দুই হাজার ফরাসী নাবিক হতাহত হইল।

ওদিকে হিটলার 'শান্তির জন্য গর্জন' করিতে লাগিলেন। মেঠো বক্তা হিসাবে হিটলারও অতুলনীয় ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা (যেমন, মার্কিন সাংবাদিক-ঐতিহাসিক উইলিয়াম শাইরার) সেকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পশ্চিম রণাঙ্গনে জয়লাভ করার পর হিটলার মনে করিলেন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। একাকী ইংল্যাণ্ডের পক্ষে আর যুদ্ধ চালাইয়া লাভ কি, এখন নিশ্চয়ই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কোন কোন নিরপেক্ষ দেশ এবং স্বয়ং পোপও শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি 'সম্মানজনক শান্তি' প্রতিষ্ঠার জন্য মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করিতেও রাজী ছিলেন। কিন্তু চার্চিল বা বৃটেন শান্তি কামনার কোন লক্ষণ দেখাইলেন না। তখন ১৯শে জুলাই সন্ধ্যাবেলা রাইখস্ট্যাগে হিটলার যে বক্তৃতা দিলেন, সেটা ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ বক্তৃতাগুলির অন্যতম এবং রাইখস্ট্যাগেও ওটাই ছিল তাঁর শেষ সেরা বক্তৃতা (অবশ্য মার্কিন সাংবাদিকের মতে)।

এই বক্তৃতার গোড়ার দিকে হিটলার চার্চিলকে 'অবিবেচক রাজনীতিক' বলিয়া গালি-

১। English History 1914 1945. Taylor. 1965. Pelican. P. 601.

দিলেন এবং ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—হাঁ, তিনি কানাডায় পালাইয়া গিয়া বাঁচিবেন বটে, কিন্তু বৃটেনের বাকী লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্গতির কি হইবে ?

তারপর শেষের দিকে তিনি ঘোষণা করিলেন ঃ

'In this hour I feel it to be my duty before my own conscience to appeal once more to reason and common sense in Great Britain as much as elsewhere. I consider myself in a position to make this appeal since I am not the vanquished beggining favours but the victor speaking in the name of reason.

I can see no reason why this war must go on.

এই যুদ্ধ কেন চলিবে, তার কারণ তিনি বুঝিতেছেন না। তিনি যুক্তির নিকট, সাধারণ বুদ্ধির নিকট আবেদন করিতেছেন। কিন্তু তার জন্য কেউ যেন একথা ধরিয়া না নেয় যে, 'আমি পরাজিতের মত অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি', মনে রাখা দরকার 'আমি বিজয়ী এবং বিজয়ী বলিয়াই যুক্তির নামে আমি এই আবেদন করিতেছি'।

কিন্তু হিটলার বিজয়ীর দাম্ভিকতার সুরে যে বক্তৃতাই দিন না কেন, চার্চিলের কাছে—বৃটেনের কাছে তা অগ্রাহ্য হইল।

[উইলিয়াম শাইরার লিখিতেছেন যে, এই বক্তৃতার সময় একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। হিটলার হঠাৎ বক্তৃতার মাঝখানে থামিয়া গিয়া পশ্চিম রণাঙ্গনের ও অন্যান্য যুদ্ধজয়ের জন্য গোয়েরিংকে রাইক মার্শাল পদবীতে ভূষিত করিয়া সবচেয়ে সেরা সম্মান দিলেন এবং ৯ জন আর্মি-জেনারেল ও ৩ জন বিমানবাহিনীর অফিসার—মোট ১২ জনকে ফিল্ড-মার্শাল পদবীতে উন্নিত করিলেন। এঁদের নাম—ব্রাউসিৎস, কাইটেল রুণ্ডস্টেড, বোক, লীব, লিস্ট, ক্লুজ, উইজলবেন, রাইখনাউ এবং মিলচ, কেসেলরিং ও স্পেরেল। একমাত্র বাদ গেলেন লেঃ জেনারেল হ্যাডলার। তাঁকে শুধু জেনারেল করা হইল। এক সঙ্গে এতগুলি ফিল্ড মার্শালের সৃষ্টি ইতিহাসের এক আশ্চর্য ঘটনা।]

হিটলার মনে করিয়াছিলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেই চার্চিল নরম হইবেন এবং শান্তি প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করার পরেও যখন ইংল্যাণ্ডের কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন ১৬ই জুলাই তারিখ ডাইরেকটিভ নং ১৬ অপারেশন সীলায়ন বা ১৬ নং নির্দেশনামা জারী করিলেন। বলা বাহুল্য যে, সেনাপতিদের নিকট এই গুপ্ত নির্দেশনামায় ইংল্যাণ্ড আক্রমণের সাঙ্কেতিক নাম ছিল 'সিন্ধুঘোটক' বা 'সীলায়ন'। সমুদ্রবেষ্টিত ইংল্যাণ্ড দ্বীপ আক্রমণের পক্ষে নামটি যথেষ্ট অর্থবহ ছিল। কিন্তু লক্ষ্য করার এই যে, ১৯শে জুলাইয়ের 'শান্তি বক্তৃতার' আগেই এই গোপনীয় নির্দেশ জারী করা হইয়াছিল। অপর পক্ষে নুরেমবার্গের আদালতের দলিলপত্রে দেখা যায় যে, ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরের তিন সপ্তাহ পরেই হিটলার 'সিন্ধুঘোটকের' পরিকল্পনায় মন দিলেন এবং ১৬ই জুলাই তারিখ যে নির্দেশ দিলেন, উহার সরকারী নাম ছিল ঃ

'General order No. 16 in the preperation of a landing operation against England'. ... ... ('Top Secret'—কথাটি যথানিয়মে উল্লিখিত ছিল)। এই নির্দেশনামায় হিটলার বলেন যে, সামরিক দিক হইতে ইংল্যাণ্ডের অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যাঞ্জক। তবু যখন বৃটেন জার্মানীর

সহিত আপোষরফার কোনই ইচ্ছা দেখাইতেছে না, তখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাই স্থির হইল। ইংল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে দখল করার জন্য কোথায় কোথায় সৈন অবতরণ করানো হইবে এবং অবতরণ সুনিশ্চিত করিবার জন্য কি প্রকারের আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে হইবে, তাও হিটলার নির্দেশ দিলেন। 'আগস্ট মাসের মধ্যভাগের মধ্যে আক্রমণের সমগ্র আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে হইবে।' জার্মান আক্রমণে বৃটিশ বিমানবহর যাতে বাধা দিতে না পারে, উহার জন্য এই বিমানবহর ধ্বংস করিতে হইবে। ইংলিশ চ্যানেলের পথ মুক্ত করিতে হইবে এবং ডেভার প্রণালীর উভয় পার্শ্ব সুরক্ষিত করিতে হইবে! "আমার অধীনে এবং আমার হুকুমনামায় ১লা আগস্ট হইতে প্রধান সেনাপতিগণ তাঁদের দপ্তরসহ আমার সদর দপ্তর (জিগেনবার্গ) হইতে ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করিবেন।"[১]

কিন্তু গুপ্ত নির্দেশ জারী করিলে কি হইবে! সত্য সত্যই ইংল্যাণ্ড আক্রমণের কোন 'বাস্তব পরিকল্পনা' ছিল না এবং তাঁর নির্দেশনামায় "যদি দরকার হয়" এই কথা-টিরও উল্লেখ ছিল। কারণ, তাঁর সেনাপতিরাও এই বিষয়ে খুব 'সিরিয়াস' ছিলেন না। কারণ, প্রথমত হিটলারের নিজের এবং তাঁর সেনাপতিদের যুদ্ধ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী একমাত্র ভুমিপথেই আবদ্ধ ছিল—সমুদ্রের কিংবা জলপথ অতিক্রমপূর্বক আক্রমণের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। এমন কি, হিটলার জেনারেল রুণ্ডস্টেডকে একবার বলিয়াছিলেন—

'On land I am a hero but on water I am a coward' !

অর্থাৎ স্থলপথে আমি একজন বীর, কিন্তু জলপথে আমি কাপুরুষ![২]

সুতরাং সহজ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইংল্যাণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়া স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর মধ্যে বিরোধ বাধিল। কারণ, এভাবে ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া জয় করিতে গেলে জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর যে প্রভূত শক্তির সমাবেশ দরকার, হিটলারী জার্মানীর তা ছিল না। সৈন্যশক্তি নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সেই সৈন্যদল ইংলিশ চ্যানেল পার হইবে কিরূপে? উপযুক্ত নৌশক্তি কোথায়? ইংল্যাণ্ড আক্রমণের জন্য আর্মির পক্ষ থেকে দাবী করা হইল ডোভার থেকে পোর্টল্যাণ্ডের পশ্চিমে লাইম রেগিস পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ উপকূলে পর পর কয়েক দফা সৈন্য অবতরণের জন্য। ডোভারের উত্তরে র‍্যামসগেট অঞ্চলেও অতিরিক্ত সৈন্য অবতরণ ঘটাইতে হইবে। জার্মান নৌ-বিভাগ অবশ্য ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা মনে করিল নর্থ ফোরল্যাণ্ড এবং আইল অব ওয়াইটের পশ্চিম প্রান্ত—এই দুই অংশের মধ্যে। আর্মি স্টাফ প্রথম দফায় ১ লক্ষ সৈন্য নামাইবার প্ল্যান করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় ডোভার থেকে পশ্চিমদিকে লাইম বে পর্যন্ত বিভিন্ন বিন্দুতে আরও ১ লক্ষ ১০ হাজার সৈন্য নামাইবার। আর্মি স্টাফের প্রধান কর্নেল-জেনারেল হ্যালডার বলিলেন যে, ব্রাইটন এলাকায় অন্তত ৪ ডিভিসন সৈন্য নামাইতে হইবে। ডিল্-র‍্যামসগেট এলাকায়ও এবং সমগ্র রণাঙ্গন ধরিয়া একই সময়ে অন্তত আরও ১৩ ডিভিসন সৈন্য সমাবেশ করিতে হইবে। এ ছাড়া লুফৎভাপে বা জার্মান বিমানবাহিনী দাবী করিল যে, অন্তত ৫২টি এ-এ ব্যাটারি জাহাজযোগে প্রথম দফাতেই পাঠাইতে হইবে।

১। The Nuremberg Trial—by R. W. Cooper. 1947 Page 95.

২। উইলিয়াম শাইয়ার প্রণীত—দি রাইজ এণ্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ। পৃঃ ৯০৭, পাদটীকা।

কিন্তু নৌবিভাগের কর্তারা পরিষ্কার বলিলেন যে, এত দ্রুত এবং এত শক্তির সমাবেশ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি পারাপারের সময় বিমানবলের প্রভুত্বও স্থাপন করা যায়, তবু নিরাপদে এককালে একবার মাত্র পার করা সম্ভব। আর দ্বিতীয় দফায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার সৈন্য চ্যানেল পার করিতে গেলে (সমস্ত সমরসম্ভারসহ) একবার অপারেশনের জন্যই ২০ লক্ষ টনের জাহাজী শক্তির দরকার! এটা নিতান্তই আজগুবী মাত্র! অর্থাৎ সোজা কথায় ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া র‍্যামসগেট থেকে লাইম বে পর্যন্ত ২০০ মাইলের বেশী রণাঙ্গনে সৈন্য সমাবেশ ঘটানো নৌবহরের পক্ষে অসম্ভব।

এভাবে নেভী ও আর্মির মধ্যে যে বিতর্ক বাধিল সেটা চরমে উঠিল ৭ই আগস্ট। জেনারেল হ্যালডার আর্মির পক্ষ থেকে নেভীর বড় কর্তা এডমিরাল স্নাইউইন্ডকে শুনাইয়া দিলেন যে, নৌ-বিভাগের পরিকল্পনা অর্থাৎ ৪০ ডিভিসনের বদলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর রণাঙ্গনে ১৩ ডিভিসন সৈন্য নামাইবার প্রস্তাব সৈন্য বিভাগের পক্ষে সোজা 'আত্মহত্যার তুল্য'। এর জবাবে এডমিরালও পালটা শুনাইয়া দিলেন যে, বৃটিশ নেভীর আধিপত্যের মুখে এত বড় চওড়া রণাঙ্গনে ৪০ ডিভিসন সৈন্য নামাইবার প্রস্তাবও জার্মান নেভীর পক্ষে আত্মহত্যার তুল্য।

চওড়া কিংবা সংকীর্ণতর রণক্ষেত্রে সৈন্য নামানো ও আক্রমণ করা হইবে, এই বিরোধের মধ্যে ফুরার স্বয়ং মধ্যস্থতা করিতে গিয়া নিজেই সংশয়ে পড়িলেন এবং আর্মির বড়কর্তাদের সঙ্গে পরামর্শের পর ১৬ই আগস্ট তারিখ হিটলার লাইম বে-তে অবতরণের প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিলেন। আবার বলিলেন যে, ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখ সংকীর্ণতর রণক্ষেত্রে অবতরণ ঘটাইতে হইবে। কিন্তু সেটাও শেষ পর্যন্ত—'পরিস্থিতি পরিষ্কার' না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রহিল।

এই সমগ্র পরিকল্পনার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ফিল্ড মার্শাল রুন্ডস্টেড ও আর্মি গ্রুপ 'এ' এবং এডমিরাল রেইডার এই বিতর্কিত পরিকল্পনার আলোচনার সময় বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন যে, বিমান শক্তির পরিপূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই অভিযান চালানো সম্ভব নয়। তখন বিমানবহরের বড়কর্তা রাইখ-মার্শাল গোয়েরিং আগাইয়া আসিলেন এবং সকলকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি একাই জার্মান বিমান-বহরের সাহায্যে ইংল্যান্ডকে খতম করিয়া ফেলিবেন। তখন নৌ ও স্থলবাহিনীর কর্তারা যেন হাঁফ ছাড়িয়ে বাঁচিলেন। কারণ, গোয়েরিংয়ের উপর দিয়াই তাঁরা ইংল্যান্ড জয়ের পরীক্ষা চালাইতে চাহিলেন। 'ব্যাট্‌ল অব্ বৃটেন' বা বৃটেনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিমান অভিযানের এটাই ছিল মূল রহস্য। ফিল্ড মার্শাল কেসেলরিং ও স্পেরেল এই বিমান আক্রমণ চালাইবার ভার পাইলেন।

চার্চিলও জানিতেন যে, ইংল্যান্ডের ভাগ্য এক্ষণে আকাশের উপর নির্ভর করিতেছে। কারণ ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে সাফল্যের সঙ্গে সৈন্য নামাইতে গেলে ইংলিশ চ্যানেল নির্বিঘ্ন করিবার জন্য জার্মানীকে বৃটিশ বিমানবাহিনী বা রয়েল এয়ার ফোর্স ধ্বংস করিতেই হইবে। ৩১শে জুলাই তারিখ হিটলার এডমিরাল রেইডারকে বলিয়াছিলেন—"যদি ৮ দিনের ঘোরতর বিমান যুদ্ধের পরেও জার্মান বিমানবহর শত্রুপক্ষের বিমানশক্তি,

বন্দর ও নৌবহরকে যথেষ্ট পরিমাণে ধ্বংস করিতে না পারে. তবে, এই আক্রমণ ১৯৪১ সালের মে মাস পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে হইবে।'[১]

ফ্রান্সের পতনের পর যে দেড়মাস সময় পাওয়া গেল সেই সময়ের মধ্যে চার্চিল ও বৃটিশ সমরকর্তারা সর্বতোভাবে প্রস্তুত হইলেন আত্মরক্ষার জন্য। কিন্তু তখন বৃটেন নিঃসঙ্গ, একাকী। ফ্রান্সও পশ্চিম ইউরোপে পরাজিত। ডানকার্কের পর সমস্ত অস্ত্রসম্ভার প্রায় শূন্য। তখন ইংল্যান্ডের উপকূল রক্ষার জন্য ছিল মাত্র ১৭ ডিভিসন বৃটিশ সৈন্য, আর রিজার্ভ ছিল ২২ ডিভিসন। আর জার্মানীর দুর্দান্ত ৪০ ডিভিসন সৈন্য ঝাঁপাইয়া পড়িতে উৎসুক। তবু ইংরাজ জাতি সেই তীব্রতম সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াইল। বাকিংহ্যাম প্রাসাদে রাজদম্পতি থেকে শুরু করিয়া সাধারণ মেছুনী বা চাকরানি-পর্যন্ত সমাজের সর্বস্তরে স্বদেশরক্ষায় আশ্চর্য উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইল। এই উদ্দীপনা, সাহস এবং প্রতিরোধের সুদৃঢ় সংকল্প ফ্রান্সের ছিল না। কিন্তু চার্চিলের নেতৃত্বে বৃটিশসিংহ যেন অকস্মাৎ কেশর ফুলাইয়া পতনের অন্ধকার গহ্বর থেকে সংগ্রামের রক্তাক্ত দুর্গম পথে আসিয়া দাঁড়াইল জনসাধারণের নৈতিক বল এবং স্বাধীনতা রক্ষার অদম্য ইচ্ছা প্রবল হইল। সুতরাং হিটলার নীতিভ্রষ্ট ফ্রান্সে সহজ জয়লাভের যে সুযোগ পাইয়াছিলেন, ইংল্যান্ডে তাহা পাওয়া গেল না। এখানে লেনিনের সেই বহু মূল্যবান উপদেশ মনে পড়িতেছে, যখন তিনি রণনীতির ব্যাপারে বলিয়াছিলেন ঃ

"The soundest strategy is to postpone operations until the moral disintegration of the enemy renders the delivey of the mortal blow both possible and easy."[২]

এই 'নৈতিক অধঃপতনের জন্যই হিটলার ইউরোপের বহু রণক্ষেত্রে 'শত্রুর' উপর একটি-মাত্র আঘাত হানিয়াই দ্রুত ও সহজে জয়লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ইংল্যান্ডের তীরভূমিতে আসিয়া সেটা সম্ভব হইল না, যার অন্যতম কারণ ছিল ইংরাজ জাতির নৈতিক শক্তির দৃঢ়তা। হিটলারের আসন্ন আক্রমণের জন্য বৃটেন যথাসম্ভব প্রস্তুত হইতে লাগিল এবং যে কয়েক ডিভিসন সৈন্য তার হাতে ছিল, সেগুলিই নানা বিন্দুতে সন্নিবেশ করা হইল। নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সহিত যোগ রাখিয়া দেশের নানা অংশে মোট ১০ লক্ষ স্বেচ্ছাসৈনিক বা হোমগার্ড গঠিত হইল। স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে যথাসম্ভব লণ্ডন ও অন্যান্য বড় বড় শহরের বিপজ্জনক এলাকা হইতে সরইয়া নেওয়া হইল (সারা বৃটেন থেকে মোট প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ লোক অপসারিত হইয়াছিলেন।) এবং অফিস হইতে শুরু করিয়া বিদ্যালয় পর্যন্ত এমনভাবে সংগঠিত হইল যাতে ইংল্যান্ড আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারে। বলা বাহুল্য যে, বিমান আক্রমণ প্রতিরোরের জন্য সর্বপ্রকার সামরিক ও বেসামরিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। জার্মানী তখন প্রায় সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের মালিক এবং উত্তর ইউরোপেও তার বাহু বহু দূরবর্তী নার্ভিক বন্দর পর্যন্ত প্রসারিত। অর্থাৎ ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও নরওয়ে উপকূল ভাগ তার দখলে—উত্তর সমুদ্র হইতে ইংলিশ চ্যানেল হইয়া অতলান্তিক মহাসমুদ্রের তীর পর্যন্ত জার্মানী দণ্ডায়মান। জার্মানীর হেলিগোল্যান্ড হইতে স্কটল্যান্ডের উত্তরে স্কাপা ফ্লো পর্যন্ত দূরত্ব ছিল ৫৫০ মাইল, আর এডিনবরা

১। চার্চিল—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৮১-৮২
২। This Expanding War—by Liddell Hart. Page 263.

বৃটেনের যুদ্ধ
জার্মান অবতরণ ও আক্রমণ পরিকল্পনা
এডিনবার্গ
গ্লাসগো
নিউক্যাসল
উত্তর সাগর
ম্যানচেস্টার
লিভারপুল
নটিংহাম
বার্মিংহাম
কভেনট্রি
কার্ডিফ
ব্রিস্টল
লণ্ডন
সাউদাম্পটন
ডোভার
ক্যালে
বোলন
প্লিমাউথ
ইংলিশ চ্যানেল
শেরবুর্গ
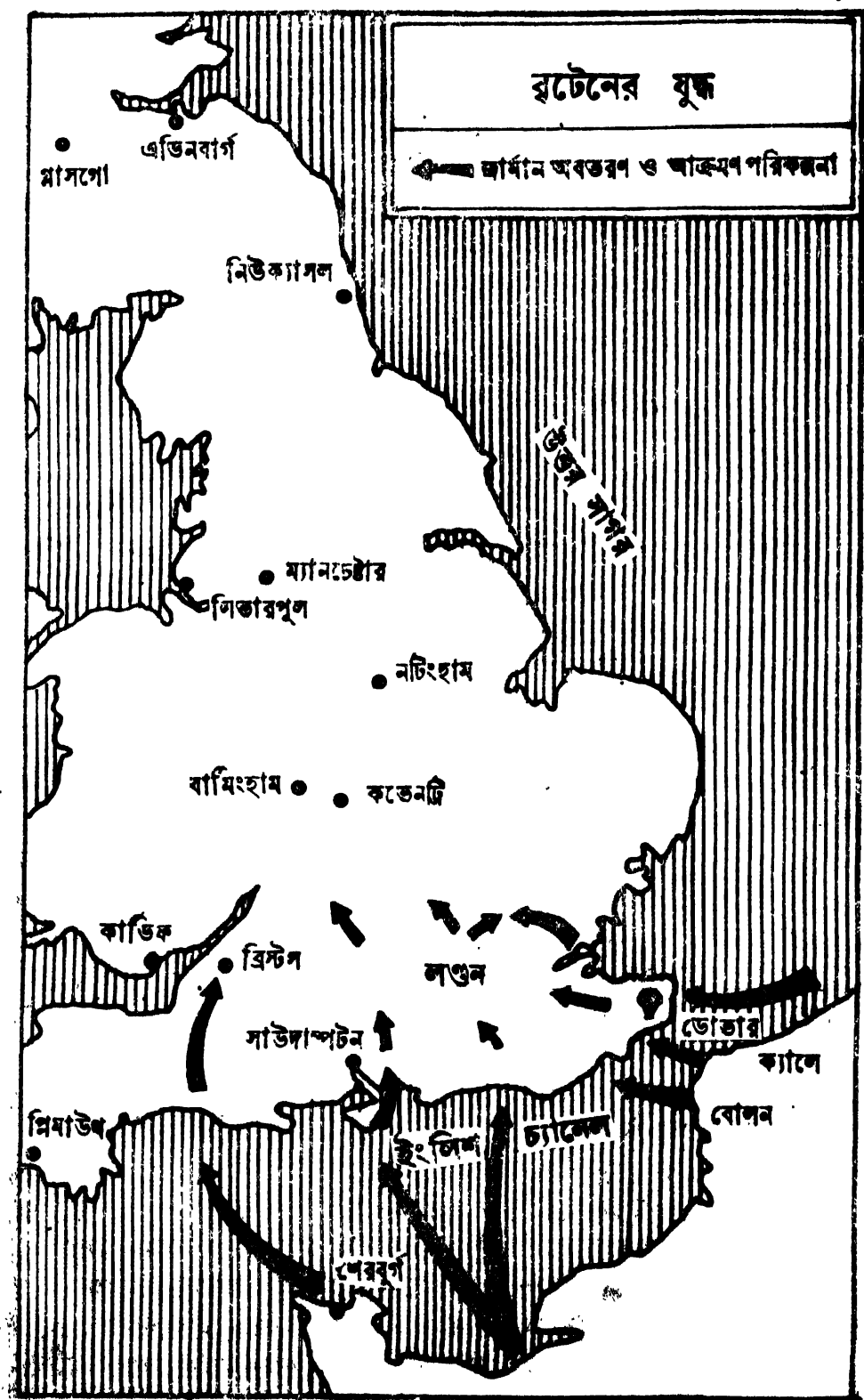
৪৫০ মাইল। কিন্তু নরওয়ে দখলের দ্বারা এই দূরত্ব কমিয়া দাঁড়াইল মাত্র ৩২০ এবং ৩৯০ মাইলের মধ্যে—নরওয়ের স্টেভ্যাঞ্জার ঘাঁটি হইতে। হল্যাণ্ডের তীর হইতে ইংল্যাণ্ডের নরউইচ ১৩৫ মাইল এবং খাস লণ্ডন ১৫৫ মাইলের মধ্যে পড়িল। আর ফ্রান্সের পতনের ফলে জার্মানী ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ডোভার প্রণালীর সংকীর্ণতম পথের দূরত্ব দাঁড়াইল মাত্র ২৬ মাইল। প্যারিস হইতে লণ্ডন ২১০ এবং দূরতম পাল্লার বিমানের পক্ষে বার্লিন হইতে লণ্ডনের দূরত্ব ছিল ৫৭০ মাইল, আর ফ্রান্সের ব্রেস্ট বন্দর হইতে ইংল্যাণ্ডের প্লিমাউথ বন্দর ১৪০ মাইলের মধ্যে পড়িল।[১]

সুতরাং হিটলারী রণনীতি যেন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ীই বৃটেনকে বিমান আক্রমণের নিকটতম পাল্লার মধ্যে আনিয়া ফেলিল। বিমান অভিযানে সাফল্যের আশা করিয়া জার্মানী ইংল্যাণ্ডে অবতরণ ও আক্রমণের জন্য রটারডাম ও শেরবুর্গ বন্দরের মধ্যে ৩ হাজার 'বাজ" (একপ্রকারের নৌকা) পর্যন্ত প্রস্তুত রাখিল এবং নরওয়ে দখলকারী সৈন্যদিগকে ইংল্যাণ্ডে 'উভচর আক্রমণের' জন্য ট্রেনিং দেওয়া হইল। ইল্যাণ্ড হইতে ফ্রান্সের তীর পর্যন্ত প্রচুর বিমানঘাঁটি তৈয়ার হইল।

ইহার পর আরম্ভ হইল ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকালে বৃটেনের আকাশে ভয়াবহ বিমান যুদ্ধ—যাহা 'ব্যাট্‌ল অব ব্রিটেন' নামে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। যাঁরা সেই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁদের মতে এমন রোমহর্ষক সাংঘাতিক সংগ্রাম ইতিপূর্বে মানুষের সমাজে আর কখনও দেখা যায় নাই। আকাশপথের যে কল্পনা-বিলাস মানুষের ছিল, কিংবা রামায়ণের পুষ্পকরথ অথবা মেঘের আড়ালে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধের যে কাল্পনিক সংগ্রামের চিত্র বহু রোমাঞ্চের প্রেরণা জোগাইয়াছে, বৃটেনের মহাশূন্যে তাহা ভয়ংকর বাস্তব মূর্তি লইয়া দেখা দিল। সাইরেনের তীব্র তীক্ষ্ণ ও আর্ত বংশীধ্বনিতে সচকিত ইংল্যাণ্ডের নরনারী ভূগর্ভের আশ্রয়স্থল হইতেই দেখিতে পাইত উর্ধ্বে আকাশে চারি পাঁচ মাইল ধরিয়া শ্বেত ধূম্রকুণ্ডলী ছড়াইয়া পড়িয়াছে যেন ধূমকেতুর পুচ্ছের মত। আর অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণে ইংল্যাণ্ডের রক্তরাঙা মুখ যেন আপন ভিত্তিমূল হইতে কাঁপিয়া উঠিতেছে এবং মাটি ও প্রস্তর, অট্টালিকা ও প্রান্তর বিদীর্ণ ও ও বিধ্বস্ত হইয়া ফাটিয়া টুকরো টুকরো হইতেছে। নভোচারী বিমানগুলি তখন লোকচক্ষুর অন্তরালে পরস্পরকে হননের জন্য আসুরিক সংগ্রামে ব্যস্ত। আর জ্বলন্ত উল্কা-পিণ্ডের মত তারা ছুটাছুটি করিত, যাদের গতি ছিল মিনিটে পাঁচ মাইল। নিঃসন্দেহে ইহা সেদিনের অবিশ্বাস্য যুদ্ধের অবিশ্বাস্য গতিবেগ।...

বৃটেনের এই বিমানযুদ্ধ চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। প্রথম দুই পর্যায়ে জার্মান বিমান বহর ইংলিশ চ্যানেলের উপর আধিপত্য বিস্তার এবং উহা নির্বিঘ্ন করিতে চাহিল, আর বৃটিশ বিমানবহর (আর. এ. এফ.) ও বৃটিশ বিমান-ময়দান ও ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিল। ইংল্যাণ্ড অভিযান করিতে হইলে ইহাই ছিল প্রথম প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রাথমিক পর্বে ব্যর্থ হইয়া বাকি দুই পর্যায়ে জার্মান বিমানবহর একেবারে বে-পরোয়া আক্রমণ ও ধ্বংসলীলা বিস্তার করিতে লাগিল, যার উদ্দেশ্য ছিল বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের মর্মকেন্দ্র লণ্ডনকে সম্পূর্ণরূপে চুরমার করিয়া দেওয়া, উহার যানবাহন ও সরবরাহ বিপর্যস্ত করা এবং তখনকার দিনের নিঃসঙ্গ যোদ্ধা বৃটিশ জাতিকে ভীতিবিহ্বল করিয়া তার নৈতিক শক্তি ধ্বংস এবং এভাবে তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা।

১। আমেরিকার 'নিউইয়র্ক টাইমস' প্রকাশিত 'দি ওয়ার ইন ম্যাপস.'।

যদিও অল্পবিস্তর বিমান আক্রমণ পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল, তথাপি ১৯৪০ সালের ৮ই আগস্ট (এই তারিখ বিতর্কিত) ছিল বৃটেনে জার্মান বিমান অভিযানের সরকারী উদ্বোধন তারিখ। ৮ই হইতে ১৮ই আগস্ট পর্যন্ত চলিল ইংলিশচ্যানেল দখলের যুদ্ধ। তীরবর্তী শহর ও জাহাজগুলির উপর সারা গ্রীষ্মকালই আক্রমণ চলিল বটে, কিন্তু ৪০০ বিমানের ব্যাপক অভিযান শুরু হইল ৮ই আগস্ট তারিখ একটি কনভয়ের উপর আক্রমণের দ্বারা। ব্রাইটনের দক্ষিণ হইতে পোর্টল্যাণ্ড পর্যন্ত জার্মান বোমারুর হানা আরম্ভ হইল। বৃটেনের 'হ্যারিকেন' ও 'স্পিটফায়ার' শ্রেণীর জঙ্গী বিমানগুলি জার্মানীর 'মেসারস্মিটস' এবং 'হেংকেইল' ও 'জুংকার' বিমানগলিকে যেন শূন্যপথের দ্বৈরথ যুদ্ধে লিপ্ত করিল। বাণবিদ্ধ বিহঙ্গের মত বিমানগুলি বিদীর্ণ হইয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল। ১৫ই আগস্ট ১৮০ খানা নাৎসী বিমান ধ্বংস হইল, তিনদিন পর ১৫৩ খানা, আর বৃটিশ পক্ষের মাত্র ৫৬টি বিমান ও ২৭ জন পাইলট নষ্ট হইল। প্রথম ১০ দিনে জার্মানী হারাইল ৬৯৭টি বিমান আর বৃটেন ১৫৩টি।

জার্মান বিমানবহরের বড়কর্তা ফিল্ডমার্শাল গোয়েরিং এই ক্ষতির পরিমাণ দেখিয়া কিছু সাবধান হইলেন এবং সপ্তাহখানেকের মত বিশ্রাম লইয়া নূতন উদ্যমে তাঁর স্কোয়া-ড্রনগুলিকে পুনর্গঠন করিলেন। ফলে ২৪শে আগস্ট হইতে ৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৪০) পর্যন্ত চলিল দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ এবং ক্রমেই অধিকতর জঙ্গী বিমানের পাহারায় ইংল্যাণ্ডের ব্যাপকতর এলাকায় জার্মান বোমারু হানা দিতে লাগিল। ৩০শে আগস্ট তারিখ একদিনে ৮০০ বিমান ইংল্যাণ্ডে হানা দিল এবং তখনকার দিনের সংবাদপত্রে ইহা হাজার বিমানের আক্রমণ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। আর. এ. এফ-এর সঙ্গে চলিল ঘোরতর যুদ্ধ, কিন্তু এবারও জার্মানীরই ক্ষতি হইল বেশী—৫৬২টি নাৎসী বিমান ও ২১৯টি বৃটিশ বিমান ধ্বংস হইল, আর ১৩২ জন বৃটিশ পাইলট বিমান-ছত্রযোগে নিরাপদে মাটিতে অবতরণ করিল। নাৎসী বোমারুর দল দিবাভাগের এই যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ক্রমে রাত্রিযোগে হানা দিতে লাগিল।···

৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ৫ই অক্টোবর (১৯৪০) পর্যন্ত চলিল তৃতীয় পর্যায়ের আক্রমণ যার প্রধান লক্ষ্য হইল লণ্ডন নগরীর ধ্বংসসাধন। দিবাভাগে ৩৮ বার হানা দিয়া এই শহরকে চূর্ণ করিবার চেষ্টা হইল এবং সেই সঙ্গে ইহার সুবৃহৎ যোগযোগ ব্যবস্থা ও নাগরিকদের মনোবল ভাঙ্গিবারও দুরন্ত চেষ্টা চলিল। স্বয়ং গোয়েরিং একবার উড়িয়া আসিলেন ইংল্যাণ্ডে এই আক্রমণ পরিচালনার জন্য। তাঁর ধারণা ছিল এই আঘাতেই লণ্ডন ধরাশায়ী হইবে। রাজধানীর চারিদিকে বিমানমারা কামানশ্রেণী সক্রিয় হইয়া উঠিল, আর 'স্পিটফায়ার' ও 'হ্যারিকেন' শ্রেণীর জঙ্গী বিমানগুলি জার্মান বোমারু ও জঙ্গীগুলিকে পর পর তিনটি বৃহৎ অর্ধবৃত্তের মত রেখাপথ ধরিয়া লণ্ডনের আকাশে বাধা দিতে লাগিল। নাৎসী বোমারগুলি ('হেইংকল' ও 'জুংকার') এক্ষণে দিনরাত্রি উভয় সময়ে আসিতে লাগিল। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তারা আসিত একক, অর্থাৎ জঙ্গী বিমানের পাহারা ছাড়া—২০ হইতে ২৫০ খানা পর্যন্ত এক-একবারের আক্রমণে। আর দিনের আলোতে তারা দেখা দিত জঙ্গী বিমানের ('মেসারস্মিটস্') পাহারায়—জঙ্গীগুলি তাদের পার্শ্ব ও পশ্চাদ্দেশ রক্ষা করিয়া চলিত। জার্মান বোমারু মরিয়া হইয়া লণ্ডনের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসলীলা বিস্তার করিতে লাগিল। ডক, কারখানা, রেলপথ, গ্যাস ও ইলেকট্রিক প্ল্যাণ্ট এবং শত সহস্র গৃহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত

হইল। একমাত্র সেপ্টেম্বর মাসেই ১০ হাজার বোমা লণ্ডনের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। —যার মোট পরিমাণ ছিল ১ হাজার টন অতি-বিস্ফোরক। ৩ মাসে লণ্ডনের ১২,৬৯৬ জন অসামরিক নরনারী প্রাণ হারাইল। এভাবে জার্মান বোমারু বিমান যে তাণ্ডবলীল সৃষ্টি করিল, তার তুলনা ছিল না। তারা অধিকতর সংখ্যক জঙ্গীবিমানের পাহারায় আসিতে লাগিল এবং ৭ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন ডকের উপর প্রকাশ্য দিব্যালোকে ভয়ঙ্কর বোমারু আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল। ৩৫০টি জার্মান বোমারু এই আক্রমণে যোগ দিল এবং বিখ্যাত টেমস নদী নিদারুণ অগ্নিশিখা ও ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হইল। এক সপ্তাহ পর এক রবিবার রাত্রে ডিনারের শেষে ৫০০টি বিমান পর পর দুইটি তরঙ্গের মত লণ্ডনের উপর নিদারুণ আঘাত হানিল। কিন্তু প্রত্যেকবারেই আর. এ. এফ অপূর্ব দক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে বাধা দিল এবং জার্মান বিমানগুলির প্রভূত ক্ষতিসাধন করিল।

বৃটেনের উপর জার্মান বিমান অভিযানের চতুর্থ বা শেষ পর্যায় ছিল ৬ই অক্টোবর (১৯৪০) পর্যন্ত। তখন দিবাভাগের আক্রমণে ব্যর্থ হইয়া জার্মান বিমানবহর একান্তরূপে নৈশ আক্রমণেই মনোনিবেশ করিল। লণ্ডন এবং বৃটেনের অন্যান্য ছোট-বড় শহরগুলিতে ক্রমাগত আক্রমণ চলিতে লাগিল। সামরিক, অসামরিক সমস্ত বস্তু ও স্থানের উপরেই জার্মান বোমারুগুলি যেন চোখ বুঁজিয়া কেবল 'ধ্বংসের খাতিরে ধ্বংস' কার্য চালাইল। আর জনসাধারণের চিত্তে ত্রাস সৃষ্টির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিল। সমগ্র লণ্ডন নগরী আগুনে ও বিস্ফোরক বোমায় জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ভস্মসাৎ করিবার আসুরিক চেষ্টায় গোয়েরিংয়ের বিমানবহর মাতিয়া উঠিল। সেই সময় দগ্ধ লণ্ডন নগরীর বহ্ন্যুৎসব রাত্রির আকাশকে দস্যুর মশাল আলোকে দীপ্তশিখার মত বীভৎস করিয়া তুলিল। তথাপি লণ্ডনের নরনারীরা মনোবল হারায় নাই, আতঙ্কিত দিন বা রাত্রে আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করে নাই। বরং সৈন্য ও নাগরিক, বৈমানিক ও স্বেচ্ছাসেবক, এ আর পি ও দমকল, নার্স ও পুলিশ—অর্থাৎ সর্বশ্রেণীর নরনারী একযোগে আত্মরক্ষায় ও উদ্ধারকার্যে মন দিল। এমন কি সংবাদপত্রের প্রকাশ হইতে দৈনন্দিন অফিসের কাজকর্ম পর্যন্ত চালাইয়া যাইতে লাগিল। মিঃ চার্চিল এক বক্তৃতায় বলিলেন যে, মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসে এমন অসাধ্য সাধনের কাহিনী আর শুনা যায় নাই।

'Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few !'

অর্থাৎ এত অল্প লোকের কাছে এত বেশী সংখ্যক মানুষের ঋনী হওয়ার কথা এর আগে যুদ্ধের ইতিহাসে শুনা যায় নাই।

১৯৪০ সালের ৩১শে অক্টোবর জার্মান বিমান অভিযানের শেষ তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া গেলেও বৃটেনের উপর সারা শীতকাল এবং ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত বিমান হানা চলিতে লাগিল—যদিও এরপর জার্মানী পূর্ব রণাঙ্গনে রাশিয়ার দিকে আক্রমণে অগ্রসর হইল। তারপরেও অবশ্য ইংল্যাণ্ডের বার্মিংহাম, মাঞ্চেস্টার, লিভারপুল শ্রমশিল্পের শহর-গুলিতে রাত্রিযোগে ইতস্ততঃ হানাদারি চলিতে লাগিল।

কিন্তু ১৯৪০ সালের সালের ১৪ই নভেম্বর পূর্ণিমার রাত্রের সুন্দর আবহাওয়ায় মিডল্যাণ্ডের বিখ্যাত কভেণ্ট্রিতে ৪৫০ খানা জার্মান বিমানের যে আক্রমণ ঘটিল, তা'

আজও উল্লেখযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত এই বিখ্যাত গীর্জাটি ধ্বংস হইয়া গেল, এবং ৫৫৪ জন লোক নিহত হইল। ৯০০ বছর আগেকার লেডী গডিভার উপাখ্যানের জন্য এই শহর বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। প্রকাশ যে, স্থানীয় লোকদিগকে অত্যাচার থেকে উদ্ধারের জন্য তিনি স্থানীয় শাসকের খেয়াল মিটাইতে গিয়া বিবস্ত্রা হইয়া অশ্বারোহণে শহর পরিক্রমা করিয়া গিয়াছিলেন। ··

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর লণ্ডন মহানগরীকে 'আগুনে পোড়াইয়া মারিবার' জন্য ১০০ নাৎসী বিমান ৩ ঘণ্টা ধরিয়া হানা দিল, ১৫০০টি অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিল। এই দাবানলের কোন তুলনা ছিল না এবং বোধহয় এই নরককুণ্ডের কথা আজ কল্পনা করাও সহজ নয়।

১৯৪০ সালে বৃটেনের উপর জার্মান বিমান অভিযানে লণ্ডনের অন্ততঃ ১০ লক্ষাধিক গৃহ ধ্বংস বা জখম হইল। ১৯৪১ সালের শেষ পর্যন্ত এই অভিযানের ফলাফল হিসাবে দেখা যায় যে, বৃটেনের উপর মোট ১ লক্ষ ৯০ হাজার টন পরিমাণ বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে এবং হতাহতের সংখ্যা (৯৪০৫৪) ছাড়াইয়া গেল তৎকালীন বৃটিশবাহিনীর ক্ষতির চেয়েও বেশী।[১]

কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, ৮ই অক্টোবর (১৯৪০) মিঃ চার্চিল কমন্সসভায় এক বক্তৃতায় বলেন যে, বিগত মহাযুদ্ধের তুলনায় এবারের বোমাবর্ষণে আনুপাতিক মৃত্যুর হার অনেক কম। লণ্ডনের এক রাত্রির বোমাবর্ষণের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ঐ রাত্রে ২৫১ টন বোমাবর্ষণের ফলে ১৮০ জন নিহত হইয়াছে। কিন্তু আগেকার মহাযুদ্ধে প্রতি এক টন বোমায় ১০ জন লোক নিহত হইয়াছে। অর্থাৎ এবার ১ টন বোমায় ১ জনেরও কম লোক মারা পড়িয়াছে, কিংবা বিগত ১৯১৪-১৮ সালের তুলনায় ১৩ ভাগের একভাগ মাত্র নিহত হইয়াছে। চার্চিলের মতে আধুনিক বোমা হইতে আত্মরক্ষার উপায়গুলিই ইহার প্রধান কারণ। তিনি অবশ্য অনেক বেশী হতাহতের জন্যই প্রস্তুত ছিলেন। প্রথম রাত্রের বোমাবর্ষণে ৩ হাজার নিহত এবং তারপর প্রতি রাত্রে ১২ হাজার করিয়া আহত হইবে, এই আনুমানিক হিসাবেই হাসপাতালে গোড়ার দিকে আড়াই লক্ষ হতাহতের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ফলাফল এত মারাত্মক হয় নাই।

* * *

যদিও 'বৃটেনের যুদ্ধ' সামরিক ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তবু এর আরম্ভের সঠিক তারিখ সম্পর্কে খ্যাতিমান ঐতিহাসিকদের রচনায়ও যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। যেমন, মার্কিন ঐতিহাসিক লুই স্নাইডারের মতে ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং ৬ই আগস্ট তারিখে হুকুম জারি করিয়াছিলেন ইংলণ্ডের উপর ব্যাপক বিমান আক্রমণ আরম্ভের জন্য। মেজর-জেনারেল জে এফ ফুলার তাঁর বইতে আক্রমণের তারিখ ৮ই আগস্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হেনরি পেলিং বলিয়াছেন ১২ই আগস্ট। অপরপক্ষে রণ-পণ্ডিত লিডেল হার্টের মতে বৃটেনের বিরুদ্ধে বিমানযুদ্ধ শুরু হইয়াছিল ১০ই আগস্ট। কিন্তু ঐতিহাসিক অ্যালান বুলক্ ও এ জি পি টেলর উভয়েই বলিয়াছেন যে, বৃটেনের বিরুদ্ধে বিমান অভিযান জার্মানীর মতে আরম্ভ হইয়াছিল ১৩ই আগস্ট এবং এই অভিযানের নাম ছিল 'অপারেশন ঈগল'। আবার অন্য বৃটিশ মতে, যেমন পিটার

১। 'The World At War'. 1945 U. S. A. Infantry Journal. P. 60.

ইয়ং তাঁর 'ডিসাইসিভ্ ব্যাটলস্' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইংলিশ চ্যানেলে বৃটিশ বাণিজ্য-জাহাজ-বহরের উপর আক্রমণের শুরু দিয়া এই যুদ্ধের উদ্বোধন হইয়াছিল ১০ই জুলাই তারিখ। স্বয়ং উইনস্টোন চার্চিল তাঁর প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ড) ১০ই জুলাই তারিখটির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

'It was not until July 10 that the first heavy onslaught began, and this date is usually taken as the opening of the battle.'

অর্থাৎ ১০ই জুলাই তারিখটিকেই বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভের উদ্বোধন হিসাবে সাধারণতঃ ধরা হইয়া থাকে।

কিন্তু স্বয়ং চার্চিল বলিলে কি হইবে, ১০ই জুলাই তারিখটিকেই বৃটেনের যুদ্ধ আরম্ভের নিশ্চিত তারিখরূপে গ্রহণ করা কঠিন। (লিডেল হার্ট লিখিয়াছেন যে, ১লা জুলাই থেকেই ইংলিশ চ্যানেলে বৃটিশ জাহাজের উপর আক্রমণ শুরু হয়েছিল।) কেননা, ফ্রান্সের যুদ্ধের পর হিটলার বৃটেনের সঙ্গে যে শান্তির আশা করিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এজন্য তিনি ৬ সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়াছেন এবং ১৯শে জুলাই তারিখ রাইখস্ট্যাগের এক নাটকীয় বক্তৃতায় তিনি এই শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই শান্তি-প্রস্তাব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর হিটলার ইংলণ্ড আক্রমণের দিকে মন দেন। সুতরাং ১৯শে জুলাইয়ের শান্তি-প্রস্তাবের সঙ্গে ১০ই জুলাই তারিখেই বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল, এটা ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গ্রহণ করা কঠিন। বরং ৮ই, ১০ই বা ১৩ই আগস্ট, এই তিনটির মধ্যে একটা তারিখকে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, ঐ সময় থেকেই নিয়মিত বিমান-যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল। অবশ্য তার আগে কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত আক্রমণ ঘটিয়াছে, যদিও সেগুলিকে নিয়মিত যুদ্ধের আরম্ভ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। তবে, বৃটিশ বিমান দপ্তর জার্মান বিমানের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে যে-বিবৃতি দিয়াছেন, তাতেও ১০ই জুলাই থেকে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত হিসাব দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে বৃটিশ সরকারী মতেও ১০ই জুলাই তারিখই আক্রমণ বোধনের তারিখ—যদিও এই সম্পর্কে মতভেদ থাকিয়াই যাইবে।

জার্মানীর দুইটি বিমানবহরের বম্বার ও ফাইটার মিলাইয়া মোট শক্তি ছিল ২৮৩০টি বিমানের। আর বৃটেনের প্রথম শ্রেণীর বিমান ছিল মোট হাজার দেড়েক। এয়ার ভাইস মার্শাল স্যার হিউ ডাউডিংয়ের নেতৃত্বে রয়েল এয়ার ফোর্সের ৫৫টি স্কোয়াড্রন এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এই শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া ৫৯ স্কোয়াড্রনে দাঁড়াইয়াছিল। অর্থাৎ বিমান শক্তি উভয় পক্ষে প্রায় সমান সমান ছিল।

কিন্তু বৃটিশ বিমানবাহিনীর শক্তি ও দক্ষতার সঙ্গে জার্মান বিমানবহর শেষ পর্যন্ত পারিয়া উঠিল না। তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জার্মান বিমানবহরের আক্রমণে এক সময় বৃটেন প্রায় পরাজয়ের মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। কেণ্ট অঞ্চলে বৃটিশ জঙ্গী বিমানের বা ফাইটার ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করার জন্য জার্মানী যে আক্রমণ শুরু করিয়াছিল, ৩০শে আগস্ট থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, তার পরিণতি ভয়ঙ্কর বিপদ ডাকিয়া আনিতেছিল। কিন্তু বৃটেনের কপালগুণে ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে জার্মান বিমানবহর তাদের আক্রমণের রণনীতি হঠাৎ বদলাইয়া ফেলিয়া লণ্ডন শহরের উপর

বোমাবর্ষণ করিতে শুরু করিল। উদ্দেশ্য ধ্বংস ও ত্রাস সৃষ্টির দ্বারা বৃটিশ জনগণের মনোবল ও নৈতিক শক্তি ভাঙ্গিয়া দেওয়া। যদিও এই বোমারু অভিযানের ফলে ৩০ হাজার নরনারী প্রাণ হারাইয়াছিল, তথাপি বৃটেনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার তেমন কোন প্রচণ্ড ব্যাঘাত ঘটে নাই। কলকারখানা ও আফিসের কাজ যথানিয়মে চলিয়াছিল। এমন কি শিশু ও বালক-বালিকাদের স্থানান্তরণের পরেও বোমাবর্ষণের দুর্যোগের মধ্যেও ২ লক্ষ ৭৯ হাজার স্কুল ছাত্র-ছাত্রী লণ্ডনেই ছিল। বোমারু আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য 'এণ্ডার্সন শেলটার' নামে যে আশ্রয়স্থল নির্মিত হইয়াছিল, তাতে এবং লণ্ডনের ভূগর্ভস্থ টিউব রেলওয়ের স্টেশনে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার লোক নিরাপত্তার সন্ধানে আশ্রয় নিত। এমন কি, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য পিকাডেলীর ভূগর্ভে ৭০ ফুট নীচে যে প্রকাণ্ড আশ্রয়স্থল ও দপ্তর নির্মিত হইয়াছিল, চার্চিল সাধারণতঃ সন্ধ্যা থেকে সেই পাতালপুরীতেই আশ্রয় নিতেন—অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে বছরের (১৯৪০) শেষ পর্যন্ত। চার্চিল বলিয়াছেন যে, সেখান থেকেই তিনি কাজকর্ম চালাইতেন এবং সেই ভূগর্ভে দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেন। চার্চিল তাঁর এই ঘুম সম্পর্কে খুব সতর্ক ছিলেন এবং তাঁর বইতে অনেকবার এই ঘুম সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন।

বোমাবর্ষণের ফলে হাউজ অব কমন্স ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল এবং একদিন ব্যাকিংহ্যাম প্যালেসেও বোমা পড়িল ও প্রাসাদের একটি অংশের প্রভূত ক্ষতি হইল। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, রাজা যষ্ঠ জর্জ ও রানী খুব সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁরা রাজপ্রাসাদেই থাকিতেন এবং ঐ দুঃসময়ে তাঁরা কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য স্বেচ্ছায় ভৃত্য বা পরিচারক ছাড়াই দৈনন্দিন কাজ চালাইতেন। রাজ-পরিবারকে যখন লণ্ডন ত্যাগ করিতে বলা হইল, তখন রানী বলিলেন—'ছেলেপিলেরা আমাকে ছাড়া যেতে পারে না, আমি রাজাকে ছাড়া যেতে পারি না এবং রাজা অবশ্য আমাদের ছেড়ে যাবেন না।' অবশ্য প্রাসাদের ভূগর্ভে তাঁদের জন্য আশ্রয়স্থল নির্মিত হইয়াছিল। চার্চিল লিখিয়াছেন যে, বিমান আক্রমণ আরম্ভের সময় রাজা এবং তিনি কোন কোন দিন মধ্যাহ্নভোজনের টেবিল থেকে প্লেট ও গ্লাস ইত্যাদি নিজেরাই হাতে করিয়া নিয়া শেলটার যাইতেন। বোমাবর্ষণে ধ্বংসকাণ্ডের ফলাফল দেখার জন্য রাজা ও প্রধানমন্ত্রী অনেক সময় একত্রে পরিদর্শনে বাহির হইতেন।

জার্মান বিমানবহরের আক্রমণে বৃটেনের যে-বিপদ ঘটিয়াছিল, তাতে সন্দেহ নাই এবং এই বিপদের বিরুদ্ধে রয়েল এয়ার ফোর্স (প্রায় হাজার-দেড়েকের মত পাইলট) অত্যন্ত কৃতিত্ব ও বীরত্বের সঙ্গে লড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও স্মরণীয় যে, বৃটিশ পদার্থ-বিজ্ঞানীরা, বিশেষভাবে হেনরি টিজার্ড ও চার্চিলের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা অধ্যাপক লিণ্ডম্যান এই সময় যে উন্নত ধরনের রাডার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, জার্মান বোমারুর বা জঙ্গী বিমানের আক্রমণ প্রতিহত করার পক্ষে সেটা অত্যন্ত ফলপ্রসু হইয়াছিল। এমন কি, জার্মানরাও পরে এই নূতন রাডার যন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

এই সময় ইংল্যাণ্ড ইউরোপের 'নির্বাসিত' গভর্নমেণ্টসমূহের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, নরওয়ে, লাক্সেমবুর্গ, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের গভর্নমেণ্টসমূহ লণ্ডনে আসিয়া আশ্রয় নিলেন, এবং 'ফ্রান্সের স্বাধীনতার প্রহরী'

(চার্চিলের বর্ণনা অনুসারে) জেনারেল দ্য গল 'ফ্রী ফ্রান্স' আন্দোলন গড়িয়া তুলিলেন। এর ফলে বৃটেনের পক্ষে যুদ্ধক্ষম লোকের সংখ্যা, আর্থিক সম্পদ এবং ৩০ লক্ষ টনেজের জাহাজী শক্তি বৃদ্ধি পাইল। ৩রা জুলাই ডঃ বেনেস (প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট) অস্থায়ী চেকোশ্লোভাক সরকারের রাষ্ট্রপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। আর 'বামপন্থী সোসিয়েলিস্ট' স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস মস্কোতে বৃটিশ রাষ্ট্রদূতরূপে প্রেরিত হইলেন সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতিবিধানের আশায়—যদিও সে-আশা তখন পূর্ণ হইল না। এদিকে লণ্ডনে কমিউনিস্টদের মুখপত্র 'ডেলী ওয়ার্কার' সরকারী আদেশে নিষিদ্ধ হইয়া গেল। অবশ্য কমিউনিস্টদের শক্তিও তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল না। অপরপক্ষে বৃটিশ ফ্যাসিস্ট এবং জার্মান পক্ষপাতী লোকদের দমন করা হইল। যুদ্ধকালীন জরুরী আইনের কবলে ইংলণ্ডের বিখ্যাত ফ্যাসিস্ট নেতা স্যার অসওয়াল্ড মোজলে (চমৎকার বক্তা ছিলেন) ও তাঁর পত্নীকে এবং একজন এম-পি'কে আটক-বন্দী করা হইল। মোট ১৭৬৯ জন বৃটেশ প্রজা অন্তরীণ হইয়াছিলেন, এঁদের মধ্যে ৭৬৩ জন ছিলেন বৃটিশ ফ্যাসিস্ট পার্টির সদস্য। ১৯৪৩ সালে মোজলে দম্পতীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবনে সেই সময় উল্লেখযোগ্য কোন রাজনৈতিক অশান্তি ছিল না এবং যদিও বৃটেনের বিরুদ্ধে 'বিদ্যুৎগতি বোমা-বাজি' বা ব্লিজের সময় ইংরাজ নরনারী যথেষ্ট সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছেন, তথাপি জীবনযাত্রার প্রভুত কষ্ট ছিল, ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড ও প্রাণহানি (প্রায় ৩০ হাজার) এবং ১ লক্ষ ২০ হাজার আহত ও বিকলাঙ্গ হওয়া ছাড়াও কিছু কিছু লোকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছিল এবং নানা কারণে অনেকের স্বাস্থ্যের অবনতি হইয়াছিল।[১]

বৃটেনের সঙ্গে আপোষরফায় আসার জন্য হিটলারের জার্মানী যে সমস্ত চেষ্টা করিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ হইতেছে প্রাক্তন সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড (যিনি ১৯৩১ সালে একজন ডাইভোর্স-করা মার্কিন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন) বা ডিউক অব উইণ্ডসরকে বাগে আনিবার চেষ্টা। ফ্রান্সের পতনের পর ডিউক এবং ডাচেস্ প্যারিস থেকে (সেখানে বৃটিশ মিলিটারি মিশনের সদস্যরূপে তাঁরা ছিলেন) স্পেনে চলিয়া গেলেন জার্মানদের হাতে পড়িবার আশংকার জন্য। কিন্তু সেই সময় জার্মানদের পক্ষ থেকে এমন একটা ধারণার প্রচার করা হইতেছিল যে, ডিউক একান্তরূপেই চার্চিলের বিরোধী, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবারও পক্ষপাতী নন এবং তিনি সন্ধি চাহেন ও পুনরায় বৃটিশ সিংহাসনে বসিতে চান। এমন কি, ডিউক এবং তাঁর পত্নীকে বাহামা দ্বীপের নবনিযুক্ত গভর্নর-রূপে জাহাজযোগে বাহামা যাত্রার আগে লিসবনে পাকড়াও করার জন্য এবং সেখান থেকে ডিউকদম্পতীকে অপহরণ করার জন্য নাৎসী গোয়েন্দাদের এক আজগুবি চক্রান্তও হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে (১৯৫৭) এই সমস্ত কথা রটনা হওয়ায় ডিউক প্রকাশ্য বিবৃতির দ্বারা তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বলেন যে, সমস্তটাই বানানো গল্প মাত্র। আর বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরও এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, ডিউক কখনও বৃটেনের প্রতি তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই।

কিন্তু ডিউকদম্পতীকে অপহরণের আজগুবী পরিকল্পনার মত আর একটি ভয়ঙ্কর পরিকল্পনাও ছিল নাৎসী জার্মানীর। যদি জার্মানী বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ জয় করিতে

১। ইংলিশ হিস্ট্রি—টেলর পৃঃ ৬১২

পারিত, তবে, ইংরাজদের অদৃষ্টে কি ঘটিত ? ১৯৪০, ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখ জার্মান জেনারেল স্টাফ যে নির্দেশনামা প্রচার করেন, তাতে স্পষ্টই বলা হয় যে জার্মান মিলিটারী প্রশাসন বৃটেনের সমস্ত সম্পদ ও শক্তি জার্মানীর সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য নিয়োগ করিবে। ১৭ থেকে ৪৫ বছরের সমস্ত ইংরাজ পুরুষকে ধরিয়া ইউরোপে চালান দেওয়া হইবে এবং বৃটিশ জাতিকে চিরদিন পদানত ও দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। ইউরোপে তাদের দিয়া দাস-শ্রমিকের কাজ করানো হইবে এবং বৃদ্ধ ও দুর্বলদিগকে পাইকারি হারে সাবাড় করা হইবে। অধিকৃত বৃটেনে গেস্টাপোর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং এর উদ্দেশ্য হইল—

'The purpose was to exterminate physically not only progressive leaders but all the cream of the British intelligentsia as well as many leaders of the Conservative and Liberal parties.'

সোজা কথায় বৃটিশ সমাজজীবনের সমস্ত প্রগতিশীল এবং বাছাই-করা বুদ্ধিজীবীদের এবং রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করা হইবে !

এই 'সাধু সংকল্প' কার্যে পরিণত করার জন্য মোটামুটি 'আরম্ভ হিসাবে ২৩০০ জনের একটা নামের তালিকাও স্থির হইল। বলা বাহুল্য যে, এই তালিকায় সর্বাগ্রে ছিল চার্চিলের নাম এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতা, সংবাদপত্রের মালিক, সম্পাদক ও সংবাদদাতারাও এই তালিকা থেকে বাদ যান নাই। এইচ জি ওয়েলস, ভার্জিনিয়া উলফ, এডওয়ার্ড এম ফরেস্টার, আলডুস হাক্সলি, জে বি প্রিস্টলি, স্টিফেন স্পেণ্ডার, সি পি স্নো, নোয়েল কাওয়ার্ড, রেবেকা ওয়েস্ট, ফিলিপ গ্রীবস, নরম্যান এঞ্জেল, গিলবার্ট মারে, বার্টরাণ্ড রাসেল, জন বি হ্যালডেন প্রভৃতি জগৎবিখ্যাত বিজ্ঞানী, মনীষী, সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের নাম ছিল নাৎসীরা যাঁদের খুন করার জন্য পরিকল্পনা করিয়াছিল।[১]

* * *

সুতরাং ইংরাজদের খুব বরাৎ জোর যে হিটলারী ঘাতকদের হাত থেকে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।

যুদ্ধের গোড়া থেকেই উইনস্টোন চার্চিল মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আমেরিকার সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই যুদ্ধ জয় সম্ভব নহে। এজন্য তিনি রুজভেল্টের সঙ্গে পত্র ও তার বিনিময় শুরু করিলেন। এই বিরাট 'পত্র-সাহিত্য' যুদ্ধের ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে এবং কেউ কেউ (যেমন এ জে পি টেলর) বলেন যে, চার্চিলের এই পত্রগুলিই তাঁর রচিত সুবিখ্যাত মহাযুদ্ধের ইতিহাসের মূল উপাদান।

জার্মানীর আক্রমণের আশঙ্কায় অস্ত্র সাহায্যের জন্য চার্চিল মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, তার ফলে ১৯৪০ সালের জুন মাসে আমেরিকার কাছ থেকে প্রথম কিস্তী হিসাবে প্রথম মহাযুদ্ধের আমলের (১৯১৭-১৮) ৫ লক্ষ এনফিল্ড রাইফেল, ১৩ কোটি গুলীবারুদ, ৯০০ ফিল্ডগান (৭৫ এম এম) ও ১০ লক্ষ গোলাগুলী

১। উইলিয়াম শাইরারের 'থার্ড রাইখ' পুস্তক, পৃঃ ১৩৬-৪০ এবং ভি ট্রুখানোভস্কি প্রণীত 'বৃটিশ ফরেন পলিসি ডিউরিং ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেণ্ড', পৃঃ ১১০।

এবং ৮০ হাজার মেসিনগান পাওয়া গেল। এগুলির মোট মূল্য ছিল ৩ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার। এছাড়া আগস্ট মাসে আমেরিকার কাছ থেকে ৫০ খানা পুরানো ডেস্ট্রয়ারও পাওয়া গেল। কিন্তু এর বিনিময়ে বৃটেনকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্তর্গত এবং অতলান্তিক মহাসমুদ্রে অবস্থিত নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, বারমুদা, বাহামা, জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ, বৃটিশ গিনি ইত্যাদি দ্বীপগুলি নৌ ও বিমানঘাঁটি স্থাপনের উদ্দেশ্য আমেরিকাকে ৯৯ বছরের জন্য লীজ দিতে হইল।

বিমান আক্রমণের দ্বারা বৃটেনকে ঘায়েল করিতে না পারিয়া অবশেষে হিটলার রণে ভঙ্গ দিলেন এবং ২১শে অক্টোবর 'অপারেশন সী-লায়ন' বা সিন্ধু ঘোটকের অভিযান বাতিল হইয়া গেল কিংবা পরবর্তী বসন্তকালের জন্য মুলতুবী রহিল। বলা বাহুল্য যে, সেই অভিযানের আর পুনরাবৃত্তি হইল না। কারণ, ততদিনে জার্মানী রাশিয়া আক্রমণের জন্য মন দিয়াছে। তথাপি জার্মান সেনাপতিদের (যেমন, ফিল্ডমার্শাল ম্যানস্টাইন) অভিমত এই যে, ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করিতে না পারা কিংবা না করা হিটলারের পক্ষে ভুল হইয়াছিল। কারণ, জার্মানী যদি বৃটেন জয় ও দখল করিতে পারিত, তবে পরবর্তীকালে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে সমুদ্র পাড়ি দিয়া ইউরোপীয় ভূভাগে অভিযান চালানো সম্ভব হইত না।

পশ্চিম জার্মানীর ঐতিহাসিকদের (যেমন, কারলু ক্লি) ধারণা এই যে, ডানকার্কের পরেই ইংল্যাণ্ডে অবতরণ ও আক্রমণ সম্ভব ছিল এবং তখন ইংল্যাণ্ড জয়ের সুবর্ণ সুযোগ গিয়াছে।

কিন্তু যা ঘটে নাই, তা নিয়া তর্ক করা চলে না। তবে, অতীতের দিকে তাকাইয়া দেখা যাইতেছে যে, বৃটেনের প্রতিরক্ষা যুদ্ধে জয়লাভ করার পর চার্চিলের মর্যাদা ও ক্ষমতা এত বাড়িয়া গেল যে, তিনি যেন ইংরাজ জাতির সমগ্র যুদ্ধ প্রচেষ্টার একমাত্র নিয়ামক হইয়া উঠিলেন। সমস্ত সমর বিভাগের উপরেই তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তথাপি পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের প্রতি চার্চিল যথাসম্ভব শ্রদ্ধা বজায় রাখিয়াছিলেন এবং রাজা ও সিংহাসনের প্রতি একটি রোমাণ্টিক অনুরক্তি বা আনুগত্য দেখাইতেন। কিন্তু বৃটিশ ঐতিহাসিকেরা যেমন—টেলর, লীডেল হার্ট ও জে এফ সি ফুলার প্রভৃতি শহরের অসামরিক জনগণের উপর বোমাবর্ষণ, যাকে সামরিক শাস্ত্রানুসারে স্ট্রাটিজিক বম্বিং বা রণনৈতিক বোমারু আক্রমণ বলা হয়, তা আগে শুরু করার জন্য চার্চিলের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। কারণ, তাঁদের মতে গোড়ায় হিটলারের এদিকে তেমন ইচ্ছা ছিল না। সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য যে বোমারু অভিযান ঘটিয়া থাকে, এই ক্ষেত্রে সে-কথা বলা হইতেছে না,—যেমন পোল্যাণ্ড ও পশ্চিম রণাঙ্গনে। কিন্তু বে-সামরিক জনগণের নৈতিক শক্তি ভাঙ্গিবার জন্য যে 'রণনৈতিক বোমা' বর্ষিত হইয়া থাকে, ঐতিহাসিকগণ তার নিন্দা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ কর্তৃক বার্লিনের উপর প্রথম এই ধরনের বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ২৫শে আগস্ট, ১৯৪০, সন্ধ্যাবেলা এবং তারপরেও আর এ এফ এই ধরনের বোমাবর্ষণ করিতে থাকে। তখন ৪ঠা সেপ্টেম্বর হিটলার এর জবাবে এক বক্তৃতা দিলেন এবং যদিও হিটলারের কোন রসবোধ ছিল না, তবু সেদিনের বক্তৃতায় তিনি চার্চিলকে 'সেই বিশিষ্ট সামরিক সংবাদদাতা' বলিয়া বিদ্রূপ করিলেন এবং তারপর

গর্জন করিয়া বলিলেন—'আমরাও প্রতিশোধ লইব, বৃটেনের শহরগুলি গুঁড়া করিয়া দিব !...'[১]

এই সভার প্রত্যক্ষদর্শী মার্কিন সাংবাদিক উইলিয়াম শাইরার লিখিয়াছেন যে, সেদিনের হিটলারের সভায় যুবতী নারীদের খুব ভিড় ছিল। তারা হিটলারের বক্তৃতা শুনিয়া এমন অভিভূত হইল যে, দাঁড়াইয়া উঠিয়া চিৎকার করিতে লাগিল এবং উত্তেজনায় তাদের বুক আন্দোলিত হইতে লাগিল।...

কিন্তু হিটলারী বক্তৃতার উন্মাদনা ও যুবতী নারীদের উত্তেজনা ঘটিলে কি হইবে, আসল সত্য এই যে, হিটলার বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ ও জয় করিতে পারিলেন না। ১৯৪১ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারির এক গুপ্ত বৈঠকে হিটলার যে সমস্ত কথা বলিলেন, তার নির্গলিতার্থ এই যে, 'সিন্ধু ঘোটকের' পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু তখন থেকে তিনি একবার 'অপারেশন সী-লায়ন' ও অন্যবার 'অপারেশন বার্বারোসা' এই দুই বিকল্প পরিকল্পনার ধাপ্পা দিয়া চলিতে চাহিলেন। অর্থাৎ তিনি ইংলণ্ডকে হাতে কলমে আক্রমণ না করিয়াও সর্বদাই আক্রমণের ভয়ের মধ্যে রাখিতে চাহিয়াছিলেন— যদিও শেষপর্যন্ত 'সিন্ধু ঘোটকে'র ভূত অপারেশন 'বার্বারোসা'র কাঁধে ভর করিয়া রাশিয়ার বিশাল প্রান্তরে গিয়া হাজির হইল !

১। শাইরার—পৃঃ ৯৩২-৩৩

প্রথম অধ্যায়

ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতি

বৃটিশ ও ইতালীয় সাম্রাজ্যবাদের সংঘাত

ইতিহাসের উষাকাল থেকে ভূমধ্যসাগর ও নীল নদকে কেন্দ্র করিয়া যেমন প্রাচীনতম সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেই সভ্যতা আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে, তেমনি এর গতিপথে যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত, হানাহানি এবং রাজ্যলোভী ও ভাগ্য-সন্ধানীদের অভিযানও এর ইতিহাসকে ভারী করিয়া তুলিয়াছে। সেই দূর প্রাচীনকালের রোমক দিগ্বিজয়ীদের সময় থেকে আধুনিক যুগের নেপোলিয়ন ও রোমেলের দুঃসাহসিক অভিযান পর্যন্ত এখানকার সামরিক উত্থানপতনের কাহিনী কম চিত্তাকর্ষক নয়। কিন্তু জার্মান সেনাপতি রোমেলের রোমাঞ্চকর আবির্ভাবের আগে নূতন রোমক সাম্রাজ্যবিলাসী যে ব্যক্তিটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছিল মহাযুদ্ধের আসরে 'যাত্রার দলের ভীমের' মত সেই মুসোলিনীকে যেন আমরা ভুলিয়া না যাই এবং ভুলিয়া যাওয়া সম্ভবও নয়। কেননা ১৯৪০ সালের পশ্চিম রণাঙ্গনে ফ্রান্স ও বৃটেনের পরাজয়ের অনেক আগে থেকেই এই ভদ্রলোক ভূমধ্যসাগরের জল ঘোলা করিতেছিলেন। ১৯২২ সালের অক্টোবরে ফ্যাসিজমের গুরু মুসোলিনী কর্তৃক ইতালীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর থেকে সাম্রাজ্য বিস্তারের যে স্বপ্ন ইতালীর পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যরূপে তিনি স্থির করিয়াছিলেন, সেই লক্ষ্য থেকে তিনি কোনদিন বিচ্যুত হন নাই। ১৯৩৯, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ফ্যাসিস্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিলের এক বৈঠকে তিনি একজন তত্ত্ববিশারদের মত ইতালীর অবস্থান, ভাগ্য ও লক্ষ্যের বিশ্লেষণ করিয়া বলেন:

'Italy is borded by an inland sea which communicates with the ocean through the Suez Canal—an artficial means of communication which is easily blocked even by accident—and by the straits of Gibralter dominated by the government of Great Britain. Italy has in fact no free access to the oceans. She is really a prisoner in the Mediteranean and the more populas and powerful she becomes, the more she will suffer from her imprisonment. The bars of this prison are Corsica, Tunisia, Malta and Cyprus. Its sentinels are Gibralter and Suez.'[১]

সোজা কথায় 'ইতালী একটি অন্তর্দেশীয় সমুদ্রের দ্বারা সীমাবদ্ধ, মহাসমুদ্রের সঙ্গে যার যোগাযোগ রহিয়াছে সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া, যে-খালটি কৃত্রিম এবং যে-কোন দিন একটা দুর্ঘটনায় অবরুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে, আর তার যোগাযোগ রহিয়াছে জিব্রাল্টারের মধ্য দিয়া, যার উপর প্রভুত্ব করিতেছে গ্রেট বৃটেন। অতএব কার্যত

১। The Brutal Friendship—by F W. Deakin (Penguin) 1966. P. 19

ইতালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে মহাসমুদ্রে প্রবেশের কোন পথ নাই। সুতরাং ইতালী আসলে ভূমধ্যসাগরে বন্দী মাত্র এবং আগামী দিনে যতই তার জনসংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, ততই এই বন্দীশালার দুর্ভোগ তার বাড়িতে থাকিবে। এই বন্দীশালার গারদ হইতেছে কর্সিকা, টিউনিসিয়া, মাল্টা এবং সাইপ্রাস। আর এর প্রহরী হইতেছে জিব্রাল্টার ও সুয়েজ'।

বর্ণনাটা খুব হৃদয়গ্রাহী সন্দেহ নাই এবং এই বর্ণনায় উপস্থাপিত তত্ত্ব থেকে মুসোলিনীর সিদ্ধান্ত এই যে, ইউরোপীয় ভূভাগে একমাত্র আলবেনিয়া ছাড়া ইতালীর আর কোন ভৌমিক লক্ষ্য থাকা উচিত নয়। কিন্তু প্রথমেই তাকে এই বন্দীশালার গারদ ভাঙ্গিতে হইবে এবং একবার এই গারদ ভাঙ্গিতে পারিলে ইতালীর একমাত্র জিগির হইবে ঃ

'The March to the Ocean. Which Ocean ? The Indian Ocean linking across the Sudan and Libya to Abyssinia or the Atlantic Ocean across French North Africa ?'

'চলো মহাসমুদ্রের দিকে মার্চ করি। কিন্তু কোন্ মহাসমুদ্র ? সুদান-লিবিয়ার উপর দিয়া আবিসিনিয়া হইয়া ভারত মহাসমুদ্রের দিকে, কিংবা ফরাসী উত্তর আফ্রিকা হইয়া অতলান্তিক মহাসমুদ্রের দিকে ?'

মুসোলিনী নিজেই এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, যে দিকেই মার্চ করি না কেন বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরোধিতার মুখে পড়িতে হইবে। সুতরাং এমন অবস্থায় ইউরোপীয় ভূভাগে আমাদের পৃষ্ঠদেশের নিরাপত্তা বিধান না করিয়া আমরা এই সমস্যার মীমাংসার জন্য কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে পারি না। রোম-বার্লিন এ্যাক্সিস এই ঐতিহাসিক প্রশ্নেরই জবাব-স্বরূপ।—(পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ১৯)

অর্থাৎ নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে ফ্যাসিস্ট ইতালীর যে মিত্রতা মুসোলিনীর পক্ষে তার প্রধান লক্ষ্য হইতেছে ইউরোপীয় ভূভাগে নিরাপত্তা বিধানের পর ভূমধ্যসাগরীয় বন্দীশালা থেকে মুক্তিলাভ এবং এই বন্দীশালার গারদগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন রোমক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু আফ্রিকা মহাদেশ এবং তার অগাধ ঐশ্বর্য তো ইউরোপীয় শক্তিবর্গের কাছে দুই শতাব্দী ধরিয়াই লুটের মাল ছিল এবং এই লুটেরাদের মধ্যে প্রধান ছিল বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী ও পর্তুগাল। উনবিংশ শতকে ইউরোপীয় জাতীয় রাষ্ট্রগুলির (নেশন স্টেটস) মধ্যে যখন আফ্রিকা নিয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল, তখন ইতালী ছিল তাদের মধ্যে বহু বিলম্বে উপস্থিত নবাগতের মত। পশ্চিম ইউরোপীয় মত তার শ্রম-শিল্পের শক্তি যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং সামরিক বলও তার সামান্য ছিল। তবু আফ্রিকান সাম্রাজ্যের লুঠের বখরায় সে পিছনে থাকিবে কেন! ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ খাল খুলিবার পর ইতালীও আফ্রিকার দিকে নজর দিল এবং ১৬ বছর পর পূর্ব আফ্রিকায় মাসাওয়া দখল ও এরিত্রিয়ার উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইল। তারপর পূর্ব আফ্রিকায় ভারত মহাসাগরের কূলে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড গড়িয়া উঠিল এবং এই দুই উপনিবেশের মাঝখানে ছিল বহু প্রাচীন রাজ্য ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া)। কিন্তু মাঝখানের এই রাজ্যটা কেনই বা ইতালী কাড়িয়া নিবে না ? আর এটি দখল করিতে পারিলেই ইউরোপীয়

ঔপনিবেশিক শক্তিবর্গের অন্যতমরূপে তার প্রেস্টিজ বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং উনবিংশ শতকের শেষ দশকে সিনর ক্রিস্‌পি মার্চ করিলেন সদর্পে আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু ইতালীর দুর্ভাগ্য (এবং সেদিনও দুর্ভাগ্য!) ওই কালো আবিসিনীয়ানদের হাতে ইতালীর সৈন্যরা এমন প্রচণ্ড মার খাইল যে, ১৮৯৬ সালে আদোয়াতে তাদের একেবারে বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। ইতালীয় ঔপনিবেশিক যুদ্ধের ইতিহাসে এজন্য 'আদোয়া'র নাম স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই মার খাওয়ার পর ইতালী অনেক দিন আর আফ্রিকা অভিযানে বাহির হয় নাই। কিন্তু সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ১৯১১ সালের তুরস্কের বিরুদ্ধে বলকান যুদ্ধের ডামাডোলে ইতালীর সেই সুযোগ আসিয়া গেল এবং ইতালী উত্তর আফ্রিকায় ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে ট্রিপোলি ও সাইরেনাইকা (লিবিয়া) নিজের দখলে আনিয়া ফেলিল। তখন জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্র লাভের (প্রথম মহাযুদ্ধ) আশায় ফ্রান্স ও বৃটেন ইতালীর এই ঔপনিবেশিক সম্পত্তি দখল অনুমোদন করিয়া লইল। পশ্চিম ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকার স্থানীয় বাসিন্দাদিগকে যেরূপ হিংস্রতা ও নির্মমতার সহিত দমন করিয়াছে এবং শ্বেতাঙ্গদের বসবাস ও ঐশ্বর্য যেভাবে ক্রমাগত বাড়িয়াছে, ইতালীর নূতন সাম্রাজ্যেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটিল।

মুসোলিনীর আমলে উত্তর আফ্রিকায় ইতালীয় উপনিবেশগুলিতে জেনারেল গ্রাৎসিয়ানীর কঠোর সামরিক শাসন প্রবর্তিত হইল। স্থানীয় অধিবাসীদের বিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হইল। ইতালীয় নাগরিকদের সংখ্যা বহু গুণ বাড়িয়া গেল, মরুভূমির পুনরুদ্ধার করা হইল। দুর্গ, বিমানঘাঁটি এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূল ভাগ ধরিয়া নূতন নূতন সড়ক, রেলপথ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু এই সমস্ত নবনির্মাণ ও আয়োজনের পিছনে ইতালীয় জাত্যাভিমানের প্রেরণা ছিল—সেই ১৮৯৬ সালের আদোয়া যুদ্ধের শোচনীয় ও মর্মান্তিক পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মুসোলিনী ১৯৩৫-৩৬ সালে আবিসিনীয়া আক্রমণ ও দখল করিলেন। এভাবে পূর্ব আফ্রিকায় ইতালীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল। লিবিয়া, এরিত্রিয়া আবিসিনিয়া, সোমালিল্যাণ্ড—এই সুবৃহৎ সাম্রাজ্যে ইতালীয় ঔপনিবেশিকদের সংখ্যা দাঁড়াইল প্রায় আড়াই লক্ষ এবং এই সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য নেটিভ ও ইতালীয়সহ মোট ৪ লক্ষেরও বেশী সৈন্য সর্বদাই প্রস্তুত ছিল। লোহিত সাগর এবং ভূমধ্যসাগরের তীরে উৎকৃষ্ট বন্দর ও নৌঘাঁটি স্থাপিত হইল।

তখন ১৯৪০ সালের জুন মাস। ইতালী পরাজিত ফ্রান্সকে পিছন থেকে ছুরি মারিয়াছে এবং ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে নিঃসঙ্গ বৃটেন বিপন্ন—সর্বদাই হিটলারী আক্রমণের মুখে। লোভী মুসোলিনীর পক্ষে এই সুযোগ। ডুচের ধারণা হইল ফ্রান্স তো ধরাশায়ী এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনও আসন্ন। সুতরাং মিশর, বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড ও বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকা—বহু দূর বিস্তৃত এই বিশাল সাম্রাজ্যের তিনি মালিক হইবেন। এত বড় সাম্রাজ্য দিগ্বিজয়ী সীজারের পর আর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাউণ্ট চীয়ানো (ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী) এই অবস্থার দিকে তাকাইয়াই বলিয়াছিলেন —৫ হাজার বছরেও এমন সুযোগ আর মিলিবে না।[১]

১৯৪০ সালের শেষ ভাগ থেকে ভূমধ্যসাগরের নীল বারিরাশি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল

১। 'The Second World War—Churchill Vol. 3, P. 70-72.

এবং তার তরঙ্গে তরঙ্গে যেন রণডঙ্কা বাজিতে লাগিল। এই সাগরের রণনৈতিক গুরুত্ব অসাধারণ। কারণ, এর চারি পাশে যে সমস্ত দেশ, যেমন উত্তর আফ্রিকা, মিশর, বলকান রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং মধ্যপ্রাচ্য, আর সেই সঙ্গে খাস ভূমধ্যসাগরের জলপথ—এই বিশাল এলাকা ছিল পুরাতন ও নূতন সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। বিশেষতঃ বৃটেনের কাছে তো এই অঞ্চল ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের হৃদপিণ্ডের তুল্য। কারণ, জিব্রাল্টার, মাল্টা ও সুয়েজ খাল দিয়া এই পথ চলিয়া গিয়াছে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী ভারতবর্ষ ও ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এবং সেখান থেকে দূরপ্রাচ্যের সিঙ্গাপুর অবধি, যেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবেশপথ। সুতরাং এক কথায় এটা বহু দূর বিস্তৃত বৃটিশ সাম্রাজ্যের 'লাইফ লাইন' বা প্রাণপ্রবাহের মত। এই প্রাণপ্রবাহের উপর লোভার্ত দৃষ্টি ছিল মুসোলিনীর ইতালীর। আরও মনে রাখা দরকার যে, ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ দিকে উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া, মিশর ও সুয়েজ খাল কিংবা লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী এরিত্রিয়া, সোমালিল্যাণ্ড, ইত্যাদি। অথবা উত্তর দিকে গ্রীস যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া কিংবা পূর্ব দিকে মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি সমস্তই ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতির অন্তর্গত এবং যদিও ভৌগোলিক বিচারে এগুলি বাহ্যতঃ পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন, তথাপি রণনীতির বিচারে এগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত বলিয়া ধরা যায়।……

১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পতনের পর পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় ফরাসী ও বেলজিয়ান উপনিবেশগুলি মোটামুটি মিত্রপক্ষের দলে থাকিয়াই 'স্বাধীনতা' রক্ষা করে। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে মিশর কিংবা দক্ষিণ আমেরিকা ও অতলান্তিক হইতে মধ্য আফ্রিকা হইয়া ভারত মহাসাগর পর্যন্ত মিত্রপক্ষের বিমানপথের যোগাযোগ অব্যাহত রহিল। কিন্তু ইউরোপ হইতে ভূমধ্যসাগর ও সুয়েজখাল দিয়া ভারতবর্ষ পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান ও সংক্ষিপ্ততম যোগাযোগের জলপথ বিপন্ন হইল। ফ্রান্সের পতনের পর ইতালী দ্রুত আঘাত হানিয়া এই ভূমধ্যসাগরীয় সাম্রাজ্য দখল করিতে চাহিল। তখন থেকে ১৯৪৩ সালের মে মাস পর্যন্ত বৃটিশ জাহাজগুলিকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতের দিকে যাইতে হইত। তখন বৃটেনের ঘোরতর দুর্দিন—ইংল্যাণ্ডের উপর জার্মানীর ভয়াবহ বিমান অভিযান চলিয়াছে এবং ইংরাজ জাতি আত্মরক্ষার সংকটে বিব্রত। ইতালী উত্তর ও পূর্বের দুইটি আর্মি সহ মোট প্রায় ৫ লক্ষ সৈন্য সমবেত করিল—ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, ট্রাক ইত্যাদি আধুনিক গতিশীল যুদ্ধের বহনগুলি একত্র করা হইল। আফ্রিকায় ইতালী এক সুবৃহৎ সাঁড়াশির চাপ অনুসরণের জন্য উদ্যোগী হইল। আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়ার 'ভাইসরয়' ডিউক অফ ডি'আওস্টার অধীন একটি আর্মি মিশরে অভিযান করিতে চাহিল। দক্ষিণ দিকের ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকা হইতে এবং মার্শাল রুডলফও গ্রাৎসিয়ানীর অধীন আর একটি আর্মি উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া হইতে পূর্বদিকে মিশর অভিমুখে অগ্রসর হইতে চাহিল। অর্থাৎ দুইদিকের চাপে মিশর দখল করাই ছিল মুসোলিনীর উদ্দেশ্য। এই অভিযানে বাধা দেওয়ার জন্য বৃটেন জোড়াতালি দিয়া মোট ৭৫ হাজার সৈন্য সমবেত করিল—যাদের বলা যাইতে পারে 'সাম্রাজ্য বাহিনী'। কেননা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং বৃটেন—সাম্রাজ্যের এই সমস্ত অংশ হইতেই সৈন্যদল সংগৃহীত হইল। অস্ত্রবলের মধ্যে তাদের সম্বল ছিল কিছু পুরানো এরোপ্লেন এবং

দুই শতেরও কম হাল্কা ট্যাঙ্ক। জেনারেল স্যার আর্চিবল্ড ওয়েভেল (যিনি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রধান সেনাপতি এবং তারও পরে ভারতবর্ষের বড়লাট হইয়াছিলেন) এই সাম্রাজ্য বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক ছিলেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লিবিয়া ও আবিসিনিয়ায় ইতালীয় সৈন্যরা পরাজিত ও নষ্ট হইল। যদিও পরবর্তীকালে এই যুদ্ধ চলিল প্রধানতঃ জার্মান সেনাপতি রোমেলের সঙ্গে প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া।

১৯৪০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর লিবিয়ার মরুভূমি হইতে ইতালীয় বাহিনীর অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী মিশর আক্রমণ করিলেন। এখানে মনে রাখা দরকার যে, লিবিয়া ও মিশর উভয়ের সীমানা মিশিয়া গিয়াছে এই মরুভূমির অন্তহীন উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে এবং একমাত্র ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ছাড়া যোগাযোগের কোন উৎকৃষ্ট পথ ছিল না। এখানে তোব্রুক ও সিদিবারানীর প্রায় মধ্যস্থলে উভয়ের সীমান্তের সংযোগ। লিবিয়ার পশ্চিমে টিউনিসিয়া, কিন্তু ফ্রান্সের পরাজয়ের জন্য
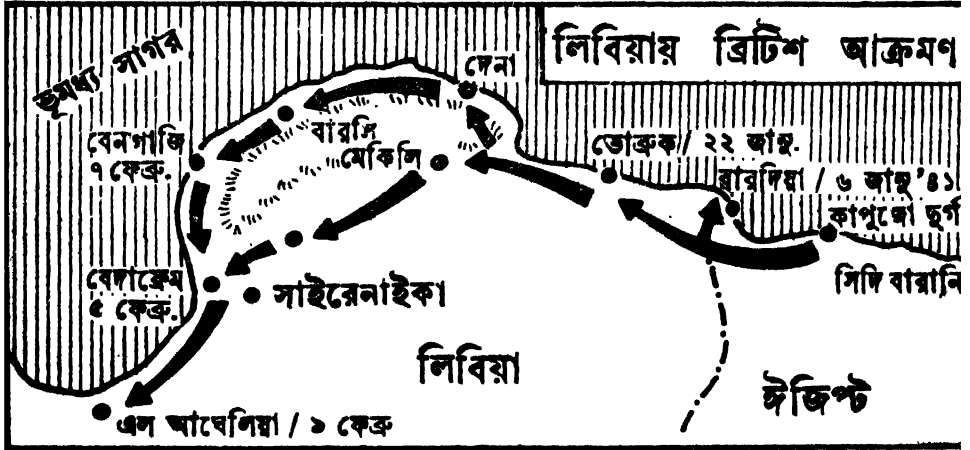
এই পশ্চাদ্ভাগ সম্পর্কে ইতালী নিশ্চিন্ত ছিল। ইতালীয় সৈন্যেরা মিশরের সীমানা পার হইয়া সিদিবারানী পর্যন্ত পৌঁছিল এবং সেখানে ঘাঁটি আগলাইয়া রহিল, যদিও বৃটিশের আত্মরক্ষার প্রধান ব্যূহ ছিল মার্সা মাত্রুতে—সমুদ্রোপকূলের এই স্থানটি রাস্তা ও রেলওয়ের সংযোগের জন্য উল্লেখযোগ্য।

গ্রাৎসিয়ানির সৈন্যেরা মরুভূমি এড়াইয়া সাবধানে সমুদ্রোপকূল ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় বৃটিশ নৌবহর তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হইয়া উঠিল এবং ইতালীয়দের সরবরাহ লাইন বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। কিন্তু মুসোলিনী ইতালীয় উপকূল ভাগ আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় তাঁর নৌবহরের অধিকাংশই ইতালীর একেবারে দক্ষিণ প্রান্তস্থিত টরেন্টো নৌঘাঁটিতে রাখিয়া দিয়াছিলেন। বৃটিশ নৌ-কর্তৃপক্ষ টের পাইয়া ১১ই নভেম্বর ১৯৪০ সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ সেই নৌবহর আক্রমণ করিলেন। 'ইলাসট্রিয়াস' নামক বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ থেকে ৯টি বিমান পর পর দুই সারিতে উড়িয়া গিয়া ইতালীয় নৌবহরের উপর আক্রমণ চালাইল টর্পেডোযোগে। সেদিনের মহাযুদ্ধে বিমান থেকে টর্পেডোযোগে জাহাজ আক্রমণের প্রথম ঘটনাবলীর মধ্যে এটিই ছিল অন্যতম এবং এর সাফল্যও ছিল অসাধারণ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই টরেন্টো

নৌপোতাশ্রয় অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিল। ৬টি ইতালীয় যুদ্ধজাহাজ বা ব্যাটলশিপের মধ্যে তিনটি ধ্বংস হইয়া গেল এবং আরও দুইটি ক্রুজার ও দুইটি সাহায্যকারী জাহাজও খতম হইয়া গেল। মাত্র দুইটি বৃটিশ প্লেন নষ্ট এবং একজন অফিসার নিহত হইল এই আকস্মিক আক্রমণে। বৃটিশ নৌশক্তির হাতে এভাবে মার খাইয়া ইতালীয় নৌবহর নিরাপদ দূরত্বে গিয়া আশ্রয় নিল এবং ভূমধ্যসাগরের জলপথে বৃটিশ নৌশক্তির কর্তৃত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৯৪০ সালের ৯ই ডিসেম্বর জেনারেল ওয়েভেলের সাম্রাজ্যবাহিনী সিদিবারানীতে ইতালীয়দিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করিল এবং বৃটিশ পক্ষে 'ধুরন্ধর রণকৌশলী' জেনারেল ও'কনোর তাদের লিবিয়ার উপকূল ভাগ ধরিয়া তাড়াইয়া লইয়া গেল। দুই মাসের মধ্যে এল সোলাম, বারদিয়া, তোব্রুক এবং বেঙ্গাজী সাম্রাজ্যবাহিনীর দখলে আসিল। বেঙ্গাজী হইতে পলায়মান ইতালীয়দিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ডের্নার দক্ষিণ-পশ্চিমে এল মোকিলি হইতে মাত্র ২৫টি ট্যাঙ্কসহ একটি মোটরায়িত সৈন্যদল ১৫০ মাইল মরুভূমি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইল। ইতালীয়দের পৌঁছিবার মাত্র দুই ঘণ্টা আগে সাম্রাজ্যসৈন্যরা সেই ঘাঁটিতে গিয়া উপস্থিত হইল এবং ইতালীয় বাহিনী ফাঁদে পড়িল। বৃটিশ পক্ষের হাতে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ইতালীয় বন্দী হইল এবং এই দ্রুত অগ্রগতিতে সাম্রাজ্যসৈন্যদলের মাত্র ৬০৪ জন লোক খোয়া গেল। এল আঘেইলা পর্যন্ত লিবিয়ার পূর্বার্ধ বা সাইরেনিকা দখল হইল—১৯৪১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি।

আফ্রিকায় নূতন সাম্রাজ্য জয় করিতে গিয়া মুসোলিনীর এই পরিণাম! ইতালীয় সৈন্যদের রণকৌশলে বহু ত্রুটি ছিল, তাদের সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল, বিমানগুলি মাটিতেই ধ্বংস হইয়াছিল এবং তারা বহু প্রকার ভুল করিয়াছিল। উপকূলবর্তী প্রত্যেকটি শহরকে তারা কামান, কাঁটাতার ও ট্যাঙ্ক-মারা ফাঁদের দ্বারা কেল্লায় পরিণত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ পক্ষ গতিশীল রণকৌশল অনুসরণ করিয়া ইতালীয়দের এই সমস্ত কেল্লা মাটি করিয়া দিল।[১] তারা দ্রুততা, অতর্কিত আঘাত এবং প্রয়োজন মত ধাপ্পা দেওয়ার কৌশল বুদ্ধিসহকারে অনুসরণ করিল। সামরিক ইতিহাসে এই প্রথম ট্যাঙ্ক ও ট্রাক এবং সাঁজোয়া গাড়ী বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে সমুদ্রের যুদ্ধজাহাজের অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করিল, যাহা ইতাললীয়দিগকে বেকুব বানাইয়া দিল।

কেবল লিবিয়া নহে, ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকার আবিসিনিয়ারও অনুরূপ দশা হইল। এরিত্রিয়া, সোমালিল্যান্ড ও আবিসিনিয়ার দুই লক্ষ ইতালীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে জেনারেল ওয়েভেল মাত্র ৩০ হাজার সৈন্য সমবেত করিতে পারিলেন। বিস্ময়ের কথা এই যে, লিবিয়ায় জয়লাভের পর জেনারেল ওয়েভেল এই সামান্য সৈন্যশক্তির সাহায্যেই ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকায় মুসোলিনীর সাম্রাজ্যকে ধূলিসাৎ করিয়া দিলেন। গতিশীল যুদ্ধ, অতর্কিত আক্রমণ এবং নৌবহর ও বিমান বহরের সহযোগিতায়ই ইহা সম্ভব হইল। আর ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল শ্রেষ্ঠতর রণনীতি এবং দ্রুত আঘাত হানিবার রণকৌশল। ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকার পশ্চিম সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০০ মাইল, সমুদ্রতীরের দৈর্ঘ্যও অনুরূপ। আর এই বিচিত্র ভূভাগের ভৌগোলিক অবস্থাও অতি

১। 'The World At War'—page 70. U. S. A, 1945

বিসদৃশ—মরুভূমি, দুর্গম ঝোপজঙ্গল, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপ, খাড়া পাহাড় এবং মাইলের পর মাইল আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন, জলহীন শুষ্কদেশ। সুতরাং এখানকার সংগ্রামকে 'পেট্রোল ও জলের যুদ্ধ' বলা যাইতে পারে।[১]

এখানে বৃটিশ পক্ষের দ্রুত আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত হইল কর্নেল উইনগেটের নেতৃত্বে অসন্তুষ্ট স্থানীয় আদিবাসীদের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ। এর ফলে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে বৃটিশ পক্ষের বেশ সুবিধা হইয়াছিল। বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড ইতালীয়দের হাতে পড়িয়াছিল ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে বৃটিশ সাম্রাজ্য বাহিনী পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ পশ্চিম দিকের ইঙ্গ-মিশরীয় সুদানের ব্যাসলো হইতে তারা এরিত্রিয়ার অভ্যন্তরে অগ্রসর হইল এবং ৭ সপ্তাহ অবরোধ যুদ্ধের পর ২৭শে মার্চ কেরেনের পার্বত্য দুর্গ দখল করিল। তারপর তারা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া আসমারা এবং লোহিত সাগরের মাসাওয়া বন্দর অধিকার করিল। ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগে যান্ত্রিক সৈন্যেরা পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া হইতে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডে প্রবেশ করিল এবং ১০ দিনে ৩০০ মাইল অতিক্রম করিয়া মোগাদিসু দখল করিল। মোগাদিসু হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে তারা ওয়েবি সেবেলি নদী উপত্যকা ধরিয়া আবিসিনিয়ার ভিতর ঢুকিল ও ডাগাবুর দখল করিল। ১৭ই মার্চ জিজিগা অধিকৃত হইল। এদিকে ১৬ই মার্চ নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনীর একত্র আক্রমণে এডেন উপসাগরের বারবেরা বন্দর দখল হইয়া গেল এবং এভাবে জিজিগা ও বারবেরার মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইল। জিজিগা হইতে হারার হইয়া তারা আদ্দিস আবাবার দিকে অগ্রসর হইল এবং ৫ই এপ্রিল আবিসিনিয়ার রাজধানীর পতন হইল। এভাবে ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকার অন্যান্য স্থানও যেন চক্ষুর নিমিষে দখল হইয়া গেল এবং আম্বা আলাগির পতনের পর ১৯৪১ সালের ২২শে জুলাই সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইল যে, ইতালীয় পূর্ব আফ্রিকা এক্ষণে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিকারে গিয়াছে। এটাই ছিল সেদিনের মহাযুদ্ধে বৃটেনের সবচেয়ে বড় জয়।

মুসোলিনীর আফ্রিকার সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া গেল এবং ১৮৩৫-৩৬ সালে যে আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা হরণ করিয়া ফ্যাসিস্ট নায়ক মহাযুদ্ধের ভূমিকা রচনা করিতেছিলেন, সেই রাজ্যই প্রথম ত্রাণলাভ করিল এবং সম্রাট হাইলে সেলাসী বৃটিশের সহযোগিতায় ২০শে জানুয়ারি তাঁর রাজধানী আদ্দিস আবাবায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কিন্তু মুসোলিনী হারিলেও হিটলার হটিবার পাত্র নহেন। অক্ষশক্তির প্রেস্টিজের খাতিরেই হিটলার মুসোলিনীকে আফ্রিকা ও বলকান সংকট হইতে উদ্ধারের সংকল্প করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি এমন একজন প্রতিভাশালী দক্ষ সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন, যাঁর বুদ্ধির দীপ্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সামরিক ইতিহাসকে বহুদূর পর্যন্ত উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তাঁর নাম জেনারেল এরউইন রোমেল।

১৯৪১ সালের মার্চ মাসে জেনারেল রোমেল বিখ্যাত আফ্রিকা কোরের অধিনায়ক রূপে লিবিয়ায় প্রেরিত হইলেন। এই বাহিনীতে ছিল দুইটি সংগ্রামপটু সাঁজোয়া ডিভিসন, উৎকৃষ্ট সৈন্যদল লইয়া ইহারা গঠিত ছিল। এই ১৫ নং ও ২১ নং ডিভিসনে

১। From Tobruk to Smolensk—by Strategieus. P. 16

আট হাজার করিয়া সৈন্য এবং ১৩৫টি করিয়া ট্যাঙ্ক ছিল, আর ছিল ৯০ নং হাল্কা পদাতিক ডিভিসন। রোমেলের নেতৃত্বে ট্যাঙ্কের অপরিসীম কৃতিত্ব দেখাইয়া এই সৈন্যেরা মরুভূমি যুদ্ধের নূতন ইতিহাস রচনা করিল। জার্মানীর নূতন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এই সংগ্রামে প্রয়োগ করা হইল এবং প্রকাশ যে, হ্যাম্বুর্গের ট্রপিকাল ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে এজন্য বিশেষ ধরনের সাজসরঞ্জাম এবং মরুভূমির বালি ও উত্তাপের উপযোগী খাদ্য, পোষাক, আশ্রয় এবং ওষুধ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইল। যন্ত্রণাদায়ক গ্রীষ্মের প্রতিষেধক সাজসজ্জায় রোমেল বাহিনী প্রস্তুত হইয়া আক্রমণে অবতীর্ণ হইল।* আর ইহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিল ৭ ডিভিসন ইতালীর সৈন্য—ইহার মধ্যে এক ডিভিসন ছিল ট্যাঙ্ক এবং ইহারা প্রধানতঃ রোমেলের যোগাযোগ ও সরবরাহ লাইন রক্ষায় নিযুক্ত হইল। এবং তারা রোমেলেরই পরিচালনাধীন ছিল।

সাম্রাজ্যবাহিনী তখন লিবিয়ার এল-আঘালিয়ায় দণ্ডায়মান। আসন্ন বলকান বা গ্রীসের যুদ্ধের জন্যতখন ইহাদের মধ্য হইতে বহু সৈন্য ও অস্ত্র সেখানে প্রেরিত হইয়াছিল। সুতরাং তারা স্বভাবতঃই হৃতবল হইয়া পড়িয়াছিল। চতুর জার্মান সেনাপতি দেখিলেন আঘাত হানিবার এই সুযোগ। সুতরাং ১৯৪১ সালের ২৪শে মার্চ রোমেল আঘালিয়ার ঘাঁটি (যেখানে মাত্র দুই ডিভিসন সাম্রাজ্য-সৈন্য ছিল) বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং বিদ্যুৎগতিতে বেঙ্গাজী, ডের্না ইত্যাদি উপকূলবর্তী সহর ও ঘাঁটিগুলি দখল করিয়া মিশরের সীমানায় পেঁাছিলেন। ৭ই এপ্রিল ডের্না এলাকায় 'ধুরন্ধর রণকৌশলী' জেনারেল ও' কোনার, জেনারেল নিম, জেনারেল প্যারি (সাঁজোয়া বাহিনীর বিশেষজ্ঞ) প্রভৃতি ৬ জন বৃটিশ সেনাপতি, ২ জন কর্নেল এবং ২ হাজার সৈন্য বন্দী হইলেন। এই আকস্মিক ঘটনা বজ্রাঘাতের মত চারিদিকে হুলস্থূল সৃষ্টি করিল এবং মরুভূমিতে রোমেলের প্রথম আবির্ভাব বহু উপকথা ও রোমাঞ্চকর গল্পের খোরাক জোগাইল। মাত্র ১০ দিনের বিদ্যুৎগতি আক্রমণে রোমেল এই অঘটন ঘটাইলেন।

সাম্রাজ্যবাহিনী বিতাড়িত হইয়া মিশর পর্যন্ত ফিরিয়া আসিল। কিন্তু পথিমধ্যে তোব্রুক বন্দর উপকূলভাগে আত্মরক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রোমেল এই বন্দরের পাশ কাটাইয়া দ্রুত মিশর সীমান্তে চলিয়া গেলেন এবং যাতে তোব্রুক তাঁর সরবরাহ পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারে, এজন্য উহাকে অবরোধ করিলেন। হালফায়া পাস, সিদি ওমর এবং বার্দিয়া—এই তিন বিন্দুকে সংযুক্ত করিয়া তিনি এক ত্রিভুজাকৃতি ব্যূহ রচনা করিয়া তোব্রুককে অবরুদ্ধ করিলেন। সাম্রাজ্য বাহিনীরএক ডিভিসন অস্ট্রেলিয়ান সৈন্য এই বন্দর রক্ষায় রহিল এবং এই অবস্থায় দীর্ঘ ৮ মাসকাল অবরুদ্ধ থাকিয়া তোব্রুক অবরোধ যুদ্ধের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিল। বৃটিশ নৌবহর ও বিমানবহর তোব্রুকের অবরুদ্ধ দুর্গরক্ষীদিগকে সরবরাহ দিতে লাগিল কিন্তু জার্মান বোমারুর প্রবল আক্রমণে তাদের প্রভুত ক্ষতি হইতে লাগিল। ১৯৪১ সালের ১৫ই হইতে ১৭ই জুন তোব্রুকে উদ্ধারের জন্য বৃটিশ বাহিনী ট্যাঙ্কযোগে জোর আক্রমণ চালাইল। কিন্তু ট্যাঙ্কের নিয়োগ কৌশলে যেমন ভুল হইল, তেমনি গুণগত দিক দিয়াও এগুলি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এদের

ডেসমণ্ড ইয়ং এই গুজবের প্রতিবাদ করিয়াছেন তাঁর রোমেল সংক্রান্ত বইতে।—লেখক

স্পীড ছিল অত্যন্ত কম এবং ইঞ্জিনগুলি অত্যন্ত দুর্বল। ফলে, এই ট্যাংকগুলি জার্মানদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না।[১]

মধ্যপ্রাচ্য কমাণ্ডের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়েভেলের প্রতি চার্চিল প্রসন্ন ছিলেন না। ওয়েভেল ছিলেন স্বল্পবাক, সতর্ক এবং হঠাৎ কোন রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ার মত বেপরোয়া ঝোঁক তাঁর ছিল না। কিন্তু উত্তর আফ্রিকা, গ্রীস ও মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রের জন্য চার্চিল তাঁকে ক্রমাগত তাগিদ দিতেছিলেন। অথচ তাঁর অধীনে না ছিল উপযুক্ত সৈন্যবল কিম্বা অস্ত্রবল—যদিও পূর্ব ভূমধ্যসাগর থেকে প্রায় ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিশাল এলাকা তাঁর দায়িত্বের অন্তর্গত ছিল। সেনাপতি হিসাবে তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর—একথা বৃটিশ ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু চার্চিলের সঙ্গে মতান্তরের জন্য তাঁকে অপসারিত হইতে হইল। ১৯৪১ সালের ২১শে জুন জেনারেল ওয়েভেল ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন এবং জেনারেল স্যার ক্লড অকিনলেক তাঁর স্থানে আসিলেন মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান অধিনায়করূপে। অকিনলেকও দক্ষ সেনাপতি ছিলেন, কিন্তু তাঁর সৌভাগ্য এই যে, ওয়েভেল যে সাহায্য ও সহযোগিতা পান নাই (ইংরাজ ঐতিহাসিক টেলরের মতে) অকিনলেক সেই সমস্তই পাইয়াছিলেন।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে জেনারেল রোমেল 'মরুভূমির মায়াবী' বলিয়া অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ভারতীয় সামরিক মহলে সুপরিচিত ডেসমণ্ড ইয়ং তাঁর রচিত রোমেলের জীবনীগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, স্ট্রাটিজি বা রণনীতির ক্ষেত্রে জেনারেল ওয়েভেল ছিলেন রোমেলের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। তবুকের অবরোধ যুদ্ধ ওয়েভেলেরই সাহসিক সিদ্ধান্তের ফল এবং রোমেল পর্যন্ত ওয়েভেলকে 'একজন শীর্ষস্থানীয় সামরিক প্রতিভা' বলিয়া স্বীকার করিতেন। এবং রোমেলের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সৈন্যপত্য সংক্রান্ত ওয়েভেলের লেখা একটি পুস্তিকাও রক্ষিত ছিল।[২]

মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গনের বৃটিশ সেনাপতি ওয়েভেলের হাতে ১৯৪০ সালের এই দুর্দিনে মিশরে ৩৬ হাজার, প্যালেস্টাইনে ২৭ হাজার, সুদানে ৯ হাজার, কেনিয়াতে ৮ হাজার ৫ শত এবং বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডে ১ হাজার ৫ শত মাত্র সৈন্য ছিল। এছাড়া কোন ভারী সামরিক সজ্জা তাঁর ছিল না এবং ট্যাংকমারা গোলন্দাজী শক্তিও তাঁর সামান্য ছিল। কিন্তু এই সামান্য শক্তি নিয়াই ওয়েভেলের পক্ষে বহু গুণ শক্তিশালী ইতালীয় সামরিক বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সুতরাং তাঁর সাফল্যকে বিস্ময়কর বলিলে নিশ্চয় অত্যুক্তি হইবে না।

আফ্রিকার এই যুদ্ধ সম্পর্কে চার্চিল তাঁর মহাযুদ্ধের ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আবিসিনিয়া, এরিত্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডের (পূর্ব আফ্রিকা) সৈন্য ছাড়াই উত্তর আফ্রিকার উপকূল ভাগে ত্রিপোলিটানিয়া ও সাইরেনাইকায় ইতালীর ২ লক্ষ ১৫ হাজার সৈন্য ছিল এবং অনেক দিন ধরিয়াই তাদের যুদ্ধের আয়োজন ও প্রস্তুতি চলিতেছিল। এজন্য ত্রিপোলিতে ছিল তাদের মূল সামরিক ঘাঁটি এবং সেখান থেকে ত্রিপোলিটানিয়া ও সাইরেনাইকা (লিবিয়া) হইয়া মিশরের সীমান্ত পর্যন্ত হাজার মাইলের বেশী দীর্ঘ

একটি চমৎকার সামরিক সড়ক নির্মিত হইয়াছিল। এই উপকূল ভাগ ও সড়কের সর্বত্র যুদ্ধের উপযোগী সরবরাহ ডিপো ও ঘাঁটি তৈয়ার হইয়াছিল এবং শরৎকালের (১৯৪০) মধ্যে এই সমস্ত এলাকায় অন্ততঃ ৩ লক্ষ ইতালীয় সমবেত হইল।...

ইতালীওরা আগষ্ট বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড আক্রমণ করিল এবং এখানকার সামান্য সংখ্যক বৃটিশ সৈন্যেরা জেনারেল গডউইন অষ্টিনের নেতৃত্বে প্রতিরোধ করিল বটে, কিন্তু পারিয়া উঠিল না। তারা পশ্চাদপসরণ করিল। আফ্রিকায় এই একটিমাত্র সামান্য যুদ্ধক্ষেত্রে বৃটিশের পরাজয় ঘটিল ইতালীর হাতে। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাতেই মুসোলিনী একেবারে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং রোম নগরী থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তর্জন-গর্জন শুরু করিয়া দিলেন। কিন্তু মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি মিশর বা নীল নদের উপত্যকা আক্রমণের জন্য উৎসাহী ছিলেন না। কারণ, তাঁর মতে ইতালীয় সামরিক শক্তি মিশর জয়ের উপযোগী ছিল না। কাউণ্ট চিয়ানো তাঁর ডায়েরীতে ৮ই আগষ্ট, ১৯৪০ মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই আক্রমণের প্রস্তুতির সম্পূর্ণতা ঘটাইতে গ্রাৎসিয়ানি আরও ২।৩ মাস সময় চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মুসোলিনী এতে অত্যন্ত চটিয়া গেলেন এবং শ্লেষের সুরে মন্তব্য করিলেন যে, গ্রাৎসিয়ানির মার্শাল হওয়া ছাড়া আর কেন উচ্চাশা নাই।

এই ঘটনার এক মাস পরে গ্রাৎসিয়ানি আরও এক মাস অপেক্ষা করিতে চাহিলেন। তখন মুসোলিনী ধৈর্য হারাইয়া হুকুম দিলেন—'যদি সোমবার দিন তুমি আক্রমণ না করো, তবে, তোমাকে পদচ্যুত করা হইবে।' মার্শাল তখন জবাব দিলেন—যথা আজ্ঞা! চিয়ানো মন্তব্য করিতেছেন যে, সেনাপতিদের এত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখন যুদ্ধযাত্রা আর কখনও দেখা যায় নাই। (১৩ই সেপ্টেম্বর মিশর আক্রমণ শুরু হইয়াছিল।)

এই পটভূমিকা থেকেই ইতালীর যুদ্ধের ফলাফল অনুমান করা যাইতে পারে। খাদ্যহীন, জলহীন মরুভূমিতে ইতালীয় বাহিনী বৃটিশের হাতে অতিদ্রুত বিধ্বস্ত হইয়া গেল, ১ লক্ষ ১৩ হাজার সৈন্য বন্দী হইল এবং ৭ শ'য়ের বেশী কামান ধরা পড়িল। ১২ই ডিসেম্বর গ্রাৎসিয়ানির কাছ থেকে এই বিপর্যয়ের বার্তাবাহী টেলিগ্রাম মুসোলিনীর নিকট পেঁাছিল এবং গ্রাৎসিয়ানী সেই তারবার্তায় অত্যন্ত রাগতভাবে অনুযোগ করিয়াছিলেন যে, তাঁকে এক অসম যুদ্ধে পাঠান হইয়াছিল—এ যেন হাতীর সঙ্গে মাছির লড়াই। আর মুসোলিনী মন্তব্য করিলেন যে, তিনি লোকটার উপর রাগিতেও পারিতেছেন না, কারণ, লোকটিকে তিনি ঘৃণা করেন।

* * *

সোমালিল্যাণ্ড, আবিসিনিয়া ইত্যাদি পূর্ব আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে বৃটিশ পক্ষের আক্রমণের অনেক কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া চার্চিল বলিয়াছিলেন যে, মোগাদিসুর গুরুত্বপূর্ণ ইতালীয় বন্দর দখলের ফলে প্রচুর সরবরাহদ্রব্য বৃটিশের হস্তগত হইল। সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে ৪ লক্ষ গ্যালন মূল্যবান পেট্রোল। একসঙ্গে এত পেট্রোল ধরা পড়া নিশ্চয়ই অদ্ভুত।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইতালীর রাজার খুল্লতাত ভ্রাতা ডিউক অব ডি'আওস্টাঘিন পূর্ব আফ্রিকার ইতালীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তিনি পরাজিত হইয়া ১৬ই মে আত্মসমর্পণ করেন এবং ১৯৪২ সালে নাইরোবিতে বন্দী

অবস্থায় মারা যান। তিনি একজন ফরাসী রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোক ছিলেন—চার্চিলের মন্তব্য।

মিশর দখলের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ইতালীর সৈন্য বন্দী, ৪০০ ট্যাংক ও ১২৯০টি কামান ধরা পড়ে। মিঃ ডেসমণ্ড ইয়ং তাঁর রোমেল সংক্রান্ত বইতে উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, এই সমস্ত সামরিকসম্ভার ছাড়াও অন্যান্য প্রচুর দ্রব্য-সামগ্রী বৃটিশ পক্ষের হাতে ধরা পড়িয়াছিল এবং এগুলির মধ্যে ছিল অজস্র প্রকারের শয্যাদ্রব্য, বিলাস ও প্রসাধনী দ্রব্য, দামী টয়লেট-সেট, গন্ধদ্রব্য, সুবাসিত জল এবং নানা প্রকারের উৎকৃষ্ট মদ্য! আর সেই সঙ্গে কয়েক গাড়ীভর্তি ইতালীয় যুবতী নারী—

"a motor caravan of young women officers for the use of..."

অর্থাৎ ইতালীয় যুদ্ধযাত্রা বেশ আরামদায়কই ছিল।—(ডেসমণ্ড ইয়ংয়ের মন্তব্য)। একেবারে মদ ও মেয়েমানুষ সহ। আর এর বিপরীত দৃশ্যে দেখা যায় যে, মুসোলিনী ১৭ই জুন, ১৯৪০ তাঁর যুদ্ধযাত্রার সমর্থনে মার্শাল গ্রাৎসিয়ানের কাছে বলিয়াছিলেন—

'I need a few thousand/dead to justify my presence at the peace table.'

অর্থাৎ 'শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত থাকার সাফাই হিসাবে আমার দরকার কয়েক হাজার মানুষের মড়া।'

অবশ্য ইউরোপে ও আফ্রিকায় ইতিমধ্যেই অজস্র মানুষের মড়া মুসোলিনীর বরাতে জুটিয়াছিল, তবু কিন্তু শান্তির টেবিলে যোগ দেওয়ার সুযোগ মুসোলিনীর কপালে আর জুটিল না।...

ইরাকের বিদ্রোহ

জেনারেল রোমেল যখন মিশরের দ্বারদেশে তখন মধ্যপ্রাচ্যে অকস্মাৎ একটি বিস্ফোরণ ঘটিল, যার গুরুত্ব নিতান্ত কম ছিল না। ইরাকের জাতীয়তাবাদী নেতা রসিদ আলী জিলানী ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ অফিসারদের সহায়তায় গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অকস্মাৎ বিদ্রোহ করিলেন। এর আগে জানুয়ারী মাসে তিনি ইরাকের মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিদ্রোহী রসিদ আলী রাজধানী বাগদাদ দখল এবং ইরাকের রাষ্ট্রশক্তি নিজের হাতে আনিলেন! এই ঘটনায় বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বিচলিত হইলেন। কেননা উগ্র জাতীয়তাবাদী রসিদ আলীর সহিত জার্মানীর কোনও একটা গোপন সম্পর্ক আছে বলিয়া তাঁরা সন্দেহ করিলেন। কারণ, ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবার পর যদিও ইরাক জার্মানীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিল, তথাপি ফ্রান্সের পরাজয় এবং ইতালী কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা সত্ত্বেও ইতালীর সহিত ইরাকের সম্পর্ক রহিয়াই গেল। বাগদাদের ইতালীয় দূতাবাস নাৎসী চর ও প্রচারকদের আড্ডা হইয়া উঠিল এবং নিখিল আরব ঐক্য প্রয়াসী জাতীয়তাবাদী মুস্লিমগণ বৃটিশ বিদ্বেষের দ্বারা অসন্তোষ ছড়াইতে লাগিলেন। যদিও ইরাক বাহ্যতঃ স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া বিবেচিত ছিল, তথাপি ১৯৩০ সালে বৃটেনের সহিত সন্ধি-সর্তানুসারে ইরাকে বৃটিশ মিলিটারি মিশন, বিমানবহর, বিমানঘাঁটি এবং ইরাকী

১। The War 1939-1945—by Snyder 1964 P. 170

পুলিশ বাহিনীতে বৃটিশ ইন্সপেক্টরগণ ছিলেন। ইহা ছাড়া ইরাকের পেট্রোল লাইন, যাহা হাইফা বন্দর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তাহা সুরক্ষিত ও পাহারা দেওয়ার অধিকারও বৃটেনের ছিল। অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যস্বার্থের অন্যতম ঘাঁটি ছিল ইরাক, ফলে বৃটেনের সহিত ইরাকের জাতীয়তাদাবীগণের সম্পর্ক আদৌ বন্ধুতাব্যঞ্জক ছিল না। যেমন ছিল না মিশরে, ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই সমস্ত দেশে শোষণ ও শাসনের জন্য যে চাতুরি খেলিয়াছে, তাহা লইয়া তুরস্কের সঙ্গে পর্যন্ত দীর্ঘকাল মন কষাকষি ছিল। যদিও তুরস্ক বর্তমানে নিরপেক্ষ এবং ইরাকের আধুনিকতম বিদ্রোহ মধ্যস্থ হিসাবে আপোষ রফা করিতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিল, তথাপি অতীত ইতিহাসের বিবেচনায় তার আচরণ সম্পর্কেও সেই সময় প্রবল গবেষণা উদ্রেক করিয়াছিল। 'প্রকৃতপক্ষে বিগত মহাযুদ্ধের তুর্কী সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়াই বর্তমান ইরাক, প্যালেস্টাইন, ট্রান্সজর্ডন, সিরিয়া ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে মেসোপটেমিয়া বা আধুনিকতম ইরাকের স্বতন্ত্র সত্ত্বা তুরস্ক মানিয়া লইলেও মসুল প্রদেশ লইয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত এমন কি মহাযুদ্ধের অবসানে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত বৃটেনের সহিত তুরস্কের তিক্ত মন কষাকষি ছিল। কামাল আতাতুর্কও মসুলের বিরাট তৈল সম্পদ বৃটেনের হাতে চলিয়া যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিশেষতঃ এখানকার কুর্দি অধিবাসীদের লইয়া তুরস্কের মনে নানা অভিযোগ ছিল। গোটা মসুল প্রদেশটা তুরস্কের হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় আত্মরক্ষার দিক হইতে তুরস্ক দুর্বল হইয়াছে। সমর বিশেষজ্ঞদের মত এই যে, মসুলের উপর যাদের অধিকার থাকিবে, বসরা পর্যন্ত আত্মরক্ষার প্রশ্নে তারাই লাভবান হইবে। যুদ্ধের পর নানা সন্ধিসর্তের আলোচনার সময় তুর্কী গভর্নমেণ্ট মসুলের উপর অধিকার দাবী করিলেও সেই দাবী স্বীকৃত হয় নাই। বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ যখন মসুলের বাঁটোয়ারা ইঙ্গ-ইরাকীয়দের পক্ষে ঘোষণা করেন, তুর্কী গভর্মমেণ্ট তখন উহা গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন। ইরাকের উপর বৃটেনের ২৫ বৎসরের জন্য ইজারাসর্ত ঘোষিত হইয়াছিল। ইহার ফলে তুরস্ক আরও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। জনৈক ঐতিহাসিক বলেন,

"It was flet that the twenty five years' extension of the British mandate over Iraq was committing Grcat Britain to the danger of future war with Turkey....*

২৫ বৎসরের জন্য বৃটেনকে ইরাকের ইজারা দেওয়ায় গ্রেটবৃটেনকে ভবিষ্যতে তুরস্কের সহিত যুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দিল। অবশ্য ১৯২৬ সালের পর মসুল সমস্যার মীমাংসা তুরস্ক মানিয়া লইয়াছিল।'

'কিন্তু ১৯১৪-১৮ সালের রাজনীতি ও রণনীতির সংঘর্ষে অসন্তুষ্ট তুরস্কের মত মিশর এবং প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও ইরাকে প্রবল জাতীয় আন্দোলন দেখা দিয়াছিল এবং প্যালেস্টাইনের অসন্তুষ্ট আরবদের নেতা গ্রাণ্ড মুফতি ইরাকে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। বিগত মহাসমরে বিভিন্ন উপজাতি, সম্প্রদায় ও সর্দারগণের মধ্যে পারস্পরিক ভেদ সৃষ্টি করিয়া এবং কর্নেল লরেন্সের মারফৎ স্বাধীনতা লাভ ও তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার উস্কানি দিয়া মিত্রশক্তি কূটনীতির যে খেলা দেখাইয়াছিলেন, আজিকার দিনে উহা পাল্টা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য আরব দেশে বৃটেনের রাজ্যগত

* 'যুগান্তর' সম্পাদকীয় হইতে উদ্ধৃত মে, ১৯৪১।

কোন লোভ নাই, কিন্তু ইরাকের প্রচুর তৈল ও ভারতবর্ষের সহিত রাস্তাঘাটের যোগাযোগের দিক হইতে বৃটেনের অর্থনৈতিক ও রণনৈতিক স্বার্থ এখানে প্রচুর। সুতরাং আরবদের অগ্রগতি সম্পর্কে বৃটেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। জার্মানী ও ইতালীর প্রচারকার্য যাতে ঘোরতর অনিষ্ট করিতে না পারে, এখানকার বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এজন্য পূর্বাহ্নে সতর্ক ছিলেন। ১৯৩৪ সালে 'লণ্ডনে টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আরবদের মধ্যে বন্ধুর মত প্রচারকার্য ও সহৃদয়তা লাভ করিবার জন্য মেজর গ্লাব নামে একজন বৃটিশ অফিসারকে কর্ণেল লরেন্সের স্থানে নিয়োগ করা হইয়াছিল। ইরাক পেট্রোল কোম্পানী ও বৃটিশ সরকার ইহার সমস্ত খরচ বহন করিতেন। কারণ, এই দুইয়ের স্বার্থরক্ষাই মেজর গ্লাবের কর্তব্য ছিল। অবশ্য যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের পরে কর্ণেল লরেন্স ও মিস বেল ছাড়াও জন ফিলবি, কর্ণেল উইলসন, গিলবার্ট ক্লেটন, স্যার পার্সি কক্স প্রভৃতি বৃটেনের অনুকূলে আরবদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাইয়াছেল—দুর্দান্ত বেদুইনেরা আরব দেশকে আধুনিক সভ্যতার উত্তরাধিকারী করিতে উৎসাহী নহে। কারণ, তাদের উষ্ট্র ও লুণ্ঠন ব্যবসায় ইহা দ্বারা প্রতিহত হইতেছে। মোটর, এরোপ্লেন ও রেলওয়ে বিস্তারের জন্য এই সমস্ত স্বচ্ছন্দচারী আরবেরা স্বাভাবিক জীবিকার্জনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে, অথচ ইরাকের যাহা প্রধান সম্পদ সেই পেট্রোল বিদেশীর হাতে। পূর্বে এই পেট্রোল ব্যবসায়ে ইতালীরও অংশ ছিল। কিন্তু আবিসিনিয়া যুদ্ধে ইতালীর আর্থিক দুর্গতির জন্য এই সমস্ত শেয়ার ইংরাজের হাতে চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে মসুলের বিরাট তৈলখনির সম্পদগুলির শতকরা সাড়ে ৫২ ভাগই বৃটেনের হস্তগত এবং এই ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর প্রধান অংশীদার রহিয়াছেন ইঙ্গ-ইরানীয় অয়েল কোং, রয়েল ডাচ শেল, স্টাণ্ডার্ড অয়েল কোং এবং একটি ফরাসী কোম্পানী। অসন্তুষ্ট আরবেরা এই সমস্ত ব্যবসায় সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং তারা সুযোগ পাইলেই পাইপ লাইন, মোটর বা রেলপথের উপর বিভ্রাট ঘটাইবার চেষ্টা করে। সমর বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, কোনও স্থানে রণক্ষেত্রে সৃষ্টি করিবার পূর্বে উহার রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে বিচার করিতে হইবে। যদি স্থানীয় অধিবাসিগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকে, তবে যুদ্ধযাত্রায় বিঘ্ন দেখা দিবে। প্যালেস্টাইন, সিরিয়ায় ও ইরাকে জাতীয় আন্দোলন প্রবল, অরা স্বাধীনতা চাহে, কোন বিদেশীর প্রভুত্ব কামনা করে না। সুতরাং জার্মানীর সহিত যোগাযোগ ঘটাইয়া রসিদ আলী জিলানী যেমন বৃটেনের বিরুদ্ধে অন্যায় করিয়াছেন, তেমন বৃটিশ কর্তৃক ইরাক আক্রান্ত হওয়ায় আরবদের স্বাধীনতার স্বাভাবিক আগ্রহের প্রতি প্রতিক্রিয়া ঘটিবার সুযোগ বৃটেনও দিয়াছেন। ১৯১৪-১৮ সালে যাঁরা তুরস্কের বিরুদ্ধে আরবদের ক্ষেপাইয়াছিলেন, বিদ্রোহের সেই অস্ত্র পাল্টা তাঁদের বিরুদ্ধে আর প্রযুক্ত হইবে না—এতটা আশা করা ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর লক্ষণ নহে। কিন্তু বিগত বারের তুলনায় অবস্থা এবার আরও খারাপ। শক্তিশালী জার্মানবাহিনী মিশরের দ্বারদেশে উপস্থিত।'*

প্রভুত পেট্রোল সম্পদ (যার উপর ভুমধ্যসাগরীয় বৃটিশ নৌবহর নির্ভরশীল) এবং মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষের যোগাযোগের জন্য ইরাকের গুরুত্ব ভাবিবার মত। কিন্তু এই গুরুত্ব অতীতেও অনুভূত হইয়াছিল। পুরানো ইতিহাসের পাতা খুঁজিলে দেখা

* 'যুগান্তর' সম্পাদকীয়, মে, ১৯৪১।

যায় যে, মেসোপোটেমিয়া বা বর্তমান ইরাকের গুরুত্ব সম্পর্কে কেবলমাত্র খাস বৃটেন নহেন, আমাদের ভারত গভর্নমেণ্টও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন! তাঁদের ধারণা ছিল যে, বাগদাদ ও বসরা যদি ভারত গভর্নমেণ্টের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে, তবে আত্মরক্ষার দিক হইতে ভারতবর্ষ লাভবান হইবে। এইজন্য ১৯১৫ সালে ভারত গভর্নমেণ্ট 'অন্ততপক্ষে' বাগদাদ ও বসরা দখল করিতে চাহিয়াছিলেন! ইউরোপীয় যুদ্ধে যখন মন্দা দেখা দিয়াছিল, তখন মিত্রশক্তি আত্মসম্মান ও সামরিক পৌরুষ দেখাইবার জন্য দার্দানেলিসের পরাজয়ের পর মেসোপোটেমিয়ার অভিযানে মন দিয়াছিলেন। ভারত গভর্নমেণ্টও খুব উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তারিখ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ তদানীন্তন ভারতসচিব মিঃ অস্টিন চেম্বারলেনের নিকট নিম্নলিখিত গোপন (প্রাইভেট) টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন—

'The advance to Baghdad would create an immense impression in the Middle East, especially in Persia, Afganisthan and on our frontier anb would counter-act the unfortunate impression in the Middle East created by want of success in the Dardanelles. It would also isolate German parties in Persia, Probably produce a pacifying effect in that conntry and frustrate the German plan of raising Afganisthan and the tribes while the impression throughout Arabia would be striking.' In India the effect would be undoubtedly good'.

বড়লাটের এই টেলিগ্রামের সঙ্গে ভারবর্ষের সেনানীমণ্ডলের অধ্যক্ষের (চীফ অব দি জেনারেল স্টাফ) নিম্নলিখিত তারবার্তাও উল্লেখযোগ্য :

"...that the possession of Baghdad would deprive the Turks of a well-equipped place of concentration ; place us in a good possession to defeat them in detail as they moved down the rivers form Asia Minor or syria....'

ভারতবর্ষের বৃটিশ কর্তৃপক্ষীয় মহলের এই মতবাদ যদিও পুরানো, তথাপি আজিকার দিনেও অবস্থাটা একই প্রকারের রহিয়াছে। আজও সেই পারস্য বা ইরাণ, আফগানিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের পাহাড়িয়াদের মধ্যে জার্মানীর প্রোপাগাণ্ডা ও কার্যকলাপের গুজব শুনা যাইতেছে এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মতামতের উপর জোর দেওয়া হইতেছে। সেদিনও বসরা ও বাগদাদ ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার দিক হইতে দূরবর্তী ঘাঁটিস্বরূপ ছিল এবং আজও তাহাই আছে।'*

ইরাকে রসিদ আলীর বিদ্রোহ এবং উহার রাজনৈতিক জটিলতা সম্পর্কে সেদিনের সংবাদপত্র থেকে যে সমস্ত কথা উদ্ধৃত করা গেল, সেগুলি থেকেই ঘটনার গতি ও প্রকৃতি উপলব্ধি করা যাইবে। বলা বাহুল্য যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এই বিদ্রোহ সম্পর্কে আদৌ উদাসীন ছিলেন না। ১৯৪১ সালের ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল পারস্য উপসাগরের বসরা বন্দরে বৃটিশ সৈন্যেরা জাহাজযোগে উপস্থিত হইল এবং বাগদাদ ও হাব্বানিয়া বিমানঘাঁটির উপর আক্রমণ চালানো হইল। এদিকে প্যালেস্টাইন হইতে ৪০০ মাইল

* 'যুগান্তর' সম্পাদকীয়

মরুপথ অতিক্রম করিয়া সাঁজোয়া গাড়ীযোগেও বৃটিশ সৈন্যেরা আসিয়া হাজির হইল। সুতরাং জার্মানী হইতে প্রেরিত কিছু কিছু সাহায্য সত্ত্বেও ১৯৪১ সালের ১লা জুন জেনারেল ওয়েভেল ইরাকের বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন। রসিদ আলী এবং জেরুজালেমের মুফ্‌তি উহার একদিন আগেই ইরানে পলায়ন করিয়াছিলেন।

ইরাকের পর ফরাসী ভিসি গভর্নমেণ্টের অধীন সিরিয়াও দখল করা হইল—১২ই জুলাই, ১৯৪১। কারণ, সেখানেও জার্মানী চক্রান্ত করিতেছিল এবং জার্মান বিমান ও কারিগর সেখানে পাঠানো হইতেছিল। মিশর, সুয়েজ খাল ও ভারতবর্ষের যোগাযোগ পথের দিকে চাহিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ইরাকের মত সিরিয়াও নিজের অধিকারে আনিলেন এবং এভাবে মধ্যপ্রাচ্যে নাৎসী অগ্রগতি রোধ করিলেন।

* * *

পরে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে ইরাণ সম্পর্কেও একই কারণে বৃটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া একত্রে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে ক্রীট্‌ দখলের পর হিটলার যদি রাশিয়ার বদলে মধ্যপ্রাচ্য জয় করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিতেন, তবে অনেক বেশী লাভবান হইতেন। তাঁর রণনৈতিক ভুলগুলির এটিও ছিল অন্যতম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতিতে তিন ডিক্টেটর

ফ্রাঙ্কো, হিটলার ও মুসোলিনীর কাহিনী

আফ্রিকায় প্রচণ্ড মার খাইয়া মুসোলিনীর রোমক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন একেবারে চুরমার হইয়া গেল এবং হতাশায় ও অপমানে তিনি অবসন্ন হইলেন। কিন্তু হিটলার তাঁকে এবং অক্ষশক্তির মর্যাদাকে পুনরুদ্ধারের জন্য জেনারেল রোমেলকে পাঠাইয়াছিলেন আফ্রিকার রণক্ষেত্রে। সেকথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। রোমেলের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা পরে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে। কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতি সম্পর্কে ফ্রাঙ্কো এবং হিটলার এই দুই ডিক্টেটরের নাটকীয় কাহিনী কম চিত্তাকর্ষক নয়। এখানে সেই কাহিনী উল্লেখ করা যাইতেছে।

পশ্চিম রণাঙ্গনে পরাজয়ের পর উইনস্টোন চার্চিল ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়া স্বভাবতঃই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। দক্ষ সামরিক নেতা হিসাবে তিনি জানিতেন যে, কেবল ইংলিশ চ্যানেল নয়, ভূমধ্যসাগর নিয়াও টান পড়িবে এবং সেই ক্ষেত্রে স্পেন ও জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইবে। কারণ, পশ্চিম দিক থেকে ভূমধ্যসাগরের প্রবেশের চাবিকাঠি জিব্রাল্টারে এবং সেই জিব্রাল্টার স্পেনের ভৌগোলিক আওতায়—যদিও জিব্রাল্টার দুর্গ বৃটেনের অধিকারে ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। কিন্তু চার্চিল জানিতেন যে, স্পেনের সিভিল ওয়ারে বা গৃহযুদ্ধে হিটলার ও মুসোলিনী যেভাবে সাহায্য দিয়াছেন এবং যার ফলে ফ্রাঙ্কো স্পেনের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিতে পারিয়াছেন, সেই 'কৃতজ্ঞতা'র জন্য ফ্রাঙ্কো হয়তো হিটলার-মুসোলিনীর দলে ভিড়িয়া পড়িতে পারেন এবং জিব্রাল্টার দুর্গ ও প্রণালী ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের দখলে চলিয়া যাইতে পারে! এজন্য বৃটিশ সরকারের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। এই পরিণতি ঠেকাইবার জন্য এবং স্পেনের নিরপেক্ষতা যাতে বজায় থাকে, সেদিকে নজর রাখিবার জন্য চার্চিল তাঁর একজন প্রাক্তন সহকর্মী ও দক্ষ কূটনীতিবিদ স্যার স্যামুয়েল হোরকে মাদ্রিদে পাঠাইলেন বৃটেনের নূতন রাষ্ট্রদূতরূপে এবং পাঁচ বছর ধরিয়া এই দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করিয়াছিলেন—অন্ততঃ চার্চিলের এই অভিমত।

এদিকে হিটলার ও জার্মান নৌবিভাগকে কেন্দ্র করিয়া ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতি যেন এক নূতন চমকের অপেক্ষায় ছিল। কারণ, পশ্চিম রণাঙ্গনে জয়লাভের পর হিটলার বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না তিনি কোন্ দিকে যাইবেন—বৃটেনের দিকে, না রাশিয়ার দিকে। এই সময় জার্মান নৌবহরের গ্র্যাণ্ড এডমিরাল ও জার্মান নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি (১৯৩৫-৪৩ সাল) এরিক রেইডার হিটলারের নিকট এক বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তিনি হিটলারকে ভূমধ্যসাগর, উত্তর আফ্রিকার সন্নিহিত অঞ্চল এবং মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, ইম্পিরিয়েল বৃটেনের সবচেয়ে দুর্বল স্থান এখানে এবং এখানে আঘাত

হানিলে বৃটেন কাবু হইবেই। ৬ই এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০, হিটলারের সঙ্গে দুইদিনের বৈঠকে এডমিরাল রেইডার রণনৈতিক ছাড়াও অর্থনৈতিক যুক্তি খাড়া করিলেন এবং এই বিরাট অঞ্চলের প্রভুত কাঁচামালের (পেট্রোলসহ) সম্পদের প্রতি হিটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন—যুদ্ধের পক্ষে এই কাঁচামাল যে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল, তা বলা বাহুল্য মাত্র। তা ছাড়া রেইডার আর একটি তথ্যের উপরেও জোর দিলেন—অতলান্তিক মহাসমুদ্রের পর্তুগীজ ও স্পানিশ দ্বীপপুঞ্জ হইয়া বৃটিশ, এমন কি মার্কিন নৌবহরও ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকায় অবতরণ ঘটাইতে পারে। এজন্য রেইডার কয়েকটি 'বাস্তব প্রস্তাব' উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জিব্রাল্টার ও ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ দখলে আনিতে হইবে এবং ভিসি ফ্রান্সের বা মার্শাল পেঁতার সরকারের সহযোগিতায় ফরাসী উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার রক্ষা ব্যবস্থা আরও দৃঢ় ও শক্তিশালী করিতে হইবে। সেই সঙ্গে ইতালীর সহযোগিতায় জার্মানীর উচিত হইবে সুয়েজ বা মিশরের বিরুদ্ধে একটি প্রকাণ্ড অভিযানে অবতীর্ণ হওয়া এবং সেখান থেকে প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার মধ্য দিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে হইবে তুরস্ক পর্যন্ত।

বলা বাহুল্য যে, যুদ্ধের সমগ্র ভবিষ্যতের পক্ষেই এটি ছিল একটি স্বতন্ত্র রণ পরিকল্পনা এবং রেইডার হিটলারকে স্পষ্টই বলিলেন যে, যদি তাঁর এই পরিকল্পনা গৃহীত এবং সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত হয় তবে, সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের বোধহয় আর দরকার হইবে না। অর্থাৎ এই রণ-পরিকল্পনায় বৃটেনকেই জার্মানীর আসল শত্রু বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—জার্মান নৌবিভাগের পক্ষে অবশ্য এই চিন্তা অস্বাভাবিক ছিল না। এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে ইতালী ও স্পেনের সহিত জার্মানীর মিত্রতার পূর্ণ ব্যবহার করা হইত এবং সোভিয়েত রাশিয়া জয় করার চেয়ে জার্মান সমরশক্তির পক্ষে এই পরিকল্পিত জয় অনেক বেশী সহজসাধ্য বলিয়া প্রতিভাত ছিল। এমন কি রাইখ-মার্শাল গোয়েরিং যাঁর সঙ্গে এডমিরাল রেইডারের মোটেই সদ্ভাব ছিল না, এমন কি রেইডারকে যিনি দু'চোখে দেখিতে পারিতেন না, সেই গায়েরিং পর্যন্ত এই বিকল্প পরিকল্পনা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করিলেন।[১]

যদি সমুদ্র ও নৌশক্তির কার্যকারিতা সম্পর্কে হিটলারের সম্যক উপলব্ধি থাকিত, তবে হয়তো রেইডারের এই বিকল্প প্রস্তাবের গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করিতে পারিতেন। কিন্তু নৌশক্তি সম্পর্কে হিটলারের তেমন উৎসাহ ছিল না। তবু রেইডারের পরামর্শে তিনি কান দিলেন, এমন কি মন দিলেন এবং মোটামুটিভাবে তাঁর সঙ্গে একমতই হইলেন। তাছাড়া, মুসোলিনী এবং সম্ভব হইলে ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে আলোচনা করিতেও রাজী হইলেন। তিনি কেবল মৌখিক সম্মতিই জানাইলেন না, ১৯৪০ সালের শেষ চার মাস পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের রণপরিকল্পনা লইয়া দস্তুরমত অনেক মাথা ঘামাইলেন। রেইডার প্রথমে মনে করিলেন যে, হিটলারকে বুঝি তিনি 'দলে টানিতে' পারিয়াছেন, কিন্তু পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁর এই ধারণা ভুল। কারণ, সেপ্টেম্বর মাসের এই সমস্ত আলোচনা হইতেই বুঝা গেল যে, হিটলার সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের জন্য ইতিমধ্যেই তাঁর মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন এবং ভূমধ্যসাগরীয়

১। Hitler—Allan Bullock. Pelican, 1963. P, 600

রণনীতি সম্পর্কে জার্মান নেভাল স্টাফ বা নৌসেনানীমণ্ডলী যে দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করিতেছেন, হিটলারের চিন্তা ছিল তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ভূমধ্যসাগর ও আফ্রিকার রণাঙ্গন সম্পর্কে হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল দু' রকমের। প্রথমতঃ ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ জাহাজের যাতায়াত বন্ধকরণের দ্বারা বৃটেনকে আরও বিব্রত করা এবং জার্মানীর সঙ্গে আপোষ রফায় আসার জন্য বৃটেনের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ বৃটেনের বিরুদ্ধে বোমারু অভিযান ও আক্রমণের ভয় দেখাইয়া জার্মানী যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিতেছিল, প্রস্তাবিত ভূমধ্যসাগরীয় রণক্রিয়ার দ্বারাও হিটলার অনুরূপ লক্ষ্যই পূরণ করিতে চাহিলেন। তথাপি পূর্বদিকের সংকল্পিত অভিযান ত্যাগ করিয়া তিনি নিশ্চয়ই দক্ষিণ দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে রাজী ছিলেন না।

হিটলারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল নিতান্তই প্রতিরক্ষামূলক। প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও অতলান্তিকের দ্বীপগুলি, যেমন—কেপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জ, এজোর্স, ক্যানারিস ও ম্যাডেইরা দ্বীপসমূহকে রক্ষা করা। কারণ, ইউরোপকে "পিছনের দরজা" দিয়া আক্রমণ করার উদ্দেশ্য অতলান্তিকের এই সমস্ত দ্বীপ অবলম্বন করিয়া ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ পশ্চিম আফ্রিকায় কিম্বা উত্তর আফ্রিকায় অবতরণ করিতে পারে এবং এভাবে পশ্চিম ইউরোপের সুরক্ষিত উপকূল তারা এড়াইয়া যাইতে পারে। হিটলারের এই অনুমান অবশ্য মিথ্যা ছিল না। কারণ, দুই বছর পর ওটা হাতে-কলমে ঘটিয়াছিল। কিন্তু হিটলার এই আলোচ্য রণাঙ্গনের দায়িত্ব কখনও নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিতে রাজী ছিলেন না। তাঁর আগাগোড়াই ইচ্ছা ছিল পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ফ্রাংকোর স্পেনের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়ার জন্য, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব যথাসম্ভব ভিসি ফ্রান্সের এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরের রণক্রিয়ার আসল দায়িত্ব ইতালীর হাতে অর্পণ করিবার জন্য। অর্থাৎ মুখ্য দায়িত্ব তাঁর নিজের বহনের ইচ্ছা কখনও ছিল না। বড় জোর দুই এক ডিভিসন জার্মান সৈন্য দিয়া তিনি ইতালী বা স্পেনের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। অবশ্য জিব্রাল্টার দুর্গের প্রতিরোধ ভাঙিবার জন্য যে স্পেশালিস্ট বা বিশেষজ্ঞ সৈনের দরকার হইত, সেই সৈন এবং কয়েক স্কোয়াড্রন ডাইভ বম্বার (ছোঁ মারা বোমারু) দিতেও তিনি রাজী ছিলেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। কারণ, রাশিয়া আক্রমণের বিকল্প প্ল্যান হিসাবে তিনি রেইডারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে কিম্বা ভূমধ্যসাগরকে জার্মানীর প্রধান রণক্ষেত্ররূপে গ্রহণের জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না।

কিন্তু ডিক্টেটর হিটলারের এই সীমাবদ্ধ রণনৈতিক অভিপ্রায়ও চড়ায় আটকাইয়া গেল আর এক ডিক্টেটরের পাল্লায় পড়িয়া—তিনি হইতেছেন, স্পেনের সর্বময় প্রভু জেনারেল ফ্রাংকো। তিনি হিটলারের চেয়ে কম ঘুঘু ছিলেন না, বরং তিনি নিজেও ফ্যাসিস্ট ছিলেন বলিয়া বোধহয় সমধর্মী ফ্যাসিস্টদের ভালো করিয়া চিনিতেন। অতএব কূটনৈতিক প্যাঁচে তিনি হিটলার ও মুসোলিনীকে খুব খেলাইলেন, কিন্তু ফাঁদে পা দিলেন না।

১৯৪০ সালের জুন মাসে পশ্চিম রণাঙ্গনে যখন জার্মানী জয়লাভ করিতেছিল এবং যখন বাহ্যত মনে হইয়াছিল যে, যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিল এবং সামনে লুটের মাল ভাগবাঁটোয়ারার দিন আসিতেছে, তখন জেনারেল ফ্রাংকো যুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ

করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, বৃটেন আত্মসমর্পণ করিল না এবং ইংলণ্ড দ্বীপ আক্রান্তও হইল না, তখন থেকেই ফ্রাঙ্কোর উৎসাহে ভাঁটা পড়িতে লাগিল এবং যুদ্ধে যোগদানে প্রস্তাব এড়াইবার জন্য তিনি এমন সব সর্ত উপস্থিত করিতে লাগিলেন যেগুলি হিটলারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

যুদ্ধে যোগদানের সর্ত দ্বারা ফ্রাঙ্কো ফরাসী উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে শুরু করিয়া খাদ্য, অস্ত্রসম্ভার এবং পেট্রোল পর্যন্ত এক দীর্ঘ তালিকা পেশ করিলেন। সুবিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক এ্যালান বুলক্ তাঁর 'হিটলার' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রাঙ্কো পাঠাইলেন তাঁর ভাবী পররাষ্টমন্ত্রী সেরানো সুনেরকে বার্লিনে আলোচনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের ভাবভঙ্গীতে ও দাম্ভিকতায় তিনি খুব বিরক্ত হইলেন। কিন্তু হিটলার কৌশলীএবং ধূর্ত ছিলেন। তিনি সুনেরেরপ্রতি এমন আচরণ করিলেন যে, হিটলার সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব ভালো হইল। ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০, প্রথম দিনের সাক্ষাতের আগে হিটলার সমগ্র ব্যাপারটা বেশ রঙ্গমঞ্চের মত সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। সুনেরকে রাইখ চ্যান্সেলারির বিরাট সৌধের শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভের সারি এবং বিশাল মার্বেল গ্যালারির মধ্য দিয়া হিটলারের সামনে নিয়া উপস্থিত করানো হইল—যেন সেকালের কোন রাজদরবারে পেঁছানোর মত। হিটলার স্পেনীয় রাষ্ট্রপ্রতিনিধির কাছে এমন একটা অভিনয়ের ভঙ্গী দেখাইলেন যেন তিনি একজন 'World historical genius' বা পৃথিবীর ঐতিহাসিক ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণকারী এক বিরাট প্রতিভা। তাঁর মুখের ভাব অত্যন্ত শান্ত এবং আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়—যেন সমগ্র ইউরোপীয় মহাদেশের তিনিই প্রভু। তিনি ম্যাপের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া এমন সহজ ভঙ্গী দেখাইলেন যে, যেন যে কোন দিন ইচ্ছা করিলেই জিব্রাল্টার দখল করিতে পারেন। হিটলারেরচোখের দৃষ্টিতে চুম্বকের মত যে আকর্ষণশক্তি ছিল, এবং যে দৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসা অনেক পশ্চিমী ঐতিহাসিক করিয়াছেন, সেই দৃষ্টি দিয়া তিনি সেরানো সুনেরকে সাদর সম্বর্ধনা জানাইলেন এবং সারা কক্ষটির মেঝের উপর তিনি অত্যন্ত সতর্ক ও নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপ করিয়া গেলেন বিড়ালের পা ফেলিবার মত। পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশের মানচিত্রের উপর তিনি চোখ বুলাইয়া দেখেন এবং খুব শান্ত কণ্ঠে বলিলেন যে, সমগ্র ইউরোপ ও আফ্রিকা নিয়া একটি ব্লক গঠন করাই তাঁর উদ্দেশ্য এবং বলাই বাহুল্য যে, এই নতুন ব্লকে বাইরের কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইবে না—একটি নতুন 'মনরো ডকট্রিন' ঘোষণা করা হইবে। রিবেনট্রপের মত তিনি কোন মেজাজ দেখাইলেন না, কোন অভিযোগ করিলেন না এবং তাঁর দর্শনার্থীর উপর কোন চাপ সৃষ্টিও করিলেন না। কিন্তু জার্মান রাষ্ট্রের বা তৃতীয় রাইখের সমস্ত জাঁকজমক ও ক্ষমতার দম্ভ দিয়া স্পেনীয় প্রতিনিধিকে ভুলাইবার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু ফ্রাঙ্কোর প্রতিনিধি ভুলিবার পাত্র নন। যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে তিনি কোন কথাই দিলেন না, অথচ দাবীর তালিকা দীর্ঘই রাখিলেন। কিন্তু বার্লিন ত্যাগ করার আগে দ্বিতীয় দিনের সাক্ষাতের সময় সুনের তাঁর প্রভু ফ্রাঙ্কোর পক্ষ থেকে যে দামী উপহার দ্রব্য হিটলারকে দিলেন, তা'তে হিটলারের ছেলেমানুষী দেখিয়া সুনের অবাক হইলেন। কারণ, জার্মানী ও ইউরোপের সর্বময় প্রভু এতক্ষণ যে বিরাট মহিমান্বিত ভাব দেখাইতেছিলেন, তার সঙ্গে এই ছেলেমানুষী একেবারেই বেমানান ছিল।...

এই ঘটনার পর ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিয়ানো ২৮শে সেপ্টেম্বর যখন হিটলারের

সঙ্গে দেখা করিলেন, তখন হিটলার দুঃখিত স্বরে মন্তব্য করিলেন, 'ফ্রাঙ্কো যত নিতে চান, তত দিতে চান না !'

এক সপ্তাহ পরে হিটলার ও মুসোলিনী ব্রেনার গিরিবর্ত্মে একত্রিত হইলেন সমগ্র পরিস্থিতির পর্যালোচনার জন্য। ফ্রাঙ্কোর দাবীর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মুসোলিনীকে বুঝাইলেন কেন ফরাসী মরক্কো স্পেনকে দেওয়া যায় না। কারণ, মধ্য আফ্রিকায় এক সুবৃহৎ জার্মান সাম্রাজ্য তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে চান এবং এই সাম্রাজ্যের জন্যই তাঁর নিজের দরকার ফরাসী মরক্কোর উপকূলবর্তী ঘাঁটি। দ্বিতীয়তঃ এই মুহূর্তে ফরাসী উপনিবেশগুলিতে হাত দিতে গেলে উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকা দ্য গলের ফ্রী ফ্রেঞ্চের সঙ্গে হাত মিলাইতে পারে। বরং তিনি ভিসি ফ্রান্সের সঙ্গে আরও বেশী ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার পক্ষপাতী। কিন্তু ফ্রান্সকে অক্ষশক্তিবর্গের আরও দলে টানিবার প্রস্তাবে মুসোলিনী খুশী হইলেন না। কারণ, ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের একটা মোটা অংশ তিনি নিজে গ্রাস করিবেন এই ছিল তাঁর মনে-মনে ইচ্ছা।

অবশেষে হিটলার স্থির করিলেন যে, তিনি নিজেই স্পেনীয় সীমান্তে গিয়া ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

জীবনে ডিক্টেটর হিটলার এমন জব্দ বোধহয় আর কখনও হন নাই। তিনি গায়ে পড়িয়া জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে খোসামোদ করিতে গেলেন এবং স্বেচ্ছায় দীর্ঘ রেল ভ্রমণের ক্লেশ স্বীকার করিয়া গোটা ফ্রান্স পাড়ি দিলেন এবং ফরাসী-স্পেনীয় সীমান্তের হেণ্ডার শহরে গিয়া হাজির হইলেন স্পেশাল ট্রেনযোগে ২৩শে অক্টোবর তারিখ। ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে আলোচনায় হিটলার গোড়াতেই জার্মানীর শক্তি ও ক্ষমতার বিজ্ঞাপন দিয়া বুঝাইতে চাহিলেন যে, ইংলণ্ডের দফা শেষ হইয়াছে। তিনি অবিলম্বেই স্পেনের সঙ্গে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে উৎসুক এবং এই সন্ধি অনুসারে স্পেন ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে যুদ্ধে যোগদান করিবে। ১০ই জানুয়ারী জার্মানীর দুর্গ-বিশেষজ্ঞ সৈন্যদের (যে সৈন্যেরা বেলজিয়ামের বিখ্যাত দুর্ভেদ্য দুর্গ 'ইবেন ইমায়েল' দখল করিয়াছিল) সাহায্যে জিব্রাল্টার দুর্গ দখল করা হইবে এবং এই দুর্গ তৎক্ষণাৎ স্পেনের অধিকারভুক্ত হইবে।

কিন্তু হিটলার যে এত আশা, এত প্রলোভন দেখাইলেন তাতেও ফ্রাঙ্কো কিন্তু এতটুকু সাড়া দিলেন না। অথচ মুসোলিনীর মত পাকা ডিক্টেটরকেও তিনি যখন অনায়াসে বাগে আনিতে পারিয়াছেন, তখন এই স্পেনীয় ডিক্টেটর অনড় রহিয়া গেলেন—জার্মান ডিক্টেটরের কাছে এই অভিজ্ঞতা নতুন! ফ্রাঙ্কো তো হিটলারের কথায় সায় দিলেন না বটেই, উপরন্তু ভূমিগত (আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশসমূহ), অর্থনৈতিক এবং সামরিক দাবীগুলির উপর জোর দিতে লাগিলেন। এমন কি দাবীর পরিমাণগুলি পূরণ করার ক্ষমতা জার্মানীর আছে কিনা, ফ্রাঙ্কো এমন প্রশ্ন তুলিয়াও হিটলারকে বিব্রত করিলেন। অধিকন্তু বৃটেন সম্পর্কে হিটলারের মতে সায় না দিয়া ফ্রাঙ্কো আরও বলিলেন যে, যুদ্ধে হারিয়া গেলেও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বশ্যতা স্বীকার করিবে না। বৃটিশ নৌ-বহরের সহায়তায় বৃটিশ সরকার কানাডা থেকে আমেরিকার সহযোগিতায় যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে! এই সমস্ত কথার পর হিটলারের আর ধৈর্য রহিল না, এক

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৬০৩-৪

সময় কথার মাঝখানেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন যে, আর আলোচনা চালাইয়া লাভ নাই !'[১]

৯ ঘণ্টা ধরিয়া এই ব্যর্থ আলোচনা চলিল এবং রাত অনেক হইয়া গেল। স্পেশাল ডাইনিং কারে হিটলারের নৈশভোজের অনেক দেরী হইয়া গেল। হিটলার তখন রিবেনট্রপের (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) উপর ভার দিলেন সেরানো সুনেরের সঙ্গে এই বিষয়ে কথাবার্তা চালাইবার জন্য। 'যা হোক একটা চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা স্পেনের সাহায্যে ইংরাজকে জিব্রাল্টার থেকে তাড়াইতে এবং পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের তাদের প্রবেশ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে'—হিটলার রিবেনট্রপকে এই মর্মে উপদেশ দিলেন। বেচারা রিবেনট্রপ রাত্রে ঘুমাইতে পারিলেন না, সারা রাত জাগিয়া একটা চুক্তিপত্রের খসড়া তৈরী করিলেন, কিন্তু সবই বৃথা। স্পেনকে দলে টানা গেল না। পরদিন সকালে রিবেনট্রপ হিটলারের একজন পার্শ্বচরের নিকট ফ্রাঙ্কোকে অভিশাপ দিতে দিতে ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—'অকৃতজ্ঞ কাপুরুষ ! ব্যাটা আমাদের জন্যই সব কিছু পেয়েছে। আর আজ আমাদের দলে ভিড়তে রাজী নয় !'

আর হিটলার এই সাক্ষাৎকার বিষয়ে মুসোলিনীর কাছে তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'আমার বরং তিনটি দাঁত তুলে ফেলা ভালো। তবু আর ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে সাক্ষাৎ নয় !'[২]

স্পেন ও ফ্রাঙ্কো সম্পর্কে এখানে চার্চিলের মন্তব্য স্মরণীয়। কারণ জিব্রাল্টার নিয়া তাঁর যে দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না, সেকথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। চার্চিল ফ্রাঙ্কো সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করিয়া বলিতেছেন—

'General Franco's policy throughout the war was entirely selfish and cold-blooded. He thought only of Spain and Spanish interest. Gratitude to Hitler and Mussolini for their help never entered his head···They had enough of war. A million men had been slaughtered by their brothers' hands Poverty, high prices, and hard times froze the stony peninsula. No more war for Spain and no more war for Franco !'[৩]

অর্থাৎ সারা যুদ্ধব্যাপী জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নীতি ছিল একেবারে স্বার্থান্ধ এবং নিষ্ঠুর ! স্পেন ও স্পেনীয় স্বার্থ ছাড়া তাঁর আর কোন ভাবনা ছিল না। হিটলার ও মুসোলিনী তাঁকে যে সাহায্য দিয়াছিলেন (স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সময়) সেই সম্পর্কে কৃতজ্ঞতাবোধের বালাইও তাঁর ছিল না। স্পেনীয়রা ঢের যুদ্ধের স্বাদ পাইয়াছে। ভাইয়ের হাত দিয়া ভাইয়ের হত্যায় ১০ লক্ষ লোক খতম হইয়াছে। দারিদ্র্য, অতিমূল্যবৃদ্ধি এবং দুর্ভোগের দ্বারা এই পাথুরে উপদ্বীপ যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। অতএব স্পেন আর যুদ্ধ চায় না, ফ্রাঙ্কোও আর যুদ্ধ চান না !

চার্চিল আরও লিখিয়াছেন যে, ফ্রাঙ্কো স্পেনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়াছিলেন এবং বৃটেন এটাই চাহিতেছিল। কেননা, ভূমধ্যসাগরে বৃটেনের সমস্ত উদ্যোগের

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৬০৫
২। উইলিয়াম শাইরার প্রণীত 'দি রাইজ এন্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ', পৃষ্ঠা ৯৭৪
৩। 'The Second World War'—Churchill, Vol. 2. P. 459.

চাবিকাঠিই ছিল স্পেনের হাতে এবং চরমতম দুর্দিনেও সেই চাবি ফ্রাংকো বৃটেনের প্রতিপক্ষের হাতে তুলিয়া দেন নাই। ভূমধ্যসাগরে বৃটেনের বিপদ এত গুরুতর ছিল যে, বৃটেনকে দুই বছর ধরিয়া ক্রমাগত পাঁচ হাজার সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজ মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশে রেডি থাকার জন্য তৈয়ার রাখিতে হইয়াছি ক্যানারি দ্বীপ দখলের জন্য। কারণ, ওই দ্বীপ দখলে রাখিতে পারিলে এবং জিব্রাল্টার প্রণালী বন্ধ হইয়া গেলে বৃটেন অন্ততঃ ওখানকার আকাশ ও সমুদ্রপথের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখিয়া উত্তমাশা অন্তরীপের পথ ঘুরিয়া অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখিতে পারিত।

বৃহৎ সাম্রাজ্য রক্ষার ও পাহারা দেওয়ার ঝামেলা অনেক সন্দেহ নাই এবং এই ঝামেলার জন্যই স্পেন সম্পর্কেও বৃটেনের এত উদ্বেগ।

চার্চিল ফ্রাংকোর প্রসঙ্গে উপসংহারে মন্তব্য করিতেছেন যে, হিটলার ও মুসোলিনীর সঙ্গে ফ্রাংকোর এই সমস্ত চালবাজি এবং তাঁর অকৃতজ্ঞতা যতই তাঁর চরিত্রের মন্দ দিকের লক্ষণ হোক, যুদ্ধের সময়ে মিত্রশক্তি কিন্তু এর দ্বারা উপকৃতই হইয়াছিল।···

ফ্রাংকোর সঙ্গে হিটলারের সাক্ষাৎকার ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু পরদিন (২৪শে অক্টোবর) ভিসি সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান মার্শাল পেঁতার সঙ্গে মন্টয়ারে হিটলারের যে সাক্ষাৎ হইল, তাতে ফুরার খুব খুশীই হইলেন। কারণ, বৃদ্ধ পেঁতা ফ্রান্সের পক্ষ থেকে বৃটেনকে নতজানু করার হিটলারী প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের সঙ্গে ভিসি সরকারের পূর্ণতর সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমন কি, কাগজে পত্রে এমন কথাও লিখিয়া দিলেন—

"The Axis Powers and France have an identical interest in seeing the defeat of England acomplished as soon as possible···"

অর্থাৎ 'অক্ষশক্তিবর্গ এবং ফ্রান্স উভয় পক্ষই তাদের সমান স্বার্থের খাতিয়ে যত দ্রুত সম্ভব বৃটেনের পরাজয় দেখিতে চায়।···'

পেঁতার এই নূতন বিশ্বাসঘাতকতার দলিলে স্বাক্ষরের পুরস্কারস্বরূপ হিটলার প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, 'নয়া ইউরোপে' ফ্রান্সকে তার 'যথাযোগ্য আসন' দেওয়া হইবে এবং ফ্রান্সকে বাধ্য হইয়া সমস্ত ভূখণ্ড জার্মানীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, তার বিনিময়ে ফ্রান্স ক্ষতিপূরণস্বরূপ আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে উপযুক্ত ভূখণ্ড পাইবে এবং সেটা ফ্রান্সের বর্তমান সাম্রাজ্যের সমান হইবে।

এই চুক্তি উভয় পক্ষই 'অত্যন্ত গোপন' রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কিন্তু এই চুক্তির বিস্তৃত রূপায়ণ আদৌ সহজসাধ্য ছিল না। সুতরাং পেঁতা তাঁর এক বন্ধুর কাছে যে মন্তব্য করিলেন, সেটাও কম চমকপ্রদ ছিল না। তিনি বলিলেন:

'It will take six months to discuss this programme and another six months to forget it!'

অর্থাৎ এই চুক্তির কর্মসূচী আলোচনা করিতে ছয় মাস লাগিবে এবং আরও ছয় মাস লাগিবে এগুলি ভুলিয়া যাইতে।

কিন্তু মার্শাল পেঁতার এই বিশ্বাসঘাতকতার গোপন চুক্তি সত্ত্বেও হিটলার পুরাপুরি খুশী হইলেন না। কেননা, তিনি চাহিয়াছিলেন ফ্রান্স ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের দলে যোগ দিয়া হাতেকলমে বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হোক!

বিশ্বাসঘাতকতার পথ কত ভয়াবহ তা এই ঘটনা থেকে আর একবার বুঝা যাইবে।

ফ্রাংকো ও পেঁতার সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই হিটলার মুসোলিনীর সঙ্গে আর একবার দেখা করিলেন ২৮শে অক্টোবর ফ্লোরেন্সে। কিন্তু এই সাক্ষাতের পিছনে ছিল একটি ঘটনা যার জন্য হিটলার খুব বিস্ময় বোধ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ২৮শে অক্টোবর ইতালী হঠাৎ গ্রীস আক্রমণ করিয়া বসিল, হিটলারের সম্মতি ছাড়া তো বটেই, এমন কি হিটলারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। হিটলার এতে বিরক্ত হইলেন। কারণ, বলকান সম্পর্কে হিটলারী রণনৈতিক পরিকল্পনা এই আকস্মিক ইতালীয় আক্রমণের দ্বারা ব্যাহত হইল। আসলে বলকান অঞ্চলের উপর মুসোলিনীরও লোভ ছিল এবং হিটলার সর্বত্র এভাবে দখলবিস্তার করুক, এটা মুসোলিনীর পছন্দসই ছিল না। আর হিটলার তো মুসোলিনীর সঙ্গে ছাড়াই অনেক কার্য করিতেছেন, এমন কি রাজ্য দখল করিতেছেন। অতএব মুসোলিনীও হিটলারের সম্মতি ছাড়াই গ্রীস আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অন্যান্য স্থানে যেমন এখানেও ইতালীর আক্রমণ ব্যাহত হইল এবং হিটলারকে মুসোলিনীর উদ্ধারের জন্য বলকানেও সাহায্য দিতে হইল। ওদিকে বৃটেন ক্রীট দ্বীপ এবং অজিয়েন দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দখল করিয়া নিল। ফলে, পূর্ব ভূমধ্যসাগরে জার্মান অভিযানের প্রস্তাব এবং সুয়েজ খালের দিকে ইতালীর অগ্রগতিতে সহায়তা দানের পরিকল্পনা বন্ধ রাখিতে হইল।

কিন্তু ৪ঠা নভেম্বরের সামরিক বৈঠকে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে রণক্রিয়ার জন্য যে পরিকল্পনা স্থির হইল তার সাংকেতিক নাম দেওয়া হইল 'অপারেশন ফেলিক্স'। জার্মান সৈন্যেরা স্পেনীয় সরকারের সহযোগিতায় জিব্রাল্টার দখল করিয়া নিবে। কিন্তু হিটলার তখনও এই বিষয়ে নির্ভর করিতেছিলেন ফ্রাংকোর উপরে। নভেম্বর মাসে তিনি ফ্রাংকোকে তাগিদ দিলেন, কিন্তু ফ্রাংকো যথারীতি এড়াইয়া গেলেন। ৭ই ডিসেম্বর এডমিরাল ক্যানারিস স্পেনীয় ডিক্টেটরকে প্রস্তাব দিলেন ১০ই জানুয়ারী জার্মান সৈন্যেরা স্পেনে প্রবেশ করিবে এবং বৃটেনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করিবে। ফ্রাংকো এই প্রস্তাবের জবাবে সরাসরি 'না' বলিয়া পাঠাইলেন। এদিকে ইতালীয় সৈন্যেরা উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে হারিয়া গেল। এই অবস্থায় হিটলার বাধ্য হইয়া 'অপারেশন ফেলিক্স' বাতিল করিয়া দিলেন।

উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশের জয়লাভে হিটলার শঙ্কিত হইলেন। কারণ, তাঁর ভয় হইল এই জয়ের পথ ধরিয়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য জেনারেল ওয়েগাঁর নেতৃত্বে বিগড়াইয়া যাইতে পারে এবং বৃটিশের দিকে ভিড়িতে পারে। সুতরাং ১০ই ডিসেম্বর তারিখ হিটলার তাড়াতাড়ি 'অপারেশন এ্যাটিলা' নামে এক জরুরী অভিযানের সিদ্ধান্ত করিলেন। এই অপারেশনের লক্ষ্য ছিল দরকার মত সমগ্র ফ্রান্স দখল করা এবং সমগ্র ফরাসী নৌবহর ও বিমানবহর করায়ত্ত করা। কিন্তু ওয়েগাঁর দিকে থেকে কোন নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা গেল না। বরং জার্মানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার যিনি সবচেয়ে বড় পাণ্ডা ছিলেন ভিসি মন্ত্রিসভার মধ্যে সেই লাভালকে পদচ্যুত ও গ্রেপ্তার করা হইল। অবশ্য জার্মানরা তাদের মিতা লাভালকে ছাড়াইয়া আনিলেন। মার্শাল পেঁতার কাছ থেকে কিন্তু সহযোগিতার আর সূত্র পাওয়া গেল না। এভাবে অপারেশন এ্যাটিলাও পরিত্যক্ত হইল।

১৯৪১ সালের নববর্ষে হিটলার আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিলেন ফ্রাংকোকে

দলে ভিড়াইবার জন্য। তিনি মুসোলিনীকে দিয়াও ফ্রাংকোর মন ভিজাইবার চেষ্টা করিলেন। কারণ, ফ্রাংকোর যদিও হিটলারকে পছন্দ করিতেন না, বরং তাঁকে ভয় করিতেন, কিন্তু মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। অতএব ১২ই ফেব্রুয়ারী মুসোলিনী বোর্ডিঘেরাতে ফ্রাংকোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। এর আগে অবশ্য ২৫শে আগস্ট (১৯৪০) তারিখ মুসোলিনী ফ্রাংকোকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন যেন তিনি "ইউরোপের ইতিহাস থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না করেন।" কিন্তু ফ্রাংকোর মন গলিল না। অবশেষে হিটলার ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪১, জেনারেল ফ্রাংকোকে একটি ব্যক্তিগত পত্র লিখিলেন এবং তাঁর দর কষাকষি মনোভাবের জবাবে কড়া ভাষায় জানাইলেন ঃ

'একটি বিষয় আপনার অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে জানা উচিত, আমরা আমাদের জীবন-মৃত্যুর জন্য কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত এবং এই সময় আপনাকে কোন উপহার দিতে পারি না'—

(We are fighting a battle of life and death and cannot at this time make any gift……)

তিন সপ্তাহ পরে ফ্রাংকো হিটলারের চিঠির জবাব দিলেন এবং তাতে জানাইলেন যে, তাঁর আনুগত্য যথাস্থানে ঠিকই আছে এবং তিনি নিশ্চিতই জানেন যে, ইতালী ও জার্মানীর সহিতই তাঁর ভাগ্য জড়িত…।

কিন্তু ওই পর্যন্ত। ধূর্ত ফ্রাংকো হিটলালের সঙ্গে যোগ দিয়া একত্র যুদ্ধযাত্রার আসল প্রশ্নটি এড়াইয়া গেলেন।

এর পর হিটলার আর কি করিবেন ? তিনি মুসোলিনীকে লিখিলেন যে, তাঁর আশংকা হইতেছে ফ্রাংকো তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করিলেন।

কিন্তু ভুমধ্যসাগরীয় রণনীতিতে তিন ডিক্টেটরের মধ্যে দুই ডিক্টেটরই বরং ভুল করিয়াছেন। কারণ, মুসেলিনী হারিয়া ভূত হইতেছেন, আর তাঁকে উদ্ধারের জন্য হিটলার তার পিছন পিছন ছুটিয়াছেন। কিন্তু তৃতীয় ডিক্টেটর ফ্রাংকো কোন ভুল করেন নাই। অর্থাৎ স্পেনের ভবিষ্যতকে এই যুদ্ধে জড়াইয়া তিনি ধ্বংস করেন নাই। কিংবা হিটলার মুসোলিনীর সঙ্গে একত্রে প্রলয়তাণ্ডবে নৃত্য জুড়িয়া দেন নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

নাৎসী গ্রাসে বলকান অঞ্চল

ইতালী জার্মানী ও বৃটেনের সংঘাত

১৯১৪ সালের পূর্ব হইতেই বলকান অঞ্চল ইউরোপের বারুদাগার নামে পরিচিত ছিল। বহু জাতি ও খণ্ডজাতি এবং মাইনরিটি সমস্যায় বিব্রত এই বিচিত্র পর্বতবহুল দেশ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের একটা মর্মকেন্দ্র ছিল। ১৯১২-১৩ সালের বলকান যুদ্ধ এবং ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভের জন্য এখানকার ইতিহাস রণ-কীর্তির 'গৌরব' দাবী করিতে পারে। যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরী এবং তুরস্ক—মোট এই সাতটি দেশের একত্র ভৌগোলিক সংস্থানকেই বলকান অঞ্চল বলা হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে খাদ্য আছে, পেট্রোল আছে এবং জনগণের শতকরা ৮০ জনই কৃষক, অর্থাৎ দরিদ্র। কিন্তু ইহার রণনৈতিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই অঞ্চল দিয়াই এশিয়া মহাদেশের সঙ্গে ইহার ভূমিপথের সংযোগ এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশের উপর আধিপত্য বিস্তারের ইহা পথ। জার্মানীতে কাইজারের আমল হইতেই ইতিহাসের পাঠক এখান দিয়া বার্লিন-বাগদাদ লাইনের কথা শুনিয়া আসিয়াছেন। কল্পনা ছিল এই যে, বার্লিন হইতে একটা রেলপথ বলকান অঞ্চল অতিক্রম করিয়া এবং তুরস্ক হইয়া বাগদাদ ও মশুলের তৈলখনি, এমন কি ভারত সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছিবে। কিন্তু ঐ রেলপথ কল্পনাতেই রহিয়া গিয়াছে।

বৃটেন' ফ্রান্স, জার্মানী ও রাশিয়া (এবং কিছুপরিমাণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) সকলেই বলান অঞ্চলে প্রভাব খাটাইতে চাহিয়াছে। কিন্তু ১৯১৮ সালের প্রথম মহা-যুদ্ধে পরাজিত জার্মানী দীর্ঘকাল আর সুবিধা করিতে পারে নাই। সেই সুযোগ আসিল ১৯৩১-৩২ সালের পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দার এবং জার্মানীতে হিটলারের ক্ষমতা লাভের পর। হিটলারের দৃষ্টি ছিল পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দিকে। নাৎসী জার্মানীর 'অর্থনীতির যাদুকর' ডাঃ শাক্ট এবিষয়ে হিটলারের সহায় হইলেন এবং তিনি এই তত্ত্ব প্রচার করিলেন যে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের আগে 'অর্থনৈতিক' অনুপ্রবেশ প্রয়োজন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বুদ্ধিমান ডাঃ শাক্ট দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বলকান রাজ্যে হানা দিলেন—এই রাজ্যের দ্বার তখন বহিঃপৃথিবীর আর্থিক মন্দা, শুল্কপ্রাচীর ও বিনিময় ঘটিত নিষেধাবিধি ইত্যাদির জন্য রুদ্ধ ছিল। ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৩৫ সালের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের প্রধান খরিদ্দার হইল জার্মানী। যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, বুলগেরিয়া ইত্যাদি বলকান অঞ্চলের রাজ্যগুলি হইতে ডাঃ শাক্ট প্রভৃত পণ্য আমদানী করিতে লাগিলেন এবং বিনিময়ে 'শস্যের বদলে শেল' অর্থাৎ গোলাগুলী ও অস্ত্র যোগাইতে লাগিলেন। গ্রীসের রাজা খুসী হইয়া ডাঃ শাক্টকে একটা সম্মানজনক পদবীতে পর্যন্ত ভূষিত করিলেন। আর এথেন্সের হোটেলে ইউরো-মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীরা কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন—

"...In the Hotle Grande Bretagne at Athens arms merchants from Britain, France, Italy, Sweden and the United States mourned their six months of wasted hotel bills and tipsters' fees."

ডাঃ শাক্টের এই অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ সত্যসত্যই বলকান রাজ্যে নাৎসী প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা দিল এবং 'শস্যের বদলে শেল' সরবরাহের নীতি এই অধমর্ণ দেশগুলিতে প্রভূত সাফল্য অর্জন করিল। কিন্তু কেন?—এর উত্তর পাওয়া যাইবে একে একে সমস্ত বলকান রাজ্যে। অতি সংক্ষেপে এর সারমর্ম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গ্রীস

৬৩ লক্ষ অধিবাসীর দেশ গ্রীস ১৯৩৬ সালের ৫ই আগস্ট তারিখ সকালবেলা সহসা সৈন্যদলের কুচকাওয়াজে চমকিত হইয়া গেল। আগের দিন রাত্রে পুলিশ সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান দখল করিল, সংবাদপত্রের অফিস বন্ধ করিয়া দিল এবং রাজধানী এথেন্সে রাজা দ্বিতীয় জর্জের ঘোষণা অনুযায়ী জেনারেল মেটাক্সাস গভর্নমেণ্ট দখল করিলেন—'কমিউনিস্ট উপদ্রব হইতে দেশকে রক্ষার জন্য'—মস্কোর বেতনভুক রক্তপিপাসু এই কমিউনিস্টরা সমাজশৃংখলা, পিতৃভূমি, পরিবার এবং ধর্মের ঘোরতর শত্রু।'

কিন্তু কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। তাদের সংখ্যা ও শক্তি উভয়ই ছিল তখন সামান্য। তথাপি এই আক্রোশ তাদের বিরুদ্ধে ফাটিয়া পড়িল এই কারণে যে, ৫ই আগস্ট তারিখ একদিনের জন্য জেনারেল স্ট্রাইক বা সর্বাত্মক ধর্মঘট ডাকা হইয়াছিল এবং সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি একত্র হইয়াই শ্রমিকদের পীড়ননীতি ও তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হরণের বিরুদ্ধে এই ধর্মঘট আহবান করিয়াছিল। গ্রীসের জনসাধারণ ছিল অত্যন্ত দরিদ্র—বহু স্থনে অর্ধনগ্ন ভিক্ষুকের দল ভীড় করিত। হাজার হাজার স্ত্রীলোকের ভদ্রভাবে জীবননির্বাহের কিংবা জীবিকা অর্জনের কোন পথ ছিল না। গ্রাম্য অঞ্চলে কৃষকেরা ছিল মহাজনের নিকট ঋণে আবদ্ধ। এই অবস্থায় দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও ধর্মঘট ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু জেনারেল মেটাক্সাস সাম্যবাদ আতঙ্কের ছুতা ধরিয়া এই সুযোগে রাজা, ব্যাংকার ও সেনাপতিবৃন্দের সাহায্যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন, পার্লামেণ্ট ও গণতন্ত্রী দলগুলিকে দমন করিলেন, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিলেন এবং বিরোধী দলকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এই সময় গ্রীসে বৃটিশ প্রভুত্বের বদলে নাৎসী প্রভুত্ব প্রসারলাভ করিল। জেনারেল মেটাক্সাস জার্মানভক্ত ছিলেন, তিনি বার্লিনের সামরিক শিক্ষাথীরূপে 'ক্ষুদে মল্টকে' নামে পরিচিত ছিলেন।

সুতরাং নাৎসী অর্থনীতিবিদ ডাঃ শাক্টের পক্ষে গ্রীসের শাসকমণ্ডলীকে হাত করা এবং 'শস্যের বদলে অস্ত্র' সরবরাহে বেগ পাইতে হইল না। মেটাক্সাসের ফ্যাসিস্ট অত্যাচারে জনগণ উৎপীড়িত হইতে লাগিল আর জেলখানাগুলি নরককুণ্ডে পরিণত হইল। মেটাক্সাস 'আমৃত্যু প্রধানমন্ত্রী' বলিয়া ঘোষিত হইলেন। এই অবস্থা চলিল

১। Hitler's Drive to the East—by F.Elwyn Jones, page 44.

২। পূর্বোক্ত পুস্তক—'গ্রীস, প্রসঙ্গ।

১৯৩৯ সাল পর্যন্ত। কিন্তু এদিকে ইউরোপীয় যুদ্ধের সংকটে গ্রীস ফ্যাসাদে পড়িল। ভূমধ্যসাগরে গ্রীসের অবস্থানের গুরুত্বের জন্য বৃটেন তাকে হাতছাড়া করিতে পারে না এবং গ্রীসের রাজপরিবারের সঙ্গে বৃটেনের ছিল একান্ত যোগ। আর রাজাকে কেন্দ্র কেন্দ্র করিয়া ছিল একদল বৃটিশ পক্ষপাতী রাজনীতিক। তাঁদের সহিত শলাপরামর্শে ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে বৃটেন গ্রীসকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং গ্রীস নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিল। কিন্তু তার মনপ্রাণ রহিয়া গেল ফ্যাসিজমের দিকে। ডাঃ শাক্টের ছায়ামূর্তি গ্রীকদিগকে অনুসরণ করিতে লাগিল। আর ডাঃ গোয়েবলসের প্রচারগুণে গ্রীসে নাৎসীবাদের জয়ধ্বনি চলিতে লাগিল।...

রুমানিয়া

বলকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রুমানিয়া সর্ববৃহৎ, এর লোকসংখ্যা প্রায় দুই কোটি। রাজা দ্বিতীয় ক্যারলকে কেন্দ্র করিয়া রুমানিয়া দস্তুরমত 'রোমান্টিক' দেশে পরিণত হইয়াছিল। একদিকে অভিজাত মহলের প্রেম, ব্যাভিচার বিলাস এবং অন্যদিকে ঘরহারা জিপসী ও দরিদ্রের দল। রাজধানী বুখারেস্ট শহর রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং বীভৎস দুর্নীতির একটা বৃহৎ আড্ডা। রাজা ক্যারল তাঁর বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া মাদাম লুপেস্কু নাম্নী এক রক্ষিতাকে লইয়া বাস করিতেন এবং এক সময় এই নারীর জন্য তিনি পিতার মৃত্যুর সময় সিংহাসনের দাবী পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজ দরবারের অন্তরালে মাদাম লুপেস্কুই আসল ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন এবং এই 'রাজকীয় কেলেঙ্কারি' একদা ইউরোপীয় সমাজের রসালোচনার বস্তু ছিল। কিন্তু একা ক্যারলই নহেন আরও অনেকে এই পথের পথিক ছিলেন।

রুমানিয়ার জনগণের দারিদ্র্য ছিল ভয়াবহ। উপবাসী ক্ষুধার্ত নরনারীর অদৃষ্টে রুটির টুকরাও জুটিত না। অনেকে আবর্জনা কুণ্ড হইতে খাদ্য কুড়াইয়া খাইত। স্বভাবতঃই এই দরিদ্র কৃষকেরা অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। আমাদের দেশের গরীব ও অজ্ঞ গ্রামবাসীরা যেমন অদৃষ্টের দোহাই দিয়া এবং পরলোকের উপর নির্ভর করিয়া চলে, এখানেও সেই একই দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে বোরারিয়ার কিসিনেভ গ্রামে একজন পুরোহিত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। এই পুরোহিতের কাছে 'স্বর্গের মানচিত্র' ছিল এবং 'মানচিত্রে' বিস্তৃত ঘর কাটা ছিল। অজ্ঞ ও সরলবিশ্বাসী কৃষকেরা, বিশেষভাবে স্ত্রীলোকেরা আসিয়া পুরোহিতের নিকট 'স্বর্গের জমির' জন্য অগ্রিম টাকা জমা দিয়া যাইত। যে 'জমি' ভগবানের যত নিকটে উহার দাম তত বেশি চড়া ছিল এবং ভগবানের কাছ হইতে যত দূরে তত কম দাম। স্বর্গের এই কম দামী স্থানগুলির মূল্য ছিল ৩০ টাকার মত। অনেক কৃষক তাদের জোত-জমি বা 'হালের শেষ গরুটি' পর্যন্ত বিক্রি করিয়া 'ভগবানের একান্ত কাছের স্থানগুলি' কিনিয়া রাখিত।

এই যেখানে অবস্থা সেখানকার রাজনৈতিক আবহাওয়া চিন্তা করিবার মত। রুমানিয়ার ভৌগোলিক সংস্থান, পেট্রোল এবং গম জার্মানীর পক্ষে লোভনীয়। ডাঃ

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক গ্রীস প্রসঙ্গ।

শাক্টের অর্থনৈতিক দৃষ্টি রুমানিয়ার উপর পড়িল, ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে জার্মানীর সহিত রুমানিয়ার বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হইল এবং রুমানিয়ার একতৃতীয়াংশ বাণিজ্য জার্মানীর হাতে গেল। পেট্রোলের জন্য রুমানিয়া প্রসিদ্ধ। ১৯৩৯ সালে ৬০ লক্ষ টন পেট্রোল সেখানে উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং একদিকে পেট্রোল এবং অন্যদিকে সোভিয়েট রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশল জার্মানী অনুসরণ করিল। ১৯৩৬ সাল হইতে ইহার সুরু।

মঃ টিটুলেস্কু যতদিন পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন ততদিন রুমানিয়া বিশ্বরাষ্ট্র সংঘের সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতি এবং ফ্রান্স, রাশিয়া বা চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে মৈত্রী রক্ষা করিয়া চলিতেছিল। কিন্তু বার্লিন ও বুখারেস্টের ফ্যাসিস্টপন্থীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ফলে ১৯৩৬ সালের আগষ্ট মাসে মঃ টিটুলেস্কু পদচ্যুত হন। বলা বাহুল্য যে, রাজা ক্যারলের নির্দেশ অনুসারেই ইহা ঘটিল। তিনি ছিলেন জার্মানী ও রাশিয়ার ভূতপূর্ব সম্রাট পরিবারদের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং ক্যারল একদিকে হিটলারপন্থী এবং অন্যদিকে নিদারুণ সোভিয়েট বিদ্বেষী ছিলেন। আর ফ্যাসিস্ট ও আধাফ্যাসিস্টপন্থী রাজনৈতিক ও সন্ত্রাসবাদী দলেরও অভাব ছিল না। ইহাদের মধ্যে 'লৌহরক্ষীর' দল ছিল সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। তারা মাদাম লুপেস্কু এবং রাজপরিবারের আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া ইচ্ছামত খুন-জখম করিয়া বেড়াইত। প্রকাশ্যে আইন অমান্য করিত এবং শেষ পর্যন্ত রাজা ক্যারলেরও সিংহাসন নড়িয়া উঠিল। তখন ক্যারল স্বয়ং ডিক্টেটরি ক্ষমতা হাতে লইয়া দমনকার্য সুরু করিলেন। কিন্তু তাতেও কুলাইল না। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইল—পুত্র মাইকেলের হাতে শাসনভার অর্পণ করিয়া। এদিকে ফ্যাসিস্ট দলপতি এবং 'আইরন গার্ড'-এর নেতা আন্তনেস্কু ডিক্টেটার হইয়া বসিলেন। উহার আগে ১৯৩৬ সাল হইতে রুমানিয়ায় ফ্যাসিস্টবিরোধীদের উপর অত্যাচারের বান ডাকিল। বেসারাবিয়ায় একটি ১৩ বৎসরের মেয়েকে ১০ বৎসরের কারাদণ্ড দেওয়া হইল এবং জেলখানাগুলি এমন সাংঘাতিক হইয়া উঠিল যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আর দরকার রহিল না।[১]

বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া

বুলগেরিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়ার ইতিহাস প্রায় একই রকম—সেই সাম্যবাদ বিরোধিতা, গণতন্ত্রবাদীদের পীড়ন, জনসাধারণের দারিদ্র্য এবং ফ্যাসিজম ও মিলিটারীর দৌরাত্ম্য। ম্যাসিডোনিয়ায় সন্ত্রাসবাদীরা এই অবস্থাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছিল,—যেমন যুগোশ্লাভিয়ায় ক্রোট সন্ত্রাসবাদীরা। এই ক্ষুদ্র দেশে দলাদলি ও মারামারির ইয়ত্তা ছিল না। জনৈক ফরাসী বিদ্রূপরসিক বুলগেরিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"One Bulgarian is a peasant
Two Bulgarians are a political party.
Three Bulgarians are three political parties."

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক। পৃঃ ৭৩

অর্থাৎ একজন বুলগেরিয়ান চাষী মাত্র, দু'জন বুলগেরিয়ান মিলে একটি রাজনৈতিক দল, আর তিনজন বুলগেরিয়ান তিনটি রাজনৈতিক দল।

তথাপি বুলগেরিয়ার রাজা বোরিস ১৯৩৮ সালের মিউনিক সংকটের সময় ফ্রান্স ও বৃটেনের দলে ভিড়িতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু হিটলারের অসন্তোষ উৎপাদনের ভয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন তাঁকে পাত্তাই দিলেন না। প্রকাশ যে, অনেক কষ্টে তিনি চেম্বারলেনের সহিত ৭ মিনিটের আলাপ করিতে পারিয়াছিলেন।[১]

যুগোশ্লাভিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে নিহত হইবার পর তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা প্রিন্স পল 'রাজপ্রতিভূ'রূপে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সোভিয়েট বিদ্বেষ ও নাৎসীবাদের এবং হিটলারের প্রতি আনুগত্যের জন্য ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মানীর সহিত যুগোশ্লাভিয়া প্রকাশ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করিল। বলা বাহুল্য যে, বলকান রাজ্যগুলিতে জার্মানীর এই আধিপত্য বিস্তারের জন্য বৃটেন শঙ্কিত ছিল এবং বৃটিশ কূটনীতিবিদগণও যথাসম্ভব পর্দার আড়ালে কলকাঠি নাড়িতেছিলেন। আর বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষপাতী একদল প্রভাবশালী গণতন্ত্রবাদী লোকও ছিলেন। এদিকে নির্যাতিত জনসাধারণও ফ্যাসিস্টদের ও শাসক শ্রেণীর প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট ছিল। সুতরাং একদিন মধ্যরাত্রে (মার্চ ১৯৪১) অকস্মাৎ এক নাটকীয় বিদ্রোহ ঘটিল অক্ষশক্তিবর্গের সহিত যুগোশ্লাভিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরের পর। সৈন্যবাহিনী ও বিমানবাহিনীর পদস্থ ব্যক্তিরা এক চক্রান্ত করিলেন, রাজপ্রাসাদের রক্ষীরাও ইহাতে যোগ দিলেন—বালক রাজা পিটারকে রক্ষার জন্য। মন্ত্রীদিগকে গ্রেপ্তার এবং সরকারী ভবনগুলি দখল করিবার জন্য একটা পরিকল্পনা স্থির হইল। সেই অনুসারে মধ্যরাত্রির পর কাপ্তেন র‍্যাকোৎচেভিস প্রধানমন্ত্রীর গৃহে হানা দিলেন এবং তাঁকে ঘুম হইতে জাগাইয়া অনুরোধ করিলেন অনুসরণের জন্য। বিস্মিত প্রধানমন্ত্রী স্বেৎকোভিস্ ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হুকুম দেওয়ার তুমি কে? তোমার কথা আমি গ্রাহ্য করি না।' কাপ্তেন তৎক্ষণাৎ রিভলবার বাহির করিয়া হুকুম করিলেন—March or I fire'—'হয় আমার অনুসরণ কর নতুবা আমি গুলী চালাইব। প্রধানমন্ত্রী সুবোধ বালকের মত অনুসরণ করিলেন। এভাবে পুলিশ হেড কোয়ার্টার ও সমস্ত সরকারী ভবন দ্রুত দখল হইয়া গেল। বিদ্রোহী বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল সিমোভিচ রাজ-প্রাসাদে গেলেন এবং নিদ্রামগ্ন বালক রাজা পিটারকে জাগাইয়া অনুগত প্রজার মত অভিবাদন করিয়া বলিলেন,

"Your Majesty from now you are king of Yugoslavia exercising full sovereign right".

এই অভিনব ঘটনাটি অত্যন্ত নাটকীয় এবং বাহ্যতঃ ক্ষুদ্র। কিন্তু এই ঘটনাটি হইতেই ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সেরাজেভোর ঘটনার মত 'বলকানের বারুদাগারে' বিস্ফোরণ ঘটিয়া গেল। সে কথা নিম্নে বলা যাইতেছে।[২]

* * *

হিটলারের দিগ্বিজয়ের দৃষ্টান্তে মুসোলিনী লুব্ধ হইয়া উঠিলেন। নিজের ব্যক্তিগত

১। Quarterly Record of the War—Vol, 6. P. 105-8.

২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃঃ ১৩১

রণপিপাসার সঙ্গে রোমক সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশাও তাঁকে পাইয়া বসিল। সুতরাং প্রথমত তিনি হাতের কাছে গ্রীস এবং পরে উত্তর আফ্রিকা আক্রমণ করিলেন। মুমূর্ষু ফরাসী সাম্রাজ্যের দখল এই বৃটেনকে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা হইতে উচ্ছেদ সাধনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ১৯৪০ সালের ২৮শে অক্টোবর মুসোলিনী আলবেনিয়ার ভিতর দিয়া গ্রীসকে আক্রমণ করিলেন।

বলকান ও ভূমধ্যসাগরের উপর এভাবে ইতালী জার্মানীর আধিপত্য বিস্তারের আশঙ্কায় বৃটেন স্বভাবতই শঙ্কিত হইল। ১৯৪০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর চেম্বারলেনীর আপোষ ও তোষণনীতির সঙ্গী পররাষ্ট্রসচিব লর্ড হ্যালিফাক্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেরিত হইলেন বৃটিশ রাজদূতরূপে এবং মিঃ ইডেন তাঁর স্থলে পুনরায় পররাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হইলেন। বলকান অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান নাৎসী আধিপত্যের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার জন্য মিঃ ইডেন, বৃটিশ সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ স্যার জন ডিল এবং অন্যান্য পদস্থ সামরিক কর্মচারিগণ ১৯৪১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় গেলেন তুর্কি নেতাদের সঙ্গে পরামর্শের জন্য। দুর্বল তুরস্কের পক্ষে জার্মানী বা বৃটেন কাহাকেও চটানো সম্ভব ছিল না। সুতরাং তুর্কি গভর্নমেণ্ট উভয়ের নিকটই শান্তি ও নিরপেক্ষতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আঙ্কারা ভ্রমণের পর মিঃ ইডেন ও স্যার জন ডিল গেলেন গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে। তখন গ্রীস ইতালীর দ্বারা আক্রান্ত (যাহা হিটলারের পছন্দসই ছিল না) এবং এথেন্সে রাজতন্ত্রবাদী ও বৃটিশ পক্ষপাতী দলও শক্তিশালী ছিল। বিশেষত গ্রীস আক্রান্ত হওয়ায় স্বভাবতই মিঃ ইডেন গ্রীক গভর্নমেণ্টের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করিলেন এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরের নিরাপত্তা, উত্তর আফ্রিকা ও সুয়েজের দিকে চাহিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্ট পূর্ণ সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। গ্রীসে বৃটিশ সৈন্য পাঠানো হইবে এবং ক্রীট প্রভৃতি দ্বীপে বৃটিশ ঘাঁটি তৈয়ারী হইবে ইত্যাদি পরামর্শ ও প্ল্যান স্থির হইল। ইহার পর মিঃ ইডেন সদলবলে চলিয়া গেলেন কাইরোতে উত্তর আফ্রিকার অবস্থা সম্পর্কে পরামর্শের জন্য।

১৯৪০ ও ১৯৪১ সালের বসন্তকালের মধ্যে ইতালী-জার্মানী এবং বৃটেন, উভয়ের মধ্যে বলকান রাষ্ট্রপুঞ্জ ও উত্তর আফ্রিকা লইয়া কূটনৈতিক ও সামরিক দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। হিটলার অনেক আগেই বলকান অঞ্চলে প্রবেশ করিলেন ডাঃ শাক্টের অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের কৌশল দ্বারা এবং তারপর ঘটাইলেন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপা। এই সমস্ত দেশ সামরিক দিক দিয়া শক্তিহীন এবং রাজনৈতিক বিচারে ফ্যাসিস্ট পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং বলকান রাজ্য গ্রাস করিতে হিটলারের বেগ পাইতে হইল না। বিগত মহাযুদ্ধের ভের্সাই সন্ধির জন্য এই সমস্ত রাজ্যের পরস্পরের মধ্যে সীমানা ও ভূমিগত দখল লইয়া বিরোধ ছিল, আর ছিল, বহু জাতি, খণ্ড জাতি ও মাইনরিটির সমস্যা। সুতরাং 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতি অনুসারে প্রথমেই হিটলার বলকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভেদ ঘটাইলেন রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার ভূমির বিনিময়ে হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়ার প্রতি পক্ষপাতিত্বের দ্বারা। ১৯৪০ সালের ৩০শে আগস্ট তিনি "ভিয়েনা বাঁটোয়ারা" দ্বারা রুমানিয়ার উত্তর ট্রান্স-সিলভানিয়া হাঙ্গেরীকে এবং যুগোশ্লাভিয়ার দক্ষিণ ডবরুজা বুলগেরিয়াকে অর্পণ করিলেন। ইহার ফলে রুমানিয়ার রাজা ক্যারল সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য হইলেন এবং ১৯৪০ সালের ২৩শে

নভেম্বর রুমানিয়া অক্ষশক্তিবর্গের সঙ্গে যোগ দিল। হাঙ্গেরীও নভেম্বর মাসে রোম-বার্লিন-টোকিও চক্রে যোগ দিল এবং ১৯৪১ সালের ১লা মার্চ জার্মানীর সহিত চুক্তি অনুসারে বুলগেরিয়াও নাৎসী সৈন্যদলের গ্রাসে পড়িল। বাকি রহিল যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস। এখানে উল্লেখযোগ্য যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ দিয়া এবং পারস্পরিক ভূমিগত লোভের উস্কানি দিয়া জার্মানী ধূর্তের মত বলকান রাজ্যগুলিকে একটি একটি করিয়া গ্রাস করিল। যে দুইটি বাকি রহিল, সেগুলিকে তারা সামরিক থাবা মারিয়া কাড়িয়া লইল।

কিন্তু এখানে যবনিকা অন্তরলবর্তী একটু গোপন ইতিহাস আছে, যাহা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ ও চমকপ্রদ।

১৯৪০ সালের ২৮শে অক্টোবর মুসোলিনীর সৈন্যেরা আলবেনিয়ার পর্বতসংকুল সীমান্ত দিয়া গ্রীস আক্রমণ করিতে গিয়া অত্যন্ত ফ্যাসাদে পড়িল এবং করিটজা ও আর্জিরোকাস্ট্রো রণাঙ্গনে পরাজিত হইয়া পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইল। ক্ষুদ্র গ্রীসের কাছে সমরগর্বী ইতালীর এই পরাজয় এবং অন্যদিকে ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে যুগোশ্লাভিয়ায় অকস্মাৎ বৃটিশ পক্ষপাতী বিদ্রোহ ও বালক রাজা পিটারকে পুরোভাগে রাখিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার দুঃসাহস—এই সমস্ত অপ্রত্যাশিত ঘটনায় হিটলার বিচলিত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। এই প্রসঙ্গে আবার উত্তর আফ্রিকায় ইতালীয় যুদ্ধের শোচনীয় অবস্থাও স্মরণীয়।

সুতরাং পর্দার আড়ালের ইতিহাস উদ্ঘাটন করিলে দেখা যায় যে, হিটলার এই অবস্থায় বিরক্ত ও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

১৯৩৯ সালের ১২ই আগস্ট, তখনও যুদ্ধ বাধে নাই। কিন্তু জার্মান সামরিক চক্রান্তের নক্সা পূর্ণবেগে অগ্রসর হইতেছিল। ইতালীর পররাষ্ট্রসচিব চিয়ানো এবং জার্মান পররাষ্ট্রসচিব রিবেনট্রপ উভয়েই বার্সেটসগাডেনে হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সাক্ষাতের গুপ্ত বিবরণীতে দেখা যায় যে, চিয়ানো হিটলারের নিকট স্বীকার করেন যে, আলবেনিয়া নিতান্তই অনুন্নত দেশ। সুতরাং বলকান রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় এই দেশকে কোন সক্রিয় সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করা যাইতে পারে না। অন্তত কয়েক বৎসর সময় লাগিবে। কারণ রাস্তাঘাট তৈয়ার করিতে হইবে, খনিজ সম্পদ, যথা—লোহা, তামা, ক্রোম, পেট্রোল ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। তারপর স্যালোনিকা কিংবা বলকানের অন্য কোন দিকে অভিযান চালানো যাইতে পারে।

অথচ এই অভিমত সত্ত্বেও মুসোলিনী আলবেনিয়া হইতে গ্রীস আক্রমণ করিয়া বসিলেন এবং পরাজিত হইলেন। কিন্তু এই আক্রমণের পিছনে হিটলার ও তাঁর হাইকমাণ্ডের সমর্থন ছিল না। অর্থাৎ জার্মানীর মতে আক্রমণটা 'সময়োচিত' হয় নাই। ইহার প্রমাণ এই যে, ১৯৪৩ সালের ৭ই নভেম্বর জেনারেল জড্‌ল এক 'গোপনীয় বক্তৃতায়' বলিলেন,

"The attack which they (Italians) launched in the autumn of 1940 from Albania with totally inadequate means was contrary to all agreements..."

১। The Nurember Documents—by Peter De Mendelssohn, Page 171

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ১৯৪০ সালের শরৎকালে আলবেনিয়া হইতে ইতালী কর্তৃক গ্রীস আক্রমণ জার্মানীর অভিপ্রেত ছিল না, যদিও জেনারেল জড্‌ল ঐ বক্তৃতারই শেষাংশে বলিয়াছেন যে, পরে অবশ্য এই আক্রমণের প্রয়োজন হইত বৃটেনকে গ্রীসের ঘাঁটি ব্যবহারে বাধা দেওয়ার জন্য। এজন্য হিটলারের প্ল্যান ছিল আগে যুগোশ্লাভিয়াকে জব্দ করা এবং গ্রীসের বিরুদ্ধে বুলগেরিয়ার ঘাঁটি ব্যবহার করা। কিন্তু মুসোলিনীর 'অপ্রত্যাশিত' গ্রীস আক্রমণে এই প্ল্যান বানচাল হইবার জো হইল। (এই সম্পর্কে হিটলারের অসন্তোষের কথা আগের অধ্যায়েই উল্লেখ করা হইয়াছে)। সুতরাং ১৯৪০ সালের মধ্যভাগে হিটলার বিরক্ত হইয়া মুসোলিনীকে এক দীর্ঘপত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাতে বলেন, "ফ্লোরেন্সে যখন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন গ্রীস আক্রমণের আগে আমার মনের ভাব আপনাকে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। যদি সম্ভব হয়, তবে এই আক্রমণ স্থগিত রাখিবার জন্য, অন্ততঃ অনুকূল সময়ের আশায় অপেক্ষা করিবার জন্য আপনাকে পরামর্শ দিতে চাহিয়াছিলাম। বিদ্যুৎগতিতে ক্রীট দ্বীপ দখল করার আগে গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযান করা আপনার পক্ষে উচিত ছিল না।...যুগোশ্লাভিয়াকে দলে টানা উচিত ছিল এবং যুগোশ্লাভিয়ার দিক হইতে নিরাপদ না হইয়া বলকানে সাফল্যমণ্ডিত যুদ্ধ কখনো সম্ভব ছিল না। সুতরাং আমি দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, মার্চ মাসের (১৯৪১) আগে আমার পক্ষে বলকান সংগ্রামে কোন সাহায্য দান সম্ভব হইবে না।"[১]

সুতরাং বুঝা যাইতেছে মুসোলিনীকে এই যুদ্ধে অন্তত কয়েক মাসের জন্য নিজ বাহুবলের উপরেই নির্ভর করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু হিটলার বুঝিয়াছিলেন যে, মুসোলিনীর দ্বারা এই কার্য সম্ভব নহে। সুতরাং ১৯৪০ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তিনি যুদ্ধসংক্রান্ত নির্দেশে (ওয়ার ডিরেকটিভ নং ২০) গ্রীস আক্রমণের পরিকল্পনা করিলেন, সাংকেতিক ভাষায় যার নাম ছিল 'অপারেশন মেরিটা' এবং যুগোশ্লভিয়া আক্রমণের নাম ছিল 'অপারেশন-২৫'। কারণ, আলবেনিয়ায় ইতালীয় যুদ্ধ 'বিপজ্জনক অবস্থায়' পেঁাছিল। উত্তর আফ্রিকায়ও অনুরূপ ফল দেখা দিল এবং ট্রিপোলিটানিয়ায় প্রস্তাবিত জার্মান আক্রমণের সাংকেতিক নাম দেওয়া হইল—'অপারেশন সান ফ্লাওয়ার'!

১৯৪১ সালের ১৯শে এবং ২০শে জানুয়ারী হিটলারের সদর দপ্তরে মুসোলিনী ও উভয়পক্ষের বড় বড় নায়কগণ একত্র হইলেন। তাঁরা স্ব স্ব দিক হইতে যুদ্ধের অবস্থা আলোচনা করিলেন এবং হিটলার বলকান ও উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত করিলেন। ঐ বৎসর ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখ হিটলার তাঁর সেনাপতিবৃন্দের সহিত এক গুপ্ত বৈঠকে মিলিত হইলেন এবং রাশিয়া আক্রমণের আগে বলকান ও আফ্রিকার সমস্যা মিটাইতে চাহিলেন। উত্তর আফ্রিকা ও গ্রীসে ইতালীয় সামরিক শক্তির দৈন্য এবং ইতিমধ্যে যুগোশ্লাভিয়ায় অতর্কিত বিদ্রোহের ফলে হিটলার উদ্বিগ্ন হইলেন। ১৯৪১ সালের ২৭শে মার্চ এই বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন হিটলার এক গুপ্ত বৈঠকে ঘোষণা করিলেন, 'যুগোশ্লাভিয়ার অবস্থা সর্বদাই অনিশ্চিত। সুতরাং নূতন গভর্নমেন্টের কাজ হইতে জার্মানীর প্রতি আনুগত্যের ঘোষণার জন্য

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ১৮৫-৮৭

অপেক্ষা না করিয়াই এবং কোন চরমপত্র না দিয়াই উহাকে আক্রমণ ও ধ্বংস করা হইবে।' এই সমস্ত দেশের ভূমিগত বিরোধেরও সুযোগ লওয়ার সিদ্ধান্ত হইল।

১৯৪১ সালের ২৮শে মার্চ হিটলার রোমের জার্মান দূতে মারফৎ মুসোলিনীকে আর একটি পত্র পাঠাইলেন। উহার আগের দিনই তিনি জার্মান হাইকম্যাণ্ডকে যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণের নির্দেশ দিয়াছিলেন। মুসোলিনীকে এই সিদ্ধান্ত জানাইয়া তিনি লিখিলেন,

'Now I would cordially request you, Duce, not to undertake further operations in Albania in the course of the next few days.'

অর্থাৎ গ্রীসের বিরুদ্ধে আলবেনিয়া হইতে আগামী কয়েকদিনের জন্য তিনি যুদ্ধ না চালাইবার জন্য মুসোলিনীকে অনুরোধ করিলেন এবং উহার বদলে যুগোশ্লাভিয়া হইতে আলবেনিয়া যাইবার গিরিসংকটগুলি 'পাহারা' দিতে বলিলেন! কিন্তু এই সমস্ত 'খুব গোপনীয়তার অন্ধকারে আবৃত' করিয়া রাখিতে হইবে এবং 'গোপনীয়তার' উপর তিনি চিঠির শেষাংশেও আবার জোর দিলেন—যার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে মুসোলিনী ও ইতালীর উপর হিটলারের বিশ্বাস ছিল না।[১]

যুগোশ্লাভিয়াকে কেন্দ্র করিয়া (অবশ্য সেই সঙ্গে গ্রীসও) বলকান বারুদাগারে অগ্নিসংযোগের এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীর মধ্যে ইতালী ও জার্মানীর পারস্পরিক সম্পর্কের যেমন আভাস পাওয়া যাইতেছে, তেমনই জার্মানীর পূর্ব সংকল্পিত চক্রান্তেরও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

* * *

বলকান অঞ্চলের উপর ইতালী ও জার্মানীর লুব্ধ দৃষ্টি ও পরস্পরের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে খ্যাতনামা বৃটিশ ঐতিহাসিক অ্যালান বুলক্ হিটলারের জীবনীগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দীর্ঘকাল যাবৎ মুসোলিনী বলকান অঞ্চলে এবং দানিয়ুব নদী এলাকায় ইতালীয় আধিপত্য বিস্তারের জন্য চিন্তা করিয়া আসিতেছিলেন। সুতরাং এই অঞ্চলে জার্মানীও যদি থাবা মারে, তবে তাঁর উচ্চাশা পূরণের পক্ষে বাধা হইবে। এমন কি দক্ষিণ-পূর্ব থেকে জার্মানীর এই থাবা বিস্তারের আশঙ্কাতেই মুসোলিনী গোড়ার দিকে জার্মানী কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখলের (নাৎসী ভাষায় যেটা 'অস্ট্রো-জার্মান মিলন' নামে অভিহিত) বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে হিটলারের অনেক মিষ্টবাক্য সত্ত্বেও মুসোলিনীর সন্দেহ কিন্তু যায় নাই—দানিয়ুব বা আদ্রিয়াতিকের দিকে জার্মানীর যে কোন অগ্রগতির লক্ষণকে মুসোলিনী ভয়ের চক্ষে দেখিয়াছেন। অবশ্য হিটলার মুসোলিনীর মনের ভাব জানিতেন এবং তিনি একথা বুঝিয়াছিলেন যে, বলকান অঞ্চলে জার্মানীর সহিত ইতালীর প্রতিযোগিতার সম্ভাবনায় ডুচে মনে মনে বিরক্ত। এমন কি, জার্মানীর উপর টেক্কা দেওয়ার জন্য মুসোলিনী আগেই এই অঞ্চলে ঢুকিয়া পড়িতে পারেন। এজন্য ৭ই জুলাই, ১৯৪০, ইতালীয় পররাষ্ট্রসচিব কাউণ্ট চিয়ানোর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে হিটলার তাঁকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন যে, ইতালীর পক্ষে যুগোশ্লাভিয়ায় এখন হানা দেওয়া ঠিক হইবে না। এদিকে পরিকল্পিত ইতালীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে যুগোশ্লাভিয়াকেও মুসোলিনী মনে মনে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তারপর গ্রীসকে। কিন্তু হিটলার তাঁর নিজস্ব

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক।

প্রয়োজনে এই দুই রাজ্যের উপরেই মুসোলিনীর লুব্ধ দৃষ্টিকে সংযত করিতে চাহিলেন এবং চিয়ানোর সঙ্গে পরে একটি সাক্ষাৎকারে হিটলার আবার বলকান পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, এখন এই অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে খুব বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে। তবে, হিটলার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করিলেন যে, যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের উপর ইতালীর যে দাবী আছে, সেই দাবীর মীমাংসা করার অধিকার মুসোলিনীর আছে, তবে সেটা অবস্থা আরও একটু অনুকূল হইলে করিতে হইবে।

চিয়ানো বুঝিলেন যে, হিটলারের এই সমস্ত পরামর্শের উদ্দেশ্য হইতেছে ইতালীকে আর বলকানের দিকে অগ্রসর হইতে না দেওয়া—

'It is a complete order to halt all along the line'.

অথাৎ এই লাইনে আর আগাইয়া না যাওয়ার হুকুম! বলা বাহুল্য যে, মুসোলিনী বিরক্ত হইলেন। তবু হিটলারের মন রক্ষার জন্য ২৭শে আগস্টের এক চিঠিতে তাঁকে এই বলিয়া ভরসা দিলেন যে, গ্রীস ও যুগোশ্লাভ সীমান্তে ইতালী যা কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, তা সমস্তই আত্মরক্ষামূলক। আসলে ইতালীর সমস্ত সামরিক শক্তি মিশর আক্রমণেই নিয়োগ করা হইবে। কিন্তু এই সমস্ত লেখা সত্ত্বেও সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি যখন রিবেনট্রপ রোমে গেলেন তখন কিন্তু মুসোলিনী গ্রীস আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব গোপন করিলেন না। বরং তিনি বলিলেন যে, গত এপ্রিল মাসের (জার্মানীর আক্রমণ) আগে নরওয়ের যে প্রয়োজন ছিল জার্মানীর কাছে, গ্রীসেরও প্রয়োজন তেমনি ইতালীর কাছে। তবে, তিনি রিবেনট্রপকে এই আশ্বাসও দিলেন যে, পূর্ব ভূমধ্যসাগর থেকে বৃটিশ শক্তিকে বিতাড়িত না করার আগে তিনি গ্রীসে অভিযান করিবেন না।

এই সময় সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ জার্মানী, ইতালী ও জাপানের মধ্যে যে নূতন ত্রিশক্তির চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব চলিয়াছিল সেটা দানা বাঁধিয়া উঠে। অবশ্য রিবেনট্রপ অনেক আগেই, ১৯৩৮ অক্টোবরে এই ধরনের একটা চুক্তির প্রস্তাবের কথা বলিয়াছিলেন। দুই বছর পর তিনি পুনরায় মুসোলিনীর নিকট সেই আগেকার চুক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন যে, প্রস্তাবিত ত্রিশক্তির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে আমেরিকার রুজভেল্টের নীতির বিরুদ্ধবাদীগণের হাত শক্তিশালী হইবে এবং যাঁরা নির্লিপ্ততা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী তাঁরা আরও জোর পাইবেন। তবে, রিবেনট্রপ স্বীকার করিলেন যে, ইতালী, জার্মানী ও জাপানের মধ্যে এই নূতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে রাশিয়ার মনে সন্দেহ উদ্রেক করিতে পারে। তবে, একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, (রিবেনট্রপের মতে) রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুতার নীতি নির্দিষ্ট একটা সীমারেখার মধ্যে রাশিয়াকেই অনুসরণ করিতে হইবে।[১]

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ এই চুক্তি বার্লিনে স্বাক্ষরিত হইল। চুক্তির ১ নং ও ২ নং অনুচ্ছেদে ইতালী ও জার্মানী কর্তৃক ইউরোপে নূতন ব্যবস্থা (নিউ অর্ডার) প্রবর্তনের অধিকার জাপান মানিয়া লইল এবং এর পাল্টা জার্মানী ও ইতালীও বৃহত্তর পূর্ব এশিয়াতে জাপানের নরা ব্যবস্থা প্রবর্তনের অধিকার স্বীকার করিল। ৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হইল যে, যদি চুক্তি স্বাক্ষরকারীর কোন এক পক্ষ আমেরিকা কর্তৃক আক্রান্ত হয়,

১। Hitler—by Allan Bullock—Pelican. P 612-13

তবে, পারস্পরিক সাহায্য দেওয়া হইবে। অবশ্য চুক্তির মধ্যে স্পষ্ট করিয়া আমেরিকার নামোল্লেখ ছিল না।

চিয়ানো এই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য বার্লিনে গিয়াছিলেন। তখন সেপ্টেম্বরের শেষ, অর্থাৎ যুদ্ধের দ্বিতীয় বছর। কিন্তু কবে যুদ্ধ শেষ হইবে তা নিয়া স্বভাবতঃই লোকে বলাবলি করিতেছিল। এজন্য মহাসমারোহে ঢাকঢোল পিটানো হইল এই চুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষে এবং গোয়েবলসের দপ্তর দারুণ প্রোপাগাণ্ডা চালাইল জনচিত্তে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য। দিন সাতেক পরে আবার ব্রেনার গিরিবর্ত্মে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে সাক্ষাৎ হইল এবং অক্ষশক্তিবর্গের ঐক্য ও সংহতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইল। চিয়ানো মন্তব্য করিলেন যে, উভয়ের সাক্ষাৎ ও আলোচনা যথেষ্ট হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল এবং হিটলার সরলভাবেই তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে অনেক কথা বলিলেন এবং বলশেভিক মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা আবার অকপটে প্রকাশ করিলেন এবং মন্তব্য করিলেন—'এই মতবাদ সেই সমস্ত লোকের যারা সভ্যতার একেবারে নীচু ধাপে রহিয়াছে।' কিন্তু হিটলার সব কথা বলিলেও জার্মানী যে ইতিমধ্যেই রুমানিয়ার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছে, সেই আসল কথাটি কিন্তু গোপন করিয়া গেলেন।

অতএব পরের সপ্তাহে যখন রুমানিয়া থেকে জার্মান সৈন্যদের চলাচল সুরু হইল, তখন মুসোলিনী হিটলারের কপটতায় রাগিয়া টং হইলেন। তাঁর মনে হইল হিটলার এবারও তাঁর উপর এক হাত নিয়াছেন! অথচ তিনিও যে এক দফা ইতালীর সৈন্য রুমানিয়া দখল করিতে পাঠাইবেন, এমন সুযোগও তাঁর ছিল না। সুতরাং ক্রুদ্ধ মুসোলিনী চিয়ানোর কাছে একেবারে ফাটিয়া পড়িলেন:

'Hitler always faces me with a fait accompli. This time I am going to play him back in his own coin. He will find out from the newspapers that I have occupied Greece. In this way the equilibrium will be re-established. I shall send in my resignation as an Italian if anyone objects to our fighting the Greek.

—'হিটলার সব সময়েই সব ঘটনা আমার কাছে যেন নিয়তির বিধানরূপে হাজির করেন। কিন্তু এবার আমি তাঁর পয়সাতেই তাঁর দাম দিব। আমি যে গ্রীস দেশ দখল করিয়া নিয়াছি এই সংবাদ তাঁকে এবার খবরের কাগজ পড়িয়া জানিতে হইবে। এভাবেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে যদি কেউ আপত্তি তোলেন, তবে, একজন ইতালীয়ান হিসাবে আমি পদত্যাগপত্র পেশ করিব।'...

ওদিকে তখন (১৩ই সেপ্টেম্বর) উত্তর আফ্রিকায় মিশরে মার্শাল গ্রাৎসীয়ানির আক্রমণ সুরু হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, অনেক বেশী সৈন্যশক্তি থাকা সত্ত্বেও ইতালীয় বাহিনী মুষ্টিমেয় বৃটিশ সৈন্যের কাছে হারিয়া যাইতেছিল। এই অবস্থায় ইতালীর জেনারেল ষ্টাফের অধ্যক্ষ মার্শাল বাদোগোলিও নূতন কোন যুদ্ধের দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু মুসোলিনীর জিদের জন্য সেই আপত্তি টিঁকিল না। ২৮শে অক্টোবর আলবেনিয়া থেকে ইতালীয় সৈন্যেরা গ্রীস আক্রমণ সুরু করিল।

১। Chiano's Diary—London, 1947. P. 297

হিটলার তখন ফ্রাঙ্কের সঙ্গে ব্যর্থ সাক্ষাৎকারের নৈরাশ্যপূর্ণ মন লইয়া ফিরিতেছিলেন। রাস্তায় তিনি গ্রীস আক্রমণের খবর পাইলেন। এই সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত মুসোলিনী তাঁকে এক পত্র দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ২৪শে অক্টোবরের রাত্রির আগে সেটা তাঁর কাছে পৌঁছিল না। হিটলার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তখন মুসোলিনীর বন্ধুত্ব ছাড়া তাঁর উপায়ও ছিল না। সুতরাং সমস্ত ক্রোধ সম্বরণ করিয়া অত্যন্ত ধৈর্য সরকারে তিনি ফ্লোরেন্স গিয়া হাজির হইলেন তাঁর স্পেশাল ট্রেনযোগে। (এই ট্রেনে করিয়াই তিনি স্পেনীয় সীমান্তে ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন)। সেখানে পিটি প্যালেসে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে সাক্ষাৎ হইল এবং হিটলার তাঁর সমস্ত মনের ভাব গোপন করিয়া মুসোলিনীর সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে আলোচনা চালাইলেন এবং গ্রীস ও ক্রীট আক্রমণে তিনি জার্মান বিমান বাহিনীর সহায়তা দানেও প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভিসি ফ্রান্স ও রুমানিয়া সম্পর্কে মুখরক্ষা গোছের একটা রিপোর্ট দিলেন মুসোলিনাকে আশ্বস্ত করার জন্য। বাহ্যতঃ দুই পক্ষের মধ্যে যথেষ্ট মনের মিল ও পারস্পরিক মতৈক্য দেখা গেল। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে হিটলার যে পাকা অভিনেতা ছিলেন, এই ঘটনা তার আর একটি প্রমাণ। কিন্তু হিটলারের পার্শ্বচর পল স্মীডট্ এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে লিখিয়াছেন—'বাহ্যতঃ দুই নেতার মধ্যে মতের মিল দেখা গেল বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে হিটলারের মনের ভাব অত্যন্ত তীব্র ও তিক্ত ছিল। কারণ, পরপর তিনবার তিনি হতাশ হইলেন—ফ্রাঙ্কোর নিকট, পেঁতার নিকট এবং এক্ষণে মুসোলিনীর নিকট। আগামী কয়েক বছর দীর্ঘ শীতের সন্ধ্যায় এই দীর্ঘ ক্লেশকর ভ্রমণ এবং সেই সঙ্গে অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসের অনুপযুক্ত অক্ষশক্তির অংশীদার বন্ধুগণ ও প্রতারক ফরাসীদের স্মৃতি হিটলারকে বারবার পীড়া দিয়াছিল।'[১]

বলাই বাহুল্য যে, মুসোলিনী ও ইতালীর সামরিক শক্তির উপর তাঁর বিশেষ কোন ভরসা ছিল না। সুতরাং জার্মানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই তিনি সামরিক নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন এবং ১২ই নভেম্বর ১৮ নং নির্দেশনামায় উত্তর আফ্রিকা ও বলকান অঞ্চল অভিযান সম্পর্কে হুকুম জারী করিলেন।

বলকান দখল

১৯৪০ সালের ২৮শে অক্টোবর ইতালী আলবেনিয়া হইতে গ্রীস আক্রমণ করিল এবং ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসের আরম্ভ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইল। কোরিট্জা এবং আড্রিয়াতিক উপসাগরের উপকূল ও ক্যাশমাস নদী উপত্যকা ধরিয়া—মোটামুটি এই দুই পার্শ্ব হইতে যে আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল, কিছুকাল যুদ্ধের পরেই ইতালী তাতে পরাজিত হইল। কিন্তু শীতকালের প্রচণ্ড বরফ ও ঝড়ের জন্য উভয়ের অবস্থাই অচল হইয়া পড়িল। পর্বতারোহী সৈন্যেরা অনেক কষ্টে পাঁচ মাসের অধিক কাল ধরিয়া যে অনিশ্চিত যুদ্ধ চালাইল, তার চূড়ান্ত মীমাংসা হইল জার্মানীর অভিযানের দ্বারা।

১৯৪১ সনের ৬ই এপ্রিল জার্মান যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করিল এবং ১১ দিনের মধ্যে উহা দখল করিয়া ফেলিল। রাজধানী বেলগ্রেড 'খোলা শহর' বলিয়া ঘোষিত

১। Hitler—Allan Bullock P. 616.

হওয়া সত্ত্বেও ভয়াবহ বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল না এবং ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড বিস্তৃত হইল। স্বাধীন যুগোশ্লাভিয়া মানচিত্র থেকে মুছিয়া গেল।

একই সঙ্গে মেটাক্সাস লাইন ধরিয়া গ্রীসও আক্রান্ত হইল। তখন মিশর হইতে একটি বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী জেনারেল স্যার হেনরি মেটল্যাণ্ড উইলসনের অধীনে
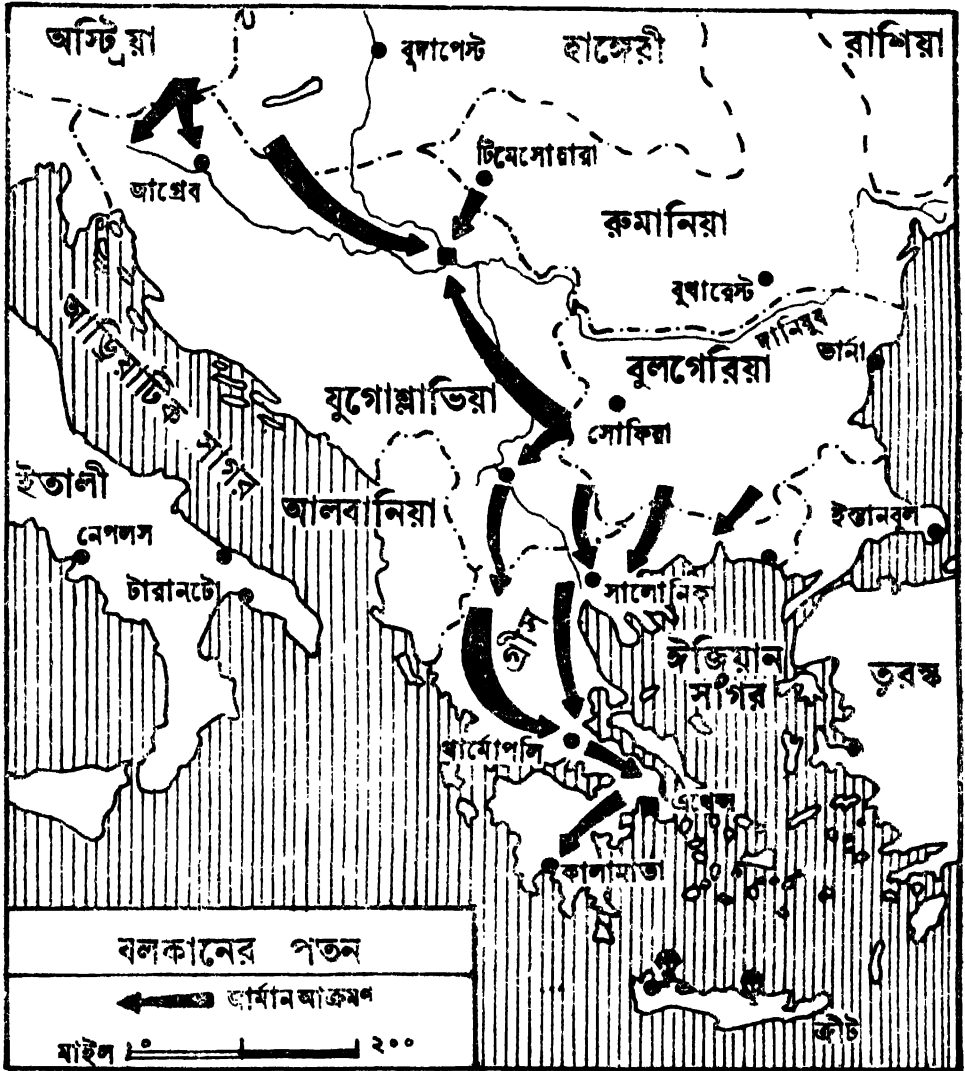
গ্রীসে প্রেরিত হইল। গ্রীসের সহিত চুক্তি অনুসারেই এই সাম্রাজ্য বাহিনী সেখানে প্রেরিত হইল। কিন্তু জার্মানীর রণক্রিয়ার মুখে বেশীক্ষণ টিকিতে পারিল না। ৪টি পর্যায়ে এই যুদ্ধ শেষ হইল, যথা—

(১) পূর্ব ম্যাসিডোনিয়ায় আত্মরক্ষা,

(২) মনাষ্টির গিরিবর্ত্ম ও থেসালিয়ান গিরিসঙ্কট দিয়া জার্মানীর অগ্রগতি,

(৩) এপিরাসে গ্রীক সৈন্যদলের বেষ্টন এবং

(৪) বৃটিশ সাম্রাজ্য বাহিনীর পশ্চাদপসরণ।

মাত্র ৭৪ হাজার সাম্রাজ্য সৈন্য সেখানে প্রেরিত হইয়াছিল, যার ফলে গ্রীস রক্ষা করাও সম্ভব হইল না, আবার উত্তর আফ্রিকায়ও এর জন্য বৃটেনের অবস্থা কাহিল হইল।

৬ই এপ্রিল হইতে ৩০শে এপ্রিল, মাত্র ৩ সপ্তাহের যুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের পতন হইল। জার্মানী এই সংগ্রামে ২৪ হইতে ৩০ ডিভিসন সৈন্য নিয়োগ করিয়াছিল এবং পার্বত্য যুদ্ধের উপযোগী হাল্কা ট্যাংক ও বিমান নিয়োগ করিয়াছিল। পর্বত ও গিরিসঙ্কট জার্মানীর শ্রেষ্ঠ ও সাহসিক রণকৌশলকে বাধা দিয়া রাখিতে পারিল না। পোল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের যুদ্ধের মতই যান্ত্রিক সেন্যেরা পদাতিকের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া বিদ্যুৎগতি জয়লাভ করিল। এই বলকান সংগ্রামে জার্মানীর মাত্র ৫৫০০ সৈন্য হতাহত হইয়াছিল (হিটলারের মতানুসারে)। কিন্তু একমাত্র গ্রীসের যুদ্ধেই সাম্রাজ্য বাহিনীর ৩০ হাজার সৈন্য নষ্ট হইল। বাকি ৪৪ হাজার সৈন্য ক্রীট ও মিশরে অপসারিত করা হইল। কিন্তু এই অপসারণ কার্যে বৃটেনকে বিষম বেগ পাইতে হইয়াছিল। জার্মান বোমারুর আক্রমণে সমুদ্রপথে পলায়মান সাম্রাজ্য বাহিনীর প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়াছিল।

বিমান সৈন্যের ক্রীট দখল

কিন্তু সর্বাপেক্ষা অভিনব এবং ভয়াবহ যুদ্ধ হইল ক্রীট দ্বীপে, যাহা তখনকার দিন পর্যন্ত ইতিহাসে অতুলনীয় ছিল। গ্রীস হইতে ১৮০ মাইল দূরবর্তী সমুদ্রবেষ্টিত ক্রীট দ্বীপ জার্মান বিমান সৈন্যেরা এক সাংঘাতিক সংগ্রামের দ্বারা মাত্র ১০ দিনের মধ্যে জয় করিয়া লইল—২০শে মে হইতে ৩০শে মে, ১৯৪১। সমগ্র পৃথিবী যেন 'হাঁ করিয়া' এই অদ্ভুত বিমানযুদ্ধ লক্ষ্য করিল এবং জার্মান প্যারাস্যুট সৈন্যেরা আশ্চর্য দক্ষতা ও অপরিসীম দুঃসাহসিকতার সঙ্গে এই দ্বীপ দখল করিল। সামরিক ইতিহাসে এই প্রথম দেখা গেল যে, বিমান সৈন্যেরা ভারী অস্ত্রের সাহায্য ছাড়াও স্থল ও জলপথের শ্রেষ্ঠতর বাহিনীকে পরাভূত করিতে পারে। বৃটিশ নৌবহর কতকগুলি নাৎসী কনভয়কে নষ্ট করিল বটে, কিন্তু জার্মান বোমারু ও টর্পেডো-বিমান বৃটিশ জাহাজগুলিকে এমন ঘায়েল করিল যে, নৌবহর ক্রীট এলাকা হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল। ক্রীটে সাড়ে ৩ হাজার প্যারাস্যুট অবতরণ করিল এবং ইহাদের অধিকাংশই নিহত হইল। তথাপি দলে দলে গ্লাইডার ও সৈন্যবাহী বিমানযোগে হাজার হাজার সৈন্য অবতরণ করিল! জেনারেল ফ্রেবার্গের অধীন বৃটিশ বাহিনী তাহা রোধ করিতে পারিল না। ৩৫০ মাইল দূরবর্তী আফ্রিকার ঘাঁটি হইতে বৃটিশ বিমান কোন সাহায্য দিতে পারিল না। ৩৫ হাজার বিমানবাহী সৈন্য ক্রীট দ্বীপ দখল করিয়া লইল এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য বাহিনীর অর্ধেক বা ২৭ হাজার সৈন্য ত্রাণ পাইল। আর জার্মানীর হতাহত হইল ১৭ হাজার। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের গুরুত্ব বিবেচনায় তাদের জয়ের মূল্য অপরিসীম ছিল।

মিঃ চার্চিল সেই সময় কমন্স সভায় ক্রীট দ্বীপের অদ্ভুত মারাত্মক সংগ্রাম সম্পর্কে বলিয়াছিলেন,

"A strange and grim battle is being fought one in which our side has no air support, because they have no aerodromes—not because

they have no aeroplanes—while the other side has very little or no artillery or tanks and neither side has any means of retreat.

It is a desperate grim battle and I certainly will send wishes and encouragement to the men who are fighting what is undoubtedly the most important battle which will affect the whole course of the campaignin the Mediterranean".

অর্থাৎ 'এক অদ্ভুত এবং নৃশংস যুদ্ধ চলিতেছে। আমাদের বিমান আছে, কিন্তু বিমানঘাঁটি নাই। ফলে বিমানের কোন সাহায্য আমরা পাইতেছি না, আবার শত্রু-পক্ষেরও কামান, ট্যাঙ্ক ও গোলাগুলি নাই—এবং কোন পক্ষেরই পিছনে হটিবার কোন জায়গা নাই। নৃশংস ও দুর্ধর্ষ এই যুদ্ধ—এই যুদ্ধ যারা চালাইতেছে, সেই সমস্ত সৈন্যদিগকে নিশ্চয়ই আমি আশা ও উৎসাহের বাণী পাঠাইব। এই যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, ইহা সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় সংগ্রামের গতি নির্ণয় করিবে।'

ক্রীট দ্বীপ দখলের দ্বারা সমগ্র বলকান অঞ্চল জার্মানীর মুঠার তলায় আসিয়া গেল এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরে অক্ষশক্তিবর্গের প্রভাব বিস্তৃত হইল। রাশিয়া আক্রমণের পূর্বে ইহাই ছিল জার্মানীর শেষ ইউরোপীয় অভিযান এবং বৃটেনকে আর একবার ইউরোপীয় ভূমিভাগ হইতে বিতাড়ন। হিটলারের জয়ধ্বনিতে তখন ফ্যাসিস্ট দুনিয়া মুখরিত হইল এবং সেই সঙ্গে আবার যুক্ত হইল উত্তর আফ্রিকার মরুভূমিতে রোমেলের রণচাতুর্যের বিস্ময়!

চতুর্থ অধ্যায়

বার্লিনে দুই কূটনৈতিক অতিথি

মলোটোভ ও মাৎসুয়োকার কাহিনী

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিটলারের জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়ার দুই দিকে—উত্তরে ফিনল্যাণ্ড এবং দক্ষিণে বলকান অঞ্চলে যে সামরিক তৎপরতা শুরু করিল, তাতে মস্কোর সন্দেহ উদ্রিক্ত হইল। বলা বাহুল্য যে, সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণের জন্য হিটলারের মনে যে অভিসন্ধি ছিল, এভাবে রাশিয়ার দুই পার্শ্বদেশে সৈন্য চলাচল বা সামরিক কার্যকলাপ ছিল তারই প্রারম্ভিক সূত্রপাত মাত্র। রাশিয়ার সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের আগেই এক দফা যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ফিনিশ শাসক চক্র মস্কোর প্রতি অনুকূল মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন না, জার্মানীর প্রতি ছিল তাঁদের অন্তরের সহানুভূতি। সুতরাং জার্মানী ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে যখন এই মর্মে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল যে, উত্তরবর্তী নরওয়েতে জার্মানীর সৈন্যদল বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত নূতন সৈন্য পাঠানো হইবে, তারা ফিনল্যাণ্ডের মধ্য দিয়াই চলাচল করিবে এবং যখন মস্কোস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূত কাউণ্ট সুলেনবুর্গ মলোটোভকে 'অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে' (অবশ্য বার্লিনের নির্দেশে) এই চুক্তির খবর দিলেন তখন ক্রেমলিনের সন্দেহ উদ্রিক্ত হইল। কিন্তু তার চেয়ে গুরুতর প্রতিক্রিয়া ঘটিল বলকান অঞ্চলের ঘটনাবলী নিয়া। একথা মনে রাখা দরকার যে, রুশ জার্মান চুক্তির গোপন সর্ত অনুসারে ইতিপূর্বেই রাশিয়া যে সমস্ত চাল চালিয়াছিল, যেমন পোল্যাণ্ডের পূর্বাংশ দখল এবং জুন মাসে (১৯৪০) বাল্টিক রাজ্যগুলি এবং রুমানিয়ার বেসারাবিয়া ও উত্তর বাকুভিনা সোভিয়েট অধিকারে আনয়ন, তাতে জার্মানী মনে মনে ক্ষুব্ধ ছিল। এই নিয়া বার্লিন ও মস্কোর মধ্যে ইতিপূর্বেই মনকষাকষি চলিতেছিল। এভাবে রাশিয়ার 'পশ্চিম দিকে অগ্রগতিতে' হিটলার মনে মনে শঙ্কা বোধ করিলেন এবং স্থির করিলেন যেভাবেই হোক রাশিয়াকে বাধা দিতে হইবে। বিশেষতঃ রুমানিয়ার পেট্রোল খনিগুলি জার্মানীর যুদ্ধযাত্রার পক্ষে অমূল্য সম্পদ এবং এই সম্পদে আর কেউ হাত না দেয় কিম্বা কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে না পারে এজন্য হিটলার কার্যত রুমানিয়া দখল করিতে উদ্যত হইলেন—বলকান গ্রাসের অধ্যায়ে একথা আগেই বলা হইয়াছে। ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে হিটলার রুমানিয়াতে 'মিলিটারী মিশন' পাঠাইলেন এবং সেই সঙ্গে 'খুব গোপনীয়' কয়েকটি নির্দেশ দিলেন। সেই গোপন নির্দেশের মর্মকথা হইল জার্মান মিশন বাহ্যত রুমানিয়ার সৈন্যদিগকে শিক্ষা ও সংগঠনের নাম করিয়া কার্যত রুমানিয়ার তৈলখনিগুলি পাহারা দিবে এবং যদি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধে, তবে, এখন থেকেই প্রস্তুতিস্বরূপ রুমানিয়ার ঘাঁটিগুলি তৈয়ার রাখিতে হইবে।

কিন্তু হিটলারের কড়া নির্দেশ ছিল যে, জার্মানীর এই সমস্ত সামরিক মতলব রুমানিয়ার কাছ থেকেও গোপন রাখিতে হইবে। এখানে স্মরণ করা দরকার যে

রাশিয়া কর্তৃক বাকুভিনা ও বেসারাবিয়া দখল করার ফলে হাঙ্গেরীও ট্রান্সিলভানিয়া কাড়িয়া নিতে উদ্যত হইয়াছিল, যখন ভিয়েনা বাঁটোয়ারা মারফত হিটলারের মধ্যস্থতায় ট্রান্সিলভানিয়ার অর্ধেক হাঙ্গেরীর দখলে যায়—মানচিত্রে যে চিহ্ন দেখিয়া রুমানিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যানোয়েসেস্কু টেবিলের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং এই ঘটনার পরেই রাজা ক্যারল তাঁর সিংহাসনও হারাইয়াছিলেন। কিন্তু এই ভিয়েনা-হাঙ্গেরী ও রুমানিয়ার ভূমিগত বিরোধের নিষ্পত্তিতে 'বাঁটোয়ারা' মস্কোর পছন্দসই ছিল না। বিশেষত রুমানিয়া সম্পর্কে জার্মানী যে গ্যারাণ্টি দিয়াছিল, রাশিয়ার তা ছিল অত্যন্ত অনভিপ্রেত। সুতরাং জার্মান রাষ্ট্রদূত যখন মলোটোভের সঙ্গে দেখা করিলেন ১লা সেপ্টেম্বর এবং ভিয়েনা বাঁটোয়ারার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া উহার সমর্থন করিলেন, তখন মলোটোভের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল এবং তিনি প্রতিবাদ জানাইলেন। কারণ, মলোটোভের মতে এর দ্বারা রুশ-জার্মান চুক্তির তৃতীয় অনুচ্ছেদ ভঙ্গ করা হইয়াছে, যে অনুচ্ছেদ অনুসারে এই সমস্ত ক্ষেত্রে পারস্পরিক আলোচনার বিধান ছিল, 'পারস্পরিক স্বার্থের প্রশ্নে' জার্মানী রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা করিবে, এমন সর্ত ছিল। কিন্তু ৩রা সেপ্টেম্বর রিবেনট্রপ এক দীর্ঘ তারবার্তায় চুক্তি ভঙ্গের কথা অস্বীকার করিলেন এবং পাল্টা অভিযোগ করিলেন যে, সোভিয়েট গভর্নমেণ্টই বরং জার্মানীর সহিত বিনা আলোচনায় বাল্টিক রাজ্যগুলি এবং দুটি রুমানিয়ান প্রদেশ দখল করিয়া নিয়াছেন। কিন্তু সোভিয়েট পাল্টা জবাবে জার্মানীকে চুক্তি ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করিলেন এবং জার্মানীকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, রুমানিয়াতে রাশিয়ারও স্বার্থ আছে।[১]

এর পর ১৬ই সেপ্টেম্বর ঘটিল ফিনল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া উত্তর নরওয়েতে জার্মান সৈন্য পাঠাইবার ঘটনা এবং তার পর ২৫শে সেপ্টেম্বর রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও একটি নাটকীয় ঘটনার সম্মুখীন হইলেন। জার্মান দূত মলোটোভকে জানাইলেন যে, 'আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই' বার্লিনে জাপান, ইতালী ও জার্মানীর মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। কিন্তু এই প্রস্তাবিত চুক্তির মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিছু থাকিবে না, কিন্তু স্পষ্টতই এটা মার্কিন যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে যাইবে। কিন্তু মলোটোভ দাবী করিলেন যে, রুশ-জার্মান চুক্তির চতুর্থ অনুচ্ছেদ অনুসারে ত্রিপক্ষীয় প্রস্তাবিত চুক্তি এবং যদি ওর মধ্যে কোন গোপন সর্ত থাকে, তবে, সেগুলি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগেই রাশিয়া ঐগুলি দেখার অধিকারী। ওদিকে ফিনল্যাণ্ডের ৩টি বন্দর দিয়া যে সমস্ত জার্মান সৈন্য পাঠানো হইতেছে, তাদের সম্পর্কে এবং ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে কি ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, সেগুলির অনুলিপি রাশিয়া দেখিতে ইচ্ছুক। কয়েকদিন পর মলোটোভকে আরও জানানো হইল যে, জার্মানী রুমানিয়াতে একটি মিলিটারী মিশন পাঠাইতেছে। তখন মলোটোভ জানিতে চাহিলেন—এই মিশনে জার্মানীর সৈন্যসংখ্যা কত ?

ক্রেমলিনের এই সমস্ত সন্দেহ দেখিয়া বার্লিনের কর্তারা উদগ্রীব হইলেন এবং রাশিয়ার সন্দেহ নিরসনের জন্য রিবেনট্রপ ১৩ই অক্টোবর তারিখ স্বয়ং স্ট্যালিনের কাছে এক দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। এই পত্রে তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, এই সমস্ত প্রশ্নের মুখোমুখি আলোচনার জন্য সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভের উচিত নভেম্বর

১। উইলিয়াম শাইরার প্রণীত 'দি রাইজ এণ্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ', পৃষ্ঠা ৯৫৭-৫৮

মাসের মাঝামাঝির আগেই বার্লিনে আসা। সাত দিন বিবেচনার পর স্ট্যালিন বার্লিনের এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

১২ই নভেম্বর মলোটোভ ট্রেনযোগে জার্মান রাজধানীতে আসিয়া হাজির হইলেন। স্টেশনে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রচুর অভ্যর্থনা এবং নিয়মমাফিক বহু সম্মান দেখানো হইল। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, রুশ-জার্মান চুক্তির মধ্যে যে সমস্ত ফাটল দেখা দিতেছিল, তার জন্য স্ট্যালিন দায়ী ছিলেন না। কারণ, যথাসম্ভব নিষ্ঠার সঙ্গে চুক্তি পালনের জন্য সোভিয়েট সরকার আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করিতেছিলেন—একথা চার্চিল পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। এমন কি, সোভিয়েট গভর্নমেন্ট এতদূর পর্যন্ত গিয়াছিলেন যে, ফ্রান্সের পতনের মুহূর্তে ১৭ই জুন মলোটোভ জার্মান সৈন্যবাহিনীর 'বিস্ময়কর জয়ের' জন্য জার্মানীকে অভিনন্দন পর্যন্ত জানাইয়াছিলেন।[১]

কিন্তু এই অভিনন্দন সত্ত্বেও ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিরূপে পরিচিত ফ্রান্সের এত দ্রুত পতনে সোভিয়েট রাশিয়ার উদ্বেগবোধ চাপা রহিল না। সেই সময় বাল্টিক রাজ্য এবং রুমানিয়ার বেসারাবিয়া ও বাকুভিনা দখল রাশিয়ার প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগেরই প্রমাণ। আসলে 'বলশেভিক বর্বরদের' বিরুদ্ধে আক্রমণের সংকল্প হিটলারের অনেক দিনের এবং ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে তারই গোপন উদ্যোগ। ফিনল্যান্ডে এবং বলকান অঞ্চলে হিটলারী দখল বিস্তার কিম্বা সৈন্য চলাচল সোভিয়েট রাশিয়াকে দুই পার্শ্বদেশ থেকে আক্রমণ পরিকল্পনারই প্রাথমিক আভাস ছিল। কিন্তু এই সমস্তই গোপন রাখিতে হইবে এবং বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণের ধাপ্পা দিতে হইবে। বার্লিনে মলোটোভের আমন্ত্রণ এবং হিটলার ও রিবেনট্রপ কর্তৃক তাঁর সংগে নাটকীয় আলোচনার যে রোমাঞ্চকর বিবরণী যুদ্ধের পর ধৃত কাগজপত্রে পাওয়া গিয়াছিল, সেগুলি থেকেই এই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সংকল্পের আভাস পাওয়া যায়।

১২ই নভেম্বর, ১৯৪০, মলোটোভ বার্লিনে পৌঁছিবার পরেই তাঁর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের সংগে। এই প্রথম সাক্ষাতে রিবেনট্রপ যা বলিলেন, তার মর্ম এই যে, ইংল্যান্ডের আর কোন আশা নাই, একথা তিনি আগেই স্ট্যালিনের নিকট চিঠিতে লিখিয়াছেন। বৃটেন তো যুদ্ধে হারিয়াছে বটেই, যদি সে এখনও হার স্বীকার না করে, তবে, খোদ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করা হইবে—বর্তমানে খুব খারাপ আবহাওয়া চলিতেছে, এই আবহাওয়ার উন্নতি হইলেই বৃটেন আক্রান্ত এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যও খতম হইবে। অবশ্য ইংরাজদের সকলে একথা বুঝিতে পারিতেছে না। কারণ, গ্রেট বৃটেনে কিছু কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে 'চার্চিল নামক এক ব্যক্তির সখের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের জন্য'—এই ব্যক্তির নেতৃত্ব আগেও ব্যর্থ হইয়াছে, ভবিষ্যতেও হইতে বাধ্য।[২]

লাঞ্চের পর স্বয়ং হিটলারের সঙ্গে মলোটোভের বৈঠক শুরু হইল। হিটলার তাঁর আলোচনার শুরুতে এক একটা জাতির দূর-ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ও পরিচালনায় নেতৃত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে উচ্চাঙ্গের তত্ত্বের অবতারণা করিলেন এবং বলিলেন যে, বর্তমানে যখন

১। পূর্বোধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৯৪৯

২। মার্কিন সরকার কর্তৃক প্রকাশিত নাৎসী-সোভিয়েট সম্পর্ক ১৯৩৯-১৯৪১, থেকে চার্চিলের উদ্ধৃত।

জার্মানী ও রাশিয়ার মত দুইটি জাতির নেতৃত্বে 'যথেষ্ট কর্তৃত্বসম্পন্ন' লোক রহিয়াছেন, তখন এই দুই জাতির ভবিষ্যৎ গতিপথ নিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।...

(আলোচনা সম্পর্কে জার্মান ভাষ্যের মর্ম)

হিটলার অতঃপর যুদ্ধের গতি বর্ণনা করিলেন এবং ইংলন্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন চূড়ান্ত আঘাতের প্রস্তুতির কথা বলিলেন। তবে, এই সংগে কেবল সামরিক নয়, ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক বিলিব্যবস্থার কথাও ভাবিতে হইবে এবং এজন্যই গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রাশিয়ার সহিত সম্পর্কের পুনর্বিবেচনা করিতে হইবে। এজন্য জার্মানী কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে—

(১) রাশিয়ার কাছ থেকে জার্মানী কোন সামরিক সাহায্য প্রত্যাশা করে না,

(২) যুদ্ধের পরিব্যাপ্তি ও ইংল্যান্ডের প্রতি বিরুদ্ধতার জন্যই জার্মানীকে তার নিজ দেশের বাইরে অনেক দূরবর্তী অঞ্চলে যাইতে হইয়াছে, যেখানে মূলতঃ তার কোন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ নাই,

(৩) যুদ্ধের জন্য যে সমস্ত অত্যাবশ্যক কাঁচামালের অপরিহার্য প্রয়োজন, সেগুলির খাতিরেই জার্মানীকে ঐ সমস্ত দেশে যাইতে হইয়াছে।...

অর্থাৎ হিটলার ভাবিয়াছিলেন যে, এই সমস্ত তত্ত্বকথা ও ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি মলোটোভকে ভুলাইতে পারিবেন। কিন্তু মলোটোভ অত্যন্ত বাস্তববাদী, ঠান্ডারক্তের মানুষ এবং ঝানু ডিপ্লোম্যাট। সুতরাং বৃটেনের পরাজয়ের পর ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ঐতিহাসিক পরিণতির দিকে না গিয়া মলোটোভ সোজাসুজি রুশ-জার্মান সহযোগিতার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পর পর কয়েকটি স্পষ্ট প্রশ্ন তুলিলেন।

পল স্মিডট, যিনি হিটলারের পার্শ্বচর ও দোভাষীরূপে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারী আলোচনার নোট রাখিতেন, তিনি পরবর্তী কালে মন্তব্য করিয়াছেন,—'আমার সামনে কোন বিদেশী দর্শনার্থীকে এভাবে হিটলারকে প্রশ্নের পর প্রশ্নবাণে জর্জর করিতে কখনও দেখি নাই।'

মলোটোভ প্রশ্ন তুলিলেন—জার্মানরা ফিনল্যান্ডে কি করিতেছে, যে ফিনল্যান্ডকে চুক্তি অনুসারে সোভিয়েট প্রভাবের অন্তর্গত বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছিল? ইউরোপে এবং এশিয়ায়, 'নয়া কানুন' বা নিউ অর্ডারের অর্থ কি এবং এতে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যাশিত ভূমিকা কি? ত্রিপক্ষীয় চুক্তির তাৎপর্য কি? বলকান অঞ্চলে ও কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার যে স্বার্থ আছে এবং যে স্বার্থের সঙ্গে বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও তুরস্ক জড়িত, সেই সমস্ত প্রশ্নও পরিষ্কার হওয়া দরকার। এগুলির তিনি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা চান।

এই সমস্ত প্রশ্নবাণের জন্য হিটলার এমন চমকাইয়া উঠেন যে, তিনি সম্ভাব্য বিমান আক্রমণের (বৃটিশ বোমারুর) অজুহাত দেখাইয়া হঠাৎ আলোচনা ভাঙ্গিয়া উঠিয়া পড়েন এবং বলেন যে, পরদিন আবার কথা হইবে।[১]

পরদিন সকালে যখন আবার হিটলারের সঙ্গে মলোটোভের বৈঠক হইল, তখন হিটলার গোড়াতেই মলোটোভের সংশয় দূর করিবার জন্য বলিলেন যে, যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনেই জার্মানীকে এমন সমস্ত অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে যেখানে তার কোন স্থায়ী-স্বার্থ নাই। যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলকান অঞ্চল—সেখানে জার্মানীর কোন

১। এ্যালান বুলক প্রণীত হিটলার, ৬১৮ পৃঃ।

রাজনৈতিক স্বার্থ নাই। কিন্তু নিতান্ত কতকগুলি কাঁচামালের অপরিহার্য প্রয়োজনেই জার্মানী সেখানে সক্রিয় হইয়াছে।

হিটলার ফিনল্যাণ্ড সম্পর্কে একথা স্বীকার করিলেন যে, ফিনল্যাণ্ড মস্কোর সঙ্গে জার্মানীর চুক্তি অনুসারে রুশ প্রভাবিত অঞ্চলেরই অন্তর্গত। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ফিনল্যাণ্ডের নিকেল ও কাঠ জার্মানীর পক্ষে খুবই দরকার। এটা রাশিয়ার নিশ্চয়ই বিবেচনা করা উচিত। হিটলার অতঃপর মলোটোভকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, জার্মানী রুশ-জার্মান চুক্তির সর্তানুসারেই চলিয়াছে বটে, কিন্তু রাশিয়াই উত্তর বাকুভিনা এবং লিথুয়ানিয়ার অংশ দখল করিয়া নিয়াছে, যদিও চুক্তিতে এগুলির কোন উল্লেখ ছিল না। তথাপি জার্মানী এগুলি মানিয়া লইয়াছে। কারণ, জার্মানী মনে করে যে, রাশিয়া তার নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এগুলি করিয়াছে। অনুরূপভাবে জার্মানীও প্রত্যাশা করে যে, ফিনল্যাণ্ড ও রুমানিয়ায় জার্মানীর যে সাময়িক স্বার্থ (টেম্পরারী ইণ্টারেস্ট) আছে, রাশিয়াও সেই সম্পর্কে সুবিবেচনা দেখাইবে।

কিন্তু মলোটোভ এই সমস্ত কথায় ভুলিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ফিনল্যাণ্ড থেকে জার্মান সৈন্য প্রত্যাহারের দাবী জানাইলেন। হিটলার জবাব দিলেন যে, জার্মান সৈন্যেরা ফিনল্যাণ্ড দখল করিয়া নেয় নাই, 'ফিনল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া' সৈন্য পাঠানো হইবে নরওয়েতে। কিন্তু হিটলার জানিতে চান রাশিয়া কি ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চায়?

জার্মান ভাষ্য অনুসারে দেখা যায়, মলোটোভ একথার সোজাসুজি উত্তর এড়াইয়া যান। তখন হিটলার নিতান্ত জোরের সঙ্গে বলেন, 'বাল্টিক অঞ্চলে কোন যুদ্ধ বাধানো চলবে না। যদি বাধে, তবে রুশ-জার্মান সম্পর্কের উপর খুব গুরুতর প্রতিক্রিয়া হবে।'

হিটলার ও মলোটোভের মধ্যে এভাবে তর্ক-বিতর্ক খুব তিক্ততার রূপ ধারণ করিতে থাকে এবং ব্যাপার দেখিয়া রিবেনট্রপ খুব ভড়কাইয়া যান। তিনি তাড়াতাড়ি বিতর্কের মধ্যপথে আসিয়া বলেন—'ফিনিশ প্রশ্ন নিয়ে এভাবে কথা বাড়াবার আসলে কোন কারণ নেই। বোধহয় এটা ভুল বুঝাবুঝির জন্যই ঘটেছে।'

হিটলার যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তিনি ধৈর্য বজায় রাখিয়া বলিলেন—আসুন, আমরা এর চেয়ে গুরুতর প্রশ্ন নিয়া আলোচনা করি।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনের পর যে অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্র খুলিয়া যাইবে, সেই দিকে রাশিয়াকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টায় হিটলার মলোটোভকে বলিলেন—৪ কোটি বর্গ কিলোমিটার আয়তনের পৃথিবীব্যাপ্ত সুবিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে ইংলণ্ডের পতনের পর। রাশিয়া তখন এই দেউলিয়া সাম্রাজ্যে বরফমুক্ত খোলা সমুদ্রে যাওয়ার পথের অধিকার পাইবে। এই পর্যন্ত সাড়ে চার কোটি ইংরাজ, যারা আসলে সংখ্যায় মাইনরিটি মাত্র, তারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ৬০ কোটি মানুষের উপর শাসনদণ্ড চালাইতেছে। এই মাইনরিটিকে তিনি পিষিয়া মারিবেন এবং তখন সারা পৃথিবীব্যাপী এক নতুন দৃশ্যের উদ্ঘাটন হইবে এবং দেউলিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভাগবাঁটোয়ারার সামনে সেই সমস্ত দেশের নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ থাকা উচিত নয়, যে সমস্ত দেশের এই ব্যাপারে স্বার্থ থাকার সম্ভাবনা। একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, রাশিয়া ও জাপানের ক্ষেত্রে।...

কিন্তু হিটলারের 'ঠাণ্ডা রক্তের অতিথি' পৃথিবীব্যাপী এত বড় প্রলোভনের মুখেও

বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি নিতান্ত বেরসিকের মত 'বাড়ীর সামনে'র ('ক্লোজার টু ইউরোপ')—যেমন তুরস্ক, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ার প্রশ্ন তুলিলেন। জার্মানী কর্তৃক রুমানিয়াকে গ্যারেণ্টি-দানের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানাইলেন। কিন্তু হিটলার তা অগ্রাহ্য করিলেন।

তখন মলোটোভ নিতান্ত কাঠখোট্টার মত বলিলেন, আচ্ছা বেশ, মস্কোর যখন দার্দানেলিস প্রণালীর দিকে স্বার্থ আছে, তখন যদি জার্মানীর রুমানিয়াকে গ্যারেণ্টি দেওয়ার মত বুলগেরিয়াকে রাশিয়া অনুরূপ গ্যারেণ্টি দেয়, তাহলে জার্মানীর বক্তব্য কি হবে?'

হিটলারের মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হইয়া উঠিল এবং মলোটোভের এই বেয়াড়া প্রশ্নের জবাবে তিনি মলোটোভকে পাল্টা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কিন্তু বুলগেরিয়া কি রাশিয়ার কাছে এমন কোন গ্যারেণ্টি চেয়েছে?—রুমানিয়া অবশ্য জার্মানীর কাছে চেয়েছিল।'

হিটলার আরও বলিলেন যে, বুলগেরিয়া এমন কোন অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া তাঁর জানা নাই। যা হোক এই বিষয়ে মলোটোভকে আরও সুনির্দিষ্ট কোন উত্তর দিতে হইলে আগে মুসোলিনীর সঙ্গে আলোচনা করিতে হইবে। তারপর হিটলার আর একটা খুব তাৎপর্যব্যঞ্জক মন্তব্য করিলেন—'জার্মানী যদি রাশিয়ার সঙ্গে ঝগড়া বাধাতেই চায়, তার জন্য দার্দানেলিস প্রণালীর দরকার হবে না।'

এর পর হিটলারের আর ধৈর্য রহিল না। তিনি এমন বেয়াড়া বলশেভিক অতিথির কর্কশ আচরণে ভীষণ বিরক্ত হইলেন। কারণ, আজ পর্যন্ত কোন বিদেশী অতিথি তাঁর মুখের উপর এমন তুড়ুক জবাব দিতে সাহস করেন নাই। ফলে, সেদিন রাত্রে (১৩ই নভেম্বর) উইণ্টারডেন লিণ্ডেনস্থিত রাশিয়ান দূতাবাসে মলোটোভ তাঁর আমন্ত্রক-দের আপ্যায়িত করার জন্য যে রাষ্ট্রীয় ভোজ দিলেন, তাতে হিটলার যোগ দিলেন না, যদিও তাঁর এই অনুপস্থিতি অপ্রত্যাশিত ছিল।

কিন্তু এই ভোজে এক অভাবিত কাণ্ড ঘটিল। রাত্রি ৯টার পর হঠাৎ বার্লিনে বিমান আক্রমণের সাইরেন বাজিয়া উঠিল এবং বিমানবিধ্বংসী কামানের গর্জন ও শুনা গেল। মলোটোভ ঠিক যে মুহূর্তে কুটনৈতিক কায়দায় রিবেনট্রপের উদ্দেশে বন্ধুতা-ব্যঞ্জক 'টোস্টে'র (স্বাস্থ্যপান) প্রস্তাব করিলেন এবং রিবেনট্রপও জবাব দেওয়ার জন্য দাঁড়াইয়া পড়িলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সাইরেন শুনা গেল। ফলে রিবেনট্রপের জবাব আর দেওয়া হইল না। জার্মান ও রুশ অতিথিরা তাড়াহুড়া করিয়া উইলহেলমস্ট্রাসির পররাষ্ট্র দপ্তরের ভূগর্ভনিম্ন আশ্রয়ের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। কিন্তু সেখানে পাতাল-পুরীর নিরাপদ আশ্রয়ে ঢুকিয়া হিটলারের জবরদস্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি হঠাৎ তাঁর পকেটে হাত দিয়া একটা খসড়া প্রস্তাবের কাগজ বাহির করিলেন এবং মলোটোভের নিকট গড়্ গড়্ করিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। রাত তখন ৯টা ৪০ মিঃ পার হইয়া গিয়াছে।

[চার্চিল তাঁর ইতিহাসে এই ঘটনা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ রসিকতার ভঙ্গিতে লিখিয়াছেন যে, বার্লিনে মলোটোভ ও জার্মান নেতাদের সাক্ষাৎকারের সংবাদ তাঁরা আগেই পাইয়াছিলেন। কিন্তু 'বৈঠকে যোগ দেওয়ার নিমন্ত্রণ' তাঁদের ছিল না। সুতরাং ঐ সময় তাঁরা বার্লিনে তাঁদের উপস্থিতি জানাইবার জন্য কয়েকখানা বম্বার পাঠাইয়াছিলেন।]

রিবেনট্রপ যে কাগজখানা মলোটোভের সামনে পড়িতেছিলেন, সেটা ছিল ত্রিপক্ষীয় চুক্তিকে (জার্মানী, জাপান ও ইতালীর মধ্যে ১৯৪০, ২৭শে সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত) সোভিয়েট রাশিয়াসহ চতুঃশক্তিতে পরিণত করার খসড়া প্রস্তাব। এই চুক্তির ২নং অনুচ্ছেদ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এতে চুক্তি স্বাক্ষরকারীদের পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা প্রভাবিত অঞ্চল হিসাবে ভাগবাঁটোয়ারা করার একটা 'গোপন পরিকল্পনা' ছিল। সেই গোপন প্রস্তাব অনুসারে—

জার্মানী ঘোষণা করিতেছে যে, যুদ্ধের পর শান্তি প্রতিষ্ঠার সময় ইউরোপীয় রাজ্যগুলির পুনর্বণ্টন ছাড়াও জার্মানীর ভূমিগত আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে হইবে মধ্য আফ্রিকার রাজ্যগুলিতে।

ইতালী ঘোষণা করিতেছে যে, ইউরোপীয় রাজ্যগুলির পুনর্বণ্টন ছাড়াও ইতালীর ভূমিগত আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে হইবে উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলিতে।

জাপান ঘোষণা করিতেছে যে, তার ভূমিগত আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলিতে এবং দ্বীপময় জাপান সাম্রাজ্যের দক্ষিণ দিকের অঞ্চলে।

সোভিয়েট রাশিয়া ঘোষণা করিতেছে যে, তার ভূমিগত আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সীমার দক্ষিণ দিকে ভারত মহাসাগর অভিমুখে।

চতুঃশক্তিবর্গ ঘোষণা করিতেছেন যে, প্রত্যেকটি সবিশেষ প্রশ্নের মীমাংসা সাপেক্ষে তাঁরা এই সমস্ত পারস্পরিক ভূমিগত আকাঙ্ক্ষার সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবেন এবং এগুলির পরিপূরণে তাঁরা বাধা দিবেন না।

বলা বাহুল্য যে, ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের এই চাতুর্যপূর্ণ প্রস্তাবের প্রলোভনে মলোটোভ ভুলিলেন না। হিটলার চাহিয়াছিলেন কৌশলে সোভিয়েট রাশিয়ার মনোযোগ ইউরোপ থেকে সরাইয়া দক্ষিণ দিকে সুদূর পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগরের দিকে ঠেলিয়া দিতে।

(কিন্তু আসলে এই সমস্তই ছিল ধাপ্পা। কারণ, রাশিয়া আক্রমণে হিটলার কৃতসংকল্প ছিলেন, কিন্তু সেই সমস্ত চক্রান্ত গোপন করার উদ্দেশ্যেই এই ধরনের প্রস্তাবিত চুক্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হইতেছিল।)

হিটলার ও রিবেনট্রপ এ ছাড়া আরও টোপ ফেলিয়াছিলেন। তাঁরা আভাস দিয়াছিলেন যে, ফ্যাসিস্ট ব্লকে যোগদান করিলে তাঁরা তুরস্ককে পশ্চিমের কোল থেকে ছিনাইয়া আনিতে এবং দার্দানেলিস প্রণালী সম্পর্কে রাশিয়ার অনুকূলে নূতন চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবেন। তাছাড়া জাপানের সঙ্গেও রাশিয়ার একটা মীমাংসা—অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং জাপান যাতে বহির্মঙ্গোলিয়ায় ও সিনকিয়াংয়ে সোভিয়েট প্রভাবাধীন এলাকা মানিয়া নিতে এবং কয়লা ও তৈল সম্পদে উন্নত শাখালিন দ্বীপ সম্পর্কে একটা মীমাংসা মানিয়া লইতে বাধ্য হয় জার্মানী সেই ব্যবস্থাও করিবে।

কিন্তু এই সমস্ত বাহারি প্রস্তাবেও মলোটোভের কঠিন হৃদয় গলিল না। তিনি সোভিয়েট স্বার্থের পক্ষ থেকে বার বার বুলগেরিয়া, তুরস্ক, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের প্রশ্ন পর্যন্ত তুলিলেন। অর্থাৎ বলকান অঞ্চলের সমস্যার উপর জোর দিলেন। এমন কি পোল্যান্ডের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলিলেন—জার্মানী পোল্যান্ডকে নিয়া কি

করিতে চায় ? অধিকন্তু সুইডেনের নিরপেক্ষতা এবং বাল্টিক সমুদ্রে রাশিয়ার প্রবেশের প্রশ্নও তুলিলেন।

তখন রিবেনট্রপ অভিযোগের সুরে বলিলেন, তাঁকে যেন বড্ড বেশী প্রশ্ন তুলিয়া জেরবার করা হইতেছে। সুতরাং তিনি পুনরায় আলোচ্য সূচীর উপর মলোটোভের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন যে, তিনি বার বার এই চূড়ান্ত প্রশ্নটিই তুলিয়া ধরিতে চান যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের কারবার গুটাইয়া ফেলার ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়া অংশ গ্রহণ করিতে ও অক্ষশক্তিবর্গের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছে কিনা ?

কিন্তু হিটলারের মত রিবেনট্রপকেও হতাশ হইতে হইল এবং যখন রিবেনট্রপ বার বার জোর দিয়া বলিতে লাগিলেন যে, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জার্মানী ইতিপূর্বেই জয়লাভ করিয়াছে, তখন মলোটোভ তাঁকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে হিটলার কিন্তু বলিয়াছিলেন যে, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানী 'জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে' লিপ্ত আছে। তা যদি সত্য হয়, তাহলে কি আমি ধরে নেব যে, একথার অর্থ হলো জার্মানী তার 'জীবনের' জন্য, আর ইংল্যাণ্ড তার 'মৃত্যুর' জন্য লড়াই করছে ?'

এই তীব্র শ্লেষ রিবেনট্রপের নীরেট মস্তিষ্কে ঢুকিল কিনা, ঈশ্বর জানেন। এবং তার পরেও ঘুঘু বলশেভিক ডিপ্লোম্যাট যা বলিলেন, তা আরও মর্মান্তিক এবং ঐতিহাসিক।

চার্চিলের বইতে সেই বর্ণনা পাওয়া যায়। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে চার্চিল যখন মস্কোতে গিয়াছিলেন, তখন কথা প্রসঙ্গে স্ট্যালিন তাঁকে বার্লিনের সেই ঘটনার কথা বলেন। "সাইরেন বেজে ওঠার পর রিবেনট্রপ আগে আগে পথ দেখিয়ে চললেন এবং অনেকগুলি সিঁড়ি বেয়ে গভীর নীচে সুসজ্জিত আশ্রয়স্থলে গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে ঢোকার পরেই বিমান আক্রমণ শুরু হলো। রিবেনট্রপ তখন নিজেই দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং মলোটোভকে বললেন, 'আমরা দুজনে এখানে এখন একাকী আছি, আসুন আমরা দুজনে (বৃটিশ সাম্রাজ্য) ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেই না কেন ?' মলোটোভ উত্তর দিলেন—'কিন্তু ইংল্যাণ্ড কি বলবে ?' রিবেনট্রপ বললেন—'ইংল্যাণ্ড ? সে খতম হয়ে গেছে। শক্তি হিসাবে তার আর দাম নেই।'

তখন মলোটোভ জবাব দিলেন—

"If that is so, why are we in the shelter, and whose are these bombs which fall ?

—অর্থাৎ যদি একথা সত্য হয়, তবে, আমরা এই ভূগর্ভের শেল্টারে আশ্রয় নিয়েছি কেন এবং কাদের বোমাই বা পড়ছে ?"[১]

এভাবে বার্লিনের বিমান আক্রমণ নিরোধক ভূগর্ভে মলোটোভ ও রিবেনট্রপের মধ্যে ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসের সেই বিখ্যাত সাক্ষাৎকার ও আলোচনার অবসান ঘটে। এই সাক্ষাৎকার ইতিহাসে সবিশেষ স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কারণ, এর পরে ইতিহাসের চাকা আরও দ্রুত ঘুরিতে থাকে এবং সেই চাকার গতি ছিল পূর্ব দিকে।...

হিটলার-রিবেনট্রপ চতুঃশক্তির প্রস্তাবিত চুক্তিতে রাশিয়াকে দলে ভিড়াইবার জন্য যত চালবাজিই করিয়া থাকুন না কেন, বলা বাহুল্য যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে তাতে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। অথচ কৌশলের খাতিরে সেই সময় হিটলারী জার্মানীকে

১। শাইবার প্রণীত দি রাইজ অ্যাণ্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ, ৯৬২-৯৬৮ এ্যালান বুলক প্রণীত হিটলার, পৃঃ ৬১৮-৬২১।

একেবারে হাতছাড়া করাও বুদ্ধিসম্মত ছিল না। এজন্য সোভিয়েট সরকার ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪০, চতুঃশক্তি প্রস্তাবের সঙ্গে অতিরিক্ত কতকগুলি পাল্টা প্রস্তাবের খসড়া বার্লিনে পাঠাইলেন। যেমন—

(১) ফিনল্যাণ্ড থেকে অবিলম্বে জার্মান সৈন্য সরাইয়া আনিতে হইবে। কারণ, ১৯৩৯ সালের রুশ-জার্মান চুক্তি অনুসারে ফিনল্যাণ্ড সোভিয়েট প্রভাবিত এলাকার অধীন।

(২) সোভিয়েট ইউনিয়নের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য বুলগেরিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

(৩) বসফোরাসের ও দার্দানেলিসের জলপথের সীমানার মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী লীজের দ্বারা রাশিয়াকে একটি নৌঘাঁটি ও স্থলসৈন্যের ঘাঁটি স্থাপন করিতে দিতে হইবে।

(৪) বাকু ও বাটুমের দক্ষিণ দিকে পারস্য উপসাগর অভিমুখে সোভিয়েটের 'আকাঙ্ক্ষিত এলাকা' বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। এবং

(৫) উত্তর শাখালিন দ্বীপে কয়লা ও পেট্রোল খনিতে জাপানের সুবিধাজনক অধিকার বা কনসেসন পরিত্যাগ করিতে হইবে।

একথা উল্লেখ করা বোধহয় অনাবশ্যক যে, এমন ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হিটলারের পক্ষে গ্রহণ বা বিবেচনা করাও সম্ভব ছিল না। সুতরাং সোভিয়েটের এই সমস্ত পাল্টা প্রস্তাবের কোন জবাব বার্লিন থেকে পাওয়া গেল না। বরং তাঁর শীর্ষস্থানীয় সামরিক নেতাদের নিকট হিটলার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে মন্তব্য করিলেন—'স্ট্যালিন খুব চালাক এবং ধূর্ত। তাঁর দাবীর বহর ক্রমেই বাড়ছে। তিনি ঠাণ্ডা মাথায় ব্ল্যাকমেইল করতে চান। জার্মানীর জয় রাশিয়ার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে। সুতরাং যতশীঘ্র সম্ভব তাকে নতজানু করতেই হবে!'

বার্লিনে মলোটোভের সঙ্গে ব্যর্থ আলোচনা এবং তারপর রাশিয়ার কাছ থেকে পাল্টা প্রস্তাব—এই সমস্ত ঘটনায় ইতিহাসের মোড় ক্রমেই ঘুরিয়া গেল। ফিনল্যাণ্ডে এবং বলকান রাজ্যগুলিতে হিটলারী জার্মানীর প্রবেশ ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া যে আপত্তি জানাইল, রাশিয়া আক্রমণের পর হিটলার সেগুলিই রাশিয়ার বিরুদ্ধে অজুহাত হিসাবে প্রচার করিলেন এবং এই মিথ্যা অভিযোগ খাড়া করা হইল যে, সুইডেন থেকে লৌহ ধাতু এবং রুমানিয়া থেকে পেট্রোল সরবরাহে বাধা দেওয়াই রাশিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

তবে, চার্চিলসহ অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিক একটি বিষয়ে একমত যে, নভেম্বর মাসে বার্লিনে মলোটোভের সঙ্গে আলোচনার ব্যর্থতার পরেই হিটলার সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজন্য মার্কিন সচিব ও কূটনীতিক মিঃ জেমস এফ বার্নেস ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত তাঁর এক পুস্তকে হিটলারের সঙ্গে আলোচনায় মলোটোভের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বুলগেরিয়ার প্রশ্নে রাশিয়ার গ্যারেণ্টি দানের প্রস্তাবেই হিটলার বিগড়াইয়া যান এবং এই প্রশ্নটিতেই মলোটোভ 'সবচেয়ে গুরুতর ভুল' করিয়াছিলেন। কারণ, এই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জবাব দেওয়ার জন্য তিনি হিটলারকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন—জার্মান দোভাষীর ভাষ্য অনুসারে হিটলারের মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছিল। বার্নেসের

সুনির্দিষ্ট অভিমত এই যে, ১৩ই নভেম্বর তারিখটি হইতেছে চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণের তারিখ এবং এই দিন থেকেই রুশ-জার্মান সম্পর্কের অবনতি ঘটিতে থাকে। ঐ তারিখ থেকেই যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া যায় এবং ইতিহাসের এটি একটি চূড়ান্ত প্রশ্ন।[১]

কিন্তু ওই আলোচনার সরকারী (জার্মান পক্ষের) বিবরণীতে এমন প্রমাণ নাই যে, মলোটোভ হিটলারের কাছে বুলগেরিয়া সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট জবাব চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি যুদ্ধ বাধাইতে কৃতসংকল্প, তাঁর পক্ষে কি নূতন কোন ছুতার দরকার আছে ? তবে একথা সত্য যে, বার্লিনে হিটলার-মলোটোভ ব্যর্থ আলোচনার পরেই হিটলার ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৪০ সেই ইতিহাস বিখ্যাত 'অপারেশন বারবারোসা' জারী করেন এবং ১৫ই মে'র মধ্যে আক্রমণের আয়োজন সম্পূর্ণ করার হুকুম দেন।

কিন্তু হিটলারের হুকুমনামা অনুসারে প্রস্তাবিত মে মাসে (১৯৪১) রাশিয়া আক্রমণ সম্ভব হইল না। কারণ, আফ্রিকায় মুসোলিনীর বিপর্যয় এবং তারপর বলকান রাজ্যগুলিতে হিটলারী অভিযান ও ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতিতে অক্ষশক্তির ব্যর্থতা—এই সমস্ত কারণে, ১৯৪১ সালের বসন্তকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল।

* * *

নাৎসী রণনেতাদের নিকট স্ট্যালিনকে 'ব্ল্যাকমেইলার' বলিয়া হিটলার যেদিন গালাগালি দিলেন, তার ১০ দিন পরে মুসোলিনী ও হিটলারের মধ্যে সাক্ষাৎ হইল বার্গহোফে—বার্সেটসগাডেনের উত্তরে এই পার্বত্য নিবাস তখন বরফে আচ্ছন্ন। কিন্তু হিটলার এই ঠাণ্ডা পার্বত্য হাওয়ায় তাঁর সামরিক পাত্রমিত্রদের নিয়া দুই দিন যাবৎ বৈঠক করিতেছিলেন (৮ই-৯ই জানুয়ারী ১৯৪১) এবং ইউরোপ, আফ্রিকা ও তাবৎ দুনিয়ার রণনৈতিক অবস্থা নিয়া ভারীক্ক চালে পর্যালোচনা করিতেছিলেন। আফ্রিকা ও মুসোলিনী প্রসঙ্গে হিটলার বলিলেন—উত্তর আফ্রিকায় এই শোচনীয় পরাজয় থেকে ইতালীকে বাঁচাইতেই হইবে। এটা অক্ষশক্তিবর্গের দারুণ প্রেস্টিজের প্রশ্ন। সুতরাং সাহায্য দিতেই হইবে। কিন্তু সেই সঙ্গে হিটলার সতর্ক করিয়া দিলেন যে, তাঁর এই পরিকল্পনার কথা ইতালীর রাজ পরিবার যেন টের না পান। কারণ, তাঁরা বৃটেনকে এই সব কথা ফাঁস করিয়া দিতে পারেন ! (এর পর উত্তর আফ্রিকায় রোমেলের অভিযান শুরু হইয়াছিল।)

১৯৷২০ জানুয়ারী মুসোলিনী আহূত হইলেন বার্গহোফে হিটলারের দরবারে। কিন্তু মিশরে ও গ্রীসে ইতালীর বিপর্যয়ের জন্য মুসোলিনী একেবারে 'মরমে মরিয়া' ছিলেন। হিটলারের কাছে মুখ দেখাইতে তিনি ভয় পাইতেছিলেন এবং ট্রেনে চাপিতে গিয়া তিনি অতিশয় নার্ভাস বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরম সৌভাগ্য এই যে, হিটলার তাঁকে খোশ মেজাজে ও বহাল তবিয়তে গ্রহণ করিলেন এবং পরম দোস্তের মত তাঁকে গ্রীস, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা ইত্যাদির রণনৈতিক ও সামরিক অবস্থার কথা একজন বিশেষজ্ঞের ভঙ্গী নিয়া বুঝাইয়া দিলেন। যদিও দুই ঘণ্টাব্যাপী এই সমস্ত আলোচনার সময় হিটলারকে তীব্র সোভিয়েটবিদ্বেষী বলিয়া মুসোলিনীর মনে হইল, তথাপি তিনি তাঁর এই পরম মিত্রকে বিশ্বাস করিয়া আসন্ন রাশিয়া আক্রমণ সম্পর্কে 'অপারেশন বারবারোসা'র কথা একটুও ফাঁস করিলেন না।

১। The Cold War—D. F. Fleming. Vol I, P. 124.

এমন কি অক্ষশক্তিবর্গের আর এক মিত্র জাপানকে হিটলার এই সম্পর্কে কোন স্পষ্ট আভাস দিলেন না, যদিও স্বয়ং জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাৎসুয়োকা বার্লিনে আসিয়াছিলেন কুটনৈতিক অতিথিরূপে মার্চ মাসে।

মাৎসুয়োকার দৌত্য

যুদ্ধজ্বরাক্রান্ত ইউরোপের সুযোগ নেওয়ার জন্য দূরপ্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিমান রাষ্ট্র জাপান অপেক্ষায় ছিল। এজন্য স্বচক্ষে ইউরোপীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে জাপানের পররাষ্টমন্ত্রী ইয়ুসুকে মাৎসুয়োকা প্রেরিত হইলেন মস্কো, বার্লিন ও রোম পরিদর্শনের জন্য। মাৎসুয়োকা যদিও আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ভীষণ মার্কিনবিদ্বেষী ছিলেন। অপরপক্ষে তিনি জার্মানী ও হিটলারের ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১২ই মার্চ ১৯৪১ তিনি টোকিও থেকে রওনা হইলেন এবং সাইবেরিয়া হইয়া ২৫শে মার্চ মস্কো অতিক্রম করিবার সময় তাঁর সঙ্গে স্ট্যালিন ও মলোটোভের দু ঘণ্টার জন্য সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই সাক্ষাৎকারের সময় মাৎসুয়োকা স্ট্যালিনকে বলিয়াছিলেন যে, জাপানীরা 'মর‍্যাল কমিউনিজমে' বা নৈতিক সাম্যবাদে বিশ্বাস করে। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কমিউনিজমে বিশ্বাস করে না এবং তিনি স্ট্যালিনকে আরও বলিয়াছিলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনের পর জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ দূর হইয়া যাইবে।...

২৬শে মার্চ মাৎসুয়োকা যখন বার্লিনে পেঁাছিলেন, তখন হিটলার বলকান রাজ্যগুলি গ্রাস করা নিয়া ব্যস্ত ছিলেন। ঐদিন সকালে এজন্য হিটলারের বদলে রিবেনট্রপের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হইল এবং জার্মান পররাষ্টমন্ত্রী গ্রামোফোন রেকর্ডের মত নাৎসী ডিক্টেটরের দম্ভোক্তিগুলি মাৎসুয়োকার নিকট পুনরাবৃত্তি করিয়া গেলেন, যেমন—ইতিমধ্যেই অক্ষশক্তিবর্গ যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে, বৃটেনের আর কোন আশা নাই। অতএব জাপানের উচিত অতি দ্রুত আঘাত হানিয়া সিঙ্গাপুর দখল করিয়া নেওয়া। সেই অবস্থায় আমেরিকা দূরবর্তী জাপানী সমুদ্রে নৌবহর পাঠাইবার সাহস পাইবে না। আর সোভিয়েট রাশিয়ার কথা উল্লেখ করিয়া রিবেনট্রপ বলিলেন যে, রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক খুব বন্ধুত্বপূর্ণ না হইলেও 'যথার্থ সম্পর্ক' (কারেক্ট রিলেসন্স) আছে। আর রাশিয়া যদি জার্মানীকে আক্রমণের ভয় দেখায়, তবে ফুয়ার নিশ্চিত যে, কয়েক মাসের মধ্যেই রাশিয়ার আর চিহ্নমাত্র থাকিবে না!

এই মন্তব্যে মাৎসুয়োকার মুখে কিছুটা উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দিলে রিবেনট্রপ তাড়াতাড়ি যেন ভ্রম সংশোধনের উদ্দেশ্যে জুড়িয়া দিলেন—'না, না, স্ট্যালিন এমন নির্বোধ নীতি অনুসরণ করিবেন না!'

ঐদিন অপরাহ্নে হিটলারের সঙ্গে মাৎসুয়োকার সাক্ষাৎ হইল এবং হিটলারও যথারীতি সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন—নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন তৃণ ধরিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করে, বৃটেনও এখন তেমনি রাশিয়া এবং আমেরিকাকে আশ্রয় করিতে চাহিতেছে।

হিটলার জাপানী দূতের সঙ্গে কথাবার্তায় রাশিয়ার সম্পর্কে রিবেনট্রপের তুলনায়

অনেক বেশী সতর্ক ছিলেন। সুতরাং বলিলেন—রাশিয়ার দিক থেকে যুদ্ধের কোন আশঙ্কা নাই। আর তাছাড়া জার্মানীর ১৬০ থেকে ১৭০ ডিভিসন সৈন্য আছে আত্মরক্ষার জন্য। আর আমেরিকা? —তাকে হয় ইংল্যাণ্ডের সাহায্যে আসিতে হইবে এবং সেই অবস্থায় সে নিজে সশস্ত্র হইতে পারিবে না। অথবা ইংল্যাণ্ডকে ত্যাগ করিতে হইবে, সেই অবস্থায় ইংল্যাণ্ড মারা পড়িবে এবং আমেরিকাকে তিনটি বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে একক লড়াই করিতে হইবে। কিন্তু আমেরিকার পক্ষে অন্য কোন ফ্রণ্টে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়।

সুতরাং হিটলারের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জাপানের আঘাত হানার সুযোগ আসিয়াছে।

"Therefore, the Fuehrer concluded, 'never in the human imagination, could there be a better opportunity for the Japanese to strike in the Pacific than now. 'Such a moment'…would never return. It was unique in history".[১]

সোজা কথায় মানুষের কল্পনায় জাপানের পক্ষে প্রশান্ত মহাসাগরে এমন সুযোগ আর আসে নাই। এমন সুযোগ আর কখনও আসিবে না, ইতিহাসে এই সুযোগ অভুতপূর্ব।

মাৎসুয়োকা হিটলারের এই বিবৃতির সঙ্গে একমত হইলেন বটে, তবে, তাঁকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, জাপানী সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে কথা দেওয়ার এক্তিয়ার তাঁর নাই। কিন্তু মাৎসুয়োকা ইতিমধ্যে রোমে গিয়া মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করিয়া ৪ঠা এপ্রিল ফিরিয়া আসিলে হিটলার তাঁর দ্বিতীয় বারের সাক্ষাতে 'গায়ে পড়িয়া' কথা দিলেন যে, জাপান ও আমেরিকার মধ্যে সংঘর্ষ বাধিলে জার্মানী অবিলম্বেই অংশ গ্রহণ করিবে। অথচ রাশিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন পরিকল্পিত আক্রমণ সম্পর্কে হিটলার মাৎসুয়োকাকে কিছুই আভাস দিলেন না।

অপর পক্ষে মাৎসুয়োকা যখন রিবেনট্রপকে বলিয়াছিলেন যে, বার্লিনে আসার পথে মস্কোতে তিনি স্ট্যালিনের সঙ্গে রুশ-জাপান অনাক্রমণ চুক্তির একটা প্রস্তাব দিয়াছিলেন, তখন রিবেনট্রপের মাথায় এর তাৎপর্য ঢুকিল না। কিম্বা টোকিওতে প্রত্যাবর্তন পথে মস্কোতে অবতরণ করিয়া যখন মাৎসুয়োকা সত্যসত্যই রুশ-জাপান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪১ তারিখে এবং সেই চুক্তিতে যখন স্পষ্টরূপে ঘোষিত হইল যে, চুক্তি স্বাক্ষরকারীরা অপরের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িলে তারা পরস্পর নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবে, তখন হিটলার পর্যন্ত এর গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন না—অথচ হিটলার কুটনীতি ও রণনীতিতে নিজেকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলিয়া মনে করিতেন!

হিটলার তাঁর দাম্ভিকতায় ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালের মধ্যেই সোভিয়েট রাশিয়া নাৎসী আক্রমণে ধরাশায়ী হইবে। সুতরাং এত বড় যুদ্ধজয়ের গৌরবের সঙ্গে তিনি জাপানকে নিতে চান না এবং এজন্যই রুশ-জাপান নিরপেক্ষতার

১। যুদ্ধের পর ধৃত জাপানী কূটনৈতিক দলিলপত্র থেকে এ্যালান বুলক ও উইলিয়াম শাইরারের (১০৪৫ পৃঃ) উদ্ধৃতি।

চুক্তিতে তিনি আপত্তি করেন নাই ! অর্থাৎ তিনি জাপানের সঙ্গে একযোগে রাশিয়া আক্রমণে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। অথচ বিস্ময়ের কথা এই যে, রাশিয়া আক্রমণের ৬ দিন পরেই ২৮ শে জুন, ১৯৪১, রিবেনট্রপ টোকিওস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূতকে তাগিদ দিলেন যে, জাপান যেন রাশিয়াকে পিছন থেকে আক্রমণ করে। ১০ই জুলাই তিনি পুনরায় টোকিওতে তাগিদ দিলেন। ২৬শে আগস্ট হিটলার রেইডারকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁর নিশ্চিত ধারণা জাপান রাশিয়াকে ভ্লাডিভোস্টকে আক্রমণ করিবে। কিন্তু জাপানী মন্ত্রিসভা এমন সুযোগের দিকেও আকৃষ্ট হইল না। বরং 'আগুনখেকো' মাৎসুয়োকাই ১৬ই জুলাই পদত্যাগ করিলেন।

ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেলওয়েযোগে জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাৎসুয়োকা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে মস্কোতে সাতদিন অবস্থান করিলেন এবং স্ট্যালিন ও মলোটোভের সঙ্গে কয়েকবার দীর্ঘ সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিলেন। ইতিমধ্যে মস্কোস্থিত বৃটিশ রাজদূত স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসের মারফত মাৎসুয়োকা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের কাছ থেকে একটি তারবার্তা পাইয়াছিলেন যাতে ধুরন্ধর চার্চিল তথ্যের দ্বারা জাপানী কূটনীতিককে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত জার্মানীর যুদ্ধ জয়ের কোন আশা নাই।

চার্চিলের অনুমান এই যে, জাপানও ইউরোপীয় যুদ্ধের পরিণতি দেখার জন্য অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিয়াছিল এবং এজন্যই ১৩ই এপ্রিল বেলা ২টায় মাৎসুয়োকা 'জাপান-সোভিয়েট নিরপেক্ষতার চুক্তি' স্বাক্ষর করিলেন এবং মস্কোস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূতকে ভরসা দিলেন যে, এই নিরপেক্ষতার চুক্তির দ্বারা ত্রিশক্তির (জাপান জার্মান, ইতালী) চুক্তির উপর কোন প্রতিক্রিয়া ঘটিবে না।

কিন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর জাপানী কূটনীতিকের বিদায় উপলক্ষে মস্কো রেলস্টেশনে যে নাটকীয় দৃশ্যের উদ্ঘাটন হইল ইতিহাসে তা উল্লেখযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। জার্মান রাষ্ট্রদূত কাউন্ট সুলেনবুর্গ স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বর্ণনা থেকেই জানা যায় যে, স্বয়ং স্ট্যালিন ও মলোটোভ স্টেশনে আসিয়া হাজির হইলেন, এত সব আড়ম্বর ও আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ঘটিল যে, ট্রেন ছাড়িতে একঘণ্টা বিলম্ব হইয়া গেল। অবশ্য এত কাণ্ডকীর্তনের জন্য জার্মান ও জাপানী প্রতিনিধিরা প্রস্তুত ছিলেন না। স্ট্যালিন দারুণ খোশ মেজাজে ছিলেন এবং মাৎসুয়োকা ও জাপানীদের প্রতি বন্ধুতার প্রবল উচ্ছ্বাস দেখাইলেন এবং কামনা করিলেন তাঁর যাত্রা যেন শুভ হয়। আর জার্মান রাষ্ট্রদূতকে দেখিতে পাইয়া তাঁর নিকট সোৎসাহে আগাইয়া গেলেন এবং তাঁর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ভাবাবেগে বলিয়া উঠিলেন—

'We must remain friends. You must now do everything to that end.

(আমরা অবশ্যই পরস্পর বন্ধু থাকিব এবং আপনি অবশ্যই এই বন্ধুত্ব বজায় রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।)

ব্যাপারটার এখানেই শেষ নয়। জার্মান দূতাবাসের মিলিটারী এ্যাটাশে কর্নেল

ক্রেব্‌সও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্ট্যালিন তাঁকেও বন্ধুর মত পাকড়াও করিলেন এবং বলিলেন—

'We will remain friends with you in any event'

(যাই ঘটুক না কেন আমরা ও আপনারা বন্ধু থাকবোই।)

জার্মান দূত মন্তব্য করিয়াছেন যে, স্ট্যালিন ইচ্ছা করিয়াই স্টেশনে এই অভিনন্দন দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিলেন এবং উপস্থিত বহু জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।[১]

অর্থাৎ এটা ছিল এক ধরনের অভিনয়—অক্ষশক্তিবর্গের সঙ্গে স্ট্যালিনের কূটনৈতিক অভিনয়। জার্মানীর সন্দেহ উদ্রিক্ত না করার জন্য এবং হিটলারী আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য সোভিয়েট নায়ক চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু হিটলার অনেকদিন আগেই আক্রমণের দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলেন। তবে সৌভাগ্যক্রমে অক্ষশক্তিবর্গের মিত্রতা সত্ত্বেও হিটলারের দাম্ভিকতা ও দূরদৃষ্টিহীনতা কূটনৈতিক সাফল্য অর্জন করিতে পারিল না—স্পেন, ইতালী, ভিসি-ফ্রান্স এবং জাপান হিটলারী নির্দিষ্ট পথে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী চলিল না বা চলিতে পারিল না। এর অন্যতম কারণ এই ছিল যে, হিটলার রাজনীতি ক্ষেত্রে কাউকে বিশ্বাস করিতেন না। 'ট্রাস্ট্ নোবডি'—এই ছিল তাঁর মূল মন্ত্র। বার্লিনে তাঁর দুই বিখ্যাত কূটনীতিক অতিথির সঙ্গে আলোচনায়ও হিটলারের ধূর্ততা, কপটতা এবং বিশ্বাসহীনতার বারবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

বার্লিনে মলোটোভের সঙ্গে হিটলার-রিবেনট্রপের আলোচনার বিষয় নিয়া সোভিয়েট বিদ্বেষীরা এই মর্মে চাতুর্যপূর্ণ প্রচারকার্য চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, রাশিয়া ত্রিশক্তির—জার্মানী, জাপান ও ইতালীর সঙ্গে চুক্তিতে যোগ দিয়া স্ব স্ব স্বার্থ ও উচ্চাশা অনুসারে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ ভাগবাঁটোয়ারা করাইতে সম্মত ছিলেন। কিন্তু জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার দর কষাকষিতে বনে নাই বলিয়াই মস্কো শেষ পর্যন্ত পিছাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এটি নিতান্তই অপপ্রচার ও সত্যের বিকৃতি মাত্র। কারণ, সোভিয়েট প্রতিনিধি মলোটোভ কখনও সেই নভেম্বর মাসের আলোচনায় জার্মানীর কোন প্রস্তাবেই সম্মতি কিম্বা কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর দেন নাই। তিনি কৌশলে সব এড়াইয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্র কখনও এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদী-সুলভ ভাগবাঁটোয়ারার প্রস্তাবে রাজী হইতে পারে না।

১৯৬৯ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত 'সোভিয়েট পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাস' পুস্তকে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে, ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে বার্লিনে জার্মানীর উপস্থাপিত ঐ সমস্ত প্রস্তাব মলোটোভ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল এবং ঐ প্রস্তাবগুলিকে সোভিয়েট পুস্তকে 'পারফিডিয়াস প্রোপোজাল' বা 'বিশ্বাসঘাতকতার প্রস্তাব' বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে।

১৯৭০ সালে প্রকাশিত বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত মস্কোর আর একটি পুস্তকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নিউইয়র্কের একটি বৃটিশ গোয়েন্দাচক্রের কার্যাবলী উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে, স্যানফ্রান্সিস্কোর জার্মান কন্সাল ফ্রিজ উইডম্যান বৃটিশ

১। চার্চিল—তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৯—১৭০

সরকারের জনৈক প্রতিনিধি উইলিয়াম ওয়াইজম্যানকে বলিয়াছিলেন যে, মলোটোভের বার্লিন আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ, উইজম্যানের মতে মলোটোভকে স্ট্যালিন নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, 'সর্বকিছু আলোচনা করিবে, কিন্তু কোন কিছুতেই রাজী হইবে না।'

এমন কি মার্কিন ঐতিহাসিক জন এল স্নেলও স্বীকার করিয়াছেন যে, 'হিটলার মলোটোভকে কিনিয়া নিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন।'[১]

১। British Foreign Policy during World War II—by V. Trukhanovsky, Moscow 1970, P. 140.

পঞ্চম অধ্যায়

বৃটেনে এক বিচিত্র আগন্তুক

অহেসের আবির্ভাব রহস্য ঘণীভূত

হিটলার কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে এমন একটা তাজ্জব ব্যাপার ঘটিল যে, দুনিয়ার বিভিন্ন রাজধানীতে একটা প্রকাণ্ড হৈচৈ পড়িয়া গেল। আকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাবের মত বৃটেনের আকাশেও একটা নাৎসী ধূমকেতুর পুচ্ছ দেখা গেল ১০ই মে, ১৯৪১ রাত্রিবেলা। ভারতীয় হিন্দুমতে ধূমকেতুর আবির্ভাব অমঙ্গলের পরিচায়ক। এই ঘটনাটাও যেন সেই অমঙ্গলেরই বার্তাবাহী ছিল। চার্চিলের বর্ণনা দিয়াই এই ঘটনার শুরু করা যাউক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সারা সপ্তাহব্যাপী প্রচণ্ড খাটুনির পর প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল নিয়মিতভাবেই বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন সপ্তাহ শেষে। অর্থাৎ উইক-এণ্ডের কর্মবিরতি তাঁর ঘটিত লণ্ডনের বাইরে পল্লীভবনে। মহাযুদ্ধের অবর্ণনীয় চাপ ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও এর বড় একটা ব্যতিক্রম ঘটিত না। তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে তিনি লিখিয়াছেন ঃ

'১১ই মে রবিবার আমি ডির্চলিতে আমার সপ্তাহান্তিক বিশ্রাম ভোগ করছিলাম। আগের রাত্রে লণ্ডনে যে প্রচণ্ড বোমা বর্ষিত হয়েছিল, সন্ধ্যাবেলা সেই খবরগুলি আসছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে আমার কিছু করার ছিল না। অতএব আমার হোস্ট (আমন্ত্রক) আমার জন্য যে সিনেমা দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন, আমি ম্যাক্স ব্রাদার্সের সেই হাসির ছবি (কমিক ফিল্ম) দেখছিলাম। ফিল্ম দেখার অবসরে আমি দু'বার বাইরে গিয়ে বোমা বর্ষণের ক্ষয়ক্ষতির খবর নিচ্ছিলাম। এই ব্যঙ্গ বা হাসির ছবি দেখে আমার ভালোই লাগছিল এবং এই চিত্তবিনোদনের জন্য আমি বেশ খুশিই ছিলাম। এমন সময় একজন সেক্রেটারি এসে আমায় বললেন যে, ডিউক অব হ্যামিলটনের পক্ষ থেকে কে একজন আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চান। অবশ্য ডিউক আমার একজন ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন এবং তিনি এই সময় পূর্ব স্কটল্যাণ্ডে একটা জঙ্গী বিমানঘাঁটি পরিচালনায় ছিলেন। কিন্তু এই সময় আমার সঙ্গে তাঁর এমন কি কাজ থাকতে পারে, যে কাজের জন্য কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না? যা'হোক, যিনি টেলিফোনে ডাকছিলেন তিনি আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য জোর তাগিদ দিচ্ছিলেন, কারণ ব্যাপারটা নাকি ক্যাবিনেট পর্যায়ের জরুরী। আমি তখন মিঃ ব্রাকেনকে বললুম ব্যাপারটি কি শুনবার জন্য। কয়েক মিনিট পর মিঃ ব্রাকেন এসে বললেন যে, ডিউক তাঁকে বলেছেন যে, এক ভয়ানক রকমের অদ্ভুত খবর দেওয়ার আছে। আমি তখন ডিউককে আসতে বললুম। তিনি এসে আমাকে বললেন যে, একজন জার্মান বন্দীর সঙ্গে তাঁর একাকী সাক্ষাৎ হয়েছে এবং সে বন্দী বলছে যে, সে হচ্ছে রুডলফ হেস। 'স্কটল্যাণ্ডে হেস'! আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ভয়ানক আজগুবী। কিন্তু ব্যাপারটা সত্য···।

'হেসের এই পলায়নের উপর আমি নিজে তেমন কিছু গুরুত্ব আরোপ করিনি। কারণ, চলতি ঘটনার সঙ্গে এই ব্যাপারের খুব যোগ ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে

বৃটেনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, রাশিয়াতে এবং সর্বোপরি জার্মানীতে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হলো এবং এই নিয়ে রাশি রাশি বইও লেখা হয়েছিল।…'

চার্চিল তাঁকে আটক বন্দী রাখার আদেশ দিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে বিবৃতি নেওয়ার ব্যবস্থাও হইল। বৃটেনে হেসের আকস্মিক আবির্ভাবে চার্চিলের এই প্রতিক্রিয়া। কিন্তু তখন খোদ জার্মানীতে হিটলারের অবস্থা কি ?

হিটলার তখন (মে মাসের গোড়ায়) সোভিয়েট রাশিয়াকে ধ্বংস করিবার জন্য তাঁর পাত্রমিত্রসহ বিস্তৃত প্ল্যান ফাঁদিছিলেন। সামরিক নেতারা, সেনাপতিরা, স্টেট সেক্রেটারিরা এবং অন্যান্য হোমরাচোমরা নাৎসী নেতারা রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ লোককে সাবাড় করার, না খাইয়ে মারার এবং সোজাসুজি হত্যা করার আসুরিক ও হিংস্র পরিকল্পনা ঠিক করিতেছিলেন। ৩০শে এপ্রিল, হিটলার স্থির করিয়াছিলেন ২২শে জুন রাশিয়া আক্রমণ করা হইবে। ৪ঠা মে রাইখস্ট্যাগে (পার্লামেন্টে) হিটলার তাঁর 'বিজয় বক্তৃতা' দিলেন এবং তারপর হৃষ্টচিত্তে তিনি প্রস্থান করিলেন তাঁর মনোরম শৈলাবাস বার্গহোফে (বিখ্যাত বার্সেটসগার্ডেনের উপরে)। সেখান থেকে আলপাইন পর্বতের তুষারশুভ্র মহিমা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তখনও শৃঙ্গগুলি বসন্তকালের বরফে আচ্ছন্ন ছিল। এই মনোরম পরিবেশে বিশ্রাম সুখভোগ করিতে করিতে হিটলার পৃথিবীর বৃহত্তম জয় সম্পর্কে আরও গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ পাইলেন।

এমন সময় ১০ই মে, ১৯৪১, শনিবার রাত্রিবেলা তিনি আচম্বিতে এমন এক অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত খবর পাইলেন যাতে তাঁর হাড়শুদ্ধ কাঁপিয়া গেল। কেবল তাঁর একার নয়, সারা পশ্চিমী জগতেই যেন এক নিদারুণ কম্পজ্বর বহিয়া গেল। হিটলার ভাবিতেই পারিলেন না যে, যে ব্যক্তি তাঁর ঘনিষ্ঠতম এবং ব্যক্তিগত বিশ্বস্ততম সহযোগীদের অন্যতম ছিল, যে লোকটা নাৎসী পার্টির ডেপুটি লীডার ছিল এবং গোয়েরিংয়ের পরেই যার হিটলারের শূন্যপদে অভিষিক্ত হওয়ার কথা, ১৯২১ সাল থেকে যে লোক হিটলারের প্রতি অন্ধ ভক্তিতে ও একগুঁয়েমীতে চূড়ান্ত করিয়া আসিয়াছে এবং রোয়েমের হত্যাকাণ্ডের পর যে ব্যক্তি ফুরারের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিল, সে—সেই রুডলফ্ হেস কিনা এরোপ্লেনে উড়িয়া গিয়া একেবারে শত্রুর সঙ্গে সলাপরামর্শ শুরু করিয়া দিয়াছে।…হিটলার যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। হেস মেসারস্মিট-১১০ ফাইটার প্লেনে চড়িয়া স্কটল্যাণ্ডে চলিয়া গিয়াছে। এই খবর বার্গহোফের শৈলাবাসের উপর যেন বোমা বিস্ফোরণ ঘটাইল এবং সেই বোমার টুকরায় খোদ হিটলার যেন আহত হইলেন! ফুরার একটা আঙুল কপালের উপর রাখিয়া তাঁর সুবৃহৎ অধ্যয়ন কক্ষের (স্টাডি) মেঝেতে পায়চারি করিতে লাগিলেন এবং বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হেস নিশ্চয় পাগলা হয়ে গেছে।'…

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই ভয়ানক খবর কিভাবে জার্মান জনগণের কাছে প্রকাশ করা যাইবে? ব্যাপারটা মোটেই সহজ ছিল না। বিশেষত গোড়ায় এই সংবাদ সম্পর্কে বৃটেন একেবারে নিঃশব্দ ছিল। তখন হিটলার এবং তাঁর পাত্রমিত্রেরা কিছুক্ষণ এই ভাবিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন যে, হেসের নিশ্চয় পেট্রোল ফুরাইয়া গিয়াছিল এবং সে উত্তর সাগরের ঠাণ্ডা জলে প্লেনসহ ডুবিয়া মারা গেছে!

ফুরার প্রথম খবর পাইলেন হেসের কাছ থেকে লেখা একটি অসংলগ্ন চিঠির মারফৎ। আগসবার্গ থেকে অপরাহ্ণ ৫টা ৪৫ মিনিটে (১০ই মে) হেস বিমান

উড্ডয়ন করেন এবং তার কয়েক ঘণ্টা পরে এই চিঠি একজন পত্রবাহকের হাত দিয়া তাঁর কাছে পেঁছায়। হিটলার মন্তব্য করেন—'আমি তো হেসকে এই লেখার মধ্যে চিনতে পারছি না। এ যেন অন্য কোন লোক। তার নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে, নিশ্চয়ই মাথার গোলযোগ ঘটেছে।' কিন্তু সেই সঙ্গে হিটলারের সন্দেহও বাড়িয়া গেল। উইলি মেসারস্মিট, যাঁর কোম্পানীর বিমানে ময়দান থেকে হেস উড়িয়া গিয়াছে, ফুরার তাঁকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন এবং সেই সঙ্গে হেসের বা ডেপুটি লীডারের স্টাফের ডজন কয়েক লোককেও।[১]

আর স্বয়ং স্ট্যালিনের কি প্রতিক্রিয়া হইল ? মস্কোতে এই ঘটনায় প্রচুর সন্দেহের ছায়াপাত হইল এবং যুদ্ধের ২৫ বছর পরেও সেই সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কারণ, ১৯৭০ সালে প্রকাশিত 'বৃটিশ ফরেন পলিসি' পুস্তকেও সোভিয়েট গ্রন্থকার ট্রুখানোভস্কি ইংলন্ডে 'হেস মিশন' ও বৃটিশ সরকারের রহস্যজনক 'নীরবতা' সম্পর্কে যথেষ্ট বাঁকা মন্তব্য করিয়াছেন। আর চার্চিল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন স্বয়ং স্ট্যালিনের প্রতিক্রিয়া। তিনি বলিতেছেন যে, হেসের ঘটনায় সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট যেন গভীর চক্রান্তের গন্ধ পাইলেন এবং এটাকে কেন্দ্র করিয়া অনেক মনগড়া বা বিকৃত তত্বের (থিওরি) জাল বুনিতে লাগিলেন।

"তিন বছর পরে আমি যখন দ্বিতীয়বার মস্কো পরিদর্শনে গেলাম, তখনও আমি অনুভব করিলাম যে, স্ট্যালিনের নিকট হেসের কাহিনী খুবই কৌতুকোদ্দীপক। একদিন তিনি ডিনার টেবিলে আমাকে জিজ্ঞাসাই করিলেন, হেস মিশনের ব্যাপারটা কি ? আমি সংক্ষেপে ঘটনাটা বলিলাম (চার্চিলের ইতিহাসে যা লেখা হয়েছে)। কিন্তু আমার যেন মনে হইল তাঁর বিশ্বাস এই যে, রাশিয়া আক্রমণের ব্যাপারে জার্মানী ও বৃটেনের মধ্যে একত্রে কাজ করার জন্য নিশ্চয়ই কোন গভীর আলোচনা বা চক্রান্ত হইয়াছে এবং সেটা ফাঁসিয়া গিয়াছে। অথচ স্ট্যালিন কিরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি সেকথা আমার জানা আছে। সুতরাং এই বিষয়টাতে তাঁর বোকামি দেখিয়া আমি খুব বিস্মিত হইলাম। যখন দোভাষী আমাকে পরিষ্কার বলিলেন যে, স্ট্যালিন আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না, তখন আমিও আমার দোভাষী মারফৎ জবাব দিলাম—'যে বিষয় আমার জানা বা জ্ঞানের মধ্যে আছে, সেই বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে আমি যখন কোন বিবৃতি দেই, তখন আমি আশা করি যে, সেটা গৃহীত হবে।' আমার এই আচমকা উত্তরে স্ট্যালিন অমায়িক কাষ্ঠ হাসির দ্বারা সাড়া দিলেন বটে, কিন্তু বলিলেন—

'আমাদের এখানে রাশিয়তেও এমন অনেক ব্যাপার ঘটে, যার সবকিছু আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ (সিক্রেট সার্ভিস) আমাকে পর্যন্ত জানায় না।"[২]

কিন্তু হেস সম্পর্কে স্ট্যালিনের গভীর কৌতূহলের আর একটি বিবরণীও উল্লেখযোগ্য এবং সেটি চার্চিলের যুদ্ধ-ক্যাবিনেটের নামজাদা মন্ত্রী লর্ড বীভারব্রুকের। প্রসিদ্ধ মার্কিন ঐতিহাসিক রবার্ট ই শেরউডের সুবিখ্যাত 'রুজভেল্ট এন্ড হপকিন্স' নামক পুস্তকে দেখা যায় যে, ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিখ্যাত মার্কিন কূটনীতিক আভেরাল হ্যারিম্যান ও লর্ড বীভারব্রুক মস্কোতে গিয়াছিলেন রাশিয়াকে

১। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে উদ্ধৃত উইলিয়াম শাইরারের 'থার্ড রাইখ' পুস্তক থেকে।
২। চার্চিল—তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯

সাহায্যদানের বিষয় নিয়া আলোচনা করার জন্য। একদিন স্ট্যালিন কথা প্রসঙ্গে হেসের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বীভারব্রুক খুব বাকপটু ছিলেন এবং তিনি হেসকে নিয়া এমন মজাদার বর্ণনা দিতেছিলেন যে, মনে হইল স্ট্যালিন খুব উপভোগ করিতেছেন। বীভারব্রুক নিজে হেসের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন। সুতরাং তখনকার অবস্থা সম্পর্কে হেসের কি ধারণা ছিল, বীভারব্রুক তা জানিতেন। স্ট্যালিন আভাস দিলেন যে, তাঁর মনে হইয়াছে হেস হিটলারের অনুরোধে (বৃটেনে) যান নাই বটে, কিন্তু হিটলারের জ্ঞাতসারেই গিয়াছেন। বীভারব্রুক এই বিষয়ে স্ট্যালিনের সঙ্গে একমত হইলেন।

বীভারব্রুক স্ট্যালিনকে যা বলিয়াছিলেন, তার মর্ম এই যে, হেসের ধারণা ছিল যে, বৃটিশ অভিজাতদের একটি ছোট্ট দল, যাঁরা চার্চিলের বিরোধী তাঁদের নিয়া একটি গভর্নমেণ্ট গঠন করা হইবে এবং এই গভর্নমেণ্ট জার্মানীর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করিবে, আর বৃটেনের অধিকাংশ জনমত সেটা মানিয়া লইবে, জার্মানী তখন বৃটেনের সাহায্যে রাশিয়া আক্রমণ করিবে।

এই প্রসঙ্গে স্ট্যালিন বীভারব্রুককে বলেন যে, হেসের পলায়নের সময় মস্কোস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূত তাঁকে (স্ট্যালিনকে) বলিয়াছিলেন যে, হেস মাথা-পাগলা লোক। কিন্তু বীভারব্রুকের মতে হেস পাগলা ছিলেন না।···

কিন্তু বৃটেনে এই বিচিত্র আগন্তুকের হঠাৎ আবির্ভাবের জন্য পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং খোদ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মনে কী প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল ?—চার্চিল রুজভেল্টকে সাতদিন পর ১৭ই মে, ১৯৪১ যে টেলিগ্রাম করিলেন, তাতে হেসের সঙ্গে তিনটি সাক্ষাৎকারেরই বর্ণনা দিয়াছিলেন। হেস বলিয়াছেন যে, তিনি নিজের ইচ্ছাতেই আসিয়াছেন, হিটলার আগে কিছু জানিতেন না। কিন্তু লক্ষ্য করার এই যে চার্চিল এই টেলিগ্রামে রুজভেল্টকে এই মর্মে সতর্ক করিয়া দেন, 'তাঁর প্রদত্ত এই সমস্ত সংবাদই তাঁর—প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিজের জন্য। কারণ, এখানে আমরা মনে করি যে, সংবাদপত্রগুলিকে নিজেদের খবর জোগাড় করিতে দেওয়াই সর্বোত্তম এবং সেই সঙ্গে জার্মানরাও অনুমান করিতে থাকুক।···আমি নিঃসন্দেহ যে, হেস কি বলে তা নিয়া জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেও সংশয় দেখা দিবে।'

সুতরাং স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে, চার্চিল হেসকে নিয়া গোড়াতেই গোপনতার পথ ধরিয়াছেন এবং এই বিষয়ে রুজভেল্টকে পর্যন্ত সতর্ক করিতেছেন।

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হুলস্থুল পড়িয়া গেল এবং ঐতিহাসিক শেরউড লিখিতেছেন যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট সমস্ত ব্যাপারটা গোপনতার ঘন কুয়াশায় আবৃত করিয়া ফেলিলেন। অথচ উত্তেজনা তখন চরমে। কারণ—

'Practically everybody in the world who could read a newspaper or listen to a radio was in a fever of anxiety to know what was really behind this strange story. There was no limit to the rumours and speculations'

অর্থাৎ কার্যত পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে যে কোন লোক সংবাদপত্র পড়িতে পারিত বা রেডিও শুনিত, সে-ই এই অদ্ভুত কাহিনীর পিছনে সত্যি সত্যি কি আছে, তা জানিবার জন্য চরম উত্তেজনা বোধ করিল। গুজব এবং গবেষণার আর ইয়ত্তা রহিল না।···

মিঃ শেরউড আরও লিখিতেছেন যে, হেসের স্কটল্যাণ্ডে অবতরণের প্রায় ১০ দিন পর একদিন সন্ধ্যাবেলা হোয়াইট হাউসে হ্যারি হপকিন্স, সামনার ওয়েলস্ এবং প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে তিনিও ডিনার টেবিলে ছিলেন। হঠাৎ রুজভেল্ট সামনার ওয়েলসের দিকে তাকিয়ে বললেন,—

'গেল বছর যখন তুমি ইউরোপে ছিলে তখন নিশ্চয়ই হেসের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল ?'

ওয়েলস বলিলেন—হাঁ।

রুজভেল্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—দেখতে কেমন ?

তখন সামনার ওয়েলস হেসের সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা বিবৃত করিয়া বলিলেন যে, লোকটা ভীষণ গোঁড়া (ফানাটিক্যাল), ফুরারের প্রতি তাঁর অলৌকিক ভক্তি এবং বাহ্যত মনে হয় লোকটা নীরেট বোকা ধরনেব।

রুজভেল্ট এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—

'I wonder what is really behind this story !'

'সত্যি সত্যি এ কাহিনীর পিছনে কী রহস্য আছে, তা ভেবে আমি অবাক হচ্ছি।'[১]

সামনার ওয়েলস্ বলিলেন যে, তিনি আর কিছু জানেন না।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, হেসের ঘটনা এক গভীর গোয়েন্দা রহস্যের মত পৃথিবীর উপরের তলার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেরও আলোড়িত করিয়াছিল। কিন্তু গোড়াতে এই রহস্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ চার্চিলের কূটবুদ্ধি ও স্বেচ্ছাকৃত নীরবতা, যার জন্য স্ট্যালিন বা সোভিয়েট রাশিয়ার সন্দেহ উদ্রিক্ত হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। এমন কি চার্চিলের টেলিগ্রাম সত্ত্বেও রুজভেল্টের কাছে পর্যন্ত হেসের কাহিনী স্বচ্ছ ছিল না। তার প্রমাণ এই যে, ডিনার টেবিলে রুজভেল্ট হেস সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলি করিয়াছিলেন সেগুলি চার্চিলের তারবার্তার তিন দিন পর। অথচ এই তারাবর্তায় চার্চিল রুজভেল্টকে হেসের রাজনৈতিক বক্তব্যের সব তথ্যই জানাইয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য ছিল না।

*　　　*　　　*

কিন্তু যে ঘটনায় চার্চিল, রুজভেল্ট, স্ট্যালিন, হিটলার প্রমুখ মহানায়কেরা আলোড়িত, সেই ঘটনার নায়ক রুডলফ্ হেস ব্যক্তিটি কে ? আগেই বলা হইয়াছে, তিনি হিটলারের অন্তরঙ্গ মহলের এবং ঘনিষ্ঠতম সহযোগীদের অন্যতম। হিটলার ও গোয়েরিংয়ের পরেই নাৎসী জার্মানীতে তাঁর স্থান। তাঁর অনেকগুলি জমকালো টাইটেল বা পদবী ছিল। যেমন—ডেপুটি ফুরার, লীডার অব দি নাৎসী পার্টি, জার্মানীর গোপন (সিক্রেট) ক্যাবিনেট কাউন্সিলের সদস্য, দপ্তরহীন রাইখ মন্ত্রী, রাইখের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ইত্যাদি। সোজা কথায় হেস ছিলেন শীর্ষস্থানীয় নাৎসী নেতাদের অন্যতম। ১৮৯৪ সালে তাঁর জন্ম হইয়াছিল মিশরে। ১৯১৮ সালের মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের এক রণক্ষেত্রে হিটলারের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। নাৎসী পার্টির গোড়াপত্তনকারীদের তিনি অন্যতম। ১৯২৩ সালে মিউনিকে বীয়ার হলের যে 'যুদ্ধ' বা বিদ্রোহ হিটলার ঘটাইয়াছিলেন হেস সেই ব্যর্থ বিদ্রোহের অংশীদার ছিলেন। হিটলারের সঙ্গে একত্রে ল্যাণ্ডসবার্গের দুর্গে বন্দী ছিলেন এবং

১। Roosevelt and Hopkins—Robert E. Sherwood. P. 294.

হিটলারের বিখ্যাত বা কুখ্যাত 'মেইন ক্যাম্প' বা আত্মজীবনী রচনায় অনুলেখকের কাজ করিয়াছিলেন। এমন কি হেস নিজেও সেই বইতে তাঁর নিজের চিন্তাভাবনা (আইডিয়া) ঢুকাইয়া দিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।

হেস ছিলেন কার্ল হাউসোফারের ভক্ত এবং জার্মানীর নূতন ভূ-রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরু ছিলেন হাউসোফার। হেস হিটলারকে হাউসোফারের মূল তত্ত্বগুলিতে দীক্ষা দিলেন। নাৎসী আকাশে হেস অতি দ্রুত একটি নূতন জ্যোতিষ্কের মত দেখা দিল। হেসের চেহারা আকর্ষণীয় ছিল, দীর্ঘকায় সুদর্শন এই যুবকের কালো চোখ ও কালো ভ্রু নাৎসী পার্টির অন্যান্য সদস্যদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিল এবং হিটলারের ইনি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। হেস ফুরারের ব্যক্তিগত স্টাফের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ফুরারের প্রতি হেসেরও কুকুরের মত অন্ধ আনুগত্য ছিল। তিনি 'আমার ফুরার' বলিতে অজ্ঞান ছিলেন এবং 'হেইল হিটলার' জয়ধ্বনি দিতে দিতে মত্ত জনতাকে আগাইয়া নিয়া যাইতেন, আর চীৎকার করিতে থাকিতেন—'ভগবান আমাদের ফুরারকে রক্ষা করুন।'

হেস সাধারণতঃ হিটলারের ডিনার টেবিলের সঙ্গী ছিলেন, কখনও কখনও একা থাকিতেন, কখনও বা দু-তিনজন সঙ্গে থাকিতেন। সুতরাং হিটলারের 'মনের কথা' জানার সুযোগ তাঁর ছিল। হিটলার ঘোরতর বলশেভিক বিদ্বেষী ছিলেন, বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যকে প্রশংসার চোখে দেখিতেন, কিন্তু অন্যান্য দেশ সম্পর্কে হিটলারের অবজ্ঞা ছিল। হিটলারের সঙ্গে ডিনার টেবিলের অন্তরঙ্গতা থেকে হেস এইসব কথা জানিতেন। কিন্তু যুদ্ধ বাঁধিবার পর, হেসের এই সুযোগ আর রহিল না। অনেক বড় বড় পদস্থ ব্যক্তি—জেনারেল, এডমিরাল, ডিপ্লোম্যাটেরা সেই টেবিলে ভিড় করিতেন। ক্রমে হেস অনুভব করিলেন যে, তিনি যেন সেই ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া যাইতেছেন, যেন হিটলারের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়া যাইতেছেন। তিনি আর অন্তরঙ্গ মহলের কেউ নন—এই চিন্তা হেসকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। সুতরাং তাঁর মাথায় ঢুকিল কিভাবে আবার ফুরারের অন্তরঙ্গ হওয়া যায়? যদি তিনি এখন একটা ভয়ংকর দুঃসাহসিক কার্য করিতে পারেন, যে কার্যের জন্য তাঁর প্রাণও যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁর পিতৃভূমির জন্যই সেই প্রাণ উৎসর্গীকৃত হইবে। তবে, তিনি আবার ফুরারের ঘনিষ্ঠতম হইতে পারেন এবং হেসের পক্ষে ফুরার ও জার্মানী ছিল এক এবং এই জার্মানীর সঙ্গে বৃটেনের পারস্পরিক লড়াই ছিল হেসের নিকট এক ভয়ংকর ট্রাজিডির মত। যদি এই ট্রাজিডি থেকে বৃটেন ও জার্মানীকে রক্ষা করিতে পারা যায়, যদি দুইয়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও দুই রণাঙ্গনের বিপদ কাটাইয়া দেওয়া যায়, তবে তার একটা মহৎ ঐতিহাসিক কার্য হইবে। সুতরাং ভগবান সুবর্ণ সুযোগ আনিয়া দিয়াছেন। এই শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি একাই ইংলণ্ডে উড়িয়া যাইবেন। এবং এই শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তাঁর ফুরার নিশ্চিন্ত মনে চিরকালের জন্য বলশেভিজম্ ধ্বংস করিয়া দিতে পারিবেন।...[১]

হেসের মানসিক জগৎ এই ধরনের চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল এবং তাঁর নিশ্চিত ধারণা ছিল যে ইংলণ্ডে তিনি এই ব্যাপারে মুরুব্বীও সঙ্গে পাইবেন। ১৯৩৬ সালে বার্লিনে ওলিম্পিক ক্রীড়া উৎসবের সময় একজন বৃটিশ অভিজাতের সঙ্গে তাঁর পরিচয়

হইয়াছিল—তিনিই ডিউক অব হ্যামিল্টন। তাঁর সঙ্গে হেসের যথেষ্ট বন্ধুত্বও হইয়াছিল। যুদ্ধ বাধিবার পর হেস তাঁকে শান্তি প্রতিষ্ঠার আভাস দিয়া একখানা পত্রও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্নমেন্টের অফিসারদের পরামর্শে ডিউক সেই চিঠির কোন জবাব দেন নাই বটে, তবু হেসের প্রত্যাশা এই যে, যদি তিনি নিজে একবার ইংলন্ডে গিয়া হাজির হইতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই ডিউকের মারফৎ শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করা যাইবে। কারণ, ডিউক অব হ্যামিল্টন 'লর্ড স্টুয়ার্ড' হিসাব নিশ্চয়ই রাজা ষষ্ঠ জর্জের ডিনার টেবিলের একজন পার্শ্বচর। অতএব ডিউকের মারফৎ রাজার সহায়তাও পাওয়া যাইবে। কারণ, হেসের ধারণা ডিউক একজন প্রো-নাৎসী।

যদিও এই সময় হেস টি-বি বা ক্ষয়রোগে ভুগিতেছিলেন এবং তাঁর মানসিক অবস্থাও খুব সুস্থ ছিল না, তবু তিনি একাকী ইংলন্ডে 'বিমান অভিযানের' সংকল্প করিলেন। অথচ তিনি বিমান চালনা জানিতেন না। কিন্তু উইলি মেসারস্মিট, যিনি জার্মানীর বিশিষ্ট বিমাননির্মাতা ছিলেন, তাঁকে ধরিয়া হেস তাঁর কোম্পানীর বিমান-ময়দানে এবং জার্মানীর অভ্যন্তরে দূর পাল্লার বিমান উড্ডয়ন ও চালনা শিক্ষা করিলেন। আশ্চর্য এই যে, বাহ্যতঃ তিনি একজন দক্ষ চালক হইয়া উঠিলেন। ১০ই মে, ১৯৪১ সন্ধ্যা ৫-৪৫ মিনিটে তিনি একটি মেসারস্মিট প্লেনে জার্মান বিমানবাহিনীর একজন ফ্লাইট লেফটেনান্টের পোষাকে ইংলন্ড যাত্রা করিলেন। সঙ্গে একটি মানচিত্র—যে মানচিত্রের উপর তিনি নিজেই একটি পেন্সিল দিয়া তাঁর যাত্রাপথে দাগ কাটিয়াছিলেন এবং নিজের সত্যকার পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য সঙ্গে নিজের কয়েকখানা ফটোও রাখিলেন।

৮০০ মাইল দীর্ঘ এই বিমানযাত্রা। কিন্তু হেস বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই আকাশ পাড়ি দিলেন। তিনি স্কটল্যান্ডে পৌঁছিলেন এবং অবতরণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু উপযুক্ত স্থান পাইলেন না। তখন তিনি বিমানের গতি বন্ধ করিয়া দিয়া বিমানছত্র বা প্যারাসুটযোগে ডিউকের স্কটল্যান্ডের বাড়ীর ১২ মাইলের মধ্যে ডুঙ্গাভেলের কাছে নামিয়া পড়িলেন। (নবাগতের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই কম কৃতিত্বের কথা নয়।) তিনি একজন চাষীকে স্কটিশ জমিদার ডিউক অব হ্যামিলটনের কাছে তাঁকে লইয়া যাইতে বলিলেন। ঘটনাচক্রে ডিউক তখন আর এ এফ-এর একজন উইং কমান্ডার হিসাবে সেদিন শনিবার সন্ধ্যায় একটি সেক্টরের অপারেশন কক্ষে ছিলেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, একটি মেসারস্মিট প্লেন তীরের দিকে আসিয়া মাটির দিকে নামিল। রাত্রি তখন দশটা উত্তীর্ণ। ঘণ্টাখানেক পর ডিউকের নিকট রিপোর্ট গেল যে, প্লেনটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে এবং পাইলট বিমানছত্র-যোগে নামিয়া পড়িয়া নিজেকে অ্যালফ্রেড হর্ন নামে পরিচয় দিতেছেন এবং দাবী করিতেছেন যে, ডিউক অব হ্যামিলটনের সঙ্গে তাঁর দেখা করা দরকার। কারণ, তিনি এক 'বিশেষ মিশন' নিয়া আসিয়াছেন। এই ঘটনাই ডিউক মহোদয় তৎক্ষণাৎ চার্চিলের কাছে রিপোর্ট করিলেন, যে-কথা এই কাহিনীর গোড়াতেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

পরদিন সকালে ডিউকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হইল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থায়। ইতিমধ্যে তাঁকে অবশ্য আটক করা হইয়াছিল।

ডিউকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে হেস তাঁর 'মানবিক মিশনের' উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া

বলিলেন যে, ফুরার ইংল্যাডকে পরাজিত করিতে চান না, তিনি বরং যুদ্ধ বন্ধ করিতেই চান।' তাঁর এই মিশনের পিছনে তাঁর যে আন্তরিকতা রহিয়াছে, বোধহয় সেটা প্রমাণের জন্যই তিনি বলিলেন যে, বৃটেনে এটা তাঁর চতুর্থ বিমানযাত্রা, আরও তিনবার তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার জন্য তাঁকে আগের কয়েকবারই ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। তিনি একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবেই শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়া আসিয়াছেন। ডিউককে তিনি স্মরণ করাইয়া দেন যে, জার্মানীর জয় তো অবশ্যম্ভাবী, অতএব বৃটেন যদি যুদ্ধ চালাইয়া যায়, তবে বৃটেনের দুর্দশা ভয়াবহ হইবে। সুতরাং তাঁর (হেসের) এই উপস্থিতির সুযোগ নিয়া শান্তি স্থাপনের জন্য জার্মানীর সঙ্গে আলোচনা চালানো উচিত।

হেসের ধারণা ছিল যে, তাঁর এই সমস্ত কথায় বৃটিশ নেতারা ভুলিয়া যাইবেন এবং তাঁর সঙ্গে বসিয়া শান্তির আলাপ-আলোচনা চালাইবেন। কিন্তু তার বদলে হেসকে ইতিমধ্যে বন্দী করা হইয়াছিল। অতএব হেস ডিউককে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন রাজা ষষ্ঠ জর্জকে বলিয়া তাঁকে 'প্যারোলে' মুক্তিদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি নিরস্ত্র অবস্থায় এবং নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছেন। হেস আরও স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে তিনি উপযুক্ত মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী।

অবশ্য চার্চিল সমর দপ্তরকে নির্দেশ দিয়াছিলেন রুডল্‌ফ্‌ হেসকে একজন বিশিষ্ট জেনারেল বা সেনাপতির মর্যাদা দিতে। নানা জায়গায় স্থান পরিবর্তনের পর তাঁকে লণ্ডন টাওয়ারে বন্দী অবস্থায় রাখা হইয়াছিল ৬ই অক্টোবর, ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। তারপর তাঁকে ন্যুরেমবার্গের কারাগারে পাঠানো হইয়াছিল যুদ্ধাপরাধী হিসাবে আন্তর্জাতিক আদালতে উপস্থাপিত করার জন্য।

টাওয়ার অব লণ্ডনে বা বৃটেনে আটক বন্দী থাকার সময় তাঁর স্বাস্থ্য, তাঁর খাদ্য এবং তাঁর লেখাপড়ার জন্য বই ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করার জন্যও চার্চিল হুকুম দিয়াছিলেন। তবে, বাইরের জগতের সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্ক রাখা তাঁর পক্ষে নিষেধ ছিল। সংবাদপত্র পড়া বা রেডিও শুনাও নিষিদ্ধ ছিল এবং সরকারী হুকুম ছাড়া কাহারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও বারণ ছিল। তাঁকে পাহারা দেওয়ার জন্য বিশেষ গার্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

তাঁর সঙ্গে কয়েক ব্যক্তিরই সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বার্লিনের বৃটিশ দূতাবাসের প্রাক্তন ফার্স্ট সেক্রেটারি আইভান কার্ক-প্যাট্রিকের সাক্ষাৎ। তাঁর এই সাক্ষাৎকার ও আলোচনার গোপন বিবরণী পরে ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে পেশ করা হইয়াছিল। এই সমস্ত বিবরণীতে দেখা যায় যে, হেস তাঁর প্রভু হিটলারের বক্তব্যই তোতাপাখির মত আওড়াইয়া গিয়াছেন। এবং অস্ট্রিয়া থেকে পশ্চিম রণাঙ্গন পর্যন্ত সমস্ত আগ্রাসনকেই সমর্থন করিয়া যুদ্ধারম্ভের জন্য চেম্বারলেনকে দায়ী করিয়াছেন। যদি এ-যুদ্ধে বৃটেন এখনও ক্ষান্ত না দেয়, তবে চরম পরাজয় তার অদৃষ্টে অপেক্ষা করিতেছে। সুতরাং হেস শান্তির প্রস্তাব করিতেছেন এবং হিটলারেরই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন যে, বৃটেনের উচিত হইবে জার্মানীকে ইউরোপে 'ফ্রী হ্যাণ্ড' বা স্বাধীনভাবে কার্য করার অধিকার দেওয়া। বদলে জার্মানীও বৃটেনকে তাঁর সাম্রাজ্যে নিরঙ্কুশ আচরণের অধিকার দিবে। অবশ্য

পূর্বেকার জার্মান উপনিবেশগুলি ফেরৎ দিতে হইবে এবং ইতালীর সঙ্গেও বৃটেনের শান্তি স্থাপন করিতে হইবে।

কার্কপ্যাট্রিক লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, হেসের সঙ্গে এই সমস্ত কথাবার্তার পর যখন তিনি চলিয়া আসিতেছিলেন, তখন তিনি হেসের কাছ থেকে একটি 'বিদায়কালীন আঘাত' পাইলেন। হেস বলিলেন, 'হ্যাঁ, তাঁর একটা কথা বলিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। জার্মানীর সঙ্গে বৃটেনের এই সমস্ত শান্তি আলোচনা তখনই চলিতে পারে—যখন বৃটেনে একটি বিকল্প গভর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হইবে। কারণ, ১৯৩৬ সাল থেকে যে চার্চিল যুদ্ধের চক্রান্ত করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁর সহকর্মীরা তাঁর যে যুদ্ধ-নীতিতে সায় দিয়া আসিতেছেন, ফুরার সেই সমস্ত লোকের সঙ্গে নিশ্চয়ই কোন আলোচনায় বসিতে রাজী হইবেন না !'

সোজা কথায় হেসের বক্তব্য ছিল এই যে, জার্মানীর সঙ্গে শান্তি আলোচনা চালাইতে হইলে সর্বাগ্রে চার্চিল এবং তাঁর মন্ত্রিসভাকে তাড়াইতে হইবে এবং যারা হিটলারের সঙ্গে শান্তি চায় এমন চার্চিলবিরোধীদিগকে নিয়া নূতন গভর্নমেণ্ট গঠন করিতে হইবে। হেসের বিশ্বাস ছিল যে, ডিউক অব হ্যামিলটন একজন সেই ধরনের ব্যক্তি যিনি এই বিষয়ে চার্চিলের বিরোধী দলভুক্ত।

১৪ই মে কার্কপ্যাট্রিকের সঙ্গে দ্বিতীয়বারের সাক্ষাতে হেস আরও দুইটি সর্তের কথা উল্লেখ করিলেন—যেমন, (১) যে কোন শান্তি-চুক্তি সম্পাদনে রসিদ আলীকে জার্মানীর সমর্থন পাইতে হইবে এবং ইরাক থেকে বৃটেনকে উচ্ছেদ করিতে হইবে এবং (২) যদি জার্মানীর সহিত বৃটেন শান্তি স্থাপন না করে, তবে, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত সরবরাহ লাইন ছিন্ন করিয়া দেওয়ার জন্য সমুদ্রতলে বিমানশক্তির সহায়তায় ইউ-বোট যুদ্ধ চালানো হইবে এবং যদি বৃটেন আত্মসমর্পণ করে, অথচ তার পরেও বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে যুদ্ধ চালানো হয়, তা'হলেও কিন্তু এই অবরোধ যুদ্ধ চলিবে। যদি বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের শেষ অধিবাসীটিও এর ফলে না খাইয়া মরে, তবু এই অবরোধ-যুদ্ধে ক্ষান্ত দেওয়া হইবে না।···

যদিও চার্চিল বলিয়াছেন যে, তিনি হেসের এই আকস্মিক আগমনের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন না, তথাপি দেখা যাইতেছে যে, পদস্থ ব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। যেমন, খোদ বৃটিশ মন্ত্রিসভা লর্ড সাইমনকে অনুরোধ করিলেন রুডলফ্ হেসের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এবং ১০ই জুন এই সাক্ষাৎকার ঘটিল। হেস এই সাক্ষাৎকারে বলিয়াছিলেন—যখন বৃটেনের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও দেখা গেল না (অর্থাৎ বৃটেন শান্তি প্রার্থনা করিল না) তখন ফুরার যুদ্ধ চালাইবারই সিদ্ধান্ত নিলেন, এডমিরাল লর্ড ফিসারের নীতি অনুসারেই তিনি ঠিক করিলেন—

'Moderation in war is folly. If you strike, strike hard and wherever you can.'

অর্থাৎ যুদ্ধ চালাইতে গিয়া সংযম দেখানো মূর্খতা মাত্র। যদি আঘাত করিতে চাও, তবে, কঠোরভাবে আঘাত করো এবং যেখানে পারো সেখানো মারো !

কিন্তু এই নীতি সত্ত্বেও হেস বৃটিশ সরকারকে নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন যে, ফুরার এই ধরনের আক্রমণের হুকুম দিতে সর্বদাই কষ্টবোধ করিতেন। ইংরাজদের

জন্য তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল, তিনি চান না যে, ইংরাজ জনগণের বিরুদ্ধে এমন নির্মম যুদ্ধ পরিচালিত হোক !

অতঃপর হেস লর্ড সাইমনকে বলিলেন, 'তখন আমি চিন্তা করিলাম যে, একবার ইংল্যাণ্ড যদি জানিতে পারিত হিটলারের এই মনোভাবের কথা, তা'হলে ইংল্যাণ্ড নিশ্চয়ই একটা আপসরফা করতে রাজী হইত !'[১]

অথাৎ হিটলার যে দয়ার অবতার একথা জানিতে পারিলে ইংল্যাণ্ড নিশ্চয়ই তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিত !

হেস আরও বলিয়াছেন যে, তিনি যে ইংল্যাণ্ডে আসিয়াছেন একথা হিটলার জানেন না। কারণ, তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজের ইচ্ছাতেই আসিয়াছেন। এমন কি, রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারের আসন্ন আক্রমণ সম্পর্কেও হেস কিছু জানেন না—তাঁর এই অজ্ঞতা কিম্বা 'অজ্ঞতার ভান' সম্পর্কে চার্চিল পর্যন্ত সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণের এমন বিরাট আয়োজন সম্পর্কে হেস কিছু জানেন না, এটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিস্ময়কর। কায়ণ, হেস হিটলারের অন্তরঙ্গ মহলের একজন প্রধানতম ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় বা আলোচনায় রাশিয়া আক্রমণ সম্পর্কে হিটলারী আয়োজনের কোন আভাস পাওয়া গেল না। তথাপি ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে তাঁর এই সমস্ত আবোল-তাবোল উক্তি ও শিশুসুলভ ধারণা দেখিয়া হেসের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু চিকিৎসকগণ সেই সময় তাঁকে পরীক্ষা করিয়া তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির কোন প্রমাণ পান নাই। ২২শে মে, তিনি তাঁর ডাক্তারের নিকট বলিয়াছিলেন যে, বৃটেনের উপর বোমাবর্ষণে দলে দলে শিশুরা ও তাদের মায়েরা নিহত হইতেছে, এই কথা চিন্তা করিয়া তিনি ত্রাস বোধ করিয়াছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের কথা তাঁর মনে পড়িয়াছিল। এজন্য তিনি বৃটেনে আসিয়াছেন, যাঁরা যুদ্ধের বিরোধী, তাঁদের সহায়তায় এই যুদ্ধ নিবারণের জন্য। এই বিষয়ে আদর্শবাদের দ্বারাই তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

হেসের এই সমস্ত কথাবার্তা বিশ্লেষণ করিলে মনে হইবে যে, তাঁর চিন্তাধারা ও আচরণ স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত ছিল না। এমন কি অকপটও ছিল না। কারণ, বোমা ও যুদ্ধের দ্বারা একমাত্র ইংলণ্ডের নরনারী ও শিশুই মারা পড়ে নাই, বিশেষ-ভাবে পোল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও যুগোশ্লাভিয়ার বা বেলগ্রেডের উপর আসুরিক বোমাবর্ষণে ভয়াবহ ধ্বংস ও অ-সামরিক নরনারীর মধ্যে হত্যাকাণ্ড বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু তখন নাৎসী-নায়ক হেসের এই মানবিক দরদ কোথায় ছিল ? সুতরাং হেসের এই ইংলণ্ড যাত্রার পিছনে স্বাভাবিক মানবিকতার কোন প্রেরণা ছিল বলিয়া মনে হয় না।...

হিটলার ও হিমলারের মত হেসেরও জ্যোতিষ শাস্ত্রে অগাধ বিশ্বাস ছিল। ১৯৪০ সালের শেষের দিকে তাঁর জ্যোতিষীরা নাকি গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁর রাশি-নক্ষত্রের এমন যোগাযোগ যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি লাগিবেনই। তাঁর ভূ-রাজনৈতিক চিন্তাধারার গুরু অধ্যাপক হাউসোফার তাঁকে একবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি (হাউসোফার) স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে, হেস যেন ইংলণ্ডের সুসজ্জিত

১। The Second World War—Churchill, Vol. 3. P. 48.

রাজপ্রাসাদের কক্ষ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন এবং দুই নর্ডিক জাতির মধ্যে শান্তি আনয়ন করিতেছেন !

(এই শেষের ঘটনাগুলি নুরেমবার্গের আদালতে বিচারের সময় বন্দী থাকাকালীন হেস কারাগারের মার্কিন মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসকের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন।)

মানসিক দিক দিয়া হেস যেন অস্থির, চপল ও অল্পবুদ্ধি বালকের মত ছিলেন। উপরে বর্ণিত তাঁর কথাবার্তা ও আচরণই তার প্রমাণ। অথচ নাৎসী পার্টিতে এই ধরনের লোক উচ্চ পদাধিকারী ও ক্ষমতাবান ছিলেন এবং হিটলারী মতবাদে এঁদের অদ্ভুত ফ্যানাটিসিজম ছিল। অতএব জার্মানী কিরূপ ভয়াবহ চক্রের মধ্যে পড়িয়াছিল, সেটাও এই সমস্ত ঘটনা থেকে উপলব্ধি করা যায়।

*　　　*　　　*

হিটলার এবং তাঁর দলবল হেসের এই ঘটনায় একেবারে হতভম্ব হইয়া যান, একথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সারা পৃথিবীতে হেসের ইংলণ্ডে 'পলায়ন' নিয়া হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। হিটলারের তখন দুর্ভাবনা হইল কিভাবে এই ঘটনাকে জার্মান জনগণের সামনে উপস্থিত করা হইবে ? বলা বাহুল্য যে, সংবাদপত্রগুলিতো নাৎসী পার্টির কুক্ষিগত ছিল। অতএব নাৎসী দলের বক্তব্যই জার্মান সংবাদপত্রগুলির ভাষ্য হইয়া দাঁড়াইল। সংবাদপত্রগুলি প্রচার করিতে লাগিল যে, হেস একদা ন্যাশন্যাল সোসিয়ালিজম মতবাদের মহান নেতা ছিলেন। কিন্তু তিনি বিভ্রান্ত, মতিচ্ছন্ন ও জড়বুদ্ধি আদর্শবাদী ও অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে আহত হইবার ফলে তিনি যে আঘাত পাইয়াছিলেন, তারই পরিণতিতে তাঁর এই ব্যারাম।

জার্মান সরকারী প্রেসনোটে ঘোষণা করা হইল যে, পার্টি-কমরেড হেস এক অলৌকিক অবাস্তব জগতে বাস করিতেন। এরই ফলে তাঁর ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তিনি জার্মানী ও ইংলণ্ডের মধ্যে একটা বুঝাপড়া করিতে পারিবেন !··· কিন্তু এই ঘটনার দ্বারা যুদ্ধ পরিকল্পনার উপর কোন প্রভাবই পড়িবে না এবং এই যুদ্ধ জার্মান জনগণের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই ইস্তাহার ছাড়াও ফুরার তাঁর পুরানো কমরেডকে সমস্ত প্রকার পার্টি-দায়িত্ব ও ডেপুটি ফুরারের পদ থেকে বিতাড়নের কথা ঘোষণা করিলেন এবং তাঁর স্থলে মার্টিন বোরম্যানকে (এই ব্যক্তিটির সঙ্গেই হেসের ভিতরে ভিতরে ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল) সেই পদে নিযুক্ত করিলেন। আর অপ্রকাশ্যে (প্রাইভেটলি) তিনি হুকুম দিয়া রাখিলেন যে, হেস যদি কখনও আবার জার্মানীতে ফিরিয়া আসে, তবে যেন তাকে গুলী করিয়া মারা হয় ![১]

যদিও হেসের ঘটনার পিছনে কোন হিটলারী ষড়যন্ত্র কিম্বা রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের কোন গূঢ় অভিসন্ধি ছিল বলিয়া পশ্চিমী ঐতিহাসিকগণ (যেমন এ্যালান বুলক্, উইলিয়াম এল শাইরার প্রভৃতি) মনে করেন না এবং স্পষ্টই তাঁরা লিখিয়াছেন যে, এই ধরনের ষড়যন্ত্রের বা মতলবের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, তথাপি সোভিয়েট রাশিয়া কিন্তু ব্যাপারটাকে এত সরল চিত্তে গ্রহণ করেন নাই। স্কটল্যাণ্ডে হেসের বিমানযোগে হঠাৎ আবির্ভাবের জন্য স্ট্যালিনের সন্দেহের কথা আগেই উল্লেখ করা

১। The Rise & Fall of the Third Reich—Shirer. P. 1001-3.

হইয়াছে। এমন কি রুজভেল্টও গোড়ায় ব্যাপারটাকে রহস্যজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে হেস মিশন নিয়া অনেক লেখালেখি হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েটের মন থেকে সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট গ্রন্থকার ভি ট্রুখানোভস্কি লিখিয়াছেন যে, হেসের ব্যাপারে সবচেয়ে বিতর্কিত প্রশ্নটি হইতেছে এই যে, হেস বৃটিশ সরকারের নিকট যে সমস্ত শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেগুলি কি তিনি নিজের উদ্যোগেই করিয়াছিলেন, কিম্বা হিটলারের পক্ষ থেকে? হেস অবশ্য বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁর নিজের উদ্যোগেই ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৬২ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত 'দি আন্‌ইনভাইটেড্ এনভয়—রুডলফ্ হেস' নামক পুস্তকে বৃটিশ লেখক জেমস লীজর (Leasor) এই বিষয়টির উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—'হেস মিশন সম্পর্কে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেটা হিটলারের জানা ছিল না, সেটা হইতেছে তাঁর রওনা হওয়ার সঠিক তারিখটি'…'হিটলারের যাঁরা ঘনিষ্ঠতম, তাঁরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ফুরার যা' চাহিয়াছিলেন, হেস তা'ই কার্যে পরিণত করিয়াছেন।—এবং তা' হিটলারেরই জ্ঞাতসারে, একমাত্র রওনা হওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় ছাড়া। কারণ, এটা আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল।'

সোভিয়েট ইতিহাসবিদ্ ইংরাজ লেখকের এই মতামত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, হেস হিটলারের কেবল জ্ঞাতসারেই নয়, তাঁর হুকুম অনুসারেই ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। কারণ, বৃটেনের সহিত শান্তি স্থাপনের জন্য, এমন কি সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় বৃটেনকে দলে পাওয়ার জন্য হিটলার খুব অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৯৪১ সালের বসন্তকালে বৃটেনের সহিত শান্তি প্রতিষ্ঠার এই আকাঙ্ক্ষা হিটলার তাঁর মৃত্যুকালীন 'ইচ্ছাতে' (টেস্টামেণ্ট) পর্যন্ত উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বৃটেনের সহিত কোন শান্তিপূর্ণ মীমাংসা না হওয়ায় নাৎসী ফুরার ক্ষোভও প্রকাশ করিয়াছেন অনেক। অবশ্য এই ক্ষোভের যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ, হেস মিশন ব্যর্থ হওয়ায় এবং জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণে বৃটেনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভুল হিসাব-নিকাশ করায় হিটলারকে অত্যধিক মূল্য দিতে হইয়াছিল।

একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, কেবল ১৯৪১ সালেই নয়, ১৯৪০ সালের পশ্চিম রণাঙ্গনে জয়যাত্রার সময়েই হিটলার বৃটেন সম্পর্কে 'সদয় মনোভাব' দেখাইতেছিলেন, যার ফলে ডানকার্ক থেকে বৃটিশ বাহিনীর ওই বিস্ময়কর পলায়ন সম্ভব হইয়াছিল। তার পরেও বৃটেনের বিরুদ্ধে বিমান অভিযান ও 'সিন্ধুঘোটক' রণ-পরিকল্পনার সময়ও হিটলার বৃটেনের সঙ্গে বুঝাপড়ার প্রত্যাশায় ছিলেন। এমন কি, ১৯শে জুলাই রাইখস্ট্যাগে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এই যুদ্ধ কেন আর চলিবে, সেকথা তিনি যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারিতেছেন না। অর্থাৎ হিটলার ও নাৎসী নেতাদের ধারণা ছিল যে, বৃটেন যেভাবে বেকায়দায় পড়িয়াছে, তাতে জার্মানীর সঙ্গে তার সন্ধি না করিয়া উপায় নাই।

কিন্তু হিটলার বৃটেনের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্য এতটা ব্যগ্র কেন ছিলেন?—এর মূল কারণ ছিল এই যে, দুই রণাঙ্গনের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য তিনি গোড়া থেকেই সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। পোল্যাণ্ড আক্রমণ ও পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের আগে থেকেই তাঁর এই রণনৈতিক চিন্তা প্রবল ছিল এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি (১৯৩৯ আগস্ট) স্বাক্ষরের মূল উদ্দেশ্যও তাই ছিল। সুতরাং ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে

সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের আগেও হিটলার চাহিয়াছিলেন বৃটেন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে কিম্বা একই সঙ্গে দুই রণাঙ্গনের দায়িত্ব এড়াইতে। ১৯৩৯ সালের ২৩শে নভেম্বর শীর্ষ জার্মান সমর নেতাদের নিকট এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন— 'আমরা রাশিয়ার বিরোধিতা তখনই করিতে পারিব, যখন পশ্চিমে মুক্ত (ফ্রী) হইতে পারিব'।

সোভিয়েট ইতিহাসবিদ্ ট্রুখানোভস্কি লিখিতেছেন যে, বৃটেনে চার্চিল সরকারের মধ্যেও মিউনিকপন্থীদের বিশিষ্ট স্থান ছিল এবং শাসক মহলের মধ্যে সোভিয়েট বিদ্বেষ ছিল, যারা চাহিতেছিল হিটলারকে রাশিয়ার দিকে ঠেলিয়া দিতে। এই সমস্ত জানা ছিল বলিয়াই হিটলার বৃটেনের সঙ্গে শান্তিস্থাপন ও সোভিয়েট আক্রমণে বৃটিশ সহযোগিতার সন্ধান করিতেছিলেন। কিন্তু হিটলার একটি বিষয়ে ভুল করিয়াছিলেন। নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে বৃটিশ জনসাধারণের চেতনা এবং স্বয়ং চার্চিল ও তাঁর সহকর্মীদের হিটলার সম্পর্কে ভীতি নাৎসী নেতারা পরিমাপ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। চার্চিল ও তাঁর সহযোগীরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদি হিটলার একবার সোভিয়েট রাশিয়া জয় ও তাঁর সম্পদের উৎসগুলি দখল করিতে পারে, তবে, বৃটেনেরও আর রক্ষা থাকিবে না। কারণ, হিটলারকে তখন বাধা দেওয়ার সাধ্য থাকিবে না এবং বৃটেন জার্মানীর একটা আশ্রিত ও পদানত রাজ্যে পরিণত হইবে। এই বিষয়ে চার্চিলের যেটুকু বা সন্দেহের অবকাশ ছিল, তাও দূর হইয়া গেল হেসের ইংলণ্ড আগমনে এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ও আলোচনার ফলে।[১]

* * *

কিন্তু একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, হিটলার যদি দুই রণাঙ্গনের দায়িত্ব এড়াইবার উদ্দেশ্যেই হেসকে বৃটেনের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্য পাঠাইয়া থাকেন, তবে চার্চিল কর্তৃক সেই প্রস্তাব নিশ্চিতরূপে অগ্রাহ্য হওয়ার পরেও হিটলার সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গেলেন কেন?—সোভিয়েট লেখক বলিতেছেন যে, এর একমাত্র জবাব এই হইতে পারে যে, হিটলার নিশ্চিত ছিলেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্র আক্রমণের ফলে দুই রণাঙ্গনের বিপদ সৃষ্টি হইবে না এবং বৃটেন জার্মানীকে এই বিষয়ে সহায়তা না করিলেও তার যুদ্ধযাত্রার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না।

(খ্যাতনামা ইংরাজ ঐতিহাসিক এ্যালান বুলক্ এই প্রশ্ন সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, হিটলারের ধারণা হইয়াছিল বৃটিশ ইতিমধ্যেই পরাজিত হইয়াছে এবং ইউরোপীয় ভূখণ্ডে সে আর কিছু করিতে পারিবে না—'হিটলার' গ্রন্থের ৬৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

সোভিয়েট লেখক ট্রুখানোভস্কির আরও অভিমত এই যে, বৃটিশ সরকার ইচ্ছা করিয়াই হিটলারকে এই 'ভুল' করার সুযোগ দিয়াছিলেন। কারণ, এই 'ভুলের' মধ্যেই বৃটেনের ত্রাণ পাওয়ার পথ ছিল এবং হেস মিশনকে বৃটিশ সরকার এমনভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যাতে হিটলার এই ভুলের ফাঁদে পা দেন এবং এ জন্যই হেস সম্পর্কে বৃটিশ সরকার চুপচাপ ছিলেন। সেই সময় সুবিখ্যাত সাম্যবাদী লেখক রজনী পাম দত্তও তাঁর 'লেবর মান্থলি' (১৯৪১, আগস্ট) কাগজে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং হেস মিশন সম্পর্কে চার্চিল সরকারের রহস্যজনক নীরবতার উল্লেখ করিয়া মন্তব্য

১। British Foreign Policy During World War II—V. Trukhanovsky, Moscow, 1970, P. 151-53.

করিয়াছিলেন যে, বৃটিশ কুটনীতি কি হেসকে দ্বিধার তরবারির মত ব্যবহার করিয়াছিল ? অর্থাৎ হেসের ব্যাপারে নিঃশব্দ থাকিয়া হিটলারকে সোভিয়েট আক্রমণে প্রথমে উস্কানি দেওয়া এবং পরে সোভিয়েট যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িলে পাল্টা জার্মানীকে আবার আঘাত হানা ?—একমাত্র ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য দলিলপত্রই এই ঘটনার উপর আলোকপাত করিতে পারে।

কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই দলিলপত্র প্রকাশিত হয় নাই। তবে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট হিটলারকে সোভিয়েট আক্রমণে 'ফ্রী হ্যাণ্ডের' কল্পিত সুযোগ দিয়া নিজেরা কিন্তু স্থির করিলেন যে, হিটলার যদি সত্যসত্যই রাশিয়া আক্রমণ করে, তবে, বৃটেন সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে একত্রে হিটলারকে বাধা দিবে। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন তারিখটি যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই বৃটিশ সরকারী ও সামরিক নেতারা প্রশ্নটি সম্পর্কে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময় চার্চিলের অন্যতম ঘনিষ্ঠ যুদ্ধ-সহযোগী জেনারেল ইজমে লিখিয়াছেন যে, স্পষ্টতঃই এ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। জুন মাসে বৃটেনের প্রধান প্রধান রক্ষণশীল পত্রিকাগুলি পর্যন্ত আগেকার সোভিয়েট বিরোধিতার সুর পাল্টাইয়া ফেলিয়া রাশিয়ার প্রতি মিত্রতার মনোভাব দেখাইতে লাগিলেন এবং এই ইঙ্গিত দিলেন যে, রাশিয়া যদি আসন্ন যুদ্ধে জার্মানীকে শীতকাল পর্যন্ত আটকাইয়া রাখিতে পারে, তবে, সমগ্র যুদ্ধের গতিই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং বসন্তকালে বৃটেনের শক্তিও আগের তুলনায় অনেক বাড়িয়া যাইবে। বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী এণ্টনি ইডেন লণ্ডনে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত আই এম মৈস্কির সঙ্গে ১০ই এবং ১৩ই জুন দেখা করিয়া বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এই আশ্বাস দিলেন যে, তাঁরা আসন্ন আক্রমণ সম্পর্কে যে সমস্ত খবর পাইয়াছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা সোভিয়েট সরকারকে বলিতে পারেন যে, আক্রান্ত হইলে তাঁরা রাশিয়াকে কেবল অর্থনৈতিক সাহায্যই দিবেন না, যথাসাধ্য জার্মান অধিকৃত পশ্চিম অঞ্চলে বোমারু অভিযান চালাইবেন এবং সামরিক পরামর্শের জন্য একটি মিলিটারি মিশনও মস্কোতে পাঠাইবেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, সোভিয়েট রাশিয়া হিটলার কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল ১৯৪১, ২২শে জুন সন্ধ্যায় রাশিয়ার প্রতি সহানভূতি প্রকাশ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া যে বেতার-বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেই সম্পর্কে সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর বৃটিশ সরকারী নীতি পূর্বাহ্ণেই স্থির হইয়া গিয়াছিল। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও পরামর্শ করা হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ১৯৪০'এর জুন মাসে ফ্রান্সের পতনের পর ১৯৪১ সালের জুন মাসে রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পুরা এক বছর বৃটেন একাকী হিটলারী আগ্রাসনের মুখোমুখি দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু তার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া দায়ী ছিল না, ছিল বৃটিশ শাসক ও অভিজাত মহলের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস এবং মিউনিকপন্থীদের আত্মঘাতী ও সর্বনাশকর ফ্যাসিস্ট তোষণনীতি। এমন কি বৃটেনের সুবিখ্যাত জুরিস্ট ও বামপন্থী নেতা ডি এন প্রিট পর্যন্ত তাঁর আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, বৃটেন 'একাকী' হিটলারী আক্রমণের মুখে দাঁড়াইবার জন্য যে গর্ব করে, (জনগণের পক্ষে অবশ্যই গর্ববোধের কারণ আছে) তাতে শাসক চক্রের বরং এই ভাবিয়া লজ্জাবোধ করা উচিত যে, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীতে যখন ধিক্কার উঠিয়াছিল, তখন বৃটিশ নেতারা এমনভাবে তাঁদের

রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর কোন দেশই তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল না ![১]

* * *

হিটলারের বিশ্বস্ত সহকর্মী রুডলফ্ হেসের অতর্কিতে বৃটেনে আবির্ভাবের (১০ই মে, ১৯৪১) ফলে যে রহস্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাতে নানা সন্দেহ, গবেষণা এবং জল্পনা-কল্পনার উদ্রেক করিল। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে হেস অত্যন্ত শোচনীয় দশায় পৌঁছিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৫, ১০ই অক্টোবর তাঁকে বৃটিশ আটক বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিয়া ন্যুরেমবার্গে পাঠানো হইয়াছিল আন্তর্জাতিক আদালতে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বিচারের জন্য। সেখানে তাঁর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। স্মৃতি ভ্রংশতার জন্য তাঁর প্রতি আন্তর্জাতিক আদালত থেকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল।* বৃটেনে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় তাঁর কেবলই সন্দেহ হইয়াছিল যে, ইংরাজরা তাঁকে বিষপ্রয়োগে মারিবার চেষ্টা করিতেছে এবং তিনি নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি দুইবার আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছেন !

অর্থাৎ হেস মানসিক দিক দিয়া সুস্থ ছিলেন না। কিন্তু অন্যান্য নাৎসী নেতারাই কি সুস্থ ছিলেন ?

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃঃ ১৫৪-৫৭

* রুডলফ হেস এখনও পশ্চিম জার্মানীর সুরক্ষিত কারাগারে (যুদ্ধাপরাধীদের জন্যে) বন্দী আছেন। বয়স ৯১, জন্মদিনে তার স্ত্রী (৮৫) সাক্ষাৎ করেছেন।—সংবাদ ৪. ৫. ৮৫—স্প্যাণ্ডার্ড জেল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

'সারা পৃথিবীর দম বন্ধ হবে!'

—রাশিয়া আক্রমণের পূর্বাহ্নে হিটলার

১৯৪০ সালের খৃস্টমাস বা বড়দিন উৎসবের ঠিক পূর্বাহ্নে হিটলার সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে পাকা করিয়া ফেলিলেন এবং এই পরিকল্পনা ছিল বিরাট ও জাঁদরেল আকারের। বলা বাহুল্য যে, হিটলারের এই সংকল্প বহুদিনের। এমনকি তাঁর ১৯২৪-২৫ সালের 'মেইন ক্যাম্প' রচনার সময় এবং জার্মান রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের সময় থেকেই তাঁর সমরায়োজন ও প্রস্তুতির আসল লক্ষ্য ছিল পূর্বদিকে এবং এই পূর্বদিকের অভিযান সফল করার জন্যই একদিকে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির আড়াল সৃষ্টির দ্বারা দুই রণাঙ্গনের দায়িত্ব এড়ানো এবং অন্যদিকে একে একে ইউরোপীয় রাজ্যগুলি অধিকার। ১৯৪০-৪১ সালের শীত ও বসন্তকালেও হিটলার বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে আক্রমণের ধাপ্পা দিয়া আসলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি ও সৈন্য সমাবেশ ঘটাইতেছিলেন। 'অপারেশন সী-লায়নের' ছদ্মবেশে 'অপারেশন বার্বারোসা'র প্রস্তুতিই চলিতেছিল। ১৯৪০, ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের সেই ইতিহাস বিখ্যাত ডাইরেক্টিভ নং ২১ বা অপারেশন বার্বারোসা যে বার্লিনে সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভের সঙ্গে নভেম্বর মাসের ব্যর্থ আলোচনার পর জারী করা হইয়াছিল, সেকথা চতুর্থ অধ্যায়েই বলা হইয়াছে। কিন্তু অপারেশন বার্বারোসার নির্দেশনামা জারী ইতিহাসের বিচারে হিটলারী জার্মানীরই যে মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষরের মত ছিল, সেকথা সেদিন অবশ্য জানা ছিল না। এই অভিশপ্ত হুকুমনামার শিরোনাম ছিল :—

Operation Barbarossa

Top secret

The Fuehrar's Headquarters December 18, 1940

The German Armed Forces must be prepared to crush Soviet Russia in a quick campaign before the end of the war against England…

Preparations…are to be completed by May 15, 1941. Great precaution has to be exercised that the intention of an attack will not be recognised.

এই হিটলারী অনুজ্ঞার আরম্ভের মর্ম এই যে, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই সোভিয়েট রাশিয়াকে এক দ্রুত আক্রমণের দ্বারা চূর্ণ করার জন্য জার্মান সশস্ত্র বাহিনীকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

১৯৪১, ১৫ই মে'র মধ্যে এই আক্রমণের আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হইবে।

কিন্তু সাবধান, আক্রমণের উদ্দেশ্যের কথা কেউ যেন টের না পায় এমনভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।...

এখানে লক্ষ্য করা উচিত যে, 'ইংলন্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই' কথাটি হিটলার স্বেচ্ছায় বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করিয়াছিলেন। কারণ, ইংলন্ডকে হাতেকলমে আক্রমণ ও ধ্বংস করার কোন 'আন্তরিক' ইচ্ছা হিটলারের ছিল না। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ইংলন্ডকে ভয় দেখাইয়া ও ধাপ্পা দিয়া নত করা কিংবা জার্মানীর সঙ্গে একটা আপস রফায় বাধ্য করা। নৌ-অভিযানে হিটলারের কোন রুচি ছিল না এবং তেমন উপযুক্ত নৌ-শক্তিও জার্মানীর ছিল না। তাঁর বরাবরই আসল লক্ষ্য ছিল পূর্বদিকে 'বলশেভিক বর্বরদের' দেশ! কিন্তু ১৯৪১ সালের মে মাসে বাস্তব কারণেই সেই অভিযান সম্ভব ছিল না। কারণ, ইতিমধ্যে সমগ্র বলকান অঞ্চল কিংবা রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্তের দক্ষিণ-পূর্ব দেশ দখল করিয়া নিতে হিটলারের যে সময় লাগিল, তার ফলে গ্রীষ্মকাল বা জুন মাসের আগে অপারেশন বার্বারোসা কার্যকর করা সম্ভব হইল না।

কিন্তু হিটলার তাঁর ২১ নং নির্দেশনামায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের সাঙ্কেতিক নাম হিসাবে 'অপারেশন বার্বারোসা' শব্দটি যে ব্যবহার করিলেন, তার তাৎপর্য কি? এটি একটি খুব পুরানো নাম। আনুমানিক ১১২৩-৯০ খৃস্টাব্দের জার্মান রাজা ও রোমান সম্রাট 'ফ্রেডেরিক প্রথম' তাঁর লাল দাড়ির জন্য 'বার্বারোসা' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি অনেক যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। কয়েকটি যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ বড় যুদ্ধে হারিয়াছিলেন। কিন্তু জার্মান জঙ্গীবাদীরা তাঁর নামে খুব জয়ধ্বনি করেন এবং তাঁকে কেন্দ্র করিয়া অনেক উপাখ্যানও গড়িয়া তোলা হইয়াছে। তার মধ্যে একটি উপাখ্যান এই যে, বার্বারোসা থুরিঙ্গিয়ার কিফ্‌হাউসার পর্বতে জীবন্ত অবস্থায়ই প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং একদিন উপযুক্ত সময়ে তিনি তাঁর এই আশ্রয় থেকে বাহির হইয়া জার্মানীকে আবার পূর্বদিকের অভিযানে পরিচালনা করিবেন![২]

বার্বারোসা নামের মাহাত্ম্য এখানে। অবশ্য হিটলার বার্বারোসার চেয়ে শোচনীয় পরাজয় মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪০-৪১ সালের ইতিহাসে নিশ্চয়ই সেকথা লেখা ছিল না। বরং অপারেশন বার্বারোসার 'জেনারেল পারপাস' বা সাধারণ লক্ষ্য হিসাবে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—

'The mass of the Russian Army in Western Russia is to be destroyed in daring operations by driving forward deep armoured wedges and the retreat of intact, battle-ready troops into the wide spaces of Russia is to be prevented. The ultimate objective of the operation is to establish a defence line against Asiatic Russia from a line running from the Volga to Archangel.'

এর মর্মার্থ—পশ্চিম রাশিয়ায় রুশ সৈন্যবাহিনীর বৃহত্তম অংশকে দুঃসাহসিক রণক্রিয়ার দ্বারা যান্ত্রিক সৈন্যদের সাহায্যে বহু দূর পর্যন্ত কীলকবিদ্ধ করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হইবে এবং রণসাজে সজ্জিত ও অক্ষত রুশ সৈন্যেরা যাতে রাশিয়ার

বৃহৎ প্রান্তরে পিছু হটিয়া যাইতে না পারে, তেমনভাবে পলায়ন পথ বন্ধ করিতে হইবে। এই রণক্রিয়ার চরম লক্ষ্য হইতেছে ভল্গা নদী থেকে আর্চেঞ্জেল পর্যন্ত দীর্ঘ রেখা ধরিয়া এশিয়াটিক রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি ডিফেন্স (প্রতিরক্ষা) লাইন গড়িয়া তোলা। সোজা কথায় সমগ্র ইউরোপীয় রাশিয়া দখল করিয়া নেওয়া।

অতঃপর কিভাবে রাশিয়াকে আক্রমণ করিতে হইবে, তাও এই নির্দেশনামায় বিস্তৃত আকারে বলা হইয়াছে। রুমানিয়া ও ফিনলাণ্ডের কি ভূমিকা হইবে, তাও নির্দেশ করা হইয়াছে। এই দুইটি দেশকে একান্ত উত্তরের ও একান্ত দক্ষিণের দুই পার্শ্ব দেশ থেকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'লম্ফ দেওয়ার' ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করা হইবে। ফিনিশ-জার্মান সৈন্যরা উত্তরে ফিনল্যাণ্ড থেকে লেনিনগ্রাদ ও লাডোগা হ্রদের দিকে আক্রমণ চালাইবে এবং মেরু সমুদ্রের বরফমুক্ত রুশ বন্দর মরমনস্ক্ দখল করিয়া নিবে। নরওয়ে থেকে সুইডেনের উপর দিয়া জার্মান সৈন্যদের চলাচলে সুইডেন সম্মতি দিবে (হিটলারের এই ধারণা সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল)। নরওয়ে, (জার্মান সৈন্যরা ইতিপূর্বেই এই দেশ দখল করিয়াছিল) সুইডেন ও ফিনলাণ্ড, এই সমগ্র অঞ্চলটাই রণনীতির বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এজন্যই বিশেষভাবে এই এলাকার কথা উল্লিখিত হইয়াছিল।

আক্রমণের মূল ধারা সম্পর্কে হিটলার নির্দেশ দিলেন যে, প্রিপেট জলাভূমির দুই দিকে এই মূলধারা বিভক্ত হইবে। এই জলাভূমির উত্তর থেকে সবচেয়ে বড় আঘাত হানিতে হইবে দুইটি পুরা আর্মি গ্রুপ সহ, এক বাহু বাল্টিক রাজ্য দিয়া লেনিনগ্রাদ পর্যন্ত প্রসারিত হইবে। অন্য বাহু আরও দক্ষিণে হোয়াইট রাশিয়ার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবে এবং তারপর ঘুরিয়া গিয়া উত্তরদিকে প্রথম বাহুর সঙ্গে মিলিত হইবে। এভাবে বাল্টিক রাজ্যগুলি থেকে পলায়নপর সোভিয়েট সৈন্যদের যা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তারা বেষ্টিত হইয়া ধরা পড়িবে। হিটলার জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, একমাত্র তখনই মস্কোর বিরুদ্ধে অভিযান চালইতে হইবে। কারণ, রাজধানী দখল করিতে পারিলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া চূড়ান্ত জয় অর্জিত হইবে এবং রাশিয়ার রেল ও সড়কের সবচেয়ে বড় জংশনও সেই সঙ্গে করায়ত্ত হইবে। অস্ত্রোৎপাদনের কারখানার দিক থেকেও মস্কোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

তৃতীয় আর্মি গ্রুপ প্রিপেট জলাভূমির দক্ষিণে ইউক্রাইনের ভিতর দিয়া কিয়েভের দিকে অগ্রসর হইবে এবং এদের প্রধান লক্ষ্য হইবে এই অঞ্চলের সোভিয়েট সৈন্যদিগকে তাড়াইয়া নিয়া গিয়া নীপার* নদীর পশ্চিমে ধ্বংস করা। আরও দক্ষিণে জার্মান ও রুমানিয়ান বাহিনী একত্রে ওডেসা বন্দরের দিকে অভিযানকারী মূল বাহিনীর পার্শ্বদেশ রক্ষা করিয়া চলিবে এবং এই আক্রমণ কৃষ্ণসাগরের উপকুল ধরিয়া ধাবিত হইবে। তারপর ডনেজ বেসিনের বা ডননদীর অববাহিকার দিকে আক্রমণ চলিবে। সেখানেই সোভিয়েট শ্রমশিল্পের শতকরা ৬০ ভাগ অবস্থিত এবং এই ডনেজ বেসিন দখল করা হইবে।

গোড়াতেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১৯৪০-এর বড়দিনের ঠিক প্রাক্কালে হিটলার সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণে এই জাঁদরেল পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিলেন। এই পরিকল্পনা এমন নিপুণভাবে তৈরি হইল যে, এর বড় একটা রদবদলের প্রয়োজন হইল না। এভাবে রুশ আক্রমণের প্ল্যান পাকা করার পর হিটলার অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে চলিয়া

* Dneiper—বাংলায় নীপার নামে প্রচলিত

গেলেন রাশিয়া থেকে দূরে, অনেক দূরে ইংলিশ চ্যানেলের তীরে তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে বড়দিনের উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য!...

কিন্তু অপারেশন বার্বারোসা সম্পর্কে খুব গোপনীয়তা অবলম্বিত হইল। এর মাত্র ৯ কপি প্রস্তুত করা হইল এবং যথারীতি 'টপ সিক্রেট' বা 'চরম গোপনীয়' মার্কা দিয়া। এই ৯ কপি দলিলের মধ্যে মাত্র ৩ কপি তিনটি সশস্ত্র সার্ভিসের—স্থল, জল ও বিমানবাহিনীর বড়কর্তাদের দেওয়া হইল। বাকিগুলি জার্মান সামরিক হাইকমাণ্ডের (ও-কে-ডবলিউ) হেপাজতে অতি সতর্ক পাহারায় রাখিয়া দেওয়া হইল। এমন কি শীর্ষস্থানীয় ফিল্ড-কমাণ্ডারদেরও এই ধাপ্পা দেওয়া হইল যে, এই প্ল্যানটা কেবলমাত্র সতর্কতাস্বরূপ—পাছে রাশিয়া জার্মানী সম্পর্কে মত বদলায়, সেজন্যই সাবধানতা হিসাবে তৈরি করিয়া রাখা হইল।...

৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখ (১৯৪১) বার্লিনে সামরিক হাইকমাণ্ডের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে হিটলারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল দুপুর থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। এই বৈঠকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা লইয়া বিস্তৃত আলোচনা হইল। জেনারেল হ্যালডার এবং ব্রাউসিৎস আর্মি জেনারেল স্টাফের প্ল্যানগুলি নিয়া আলোচনা করিলেন এবং এক বিরাট পরিকল্পনার বিস্তৃত রূপ দেখিয়া রণাঙ্গনের বিরাট দৈর্ঘ্য ও বিশালতায় হিটলারের কল্পনা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। যদিও রাশিয়ার হাতে প্রচণ্ড মার খাওয়ার পর পরাজিত জার্মানীর শীর্ষস্থানীয় সেনাপতিরা সমস্ত দোষ হিটলারের ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং নুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে সাফাই গাহিয়াছেন যে, তাঁরা হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের পরিকল্পনায় আপত্তি করিয়াছিলেন ও বাধা দিয়াছিলেন, এমন কি কোন কোন সেনাপতি হিটলারের সামরিক জ্ঞানের বিদ্রূপ করিয়া পরবর্তীকালে বই পর্যন্ত লিখিয়াছিলেন, তবু হিটলারের সঙ্গে সামরিক বৈঠকের সরকারি রিপোর্টে ও দলিলে এবং জেনারেল হ্যালডারের প্রকাণ্ড ডায়েরীর কোথাও এই আপত্তির কিংবা বাধা দেওয়া সম্পর্কে একটি শব্দেরও উল্লেখ পাওয়া যায় না। এ্যালান বুলক কিংবা উইলিয়াম শাইরারের মত খ্যাতনামা বৃটিশ ও মার্কিন ঐতিহাসিকরা (যারা মোটেই সোভিয়েট পক্ষপাতী নন) পর্যন্ত স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, বড় বড় জার্মান সেনাপতিরা হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের পরিকল্পনায় কোন বাধা দেন নাই তো বটেই, বরং তাঁরা সমর্থন এবং সোৎসাহে উভয় পক্ষের সম্ভাব্য শক্তি সমাবেশের ও সৈন্যসংখ্যা ইত্যাদির হিসাবনিকাশ করিয়াছেন, গভীরভাবে ও নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা করিয়াছেন—

...businesslike estimate of opposing forces', (—শাইরার)

রুশ সৈন্যবাহিনী অতি দ্রুত যে খতম হইয়া যাইবে এই বিষয়ে হিটলারের বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না এবং কোন কোন বিস্তৃত খুঁটিনাটির আলোচনায় সেনাপতিদের যদিও বা কোন সন্দেহ থাকিয়া থাকে হিটলারের তাও ছিল না। হিটলার সেনাপতিদের নিকট বার বার দাবী করিতেছিলেন যে, রুশ সৈন্যরা যেন কিছুতেই পিছু হটিয়া দেশের অভ্যন্তরভাগে চলিয়া যাইতে না পারে। সীমান্তের যত কাছাকাছি সম্ভব প্রধান প্রধান রুশ বাহিনীগুলিকে ঘেরাও করিয়া সাবাড় করিতে হইবে এবং এর উপরেই সবকিছু নির্ভর করিতেছে। 'দেখা দরকার তারা যেন কিছুতেই পলাইয়া যাইতে না পারে, শত্রুকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে হইবে।' হিটলার আশ্বাস দিলেন যে

ফিনল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং হাঙ্গেরীও এই অভিযানে যোগদান করিবে। তবে, গোপনীয়তা রক্ষার খাতিরে রুমানিয়াকে একেবারে শেষ মুহূর্তের আগে জানানো হইবে না। প্রত্যেকটি আর্মি গ্রুপের জন্য অপারেশন বা রণক্রিয়ার যে প্ল্যান তৈরি হইয়াছিল, হিটলার সেগুলির প্রত্যেকটি পরীক্ষা করিলেন এবং খুশি হইলেন। তিনি সেনাপতিদের বলিলেন—'একথা যেন কখনও ভুলিয়া না যাই যে, আমাদের আসল লক্ষ্য হইতেছে বাল্টিক রাজ্যগুলি ও লেনিনগ্রাদ দখল করিয়া নেওয়া···তারপর আক্রমণের বিরাট পরিকল্পনায় নিজেই উত্তেজিত হইয়া সোল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিলেন ঃ

"When Barbarossa commences, the world will hold its breath and make no comment !"[১]

'যখন বার্বারোসা রণ-পরিকল্পনা শুরু হইবে, তখন সারা পৃথিবীর দম বন্ধ হইয়া যাইবে এবং কেউ টু শব্দটিও করিবে না !'

হিটলারের এই উচ্ছ্বাস নিতান্তই বাগাড়ম্বর কিংবা স্নায়বিক উত্তেজনা মাত্র ছিল না। কারণ, এত বড় আক্রমণ সত্যসত্যই ইতিহাসে যেমন ঘটে নাই, তেমন আক্রমণের ব্যাপকতা ও বিশালতা দেখিয়া দুনিয়ার দম প্রায় বন্ধ হইয়াছিল !···

ইতিমধ্যে হিটলার গোপনীয়তার আড়ালে পূর্বদিকে জার্মান সৈন্য সমাবেশ করিতে লাগিলেন এবং ডবল ধাপ্পা হিসাবে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, এই সমাবেশের উদ্দেশ্য হইল ইংল্যাণ্ড ও গ্রীসের বিরুদ্ধে আক্রমণের আয়োজন গোপন করা।

এক মাস পর মার্চ মাসের গোড়ার দিকে সামরিক নেতাদের সঙ্গে হিটলারের আর একটি বৈঠক হইল। যাঁরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণে অংশ গ্রহণ করিবেন, সেই সমস্ত সিনিয়র সেনাপতিকে এই বৈঠকে ডাকা হইল। এই বৈঠকে হিটলার বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, বাল্টিক ও বলকান রাজ্যগুলিতে রাশিয়া যেভাবে 'সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি' লইয়া অগ্রসর হইতেছে, তাতে জার্মানীর বিরুদ্ধে তার আক্রমণের মতলবই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং এই নিশ্চিত আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্যই পাল্টা সামরিক পন্থা অবলম্বন করিতে হইতেছে। এমন কি ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে একটা গোপন চুক্তি পর্যন্ত হইয়াছে এবং এই চুক্তির জন্যই ইংল্যাণ্ড জার্মানীর শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

(পরবর্তীকালে হিটলার ও তাঁর সেনাপতিরা এই সমস্ত মনগড়া যুক্তি খাড়া করিয়া রাশিয়া আক্রমণের সাফাই হিসাবে 'প্রিভেণ্টিভ ওয়ার' বা প্রতিরোধাত্মক যুদ্ধের থিওরি প্রচার করিয়াছিলেন।)

এই সময় নাৎসী জার্মানীর নৌ-বিভাগীয় সেনাপতিরা এবং জেনারেল রোমেল পর্যন্ত ভূমধ্যসাগর, সুয়েজ খাল ও মিশর দখলের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যকে 'মারাত্মক আঘাত' হানার জন্য হিটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিটলার আগে সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ ও ধ্বংস করার জন্য মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অতএব ঐ কার্য সম্পন্ন হওয়ার আগে তিনি ভূমধ্যসাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্তী বৃটিশ শক্তিকে চূর্ণ করার জন্য তেমন আঘাত হানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আগে রাশিয়া, তারপর অন্য কথা—সংক্ষেপে এটাই ছিল তাঁর মনের ভাব। অতএব বলকান অঞ্চলে যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীস দখলের

১। উইলিয়াম শাইরার—পৃঃ ৯৬৯-৭১ এবং ৯৮৪

পর হিটলার রাশিয়া আক্রমণ বা অপারেশন বার্বারোসার জন্য নূতন তারিখ স্থির করিলেন—২২শে জুন, ১৯৪১।...

এখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সবচেয়ে বীভৎস ও সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধ সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নির্বিচারে যুদ্ধবন্দী সাবাড় ও অধিকৃত অঞ্চলের নরনারী ও শিশু হত্যার যে কল্পনাতীত পৈশাচিক কাহিনীগুলি লইয়া সারা পৃথিবী তোলপাড় হইয়াছিল এবং আন্তর্জাতিক আদালতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও দণ্ড হইয়াছিল, সেই সমস্ত অপরাধের মূল উৎসের সন্ধানও এখানে পাওয়া যাইবে। রাজনৈতিক মতবাদ ও জাতি বিদ্বেষের সঙ্গে সোভিয়েট বন্দী ও নরনারী সাবাড়ের পরিকল্পনাও একসূত্রে বাঁধা ছিল। কারণ, মনে রাখা দরকার এই বৈঠকেই হিটলার টেরর্ বা বিভীষিকা সৃষ্টির ভয়ংকর পরিকল্পনা জার্মান সেনাপতিদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কেবল ব্যক্ত নয়, এগুলি কার্যকর করার জন্য সুনির্দিষ্ট হুকুম জারী করিয়াছিলেন। ন্যুরেমবার্গের আদালতে উত্থাপিত দলিলপত্রের দ্বারা এগুলি প্রমাণিত হইয়াছে। এই টেরর্ সৃষ্টি সম্পর্কে হিটলার নির্দেশ দিলেন :

'The war against Russia will be such that it cannot be conducted in a chivalrous fashion. This struggle is one of ideologies and racial differences and will have to be conducted with unprecedented merciless and unrelenting harshness. All officers will have to rid themselves of obselete ideologies. I know that the necessity for such means of waging war is beyond the comprehension of you generals but···I insist absolutely that my orders be exeuted without contradiction···The (Russian) commissars are bearers of an ideology directly opposed to National Socialism. Therefore the commissars will be liquidated. German soldiers guilty of breaking international law···will be excused. Russia has not participated in the Hague convention and therefore has no rights under it.'[১]

এই আদেশের অর্থ এই যে, 'সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোন ক্ষাত্রধর্মের বা বীরধর্মের স্থান নাই। এই যুদ্ধ মতাদর্শগত এবং জাতি বৈষম্যগত এবং সেভাবেই এই যুদ্ধকে অভূতপূর্ব নির্দয়তা ও বিরামহীন নির্মমতার সঙ্গে চালাইতে হইবে। সমস্ত অফিসারদেরই তাদের পুরাতন ধ্যান-ধারণা বিসর্জন দিয়া চলিতে হইবে। আমি জানি, আপনারা যাঁরা সৈন্যাধ্যক্ষ, তাঁদের পক্ষে এমন পন্থায় যুদ্ধ চালানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা আপনাদের উপলব্ধির বাইরে। কিন্তু আমার এই আদেশ বিনা প্রতিবাদে ও সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লইবেন এবং কার্যক্ষেত্রে পালন করিবেন—এটাই আমি বার বার জোর দিয়া বলিতে চাই। রুশ কমিশারগণ এমন মতবাদের বাহক, যেটা ন্যাশনাল সোসিয়ালিজম (নাৎসীবাদের) সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং এই কমিশারদিগকে সাবাড় করিতে হইবে। যে সমস্ত জার্মান সৈন্য আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের জন্য অপরাধী হইবে, তাদের ক্ষমা করা হইবে। রাশিয়া যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত হেগ বিধানাবলীর

১। Hitler—by Allan Bullock, P. 640-41.
The Rise & Fall of the Third Reich—by William shirer. P. 993

সম্মেলনে যোগ দেয় নাই, অতএব সেই সমস্ত বিধান অনুসারে তার কোন অধিকারও বর্তায় নাই।'*

নাৎসী ডিক্টেটর হিটলারের এই আদেশ যুদ্ধের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। কারণ, নিষ্ঠুরতায় ও বীভৎসতায় এই আদেশ একেবারে নিশ্ছিদ্র এবং এই আদেশ জারী হইয়াছিল স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক। সৈন্য ও সেনাপতিদের পক্ষে এই হুকুম পালন যেমন বাধ্যতামূলক ছিল, তেমনি আইন-কানুন ভঙ্গ করার অপরাধ থেকেও তাদের মুক্তি দেওয়া হইল। সেনাপতিদের মধ্যে এই বে-আইনী, নীতিবিগর্হিত ও নির্মম আদেশ নিয়া কেউ কেউ আপত্তি তুলিল। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু এই ভয়াবহ হুকুমনামা পালিতই হইয়াছিল।

কেবল যুদ্ধবন্দী ও লালফৌজের রাজনৈতিক উপদেষ্টারূপী কমিশারদিগকে (যাঁরা সামরিক বাহিনীরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) নির্বিচারে গুলী করিয়া হত্যারই আদেশ দেওয়া হইল না, সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও ধ্বংস সাধনের আরও অজস্র উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, যেগুলির বর্ণনা দেওয়া এখানে অসম্ভব। তবে, কিছু কিছু নির্দেশ সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন, বার্বারোসা পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত জার্মান প্রশাসনিক কর্তারা (স্টেট সেক্রেটারিগণ) রাশিয়ার অধিকৃত অঞ্চল সম্পর্কে এমন অর্থনৈতিক প্ল্যান তৈরী করিলেন, যার ফলে জার্মান দখলদার বাহিনীকে খাদ্য জোগাইতে গিয়া রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ লোককে স্বেচ্ছায় উপবাসে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইল। তাঁরা পরিষ্কারই বলিলেন যে, অধিকৃত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ঠেকানো যাইবে না। কিন্তু জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ চালাইতে গিয়া এছাড়া কোন উপায়ও নাই। গোয়েরিং, আলফ্রেড রোজেনবার্গ প্রভৃতি পদস্থ নাৎসী নেতারা এই সমস্ত চক্রান্তের অংশীদার ছিলেন। একদিকে খাদ্যের অনটন সৃষ্টির দ্বারা রাশিয়ার জনগণকে অনশনে মারিয়া ফেলা এবং অন্যদিকে হিমলারের এস এস বাহিনী কর্তৃক জার্মান 'নর্ডিকদের' তুলনায় 'হীন ও ছোট জাত' রুশদিগকে সাবাড় করা— সরকারীভাবে এই সমস্ত পরিকল্পনা ঠাণ্ডা মাথায় গৃহীত হইল। অর্থাৎ কেবল হিটলার নন, তাঁর অফিসারেরাও একই পরিকল্পনার অংশীদার ছিলেন!

সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের আগেই নিখুঁত সামরিক নক্সার মত সোভিয়েট জনগণকে উৎসাদনের পরিকল্পনাও পাকাপাকিভাবে স্থির হইয়াছিল। এই সমস্ত আদেশ লিখিতভাবেই দেওয়া হইয়াছিল। ১৩ই মে, ১৯৪১, জার্মান গভর্নমেণ্ট এক বিশেষ ডিক্রি জারি করিয়া—

(Exercise of Military Jurisdiction in the 'Barbarossa' Area and Special Measures for the Troops)

সৈন্যদিগকে হুকুম দিলেন বে-সামরিক জনগণের প্রতি নির্দয় হওয়ার জন্য— যাদের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র প্রতিরোধের সন্দেহ হইবে, তাদের গুলী করিয়া হত্যার জন্য! এই সমস্ত সন্দেহভাজন লোককে বিচার বা গ্রেপ্তার না করিয়া সোজাসুজি মারিয়া ফেলার জন্য হুকুম দেওয়া হইল। এক একটি সমগ্র জেলার জনগণকেই দণ্ড দেওয়ার

---

* ১৮৯৯ ও ১৯০৭ খৃস্টাব্দে যুদ্ধ ও যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত আইন-কানুন সম্পর্কে হেগ শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলন ও প্রধান শক্তিবর্গ কর্তৃক ঐগুলির গ্রহণ।

A Dictionary of International Affairs—Hyamson. London, 1946. P. 127.

জন্য বিধান দেওয়া হইল এবং এই সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব থেকে সমস্ত জার্মান অফিসার ও সৈন্যদিগকে রেহাই দেওয়া হইল। রাশিয়ার সম্পদ লুটপাট করিয়া জার্মান সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে, এমন লোভও দেখানো হইল। শহরে ও গ্রামে এই অবাধ লুণ্ঠনের সঙ্গে রাশিয়ার স্ত্রীলোকদিগকে বলাৎকার করার ঢালাও অনুমতি দেওয়া হইল এবং ইচ্ছামত হত্যা বা অন্যান্য অপরাধ অনুষ্ঠানে বাধা না দিয়া প্রশ্রয় দেওয়া হইল।

ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে উত্থাপিত অসংখ্য দলিলপত্র থেকে এই সমস্ত বর্বরতার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে এবং সামরিক ঐতিহাসিকগণ নানা পুস্তকে সেগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন, হিটলার সোভিয়েট রাশিয়ার জনগণের পাইকারি হত্যা সম্পর্কে জার্মান রক্তের বিশুদ্ধতার সাফাই গাহিয়া 'কীটপতঙ্গের' মত বংশ বৃদ্ধিকারী ওই 'ছোটলোকগুলি'কে সাবাড় করার যে বীভৎস হুকুম জারি করিয়াছিলেন, সেটি এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে:

'We must exterminate the population for this is part of our mission of safeguarding the German population. We shall have to develop techniques for anihilation···since I am sending the flowers of the German nation into the inferno of war, spilling precious German blood without a tinge of remose, I am surely entitled to destroy millions of people of a lower race, who are multiplying like worms.'

হিটলারের চিন্তার মধ্যে কি পরিমাণ বীভৎসতা ও পৈশাচিকতা ছিল, সে কথা বুঝিবার পক্ষে বোধ হয় এই একটি মাত্র আদেশই যথেষ্ট। এই সঙ্গে সোভিয়েট যুদ্ধবন্দীদিগকে যে পাইকারি হারে (ম্যাস কিলিং) বা গণহত্যার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল, সেকথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। সামরিক হাইকমাণ্ডের সদর দপ্তরে লেঃ জেনারেল রেইনেকের (Reinecke) অধীনে একটি যুদ্ধবন্দী ডিপার্টমেণ্ট খোলা হইয়াছিল এবং সেখানে ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে একটি গুপ্ত বৈঠকে 'যুদ্ধবন্দীদের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হইবে' সেই নির্দেশ তৈরী হইল এবং তাতে রুশ যুদ্ধবন্দীদিগকে পাইকারি হত্যার ও না খাইয়ে মেরে ফেলার কথা বলা হইল। বে-সামরিক জনগণ সম্পর্কেও ওই একই নীতি প্রযোজ্য হইল।

রাশিয়ার জনপদ ও শহরগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলারও পরিকল্পনা হইল। জার্মান জেনারেল স্টাফের একটি সরকারী দলিলে বলা হইয়াছে—

'ফুরার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পিটার্সবুর্গ (লেনিনগ্রাদ) শহরকে ধরা পৃষ্ঠ হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলা হইবে। সোভিয়েট রাশিয়ার পরাজয়ের পর এই ঘনবসতিপূর্ণ নগরীকে আর জিয়াইয়া রাখার কোন প্রয়োজন হইবে না।'

ফুরার এই 'মহৎ সিদ্ধান্ত' করিয়াছিলেন ফিনিশ নেতাদের সঙ্গে একত্রে। লেনিনগ্রাদের বিরুদ্ধে আক্রমণে ফিনল্যাণ্ডের যোগদানের পুরস্কারস্বরূপ ইস্ট্ ক্যারেলিয়া ঘুষ দানেরও প্রস্তাব হইল।

অন্যান্য যে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক।

তবে, এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, এস এস বাহিনীর রাজনৈতিক পুলিশ অধিনায়ক হিমলারকে রাশিয়ার অধিকৃত অঞ্চলগুলির 'রাজনৈতিক প্রশাসনের' জন্য অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হইল। সোভিয়েট শাসন ও সমাজব্যবস্থা সমূলে উৎপাটনের জন্য হিমলার তাঁর ইচ্ছামত যে কোন পন্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন, এই নিরঙ্কুশ অধিকার দেওয়া হইল। অপর দিকে নাৎসী তত্ত্ববিদ আলফ্রেড রোজেনবার্গকে 'পূর্ব ইউরোপীয় অঞ্চলের' কমিশনার পদে নিয়োগ করা হইল। সোজা কথায় রাশিয়াকে শ্মশানে পরিণত করিবার ব্যবস্থা পাকা হইল এবং এজন্য পদস্থ খুনীদের হাতে অবাধ ক্ষমতা অর্পণ করা হইল।

এদিকে যখন রাশিয়াকে খতম করার উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রকার শয়তানী পরিকল্পনা পাকা করা হইতেছিল, তখন কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া তার চুক্তি অনুযায়ী (১৯৪১, জানুয়ারীতে একটি নূতন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল) সমস্ত প্রকার কাঁচামাল, এমন কি আক্রমণের দিন পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিয়া আসিতেছিল। যদিও পশ্চিমদিকে রাশিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছিল, তথাপি জার্মানীকে খুশী করার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল এবং জার্মানীর মনে কোন সন্দেহ না জাগে এমনভাবে চলিতে চাহিয়াছিল। অন্যদিকে জার্মানী যে রাশিয়া আক্রমণে উদ্যত হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য গোপন করার জন্য নাৎসী ডিক্টেটরও চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়াকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত 'মাল সরবরাহের' ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু ক্রেমলিনেও আসন্ন দুর্বিপাকের ছায়া পড়িল। এজন্য স্ট্যালিন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন ৬ই মে, ১৯৪১,—যে ঘটনা রুশ জনগণকেও উৎকণ্ঠিত করিল। কারণ, স্ট্যালিন এতদিন পর্যন্ত সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারিই ছিলেন, মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি পদে কখনও ছিলেন না। মলোটোভ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এবার তিনি শেষোক্ত পদের সঙ্গে উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু সোভিয়েট সরকারী নেতৃত্বের এই আকস্মিক পরিবর্তনে রাশিয়ায় এবং রাশিয়ার বাইরে এমন ধারণারই সৃষ্টি হইল যে, এমন সংকট আসিতেছে যার জন্য স্বয়ং স্ট্যালিনকে সরকারীভাবে রাষ্ট্রীয় তরণীর হাল ধরিতে হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানীর মন থেকে সন্দেহের লেশমাত্র দূর করিবার জন্য ৮ই মে তারিখে তাস সংবাদ প্রতিষ্ঠান পশ্চিমে রুশ সৈন্য সমাবেশের কথা অস্বীকার করিয়া এক বিবৃতি প্রচার করিল। ৯ই মে তারিখ বেলজিয়াম, নরওয়ে ও যুগোশ্লাভিয়ার নির্বাসিত গভর্নমেন্টসমূহের মস্কোস্থিত প্রতিনিধিদের কূটনৈতিক স্বীকৃতি সোভিয়েট সরকার প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। অপর পক্ষে ১২ই তারিখ ইরাকের জার্মান সমর্থক রসিদ আলী গভর্নমেন্টকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেন। জার্মানীকে কোনভাবে কোন প্ররোচনা দেওয়া হইতে পারে, এমন সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য এই সময় সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল।

মস্কোস্থিত খ্যাতিমান জার্মান রাষ্ট্রদূত কাউন্ট ফন ডের সুলেনবুর্গ (ব্যক্তিগতভাবে তিনি আদৌ নাৎসী পক্ষপাতী ছিলেন না) এপ্রিল মাসে হিটলারকে একটি লিখিত স্মারকলিপি দাখিল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, রাশিয়া শান্তিকামী এবং

জার্মানীর সঙ্গে আদৌ কোন বিরোধ চায় না। জার্মানীর স্টেট সেক্রেটারি ভিজস্যাকারও সুলেনবুর্গের অভিমত সমর্থন করিলেন। কিন্তু হিটলার এই সমস্ত কথায় মন দেওয়ার পাত্র ছিলেন না। অথচ হিটলার রাশিয়াকে আক্রমণ করা সম্পর্কে সুলেনবুর্গকেও বিশ্বাস করিয়া কিছু বলিলেন না, বরং এই উদারতাবাদী শান্তিকামী ভদ্র জার্মান রাষ্ট্রদূত শেষ মুহূর্তের আগেও কিছু জানিতে পারেন নাই। তবে, একটি বিষয়ে তিনি মলোটোভের নিকট আপত্তি জানাইয়াছিলেন। যুগোশ্লাভিয়ার উপর জার্মান আক্রমণের আগের দিন বা ৫ই এপ্রিল তারিখ সোভিয়েট সরকার তাড়াহুড়া করিয়া যুগোশ্লাভ সরকারের সঙ্গে 'অনাক্রমণ ও বন্ধুতা'র যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাতে জার্মান রাষ্ট্রদূত আপত্তি জানাইয়া বলিয়াছিলেন, ব্যাপারটা বড়ই দুর্ভাগ্যজনক। কারণ, চুক্তি স্বাক্ষরের সময়টা খুব খারাপ।

চারদিক থেকে যখন জার্মান সৈন্য সমাবেশের সংবাদ রটিতেছিল এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারী আক্রমণ আসন্ন বলিয়া প্রচারিত হইতেছিল, তখনও ক্রেমলিনের নেতারা তা বিশ্বাস করেন নাই। এমন কি, আক্রমণের সাতদিন আগে পর্যন্ত ১৪ই জুন তারিখ স্ট্যালিনের নির্দেশে তাস নিউজ এজেন্সি আসন্ন রুশ-জার্মান সংঘর্ষের কথা তীব্র ভাষায় অস্বীকার করিয়া এক ইস্তাহার প্রচার করিল। (পরবর্তীকালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট সরকারী ইতিহাসে এজন্য স্ট্যালিনকে কঠোর সমালোচনা করা হইয়াছে।) অর্থাৎ যুদ্ধ এড়ানো ও শান্তি রক্ষার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি, হিটলারের পক্ষ থেকে অপপ্রচার করা হইতেছিল যে, রাশিয়াই জার্মানীকে আক্রমণের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে খ্যাতিমান বৃটিশ ঐতিহাসিক এ্যালান বুলক্ দৃঢ়তার সঙ্গে লিখিয়াছেন—

'There is, in fact not a scrap of evidence to show that, in the summer of 1941, the Soviet Government had any intention of attacking Germany.'

অর্থাৎ ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট জার্মানীকে আক্রমণ করার কোন মতলব করিয়াছিল, এমন কোন প্রমাণের বিন্দুবিসর্গও বাস্তব ক্ষেত্রে পাওয়া যায় নাই।

১৪ই জুন তারিখ তাসের সেই বিখ্যাত বিবৃতিতে যখন জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের গুজবকে 'আজগুবি' বলিয়া নিন্দা করা হইতেছিল, তখন কিন্তু নাৎসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ ছিলেন ভেনিসে এবং ১৫ই জুন তিনি সেখান থেকে এক 'গোপনীয় বার্তা' পাঠাইলেন বুদাপেস্টে—এই গোপন বার্তায় তিনি হাঙ্গেরী গভর্নমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিলেন 'সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বনের' জন্য। 'জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে প্রচুর রুশ সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়াছে'—এই অজুহাত সেই বার্তায় উল্লেখ করা হইল। ভেনিসে রিবেনট্রপ ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিয়ানোর সঙ্গে ক্রোশিয়ার প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন এবং যখন রাত্রে দুই বন্ধু ভেনিসের ক্যানেলে নৌকাবিহার বা গণ্ডোলাতে ডিনার খাইতেছিলেন, তখন চিয়ানো রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মান আক্রমণের গুজব সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন। রিবেনট্রপ অনায়াসে মনের কথা গোপন করিয়া জবাব দিলেন 'প্রিয় চিয়ানো, আমি তোমাকে এখনও কিছু বলতে পারছি না। কারণ, যে-কোন সিদ্ধান্তই ফুয়ারের দুর্ভেদ্য বুকের গোপন কুঠুরিতে

লুকানো থাকে। তবে, একটি বিষয়ে নিশ্চিত জেনো যদি আমরা আক্রমণ করি, তবে স্ট্যালিনের রাশিয়া ৮ সপ্তাহের মধ্যেই মানচিত্র থেকে মুছে যাবে।'

যখন রাশিয়া আক্রমণের মাত্র ১ সপ্তাহ বাকী, তখনও নাৎসী নেতারা তাঁদের বিশ্বস্ত বন্ধু ইতালীকে সেই সম্পর্কে কিছু বলিলেন না—যদিও বলকান রাজ্যগুলিতে একে একে সমস্ত আয়োজন পাকা করা হইতেছিল। হাঙ্গেরী ও রুমানিয়াকে সতর্ক করার পর ১৮ই জুন তুরস্কের সঙ্গে জার্মানীর এক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।...

এদিকে ক্রেমলিনের কর্তারা মোহগ্রস্তের মত যখন জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণের নিশ্চিত আয়োজনকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিয়া মস্কো বেতারে বার্তা প্রচার করিতেছিলেন, তখন কিন্তু সেই ১৪ই জুন তারিখ বার্লিনে হিটলার তাঁর সামরিক নেতাদের সঙ্গে 'বার্বারোসা' সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত বৈঠকের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। সকাল ১১টা থেকে এই বৈঠক চলিল সন্ধ্যা ৬-৩০টা পর্যন্ত, মাঝখানে ২টার সময় লাঞ্চের বিরতি। এই বৈঠকে হিটলার রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে 'হিংস্র পদ্ধতির' দ্বারা 'অভাবনীয় সন্ত্রাস সৃষ্টির' নির্দেশ দিলেন এবং সেনাপতিরা তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করিলেন না।

২১শে জুন রাত্রি সাড়ে নটায়, অর্থাৎ জার্মান আক্রমণ শুরু হওয়ার মাত্র ৯ ঘণ্টা আগে জার্মান রাষ্ট্রদূত সুলেনবুর্গ মলোটোভের সন্ধানে ক্রেমলিনে তাঁর দপ্তরে দেখা করিতে গেলেন। মলোটোভ তাঁকে সীমান্তে জার্মান প্লেন কর্তৃক সোভিয়েট আকাশ লঙ্ঘনের আরও কয়েকটি ঘটনার কথা জানাইলেন। (ইতিপূর্বে ২২শে এপ্রিল আকাশ-সীমা লঙ্ঘনের ৮০টি ঘটনার কথা জানানো হইয়াছিল।)

মলোটোভ তাঁর সঙ্গে আলোচনায় আর একটি বিষয়ের কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন যে, কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে, জার্মান গভর্নমেণ্ট সোভিয়েট সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রবল গুজব রটিয়াছে যে, জার্মানী ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন। কিন্তু জার্মানীর এই অসন্তোষের কারণ কি, তা সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। জার্মান-সোভিয়েট সম্পর্কের মধ্যে এমন অবস্থার কেন উদ্ভব হইল, যদি রাষ্ট্রদূত সেই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করিতে পারেন, তবে মলোটোভ খুব বাধিত হইবেন। রাষ্ট্রদূত বলিলেন যে, তাঁর পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, তাঁর সঠিক সংবাদ জানা নাই।

(উপরের এই অংশ সুলেনবুর্গ কর্তৃক বার্লিনে প্রেরিত জরুরী টেলিগ্রাম থেকে উদ্ধৃত।)

হিটলারী আক্রমণের মাত্র ৯ ঘণ্টা আগে জার্মান-রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মলোটোভের এই হতবুদ্ধিকর আলোচনার 'সারল্য' লক্ষ্য করিলে অবাক হইতে হয়। অথচ ক্রেমলিনের নেতারা মোটেই সরল ছিলেন না এবং সন্দেহবাতিকতাও তাঁদের যথেষ্ট ছিল।

এই সারল্য বা 'বোকামি'র (চার্চিলের মতে) চূড়ান্ত নাটক ক্রমেই যবনিকাপাতের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কারণ, সুলেনবুর্গ-মলোটোভ আলোচনার পরেই বার্লিন ও মস্কোর মধ্যে সেই রাত্রেই বেতার তরঙ্গে একটি দীর্ঘ সাঙ্কেতিক রেডিওবার্তা স্পন্দিত হইতেছিল রিবেনট্রপের কাছ থেকে। সেই সাঙ্কেতিক বার্তা নিম্নলিখিতরূপ—

'...dated June 21, 1941 marked Very Urgent, State Secret, for the Ambassador Personally....'

তারপর আরম্ভ—

'Upon receipt of this telegram, all of the cipher material still there, is to be destroyed. The radio set is to be put out of commission.

Please inform Herr Molotov at once that you have an urgent communication to make to him…Then please make the following declaration to him.'

অর্থাৎ সেই রাত্রে বার্লিন থেকে জরুরী সাঙ্কেতিক তারবার্তায় রাষ্ট্রদূত সুলেনবুর্গকে নির্দেশ দেওয়া হইল ভোরবেলা মলোটোভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জার্মান সরকারের একটি জরুরী ঘোষণা সোভিয়েট সরকারকে জানাইয়া দেওয়ার জন্য। এই তারবার্তার শেষে রিবেনট্রপ সুলেনবুর্গকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন জার্মান সরকারের বিবৃতি নিয়া মলোটোভের সঙ্গে কোন আলোচনা না করেন।

রুশ-জার্মান সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সুলেনবুর্গের চেষ্টা ও আন্তরিকতার কোন অন্ত ছিল না। সুতরাং মানসিক দিক দিয়া তিনি বিপর্যস্ত বোধ করিলেন, কিন্তু নিষ্করুণ কর্তব্য তিনি পালন করিলেন রাষ্ট্রদূত হিসাবে। ভোরবেলা তিনি ক্রেমলিনে গিয়া হাজির হইলেন এবং জার্মান সরকারের ঘোষণাবাণী মলোটোভকে পড়িয়া শুনাইলেন। এই ঘোষণায় হিটলার বহু রকমের মিথ্যা ও বিকৃত তথ্যের অভিযোগ রাশিয়ার বিরুদ্ধে উত্থাপন করিয়া বলিলেন—রাশিয়া রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত, সন্ত্রাস ও গোয়েন্দাগিরিমূলক কার্যকলাপ চালাইয়াছে। বৃটেনের সহিত চক্রান্ত করিয়া রুমানিয়ায় ও বুলগেরিয়ায় জার্মান সৈন্যদের বিরুদ্ধে আক্রমণের মতলব করিয়াছে এবং বাল্টিক থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত দীর্ঘ রণাঙ্গনে রুশসৈন্যবাহিনীগুলির সমাবেশ ঘটিয়াছে। জার্মান রাষ্ট্র যখন তার বাঁচার লড়াইতে ব্যস্ত, তখন তাকে পিছন থেকে আক্রমণে উদ্যত হইয়াছে। সুতরাং ফুরার জার্মান সশস্ত্রবাহিনীকে হুকুম দিয়াছেন সর্বশক্তি দিয়া এই বিপদ প্রতিরোধের জন্য।

—(দীর্ঘ বিবৃতির সংক্ষিপ্ত মর্ম দেওয়া হইল।)

এতদিনে এবং এতক্ষণে মলোটোভের কানে জল গেল। তিনি পাথরের মত স্তম্ভিত হইয়া নিঃশব্দে এই হিটলারী ঘোষণা শুনিলেন এবং ঘোষণাটি শেষ হইয়া যাওয়ার পর বিরস বদনে বলিলেন ঃ

'It is war, Do you believe that we deserved that ?'

'এর অর্থ যুদ্ধ। আপনি কি সত্যি মনে করেন এটা আমাদের প্রাপ্য ছিল ?…'

মস্কোর ক্রেমলিনে যখন এই মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা হইল, তখন বার্লিনের উইলহেলমস্ট্রাসিতে অনুরূপ নাটকের অভিনয় হইল। সেখানে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত ভ্লাদিমির দেকানোজোভ জার্মান প্লেন কর্তৃক সোভিয়েট আকাশ-সীমা লঙ্ঘনের বিষয়ে নাৎসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের কাছে নালিশ জানাইবার কথা যখন ভাবিতেছিলেন, তখন ২২শে জুন রাত্রি ২টায় (আমাদের মতে ২১শে জুন মধ্যরাত্রে) তাঁকে জানানো হইল যে, ভোর রাত্রি ৪টায় পররাষ্ট্র দপ্তরে তাঁর সঙ্গে রিবেনট্রপের সাক্ষাৎ হইবে। মলোটোভের মত দেকানোজোভও এমন একটা আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

অতএব রিবেনট্রপের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের দৃশ্যটিও কম ট্রাজিক ছিল না। সে-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন হিটলারের পার্শ্বচর ডঃ স্মিডট ঃ

'দেকানোজোভের আগমনের পাঁচ মিনিট আগে রিবেনট্রপ যেভাবে উত্তেজিত ছিলেন, এমন উত্তেজনা আমি তার আগে কখনও দেখিনি।' খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ জন্তুর মত তিনি যেন ঘরের মধ্যে উপরনীচ করে পায়চারি করছিলেন···

'দেকানোজোভ এলেন, বাহ্যতঃই মনে হলো তিনি কিছুই অনুমান করতে পারেন নি। তিনি রিবেনট্রপের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমরা বসে পড়লুম। দেকানোজোভ তাঁর সরকারের তরফ থেকে কিছু অভিযোগের কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কিছু আরম্ভ করার আগেই স্তব্ধ গম্ভীর মুখে রিবেনট্রপ বাধা দিয়ে বলিলেন— "ওসব কথা এখন নয়"—'

'That's not the question now'.

তারপর হতভম্ভ সোভিয়েট কূটনীতিক মস্কোতে মলোটোভের মত একই সময়ে বার্লিনের দপ্তরে জার্মান সরকারের ঘোষণা শুনিলেন এবং রিবেনট্রপ তাঁকে জানাইলেন যে, যখন এই বিবৃতি তিনি পড়িতেছেন, তখন জার্মান সৈন্যরা সোভিয়েট সীমান্তে 'পাল্টা সামরিক ব্যবস্থা' অবলম্বন করিতেছে।

চমকিত ও বিস্মিত দেকানোজোভ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যন্ত্রবৎ মাথা নোয়াইলেন এবং তারপর করমর্দন না করিয়াই কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।[১]

* * *

কিন্তু এই বিয়োগান্ত নাটকের আর একটি কূটনৈতিক অঙ্ক বাকী আছে। সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত করিয়া হিটলার চলিয়া গেলেন পূর্ব প্রুশিয়ার 'বিষণ্ণ অরণ্য' অঞ্চলের রেস্তেনবুর্গের কাছে যেখানে এই মহাযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ভূগর্ভে তাঁর জন্য নূতন সদর দপ্তর—'নেকড়ের গর্ত' (উল্‌ফস্‌ লেয়ার) তৈরী হইয়াছিল। ২১শে জুন অপরাহ্ণে হিটলার সেই ভূগর্ভে তাঁর ডেস্কে বসিয়া তাঁর সবচেয়ে বড় বন্ধু মুসোলিনীকে স্মরণ করিলেন এবং এতদিনে একেবারে শেষ মুহূর্তে তাঁকে বিশ্বাস করিয়া এক দীর্ঘ পত্রযোগে রাশিয়া আক্রমণের কথা জানাইলেন। বলা বাহুল্য যে, এই পত্রেও যথারীতি তিনি তাঁর 'বন্ধুর' কাছে মিথ্যা, অসত্য এবং বিকৃত তথ্য উল্লেখ করিলেন রাশিয়া আক্রমণের সাফাইস্বরূপ। এই দীর্ঘ পত্রের আরম্ভ ও শেষটা উল্লেখ করার মত। যেমন—

'Duce !

I am writing this letter to you at a moment when months of anxious deliberation and continuous nerve-racking waiting are ending in the hardest decision of my life···'

[ডুচে,

আমি এমন এক মুহূর্তে এই চিঠি আপনাকে লিখছি, যখন মাসের পর মাস উদ্বিগ্ন চিন্তায় ও বিবেচনায় এবং স্নায়ুমণ্ডলী ভেঙ্গে পড়ার মত ক্রমাগত আশঙ্কায় আমার কেটেছে এবং আজ আমার জীবনের কঠিনতম সিদ্ধান্তের মধ্যে সেই অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে]

১। The Rise and Fall of the Third Reich—Page 1014-15

হিটলার মুসোলিনীকে জানাইলেন যে, তিনি রাশিয়ার কাছ থেকে আক্রমণের আশঙ্কায় ছিলেন কিংবা তাঁর ভয় ছিল যে, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর ভবিষ্যৎ বিমান অভিযান মাটি হইয়া যাইবে। তবে, এখন 'পূর্ব দিকে যুদ্ধ' অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে এবং এই যুদ্ধে যে প্রকাণ্ড রকমের জয় তাঁর হইবে, এই বিষয়ে তাঁর মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ নাই। 'তবে, ডুচে আপনাকে এই সংবাদ জানাইবার জন্য এই মুহূর্ত পর্যন্ত যে অপেক্ষা করিতে হইয়াছে, তার কারণ আজ রাত্রে ৭টার আগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে না।'

হিটলারের ধাপ্পাবাজীটা লক্ষ্য করার মত। তিনি লিখিতেছেন—'এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের' বাকী আছে! অতএব তিনি মুসোলিনীকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তিনি যেন মস্কোস্থিত ইতালীয় রাষ্ট্রদূতকে এই সংবাদ এখন না জানান!

অতঃপর হিটলার তাঁর চিঠিতে ইংলণ্ড, ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, আফ্রিকা ইত্যাদির রণনৈতিক অবস্থার মনগড়া ব্যাখ্যা ও চিত্র দিয়া কেন 'ক্রেমলিনের এই ভণ্ডামীপূর্ণ অভিনয় শেষ করা দরকার' সেকথা উল্লেখ করিয়া উপসংহারে লিখিলেন—

...The partnership with the Soviet Union, inspite of the complete sincerity of our efforts to bring about a final conciliation, was nevertheless often very irksome to me for in some way or other it seemed to me to be a break with my whole origin, my concepts and my former obligations. I am happy now to be relieved of these mental agonies.

With hearty and comradely greetings.

Yours
Adolf Hitler.

[রাশিয়ার সঙ্গে একটি চূড়ান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আমাদের সম্পূর্ণ আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব আমার কাছে প্রায়শঃই খুব বিরক্তিকর মনে হতো। কারণ, কোনও-না কোনভাবে এই সম্পর্ক যেন আমার সমস্ত অস্তিত্ব, আমার উপলব্ধি এবং আমার আগেকার বাধ্যবাধকতা বোধের সঙ্গে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছে, এমন কথাই আমার মনে হতো। এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে আমি আজ সুখী বোধ করছি।

আন্তরিক ও কমরেডসুলভ অভিনন্দনসহ, ইতি—

আপনার
এ্যাডলফ হিটলার]

আক্রমণের শেষ মুহূর্তের এই চিঠিতেও রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষ এবং 'বিরোধ নিষ্পত্তির' চেষ্টা বিষয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা উক্তি মনে রাখার মত। নিজের 'বন্ধুর' কাছেও হিটলার কেমন কপট ও ধূর্ত ছিলেন পত্রটি তারই অন্যতম প্রমাণ।

২১-২২শে জুন রাত্রি ২টার সময়, যখন জার্মান সৈন্যদের মাত্র আধ ঘণ্টা বাকী ছিল রাশিয়ার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ার, সেই সময় রোমের জার্মান রাষ্ট্রদূত ফন বিসমার্ক ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউণ্ট চিয়ানোকে ঘুম থেকে জাগাইয়া তুলিলেন ফুয়ারের এই দীর্ঘ বার্তা ডুচেকে দেওয়ার জন্য। মুসোলিনী তখন রিসিওনের গ্রীষ্ম প্রাসাদে নিদ্রামগ্ন

ছিলেন। চিয়ানো তাঁকে টেলিফোনে ঘুম থেকে জাগাইয়া হিটলারের দীর্ঘ বার্তার কথা বলিলেন। যদিও জার্মানীর পাল্লায় পড়িয়া এভাবে মুসোলিনীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটা আদৌ নতুন নয় এবং আগে কয়েক বারেই এমন ঘটিয়াছে, তবু কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ায় মুসোলিনী খুব চটিয়া গেলেন এবং রাগত স্বরে বলিলেন—'এত রাত্রে আমি আমার চাকরেরও ঘুম ভাঙাই না। আর জার্মানরা অনায়াসে আমাকে শয্যা থেকে ডেকে তোলে এবং এর জন্য তাদের বিন্দুমাত্র বিবেচনা পর্যন্ত নেই।'

কিন্তু এই বিরক্তি প্রকাশ এবং অসম্মানবোধ সত্ত্বেও মুসোলিনী বিছানা থেকে উঠিলেন, হিটলারের বার্তা পাঠ করিলেন এবং চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে হুকুম দিলেন অবিলম্বে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য! তবে, তিনি চিয়ানোর নিকট তাঁর বিক্ষুব্ধ মনের জ্বালা চাপিয়া রাখিতেও পারিলেন না এবং এমন মন্তব্যও করিলেন—'পূর্বদিকের এই যুদ্ধে আমার শুধু একটি কামনা এই যে জার্মানরা বেশ কিছু ধোলাই খাক!'

রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণে 'জার্মানীর বেশ কিছু ধোলাই খাওয়া' সম্পর্কে মুসোলিনীর কামনা ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা পূর্ণ হইয়াছিল এবং 'অপারেশন বার্বারোসা'র যে অভিযান 'সারা দুনিয়ার দম বন্ধ' করিবে বলিয়া হিটলার তাঁর সেনাপতিদের নিকট উল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন, সেটাও প্রায় অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়

ইতিহাসের বৃহত্তম আক্রমণ

২২শে জুন, ১৯৪১

গ্রীষ্মকালের রাত্রি, মনোরম এবং স্বচ্ছ। মধ্য পোল্যাণ্ডের সীমানা যেখানে সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন সীমানার (১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে পোল্যাণ্ড পার্টিশানের পর) সঙ্গে মিলিয়াছে, সেখানে বুগ নদী ও বিখ্যাত ব্রেস্টলিটোভস্ক দুর্গের অদূরে পাইন অরণ্যের মধ্যে নিঃশব্দে অপেক্ষমান জার্মান সৈন্যেরা। গত কয়েকদিন ধরিয়া তারা গোপনে এখানে আসিয়া মিলিয়াছে, কোন সাড়াশব্দ করা নিষেধ। শত্রু পক্ষ যেন টের না পায়, রাশিয়ার যেন সন্দেহ না জাগে। কমাণ্ডারদের কড়া হুকুম—দিনেরবেলা চুপচাপ, কোন শব্দ করা চলিবে না, কেবল যখন সন্ধ্যা নামিবে সীমান্তের অরণ্যে, তখন সৈন্যেরা কোন স্রোতস্বতীতে গিয়া স্নান করিতে পারে, পরিচ্ছন্ন হইতে পারে।...

রুশ-জার্মান সীমান্তের ৯৩০ মাইল দীর্ঘ সীমানার জঙ্গলে, শস্যক্ষেত্রে, মাঠে, প্রান্তরে এবং বৃহৎ বিটপি ও অজানা গাছগাছড়ার আড়ালে আবডালে লক্ষ লক্ষ হিটলারী সৈন্য জমায়েৎ হইয়াছে—কিন্তু গোগনে। মধ্যবর্তী রণাঙ্গনে রুশ-পোলিশ সীমানায় বুগ নদীর তিন মাইল দূরে প্রাটুলিনের জঙ্গলে হিটলারী সৈন্যেরা রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে অপেক্ষমান।

রাত দুটো। সমস্ত পৃথিবী শান্ত, নিঃশব্দ—কিছুক্ষণের জন্য সেই নিঃশব্দতা ভঙ্গ করিয়া রাশিয়ার শস্যবাহী ট্রেন (রুশ-জার্মান অর্থনৈতিক চুক্তি অনুযায়ী) বুগ নদীর ব্রীজের উপর দিয়া হুস হুস করিয়া জার্মানীর সীমানার দিকে চলিয়া গেল। কোথাও রাশিয়ার মনে, সীমান্তরক্ষী সোভিয়েট সৈন্যদের মনে সন্দেহ নাই—যদিও ২১-২২ জুন রাত দুটো।...

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে জার্মান ঐতিহাসিক পল ক্যারল লিখিয়াছেন যে, বুগ নদীর ধারে গ্রীষ্মের সেই রাত্রি তখনও অন্ধকারে আবৃত। সমস্ত পৃথিবী নিদ্রামগ্ন, স্তব্ধ—তবু সেই গভীর রাত্রে জঙ্গল ও ঘাসের মধ্যে যে সমস্ত জার্মান সৈন্য ওৎ পাতিয়া ছিল, তারা কিছুতেই বুগ নদীর সেই অবিস্মরণীয় ব্যাঙের ডাক ভুলিতে পারিবে না—সেই ডাক ছিল 'দাম্পত্য' মিলনের![১]

বুগ নদীর ওপারে বিখ্যাত ব্রেস্ট দুর্গ, বিপরীত দিকের পোল সীমান্তে জেনারেল গুডেরিয়ানের (জার্মান ট্যাঙ্ক-বিশারদ) অবজার্ভেশন পোস্ট বা পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি। পোলিশ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে এই অঞ্চলের পথঘাট তাঁর অত্যন্ত পরিচিত। এই পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি থেকে দিনের বেলা জার্মান অফিসারেরা ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পাইতেন যে, ব্রেস্ট দুর্গের সোভিয়েট সৈন্যদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চলিতেছে, তারা ড্রিল করিতেছে, খেলাধুলা করিতেছে, এবং সন্ধ্যাবেলা ব্যাণ্ডের বাজনা শুনিতেছেন।

১। Hitler's war on Russia—Paul Carell (Translated from German) London. 1957. Gorgi Book edition—P. 1 & 7.

২২শে জুন রাত্রি ২-১০ মিনিটের সময় জেনারেল গুডেরিয়ান সদলবলে আসিলেন এই পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে।...[১]

অফিসারেরা হাতের ঘড়ি দেখিতেছেন। সময় যেন কত মূল্যবান। সমস্ত ঘড়ির কাঁটা যেন নিয়ন্ত্রিত। সেকেণ্ড ও মিনিটের কাঁটাগুলি যথানিয়মে ঘুরিতেছে, অন্ধকারেও সেগুলি জ্বলজ্বল করিতেছে। অফিসারদের চোখ নিজ নিজ ঘড়ির উপর। রাত্রি ৩-১২, এখনও কি সময় আছে?—শান্তিরক্ষার, রুশ-জার্মান চুক্তি পালনের? চারিদিক স্তব্ধ, এই স্তব্ধতা ভয়ংকর, সকলের দৃষ্টি ঘড়ির কাঁটার দিকে—নিঃশ্বাস যেন রোধ হইয়া আসিতেছে।

রাত্রি ৩-১৩ মিনিট, চতুর্দিকে কী প্রশান্তি!—না, প্রশান্তি নয়, মৃত্যু, ভয়ঙ্কর মৃত্যু আসিতেছে!

"Peace was dead. War was drawing its first terrible breath".

'শান্তি?—শান্তি মৃত! যুদ্ধ তার প্রথম ভয়ংকর নিঃশ্বাস টানিতেছে।'

ঘড়ির কাঁটা ঠিক ৩টা ১৫ মিনিটে আসিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ সেই মুহূর্তে শুনা গেল—'ফায়ার'!—নারকীয় তাণ্ডবে সমস্ত পৃথিবী যেন দুলিয়া উঠিল![২]

একসঙ্গে সমগ্র সীমান্ত জুড়িয়া ৬ হাজার কামান গর্জন করিয়া উঠিল। ৬ হাজার কামানের মুখ থেকে যেন আগ্নেয়গিরির মত আগুনের গোলা উদ্গির্ণ হইতে লাগিল। ধোঁয়ায় ও আগুনে বুগ নদী আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সোভিয়েট সীমানায় রুশ সৈন্যেরা বিমূঢ় হইয়া গেল। ব্রেস্টলিটোভস্কের দুর্গের সীমান্তপ্রহরীরা যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, ব্যাপারটা কি? ট্যাঙ্কের কর্কশ আওয়াজে চমকিত হইয়া যেমন তারা ব্যারাকের বাহিরে আসিতে লাগিল অমনি গুলি খাইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইতে লাগিল। জামা-কাপড় অর্ধেক পরা অবস্থায় অনেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। হতবাক, স্তম্ভিত সীমান্তের রক্ষীরা সদর দপ্তরে বার্তা পাঠাইতেছিল—

'We are being fired on, what shall we do?'

'আমাদের উপর গুলি চালানো হইতেছে, আমরা এখন কি করিব?'

জবাবে রুশ সদর দপ্তর ভৎর্সনার সুরে উত্তর দিল—'তোমাদের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হইয়াছে। নইলে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করিতেছ না কেন?'—

(You must be insane. And why is your signal not in code?)

জার্মানী কর্তৃক অতর্কিত আক্রমণের সাংঘাতিক মুহূর্তে সোভিয়েট সীমান্তের কী মর্মান্তিক অবস্থা![৩]

তবু তরুণ ইংরাজ ঐতিহাসিক অ্যালান ক্লার্ক 'অপক্ষপাত' ইতিহাসের দাবীতে স্বীকার করিতেছেন, এত বড় যুদ্ধ মানুষের ইতিহাসে আর কখনও হয় নাই। এর তুলনায় প্রথম মহাযুদ্ধও অনেক পিছনে পড়িয়া গেল—যখন ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে সারা ইউরোপের সমস্ত রেল ইঞ্জিন একমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য বহনের জন্যই নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এবার পৃথিবীর দুটি বৃহত্তম সৈন্যবাহিনী, দুটি 'চরম রাষ্ট্র-ব্যবস্থা' পরস্পরের মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হইল...

১। They Sealed Their own Doom—P. Zhilin. Moscow, 1970, P. 182.

২। Hitler's war on Russia—Paul Carell. P. 12-15.

৩। Barbarossa—Alan Clark. London. Penguin edition, 1966, P. 71.

'In terms of numbers of men, weight of ammunation, length of front, the desperate crescendo of fighting, there will never be another day like 22 June, 1941.

অর্থাৎ সৈন্যসংখ্যা, অস্ত্র ও গোলাগুলির পরিমাণ, রণাঙ্গনের দৈর্ঘ্য এবং মৃত্যুপণ বেপরোয়া লড়াইয়ের এমন প্রচণ্ডতার ক্রমবৃদ্ধি—১৯৪১ সালের ২২শে জুন তারিখের মত পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনদিন দেখা যাইবে না।

*

সত্য সত্যই মানুষের ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর ও অকল্পনীয় দৃশ্যের উদ্ঘাটন হইল। উত্তরে মেরু সমুদ্র থেকে ফিন উপসাগর পর্যন্ত ৭৫০ মাইল এবং তারপর বাল্টিক সাগরের মেমেল বন্দর থেকে রুমানিয়ার দানিয়ুব নদীর মুখ পর্যন্ত ১২৫০ মাইল, অর্থাৎ মেরু সাগর থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত একত্রে ২০০০ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে হিটলারী সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ শুরু হইল ২২শে জুন ভোর রাত্রে। ইতিহাসের এই দীর্ঘতম রণাঙ্গনে হিটলারের বহু আকাঙ্ক্ষিত ও বহু আলোচিত 'অপারেশন বার্বারোসা' পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনটি বৃহত্তম যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্ভব হইল—উত্তরে লেনিনগ্রাদ অভিমুখে, মধ্যভাগে মস্কোর দিকে এবং দক্ষিণে কিয়েভ ও ককেশাস অঞ্চলের দিকে। কত সৈন্য ও সমর-সম্ভার এই আক্রমণে জার্মান পক্ষে নিয়োজিত হইল? জার্মান লেখক পল ক্যারেল বলিতেছেন যে, 'অপারেশন বার্বারোসা'র আরম্ভে পূর্বদিকে ২১শে জুন তারিখ নিয়োজিত হইয়াছিল ৭টি আর্মি, ৪টি প্যাঞ্জার গ্রুপ এবং ৩টি বিমানবহর বা এয়ার ফ্লিট—অর্থাৎ ৩০ লক্ষ সৈন্য, ৬ লক্ষ যানবাহন, ৭ লক্ষ ৫০ হাজার অশ্ব, ৩৫৮০ ট্যাঙ্ক ও বর্মাবৃত যান, ৭১৮৪ কামান এবং ১৮৩০ বিমান। এগুলি ছাড়াও দক্ষিণ দিকে ছিল রুমানিয়ার তৃতীয় ও চতুর্থ আর্মি। আর সোভিয়েট রাশিয়া সীমান্ত অঞ্চলে সমাবেশ ঘটাইয়াছিল ১০টি আর্মির—যেগুলির মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪৫ লক্ষ।[১]

আর সোভিয়েট লেখক পি ঝিলিন বলিতেছেন যে, জার্মানী রাশিয়ার পশ্চিম সীমানা বরাবর নাৎসী তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির সৈন্যদলসহ মোট ১৯০ ডিভিসন সৈন্য নিয়োগ করিয়াছিল। অর্থাৎ মোট ৫৫ লক্ষ সৈন্য (এর মধ্যে তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির ৯ লক্ষ সৈন্য) ৪,৯৫০ বিমান, ২,৮০০ ট্যাঙ্ক এবং ৪৮ হাজার গোলন্দাজী অস্ত্র ও মর্টার কামান। এর সঙ্গে নৌবহরের দিক থেকে ছিল ১৯৩টি রণপোত।

(লক্ষ্য করার এই যে, জার্মান লেখকের বর্ণনায় বিমানের ও কামানের সংখ্যা অনেক কম দেখানো হইয়াছে।)

মিঃ ঝিলিন সোভিয়েট সৈন্য সংখ্যা (মোট ১৭০ ডিভিসন) সম্পর্কে আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের জানুয়ারী থেকে জুন মাসের মধ্যে সোভিয়েট সৈন্যের সংখ্যা ৮ লক্ষ্য বাড়ানো হইয়াছিল। অর্থাৎ লালফৌজের মোট শক্তি দাঁড়াইয়াছিল ৫০ লক্ষ। ১৯৩৯ সালের আরম্ভের তুলনায় এই শক্তি আড়াই গুণ বেশী ছিল।[২]

পশ্চিমের সেরা সমর-বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন লীডেন হার্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে দুই পক্ষের সৈন্যশক্তি সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, আসলে আক্রমণকারী জার্মান সৈন্যের

১। Hiter's war on Russia—P. 9.

২। They Sealed Their Own Doom—Moscow. P. 175. 183.

সংখ্যা ছিল ১১৬ পদাতিক ডিভিসন (এর মধ্যে ১৪টি ছিল মোটরায়িত), ১টি অশ্বারোহী ডিভিসন, ১৯টি আর্মার্ড ডিভিসন এবং যোগাযোগ রক্ষার জন্য ৯ ডিভিসন। জার্মানীর ট্যাংক ছিল ৩৫৫০টি। আর রাশিয়ার তখন ছিল ৮৮ পদাতিক ডিভিসন, ৭ অশ্বারোহী ডিভিসন, ৫৪টি ট্যাংক ও মোটরায়িত ডিভিসন এবং ১০ই জুলাই, ১৯৪১ স্ট্যালিন রুজভেল্টকে জানাইয়াছিলেন যে, রাশিয়ার ২৪ হাজার ট্যাংক আছে এবং তার অর্ধেকের বেশী পশ্চিম রাশিয়ায়।

কিন্তু সংখ্যার দিক দিয়া বেশী হইলেও এই সমস্ত ট্যাঙ্ক গুণগত দিক দিয়া তেমন উৎকৃষ্ট ছিল না।

পশ্চিমের আর একজন স্বনামধন্য সমর-ঐতিহাসিক মেজর জেনারেল জে এফ সি ফুলার তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে নাৎসী বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, প্রথম আক্রমণের শুরুতে ১২১ ডিভিসন সৈন্য (ন্যুরেমবার্গের আদালতে সাক্ষ্য অনুসারে) নিয়োজিত হইয়াছিল। এর মধ্যে ১৭ ডিভিসন ছিল আর্মার্ড (বর্মাবৃত) ও ১২ ডিভিসন মোটরায়িত এবং প্রায় ৩ হাজার বিমান। এই সমস্ত শক্তিই ৩টি আর্মি গ্রুপে বিভক্ত ছিল এবং এই সৈন্য সংখ্যা পরে ২০০ ডিভিসনে দাঁড়াইয়াছিল।

অর্থাৎ কাগজেপত্রে উভয়পক্ষের সামরিক শক্তি প্রায় সমান সমান বলিয়া প্রতিভাত হইলেও কার্যত সমান ছিল না এবং রাশিয়ার অনেক গলদ ছিল। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় যে, এমন 'অতর্কিত' এবং 'বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ' আক্রমণের জন্য সোভিয়েট রাশিয়া প্রস্তুত ছিল না—স্বয়ং স্ট্যালিনের মতানুসারে। কিন্তু এই প্রস্তুতিহীনতা ছাড়াও অন্যান্য দিক দিয়া বহু ঔদাসীন্য ও মারাত্মক ত্রুটি ছিল, যেগুলির কথা পরে আলোচিত হইবে। কিন্তু এই সমস্ত ত্রুটির জন্য যুদ্ধের গোড়ার দিকে সোভিয়েট রাশিয়া প্রচণ্ড মার খাইল এবং বাল্টিক সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনের সর্বত্র রাশিয়া হারিয়া যাইতে লাগিল। আর হিটলারী সৈন্য-বাহিনীর অপ্রতিহত জয়যাত্রায় সারা পৃথিবী চমকিত হইল···

দশ বছরের অনাক্রমণ চুক্তিকে নির্দ্বিধায় এবং ঠাণ্ডা মাথায় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া হিটলার যেভাবে বিশ্বসঘাতকের মত রাশিয়ার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, তার তুলনা নাই। এজন্য নিয়মমাফিক সোভিয়েট সরকারের নিকট কোন চরমপত্র দেওয়া হইল না কিংবা সরকরীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল না। হিংস্র ব্যাঘ্র যেমন অতর্কিতে রাত্রির অন্ধকারে শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে, তেমনি ভাবে লক্ষ লক্ষ সৈন্য শেষ রাত্রে সর্বত্র সোভিয়েট সীমান্তের উপর আক্রমণ চালাইল এবং পরে সেকথা সরকারীভাবে সোভিয়েট গভর্নমেণ্টকে জানানো হইল—আগের অধ্যায়ে সে-কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আক্রমণের চার ঘণ্টা পর জার্মান জনগণের উদ্দেশে রেডিওযোগে হিটলারের ঘোষণা পাঠ করা হইল। প্রচারসচিব গোয়েবেলস্ সকাল ৭টায় হিটলারের সেই ঘোষণা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। এই ঘোষণার মধ্যে হিটলার যথারীতি সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে, জার্মানী কখনও রাশিয়ার বিরুদ্ধে শত্রুতার মনোভাব পোষণ করে নাই। তথাপি গত ২০ বছরের অধিক কাল ধরিয়া মস্কোর 'বলশেভিক ইহুদী' শাসকেরা কেবল জার্মানীতে নয়, সারা ইউরোপে আগুন জ্বালাইবার চেষ্টা করিয়াছে। তারা কেবল তাদের মতবাদই চাপাইয়া দিতে চাহে নাই, সামরিক বলপ্রয়োগের দ্বারা ইউরোপীয় জনগণের উপর

প্রভুত্ব করিতে চাহিয়াছে। ১৯৪০ সালের মে মাসে পশ্চিম রণাঙ্গনে জয়লাভের পর থেকেই জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে রাশিয়ার সামরিক সমাবেশ ঘটিতে এবং সেটা ক্রমশঃ উৎপাতের আকার ধারণ করে। তখন ১৯৪০ সালের আগস্ট মাস থেকেই জার্মানীর পূর্ব সীমান্ত সুরক্ষিত করার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে যোগসাজসে এবং পারস্পরিক চক্রান্তের দ্বারাই জার্মানী ও ইউরোপকে বিপন্ন করার এই সমস্ত চেষ্টা চলিতেছিল।

এই সমস্ত মিথ্যা ও মনগড়া অভিযোগের পর হিটলার তাঁর বেতার ঘোষণার উপসংহারে বলিলেন—

'To-day something like 160 Russian divisions are facing our frontiers. For weeks violations of this frontier have been taking place, not only into our country, but in the far north, right down to Rumania···Weighted down with heavy cares, condemned to months of silence, I can at last speak freely—German people! At this moment a march is taking place, that, for its strength, compares with the greatest the world has ever seen. I have decided again to-day to place the fate and future of the Reich and our people in the hands of our soldiers. May God aid us in this greatest of all struggles'.[১]

রাশিয়ার বিরুদ্ধে রেডিওতে এই হিটলারী মিথ্যা ভাষণের মধ্য দিয়া একটা বিষয় কিন্তু পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, হিটলার তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্টই স্বীকার করিতেছেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ জয়ের পর থেকেই (আগস্ট, ১৯৪০) তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক পন্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। অবশেষে ২২শে জুন শেষ রাত্রে অতর্কিতে রাশিয়া আক্রমণ করিয়া তিনি 'দীর্ঘ দিনের এক দুশ্চিন্তা' থেকে মুক্ত হইলেন। প্রায় এক বছর ধরিয়া এই আক্রমণের প্রস্তুতি নিখুঁত করা হইতেছিল এবং সর্বপ্রকার আয়োজন পাকা করা হইতেছিল। জার্মান মিলিটারী হাইকমাণ্ডের অধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল কাইটেল ৬ই জুন তারিখ আক্রমণের যে হুকুমনামায় স্বাক্ষর দেন, তাতে দেখা যায় যে, রাশিয়া অভিযানের জন্য জার্মানী তখন ৮২ ডিভিসন পদাতিক সৈন্য, ১ ডিভিসন অশ্বারোহী সৈন্য, ১৭ ডিভিসন সাঁজোয়া সৈন্য, ১২ ডিভিসন মোটরায়িত সৈন্য এবং ৯ ডিভিসন যোগাযোগ রক্ষার সৈন্য এবং পুরা ৩টি বিমানবহর নিয়োগ করিতে চাহিয়াছিল। কাইটেল সংখ্যার চেয়েও জার্মানবাহিনীর গুণগত শক্তির উপর বেশী জোর দিয়াছিলেন। হিটলারও প্রথমতঃ ১৩০ বা ১৪০ ডিভিসন সৈন্যই যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন। এমনভাবে এই যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং সামরিক শক্তির সমাবেশ করা হইয়াছিল যে, ৮ সপ্তাহের মধ্যেই রেড আর্মি তথা সোভিয়েট রাশিয়া খতম হইয়া যাইবে বলিয়া হিটলার ও তাঁর সেনাপতিরা ধরিয়া লইয়াছিলেন। এজন্য ১লা জুন তারিখ এই যুদ্ধের একটা 'টাইম-টেবিল' পর্যন্ত তৈয়ার হইয়া গেল এবং ২২শে জুন রাত্রি সাড়ে তিনটায় রাশিয়ার উপর আক্রমণ আরম্ভের জন্য হুকুনামার সাঙ্কেতিক নাম দেওয়া হইল 'ডর্টমুণ্ড' এবং ফিনল্যাণ্ডের

১। The Second Great War—Vol. 5. P. 1819.

রণক্ষেত্রের নাম দেওয়া হইল 'সিলভার ফক্স'। এর আগে হিটলারী বাহিনীকে কোথাও ৮ সপ্তাহের বেশী লড়িতে হয় নাই কিংবা তিন শতাধিক মাইলের বেশী রণাঙ্গনে যুদ্ধ চালাইতে হয় নাই। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করিতে গিয়া নাৎসী সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইতে হইল—প্রায় দুই হাজার মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গন, বিশাল প্রান্তর, কঠিন ও নিদারুণ আবহাওয়া, অবিশ্বাস্য প্রতিরোধ এবং বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের বদলে প্রায় চার বছর ধরিয়া ক্রমাগত বলক্ষয়কারী সংগ্রাম (War of attrition) যেটা হিটলারের ধারণার বিপরীত ছিল। কিন্তু এই মহা আক্রমণের যখন সাড়ম্বর 'উদ্বোধন' হইল, তখন হিটলার ও জার্মানবাহিনী সারা পৃথিবীর নাৎসী পক্ষপাতী মহলে যশের শিখরে এবং সারা ইউরোপের সম্পদ তাঁর মুঠির তলে। ১৭০ ডিভিসন জার্মান সৈন্য (স্ট্যালিনের বিবৃতি অনুসারে) সোভিয়েট রাশিয়ার পশ্চিমাংশে যেন নিদারুণ মারী গুটিকার মত ছাইয়া ফেলিল এবং সমস্ত কিছু দলিত-মর্দিত ধ্বংস ও দগ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

সোভিয়েট সীমান্ত তিনটি প্রধান রণক্ষেত্রে পরিণত হইল। জার্মানীর পক্ষে তিনজন মার্শাল এই তিন রণাঙ্গনের প্রধান অধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন। যেমন—

উত্তর রণাঙ্গনে মার্শাল ফন লীব বাল্টিক রাজ্য ও লেনিনগ্রাদ অভিমুখে, মধ্য রণাঙ্গনে মার্শাল ফন বোক মস্কোর দিকে এবং দক্ষিণ রণাঙ্গনে মার্শাল রুণ্ডস্টেড উক্রাইন ভেদ করিয়া কিয়েভের দিকে বিরাট অভিযান আরম্ভ করিলেন।

এই সমগ্র রণাঙ্গনের সর্বোচ্চ সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন ফন ব্রাউসিৎস এবং এই মহাসংগ্রামে বিভিন্ন অধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন হ্যালডার, গুডেরিয়ান, ক্লিস্ট, কেসেলরিং, হোয়েপনার, স্ট্রায়ুস, বুমেনট্রিট এবং ম্যানস্টাইন প্রভৃতি হিটলারী জার্মানীর দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নামকরা সেনাপতিরা।

আর সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ থেকে এই তিন রণাঙ্গনে নাৎসী সৈন্যদলকে প্রতিরোধ করার জন্য তিনজন মার্শাল যথা—ভরোশিলভ, টিমোশেঙ্কো ও বুদেনী লাল ফৌজের তিন অধিনায়করূপে দেখা দিলেন। কিন্তু হিটলারী প্রচণ্ডতার মুখে তাঁরা টিঁকিতে পারিলেন না। প্রথম সাড়ে তিন মাস চলিল প্রায় একটানা বিপর্যয় এবং প্রথম ১৪ দিনেই লাল ফৌজের প্রায় ১০ লক্ষ সৈন্য জার্মানীর হাতে বন্দী হইল। পশ্চিম সীমানায় সমস্ত সোভিয়েট বিমান বহর প্রথম আক্রমণেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল এবং রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড ও বাল্টিক রাজ্যের যে সমস্ত এলাকা ১৯৩৯-৪০ সালে রাশিয়ার দখলে আসিয়াছিল সেগুলি পাঁচ দিনের যুদ্ধেই হিটলারী বাহিনী কাড়িয়া লইল। এমন কি ২২শে জুন দুপুরের আগেই ১২০০ সোভিয়েট প্লেন (মাটিতে ৮০০) ধ্বংস হইয়া গেল। বছরের পর বছর ধরিয়া লাল ফৌজের অপরাজেয় শক্তি সম্পর্কে ক্রমাগত প্রোপাগাণ্ডা শুনিবার পর যখন দেখা গেল যে, জার্মান আক্রমণ প্রথম তিন সপ্তাহের মধ্যেই স্টীম রোলারের মত সমস্ত কিছু পিষ্ট করিয়া উত্তরে লেনিনগ্রাদ, মধ্য রণাঙ্গনে স্মলেনস্ক এবং দক্ষিণে কিয়েভের উপকণ্ঠের কাছে অগ্রসর হইয়াছে, তখন সেই সংবাদ সোভিয়েট নর-নারীর কাছে—

'...came as a terrible shock...'

একটা ভয়ঙ্কর আঘাতের মত অনুভূত হইল।[১]

রিগা
লাটভিয়া
লিবাউ
ডীন
সাউলাই
মেমেল
লিথুয়ানিয়া
ভাইবেটস্ক
স্মলেনস্ক
পোল্যাণ্ড
বরিসভ
পূর্ব
প্রুশিয়া
মিনস্ক
গ্রডনো
বব্রুইস্ক
বিয়ালিস্টক
বারানভ
বুগ
প্রিপেট
ব্রেস্ট
ওয়ারশ
লিটভস্ক
জলাভূমি
লজ
লবলিন
লুক
কিয়েভ
ভ্লাদিমির
ঝিটোমির
হাঙ্গেরী
ওডেসা
রুমানিয়া
বেসারাবিয়া
জার্মান আক্রমণের গতি
রুশ আত্মরক্ষার ধারা
১২ই জুলাই '৪১
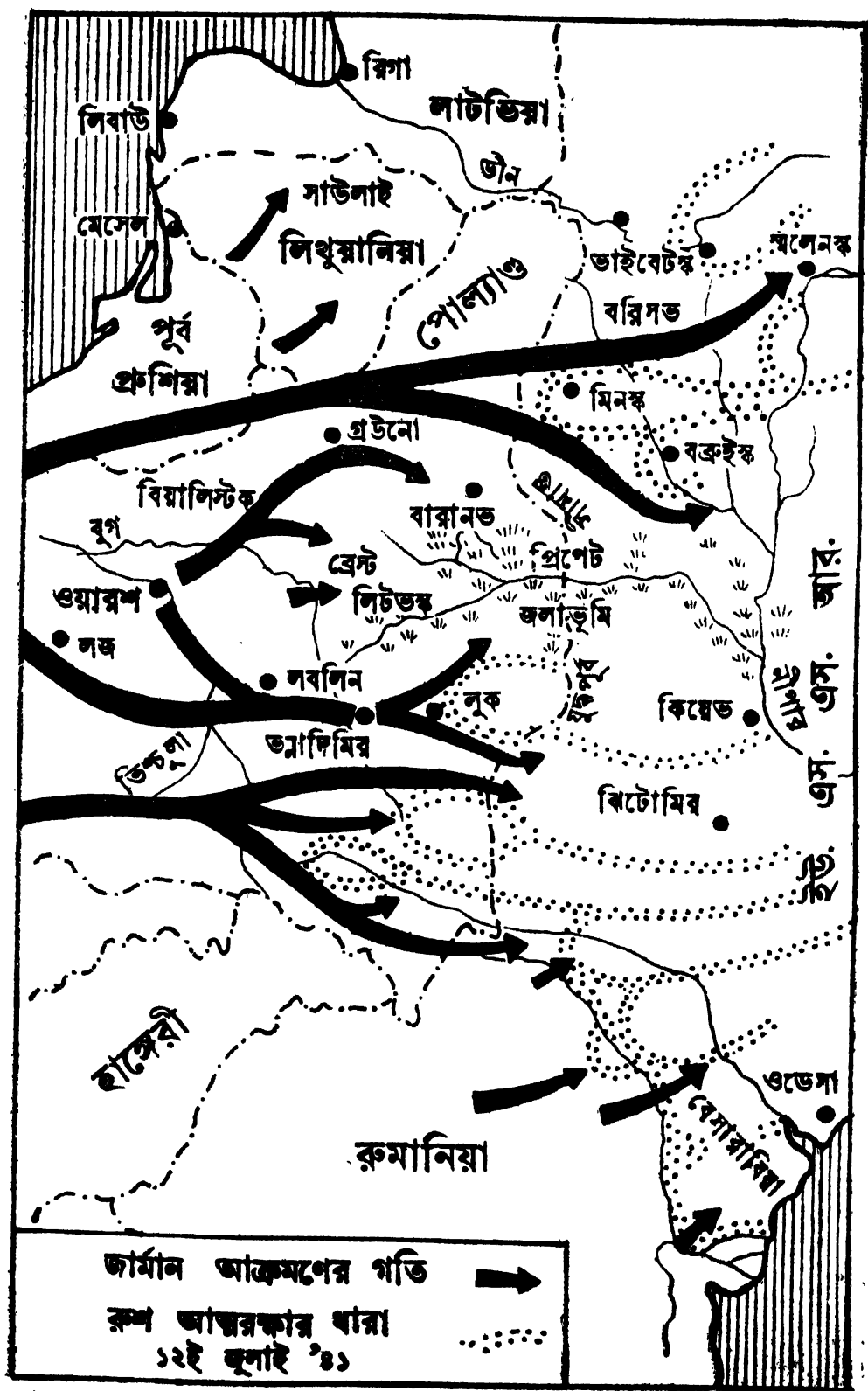
মাত্র ১৮ দিনের মধ্যে নাৎসী সৈন্যরা দুর্বারগতিতে মস্কো থেকে পশ্চিমে মাত্র ২০০ মাইল দূরবর্তী স্মলনেস্ক শহরে পেঁছিল ১০ই জুলাই, ১৯৪১। অন্যান্য রণাঙ্গনেও রুশ সৈন্যরা নিদারুণ পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইল এবং নাৎসী রণকৌশলের বেষ্টনী বা 'এনসার্কলমেণ্ট'এর মধ্যে পড়িয়া লক্ষ লক্ষ রুশ সৈন্য বন্দী এবং লক্ষ লক্ষ হতাহত হইতে লাগিল। লালফৌজ হিটলারী আক্রমণের মুখে কিরূপ 'অপ্রস্তুত' ছিল, তার অন্যতম প্রমাণ এই যে, জার্মানরা সীমান্ত এলাকার নদীগুলির সমস্ত ব্রীজ অক্ষত অবস্থায় দখল করিয়া নিল! নাৎসী নেতারা সোভিয়েট রাশিয়ার পরাজয় আসন্ন বলিয়া ধরিয়া লইলেন। স্বয়ং হিটলার ঘোষণা করিলেন—

'Russia is broken! She will never rise again!'

'রাশিয়া ভেঙে চুরমার! সে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না!'

আর বার্লিন থেকে প্রচারসচিব ডঃ গোয়েবলস তারস্বরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর অভূতপূর্ব জয়বার্তা ঘোষণা করিয়া বলিলেন—'ফুরারের আক্রমণে লালফৌজ চূর্ণবিচূর্ণ, পূর্ব মহাদেশ জার্মান রণদেবতার শক্তিশালী বাহুতে পঙ্গু কুমারীর মত শায়িতা'।[১]

নাৎসী জার্মানীর এই উচ্ছ্বাস ভিত্তিহীন ছিল না। কারণ ১৯৪১ সাল গিয়াছে (১৯৪২ সালও বটে) রাশিয়ার প্রায় একটানা নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে—অবশ্য ডিসেম্বর মাসে মস্কোর দ্বারদেশে ঐতিহাসিক প্রতিরোধ ছাড়া। পৃথিবীর অধিকাংশ রাজধানীতেই রাশিয়া সম্পর্কে হতাশা জাগিয়াছিল এবং ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে হিটলারী বাহিনী সত্যসত্যই চূড়ান্ত জয়লাভের সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।…

কিন্তু কেন এই বিপর্যয়, কেন এই ভয়াবহ পরাজয়? এই সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোন গভীর এবং বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ও বিশ্লেষণ রাশিয়াতে বহুদিন পর্যন্ত অত্যন্ত কঠিন ছিল। অর্থাৎ স্ট্যালিন যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন এই সামরিক বিপর্যয়ের মূল কারণগুলি প্রকাশ্যে উদ্ঘাটন করিতে কেহ সাহস করেন নাই। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ১৯৫৬ সালে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি বিংশতি কংগ্রেসে এন এস ক্রুশ্চেভ কর্তৃক 'স্ট্যালিনের সামরিক প্রতিভার' প্রথম তীব্র সমালোচনার (যদিও অতিরঞ্জিত ছিল) পর সোভিয়েট সামরিক ইতিহাসবিদগণ এই ত্রুটিগুলির মূল কারণ উদ্ঘাটন করিতে থাকেন। তার আগে পর্যন্ত শুধু এই কথাটাই সরকারী-ভাবে চলতি ছিল যে, হিটলারের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণের জন্যই রাশিয়ার এই সমস্ত পরাজয় ঘটিয়াছিল। কারণ, স্ট্যালিন তাঁর ৩রা জুলাইয়ের বেতার বক্তৃতায় একমাত্র ওই কারণটির উপরেই জোর দিয়াছিলেন। পরে অবশ্য তিনি 'কয়েকটি ভুলের' কথা স্বীকার করিয়াছিলেন।

কিন্তু আসলে এই বিপর্যয়ের জন্য অনেকগুলি কারণ দায়ী এবং সেই কারণগুলি রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি বহু প্রকারের। আকস্মিক হিটলারী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যেমন উপযুক্ত প্রস্তুতি ছিল না এবং সীমান্ত অঞ্চলে সৈন্যবাহিনীর মানসিক ও সাংগঠনিক দিকটাও যেমন উপেক্ষিত ছিল (এবং তার প্রমাণস্বরূপ এই অধ্যায়ের গোড়াতেই পোল্যাণ্ড সীমানায় বুগ নদীর ধারের একটি বাস্তবচিত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে) তেমনি সবচেয়ে বড় কারণ

১। The War—L. Snyder, P. 218.

ছিল ১৯৩৬ সালের রাজনৈতিক নেতাদের এবং ১৯৩৭ সালের লালফৌজের ইতিহাস-বিখ্যাত (কিংবা কুখ্যাত ?) 'শুদ্ধিকরণ' বা পার্জ ! এই ভয়াবহ পার্জের ফলে প্রথম শ্রেণীর অজস্র সেনাপতি ও সৈন্যেরা খতম হইয়াছিল। এমন কি ১৯৪০ সালের শীতকালে ক্ষুদ্র ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশাল রাশিয়া যে নাজেহাল হইয়াছিল এবং গোড়ার দিকে অত্যন্ত লজ্জাকরভাবে হারিয়া গিয়াছিল তারও মূলে কারণ ছিল ১৯৩৭ সালের 'পার্জ' বা রেড আর্মির বিখ্যাত সামরিক নেতাদের প্রাণহনন। বলা বাহুল্য যে, ডিক্টেটর স্ট্যালিনের সন্দেহবাতিকতা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনাচার ও চক্রান্ত এর মূলে ছিল। বিষয়টি রাশিয়ার ইতিহাসের পক্ষে এত গুরুতর যে, অত্যন্ত সংক্ষেপে কিছুটা উল্লেখ না করিয়া উপায় নাই।

১৯৩৪ সালের ১লা ডিসেম্বর লেনিনগ্রাদে জনৈক তরুণ কমিউনিস্ট নিকোলায়েভ (বিরোধী গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত) কর্তৃক স্ট্যালিনের সহকর্মী কিরোভের হত্যাকাণ্ডের পর যে রাশি রাশি রাজনৈতিক খতমের মামলা প্রকাশ্যে ও গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল এবং অসংখ্য লোক সাবাড় ও নিষ্ঠুর নির্বাসনে ও কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে লাগিল, এখানে তার বর্ণনা দেওয়া অনাবশ্যক। তবে, এই সমস্ত অন্তহীন গোপন ও প্রকাশ্য মামলার মধ্যে চারটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা—(১) ১৯৩৬, আগস্ট মাসে জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, স্মারনোভ প্রমুখ ১৬ জন ; ১৯৩৭, জানুয়ারী মাসে পিয়াটাকোভ, রাডেক, শোকোলনিকোভ, মুরালোভ প্রভৃতি ১৭ জন ; ১৯৩৭ সালের জুন মাসে, মার্শাল তুখাচেভস্কি প্রমুখ রেড আর্মির সর্বোচ্চ জেনারেলগণ এবং ১৯৩৮ মার্চ মাসে রায়কোভ, বুখারিন, ক্রেস্টিনস্কি, রাকোভস্কি, ইয়াগোদা প্রমুখ ২১ জনের মামলা ও প্রাণদণ্ড সারা পৃথিবীতে তোলপাড় সৃষ্টি করিয়াছিল। জনমানসে এর প্রতিক্রিয়ায় নানা সন্দেহ ও বিতর্ক সৃষ্টি করিয়াছিল। জনৈক বিশ্ববিখ্যাত লেখক বলিতেছেন—কিন্তু এই সমস্ত রাশি রাশি ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত মামলায় (রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে) এবং স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে শুনানীর সময় স্বয়ং স্ট্যালিন কিন্তু একবারও ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হন নাই। এটা খুবই আশ্চর্যের কথা যে, যিনি এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের 'শিকার' ছিলেন, তিনি নিজে একবারও সাক্ষ্য দিতে যান নাই কিম্বা তাঁকে সাক্ষ্য দিত ডাকা হয় নাই। অথচ আদালতে তিনি সশরীরে উপস্থিত না থাকিলেও এই বিয়োগান্ত নাটকের তিনিই ছিলেন নেপথ্য প্রোম্পটার, এবং অদৃশ্য গ্রন্থকার, ম্যানেজার ও প্রোডিউসার ![১]

অসংখ্য শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, যেমন, লেনিনের পোলিট ব্যুরোর সমস্ত সদস্য (একমাত্র স্ট্যালিন ও ট্রটস্কি ছাড়া, কিন্তু ট্রটস্কি নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও অভিযুক্ত হইয়াছিলেন) থেকে শুরু করিয়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দুই নেতা, ইউরোপ ও এশিয়ার প্রায় সমস্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত, জেনারেল স্টাফের প্রধান, আর্মির প্রধান রাজনৈতিক উপদেষ্টা বা কমিশার, রাজনৈতিক গোয়েন্দা পুলিশের দুই প্রধান (ইয়াগোদা এবং ইয়েজহোভ) এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মিলিটারি ডিস্ট্রিকটের সুপ্রীম কমাণ্ডারগণ খতম হইয়াছিলেন। অনেককে 'গোপন বিচারে' এবং অনেককে

আবার কোন প্রকার বিচার ছাড়াই সাবাড় করা হইয়াছিল। ডুয়েটসার বলিতেছেন যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে এবং বিশেষভাবে উচ্চতম স্তরে এই সমস্ত চক্রান্তের অভিযোগ যদি সত্য হইত, তবে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে টিঁকিয়া থাকা সম্ভব হইত না। অথচ ষড়যন্ত্রকারীরা মাত্র দুটি বা তিনটির বেশী হত্যা করিয়াছিল, এমন কোন নজীর পাওয়া যায় না। বিশ্ববিখ্যাত গোর্কি'র প্রাণনাশের কথাও পরে (১৯৪০ সালে স্ট্যালিনের চীফ সেক্রেটারি রচিত আত্মজীবনীতে) অস্বীকৃত হইয়াছে এবং এক্ষণে সকলেই স্বীকার করেন যে, ১৯৩৬ সালে গোর্কি স্বাভাবিকভাবেই মারা গিয়াছিলেন।[১]

সোভিয়েটের অভ্যন্তরীণ সমাজ-জীবনের পক্ষে এই সমস্ত গুরুতর ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া যেমন অস্বীকার করা যায় না (যার জন্য বিংশতি কংগ্রেসের পর স্ট্যালিনকে অস্বীকার করার পর্যন্ত চেষ্টা হইয়াছে)* তেমনি লালফৌজের প্রতিভাসম্পন্ন নেতাদের খতম করার ফলে হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের গোড়ার দিকে সোভিয়েট বিপর্যয়ের কারণগুলিকেও উপেক্ষা করা যায় না।...

১৯৩৭ সালের ১১ই জুন সোভিয়েট তাস এজেন্সি প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইল যে, মার্শাল তুখাচেভস্কি ও ৭ জন নেতৃস্থানীয় জেনারেলকে মিলিটারি ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে সোভিয়েট সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হইয়াছে। সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন ও বাইরের জগত এই সংবাদে স্তম্ভিত হইল।

স্তম্ভিত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ আধুনিক লালফৌজ বা রেড আর্মি'র স্রষ্টা ছিলেন দু'জন—ট্রটস্কি এবং তুখাচেভস্কি। গোড়ায় ট্রটস্কি এই সৈন্যবাহিনীকে রূপ দিয়াছিলেন, ডিসিপ্লিন দিয়াছিলেন এবং সংগঠন দিয়াছিলেন এবং তুখাচেভস্কি দিয়াছিলেন আধুনিক যুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশলের শিক্ষা। ট্রটস্কি আগেই নির্বাসিত হইয়াছিলেন (১৯২৮ সাল এবং নিহত ১৯৪০ সালে) স্ট্যালিনের সঙ্গে তীব্র দ্বন্দ্বের জন্য এক্ষণে মার্শাল তুখাচেভস্কি ও অন্যান্য সামরিক পুরুষদের পালা। তুখাচেভস্কি ছিলেন জারের রাশিয়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, জন্ম ১৮৯৩। কিন্তু প্রথম যৌবনেই তিনি বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টিতে ও লালফৌজে যোগদান করেন এবং অসামান্য দক্ষতা ও প্রতিভার বলে সামরিক জগতে শীর্ষস্থান দখল করেন। ১৯১৮ সালের মে মাসে মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি ফার্স্ট আর্মি'র প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন এবং প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি যুদ্ধে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। রণনীতি ও রণকৌশলে তিনি নূতন প্রাণসঞ্চার করেন এবং ক্রমে সোভিয়েট রাশিয়ায় সেরা সামরিক নেতারূপে ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর 'সোভিয়েট ইউনিয়নের মার্শাল' পদবীর দ্বারা সম্মানিত হন। আরও চারজন—বুচার, ইয়েগোরোভ, বুদেনী ও ভরোশিলোভ সেই সঙ্গে মার্শালের মর্যাদায় উন্নীত হন এবং রেড আর্মিতে এই প্রথম এই সর্বোচ্চ সামরিক মর্যাদার পদ প্রবর্তিত হইল।

১। পূর্বাধৃত পুস্তক পৃঃ ৩৬৯

* ১৯৫৫-৭১ সালের মধ্যে আমার কয়েকবার সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শনের সুযোগ ঘটেছিল। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, সোভিয়েট জনজীবনে স্ট্যালিন আজ উপেক্ষিত, এমনকি তাঁর জন্মস্থান জর্জিয়াতে পর্যন্ত। এর মূল কারণ স্ট্যালিন কর্তৃক অজস্র মানুষের পীড়ন এবং বিশিষ্ট সামরিক ও রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের প্রাণহনন।—লেখক

২। Barbarassa—Allan clark—P. 55

তুখাচেভস্কি চীফ অব দি জেনারেল স্টাফ এবং ডেপুটি সমর সচিবের পদেও অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৯৩১ সালে তিনি গিয়াছিলেন পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি পরিদর্শনে। সেখানে সমাজের উপরতলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ হইয়াছিল—বিশেষভাবে প্যারিসে। ফরাসী সৈন্যবাহিনীর মঃ গ্যামেলাঁ (যিনি ১৯৪০ সালে পশ্চিম রণাঙ্গনে ফরাসী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন) এবং জারিস্ট রাশিয়ার এক প্রাক্তন সেনাপতির সঙ্গেও তাঁর আলাপ হইয়াছিল। মাদাম তাবুই (Madame Tabouis) একজন অভিজাত শ্রেণীর এবং সন্দেহজনক চরিত্রের মহিলা ছিলেন। কিন্তু বৃত্তিতে তিনি ছিলেন একজন নামকরা সাংবাদিক। তিনি তাঁর নারীজনোচিত প্রভাব খাটাইয়া নানা গোপন সংবাদ সংগ্রহ করিতেন এবং সেগুলি তিনি তাঁর সাংবাদিকতায় প্রচার করিয়া বাহাদুরি নিতেন। (১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পতনের আগে উচ্চ কূটনীতিক মহলে এই মহিলার কার্যকলাপের ইঙ্গিত পাওয়া যায় কোন কোন পদস্থ মার্কিন কূটনীতিকের রচনায়—যেমন রবার্ট মারফি রচিত 'ডিপ্লোম্যাট এবং ওয়ারিয়রস' পুস্তকে।) মার্শাল তুখাচেভস্কি এই মহিলার সঙ্গে পানভোজন করেন এবং মাদাম তাবুই তাঁর সংবাদপত্রের স্তম্ভে তাঁর সঙ্গে আলোচনার উদ্ধৃতি দেন।…[১]

পশ্চিমের এই পরিভ্রমণের পরেই তুখাচেভস্কির বিরুদ্ধে ক্রেমলিনে সন্দেহের মেঘ জমিতে থাকে এবং তখন স্ট্যালিন কর্তৃক সৃষ্ট টেরর বা সন্ত্রাস এক ভয়াবহ বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং কোন পদস্থ ব্যক্তিই তখন নিরাপদ ছিলেন না। এমন কি, স্ট্যালিনের বিশ্বস্ত ও সমর্থক গোষ্ঠীর মধ্যেও এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। স্বভাবতই তখন স্ট্যালিনের বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিকূলতা ভিতরে ভিতরে দানা বাঁধিতেছিল।[২]

স্ট্যালিনের স্বৈরাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে রেড আর্মির নেতাদের তথাকথিত চক্রান্ত ও ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রের বহু রোমাণ্টিক বিবরণী এবং ১৯২২ হইতে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত জার্মান সৈন্যবাহিনী ও লালফৌজের নেতৃত্বের মধ্যে যোগাযোগের প্রভুত চাঞ্চল্যকর কাহিনী পাওয়া যায় পশ্চিমী লেখকদের, বিশেষভাবে পশ্চিম জার্মানীর সামরিক ইতিহাস লেখক পল ক্যারেলের—'হিটলারস ওয়ার অন রাশিয়া' পুস্তকে। কিন্তু এগুলি বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ, এগুলির দলিলগত কোন নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ নাই। এজন্য আইজাক ডুয়েটসার বলিয়াছেন যে, বৈদেশিক রাষ্ট্রের কিংবা ফ্যাসিস্ট শক্তির সহায়তায় সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ 'সম্পূর্ণ মিথ্যা'। যদি এগুলি সত্য হইত, তবে, ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে নাৎসী জার্মানীর নেতা ও জার্মান সামরিক বাহিনী সংক্রান্ত পর্বতপ্রমাণ নথিপত্রের মধ্যে নিশ্চয়ই চক্রান্তের কোন সন্ধান পাওয়া যাইত। কিন্তু সেই সমস্ত নথিপত্রের কোথাও সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট বা আর্মির মধ্যে কোন নাৎসী পঞ্চম বাহিনীর কোন অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায় নাই।[৩]

ডুয়েটসারের এই মন্তব্য সমীচীন। তথাপি তিক্ত সত্য এবং রাশিয়ার পক্ষে

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ৫৯

২। আইজাক ডুয়েটসার প্রণীত 'স্ট্যালিন'—পৃঃ ৩৭৫-৭৬

৩। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক 'স্ট্যালিন'—পৃঃ ৩৭৬, পাদটীকা

দুর্ভাগ্যজনক সত্য এই যে, লালফৌজের শীর্ষস্থানীয় নেতারা ১৯৩৬-১৯৩৭ সালে এক গভীর চক্রান্তের অংশীদাররূপে সন্দেহভাজন হইলেন। সেদিনে রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক প্রতিভা তুখাচেভস্কি এবং তাঁর সহকর্মীগণ স্ট্যালিনের বিষনজরে পড়িলেন। কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন যে, এই চক্রান্তের আসল উদ্ভব হইয়াছিল হিটলারের সামরিক ও রাজনৈতিক গোয়েন্দা মহলে। তারাই এক চক্রান্তের মিথ্যা দলিল জাল করিয়া সেটা চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট বেনেসের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে সেই দলিল গিয়া পেঁাছিল স্ট্যালিনের হাতে। অন্য একদল বলিতেছেন যে, এই জাল দলিলের উৎস মস্কোয় রাজনৈতিক গোয়েন্দা দপ্তরে (জি. পি. ইউ) এবং সম্ভবত স্ট্যালিনের যোগসাজসে। আবার তৃতীয় এক দলের ধারণা যে, এর পিছনে কোন বিদেশী শক্তির কোন সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী নেতারা স্ট্যালিনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁকে অপসারিত করিতে চাহিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ক্রেমলিনে আকস্মিক এক বিদ্রোহ ঘটানো এবং স্ট্যালিনকে হত্যা !···[চার্চিল—১ম খণ্ড—পৃঃ ২২৫ দ্রষ্টব্য]

এই সমস্ত ঘটনার সত্যাসত্য কখনও নির্ণীত হয় নাই এবং আসল সত্য এই যে, ১৯৩৭ সালের ১লা মে তুখাচেভস্কিকে দেখা গেল স্বয়ং স্ট্যালিনের পার্শ্বে লেনিন স্মৃতিসৌধে—মে দিবসের প্যারেড উপলক্ষে। আর ১১ দিন পরেই তাঁর পদাবনতি ঘটিল এবং ১২ই জুন তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের প্রাণহননের (প্রাণদণ্ড) কথা ঘোষিত হইল ! এভাবে মাত্র ৪৪ বছর বয়সে লালফৌজের এক ঐতিহাসিক প্রতিভা নেপথ্যে অপসারিত হইলেন অত্যন্ত রহস্যজনক অবস্থার মধ্যে। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা কোন অনুশোচনা করেন নাই, কোন স্বীকারোক্তিও দেন নাই। রাজনৈতিক গোয়েন্দা পুলিশ নাকি এই চক্রান্ত আবিষ্কার করিয়াছিল। তুখাচেভস্কিকে গ্রেপ্তার করার সময় তিনি আহত হইয়াছিলেন এবং তাঁকে স্ট্রেচারে করিয়া স্ট্যালিনের নিকট নেওয়া হইয়াছিল। সেখানে স্ট্যালিনের সঙ্গে মার্শালের বহুক্ষণ ধরিয়া তীব্র ও রুদ্ধ বচসা হওয়ার পর তাঁকে পুনরায় কারাগারে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁর আদৌ কোন বিচার হইয়াছে কিনা কিংবা বিচারের আগেই গুলী করিয়া মারা হইয়াছে সে বিষয়েও গভীর বিতর্ক আছে। অবশ্য অপর চারজন মার্শাল—ভরোশিলোভ, বুদোনি, ব্লুচার ও ইয়েগোরেভ মার্শাল তুখাচেভস্কির মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞায় স্বাক্ষর দিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের চরম বিদ্রূপ এই যে, শেষোক্ত দুইজন মার্শাল ব্লুচার এবং ইয়েগোরেভও শীঘ্রই বধ্যভুমিতে প্রেরিত হইলেন। কত সহস্র হতভাগ্যকে এভাবে প্রাণ দিতে হইয়াছিল সেই সঠিক সংখ্যা কোনদিন জানা যাইবে না। তবে, কোন কোন মহলের বিশ্বাস যে, একমাত্র সৈন্য-বাহিনীরই ২০ হাজার অফিসার খতম হইয়াছেন এবং গোটা অফিসার বাহিনীর শতকরা ২৫ জন ধৃত ও কয়েক হাজারকে গুলী করিয়া মারা হইয়াছিল। রাষ্ট্রের সমগ্র কাঠামো যেন কাঁপিয়া উঠিল।[১]

কি রকম বেপরোয়াভাবে পদস্থ ব্যক্তিদের ধরপাকড় বা গুলী করিয়া মারা হইয়াছিল, তার প্রমাণ এই যে, লালফৌজের অপর দুইজন কৃতী সেনানী গভোরোভ এবং রকোসোভস্কিকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, অথচ এঁরা দৈবক্রমে রেহাই পাইয়া ভবিষ্যতে (জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে) মার্শাল পদবীর দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১৯৬১

১। পূর্বোক্ত পুস্তক—পৃঃ ৩৭৭

সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সোভিয়েট সরকারী সামরিক ইতিহাসেও এই সমস্ত "'পার্জের' নিন্দা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধে গোড়াকার ব্যর্থতার জন্য ১৯৩৭-৩৮ সালের সামরিক ও রাজনৈতিক অফিসারদের 'পার্জ'ই দায়ী।"[১]

সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে এন এস ক্রুশ্চেভ কঠোর ভাষায় স্ট্যালিন কর্তৃক অনুষ্ঠিত এই সমস্ত 'পার্জের' বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানাইয়াছিলেন এবং ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, নাৎসী জার্মানীর সহিত গোপন চক্রান্তের অভিযোগ ইত্যাদি সবই মিথ্যা এবং এঁরা সকলেই নির্দোষ ছিলেন।...

১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সালের এই সমস্ত ভয়াবহ ঘটনাবলী স্ট্যালিনের অদ্ভুত জীবনের যেমন এক 'অন্ধকার অধ্যায়' তেমনি লালফৌজের অভূতপূর্ব ইতিহাসের মধ্যেও সেই অধ্যায় কালো ছায়া ফেলিয়াছিল। একদিকে স্টালিনের 'ব্যক্তিপূজা'র হিড়িক এবং অন্যদিকে এই হিংস্র পার্জ-নীতি লালফৌজের মধ্যে উদ্যম, উৎসাহ ও সজীবতায় যেন ভাটা আনিয়া দিয়াছিল। এমন কি অনেকদিন পর্যন্ত সেনানীমণ্ডলী ও রাজনৈতিক পার্টির সদস্যদের মধ্যে বনিবনা ও সদ্ভাব ছিল না। কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্ট বিরোধও কম ছিল না। ১৯৪২ সালের শরৎকালে এই অবস্থার অবশ্য পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু পার্জের ফলে আর্মির শূন্যপদগুলিতে হাজার হাজার আনাড়ি প্রবেশ করে, ১৯৪১ সালে যাদের কোন যুদ্ধের অভিজ্ঞতাই ছিল না। ট্যাংক ও বিমান চালনায়ও কোন উপযুক্ত ট্রেনিং ছিল না। এমন কি গোটা লালফৌজেরই মডার্ন বা আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা ও রণশিক্ষার অভিজ্ঞতা ছিল না—তাদের একমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল ১৯১৮-২২ সালের গৃহযুদ্ধের। কিন্তু সেই যুদ্ধের সঙ্গে হিটলারী যুদ্ধের কোন তুলনাই দেওয়া চলে না। এজন্যই মার্শাল বুদেনি ও মার্শাল ভরোশিলোভের মত গৃহযুদ্ধের দক্ষ সেনাপতিরাও এবার অকেজো প্রমাণিত হইলেন।

অন্যান্য যে সমস্ত ত্রুটির কথা প্রামাণ্য এবং সোভিয়েট পক্ষপাতী সামরিক গ্রন্থে (যেমন, আলেকজাণ্ডার ভার্থ, পি ঝিলিন প্রমুখের রচনায়) উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে আকস্মিক আক্রমণের জন্য সামরিক দিক দিয়া উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাব, যার জন্য স্বয়ং স্ট্যালিনের 'ভুল হিসাব ও বিবেচনা' দায়ী ছিল। এমন কি, সোভিয়েট সরকারী ইতিহাসেও একথা স্বীকার করা হইয়াছে। লালফৌজের সৈন্য সংখ্যা যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু ১৭০ ডিভিসন সৈন্যকে অতিরিক্ত দীর্ঘ রণাঙ্গনে (দেড় হাজার থেকে দুই হাজার মাইল পর্যন্ত) পাঁচটি 'সামরিক জেলায়' (লেনিনগ্রাদ, বাল্টিক, পশ্চিম অঞ্চল, কিয়েভ ও ওডেসা) ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সমস্ত সীমান্ত অঞ্চলে জার্মানীর অতর্কিত আক্রমণ ঘটিতে পারে, এমন সম্ভাবনাকে পর্যন্ত উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল—

"that a surprise attack by Germany was out of the question..."[২]

সীমান্তে 'অরক্ষণীয়' অবস্থা এবং ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ৫০০ বার জার্মান বিমান কর্তৃক সীমানা লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও এই সমস্ত বিমানকে গুলী করিয়া নামানো নিষিদ্ধ ছিল! কারণ, রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির মর্যাদা বিধান করিতে হইবে এবং হিটলারকে খুশী রাখিতে হইবে! কিন্তু সরকারী ইতিহাসের

১। Russia At War—Alexander Werth. P. 147

২। পূর্বোক্ত পুস্তকে সোভিয়েট সরকারী ইতিহাসের উদ্ধৃতি।

মতে এই আদেশটি দিয়াছিলেন 'বিশ্বাসঘাতক' বেরিয়া, সীমান্তরক্ষী বাহিনী যার এক্তিয়ারের অধীন ছিল।

যন্ত্রবিজ্ঞান, কলকারখানা ও অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য যে সোভিয়েট পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির এত খ্যাতি ১৯৪১ সালে হিটলারী আক্রমণের সময় জার্মানীর তুলনায় কিন্তু সেদিক দিয়াও অবস্থা তেমন সন্তোষজনক ছিল না। মহাযুদ্ধের প্রথমদিকে সোভিয়েট ভাগ্যবিপর্যয়ের এটাও ছিল অন্যতম কারণ। প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে প্রায় ৯ হাজারের মত নূতন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এণ্টারপ্রাইজ শুরু হইয়াছিল এবং এর ফলে সোভিয়েট রাশিয়া শ্রমশিল্পে অগ্রগণ্যদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তার প্রতিরক্ষার শ্রমশিল্প (ডিফেন্স ইণ্ডাস্ট্রি) শক্তিশালী হইয়া উঠিল—বিশেষভাবে অস্ত্র ও গোলাগুলী নির্মাণের কারখানা। এভাবে যুদ্ধপূর্ব দুই বছরে শ্রমশিল্পের উৎপাদন আড়াই গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু মিলিটারি ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের পাকা ভিত তৈরীর জন্য যে ভারী শ্রমশিল্পের সবগুলি শাখা সমানভাবে বিকশিত হওয়া দরকার কার্যক্ষেত্রে তা ঘটে নাই—বিশেষভাবে ferrous metallurgy-এর শাখা। ১৯৩৮, ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, ইস্পাত (১ কোটি ৮০ লক্ষ টন) কাঁচা লোহা (১ কোটি ৪০ লক্ষ টন) এবং রোল্ড্ মেটাল (১ কোটি ৩০ লক্ষ টন)—এই সমস্ত অত্যাবশ্যক ধাতুর উৎপাদন প্রায় একই অবস্থায় ছিল কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে হ্রাস পাইয়াছিল। ফলে প্রতিরক্ষার ইণ্ডাস্ট্রি পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল।[১]

রেড আর্মির আর একটি গুরুতর ত্রুটি ছিল যানবাহনের প্রশ্নে। ১৯৪১-এর জুন মাসে সোভিয়েট ইউনিয়নের মাত্র ৮ লক্ষ মোটর যান ছিল। ফলে, অনেক কামান ও ভারী অস্ত্র ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে কিংবা কৃষি ফার্মের ট্রাক্টরে করিয়া বহন করিয়া নিতে হইয়াছিল।

গোলন্দাজী বা গোলাগুলীর ব্যাপারে জার্মান বাহিনীর চেয়ে লালফৌজের দক্ষতা অবশ্য বেশী ছিল এবং বিখ্যাত (Katyusha) 'কাটিয়ুশা' মর্টার কামান প্রথম থেকেই স্মলেনস্ক রণক্ষেত্রের আত্মরক্ষার পক্ষে (জুলাইয়ের মধ্যভাগ) সাফল্য অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু এই গোলন্দাজী শক্তির পাশাপাশি উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রাডারের ব্যবহার একেবারে শৈশব দশায় ছিল। রেড আর্মির মধ্যে অনেকে ভালো করিয়া বেতার যোগাযোগের ও সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা পর্যন্ত জানিতেন না। একথা সরকারী ইতিহাসেও স্বীকার করা হইয়াছে। এবং এই ইতিহাসে লালফৌজের জন্য ১৯৩৯ সালের প্রস্তাবিত ফিল্ড রেগুলেশনের অতিরিক্ত 'আক্রমণাত্মক' মনোভাব ও নির্দেশকে তীব্র সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, এইগুলি বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক ছিল না। এমন কি এই রেগুলেশনে 'ব্লিজক্রীগ' বা বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের তত্ত্বকে বুর্জোয়া তত্ত্ব বলিয়া নস্যাৎ করা হইয়াছে এবং আক্রমণ ও আত্মরক্ষা সম্পর্কে এমন সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, যার ফলে সৈন্যদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। ('রাশিয়া এ্যাট ওয়ার', পৃঃ ১৩৯)

বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত ত্রুটি এবং দুর্বলতাই পরবর্তীকালে সম্পূর্ণরূপে কাটাইয়া উঠিয়া জার্মানীর তুলনায় প্রায় সমস্ত দিক দিয়াই অনেক বেশী সামরিক শক্তি

১। They Sealed Their Own Doom—P. Zhilin—P. 185

সোভিয়েট ইউনিয়ন অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু ১৯৪১ সালের আক্রমণের মুখে জার্মানীর শক্তি অনেক বেশী ছিল। কারণ ১৯৩৩-৩৪ সাল থেকেই নাৎসী জার্মানী যুদ্ধের জন্য তৈরী হইতেছিল এবং এই বিষয়ে (শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠায় ও উৎপাদনে) মার্কিন ধনপতিদের প্রচুর সহায়তা পাইয়াছিল। জনৈক সোভিয়েট ইতিহাস লেখক জার্মানীর সূত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৯৩৩ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে জার্মানীর রণশিল্পের উৎপাদন ২২ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অধিকন্তু যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার দ্রব্যের স্টক বা মজুতের পরিমাণও প্রচুর বাড়িয়া গিয়াছিল। ইউরোপের ধনিক দেশগুলি নাৎসী জার্মানীর দখলে চলিয়া যাওয়ার পর জার্মানীর উৎপাদন শক্তি, শ্রমিক জনসংখ্যা, খাদ্য, কাঁচামাল, খনিজ সম্পদ ও জ্বালানী ইত্যাদি অদ্ভুত রকমে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইউরোপে ৯ হাজার মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের নানাপ্রকার সম্পত্তি, ২ লক্ষ ৩৫ হাজার টন তামা (৭ মাসের স্টক) এবং ১৫ মাসের নিকেলের স্টক জার্মানীর হাতে আসিল। ফ্রান্সের যানবাহনগুলি দখলে আসায় জার্মানীর ৮৮ ডিভিসন সৈন্যকে সুসজ্জিত করিতে পারিয়াছিল। হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও পোল্যান্ডের খনিগুলি সমস্তই অক্ষত অবস্থায় এবং কলকারখানাগুলিরও অনেকটা জার্মানীর দখলে আসিয়াছিল। অধিকৃত দেশগুলি থেকে এত শ্রমিক বলপূর্বক সংগ্রহ করা হইল যে, ১৯৪২ সালে জার্মানীতে বিদেশী শ্রমিকের সংখ্যা ১ কোটিতে, ১৯৪৪ সালের শেষে ১ কোটি ৩০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছিল। এভাবে জার্মানী সমগ্র ধনতন্ত্রী দুনিয়ায় সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। একমাত্র ১৯৪০ সালেই জার্মানী প্রায় ৯ হাজার ৫ শত বিমান, ১ হাজার ৮ শত ট্যাঙ্ক, ৪ হাজার কামান, ৫৭ হাজার মেসিনগান এবং ১৪ লক্ষ রাইফেল উৎপাদন করিল। অধিকৃত ইউরোপীয় দেশগুলিতেও হিটলারী সৈন্যদের জন্য অস্ত্র তৈরী হইতে লাগিল।[১]

১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সালে অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার কারখানাগুলি হিটলারী দখলে আসার ফলে জার্মান সামরিক শক্তি যে বাড়িয়া গিয়াছিল সেকথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। একমাত্র চেকোশ্লোভাকিয়াতেই হিটলারের হাতের মুঠোয় আসিল ১০ লক্ষ রাইফেল, ১ লক্ষ ৫৮ হাজার মেসিনগান, ৪৬৯ ট্যাঙ্ক, ১ হাজার ৫৮২টি মিলিটারি গাড়ী, ৩ হাজার কামান ও মর্টার, ৫ শত বিমান-মারা কামান এবং ৩০ লক্ষ গোলা। আর সেই সঙ্গে জগৎবিখ্যাত স্কোডা কারখানা।

এই সমস্ত হিসাব থেকেই বুঝা যাইবে যে, জার্মান সামরিক শক্তি কিভাবে তৈরী হইতেছিল। সোভিয়েট রাশিয়া যখন তার পশ্চিমদিকের নূতন সীমানায়—বাল্টিক রাজ্যগুলিতে, পোল্যান্ডের পূর্বাংশে ও বেসারাবিয়ায় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাগুলি একেবারে কাঁচা অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছিল কিংবা উপযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, নাৎসী জার্মানী তখন সর্বস্তরে নিখুঁত প্রস্তুতি চালাইতেছিল। সড়ক, রেলওয়ে, বিমান ঘাঁটি, যানবাহন ইত্যাদির ব্যবস্থা একেবারে পাকা করা হইয়াছিল। একমাত্র পোল্যান্ডেই জার্মানীর হেইঙ্কল, ডোরনিয়ার ও মেসারস্মিট জাতীয় 'হিংস্র' বিমানগুলির জন্য ২৫০টি আধুনিক বিমান ঘাঁটি ও অবতরণক্ষেত্র তৈয়ার হইয়াছিল।[২]

১। The Second World War—G. Deborin. Moscow. 1964, P. 126-128

২। The Russian Campaigns of 1941-43—W. E. D. Allen and Paul Muratoff. Penguin, London. 1944, P. 13

('রাশিয়া এ্যাট ওয়ার' পৃঃ ১৪৮)

সেই সঙ্গে ৩৩ লক্ষ নাৎসী সৈন্য ছিল সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সামরিক ইতিহাসে এমন আয়োজন ও প্রস্তুতি অভুতপূর্ব ছিল, সন্দেহ নাই। এই প্রচণ্ড সামরিক শক্তি লইয়া হিটলারী বাহিনী সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কিন্তু জার্মান রণনৈতিক উদ্দেশ্য কি ছিল? বিখ্যাত সমর-বিশেষজ্ঞ মেজর-জেনারেল জে এফ সি ফুলার বলিতেছেন যে, ইংল্যাণ্ড সামলাইয়া উঠার আগেই কিংবা আমেরিকা কর্তৃক আগাইয়া আসিবার পূর্বেই রাশিয়াকে যুদ্ধক্ষেত্রে ধরাশায়ী করাই ছিল জার্মানীর উদ্দেশ্য। কিন্তু সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়ন, (যার আয়তন সমগ্র পৃথিবীর ভুমিগত আয়তনের এক ষষ্ঠাংশ) দখল করা নিশ্চয়ই হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ, সেটা কার্যত অসম্ভব ছিল। কিন্তু রাশিয়ার যুদ্ধ চালাইবার ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েটের প্রাণতুল্য চারটি অঞ্চল—(১) লেনিনগ্রাদ, (২) মস্কো, (৩) উক্রাইন ও ডনেজ অববাহিকা এবং (৪) কুবান ও ককেশিয়া—এগুলি দখল করিয়া নেওয়া। কারণ, ব্যবসাবাণিজ্য, শ্রমশিল্প, খাদ্য, বৈষয়িক সম্পদ ও পেট্রোল ইত্যাদি—অর্থাৎ একটা সুবৃহৎ রাষ্ট্রের সম্পদ ও শক্তির যা কিছু উৎস সমস্তই ছিল এই অঞ্চলগুলিতে। কিন্তু উক্রাইন থেকে ককেশিয়া পর্যন্ত খাদ্য, কৃষি, শ্রমশিল্প (ডনেজ বেসিন এলাকায় সোভিয়েটের শতকরা ৬২ ভাগ ভারী শ্রমশিল্প ছিল) ও পেট্রোলের অজস্র সম্পদ দখল করিতে না পারিলে যেমন সোভিয়েটের সমর পরিচালনার শক্তিকে নষ্ট করা যাইবে না, তেমনি আবার লালফৌজকে আগে খতম করিতে না পারিলে দক্ষিণের ওই ঐশ্বর্যও করায়ত্ত করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং প্রথমটি ছিল রণনৈতিক ও দ্বিতীয়টি ছিল রণকৌশলগত প্রশ্ন কিংবা স্ট্র্যাটিজি ও ট্যাকটিসের এই দুই লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য খাটাইবার সমস্যা ছিল জার্মান সমরশক্তি সামনে। কিন্তু এই বিপুল ও জটিল সমস্যাকে সহজে মীমাংসা করিবার আশায় হিটলার চাহিলেন বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের একটি আঘাতে কিংবা একটিমাত্র অভিযানে (in a single campaign) রাশিয়াকে শেষ করিয়া দিতে।[১]

১৮১২ খৃস্টাব্দের ২২শে জুন রবিবার দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন নিয়েমেন নদী পার হইয়া তাঁর ইতিহাস বিখ্যাত রুশ অভিযান শুরু করিয়াছিলেন (অবশ্য আক্রমণের হুকুম দিয়াছিলেন ২১শে জুন) এবং শেষ পর্যন্ত বিপর্যয় বরণ করিয়াছিলেন। হিটলারও চাহিয়াছিলেন নেপোলিয়নের ভুমিকায় অবতীর্ণ হইতে। এমন কি, তাঁকে পশ্চাতে ফেলিয়া বিশাল সোভিয়েট শক্তিকে চূর্ণ করিতে এবং ওই ২২শে জুন তারিখেই হিটলারী সৈন্যেরা সোভিয়েট রাশিয়ার সুদীর্ঘ সীমান্তে আসুরিক আক্রমণ শুরু করিল। যদিও পরিণামে নেপোলিয়নের চেয়েও বহুগুণ বেশী বিপর্যয় হিটলার ও জার্মানীকে বরণ করিতে হইল, তবু ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে নাৎসী রণশক্তি যেন দৈত্যের মত সোভিয়েট শক্তিকে বিপর্যস্ত করিতে লাগিল। সত্য সত্যই মানুষের ইতিহাসে এত বড় আক্রমণ আর কখনও ঘটে নাই এবং এমন অবিশ্বাস্য সংগ্রামও ইতিহাস কোনদিন প্রত্যক্ষ করে নাই। মহাযুদ্ধের 'মহাভারত' এক মহাসর্বনাশা মূর্তি লইয়া দুই হাজার মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে দেখা দিল এবং সমগ্র পৃথিবী রুদ্ধনিঃশ্বাসে তার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিল।

১। The Second World War—J. F. C. Fuller. London. 1968. P. 116-117

অষ্টম অধ্যায়

অসতর্ক রাশিয়ার বিহ্বলতা

দুই বিশ্বনেতার বেতার ভাষণ

হিটলারী জার্মানীর অতর্কিত ও আকস্মিক আক্রমণে সোভিয়েট রাশিয়ার জনগণের মধ্যে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত বিহ্বলতার সৃষ্টি হইল। কারণ ১৯৩৯ সালের রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণের চিত্তে এমন ধারণা সৃষ্টির সুযোগ ঘটিয়াছিল যে, জার্মানী শান্তিকামী, কিন্তু পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীরাই যুদ্ধকামী। ফলে রাশিয়ার জনগণ এমন আসুরিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কেবল, সোভিয়েট রাশিয়াতেই নহে, সারা পৃথিবীতেই রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি প্রবল কুঝটিকার সৃষ্টি করিয়াছিল! একদিকে সারা ধনতান্ত্রিক জগৎ যেমন 'হিটলার-স্ট্যালিন মৈত্রীর' বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল অন্যদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন মহলে এবং সর্বত্র কমিউনিস্ট শিবিরেও বিহ্বলতার সৃষ্টি হইল। বলা বাহুল্য যে, এই বিহ্বলতা সৃষ্টির জন্য রাশিয়ার সংবাদপত্র, রেডিও, প্রচারযন্ত্র এবং স্বয়ং সোভিয়েট সরকার ও নেতৃবৃন্দও কম দায়ী ছিলেন না। তাঁরা এমন আচরণ করিতে লাগিলেন যার ফলে বাহ্যত সোভিয়েট ইউনিয়ন হিটলার ও ফ্যাসিজিমের "বন্ধু" বলিয়া বিরোধী মহলে চিত্রিত হইতে লাগিল। বিশেষভাবে হিটলারের বিদ্যুৎগতি আঘাতে ধরাশায়ী স্বাধীন রাষ্ট্র পোল্যাণ্ডের পূর্বাংশ দখল করিয়া নেওয়ার পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডার বান ডাকিল। কিন্তু সোভিয়েট নেতারাই এর সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, একথা বলিলে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হইবে না। জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে পোলিশ সীমানা ভাগ-বাঁটোয়ারার পর নাৎসী পররাষ্ট্র সচিব রিবেনট্রপের সম্মানে স্বয়ং স্ট্যালিন, মলোটোভ প্রভৃতি মস্কোতে এক ডিনারের উৎসব করিলেন এবং তার পর ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯, রুশ-জার্মান যুগ্ম বিবৃতিতে রিবেনট্রপ ও মলোটোভ যে স্বাক্ষর দিলেন তাতে ঘোষণা করা হইল যে, এই চুক্তির দ্বারা পূর্ব ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। এর পর একদিকে বৃটেন ও ফ্রান্স এবং অন্যদিকে জার্মানী এই দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাতিল হওয়া উচিত এবং সেটা সমস্ত জাতির পক্ষেই কল্যাণকর হইবে। 'কিন্তু যদি এই যুদ্ধ চলিতে থাকে, তবে, প্রয়োজনীয় কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত সেই সম্পর্কে জার্মানী ও সোভিয়েট ইউনিয়নের গভর্নমেণ্ট পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন।'

বলা বাহুল্য যে, যুগ্ম বিবৃতির এই ভাষ্য নিশ্চয়ই ফ্যাসিজম বা হিটলারের বিরোধী ছিল না। বরং দুই গভর্নমেণ্টের মধ্যে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার ইঙ্গিতবহ ছিল। তারপর ৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৯, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভ সুপ্রীম সোভিয়েটে যে 'বিখ্যাত বক্তৃতা' দিলেন, তাতে মানচিত্র থেকে পোল্যাণ্ডের অবলুপ্তিকে স্বাগত জানাইলেন। কারণ, তাঁর মতে ওটা ছিল ভার্সাই সন্ধির অপজাত বীভৎস সন্তান!—

'The monster child of the Treaty of Versailles'—

এবং ঘোষণা করিলেন—'জার্মানী নয়, বৃটেন ও ফ্রান্সই এক্ষণে আগ্রাসী রাষ্ট্র!'

(অবশ্য ১৯৬০ সালে প্রকাশিত মহাযুদ্ধের সোভিয়েট সরকারী ইতিহাসে মলোটোভকে পোল্যান্ড সংক্রান্ত বক্তৃতার এই অংশের জন্য সমালোচনা করা হইয়াছে।)

কিন্তু মলোটোভের বক্তৃতার ওখানেই শেষ নয়। তিনি আরও আগাইয়া গেলেন এবং আক্রমণ বা আগ্রাসন প্রসঙ্গে নিজের আরোপিত ব্যাখ্যা টানিয়া বলিলেন—বর্তমানে 'আগ্রাসন' সংক্রান্ত সমস্ত ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তিন বা চার মাস আগে যে অর্থে আমরা এই শব্দটি ব্যবহার করিতাম, এখন সেই অর্থে করিতে পারি না। এক্ষণে জার্মানী শান্তির সপক্ষে দণ্ডায়মান। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সই যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে চাহিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে পারস্পরিক ভূমিকা পাল্টাইয়া গিয়াছে।—

('Now Germany stands for peace, while Britain and France are in favour of continuing the war. As you see, the roles have been reversed')

এমন কি হিটলারিজমের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্র রক্ষার পক্ষে বৃটেন ও ফ্রান্সের বিঘোষিত যুদ্ধকে বিদ্রূপ করিয়া মলোটোভ এমন পর্যন্ত বলিলেন:

'বৃটেন ও ফ্রান্স পোল্যান্ডের পুনরুজ্জীবনের জন্য আর যুদ্ধ করিতে পারিবে না দেখিয়া এক্ষণে এমন ভঙ্গী দেখাইতেছে—যেন তারা হিটলারিজমের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই করিতেছে! বৃটিশ সরকার হিটলারীবাদকে ধ্বংস করার জন্য নাকি কৃতসংকল্প। সুতরাং এটা হইতেছে মতবাদের লড়াই—এক ধরনের মধ্যযুগীয় ধর্মীয় লড়াই।'

"It ts therefore not only nonsensical but also criminal to pursue a war for the destrucation of Hitlerism under the bogus banner of a struggle for democracy!"[১]

এ ধরনের বক্তৃতা ও প্রচারের ফলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হইল, সেই প্রসঙ্গে বিখ্যাত লেখক মরিস হিন্ডাস 'রাশিয়া ফাইটস্ অন' নামক পুস্তকে বলিয়াছিলেন—অথচ মলোটোভ ও স্ট্যালিন ইতিপূর্বে নাৎসীদের সম্পর্কে যা কিছু প্রচার করিয়াছিলেন, এই প্রকার মন্তব্য সেগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত তো বটেই, এমন কি কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েট গভর্নমেন্টের প্রচারিত বৈপ্লবিক চিন্তাধারারও এগুলি মারাত্মক বিরোধী ছিল। কেবল তাই নয়, এর দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল নরনারীর মুখের উপর যেন চড় কষানো হইল!'

১৯৪০ সালের ৩০শে নভেম্বর 'প্রাভদা' পত্রিকায় স্ট্যালিন বলিলেন—'জার্মানী ফ্রান্স ও ইংলন্ডকে আক্রমণ করে নাই, বরং ফ্রান্স ও বৃটেনই জার্মানীকে আক্রমণ করিয়াছে। অতএব বর্তমান যুদ্ধের প্রাথমিক দায়িত্ব তাদের।'[২] ইজভেস্তিয়া ও অন্যান্য রুশ পত্রিকা এবং মস্কো রেডিওতে এই ধরনের প্রচার চলিতে লাগিল।

মরিস হিন্ডাস তাঁর বইতে (রাশিয়া ফাইটস অন, পৃঃ ১৮-১৯) মন্তব্য করিয়াছেন, 'মার্কিন ও বৃটিশ কমিউনিস্টরা, যাঁদের মনে করা হইত রাশিয়ার সর্বোত্তম বন্ধু, রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ জীবন ও বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে তাঁদের আজগুবি ভুল ধারণা

১। Russia At War—Alexander Werth. London 1956. P. 79-81-82.

২। The Great Challenge—Louis Fischer. Delhi. Rajkamal Publications. 1946,

ছিল। ফলে, তাঁদের আচণে রাশিয়া সম্পর্কে সাধারণ বিভ্রান্তি, ঘৃণা এবং রাশিয়ার সামরিক শক্তির প্রতি অবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তা করিল। বছরের পর বছর ধরিয়া এই সমস্ত কমিউনিস্টরা নাৎসী আগ্রাসন ও যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে সারা পৃথিবীর গগন বিদীর্ণ করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁরা রাতারাতি একেবারে ভোল পাল্টাইয়া ফেলিলেন এবং তারস্বরে চেঁচাইতে লাগিলেন যে, সোভিয়েট-জার্মান চুক্তির ফলে যুদ্ধের সমস্ত বিপদ দূর হইয়া গিয়াছে এবং শান্তি সুনিশ্চিত হইয়াছে।…তাঁরা বৃটেনের শত্রু এবং জার্মানীর মিত্রের মত আচরণ করিতে লাগিলেন এবং পরবর্তী ঘটনাবলীতে দেখা যায় যে, তাঁদের এই আচরণে রাশিয়ার প্রতিও শত্রুতাই করা হইয়াছিল।'

ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতেই এই মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। আসলে নাৎসী জার্মানী অকস্মাৎ চুক্তিপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি এমন বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণ চালাইতে পারে, এমন বিশ্বাস অনেক মহলেই ছিল না। 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত কর'—কমিউনিস্টদের এই শ্লোগান দীর্ঘকালের। ১৯৩৯-১৯৪১ সাল পর্যন্ত (রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার আগে) এই সমস্ত কেতাবী শ্লোগানও নাৎসী আক্রমণের মুখে ভুল বুঝাবুঝির সুযোগ দিয়াছিল। এখানে স্মরণীয় যে, ১৯৩৫ সালে কমিউনিস্ট কংগ্রেসে আন্তর্জাতিক কমিণ্টার্নের নেতা মঃ ডিমিট্রভ তাঁর বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—'যদি সর্বহারা শ্রেণী যুদ্ধকে ঠেকাইতে না পারে, তাহা হইলে সাম্রাজ্যবাদীদের নূতন বিশ্বযুদ্ধ হইবে সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের সোভিয়েট রাশিয়া লুণ্ঠনের যুদ্ধ, অধুনা স্বাধীন ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিগুলিকে কৃতদাসে পরিণত করার যুদ্ধ, উপনিবেশের ভাগবাঁটোয়ারা এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রধান শক্তিগুলির প্রভাব বিস্তারের যুদ্ধ। সাম্রাজ্য-বাদীরা যেদিন যুদ্ধ আরম্ভ করিবে, সেইদিনই ধনতান্ত্রিক জগতে বৈপ্লবিক সংকটের সূচনা হইবে। এই যুদ্ধে সর্বহারা শ্রেণীর ভূমিকা হইবে বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করা, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে পরিণত করা।'

আমাদের দেশের একজন প্রথিতযশা সম্পাদক পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (যিনি আজ পাঠকদের কাছে বিস্মৃত, অথচ যাঁর লেখনীই ছিল আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠার মূলে) স্ট্যালিনের জীবনীগ্রন্থে ডিমিট্রভের উপরের কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন—

'নূতন সাম্রাজ্যলোভী অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে বৃটেন ও আমেরিকা সোভিয়েটের মিত্র হইতে পারে, এমন সম্ভাবনা তখন কল্পনা করা হয় নাই।…এমন কি ১৯৪১ সালের জুন মাসে নাৎসী জার্মানী সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি 'সাম্রাজ্যভোগীর সহিত সাম্রাজ্যলোভীর যুদ্ধে অনেকাংশে শান্তিবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সংশয়ের কারণ ছিল হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণাকারী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি আসলে সাম্রাজ্যবাদী।…'[১]

গণতন্ত্র নামধারী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে এই গভীর অবিশ্বাস (এবং বলাই বাহুল্য যে, এই অবিশ্বাসের ঐতিহাসিক কারণ ছিল) এমন একটা আবহাওয়ার

১। স্ট্যালিন (জীবনী গ্রন্থ) শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, অগ্রণী বুক ক্লাব, কলিকাতা, ১৯৪৭, পৃঃ ২৩৩-২৩৫।

সৃষ্টি করিয়াছিল যে, জার্মানী প্রমুখ ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির জয়ের দ্বারা ইউরোপ তথা পৃথিবীর সমস্ত সর্বহারা শ্রেণী এবং জনগণের যে সর্বনাশ সাধিত হইবে, এই তথ্য সেদিন গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা হয় নাই। আগেই বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির মর্যাদারক্ষা ও হিটলারকে খুশী রাখার জন্য সেদিনের সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এমন সমস্ত কাজ করিয়াছিলেন, যার জন্য ব্যাপক ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে স্ট্যালিনের ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষে হিটলার 'বন্ধুভাবাপন্ন সোভিয়েট রাশিয়া' ও তার 'জনগণের উদ্দেশে' যে শুভেচ্ছামূলক বার্তা পাঠাইয়াছিলেন, তার জবাবে স্ট্যালিন তারযোগে যে 'বাণী' পাঠাইয়াছিলেন আজ তা নিশ্চয়ই হাস্যকর এমন কি অবিশ্বাস্য মনে হইবে ঃ

'The friendship of the peoples of Cermany and the Soviet Union, cemented by blood, has every reason to be lasting and firm.'

সোভিয়েট ও জার্মান জনগণেয় রক্তের দ্বারা যে বন্ধুতা শক্ত করা হইয়াছে, তা যে চিরস্থায়ী ও দৃঢ় হইবে, এমন আশা ব্যক্ত করিলেন স্ট্যালিন। আর 'রক্তের দ্বারা শক্ত করা' সেই বন্ধুতার উপর তখন হিটলারী আক্রমণ আসন্ন হইল, যখন মাত্র সাতদিন আগেও তাস কর্তৃক প্রচারিত ১৪ই জুন তারিখের সেই বিখ্যাত ইস্তাহারে আক্রমণের সমস্ত 'গুজবকে' তীব্রভাবে অস্বীকার করা হইল এবং সমস্ত কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিয়া বৃটিশ রাজদূতকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হইল এমন গুজব প্রচার করার জন্য![১]

কেবল রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি নয়, ১৯৪০, ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখ পরস্পরের মধ্যে যে অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, শেষ দিন বা ২২শে জুন পর্যন্ত রাশিয়া তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল। জার্মান লেখক পল ক্যারেল বলিতেছেন যে, এই চুক্তি অনুসারে রাশিয়া জার্মানীকে ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য, ১০ লক্ষ টন খনিজ তৈল, ২৭০০ কিলোগ্রাম প্লাটিনাম এবং ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোম ও কার্পাস সরবরাহ করিয়াছিল। এবং এজন্য হিটলারই শেষ পর্যন্ত স্ট্যালিনের কাছে ঋণী ছিলেন।

রুশ লেখক পি ঝিলিন বলিতেছেন যে, চুক্তি অনুসারে সোভিয়েট রাশিয়া ৫৫ কোটি ৫৯ লক্ষ রুবল মূল্যের (১৯৪০ সালে) পণ্য জার্মানীকে সরবরাহ করিয়াছিল। অপরপক্ষে জার্মানী কিন্তু রাশিয়াকে বিশ্বাস করে নাই, চুক্তির মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ কিংবা ৩১ কোটি ৬৩ লক্ষ রুবল মূল্যের জিনিস জার্মানী রাশিয়াকে সরবরাহ করিয়াছিল। তবু রাশিয়া জার্মানীকে অবিশ্বাস করে নাই!

* * *

উপরের এবং আগেকার অধ্যায়গুলির বর্ণিত ঘটনাবলী থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, স্ট্যালিন ও সোভিয়েট নেতারা কি অন্ধ ছিলেন কিংবা তাঁরা সরল বিশ্বাসী বোকা ছিলেন? আসল কথা তাঁরা যুদ্ধ এড়াইবার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াছেন এবং অন্যদিকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের অতীত ইতিহাস ও সাম্রাজ্যবাদী-সুলভ আচরণের জন্য তাঁদের বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, স্ট্যালিন নাৎসী জার্মানী ও হিটলার সম্পর্কে ভুল বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং স্ট্যালিনের এই ভ্রান্তির কথা সোভিয়েট ইতিহাসকারগণও উল্লেখ

১। Stalin—Issac Deutsher. P 435 & 445.

করিয়াছেন। পি ঝিলিন লিখিয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিরক্ষার শক্তি বাড়ানো হইয়াছিল বটে, কিন্তু—

'However, Stalin seriously misjudged the military political situation just before the outbreak of the war and much of what could have been accomplished was left undone'

অর্থাৎ যুদ্ধ বাধিবার আগে প্রতিরক্ষার যা কিছু সম্পূর্ণ করা উচিত ছিল, স্ট্যালিন কর্তৃক সামরিক-কূটনৈতিক পরিস্থিতির ভুল বিবেচনার জন্য সেগুলি করা যায় নাই।

সুতরাং আবার প্রশ্ন উঠিতেছে—জার্মানী যে রাশিয়াকে আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে, সেই সম্পর্কে স্ট্যালিন ও সোভিয়েট নেতারা কি কোন খবর রাখিতেন না ?—তাঁরা খবর রাখিতেন এবং বহু খবর নানা সূত্রে তাঁদের নিকট পৌঁছিয়াছিল, তবু তাঁরা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই।

পি ঝিলিন বলিতেছেন ঃ

'রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সত্ত্বেও ১৯৪০ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এমন অনেক ঘটনার কথা জানা গিয়াছিল যে, জার্মানী রাশিয়া সম্পর্কে তার মনোভাবের নিদারুণ পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। ফ্রান্সের পতনের পরেই রাশিয়াকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি শুরু করিয়াছে। অর্থনৈতিক চুক্তির অর্ধেকটা তারা পালন করে নাই।...'

জার্মানীতে যাঁরা ফ্যাসিজমের বিরোধী ছিলেন, তাঁরা আসন্ন যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়াকে সতর্ক করিয়া দেওয়া নিজেদের কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁরা বার্লিনের সোভিয়েট দূতাবাসে এবং কোনিসবার্গ, ডানজিগ ও প্রাগের বাণিজ্য দূতাবাসগুলিতে চিঠিপত্র দিয়া একবাক্যে ঘোষণা করিলেন যে, সাবধান, হিটলার তোমাদের আক্রমণ করিবে!

১৯৪০ সালের জুলাই মাসে বার্লিনের সোভিয়েট দূতাবাস মস্কোতে এই মর্মে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের জন্য নাৎসীরা প্রস্তুতি চালাইতেছে এবং হিটলার 'বলশেভিক রাশিয়ার' বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এমন কি, লেনিনগ্রাদ, মস্কো ও কৃষ্ণ সাগরের দিকে যে আক্রমণ চালানো হইবে, সেই সমস্ত রণনৈতিক পরিকল্পনার কথাও জানা গিয়াছিল। 'বার্বারোসা' পরিকল্পনার সঙ্গে এগুলি মিলিয়া গিয়াছিল। জার্মানীর অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যাও প্রচুরভাবে বৃদ্ধির সংবাদ আসিতেছিল। যুগোশ্লাভিয়ার পরাজয়ের পর এবং পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরীণ অবস্থার নানা সংবাদ থেকেও আসন্ন হিটলারী আক্রমণ সম্পর্কে খবর পাওয়া যাইতেছিল।

'তবে, রাশিয়াকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে জার্মানীর এই সমস্ত যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে সোভিয়েট সরকার ও স্ট্যালিন ব্যক্তিগতভাবে কতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন, সে কথা এখনও অস্পষ্ট'—একথা লিখিয়াছেন পি ঝিলিন। তিনি বলিতেছেন—কিন্তু প্রথম রিপোর্ট আসিয়াছিল লণ্ডন থেকে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ১৯৪১ সালের ৩রা এপ্রিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারী আসন্ন আক্রমণের বিপদ সম্পর্কে স্ট্যালিনকে সতর্ক করিয়া দেন। চার্চিল তাঁর এই বার্তা মস্কোস্থিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের নিকট পাঠান এবং তাঁকে এই

নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন নিজে চার্চিলের এই বার্তা নিয়া স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস চার্চিলের এই নির্দেশ পালন করেন নাই। কারণ, তাঁর যুক্তি এই ছিল যে, প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের এই বার্তা লণ্ডন থেকে তাঁর নিকট পেঁৗছিবার আগেই তিনি (ক্রিপস) নিজে উদ্যোগী হইয়া অনুরূপ একটি বার্তা (হিটলারী আক্রমণ সম্পর্কে) লিখিতভাবে উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. ওয়াই. ভিসিনস্কির নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

চার্চিল ক্রিপসের এই আচরণে বিরক্ত হইলেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এন্থনি ইডেনকে নির্দেশ দিলেন যেন তাঁর এই বার্তা স্ট্যালিনের নিকট পেঁৗছাইয়া দেওয়া হয়। এজন্য ক্রিপসকে ১৫ই এপ্রিল পুনরায় চার্চিলের এই বার্তা সম্পর্কে স্মরণ করাইরা দেওয়া হয় এবং ক্রিপস পুনরায় এই নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন। অবশ্য ৩০শে এপ্রিল ক্রিপস ইডেনকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি এই বার্তাটি ১৯শে এপ্রিল তারিখে ভিসিনস্কির নিকট পেঁৗছাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভিসিনস্কি এই বার্তা স্ট্যালিন বা মলোটোভ কার কাছে পাঠাইয়াছিলেন, তা জানা যায় নাই।

এই প্রসঙ্গে চার্চিল তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে (তৃতীয় খণ্ড) মন্তব্য করিয়াছেন—

'I can not form any final judgment upon whether my message, if delivered with all the promptness and ceremony prescribed, would have altered the course of events.

অর্থাৎ আমার সেই বার্তা যদি আমার নির্দেশমত দ্রুততা ও আদবকায়দাসহ স্ট্যালিনের কাছে পেঁৗছাইয়া দেওয়া হইত, তবে, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর গতি পরিবর্তিত হইত কিনা, সেই বিষয়ে আমি কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পেঁৗছিতে পারিতেছি না।

চার্চিলের এই সংশয় সত্ত্বেও একথা নিশ্চিত যে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই গুরুতর বার্তাটি সোভিয়েট সরকারের খাস দপ্তরে পেঁৗছিয়াছিল। স্বয়ং ভিসিনস্কি লিখিতভাবে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে জানাইয়াছিলেন যে, চার্চিলের বার্তাটি স্ট্যালিনের নিকট পেঁৗছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। (চার্চিলের গ্রন্থ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩২২-২৩)। কিন্তু তবু স্ট্যালিন বা সোভিয়েট সরকার সতর্ক হইলেন না কেন? সোভিয়েট লেখকদের অভিমত এই যে, যে চার্চিল ও বৃটিশ সরকার দুই যুগেরও অধিককাল ধরিয়া সোভিয়েট সরকারের তীব্র বিরোধিতা এবং শত্রুতা করিয়া আসিতেছেন, তাঁকে স্ট্যালিন কিভাবে বিশ্বাস করিবেন? তারপর বৃটিশ সরকারের মতলব সম্পর্কেও প্রশ্ন করার ছিল। কারণ, হঠাৎ সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের জন্য বৃটেনের এতটা দরদবোধের কারণই বা কি ছিল?…

অর্থাৎ সোভিয়েট লেখকদের মতে স্ট্যালিন কর্তৃক চার্চিলের সতর্কতাজ্ঞাপক বার্তাটি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।

মাত্র মে মাসে হিটলারের ডেপুটি রুডল্‌ফ্‌ হেসের হঠাৎ ইংলণ্ডে গমন স্ট্যালিন এবং রাশিয়ার জনগণের মনে গভীর সন্দেহের ছায়া ফেলিয়াছিল। জার্মানী ও বৃটেনের মধ্যে তলে তলে একটা বুঝাপড়ার চেষ্টা হইতেছে না তো? অপরপক্ষে বৃটেন ছিল জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। সুতরাং সেই সময় মস্কোতে বৃটিশ দূতাবাস কার্যতঃ প্রায় 'অস্পৃশ্য' ছিল। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের পক্ষে স্ট্যালিন বা মলোটোভের সঙ্গে যোগাযোগ করা খুব কঠিন ছিল। পাছে হিটলারের মনে কোন

সন্দেহের উদ্রেক হয়, এই ভয়ে স্ট্যালিন এবং মলোটোভ উভয়েই স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে 'যমের মত এড়াইয়া' চলিতেছেন !—একথা স্বয়ং ক্রিপস নিজেই পরে স্বীকার করিয়াছেন, ('রাশিয়া এ্যাট ওয়ার' পৃঃ ২৬৪)। আসলে এই প্রতিকূল অবস্থার জন্যই ক্রিপস স্বয়ং স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সোভিয়েট সরকারের নিজস্ব সূত্রেও হিটলারী আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পর্কে ক্রেমলিনে গুপ্ত সংবাদ পেঁছিতেছিল। টোকিওতে রাশিয়ার সুবিখ্যাত গোয়েন্দা অফিসার রিচার্ড সোর্জ, যাঁর অদ্ভুত কার্যাবলীর কাহিনী গত ৬০'এর দশকে সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তিনি টোকিওতে জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি প্রায় সমস্ত গুহ্য খবর জানিতে পারিতেন। মিঃ সোর্জ স্বয়ং ১৯৪১, ৫ই মার্চ তারিখ মস্কোকে জানাইয়া দিলেন যে, জার্মানী ১৯৪১ সালের জুন মাসের দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়াকে আক্রমণ করিবে। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ টোকিওর জার্মান রাষ্ট্রদূতের নিকট যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, সোভিয়েট গোয়েন্দা রিচার্ড সোর্জ সেই টপ্‌ সিক্রেট ডকুমেণ্টের হুবহু ফটোগ্রাফ মস্কোতে পাঠাইয়াছিলেন। আক্রমণের এক মাস আগে (১৯শে মে) সোর্জ আবার সুনির্দিষ্ট খবর পাঠাইলেন রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্তের কোথায় কত ডিভিসন (১৫০) জার্মান সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়াছে এবং আক্রমণের এক সপ্তাহ আগে (১৫ই জুন) সোর্জ প্রভৃত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া এবং নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া জরুরী এবং চরম গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠাইলেন :

'The War will start on June 22.'

—২২শে জুন তারিখ যুদ্ধ শুরু হইবে ![১]

হিটলারের আসন্ন আক্রমণ সম্পর্কে এভাবে নিজেদের অজস্র সূত্র থেকে এবং দায়িত্বশীল মহল থেকে মস্কোতে সংবাদ পেঁছিয়াছিল। খাস বৃটিশ সরকার ছাড়া খোদ মার্কিন সরকারও অনেক আগেই মস্কোকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালে যখন সোভিয়েট-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের গুজব ওয়াশিংটনে পেঁছিয়াছিল, তখন ১৮ই জুলাই তারিখ ১৯৩৯, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মস্কোর প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ই ডেভিসের (যাঁর 'মিশন টু মস্কো' পুস্তক যুদ্ধের সময় প্রভৃত গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল) সঙ্গে হোয়াইট হাউজে মধ্যাহ্নভোজনের সময় বলিয়াছিলেন যে, তিনি (রুজভেল্ট) সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত আউম্যানস্কিকে বলিয়া দিয়াছেন যে, স্ট্যালিন যদি হিটলারের সঙ্গে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন, তবে একথা নিশ্চিতরূপে জানিবেন যে, দিনের শেষে যেমন রাত্রি আসে, তেমনি হিটলার ফ্রান্সকে জয় করার পর রাশিয়াকে আক্রমণ করিবে। যদি সম্ভব হয়, তবে স্ট্যালিন ও মলোটোভকে যেন প্রেসিডেণ্টের এই কথা জানাইয়া দেওয়া হয়।[২]

কিন্তু দূরবর্তী ১৯৩৯ সাল কেন, ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ডেল হাল বার্লিন থেকে গোপনীয় সূত্রে হিটলারী আক্রমণের প্ল্যান সম্পর্কে যে সংবাদ পান, সেগুলি তিনি গোয়েন্দা বিভাগের মারফত পরীক্ষা করার পর ২০শে মার্চ তারিখ ওয়াশিংটনস্থিত সোভিয়েট দূত কনস্টানটাইন আউম্যানস্কিকে জানাইয়া দেন এবং 'সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত এই সংবাদ পাওয়া মাত্র তার মুখ ফ্যাকাশে

১। They Sealed Their Own Doom—P. Zhilin. P—193—97

২। The Great Challenge—Louis Fischer: Delhi. 1946, P. 25.

হইয়া যায়' এবং তিনি বলেন যে, তিনি অবিলম্বেই তাঁর গভর্নমেণ্টকে এই খবর জানাইবেন।[১]

সুতরাং বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য সূত্র থেকেই দেখা যাইতেছে যে, সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের শীর্ষস্থানীয় নেতারা জার্মানীর আসন্ন আক্রমণ সম্পর্কে বহু পূর্ব থেকেই সঠিক সংবাদ পাইয়াছিলেন। তথাপি দুর্ভাগ্য এই যে, স্ট্যালিন বা জেনারেল স্টাফ কেউ অতর্কিত হিটলারী আক্রমণের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত সতর্কতা ও সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ৫ই মে তারিখ ক্রেমলিনে তরুণ সামরিক অফিসারদের এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে স্বয়ং স্ট্যালিন তাঁর ৪০ মিনিটব্যাপী বক্তৃতায় হিটলারের সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে নিজেই সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—'যে কোন অতর্কিত ঘটনার জন্য প্রস্তুত থেকো!' তাঁর মতে পরিস্থিতি খুব গুরুতর, এমন কি মে মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত খুব বিপজ্জনক। তবে, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট সর্বপ্রকার কূটনৈতিক উপায়ে চেষ্টা করিবে এই আক্রমণ অন্তত 'আগামী শরৎকাল' পর্যন্ত ঠেকাইয়া রাখিতে। যদি ঠেকাইয়া রাখা যায়, তবে, ১৯৪২ সালে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিবেই, কিন্তু তখন রেড আর্মি আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হইবে।[২]

সম্ভবত এই আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখার আশাতেই সোভিয়েট সরকার এমন কিছু করিতে চান নাই যাতে নাৎসী জার্মানীর সন্দেহ বা ক্রোধ উদ্রিক্ত হইতে পারে। সীমান্তে 'অপ্রস্তুতির' মূল কারণ বোধহয় এই এবং এর ফলাফলও খুব মারাত্মক হইয়াছিল।

* * *

২২শে জুন জার্মান আক্রমণের কয়েক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর সোভিয়েট সরকারের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভ সরকারীভাবে এই আক্রমণের সংবাদ মস্কো রেডিওযোগে দেশবাসীকে জানান। কিন্তু রেডিও ভাষণ দেওয়ার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গিয়াছিল এবং তাঁর উচ্চারণে কিছুটা তোতলামি ছিল।

কিন্তু সোভিয়েট সরকারের পক্ষ থেকে এবং 'কমরেড স্ট্যালিনের নির্দেশে' এই প্রথম বক্তৃতায়ও কিছুটা আক্ষেপের সুরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে কোন দাবী পেশ না করিয়াই এবং 'বিনা যুদ্ধ ঘোষণায়' এই আক্রমণ করা হইয়াছে ভোর রাত্রি ৪টায়।

এই বক্তৃতার সুরে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষদের পক্ষে এমন সন্দেহ করা স্বাভাবিক ছিল যে, যদি আক্রমণের আগে হিটলারী জার্মানী রাশিয়ার নিকট কোন দাবী পেশ করিত, তবে সোভিয়েট সরকার তখনও তা বিবেচনা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এবং সম্ভবত যে কোন কনসেশনেও রাজী ছিলেন! কিন্তু এই কথাগুলি রুশ জনগণের কাছেও ভালো লাগে নাই।

মলোটোভের বক্তৃতার মধ্যে আর একটি কথাও লক্ষ্য করার এই ছিল যে, তিনি এই আক্রমণের জন্য 'জার্মান জনগণ, শ্রমিক, কৃষক বা বুদ্ধিজীবীদের' দায়ী করেন নাই। 'রক্তপিপাসু জার্মান শাসকদিগকে'ই তিনি দায়ী বলিয়া ঘোষণা করেন।

কিন্তু স্বয়ং স্ট্যালিন ইতিহাসের এই বৃহত্তম আক্রমণের পরেও অবিলম্বেই জনগণের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন না। সম্ভবত রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির এই বেদনাদায়ক

১। The Rise and Fall of the Third Reich—Shirer P. 1008-9.

২। Russia At War—Alexander Werth. P. 133.

পরিণতির জন্য তিনি কিছুটা কুণ্ঠা বোধ করিতেছিলেন। প্রায় এক পক্ষ কাল তিনি প্রকাশ্যে কোন বাক্য উচ্চারণ করিলেন না। রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে নিঃসন্দেহে এটা কিছুটা অস্বাভাবিক ছিল। বোধহয় যুদ্ধক্ষেত্রের প্রাথমিক ফলাফলের জন্য এবং গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব কি দাঁড়ায় সে কথা জানিবার জন্যও তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি সোভিয়েট সামরিক নেতাদের সঙ্গে গভীর পরামর্শে ব্যস্ত রহিলেন। ভরোশিলোভ, টিমোশেংকো ও বুদেনীর উপর তিনি তিনটি রণক্ষেত্রের ভার দিলেন এবং নিজে সুপ্রীম কমাণ্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁর সেনানীমণ্ডলীর প্রধান ছিলেন জেনারেল শ্যাপসনিকোভ, যিনি বিপ্লবের পূর্ব থেকেই দক্ষ সেনানী, সুপণ্ডিত ও কঠোর শ্রমসহিষ্ণুরূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁর ডেপুটি ছিলেন জেনারেল জুকোভ, যিনি পরবর্তীকালে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁরা দুজনেই স্ট্যালিনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করিতেন। সমগ্র যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিচালনা অর্পিত হইল স্টেট ডিফেন্স কমিটি বা রাষ্ট্র প্রতিরক্ষা কমিটির উপর এবং এই কমিটি পাঁচজনের সদস্য নিয়া গঠিত হইল—

স্ট্যালিন, মলোটোভ, ভরোশিলোভ, ম্যালেনকোভ এবং বেরিয়া—শেষোক্ত ব্যক্তি 'অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা' রক্ষার ভারপ্রাপ্তরূপে স্বরাষ্ট্র সচিবের দায়িত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। স্ট্যালিন ছিলেন এই কমিটির চেয়ারম্যান।[১]

কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, রাষ্ট্র-প্রতিরক্ষার এই সর্বোচ্চ কমিটির প্রত্যেক সদস্যই মহাযুদ্ধের পর এন এস ক্রুশ্চেভের আমলে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৫৬ সালের বিখ্যাত বিংশতি কংগ্রেসে নিন্দিত, সমালোচিত কিংবা অপসারিত হইয়াছিলেন। অবশ্য এই সমস্তই ঘটিয়াছিল ১৯৫৩ সালের ৭ই মার্চ ৭৩ বছর বয়সে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর। ১৯৫৬ সালে পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের 'পার্জের' যেমন তীব্র নিন্দা করেন, তেমনি তাঁর ব্যক্তিপূজার এবং বহুল প্রচারিত 'সামরিক প্রতিভার'ও কঠোর সমালোচনা করেন। রাজনৈতিক গোয়েন্দা পুলিশ বা এন কে ভি ডি'র বড়কর্তা (১৯৩৫-৫২) এস পি বেরিয়াকে ক্রুশ্চেভের হুকুমেই খতম করা হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস। তাঁর বিরুদ্ধে পার্টিদ্রোহিতা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন প্রকাশ্য বিচার হয় নাই এবং তাঁর মৃত্যুও রহস্যাচ্ছন্ন। অন্যান্য সদস্য, যেমন ভি এম মলোটোভ (পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৯৩৯-৫২), মার্শাল ভরোশিলোভ (কমিউনিস্ট পার্টির একজন প্রাচীনতম সদস্য এবং নামকরা সেনাপতি), জি এম ম্যালেনকোভ (১৯২০-৪১ সাল পর্যন্ত বহু দায়িত্বশীল পদের অধিকারী এবং স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর কিছুকালের জন্য প্রধানমন্ত্রী) মর্যাদাভ্রষ্ট ও পদ থেকে অপসারিত হইয়াছিলেন।[২]

* * *

১২ দিনের দীর্ঘ এবং অবিশ্বাস্য প্রতীক্ষার পর অবশেষে ৩রা জুলাই, ১৯৪১, স্ট্যালিন মস্কো বেতারে হিটলারী আক্রমণে বিভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি জনগণের উদ্দেশে তাঁর যুদ্ধকালীন প্রথম স্মরণীয় বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু স্ট্যালিনের সমালোচকেরা, যেমন আইজাক ডুয়েটসার তাঁর এই বক্তৃতা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন

১। Stalin—Issac Deutscher. P. 451.

২। Barbarossa—Alan Clark. P. 58

যে, তাঁর বাচনভঙ্গী অত্যন্ত ধীর, কুণ্ঠাপূর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন ছিল, তাঁর অভ্যাসগত বক্তৃতাগুলির মতই এটিও ছিল কষ্টকর এবং শুষ্ক। চার্চিলের সেই বিখ্যাত উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা—

'...blood, toil, tears and sweat'

—এর মত কোন প্রাণবন্ত কথাই এর মধ্যে ছিল না। এমন কি এত বড় ঘটনার নাটকীয়তার সঙ্গেও তাঁর বক্তৃতার স্টাইল একেবারেই সামঞ্জস্যহীন ছিল। এই ভাষণের শেষে জনগণের উদ্দেশে তিনি যে,—

'to relly round the party of Lenin and Stalin'—

আহ্বান জানাইলেন, তার মধ্যে—'লেনিন ও স্ট্যালিনের পার্টির পতাকাতলে দাঁড়াইবার আহ্বান'—এই কথাগুলি কিংবা নিজের মুখে নিজের নামযুক্ত পার্টির কথা তৃতীয় পুরুষের মাধ্যমে উল্লেখ করা লোকের কাছে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত এবং বেমানান বলিয়া মনে হইয়াছিল।[১]

অপর পক্ষে আলেকজান্দার ভার্থ, যিনি রুশ-জার্মান যুদ্ধের সময় প্রায় আগাগোড়াই রাশিয়াতে ছিলেন, তিনি তাঁর সুবিখ্যাত এবং প্রামাণ্য পুস্তক 'রাশিয়া এ্যাট ওয়ার' গ্রন্থে স্ট্যালিনের এই বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই বক্তৃতার দ্বারা তিনি নিজেকে যুদ্ধের উপযুক্ত নেতারূপে প্রমাণিত করিয়াছেন, নার্ভাস জনগণকে শক্তি ও উৎসাহ জোগাইয়াছেন এবং তাঁর বক্তৃতা ডানকার্কের পর চার্চিলের ঐতিহাসিক বক্তৃতার সঙ্গেই তুলনীয় ছিল। (ডুয়েটসারের সমালোচনার একেবারে বিপরীত মন্তব্য)।

স্ট্যালিনের এই ঐতিহাসিক বক্তৃতার আরম্ভেই এবং সম্বোধনের মধ্যেই নূতনত্ব লক্ষ্য করা গেল, যেমন—

'Comrades, citizens, brothers and sisters, fighters of our Army and Navy! I am speaking to you my friends!'

দেশবাসীর উদ্দেশে স্ট্যালিন তাঁর বক্তৃতায় কখনও এভাবে সম্বোধন করেন নাই। এটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন—'ভ্রাতা ও ভগ্নী' কিংবা 'আমার বন্ধুগণ' বলিয়া বক্তৃতার আরম্ভ কোন দিন স্ট্যালিনের মুখে শুনা যায় নাই।

কিন্তু সেদিনের রাশিয়ার আবহাওয়ায় এই সম্বোধন যেন সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। হিটলারী জার্মানীর আসুরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বাধিনায়ক স্ট্যালিনের এই ঐতিহাসিক বক্তৃতাটি সংক্ষেপিত আকারে পাঠকদের অবগতির জন্য নীচে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ঃ

'হিটলারী জার্মানী ২২শে জুন আমাদের মাতৃভুমির বিরুদ্ধে যে ঘৃণ্য সামরিক আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল, আজও তা চলিতেছে। লালফৌজ বীরবিক্রমে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে, শত্রুপক্ষের সেরা স্থল ও বিমানবাহিনী ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত হইয়াছে কিন্তু এতৎসত্ত্বেও শত্রুপক্ষ যুদ্ধে নূতন সৈন্য নিয়োগ করিয়া অব্যাহত গতিতে আমাদের দেশের মধ্যে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। হিটলারের সৈন্যদল লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়ার বিস্তীর্ণ অংশ, বায়েলো রুশিয়ার পশ্চিমাংশ এবং পশ্চিম উক্রাইনের অংশবিশেষ অধিকার করিয়াছে। ফ্যাসিস্ট শক্তির বিমানগুলি ক্রমশঃ বিমানের পাল্লা প্রসারিত করিয়া

১। Stalin—Issac Deutscher, F. 452-53.

ময়মনস্ক, ওর্শা, মোঘিলেফ, স্মোলেনস্ক, কিয়েভ, ওডেসা ও সেবাস্তোপোলের উপর বোমাবর্ষণ করিতেছে। আমাদের দেশ আজ এক গুরুতর বিপদের সম্মুখীন।

'যে লালফৌজের অতীত ইতিহাস এত গৌরবোজ্জ্বল, তার পক্ষে স্বদেশের কতকগুলি নগরী ও জেলা এইভাবে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর হাতে সমর্পণ কিরূপে সম্ভব হইল? ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলির দাম্ভিক প্রচারকগণ যে-কথা অবিশ্রাম প্রচার করিয়া থাকে, তাই কি সত্য, জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনী কি সত্যই অপরাজেয়?

'কখনই না। ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, কোনও সৈন্যদলই অপরাজেয় নয়, কোনও সৈন্যদলই অপরাজেয় থাকে নাই। নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীকে এক সময়ে লোকে অপরাজেয় বলিয়া মনে করিত। কিন্তু পর পর রাশিয়া, ইংলণ্ড ও জার্মানীর সৈন্যবাহিনীর হাতে তারা পরাজয় বরণ করিল। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কালে লোকে কাইজার উইলহেলমের জার্মান বাহিনীকেও অপরাজেয় বলিয়া মনে করিত। কিন্তু রাশিয়ান এবং ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যদের কাছে উহাদের বার বার পরাজয় ঘটিল, শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর নিকট তারা চরম পরাজয় বরণ করিল। আজিকার হিটলার পরিচালিত জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর সম্পর্কেও এই কথাই প্রযোজ্য। জার্মান সৈন্যদল এখন পর্যন্ত ইউরোপ মহাদেশে কোথাও কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় নাই, কেবলমাত্র আমাদের দেশেই তারা এইরূপ প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়াছে। এই প্রতিরোধের ফলে যদি জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর সেরা দলগুলি লালফৌজের কাছে পরাজয় বরণ করিয়া থাকে, তাহলে নেপোলিয়ন ও উইলহেলমের সৈন্যদলের মত হিটলারের সৈন্যদেরও ভবিষ্যতে চরম পরাজয় সম্ভব হইতে পারে। এতদসত্ত্বেও আমাদের দেশের অংশবিশেষ যে জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, তার প্রধাণ কারণ এই যে, যে অবস্থায় জার্মানী সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল, তা জার্মানীর পক্ষে অনুকূল এবং সোভিয়েটের পক্ষে প্রতিকূল ছিল। আসল ব্যাপার এই যে, জার্মানী তখন যুদ্ধরত থাকায়, তার সমরায়োজন পূর্ব হইতেই পূর্ণাঙ্গ হইয়াছিল। জার্মানীর যে একশত সত্তর ডিভিসন সৈন্য সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া রুশ সীমান্তে আসিয়া উপনীত হয়, তারা পূর্ব হইতেই পুরাপুরি তৈয়ারী থাকিয়া কেবলমাত্র নির্দেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু সোভিয়েট বাহিনীকে তখনও সমাবেশ করা হয় নাই, তখনও তারা সীমান্ত অঞ্চলে পৌঁছায় নাই। ১৯৩৯ সালে ফ্যাসিস্ট জার্মানী সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত যে অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল, জার্মানী একান্ত আকস্মিকভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তা লঙ্ঘন করে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় জার্মানীর সাফল্যলাভে ইহারও গুরুত্ব কম নয়। এই চুক্তিভঙ্গের জন্য সমগ্র জগৎ যে জার্মানীকে আক্রমণকারীরূপে গণ্য করিবে, এই চিন্তাও তাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। আমাদের দেশ স্বভাবতঃই শান্তিপ্রিয়, কাজেই আমরা চুক্তিভঙ্গে অগ্রণী হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি নাই।

'আজ হয়ত এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট কিভাবে এই সকল বিশ্বাসঘাতকের সহিত, হিটলার ও রিবেনট্রপের ন্যায় দৈত্যদের সহিত অনাক্রমণ চুক্তিবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইয়াছিল? সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের কি ভুল হয় নাই? নিশ্চয়ই নয়। অনাক্রমণ চুক্তি হইতেছে দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি। ১৯৩৯ সালে জার্মানী আমাদের কাছে এইরূপ চুক্তি সম্পাদনের জন্যই প্রস্তাব করিয়াছিল। সোভিয়েট

গভর্নমেণ্টের পক্ষে এইরূপ প্রস্তাবে অসম্মত হওয়া কি সম্ভব হইত? আমার মতে, কোন শান্তিকামী রাষ্ট্রই তার প্রতিবেশীস্থানীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদনে অসম্মত হইতে পারে না। এমন কি হিটলার ও রিবেনট্রপের মত নরখাদক দৈত্যও যদি সে-দেশের নায়কপদে অধিষ্ঠিত থাকে, তথাপিও নয়। কিন্তু উহার অপরিহার্য সর্ত এই যে, ঐ শান্তি-চুক্তির দ্বারা শান্তিকামী রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা, স্বাধীনতা এবং মর্যাদা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবে ক্ষুন্ন হইবে না। সকলেই জানেন যে, জার্মানী ও সোভিয়েটের মধ্যে এইরূপ চুক্তিই সম্পাদিত হইয়াছিল।

'জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া আমাদের লাভ হইয়াছিল কি? আমরা দেড় বৎসরকাল দেশে শান্তি রক্ষায় সমর্থ হইয়াছি। চুক্তি সত্ত্বেও ফ্যাসিস্ট জার্মানী যদি আমাদের দেশ আক্রমণ করে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য নিজ সৈন্যদের তৈয়ারী করিবার সুযোগ অর্জন করিয়াছি। ফলে একদিকে আমাদের যেমন সুবিধা হইয়াছে, তেমনই অপরদিকে জার্মানীর অসুবিধা হইয়াছে।

'বিশ্বাসঘাতকতাক্রমে চুক্তিভঙ্গ করিয়া আমাদের দেশ আক্রমণের দ্বারা ফ্যাসিস্ট জার্মানীর লাভই বা কি হইয়াছে, আর ক্ষতিই বা কি হইয়াছে? জার্মানী সাময়িক-ভাবে অল্প কিছুদিনের জন্য সুবিধাজনক ঘাঁটি অর্জনে সমর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজনীতির দিক দিয়া সে সমগ্র জগতের চক্ষে রক্তলোলুপ আততায়ীরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। জার্মানীর এই সামরিক সুযোগ যে নিতান্ত স্বল্পস্থায়ী তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। অপরপক্ষে রাজনীতি ক্ষেত্রে সোভিয়েট যে বিপুল সুবিধার অধিকারী হইয়াছে, তারও স্থায়িত্ব অনেক বেশী। ফ্যাসিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্য অর্জনে উহা লালফৌজের পক্ষে সহায়ক হইবে।...

'আমাদের দেশ আজ যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে, তার ব্যাপকতা সোভিয়েট জনগণের পূর্ণরূপে অনুধাবন করা দরকার। তাদের আজ উদাসীনতা পরিত্যাগ করিতে হইবে, যুদ্ধপূর্বকালে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে তারা যে সকল শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কার্যে মন নিয়োজিত রাখিয়াছিল, সেগুলি থেকে নিজেকে দূরে সরাইয়া আনিতে হইবে। যুদ্ধ আজ দেশের অবস্থায় যে আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, তাতে এইরূপ মনোভাব সাংঘাতিক ক্ষতিকর। শত্রু দুর্ধর্ষ, নিষ্ঠুর। যে মৃত্তিকা আমাদের পরিশ্রান্ত দেহের স্বেদে সিক্ত হইয়াছে, আমাদের শ্রমের ফলে যে শস্য ও তৈল উৎপন্ন হইয়াছে, সে আজ সেগুলি ছিনাইয়া নিতে চায়। সে চায় আমাদের দেশে নূতন করিয়া আবার জমিদারী শাসনের প্রতিষ্ঠা করিতে, জারকে পুনরায় আনিয়া সিংহাসনে বসাইতে, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় সত্তাকে ধ্বংস করিতে। সুতরাং সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সোভিয়েট জনগণের পক্ষে এটা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন।...

'এখন হইতে আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সমরকালীন প্রয়োজনের ভিত্তিতে নূতন-ভাবে সংগঠিত করিতে হইবে, রণাঙ্গনের প্রয়োজন এবং শত্রুকে পরাজিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠনই সর্বাধিক গুরুত্ব পাইবে। সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণ আজ দেখিতেছে যে, জার্মান ফ্যাসিবাদের হিংস্রতা ও সোভিয়েট বিদ্বেষ অনমনীয়। সোভিয়েট জনগণকে আজ স্বীয় পিতৃভূমি এবং অধিকার রক্ষার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে।...

'লালফৌজ যদি কোন স্থানে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়, তাহলে তথাকার সমস্ত ট্রেন

স্থানান্তরিত করিতে হইবে, একখানা ইঞ্জিন, একখানা রেল-কামরা, এক পাউণ্ড শস্য, এমন কি এক গ্যালন জ্বালানী তৈলও শত্রুর হাতে ছাড়িয়া আসিলে চলিবে না। যৌথ কৃষিক্ষেত্রের চাষীদের সমস্ত গৃহপালিত পশু তাড়াইয়া লইয়া আসিতে হইবে। মজুত শস্য রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের জিম্মায় দিয়া আসিতে হইবে, তারা উহা দেশের অভ্যন্তরভাগে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন। যে সমস্ত মূল্যবান সম্পত্তি, লৌহ ছাড়া অন্যান্য ধাতু, শস্য ও জ্বালানী দ্রব্য সরাইয়া আনা সম্ভব হইবে না, সেগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হইবে, কোনপ্রকার ব্যতিক্রম চলিবে না।

'যে সকল অঞ্চল শত্রুর দ্বারা অধিকৃত হইবে, তথায় অশ্বারোহী ও পদাতিক গেরিলা দল সংগঠন করিতে হইবে, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালন, গেরিলা নীতি অনুসরণে প্রতিরোধ, সেতু, রাস্তা, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইন ধ্বংস এবং অরণ্য, জিনিসপত্র ও যানবাহনে অগ্নিসংযোগের জন্য প্রতিরোধী দল গড়িয়া তুলিতে হইবে। শত্রু অধিকৃত এলাকায় এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে যার ফলে তথায় শত্রুপক্ষ ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। ছায়ার ন্যায় পিছু লইয়া তাদের হত্যা করিতে হইবে, তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিতে হইবে।...

'ফ্যাসিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কোন সাধারণ যুদ্ধ নয়। এটা কেবল দুইটি সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও যুদ্ধ নয়, এটা জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে সমগ্র সোভিয়েট জনগণের মহান যুদ্ধ। জনগণের এবং স্বদেশাত্মক যুদ্ধের লক্ষ্য কেবল আমাদের দেশকে বিপদমুক্ত করা নয়, জার্মান ফ্যাসিজমের পরাধীনতায় আবদ্ধ সমস্ত ইউরোপীয় জনগণকে সহায়তা করাই এই যুদ্ধের লক্ষ্য।

'ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণ স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে সংগ্রাম চালাইতেছে, মাতৃভূমির মুক্তিসাধনের জন্য আমাদের এই সংগ্রাম উহার সহিত একযোগে পরিচালিত হইবে। মানুষের স্বাধীনতা হরণ, তাকে দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হিটলারী ফ্যাসিস্ট বাহিনীর এই অভিযানের যারা বিরোধী ও স্বাধীনতার যারা সমর্থক, তারা সকলে এই দলে সম্মিলিত হইবে। এই সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নকে সাহায্য প্রদানের বিষয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিলের ঐতিহাসিক ঘোষণা এবং আমাদের দেশকে সাহায্য প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গভর্নমেণ্টের ঘোষণা সম্পূর্ণ তাৎপর্যব্যঞ্জক ও অনুধাবন-যোগ্য। এই ঘোষণা সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণের মনে কৃতজ্ঞতার উদ্রেক না করিয়া পারে না।'[১]

স্ট্যালিনের এই ঐতিহাসিক বক্তৃতার মধ্যে একদিকে যেমন যুদ্ধের রূপান্তর এবং রাশিয়া, বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতা ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত রহিয়াছে, তেমনই নাৎসী আক্রমণের জন্য রাশিয়ার গুরুতর বিপদের কথাও স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। মোটামুটি ১৯৪১ ও ১৯৪২ সাল রাশিয়ার পক্ষে কার্যত সঙ্কটজনকই ছিল।

কিন্তু এই অভূতপূর্ব সঙ্কটের সামনে দাঁড়াইবার জন্য স্ট্যালিন তাঁর ভুলভ্রান্তি

১। On the Great Patriotic War of the Soviet Union—J. Stalin ; Moscow 1946, P. 9-16.

সত্ত্বেও যেন মহাযুদ্ধের মহানায়করূপে সোভিয়েট জনগণের সামনে আবির্ভূত হইলেন। তিনি তাঁর এই প্রথম বক্তৃতায় যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি, বিশেষভাবে ভূমিগত ক্ষতির পরিমাণ কম করিয়া দেখাইলেন বটে, কিন্তু বাস্তব অবস্থাকে গোপন করিলেন না। আবার কোন নৈরাশ্যের সুরও ধ্বনিত করিলেন না। অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া এবং সোভিয়েট জনগণ ও যোদ্ধৃদের উপর গভীর আস্থা রাখিয়া পরিণামে চূড়ান্ত জয়ের আশাই ঝঙ্কৃত করিলেন—নেপোলিয়ান ও কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলমের পরাজয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। ১৯৩৯ সালের বহুবিতর্কিত রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পর্কে ইতিহাসের দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এই বলিলেন যে, হিটলারী জার্মানীই প্রথম এই চুক্তির জন্য মস্কোর নিকট প্রস্তাব পাঠাইয়াছিল এবং এই চুক্তি সম্পাদন যুক্তিসঙ্গত ছিল ও আত্মরক্ষার সহায়ক ছিল। কিন্তু সোভিয়েট জনগণের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা কেবল প্রতিরোধের আহবান নয়, পরিত্যক্ত অঞ্চলগুলিতে ও ভূখণ্ডে সর্বাত্মক 'পোড়ামাটি'র নীতি অনুসরণের, শত্রুকে বঞ্চিত করার এবং শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে গেরিলা যুদ্ধ সংগঠনের বা 'পার্টিজান ওয়ারের' নির্দেশ। এই সমস্ত নির্দেশ ইতিহাসের যেন নূতন অধ্যায়রূপে দেখা দিয়াছিল এবং স্ট্যালিন গোড়া থেকেই এই যুদ্ধকে সমগ্র জনগণের এবং ইউরোপীয় জনগণের মুক্তিযুদ্ধরূপে প্রতিভাত করিলেন এবং 'পিপলস্ প্যাট্রিঅটিক্ ওয়ার' বা 'জনগণের স্বদেশাত্মক যুদ্ধ'রূপে ঘোষণা করিলেন। আর ইউরোপ ও আমেরিকার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামরূপেও তিনি এই যুদ্ধকে ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি সমগ্র জাতিকে কলে কারখানায় মাঠে উৎপাদনের এবং শেষ রক্তবিন্দু দিয়া সর্বত্র প্রতি ইঞ্চি জমিতে শত্রুকে প্রতিরোধের জন্য এক মর্মস্পর্শী আবেদন জানাইলেন। জাতীয় গর্ববোধ ও স্বদেশপ্রেমের প্রতি স্ট্যালিনের এই বক্তৃতায় যে আবেদন ছিল আকস্মিক আক্রমণে বিমূঢ় সোভিয়েট জনগণের পক্ষে তা যেন সঞ্জীবনী সুধার মত কাজ করিল।···

পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে সোভিয়েট রাশিয়াতে স্ট্যালিনের অবমূল্যায়ন ঘটিয়া থাকিলেও তাঁর এই ঐতিহাসিক প্রথম বক্তৃতাটি কনস্টানটিন সিমোনোভের সুবিখ্যাত উপন্যাস 'দি লিভিং এণ্ড দি ডেড' পুস্তকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখা হইয়াছে এবং দেখানো হইয়াছে, কিভাবে এই বক্তৃতায় সেদিনের রাশিয়ায় নূতন প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল। সিমোনোভ লিখিয়াছেন যে, স্ট্যালিনের কণ্ঠস্বর ধীর, নীচু ও নরম ছিল, তাঁর বাচনভঙ্গীতে জর্জিয়ান উচ্চারণের প্রাবল্য ছিল। রেডিও বক্তৃতার সময় তিনি যে জলপান করিতেছিলেন, সেই কাচের গ্লাসের শব্দ পাওয়া যাইতেছিল। তাঁর কণ্ঠ পুরাপুরি শান্ত ও স্থির ছিল। তাঁর ভারী ক্লান্ত নিঃশ্বাসও অনুভব করা যাইতেছিল।···কেউ তাঁকে ভালোবাসিত, কেউ তাঁকে শ্রদ্ধা করিত, কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ও করিত, আবার অনেকে তাঁকে পছন্দও করিত না। কিন্তু কেউ তাঁর সাহস ও লৌহকঠিন ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করিত না।[১]

* * *

১৯৩৯ সালের রুশ-জার্মান চুক্তি নিয়া সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক মহলে তুমুল আলোড়ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই চুক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকা করিয়াই হিটলার রাশিয়াকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং এই চুক্তির সমালোচনায় এজন্য বিরোধী পক্ষ

১। Russia At War—by Alexander Werth ; P. 168.

স্ট্যালিনকে খুব নিন্দা করিয়াছেন। এমন কি, রাশিয়া গায়ে পড়িয়া নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে এই চুক্তি করিয়াছে, এমন অভিযোগ পর্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু স্ট্যালিন তাঁর রেডিও বক্তৃতায় যে কথা বলিয়াছেন, তাতে দেখা যায় যে, হিটলারই প্রথম এই প্রকার চুক্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ এবং প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষর কি ভুল হইয়াছিল?—মার্কিন ঐতিহাসিক ডি এফ ফ্লেমিং তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে ('দি কোল্ড ওয়ার', ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৩, ১৯৬১ সাল) এই চুক্তিকে সমর্থন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, রাশিয়ার প্রতিরক্ষার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। ১৯৪৪ সালের ২৭শে আগস্ট নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার সি এল সালসবার্জার এই চুক্তিকে স্ট্যালিনের পক্ষে 'জয়' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ কমিউনিস্ট বিরোধী আমেরিকার অত্যন্ত রাজনৈতিক সচেতন মহলেও এই চুক্তির জন্য স্ট্যালিনকে প্রশংসাই করা হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই চুক্তি সত্ত্বেও এবং দেড় বছর সময়ের মধ্যে রাশিয়ার আত্মরক্ষার সামরিক শক্তি নানাদিক দিয়া বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও অনেকাংশে এই চুক্তির দিকে তাকাইয়া পশ্চিম রাশিয়ার নূতন সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত সামরিক শক্তির সমাবেশ ঘটানো হয় নাই, যার ফলে লালফৌজকে বিপর্যয় বরণ করিতে হইয়াছিল।

স্ট্যালিন যদিও হিটলারী আক্রমণের পর ১২ দিন বিলম্বে তাঁর বেতার ভাষণ দিয়াছিলেন, চার্চিল কিন্তু ১২ দিন দূরের কথা একদিনও বিলম্ব করেন নাই এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ বক্তৃতা বি বি সি মারফত প্রচার করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার কথাই স্ট্যালিন কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর বেতার ভাষণে উল্লেখ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে সোভিয়েট রাশিয়া, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে মহামৈত্রী অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, চার্চিলের এই অপূর্ব বক্তৃতাটি ছিল তারই সুনিশ্চিত ভুমিকামাত্র। এই প্রসঙ্গে চার্চিল তাঁর নিজস্ব ইতিহাসে যে কাহিনী লিখিয়াছেন, তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তিনি বলিতেছেন:

'২০শে জুন (১৯৪১) শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা আমি একাই মোটরযোগে চেকার্সে গেলাম। আমি জানতাম যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মান আক্রমণ কয়েকদিন কিংবা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আসন্ন। এই ঘটনা উপলক্ষে শনিবার রাত্রে বেতারযোগে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমি ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। অবশ্য আমাকে সাবধান হয়েই বক্তৃতা দিতে হতো। কারণ, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট উদ্ধত এবং অন্ধ এবং আমাদের যে কোন ওয়ারনিং বা হুঁশিয়ারিকেই তারা এই বলে ব্যাখ্যা করতো যে, নিজেরা পরাজিত হয়ে এক্ষণে অপরকেও ধ্বংসের পথে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছে! মোটরে বসে এই সমস্ত কথা চিন্তা করার পর আমি রবিবার রাত্রি পর্যন্ত বেতার বক্তৃতা পিছিয়ে দিলাম। কারণ, আমি ভাবলুম সেই সময়ের মধ্যেই সমগ্র অবস্থা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

'২২শে জুন, রবিবার সকালে যখন আমি ঘুম থেকে জাগলুম, তখন হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের খবর আমাকে দেওয়া হলো। এতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আরও সুনিশ্চিত হলো। আমাদের কর্তব্য এবং নীতি কি হবে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। আমি কি বলবো সে বিষয়েও সংশয় ছিল না, একমাত্র বাকি ছিল বক্তৃতাটি তৈরী করা। আমি নির্দেশ দিলাম যে, অবিলম্বেই নোটিশ দেওয়া হোক যে, এইদিন রাত্রি ৯টায় আমি বেতারযোগে বক্তৃতা দিব। এই সময় জেনারেল ডিল

(ইম্পিরিয়েল জেনারেল স্টাফের বড়কর্তা) আমার বেডরুমে এসে হাজির বিস্তৃত খবর নিয়ে।…

'আমি সারাদিন ধরে আমার বিবৃতিটি তৈয়ার করলাম। যুদ্ধ-মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করার কোন সময় ছিল না এবং তার কোন প্রয়োজনও ছিল না। কারণ, তাঁরা সকলেই আমার সঙ্গে একমত ছিলেন। মিঃ ইডেন, লর্ড বীভারব্রুক এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস—এঁরা সকলেই দিনের বেলা আমার সঙ্গে ছিলেন।'

প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের প্রাইভেট সেক্রেটারি মিঃ কলভিল সেই রবিবার চেকার্সে ডিউটিতে হাজির ছিলেন। সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিম্নলিখিত বিবরণী লিপিবন্ধ করিয়াছেন ঃ

'২১শে জুন শনিবার ডিনারের ঠিক আগে আমি চেকার্সে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে তখন মিঃ ও মিসেস উইনাণ্ট (মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও তাঁর পত্নী) মিঃ ও মিসেস ইডেন এবং এডওয়ার্ড ব্রিজেজ অবস্থান করছিলেন। ডিনারের সময় মিঃ চার্চিল বললেন যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে এখন জার্মানীর আক্রমণ সুনিশ্চিত। তাঁর ধারণা হিটলার মনে করেছেন যে, এই দেশের ক্যাপিটালিস্ট ও দক্ষিণপন্থীদের (রাইট উইং) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি তিনি পাবেন। কিন্তু হিটলারের এই হিসাব একেবারেই ভুল। আমরা সর্বপ্রকারে রাশিয়ার সাহায্যে এগিয়ে যাবো। উইনাণ্টও বললেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও একই কথা সত্য।

'ডিনারের পর যখন আমি চার্চিলের সঙ্গে লনে পায়চারি করছিলাম, তখন তিনি পুনরায় ওই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। আমি তখন চার্চিলকে বললাম যে, তাঁর মত ঘোরতর কমিউনিস্ট বিদ্বেষীর পক্ষে এটা কি মাথা নীচু করার মত ব্যাপার হচ্ছে না ? মিঃ চার্চিল জবাব দিলেন—'মোটেই না। আমার একটিই মাত্র উদ্দেশ্য এবং তা হচ্ছে হিটলারকে ধ্বংস করা এবং তা হলেই আমার জীবন অনেক সহজ হয়ে উঠবে।

If Hitler invaded Hell I would make at least a favourable reference to the Devil in the House of Commons !

হিটলার যদি নরকও আক্রমণ করতো তা'হলে অন্ততঃ একবারের জন্যও শয়তানের পক্ষে আমি কমন্স সভায় দুটো ভাল কথা বলতুম !'

'পরদিন ভোরে ৪টার সময় পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে এক টেলিফোন বার্তায় বলা হলো যে, জার্মানী রাশিয়াকে আক্রমণে করেছে। প্রাইম মিনিস্টার আমাকে সব সময়েই বলেছেন যে, একমাত্র ইংল্যাণ্ড আক্রান্ত না হলে আমাকে যেন আর কোন উপলক্ষেই ঘুম থেকে ডেকে না তোলা হয়। সুতরাং এই খবর দেওয়ার জন্য সকাল ৮টা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হলো। (খবর শোনার পর) তাঁর একমাত্র মন্তব্য হলো— "বি বি সি'কে জানিয়ে দিও যে, আজ রাত্রি ৯টায় আমি বেতার ভাষণ দিব।" সকাল ১১টায় তিনি বক্তৃতাটি তৈরী করতে বসলেন এবং একমাত্র লাঞ্চের সময় ছাড়া সারা দিন ধরে তিনি এই ভাষণটি তৈরী করলেন। রাত্রি ৯টা বাজতে ২০ মিনিট আগে মাত্র বক্তৃতাটি তৈরী হলো।'

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইনস্টোন চার্চিলের সেই অপূর্ব বক্তৃতার সবচেয়ে তাৎপর্য-পূর্ণ অংশ হলো ঃ

"No one has been a more consistent opponent of Communism

than I have for the last twentyfive years. I will unsay no word that I have spoken about it. But all this fades away before the spectacle which is now unfolding. The past, with its crimes, its follies and its tragidies, flashes away.

"I see the Russian soldiers standing in the threshould of their native lands, guarding fields which their fathers have tilled from time immemorial. I see them guarding their homes where mothers and wives pray—ah, yes, for there are times when all pray— for the safety of their loved ones, the return of the bread-winner, of their champion, of their protector. I see the ten thousand villages of Russia where the means of existence is wrunp so hardly from the soil, but where there are still primordial human joys, where maidens laugh and children play. I see advancing upon all this in hideous onslaught the Nazi war machine··· I also see the dull, drilled, docile brutish masses of Hun soldiery plodding on like a swarm of crawling locusts. I see the German bombers and fighters in the sky, still smarting from many a British whipping, delighted to find what they believe is an easier and a safer prey.

Behind all this glare, behind all this storm, I see that small group of villainous men who plan, organise and launch this cataract of horros upon mankind······"[১]

জীবন্ত ও বলিষ্ঠ ভাষায় এবং বর্ণনার কাব্যমণ্ডিত সৌন্দর্যে চার্চিলের এই বক্তৃতা অতুলনীয় ছিল এবং এই বক্তৃতায় তিনি পরিষ্কার ঘোষণা করিলেন যে, 'রাশিয়ার বিপদ আমাদের বিপদ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও বিপদ।' সুতরাং রাশিয়াকে যথাসাধ্য সহায়তাদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল।

এই বক্তৃতার পাঁচ দিন আগেই চার্চিল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে আসন্ন হিটলারী আক্রমণ এবং রাশিয়ার প্রতি বৃটেনের সমর্থনের কথা জানাইয়া দিয়াছিলেন এবং উত্তরে রুজভেল্টও তাঁকে আমেরিকার সমর্থনের আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছিলেন।

কেবল স্ট্যালিন নয়, রুশ জনগণও সেদিন রাত্রে চার্চিলের এই বেতার ভাষণ শুনিয়া চমৎকৃত ও আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, ইংল্যাণ্ড তাঁদের একজন মিত্রে পরিণত হইবে। কারণ, 'ইংল্যাণ্ডকে অবিশ্বাস করার জন্যই তাঁদের শেখানো হইয়াছিল।[২]

১। The Second World War—by Winston S. Churchill vol-3, P. 329-332.

২। Russia at War—by Alexander Werth, P. 164.

নবম অধ্যায়

লেনিনগ্রাদ অবরোধ ঃ উক্রাইনের মৃত্যুফাঁদ

হিটলারী অভিযানে রূপরেখা

১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে নাৎসী জার্মানীর প্রচণ্ড আক্রমণ ও বিরাট অভিযানগুলির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পাঠকদের সুবিধার জন্য গোড়াতেই উল্লেখ করা যাইতেছে। বলা বাহুল্য যে, এখানে সামরিক অভিযানগুলির বিস্তৃত কোন বর্ণনা দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। কারণ, তার জন্য আলাদা কোন 'মহাভারত' রচনার দরকার। সুতরাং জার্মানীর অভিযানগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ১৯৪১ সালের এই আক্রমণাত্মক যুদ্ধ মোট পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। (এই পর্যায়গুলি মার্কিন সূত্র থেকে গৃহীত।) এই প্রত্যেকটি পর্যায়েই জার্মান আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল চূড়ান্ত জয়লাভ করা—যে চূড়ান্ত জয় হিটলারের অদৃষ্টে কখনও জুটিল না।

এই আক্রমণের প্রথম পর্যায় গিয়াছে ১৯৪১ সালের ২২শে জুন থেকে ১০ই জুলাই পর্যন্ত যখন জার্মানীর ট্যাংক ও মোটরারূঢ় সৈন্যদল পদাতিক বাহিনীসহ রাশিয়ার বহুদূর অভ্যন্তরে ঢুকিয়া গেল দৈনিক ৪০ মাইল গতিবেগে। তারা উত্তরে বাল্টিক রাজ্যের লিথুয়ানিয়া পর্যন্ত গ্রাস করিল, মধ্য রণাঙ্গনে বিয়ালিস্টক ও মিনস্ক বেষ্টন করিল এবং দক্ষিণে লোও দখল করিল। এখানে পোল্যাণ্ডের মত 'সীমান্ত যুদ্ধে' লালফৌজকে সাবাড় করা সম্ভব হয় নাই—যদিও বিপর্যয়কর ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। এখানে তারা 'স্ট্যালিন লাইনের' দিকে পিছু হটিয়া গিয়াছিল। (অবশ্য এই স্ট্যালিন লাইনের বাস্তব অস্তিত্বের কথা স্বয়ং স্ট্যালিন অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের নানা ইতিহাসে এবং তখনকার সামরিক সংবাদদাতাদের বর্ণনায় আত্মরক্ষার ব্যূহ হিসাবে ওই লাইনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।)

দ্বিতীয় পর্যায় গিয়াছে ১১ই জুলাই থেকে ৮ই আগস্ট পর্যন্ত, যখন জার্মান সৈন্যরা "স্ট্যালিন লাইনের" (ফিন উপসাগরের নার্ভা থেকে পিসকোভ ও পলোটস্ক এবং তারপর নীপার নদী হইয়া কৃষ্ণ সাগরের খেরসন পর্যন্ত) প্রতিরক্ষা ব্যূহগুলি চূর্ণ করিয়া ফেলিল। তারা লেনিনগ্রাদের দিকে অগ্রসর হইল, ওডেসা বন্দর অবরোধ করিল, উক্রাইনের কিয়েভ পর্যন্ত ধাওয়া করিল, আর মধ্য রণাঙ্গনের সুপরিচিত স্মলেনস্ক শহরের প্রচণ্ড সংগ্রামে মত্ত হইল। অবশ্য সমূলে ধ্বংসের হাত থেকে লালফৌজের মূল বাহিনী রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু নাৎসী বাহিনীর রণনৈতিক ও রণকৌশলগত বিরামহীন চাপের মধ্যে রহিল।

৯ই আগস্ট থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৪১) পযন্ত চলিল তৃতীয় পর্যায়। স্মলেনস্ক খণ্ডের যুদ্ধের পর জার্মান আক্রমণের মূল ধারা প্রবাহিত হইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে উক্রাইন ভেদ করিয়া কিয়েভ অঞ্চলে। এখানে মধ্য ও দক্ষিণ রণাঙ্গনের জার্মান বাহিনীগুলি সম্মিলিতভাবে মার্শাল বুদেনীর সৈন্যদিগকে ঘেরাও করিতে লাগিল এবং

উক্রাইনে বিস্ময়কর জয় অর্জন করিল। কিন্তু উত্তরদিকে জার্মানরা লেনিনগ্রাদের প্রতিরক্ষার ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না এবং এই ইতিহাসখ্যাত নগরীর অবরোধ চলিল দুই বছর ধরিয়া। এদিকে মধ্য রণাঙ্গনের স্মলেনস্ক খণ্ডেও মার্শাল টিমোশেঙ্কো হঠাৎ পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া জার্মান ব্লিজক্রিগের গতি এই প্রথম রোধ করিয়া দিলেন এবং তাদের পাল্টা আত্মরক্ষার চালে ফেলিলেন—অবশ্য মাস দুইয়ের মত। কিন্তু স্মলেনস্ক খণ্ডে শেষ পর্যন্ত রাশিয়া যে পরাজয় স্বীকার করিল, তার ফলে জার্মানদের মতে রাশিয়ার ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার সৈন্য বন্দী এবং ৩ হাজার ট্যাঙ্ক ও ৩ হাজার কামান ধরা পড়িয়াছিল। আর রুশ সরকারী ইতিহাসের মতে মাত্র ৩২ হাজার সৈন্য, ৬৮৫টি ট্যাঙ্ক এবং ১১৭৬টি কামান খোয়া গিয়াছে।

চতুর্থ পর্যায়ে একদিকে মস্কো অভিমুখে এবং অন্যদিকে উক্রাইনের অভ্যন্তরে নীপার নদীর বাঁকে বিরাট জার্মান অভিযান অনুষ্ঠিত হইল ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত। এই সময় সমগ্র রণাঙ্গনে রাশিয়ার অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিল এবং রাশিয়া টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে কিনা পৃথিবীর নানাস্থানে, এমন কি লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের সামরিক মহলে পর্যন্ত সংশয় দেখা দিল।

কিন্তু ১৯৪১ সালের জার্মান অভিযানের পঞ্চম বা চরম পর্যায় গিয়াছে রাজধানী মস্কোর সংগ্রামে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে যেটা ছিল একটি বিশেষ অধ্যায়। এই চরম পর্যায়ের আবার তিনটি স্তর ছিল এবং প্রত্যেকটি স্তর অপরটির চেয়ে তীব্র ছিল। যেমন—প্রথমত ১৫ই অক্টোবর থেকে ১লা নভেম্বর মস্কোর প্রবেশ পথ দখলের যুদ্ধ। দ্বিতীয়ত ১লা নভেম্বর থেকে ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত উক্রাইনের রস্টোভ বন্দর ও ডন নদী পর্যন্ত অগ্রগতি এবং তৃতীয়ত ২১শে নভেম্বর থেকে ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মস্কো দখলের জন্য তিন দিক দিয়া আঘাতের পর আঘাত। ১৯৫১ সালের মস্কোর যুদ্ধই ছিল লালফৌজকে সংহার ও রাশিয়াকে চূর্ণ করার চরম চেষ্টা।[১]

* * *

কিন্তু মস্কোর যুদ্ধে রাশিয়াকে চূর্ণ করার চরম চেষ্টার আগে হিটলার ও তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে মতবিরোধের যে চাঞ্চল্যকর কাহিনী পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের রচনায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে, রণনীতির দিক থেকে তার গুরুত্ব যেমন কম নয়, তেমনি তার নাটকীয়তাও কম রোমাঞ্চকর নয়। কারণ, ৮ সপ্তাহের যুদ্ধ ও অগ্রগতির পর নাৎসী বাহিনী যখন উক্রাইন থেকে স্মলেনস্ক হইয়া বাল্টিক রাজ্যগুলির মধ্য দিয়া লেনিনগ্রাদের দিকে মুখ করিয়াছে এবং যখন ঘাগী জার্মান সেনাপতিরা মধ্য রণাঙ্গন থেকে মস্কোর বুক বিদীর্ণ করার জন্য উৎসুক ছিলেন, তখন হঠাৎ রঙ্গমঞ্চের যেন অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। কারণ, রণাঙ্গন সম্পর্কে হিটলারের একটি নাটকীয় নির্দেশনামা আসিয়া হাজির হইল—তখন আগস্ট মাসের (১৯৪১) তৃতীয় সপ্তাহ। এই আদেশনামার ফলে জার্মান সেনাপতিদের মধ্যে যেন হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কর্নেল জেনারেল গুডেরিয়ানের (মধ্য রণাঙ্গন) ডাক পড়িল গভীর পরামর্শের জন্য আর্মি গ্রুপের সদর দপ্তরে। বিভিন্ন বাহিনী বা আর্মির প্রধান সেনাপতিদের অনেকেই হিটলারের রণনৈতিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত ছিলেন না। অতএব পূর্ব রণাঙ্গনের সদর দপ্তরের দিকে গুডেরিয়ান প্লেনযোগে রওনা হইলেন ২৩শে আগস্ট এবং

১। **The World At War—The Infantry Journal, Washington, 1945. P. 83-84.**

সকাল দশটার কিছু আগে বোরিসোভ-এর বিমানঘাঁটিতে গিয়া পেঁছিলেন। সেখান থেকে মোটরে গিয়া হাজির হইলেন আর্মি গ্রুপের প্রধান শিবিরে। সেখানে তখন চতুর্থ আর্মির ফিল্ড মার্শাল ফন্ ক্লুজ, নবম আর্মির কর্নেল জেনারেল স্ট্রাযুস এবং দ্বিতীয় আর্মির কর্নেল জেনারেল ব্রেইজার ফন্ ভিক্স আগেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তখনও জেনারেল স্টাফের খোদ বড়কর্তা কর্নেল জেনারেল হ্যালডার আসিয়া পেঁছেন নাই। তাঁর জন্য সকলেই ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি আসিয়া পেঁছিলেন বেলা ১১টা নাগাদ। কিন্তু তাঁকে অত্যন্ত অবসন্ন ও রুগ্ন দেখাইতেছিল। তার কারণটাও পর মুহূর্তেই বুঝা গেল। হ্যালডার ঘোষণা করিলেন—'ফুরার স্থির করেছেন যে, তাঁর আগের প্রস্তাবিত লেনিনগ্রাদের দিকেও অভিযান চালানো হবে না কিংবা আর্মি জেনারেল স্টাফের প্রস্তাবিত মস্কোর দিকেও আক্রমণ চালানো হবে না, কিন্তু তার আগে প্রথমেই উক্রাইন ও ক্রিমিয়া দখল করতে হবে।'

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং গুডেরিয়ান যেন একটা লোহার রডের মত শক্ত হইয়া খাড়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।[১] তাঁর মুখ দিয়া একটিমাত্র কথা বাহির হইল—

—'এটা সত্য হতে পারে না'।

হ্যালডারও উদাসভাবে কতকটা তাঁকে সায় দিয়া বলিলেন—'সে কথা ঠিক। আমরা পাঁচ সপ্তাহ ধরে এত ঝগড়া করলুম মস্কোর দিকে অভিযানের জন্য। ১৮ই আগস্ট আমরা আক্রমণের একটা নক্সাও দাখিল করলুম। কিন্তু তার জবাবে এলো এই হুকুম।'—এইটুকু বলিয়া হ্যালডার একটি কাগজের সীট বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন ঃ

"Fueher's Directive No 34, 21. 8. 1941. The Army's proposal for the continuation of operations in the East, submitted to me on 18. 8. is not in line with my intentions. I, therefore, command as follows.

"(1) The most important objective to be achieved before the onset of winter is not the capture of Moscow but the seizure of the Crimea and of the industrial and coal-mining region on the Donets, and the cutting off of Russian oil supplies from the Caucasus area ; in the north it is the isolation of Leningrad and the link-up with the Finns'.

অর্থাৎ হিটলারের সেই চাঞ্চল্যকর ৩৪নং নির্দেশনামার সহজ মর্ম এই ছিল যে, সেনাপতিরা মধ্য রণাঙ্গন থেকে সোজা মস্কো দখলের জন্য যে অভিযান এক্ষুনি চালাইতে চান, তার সঙ্গে হিটলার একমত নন। তাঁর মতে আগে উক্রাইন, ডনেজ অববাহিকা, ককেশাস ও ক্রিমিয়ার এলাকাগুলি দখল করিয়া নেওয়া দরকার রাশিয়াকে খাদ্য, শিল্পসম্ভার, কয়লা ও পেট্রোলের ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করার জন্য। উত্তরদিকে লেনিনগ্রাদকে বিচ্ছিন্ন ও ফিনদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করিতে হইবে। এই সমস্ত

কার্য সমাধা হইলে পর মধ্য রণাঙ্গনে টিমোশেংকোর সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ ও খতম করা হইবে এবং তাঁর মতে সেটাই সহজতর ও বুদ্ধিসঙ্গত হইবে।

সোজা কথায় মস্কো অভিযানের আগে দক্ষিণ রণাঙ্গনের অভিযান শেষ করিতে হইবে। কিন্তু সেনাপতিদের সঙ্গে এখানেই হিটলারের বড় রকমের মতবিরোধ ঘটিল। কারণ, এই পর্যন্ত জার্মান আক্রমণের বিদ্যুৎগতির ফলে নাৎসীবাহিনী রাশিয়ার অভ্যন্তরে যেভাবে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং যেভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে তাতে মধ্য রণাঙ্গনের এই গতিবেগ থামাইয়া দিয়া উক্রাইনের দিকে অভিযান করিলে মস্কো আক্রমণে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া যাইবে এবং শত্রুপক্ষও ইতিমধ্যে সামলাইয়া উঠিবে। এটা অপারেশন বার্বারোসার মূল রণ-পরিকল্পনারও বিরোধী।

মোটামুটি সেনাপতিদের এটাই ছিল মনোভাব। সুতরাং ফিল্ড মার্শাল ফন বোক্ (মধ্য রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি) হতাশার সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা কি করতে পারি?' কর্নেল-জেনারেল হ্যালডার মন্তব্য করিলেন—

'সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়।'

কিন্তু গুডেরিয়ান বলিলেন—'এই সিদ্ধান্ত নড়াতেই হবে। যদি আমরা আগে কিয়েভের দিকে যাই, তবে, মস্কো পৌঁছুবার আগেই শীতকাল এসে যাবে···তা ছাড়া আমার ট্যাংক বাহিনী আজ পর্যন্ত একদিনও বিশ্রাম পায় নি।'

তখন সেনাপতিরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, গুডেরিয়ান হ্যালডারের সঙ্গে একত্রে যাইবেন ফুরারের সদর দপ্তরে এবং সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া হিটলারের মত বদলাইবার চেষ্টা করিবেন।[১]

অতএব অপরাহ্নবেলা গুডেরিয়ানকে নিয়া একটি জুংকার বিমান সগর্জনে আকাশে উড়িল এবং পূর্ব প্রুশিয়ার র‍্যাস্টেনবুর্গ অভিমুখে রওনা হইল—সেখানে ফুরারের সদর দপ্তর। সন্ধ্যার মুখে গুডেরিয়ান ও হ্যালডারের বিমান অবতরণ করিল লুৎঝেনের বিমানঘাঁটিতে—সেখান থেকে তাঁরা দুইজনে মোটরযোগে 'নেকড়ের আস্তানা'র (ফুরারের গোপন আবাসস্থলের এই ছিল নামকরণ) দিকে চলিলেন। বড় বড় ওক্ গাছের নীচে হিটলার এবং জার্মান সামরিক হাইকমাণ্ডের শিবির—কংক্রীটের তৈরী সব 'কুটির'। সশস্ত্র প্রহরী স্যালুট করিলেন, বন্ধ গেট খুলিয়া দিলেন এবং আগন্তুকদের গাড়ী গড়াইয়া চলিল অ্যাসফাল্টের তৈরী সড়ক ধরিয়া। কম্পাউণ্ডের ভিতরে বাঁদিকে প্রেস অফিস্। দুই দিকেই ছড়ানো কতকগুলি ধূসর রঙের 'কুটির'—সেগুলির ছাদের উপর ঘাস ও গুল্ম গজানো হইয়াছে। আগন্তুক দুইজন ক্যাণ্টিন পার হইয়া গেলেন। বাঁ দিকে হাইকমাণ্ডের সবচেয়ে বড়কর্তা ফিল্ড মার্শাল কাইটেলের 'কুটির'। সড়কের শেষ প্রান্তে 'ফুরারের কুটির'—দুই প্রস্ত বেড়া দিয়া ঘেরা এবং দুই সারি সশস্ত্র প্রহরীর দ্বারা বেষ্টিত। হিটলারের খাস সদর দপ্তরের বা প্রধান শিবিরের অভ্যন্তরে ঢুকিতে গেলে বিশেষ এক ধরনের হলুদ রঙের পাস দরকার হয়।

হিটলারের 'কুটির'ও অন্যান্য জেনারেলদের মতই আড়ম্বরশূন্য—সাজসজ্জা সহজ, ওকের তৈরী ফার্নিচার এবং দেওয়ালগুলিতে টাঙানো কিছু ছাপানো

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃঃ ৯৯

কাগজপত্র। এখানেই হিটলার সারারাত জাগিয়া বসিয়া থাকেন এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া ম্যাপ, রিপোর্ট, ফটোগ্রাফ, মেমোরেণ্ডা ও সংখ্যাতত্ত্বের কাগজপত্র অধ্যয়ন করেন।

এখানে আগমনের দুইঘণ্টার মধ্যেই গুডেরিয়ানকে দেখা গেল ফুরারের শিবিরের ম্যাপরুমে। কিন্তু গুডেরিয়ান প্রথমেই তাঁর মনের কথা (অর্থাৎ মস্কো) বলিলেন না। কারণ, সদর দপ্তরে হিটলারের কাছে আসিবার আগে পূর্ব রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল ফন ব্রাউসিৎস গুডেরিয়ানকে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন, 'খবর্দার, হিটলারের কাছে আগে মস্কোর কথা মুখেও এনো না! কারণ, দক্ষিণ দিকে রণাভিযানের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, এখন আমাদের কাজ শুধু কিভাবে এটা কার্যক্ষেত্রে সফল করা যায়। অতএব আলোচনা বৃথা।'

গুডেরিয়ান তখন হিটলারের কাছে যাইতে অসম্মত হইলে ব্রাউসিৎস বলিলেন—'না, না, একবার দেখা করে এসো এবং তোমার প্যাঞ্জার গ্রুপের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট দিয়ে এসো—তবে, মস্কোর কথা উল্লেখ না করে!'

হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের সেই কক্ষে হাইকমাণ্ডের অনেক বড় বড় অফিসার উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ব্রাউসিৎস বা হ্যালডার—এই দুইজনের কেউ ছিলেন না। তবে, কাইটেল মানচিত্রের টেবিলের ধারে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, জড্‌ল্ নোট নিতেছিলেন এবং হিউসিঙ্গার গভীর মন দিয়া শুনিতেছিলেন। জার্মান লেখক পল ক্যারল বলিতেছেন—তখন হিটলারের কক্ষে বাইরে থেকে খোলা জানালা দিয়া সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া আসিছিল। সেই ঘরের জানালাগুলিতে মশক নিবারণী জাল আঁটা ছিল! কারণ, হিটলার মশা-মাছি সহ্য করিতে পারিতেন না—যদিও বাইরের কম্পাউণ্ডে ছোট ছোট লেক ও পুকুর ছিল।

গুডেরিয়ান তাঁর যান্ত্রিক বাহিনীর অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট দিলেন। হিটলার মন দিয়া শুনিলেন এবং তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—

'আপনার সেনাদলের শেষ লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি মনে করেন যে, তারা আর একটা বড় রকমের চেষ্টায় নামতে পারবে?'

গুডেরিয়ান জবাব দিলেন—

'যদি এমন কোন বৃহৎ লক্ষ্য পূরণের অভিযান হয়, যার গুরুত্ব প্রত্যেকটি সৈন্যের কাছেই স্পষ্ট প্রতীয়মান, তবে, বলবো—হাঁ, আমার সৈন্যেরা পারবে।'

'আপনি নিশ্চয়ই মস্কোর কথা বলছেন?'

'হাঁ, আপনি যখন কথাটা তুললেনই তখন আমার মনের কথা এবং যুক্তিগুলি বলবার অনুমতিও আমাকে দিন।'

এই বলিয়া গুডেরিয়ান কেন আশু এবং অবিলম্বেই মস্কো অভিযান প্রয়োজন সেই সম্পর্কে তাঁর যুক্তিগুলি বলিতে লাগিলেন। হিটলার নিঃশব্দে শুনিয়া গেলেন এবং গুডেরিয়ানের বক্তব্য শেষ হইলে পর হিটলার তাঁর সিদ্ধান্তের সপক্ষে দক্ষিণ দিকে অভিযানের কেন অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত সেই অর্থনৈতিক কারণগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিলেন। হিটলার মন্তব্য করিলেন—

'My generals know nothing about the economic aspects of War.'

'আমার সেনাপতিরা যুদ্ধের অর্থনৈতিক দিকগুলি সম্পর্কে কিছুই জানেন না।'[১]
এভাবে হিটলার কেবল সেনাপতিদের বিদ্যাবুদ্ধির উপরেই কটাক্ষ করিলেন না, মস্কোর আগে উক্রাইনের দিকে অভিযানের সিদ্ধান্তও চাপাইয়া দিলেন এবং আশ্চর্য এই
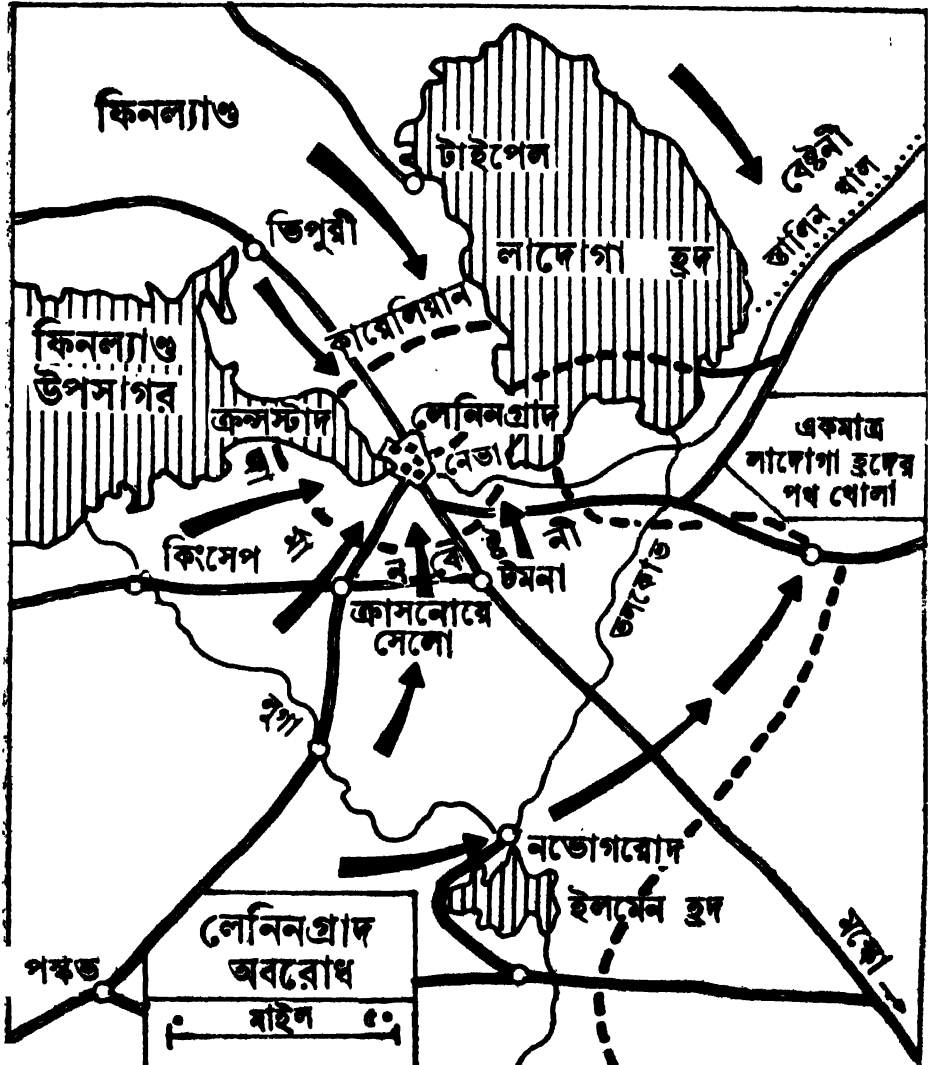
যে, সেই কনফারেন্সে হাইকমাণ্ডের শীর্ষস্থানীয় নেতারা কোন প্রতিবাদ করিলেন না। বরং বিষয়টি নিয়া আগেই যে সেনাপতিদের সঙ্গে অনেকবার আলোচনা হইয়া গিয়াছে সেটাই বুঝা গেল। অবশ্য এই ঘটনার পর জেনারেল হ্যালডার ও জেনারেল ফন বোক হিটলারী নির্দেশের বিরুদ্ধে নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি, স্নায়বিক দুর্বলতায় হ্যালডার ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি প্রধান সেনাপতি ব্রাউসিৎসকে এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, হিটলারের প্রস্তাবিত এই

১। Barbarossa—Alan Clark, Penguin 1966, P. 141 43.

অপারেশনের দায়িত্ব যখন তাঁরা নিতে পারিবেন না, তখন তাঁদের দুইজনের পদত্যাগ করা উচিত।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মধ্য রণাঙ্গনের শীর্ষস্থানীয় এই দুই সেনানায়কের কাহারও সেই সাহস হয় নাই। তবে, হিটলারের সঙ্গে সেনাপতিদের এই মতবিরোধ পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের মতে জার্মানীর পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক ছিল এবং মস্কোর যুদ্ধেও এর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল। ইংরাজ ঐতিহাসিক অ্যালান ক্লার্ক এই লুৎঝেন-সিদ্ধান্ত এবং হিটলারের সঙ্গে সেনাপতিদের বিরোধকে 'বিপর্যয়কর' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

লেনিনগ্রাদ অবরোধ

হিটলারের এই নির্দেশ অনুসারে দক্ষিণদিকে যে উক্রাইন অভিযান অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তা অসাধারণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তার আগে লেনিনগ্রাদ অবরোধের কথা উল্লেখ করা দরকার ঃ

'নগরী হিসাবে লেনিনগ্রাদের গুরুত্ব অসাধারণ। উক্রাইনের পক্ষে যেমন কিয়েভ ও খারকোভ, সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষেও তেমনি লেনিনগ্রাদ ও মস্কো। বর্তমান রাশিয়ার এটা দ্বিতীয় রাজধানী। পিটার দি গ্রেটের আমলে এর পত্তন। জলাভূমি ও 'শ্রমিকের হাড়ের' উপর এই শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইতিহাসের বড় বড় রুশ সম্রাট বা জারদের এটা ছিল রাজধানী ও বিলাস নিকেতন। আবার এই শহরেই রুশ বিপ্লবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আধুনিক সোভিয়েট রাশিয়ার জন্মের আরম্ভ এখানে। ইতিহাসের গতিপথে বার বার এই শহরের নাম পরিবর্তিত হইয়াছে। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ ও পেট্রোগ্রাদ থেকে লেনিনগ্রাদে (১৯২৪) রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রবাদের বিবর্তন কাহিনী এখানে রহিয়াছে। সুতরাং সোভিয়েট বিপ্লবের ও লেনিনের স্মৃতিমণ্ডিত ও নামাঙ্কিত এই নগরীর মূল্য অসাধারণ। এই শহরের লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষেরও অধিক। এর শিল্প বাণিজ্য রেলপথ ও সমুদ্রপথের যোগাযোগের জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। জাহাজ তৈয়ারী, বিমান তৈয়ারী এবং গোলাগুলী, যন্ত্রপাতি, বস্ত্রশিল্প ও অস্ত্রসম্ভার নির্মাণের কেন্দ্র হিসাবে লেনিনগ্রাদ সোভিয়েট রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরীরূপে পরিচিত।

কিন্তু ভৌগোলিক সংস্থানের বিচারে লেনিনগ্রাদের অবস্থান খুব নির্বিঘ্ন ছিল না। একদিকে ফিনল্যান্ডের প্রান্তবর্তী এবং অন্যদিকে এস্থোনিয়ার সীমান্তবর্তী হওয়ায় উত্তর ও পশ্চিম, এই উভয় দিক থেকেই লেনিনগ্রাদের উপর শত্রুর আক্রমণ সহজ ছিল। সামরিক অবস্থার এই গুরুত্বের জন্যই ১৯৩৯-৪০ সালে ফিনল্যাণ্ড ও অন্যান্য বাল্টিক রাজ্যগুলির সঙ্গে রাশিয়া নূতন সীমানা নির্ধারণ ও আত্মরক্ষার কেল্লাদি তৈয়ারে বাধ্য হইয়াছিল। তবে, ভৌগোলিক সংস্থানের এই দুর্বলতার কিছুটা ক্ষতিপূরণ করিয়াছে লেনিনগ্রাদের প্রাকৃতিক বিঘ্নগুলি। এর চারিদিকেই হ্রদ ও জলাভূমি এবং কোন কোন দিকে অরণ্য, পাহাড় ও বন্ধুর ভূমি রহিয়াছে। ওনেগা, লাডোগা, পীপাস, ইলমেন প্রভৃতি হ্রদগুলিকে লেনিনগ্রাদের চতুষ্পার্শ্বের মানচিত্রে জলকূপের মত দেখা যায়।

পশ্চিম দিকের ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের যে উপকূলবর্তী অংশ দিয়া জার্মানরা অগ্রসর হইতে চাহিল, সেখানে একটি সংকীর্ণ বেড়ার মত অরণ্য রহিয়াছে। এই বেড়া পার হইয়া গেলে নার্ভা বন্দর পর্যন্ত তৃণহীন, গুল্মহীন, হিমশীতল মালভূমি পথিকের চোখে পড়িবে। আর রহিয়াছে কতকগুলি খাল ও নদী এবং বাল্টিক সমুদ্র পথ—যে পথ দিয়া লেনিনগ্রাদের প্রবেশমুখে রহিয়াছে ক্রোনস্টাডের বিখ্যাত নৌদুর্গ। এই নৌদুর্গ রাশিয়ার বাল্টিক নৌবহরের প্রধান ঘাঁটিও বটে। আর যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে লেনিনগ্রাদে রহিয়াছে মাকড়শার জালের মত বহু রেলপথের সংযোগ। এগুলির মধ্যে অবশ্য তিনটি রেলপথ সর্বপ্রধান—পূর্বগামী ভলোগদা, দক্ষিণগামী মস্কো এবং উত্তরগামী মরমনস্কের (পেট্রোজাভোদস্ক হইয়া) লাইন।'[১]

কিন্তু লেনিনগ্রাদের গুরুত্ব কিংবা ভৌগোলিক সংস্থান যাই হোক না কেন জার্মান বাহিনীর দুর্দান্ত আক্রমণে গোড়াতেই বাল্টিক রাজ্যগুলি দখল হইয়া গেল। উত্তর রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল রিটার ফন লীবের অধীন ৭ লক্ষ সৈন্য, ১৫ শত ট্যাঙ্ক এবং ১২ শত প্লেন যে অভিযান শুরু করিল জুলাই মাসের মধ্যভাগেই লেনিনগ্রাদে পৌঁছিবার পথে লুগা নদীর ধারে অগ্রসর হইল। সোভিয়েট পক্ষে এই উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন মার্শাল ভরোশিলোভ এবং যদিও তাঁর অধীনে নামে ৩০ ডিভিসন সৈন্য ছিল, কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ৫ ডিভিসন ছিল সত্যকার যুদ্ধের উপযোগী, আর জার্মানরা সমস্ত দিক দিয়াই বহু গুণ শক্তিশালী ছিল। যদিও লেনিনগ্রাদের প্রতিরক্ষা নিয়া অনেক আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছিল (১৯৩৯-৪০ সালে) তথাপি কার্যক্ষেত্রে তেমন সামরিক প্রতিরোধের ব্যবস্থা উপযুক্ত ছিল না—একথা সোভিয়েট সরকারী ইতিহাসে স্বীকার করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, লেনিনগ্রাদ যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়া আক্রান্ত হইতে পারে, একথা যুদ্ধের আগে কাহারও মাথায় পর্যন্ত আসে নাই ![২]

৮ই সেপ্টেম্বর শ্লুসেস বুর্গ নাৎসী বাহিনী কর্তৃক দখল হওয়ার ফলে লেনিনগ্রাদ কার্যত চতুর্দিকে বেষ্টিত হইয়া গেল। অবস্থা ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতে লাগিল এবং প্রধান সেনাপতি ভরোশিলোভ ও লেনিনগ্রাদ কমিউনিস্ট পার্টির অধিনায়ক কমরেড ঝাদানোভ প্রায় মরিয়া হইয়া উঠিলেন এবং লেনিনগ্রাদ রক্ষার জন্য সৈন্য ও নাগরিকদের উদ্দেশে মর্মস্পর্শী এবং ঐকান্তিক আবেদন প্রচার করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই আবেদনে লেনিনগ্রাদের সর্বশ্রেণীর মানুষ—বিজ্ঞানী থেকে মজুর এবং অভিনেতা থেকে স্কুলের বালক-বালিকারা পর্যন্ত সাড়া দিল। আত্মরক্ষার এই কাহিনীও অভূতপূর্ব এবং এই গৌরবদীপ্ত কাহিনী একমাত্র খাস রাজধানী মস্কোর সঙ্গেই তুলনীয়। লেনিনগ্রাদের ৩০ লক্ষ নাগরিক শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যেন ৬০ লক্ষ বাহু উত্তোলন করিয়া আগাইয়া আসিল। তারা লেনিনগ্রাদ মহানগরীর চারদিকে ৩৪০ মাইল দীর্ঘ ট্যাঙ্ক-মারা ফাঁদ মোট ১৫,৮৭৫ মাইল দৈর্ঘ্যের খোলা ট্রেঞ্চ,

১। গ্রন্থকার প্রণীত এবং ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত 'রুশ-জার্মান সংগ্রাম' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

৪০০ মাইল দীর্ঘ কাঁটাতারের বেড়া, ১৯০ মাইল দীর্ঘ কাঠ ও গাছের গুঁড়ির বেড়া এবং ৫ হাজার পিলবক্স ও গুলীগোলা ছুঁড়িবার ঘাঁটি তৈয়ার করিল।

কিন্তু অতি দ্রুত তৈয়ারী এই সমস্ত প্রতিরক্ষায় বেষ্টনী ও ঘাঁটি খুব পাকা ছিল না। আর জার্মান সৈন্যেরা সংখ্যায়, ট্যাঙ্ক ও গোলাগুলী এবং বোমারু বিমান শক্তিতে এত বেশী বলীয়ান ছিল যে, লালফৌজের প্রতিরক্ষা ভাঙিয়া পড়িল। আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনের অবস্থা সংকটজনক হইয়া পড়িল এবং সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অবস্থা এমন গুরুতর হইয়া পড়িল যে, রণাঙ্গনে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এই সময় শুনা যায় যে, মার্শাল ভরোশিলোভ একেবারে নার্ভাস হইয়া পড়িলেন। আর কোন আশা নাই দেখিয়া তিনি জীবন বিসর্জনের আশায়, অর্থাৎ শত্রুর গুলীতে নিহত হওয়ার আশায় একেবারে রণাঙ্গনের গোলাগুলীর মুখে গিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখ স্ট্যালিন এই রণক্ষেত্রের সৈনাপত্যের পরিবর্তন ঘটাইলেন এবং এমন একজন সেনাপতিকে সেখানে পাঠাইলেন যিনি রুশ-জার্মান সংগ্রামের অদ্বিতীয় নায়করূপে ইতিহাসে বন্দিত হইয়াছেন এবং যিনি সমস্ত বিপজ্জনক রণক্ষেত্রের ত্রাণকর্তারূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। তাঁর নাম জেনারেল জি কে জুকোভ। লেনিনগ্রাদের যুদ্ধের মুক্তির পরে তাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল পদবীতে ভূষিত করা হইয়াছিল।

মাত্র তিন দিনের মধ্যে জুকোভ লেনিনগ্রাদের রক্ষা প্রাচীর গড়িয়া তুলিলেন এবং কার্যত জুকোভের সামরিক প্রতিভাই লেনিনগ্রাদকে আশু পতন থেকে রক্ষা করিয়াছিল। অর্থাৎ জার্মানরা যেমন লেনিনগ্রাদ দখল করিতে পারে নাই, তেমনি অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদ আত্মসমর্পণও করে নাই। দুর্ধর্ষ নাৎসী বাহিনী হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও লেনিনগ্রাদের জনপ্রতিরোধের সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভাঙিতে পারে নাই। অথচ পূর্বদিকে একমাত্র লাডোগা হ্রদের বিপজ্জনক পথ ছাড়া আর বাকী তিনদিকে লেনিনগ্রাদ শত্রুবেষ্টনীর মধ্যে পড়িল—উত্তর দিক থেকে ফিনিশ সৈন্যেরা আগাইয়া আসিয়া এই বেষ্টনী সৃষ্টিতে জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করিল।

কিন্তু অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদের ৩০ লক্ষ নাগরিক যে ভয়াবহ দুর্ভোগের মধ্যে পড়িল, ইতিহাসে তারও কোন তুলনা নাই। ঐতিহাসিক আলেকজান্দার ভার্থ মন্তব্য করিয়াছেন—

No food, no light, no heat and on top of it all, German air-raids and constant shelling—such was the life of Leningrad in the winter of 1941-42'.[১]

অর্থাৎ খাদ্য নাই, আলো নাই, আগুন নাই। এবং এই সমস্তের উপর আবার যুক্ত হইল শত্রুর বিমান হানা, আর অনবরত গোলাবর্ষণ—১৯৪১-৪২-এর শীতকালে লেনিনগ্রাদের জীবন এমন ভয়াবহ ছিল।

কিন্তু হিটলার লেনিনগ্রাদ ও মস্কো সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলেন। তাঁর ধারণা

১। পূর্বোধৃত পুস্তক—পৃঃ ২৯৯

ছিল (সেপ্টেম্বর মাসেই) লেনিনগ্রাদের পতনে আর বিলম্ব নাই। কিন্তু এত বড় বড় শহরকে দখল করিয়া রাখিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁর সেনাপতিরা লেনিনগ্রাদ বা মস্কোর লক্ষ লক্ষ নাগরিককে রেশন বা খাদ্য জোগান দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে রাজী ছিলেন না। অতএব ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখ তিনি এক কড়া হুকুম জারী করিলেন—

'A capitulation of Leningrad or Moscow is not to be accepted even if offered.'

লেনিনগ্রাদ বা মস্কো যদি আত্মসমর্পণও করিতে চায়, তবু সেই আত্মসমর্পণ গ্রহণ করা হইবে না।

তাহলে এই নগরীগুলির অদৃষ্টে কি ঘটিবে এবং কি করা উচিত ? সেই বিষয়েও হিটলার তাঁর সেনাপতিদের উদ্দেশে ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখ অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় যে নির্দেশ দিলেন তার বয়ান এই—

'The Fuehrer has decided to have St. Petersburg (Leningrad) wiped off the face of the earth.

The further existence of this large city is of no interest once Soviet Russia is overthrown···

The intention is to close in on the city and raze it to the ground by artillery and by continuous air attack······

Requests that the city be taken over will be turned down, for the problem of the survival of the population and of supplying it with food is one which cannot and should not be solved by us.*

In this war for existence we have no interest in keeping even part of this great city's populaton.'

এর মর্ম এই যে,—

'ফুরার স্থির করিয়াছেন যে, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ (লেনিনগ্রাদ) শহরকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছিয়া ফেলা হইবে। সোভিয়েট রাশিয়া একবার কাবু হইলে পর এই শহরকে টিকাইয়া রাখার কোন আগ্রহ জার্মানীর নাই ! হিটলারের উদ্দেশ্য হইতেছে এই শহরকে চারদিক থেকে ঘিরিয়া ধরা এবং ক্রমাগত কামান দাগিয়া ও বিমান থেকে বোমা মারিয়া শহরটিকে একেবারে মাটির সঙ্গে ধূলায় মিশাইয়া দেওয়া।

'শহরটি যদি আমাদের হাতে তুলিয়া দেওয়ার অনুরোধ আসে, তবে, সেই অনুরোধ অগ্রাহ্য করা হইবে। কারণ, শহরের অধিবাসীদিগকে খাদ্যদ্রব্য দিয়া বাঁচাইয়া রাখার দায়িত্ব এমন একটা ব্যাপার যে, আমরা তা গ্রহণ করিতে পারি না এবং তা করা উচিতও নয়। এই যুদ্ধ হইতেছে জার্মানীর অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। অতএব এই সুবৃহৎ নগরীর বিশাল জনসংখ্যার কোন অংশকেও বাঁচাইয়া রাখার গরজ আমাদের নাই।'

রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারী নৃশংসতার নমুনা পাওয়া যাইবে এই সমস্ত হুকুমনামার

---

* নির্দেশনামার গুরুত্ব বুঝাবার জন্য মূল বয়ানে বিশেষভাবে বাঁকা টাইপ ব্যবহার করা হয়েছে।
—লেখক

মধ্যে—যে হুকুমনামায় সমগ্র শহরকে ধূলিসাৎ করার এবং ৩০ লক্ষ অধিবাসীকে না খাইয়ে মারার ক্রূর সংকল্প ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই ঘটনারই কয়েক সপ্তাহ পরে গোয়েরিং কাউণ্ট চিয়ানোকে (মুসোলিনীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী) বলিয়াছিলেন—

'রাশিয়াতে এই বছর ২০ থেকে ৩০ মিলিয়ন (২।৩ কোটি) লোক না খেয়ে মারা যাবে। বোধহয় এটা ভালোই হবে। কারণ, কোন কোন জাতির ধ্বংস পাওয়াই উচিত। এটা তো স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, পৃথিবীর মানুষকে যদি না খেয়েই মরতে হয়, তবে আমাদের দুটি জাতিকে যেন একেবারে শেষে মরতে হয়।…রুশ বন্দীশালা-গুলিতে তো রুশরা একে অপরের মাংস খেতে শুরু করেছে!'—(কাউণ্ট চিয়ানোর 'ডিপ্লোম্যাটিক পেপার্স' থেকে উদ্ধৃতি)—[১]

এই সময় অক্টোবর মাসে লেনিনগ্রাদ থেকে দক্ষিণে কিয়েভ পর্যন্ত সমগ্র হাজার মাইল রণাঙ্গনে লাল ফৌজের প্রচণ্ড পরাজয় ও বিষম ক্ষয়ক্ষতি হইতেছিল। অতএব উল্লসিত হিটলার ৩রা অক্টোবর বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করিয়া সদর্পে ঘোষণা করিলেন,—

'আজ আমি ঘোষণা করিতেছি এবং বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করিতেছি যে, পূর্বদিকে শত্রুকে ঘায়েল করা হইয়াছে, সে মাটিতে শুইয়া পড়িয়াছে, আর সে কখনও উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। ১৯৩৩ সালে আমি জার্মান রাষ্ট্রের ক্ষমতায় যখন আসিয়াছিলাম তখনকার জার্মানীর আয়তনের চেয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ রুশভূমি ইতিমধ্যেই আমাদের সৈন্যদের পশ্চাৎভাগে পড়িয়া আছে।'

হিটলারী প্রেসের বড়কর্তা অটো ডায়েট্রিকও অনুরূপ ভাষায় বার্লিন থেকে ঘোষণা করিলেন (মস্কোর দক্ষিণে ওরেলের পতনের পর ৮ই অক্টোবর)—'যে-কোন সামরিক সাক্ষ্যের বিবেচনাতেই বলা যেতে পারে যে, রাশিয়া খতম হয়ে গেছে।'

অবশ্য এটা ছিল নাৎসী জার্মানীর অতিরিক্ত উল্লাস ও অতিরিক্ত আশাবাদিতার কিংবা দম্ভের কথা। কারণ, লেনিনগ্রাদ বা মস্কো কখনও খতম হয় নাই। তবে, লাল ফৌজের বিপর্যয় ঘটিতেছিল এবং সেই বিপর্যয় দক্ষিণ দিকে বা উক্রাইনেই ছিল সবচেয়ে বেশী।…

উক্রাইনে নাৎসী জয়যাত্রা

লক্ষ্যভেদের আগে ধনুকের দুই প্রান্ত বাঁকাইয়া তীর ছুঁড়িবার মত জার্মান রণনীতি যেন সোভিয়েট রাশিয়ার দুই প্রান্ত—উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দুইটি বক্র করিতে লাগিল।'…

'উত্তর ও দক্ষিণের এই যুগপৎ আক্রমণকে লাল ফৌজের বিরুদ্ধে দুই পার্শ্বদেশের অভিযান বলা যাইতে পারে। জার্মানী যেন দুই পার্শ্বে দুইটি প্রকাণ্ড বাহু বাড়াইয়া রুশ সমরশক্তিকে ছিনাইয়া নিতে চাহিল। এই দুই পার্শ্ব দেশের দক্ষিণ বাহু যদিও উক্রাইনে বিস্ময়কর জয় অর্জন করিল, কিন্তু উত্তর বাহু লেনিনগ্রাদের উপকণ্ঠে পেঁীছিয়া অবশ হইয়া রহিল। ফলে, জার্মানী আর দুই বাহুকে একত্র করিয়া সোভিয়েট রাশিয়াকে বজ্রমুষ্টির মধ্যে চাপিয়া মারিতে পারিল না।'[২]

১। উইলিয়াম শাইরার প্রণীত 'দি রাইজ এণ্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ'—পৃষ্ঠা ১০২০
২। গ্রন্থকার প্রণীত 'রুশ-জার্মান সংগ্রাম'—পৃষ্ঠা ১২২ ও ৮৬

মস্কোকে খতম করার আগে উক্রাইন ও লেনিনগ্রাদ দখল করিতে হইবে, এটাই ছিল হিটলারের ইচ্ছা। কারণ, প্রথমতঃ শ্রমশিল্প, কাঁচামাল ও কৃষি-ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার দখল এবং তারপর এই দুই পার্শ্বদেশের রণাঙ্গনের দায়িত্ব মুক্ত হইয়া উত্তর ও দক্ষিণের যান্ত্রিক সৈন্যদল একত্রে মধ্য রণাঙ্গনে বা মস্কো দখলের অভিযানে মিলিত হইবে—মোটামুটি এটাই ছিল হিটলারের 'সংশোধিত' রণনৈতিক সিদ্ধান্ত।

'উক্রাইনের ঐশ্বর্যকে বোধহয় একত্রে বিহার ও বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। বাংলাদেশ যেমন ভারতবর্ষের ধান্য শস্যাগার, বিহার যেমন খনিজ ভাণ্ডার, রাশিয়ার পক্ষে একক উক্রাইন তাহাই। ইহার বড় বড় নদী, প্রকাণ্ড সমতলভূমি, পর্বতহীন প্রান্তর, শস্যশ্যামল মাঠ যেন বাংলাদেশের মতই সুন্দর এবং জনবসতির পক্ষে লোভনীয়। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র মস্কো জেলা ছাড়া প্রতি বর্গমাইলে এত বেশী লোকের বাস আর কোথাও নাই। ইহার লোকসংখ্যা সাড়ে ৩ কোটি, আয়তন সাড়ে ৪ লক্ষ বর্গমাইল।'

সংক্ষেপে এই ঐশ্বর্যের কিছুটা আভাস দেওয়া যাইতে পারে, যেমন—'উক্রাইনে মোট ২ কোটি ৭০ লক্ষ হেক্টর (১ হেক্টর ২.৪৭ বা প্রায় আড়াই একরের সমান) জমিতে শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। সমগ্র রাশিয়ার মোট ইস্পাতশিল্পের শতকরা ৮০ ভাগ, কাঁচা লোহার শতকরা ৬০ ভাগ, চিনি শতকরা ৮৫ ভাগ, কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতির শতকরা ৭০ ভাগ, ম্যাঙ্গানিজ শতকরা ৯৫ ভাগ উক্রাইনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৯৩৫ সালে উক্রাইনে মোট ৬ কোটি ১০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল। ঐ বৎসর লোহা গলানো হইয়াছিল ৭৬ লক্ষ ২৩ হাজার টন এবং ইস্পাত তৈয়ার হইয়াছিল ৬০ লক্ষ ২১ হাজার টন। উক্রাইনের সঙ্গে ককেশাসের বিখ্যাত পেট্রোল সম্পদও বিশেষভাবে ভাবিবার মত। ১৯৩৮ সালে ককেশাসে মোট ২ কোটি ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল। অতএব উক্রাইনে অভিযানের শেষ লক্ষ্য ছিল বাকু ও বাটুম দখল করা।'...[১]

প্রকৃতপক্ষে উক্রাইন এবং রাশিয়ার শ্রমশিল্প ও কাঁচামালের ঐশ্বর্যের এলাকাগুলি দখলের পরিকল্পনা কেবল হিটলারের নয়। প্রথম মহাযুদ্ধে কাইজারের জার্মানী এবং তারপর পশ্চিমী আর্থিক সাহায্যপুষ্ট নাৎসী জার্মানীর বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিপতিদেরও এই পরিকল্পনা ছিল এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অত্যন্ত দ্রুত আঘাত হানিয়া বিদ্যুৎগতিতে চূড়ান্ত জয়লাভ এর জন্য প্রয়োজন ছিল। জার্মান 'ফিনান্স-ক্যাপিটালের' এই জরুরী প্রয়োজন থেকেই 'ব্লিজক্রীগ' কিংবা বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের উদ্ভব—হিটলার যে শব্দটির জনক বলিয়া প্রচারিত। জার্মান একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সেরা সুবিখ্যাত আই জি ফারবিন ট্রাস্টের কর্তাব্যক্তিরা এই সমস্ত পরিকল্পনার পৃষ্ঠাপোষক এবং তাঁরাই হিটলারী আক্রমণের উস্কানিদাতা। অন্যান্য পুঁজিপতিরাও ছিলেন এঁদের সহযোগী এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারী আক্রমণের ৯৬ ঘণ্টার মধ্যেই এঁরা লেনিনগ্রাদ, মস্কো, কিয়েভ ও ককেশাসের অধিকৃত এলাকাগুলি কিভাবে অর্থনৈতিক শাসনের দ্বারা শোষণ করিবেন, সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধিদের নাম পর্যন্ত বাছাই করা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে

১। গ্রন্থকার প্রণীত 'রুশ জার্মান সংগ্রাম'—পৃষ্ঠা ৮৭

উক্রাইনের উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল। কারণ, এই অঞ্চলই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—

"By far the most important area is the Ukraine, with an iron ore yield of 22,000,000 tons, 18,00,000 manganese ore, a steel production of 12,000,000 tons and about 35 important blast furnaces and rolling mills..."

১৯৪১ সালের জার্মান সূত্রের এই হিসাব ও তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া সাম্প্রতিক কালে পূর্ব জার্মান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী নেতা বলিতেছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পদ লুণ্ঠন করার আসল পরিকল্পনা ছিল জার্মানীর একচেটিয়া পুঁজিপতিদের।[১]

* * *

ক্রিমিয়া উপদ্বীপসহ উক্রাইন দখলের জন্য হিটলারী সৈন্যরা রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে যে অভিযান শুরু করিল, তার গোড়াপত্তন হইয়াছিল দক্ষিণ পোল্যাণ্ডের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ঝিটোমির থেকে। জুলাই মাসের (১৯৪১) গোড়ার দিকে লালফৌজ নাৎসী বাহিনীকে স্থানীয় যুদ্ধে কিছু কিছু বাধা দিয়া রাখিতে পারিল বটে এবং উক্রাইনের রাজধানী কিয়েভ থেকে ১০।১২ মাইল দূরে সাময়িকভাবে তাদের প্রতিরোধ করিতে পারিল বটে, কিন্তু জেনারেল ফন ক্লাইস্টের যান্ত্রিক বাহিনী আগস্ট মাস থেকে যে বিদ্যুৎগতি আক্রমণ আরম্ভ করিল, তার ধাক্কায় বিখ্যাত নীপার নদী অতিক্রান্ত, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাণকেন্দ্র নীপ্রোস্ট্রয় ও যন্ত্রপাতির কারখানা-নগরী নীপ্রোপেট্রোভস্ক হাতছাড়া হইয়া গেল। কিন্তু পরাজিত লালফৌজ এই অঞ্চল থেকে ২৮শে আগস্ট হটিয়া যাওয়ার আগে অত্যন্ত কঠোরভাবে পোড়ামাটির নীতি অনুসরণ করিল এবং প্রচুর পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে নীপার নদীর বিখ্যাত বাঁকে যে ডামু বা বাঁধ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈয়ার হইয়াছিল, সেগুলিকে বিস্ফোরণের সাহায্যে উড়াইয়া দেওয়া হইল।*

এদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী ওডেসা বন্দর রুমেনীয় বাহিনীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল (আড়াই মাস অবরোধ যুদ্ধের পর ওডেসা বন্দরের পতন হইয়াছিল। ওখানকার তীব্র ও তিক্ত যুদ্ধে রুশ ও রুমেনীয় উভয় পক্ষে প্রচুর ক্ষতি হইয়াছিল। ১ লক্ষ ১০ হাজার রুমেনীয় সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল।) এবং জার্মানরা পোলটাভা ও পারকোভ অভিমুখে আর একটি অভিযান শুরু করিল। ফলে, সেপ্টেম্বর মাসের আরম্ভে জার্মান বাহিনী কিয়েভ শহরকে উত্তর ও দক্ষিণ দিক দিয়া বেষ্টন করিয়া বহুদূর পূর্বদিকে আগাইয়া গেল।

কিন্তু উক্রাইনের এই যুদ্ধ নিয়া হিটলার ও তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে যেমন বিতর্ক

১। Thus Wars Are Made—Prof. Albert Norden, Dresden, 1970 P. 111-115.

* ১৯৪১ সালের ঐ সময়টার দৈনিক যুগান্তরে উক্রাইনের বিখ্যাত Dnieper নদীকে 'নীপার' নামে অভিহিত করা হইয়াছিল এবং 'রুশ-জার্মান সংগ্রাম' গ্রন্থেও এই নামেই উল্লেখ করা হইয়াছিল। কিন্তু আসলে এর উচ্চারণ 'ডিনিপার'—বাংলায় অবশ্য 'নীপার' শব্দটি জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং 'নীপার নদীর বাঁকের' যুদ্ধ সে সময় পাঠকের চিত্তে প্রভূত কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছিল।—লেখক

ও বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল, তেমনি স্ট্যালিনের সঙ্গে ক্রুশ্চেভেরও ঐতিহাসিক বিরোধ হইয়াছিল। অনেকের ধারণা কিয়েভের এই যুদ্ধ উপলক্ষে স্ট্যালিনের সঙ্গে এন এস ক্রুশ্চেভের যে মতবিরোধ হইয়াছিল, পরবর্তীকালে সেটাই অন্যান্য বিরোধ উপলক্ষে এত তিক্ততায় পরিণত হইয়াছিল এবং ১৯৫৬ সালে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস-বিখ্যাত বিংশতি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের 'সামরিক প্রতিভার' তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, এবং তাঁর যে ব্যক্তিত্বের অবমূল্যায়ন ঘটাইয়াছিলেন, তারও মূলসূত্র এখানে।

ঘটনাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রহিয়াছে বলিয়া একটু খোলসা করিয়া বলা দরকার যে, দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি মার্শাল বুদেনীর পরামর্শদাতারূপে যে ওয়ার কাউন্সিল বা সমর-পরিষদ গঠিত হইয়াছিল, ক্রুশ্চেভ ছিলেন তার বিশিষ্ট সদস্য। তিনি উক্রাইনীয় কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি এবং পোলিট ব্যুরোরও সদস্য ছিলেন। এখানে আর একটি কথাও উল্লেখ করা দরকার যে, উক্রাইনে বিচ্ছিন্নতাকামী জাতীয়তাবাদের আন্দোলন আদৌ উপেক্ষণীয় ছিল না। অতীতে প্রথম মহাযুদ্ধের পর মাত্র বছর কুড়ি আগে কিয়েভের অতি দ্রুত কয়েকবার হাত বদল হইয়াছিল জার্মান-অস্ট্রিয়ান বাহিনীর দ্বারা। হেটমান স্করোপাদস্কি নামে এক ব্যক্তিকে 'উক্রাইন জাতীয় রাষ্ট্রের' রাষ্ট্রপতিরূপেও ঘোষণা করা হইয়াছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় হোয়াইট এবং রেডগার্ডদের হাতেও কিয়েভের বার বার ভাগ্যপরিবর্তন ঘটিয়াছে। এমন কি, মার্শাল পিলসুদস্কির পোল সৈন্যেরাও সাময়িক দখলদারি স্থাপন করিয়াছিল। অতএব উক্রাইনের এই অতীত ইতিহাসও একেবারে উপেক্ষণীয় ছিল না—যে উক্রাইনের কমিউনিস্ট অধিনায়ক ছিলেন এন এস ক্রুশ্চেভ।

৯ই সেপ্টেম্বর জার্মানরা উত্তর দিক থেকে কিয়েভের ৭০ মাইল উত্তর-পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত নেঝিন শহরের দিকে অগ্রসর হইল এবং অন্যান্য জার্মান বাহিনী দক্ষিণে নিপার নদীর বাঁকের দিকে বহু গভীরে ঢুকিয়া পড়িল। জার্মানীর এই সাঁড়াশী আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য কোন রুশ মজুত (রিজার্ভ) সৈন্য পাওয়া গেল না। তখন মার্শাল বুদেনী ও মিঃ ক্রুশ্চেভ কিয়েভের এই ফাঁদ থেকে বাহির হইয়া আসার জন্য উদ্যোগী হইলেন। সুতরাং ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখ তাঁরা সুপ্রীম কমাণ্ডের অনুমতি পাওয়ার জন্য স্ট্যালিনের নিকট নির্দেশ চাহিয়া পাঠাইলেন আরও পূর্বদিকে হটিয়া গিয়া নূতন লাইন প্রতিষ্ঠার জন্য।

কিন্তু স্ট্যালিন সেদিনই দক্ষিণ-পশ্চিম রণক্ষেত্রের সেনাপতি জেনারেল কিরপোনোসকে 'অত্যন্ত দৃঢ়তার' সঙ্গে হুকুম দিলেন কিয়েভ পরিত্যাগ না করার জন্য, বরং রণাঙ্গনের অন্যান্য অংশ থেকে আরও সৈন্য আনাইয়া নেঝিনের পূর্বদিকে জার্মান অগ্রগতি প্রতিরোধের জন্য। সেই সঙ্গে তিনি মার্শাল বুদেনীকেও প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারিত করিলেন এবং মার্শাল টিমোশেঙ্কোকে তাঁর জায়গায় পাঠাইলেন ১৩ই সেপ্টেম্বর। কিন্তু ঐদিনই দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের পুরা চারটি সোভিয়েট আর্মিই জার্মানদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পড়িতেছিল এবং এই বেষ্টনী থেকে বাহির হইয়া আসার মাত্র ২০ মাইল ফাঁক ছিল—লখভিস্টা ও লুবনির মধ্যবর্তী এলাকায়। ১৪ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ-পূর্ব রণাঙ্গনের চীফ অব স্টাফ মেজর-জেনারেল তুপিকোভ

মস্কোতে সদর দপ্তরের জেনারেল শ্যাপসানিকোভকে এই সংকটজনক অবস্থার কথা জানাইলেন। কিন্তু উত্তরে তিনি 'মাথা খারাপ না করিয়া' কমরেড স্ট্যালিনের ১১ই সেপ্টেম্বরের হুকুম পালনের জন্য নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বর জার্মানরা সোভিয়েট সৈন্যদের বাহির হইয়া আসার পথ বন্ধ করিয়া দিল এবং ৪টি আর্মি বেষ্টিত হইয়া পড়িল। তাদের অবস্থা একেবারে বিপর্যয়কর হইয়া পড়িল। বিশৃংখলা দেখা দিল, এমন কি লড়াইয়ের ক্ষমতা পর্যন্ত তারা হারাইয়া ফেলিল।
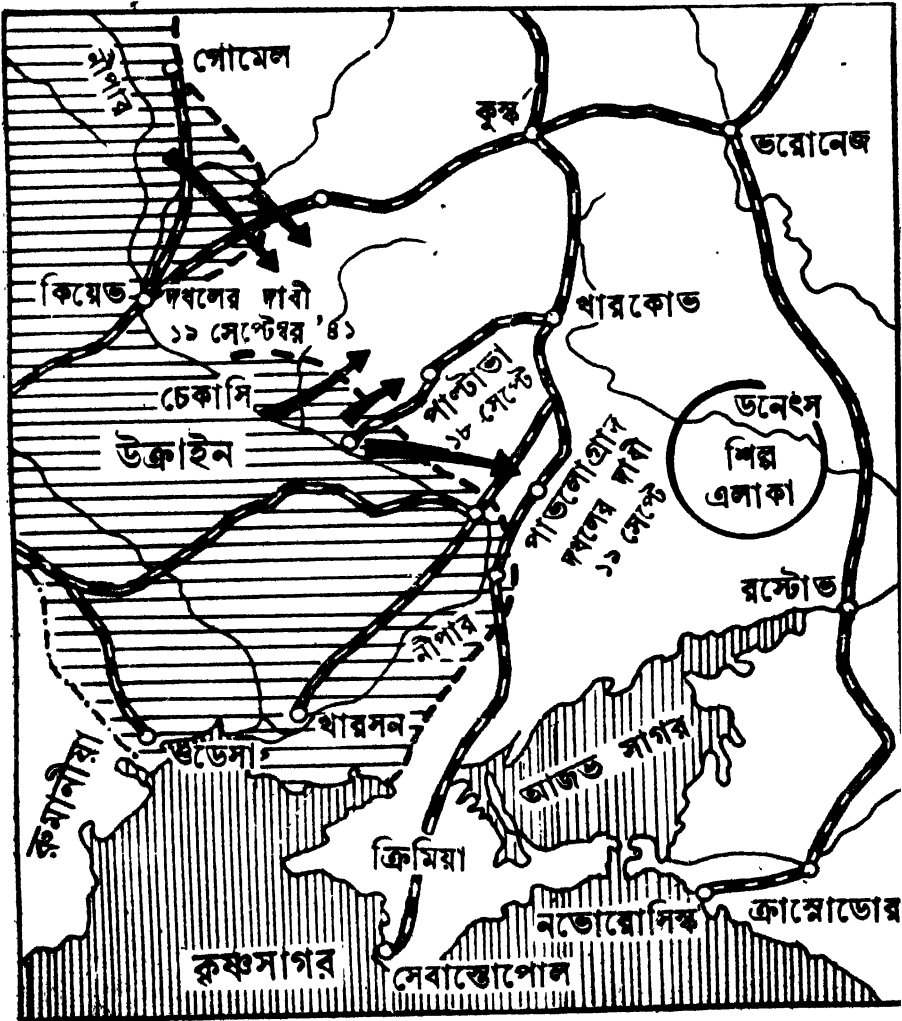
উক্রাইনে জার্মানদের অগ্রগতি

অবশেষে ১৭ই সেপ্টেম্বর বেলা ১১-৪০ 'এর সময় যখন মস্কোর সদর দপ্তর থেকে কিয়েভ পরিত্যাগের নির্দেশ পাওয়া গেল, তখন অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। সোভিয়েট সৈন্যদের পালাইবার পথ ছিল না। জেনারেল কিরপোনস, জেনারেল

তুপিলোভ এবং সেনানীমণ্ডলী ও সমর-পরিষদের বহু বিশিষ্ট সদস্য ও অফিসার কোন ত্রাণের পথ না পাইয়া প্রাণ হারাইলেন—হাজার হাজার রাজনৈতিক ও সামরিক পদস্থ ব্যক্তিগণ ও অজস্র সৈন্য জার্মানদের ইঁদুর কলে ধরা পড়িয়া শোচনীয় মৃত্যু বরণ করিলেন। প্রকাশ যে, জেনারেল কিরপোনস হতাশ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু বুদেনী, টিমোশেঙ্কো এবং ক্রুশ্চেভ কোনমতে একখানা প্লেন জোগাড় করিয়া কিয়েভ থেকে পলাইয়া আসিতে পারিয়াছিলেন।[১]

এদিকে হিটলারের সদর দপ্তর থেকে ঘোষণা করা হইল যে, 'পৃথিবীর ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধে' জার্মানী জয়ী হইয়াছে। কারণ, কিয়েভের আবেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া রুশ সৈন্যবাহিনীর একমাত্র বন্দী সংখ্যাই দাঁড়াইয়াছে ৬,৬৫০০০ এবং ধৃত সামরিক সম্ভার অজস্র। কিন্তু সোভিয়েট পক্ষ সরকারীভাবে এই সংখ্যা অস্বীকার করিয়া বলিলেন যে, ১৫০৫৪১ সৈন্য বেষ্টিত হওয়ার আগেই পলাইতে পারিয়াছিল।

কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ব নিয়া দুই পক্ষের যে বিরোধই থাকুক একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, কিয়েভ ও উক্রাইনের যুদ্ধে রাশিয়ার যে বিপর্যয় ঘটিয়া গেল তার তুলনা নাই। সেই সঙ্গে একথাও চিন্তনীয় যে, স্ট্যালিনের ১১ই সেপ্টেম্বরের সেই নির্দেশ (কিয়েভ পরিত্যাগ না করার জন্য) বোধহয় সঠিক ছিল না। অন্যথা লালফৌজের এত ভয়ঙ্কর ক্ষয়ক্ষতি হইত না। ইংরাজ লেখক এ্যালান ক্লার্ক বলিতেছেন যে, উক্রাইনের মৃত্যু ফাঁদে রাশিয়ার মোট সৈন্যবাহিনীর একতৃতীয়াংশ নষ্ট হইয়াছিল। তবে, সোভিয়েট পক্ষের একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, উক্রাইনে জার্মানীর এই বৃহৎ জয় হিটলারের 'টাইম টেবিল'ও উল্টাইয়া দিয়াছিল। কারণ, শীতকাল আসিবার আগেই মস্কো দখলের যে পরিকল্পনা জার্মান হাইকমাণ্ডের ছিল, উক্রাইনের জন্য তা বানচাল হইয়া গেল। জেনারেল হ্যালডার ও জেনারেল গুডেরিয়ান এজন্য খুব আফশোস করিয়াছেন এবং তাঁরা মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'সমগ্র পূর্ব রণাঙ্গনের অভিযানে কিয়েভের যুদ্ধই ছিল সবচেয়ে বড় রণনৈতিক ভুল—যদিও রণকৌশলের দিক থেকে খুব বড় জয়।'

কিন্তু জার্মানদের এই বিদ্যুৎগতি জয়াভিযানের ফলে উক্রাইনের রুশ রণাঙ্গন বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং ২০০ মাইলব্যাপী এক বিরাট ফাঁকের সৃষ্টি হইল। বুগ, ডিনিস্টার, নীপার, ডনেজ ও ডন ইত্যাদি বিখ্যাত নদীগুলির পর পর প্রাকৃতিক বিঘ্ন সত্ত্বেও নাৎসী যান্ত্রিক শক্তিকে প্রতিরোধ করা যায় নাই। পরবর্তী দুই মাসে সমগ্র পূর্ব উক্রাইন এবং প্রায় গোটা ক্রিমিয়া উপদ্বীপ জার্মানদের দখলে চলিয়া গেল—একমাত্র সেবাস্তপোল দুর্গ ছাড়া, সেখানে দীর্ঘকাল অবরোধ যুদ্ধ চলিল। কিন্তু খারকোভ ও ডনেজ নদীর অববাহিকা এবং গুরুত্বপূর্ণ রস্টোভ বন্দর ইত্যাদি হাতছাড়া হওয়ার ফলে ককেশাসের পেট্রোল পাইপ লাইন বিপন্ন হইয়া পড়িল। তবে, নভেম্বরের শেষভাগে টিমোশেঙ্কোর পাল্টা আক্রমণে রস্টোভ বন্দরের পুনরুদ্ধার ঘটিয়াছিল।

১। Russia At War (1941-45)—Alexander Werth. Page—199-203

দশম অধ্যায়

মস্কো অভিযান

লালফৌজ সংহারের চরম চেষ্টা

সীমান্ত সংগ্রাম ও "স্ট্যালিন লাইনের" যুদ্ধের পর জার্মানরা স্মলেনস্ক বা মধ্য রণাঙ্গনে প্রবল বাধা পাইয়াছিল। তার পরেই জার্মানী দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন বা উক্রাইনের দিকে ঝুঁকিল। উক্রাইনে প্রচুর সামরিক সফলতা অর্জিত হইলেও ইহা কোন চূড়ান্ত ফল আনিল না, কিংবা এই চূড়ান্ত ফলাফলের অপেক্ষা না রাখিয়াই জার্মান সমর কর্তৃপক্ষ একই সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বদেশ বা লেনিনগ্রাদে আক্রমণ চালাইলেন। কিন্তু এখানেও সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধাতে পেঁছানো গেল না, লেনিনগ্রাদ দীর্ঘ অবরোধ সংগ্রামে পরিণত হইল। তখন হিটলার আবার মধ্য রণাঙ্গন বা স্মলেনস্কের সড়ক ধরিয়া মস্কো যাত্রার কথা চিন্তা করিলেন। এই সময়কার জার্মান রণনীতি লক্ষ্য করিলে মনে হইবে উহা যেন অতিরিক্ত যৌবনশক্তিতে উদ্বেল। নাৎসী জার্মানীর এই যৌবন জলতরঙ্গ যেন দুকূল ছাপাইয়া প্লাবনের বেগে সমস্ত কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চাহিতেছে। বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত দিয়া বলা যায় যেন পদ্মার সংহারিণী মূর্তি। তার সংযম নাই, অপেক্ষা করিবার সময় নাই, এমন কি চিন্তা করিবার মত ধৈর্যও বুঝি নাই! সুতরাং ক্রমাগত সে আক্রমণ চালাইতেছে—একবার মধ্য রণাঙ্গনে, আর একবার দক্ষিণ রণক্ষেত্রে এবং আবার উত্তর রণক্ষেত্র হইয়া মধ্য রণাঙ্গনে। নাৎসী সমরকর্তাদের যেন সময় নাই, তলাইয়া বুঝিবারও অবসর নাই—অক্টোবর মাস আসিয়া গেল, মাস কাবার হইলেই শীতের শুরু হইবে এবং 'বলশেভিক বর্বরদের' শীত! সুতরাং ইহার আগেই রাশিয়াকে শেষ করিতে হইবে। তিন সপ্তাহে যদি পোল্যাণ্ডের ৩০০ মাইল জয় হইয়া থাকে এবং রুশ সীমান্তের বিয়ালিস্টক ও ব্রেস্টলিটোভস্ক হইতে সাড়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে (২২শে জুন হইতে ১৬ই জুলাই) যদি স্মলেনস্ক পর্যন্ত ৪৫০ মাইল অতিক্রান্ত হইয়া থাকে, তা' হলে মস্কো পর্যন্ত বাকী ২০০ বা ২৫০ মাইল জয় করিতে আর কত দিন লাগিবে? বিশেষত উক্রাইনের যখন পূর্বাংশ পর্যন্ত দখল হইয়া গিয়াছে এবং লেনিনগ্রাদে বৃহৎ সোভিয়েট সৈন্যদল আটকা পড়িয়াছে, তখন মধ্য রণাঙ্গনে আঘাত হানিয়া মস্কোকে চূর্ণ করিবার এই তো সুযোগ! হিটলার সামরিক শক্তির এত বড় বজ্র নিক্ষেপ করিবেন যে, রাশিয়া তো সাবাড় হইবেই পৃথিবীর লোকে সবিস্ময়ে দেখিবে দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন যাহা পারেন নাই, 'ফুরার তাহা সাধন করিলেন।' কেনই বা পারিবেন না?—'ফুরারের' স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা রহিয়াছে, যাহা ঐশী প্রেরণার মতই দৈবশক্তিসম্পন্ন! রাশিয়া আক্রমণ তো স্বয়ং হিটলারেরই 'জীবনের কঠিতম সিদ্ধান্ত।'

সুতরাং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 'বৃহত্তম সংগ্রামের' আয়োজন হইল। যুদ্ধজয় সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসী এবং আপন সামরিক শক্তিতে গর্বিত হিটলার ৩রা অক্টোবর (১৯৪১)

বার্লিন রেডিওযোগে এক ঘোষণা-বাণীতে বলিলেন, 'এক শত্রুর পর অন্য শত্রুকে জার্মানী বিগত দুই বৎসর যাবৎ পরাজিত করিয়া আসিয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। তাদের এই পরাজয়ও আমি চাহি নাই। প্রথমে সংঘর্ষের পরেই আমি বন্ধুতার হাত বাড়াইয়া দিয়াছি, কিন্তু প্রতি বারই আমার শান্তিপ্রস্তাব যুদ্ধবিলাসী চার্চিল প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এবার আমি এই কথা স্থিরভাবেই জানাইয়া দিয়াছি যে, যুদ্ধ করিয়াই সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে। সেই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে অনাগত এক শতাব্দী কাল পর্যন্ত প্রচারিত হইতে থাকিবে।' রুশ-জার্মান যুদ্ধের উল্লেখ করিয়া হিটলার বলিলেন, 'মানব ইতিহাসের ইহা বৃহত্তম যুদ্ধ। সেই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার দিন হইতে আজ পর্যন্ত সকল কিছুই পরিকল্পনা মত চলিয়াছে… কোথাও এতটুকু ভুল হয় নাই!…আজ আমার এই কথা ঘোষণার অধিকার রহিয়াছে। কেননা, এই শত্রু (রাশিয়া) ইতিমধ্যেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই পর্যন্ত রাশিয়ার ২৫ লক্ষ সৈন্য নষ্ট (হতাহত ও বন্দী ইত্যাদিসহ), ২০ হাজার কামান ও ১৮ হাজার ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে—এবং এরোপ্লেন নষ্ট হইয়াছে সাড়ে ১৪ হাজার।' এই বক্তৃতায় তিনি আরও বলিলেন যে, ৪৮ ঘণ্টা ধরিয়া রুশ রণাঙ্গনে বৃহত্তম যুদ্ধ চলিতেছে। উহার আগের দিন (২রা অক্টোবর) মস্কো অভিযানের আরম্ভে সৈন্যবাহিনীর নিকট এক ঘোষণায় তিনি রাশিয়া সম্পর্কে বলেন,

"To day begins the last great decisive battle of this year. It will hit the enemy destructively."

অর্থাৎ আজ এই বৎসরের সর্ববৃহৎ এবং শেষ চূড়ান্ত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই আঘাত শত্রুকে সংহার করিবে।

হিটলারের এই সমস্ত বক্তৃতা ও ঘোষণা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, মস্কোর সংগ্রামকেই তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক শক্তি ধ্বংসের শেষ যুদ্ধ বলিয়া নিশ্চিতভাবে ধরিয়া লইয়াছিলেন। সেই ঐতিহাসিক সংগ্রাম যখন শুরু হইল, উহার এক সপ্তাহ পর (৯ই অক্টোবর) হিটলারের বিশ্বস্ত অনুচর এবং জার্মান সংবাদ ও সংবাদপত্রসমূহের বড় কর্তা অটো ডায়েট্রিক পূর্ব রণাঙ্গনে 'ফুরারের' সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বার্লিনে সমবেত স্বদেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের নিকট ঘোষণা করিলেন,

"With the crushing of the Timoshenko's army group the campaign in the East been decided. The military decision is final and further developments will follow the wishes of the German High Command. These blows have finished the Soviet Union in a millitary sense".

এই বিবৃতিতে একেবারে পরিষ্কারভাবেই দুনিয়াকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, মধ্য রণাঙ্গনে টিমোশেঙ্কোর সৈন্যদলের ধ্বংসের দ্বারা পূর্ব রণাঙ্গনের অভিযান শেষ হইয়া গেল। এক্ষণে জার্মান হাইকম্যাণ্ডের ইচ্ছানুসারেই ভবিষ্যতের সমস্ত কিছু চলিবে। সামরিক দিক দিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন খতম হইয়া গিয়াছে।

অতএব হিটলার এবং তাঁর বড় কর্তাদের এই ধারণা ছিল যে, রাজধানী মস্কোর

যুদ্ধই রাশিয়ার শেষ সংগ্রাম। আর এত বড় সংগ্রামের আয়োজনেও হিটলার 'কোন ত্রুটি' রাখেন নাই। তাঁর নিজ মুখেই প্রকাশ—

"All preparations so far as human beings can foresee have been made. Step by step this has been prepared systematically to manoeuver the opponent into such a position that we can now strike a deadly blow."

অর্থাৎ মানুষের দূরদৃষ্টিতে যতদূর সম্ভব, ততদূর সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। ধাপে ধাপে এই আয়োজন এমন নিয়ম শৃংখলার সহিত পূর্ণ করা হইয়াছে এবং শত্রুপক্ষকে মহড়ার চালে এমন এক অবস্থার মধ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে যে, এক্ষণে আমরা অনায়াসেই তাকে মারাত্মক আঘাত হানিতে পারিব। [গ্রন্থকার প্রণীত রুশ-জার্মান সংগ্রাম, পৃঃ ১৪০-৪২]

বাস্তবিকই হিটলারের পক্ষে ইহা আস্ফালন মাত্র ছিল না এবং যে আক্রমণ ও আয়োজন তিনি করিয়াছিলেন তা' অবিশ্বাস্য রকমের ছিল বলিয়াই রাশিয়া জয় সম্পর্কে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন। বোধহয় সেপ্টেম্বর মাস হইতে স্মলেনস্ক খণ্ডে এই আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইতেছিল। জার্মান হাইকম্যাণ্ড ইহাকে চূড়ান্ত যুদ্ধের পরিকল্পনা অনুসারেই যথাসাধ্য নিখুঁত এবং শক্তিশালী করিতেছিলেন। 'ফুয়ারের স্বপ্ন' পরিপূর্ণ করিবার জন্য দলে দলে জার্মান রিজার্ভ সৈন্য ও সমরাস্ত্র স্মলেনস্কে পৌঁছিতে লাগিল। ১২ ডিভিসন যান্ত্রিক সৈন্যদল সহ অন্ততপক্ষে ৬০ ডিভিসন সৈন্য মস্কো অভিযানে নিযুক্ত হইল। মোট সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়াইল ১৫ লক্ষ এবং সমরাস্ত্রের মধ্যে একমাত্র ট্যাংকের সংখ্যাই ছিল ৫ হাজার। একটি মাত্র রণাঙ্গনে এত সৈন্য ও সমরাস্ত্রের বিপুল সমাবেশ ইহার আগে পৃথিবীর কোন দেশের সামরিক ইতিহাস প্রত্যক্ষ করে নাই। সমগ্র রুশ রণাঙ্গনে মোট জার্মান শক্তির সমাবেশের হিসাবে বলা যায় যে, পূর্ব রণাঙ্গনের সমস্ত জার্মান ট্যাংকের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ, বিমানবহরের দুই-তৃতীয়াংশ এবং পদাতিক বাহিনীর অর্ধেক একমাত্র মস্কো জয়ের উদ্দেশ্যে সমাবেশ করা হইল। নিঃসন্দেহে ইহা বৃহত্তম যুদ্ধ ছিল এবং এই যুদ্ধের পরিকল্পনাও ছিল বিরাট। স্মলেনস্ক খণ্ড হইতে ইহা উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত হইল—৪০০ মাইল রণাঙ্গন ধরিয়া যেন আকাশে রামধনুর মত এক প্রকাণ্ড অর্ধবৃত্তের আকারে ইহা ক্যালিনিনের উত্তরে এবং ওরেলের দক্ষিণে বিস্তৃত হইল। এই অর্ধবৃত্তের পূর্ব নির্ধারিত দুইটি বিন্দুতে ব্রিয়ানস্ক ও ভিয়েজমায় গোটা লালফৌজকে ঘিরিয়া ধরিয়া সাবাড় করা হইবে! রাশিয়ার সর্বপ্রধান সৈন্যদলের এখানে সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। সুতরাং রণশাস্ত্রানুসারে ক্যালিনিন ও ওরেলের মধ্যবর্তী সমগ্র রুশ রণক্ষেত্র গ্রাস ও আচ্ছন্ন করা হইবে দ্রুততম গতিতে এবং তারপর এই বিরাট ব্যূহের মধ্যভাগ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মস্কো নগরীর দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করা হইবে। সমগ্র মধ্য রণাঙ্গন একটি মাত্র লড়াইয়ের ভূমিতে পরিণত হইবে। অভূতপূর্ব যুদ্ধায়োজনের অভূতপূর্ব পরিকল্পনা!

অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত আড়াই মাস ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিল। মস্কো রণাঙ্গনে উভয় পক্ষের আক্রমণ, প্রতিরোধ শক্তি, সমরাস্ত্র, সৈন্য রণকৌশল এবং আঘাত হানিবার প্রচণ্ডতার সহিত উক্রাইন বা লেনিনগ্রাদেরও কোন তুলনা হয় না। জার্মানীর

এই আক্রমণের শক্তি ও বেগ ক্রমশ পর্দার উপর পর্দায় চড়িয়াছে এবং সমুদ্রের তরঙ্গের মত উদ্বেলিত হইয়া যেন ভয়ঙ্কর আবর্তে ফাটিয়া পড়িয়াছে। জার্মানীর মত বহির্জগতেরও অনেকেই ধরিয়া লইয়াছিল যে রাশিয়ার পতন আসন্ন।

আক্রমণ আরম্ভ

ফিল্ড মার্শাল ফন বোক এই আক্রমণের ছিলেন প্রধান অধিনায়ক, যেমন ছিলেন ফিল্ড মার্শাল টিমোশেঙ্কো রাশিয়ার পক্ষে। ফন বোকের সহিত যুক্ত হইলেন ট্যাঙ্ক বিশারদ জেনারেল গুডেরিয়ান ও বিমান বিশারদ ফিল্ড মার্শাল কেসেলরিং। আক্রমণ
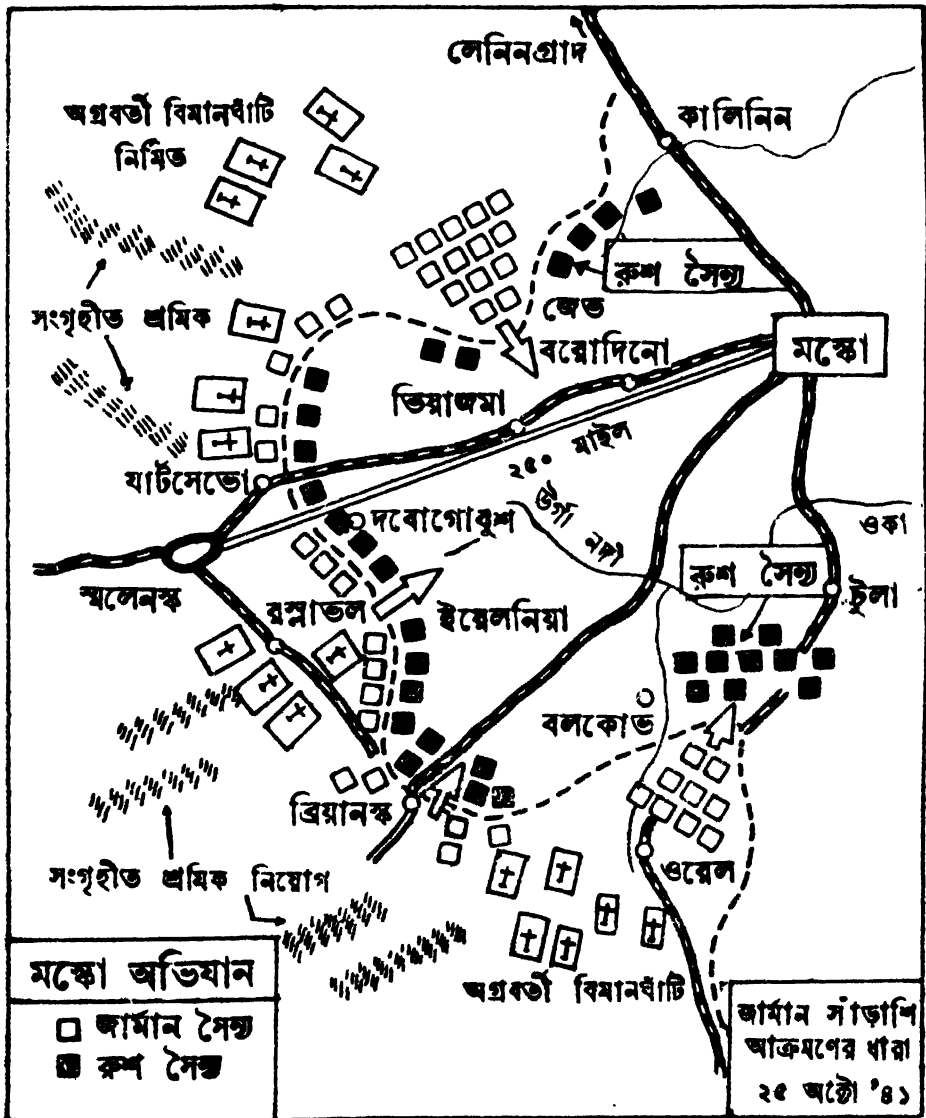
পরিকল্পনায় দেখা যায় যে, কিয়েভের পতনের পর জেনারেল গুডেরিয়ানের ট্যাঙ্ক বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হইল উত্তরবর্তী মধ্য রণাঙ্গনের দিকে অগ্রসর হইতে—দেসনা

নদী ধরিয়া চেরনিগোভের উত্তর-পূর্বে নভগরোদ-সেভেরস্ক হইয়া ট্রুবচেভস্ক পর্যন্ত পৌঁছিতে। এখান হইতে জেনারেল গুডেরিয়ান উত্তর-পূর্ব দিকে মুখ ঘুরাইয়া ওরেল অভিমুখে আক্রমণ চালাইলেন টিমোশেঙ্কোর দক্ষিণ পার্শ্বদেশে। গুডেরিয়ানের বামদিক হইতে ফন ভিক্স তাঁর সেন্যদল সহ (দ্বিতীয় আর্মি) ব্রিয়ানস্ক আক্রমণ করিলেন। আবার একই সময়ে ব্রিয়ানস্কের পার্শ্বদেশ ছিন্ন করিল ফন ক্লুজের চতুর্থ আর্মি, যারা রসল্যাভল হইতে যুকনোভ ও কালুগার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। আরও দুইটি আর্মি শক্তিশালী যান্ত্রিক সেনাদল সহ ভিয়েজমা ও রিজেভের দিকে আক্রমণ করিতেছিল—তাঁদের বামপার্শ্ব রক্ষা করিতেছিল ৯নং আর্মি। আরও উত্তরে ছিল কয়েকটি পদাতিক ও অশ্বারোহী ডিভিসন, যারা ভলদাই পাহাড় অঞ্চলে সক্রিয় ছিল। এভাবে ১৫ লক্ষ সৈন্যের যেন বিরাট সামরিক যজ্ঞ শুরু হইল।

স্মলেনস্কের যুদ্ধে যে দুই মাসের সময় পাওয়া গিয়াছিল, সেই অবসরে মধ্য রণাঙ্গনের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দুই মাসের চেষ্টা জার্মানীর দুর্দান্ত আক্রমণে যেন ৭ দিনের মধ্যে চুরমার হইয়া গেল। প্রবলতম ট্যাংক ও বিমান শক্তি লইয়া নাৎসী সৈন্যেরা সোভিয়েট সৈন্যদিগকে ঘেরাও করিতে ও সাঁড়াশীর চাপ দিতে লাগিল এবং মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সমগ্র রণাঙ্গনে জার্মানরা ট্যাংক দিয়া ব্যূহভেদ করিতে লাগিল। ট্যাংকের দ্বারা ছিদ্র সৃষ্টির পর জার্মান পদাতিকেরা উহার মধ্য দিয়া 'গলাইয়া পড়িতে' ও আঘাত করিতে লাগিল। ওরেল রণক্ষেত্রে ট্যাংক যুদ্ধের সর্ব বৃহৎ আক্রমণ অনুষ্ঠিত ইইল। জেরেমেঙ্কো, জেনারেল বোলডিন ও জেনারেল রকোসোভস্কির অধীন সোভিয়েট সৈন্যরা ব্রিয়ানস্ক, ভিয়েজমা ও জারেৎসেভোতে ক্রমাগত ঘেরাও বা বেষ্টিত হইতে লাগিল। এক সময় এমন আশংকা হইল যে, ব্রিয়ানস্ক ও ভিয়েজমার জার্মান বেষ্টনী হইতে সোভিয়েট সৈন্য ও সেনাপতিরা বোধহয় আর রেহাই পাইবেন না। এই সময় 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের' সামরিক সংবাদদাতা লিখিলেন যে, মস্কোর দিকে হিটলার কেবল সাঁড়াশীর চাপ দেন নাই, উহা বহুদিকে বহু বাহু প্রসারিত করিয়া যেন অক্টোপাসের মত রুশ সৈন্যদিগকে ঘিরিয়া ধরিতেছে। মস্কো হইতে ২৪০ মাইল দক্ষিণে ওরেল, ২৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ব্রিয়ানস্ক এবং ১৪০ মাইল পশ্চিমে ভিয়েজমা—এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি যেন চুরমার হইয়া গেল।

মস্কো রণাঙ্গনে ক্রমশ সংকট যেন চরম পর্যায়ের দিকে ঝুঁকিতে লাগিল এবং নাৎসী নেতারা জয় সুনিশ্চিত মনে করিলেন। ১৮ই অক্টোবর জার্মান সামরিক ইস্তাহারে দাবী করা হইল যে ব্রিয়ানস্ক ও ভিয়েজমার 'যমজ যুদ্ধের' সাফল্যমণ্ডিত পরিণতি হইয়াছে। মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যশক্তি, যাহা ৮টি আর্মি লইয়া গঠিত, সেই শক্তি নির্মূল হইয়াছে। অন্ততপক্ষে ৬,৪৮,১৯৬ জন রুশ সৈন্য বন্দী হইয়াছে। এই দাবী অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য ছিল না। তবে, নানা স্থানে টিমোশেঙ্কোর সৈন্যদল যেভাবে ঘেরাও হইয়া পড়িয়াছিল তাতে জার্মানরা এই পরিণতি অনিবার্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। ব্রিয়ানস্ক ও ভিয়েজমায় জার্মান সাঁড়াশীর চাপ হইতে প্রচুর সৈন্য বলি দিয়া রুশ সেনাপতিদিগকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল, ইহাতেও সন্দেহ নাই। তবে যে ৮টি আর্মি ধ্বংসের দাবী করা হইয়াছিল তাহাও সত্য নহে। কেননা ইহারাই পরে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছিল। এই রুশ সেনাপতিদের নাম—জেনারেল

লেলায়্‌শেঙ্কো, কুজনেৎসোভ, ভ্লাসোভ, রকোসোভস্কি, গবোরোভ, বোলডিন, বেলোভ এবং গলিকোভ।

তথাপি দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে মস্কো বেষ্টিত হইতে লাগিল এবং জার্মান যান্ত্রিক বাহিনী যেন বাঘের থাবার মতো সোভিয়েট রাজধানীকে বিদ্ধ করিতে চাহিল। উত্তর দিকে মস্কো হইতে লেনিনগ্রাদগামী রেলপথে ক্যালিনিন তারা দখল করিয়া লইল, জেভ হইতে জার্মানরা এক ধাক্কায় অগ্রসর হইয়া গেল ভলোকোলামস্ক শহরে—যাহা মস্কোর সঙ্গে রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত ছিল। পশ্চিম দিকে বিখ্যাত স্মলেনস্ক-মস্কো সড়ক ধরিয়া জার্মান যান্ত্রিক বাহিনী ভিয়েজমা ও
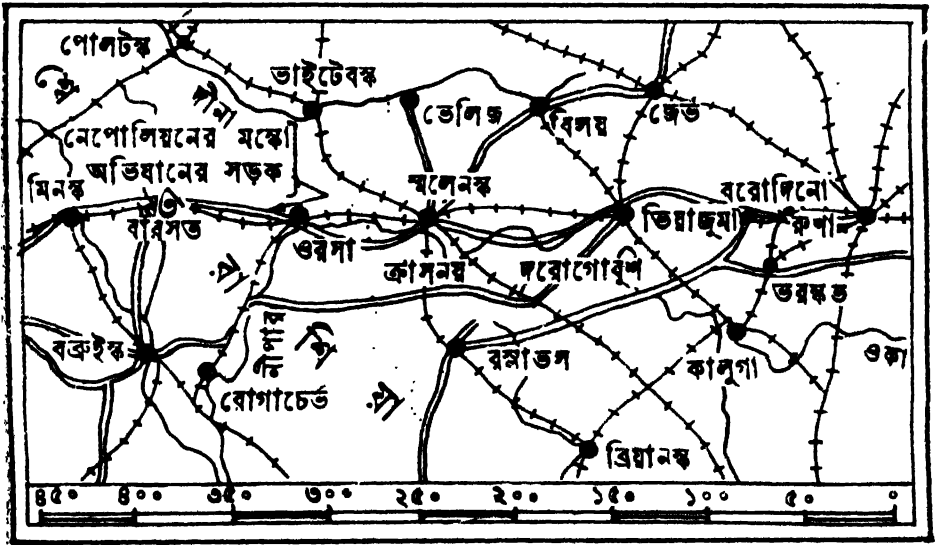
বরোডিনো হইয়া মোজাইস্কে পৌঁছিল—মস্কো হইতে মোজাইস্ক মাত্র ৬০। ৬৫ মাইল পশ্চিমে ছিল। আরও দক্ষিণে তারা ব্রিয়ানস্ক হইতে কালুগা এবং ম্যালো যারোশ্লাভেৎস শহর (মস্কো হইতে মাত্র ৭০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) দখল করিয়া লইল। ওরেল হইতে তারা টুলার দিকে অগ্রসর হইল। ওকা ও নারা নদী ধৌত মধ্য রণাঙ্গনের এই অংশটা রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত ছিল। দুর্ধর্ষ নাৎসী যোদ্ধারা সমস্ত রেলপথ, সড়ক ও নদীপথের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাজধানী মস্কোকে যেন গলা টিপিয়া মারিতে চাহিল! ৮ই অক্টোবর হইতে ২০শে অক্টোবর পর্যন্ত তাদের একটানা হিংস্র আক্রমণে মস্কোর চারিদিকে যেন একটা বেড়াজালের সৃষ্টি হইল। মোটামুটি স্মলেনস্ক কেন্দ্র হইতে এই আক্রমণ কয়েক দিনের মধ্যেই ১২০ হইতে ১৫০ মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গেল। মানচিত্রের উপর রেখা টানিলে উহা অর্ধবৃত্তাকারে ক্যালিনিনের দক্ষিণ হইতে ওরেলের উত্তর দিকে ঘুরিয়া যাইবে এবং সর্বাপেক্ষা অগ্রসরমান জার্মান আক্রমণের ফলক পাওয়া যাইবে মস্কোর পশ্চিমে ৬০ হইতে ৭০ মাইলের মধ্যে মোজাইস্ক ও ম্যালো যারোশ্লাভেৎস অঞ্চলে।

২০শে অক্টোবর রেডিও যোগে মস্কোর বিপদবার্তা ঘোষিত হইল। মার্শাল স্ট্যালিন মস্কোতে 'অবরোধের অবস্থা' ঘোষণা করিলেন। বৈদেশিক দূতাবাস ও গভর্নমেণ্ট ৫০০ মাইল দূরে ভল্গা নদী তীরস্থ কুইবিশেভে স্থানান্তরিত হইল। মঃ

ষ্ট্যালিন রাজধানীতেই রহিয়া গেলেন মস্কোর আত্মরক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য। ২৪শে অক্টোবর সমগ্র সমগ্র রুশ রণাঙ্গনকে মাত্র দুইটি কম্যাণ্ড বা সৈন্যাপত্যের মধ্যে ভাগ করা হইল। মস্কোসহ উত্তর রণক্ষেত্রের ভার পড়িল জেনারেল জুকোভের উপর এবং উক্রাইনের দক্ষিণ রণক্ষেত্র টিমোশেঙ্কোর উপর। মার্শাল ভরোশিলভ ও মার্শাল বুদেনীকে রণক্ষেত্র হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল 'পিছনে' নূতন সৈন্যদল গড়িবার ও ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। নিঃসন্দেহে রণক্ষেত্রের এই বিলিব্যবস্থা ও সেনাপতি পরিবর্তন ইত্যাদি সোভিয়েট রাশিয়ার নিদারুণ সংকটবার্তা বহিয়া আনিল।...

১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে মস্কো রণাঙ্গনের যুদ্ধ সম্পর্কে যুগান্তরের সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে ধারাবাহিক আলোচলনা করিয়াছিলাম, এখানে তার কিছু কিছু উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"...২৬শে আগস্ট তারিখে (১৮১২ খৃষ্টাব্দ) বরডিনো গ্রামে আবার নেপোলিয়নের সহিত রুশ সৈন্যদলের সংঘর্ষ হইল। এই যুদ্ধ হিংস্রতায় ও হত্যাকাণ্ডে ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। জারের ১ লক্ষ ১০ হাজার সৈন্য এবং নেপোলিয়নের ১ লক্ষ ৩০ হাজার সৈন্য প্রচণ্ড বিক্রমে লড়িতে লাগিল। সারা দিন ধরিয়া নেপোলিয়ন আঘাতের পর আঘাত হানিয়া রুশ সৈন্যদলকে মাত্র কয়েক শত গজ পিছু হটাইতে পারিলেন! ১ লক্ষ সৈন্য হতাহত হইল এবং রণাঙ্গনে যখন রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিল তখন নেপোলিয়ান ফিরিয়া গেলেন তাঁর শিবিরে এবং রুশ সৈন্যেরা সেই রাত্রি যুদ্ধক্ষেত্রেই কাটাইয়া দিলেন। উভয় পক্ষই এই ধারণা লইয়া ফিরিলেন যে, অপর পক্ষ একেবারে হারিয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে এত সৈন্য ও কামান ধরা পড়িবে কেন? বরডিনোতে যখন রাত্রি প্রভাত হইল, তখন রুশ সৈন্যাধ্যক্ষ যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে গিয়া দেখিলেন যে, তাহার অর্ধেক সৈন্যই সাবাড় হইয়াছে!—এবারও সেই বরডিনো গ্রামে হিংস্র যুদ্ধ শুরু হইয়াছে এবং বিজয়লক্ষ্মী সম্ভবতঃ নেপোলিয়নের মত হিটলারকেই অনুগ্রহ করিবেন। তবে, নেপোলিয়ন মস্কোতে পৌঁছিয়া যে দুর্দশায় পড়িয়াছিলেন, হিটলারের অদৃষ্টেও ইতিহাসের সেই বিড়ম্বনা আছে কিনা কে জানে?"

উহার তিনদিন পরে ২২শে অক্টোবর তারিখ মস্কোর আত্মরক্ষা সম্পর্কে 'যুগান্তরে' লিখিয়াছিলাম—

'গতবারের প্রবন্ধে (১৯শে অক্টোবর) আমরা বলিয়াছিলাম যে, জার্মান ট্যাঙ্ক বাহিনী বাঘের থাবার মত ক্যালিনিন, ওরেল ও ভিয়েজমা কেন্দ্রে যে সমস্ত ব্যূহ ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যদি সোভিয়েট বাহিনী পাল্টা আক্রমণ দ্বারা সেই সমস্ত ছিন্নসূত্র অনুরূপ শক্তির সঙ্গে জোড়া দিতে পারে, তাহা হইলে মস্কো সম্পর্কে আশা আছে। সংবাদে দেখা যাইতেছে যে, কালিনিন হইতে ওরেল পর্যন্ত দীর্ঘ অর্ধবৃত্তের আকারে রণক্ষেত্রের রেখা সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে সোভিয়েট সৈন্যরা পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে। রাশিয়ার এই রণকৌশলই জার্মানীকে দ্রুত জয়লাভে বাধা দিতেছে। কিন্তু এই পাল্টা আক্রমণ এখনও 'পাল্টা অভিযানে' পরিণত হয় নাই। অর্থাৎ সামরিক ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, 'কাউন্টার অ্যাটাক' এখন 'কাউন্টার ওফেনসিভ'-এ পরিণত হয় নাই। পাল্টা আক্রমণের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, স্থানীয় নির্দিষ্ট কেন্দ্রের ছিন্ন ব্যূহকে জোড়া দেওয়াই উহার উদ্দেশ্য। কিন্তু পাল্টা অভিযানের অর্থ প্রকাণ্ড রকমের

আক্রমণাত্মক সংগ্রাম। বর্তমান অবস্থায় সোভিয়েটের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। এক্ষণে রাশিয়ার একমাত্র লক্ষ্য কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা এবং সেই আত্মরক্ষার খাতিরে স্থানে স্থানে পাল্টা আক্রমণের অনুষ্ঠান।...খাস মস্কো শহর রণক্ষেত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে এবং মঃ স্ট্যালিন রাজধানীর সমগ্র শাসনভার সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। নগরীর পশ্চিম দ্বার রক্ষার ভার দেওয়া হইয়াছে জেনারেল
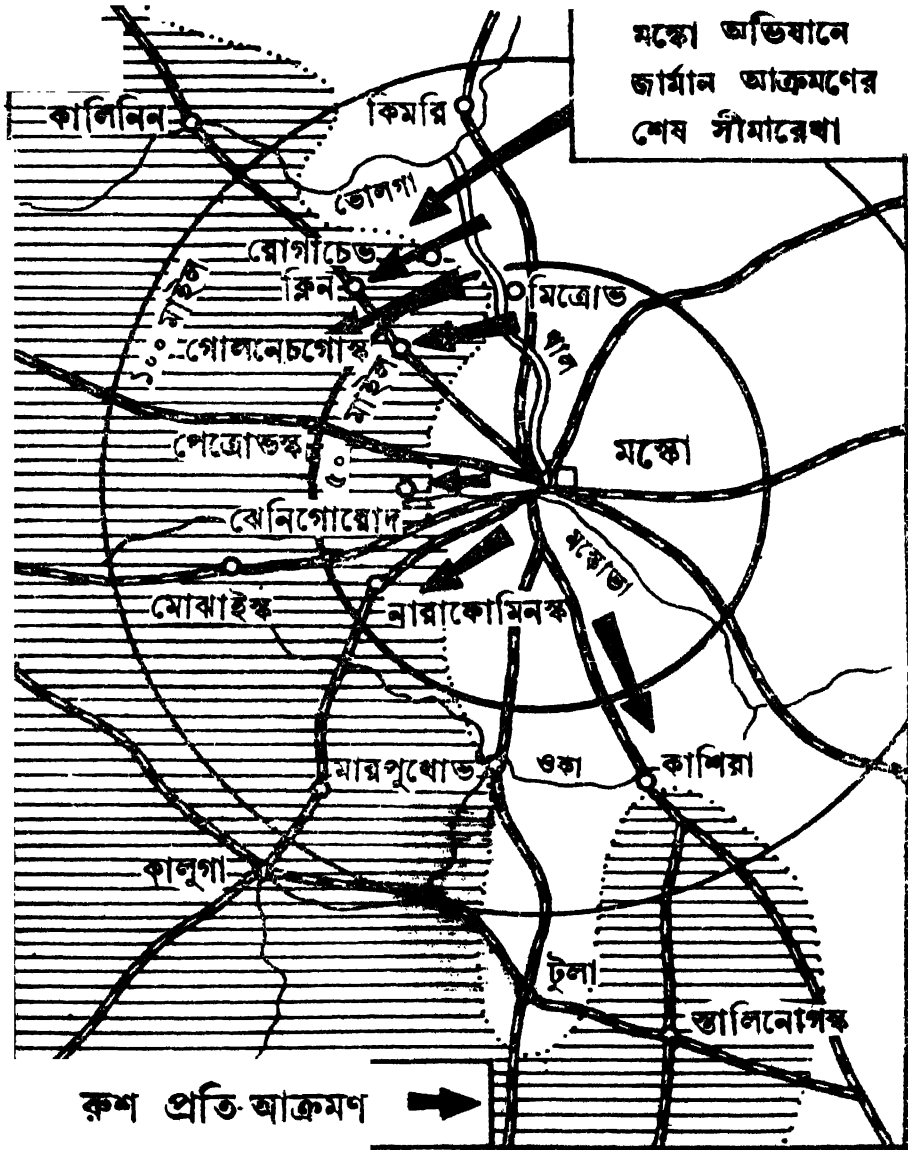
জুকোভের উপর, খাস মস্কো দুর্গের ভার পড়িয়াছে লেঃ জেনারেল আর্টিমিয়েভের উপর, আর মস্কোর আভ্যন্তরীণ রক্ষার ভার পাইয়াছেন জেনারেল সিনিলোভ। মস্কো শহরকে সামরিক আত্মরক্ষার দিক হইতে এভাবে বণ্টন করিয়া শৃঙ্খলা ও সংহতি

বজায় রাখিবার কঠোর বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। মস্কোর চারিদিকে ইস্পাত ও লোহের প্রাচীর তোলা হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি রাস্তা ও গৃহ আক্রমণকারী শত্রুকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। যে কোন পুরুষ বন্দুক ধরিতে ও গুলী ছুঁড়িতে জানে, তাহাকেই নগরী রক্ষার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যে কেহ এই নির্দেশ অমান্য করিবে, তাহাকেই দেশদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা হইবে। এই আদেশ কিরূপ কঠোর! ইহা সৈনিকের প্রতি নহে, সাধারণ নাগরিকের প্রতি হুকুম।···যে দৃঢ়তা এবং কঠিন ও কঠোর সংকল্পের দ্বারা মস্কো শহরকে রক্ষা করা হইতেছে, ইতিহাসে তাহা গৌরবমণ্ডিত হইয়া থাকিবে।'

৮ই অক্টোবর হইতে যে মারাত্মক নাৎসী আক্রমণের স্রোত তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত উদ্বেলিত হইতে লাগিল, ২০শে অক্টোবরের পর তাহা প্রতিহত হইল। লালফৌজ জার্মান ট্যাংক, বিমান, যান্ত্রিক ও পদাতিক সৈন্যের বিরুদ্ধে অনুরূপ শক্তি নিয়োগ করিল। এই সময় দলে দলে রুশ রিজার্ভ সৈন্যও যোগ দিল। এভাবে ২২শে অক্টোবর হইতে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত সাময়িকভাবে রণক্ষেত্রের মধ্যে একটা স্থিরতা আসিল। অথাৎ যে রুশ সৈন্যদল ক্রমাগত পশ্চাতে হটিতেছিল, তাহারা যেন দাঁড়াইবার কিছুটা সুযোগ পাইল এবং প্রথম আক্রমণের প্রচণ্ডতার পর জার্মান বাহিনীও যেন দম লইবার জন্য অপেক্ষা করিল। কিন্তু তাহাদের গতিবেগ শান্ত হইলেও রণক্ষেত্রের উপর চাপ অব্যাহত রহিল। বিশেষভাবে মস্কোর দুই পার্শ্বদেশ, উত্তর ও দক্ষিণে এই চাপ প্রবল ছিল। ইহার মধ্যে আবার দক্ষিণ পার্শ্বের চাপ যেন প্রবলতম ছিল। দক্ষিণ দিকের এই রণাঙ্গনে তিন সপ্তাহের মধ্যে জার্মানরা ওরেল হইতে টুলা পর্যন্ত অগ্রসর হইল (২৯শে অক্টোবর) টুলা দখলের জন্য জার্মানরা এক মাস ধরিয়া ঘোরতর সংগ্রাম চালাইল। শ্রমশিল্পের জন্য মস্কো ও টুলার এই অঞ্চল প্রসিদ্ধ ছিল। জার্মানদের এক বাহু যখন টুলা কাড়িয়া লইবার জন্য ব্যগ্র ছিল, আর এক বাহু তখন টুলার পশ্চিমে কালুগার দিক হইতে সেরপুখোভ দখলের চেষ্টা করিতেছিল। নারা ও ওকা নদীর সঙ্গম স্থলে সেরপুখোভ শহর। মস্কো হইতে মাত্র ৫০ মাইল দক্ষিণে ইহা টুলাগামী রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। নাৎসী বাহুর প্রসারিত ডগাগুলি মস্কোর দক্ষিণে ৫০ মাইলের মধ্যে পৌঁছিলেও উত্তর ও মধ্য দিকে বা সম্মুখ ভাগের রণক্ষেত্রে এই সময়ে জার্মানদের অগ্রগতি বন্ধ ছিল। এই সমস্ত অংশে সোভিয়েট আত্মরক্ষার সংগ্রাম জার্মান আক্রমণকে সমান শক্তি ও কৌশলের সঙ্গে প্রতিহত করিতেছিল। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন রহিল না। অক্টোবরের শেষভাগ হইতেই শরৎকালের আবহাওয়া যেন শীত ঋতুর আবির্ভাব ঘোষণা করিল। আবহাওয়ার এই কদর্যতার উপর জার্মানরা জোর দিতে লাগিল এবং প্রাকৃতিক বিঘ্নের জন্য তাহাদের আক্রমণাত্মক অভিযানে অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। ক্রমে নভেম্বরের অর্ধভাগ কাটিয়া গেল। বরফ ও তুষারপাত আরম্ভ হইল। হিটলারের পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নহে। কেননা ইহার পরেই রাশিয়ার চির কুখ্যাত শীত উহার সমস্ত বীভৎস শক্তি লইয়া পূর্ণতর রূপে দেখা দিবে। সুতরাং ডিসেম্বরের আগেই মস্কো জয় করিতে হইবে।

জার্মান বাহিনী ফুয়ারের এই সংকল্প কার্যে পরিণত করিবার জন্য আবার নবোদ্যমে মস্কো আক্রমণ শুরু করিল। ১৬ই নভেম্বর হইতে এই তৃতীয় পর্যায়ের

আক্রমণ আরম্ভ হইল ! 'ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে এই রণক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে' —হিটলার এক বক্তৃতায় এই তথ্য প্রকাশ করিলেন। সুতরাং এই তৃতীয় পর্যায়ের আক্রমণে নূতনতর পরিকল্পনা দেখা গেল। আগের মত সমগ্র মধ্য রণাঙ্গন ব্যাপিয়া আর বেড়াজালের সৃষ্টি নাই। এক্ষণে খাস মস্কো এলাকায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হইবে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের অর্ধবৃত্তের বেষ্টনী ক্রমশ মস্কো এলাকায় সঙ্কুচিত করিয়া আনা হইবে এবং দুই পার্শ্বদেশের আক্রমণকে আরও পূর্বদিকে আগাইয়া নিয়া মস্কোকে চারিদিক দিয়া আংটির মত ঘিরিয়া ধরা হইবে। মস্কোর গলদেশে যে ফাঁস আঁটা হইবে দুই পার্শ্বের দুই প্রান্ত হইতে উহা টানিয়া ধরিয়া রাজধানীকে শ্বাসরোধ করা তো হইবেই, অধিকন্তু লালফৌজও সেই বেষ্টনী হইতে আর ত্রাণ পাইবে না—রাশিয়ার সামরিক শক্তি ধ্বংস হইবে। নভেম্বরের আক্রমণে জার্মানীর এই দুর্দান্ত পরিকল্পনাই ফুটিয়া উঠিল।

সঙ্কীর্ণতর গণ্ডীতে আক্রমণের এই কৌশলের দ্বারা জার্মানী চাহিল সৈন্যশক্তি ও অস্ত্রশক্তিকে আরও নিবিড়ভাবে প্রয়োগ করিতে। ব্যাপকতর রণক্ষেত্রে আক্রমণের যে শক্তি ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা, অপেক্ষাকৃত অল্পপরিসর রণভূমিতে সেই শক্তিই অধিকতর কেন্দ্রীভূত এবং আঘাতগুলি ঘনীভূত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার ফলে দ্রুত ধাবমান যান্ত্রিক যুদ্ধের ইচ্ছামত মহড়া ও গতিবেগ থাকিবে না বটে, কিন্তু মস্কোর সুনির্দিষ্ট আত্মরক্ষার প্রাচীরের উপর আক্রমণগুলি সংহত ও নিবিড়তর হইবে। আর ইহার সঙ্গে চলিবে দুই পার্শ্বদেশের বেষ্টন নীতির কৌশল। এই উদ্দেশ্যে মোট ৫১ ডিভিসন জার্মান সৈন্য মস্কো এলাকায় নিয়োজিত হইল। ইহার মধ্যে ছিল ৩৩ ডিভিসন পদাতিক সৈন্য, ১৩টি ট্যাঙ্ক ডিভিসন এবং ৫টি মোটরারূঢ় বা মোটরায়িত ডিভিসন। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, এত ক্ষুদ্র পরিসর গণ্ডীতে এত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও সৈন্যের সমাবেশ আর কখনও দেখা যায় নাই। বরাবরের মত এবারও জার্মানীর প্রথম আঘাত অতি দুর্দান্ত এবং অতি মারাত্মক হইল। উত্তর দিকে যেখানে জার্মান সৈন্যেরা ছিল ক্যালিনিনের নিকট মস্কো হইতে শতাধিক মাইল দূরে, এবার তাহারাই এক ধাক্কায় অগ্রসর হইয়া আসিল মাত্র ৩৫ মাইলের মধ্যে। ২৪শে নভেম্বরের মধ্যে তাহারা ক্যালিনিনের দক্ষিণে ক্লিন ও সোলনেকনগোরস্ক পর্যন্ত অগ্রসর হইল। মস্কো হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে এই ৩৫ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়া জার্মান সৈন্যেরা মস্কো-ভল্গা খাল অতিক্রম ও ডিমিট্রোভের পূর্বদিক ভেদ করিয়া যাইতে চাহিল। মধ্যভাগে তাহারা মোজাইস্ক ম্যালোযারো-শ্লাভেৎস অঞ্চলে ক্ষুদ্র নারা নদী অতিক্রম করিয়া নারাফোমিনস্কে পৌঁছিল। মস্কোর উপকণ্ঠ হইতে এখানকার দূরত্বও ৩৬ মাইলের বেশী ছিল না এবং পশ্চিমের এই উপকণ্ঠ হইতে শত্রুপক্ষের কামান গর্জন নাগরিকদের কানে আসিতে লাগিল। মস্কোর দক্ষিণে টুলা যদিও জার্মান সৈন্যের দ্বারা অধিকৃত হইল না, তথাপি উত্তর-পূর্বাংশ হইতে উহার পার্শ্ব বেষ্টিত হইল এবং জার্মানরা এই শহরের পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া স্ট্যালিনো-গোরস্ক দখল করিল এবং উত্তরদিকে ওকা নদী অভিমুখে অগ্রসর হইল। এই অঞ্চলে এপিড্যান, স্কোপিন, ভেনেভ ইত্যাদি কয়েকটি ছোট ছোট শহরও জার্মানরা ছিনাইয়া লইল।

মস্কো আক্রমণে সৈন্য ও অস্ত্রসমাবেশের কৌশল লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে,

উহার দুই পার্শ্বদেশেই সর্বাধিক ট্যাঙ্কের শক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছিল। উত্তর পার্শ্বে জেনারেল হোয়েপনার ও জেনারেল হথ্ ৭টি ট্যাঙ্ক ডিভিসন এবং দক্ষিণ পার্শ্বে জেনারেল গুডেরিয়ান ৪টি ট্যাঙ্ক ডিভিসন লইয়া আক্রমণ চালাইল। এই দুই পার্শ্বের ট্যাঙ্ক বাহিনী যখন ব্যূহভেদ করিবে তখন পদাতিকেরা মস্কোর সম্মুখভাগে অগ্রসর হইবে শহর দখলের জন্য। এখানেও জেনারেল রেইনহার্ডের ট্যাঙ্কবাহিনী পদাতিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিল। মধ্যভাগেই সর্বাপেক্ষা বেশী পদাতিক সৈন্য আক্রমণ চালাইল। উত্তরদিকে জার্মান সৈন্যেরা যেমন মস্কো-ভল্গা অতিক্রম করিয়া এবং ডিমিট্রোভ ভেদ করিয়া মস্কোর পূর্বদিকে পৌঁছিতে চাহিয়াছিল, দক্ষিণ দিকেও তেমনই টুলা হইতে রিয়াজন, ক্যাসিরা ও কলোমনায় পৌঁছিয়া তারা মস্কোকে পূর্বদিক হইতে ঘিরিতে চাহিয়াছিল। জার্মানরা এই সমস্ত লক্ষ্যস্থলের ১০ হইতে ৫০ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু লক্ষ্যভেদ আর করিতে পারিল না। মস্কোর দূরত্বও ৩৫ মাইলের বেশী অতিক্রান্ত হইল না। ২৫শে নভেম্বর হইতে ৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে আক্রমণের শেষ তরঙ্গ যেন ঊর্ধ্বতন শীর্ষে উঠিয়া নীচে নামিয়া গেল।

অথচ এই সময়ের মধ্যে মস্কোর ভাগ্য লইয়া পৃথিবীব্যাপী উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। এক সময় মনে হইয়াছিল জার্মানরা বোধহয় মস্কো জয় করিয়া রুশ সমরশক্তিকে চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু নাৎসী সমরশক্তি কুমীরের মত মস্কোকে গিলিয়া ফেলিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া থাকিলেও উহার দুই পার্শ্বদেশের চোয়ালের উপর রুশ আত্মরক্ষার আঘাত প্রচণ্ড হওয়াতেই সেই মুখব্যাদান বন্ধ হইয়া গেল। উত্তর ও দক্ষিণের এই পার্শ্বদেশের সংগ্রামই মস্কো যুদ্ধের পক্ষে অতি গুরুতর হইয়াছিল। ৬ই ডিসেম্বর হইতে লালফৌজের পাল্টা আক্রমণ শুরু হইল। ৮টি রুশ আর্মি (উহার মধ্যে একটি অশ্বারোহী বাহিনী ছিল) এই পাল্টা আক্রমণ চালাইল। উত্তর-দিকে ক্লিন ও ইস্ট্রার মধ্যে যে মারাত্মক জার্মান ট্যাঙ্ক বাহিনী ছিল, জেনারেল কুজনেৎসোভ ও জেনারেল রকোসোভস্কি তাঁদেরকে পরাজিত করিল এবং জেনারেল গুডেরিয়ানের ট্যাঙ্ক বাহিনী জেনারেল বোলদিনের সৈন্যদল ও জেনারেল বেলোভের অশ্বারোহী বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হইল। ক্রমে জার্মান অগ্রগতির সীমা মস্কো হইতে পশ্চিম দিকে অপসারিত হইতে লাগিল। ক্লিন ও ক্যালিনিন জার্মানদের হাত হইতে পুনরায় উদ্ধার করা হইল, মধ্যভাগেও জার্মানরা পশ্চাতে হটিল এবং দক্ষিণদিকে টুলা অঞ্চল হইতেও জার্মানরা অপসৃত হইল। ফলে, খাস মস্কো এলাকা বিপদমুক্ত হইল এবং ১৯৪১-৪২ সালের শীতকালীন যুদ্ধ শুরু হইল।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মান সমগ্র পোল্যান্ড অভিযানে যত সৈন্য ও অস্ত্র (৪৫ ডিভিসন পদাতিক সৈন্য, ১৪ শত ভারী কামান, ৩,৩৫০টি ট্যাঙ্ক ইত্যাদি) প্রয়োগ করিয়াছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী তারা খাটাইয়াছিল রাশিয়ার এই একটিমাত্র রণাঙ্গনে বা মস্কোতে। তথাপি মস্কো জয় হইল না। কেহ কেহ[১] মনে করেন যে, জার্মানরা চূড়ান্ত আক্রমণের ভুল পথ বাছিয়া লইয়াছিল। তাদের উচিত ছিল মস্কোর দক্ষিণে নারা নদী অঞ্চলের আত্মরক্ষার ব্যূহ ভাঙিবার চেষ্টা করা—নারা ফোমিনাস্ক ও সেরপুকোভের মধ্যবর্তী অংশটি বিদ্ধ করিতে পারিলে পদোলস্ক হইয়া জার্মানরা

১। The Russian Campaigns of 1941-43—by W. E. D. Allen and Paul Muratoff. P. 49

মস্কোর দক্ষিণ শহরতলীতে পেঁছিতে পারিত। সেই একই সময়ে তারা সেরপুকোভ হইয়া ওকা নদী ধরিয়া পূর্বদিকে কলোমনার শিল্প শহর আক্রমণ করিতে পারিত। সেখানে মস্কো হইতে দক্ষিণ-পূর্বগামী দুইটি প্রধান রেলপথ ছিন্ন করা যাইত। কিন্তু ইহার বদলে জার্মানরা ওকা নদীর দক্ষিণের এক বিস্তৃত অংশে যেন পাখার মত ছড়াইয়া পড়িল—টুলা এলাকার উত্তর-পূর্ব, পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বদিকে। এই স্থানে তারা কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন শহর দখল করিল বটে, কিন্তু ওকা নদীর দক্ষিণে যে গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ রহিয়াছে এবং যাহা মস্কো হইতে কলোমনা, রিয়াজান ও ভরোনেজ হইয়া বিখ্যাত রস্টোভ বন্দরে পেঁছিয়াছে, সেই পথের ত্রিসীমানার মধ্যেও জার্মানরা অগ্রসর হইল না। জার্মান হাইকম্যাণ্ডের মস্তিষ্ক যেন কেবলমাত্র সাঁড়াশীর চাপের আক্রমণ কৌশলেই আচ্ছন্ন ছিল। ফলে উত্তরে ও দক্ষিণে কতকগুলি সাঁড়াশীর চাপ ঘটিল বটে, কিন্তু উত্তরদিকে তারা মস্কো ও ভল্গা নদী এলাকার অতি দুর্গম স্থানে গিয়া হাজির হইল। এই অঞ্চলে ভল্গা নদীর অসংখ্য ছোট ছোট শাখা নদী রহিয়াছে, যেগুলি নিবিড় জঙ্গল, জলাভূমি, হ্রদ ও বিশ্রী রকমের নরম মাটির মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এদিকে কোন ভাল সড়ক ছিল না, সেতুও সামান্য। আর দক্ষিণ দিকে তারা ওকা নদীর সীমাহীন মাঠের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। এদিকে 'সেনাপতি শীত'* আবির্ভূত হইলেন জার্মানদের দুর্ভাগ্যের দূতরূপে। কাদা, বরফ, তুষার ইত্যাদিতে আক্রমণকারী জার্মান সৈন্যেরা ক্রমে নিস্তেজ ও ক্লান্ত হইয়া পড়িল। রাশিয়ার দুই প্রধান প্রাণকেন্দ্র লেনিনগ্রাদ ও মস্কো জার্মানরা জয় করিতে পারিল না এবং মস্কোর সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী মেরু সমুদ্রের বন্দর, ভল্গা নদী তীরবর্তী শহর, সাইবেরিয়া এবং ককেশাস—এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পথের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রহিল। অধিকৃত দেশগুলিতে পোড়ামাটির নীতি কঠোরভাবে অনুসৃত হইল এবং সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী রুশ গেরিলা দল স্থানে স্থানে জার্মানদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। পশ্চিম রাশিয়াতে সোভিয়েটের লোকবল প্রচুর ক্ষয় পাইল সন্দেহ নাই এবং ১৯৩৯ সালের উৎপাদনের তুলনায় সোভিয়েটের শ্রমশিল্প শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী নষ্ট হইল বটে, তথাপি ১৯৪১ সালের জার্মান গ্রীষ্মাভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইল না। লেনিনগ্রাদ ও মস্কো অনতিদূর ইতিহাসের লাল নিশানারূপে অপেক্ষা করিতে লাগিল।**

*...'সেনাপতি শীত' কথাটা রুশপক্ষের মতে পশ্চিমীদের প্রচারকার্য মাত্র। আসলে সোভিয়েটের দুর্জয় প্রতিরোধের জনাই মস্কো আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছিল।—লেখক

** লেখকের প্রণীত 'রুশ-জার্মান সংগ্রাম' (১৯৪৮) থেকে।

একাদশ অধ্যায়

হিটলারী আক্রমণের পটভূমিকায় মস্কো

পাল্টা আক্রমণে নাৎসী বাহিনীর পরাজয়

নাৎসী জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে এমন অভাবনীয় আক্রমণের আরম্ভে রাজধানী মস্কো শহরে কিন্তু তেমন কোন অস্বাভাবিক উত্তেজনা ছিল না। বরং প্রত্যক্ষদর্শীগণ বলিয়াছেন যে, মহানগরীর জীবনযাত্রা মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল। হোটেল, রেস্তোরাঁয় ও রাস্তায় এবং দোকানগুলিতে যেমন তেমনি থিয়েটারগুলিতেও লোকজনের ভীড় লাগিয়াই ছিল এবং খাদ্যশস্য, জামাকাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যের অভাব ছিল না। কিন্তু জুলাই মাস থেকে যুদ্ধকালীন কঠোরতা শুরু হইল এবং খাদ্যদ্রব্যের জন্য তিন রকমের (প্রয়োজনভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ) রেশন কার্ড প্রবর্তিত হইল। প্রথম প্রথম মস্কোর শহরবাসীরা যুদ্ধ নিয়া তেমন মাথা ঘামাইত না, কিন্তু ক্রমেই হিটলারী আক্রমণের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্য ও স্নায়বিক উত্তেজনা দেখা দিতে লাগিল। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং বৈদেশিক চর ও গোয়েন্দাচক্রের বিরুদ্ধে স্ট্যালিন যে কঠোর সতর্কবাণী জারী করিয়াছিলেন, তার ফলে কিছুকালের জন্য সর্বত্র স্পাই বাতিক দেখা দিল। যেখানে সেখানে ছত্রী সৈন্য অবতরণের গুজবও রটিয়াছিল। অবশ্য এটা ছিল নাগরিকদের অতিরিক্ত সতর্কতাবোধের পরিচায়ক।

জার্মান বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় মস্কো থেকে শিশুদিগকে এবং সেই সঙ্গে অনেক স্ত্রীলোককে বাইরে অপসারিত করা হইল। ২১শে জুলাই রাত্রে প্রথম মস্কো নগরীতে জার্মান বোমারু হানা দিল এবং সেই বোমারুগুলি প্রচণ্ড বিমান বিধ্বংসী কামানের সম্মুখীন হইল। মস্কোর চারিদিকে বিমান হানা প্রতিরোধের জন্য তিনটি বিমান-বিধ্বংসী চক্র গড়িয়া উঠিয়াছিল।...

রুশ-জার্মান যুদ্ধের সময় হিটলারের প্রচার সচিব গোয়েবলস যেমন পৃথিবীর সর্বত্র নাম কিনিয়াছিলেন, তেমনি সোভিয়েট প্রচারবিদ লজোভস্কির নামও সর্বত্র শুনা গিয়াছিল। কিন্তু সেই সময় যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বা ফলাফল সম্পর্কে গোয়েবলস বা লজোভস্কি কাহারও প্রচারিত বিবৃতিই তেমন বিশ্বাসজনক বলিয়া বাইরের জগতে গৃহীত হইত না—তথাপি এগুলি মিত্র বা শত্রুপক্ষের সমর্থকদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনার খোরাখ জোগাইত। লজোভস্কি জাতিতে ইহুদী ছিলেন এবং একজন পুরাতন বলশেভিক ছিলেন। তিনি জেনেভায় ও প্যারিসে অনেক বছর কাটাইয়াছিলেন এবং লেনিনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন। ফরাসী ভাষার উপর তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। বিপ্লবের পর সোভিয়েট সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরে তিনি যোগ দিয়াছিলেন এবং অন্যতম উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও প্রচারকর্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি উদারতাবাদী, সৎ ও কর্মক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। ১৯৪৩ সালে 'ইহুদী ফ্যাসিস্ট বিরোধী' কমিটির তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। কিন্তু পরিণামে এই পদের জন্যই তাঁর পতন

ঘটিল। ১৯৪৯ সালে এই কমিটির অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যদের সঙ্গে তাঁরও প্রাণদণ্ড হইল এবং এভাবে একজন সম্পূর্ণ নির্দোষ বৃদ্ধ বলশেভিককে গুলী করিয়া মারা হইল।[১]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হিটলারের বিখ্যাত প্রচার বিশেষজ্ঞ গোয়েবলসও ১৯৪৫ সালের ১লা মে বার্লিনের পতনের মুখে ভূগর্ভের বাঙ্কারে সপরিবারে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

হিটলারী আক্রমণের প্রচণ্ডতা ও নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়া সোভিয়েট জনগণ এবং সামরিক ও অ-সামরিক নেতৃবৃন্দ ক্রমেই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ করিতে-ছিলেন। সৈন্যবাহিনীর পলিটিসিয়ান বা রাজনৈতিক কমিশারদের চেয়ে সামরিক বৃত্তিধারী সৈনিকরা (প্রোফেসন্যাল) এবং গৃহযুদ্ধের আমলের চেয়ে আধুনিক কালের সেনাপতিরাই যে অধিকতর দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য এই তথ্যও ক্রমে হাতেকলমে প্রমাণিত হইতে লাগিল। স্ট্যালিনের ১৯৩৭-৩৮ সালের ভয়াবহ 'পাজ' এড়াইয়া এমন কয়েকজন সৈনিক এই যুদ্ধে যোগ দিলেন, যাঁদের সামরিক প্রতিভা সোভিয়েট ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্রের দীপ্তি লইয়া দেখা দিল। এই সমস্ত জেনারেল ও মার্শালকে একমাত্র নেপোলিয়নের ইতিহাস বিখ্যাত Grande Armee-র সঙ্গেই তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। বিমানবাহিনীর সংস্কারে জেনারেল নোভিকোভ গোলন্দাজী শক্তির ব্যবহারে জেনারেল ভরোনোভ যেমন কৃতিত্ব দেখাইলেন, তেমনি বিভিন্ন রণাঙ্গনে জার্মানদের প্রতিরোধ করিতে গিয়া অতি দ্রুত খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করিতে লাগিলেন জেনারেল জুকোভ, কোনেভ, রকোসোভস্কি, ভাতুতিন, চেরনিয়াখোভস্কি, রোটমিসট্রোভ, বোলডিন ম্যালিনোভস্কি, ফেদায়ুনইনস্কি, গভোরোভ, মেরেৎস্কোভ, ঘেরেমেংকো, বেলোভ, লেলুশেংকো, বাগরামিয়ান এবং আরও বহু দক্ষ সেনাপতি। আগেই বলা হইয়াছে স্ট্যালিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং ৭ই আগস্ট তিনি সুপ্রীম কমাণ্ডার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন—(রুশ ভাষায় হাইকম্যাণ্ডের সদর দপ্তরের নাম ছিল স্টাভ্‌কা।)

কমিউনিস্ট পার্টি ও গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে লালফৌজে পুনরায় রাজনৈতিক কমিশারের পদগুলি জোরদার করা হইল। তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য ও অফিসারদের আচরণের জন্য দায়ী থাকিতেন। এ ছাড়া কুখ্যাত রাজনৈতিক গোয়েন্দা পুলিশ সংস্থা 'এন কে ভি ডি'-এর কার্যকলাপ তো ছিলই। তবে, যুদ্ধ বাধিবার পর এদের হস্তক্ষেপ অনেক কমিয়া গেল এবং ১৯৪১ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎকালের কঠোর অভিজ্ঞতা থেকে স্ট্যালিনও উপলব্ধি করিলেন যে, আর্মির ব্যাপারে আর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বাড়াবাড়ি ভালো নয়। সমগ্র আবহাওয়ার মধ্যে যেন সেই '১৮১২' সালের (নেপোলিয়নের আক্রমণের সময়) মনোভাব ফিরিয়া আসিল এবং ১৯৪১ সালের অক্টোবর-নভেম্বরের মস্কো যুদ্ধের সংকটে একমাত্র স্ট্যালিনই 'বিপন্ন পিতৃভূমির' ঐক্যরক্ষাকারী যোগসূত্ররূপে প্রতিভাত হইলেন। এ ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না।[২]

দক্ষিণের পূর্ব উক্রাইনে জার্মানদের অগ্রগতি এবং উত্তরে লেনিনগ্রাদের উপকণ্ঠে পৌঁছিবার পর জার্মানরা শেষ মরণ কামড় দিতে চাহিল মস্কোর দিকে। ৩০শে

১। Russia At War—Alexander Werth. P. 180.

২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক। পৃঃ ২২১

সেপ্টেম্বর (জার্মানদের মতে ২রা অক্টোবর) মস্কোর দিকে 'চূড়ান্ত' হিটলারী অভিযান শুরু হইল। জার্মানদের সামরিক ভাষায় এই আক্রমণের সাংকেতিক নাম ছিল 'টাইফুন' বা 'তুফান' এবং তুফানের প্রচণ্ডতা নিয়াই এই আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই অভিযানকে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়—৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের প্রায় শেষ পর্যন্ত প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায় ১৭ই নভেম্বর থেকে ৫ই ডিসেম্বর এবং তারপর তৃতীয় পর্যায় ৬ই ডিসেম্বর থেকে রাশিয়ার পাল্টা আক্রমণাত্মক অভিযান একেবারে ১৯৪২ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত।

অক্টোবর মাসে মস্কো যুদ্ধের যে সংকট দেখা দিল, সেই সংকটের কথা রেড স্টার ও প্রাভদা (১২ই অক্টোবর) কর্তৃক অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ঘোষিত হইল। সরকারী দপ্তর ও বিদেশীরা মস্কো ত্যাগ করিলেন এবং পূর্বদিকে কুইবিশেভ ও অন্যান্য শহরে গিয়া আশ্রয় নিলেন। তারপর সুপ্রীম কমাণ্ডের দপ্তর এবং স্ট্যালিন প্রভৃতি মস্কোতেই রহিয়া গেলেন। প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলিও মস্কো থেকেই প্রকাশিত হইতে লাগিল।

কিন্তু যে সমস্ত তরুণ বয়স্ক ইংরাজ ও মার্কিন ডিপ্লোমাট ও সাংবাদিক এই সময় মস্কোতে ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশেরই ধারণা ছিল যে, রাশিয়ার সামনে বিপর্যয় আসন্ন। একজন মার্কিন মহিলা সাংবাদিক তো বলিয়াই ফেলিলেন যে, তিনি অপেক্ষায় আছেন তাঁর হোটেলের কক্ষ থেকে রেড স্কোয়ারে জার্মান সৈন্যদের মার্চ দেখার জন্য। তবে, সাধারণভাবে অন্যান্য সাংবাদিকদের মধ্যে এমন মনোভাব ছিল না, রাশিয়ার প্রতি তাঁদের সপ্রশংস মনোভাবই ছিল। গোড়ার দিকে এই সমস্ত বুর্জোয়া জার্নালিস্টের সংখ্যা সামান্যই ছিল, তবে, যুদ্ধের গতিপথে তাঁদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। এঁরা ছাড়া অবশ্য আর ছিলেন 'কোমিণ্টান' সাংবাদিকগণ—বিভিন্ন কমিউনিস্ট পত্রিকার সংবাদদাতা। সোভিয়েট-জার্মান চুক্তির সময় এঁদের অবস্থা বেশ কাহিল ছিল। কিন্তু এখন এঁরা যেন অপরের সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিতেছিলেন। কিন্তু এঁরা ছাড়া এই সময় মস্কোতে বিদেশের যে সমস্ত নামকরা কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন, তাঁদের টিকিটিও দেখা যাইতেছিল না—

'Nor were the communist leaders from foreign countries—Pieck, Thorez, Ulbrict, Gottwald, Anna Pauker, Dimitrov—to be seen at all in 1941. It was scarecely known even whether they were stil in Moseow.'

মিঃ আলেকজান্দার ভার্থ তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে এই মন্তব্য করিয়াছেন এবং সাধারণভাবে রুশ জনগণ সম্পর্কেও তিনি বলিয়াছেন যে, মস্কোর সঙ্কট যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল মস্কোর বাসিন্দাদের মধ্যে ততই ত্রাস ও স্নায়বিক দুর্বলতা বাড়িতে লাগিল। ১৫ই অক্টোবর তারিখ এমন একটা গুজব রটিল যে, জার্মান সৈন্যেরা মস্কো শহরের উপকণ্ঠে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। ফলে, ১৬ই অক্টোবর এমন ত্রাসের সৃষ্টি হইল যে, হাজার হাজার নর-নারী মস্কো থেকে পলায়ন করিতে শুরু করিল। এজন্য ১৬ই অক্টোবর তারিখটি মস্কো যুদ্ধের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য অক্টোবরের শেষে সরকারীভাবেই ২০ লক্ষ লোক কিংবা মস্কো-বাসিন্দাদের প্রায় অর্ধেক ও কলকারখানার একটা বড় অংশ মস্কো থেকে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এটা ছিল মস্কো

থেকে 'পলায়নের মহাকাব্যের' মত—অবশ্যই বিয়োগান্ত মহাকাব্য—যেমন ১৯৪০ সালের মে মাসে প্যারিস থেকে অজস্র নর-নারীর পলায়নের মর্মান্তিক দৃশ্যের উদ্ঘাটন হইয়াছিল। কিন্তু মস্কোর সেই সংকট মোচনে সহায়তা করিয়াছিল মধ্য এশিয়া ও সোভিয়েট সাইবেরিয়া থেকে আগত মজুত সৈন্যবাহিনী। এটা সম্ভব হইয়াছিল ১৯৩৯ সালে জাপানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত রুশ-জাপান অনাক্রমণ চুক্তির জন্য। স্ট্যালিনের দূরদর্শিতার এটা প্রমাণ।

অক্টোবরে ও নভেম্বরে মস্কো যুদ্ধ চরম পর্যায়ে উঠিয়াছিল, সন্দেহ নাই। জার্মান সৈন্যেরা মস্কো শহরের নিকটতম বিন্দু পশ্চিম দিকে ১৫ মাইলের মধ্যে ইস্ত্রা শহরে পেঁৗছিয়াছিল। এটাই ছিল চরম অগ্রগতি। কিন্তু জুকোভ ও অন্যান্য সেনাপতিদের নেতৃত্বে সোভিয়েট বাহিনী, নাগরিকবৃন্দ, কলকারখানার শ্রমিক এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের আপ্রাণ প্রতিরোধের ফলে 'হিটলারী টাইফুন' বা মস্কো আক্রমণের প্রচণ্ডতা ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িল। এই ব্যর্থতার জন্য ট্যাংকবিশারদ জেনারেল গুডেরিয়ান ও অন্যান্য নাৎসীরা তাঁদের স্মৃতিকথায় মস্কোর খারাপ আবহাওয়া, অর্থাৎ জল কাদা ঠাণ্ডা ইত্যাদির উপর দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আবহাওয়ার কদর্যতার কুফল উভয় পক্ষের উপরেই সমান ছিল—যদিও সোভিয়েট কমাণ্ড আগে থেকে এজন্য জার্মানদের চেয়ে বেশী সতর্ক ছিলেন।…

মস্কো যুদ্ধের সেই চরম দুর্দিনে স্ট্যালিনের দুটি বক্তৃতা রুশ জনগণ ও সৈন্যবাহিনীর নিকট নূতন উদ্দীপনায় স্মরণীয় ছিল। কারণ, এই দুটি বক্তৃতাতেই স্ট্যালিন জাতীয়তাবাদ, জাতীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় গর্ববোধের উপর এমন জোর দিলেন যে, স্ট্যালিনের মত গোঁড়া কমিউনিস্ট প্রধানের কাছে যেন উহা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ছিল। ৬ই নভেম্বর রাত্রে যখন জার্মানরা মস্কো থেকে মাত্র ৪০ মাইল দূরে ছিল এবং গোটা নগরী অবরুদ্ধ দুর্গের আবহাওয়ায় ছিল, তখন সোভিয়েট বিপ্লবের ২৪তম বার্ষিকী উপলক্ষে স্টালিন মায়াকোভস্কি 'পাতাল রেল স্টেশনের' ভূগর্ভস্থ প্রশস্ত কক্ষে যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে একদিকে যেমন যুদ্ধের মসীবর্ণ চিত্র উদ্ঘাটিত হইল, অন্যদিকে তেমনি স্ট্যালিনের সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসও ফুটিয়া উঠিল। তিনি বহু প্রকার তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন কেন নাৎসী আক্রমণকারীরা রাশিয়ার এতদূর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, কিন্তু পরিণামে জার্মানদের পরাজয় অনিবার্য। কেননা তারা শত্রুর দেশে সরবরাহ ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনেক দূরে যুদ্ধ করিতেছে। রাশিয়ানদের পক্ষে রহিয়াছে নৈতিক শক্তি ও ন্যায় যুদ্ধের (just war) প্রেরণা এবং অনবরত স্বদেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে সাহায্য ও সরবরাহ। কিন্তু জার্মানরা এই সমস্ত থেকে বঞ্চিত। লেনিনগ্রাদ ও মস্কোর আত্মরক্ষাতেই প্রমাণ…

"…that in the fire of the Great Patriotic war new soldiers, officers. airmen, gunners, tank-crews, infantrymen, sailors, are being forged—men who will tomorrow become the terror of the German Army. (stormy applause).'

অর্থাৎ এই মহান স্বদেশাত্মক যুদ্ধের আগুন থেকে যে নতুন সৈন্যদল দেখা দিতেছে, আগামী দিনে তারাই হইবে জার্মান বাহিনীর ত্রাসস্বরূপ। (শ্রোতৃবৃন্দের উল্লাসধ্বনি)

কিন্তু স্ট্যালিন তাঁর এই ঐতিহাসিক বক্তৃতায় 'জাতীয় গর্বের'ও উদ্বোধন করিলেন।

তিনি ঘোষণা করিলেন যে, নাৎসী জার্মানরা ন্যাশন্যালিস্টও নয়, সোসিয়েলিস্টও নয়, তারা হইতেছে নিকৃষ্টতম ইম্পিরিয়েলিস্ট বা সাম্রাজ্যবাদী এবং এরাই শ্লাভ জনগণকে সমূলে ধ্বংস করিতে চাহিতেছে—

'And it is these people without honour or conscience, these people with the morality of animals, who have the the effrontery to call for the extermination of the great Russian nation—the nation of Plekhanov and Lenin, of Belinsky and Chernyshevsky, of Pushkin and Tolstoy, of Gorki and Chekhov, of Glinka and Tchaikovsky. of Sechenov and Pavlov, of Suvorov and Kutuzov ! The German invaders want a war of extermination against the peoples of the Soviet Union. Very well then ! If they want a war of extermination they shall have it ! (Prolonged, stormy applause) Our task now··· will be to destroy every German, to the very last man, who had come to occupy our country. No mercy for the German invaders.! (stormy applause) [১]

এই বক্তৃতায় কেবল তিনি জাতীয়তার বোধন ও শত্রুকে নির্মমভাবে নিপাতের জন্যই বজ্রকণ্ঠের আহ্বান জানাইলেন না, জার্মানীর নিশ্চিত পরাজয়ের অন্যতম কারণ-স্বরূপ বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে সদ্য অনুষ্ঠিত ত্রিশক্তির মহামৈত্রীর কথাও উল্লেখ করিলেন এবং তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—এটা হইতেছে ইঞ্জিনের বা যন্ত্রপাতির যুদ্ধ। কিন্তু বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন একত্রে জার্মানীর চেয়ে তিনগুণ বেশী ইঞ্জিন উৎপাদন করিতে পারিবে। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার এই যে, এই পর্যন্ত স্ট্যালিন তাঁর বক্তৃতায় নাৎসী সমর্থক ও জার্মান জনগণের মধ্যে যে বৈষম্যের রেখা টানিয়া আসিতেছিলেন, আলোচ্য বক্তৃতার পর থেকে সেই সীমারেখা আর রহিল না।

পরদিন সকালে ৭ই নভেম্বর, যখন দূর থেকে শত্রুর কামান গর্জন এবং আকাশে পাহারারত সোভিয়েত জঙ্গী বিমানের শব্দ শুনা যাইতেছিল, তখন সেই ঠাণ্ডার মধ্যে রেড স্কোয়ারে সমবেত সৈন্যদের সম্মুখে স্ট্যালিন যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে তিনি ১৯১৮ সালের প্রথম বিপ্লব বার্ষিকী ও বৈদেশিক শক্তিগুলির হস্তক্ষেপের কথা স্মরণ করিলেন, যখন তিন-চতুর্থাংশ রাশিয়া শত্রুর কবলে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই ঘোরতর দুর্দিনের তুলনায় আজিকার রাশিয়ার অবস্থা বহুদিক দিয়া উন্নত—এই তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া স্ট্যালিন ঘোষণা করিলেন যে, গত চার মাসে জার্মানী হতাহত ও বন্দী নিয়া মোট সাড়ে চার মিলিয়ন (৪৫ লক্ষ) লোক হারাইয়াছে।* অতএব ৬ মাস থেকে এক বছরের মধ্যে জার্মান সমরযন্ত্র ভাঙিয়া পড়িবেই। কিন্তু স্ট্যালিন স্মরণ করাইয়া দিলেন এটা কেবল স্বদেশ রক্ষার যুদ্ধ নয়, দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ সমগ্র ইউরোপীয় জনগণের মুক্তিযুদ্ধ। তারা তাকাইয়া আছে লালফৌজের দিকে—

'Be worthy of this great mission ! The war you are waging is

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ২৩৬—২৩৭

* জার্মানদের এই ক্ষয়ক্ষতির বিবরণী নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জিত ছিল।—লেখক

a war of liberation, a just war. May you be inspired in this war by the heroic figures of our great ancestors, Alexander Nevsky. Dimitri Donskoi, Minin and Pozharsky. Alexander, Suvorov, Michael Kutuzov ! May you be blest by great Lenin's victorious banner ! Death to the German invaders ! Long live our glorious country, its freedom and independence ! Under the banner of Lenin—onward to victory !'

অর্থাৎ স্ট্যালিনের পর পর দুই দিনের বক্তৃতায় দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐতিহ্যের এবং গৌরবের সর্বজনীন আবেদন অত্যন্ত গভীরভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্চারিত হইল। পুশকিন, টলস্টয়, চেকভ, ৎচেইকোভস্কি প্রভৃতি রুশ সাহিত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির দিকপালগণকে লেনিনের নামের সঙ্গে স্মরণ করা হইল। যে মধ্যযুগের নামে কমিউনিস্টরা সাধারণত নাসাকুঞ্চন করিয়া থাকেন, সেই যুগের 'মহান পূর্বপুরুষগণকে' ও জাতীয় বীরগণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হইল। কারা এই জাতীয় বীর ? আলেকজান্দার নেভস্কি, যিনি ১২৪২ খৃস্টাব্দে টিউটোনিক নাইটদের পরাজিত করিয়া ছিলেন। ডিমিট্রি ডনস্কোয় যিনি ১৩৮০ খৃস্টাব্দে তাতারদের কাবু করিয়াছিলেন, মিনিন ও পোঝারস্কি যাঁরা সপ্তদশ শতাব্দীতে পোলিশ আক্রমণকারীদের হটাইয়াছিলেন এবং সুভোরভ ও কুটোজোভ যাঁরা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

সম্ভবত সেই সময় এই জাতীয় গৌরবের প্রেরণা ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ, তখন বাল্টিক রাজ্যগুলি হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, গোটা উক্রাইন শত্রুর কবলে, একমাত্র পুরাতন রাশিয়া কিংবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় সেই 'পুরাতন মস্কোবা' মাত্র বাকী রহিয়াছে।[১]

স্ট্যালিনের এই উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দুটি সারা রাশিয়াতে, এমন কি অধিকৃত অঞ্চলের জনগণের মধ্যে পর্যন্ত বিমানযোগে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং এর ফলে সোভিয়েত নরনারী ও সৈন্যদের মধ্যে সেই গভীর সঙ্কটের দিনে প্রচণ্ড আশা ও উৎসাহ জাগাইয়াছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণেও যখন জার্মান বাহিনী মস্কো জয় করিতে ব্যর্থ হইল, তখন সেনাপতিরা সব দোষ চাপাইতে চাহিলেন রাশিয়ার 'কদর্য আবহাওয়া' বা 'বীভৎস শীতের' উপর। কারণ, নভেম্বর পার হইয়া ডিসেম্বরের সূচনা হইল। ক্রমে জল কাদা তুষার বরফ ও তীব্র ঠাণ্ডার মুখে পড়িয়া জেনারেল গুডেরিয়ান, জেনারেল ব্লুমেণ্ট্রিট্ প্রভৃতি 'বাঘা বাঘা' নাৎসী সেনাপতিরা যেন আর্তনাদ করিতে লাগিলেন— 'সমস্ত সমরযন্ত্র যেন অচল হইয়া গেল, পদাতিক বাহিনীর লড়াইয়ের দম ফুরাইয়া গেল, আর পেট্রোলের সাপ্লাই নিঃশেষ হইয়া গেল, মেসিনগানের গুলী বা ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামানের গোলাও আর ছোঁড়া গেল না। সৈন্যরা তুষার দংশনে কাবু হইয়া পড়িল। আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

জেনারেল গুডেরিয়ান ছিলেন মধ্য রণাঙ্গনের অন্যতম প্রধান ট্যাঙ্কবিশারদ জার্মান নায়ক। তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি মস্কো অভিযান সম্পর্কে নাৎসী ব্যর্থতার জন্য মূলত

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা ২৩৭-২৩৯

রাশিয়ার 'ভয়ঙ্কর শীতের' উপর দায়িত্ব চাপাইতে চাহিয়াছেন। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন—যার মর্মার্থ এই :

'সেই বিরাট রাশিয়ার প্রান্তর যার কোন অন্ত নাই, সেই প্রান্তর একমাত্র বরফের দ্বারা আচ্ছন্ন, সেই সীমাহীন বরফপ্রান্তরের উপর দিয়া যখন ঠাণ্ডা ঝড় বহিয়া যাইত, এবং তার গতিপথে সমস্ত কিছু কবর চাপা দিয়া চলিয়া যাইত—কিংবা সেই অন্তহীন তেপান্তরের মাঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ী চালাইয়াও যখন কোন আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না, তখন আমাদের অর্ধভুক্ত এবং উপযুক্ত পরিচ্ছদহীন সৈন্যদলের দুর্দশা যিনি দেখেন নাই, কিংবা ইহারই পাশাপাশি চমৎকার শীতবস্ত্রে সজ্জিত নতুন সাইবেরিয়ান সৈন্যদলের আক্রমণ প্রস্তুতি যিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই, তিনি এই সমস্ত ঘটনাবলীর সত্যকার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।'

অবশ্য গুডেরিয়ানের মতে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহেই (৬-৭ অক্টোবর) তিনি নাকি বরফ পড়িতে দেখিয়াছেন এবং সেবার নাকি অকালেই রাশিয়ায় শীত দেখা দিল —৩রা নভেম্বর হিমাঙ্কের নীচে তাপ নামিয়া গেল এবং সৈন্যেরা তুষার দংশনে পীড়িত হইল।...[১]

রাশিয়ার শীত দুর্দান্ত তাতে সন্দেহ নাই এবং সেবার ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখ মস্কোর পারদযন্ত্র নামিয়া গেল হিমাঙ্কের নীচে—৩১ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড! কিন্তু জার্মান সেনাপতিরা এমন আজগুবি তথ্যও প্রচার করিলেন যে, সেবার রাশিয়ার শীত নেপোলিয়ানের আমলকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল—পারদযন্ত্র নামিয়া গেল মাইনাস ৬৮ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডে যেটা প্রাকৃতিক কারণেই অসম্ভব ছিল। একথা সত্য যে, ঠাণ্ডা নিদারুণ ছিল। কিন্তু সেই ঠাণ্ডায় জার্মান ও রাশিয়ান উভয় পক্ষেরই সমান দুর্ভোগের মধ্যে পড়িবার কথা। কিন্তু লালফৌজের সেনানীমণ্ডলী আগে থেকেই সতর্ক ছিলেন, সুতরাং উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু হিটলারী সৈন্যদের জন্য সেটা ছিল না। কেননা তাঁরা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, শীতের আগেই মস্কো দখল ও লালফৌজ সাবাড় হইয়া যাইবে!

এই ঠাণ্ডার উপর জার্মান হাইকমাণ্ড অতিরিক্ত জোর দিয়াছেন এবং ইউরোপীয় লেখকরাও অতিরিক্ত প্রচার করিয়াছেন এবং বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, রাশিয়ার সৈন্য দলের অপরিসীম বীরত্ব ও অতুলনীয় প্রতিরোধ শক্তির জন্য হিটলারের পরাজয় ঘটে নাই, ঘটিয়াছে ঠাণ্ডার জন্য—এই প্রোপাগাণ্ডার জবাবে সুবিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক উইলিয়াম এল সাইরারের একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য উল্লেখ করা যাইতে পারে—

'......terrible as the Russian winter was and granted that the Soviet troops were naturally better prepared for it than the German, the main factor is what is now to be set down was not the weather but the fierce fighting of the Red Army troops and their indomitable will not to give up'—[২]

অর্থাৎ আসলে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডার জন্য জার্মান আক্রমণ ব্যর্থ হয় নাই, হইয়াছে

১। উইলিয়াম সাইরার প্রণীত—দি রাইজ এ্যাণ্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ, পৃষ্ঠা ১০২৯-৩০
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃঃ ১০৩০—১০৩২

লালফৌজের প্রচণ্ড লড়াইয়ের শক্তি এবং হার স্বীকার না করার অদম্য ইচ্ছাশক্তির জন্য।…

কিন্তু হিটলার মনে করিলেন মস্কো হাতের মুঠায় আসিয়া গিয়াছে, আর একটা ধাক্কা দিলেই ক্রেমলিনের চূড়া ভাঙিয়া পড়িবে। সুতরাং ১লা ডিসেম্বর তারিখ, ১৯৪১, রাশিয়ার হৃদ্‌পিণ্ডের দিকে চূড়ান্ত হিটলারী আঘাত শুরু হইল, জেনারেল হেরম্যান হোথ্ এবং জেনারেল গুডেরিয়ান—এই তিন ট্যাংকবাহিনীর যুগপৎ আক্রমণ ঘটিল। একটি রণাঙ্গনে এত ট্যাঙ্কের একসঙ্গে আক্রমণ আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ২রা ডিসেম্বর মস্কো মহানগরীর উপকণ্ঠে খিমকিতে কিছু পর্যবেক্ষণকারী জার্মান সৈন্য (২৫৮ নং পদাতিক ডিভিসন) ঢুকিয়াছিল বটে, কিন্তু পরদিন সকালেই তারা রুশদের হাতে বিতাড়িত হইল। হিটলারী বাহিনীর মস্কোর ক্রেমলিনের চূড়া পরিদর্শন ওখানেই শেষ। কারণ, ৫ই ডিসেম্বর তারিখেই মস্কোর ২০০ মাইল অর্ধবৃত্তাকার রণাঙ্গন ব্যাপিয়া গোটা জার্মান বাহিনীর আক্রমণ স্তব্ধ হইয়া গেল এবং জার্মান সেনানীরা বুঝিলেন যে, আর আশা নাই।

পরদিন ৬ই ডিসেম্বর তারিখটি ঐতিহাসিক। কারণ, ঐদিন জেনারেল জর্জি জুকোভ, যিনি ৬ সপ্তাহ আগে জেনারেল টিমোশেঙ্কোর বদলে মধ্য রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব নিয়াছিলেন—তিনি প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত হানিলেন। মার্কিন ঐতিহাসিক উইলিয়াম শাইরার বলিতেছেন—

'On the 200-mile front before Moscow he unleashed seven armies and two cavalry corps—100 divisions in all—consisting of troops that were either fresh or battle-tried and were equipped and trained to fight in the bitter cold and the deep snow. The blow which this relatively unknown general now delivered with such a formidable force of infantry, artillery, tanks, cavalry and planes which Hitler had not faintly suspected cxisted, was so sudden and so shattering that the German Army and the Third Reich never fully recovered from it.'—[১]

'মস্কোর সম্মুখবর্তী ২০০ মাইলব্যাপী রণাঙ্গনে তিনি ৭টি আর্মি এবং ২টি অশ্বারোহী কোর—মোট ১০০ ডিভিসন সৈন্য লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং এই সৈন্যদল ছিল একেবারে আনকোরা কিংবা যুদ্ধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এরা তীব্র ঠাণ্ডা এবং এক কোমর বরফের মধ্যে লড়াই চালাইবার জন্য পরিপূর্ণভাবে সজ্জিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিল। অপেক্ষাকৃত একজন অপরিচিত সেনাপতি এই বিশাল সৈন্যশক্তি—পদাতিক, গোলন্দাজ, ট্যাঙ্ক, অশ্বারোহী ও প্লেন—যে সামরিক শক্তির অস্তিত্ব আছে বলিয়া হিটলার দূরতম কল্পনায়ও সন্দেহ করেন নাই, সেই শক্তি নিয়া যে প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন এবং সেই আঘাত এত আকস্মিক ও এত বিপর্যয়কর হইল যে জার্মান আর্মি বা তৃতীয় রাইখ আর কোনদিন সেই আঘাতের প্রচণ্ডতা সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই।'

সুতরাং মস্কো দখল করিতে গিয়া হিটলার যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তা'

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ১০৩৩।

ব্যাহত হইয়া গেল এবং উইলিয়াম শাইরার বলিতেছেন যে, যে হিটলারী বাহিনী গত দুই বছর একটানা সামরিক জয় অর্জন করিয়া আসিতেছিল, তারা এই প্রথম শ্রেষ্ঠতর শক্তির পাল্লায় পড়িয়া পিছু হটিতে লাগিল। এমন কি জেনারেল হ্যালডারও স্বীকার করিলেন—

'The myth of the invincibility of the German Army was broken.'

—'জার্মান সেনাবাহিনী অপরাজেয়, এই উপকথারও শেষ হইল।'

কিন্তু এই ঐতিহাসিক পাল্টা আক্রমণে লালফৌজের নূতনতর প্রচণ্ড শক্তির সমাবেশ সত্ত্বেও একথা জানা দরকার যে, খাস মস্কো এলাকায় সৈন্যসংখ্যা, গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্কের শক্তিতে তখনও জার্মানরা তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিল। বিশেষত মোটর ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ পরিবহণ শক্তিতে রাশিয়া অত্যন্ত দুর্বল ছিল। কিন্তু তবু লালফৌজের অদম্য আক্রমণে নাৎসী সৈন্যেরা কাবু হইয়া পড়িল। তারা জানুয়ারীর (১৯৪২) প্রথম ভাগের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণের পার্শ্বদেশে ২০০ মাইল পশ্চাতে হটিতে বাধ্য হইল। কিন্তু কেন্দ্রস্থলে—ঠিক মস্কোর সম্মুখভাগে রিজেভ-ঘাটস্ক-ভিয়াজমা—এই রেখা ধরিয়া তারা অটল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাদের এই দৃঢ়তা কম প্রশংসনীয় ছিল না।[১]

* * *

মস্কো অভিযানে জার্মানদের ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল প্রচণ্ড রকমের। সোভিয়েট সরকারী ইতিহাসে প্রকাশ যে, ১৬ই নভেম্বর থেকে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মস্কোর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ের জার্মান আক্রমণে ৫৫ হাজার জার্মান সৈন্য নিহত, ১ লক্ষ সৈন্য আহত বা তুষারদষ্ট হইল এবং ৭৭৭ ট্যাঙ্ক, ২৯৭ কামান ও মর্টার, ২৪৪ মেসিনগান, ৫০০'এর বেশী টমিগান খোয়া গেল। আর প্রথম পাঁচ মাসের যুদ্ধে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার জার্মান সৈন্য নষ্ট হইল—এই সংখ্যাটি জার্মান সরকারী সংখ্যার চেয়েও কিছু কম। কারণ, জার্মানদের মতে ১৯৪১ সালের ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব রণাঙ্গনে ৭,৭৫,০৭৮ জার্মান সৈন্য নষ্ট হইয়াছে (এই সংখ্যার মধ্যে পীড়িতদের ধরা হয় নাই।)—বিশেষভাবে ক্ষতি হইয়াছিল মস্কোর যুদ্ধে। অর্থাৎ পূর্ব রণাঙ্গনের সমগ্র জার্মান বাহিনীর (মোট সংখ্যা ৩২ লক্ষ) শতকরা ২৪·২২ ভাগ সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল।

মস্কো অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ পর্যন্ত জার্মান বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহত সম্পর্কে সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল হ্যালডার তাঁর ডায়েরীতে যে সংখ্যা তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেটা কম উল্লেখযোগ্য নয়:

মোট—	৩১শে জুলাই	পর্যন্ত—	২,১৩,০০০	সৈন্য
”	৩রা আগস্ট	”	২,৪২,০০০	”
”	৩০শে সেপ্টেম্বর	”	৫,৫১,০০০	”
”	৬ই নভেম্বর	”	৬,৮৬,০০০	”
”	১৩ই নভেম্বর	”	৭,০০,০০০	”
”	২৩শে নভেম্বর	”	৭,৩৪,০০০	”
”	২৬শে নভেম্বর	”	৭,৪৩,০০০	”

১। আলেকজান্দার ভার্থ—রাশিয়া অ্যাট ওয়ার—পৃঃ ২৫৩-৫৪।

এই মোট হতাহতের মধ্যে নিহত মোট ২ লক্ষ এবং এর মধ্যে অফিসার নিহত ৮ হাজার। তালিকাটি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে প্রত্যেক বারেই হতাহতের সংখ্যা প্রচুরভাবে বর্ধমান!

একমাত্র মস্কো যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করিলেই দেখা যাইবে যে, ১৯৪০ সালের গোটা পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধেও জার্মানীর ক্ষতির পরিমাণ ছিল সামান্য—মোট ১ লক্ষ ৫৬ হাজার হতাহত এবং এর মধ্যে নিহতের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০ হাজার।[১]

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ—২৪৯।

দ্বাদশ অধ্যায়

জার্মান সৈনাপত্যে ওলট-পালট

মস্কো যুদ্ধের পরাজয়ে প্রতিক্রিয়া

১৯৪১ সালে মস্কোর মধ্য রণাঙ্গনে ঠাণ্ডাটা একটু আগেই পড়িয়াছিল। আগস্ট-সেপ্টেম্বরের বৃষ্টি ও শীতের আবির্ভাব, আর নভেম্বর মাসে ঠাণ্ডার তীব্রতা বাড়িল বটে, কিন্তু দক্ষিণ দিকে উক্রাইন অঞ্চল অপেক্ষাকৃত গরম ছিল। তথাপি বৃষ্টি ও কাদায় রাস্তাঘাট সমান কদর্য ছিল। যদিও নাৎসী বাহিনী উক্রাইনের কিয়েভ অঞ্চলে প্রকাণ্ড জয়ের পর ক্রমশ পূর্বদিকে আগাইয়া যাইতেছিল, তবু অবস্থা খুব ভালো ছিল না। ২১শে নভেম্বর জেনারেল ফন ক্লাইস্টের ট্যাঙ্কবাহিনী ডন নদীর মুখে রস্টোভ বন্দরে প্রবেশ করিল এবং ডঃ গোয়েবলসের প্রচার দপ্তর খুব ঘটা করিয়া ঘোষণা করিল যে, ককেশাস অঞ্চলের প্রবেশ দ্বার খুলিয়া গিয়াছে! কিন্তু বেশীদিন এই দুয়ার খোলা থাকিল না এবং ক্লাইস্ট ও রুণ্ডস্টেড উভয় সেনাপতিই বুঝিতে পারিলেন যে, রস্টোভ আর হাতে রাখা যাইবে না। পাঁচদিন পর রুশরা পুনরায় ডন নদীর এই বিখ্যাত বন্দর কাড়িয়া লইল। উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে আক্রান্ত হইয়া জার্মানরা ৫০ মাইল পিছনে মিয়াম নদীর দিকে হটিয়া যাইতে লাগিল। ক্লিস্ট এবং রুণ্ডস্টেড ভাবিয়াছিলেন সেখানেই তাঁরা শীতকালীন ছাউনি গড়িয়া তুলিবেন। কিন্তু জার্মানীর দুর্ভাগ্যের প্রথম সূচনা হইল রস্টোভে—জেনারেল গুডেরিয়ান পরে সেকথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন—'ওটাই ছিল দেওয়ালের লিখন'।

রস্টোভ থেকে প্রত্যাবর্তনের ফলে ওই রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি এবং জার্মান আর্মি'র একজন প্রবীণ অফিসার ফিল্ড মার্শাল ফন রুণ্ডস্টেড কার্যত পদচ্যুত হইলেন। পরবর্তীকালে মিত্রপক্ষের জেরার জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন—

'যখন মিয়াম নদীর দিকে পিছু হটছিলাম, তখন হঠাৎ ফুরারের কাছ থেকে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির—'যেখানে আছ, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, আর পিছু হটো না'। আমিও সঙ্গে সঙ্গে পালটা তার করে জবাব দিলুম—এখানে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা পাগলামি মাত্র। প্রথমত সৈন্যদের পক্ষে এভাবে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। এবং দ্বিতীয়ত যদি তারা পিছু না হটে, তবে, তারা ধ্বংস হবে। অতএব আমি আবার বলছি—এই আদেশ প্রত্যাহার করা হোক কিংবা আমার বদলে আর কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হোক। সেই রাত্রেই ফুরারের কাছ থেকে জবাব এলো—আমি তোমার অনুরোধই পালন করছি। দয়া করে তোমার সৈনাপত্য ছেড়ে দাও!'

অতএব ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডস্টেড রণক্ষেত্রের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া সোজা নিজের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল হ্যালডার ৩০শে নভেম্বর তাঁর ডায়েরীতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, হিটলার ফিল্ড মার্শালকে এভাবে পদচ্যুত করায় সেনানী মহলে

নিদারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ফুয়ার ব্রাউসিৎসকে (পূর্ব রণাঙ্গনের সমগ্র জার্মান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি) ডাকিয়া গালিগালাজ করিলেন এবং অপমানিত করিলেন। ১লা ডিসেম্বর রুন্ডস্টেডের জায়গায় ষষ্ঠ আর্মির কমান্ডার জেনারেল রাইখনাউকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু তাঁর অবস্থাও সুবিধার ছিল না। তিনিও হিটলারকে টেলিফোন করিলেন এবং সেই রাত্রে মিয়াম নদীর লাইনে পিছু হটিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আশ্চর্য এই যে, হিটলার সেই অনুমতি দিলেন। অর্থাৎ রুন্ডস্টেডের বক্তব্যই বজায় রহিল, মাঝখান থেকে ফিল্ড মার্শালের চাকুরিটা গেল।

হ্যালডারের ডায়েরীতে আরও প্রকাশ যে, প্রধান সর্বাধ্যক্ষ ব্রাউসিৎসের শরীর ক্রমাগত মানসিক চাপের ফলে খারাপ যাইতেছে, উদ্বেগের কারণ ঘটাইতেছে এবং ১০ই নভেম্বর তিনি গুরুতর হৃদরোগে (হার্ট এ্যাটাক) আক্রান্ত হইয়াছিলেন।[১]

এদিকে মস্কো যুদ্ধের ব্যর্থতার জন্য হিটলারী শিবিরে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কারণ, একদিকে আমেরিকা কর্তৃক জার্মানী বা ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং অন্যদিকে মস্কো রণাঙ্গনে হিমাঙ্কের নীচে ৪০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রড ঠাণ্ডা পড়ার সংবাদে বার্লিনের অধিবাসীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা ছড়াইয়া পড়িল। ঐতিহাসিক আর্ভিড ফ্রেডবোর্গ সেই সময় বার্লিনে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, 'নৈরাশ্যবাদীরা নেপোলিয়নের পরিণামের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন' 'আর গণকদের বরাৎ খুলিয়া গেল, ভাগ্যগণনার ধুম পড়িয়া গেল!'[২]

লালফৌজের হাতে প্রচণ্ড মার খাইয়া 'অপরাজেয়' জার্মান বাহিনীকে মস্কোর দ্বারদেশ থেকে ফিরিয়া আসিতে হইল। হিটলার ক্রুদ্ধ হইলেন। জার্মান সৈন্যেরা বরফে, কাদায়, ঠাণ্ডায় বিপন্ন হইয়া এবং সোভিয়েট বাহিনীর পালটা আঘাতে জর্জরিত হইয়া যতই পিছনে হটিতে লাগিল, ততই বিভিন্ন রণক্ষেত্রে জার্মান সেনাপতিদের মাথাও মাটিতে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। দক্ষিণ রণক্ষেত্রের অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল রুন্ডস্টেডের পদচ্যুতির কথা আগেই বলা হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসে মধ্য রণাঙ্গনে যখন বিপর্যয় ঘটিতে লাগিল, তখন অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল ফন বোকের সেই আগেকার 'পেটের ব্যথা' আবার মোচড় দিয়া উঠিল। ১৮ই ডিসেম্বর তিনি অপসারিত হইলেন এবং তাঁর জায়গায় স্থান নিলেন ফিল্ড মার্শাল ফন ক্লুজ, কিন্তু তাঁর চতুর্থ আর্মিকেও মস্কোর উপকণ্ঠ থেকে 'চিরদিনের জন্য' পিছু হটিতে হইল। এমন কি, 'যান্ত্রিক যুদ্ধের এত বড় পাণ্ডা' জবরদস্ত জেনারেল গুডেরিয়ান পর্যন্ত রেহাই পাইলেন না। তিনি হাইকমাণ্ডের বিনা অনুমতিতে কেন তাঁর সৈন্যদলকে পিছু হটিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন, এজন্য তাঁকে অপমানিত এবং পদচ্যুত করা হইল খৃষ্টমাস পর্বের দিন। আর একজন প্রতিভাদীপ্ত ট্যাংক কমাণ্ডার জেনারেল হোয়েপনার, যাঁর সৈন্যেরা উত্তর দিকে মস্কোর নিকটবর্তী হওয়ার পর পিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাঁকেও হিটলার একই কারণে হঠাৎ পদচ্যুত করিলেন। কেবল পদচ্যুতি নয়, তাঁর র‍্যাঙ্ক বা পদমর্যাদা কাড়িয়া নেওয়া হইল এবং তাঁকে ইউনিফর্ম পরিতে পর্যন্ত নিষেধ করা হইল! আর একজন নামকরা সেনাপতি জেনারেল কাউণ্ট হ্যান্স ফন স্পোনেক, যিনি আগের বছর

১। The Rise and Fall of the Third Reich—Shirer. P. 1028-29.

২। The Second World War—J. F. C. Fuller, P. 175.

হল্যাণ্ডের যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য পুরস্কৃত হইয়াছিলেন তাঁর অদৃষ্টে জুটিল মৃত্যুদণ্ড! ২৯শে ডিসেম্বর তারিখ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রুশরা সমুদ্রপথে তাঁর পিছনে সৈন্যদল অবতরণ করাইবার ফলে স্পোনেকের অধীন এক ডিভিসন সৈন্যের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িল। অতএব তিনি পশ্চাদপসরণ করিলেন। কিন্তু এই সংবাদে হিটলার মহা খাপ্পা হইলেন, বিনা অনুমতিতে পিছু হটার জন্য তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনা করা হইল। কেবল তাই নয় তাঁর পদমর্যাদা সোজাসুজি কাড়িয়া নেওয়া হইল, তাঁকে বন্দী করা হইল। তাঁকে 'কোর্ট মার্শেল' বা সামরিক আদালতে বিচার হইল এবং হিটলারের আদেশে তাঁকে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হইল।[১]

জার্মান সামরিক হাইকমাণ্ড ও.কে. ডব্লু.-এর প্রধান ফিল্ড মার্শাল কাইটেল, যাঁকে মার্কিন ঐতিহাসিক হিটলারের 'পোষা কুকুরের মত বশংবদ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই কাইটেল পর্যন্ত বিচলিত বোধ করিতে লাগিলেন। কারণ, মস্কো রণাঙ্গনে বিপর্যস্ত জার্মান বাহিনীর পশ্চাদপসরণ না করিয়া উপায় ছিল না। অথচ হিটলার কিছুতেই সেনাপতিদিগকে অনুমতি দিবেন না। তবু কাইটেল সাহসে ভর করিয়া হিটলারের নিকট গিয়াছিলেন এই বিষয়ে কিছু ওকালতি করিতে। কিন্তু সুপ্রীম কমাণ্ডার হিটলারের কাছে তিনি এমন ধমক খাইলেন যে, হাইকমাণ্ডের চীফ মহোদয় একেবারে মুষড়ে পড়িলেন। হাইকমাণ্ডের আর-একজন ধুরন্ধর জেনারেল জড্‌ল কাইটেলের কক্ষে গিয়া দেখিলেন যে, কাইটেল তাঁর ডেস্কে বসিয়া পদত্যাগ পত্র লিখিতেছেন এবং পাশেই একটা রিভলবার পড়িয়া তাছে। জড্‌ল নিঃশব্দে রিভলবারটি তুলিয়া নিলেন এবং হিটলারী অপমান হজম করিবার জন্য তাঁকে বুঝাইতে লাগিলেন। অবশ্য কাইটেলকে বুঝাইতে খুব বেশী বেগ পাইতে হইল না। তিনি আর পদত্যাগ করিলেন না এবং আশ্চর্য ধৈর্যের সঙ্গে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই অপমান হজম করিয়া গেলেন।

এদিকে পূর্ব রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল ব্রাউসিৎস আবার হৃদরোগে আক্রান্ত হইলেন এবং ৬ই ডিসেম্বর যখন জেনারেল জুকোভের পাল্টা আক্রমণ শুরু হইল, তখন তিনি পরদিন ৭ই ডিসেম্বর পদত্যাগ করিতে চাহিলেন। ১৭ই ডিসেম্বর তিনি পুনরায় হিটলারকে অনুরোধ করিলেন তাঁকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য! দুইদিন পর হিটলার নিয়মমাফিক তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এত চট করিয়া তিনি যখন খোদ প্রধান সেনাপতির পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিলেন তখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে প্রধান সেনাপতির প্রতি তাঁর মনোভাব কিরূপ ছিল? তিন মাস পর তিনি গোয়েবলসের নিকট বলিয়াছিলেন—

—'A vain, cowardly wretch…and a nincompoop.'

'একটা দাম্ভিক, কাপুরুষ, হতভাগা এবং নীরেট মস্তিষ্ক'—প্রধান সেনাপতি সম্পর্কে হিটলারের এই ছিল উক্তি এবং তিনি তাঁর মোসাহেবদের কাছে অবজ্ঞার সুরে

১। দি রাইজ এন্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ—১০৩৪ পৃষ্ঠা। গ্রন্থকার মিঃ শাইরার লিখিয়াছেন যে, জেনারেল স্পোনেকের প্রাণদণ্ড তখন কার্যকর করা হয় নাই। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে হিটলার-হত্যার ষড়যন্ত্রের ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে গুলি করিয়া মারা হয়। যদিও ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না।

বলিয়াছিলেন—'গ্রাউসিৎস ?—ওটা কোন লড়াকুই নয়, একেবারেই অপদার্থ'। যদি আরও কিছুকাল ও তার পদে থাকতো, তবে, একেবারে বিপর্যয় ঘটে যেতো।'

অতএব অসম্মানের মধ্যেই প্রধান সেনাপতি পূর্ব রণাঙ্গন থেকে বিদায় নিলেন।

এভাবে পূর্ব রণাঙ্গনের সর্বাধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল ব্রাউসিৎসহ বড় বড় সেনাপতিদের মুণ্ডু গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। জার্মান জেনারেল স্টাফের সঙ্গে হিটলারের খুব একটা সম্ভাব ছিল না। তিনি এই সমস্ত 'প্রোফেশন্যাল' বা বৃত্তিধারী সেনাপতিদিগকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন না। বরং তাঁর নিজের 'সামরিক প্রতিভার' উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং যদিও প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি সামান্য একজন কর্পোরাল মাত্র ছিলেন তবু তাঁর ধারণা ছিল যে, রণবিদ্যায় ও রণনীতিতে তিনি একজন বিশারদ এবং ১৯৩৯ সাল থেকে সমস্ত যুদ্ধে অতি সহজে বিদ্যুৎগতি জয়লাভ করিয়া এই ধারণা তাঁর আরও দৃঢ় হইল। কেবল তাঁর নিজের নয়। তাঁর সৈন্য ও সেনাপতিদের অধিকাংশের মধ্যেই এমন বিশ্বাস ছড়াইয়া পড়িল যে, হিটলার যেন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এবং রণবিদ্যায় তাঁর 'স্বাভাবিক পটুত্ব' রহিয়াছে। সুতরাং তাঁর আজ্ঞাবহ হওয়া কিংবা তাঁর আদেশ মানিয়া লইতে কোন দ্বিধা ছিল না। বিশেষত সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় জার্মান জেনারেল স্টাফ ও হিটলারের মধ্যে বিশেষ কোন মতবৈষম্য ছিল না। কিন্তু যুদ্ধে পরাজয়ের পর জার্মান সেনাপতিরা আত্মদোষ স্খালনের জন্য সমস্ত দায়দায়িত্ব একমাত্র হিটলারের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চাহিয়াছেন এবং নিজেদের স্মৃতিকথায় বা ডায়েরীতে অনেক অতিরঞ্জন করিয়াছেন—অন্তত সোভিয়েট ঐতিহাসিকদের এই অভিমত। পশ্চিম জার্মানীর লেখকরাও তাঁদের প্রুশিয়ান অভিজাত সমরনেতাদের মান রক্ষার উদ্দেশ্যে একমাত্র হিটলারকেই দায়ী করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সেটা বাস্তবতাসম্মত নয়। আসলে জার্মান হাইকমাণ্ড এবং হিটলার উভয় পক্ষই সোভিয়েট ইউনিয়নের সামরিক শক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন এবং নাৎসী মতবাদের বাহকরূপে কমিউনিস্ট বিদ্বেষে অন্ধ হইয়া 'বলসেভিক বর্বরদের' ঝাড়েবংশে সংহার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পাঁচ মাস যুদ্ধের পরেও যখন লালফৌজ ধ্বংস হইল না এবং আক্রমণের প্রধান তিনটি লক্ষ্যস্থল—উক্রাইন, মস্কো ও লেনিনগ্রাদের মধ্যে—একমাত্র প্রথমটি ছাড়া বাকী দুইটিই অজেয় রহিয়া গেল, তখন ফুরার ও তাঁর নাৎসী সমরনেতাদের মোহভঙ্গ হইতে লাগিল। কিন্তু এই পরাজয়ের গ্লানি ঢাকিতে গিয়া হিটলারের রাগ পড়িল সেই সমস্ত সেনাপতির উপর যাঁরা সৈন্যদলসহ পশ্চাতে হটিতে চাহিতেছিলেন। সুতরাং ফিল্ড মার্শাল ব্রাউসিৎসকে পূর্ব রণাঙ্গনের পরিচালনার দায়িত্ব থেকে 'বিদায়' দেওয়া হইল। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় এতগুলি প্রবীণ সেনাপতির বিতাড়ন নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা। কারণ, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠিল পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিচালনায় সর্বাধ্যক্ষের দায়িত্ব কে নিবেন ? জার্মান সেনাপতি মহলে যখন এটা একটা মুখরোচক ও উত্তেজনাপূর্ণ গবেষণার বিষয় হইয়া উঠিল, তখন দেখা গেল যে, হিটলার স্বয়ং চট্ করিয়া এই গুরুতর প্রশ্নেরও মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছেন। ১৯শে ডিসেম্বর হিটলার হ্যালডারকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তিনি নিজেই আর্মির কমাণ্ডার-ইন-চীফ'-এর পদ গ্রহণ করিতেছেন, যদি হ্যালডার ইচ্ছা করেন, তবে, তিনি আগের মতই 'চীফ অব দি জেনারেল স্টাফ'-এর পদে থাকিতে পারেন!

অবশ্য এমন গুরুতর ঘটনায়ও জার্মান সেনানীমহলে নূতন করিয়া খুব বিস্ময়ের কারণ ঘটিল না। কারণ, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নায়ক হিসাবে তিনি পূর্বেই সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডার ও সমস্ত ক্ষমতার অধীশ্বর ছিলেন। এক্ষণে তিনি নিজ হাতে সৈন্যদল পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করিলেন। কারণ, তাঁর মতে—

'This little matter of operational command is something any one can do……'

—'রণক্রিয়া পরিচালনার এই সামান্য ব্যাপারটা যে কোন ব্যক্তিই করিতে পারেন।'[১]

অতএব হিটলার স্বয়ং এবার খাস রণক্ষেত্রের সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব নিলেন। তিনি সেনাপতিদের উপর আর ভরসা রাখিতে পারিতেছিলেন না। মস্কোর দ্বারদেশে আসিয়া তাঁকে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং নেপোলিয়নের গ্রাণ্ড আর্মির মত পশ্চাদপসরণ করিতে গিয়া ধ্বংস বরণ করিতে হইবে, এই চিন্তা তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। অতএব 'ভীরু, কাপুরুষ, অপদার্থ সেনাপতিদিগকে' তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে বিদায় করিয়া দিলেন এবং হুকুম জারি করিলেন, ঠাণ্ডা, বরফ, তুষার ইত্যাদি সত্ত্বেও আর পিছুহটা চলিবে না—

'He forbade any further withdrawls.'

কিন্তু ফুরারের এই একগুঁয়েমি এবং জিদ নিয়া জার্মান সেনানীমহলে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হইয়া থাকিলেও রুশ রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর সেই দুর্দিনে এই হুকুমনামা পর্যুদস্ত সেনাদলের আত্মরক্ষার পক্ষে শেষ পর্যন্ত সহায়ক হইয়াছিল বলিয়া একশ্রেণীর সেনাপতি মনে করেন। এই প্রসঙ্গে কোন কোন জার্মান সেনাপতি হিটলারের 'লৌহসদৃশ ইচ্ছাশক্তি'র প্রশংসাও করিয়াছেন।

জেনারেল ব্লুমেনট্রিট মন্তব্য করিয়াছেন যে, হিটলারের সেই 'বেপরোয়া আদেশ' সঠিক ছিল। কারণ, সেই অসম্ভব অবস্থার মধ্যে জার্মান সৈন্যদিগকে যদি পিছু হটিতে হইত, তবে, রণক্ষেত্র ভাঙিয়া পড়িত এবং বরফে ও তুষারে সৈন্যেরা দলে দলে মারা পড়িত। পশ্চাতে আশ্রয় নেওয়ার মত কোন সুসজ্জিত ব্যূহ বা লাইন ছিল না।

জেনারেল ফন্ টিপেলস্কার্শ (Tippelskirch) বলিয়াছেন—'It was Hitler's one great achievement'
হিটলারের এটা একটা প্রকাণ্ড সাফল্য।…যদি সৈন্যেরা পিছু হটিতে শুরু করিত, তবে, ব্যাপারটা হইত ত্রাসের পলায়ন—'panic flight,'

কিন্তু মস্কো অভিযানের ব্যর্থতার পর নভেম্বর-ডিসেম্বর-জানুয়ারীর শীতকালে জার্মান সামরিক মহলে 'ত্রাসের মনোভাব'ই দেখা দিয়াছিল।[২]

* * *

কিন্তু হিটলারের মনে সম্ভবত কোন ত্রাস ছিল না। সমস্ত ব্যর্থতার দায়িত্ব তিনি সেনাপতিদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন* এবং একথা আগেই বলা হইয়াছে যে, প্রধান

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা ১০৩৫
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা—১০৩৭
* 'সেনাপতি শীতের' বিরুদ্ধে দোষারোপের কথা পরে আলোচিত হইয়াছে। —লেখক

সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল ব্রাউসিৎস, দক্ষিণ ও মধ্য রণাঙ্গনের দুই প্রধান নায়ক ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডস্টেড ও ফিল্ড মার্শাল ফন বোক, যান্ত্রিক বাহিনীর জেনারেল গুডেরিয়ান, উত্তর রণাঙ্গনের ফিল্ড মার্শাল ফন লীব্ প্রমুখ বিখ্যাত সেনাপতিদিগকে হিটলার অপসৃত করিলেন। রুণ্ডস্টেডের বদলে ফিল্ড-মার্শাল রাইখনাউ সৈনাপত্যে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু সহসা স্ট্রোক বা হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া মারা গেলেন। বিমানবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল উডেট রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করিলেন— ১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১। এই শীতকালীন ব্যর্থ অভিযানের পর আরও ৩৫ জন কোর ও ডিভিসনাল কমাণ্ডারকে পদচ্যুত করা হইল।

সেনাপতিদের বিরুদ্ধে এই হিটলারী 'পাল্টা অভিযান' অবশ্য এখানেই শেষ হইল না। ন্যুরেমবার্গের আদালতে নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের মামলায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, ১৭ জন ফিল্ড মার্শালের মধ্যে ১০ জনকেই রণাঙ্গনের ব্যর্থতার জন্য 'বিদায়' করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং হিটলারের প্রাণনাশের চক্রান্তের (২০শে জুলাই, ১৯৪৪) অভিযোগ ৩ জন ফিল্ড মার্শালকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। মাত্র একজন ফিল্ড মার্শাল যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়াছিলেন। ৩৬ জন শীর্ষস্থানীয় জেনারেলের মধ্যে অধিকাংশই পদচ্যুত এবং কয়েকজন খতম হইয়াছিলেন। মাত্র ৩ জন জেনারেল রেহাই পাইয়াছিলেন।

এভাবে 'কর্পোরেল' হিটলার তাঁর ফিল্ড মার্শাল ও জেনারেলদের 'সমুচিত শিক্ষা' দিয়া ছাড়িয়াছিলেন সোভিয়েট রণাঙ্গনের যুদ্ধে অকৃতকার্যতার জন্য। কিন্তু সেখানেই তিনি থামিয়া থাকিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আরও ক্ষমতা দখলের জন্য অগ্রসর হইলেন। একাধারে তিনি জাতির নেতা, রাষ্ট্রপতি, সমর-মন্ত্রী, সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও স্থলবাহিনীর (আর্মির) প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন এবং তারপর বশংবদ জার্মান রাইখস্ট্যাগের (পার্লামেণ্টের) মাধ্যমে ইচ্ছামত এক 'আইন' পাশ করাইয়া এত অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্জন করিলেন যে, পৃথিবীতে কোন সম্রাট, রাজা কিংবা প্রেসিডেণ্ট কিংবা প্রাচীন ও মধ্যযুগের কোন গোষ্ঠীপতি সর্দারও এত ক্ষমতা কখনও অর্জন করেন নাই। ইতিহাসে এটা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪২, রাইখস্ট্যাগে এমন এক আইন গৃহীত হইল, যার দ্বারা হিটলার যে কোন জার্মান নাগরিকের জীবন-মৃত্যুর সর্বময় নিয়ামকরূপে অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। ইতিহাসে এমন ঘটনা অভূতপূর্ব। নীচে সেই আশ্চর্য আইনটির মর্ম উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

'In the present war, in which the German people are faced with a struggle for their existence or their anihilation, the Fuehrer must have all the rights postulated by him which serve to further or achieve victory. Therefore—without being bound by existing legal regulations—in his capacity as Leader of the nation, Supreme Commander of the Armed Forces, Head of Government and Supreme executive chief, as Supreme Justice and Leader of the Party—the Fuehrer must be in a position to force with all means at his disposal every German, if necessary, whether he be common soldier or

officer, low or high official or judge, leading or subordinate official of the party, worker or employer—to fulfill his duties. In case of violation of these duties, the Fuehrer is entitled after conscientious examination regardless of so-called well-deserved rights, to mete out due punishment and to remove the offender from his post, rank and position without introducing prescribed procedures."[১]

এই অদ্ভুত আইনের উপর চোখ বুলাইলে যে কোন বুদ্ধিমান পাঠক উপলব্ধি করিবেন যে, হিটলার যেমন বেপরোয়া ছিলেন, তাঁর পার্লামেণ্টও তেমনি বেপরোয়া ছিল। অন্যথা একজন মানুষের হাতে এমন সর্বাত্মক ক্ষমতা কিভাবে অর্পিত হইতে পারে? অথাৎ জার্মান রাষ্ট্রনায়ক হিটলারকে আইনের ঊর্ধ্বে তুলিয়া দিয়া আইনের প্রতিমূর্তিরূপে ঘোষণা করা হইল!

মার্কিন ঐতিহাসিক শাইরার মন্তব্য করিয়াছেন—

"Truly Adolf Hilter had become not only the Leader of Germany but the Law. Not even in medieval times nor further back in the barbaroust trival days had any German arrogated such tyrannical power, nominal and legal as well as actual, to himself."—[২]

কিন্তু হিটলার সমগ্র জার্মান বাহিনীর, এমন কি সমগ্র জার্মান জাতির অপ্রতিরোধ্য ও সর্বাত্মক দণ্ডমুণ্ডের মালিক হইলে কি হইবে, সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গনে, অথবা আরও নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় যে, মস্কোর রণাঙ্গনে ফুরারের ইচ্ছামত ও হুকুম মত আর যুদ্ধের গতি নিয়ন্ত্রিত হইল না। সমুদ্রের তরঙ্গকে যেমন হুকুম দিয়া আটকাইয়া রাখা যায় না, তেমনি লালফৌজের তরঙ্গকেও জার্মান সুপ্রীম কমাণ্ডার হিটলার ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। ডিসেম্বরের দারুণ ঠাণ্ডায় ও বরফে, লালফৌজ নতুনতর বিক্রমে যে প্রত্যাক্রমণ শুরু করিল, তার ফলে সমগ্র রণাঙ্গনের উদ্যোগ ও আধিপত্য সোভিয়েট সৈনাপত্যের হাতে চলিয়া গেল।

'সেনাপতি শীত' ও 'সেনাপতি হিটলার'

কিন্তু পূর্ব রণাঙ্গনে এই অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের লজ্জা কিভাবে গোপন করা যায় এবং কিভাবেই বা হিটলার জার্মান জনগণের নিকট মুখ দেখাইবেন?—বিশেষত স্বয়ং হিটলার ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা যখন তারস্বরে বার বার ঘোষণা করিতেছিলেন যে, রাশিয়ার দফা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, তার আর উঠিবার শক্তি নাই, ঠিক সেই মুহূর্তে মস্কোর দ্বারদেশে এই শোচনীয় পরাজয় হিটলারী 'প্রতিভার' পক্ষে বজ্রাঘাতের তুল্য। সুতরাং চতুর ফুরার তাঁর এই পরাজয়ের সমস্ত গ্লানি, দোষ ও দায়িত্ব চাপাইয়া দিলেন রাশিয়ার ঠাণ্ডা ও শীতের ওপর। ইউরোপের এবং বিশেষভাবে রাশিয়ার নিদারুণ শীতের প্রকোপ সর্বজনবিদিত। এই শীত একটা ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে

১। উইলিয়াম শাইরার—পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃঃ ১০৩৭।
২। ঐ

১২৫ বছরেরও বেশী পূর্বে দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের সৈন্যদের বিপর্যয়ের জন্য। ১৮১২ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর নেপোলিয়ন সসৈন্যে মস্কোতে প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরাজিত হইয়া ১৯শে অক্টোবর মস্কো থেকে পিছু হটিতে শুরু করিয়াছিলেন বরফাচ্ছন্ন পথ ধরিয়া, যার ফলাফল অতি শোচনীয় হইয়াছিল। রাশিয়ার ঠাণ্ডা ও বরফের মধ্যে নেপোলিয়নের এই বিপর্যয়ের জন্যই রাশিয়ার স্বদেশরক্ষার সংগ্রামে 'সেনাপতি শীত'-এর এত নাম! 'সেনাপতি শীতের সঙ্গে অবশ্য 'সেনাপতি কর্দম'ও দেখা দিয়া থাকে, যখন জমাট বরফ গলিয়া রাস্তাঘাট কাদায় ও জলে প্রায় অগম্য হইয়া উঠে। হিটলার ও নাৎসী প্রচারকেরা মস্কোতে তাঁদের পরাজয়ের দায়িত্ব 'সেনাপতি শীতের' ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চাহিলেন। কেবল তাই নয়, পূর্ব রণাঙ্গনে এই অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের জন্য হিটলার তাঁর সেনানীমণ্ডলীর উপর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রধান সেনাপতিকে (ফিল্ড মার্শাল ব্রাউসিৎস) ও অন্যান্যকে পদচ্যুত করিয়া নিজেই সর্বোচ্চ সেনাপতিরূপে সমগ্র বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, একথাও আগেই সবিস্তারে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার এই যে, মস্কোর যুদ্ধে সোভিয়েট বাহিনীর হাতে জার্মান বাহিনীর এই পরাজয়ের গুরুত্ব গোপন বা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে হিটলার ও গোয়েবেলস যে প্রচার কার্য শুরু করিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে পশ্চিমী লেখকদের কৃপায় সেটাই প্রায় সত্য বলিয়া গৃহীত এবং প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু এটা অর্ধ মিথ্যা এবং রাজনৈতিক মতবাদের বৈষম্যের জন্য বিকৃত প্রচারকার্য মাত্র। কেননা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মস্কো থেকে প্রকাশিত নানা দলিলপত্র, ইতিহাস, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণী, সৈন্য ও সেনাপতিদের বক্তব্য এবং অন্যান্য সূত্রে প্রকাশিত তথ্যগুলি থেকে দেখা যায় যে, মস্কোর যুদ্ধে হিটলারী বাহিনীর পরাজয় অকস্মাৎ 'অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা' পড়ার জন্য ঘটে নাই, ঘটিয়াছে লালফৌজের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ ও জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের জন্য।

কিন্তু সেদিন হিটলার লালফৌজের পাল্টা আক্রমণ শুরু হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৪১, রাইখস্ট্যাগের বক্তৃতায় রাশিয়ার আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার উপর দোষারোপ করিয়া বলিলেন—

"Marching in the boundless expanses pushing on in the heat, tormented by thirst, often driven to despair by the delays caused by impossible roads, halted from the White Sea to the Black Sea by foul weather and the climate, in the heat of July and August and the snowstorms of November and December, suffering from the mud and freezing in the ice and snow, they fought on···the soldiers of the Eastern Front." [পৃষ্ঠা ৪১৩, ২নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

এই বক্তৃতায় হিটলার খুব কৌশলে এবং আবেগপূর্ণ ভাষায় প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, জার্মান সৈন্যেরা মস্কোর ও পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রীষ্ম বা শীতের কী প্রচণ্ড প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে বাধ্য হইয়াছিল, কিন্তু লালফৌজের হাতে যে তিনি বা তাঁর সৈন্যদল মার খাইতেছিলেন, সেই কথাটি সযত্নে এড়াইয়া গিয়াছেন।

অতঃপর ১৯৪১-৪২ সালের শীতকালীন যুদ্ধে পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনী যে দুর্দশায় পড়িয়াছিল, সেই প্রসঙ্গেও তিনি প্রধানত রাশিয়ার শীত ও নিদারুণ আবহাওয়াকেই দায়ী করিয়াছিলেন। ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪২ রাইখস্ট্যাগের বক্তৃতায় হিটলার বলিলেন—

'গতবার যখন আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম, তখন পূর্ব রণাঙ্গনে এমন এক নিদারুণ শীত পড়েছিল, যেটা ৪০ বছরেরও বেশী কালের মধ্যে রুশদের নিকটও অজ্ঞাত ছিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাপমান যন্ত্র শূন্য ডিগ্রি থেকে নীচের দিকে ৪৭ ডিগ্রিতে নেমে গেল। এমন কি, তার চেয়েও কমের দিকে গেল। অপ্রত্যাশিতভাবে চার সপ্তাহ আগেই সমস্ত রণক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। যে রণাঙ্গন সম্মুখের দিকে অগ্রসরমান ছিল, তা পিছনেও হটতে পারলো না, কিংবা যেখানে ছিল সেখানেও তিষ্ঠিতে পারলো না। সুতরাং মোটামুটিভাবে ট্যাগানরগ থেকে লাডোগা প্রান্ত পর্যন্ত একটি সাধারণ লাইন ধরে পশ্চাদপসরণ করতে হইয়াছিল।

'আজ আমি বলতে পারি যে, এই রণক্রিয়া কার্যক্ষেত্রে অনুসরণ করা মারাত্মক রকমের কঠিন ছিল। এমন চরম মুহূর্তও এসেছিল, যখন মানুষ ও যন্ত্র উভয়েই জমে যাওয়ার জো হয়েছিল। যাঁরা পূর্ব রণাঙ্গনের বিশালতার দিকে তাকান, তাঁদের বুঝা উচিত যে, ১৮১২ খৃস্টাব্দে নেপোলিয়নের গ্র্যান্ড আর্মি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।...'[১]

এই হিটলারী বক্তৃতাই মস্কোর রণাঙ্গনে এবং সাধারণভাবে শীতকালীন যুদ্ধে জার্মান বাহিনীর ভাগ্যবিপর্যয়ের একমাত্র সাফাই হিসাবে নাৎসী সরকারী ভাষ্যরূপে গৃহীত হইল। গোয়েবলস ও লেঃ জেনারেল ডিটমার প্রভৃতি হিটলারের প্রোপাগান্ডা-বিশারদগণ উচ্চকণ্ঠে এই প্রচারকার্য চালাইতে লাগিলেন।...

দুর্ভাগ্যক্রমে মহাযুদ্ধের পরেও পশ্চিম জার্মানী, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি পশ্চিমী জগতের বিখ্যাত লেখক, সামরিক ঐতিহাসিক এবং সেনাপতিবৃন্দের স্মৃতি-পুস্তকে মস্কো যুদ্ধে হিটলারী বাহিনীর পরাজয়ের প্রধান কারণরূপে 'সেনাপতি শীত' ও 'সেনাপতি কর্দম'—এই দুইকে দায়ী করা হইল। জেনারেল গুডেরিয়ান, জেনারেল ব্লুমেনট্রিট, জেনারেল হ্যালডার প্রমুখ প্রধান প্রধান জার্মান সেনানায়ক, কুর্ট ফন টিপেলস্কার্চ, পল ক্যারল প্রমুখ জার্মান সমর ঐতিহাসিক, জেনারেল ওমর ব্রাডলী প্রভৃতি মার্কিন শীর্ষ সেনাপতি, রবার্ট ই শেরউড, উইলিয়াম শাইরার, এল স্নাইডার প্রমুখ মার্কিন ঐতিহাসিক, এ্যালান ক্লার্ক, মেজর-জেনারেল জে.এফ.সি. ফুলার, ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট, এল্যান বুলক প্রমুখ প্রসিদ্ধ বৃটিশ সামরিক ঐতিহাসিকগণ রাশিয়ার ঠাণ্ডা, শীত, তুষার ও কাদার উপরেই বেশী জোর দিয়াছেন। এমন কি স্বয়ং চার্চিল পর্যন্ত তাঁর মহাযুদ্ধের গ্রন্থে 'অর্ধ জমে যাওয়া' জার্মান সৈন্যদের কথা উল্লেখ করিয়া পরোক্ষে ঠাণ্ডার প্রকোপের উপরেই প্রাধান্য দিয়াছেন।

কোন কোন জার্মান সেনাপতি ঠাণ্ডার এমন ভয়াবহ বর্ণনা দিয়াছেন যে, পড়িলে আক্কেল গুড়ুম হওয়ার জো। যেমন, জেনারেল গুডেরিয়ান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ১০ই ডিসেম্বর মস্কো রণাঙ্গনে ঠাণ্ডা 'হিমাঙ্কের নীচে ৬৩ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড' নামিয়া গিয়াছিল এবং জার্মান বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক ও গুরুতর অসুস্থতা দেখা দিয়াছিল। সেই সময় বাইরে অবস্থানের অর্থ ছিল মৃত্যুকে বরণ করা। পাইখানা করিতে গিয়া

১। গ্রন্থকার প্রণীত রুশ-জার্মান সংগ্রাম, ১৯৪৭, পৃঃ ১৮৭-৮৮।

পর্যন্ত অনেকে মারা পড়িয়াছিল, কেন না ঠাণ্ডায় মলদ্বার জমাট বাঁধিয়া যাইত, আর ঘোড়ার মাংস, এমন কি মাখন পর্যন্ত শুকাইয়া এমন কঠিন পাথর হইয়া যাইত যে, সেগুলিকে কাটিবার জন্য কুড়ুল বা করাত দরকার হইত।[১]

অথচ কোন সোভিয়েট দলিলপত্রে ঠাণ্ডার স্বপক্ষে এমন অস্বাভাবিক রঙীন বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায় না।...

কিন্তু মহাযুদ্ধের শেষে অন্তত ২৫ বছর (১৯৭০-৭১) ধরিয়া রাশিয়ার প্রাক্তন মিত্রপক্ষের তরফ থেকে অসংখ্য পুঁথিপত্রে, স্মৃতিকথায়, সরকারী বিবরণীতে মস্কো ও শীতকালীন যুদ্ধ ও অন্যান্য যুদ্ধ সম্পর্কেও এই ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারকার্য চলিতে থাকায় সোভিয়েট ঐতিহাসিক ও লেখকগণ ক্ষুব্ধচিত্তে এগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রতিবাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে স্বয়ং মার্শাল জুকোভের অত্যন্ত স্পষ্ট, তীব্র এবং ক্রুদ্ধ বিবৃতি। মস্কো, লেনিনগ্রাদ স্ট্যালিনগ্রাদ, কুস্ক ও বার্লিন—এই কয়টি ইতিহাস প্রসিদ্ধ রণাঙ্গনে তিনিই ছিলেন অন্যতম সেরা অধিনায়ক এবং সোভিয়েট পক্ষের সর্বাপেক্ষা রণবিশারদ ও প্রতিভাশালী সেনাপতি। তিনি লিখিয়াছেন যে, মতাদর্শের পার্থক্যহেতু পশ্চিমী জগতের বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ও সেনাপতিরা সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গনে ও মস্কো যুদ্ধে লালফৌজের বীরত্ব, কৃতিত্ব ও জনগণের ত্যাগ স্বীকারকে লঘু করিয়া দেখাইয়াছেন এবং হিটলার যে মস্কো জয়ে ব্যর্থ হইয়াছিলেন, তার কারণস্বরূপ একমাত্র কদর্য আবহাওয়া, নিদারুণ ঠাণ্ডা ও কর্দমাক্ত রাস্তাঘাটের উপর জোর দিয়াছেন। 'কিন্তু মস্কো যুদ্ধের অন্যতম অংশগ্রহণকারী হিসাবে আমি ইতিহাসের এই জঘন্য বিকৃতির বিরুদ্ধে তীব্র রোষ প্রকাশ করিতেছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে, না, কর্দম বা তুষারপাতের জন্য নয়, হিটলার পরাজিত ও প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিলেন জনগণের, সোভিয়েট জনগণের বাধাদানের জন্য!'

'No, it was not the mud or the frosts which checked Hitler's troops after their break through to Vyazma and their emergence on the approaches to the capital. It was not weather, but the people—the Soviet people' !—[২]

অতঃপর মার্শাল জুকোভ উল্লেখ করিয়াছেন যে, মস্কোর প্রতিরক্ষা যুদ্ধের অতি সংকট সময়ে স্বয়ং জোসেফ স্ট্যালিন রাজধানীর ভাগ্য সম্পর্কে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন তিনি গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিয়াছিলেন—

'না, মস্কো আত্মসমর্পণ করিবে না!'

প্রবন্ধের উপসংহারে জুকোভ মন্তব্য করিয়াছেন যে, সোভিয়েটের শত্রুপক্ষের সমস্ত অপপ্রচার সত্ত্বেও মস্কো যুদ্ধের অবিস্মরণীয় গৌরবকাহিনী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া থাকিবে।

কিন্তু সোভিয়েট ও সোভিয়েট বিরোধীদের এই বিতর্ক প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, সমস্ত প্রসিদ্ধ সমর-ঐতিহাসিকেরাই নাৎসীদের প্রচারিত 'সেনাপতি শীতের' কাহিনী

অপ্রতিবাদে মানিয়া লন নাই। যেমন, যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই ১৯৪৪ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'দি রাশিয়ান ক্যাম্পেইনস…' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকের গ্রন্থকারদ্বয় ডবলিউ. ই. ডি. অ্যালেন এবং পল মুরাটোভ অত্যন্ত জোরের সঙ্গে হিটলারের দাবীর (নেপোলিয়ানের অভিযানের সময় মস্কোয় ঠান্ডা ছিল ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আর তাঁর বা হিটলারের সময় ছিল ৫২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। অতএব নেপোলিয়ানের তুলনায় তাঁর কৃতিত্ব অনেক বেশী) বিরুদ্ধে লিখিয়াছিলেন যে, একমাত্র ঠান্ডার জন্যই মস্কোর যুদ্ধে হিটলারী সৈন্যরা হারিয়া গিয়াছিল এটা যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। বরং এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, শীতকালীন যুদ্ধ সম্পর্কে ফুয়রার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছিলেন, অধিকন্তু কঠিন বরফের উপর দিয়া যান্ত্রিক বাহিনীর চলাচলের পক্ষে সুবিধা হওয়ারই কথা ছিল। আর নেপোলিয়ানের সঙ্গে তুলনা? গ্রন্থকারদ্বয় হিটলারের উদ্দেশ্যে বিদ্রুপের ভঙ্গীতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ১৮১২ সালে একমাত্র ঠান্ডার জন্যই নেপোলিয়ানের গ্র্যান্ড আর্মির বিপর্যয় ঘটে নাই, অন্যান্য গুরুতর কারণও ছিল—যেমন, (১) বরোডিনের যুদ্ধে সৈন্যবলের নিদারুণ ক্ষতি (২) রুশ পোড়া মাটির নীতি, (৩) পার্টিজান বা গেরিলাদের আক্রমণ এবং (৪) অতি দীর্ঘ ও বিপজ্জনক যোগাযোগ ব্যবস্থা। ১৯৪১ সালে হিটলারও অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন বটে। কিন্তু তাঁর যোগাযোগ ও রেলপথের ব্যবস্থা অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। আর নেপোলিয়ানের আমলে রেলপথই ছিল না। কিন্তু নেপোলিয়ান তবু দাবী করিতে পারিতেন যে, তিনি মস্কো দখল করিয়াছিলেন, কিন্তু হিটলার তাও পারেন নাই! অতএব নেপোলিয়ানের সঙ্গে তুলনা দেওয়া 'নিতান্তই হাস্যকর!'…[১]

আমেরিকার প্রসিদ্ধ সাংবাদিক-ঐতিহাসিক উইলিয়াম শাইরারও লিখিয়াছেন যে, রাশিয়ার শীত ভয়ঙ্কর ছিল সন্দেহ নাই এবং সোভিয়েট সৈন্যেরা স্বভাবতই জার্মানদের তুলনায় ঠান্ডার বিরুদ্ধে ভালোভাবে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু একথা মানিয়া লওয়ার পরেও স্বীকার করিতে হইবে যে, 'আসলে আবহাওয়ার জন্য নয়, সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে লালফৌজের হিংস্র যুদ্ধ এবং হার স্বীকার না করার জন্য তাঁদের অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাশক্তি। সেই সময়কার শীর্ষ জার্মান সেনাপতিদের ডায়েরী থেকেই এর প্রমাণ মিলিবে। কেননা, এই দৈনন্দিন লিপিগুলিতে লালফৌজের পাল্টা আক্রমণের ভয়াবহ তীব্রতা ও জার্মান পক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষয়-ক্ষতির জন্য হতাশা ও বিহ্বলতা প্রকাশ করা হইয়াছে।'

মিঃ শাইরার আরও মন্তব্য করিয়াছেন যে, হিটলারী সৈন্যেরা মস্কোতে বড়দিনের উৎসব পালন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু ফল হইল উল্টা। সেই নিদারুণ ঠান্ডায় তাঁরা মস্কো থেকে বহু দূর বিতাড়িত হইলেন![২]

সুতরাং দেখা যাইতেছে 'সেনাপতি হিটলার' 'সেনাপতি শীতের' ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইয়াও শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের বিচারে রেহাই পাইলেন না! তবে, সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে, মস্কোর ঠান্ডার মধ্যে লড়িবার জন্য হিটলারী হাইকমান্ড আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ, তাঁরা ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, ৮ সপ্তাহের যুদ্ধে কিংবা আগস্ট মাসের মধ্যেই 'বর্বর বলসেভিক' রাশিয়া খতম হইয়া যাইবে!

১। The Russian Campaigns of 1941-43, p. 54-55.

২। The Rise and Fall of the Third Reich,—P. 1030.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ফ্যাসি-বিরোধী মহাজোটের সূত্রপাত

হপকিন্সের ঐতিহাসিক দৌত্য

সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারী আক্রমণের দ্বারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটি সম্পূর্ণ নতুন পর্বের শুরু হইল। প্রকৃতপক্ষে এই পর্বে মহাযুদ্ধের চেহারা ও চরিত্রের—কূটনৈতিক ও সামরিক—যেমন বদল হইতে লাগিল, তেমনি সারা পৃথিবীর উপরেই তার প্রভাব অনুভূত হইতে লাগিল। এমন কি পরবর্তীকালের আন্তর্জাতিক পৃথিবীর অনেক ভাঙাগড়ার সঙ্গেই মূলতঃ যুক্ত ছিল রুশ-জার্মান সংগ্রামের ফলাফল। যে 'গ্রাণ্ড এ্যালায়েন্স' বা মহামৈত্রী কিংবা যে 'গ্রেট অ্যাণ্টি-ফ্যাসিস্ট কোয়ালিশন' বা ফ্যাসি-বিরোধী মহাজোট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে এত প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তারও সূত্রপাত হইল নাৎসী জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের পর। অথচ হিটলারের ঘোষিত লক্ষ্য ও নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত পথ ধরিয়া এই গ্রাণ্ড অ্যালায়েন্স বা মহামৈত্রী গড়িয়া উঠিল। কারণ, সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের কারণ হিসাবে জার্মান গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীকে বলশেভিক মতবাদের মারাত্মক বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যই এই অভিযানের প্রয়োজন হইয়াছিল। অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিনসহ সমগ্র পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক জগতের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভের উদ্দেশ্য ছিল এই অভিযানের পিছনে। আরও সোজা কথায় বলা যাইতে পারে যে, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিবর্গ যাতে আক্রান্ত রাশিয়ার সাহায্যার্থে অগ্রসর না হয়, তেমন গূঢ় মতলবই ছিল 'বলশেভিক বিপদের' বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘোষিত লক্ষ্যের মধ্যে।[১]

কিন্তু হিটলারের এই গূঢ় মতলব ব্যর্থ হইয়া গেল। কারণ রুশ-জার্মান সংগ্রামের গতিপথে বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে যে মহামৈত্রী বা মহাজোট রচিত হইল, ইতিহাসে তার দূরপ্রসারী ফলাফল প্রতিবিম্বিত হইল। বলা বাহুল্য যে, আক্রান্ত সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি খুব দরদ ইঙ্গ-মার্কিন ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গের ছিল না এবং এজন্য উভয়পক্ষের পারস্পরিক বিশ্বাসের মধ্যেও খুব আন্তরিকতা ছিল না। কারণ, কমিউনিজমের প্রতি অবিশ্বাস ও ভীতি আগের মতই বজায় ছিল এবং পর্দার আড়ালে অনেক কূটনৈতিক ও রণনৈতিক বিরোধ ও মতান্তর ঘটিয়াছিল। তবু এই মৈত্রী গড়িয়া উঠিল এবং শেষ পর্যন্ত অন্তত বাহ্যত্ব বজায় থাকিল এই আশংকায় যে, যদি নাৎসী জার্মানীর হাতে সোভিয়েট রাশিয়া সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া যায়, তবে, ইউরোপজয়ী হিটলারী বাহিনী পরবর্তীকালে নিশ্চিতরূপেই বৃটেন আক্রমণ করিবে এবং বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের পতন ঘটিলে সুবৃহৎ বৃটিশ সাম্রাজ্য হিটলারী মুঠায় আসিয়া যাইবে এবং তারপর জাপানী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আর হিটলারী গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। প্রধানত এই সম্ভাব্য পরিণতির কথা চিন্তা

১। British Foreign Policy during World War II—P. 158

করিয়াই বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতায় অগ্রসর হইয়াছিল।

সুতরাং ২২শে জুন তারিখ হিটলারী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল যে অপূর্ব বক্তৃতা দিয়াছিলেন,' তার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ আপাতত হিটলারী আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে রেহাই পাইয়া গেল এবং এজন্য চার্চিল এবং তার বড় বড় সহযোগীরা 'খুব খুশী' হইয়াছিলেন। কারণ, তাঁরা বুঝিলেন যে, 'বৃটেন আর একক নয়' এবং 'সেদিন সকালে চেকার্সের (বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর পল্লী-বিশ্রাম ভবন) আবহাওয়ার মধ্যে একটা নিদারুণ স্বস্তির নিঃশ্বাস অনুভব করা গেল'—একথা লিখিয়াছেন চার্চিলের দেহরক্ষী ইন্সপেক্টর টমসন।[১]

চার্চিলের ২২শে জুন তারিখের সেই ইতিহাস বিখ্যাত বেতার ভাষণের পরেও কিন্তু দুই দেশের মধ্যে অবিলম্বেই সহৃদয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইল না। কারণ, এতদিনের পারস্পরিক শত্রুতা ও সন্দেহ একটিমাত্র বেতার বক্তৃতাতেই দূর হওয়া সম্ভব ছিল না। বিশেষত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার আগে হিটলারের অন্যতম প্রধান সহকর্মী হেসের হঠাৎ ইংলণ্ডে গমন (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) স্ট্যালিন ও রাশিয়ার মনে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছিল। স্বভাবতই এই সন্দিগ্ধ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে, বৃটেন ও জার্মানীর মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়াকে নিয়া কোন গোপন বুঝাপড়া বা চক্রান্ত হইয়াছে কিনা? সুতরাং চার্চিলের সেই চাঞ্চল্যকর বেতার বক্তৃতার পরেও রাশিয়ার কাছ থেকে তেমন উপযুক্ত সাড়া না আসায় ৭ই জুলাই তারিখ চার্চিল স্বয়ং স্ট্যালিনের নিকট পত্র লিখিলেন এবং সেই পত্রের জবাবও স্ট্যালিন ১৮ই জুলাইয়ের আগে দিলেন না—যদিও ইতিমধ্যে চার্চিলের বক্তৃতার জন্য সোভিয়েট জনগণের মধ্যে কিছুটা 'বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দের' সৃষ্টি হইয়াছিল। তবু ঘটনার এই আকস্মিক ও অদ্ভুত নাটকীয় পরিণতির জন্য সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট যেন কিছুকালের জন্য হতভম্ব হইয়াছিলেন এবং এই ঘোর কাটাইয়া উঠিতে স্বয়ং স্ট্যালিনেরও ১১ দিন লাগিয়াছিল। সোভিয়েট জনগণের সামনে যুদ্ধের নীতি সংক্রান্ত বক্তৃতা দিতে জন্যই এত দেরী হইয়াছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে জেনারেল ম্যাসন ম্যাকফারলেনের নেতৃত্বে একটি বৃটিশ মিলিটারী মিশন লণ্ডন থেকে মস্কোতে পৌঁছিল। আবার মস্কো থেকেও একটি সোভিয়েট মিলিটারী মিশন লণ্ডনে পৌঁছিল। এদিকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে স্ট্যালিন ও মলোটভের আলোচনা হইল ইঙ্গ-সোভিয়েট সামরিক সহযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে। ১২ই জুলাই, ১৯৪১, ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি স্বাক্ষরিত ও ঘোষিত হইল। এই চুক্তি অনুসারে জার্মানীর বিরুদ্ধে উভয়ে একত্রে যুদ্ধ চালাইবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইলেন এবং এমন অঙ্গীকার করিলেন যে, চুক্তি স্বাক্ষরকারীর কেহ পৃথকভাবে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আলোচনা করিবেন না কিংবা সন্ধিপত্রেও স্বাক্ষর দিবেন না।

'...not to conduct negotiations or sign a separate armistice or peace with Germany'.[২]

বৃটেন ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধকালীন স্বাক্ষরিত এই প্রথম চুক্তির বয়ান

১। পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৪৯।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ১৬৭।

থেকেই বুঝা যাইতেছে যে, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসের তেমন গভীরতা ছিল না। কিন্তু হিটলারী বিপদের মুখে উভয়ের পক্ষে এ ছাড়া কোন গত্যন্তরও ছিল না।

কিন্তু শুরুতেই সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ থেকে জার্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন বা সেকেণ্ড ফ্রণ্ট খোলার দাবী উঠিল—যে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের বিতর্ক ও মহাযুদ্ধের ইতিহাসে একটা প্রকাণ্ড অংশ জুড়িয়া আছে। কেননা এর পিছনে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ কূটনীতির চাল ছিল—যে কথা পরে আলোচিত হইবে।

১৮ই জুলাই তারিখ স্ট্যালিন চার্চিলের চিঠির যে জবাব দিলেন, তাতে প্রথমেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। স্ট্যালিন লিখিলেন যে, হিটলারী সামরিক শক্তি এখন পূর্বদিকে নিয়োজিত হইয়াছে। সুতরাং পশ্চিমদিকে (উত্তর ফ্রান্স) এবং উত্তরে (মেরু সমুদ্র অঞ্চলে) দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার এটাই সর্বোত্তম সময়।

এর জবাবে চার্চিল দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রস্তাব সম্পূর্ণ অবাস্তব বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিলেন। তবে, উত্তর দিকে মেরু সমুদ্র অঞ্চলে কিছু নৌক্রিয়ার এবং মরমনস্ক বন্দরে কিছু বৃটিশ জঙ্গী বিমানবহর স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন।

২৬শে জুলাই চার্চিল আবার স্ট্যালিনের কাছে পত্র লিখিলেন এবং তাতে ২০০ বিমান, ২০। ৩০ লক্ষ জোড়া বুট জুতা এবং রবার, টিন, পশম ও পশমী পোশাক, দস্তা, পাট ও 'শেলাক' সরবরাহের প্রস্তাব দিলেন।

বলা বাহুল্য যে, এই সাহায্যের প্রস্তাব সমুদ্রে শিশির বিন্দুর মত। কিন্তু মহাযুদ্ধের সেই দুর্দিনে এভাবেই বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতা শুরু হইল এবং একথাও মনে রাখা দরকার যে, ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে কার্যতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার একমাত্র মিত্র (অ্যালাই) ছিল বৃটেন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখনও যুদ্ধ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু এই মিত্রের কাছ থেকে তেমন কোন সামরিক সহায়তা সরাসরি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং যদি অস্ত্রশস্ত্র ও কাঁচামালের আকারে সর্বাধিক অর্থনৈতিক সহায়তা পাইতে হয়, তবে, বৃটেনের চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরে নির্ভর করাই যুক্তিসঙ্গত—সোভিয়েট নেতারা স্বভাবতই এই চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিম থেকে 'উপযুক্ত' সাহায্য পাওয়ার আগে বৃটিশ ও মার্কিন মহলে সর্বাগ্রে যে প্রশ্নটি দেখা দিল, সেটি এই—'সোভিয়েট রাশিয়া জার্মানীর এই আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে কিনা এবং পারিলে কতদিন পর্যন্ত পারিবে?'[১]

বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের সামরিক-কূটনৈতিক মহলেই এই প্রশ্ন দেখা দিল। বৃটেনের অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের বিশ্বাস ছিল যে, সোভিয়েট রাশিয়া দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। এমন কি, মস্কোস্থিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের গোড়ার দিকে এই বিশ্বাস ছিল। বৃটিশ সরকারী মহল এবং সামরিক মহলেরও এই ধারণাই ছিল। চার্চিলের সামরিক উপদেষ্টা জেনারেল লর্ড ইসমে, জেনারেল স্টাফের অধ্যক্ষ জেনারেল স্যার জন ডিল, মিলিটারি অপারেশনের ডিরেক্টার জেনারেল জন কেনেডি প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় বৃটিশ সামরিক নেতাদের বিশ্বাস ছিল যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সোভিয়েট রাশিয়া খতম হইবে। 'মাখনের মধ্যে ছুরি চালাইবার মত' হিটলারী বাহিনী রাশিয়াকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিবে—এই

১। Russia At War—P. 266.

বিশ্বাস ছিল বৃটিশ সেনানীমণ্ডলীর বড়কর্তার। এমন কি স্বয়ং চার্চিলেরও এই বিষয়ে সংশয় ছিল—যদিও পরবর্তীকালে তাঁর মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত পুস্তকে এটা তিনি অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন।[১]

কিন্তু চার্চিল তাঁর গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, প্রায় সমস্ত দায়িত্বশীল সামরিক নেতারই মত ছিল যে, রুশ সৈন্যবাহিনী শীঘ্রই হারিয়া যাইবে এবং অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

বৃটেনের মত মার্কিন সামরিক মহলের মতামতও সোভিয়েট রাশিয়ার শক্তির প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল না। মার্কিন সমর সচিব মিঃ স্টিমসন তাঁর সমর দপ্তরের ও সেনানী-মণ্ডলীর পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে জানাইয়াছিলেন যে, রাশিয়াকে পরাজিন করিতে জার্মানীর সর্বনিম্ন এক মাস কিম্বা সম্ভবত সর্বাধিক তিন মাস সময় লাগিবে—

(......a minimum of one month and a possible maximum of three months.)[২]

এদিকে মস্কোস্থিত মার্কিন দূতাবাসে সোভিয়েট সামরিক শক্তি সম্পর্কে মতামত দ্বিধাবিভক্ত ছিল। দূতাবাসের মিলিটারী এ্যাটাশে মেজর ইভান ইয়েটন বিশ্বাস করিতেন যে, লালফৌজ খুব শীঘ্রই চূর্ণ হইয়া যাইবে। অপর পক্ষে রাষ্ট্রদূত স্টেইনহার্ড লালফৌজের শক্তি সম্পর্কে অতটা নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না। অবশেষে হ্যারী হপকিন্সের পরামর্শ অনুসারে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে কর্নেল ফিলিপ ফেমনভিলকে পাঠাইলেন 'কর্জ ও ইজারা' চুক্তির তদারকী অফিসার হিসাবে এবং তিনি রাশিয়ার অনুকূলেই মতামত প্রকাশ করিলেন। হপকিন্স স্বয়ং জুলাই মাসের শেষে মস্কো পরিদর্শনে গিয়াছিলেন এবং তাঁর এই পরিদর্শন ও স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সমগ্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারূপে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। কারণ, মার্কিন-সোভিয়েট ও ইঙ্গ-সোভিয়েট সম্পর্কের সমগ্র ভবিষ্যতের উপরেই হ্যারী হপকিন্সের মস্কো সফর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।[৩]

হপকিন্স ছিলেন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও বিশ্বাসভাজন—একেবারে অন্দরমহলের লোক। অথচ হপকিন্স ছিলেন এক অদ্ভুত ধরনের মানুষ—অত্যন্ত রোগা, শীর্ণকায়, লম্বা। রুজভেল্ট তাঁকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, 'অর্ধেক মানুষ', প্রায়শঃই অত্যন্ত অসুস্থ এমন কি শয্যাশায়ীও থাকিতেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কূটনৈতিক ব্যাপারে এবং তীক্ষ্ন বুদ্ধিমত্তায় তিনি অসাধারণ ছিলেন, আর অসাধারণ ছিল তাঁর সাহস, শ্রমনৈপুণ্য ও সহনশীলতা। ওই রুগ্ন শীর্ণ চেহারা ও অসুস্থ দেহ লইয়া তিনি ওয়াশিংটন-লণ্ডন এবং লণ্ডন-মস্কো ইত্যাদি যেভাবে ছুটাছুটি করিয়াছেন, সেই সমস্ত ঘটনা প্রায় অবিশ্বাস্য। শেরউডের বইতে এই সমস্ত কাহিনীর

১। The British Foreign Policy—Trukhanovsky, P. 163.

২। Roosevelt and Hopkins—Robert E. Sherwood, Bantam edition, Vol. 1, P. 370.

৩। হপকিন্স সম্পর্কে বিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক রবার্ট ই. শেরউড প্রণীত 'রুজভেল্ট এণ্ড হপকিন্স' নামক অপূর্ব তথ্যসম্বলিত পুস্তক মহাযুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে পরিচিত। —লেখক

অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা আছে। কিন্তু হ্যারী হপকিন্স কিরূপ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে কিরূপ সংস্কারমুক্ত ছিলেন, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁর মেরু সমুদ্র এলাকায় আর্চেঞ্জেল বন্দর (লণ্ডন থেকে অতি কষ্টে বিমানযোগে এখানে পৌঁছিয়াছিলেন) থেকে মস্কো যাওয়ার পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার বর্ণনায়।

রবার্ট ই. শেরউড লিখিয়াছেন—'আর্চেঞ্জেল থেকে বিমানযোগে মস্কো যেতে চার ঘণ্টা লেগেছিল এবং এই সময়ের মধ্যে হপকিন্স সোভিয়েট রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। বিমান থেকে তিনি নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—যেন শত শত হাজার হাজার মাইল গভীর ও ঘন অরণ্যে আবৃত এবং তিনি চিন্তা করিলেন—হিটলার তাঁর সৈন্যবাহিনীর সমস্ত যান্ত্রিক ডিভিসন নিয়েও এমন দেশকে বিদীর্ণ করতে পারবেন, এমন আশা তাঁর কখনও করা উচিত নয়।'[১]

হপকিন্স ও আভেরিল হ্যারিম্যান প্রভৃতির মস্কো পরিদর্শনের পর যখন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক শক্তি সম্পর্কে দৃঢ় আশাব্যঞ্জক মত প্রকাশ করিলেন, তখন চার্চিল মন্তব্য করিলেন—

'President Roosevelt was considered very bold when he proclaimed in September 1941 that the Russian Front would hold and that Moscow would not be taken.'

অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসে রুজভেল্ট যখন ঘোষণা করিলেন যে, রুশ রণাঙ্গন ভাঙ্গিয়া পড়িবে না এবং মস্কোর পতন হইবে না—তখন তাঁর মতামতও দুঃসাহসিক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।[২]

১৯৪১ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক শক্তি সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন মহলে যখন এই প্রকার ধারণা চলিতেছিল তখন হ্যারী হপকিন্সের দূরদৃষ্টি নিশ্চয় উচ্চ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে।

কিন্তু হপকিন্স হঠাৎ মস্কো গিয়াছিলেন কেন এবং কার নির্দেশে? কারণ, রাশিয়া তখনও বহু বিশিষ্ট ইঙ্গ-মার্কিনের কাছে অজ্ঞাত দেশ ও ভীতির দেশ ছিল। অথচ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল চাহিতেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে সমগ্র যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়া ব্যক্তিগতভাবে আলোচনার জন্য। এই উদ্দেশ্যে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে তাঁদের কথা ছিল অতলান্তিক (নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড) বৈঠকে মিলিত হওয়া। রুজভেল্টের প্রতিনিধিরূপে হ্যারী হপকিন্স দ্বিতীয় বারের (প্রথম বার বড়দিনে) জন্য লণ্ডনে আসিয়া চার্চিলের সঙ্গে এই প্রস্তাবিত বৈঠক নিয়া আলোচনা করিলেন। কিন্তু তখন তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, রুশ রণাঙ্গনের সত্যকারের অবস্থা জানা না থাকিলে চার্চিল-রুজভেল্টের আলোচনা বাস্তবতাসম্মত হইতে পারে না। অধিকন্তু কর্জ-ইজারা আইন অনুসারে রাশিয়াকে সাহায্য দানের প্রশ্নটিও নির্ভর করিতেছে রাশিয়া কতদিন পর্যন্ত হিটলারী আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে, সেই গুরুতর তথ্য জানার উপর। এজন্য হপকিন্স স্থির করিলেন যে, তিনি নিজেই মস্কো যাইবেন এবং খোদ স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। তখন হপকিন্স

১। রবার্ট ই. শেরউড প্রণীত 'রুজভেল্ট এ্যাণ্ড হপকিন্স' পৃষ্ঠা ৩৯৮।
২। উইনস্টোন চার্চিল—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস (ইং) তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫১।

চার্চিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সাত দিনের মধ্যে মস্কো ঘুরিয়া আসা সম্ভব কিনা? চার্চিল তাঁকে জানাইলেন যে, আর. এ. এফ. কোস্টাল কমান্ডের ক্যাটালিন ক্লাইংবোট স্কটল্যান্ডের ইনভারগর্ডন থেকে নরওয়ের নর্থ কেপ হইয়া আর্চেনজেল বন্দর পর্যন্ত যাতায়াত করিয়া থাকে, কিন্তু এই পথ নিদারুণ বিঘ্নপরিপূর্ণ। সেজন্য চার্চিলের খুব উৎসাহ ছিল না। কিন্তু হপকিন্স যেন 'উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।' তিনি ২৫শে জুলাই রুজভেল্টের অনুমতি চাহিয়া তারবার্তা পাঠাইলেন এবং রুজভেল্টও সোৎসাহে সম্মতি দিলেন।

মস্কো অভিমুখে যাইবার আগে ২৭শে জুলাই সন্ধ্যায় হপকিন্স চার্চিলকে (চেকার্সে) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার গুরুত্ব' সম্পর্কে চার্চিলের মতামতের কিছুটা তিনি স্ট্যালিনকে বলিতে পারেন কিনা?

চার্চিল জবাব দিলেন—

"Tell him, tell him that Britain has but one ambition to-day, but one desie—to crush Hitler. Tell him that he can depend upon us……Good-bye, God bless you, Harry".

তাঁকে বলেন, বলো যে, আজকের দিনে বৃটেনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এবং একমাত্র ইচ্ছা—হিটলারকে ধ্বংস করা। তাঁকে বলো যে, তিনি আমাদের উপর নির্ভর করতে পারেন…বিদায়, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, হ্যারী।'—(শেরউড, পৃঃ ৩৯১)

শেরউড মন্তব্য করিয়াছেন যে, সেই সময় হপকিন্সের 'মস্কো যাত্রা যেন অজ্ঞাত গ্রহনক্ষত্র-লোকের দিকে রকেটযোগে যাত্রার মত' মনে হইতেছিল। কারণ, রাশিয়া তখন এত দূরবর্তী বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল।…

এত দূরে ও বিপজ্জনক পথে যুদ্ধবিমানের কঠোরতার মধ্যে এবং সামান্য রেশনের উপর নির্ভর করিয়া ২৪ ঘণ্টার এই আকাশযাত্রা অত্যন্ত উদ্বেগপূর্ণ ছিল—বিশেষত হপকিন্সের স্বাস্থ্যের সংকটজনক অবস্থায়।

তবু হপকিন্স আর্চেঞ্জেলে গিয়া পেঁছিলেন, কিন্তু ক্লান্ত দেহে সেই রাত্রে মস্কো যাত্রা করিলেন না। তাঁর একটু ঘুম ও বিশ্রামের দরকার ছিল। সেই রাত্রে বন্দরের ভারপ্রাপ্ত সোভিয়েট এডমিরাল তাঁকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং হপকিন্স এই প্রথম সোভিয়েট আতিথেয়তার স্বাদ পাইলেন। তিনি এই ডিনারের কথা ভুলিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি লিখিয়াছিলেন যে—

'সেদিনের ডিনার যেন এলাহি ব্যাপার ছিল। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে এই ভোজ চলল। টাটকা সবজি, মাখন, ক্রীম ইত্যাদি শশা ও লাল মুলোগুলি বিস্ময় উদ্রেক করছিল। বহু পদ পরিবেশন করা হয়েছিল—ঠাণ্ডা মাছ, ক্যাভিয়ার ও ভদকা। ভদকার একটা কড়া মেজাজ আছে। এটাকে উপেক্ষা করা কঠিন। ইংরাজ বা আমেরিকানরা যেমন হুইস্কি নীট খায় তেমনভাবে খেলে বুক যেন জ্বলে যাবে। অতএব একটা বড় টুকরো রুটিতে ক্যাভিয়ার (মাছের ডিম, অত্যন্ত রাজসিক খাদ্য রাশিয়ানদের কাছে—গ্রন্থকার) মিশিয়ে নিতে হবে এবং তারপর গিলে ফেলতে হবে। তখন কিন্তু ভদকায় বোতল বন্ধ রাখতে হবে। ওটা খেলা করার বস্তু নয়। ভদকা যখন পান করবে, তখন কিছু খাদ্য খেতে হবে। এই খাদ্যটাই ভদকা পানের তীব্র আঘাতকে সইয়ে নিতে সাহায্য করবে।'

৩০শে জুলাই মস্কোর মার্কিন দূতাবাসে পেঁৗছিয়া হপকিন্সের ধারণা হইল যে, মার্কিন রাষ্ট্রদূত রুশ জনগণের আত্মরক্ষার শক্তি সম্পর্কে অত্যন্ত আশাশীল বটে, কিন্তু বিদেশীদের সম্পর্কে সমগ্র আবহাওয়া এমন সন্দেহ, অবিশ্বাস ও গোপনীয়তায় পূর্ণ যে, সমগ্র পরিস্থিতির পরিষ্কার চিত্র পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। হপকিন্স যে কোন প্রকারে হোক এই সন্দেহের প্রাচীর ভাঙ্গিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

অতঃপর হপকিন্স ও স্ট্যালিনের মধ্যে সন্ধ্যা ৬-৩০-এ ক্রেমলিনে যে ঐতিহাসিক প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটিল, মিঃ শেরউডের বইতে তাঁর বিবরণীতে দেখা যায়—

হপকিন্স স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করিয়া গোড়াতেই ভূমিকা স্বরূপ বলিলেন যে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত দূতরূপে তিনি আসিয়াছেন এবং প্রেসিডেণ্ট বিশ্বাস করেন যে, আজিকার পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে হিটলার ও হিটলারইজমকে পরাজিত করা এবং সে জন্য তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক।

জবাবে স্ট্যালিন হপকিন্সকে স্বাগত জানাইলেন এবং তারপর হিটলার ও জার্মানী সম্পর্কে বর্ণনা দিয়া বলিলেন যে, সমস্ত জাতির মধ্যেই একটা ন্যূনতম নৈতিক মানদণ্ড থাকা দরকার এবং এই ন্যূনতম মানদণ্ড ছাড়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহ-অবস্থান সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমান জার্মান নেতাদের মধ্যে নৈতিকতার এই ন্যূনতম মানদণ্ডও "মিনিয়াম মরাল স্ট্যাণ্ডাড" নাই এবং তারা বর্তমান পৃথিবীর সমাজ-বিরোধী শক্তির প্রতিনিধি মাত্র—

'represented an ant-social force in the world to-day !'

হপকিন্স স্ট্যালিনের সঙ্গে এই বিষয়ে একমত ছিলেন।

হিটলারী জার্মানীর চরিত্র সম্পর্কে স্ট্যালিনের এই মন্তব্য—'পৃথিবীর সমাজ-বিরোধী শক্তি'—এবং বিভিন্ন জাতির পক্ষে ন্যূনতম নৈতিক মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ নিশ্চয়ই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

অতঃপর হপকিন্সের সঙ্গে আলোচনায় স্ট্যালিন সোভিয়েট রাশিয়ার বর্তমানে কি কি প্রয়োজন—অবিলম্বে এবং ভবিষ্যতের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ভিত্তিতে সেই তালিকা বলিয়া গেলেন : যেমন, প্রথমত বিমানমারা কামান—ছোট-বড় ২০ হাজার, দ্বিতীয়তঃ শহরগুলি রক্ষার জন্য বড় বড় মেসিনগান, তৃতীয়তঃ ১০ লক্ষ রাইফেল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রয়োজন সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করিলেন বিমানের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ গুণসম্পন্ন এক প্রকার গ্যাসোলিন এবং এরোপ্লেন নির্মাণের জন্য এলুমিনিয়াম এ ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা আগেই ওয়াশিংটনে দাখিল করা হইয়াছে।

মিঃ হপকিন্স লিখিয়াছেন যে, এর পর স্ট্যালিনের মুখ থেকে একটা চমকপ্রদ মন্তব্য শুনা গেল,—

"Give us anti-aircraft guns and the aluminium and we can fight for three or four years."

এই মন্তব্যের গভীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল। কারণ, ২৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে হিটলারী দিগ্বিজয় যাত্রার মুখেও স্ট্যালিন মনে করিতেছেন যে, তিনি ৩-৪ বছর যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে পারিবেন এবং তাঁর এই মন্তব্য ইতিহাসের দিক থেকেও কত সত্য

স্ট্যালিনের সঙ্গে হপকিন্সের দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সময় স্ট্যালিন বলিলেন—

যুদ্ধারম্ভের পর থেকে রুশ রণাঙ্গনে জার্মান ডিভিসনের সংখ্যা ১৭৫ থেকে বৃদ্ধি পাইয়া ২৩২ হইয়াছে, জার্মানী এই সংখ্যা ৩০০ পর্যন্ত বাড়াইতে পারে। যুদ্ধারম্ভের সময় রাশিয়ার ছিল মাত্র ১৮০ ডিভিসন। এখন সেই সংখ্যা হইয়াছ ২৪০ ডিভিসন —রাশিয়া ৩৫০ ডিভিসন পর্যন্ত সৈন্যসমাবেশের ক্ষমতা রাখে।···

স্ট্যালিন বলিলেন—১৯৪২ সালের মে মাসে জার্মানী যখন বসন্তকালীন অভিযান শুরু করিবে, তখন উক্ত পরিমাণ সৈন্যদল তিনি সমাবেশ করিতে পারিবেন। তাঁর ইচ্ছা তাঁর সৈন্যদল শত্রুর সংস্পর্শে আসিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করুক। তারা শিখুক যে, জার্মানদেরও খতম করা যায়। তারা কেউ সুপারম্যান বা অতি-মানব নয়।···তিনি মনে করেন যে, জার্মানদের শীঘ্রই আত্মরক্ষার দিকে ঝুঁকিতে হইবে এবং তিনি স্বীকার করেন যে, যদিও রুশদের বৃহত্তম সংখ্যক ট্যাঙ্ক ও মোটরায়িত ডিভিসন আছে, কিন্তু জার্মান যান্ত্রিক ডিভিসনের তুলনায় সেগুলি দাঁড়াইতেই পারে না।

(···none of them were a match for the German Panzer divisions)

তিনি বলিলেন যে, লালফৌজের এখন রহিয়াছে ৪৩০০ বড় ট্যাংক, ৮হাজার মাঝারী ট্যাঙ্ক ও ১২০০০ হাল্কা ট্যাংক। আর জার্মানদের মোট ট্যাংকের সংখ্যা ৩০ হাজার। রাশিয়ার ট্যাংকের উৎপাদন এখন মাসে মাত্র ১ হাজার। তবে, রাশিয়ার ইস্পাতের অভাব ঘটিবে এবং এজন্য তিনি আমেরিকার নিকট ট্যাংকের অর্ডার পেশ করিতে চান।···

স্ট্যালিন বার বার উল্লেখ করিলেন যে, তিনি জার্মান আর্মিকে মোটেই লঘু করিয়া দেখিতেছেন না—

'Stalin repeatedly stated that he did not underrate the German Army. Their organisation was of the very best and they had large reserve of food, men, supplies and fuel···The German is (therefore) capable of taking part in a winter campaign of Russia······—'

অর্থাৎ জার্মান সৈন্য বাহিনীর সংগঠন সবচেয়ে সেরা। খাদ্য, লোকবল, সরবরাহ ও জ্বালানী জার্মানীর প্রচুর—মজুত ভাণ্ডার তাদের রহিয়াছে। অতএব জার্মান সৈন্যবাহিনী রাশিয়ার শীতকালীন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম।···

কিন্তু স্ট্যালিনের ধারণা এই যে, ১লা সেপ্টেম্বরের পর বেশী দিন জার্মানরা আর আক্রমণাত্মক অভিযান চালাইতে পারিবে না। কারণ, তখন প্রচুর বৃষ্টি শুরু হইবে। ১লা অকটোবরের পর মাটির অবস্থা এমন খারাপ হইবে যে, তাদের বাধ্য হইয়াই আত্মরক্ষার নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। স্ট্যালিনের দৃঢ় বিশ্বাস শীতের মাসগুলিতে জার্মানদের লাইন হইবে লেনিনগ্রাদ-মস্কো-কিয়েভের বরাবর। তারা এখন যেখানে আছে বোধহয় সেখান থেকে ১০০ কিলোমিটারের বেশী আসিতে পারিবে না।···

শেরউডের বইতে স্ট্যালিন ও হপকিন্সের মধ্যে সাক্ষাতের যে বিশদ বর্ণনা আছে এবং হপকিন্স স্বয়ং যে সমস্ত রিপোর্ট রচনা করিয়াছেন (অন্ততঃ ২০ পৃষ্ঠাব্যাপী) ইতিহাসের উপাদান হিসাবে সেগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। ৩০শে ও ৩১শে জুলাই, ১৯৪১, পর পর দুই দিন ক্রেমলিনে স্ট্যালিনের সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার

ঘটিয়াছিল এবং একটি সাক্ষাৎকার চলিয়াছিল চার ঘণ্টা ধরিয়া। স্ট্যালিনের সঙ্গে ছাড়াও হপকিন্স পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভ, কয়েকজন সামরিক ও কূটনৈতিক পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের দিক থেকে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই সাক্ষাতের উপসংহারে স্ট্যালিন বলিলেন যে, জার্মানদের নৈতিক শক্তি নীচে নামিয়া গিয়াছে। যদি এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেন যে, তাঁরা হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে যাইতেছেন, তবে, জার্মানদের নৈতিক শক্তি আরও ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

হপকিন্সের রিপোর্ট প্রকাশ—

'Stalin said it was inevitable that we (the USA) would finally come to grips with Hitler on some battlefield. The might of Germany was (still) so great that, even though Russia might defend herself, it would be very difficult for Britain and Russia combined to crush the German military machine. ···He believed the war would be bitter and perhaps long ···and he wanted me to tell the President that he would welcome American troops on any part of the Russian front under the complete command of the American Army··· Finally he asked me to tell the President that, while he was confident that the Russian Army could withstand the German Army, the problem of supply by the next spring would be serious one and that he needed our help.'[১]

হপকিন্সের মূল্যবান রিপোর্টের কেবল এই অংশগুলিই নয়, ব্যক্তি মানুষ হিসাবে স্ট্যালিনের অসাধারণত্ব সম্পর্কে হপকিন্স তাঁর অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তা'ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা স্ট্যালিনকে নিয়া এখনও পৃথিবীব্যাপী বিতর্কের শেষ নাই।

হপকিন্স লিখিয়াছেন—

'তিনি একবারও তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করেননি। তিনি যখন সোজাসুজি কথা বলছিলেন, তখন তিনি জানতেন যে, তাঁর সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে গুলি চালাচ্ছে। খুব দ্রুত কয়েকটি রুশীয় কথায় তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি সংক্ষেপে দৃঢ়তার সঙ্গে ও শিষ্টাচারের সঙ্গে আমার করমর্দন করলেন। একটি শব্দও তিনি অপব্যয় করলেন না, তাঁর মধ্যে কোন অঙ্গভঙ্গী বা কোন ম্যানারইজম (মুদ্রাদোষ) ছিল না। আমি যেন একটা সম্পূর্ণ নিখুঁত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ যন্ত্রের সঙ্গে কথা বলছিলাম, যে যন্ত্রের বুদ্ধি আছে। যোসেফ স্ট্যালিনের জানা ছিল যে, তিনি কি চান এবং পশ্চিম কি চায়···যে প্রশ্নগুলি তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেগুলি ছিল সোজাসুজি, পরিষ্কার ও সংক্ষিপ্ত···তাঁর ভাষাগুলি ছিল একেবারে তৈরী, দ্ব্যর্থহীন এবং মনেহয় যে কথাগুলি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো সেগুলি যেন বছরের পর বছর তাঁর জিহ্বাগ্রেই ছিল। তিনি একটি শব্দও বৃথা ব্যয় করেন না। যদি হঠাৎ কোন উত্তর তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং যদি তিনি সেটা একটু নরম করতে চান, তবে, তিনি তা করেন অত্যন্ত

১। Sherwood—New York, 1948 P. 333-43.

দ্রুত নিয়ন্ত্রিত একটু মৃদু হাসির দ্বারা—যে হাসি হয়তো নির্বিকার, কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ কঠিন, অথচ উষ্ণ। তিনি আপনার কোন অনুগ্রহ চান না। তিনি আপনাকে এমন নিশ্চিত আশ্বাস দেবেন যে, রাশিয়া জার্মানীর এই প্রচণ্ড আক্রমণ ঠেকাবেই এবং সেই সঙ্গে তিনি এটাও ধরে নেন যে, আপনারও এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ···।'

এই বর্ণনারই অন্যত্র আছে—দ্বিতীয় দিন যে চার ঘণ্টা হপকিন্স স্ট্যালিনের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, তখন—

'আমাদের কথাবার্তার মধ্যে একবার মাত্র টেলিফোন বেজে উঠেছিল। তিনি ওই বাধার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন এবং বললেন যে, তিনি তাঁর নৈশ আহারের (সাপার) ব্যবস্থা করছেন রাত সাড়ে বারোটায়। কোন ডেসপ্যাচ বা মেমোরাণ্ডা নিয়ে একবারও কোন সেক্রেটারী প্রবেশ করলেন না।···রাশিয়ার এই ডিক্টেটরের চিত্র কেউ ভুলতে পারে না। কঠিন কঠোর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটি মানুষের মূর্তি। তাঁর পায়ের বুটজুতো এত পালিশ যেন আয়নার মত চক চক করছিল। তেমনি শক্ত ট্রাউজার পরা—কোন সামরিক বা অসামরিক কোন আভরণ তাঁর পরিধানে নেই, তিনি পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা। ১৯০ পাউণ্ড তাঁর ওজন। তাঁর হাতগুলি যেমন প্রকাণ্ড এবং তাঁর মনোবলের মতই শক্ত, তাঁর কণ্ঠস্বর কর্কশ, কিন্তু সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত।

'তাঁর সিগারেট থেকে একটি সিগারেট তিনি আমাকে দিলেন এবং আমার একটি সিগারেট তিনি নিলেন। তিনি অনবরত সিগারেট খেয়ে যান (চেইন স্মোকার) এবং এজন্যই বোধহয় তাঁর নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠস্বরের এই কর্কশতা। তিনি অনেক সময় বেশ উচ্চস্বরে হেসে উঠেন, কিন্তু সংক্ষিপ্ত হাসি এবং কিছুটা ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি। কোন ছোট কথার মধ্যে তিনি নেই! তাঁর 'হিউমার' (বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গকৌতুক) খুব তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী। তিনি ইংরেজী জানেন না, কিন্তু দোভাষীকে উপেক্ষা করে তিনি সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রুশভাষায় এমন দ্রুত কথা বলে গেলেন যে, যেন তাঁর সব কথাই আমি বুঝে ফেলেছি।

আমি আগে বলেছি যে, আমাদের সাক্ষাতের সময় কোন বাধা ঘটেনি—ঘটেছিল দু'বার কিংবা তিনবার। কিন্তু টেলিফোন বেজে ওঠার জন্য নয় বা অবাঞ্ছিতভাবে কোন সেক্রেটারি প্রবেশের জন্যও নয়। বার দু'তিনেক আমি এমন প্রশ্ন করেছিলাম যে, তিনি এক সেকেণ্ডেরও এক ভগ্নাংশ সময় মাত্র ভেবে নিয়ে নিজেই সন্তোষবোধ করলেন না। তখন তিনি একটা বোতাম টিপলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে একজন সেক্রেটারি দেখা দিলেন, মনে হলো তিনি যেন দরজার কাছেই একেবারে সতর্ক হয়ে অপেক্ষা করছিলেন, তিনি 'অ্যাটেনশনের' ভঙ্গীতে এসে দাঁড়ালেন। স্ট্যালিন আমার প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলেন। উত্তরটা যেন গুলির মত বেরিয়ে এলো। সেভাবেই সেক্রেটারী মশাই অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।'[১]

* * *

স্ট্যালিনের এই অন্তরঙ্গ ছবি আজও পাঠকদের কাছে অপূর্ব মনে হইবে এবং আভাষ পাওয়া যাইবে তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বের ও ব্যক্তিত্বের। বলা বাহুল্য যে, স্ট্যালিনের সঙ্গে হপকিন্সের এই সাক্ষাতে হপকিন্সের মনের উপর গভীর রেখাপাত হইয়াছিল এবং এমন রেকর্ড তিনি রাখিয়া গিয়াছেন যা সেদিনের অবস্থার বিষয়ে

১। শেরউড, পৃষ্ঠা ৩৪৪।

মহামূল্যবান। ঐতিহাসিক মিঃ শেরউড মন্তব্য করিয়াছেন যে, মাত্র দুই দিনে হপকিন্স রাশিয়ার শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে এমন সমস্ত তথ্য জানিতে পারিয়াছিলেন, যেগুলি তাঁর আগে কোন বাইরের লোকের পক্ষে জানা সম্ভব হয় নাই। হপকিন্স ক্রেমলিন থেকে এই ধারণা নিয়াই বিদায় নিয়াছিলেন যে, স্ট্যালিন কোন আজেবাজে কথা বলার মানুষ নন, তিনি তাঁর মনের কথাটি বলিয়াছেন।

"This was indeed the turning point in the wartime relations of Britain and the United States with the Soviet Union. No longer would all Anglo-American calculations be based on the probability of early Russian collapse—after this, the whole approach to the problem was changee".—(Sherwood, P. 343)

অর্থাৎ 'বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধকালীন সম্পর্কের এটাই ছিল দিক পরিবর্তনের চিহ্নের মত। আগেই রাশিয়ার পতনের সম্ভাবনা আছে, একথা ধরিয়া লইয়া পরে ইঙ্গ-মার্কিনের পক্ষে হিসাব নিকাশের কোন প্রয়োজন রহিল না—এই সাক্ষাতের পর সমস্ত সমস্যাটি বুঝিবার পক্ষে গোটা ধারাটিই যেন বদলাইয়া গেল।'

রুশ-জার্মান সংগ্রামের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক মিঃ আলেকজান্দার ভার্থও তাঁর বইতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাতের যে বিবরণী মিঃ হ্যারি হপকিন্স রাখিয়া গিয়াছেন, সেগুলি অমূল্য সম্পদ। প্রকৃতপক্ষে জার্মান আক্রমণের চরম পর্যায়ের সময় স্ট্যালিনের মনোভাব কি ছিল, সেটা বুঝিবার পক্ষে একমাত্র নির্ভর-যোগ্য প্রাথমিক রিপোর্ট ছিল হপকিন্সের। কিন্তু এই সমস্ত বিবরণীর মধ্যে কতকগুলি প্রশ্ন চিন্তা করার আছে। যেমন—১৯৪১ সালের জুলাই মাসের শেষে যুদ্ধের যে অবস্থা ছিল, তাতে মনে হয় স্ট্যালিন ইচ্ছা করিয়াই কিছুটা অনুকূল চিত্র আঁকিয়াছিলেন মার্কিন সাহায্য পাওয়ার আশায়। লালফৌজের ট্যাংক ও বিমানবহরের যে অপ্রতুলতা ছিল, সেকথাও তিনি গোপন করিয়াছিলেন এবং ইচ্ছা করিয়াই ১৯৪২ সালের বসন্তকালীন অভিযানের পরিকল্পনা ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের উপর জোর দিয়াছিলেন।

কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়ের কথা, স্ট্যালিনের বাহ্যিক দৃঢ়তা ও কঠোরতা সত্ত্বেও তিনি যেন স্নায়বিক দুর্বলতার লক্ষণ গোপন করিতে পারেন নাই। অন্যথা হপকিন্সের রিপোর্ট এমন কথার উল্লেখ থাকিত না যে, স্ট্যালিন সোভিয়েট রণাঙ্গনের যে কোন অংশে মার্কিন সেনাপতির অধীনে মার্কিন সৈন্যের যুদ্ধে যোগদানকে স্বাগত জানাইবেন।

তাঁর এই উদ্বেগ ও স্নায়বিক দুর্বলতার লক্ষণ বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে উক্রাইনের অধিকাংশ জার্মানীর দখলে চলিয়া যাওয়ার পর। ৩রা সেপ্টেম্বর তিনি চার্চিলের নিকট এক চিঠিতে লেনিনগ্রাদে ও উক্রাইনে পরিস্থিতির গুরুতর পরিণতির কথা জানাইলেন এবং বলিলেন যে, জার্মানরা একে একে তাদের শত্রুদের খতম করিতে চায়—প্রথমে রুশ, পরে বৃটিশকে।

'ক্রিভয়রগের' (শ্রমশিল্পের প্রকাণ্ড কেন্দ্র) পতনের দ্বারা আমাদের প্রতিরক্ষার শক্তি হ্রাস পাইয়াছে এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে

'—has confronted the Soviet with mortal danger—"

এর একমাত্র প্রতিকার এই বছরেই বলকানে বা ফ্রান্সের কোথায় দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি···

স্ট্যালিন এই চিঠিতে চার্চিলকে আরও লিখিলেন দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার সাথে সাথে অক্টোবরের আরম্ভেই ৩০ হাজার টন এলুমিনিয়াম এবং 'প্রতি মাসে' অন্ততঃ ৪০০ এরোপ্লেন ও ৫০০ ট্যাঙ্ক (ছোট ও মাঝারি) সোভিয়েট ইউনিয়নকে পাঠাইবার জন্য। কারণ, স্ট্যালিনের মতে এই দুই প্রকারের সাহায্য ছাড়া রাশিয়ার পক্ষে টিকিয়া থাকা কঠিন।

এর দশদিন পর স্ট্যালিন আবার চার্চিলকে এই মর্মে পত্র দিলেন যে, যদি বর্তমান অবস্থায় দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা কার্যতঃ সম্ভব নাও হয়, তবে বৃটেন অন্ততঃ এইটুকু করিতে পারেন যে, তাঁরা ২৫ থেকে ৩০ ডিভিসন সৈন্য আর্চেঞ্জেল বন্দরে অনায়াসেই নামাইতে পারেন কিংবা ঐ সৈন্যদিগকে জাহাজযোগে রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে পাঠাইতে পারেন এবং তারা ইরাণ হইয়া সোভিয়েট ভূমিতে সোভিয়েটের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা করিতে পারেন। এর দ্বারাও প্রভূত সহায়তা করা হইবে।

নিঃসন্দেহে সেই সময় রাশিয়ার অবস্থা কাহিল হইয়াছিল এবং স্ট্যালিনের উৎকণ্ঠাও খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। এজনাই হ্যারি হপকিন্সের রিপোর্ট দেখা যায় যে, স্ট্যালিন রুজভেল্টের নিকট মার্কিন সৈন্যপত্যের অধীনে মার্কিন সৈন্য এবং চার্চিলের নিকট স্বলিখিত পত্রে বৃটিশ সৈন্য প্যাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সাধারণ অবস্থায় স্ট্যালিনের পক্ষে এমন প্রস্তাব বোধহয় কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ যখন 'বিদেশীদের' সম্পর্কে রাশিয়াতে এত সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রবল ছিল। ··

কিন্তু ১২ই জুলাই ১৯৪১-এর ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি অনুসারে পারস্পরিক সামরিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি এবং স্ট্যালিনের ঐকান্তিক আবেদন সত্ত্বেও চার্চিল দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিলেন কেন? একথা মনে রাখা দরকার ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি স্বাক্ষরের পিছনে বৃটেনের জনমতের প্রবল সমর্থন ছিল। কারণ, তাঁরা অনুভব করিয়াছিলেন যে, রাশিয়ার পরাজয়ের দ্বারা বৃটিশ জনগণের বিপদ বৃটিশ জনগণের বিপদ ঘটিবে। শ্রমিক দল, বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং অজস্র সংগঠন সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি গভীর সমর্থন ও সহানুভূতি জানাইতে ছিলেন। রাশিয়াকে মেডিক্যাল সাহায্য দেওয়ার জন্য অক্টোবরের মাঝামাঝি ২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ডের চাঁদা পর্যন্ত সংগৃহীত হইল।

কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ও বৃটিশ সেনাপতি-মণ্ডলীর মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি বিরূপ মনোভাব কম ছিল না। রাশিয়ার সামরিক শক্তির উপরেও তাঁদের আস্থা ছিল না। তাঁরা চাহিতেছিলেন রাশিয়া ও জার্মানী উভয়েই পারস্পরিক যুদ্ধের দ্বারা ঘায়েল হোক এবং এভাবে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষিত হোক। দ্বিতীয়তঃ বৃটিশ রক্ষণশীল নেতারা ও চার্চিল ছিলেন মূলতঃ সাম্রাজ্য ও উপনিবেশবাদী এবং সাম্রাজ্য রক্ষাই ছিল চার্চিলের মূল লক্ষ্য। সুতরাং আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাঁর নজর বেশী ছিল এবং প্রচুর পরিমাণ রসদ, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য তিনি সেখানে পাঠাইতেছিলেন। সোভিয়েট ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার

১। Alexander Werth—Russia At War. P. 273--74.

২। V. Trukhanovesk—P. 169—170.

মত বৃটেনের তখন উপযুক্ত সামরিক শক্তি ছিল না, এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তাঁরা বলিতেছেন যে, ফ্রান্সের উপকূলভাগে তখন 'প্রতিরক্ষা প্রাচীর' তেমন শক্ত ছিল না। মার্কিন ঐতিহাসিক ট্রামবুল হিগিন্স বলিয়াছেন যে, নাৎসী সেনাপতিরা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ফ্রান্সের উপকূলে তখন ছিল 'প্রোপাগাণ্ডা ওয়াল', অর্থাৎ বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রক্ষা প্রাচীরের নামে অতিরঞ্জিত প্রচার।—

সেই সময় বৃটিশ সামরিক শক্তি সম্পর্কে চার্চিলের লিখিত ইতিহাসেই (তৃতীয় খণ্ড ৭৬৫-৬৬) দেখা যায় যে, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে তখন ২০ লক্ষের অধিক সৈন্য ও ১৫ লক্ষ হোমগার্ড ছিল। এদের মধ্যে ২০ ডিভিসন ছিল মোবাইল (গতিশীল) ডিভিসন, ৯টি অর্ধ-গতিশীল ডিভিসন, ৬টি সাঁজোয়া ডিভিসন, ৫টি সাজোয়া ব্রিগেড এবং এগুলি ছাড়া নৌ ও বিমান বহর—শেষোক্ত শক্তি হিটলারের চেয়ে বৃটেনের বেশীই ছিল অর্থাৎ সোভিয়েট লেখক ট্রুখনোভস্কি মনে করেন যে, বৃটিশ সরকার ইচ্ছা করিলে সেই সময় ফ্রান্সের উপকূলে সৈন্য নামাইতে ও দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিতে পারিতেন।

এমন কি, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, লর্ড বীভারব্রুক, শ্রমিক নেতা মিঃ বীভান প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বৃটিশ জনমতও সেই প্রস্তাবের পক্ষে ছিল।

বলা বাহুল্য যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হইল না। কিন্তু অবস্থার চাপে পড়িয়া বৃটেনকে সোভিয়েটের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রাখিতেই হইল এবং ১৯৪১ সালে এই সহযোগিতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন ছিল ইঙ্গ-সোভিয়েট কর্তৃক ইরান দখল।

ইরান দখল

১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে মধ্যপ্রাচ্যে নাৎসী পক্ষপাতী কার্যকলাপের জন্য বৃটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয়েই উদ্বিগ্ন হইল। সৌভাগ্যক্রমে এই সমস্ত কার্যকলাপ নিবারণে ও নিয়ন্ত্রণে বৃটেন ও সোভিয়েট একমত ছিলেন। ফলে তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্থানকে ফ্যাসিস্ট ব্লকে যোগদান থেকে বিরত রাখা সম্ভব হইল এবং এই ব্যাপারে বৃটেন ও সোভিয়েট একযোগে যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করেন, তাতে নাৎসী পক্ষপাতী চক্র নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল।

১৯৪১, ১৯শে জুলাই বৃটিশ ও সোভিয়েট সরকারের পক্ষ থেকে দাবী করা হইল যে, ইরানে যে সমস্ত জার্মান শত্রুতামূলক কার্যকলাপ চালাইতেছে, ইরান সরকার যেন তাদের দমন করেন। ১৬ই আগস্ট আর-একটি যুগ্মলিপি ইরান সরকারের নিকট পাঠানো হইল। কিন্তু ইরান সরকার এই সমস্ত লিপিকে তেমন আমল দিলেন না। তখন ২৫শে আগস্ট, ১৯৪১, সোভিয়েট সরকার ইরান সরকারকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ১৯২১ সালের সোভিয়েট-ইরান চুক্তির ৬নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট আত্মরক্ষার খাতিরে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হইতেছেন এবং ২৬শে আগষ্ট তারিখ সোভিয়েট সৈন্যেরা ইরানে প্রবেশ করিল। দক্ষিণ রাশিয়ার ককেশাস অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধানই ছিল এর মূল লক্ষ্য। বৃটেনও ইরান সম্পর্কে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিল।[২]

প্রকৃতপক্ষে বৃটেনেরও সৈন্য না পাঠাইয়া উপায় ছিল না। কারণ, দক্ষিণ ইরানে এ্যাংলো-ইরানীয়ান অয়েল কোম্পানীর বিরাট পেট্রোল সম্পদ সুরক্ষিত করার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ, এই পেট্রোল সরবরাহ করা হইত ভূমধ্যসাগরের ও ভারত মহাসাগরের বৃটিশ নৌবহরগুলির জন্য, আর মধ্যপ্রাচ্যের বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর জন্য। ১৯৪১ সালের বসন্তকালে ইরাকে জার্মান পক্ষপাতী অভ্যুত্থান (রসিদ আলী) ঘটার আগেই বৃটেনের টনক নড়িয়াছিল। ১০ই জুলাই, ১৯৪১, ভারতের বৃটিশ প্রধান সেনাপতি জেনারেল আর্চিবল্ড ওয়েভেল ইরানে জার্মানদের (সংখ্যা প্রায় দুই হাজার) কার্যকলাপ সম্পর্কে বৃটিশ সরকারকে সতর্ক করিয়া দিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে, ইরানের মধ্য দিয়া রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলানো একান্ত দরকার। বৃটিশ সরকার কিন্তু আমেরিকাকেও এই বিষয়ে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু পাছে বৃটেন ইরানে কোন 'অতিরিক্ত সুবিধা' আদায় করিয়া নেয়, এই আশঙ্কাতে ইরানের উপর চাপ সৃষ্টি করিতে রাজী হইলেন না। অবশেষে এই সমস্যার মীমাংসা হইল ইঙ্গ-সোভিয়েট যুগ্ম অভিযানের দ্বারা। উত্তর দিকে সোভিয়েট সৈন্যেরা এবং দক্ষিণ দিকে বৃটিশ সৈন্যেরা (১৯ হাজার) ইরানে প্রবেশ করিল।[১]

এই দখলদারির ফলে রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল এবং ইরানের তৈলকূপগুলি যেমন সুরক্ষিত হইল, তেমনি আর একটি বড় কাজ হইল পারস্য উপসাগর থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহের পথ উন্মুক্ত রাখা। কেননা, মিত্রপক্ষ, বিশেষভাবে চার্চিল মনে করিতেন যে, রাশিয়াকে সরবরাহ যোগান দেওয়ার পক্ষে ব্লাডিভোস্টক বন্দরের পথ কিম্বা মেরু সমুদ্রের পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। সুতরাং পারস্য উপসাগরের পথই ছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

ইঙ্গ-সোভিয়েট সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে জার্মান পক্ষপাতী রেজা শা সিংহাসন ত্যাগ করিলেন, নূতন ইরানীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। রেজা শা দূরবর্তী জোহান্সবার্গে (দক্ষিণ আফ্রিকা) নির্বাসনে প্রেরিত হইলেন এবং সেখানে ১৯৪৪ সালে মারা গেলেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১, তেহরাণ ইঙ্গ-সোভিয়েটের দখলে গেল এবং রেজা শা'র পুত্র ২২ বৎসর বয়স্ক নূতন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মিত্রপক্ষের পরামর্শে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। এর পর ১৮ই অক্টোবর তারিখ বৃটিশ ও সোভিয়েট সৈন্যেরা তেহরাণ ছাড়িয়া চলিয়া আসেন—কেবলমাত্র যোগাযোগ রক্ষার পাহারা দেওয়ার জন্য কিছু সৈন্য ছিল।

চার্চিল লিখিয়াছেন যে, যুদ্ধের সময় ইরানের এই গুরুত্বপূর্ণ পথ দিয়া রাশিয়াকে মোট ৫০ লক্ষ টন সরবরাহ দেওয়া হইয়াছিল।[২]

নাৎসীবিরোধী ইঙ্গ-সোভিয়েট সহযোগিতার পক্ষে এই ঘটনা নিশ্চয়ই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছিল।

১। British Foreign Policy—P. 203-4.

২। Churchill—Vol. 3, P. 432.

মস্কোতে ইঙ্গ-মার্কিন মিশন

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধিরূপে হ্যারি হপকিন্স জুলাই মাসের শেষে মস্কোতে স্ট্যালিনের সঙ্গে যে দুইদিন সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সেই সাক্ষাৎকার ঐতিহাসিক। মস্কোস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্টেইনহার্ড পররাষ্ট্র দপ্তরে জানাইয়াছিলেন যে, হপকিন্সের এই সাক্ষাৎ ছিল অসাধারণ। স্ট্যালিনের সঙ্গে খুব দীর্ঘ বিস্তৃত সময় তাঁর সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং "যেরূপ খোলা-খুলিভাবে স্ট্যালিন তাঁর সঙ্গে এই আলোচনা করিয়াছিলেন, আমার জানা কালের মধ্যে সোভিয়েট ইতিহাসে তার কোন তুলনা নাই।"[১]

মস্কো থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হপকিন্স চার্চিলের কাছেও স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিবরণী দিয়াছিলেন। কিন্তু হপকিন্সকে পুনরায় আর্চেঞ্জেলের সেই বিপজ্জনক পথেই ফিরিতে হইল এবং সেই একই ফ্লাইংবোট—উত্তর সমুদ্রের শত্রু বিমান ও ডেস্ট্রয়ারের গুলিবর্ষণ আশংকাকে উপেক্ষা করিয়া ঝড়ো হাওয়ার মধ্যেই যাত্রা করিতে হইল। কিন্তু এবার দুর্দশার আর ইয়ত্তা রহিল না। কারণ, যে অপরিহার্য ঔষধগুলি ছাড়া হপকিন্সের বাঁচিয়া থাকাই কঠিন এবং যে ঔষধগুলি তিনি সর্বদাই বহন করিতেন, এবার দৈবক্রমে তিনি সেগুলি মস্কোতে ফেলিয়া আসিলেন। অতএব তাঁর অবস্থা চরমে পেঁছিল এবং যখন স্কটল্যাণ্ডের স্কাপা ফ্লোতে বৃটিশ নৌবহরের প্রধান এডমিরাল স্যার জন টোভের কাছে কোনও রকমে পেঁছাইয়া দেওয়া হইল, তখন সত্য সত্যই এমন আশংকা দেখা দিল যে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের এই ব্যক্তিগত প্রতিনিধিটি তাঁর মস্কোর রিপোর্ট পেশ করার জন্য আর প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন কিনা! তবু তাঁকে কোনমতে টানিয়া তুলিয়া ডিনারে বসানো হইল এবং "এডমিরাল মহোদয় তাঁর সাধ্যমত সমস্ত মেডিক্যাল সাহায্য একত্র করিয়া ও ঘুমের ঔষধ দিয়া" তাঁকে নিদ্রামগ্ন করিয়া রাখিলেন।...

কিন্তু সময় ছিল না। পরদিনই হপকিন্সকে আবার 'প্রিন্স অব ওয়েলস' যুদ্ধ-জাহাজে চড়িতে হইল চার্চিলের সঙ্গে অতলান্তিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য।

আর্চেঞ্জেল যাতায়াতকারী আর. এ. এফ. বিমানের ক্যাপ্টেন ম্যাককিনলি যথার্থই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, এত অসুস্থ দেহে হপকিন্স যে সাহস ও দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন, তা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি তাঁর কর্তব্যপরায়ণতাও অতুলনীয়।

আগেই বলা হইয়াছে যে, রুজভেল্টের পক্ষ থেকে হপকিন্স গোড়াতে লণ্ডনেই আসিয়াছিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সঙ্গে ইউরোপীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য এবং সেখান থেকে তিনি পূর্ব রণাঙ্গনের অবস্থা বুঝিবার জন্য বহু কষ্ট সহ্য করিয়া মস্কোতে গিয়াছিলেন অসুস্থ দেহে। পরে শেরউডের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে চার্চিল হপকিন্সের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন—"ওই শীর্ণ দেহের আড়ালে একটা প্রকাণ্ড হৃদয় লুকিয়ে আছে।"—একথা বলিতে বলিতে চার্চিলের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। শেরউড তাঁর বিখ্যাত বইতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, চার্চিল একজন "পুরাপুরি ইংরাজ"। অতএব বাইরের ব্যবহারে তাঁর উদাসীন থাকারই কথা। কিন্তু তাঁর ভিতরটা ছিল একেবারে "নগ্নভাবে ভাবাবেগে"

১। Sherwood—P. 346.

ভার্ট! অথচ রুজভেল্ট ছিলেন বিপরীত—একজন "সেণ্টিমেণ্টাল আমেরিকান"। কিন্তু তাঁর বাইরের মুখ চোখ দেখিয়া—একমাত্র আন্দাজ করা ছাড়া বুঝিবার উপায় ছিল না, তাঁর ভিতরে কি ঘটিতেছে।[১]

স্ট্যালিনের সঙ্গে হপকিন্সের এই সাক্ষাতের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়াই সেপ্টেম্বর মাসের শেষে মস্কোতে চার্চিল ও রুজভেল্ট একটি ইঙ্গ-মার্কিন মিশন পাঠাইয়াছিলেন। বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে লর্ড বীভারব্রুক এবং মার্কিন সরকারের পক্ষে আভেরিল হ্যারিমান ২৮শে সেপ্টেম্বর মস্কোতে পৌঁছিলেন। মলোটোভের সভাপতিত্বে কয়েকদিন ধরিয়া এই বৈঠকের অনুষ্ঠান হইল এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় কি কি সামরিক দ্রব্যসম্ভার, কাঁচামাল ইত্যাদি সরবরাহ করা যাইতে পারে সেই সমস্তই আলোচনা হইল। বৈঠকের শেষে এই মর্মে ইস্তাহার প্রকাশ করা হইল যে, "রাশিয়া যা কিছু চেয়েছে, বৃটেন ও আমেরিকা তার সমস্তই সরবরাহ করতে রাজী।" ১লা অক্টোবর তিন গভর্নমেণ্টের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।

কিন্তু মস্কোতে ইঙ্গ মার্কিন মিশনের সামরিক গুরুত্বের চেয়েও রাশিয়ানদের কাছে এর রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল অনেক বেশী। কেননা হিটলারের বিরুদ্ধে ইঙ্গ মার্কিন সোভিয়েট মৈত্রী এভাবেই গড়িয়া উঠিতেছিল। চার্চিলের মন্ত্রিসভায় লর্ড বীভারব্রুক (এবং স্যার এণ্টনি ইডেন) ছিলেন সবচেয়ে বেশী রুশ পক্ষপাতী। মস্কো বৈঠকের অভিজ্ঞতার পর বীভারব্রুকের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, "পৃথিবীতে একমাত্র রুশরাই পারে জার্মানীকে গুরুতরভাবে কাহিল করিতে।" অথচ তখন রুশ রণাঙ্গনে যুদ্ধের খুব ভয়াবহ অবস্থা চলিতেছিল। বীভারব্রুকের সঙ্গে প্রায় প্রতি রাত্রে স্ট্যালিনের সাক্ষাৎ হইত এবং "বীভারব্রুক স্ট্যালিনের প্রশংসায় এমন পঞ্চমুখ হইলেন যে, তাঁকে প্রায় আকাশে তুলিয়া দিলেন।" —"স্ট্যালিনের তীক্ষ্ন বাস্তব বুদ্ধি, তাঁর সংগঠন ক্ষমতা এবং সর্বোপরি জাতীয় নেতা হিসাবে তাঁর গুণাবলী বীভারব্রুকের মনের উপর সত্যি সত্যি গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।"—মস্কো বৈঠক সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন মিঃ আলেকজান্দার ভার্থ।[২]

এই সময় চেকোশ্লভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল বটে, কিন্তু পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ সীমানা নিয়া লণ্ডনপ্রবাসী পোলিশ সরকারের সঙ্গে কোন মীমাংসা হইল না, বরং বিরোধ রহিয়াই গেল। তথাপি জোড়াতালি দেওয়া মীমাংসার ফলে সোভিয়েট রাশিয়াতে একটি পোলিশ আর্মি গঠিত হইল এবং তার অধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন সোভিয়েট জেল থেকে সদ্যমুক্ত জেনারেল এ্যাণ্ডার্স।

জেনারেল দ্য গলের সঙ্গেও সোভিয়েট সরকারের চুক্তি হইল ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ এবং দ্য গলকে 'স্বাধীন ফ্রান্সের' অধিনায়করূপে স্বীকার করা হইল এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা—৩৬৯।
২। রাশিয়া এ্যাট্ ওয়ার—পৃঃ ২৬৭।

চতুর্থ অধ্যায়

গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার—আমেরিকা

অতলান্তিক বৈঠকে রুজভেল্ট-চার্চিল

১৯৪০ সালের ৫ই নভেম্বর ফ্রাংকলিন ডি. রুজভেল্ট তৃতীয় বারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হইলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান দলের ওয়েন্ডেল এল. উইলকি, যিনি ১৯৪২ সালে মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে পৃথিবী পরিক্রমা করিয়া এবং ৩১ হাজার মাইল ভ্রমণ পথে 'এক বিশ্ব' বা 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড' শ্লোগান প্রচার করিয়া প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি সেদিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে হারিয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রুজভেল্টের জয়লাভ ছিল অসাধারণ। কেননা রুজভেল্টকে নিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভে আমেরিকায় বিতর্কের অবধি ছিল না। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দুই বারের বেশী প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের কোন রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু রুজভেল্ট আমেরিকার এই ট্র্যাডিশন ভঙ্গ করিয়া তৃতীয় বারের জন্য রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হইলেন—যে ঘটনা ছিল অভূতপূর্ব। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পর ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৪০, তিনি যে বেতার ভাষণ দিলেন, তাতে আগ্রাসী ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের জন্য আমেরিকার বিপদের কথা উল্লেখ করিলেন এবং জাতীয় ভিত্তিতে এমন উৎপাদনের জন্য আহ্বান জানাইলেন যাতে আমেরিকা 'গণতন্ত্রের অস্ত্রাগারে' পরিণত পারে।[১]

রুজভেল্টের সেই বক্তৃতা থেকেই সারা পৃথিবীতে 'গণতন্ত্রের অস্ত্রাগারে কথাটি ছড়াইয়া পড়িল এবং মিত্র শক্তিবর্গের প্রচার মাহাত্ম্যে কলিকাতাসহ দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রের শিরোনাম দখল করিয়া বসিল। Lend and Lease বা কর্জ ও ইজারা আইন মহাযুদ্ধের ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। কেননা, এই আইন অনুসারেই আমেরিকা থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র ও মালপত্র মিত্র শক্তিবর্গকে সরবরাহ করা হইয়াছিল।

ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকে রক্ষা করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রশান্ত মহাসাগরের জাপানী আক্রমণের পর আমেরিকা অবশ্যই সরকারীভাবে যুদ্ধরত হইল। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে এই মহাযুদ্ধের সাহায্য দান ও যোগদান নিয়া প্রচুর বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। কেননা, ১৯১৪—১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ থেকেই 'ইউরোপের নরককুণ্ড' নিয়া আমেরিকায় প্রচণ্ড বিতণ্ডা ছিল। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে ইউরোপে যখন এই যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন আমরিকার জনগণের কাছে সেই ঘটনাটা ছিল এমন অপ্রত্যাশিত যে, বজ্রপাতের মত নিদারুণ। গোড়াতে কোন পক্ষেই মতামত খুব প্রবল ছিল না, কোন এক পক্ষের দিকেই জনমতের সমর্থন নিরঙ্কুশ ছিল না। তবে সেই

১। The War 1939-1945—By Louis L. Snyder. USA, 1964. P. 238.

সময় অনেকেই বৃটিশ বিরোধী ও জার্মান পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ১৯১৭ সালে প্রেসিডেণ্ট উইলসনকে আমেরিকার পক্ষ থেকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইল এবং আমেরিকার কলকারখানায় উৎপাদিত বিশাল অস্ত্রসম্ভারের সাহায্যে কাইজারের জার্মানী পরাজিত হইল বটে, কিন্তু পরবর্তী কাল ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরের সময় মার্কিন জনমত মনে করিল যে, ইউরোপীয় (প্রধানত বৃটিশ ও ফরাসী) রাষ্ট্রধুরন্ধরগণের দ্বারা আমেরিকা প্রবঞ্চিত হইয়াছে। এমন কি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগ অফ নেশন্সের সদস্যপদ গ্রহণে পর্যন্ত অস্বীকৃত হইত। সেই থেকে কিংবা ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৯ সালে পর্যন্ত 'সুদীর্ঘ যুদ্ধবিরতির' সময় আমেরিকা ইউরোপীয় ব্যাপারে বাহ্যত নির্লিপ্ত হইয়া পড়িল এবং নির্লিপ্ততাবাদীগণ (আইসোলেশানিস্ট) প্রচার করিতে লাগিলেন যে, ইউরোপীয় দেশগুলি বার বার নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে জড়াইয়া পড়িতেছে, আমেরিকা কেন সেই ব্যাপারে মাথা গলাইতে যাইবে? তাঁরা জর্জ ওয়াশিংটনের উপদেশ স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, ইউরোপীয় মহাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার থেকে আমেরিকার দূরে থাকাই উচিত। কিন্তু আমেরিকার এই 'উদাসীন' মনোভাবের পিছনে কেবল কি ভালোমানুষী ছিল, কিংবা অন্য কোন নিগূঢ় কারণ ছিল? আসলে 'মনরো ডকট্রিনে'র (১৮২৩ ডিসেম্বর) কৃপায় গোটা দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল সম্পদ মার্কিন ধনিক ও বণিকদের নিকট রিজার্ভ ফরেস্টের মত সংরক্ষিত মৃগয়ার ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দিয়া নতুন সাম্রাজ্য সন্ধানে তাদের বাহির হওয়া প্রয়োজন ছিল না।* মূলত এজন্যই ইউরোপীয় যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে মার্কিন ধনবাদী সমাজের বহু লোক নির্লিপ্ততা বা 'আইসোলেশন'-এর পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কিন্তু এই সমস্ত পুরাতন কথা। আসলে রুজভেল্ট যখন প্রথম প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হইলেন, তখন থেকেই জার্মানীতে হিটলার ক্ষমতায় আসীন এবং ইউরোপে ফ্যাসিজমের দৌরাত্ম্য শুরু। রুজভেল্ট ছিলেন উদারতাবাদী এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল প্রগতিশীল ও মানবিক। তিনি প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার পরেই সোভিয়েট রাশিয়াকে প্রথম কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেন (১৯৩৩, নভেম্বর) এবং আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য 'কালেকটিভ সিকিউরিটি' বা যৌথ নিরাপত্তার নীতির উপর জোর দিলেন। হিটলার-মুসোলিনীর দাপাদাপির দিকে তাকাইয়া ১৯৩৭ সালের ৫ই অক্টোবর শিকাগোতে Quarantine of aggressors' নামে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, ইতিহাসে তা' স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই বক্তৃতায় তিনি বলিলেন—

দুর্ভাগ্যক্রমে এটা সত্য যে, পৃথিবীব্যাপী অরাজকতা সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়াইয়া পড়িতেছে। যখন সংক্রামক ব্যাধি দেখা দেয়, তখন সমাজের বাকী জনগণের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য ব্যাধি আক্রান্ত রোগীদিগকে কোয়ারেণ্টাইনে আবদ্ধ করিয়া রাখার প্রয়োজন ঘটে। যুদ্ধ এইপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি···এবং ব্যাধি থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমেরিকাকে নিশ্চয়ই শান্তির সন্ধান করিতে হইবে।[২]

---

* ১৮২৩ ২রা ডিসেম্বর প্রেসিডেণ্ট জেমস মনরো এই মর্মে ঘোষণা দিয়াছিলেন যে, উভয় আমেরিকার রাজ্যগুলি আমেরিকান গভর্নমেণ্টেরই সংরক্ষিত এলাকা বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই মহাদেশের কোথাও অন্য কোন শক্তিকে, কোন ইউরোপীয় শক্তিবর্গকে দক্ষিণ আমেরিকায় ঢুকিতে দেওয়া হইবে না।

২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২৩০।

কিন্তু আসন্ন মহাযুদ্ধের ছায়া যতই ঘনীভূত হইতে লাগিল ততই মার্কিন সমাজে বিতর্কের ঝড় বহিতে লাগিল। ১৯১৪ সালে যে মার্কিন জনগণ বিস্ময় বোধ করিয়াছিল, ১৯৩৯ সালে তারাই অবাক মানিতে লাগিল। অবশ্য আমেরিকায় নাৎসী আগ্রাসন ও হিটলারী বর্বরতার বিরুদ্ধে জনমত যথেষ্ট প্রবল ছিল। তথাপি অবিলম্বেই যুদ্ধে যোগদানের পক্ষপাতী বড়-একটা কেউ ছিলেন না। বরং তাঁদের মধ্যে তিনটি সুস্পষ্ট মতের অভিব্যক্তি ছিল—প্রথমত শক্তিশালী ও বৃহৎ একদল ছিলেন 'আইসোলেশন' বা নির্লিপ্ততার তীব্র পক্ষপাতী। দ্বিতীয় দল ছিলেন নাৎসী শক্তিবর্গের দ্বারা আক্রান্ত দেশগুলিকে যুদ্ধ ছাড়া যথাসম্ভব সাহায্য দানে ইচ্ছুক এবং তৃতীয় দল ছিলেন আমেরিকার নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাইবার পক্ষে।

যদিও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ব্যক্তিগতভাবে নাৎসী আগ্রাসনের সম্পূর্ণ বিপক্ষে এবং আক্রান্তদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তবু তিনি সহসা এমন কোন নাটকীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে সাহস পাইলেন না যাতে আমেরিকা যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে পারে। এ জন্যই পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হওয়ার পর ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯, তিনি ঘোষণা করিলেন—'আমেরিকা নিরপেক্ষ থাকিবে' এবং ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখ ১৯৩৭ সালের নিরপেক্ষতা আইনের শর্তগুলি প্রয়োগ করিলেন এবং যুদ্ধরত দেশগুলিকে অস্ত্র প্রেরণ নিষেধ করিলেন। কিন্তু এর ফলে বৃটেন ও ফ্রান্সই সবচেয়ে বেকায়দায় পড়িল এবং অভিযোগ উঠিল যে, এর দ্বারা কার্যত জার্মানীকেই সাহায্য করা হইবে। ৮ই সেপ্টেম্বর 'সীমাবদ্ধ জরুরী অবস্থা' ঘোষণা করা হইল এবং ৪ঠা নভেম্বর নিরপেক্ষতা আইনের সংশোধনপূর্বক অস্ত্র সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইল এবং সদ্য গৃহীত (২রা নভেম্বর) 'ক্যাশ এ্যাণ্ড কেরি' অর্থাৎ নগদ টাকার বিনিময়ে প্রেসিডেণ্টের ইচ্ছানুযায়ী যুদ্ধরত দেশগুলিতে অস্ত্র ও মাল সরবরাহের অনুমতি দেওয়া হইল।* কিন্তু এই সমস্ত অস্ত্র ও মাল যুদ্ধরত দেশগুলিকে আমেরিকায় কিনিতে অনুমতি দেওয়া হইল বটে, কিন্তু পরিবহণের ব্যবস্থা সেই সমস্ত দেশকেই করিতে হইত, অন্যথা সমুদ্রপথে জার্মান আক্রমণে মার্কিন জাহাজ মারা যাওয়ার ভয় ছিল।

১৯৪০ সালের মে-জুন মাসে পশ্চিম রণাঙ্গনের চূড়ান্ত যুদ্ধে নাৎসী জার্মানীর হাতে পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবর্গের পরাজয় এবং ফ্রান্সের অতি শোচনীয় আত্মসমর্পণের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তখন থেকেই আমেরিকার নিরাপত্তার প্রশ্নটি নিয়া উৎকণ্ঠিত গুঞ্জন শুরু হইল। প্রথম মহাযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগ দিতে বাধ্য হইলেও বৃটেন জার্মানীর দখলে চলিয়া যাইতে পারে কিংবা বৃটিশ রয়েল নেভী বা রাজকীয় নৌবহর ধ্বংস এবং অতলান্তিক মহাসমুদ্রের নিরাপত্তার ব্যবধান ভাঙিয়া পড়িতে পারে, এমন দুর্ভাবনা তখন ছিল না। কিন্তু এবার সেই দুর্ভাবনা কালো মেঘের ছায়ার মত দেখা দিতে লাগিল। অতলান্তিক মহাসমুদ্র কি হিটলারকে বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে কিংবা নাৎসী জার্মানী কি 'মনুরো ডকট্রিন' মানিয়া চলিবে—যে নাৎসীরা এ পর্যন্ত কোন আন্তর্জাতিক সন্ধিপত্রের মর্যাদা রাখে নাই? অথবা দক্ষিণ অতলান্তিক পার হইয়া হিটলারী দস্যুদল

---

* তখনকার দিনের বাংলা সংবাদপত্রে 'ক্যাশ এ্যাণ্ড কেরি' বিধানকে 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল'—এই চলতি বাংলায় অনূদিত করা হইয়াছিল এবং মার্কিন বণিকবুদ্ধিকে কিছুটা বিদ্রূপও করা হইয়াছিল।

পশ্চিম গোলার্ধেও হানা দিবে ? লাতিন আমেরিকায় তো ইতিমধ্যেই নাৎসী প্রচারকার্যের বান ডাকিয়াছে। যদি অক্ষ শক্তিবর্গ জয়ী হয়, তবে শেষ পর্যন্ত আমেরিকাকে কি তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একা ডিক্টেটরদের বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে না ?

ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়া আমেরিকায় রাজনৈতিক মহল, কংগ্রেস, সংবাদপত্র, রাস্তাঘাট, এমন কি পল্লী ও জনপদ পর্যন্ত মুখরিত হইতে লাগিল। প্রচণ্ড বিতর্ক দেখা দিল এবং জনমত প্রধানত দুইটি অংশে বিভক্ত হইয়া গেল—Interventionist এবং Isolationist অর্থাৎ হস্তক্ষেপকামী ও নির্লিপ্ততাবাদী এবং এই দুইয়ের মতবাদ ছিল প্রায় পরস্পরের বিপরীত।[১]

জাপান, জার্মানী ও ইতালির আগ্রাসী ফ্যাসিজমের দিকে তাকাইয়া 'হস্তক্ষেপকামী'রা গণতন্ত্র ও সভ্যতা রক্ষার জন্য আবেদন জানাইতে লাগিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত হস্তক্ষেপকামীরা অক্ষশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে রাজী ছিলেন না, তাঁরা আক্রান্ত পক্ষকে সর্বপ্রকার সহায়তা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কারণ, তাঁরা ফ্যাসিজমকে ঘৃণা করিতেন।

অপরপক্ষে নির্লিপ্ততাবাদীরা এই ধরনের সাহায্যদানেরও বিরোধী ছিলেন। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, কোন প্রকার সাহায্য দিতে গেলেই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে হইবে এবং কেন তারা মিছিমিছি ইউরোপের 'ঘরোয়া বিবাদে' নাক গলাইতে যাইবে ? প্রথম মহাযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে কি আমেরিকার শিক্ষা হয় নাই ? নির্লিপ্ততাবাদীদের মধ্যে এমন বহু লোক ছিলেন যাঁরা জার্মানীর পক্ষপাতী এবং কোনও-না-কোন কারণে বৃটেনের বিরোধী। এই গোঁড়া রক্ষণশীলদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সেনেটর বার্টন কে. হুইলার (মণ্টানা), সেনেটর জেরাল্ড পি. নাই (নর্থ ডাকোটা), লা ফোলেত্ (উইস্কন্সিন) ভ্রাতৃদ্বয়, প্রতিনিধিসভার হ্যামিল্টন ফিশ (নিউইয়র্ক), বিখ্যাত সংবাদপত্র স্বত্বাধিকারী উইলিয়াম হার্স্ট এবং হার্স্ট সংবাদপত্রগোষ্ঠী এবং শিকাগো ট্রিবিউন পত্রিকার আর. ম্যাক্করমিক। সোসিয়েলিস্ট নেতা ও শান্তিবাদী নরম্যান টমাসও এই দলভুক্ত ছিলেন।

এ ছাড়া 'আমেরিকা ফাস্ট কমিটি' নামে একটি সংস্থা গঠিত হইল। এই কমিটির পিছনে ছিল প্রচুর লোকবল ও অর্থবল। তারা সারা দেশে আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন ইউরোপীয় যুদ্ধে যোগদান বা হস্তক্ষেপকামীদের বিরুদ্ধে। এমন কি বিপন্ন বৃটেনের প্রতি কোন সহানুভূতি প্রদর্শনেরও এঁরা বিরোধী ছিলেন। এই সময় নির্লিপ্ততাবাদীদের পক্ষ থেকে নাৎসী শক্তিবর্গের তোষণকামীরূপে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন—১নং পাব্লিক হীরো চার্লস এ. লিণ্ডবার্গ।[২]

বৈমানিক চার্লস লিণ্ডবার্গ তখন পৃথিবীব্যাপী খ্যাতির শীর্ষে। ১৯২৭ সালে যুবক লিণ্ডবার্গ ছোট্ট একটি এক ইঞ্জিনের প্লেনে করিয়া অসম সাহসিকতার সঙ্গে একাকী অতলান্তিক মহাসমুদ্রের উপর দিয়া না থামিয়া উড়িয়া আসিয়াছিলেন ইউরোপে (৩৩ ঘণ্টা ৩২ মিনিট নিউইয়র্ক থেকে প্যারিস)।* সেদিনের বিমান জগতে এই অভূতপূর্ব কার্যের জন্য লিণ্ডবার্গ আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় 'হীরো' বা

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২৩২।
২। পূর্বোক্ত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২৩৩।
* Doubl day's Encyclopedia. 1936.

নায়করূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বার্লিনে স্বয়ং মার্শাল হেরমন গোয়েরিংয়ের দ্বারা 'রাজকীয় সম্বর্ধনায়' আপ্যায়িত হইয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি নাৎসী জার্মানীর যে বিমান শক্তি দেখিয়া আসিয়াছিলেন তাতে তাঁর ধারণা হইল যে, জার্মানী অপরাজেয়! ৩০শে এপ্রিল, ১৯৪১, লিণ্ডবার্গ 'আমেরিকা ফার্স্ট কমিটির' পক্ষ থেকে নিউইয়র্কে যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে তিনি জার্মান বিমানশক্তি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিয়া ঘোষণা করিলেন—'বৃটেনকে আমরা যতই সাহায্যদানের চেষ্টা করি না কেন, আমরা কিছুতেই এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিব না। বিদেশী যুদ্ধের প্রশ্নে জাতিকে দুই ভাগ করার অর্থ শত্রুকে সহায়তা করা। আর যুদ্ধ আমেরিকার পক্ষে অনিবার্যও নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ১০ কোটির অধিক লোক এই যুদ্ধে যোগদানের বিরোধী, অতএব গণতন্ত্রের দাবী অনুসারে আমাদের উচিত এই যুদ্ধের বাইরে থাকা।

কিন্তু আমেরিকার বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা নিউইয়র্ক টাইমস বৈমানিক লিণ্ডবার্গের এই নাৎসী তোষণ মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করিলেন এবং মন্তব্য করিলেন যে, নির্লিপ্ততা দ্বারা ত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় নাই। আমাদের সামনে মাত্র দুটি পথ আছে—হয় আমাদের আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, অথবা যথাশক্তি আমাদের লড়িতে হইবে আমাদের নৈতিক ও আইনগত অধিকার রক্ষার জন্য।...

এভাবে নির্লিপ্ততাবাদীদের বিরুদ্ধেও শক্তিশালী জনমত গড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে হিটলার ও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে জনমতের একটা প্রকাণ্ড অংশ খুব সোচ্চার ছিল এবং তাঁরা নিরপেক্ষও ছিলেন না। উইলিয়াম অ্যালেন হোয়াইট নামক প্রখ্যাত সাংবাদিক যেন 'আমেরিকা ফার্স্ট কমিটির' জবাবে একটা পালটা সংগঠন দাঁড় করাইলেন 'মিত্রপক্ষকে সহায়তার দ্বারা আমেরিকাকে রক্ষা করার জন্য'। সারা দেশব্যাপী এই সংস্থা হিটলারী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইল।

হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্মিগণ অবশ্যই অক্ষশক্তিবর্গের আগ্রাসন সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ৩রা জানুয়ারী, ১৯৪০, তিনি জাতীয় প্রতিরক্ষা খাতে যে ১৮০ কোটি ডলার ব্যয়বরাদ্দ নির্দেশ করিয়াছিলেন, তার সঙ্গে অতিরিক্ত আরও ১১৮ কোটি ২০ লক্ষ ডলার যুক্ত হইল এবং ১৬ই মে তারিখ তিনি বছরে ৫০ হাজার প্লেন বা বিমান উৎপাদনের নির্দেশ দিলেন।

বছরে ৫০ হাজার প্লেন? সংখ্যাটি সেদিন অনেকের কাছে হঠাৎ আজগুবি বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। এমন কি লেণ্ড-লীজের বড়কর্তা মিঃ স্টেটিনিয়াসেরও প্রথম সংশয় উদ্রেক করিয়াছিল। কারণ, এর আগের বছর মাত্র ১২০০ প্লেন তৈরী হইয়াছিল।—(১৯৪৪ সালে প্রকাশিত লেণ্ড-লীজ পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তথাপি একথা সত্য যে, ১৯৪০ সালের প্রথম ভাগ থেকে মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আমেরিকার কারখানাগুলি থেকে মোট ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬০১টি রণ-বিমান তৈয়ার হইয়াছিল। অর্থাৎ বছরে গড়পড়তা প্রায় ৬০ হাজার প্লেন উৎপাদিত হইয়াছিল।[১]

'গণতন্ত্রের অস্ত্রাগারে'র উৎপাদন শক্তির এটি একটি চমকপ্রদ নমুনা, সন্দেহ নাই।

পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধের সঙ্কট (১৯৪০) যত বাড়িতে লাগিল রুজভেল্ট ততই স্থল, নৌ ও বিমান শক্তি বৃদ্ধির দিকে মন দিতে লাগিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা ২০৬।

যাইতে পারে যে, ২০শে জুলাই তিনি ২০০ নূতন যুদ্ধ-জাহাজ নির্মাণের হুকুম দিলেন।—যার মধ্যে সাতটি ছিল ব্যাটলশিপ এবং যার প্রত্যেকটি ছিল ৫৫ হাজার টনের। অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগর দুইয়ের জন্যই (কারণ, একদিকে জার্মানী ও অন্যদিকে জাপান) মার্কিন নৌবহরের এই শক্তি বৃদ্ধি। এই সময় মোট প্রতিরক্ষা ব্যয়বরাদ্দ দাঁড়াইল ২৮০০ কোটি ডলার। রুজভেল্ট চার দফা কর্মসূচীর উপর জোর দিলেন—(১) প্রতিরক্ষার শক্তি বৃদ্ধি, (২) আভ্যন্তরীক প্রস্তুতি, (৩) দুই মার্কিন মহাদেশের মধ্যে সংহতি এবং (৪) কর্জ ও ইজারা।

এই সঙ্গে সৈন্যবল বৃদ্ধির জন্যও ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০, মার্কিন কংগ্রেসে এমন একটি আইন পাশ হইল, যার ফলে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ (২১ থেকে ৩৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত সমস্ত পুরুষদের জন্য) প্রবর্তিত হইল। তখনও আমেরিকা যুদ্ধরত নয়। সুতরাং শান্তির সময়ে এমনই আইন ছিল অভিনব।...

অতলান্তিক মহাসমুদ্রের পথ বৃটেন ও আমেরিকার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনের মত ছিল। সুতরাং চার্চিলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে রুজভেল্ট মার্কিন নৌবহরকে ৯ই এপ্রিল, ১৯৪১, গ্রীনল্যাণ্ড (নির্বাসিত ড্যানিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে) এবং ৭ই জুলাই আইসল্যাণ্ড দখলের জন্য নির্দেশ দিলেন। নাৎসী জার্মানীর হাত থেকে এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ দখল না করিয়া উপায় ছিল না। এর ফলে আমেরিকার পক্ষে অতলান্তিকের পশ্চিমাংশে এবং বৃটেনের পক্ষে পূর্বাংশ পাহারা দেওয়ার সুবিধা হইয়াছিল।

এদিকে ৩০শে জুলাই, ১৯৪০, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে সংহতি এবং অধিকতর ঐক্য ও আত্মরক্ষার জন্য ২১টি রিপাব্লিকের যে সম্মেলন হাভানায় অনুষ্ঠিত হইল, তাতে মনুরো ডকট্রিন আরও কড়াকাড়িভাবে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত হইল এবং কার্যত লাতিন আমেরিকায় নাৎসী প্রভাব বৃদ্ধি বা অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল।

* * *

আগেই বলা হইয়াছে যে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট অক্ষশক্তিবর্গের আগ্রাসী কার্যকলাপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপদ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হওয়ার পর ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪১, তিনি জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিলেন, ১৯২৭ সালে প্রেসিডেণ্ট উইলসন কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মতই সেই ভাষণ আমেরিকাবাসীদের নিকট গুরুতর বলিয়া মনে হইল। এই বক্তৃতার আরম্ভে রুজভেল্ট ঘোষণা করিলেন যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের এক 'অভূতপূর্ব মুহূর্তে' এই বক্তৃতা দিতেছেন—'অভূতপূর্ব (আনপ্রেসিডেণ্টেড) এজন্য যে, এর আগে আমেরিকার নিরাপত্তা বাইরে থেকে এমনভাবে আর কখনও বিপন্ন হয় নাই, যেমন আজ হইয়াছে।' 'চীনা প্রাচীরের আড়ালে আমরা আবদ্ধ হইয়া থাকিব, আর আমাদের সামনে দিয়া সভ্যতার শোভাযাত্রা চলিয়া যাইবে, এমন নীতির বা এমন চেষ্টার আমরা সর্বদাই বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছি।'...কিন্তু ১৮১৫ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯১৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই ৯৯ বছর ধরিয়া ইউরোপের একটি যুদ্ধেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা অন্য কোন আমেরিকান জাতির নিরাপত্তা এতটা বিপন্ন হয় নাই।...[১]

১। The Second Great War—Sir John Hammerton, Vol. 5, P. 1737.

রুজভেল্টের এই উপলব্ধি যে কত সত্য ছিল, তার প্রমাণ এই যে, ফ্রান্সের পতনের পর রণপণ্ডিত ম্যাক্স ভার্নার আমেরিকার উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলেন—

'Security is no longer determined by international law, and even, less by geography. The new methods of warfare have conquered space.'

অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা আর নিরপত্তার নিশ্চয়তা নাই। ভৌগোলিক অবস্থানের দ্বারা আরও নাই। যুদ্ধের নূতন পদ্ধতি দূরত্বকে জয় করিয়াছে।[১]

মার্কিন নৌসচিব মিঃ নক্স ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪১, পররাষ্ট্র কমিটির নিকট বলিয়াছিলেন যে, মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে যে, ইউরোপের অতলান্তিক মহাসমুদ্রে প্রবেশের মাত্র তিনটি পথ আছে—(১) উত্তর সাগরের পথ, (২) ইংলিশ চ্যানেল এবং (৩) জিব্রাল্টারের পথ। একমাত্র বৃটিশ নৌবহরের পাহারার জন্যই এই পথগুলি এতদিন নিরাপদ এবং সারা পশ্চিমী জগৎ নির্বিঘ্ন ছিল। কিন্তু বৃটেনের পতন ঘটিলে এই সমস্তই নষ্ট হইবে।

মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব কর্ডেল হালও এই সময় অনুরূপ সুরে আমেরিকাবাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন।[২]

অর্থাৎ মার্কিন রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নেতারা পশ্চিম ইউরোপের সংকটে আমেরিকার বিপদ বৃদ্ধির বাস্তবতা সম্পর্কে ক্রমেই সচেতন হইতেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে রুজভেল্ট নাৎসীবাদকে ঘৃণা করিতেন এবং মার্কিন গণতন্ত্রের আদর্শকে রক্ষার জন্য ৬ই জানুয়ারীর (১৯৪১) প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় 'ফোর ফ্রিডমস্' বা 'চতুর্বিধ স্বাধীনতা' রক্ষার উপর জোর দিলেন, যথা—

(১) বাক্ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা,

(২) ধর্মানুষ্ঠানের স্বাধীনতা,

(৩) অভাব থেকে মুক্তি বা স্বাধীনতা এবং

(৪) ভয় থেকে মুক্তি।

কিন্তু কেবল বক্তৃতা দিয়াই এই চতুর্বিধ স্বাধীনতাকে রক্ষা করা যাইবে না এবং এজন্য যাঁরা ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে হাতেকলমে যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁদের সাহায্য দেওয়া দরকার। সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও সরবরাহ যোগান দেওয়া দরকার—দরকার জাহাজ, এরোপ্লেন, ট্যাংক, কামান ইত্যাদি। সুতরাং রুজভেল্টের উদ্যোগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই বিখ্যাত মার্কিনী বিধান 'লেণ্ড-লীজ' বা কর্জ ও ইজারা আইন পাশ হইল ১১ই মার্চ, ১৯৪১। দুই সপ্তাহ পরেই এই আইন অনুসারে প্রাথমিক পর্যায়ে ৭০০ কোটি ডলার ব্যয়মঞ্জুরি হইল। অবশ্য নির্লিপ্ততাবাদীরা এই আইনের বিরুদ্ধে খুব চেঁচাইতে লাগিলেন। এমন কি হোয়াইট হাউজের ফুটপাতের সম্মুখে মার্কিনী 'মায়েদের' এক বিক্ষোভ-প্রার্থনার পর্যন্ত অনুষ্ঠান হইল। কিন্তু অক্ষশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দেশগুলিকে সাহায্যদানের অতি ব্যাপক ক্ষমতা এই আইনের বলে প্রেসিডেন্টের হাতে অর্পণ করা হইল।

'The law empowerd the President to manufacture, sell, lend,

১। Battle for the World—Max Werner, P. 248.

২। ঐ পুস্তক, পৃঃ ২৫১।

transfer, lease, or exchange any war material to the government of any country whose defence the President deems vital for the defence of the United States. The President was given complete discreation even to the extent of not requiring any repayment if he did not wish it'.[১]

এর মর্ম এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার পক্ষে যে কোন দেশের গভর্নমেণ্টকে সামরিক সাহায্য দান প্রেসিডেণ্ট প্রয়োজনীয় মনে করিবেন, এই আইন অনুসারে প্রেসিডেণ্ট সেই সাহায্য দিতে পারিবেন এবং এজন্য তিনি যে কোন সামরিক মালমশলা উৎপাদন, বিক্রি, ইজারা বা বিনিময় করিতে পারিবেন। এমন কি, তিনি ইচ্ছা করিলে এই সমস্ত পণ্যের জন্য মূল্য গ্রহণ না করিয়াও পারিবেন।...

একথা নিঃসন্দেহ যে, লেণ্ড-লীজ বা কর্জ ও ইজারা আইন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে এক প্রকাণ্ড অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং অজস্র কোটি টাকার সমরাস্ত্র উৎপাদন ও সরবরাহের দ্বারা নাৎসী শক্তিবর্গের পরাজয়ে মিত্রশক্তিবর্গকে সহায়তা করিয়াছিল। ইংলণ্ড থেকে উইস্টোন চার্চিল তো এই আইন পাশ হওয়ার পর একে—

'An inspiring act of faith, a monument of generous and far-reaching statesmanship'—

বলিয়া উচ্ছ্বসিত ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

* * *

অতলান্তিক বৈঠক ও অতলান্তিক সনদ

আগেই বলা হইয়াছে যে, ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর মহাযুদ্ধের চেহারা ও চরিত্র পালটাইয়া যাইতে লাগিল। ওদিকে দূরবর্তী পূর্ব এশিয়ায় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের মতিগতিও ইঙ্গ-মার্কিন মহলের খুব সন্দেহ উদ্রেক করিতে লাগিল। সুতরাং এই সময় বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ ও আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। অবশ্য এর অনেক আগেই চার্চিল রুজভেল্টের সঙ্গে নিয়মিত পত্র, টেলিগ্রাম ও সমুদ্রপারবর্তী টেলিফোন যোগে অতলান্তিকের এপার থেকে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। (নৌ বিভাগের সঙ্গে দুইজনেরই জীবন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল এবং রুজভেল্ট নৌ-জীবন খুব পছন্দও করিতেন। এজন্য চার্চিল রুজভেল্টের নিকট সমস্ত চিঠিপত্রের আদানপ্রদানে 'Former Naval Person' এই সাংকেতিক নাম ব্যবহার করিতেন।) কিন্তু, সাক্ষাৎ আলোচনা ঘটে নাই। অবশ্য এই ব্যাপারে রুজভেল্টের মনে একটু ক্ষোভ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রুজভেল্ট যখন নৌবিভাগের সহকারী সেক্রেটারি ছিলেন, তখন তিনি একবার লণ্ডনে গিয়াছিলেন এবং একটি ভোজ উৎসবে চার্চিলের সঙ্গে দেখাও করিয়াছিলেন। কিন্তু চার্চিল তখনই প্রখ্যাতমানা ব্যক্তি, তিনি তরুণ রুজভেল্টকে তেমন আমল দিলেন না এবং মনেও

১। The War—L. Snyder. P. 241.

রাখিলেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে দিনকালের ওলটপালট ঘটিয়া গিয়াছে। রুজভেল্ট এক্ষণে আমেরিকার মত শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রের তৃতীয়বারের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট—যেটা ইতিহাসের নূতন রেকর্ডের মত। আর চার্চিল বৃটিশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মাত্র—এই পদমর্যাদায় তফাৎ বাহ্যত কেতাবী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু চার্চিল রুজভেল্টকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অধিনায়করূপে যথেষ্ট সমীহ করিতেন। ১৯৪১ সালের আর্জেন্টিয়া বৈঠক থেকে ১৯৪৫ সালের ইয়ালটা বৈঠক পর্যন্ত এই দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে অনেকবার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং এই দুইজনের সম্পর্ক মহাযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে।[১]

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ৪ঠা আগস্ট তাঁর দলবলসহ বিখ্যাত যুদ্ধ-জাহাজ 'প্রিন্স অব ওয়েলস' যোগে যাত্রা করিলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে তাঁর প্রথম শীর্ষ বৈঠকের জন্য। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য অনেকগুলি ডেস্ট্রয়ার অতলান্তিক মহাসমুদ্রে 'প্রিন্স অব ওয়েলস'কে পাহারা দিতে দিতে চলিল, এবং এই সমগ্র যাত্রাপথ অত্যন্ত কাঠোরভাবে গোপন রাখা হইল। এমন কি, রেডিও বার্তা বিনিময় পর্যন্ত বন্ধ রাখা হইল, পাছে শত্রুর কাছে কোন সাংকেতিক বার্তা ধরা পড়ে। অপরদিকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও গোপনীয়তা রক্ষার জন্য কৌশল অবলম্বন করিলেন। বাইরে প্রচার করা হইল যে, প্রেসিডেন্ট কয়েকদিনের ছুটি উপভোগের জন্য তাঁর প্রমোদ তরীতে যাইতেছেন। কিন্তু পরে এই প্রমোদ তরীটি পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া তিনি তাঁর দলবলসহ 'অগাস্টা' ক্রুজারে (রণতরী) গিয়া আরোহণ করিলেন এবং ৯ই আগস্ট, ১৯৪১, নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের অদূরে উত্তর অতলান্তিকের দরিয়ায় তিনি চার্চিলের সঙ্গে মিলিত হইলেন।

আগের অধ্যায়েই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মস্কো প্রত্যাগত হ্যারি হপকিন্স 'প্রিন্স অব ওয়েলস' জাহাজে চার্চিলের সহযাত্রী হইয়াছিলেন এবং দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠকে যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৯ই আগস্ট সন্ধ্যার পর 'অগাস্টা' জাহাজে চার্চিল-রুজভেল্টের ডিনার বা ভোজসভা অনুষ্ঠিত হইল। সঙ্গে উভয়পক্ষের বড় বড় সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিগণ ছিলেন। যাঁদের হাতে সেদিন গোটা পৃথিবীর ভাগ্য নির্ভর করিতেছিল, তাঁদের ডিনার উৎসব কেমন ছিল? 'মেনু' খাদ্যতালিকা কিরূপ ছিল? শেরউড তাঁর মনোজ্ঞ ইতিহাসে সেই সমস্তই উল্লেখ করিয়াছেন—

Present at that dinner were, on the American side, Roosevelt, Welles, Stark, Marshall, King, Arnold, Hopkins and Harriman.

On the British side, Churchill, Cadogan, Pound, Dill, Freeman and Cherwell.

The menu : 'vegetable soup, broiled chicken, spinach omlet, lettuce and tomato salad, chocolate ice cream and a lot of side dishes'.

না, এই খাদ্যতালিকার উপর চোখ বুলাইলে এমন কিছু হাতি ঘোড়ার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। এমন কি, সেদিনের বিশ্ববিখ্যাত চার্চিল-রুজভেল্টের ডিনারের

১। Roosevelt & Hopkins—Sherwood. USA, 1950, P. 425-26.

চেয়ে অনেক বেশী রাজসিক ডিনার বোধহয় আজিকার আধুনিক যুবকেরাও উপভোগ করিয়া থাকেন।

* * *

অতলান্তিক সম্মেলনে দুই শীর্ষ নেতার বৈঠক থেকেই অতলান্তিক সনদ বা 'আটল্যাণ্টিক চার্টার' রচিত হইয়াছিল। এর প্রথম খসড়া বৃটিশ পক্ষের বা চার্চিলের, রুজভেল্ট বা মার্কিন পক্ষ সংশোধন ও পরিবর্জন করিয়াছিলেন। যুদ্ধের লক্ষ্য কি, কি কি নীতি বা প্রিন্সিপল্ অনুসারে যুদ্ধ পরিচালিত হইবে, সেই সম্পর্কে উভয় রাষ্ট্রনেতা একটা ঘোষণা প্রচার করা প্রয়োজন মনে করিলেন। ১২ই আগস্ট, ১৯৪১, অতলান্তিক সনদ চূড়ান্তরূপে রচিত হইল। এই সনদে ৮টি অনুচ্ছেদ ছিল এবং শেষের অনুচ্ছেদে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে এমন কথা ছিল, যেগুলিকে বলা যাইতে পারে পরবর্তীকালের ইউনাইটেড নেশন্সের বীজতুল্য—অতলান্তিক সনদে এই বীজ প্রথম বপন করিয়াছিলেন রুজভেল্ট।[১]

কিন্তু ৮ দফার অতলান্তিক সনদ কোন মৈত্রীচুক্তি ছিল না, কিম্বা এর কোন আইনগত বাধ্যবাধকতাও ছিল না। এটা ছিল দুই রাষ্ট্রনেতার প্রচারিত (পরে স্ট্যালিন কর্তৃক অনুমোদিত) একটি যৌথ বিবৃতি মাত্র, অনেকটা প্রেসিডেণ্ট উইলসন কর্তৃক প্রচারিত (৮ই জানুয়ারী ১৯১৮) ১৪ দফার ঘোষণাপত্রের মত। কিন্তু চার্চিলের মতে অতলান্তিক সনদ এক হিসাবে খুব অভিনব ছিল। কেননা, আমেরিকা তখনও যুদ্ধরত নয়, অথচ যুদ্ধরত বৃটেনের সঙ্গে একত্রে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট 'নিরপেক্ষ' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যুক্ত ঘোষণায় সম্মতি দিলেন।[২]

মার্কিন নির্লিপ্ততাবাদীগণ অবশ্য অতলান্তিক সনদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন—বিশেষত 'ধর্মের স্বাধীনতা'র কথা না থাকায়। পরবর্তীকালে ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী যখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে প্রথম ঘোষণাবাণী প্রচার করা হয়, তখন অতলান্তিক সনদ সেই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং স্ট্যালিন বা সোভিয়েট রাশিয়ার সম্মতিক্রমেই 'ধর্মের স্বাধীনতা'ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রজভেল্টের পূর্ব প্রদত্ত (৬ই জানুয়ারী) বক্তৃতার মধ্যে যে চতুর্বিধ স্বাধীনতা'র কথা ছিল, সেই ভাবধারা অতলান্তিক সনদেও প্রতিফলিত হইল।[৩]

এখানে মূল ইংরাজীতে অতলান্তিক সনদের পূর্ণ বয়ান উদ্ধৃত করা যাইতেছে :

'The President of the United States of America and the Prime minister Mr. Churchill representing His Majesty's Government in the United Kingdom, being met together, deem it right to make known certain common principles in the national policies of their respective countries on which they base their hopes for a better future for the world.

First. Their countries seek no aggrandizement, territorial or other.

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৪০৬-০৭।
২। The War—Snyder, P. 243.
৩। Roosevelt and Hopkins—P. 438-39.

Second. They desire to see no territorial changes that do not accord with the freely expressed wishes of the peoples concerned.

Third. They respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live, and they wish to see sovereign rights and self-government restored to those who have been forcibly deprived of them.

Fourth. They will endeavour, with due respect for their existing obligations, to further the enjoyment by all States, great or small, victor or vanquished, of access, on equal terms, to the trade and to the raw materials of the world which are needed for their economic prosperity.

Fifth. They desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field, with the object of securing for all improved labour standards, economic advancement and social security.

Sixth. After the final destruction of Nazi tyranny they hope to see established a peace which will afford to all nations the means of dwelling in safety within their own boundaries, and which will afford assurance that all the men in all the lands may live out their lives in freedom from fear and want.

Seventh. Such a peace should enable all men to traverse the high seas and oceans without hindrance.

Eighth. They believe that all the nations of the world, for realistic as well as spiritual reasons, must come to the abandoment of the use of force. Since no future peace can be maintained if land, sea, or air armaments continue to be employed by nations which threaten, or may threaten aggression outside of their frontiers, they believe, pending the establishment of a wider and permanent system of general security, that the disarmament of such nations is esseantial. They will likewise aid and encourage all other practicable measures which will lighten for peace-loving peoples the crushing burden of armaments.—[১]

অতলান্তিক সনদ নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু শেরউডের মতে বৃটিশ সরকারের পদস্থ অফিসারেরা গোড়ায় এই বিবৃতিকে একটা প্রচারমূলক ইস্তাহার বা 'পাব্লিসিটি হ্যাণ্ডআউটের' চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করেন নাই—কিন্তু রুজভেল্ট এই ঘোষণাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। এর প্রমাণ এই যে, এর শর্ত বা অনুচ্ছেদগুলির ব্যাখ্যা নিয়া চার্চিল ও রুজভেল্টের মধ্যে মতবিরোধ

১। The War—Snyder, P. 242-43.

ঘটিয়াছিল। যখন অতলান্তিক সনদের কথা ঘোষিত এবং এশিয়াতে প্রচারিত হইল, তখন ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি উপনিবেশগুলি থেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল যে, অতলান্তিক সনদ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এবং এশিয়া খণ্ডেও প্রযোজ্য কিনা? এই প্রশ্ন এত তীব্র আকার ধারণ করিল যে, চার্চিলকে বাধ্য হইয়া এই সম্পর্কে কমন্সসভায় এক বিবৃতি দিতে হইল।[১]

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১, প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তাঁর এই সরকারী বিবৃতিতে 'ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যকে' অতলান্তিক সনদের আওতা থেকে বাদ দিলেন এবং ঘোষণা করিলেন—

'অতলান্তিক সম্মেলনে আমরা মূলত ইউরোপের সেই সমস্ত দেশ ও জাতির সার্বভৌমত্ব স্বায়ত্তশাসন ও জাতীয় সত্তা পুনরুজ্জীবনের কথাই চিন্তা করিয়াছিলাম, যাঁরা এখন নাৎসী জোয়ালে আবদ্ধ রহিয়াছেন।'

অর্থাৎ চার্চিলের ঘোষণার দ্বারা অতলান্তিক সদন থেকে ভারত ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা লাভের আশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হইল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বৃটিশ সরকারের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলেন না। ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২, রুজভেল্ট ঘোষণা করিলেন—'পৃথিবীর যে সমস্ত অংশ অতলান্তিক মহাসমুদ্রের সীমানাবর্তী অতলান্তিক সনদ কেবল সেগুলির পক্ষেই প্রযোজ্য নয়, সারা পৃথিবীর পক্ষেই প্রযোজ্য।'

অতএব দেখা যাইতেছে যে, রুজভেল্ট চার্চিলের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একমত ছিলেন না। এমন কি, অতলান্তিক সনদে বর্ণিত 'পৃথিবীর কাঁচামালের বাজার ও ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবেশের জন্য কোন জাতির প্রতি বৈষম্য করা চলিবে না এবং সমস্তের সমান অধিকার থাকিবে'—এই ধরনের ঘোষণাতেও বৃটেনের আপত্তি ছিল। তবে, এই বিষয়ে বৃটিশ ও মার্কিন অভিমতের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসা করা হইয়াছিল, যদিও বৃটিশ মতের প্রাধান্য ছিল।[২]

চার্চিল চিরকাল ঝুনো সাম্রাজ্যবাদী ও গোঁড়া রক্ষণশীল ছিলেন। যুদ্ধের এই বিপদেও তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যে এক ইঞ্চি জমি কিংবা ভারতবর্ষের বৃহৎ জমিদারি ছাড়িতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কেবল অতলান্তিক সনদের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের অপব্যাখ্যাই করিলেন না, ১৯৪২ সালে ভারতের জাতীয় আন্দোলন যখন এক সময় (আগস্ট) বিদ্রোহের আকার ধারণ করিল এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসিবার জন্য চার্চিলের উপর চাপ পড়িল, তখন উইনস্টোন চার্চিল চটিয়া গেলেন এবং তপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

'I have not become the King's First Minister in order to preside over the liquidition of the British Empire.'—(The Times, Nov. 1942)—[৩]

অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের কারবারে লাল বাতি জ্বালাইবার জন্যই আমি মহামান্য সম্রাটের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করি নাই।

১। Roosevelt & Hopkins—Sherwood, P. 440.
২। The Anti-Hitler Coalition—Issraeljan, P. 54.
৩। British Foreign Policy During World War II—Moscow, 1970, P. 192-93.

চার্চিলের এই দম্ভোক্তি স্বাধীনতার পরেও ভারতবাসীর কাছে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং তাঁর এই কথা সেদিন বৃটিশ ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন ক্ষোভ ও উত্তেজনার সঞ্চার করিয়াছিল।

অপরপক্ষে ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েট সরকার অতলান্তিক সনদের মূল শর্তগুলির সঙ্গে একমত হইলেন। কিন্তু এগুলির ব্যাখ্যায় সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের ও রাষ্ট্রিক পূর্ণ স্বাধীনতার ঔপনিবেশিক এলাকাগুলির মুক্তির এবং সার্বভৌম অধিকারের মূল নীতি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করিলেন।[১]

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, যদিও ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রধানত সোভিয়েট রাশিয়াই যুদ্ধের এই অসম্ভব দায়িত্ব বহন করিতেছিল, তবু কিন্তু অতলান্তিক সম্মেলনে চার্চিল-রুজভেল্টের বৈঠকে সোভিয়েট রাশিয়াকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় নাই কিম্বা যে অতলান্তিক সনদ ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যতম মূল দলিলের মত ছিল, তার রচনায়ও সোভিয়েটকে আহ্বান করা হয় নাই।

সুতরাং রাশিয়াকে তখনও ইঙ্গ-মার্কিন মহলে পরিপূর্ণভাবে 'বিশ্বাস' করিবার পক্ষে সংশয় ছিল।

তবে, অতলান্তিক সম্মেলন থেকেই চার্চিল ও রুজভেল্ট একত্রে স্ট্যালিনের নিকট একটি বার্তা পাঠাইলেন এবং সেই বার্তায় দুই রাষ্ট্রনেতাই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাঁরা সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে পাঠাইবার চেষ্টা করিবেন।[২]

স্ট্যালিনের নিকট দুই রাষ্ট্রনায়ক কেবল সহযোগিতামূলক বার্তাই পাঠাইলেন না, হিটলার-বিরোধী মহাজোটের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক শক্তি সংহত করিবার উদ্দেশ্যে কি কি করা দরকার সেই প্রশ্নগুলি আলোচনার জন্য (প্রধানত হ্যারি হপকিন্সের পরামর্শ ও লর্ড বীভারব্রুকের আগ্রহের জন্য) মস্কোতে একটি উচ্চপর্যায়ের ইঙ্গ-মার্কিন-সোভিয়েট বৈঠক অনুষ্ঠানেরও সিদ্ধান্ত হইল। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৮শে সেপ্টেম্বর ইঙ্গ-মার্কিন মিশন মস্কোতে পৌঁছিয়াছিল—সে কথা আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে।...[৩]

* * *

অতলান্তিক সম্মেলনে বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষ যুদ্ধের সাধারণ অবস্থা এবং বিশেষভাবে দূর-প্রাচ্যে জাপানের কার্যকলাপ নিয়া বিস্তৃত আলোচনা করিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় বৃটেনের বিরাট সাম্রাজ্যের স্বার্থের খাতিরে আমেরিকাকে যথাশীঘ্র সম্ভব জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাইবার জন্য বৃটিশ পক্ষ চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইল না।

তবে অতলান্তিক সম্মেলন থেকে চার্চিল ও রুজভেল্টের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হইয়াছিল মহাযুদ্ধের উত্তাল তরঙ্গে মাঝে মাঝে তার উঠানামা ঘটিয়া থাকিলেও শেষ পর্যন্ত এই হৃদ্যতার সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। কারণ, 'উভয়েরই উভয়কে

১। Anti-Hitler Coalition—P. 55.

২। Correspondence—(Stalin-Churchil-Roosevelt)—Moscow 1959, Vol. 1, P. 18.

৩। The Anti-Hitler Coalition, P. 59.

অনুপ্রাণিত ও সতেজ করিয়া তোলার আশ্চর্য ও ব্যাপক ক্ষমতা ছিল!' যুদ্ধের ভয়ংকরতম দুর্দিনেও রুজভেল্ট চার্চিলকে এক গম্ভীর ও দীর্ঘ তারবার্তার শেষে এই কথাটি লিখিয়াছিলেন—

'It is fun to be in the same decade with you.'

(আপনার সঙ্গে একই দশকের সঙ্গী হওয়া মজার বিষয় বটে)।

চার্চিল কিন্তু অতলান্তিক সম্মেলন থেকে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে এবং গভীর বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন। ফিরিয়া গিয়াই তিনি পরমোৎসাহে জনগণের সামনে তাঁর সেই বিখ্যাত "V for Victory" সাইন দেখাইতে লাগিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের এই চার্চিলীয় ভঙ্গীটি পরে বহু ফটোতে ও চিত্রে বিখ্যাত হইয়াছিল এবং এই "V" চিহ্নের শুরু তখন থেকে।

চার্চিলের এই নূতন অদম্য উৎসাহ দেখিয়া মার্কিন নির্লিপ্ততাবাদীগণ ও বৃটিশ জনসাধারণ কিন্তু ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, অতলান্তিক সম্মেলনে নিশ্চয়ই কোন 'গোপন চুক্তি' হইয়াছে, যার ফলাফল যথাসময়ে জানা যাইবে।[১]

* * *

অতলান্তিক সম্মেলনের পর আইসল্যাণ্ডের দিকে অতলান্তিকের জলপথে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বরে জার্মান সাবমেরিন কর্তৃক মার্কিন ডেস্ট্রয়ারগুলি আক্রান্ত এবং কোন কোনটা ডুবিয়া গেল ও প্রচুর প্রাণহানি ঘটিল। তখন ১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১, নিরপেক্ষতা আইনের এমন বিপুল সংশোধন ঘটানো হইল যে, মার্কিন বাণিজ্য জাহাজগুলিকে সশস্ত্র করার ও যুদ্ধরত দেশের বন্দরে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হইল এবং আমেরিকা এভাবে পরিপূর্ণ যুদ্ধযাত্রার দিকে অগ্রসর হইল।[২]

কিন্তু মার্কিন সরকারী মহল যুদ্ধযাত্রার দিকে অগ্রসর হইলে কি হইবে, জনগণের এক বৃহৎ অংশে যুদ্ধের পক্ষে কোন উত্তেজনাই ছিল না, প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁদের মনে ছিল। বরং জাহাজডুবির খবরের চেয়ে ফুটবল খেলার ফলাফলের দিকেই তাঁদের বেশী ঝোঁক ছিল। মিঃ শেরউড এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন লোকে বলে ফরাসীরা ১৯১৪ সালে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের (ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ) যুদ্ধের জন্য তৈরী হইয়াছিলেন, ১৯৩৯ সালে তাঁরা তৈরী হইয়াছিলেন ১৯১৪ সালের যুদ্ধের জন্য, ঠিক অনুরূপভাবে বলা যাইতে পারে যে, ১৯৪১ সালে আমেরিকানরা ১৯১৭ সালের মহাযুদ্ধের বাইরে থাকার জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।'[৩]

রাশিয়ার পক্ষে ও বিপক্ষে

এই সময় আমেরিকার রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে হিটলার কর্তৃক আক্রান্ত সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি মনোভাবের যে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছিল, সেটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করার মত। বলা বাহুল্য যে, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই জনসমাজের প্রগতিশীল অংশ

১। Roosevelt and Hopkins—P. 364-65.
২। The War—P. 245.
৩। Roosevelt and Hopkins—P. 382.

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি অত্যন্ত অনুকূল ছিল এবং হিটলারী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল। আমেরিকায়ও জনমতের এই অভিব্যক্তি দেখা গেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শহরের অনেক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, ছাত্র সংগঠন জাহাজী লস্করদের সংস্থা, মোটর যান কর্মীদের সংগঠন, গণতন্ত্র রক্ষার নাগরিক প্রতিষ্ঠান, কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি বহু প্রকার সংস্থা সোভিয়েট জনগণের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইতে লাগিল। মার্কিন বুদ্ধিজীবী মহলের ও জনজীবনের নামকরা নেতা ও লেখকেরা—যেমন. থিওডোর ড্রেইজার (প্রগতিবাদী লেখক), বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ও আপ্‌টন সিনক্লেয়ার, সুবিখ্যাত গায়ক পল রোবসন, চিত্রশিল্পী রকওয়েল কেণ্ট, নাট্যকার ক্লিফোর্ড ওডেটস, বিখ্যাত চিকিৎসক হেনরি সিগারিস্ট, মেরু-অভিযানকারী ভিলজালমুর স্টেফানসন প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থনে বিবৃতি দিলেন। ২রা জুলাই ১৯৪১, নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে ১০ হাজারের অধিক জনগণের এক বৃহৎ সভা হইল এবং তাতে সোভিয়েট জনগণের প্রতি 'সীমাহীন সমর্থন' জানাইবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হইল। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র সভা অনুষ্ঠিত হইল। মার্কিন রাজনীতিবিদদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ ছিলেন, যাঁরা অবিলম্বে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন, যেমন—স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি হ্যারল্ড এস্. আইকস্, নৌবিভাগের এডমিরাল হ্যারল্ড স্টার্ক প্রভৃতি।

কিন্তু নির্লিপ্ততাবাদী এবং সোভিয়েটের বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যাও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কম ছিলেন না। যেমন—প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট হার্বার্ট হুভার, সিনেটর হ্যারি এস. ট্রুম্যান (পরবর্তীকালে প্রেসিডেণ্ট), রবার্ট এ. টাফট, হ্যামিল্টন ফিস, চার্লস লিণ্ডবার্গ, জন এল. সুইস প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ জার্মানীর পক্ষপাতী মনোভাব দেখাইতে লাগিলেন। ট্রুম্যান তো প্রকাশ্যেই বলিলেন যে, জার্মানী ও রাশিয়া যদি পরস্পরকে ঘায়েল করে, তবে, সেটা আমেরিকার পক্ষে ভালোই হইবে। আর সেনেটর টাফট রেডিওযোগে ভাষণ দিলেন—'পৃথিবীতে কমিউনিজমের জয় ফ্যাসিজমের জয় অপেক্ষা আমেরিকার পক্ষে বহু গুণ বিপজ্জনক হইবে।' এমন কি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরেও সোভিয়েট বিরোধী মনোভাব ছিল এবং সোভিয়েট জয়লাভ সম্পর্কে আদৌ বিশ্বাস ছিল না।[1]

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মস্কোতে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে লর্ড বীভারব্রুক এবং মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে আভেরিল হ্যারিম্যান স্ট্যালিনের সঙ্গে যে সমস্ত সাক্ষাৎ ও যুদ্ধে সাহায্য দানের বিষয় নিয়া সমস্ত আলোচনা করিয়াছিলেন, আগের অধ্যায়ে সে কথা বলা হইয়াছে। তিন দিনে স্ট্যালিনের সঙ্গে ৯ ঘণ্টা আলোচনা হইয়াছিল। এখানে সেই সম্পর্কে দুই একটা স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

হ্যারিম্যানের রিপোর্টে প্রকাশ যে, দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় সাক্ষাতের সময় দেখা গেল যে, স্ট্যালিনের মেজাজ খুব তিরিক্ষি, তাঁকে শিষ্টাচারহীনও মনে হইল। যেমন, এক সময় তিনি চাঁছাছোলাভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন—আমেরিকা যখন বছরে ৫০ মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদন করিতে পারে, তখন তারা আমাকে ট্যাঙ্কের বর্মাচ্ছাদনের জন্য মাত্র এক হাজার টনের বেশী ইস্পাত দিতে পারে না, এটা কেমন কথা ?

১। The Anit-Hitler Coalition—P. 39-43.

হ্যারিম্যান এবার একটা ব্যাখ্যা দিতে চাহিলেন, কিন্তু স্ট্যালিন গ্রাহ্যই করিলেন না।

বীভারব্রুকও লিখিয়াছেন, 'স্ট্যালিনকে অত্যন্ত অস্থির দেখা গেল, তিনি অনবরতঃ ধূমপান করছিলেন ও পায়চারি করছিলেন। মনেহলো তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীর উপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে।'

বীভারব্রুক চার্চিলের কাছ থেকে পাওয়া একখানা চিঠি স্ট্যালিনকে দিলেন। স্ট্যালিন সেটা খুলিয়া একবার মাত্র চোখ বুলাইয়া নিলেন। তারপর টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিলেন। যখন বীভারব্রুক ও হ্যারিম্যান বৈঠক থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন মলোটোভ আবার স্ট্যালিনকে চার্চিলের চিঠির কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু স্ট্যালিন চিঠিখানা খামের মধ্যে পুরিয়া একজন কেরানীর হাতে দিলেন। বৈঠকের সময় স্ট্যালিন নিজে তিনবার টেলিফোন করিলেন এবং তিনবার নিজে নম্বর ডায়েল করিলেন।

কিন্তু স্ট্যালিনের এই খারাপ মেজাজের কারণ কি, তা' বীভারব্রুক বা হ্যানিম্যান কেউ বুঝিতে পারিলেন না। তবে, তাঁদের অনুমান এই যে, সেই সময় মস্কোর দিকে আসন্ন জার্মান অভিযানের খুব উদ্বেগজনক সংবাদ তিনি পাইয়াছিলেন।[১]

তবে, আগেরবার হ্যারি হপকিন্সের সঙ্গে বৈঠকের মতই স্ট্যালিন এই সমস্ত বৈঠকেও সামরিক অবস্থা, জার্মান সৈন্যবাহিনীর শক্তি এবং রাশিয়ার জরুরী প্রয়োজন ইত্যাদি সম্পর্কে খোলাখুলিভাবেই আলোচনা করিলেন।...

তৃতীয় দিনের বৈঠকে স্ট্যালিনের মেজাজ খুব প্রসন্ন ছিল এবং বীভারব্রুক লিখিয়াছেন যে, 'এই প্রথম স্ট্যালিন আমাদের চা ও জলখাবার দিলেন।' পরদিন সন্ধ্যায় তিনি ডিনারেরও নিমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন।

মস্কোর বৈঠকে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল এবং বীভারব্রুক ও হ্যারিম্যান উভয়েই স্ট্যালিন সম্পর্কে উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন। বীভারব্রুক লিখিয়াছেন—'আমরা তাঁকে পছন্দ করতে লাগলাম। একটি সদয় চিত্তের মানুষ কার্যত কখনও ধৈর্যহীনতার পরিচয় দেন না।'

১লা অক্টোবর, ১৯৪১, সামরিক সাহায্য দান সম্পর্কে রাশিয়া, আমেরিকা ও বৃটেনের মধ্যে একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।

কিন্তু হ্যারিমান মস্কো ত্যাগ করার আগেই হিটলারের পক্ষ থেকে সারা দুনিয়াকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে লালফৌজ খতম এবং রাশিয়ার যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে।[২]

এদিকে কর্জ ও ইজারা অনুসারে রাশিয়া যখন ৭ই নভেম্বর মার্কিন সাহায্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইল, তখন জার্মান সৈন্যরা মস্কো থেকে মাত্র ৩০ মাইল দূরে ছিল।

অর্থাৎ জার্মান আক্রমণের পুরা সাড়ে-চার মাস পরে রাশিয়ার জন্য বিনা সুদে কর্জ ও ইজারা অনুসারে আমেরিকা ১০০০ মিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করিয়াছিল বটে, কিন্তু সাহায্য আসিতেছিল অত্যন্ত ধীর গতিতে। ১৯৪১-এর শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট

১। Roosevelt & Hopkins—Sherwood, P. 388-89.

২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃঃ ৩১৫।

ইউনিয়ন মাত্র ৫,৪৫০০০ ডলার মূল্যের বা মোট মার্কিন সাহায্যের ০·১ ভাগেরও কম সামরিক সাহায্য পাইয়াছিল।[১]

কিন্তু মস্কো যখন অবরুদ্ধ অবস্থায় তখন পারস্য উপসাগরের পথে জঙ্গী বিমান পাঠাইয়া জরুরী সাহায্য দেওয়ার জন্য হপকিন্স নৌবিভাগের উদ্দেশ্যে যে স্মারকলিপি তৈরি করিয়াছিলেন, রুজভেল্ট তার এক কোণায় পেন্সিল দিয়া মন্তব্য করিলেন—

H. L. H.

O. K. but say to them from me : Hurry, Hurry. Hurry.

F. D. R.

রুজভেল্ট কর্তৃক এই 'জরুরী' তাগাদার তারিখ ছিল ২৫শে নভেম্বর, ১৯৪১।[২]

তখন মস্কো যুদ্ধের চরম অবস্থা। কিন্তু তখনও সোভিয়েট রাশিয়ার জন্য 'গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার' আমেরিকার দরজা খুলিতে স্বয়ং রুজভেল্টকে 'জরুরী ধাক্কা' দিতে হইল।

১। The Anti Hitler Coalition, P. 47.

২। Roosevelt & Hopkins, P. 398.

পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের বিস্তার

প্রথম অধ্যায়

উদীয়মান সূর্যের দেশ জাপান

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে 'অপরাজেয়' হিটলারী বাহিনী যখন মস্কোর দ্বারদেশে লালফৌজের প্রচণ্ড পালটা আঘাতের নিদারুণ বিপদের মুখে পড়িল, তখন সেই নাটকীয় মুহূর্তে ৭ই ডিসেম্বর তারিখ জাপান পূর্ব ভূখণ্ডে হঠাৎ যে বজ্র নিক্ষেপ করিল, তাতে সারা পৃথিবীতে যেন প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। সমগ্র প্রশান্ত মহাসমুদ্রের জল উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বলা যাইতে পারে, পার্ল হারবারে এই আকস্মিক জাপানী আক্রমণ একটি আঘাতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্নিকাণ্ডকে পৃথিবীব্যাপী প্রলয়াগ্নিতে পরিণত করিল! জুন মাসে জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের দ্বারা মহাযুদ্ধের চেহারার যে পরিবর্তন ঘটিতেছিল, ডিসেম্বর মাসে জাপান কর্তৃক আমেরিকাকে আক্রমণের দ্বারা সেই পরিবর্তন যেন আরও গভীর এবং আরও ব্যাপক ও জটিল হইয়া উঠিল। মহাযুদ্ধের ইতিহাস এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে উত্তীর্ণ হইল। এমন কি, পশ্চিমে ইউরোপ ও আফ্রিকার ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে এই মহাযুদ্ধ আর আবদ্ধ রহিল না, পূর্ব খণ্ডের 'সাত সমুদ্র তের নদী পার' হইয়া আমাদের ভারতবর্ষের দুয়ারের দিকে যেন পা বাড়াইল!…

জাপান 'উদীয়মান সূর্যের' দেশরূপে পরিচিত এবং তার এই পরিচয় বিশেষভাবে প্রাচ্য জগতের কাছে একদা উদীয়মান সূর্যের আলোর মতই আশার ও আনন্দের বাণী বহন করিয়া আনিতেছিল। কারণ, সারা এশিয়া মহাদেশ যখন কার্যত পদানত ছিল, বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের আধিপত্যের নিকট নতশির ছিল, তখন একমাত্র স্বাধীন জাপান পূর্বদিকে নবোদিত সূর্যের মতই গৌরবোজ্জ্বল ছিল। তার সামরিক শক্তি ও মহিমার কাছে ইউরোপের বিশালতম জারের সাম্রাজ্য রাশিয়াও হতমান হইয়াছিল—১৯০৪ খৃস্টাব্দে। অতএব ইউরোপীয় শক্তিগুলির অধিকৃত দেশের জনগণের এবং বিশেষভাবে পরাধীন ভারতের নিকটও জাপানের একটা আলাদা মর্যাদা ছিল।

কিন্তু জাপানের ইতিহাস দীর্ঘ ও রোমাঞ্চকর। শত শত বছর ধরিয়া সমুদ্রবেষ্টিত এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা ছিল সাহসী, শৃঙ্খলাপরায়ণ, দেশপ্রেমিক এবং পুরাতন ঐতিহ্যের অনুরক্ত। প্রাচীন জাতীয় ধর্ম শিণ্টো ও তার পর বৌদ্ধ ধর্মের আচার-আচরণের ফলে এদের জাতীয় চরিত্রে যেন কিছুটা 'গুপ্ত রহস্যবাদ' বা মিস্টিক প্রভাব পড়িয়াছিল। কিন্তু ১৩ শত খৃস্টাব্দের আগে ইউরোপ জাপান সম্পর্কে কোন খবর রাখিত না এবং ষোড়শ শতাব্দীতে খৃস্টধর্ম প্রথম প্রবর্তিত হইবার পর খৃস্টানদের উপর নিদারুণ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল এবং ২৪ বছর ধরিয়া জাপানে যে খৃস্টান নিধন যজ্ঞ শুরু হইল, তা শেষ হইল ১৬৩৮ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি। এই সময়ের মধ্যে আড়াই লক্ষের অধিক খৃস্টানকে সাবাড় করা হইল। এর পর জাপান তার সদর দরজা

বন্ধ করিয়া দিল এবং বাইরের জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া যেন স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী হইয়া রহিল।[১]

কয়েক পুরুষ ধরিয়া এই অবস্থা চলিল। এদিকে সামন্ত যুগের বিধিব্যবস্থায় সারা দেশ যেন আচ্ছন্ন ছিল, অভিজাতগণ সামুরাই নামে পরিচিত ছিলেন। দেশের ভূমি ও সম্পত্তির মালিক ছিলেন তাঁরাই। তাঁদের একটি কঠিন নৈতিক আচরণবিধি ছিল, যার নাম ছিল 'বুসিদো'—এই বুসিদোর গুণে তাঁরা যেমন আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বিরোধীকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তেমনি অপমানিত জীবনের অবসানের জন্য 'হারিকিরি' (পেটে ছুরিকাঘাতের দ্বারা আত্মহত্যা) করিতেও বিন্দুমাত্র সংশয় বোধ করিতেন না। এই সামুরাইগণই ছিলেন দেশ ও সমাজের আসল শাসক—যদিও সকলের মাথার উপরে নামে মাত্র ছিলেন মিকাডো বা সম্রাট। কিন্তু মধ্যযুগের খৃস্টান জগতের নাইটদের মত জাপানের সামুরাই গোষ্ঠীগুলির নিজেদের মধ্যেও ঝগড়া বিবাদ ও লড়াই লাগিয়া থাকিত। ফলে, দেশে যেমন শান্তি ছিল না, তেমনি ছিল না কোন অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি।[২]

এমন সময় একটা অঘটন ঘটিল। ১৮৫৩ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে আমেরিকা থেকে কমোডোর পেরি চারখানা জাহাজসহ প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া জাপানী দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া হাজির হইলেন। এই চারিখানার মধ্যে দু'খানা ছিল বাষ্পচালিত পোত। এমন তাজ্জব ব্যাপার, অর্থাৎ বাষ্পীয় পোত জাপানীরা আগে কখনও দেখে নাই। তারা অবাক হইল এবং আরও অবাক হইল এজন্য যে, একজন বিদেশী আসিয়া অনায়াসে এবং দম্ভভরে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এক দাবীপত্র জাপানের মিকাডোর (সম্রাটের) উদ্দেশ্যে পেশ করিলেন! পরের বছর কমোডোর পেরি আবার তাঁর নৌবহরসহ ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁর আগেকার চরমপত্র অনুসারে জাপানের কাছ থেকে আমেরিকার অনুকূলে এক সন্ধি চুক্তি আদায় করিয়া ছাড়িলেন।

এই ঘটনা ইতিহাসের এক নূতন দিগন্ত খুলিয়া দিল এবং জাপান কয়েক শতাব্দীর বিচ্ছিন্নতা থেকে আধুনিক পৃথিবীর নূতনতর সংস্পর্শে আসিয়া পৌঁছিল। এর পর ১৮৬৭-৬৮ খৃস্টাব্দ থেকে শুরু হইল সম্রাট মৈজির রাজকীয় ক্ষমতা ও গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বা 'রেস্টোরেশান'-এর সঙ্গে জাপানের জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণের আধুনিকতা প্রতিষ্ঠার যুগ। ইংলণ্ডের ভিক্টোরিয়া যুগ যেমন ইতিহাস বিখ্যাত, জাপানের ইতিহাসে তেমনি মৈজি যুগের গৌরব। জাপান এই প্রথম অনুভব করিল—'পশ্চিমে আজ খুলিয়াছে দ্বার' এবং সেখান থেকে নব্য জ্ঞানবিজ্ঞানের 'উপহার' আহরণ করিতে হইবে। বিদেশীরা আর 'বর্বর' বলিয়া বিতাড়িত হইল না। বরং তরুণ সম্রাট এক নূতন 'প্রতিজ্ঞার সনদ' (দি চার্টার ওথ্) প্রচার করিলেন :

'Knowledgc shall be sought for all over the world and thus shall be strengthened the foundation of the imperial polity.'[৩]

অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবী থেকে জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে এবং এভাবেই সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করিতে হইবে।

সম্রাটের এই অনুজ্ঞা অনুসারে জাপানের সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইল। কারণ মেধাবী জাপানীরা প্রেরিত হইলেন লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, নিউইয়র্ক ম্যাঞ্চেস্টার ইত্যাদি নগরীতে—আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কিত সমস্ত প্রকার জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণের জন্য।

জাপানের অভ্যন্তরে দ্রুত সামন্ত যুগ ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা সেখানে প্রবেশ করিল। সামুরাই অভিজাতগণ তাঁদের জমিদারি মনোবৃত্তি ও বিশেষ অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং ক্রমে কৃষকেরাও জমির অধিকার পাইল। পশ্চিমের অনুকরণে জাপানেও পার্লামেণ্টারি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল বটে, কিন্তু সম্রাটের বিশেষ অধিকার ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতাও অব্যাহত রহিল। জাপানের মন্ত্রিসভা সংসদের নিকট দায়ী ছিল না এবং প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং নিযুক্ত হইতেন সম্রাটের দ্বারা। আর সম্রাটকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ছিল 'জেনুরো' বা একদল প্রবীণ রাজনীতিক। কিন্তু নৌ ও সৈন্যবিভাগের যেমন সর্বোচ্চ দায়িত্ব ছিল সম্রাটের হাতে, তেমনি এই দায়িত্ব তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তর মারফৎ পরিচালনা করিতেন না, করিতেন সোজাসুজি সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষদের (Chiefs of Staff) মারফৎ আবার এঁরা একমাত্র সম্রাটের নিকট দায়ী ছিলেন। সুতরাং জাপানের সামরিক বাহিনী জাপানী পার্লামেণ্টের আওতার বাইরে ছিল, এই গুরুতর তথ্যটি মনে রাখা দরকার। কারণ, আধুনিক জাপানের শাসনকর্তা ছিলেন এই সামরিক গোষ্ঠি। পূর্বেকার ভূম্যধিকারী অভিজাত সামুরাইগণ নবীন জাপানের সেনাপতি ও সামরিক নেতায় রূপান্তরিত হইয়াছিলেন।

যে দ্রুতগতিতে সমুদ্রবেষ্টিত এই দ্বীপপুঞ্জ* মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে একেবারে আধুনিক যুগের সূর্যোদয়ে আসিয়া পৌঁছিল, তা প্রায় অবিশ্বাস্য। চীনা ভাষায় 'জাপান' শব্দের অর্থ 'উদীয়মান সূর্য' এবং জাপানীরা বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁরা সূর্যদেবতার দ্বারা সুরক্ষিত এবং তাঁদের সম্রাটও 'সূর্যবংশোদ্ভূত'। দুই হাজার বছর ধরিয়া এই রাজবংশ জাপানে রাজত্ব করিতেছিল। দেবতারূপী এই সম্রাটের সেবায় আত্মবিসর্জন করিতে পারাকে সৌভাগ্য বলিয়া মনে করা হইত। নবীন জাপানের রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবন সম্রাটকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতে লাগিল।

অন্যদিকে ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের পর কয়েক বছরের মধ্যেই বিদ্যুৎগতিতে জাপানে কলকারখানা, শ্রমশিল্প এবং ব্যবসায় বাণিজ্য প্রসার লাভ করিল। বৃহৎ মূলধনের প্রয়োগে বড় বড় শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠিল এবং ধান চাষকারী কৃষকেরা গুটিপোকা ও রেশম উৎপাদনের দ্বারা আয় বৃদ্ধি করিতে লাগিল। জাপান এভাবে অতি দ্রুত এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইল। তারপর ১৯০৪ সালে জারের রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে জাপান একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের মর্যাদায় উন্নীত হইল। তার এই শক্তি ও গর্বিত চেহারায় এশিয়া মহাদেশের পরাধীন

* খাস জাপানের আয়তন ১,৪৮,৮০০ বর্গমাইল। কোরিয়া, ফরমোজা ও দক্ষিণ শাখালিনসহ সমুদ্র-পারবর্তী রাজ্যগুলির আয়তন ছিল ১,১৪,৬০০ বর্গমাইল। জাপানের লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৩০ লক্ষ এবং জাপ দখলীকৃত রাজ্যগুলির লোকসংখ্যা ৩ কোটি—(১৯৩৯ সাল)।

দেশগুলিতে ধন্য-ধন্য রব উঠিল। এদিকে তার জনসংখ্যাও দ্রুত বাড়িতে লাগিল। ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে যে জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৬০ লক্ষ, ১৯২০ সালে তাহা দাঁড়াইল সাড়ে ৫ কোটিতে এবং পরবর্তী দুই দশকে আরও বৃদ্ধি পাইল। এই বর্ধিত জনসংখ্যা কেবলমাত্র কৃষির দ্বারা বাঁচিতে পরে না এবং কৃষিকার্যের উপযোগী আর-এক ছটাক জমিও ছিল না। সুতরাং পুঁজিবাদ ও ধনতন্ত্রের সংকট আরম্ভ হইল। এই গভীর সমস্যায় দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল স্থির করিলেন যে, আরও ব্যাপকভাবে এবং পূর্ণতররূপে দেশকে শ্রমশিল্পের দ্বারা ছাইয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু পেট্রোল, কয়লা, লোহা, কার্পাস, পশম ইত্যাদি বৃহৎ শ্রমশিল্পের সহায়ক কাঁচামালগুলির জন্য তাকে বিদেশের—বিশেষভাবে আমেরিকা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপর নির্ভর করিতে হইত। সুতরাং সমস্যা সহজ ছিল না এবং ছিল না বলিয়াই এর পরিণতি ঘটিল আক্রমণাত্মক যুদ্ধে। সিজুকাই ও মিনসিটো নামে যে দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল জাপানে ছিল, তারা বৃহৎ শ্রমশিল্পের প্রসার সম্পর্কে একমত ছিল বটে, কিন্তু কিভাবে উহা প্রচুর ঐশ্বর্যদায়ক হইবে, তা নিয়া মতভেদ ছিল। সিজুকাই দল বিশ্বাস করিতেন যে, একমাত্র আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির মধ্যেই জাপানের মুক্তি নিহিত। অপরপক্ষে মিনসিটো দল বিশ্বাস করিতেন যে, সমুদ্রপারবর্তী বহির্বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার দ্বারাই জাপান চরম উন্নতি লাভ করিতে পারে। এজন্য দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি কঠোর করিতে হইবে এবং বিদেশী রাজ্যগুলির সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

এই দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল ছাড়া জাপানে আর-একটা তৃতীয় দল ছিল এবং তাঁরা এই দুই দলেরই বিরোধী ছিলেন। তাঁরা হইতেছেন সামরিকতাবাদী, সেনানী-মণ্ডলী এঁদের পরিচালক। এই সামরিক গোষ্ঠীর নীতি ছিল এই যে, পৃথিবীতে জাপানের বৃহত্তম সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং দিগ্বিজয়ের দ্বারা জাপানের সমৃদ্ধি ঘটাইতে হইবে। রাজনৈতিক দলগুলি এঁদের নীতির সঙ্গে একমত না হইলেও উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁদের বিরোধিতা ছিল না, ছিল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ পূরণের জন্য বিরোধ। কেননা এঁদের পিছনে ছিল জাপানের সুপ্রসিদ্ধ কয়েকটি ধনিক পরিবার—যাদের মধ্যে প্রধান ছিল দুইটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী, মিৎসুই এবং মিৎসুবিসি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বতী ফ্রান্সের মত জাপানেও এই ধনিক পরিবারগুলিরই আধিপত্য ছিল এবং সমগ্র জাপানের আর্থিক জীবন এঁদের করতলগত ছিল। প্রাচীন সামুরাই অভিজাত শ্রেণীর বংশধরেরাই নূতন জাপানের ব্যবসায়-বাণিজ্য পত্তন এবং প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। মিৎসুই গোষ্ঠী ছিলেন ব্যাংক ব্যবসায়ে, কারখানাজাত পণ্যদ্রব্যে কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যাদিতে এবং বিশেষভাবে অস্ত্র ব্যবসায়ে প্রতিপত্তিশালী। এঁরাই ছিলেন সিজুকাই দলের নেতা ও পৃষ্ঠপোষক। আর মিৎসুবিসি গোষ্ঠী ছিলেন জাহাজ ব্যবসায়, ইঞ্জিনীয়ারিং, সামুদ্রিক বীমা, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং এবং বিমানশিল্প নির্মাণ ইত্যাদি এবং তাঁরা ছিলেন মিন-সিটো দলের অভিভাবক। সুতরাং বৃহৎ ব্যবসায়ের পরিচালক এই দুই পরিবারগোষ্ঠীর মত এই দুইটি পার্টিও অনিবার্যরূপেই রণপ্রস্তুতি ও যুদ্ধযাত্রার সঙ্গে জড়িত ছিল। যেমন, সৈন্যবাহিনী সম্প্রসারণের খরচের সঙ্গে সিজুকাই দলের এবং নৌবহরের খরচের সঙ্গে মিনসিটো দলের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ছিল।[১]

১। 'The Between-War World—by J. Hampden Jackson, P. 285-58.

জাপান ক্রমশঃ প্রশান্ত মহাসাগরে ও পূর্ব এশিয়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতে লাগিল। ফলে, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টনক নড়িল। এই অবস্থায় ১৯২১ সালে ওয়াশিংটন সম্মেলনে আমেরিকা ও বৃটেন ইত্যাদির সঙ্গে নৌ চুক্তির দ্বারা জাপান শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিল এবং ১৯৩০ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় ১০ বৎসর ধরিয়া এই 'শান্তির যুগ' চলিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৯২৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পৃথিবীর ইতিহাসের এক ভয়ংকরতম ভূমিকম্পের দ্বারা জাপান বিধ্বস্ত হইল। রাজধানী টোকিও এবং প্রসিদ্ধ বন্দর ইয়কোহামা ধ্বংস হইল। সেই প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পের যেমন কোন তুলনা ছিল না, তেমনই ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করাও দুঃসাধ্য ছিল। ১ লক্ষ ৬০ হাজার লোক ভূমিকম্পে এবং কম্পনসঞ্জাত অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারাইল, আর সম্পত্তি নষ্ট হইল ৫৫ কোটি পাউন্ড বা কয়েক সহস্র কোটি টাকা মূল্যের। কিন্তু জাপানীদের ধৈর্য, সহনশক্তি এবং নৈপুণ্য ও পরিশ্রমেরও তুলনা ছিল না। ৭ বৎসরের মধ্যেই এই ভয়াবহ ভূমিকম্পের অধিকাংশ ক্ষয়ক্ষতি জাপান সামলাইয়া উঠিল এবং নূতন নূতন নগর নির্মাণ করিল। (এই সময় জাপানের 'শান্তিপূর্ণ" থাকার অন্যতম কারণও ইহাই।) কিন্তু একদিকে ভূমিকম্পের আঘাত এবং অন্যদিকে শ্রমশিল্প বিপ্লবের আকস্মিক প্রতিক্রিয়া—এই দুইয়ের ধাক্কায় জাপানী সমাজ-জীবনের অভ্যন্তরে বহু আলোড়ন আনিল। বৃহৎ মালিক ও শ্রমিক শ্রেণী গড়িয়া উঠিল এবং নির্মাণ, সংগঠন ও উৎপাদনের তাগিদে শ্রমিকদের খাটুনির ঘণ্টা বাড়িয়া গেল। তাদের মজুরি ছিল সামান্য, পরিশ্রম ছিল অসাধারণ। মজুরদের বাহিরের জীবন বলিয়া কিছু ছিল না, অনেকে কারখানায় কাজ করিয়া সেখানেই ক্লান্ত দেহে ঘুমাইয়া পড়িত। আর বাকি লোকগুলি ছিল নোংরা বস্তির বাসিন্দা মাত্র। ১৯১৯ সাল হইতেই ধর্মঘট আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ বৎসর খৃস্টান প্রচারক কাগাওয়ার নেতৃত্বে কোবে শহরের ৩৫ হাজার শ্রমিক শোষণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু ধর্মঘটগুলি সফল হইল না, ট্রেড ইউনিয়নগুলি ছিল দুর্বল। সুতরাং এই অবস্থায় জাপানে 'বিপজ্জনক চিন্তাধারা' প্রবেশ করিল। অর্থাৎ কমিউনিজম দেখা দিতে লাগিল। বিশেষভাবে ছাত্র ও যুবক সমাজে ইহা প্রসার লাভ করিল। সুতরাং এই 'বিপজ্জনক চিন্তাধারা' দমনের জন্য পীড়ননীতি শুরু হইল এবং এই বিষয়ে দুইটি রাজনৈতিক দলই—সিজুকাই ও মিৎসুবিসি একমত ছিলেন। ১৯২৮ সালে 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির' প্রথার বিরুদ্ধে আক্রমণকে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য অপরাধ বলিয়া আইন পাশ হইল।

এর পর ১৯৩০ সাল হইতে পৃথিবীব্যাপী বাজার মন্দার ফলে জাপান নিদারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়িল। ইহার পরই শুরু হইল মাঞ্চুরিয়া ও চীনে জাপানের আক্রমণাত্মক নীতি ও যুদ্ধ—যাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ১০ বৎসর ধরিয়া চলিল।

এই সময় হইতে জাপানে ফ্যাসিজম ও সন্ত্রাসবাদীয় হত্যাকাণ্ড শুরু হইল। ১৯২১-২২ সালে ওয়াশিংটনে নৌবল নিয়ন্ত্রণ চুক্তির পর ১৯৩০ সালে লণ্ডনে আর-একটি নৌ-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইল এবং উহাতে জাপান ক্রুজার ও ডেস্ট্রয়ার সীমাবদ্ধ করিতে সম্মত হইল। ফলে জঙ্গীবাদীগণ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধানমন্ত্রী হামাগুচিকে হত্যা করিল। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই জঙ্গীবাদীরাই মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল এবং এজন্য মন্ত্রিসভা বা গভর্নমেন্টের সম্মতির পর্যন্ত প্রয়োজন হইল না। তখন

মিনসিটো দলের ব্যারণ সিদেহারা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মন্ত্রিসভা এতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করিতেছিলেন না এবং মাঞ্চুরিয়ার 'রণপ্রভু' চ্যাং সুয়ে লিংয়ের সঙ্গে একটা আপোষরফার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু জাপানী সেনানীমণ্ডলী তা' গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না। ডিসেম্বর মাসে মিনসিটো মন্ত্রিসভার পতন হইল এবং সিজুকাই দল নূতন গভর্নমেণ্ট গঠন করিলেন। ইতিমধ্যে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী আক্রমণ সম্পর্কে বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক নিযুক্ত লর্ড লিটনের (লিটন কমিশন) রিপোর্ট প্রকাশিত হইল এবং তাতে জাপানের কার্যকে 'সমর্থনের অযোগ্য' বলিয়া নিন্দা করা হইল। তখন প্রধানমন্ত্রী ইনুকাই চীনের সঙ্গে আপোষরফার প্রস্তাব করিলেন। তৎক্ষণাৎ জঙ্গীবাদীরা চীৎকার শুরু করিল যে, ইনুকাই এবং তাঁর সমর্থক মিৎসুই গোষ্ঠী দেশপ্রেমিক নহেন। ফলে মিৎসুবিসি কারবারের বড়কর্তা এবং প্রধানমন্ত্রী ইনুকাই নিহত হইলেন। জেনারেল আরাকি তখন সমরসচিব এবং কার্যত জাপানের ডিক্টেটার। মাঞ্চুরিয়া অভিযানের সংগঠকও ছিলেন তিনি। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে (জার্মানীতে হিটলারের ক্ষমতালাভের সময়) জেনারেল আরাকি যে বক্তৃতা দিলেন তা' দস্তুরমত ফ্যাসিস্টপন্থী এবং এই বক্তৃতায় তিনি 'কোডো' (Kodo) নামে এক তত্ত্বের উপর জোর দিলেন, যাহা নাৎসী জার্মানির আর্য জাতির শ্রেষ্ঠত্বের মত জাপানী জাতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রচার করিল এবং এশিয়া হইতে শ্বেতকায় জাতির প্রভুত্ব অবসানের দাবী জানাইল। এদিকে জেনারেল আরাকি পুঁজিবাদীদের উপর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সৈন্য ও নৌবিভাগের পদস্থ সেনানীগণ জানিতেন যে, মিৎসুই এবং মিৎসুবিসিদের মূলধন ও আর্থিক শক্তি ছাড়া যুদ্ধ চলিতে পারে না। সুতরাং তারা জেনারেল আরাকিকে সহ্য করিতে পারিলেন না। ১৯৩৪ সালে তিনি মন্ত্রিসভা হইতে অপসারিত হইলেন এবং ১৯৩৫ সালে তাঁর পশ্চাদনুসারীগণকে সৈন্যবাহিনী হইতে নির্মূল (পার্জ) করা হইল। এর প্রতিশোধ লওয়ার জন্য ১৯৩৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তরুণ সামরিক অফিসারেরা বিদ্রোহ করিল এবং ৪ জন মন্ত্রীকে হত্যা করিল। প্রধানমন্ত্রী ওকাদা কয়েকদিন গা ঢাকা দিয়া রহিলেন এবং শোকার্ত শবযাত্রীর ছদ্মবেশে 'নিজের শবযাত্রায়' দেখা দিলেন! অর্থাৎ তাঁকে ভুল করিয়া তাঁর শ্যালককে হত্যা করা হইয়াছিল।[১]

এভাবে জঙ্গীবাদী এবং পুঁজিপতিরা নিজেদের মধ্যে দলগত বিরোধ সত্ত্বেও পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিকবাদের নীতি আঁকড়াইয়া ধরিল এবং জাপানে গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মৃত্যু ঘটিল।

আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উগ্রজাতীয়তায় জাপান নেশাচ্ছন্ন হইল এবং ইতিমধ্যেই যে মার্কসীয় চিন্তাধারা সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিয়াছিল, তাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলিয়া মনে করা হইল এবং নিষ্ঠুর দমন নীতি শুরু হইল। সোসিয়েলিস্টপন্থীরা দুই ভাগ হইয়া গেল। এক পক্ষ জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেমের নামে আর্মিকে সমর্থন করিল এবং অপর পক্ষ আন্তর্জাতিকতার আদর্শকেই অনুসরণ করিতে চাহিল। কিন্তু বামপন্থী মতবাদ ও মার্কসীয় চিন্তাধারার বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্ট যে হিংস্র আক্রমণ শুরু করিলেন, তার প্রথম শিকার হইল একজন তরুণ বামপন্থী লেখক—কোবাইয়াসি তাকিজি, একে পুলিশের হেপাজতে মারিয়া ফেলা হইল। শুরু হইল সমস্ত শিক্ষালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বামপন্থী মতবাদের পুঁথিপত্র ও শিক্ষক

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩০৩।

বিতাড়ন। ১৯৩৩ এবং ১৯৩৭ সালের মধ্যে অনেক বিদ্বান ব্যক্তি ও অধ্যাপককেই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িতে বাধ্য করা হইল। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রখ্যাত মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ, জাপানের সমগ্র শিক্ষাজগতে যাঁর প্রচুর প্রতিষ্ঠা ছিল, তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাদণ্ড দেওয়া হইল। অধ্যাপক মিনোবে নামে একজন সুবিখ্যাত মনীষী, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য যাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং যিনি হাউজ অব্ পীয়ার্স-এর সদস্য ছিলেন, তাঁর উপর পর্যন্ত নির্যাতন অনুষ্ঠিত হইল। তাঁকে শিক্ষা জগৎ ও জনগণের জীবন থেকে বিতাড়িত করা হইল। অবশ্য তাঁর ভাগ্য ভালো যে, তাঁকে জেলে দেওয়া হইল না, বা তাঁকে খুন করা হইল না, কিন্তু দৈহিক আক্রমণ তাঁকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। অথচ তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং জাপানের সম্রাটের মন্তব্য কিন্তু উল্লেখযোগ্য ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—

'মিনোবে সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হইতেছে। কিন্তু তাঁর আনুগত্য নাই, এমন কথা আমি বিশ্বাস করি না। আজিকার জাপানে মিনোবের মত প্রতিভাধর ব্যক্তি কয়জন আছেন? কিন্তু এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে বিস্মৃতির অন্ধকারে ঠেলিয়া দেওয়া নিতান্তই দুর্ভাগ্যের বিষয়।'

এমন কি এই ঘটনার দুই বছর পর জাপানের সম্রাট সম্পর্কে পর্যন্ত টোকিওর উগ্র জাতীয়তাবাদীরা কটাক্ষ করিতে লাগিলেন। কারণ, 'বিজ্ঞান বিষয়ক পড়াশুনায়' তিনি অত্যধিক সময় ব্যয় করিতেন।

আধুনিক জাপান সম্পর্কে জনৈক লেখক জানাইতেছেন যে, এভাবে জাপাপকে চারদিক থেকে 'কুরাই তানিমা' বা 'অন্ধকার উপত্যকার' গভীর কালো ছায়া ঘিরিয়া ধরিতে লাগিল।[১]

অর্থাৎ মহাযুদ্ধের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল এবং আমেরিকার সহিত সংঘর্ষ বাধিল।

জাপ-মার্কিন সংঘর্ষ

আমেরিকার সঙ্গে জাপানের সংঘাত যে অনিবার্য ছিল এই ঐতিহাসিক সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন সোভিয়েট বিপ্লবগুরু স্বয়ং লেনিন। সেই বিংশ শতকের গোড়াতেই এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের অবস্থার দিকে তাকাইয়া তিনি ১৯২০ সালে লিখিয়াছিলেন—

'...a most stubborn struggle has been going on for many decades between Japan and America over the pacific ocean and the mastery of its shores, and the entire diplomatic, economic and trade history of the Pacific ocean and its shores is full of quite definite indications that the struggle is developing and making war between America and Japan inevitable.'[২]

অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসমুদ্র এবং এর তীরবর্তী দেশগুলির উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা লইয়া জাপান ও আমেরিকার মধ্যে গত কয়েক দশক ধরিয়া যে ভয়ানক রকমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে, এবং প্রশান্ত মহাসাগর ও তার উপকূলভাগের সমগ্র কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ইতিহাসের মধ্যে যে সমস্ত লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই তীব্র দ্বন্দ্ব জাপান ও আমেরিকার মধ্যে 'যুদ্ধকে অনিবার্য" করিয়া তুলিতেছে।

এই 'অনিবার্য' যুদ্ধ'ই ঘনাইয়া আসিতেছিল প্রশান্ত মহাসাগরে, যার ঐতিহাসিক রূপ লেনিনের চোখে ধরা পড়িয়াছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই। সাম্রাজ্যবাদের এটাই স্বাভাবিক পরিণতি এবং এই পরিণতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন বৃটেনের সুবিখ্যাত সমর-ঐতিহাসিক মেজর-জেনারেল জে. এফ. সি. ফুলার। তিনি লিখিয়াছেন যে, পশ্চিমে যেমন জার্মানী, পূর্বদিকে তেমনই জাপানেরও যুদ্ধযাত্রার মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক। জাপানের দ্রুত শ্রমশিল্পায়ন ঘটিল বটে, কিন্তু জার্মানীর মত তারও কাঁচামালের মূল উৎস ছিল না। ফলে, বিদেশের দিকে যাত্রা করিতে হইল এবং সাম্রাজ্যবাদের পথ ধরিতে হইল। ১৮৭৫ ও ১৮৭৯ সালের মধ্যে জাপান কিউরাইল, বোনিন ও রিউকিউ দ্বীপ দখল করিল এবং ১৮৯১ খৃস্টাব্দে ভলক্যানো দ্বীপপুঞ্জ। তারপর ১৮৯৪-১৮৯৫ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জাপান ফরমোজা, পেসকাডোরস্ ও পোর্ট আর্থার বন্দর আদায় করিয়া লইল। কিন্তু রাশিয়া, জার্মানী ও ফ্রান্সের চাপে পড়িয়া পোর্ট আর্থার ছাড়িয়া দিতে হইল। কিন্তু ১৯০৫ সালে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাপান আবার পোর্ট আর্থার ফিরিয়া পাইল। শাখালিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ দখল এবং কোরিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিল। ১৯১০ সালে কোরিয়া জাপানের পুরাপুরি অধিকারে গেল এবং ১৯১৯ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের একমাত্র গুয়াম ছাড়া ম্যারিয়ানা, ক্যারোলিন ও মার্শাল দ্বীপগুলি ইজারা বা ম্যান্ডেটস্বরূপ লাভ করিল। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে জাপান পিকিংয়ের কাছে মার্কোপলো ব্রীজ পার হইয়া চীন আক্রমণ করিল। জার্মানীর মত সেও এক নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (নিউ ইকোনোমিক অর্ডার) গড়িয়া তুলিতে চাহিল এবং এই ব্যবস্থাকেই সে 'দি গ্রেট এশিয়া কো-প্রসপারিটি স্ফীয়ার' নামে অভিহিত করিল। এর উদ্দেশ্য ছিল মাঞ্চুকো থেকে অস্ট্রেলিয়া এবং ফিজি দ্বীপ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এই বিশাল এলাকায় এমন একটি অর্থনৈতিক সৌরমণ্ডলের প্রতিষ্ঠা করা—যার মর্মকেন্দ্রে থাকিবে জাপানের নবোদিত সূর্য![১]

আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জাপানী মন্ত্রিসভার উপর সশস্ত্রবাহিনীর প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। কিন্তু চার্চিল তাঁর ইতিহাসে মন্তব্য করিয়াছেন যে, আর্মির তুলনায় নেভী কম উগ্র ছিল। কারণ, উনবিংশ শতকে জাপানের সৈন্যবাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছিল জার্মানীর প্রশিক্ষণের ফলে, আর নেভী বা নৌবাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছিল বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতায়। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ ছিল এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী আবার পরিপুষ্ট হইয়াছিল উভয় বাহিনীর সৈনিক জীবনের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। আর্মির অফিসারেরা কদাচিৎ বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাইতেন একমাত্র যুদ্ধ ও আক্রমণের উপলক্ষ ছাড়া। ফলে, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সংকীর্ণ ও জাতীয়তার উগ্রতায়

আচ্ছন্ন। কিন্তু নেভী বা নৌবহরের লোকদের সচরাচর বিদেশের বন্দরে ও নৌঘাঁটিতে যাতায়াত করিতে হইত এবং বৃটিশ বা মার্কিন নৌবহরের তুলনায় তাঁদের শক্তি যে কম, এই চেতনাও তাঁদের ছিল। এজন্য আর্মির তুলনায় নেভী অনেক বেশী সাবধানী ও মধ্যপন্থী ছিল।[১]

১৯৪০ সালে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফরাসী, ওলন্দাজ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ উপনিবেশগুলিকে ছিনাইয়া লওয়ার জন্য জাপান লোভার্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু যুদ্ধের এই বিপজ্জনক কিনারা থেকে জাপানকে সরাইয়া নেওয়ার জন্য তখনও জাপানী সমাজে কিছু স্থির-বুদ্ধি ও সংযত স্বভাবের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। জাপানী রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রিন্স কনোয়ে ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৯৪০ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৪১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রীর গদীতে আসীন ছিলেন। চার্চিল লিখিয়াছেন যে, জাপানী সমাজে তিনি একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ও বিচক্ষণ রাজনীতিকরূপে পরিচিত ছিলেন। বৃটিশ ও ওলন্দাজ উপনিবেশগুলি উপর ঝাঁপাইয়া পড়ার আগ্রহ থেকে তিনি জাপানী আর্মির রাশ টানিয়া ধরিলেন। সম্রাট ও সম্রাট পরিবারের রাজপুত্রগণ এবং উচ্চতম অভিজাতগণও এই প্রকার আগ্রাসী যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আর্মিকে ঠেকাইয়া রাখিয়া নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিতে তাঁরাও প্রস্তুত ছিলেন না।

* * *

১৯৪১, জুলাই মাসে জাপানী সৈন্যরা দক্ষিণ ইন্দোচীনের ঘাঁটিগুলি দখল করিয়া নিল। ফলে, জাপানের দিক থেকে শ্যাম, মালয় এবং পূর্ব ভারতীয় ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের বিপদ দেখা দিল। প্রিন্স কোনোয়ে ইন্দোচীনের এই ঘাঁটি দখলে রাজী হইয়াছিলেন এজন্য যে, তাঁর মনে হইয়াছিল এটাই সবচেয়ে মন্দের ভালো। কারণ, তখন জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের ফলে জাপানী সামরিক মহলে উত্তেজনার ঝড় বহিতেছিল। মাৎসুয়োকার মত কোন কোন উগ্রতাবাদী রাজনীতিক 'মিত্র জার্মানীর' সহিত একত্র হইয়া অবিলম্বেই সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করিতে চাহিলেন। কেউ কেউ আবার হংকং এবং মালয় দখল করিয়া নেওয়ার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অবস্থার জন্যে প্রিন্স কোনোয়ে অনুভব করিলেন যে, বোধহয় সায়গনের দিকে যাওয়াই সবচেয়ে কম বিপজ্জনক হইবে। কিন্তু মার্কিন, বৃটিশ, ওলন্দাজ—একত্রে জাপানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক স্যাংশন জারী করিবে, এতটার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।[২]

জাপানী সেনাবাহিনী এবং সমরসচিব জেনারেল তোজো ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ লওয়ার জন্য ক্রমেই যেন অধৈর্য হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, আমেরিকা বৈষয়িক সম্পদে ধনীর দেশ হইতে পারে, কিন্তু জাপানীদের মত তাঁরা যুদ্ধনিপুণ নন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স কোনোয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের একান্ত বিরোধী ছিলেন। এই সময় কোনোয়ে চাহিলেন, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে সরকারী সাক্ষাৎ-আলোচনার দ্বারা জাপানী-মার্কিন বিরোধ মিটাইয়া ফেলা যায় কিনা, তেমন চেষ্টা করিয়া দেখার জন্য। জাপানী প্রধানমন্ত্রী এজন্য হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে

১। The Second World War—Churchill. Vol. 3, P. 517.
২। A History of Modern Japan—P. 210.

অথবা আলাস্কাতে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু এর পিছনে জাপানী সমর বিভাগের কোন চাতুর্যপূর্ণ ফাঁদ থাকিতে পারে, কিংবা আমেরিকাও জাপান সম্পর্কে মিউনিকের তোষণনীতি অনুসরণ করিতে চলিয়াছে, এমন অপবাদ বিরোধী পক্ষ রটনা করিতে পারেন—এই আশঙ্কায় কোনোয়ে-রুজভেল্ট বৈঠকে ওয়াশিংটন আর রাজী হইল না।[১]

এদিকে সেপ্টেম্বর মাসে সম্রাটের উপস্থিতিতে যে ইম্পিরিয়েল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইল, তাতে ক্যাবিনেট মন্ত্রিগণ, সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষবৃন্দ এবং শীর্ষস্থানীয় অফিসারবৃন্দ যোগ দিলেন। এই বৈঠকে স্থির হইল যে, আমেরিকার সঙ্গে জাপানের যে আলোচনা চলিতেছে, যদি সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝির মধ্যে তা সার্থক না হয়, তবে বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য জাপানকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন যে, যদি এই সময় নৌ-দপ্তরের মন্ত্রী এবং নৌ-সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ সাহসপূর্বক সমর-সচিব জেনারেল তোজোকে বাধা দিতেন, তবে প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স কোনোয়ে ও জাপানের সম্রাট একত্রে চাপ দিয়া হয়তো আমেরিকার সঙ্গে একটা আপোসরফা ঘটাইয়া যুদ্ধ এড়াইতে পারিতেন। কিন্তু নৌ-দপ্তর প্রকাশ্যে যুদ্ধের বিরোধিতা করিতে সাহস পাইল না।

অক্টোবরের (১৯৪১) মাঝামাঝি আসিয়া গেল! প্রিন্স কোনোয়ে কিন্তু ওয়াশিংটনের সঙ্গে কথাবাতা চালাইয়া যাইতেই চাহিলেন। কিন্তু টোকিওতে যুদ্ধের উন্মাদনা বাড়িয়াই গেল। ক্রমেই সংকট গাঢ় হইতে লাগিল। তখন প্রিন্স কোনোয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং জেনারেল তোজো একাই জাপানের প্রধানমন্ত্রী, সমরমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। মন্ত্রিসভার এই এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের আগে জেনারেল তোজোর সঙ্গে এই বুঝাপড়া হইল যে, ওয়াশিংটনের সঙ্গে কথাবার্তার শেষ চূড়ান্ত তারিখ কয়েক সপ্তাহ আগাইয়া দেওয়া হইবে।[২]

জেনারেল তোজো নিজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদও কেন গ্রহণ করিলেন, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের বদলে শান্তির সিদ্ধান্ত হইলে পাছে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দেয় সেজন্যই এই সতর্কতা![৩]

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ২১২।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২১২-১৩।
৩। চার্চিল—৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাপ-মার্কিন বিরোধের মূলসূত্র

প্রশান্ত মহাসাগরের এই জাপ-মার্কিন সংঘর্ষ বুঝিবার জন্য ইতিহাসের পিছনের দিকে আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে। কারণ, শতাধিক বর্ষ পূর্বের অন্ধকার যবনিকা উত্তোলন করিলেই দেখা যাইবে, কিভাবে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য, বন্দর ও নৌদুর্গ পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া এশিয়া খণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিল শাসন ও শোষণের জন্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৯৫২ খৃস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নামজাদা পররাষ্ট্রসচিব মিঃ উইলিয়াম সীওয়ার্ড ঘোষণা করিলেন—

"Commerce brings America closer to the Asiatic Continent. The new situation which thus arises will bring about great changes in America's position : that is, America is now confronted with a situation requiring her to possess a connecting point between herself and the Asiatic Continent : that is, a colony. There is no doubt that the Pacific, all the shores of the Pacific, and all the Pacific islands will become a main theatre for this particular purposes."

—বাণিজ্যের জন্য আমেরিকা এশিয়া ভূখণ্ডের নিকটবর্তী হইয়াছে। এই নূতন পরিস্থিতির জন্য আমেরিকার অবস্থার বিপুল পরিবর্তন ঘটিবে। এশিয়া মহাদেশ ও আমেরিকার নিজের মধ্যে একটি যোগসূত্রের সন্ধান করিতে হইবে। সোজা কথায়, আমেরিকার একটি উপনিবেশ প্রয়োজন। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে, কেবলমাত্র এই একটি উদ্দেশ্যের জন্যই প্রশান্ত মহাসমুদ্র উহার সমুদয় তীর ও সমস্ত দ্বীপ একটি প্রধান মঞ্চে পরিণত হইবে—প্রায় ১০০ বৎসর আগেকার এই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে। ১৮৫২ খৃস্টাব্দের এই মার্কিননীতি অনুসারেই উহার পরের বৎসর জুলাই মাসে কমোডোর পেরি জাপানে গেলেন আমেরিকার সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের দাবী লইয়া। ইহার ফলে জাপানের রাষ্ট্রজীবনেও নূতন ধারা; ইউরো-মার্কিন সভ্যতার উগ্র প্রভাব দেখা দিল। পেরি সাহেব মার্কিন বাণিজ্যের পথ হিসাবে জাপানের বোনিন ও রিউকিউ দ্বীপ, ফরমোজা, শ্যাম, কম্বোডিয়া, কোচিন চীন, সুমাত্রা ও বোর্নিওর উপর নজর রাখিয়াছিলেন। ঐ একই উদ্দেশ্যে মার্কিন গভর্নমেণ্ট ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে, এলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও আলাস্কা ৭২ লক্ষ ডলার মূল্যে জারের রাশিয়ার নিকট হইতে ক্রয় করিলেন। ক্রমে ফিলিপাইন ও হাওয়াই ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জও আমেরিকার হাতে আসিল। এভাবে বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টার সঙ্গে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের উপর নৌ-আধিপত্য বজায় রাখিবার প্রয়োজন হইল। নৌবহরের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের নানা দ্বীপে গড়িয়া উঠিল নৌঘাটি। কিন্তু আমেরিকার বহু আগেই বৃটেন এশিয়া মহাদেশের ভারতবর্ষ ও চীন ইত্যাদিতে প্রবেশ করিয়াছিল। ক্যাণ্টনে ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশী বণিকেরা দেখা দিলেন। চীনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক

ব্যবসায়ে বিঘ্ন সৃষ্টির অভিযোগ ও অহিফেনের চোরাই কারবার বন্ধের নাম করিয়া শুরু হইল ১৮৪০-৪২ খৃস্টাব্দের ইতিহাস-খ্যাত 'অহিফেন-যুদ্ধ'। অতঃপর সন্ধিসূত্রে ইংরাজেরা হংকং ও অন্যান্য ৫টি বন্দর পাইলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বৃটেন সুদূর প্রাচ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিল। হংকং ছিল ইংরাজের প্রধান নৌঘাঁটি ও পণ্যদ্রব্য প্রবেশের প্রধান পথ। ইহার সঙ্গে বৃটেনের কর্তৃত্বে সাংহাইয়ের আন্তর্জাতিক উপনিবেশ ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প বিস্তারের ও শোষণের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হইল। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত (১৯১৩ সাল) চীনের সঙ্গে আমদানী বাণিজ্যের অর্ধেকই আসিত বৃটেন হইতে, এক-পঞ্চমাংশ জাপান হইতে এবং ষোল ভাগের একভাগ অপেক্ষাও কম আসিত আমেরিকা হইতে। ইহা ছাড়া রেলপথ, ব্যাংক, কারবারি মূলধন ও আর্থিক বিলি-ব্যবস্থাও বৃটেনের হাতে ছিল। চীন যেন বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের লুঠের মালে পরিণত হইল।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর এই সৌভাগ্য রহিল না। বিংশ শতকের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র বৃটেনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জারের রাশিয়া ও জার্মানীও প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। এই ইতিহাস দীর্ঘ ও জটিল। অত্যন্ত সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে আমেরিকাই সর্বপ্রথম চ্যালেঞ্জ জানাইল—মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব জন হে চীন মহাদেশে 'খোলা দরজা' নীতির দাবী জানাইলেন। এই দাবী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নীতিতেও বজায় ছিল। চীনের সমুদ্রতীরস্থ বন্দর ও শহরগুলির 'লীজ' গ্রহণের ধুম পড়িয়া গেল—জার্মান, রাশিয়া, ফ্রান্স ও বৃটেনের মধ্যে। ইংরাজ বণিকগণ শংকা বোধ করিতে লাগিলেন এবং সেই হইতে বৃটিশ নীতিতে দূরপ্রয়াসী পরিবর্তন শুরু হইল। জাপান তখনও এশিয়ার অস্ত্রধারী দিগ্বিজয়ী বণিকরূপে দেখা দেয় নাই। বৃটেন জাপানের দিকে ঝুঁকিল অন্যান্য বিদেশী শক্তিকে প্রতিরোধের উপায় হিসাবে। ১৮৯৪ সালে ইঙ্গ-জাপান শর্ত স্বাক্ষরিত হইল। বৃটেনের সহযোগিতায় জাপানের নৌবহর ও নৌবল গড়িয়া উঠিল এবং ইঙ্গ-জাপ চুক্তি স্বাক্ষরের দুই সপ্তাহের মধ্যেই জাপান চীনের বিরুদ্ধে অভিযানে বাহির হইল ১৮৯৪-৯৫ সালে। জাপান কোরিয়া কাড়িয়া লইল এবং লিওটাঙ্ উপদ্বীপ হস্তগত করিল। কিন্তু বৃটেন ছাড়া আর বাকী সমস্ত বিদেশী শক্তি একত্রে চাপ দেওয়ায় জাপান এই নূতন অধিকার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। ১৯০২ সালে ইঙ্গ-জাপানী সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধিপত্রের পরেই ১৮৯৪ সালের মত এবারও জাপান যুদ্ধে বাহির হইল। ১৯০৪-৫ সালে জারের রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জাপান পোর্ট আর্থার বন্দর দখল, লিওটাঙ্ অধিকার এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিল। ১৯০৫ সালে আবার জাপানের সহিত বৃটেনের সন্ধি হইল এবং সেই শর্তগুলির মধ্যে একদিকে নজর ছিল ভারতবর্ষে বৃটিশ শক্তির রক্ষা ও অন্যদিকে আমেরিকা। এভাবে ক্রমশঃ ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বৃটেনের সাহায্যে ও সহযোগিতায় জাপ শক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগেল। আধুনিক কাল পর্যন্ত ইহা চলিয়াছিল। ১৯৩১ সালে জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযান, ১৯৩৩ সালে জিহোল অধিকার ও রাষ্ট্রসংঘ পরিত্যাগ এবং ১৯৩৪ সালে নয়-শক্তি সন্ধির ('নাইন্ পাওয়ার্ ট্রিটি') বাতিল ও নৌবল নিয়ন্ত্রণের শর্ত (১৯২২ সালে ওয়াশিংটনের সম্মেলনে স্থিরীকৃত) অগ্রাহ্য, ১৯৩৬

সালে লণ্ডনের নৌসম্মেলন পরিত্যাগ, ১৯৩৭ সালে চীনের বিরুদ্ধে নয়া অভিযান ও ১৯৪০ সালের অক্টোবরের পূর্ব পর্যন্ত বৃটেন কর্তৃক বর্মা রোড বন্ধ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক জগতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এই সাক্ষই দেয় যে, বিগত মহাযুদ্ধের আগে আমেরিকা ও জারের রাশিয়া ইত্যাদির বাণিজ্যগত প্রভুত্বে বাধা দেওয়ার জন্য, মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিজম ও চীনের বৈপ্লবিক জাতীয় শক্তি (ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও জাপ সাম্রাজ্যবাদ পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছিল।

কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, ইহারই গতিপথে পূর্ব এশিয়ায় বৃটেনের বাণিজ্য ও রণনৈতিক শক্তি মন্দীভূত হইতে লাগিল। ১৯১৩ হইতে ১৯২৫ সালের মধ্যে চীনের আমদানী বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ বৃদ্ধি পাইল শতকরা ৬ ভাগ হইতে ১৫ ভাগে, আর বৃটেনের নামিয়া গেল শতকরা ৪৬ ভাগ হইতে শতকরা ২৮ ভাগে! আমেরিকার এই পরিবর্ধিত বাণিজ্যের সঙ্গে জাপানী রাজ্য এবং বাণিজ্যের ক্রমে তীব্র দ্বন্দ্ব শুরু হইল। এশিয়াখণ্ডে জাপানের এই আক্রমণাত্মক রণনীতি ও বাণিজ্যনীতির বিরুদ্ধে মার্কিন কর্তারা বৃটেনের নিকট আবেদন করিয়াও সাড়া পাইলেন না। ১৯৩৪ সালে জাপান বিদেশীদিগকে 'চীন হইতে হাত গুটাইবার' দাবী জানাইল। আর বৃটিশ নীতির ব্যাখ্যা করিয়া কমন্স সভায় পররাষ্ট্রসচিব স্যার জন সাইমন বলিলেন—

—"His Majesty's Government are centent to leave this particular question where it is!"

(বৃটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত এই যে, এই সুনির্দিষ্ট প্রশ্নটি যেখানে আছে সেখানেই থাকুক।)

সাম্রাজ্যবাদীর চালটা লক্ষ্য করিবার মত! কিন্তু একদিকে প্রশান্ত মহাসাগরে ও এশিয়াখণ্ডে জাপানের নৌবল ও সামরিক বলের অভুতপূর্ব প্রাধান্যের জন্য যেমন বৃটিশ বাণিজ্য হ্রাস পাইয়া গেল, তেমনই সুদূর প্রাচ্যে বৃটিশ নৌশক্তিও দুর্বল হইয়া পড়িল। ক্রমে জাপানের সঙ্গে বৃটেনেরও যুদ্ধ বাধিবার একান্ত সম্ভাবনা দেখা দিল। কারণ বৃটিশ স্বার্থ উভয় দিক দিয়াই নষ্ট হইতেছিল। চীনের সঙ্গে ব্রহ্ম, মালয়, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ এবং অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদির দিকে জাপান হাত বাড়াইতেছিল। ১৯৩৪ সাল হইতেই জাপানী আক্রমণাত্মক নীতিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারগণ বিপদ গণিতেছিলেন। জেনারেল স্মাটস্ ও লর্ড লোথিয়ান প্রভৃতি তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একত্রিত হইয়া জাপানকে প্রতিরোধের জন্য আন্দোলন শুরু করিলেন। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে 'রয়েল ইনস্টিটিউট্ অফ্ ইনটারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স'-এ সুদূর প্রাচ্যের সমস্যা সম্পর্কে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে জেনারেল স্মাটস ঘোষণা করিলেন—

'I would say that to me the future policy and association of our great British Commonwealth of Nations lie more with the USA than any group in the world.'

আর লর্ড লোথিয়ান 'অবজার্ভার' পত্রিকায় লিখিলেন—

'That the United States and the nations of the British Common-

wealth will be driven together in resistance to Japan in her leaders adopt the militarist policy.' [World Politics—R. Palme Dutt, P. 229.]

এই সমস্ত মতামত জাপানের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রী আন্দোলনেরই অগ্রদূত ছিল। অবশ্য আর-একদল তখনও জাপান সম্পর্কে তোষণনীতির (১৯৩৯ সালের বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের কার্যাবলী ও বর্মা রোড বন্ধ ইত্যাদি স্মরণীয়) পক্ষপাতী ছিলেন। বর্তমান মহাযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগ দিবে কিনা, এমন সন্দেহ আন্তর্জাতিক মহলে ছিল এবং এই জন্যই ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক জাপানী ধনসম্পত্তি আটকের হুকুম জাপানের বিরুদ্ধে প্ররোচনা বলিয়া কেহ কেহ (যেমন, রণ-পণ্ডিত লীডেল হার্ট) ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ ইহার দ্বারা একপক্ষে বৃটেন ও আমেরিকা এবং অন্যপক্ষে জাপান নিশ্চিত যুদ্ধের মধ্যে পড়িয়াছিল—এই অনুমান সম্পূর্ণ যুক্তিহীন নহে।

বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্রয়ে জাপান চীনে ও প্রশান্ত মহাসাগরে কায়েম হইয়া বসিতেছিল। কিন্তু ইহাতে এক সাম্রাজ্যবাদীয় নীতির দ্বারা আর এক ধনতন্ত্রবাদের প্রসারে বিঘ্ন ঘটিতেছিল। আমেরিকা ক্রমেই শংকাবোধ করিতেছিল। কিন্তু গোড়াতেই বলিয়াছি যে, এই জাপ-মার্কিন বিরোধের সূত্র বুঝিতে হইলে ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে শুরু করিতে হইবে। গত শতাব্দীতেই বিভিন্ন ইউরো-মার্কিন শক্তি পৃথিবীর নানা অংশে ছড়াইয়া পড়িয়া রাজ্য ও বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা দিয়াছিল। ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ও প্রশান্ত মহাসাগরের আরও কয়েকটি দ্বীপ দখল করিল। মার্কিন নৌবহর ও বাণিজ্যবহরের দূর প্রাচ্যযাত্রার ঘাঁটি সৃষ্টি হইল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জাপান তখন প্রবেশ করিয়াছে। আমেরিকার এই অগ্রগতি তাহার ভালো লাগিল না, বরং সন্দেহের সৃষ্টি হইল। ইহার পর ফিলিপাইন ও গুয়াম আমেরিকার হাতে যাওয়ায় জাপানীদের সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। অবশ্য এই সময়ে আমেরিকা ও জাপানের বাণিজ্য ও সৌহার্দের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এই সম্পর্কের উপর প্রথম যে আঘাত পড়িল, তাহারও মূলে অর্থনৈতিক কারণ রহিয়াছে।

ক্ষুদ্র জাপানের বাড়তি লোকসংখ্যা জীবিকার সন্ধানের জন্য বাহিরের পৃথিবীর দিকে তাকাইতেছিল। ইহাদের বেশীর ভাগ চীনে দেশান্তরিত হইতেছিল বটে, কিন্তু বৃহৎ একদল প্রতি বৎসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাইতে লাগিল। তখন মার্কিন ব্যবসায়-বাণিজ্যের হাঁকডাক শুনিয়া ইউরোপ ও এশিয়ার ভাগ্যান্বেষীদল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৯৩ সাল হইতে বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ (১৯১৯) পর্যন্ত মার্কিন-প্রবাসী জাপানীদের সংখ্যা দাঁড়াইল ২,১৯,০৪৮ জন। সংখ্যাটা নিশ্চয়ই তুচ্ছ করিবার মত ছিল না। এই নবাগত জাপানীরা প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তীর ধরিয়া নীড় বাঁধিতে শুরু করিল। বেশীর ভাগ জাপানী-'নীড়' দক্ষিণ ও মধ্য কালিফোর্নিয়ায় গড়িয়া উঠিল। কারণ, সেখানকার আবহাওয়া চমৎকার ছিল। কালিফোর্নিয়া ছাড়া ওয়াশিংটন, বৃটিশ কলম্বিয়া ইত্যাদি শহরেও জাপানীরা ছড়াইয়া পড়িতেছিল। প্রথম প্রথম মার্কিন পুঁজিপতিরা ইহাদিগকে সাগ্রহে গ্রহণ করিতেছিলেন। কারণ, ইহারা অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও শ্রম-সহিষ্ণু ছিল, বিশেষভাবে অতি সামান্য অর্থের বিনিময়ে ইহারা কঠোর শ্রমসাধ্য কাজও গ্রহণ করিত। ইংরাজীতে যাহাকে (চীপ্ লেবর্) বা 'সস্তার

মজুর' বলে, ইহারা ছিল সেই শ্রেণীর। ফলে, কৃষিক্ষেত্রের মজুর, কলকারখানার শ্রমিক, গৃহের ভৃত্য ইত্যাদি নানা কাজে ইহাদের চাহিদা দ্রুত বাড়িয়া গেল। মার্কিন বা 'সাদা শ্রমিক'দের চেয়ে অতি কম মজুরি পাইয়াও এই সমস্ত জাপানী শ্রমিক উৎকৃষ্টতর কাজ করিতে লাগিল। কেবল তাহাই নহে, ইহারা স্বভাবতঃই মিতব্যয়ী ছিল বলিয়া স্বল্প বেতন হইতেও কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিত। ইহাদের প্রধান খাদ্য ছিল সামান্য মাছভাত এবং জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সাধারণ। একজন মার্কিন শ্রমিক স্ত্রীপুত্রসহ যে টাকায় উপবাস করিত, জাপানীরা সেই অবস্থায়, টাকা বাঁচাইয়া সঞ্চয় করিতে পারিত। ফলে, উভয়পক্ষে সংঘর্ষের বীজ রোপিত হইল। এই দেশান্তরিতের দল কেবল টাকা বাঁচাইয়াই চুপ করিয়া থাকিল না। তাহারা সেই উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা জমি কিনিতে কিংবা 'লীজ' নিতে লাগিল। এভাবে প্রশান্ত মহাসমুদ্র-তীরের কতকগুলি উৎকৃষ্টতম উর্বর জমি তাহাদের হাতে গেল—কোন কোন ক্ষেত্রে এই জমির পরিমাণ দাঁড়াইল শতকরা ৫০ হইতে ৭৫ ভাগ। চাষবাসের ব্যাপারেও তাহারা বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগিল। ক্রমে সামান্য মজুর হইতে বহু জাপানী বেশ বড় রকমের পুঁজিপতিতে পরিণত হইল। কিন্তু জীবনযাত্রা তাহাদের রহিয়া গেল সামান্য মজুরের মতই। ফলে, অর্থ ও সম্পদের পরিমাণ তাহাদের ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অপরপক্ষে, সমস্ত জাপানীদেরই জমি কিনিবার শক্তি ছিল না। তাহারা সস্তা শ্রমিক ও মজুররূপে বাজার ছাইতে লাগিল। স্বভাবতঃই ইহার অনিবার্য পরিণতি ঘটিল সংঘর্ষের মধ্যে এবং এই সংঘর্ষ দুই দিক হইতেই আসিল। মার্কিন জমির মালিক এবং শ্রমিক, উভয় পক্ষই এই নূতন জাপানী উৎপাতে অতিষ্ঠ বোধ করিতে লাগিল। ১৯০০ খৃস্টাব্দে স্যানফ্রান্সিসকোতে প্রথম বৃহৎ প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান হইল—জাপানী দেশান্তরিতদের আমেরিকায় আগমনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হইল। ১৯০৫ ও ১৯০৬ খৃস্টাব্দে মার্কিন শ্রমিক সংঘ বা আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবর-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী বহু রাজনৈতিক ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠান একত্রে জাপানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া উহাদিগকে বিতাড়নের দাবী জানাইল। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর জাপানীদের স্বজাত্যাভিমান, সামরিক শক্তি এবং শ্বেতকায় জাতিসমূহের সহিত সমকক্ষতা বোধ বাড়িয়া গিয়াছিল। সুতরাং জাপ-বিরোধী মার্কিন নীতিতে একদিকে জাপানীরা যেমন ক্ষেপিতে লাগিল, অন্যদিকে মার্কিনীরাও সস্তা জাপ-শ্রমিকের বিরুদ্ধে অতি ব্যাপক ও তীব্র আন্দোলন চালাইতে লাগিল। কেবল সস্তা শ্রমিক হিসাবেই নহে, আমেরিকার সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার ধারার সঙ্গে জাপানীদের কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল না। ফলে, তাহারা সর্বত্র অবাঞ্ছিতরূপে বিবেচিত হইতে লাগিল। প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট (প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পিতৃব্য) ব্যক্তিগতভাবে জাপান সম্পর্কে কিঞ্চিৎ উদারতা-ব্যঞ্জক নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু সাধারণভাবে মার্কিন নাগরিকেরা ইহার বিরুদ্ধবাদী ছিল। এমন কি জাপ বিতাড়নের জন্য আড়াই লক্ষ সদস্যসহ একটি সমিতি গঠিত হইল। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে খাস মার্কিন কংগ্রেসে এবং ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের আইনসভায় জাপানী দেশান্তরিতদের উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া আইন রচিত ও প্রবর্তিত হইল। ক্যালিফোর্নিয়ায় জাপানীদের আর জমির মালিকানা স্বত্বের অধিকার রহিল না। ইহার আগে জাপ

শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কেও নিষেধ বিধি জারির চেষ্টা হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে যে ধরনের বিরোধ চলিয়া আসিতেছে, আমেরিকায়ও তাহাই ঘটিতেছিল। ১৯০৭ সালের আইনের মধ্যে কোন কোন শর্তে জাপানীদের চাষবাসের অধিকার স্বীকার করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৯২০ সাল হইতে তাহাও কাড়িয়া লওয়ার জন্য আন্দোলন দেখা দিল! অবশেষে ১৯২৪ সালে জাপানীদের বিরুদ্ধে কার্যতঃ আমেরিকা গমন নিষিদ্ধ করিয়া এক ব্যাপক আইন গৃহীত এবং ১লা জুলাই তারিখে উহা প্রবর্তিত হইল। প্রেসিডেণ্ট কুলিজ এতটা বাড়াবাড়ির পক্ষপাতী না থাকিলেও জাপবিরোধী আন্দোলনের নিকট তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করিতে হইল।

দেশপ্রেমিক, সাম্রাজ্যবাদী ও সামরিক শক্তিতে বলীয়ান জাপানীদের কাছে এই নূতন মার্কিনী আইন অসম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইল। ১লা জুলাই (১৯২৪) তারিখ জাতীয় অসম্মানের দিন বলিয়া ঘোষিত হইল। জাপানের ১৯টি সংবাদপত্র একযোগে সম্মিলিত প্রতিবাদ প্রকাশ করিল, জাপানী পার্লামেণ্টের এক বিশেষ অধিবেশনে জাপ বিতাড়ন আইনের বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব গৃহীত হইল। দেশের সর্বত্র জনসভার অনুষ্ঠান হইল এবং টোকিওতে মার্কিন দূতাবাসের সম্মুখে কয়েকজন জাপানী 'হারিকিরি' (আত্মহত্যা) করিল এবং মার্কিন দূতাবাসের পতাকাও কেহ কেহ নামাইয়া ফেলিল।

এই জাতীয় মনোবেদনা ও বিক্ষোভ (অবশ্য জাপানও নিজ দেশে চীনা শ্রমিক ও মজুর সম্পর্কে একই নীতি অবলম্বন করিয়াছিল) ক্রমশঃ আমেরিকা ও জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্ককেও ঘোরালো এবং উগ্র করিয়া তুলিল। তখন হইতেই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য একদল চীৎকার করিতেছিল, 'আমেরিকাকে শাস্তি দাও', ক্রমেই সেই চীৎকার ১৯৪১ সালের রণ-ধ্বনিতে পরিণত হইল। মাঞ্চুরিয়ায় ও চীনে জাপানী আক্রমণাত্মক নীতি লইয়া বিরোধ প্রবলতর হইতেছিল। চীন বহু পূর্বেই রুশ, ফরাসী, জার্মান, ইংরাজ, মার্কিন ও জাপানী বৈদেশিক শক্তির 'লুঠের মালে' পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার 'বখরা' লইয়া আবার পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া লাগিল। এই ঝগড়া যাহাতে চরমে না উঠে এবং কোন এক বিশেষ পক্ষই চীনে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ না পায়, এজন্য সকলের সমান বাণিজ্যের অধিকার স্বীকার করিয়া ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে মার্কিন গভর্নমেণ্ট 'খোলা দরজার' নীতি ঘোষণা করিলেন, জাপান এই নীতি কখনও মানিয়া লয় নাই। বরং ১৯০৪-৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধের পর জাপান ও আমেরিকার মধ্যে মন কষাকষি বাড়িতে লাগিল। মাঞ্চুরিয়ার উপর জাপানের আধিপত্য বিস্তার লাভ করিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ অত্যন্ত গুরুত্ব-সম্পন্ন ছিল। এই রেলপথ যাহাতে জাপানের হাতে না পড়ে এজন্য মার্কিন গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে উহা ক্রয় করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু জাপান তাহাতে বাধা দেয়। কেবল বাধা দিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, কার্যতঃ কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার রেলপথগুলির উপর জাপানীরা প্রভুত্ব বিস্তার করিল। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জার্মানী ও ফ্রান্স —এই চারি শক্তি মিলিয়া ব্যাঙ্ক ও রেলপথ স্থাপন এবং প্রভুত মূলধন বিনিয়োগের দ্বারা চীনকে 'সাহায্য' করিতে চাহিল। কিন্তু জাপানী সাম্রাজ্য-স্বার্থের ইহা পরিপন্থী বলিয়া জাপান ইহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাধা দিল। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এই অবস্থাই চলিতে থাকে। সেই সময় জাপান মিত্রপক্ষের সহিত যোগ দিয়া

চীন ও প্রশান্ত মহাসমুদ্রে জার্মান অধিকৃত দ্বীপ ও রাজ্য কাড়িয়া লইল। মহাযুদ্ধের পর বৃটেন, আমেরিকা ও জাপানের সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। কারণ, ইহার আগে পর্যন্ত জাপানীদের বিশ্বাস ছিল যে, চীনে আমেরিকার অগ্রগতির প্রধান বিঘ্ন হইতেছে জাপান ও ইংলণ্ডের মধ্যে মৈত্রী। জাপানী নৌ-বিভাগের কিনোয়াকাই ংসুয়ো লিখিয়াছেন—

"The primary obstacle to America's advance in China was the alliance between Japan and England. That is, should the United States attempt to challenge Japan's position in Asia, this would mean she would face the combined Anglo-Japanese armies and navies."

(চীনে মার্কিন অগ্রগতির পক্ষে প্রধান বাধা হইতেছে জাপান ও ইংলণ্ডের মধ্যে মৈত্রী। সুতরাং আমেরিকা যদি এশিয়াতে জাপানের অবস্থান সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ জানাইতে চায়, তবে তাদেরকে সম্মিলিত ইঙ্গ-জাপানী সৈন্য ও নৌবাহিনীর সম্মুখীন হইতে হইবে।)

কিন্তু ১৯২১ সালে ওয়াশিংটন সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নৌবল নিয়ন্ত্রণ ও চীন সম্পর্কে নয়শক্তির সন্ধির পর ইঙ্গ-জাপ সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। ১৯২২ সালে বৃটেন ও জাপানের মধ্যে মৈত্রী চুক্তির অবসান হয়। কারণ জার্মানীর পরাজয়ের পর পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক অবস্থায় বৃটেনের পক্ষে জাপানের সহযোগিতার আর ততটা প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সেই চুক্তির অবসান ঘটিলেও এবং উহার দ্বারা জাপান ক্ষুব্ধ হইলেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর নীতি জাপানকে কার্যতঃ বাধা দেয় নাই। ১৯৩১ সালে জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযানের পর আমেরিকা তারস্বরে প্রতিবাদ জানাইল। কিন্তু জেনেভায় রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে স্যার জন সাইমন বৃটিশ নীতির অতি উদার ব্যাখ্যা করিয়া আপনাকে সমর্থন করিলেন। ১৯৩৪ সালে জাপান ওয়াশিংটন বৈঠকের নৌ-বল নিয়ন্ত্রণ চুক্তি বাতিল করিয়া দিল। ইহার পর হইতে জাপান, বৃটেন ও আমেরিকা যেন পরস্পরের সহিত পাল্লা দিয়া নৌ-বল বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই নৌ-বল বৃদ্ধির উদ্দেশ্য অতি স্পষ্ট ছিল। কেবল নৌ-বল নহে, অস্ত্রশস্ত্রের দিকেও বিভিন্ন রাষ্ট্র মনোযোগী হইল। বিশেষভাবে নাৎসীপন্থী রাষ্ট্রসমূহ রণসজ্জা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ১৯৩৬ সালে জাপান, জার্মানী ও ইতালী 'সোভিয়েট বিরোধী চুক্তি' (এ্যাণ্টি কোমিণ্টার্ন প্যাক্ট) শর্তে আবদ্ধ হইল। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মতে উহার উদ্দেশ্য ছিল বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাৎসী শক্তিবর্গের ঐক্য-বিধান। ইহার পরের বৎসর ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে জাপান চীনে নূতন পর্যায়ের অভিযান শুরু করিল।

আমেরিকা বরাবর জাপানের এই আক্রমণাত্মক রণনীতি ও বাণিজ্যনীতির বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে। ১৯৩৭ সালে বেলজিয়াম গভর্নমেণ্টের উদ্যোগে ব্রুসেলসে সুদূর প্রাচ্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত রাষ্ট্রের এক সম্মেলন হয়। ইহাতে সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু জার্মানী ও জাপান নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও উহাতে উপস্থিত হয় নাই। তারপর ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ। আমেরিকা ক্রমশঃ মহাযুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী রাজ্য বিস্তারের

সুযোগও আগাইয়া আসিতে লাগিল। যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া মার্কিন গভর্নমেণ্ট অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং আপোষ-মীমাংসার দ্বারা উহা এড়াইবার জন্য জাপানী গভর্নমেণ্টের সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও পররাষ্ট্রসচিব মিঃ কর্ডেল হাল আলোচনা শুরু করিলেন। ৯ মাস ধরিয়া এই আলোচনা চলিয়াছিল। এত দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনা অত্যন্ত অভিনব বটে। ইহার দ্বারাই বুঝা উচিত ছিল আপোষ-মীমাংসা সম্ভব নহে। কারণ, বিরোধের আসল প্রশ্ন রহিয়া গিয়াছে উভয় দেশের ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে। তথাপি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মার্কিন গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করিয়া আলোচনার ভিত্তি হিসাবে ৪টি মূলনীতির উপর জোর দিলেন। যথা—(১) সমস্ত জাতির পূর্ণ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও ভূমিখণ্ডের অখণ্ডতার অধিকার এবং সেই অধিকার ভঙ্গ না করার নীতি স্বীকার করা, (২) অপর দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় কোন হস্তক্ষেপ না করা, (৩) সকলের সমান অধিকার স্বীকার করা ও (৪) বিরোধের ক্ষেত্রে শান্তিজনক উপায়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও আপোষের দ্বারা মীমাংসার নীতি মানিয়া চলা। কিন্তু এই মূলনীতিগুলি জাপান মানিতে পারিল না, আলোচনার নাম করিয়া কেবল সময় হরণ করিল মাত্র। অথচ জাপানের বিরুদ্ধে মার্কিন গভর্নমেণ্টের অভিযোগের অন্ত ছিল না। ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই (চীন-জাপান যুদ্ধারম্ভের তারিখ) হইতে ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত মাঞ্চুরিয়া ও চীন দেশের সর্বত্র জাপান আমেরিকার স্বার্থ যেভাবে নষ্ট করিয়াছে, একমাত্র সেই কারণেই উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধা অসম্ভব ছিল না। মার্কিন গভর্নমেণ্টের প্রকাশিত সরকারী দলিলে দেখা যায় যে, ঐ সময়ের মধ্যে চীনে ১৮ জন মার্কিন নাগরিক জাপানীদের হাতে হতাহত হইয়াছে এবং অপমানিত, লাঞ্ছিত ও আটক হইয়াছিল ১০৮ জনেরও বেশী। ইহাদের মধ্যে মহিলা ও শিশু বাদ যায় নাই এবং দূতাবাসের কর্মচারীরাও রেহাই পায় নাই। অন্ততঃ ৩০০ ক্ষেত্রে মার্কিন সম্পত্তি নষ্ট করা হইয়াছে, ৩৪টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি আটক বা দখল করা হইয়াছে। এমন কি আমেরিকার সরকারী ডাক, দূতাবাসের অফিসারদের কার্যকলাপ, মার্কিন নাগরিকদের ভ্রমণ ব্যাপারে পর্যন্ত জাপানী সৈন্য, পুলিশ ও কর্তৃপক্ষ জবরদস্তি বা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইহার পিছনে যে জাপানের আক্রোশমূলক মনোবৃত্তি ছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু মার্কিন গভর্নমেণ্ট আপোষ-আলোচনার দ্বারা সমস্ত বিরোধ মিটাইতে চাহিয়াছিলেন। এই নিষ্ফল কথাবার্তা অকস্মাৎ জুলাই মাসে (১৯৪১) বন্ধ হইয়া গেল। কারণ, ২৩শে তারিখ ফ্রান্সের ভিসি গভর্নমেণ্ট জানাইলেন যে, জাপান ফরাসী ইন্দোচীনের ঘাঁটিগুলি দখল করিতেছে এবং সেখানে সৈন্য ও সমরোপকরণ পাঠাইতেছে। সুতরাং আপোষ-আলোচনা বন্ধ হইল। অথচ বিস্ময়ের কথা এই যে, তখন পর্যন্ত (২ বৎসর ধরিয়া) জাপানকে পেট্রোল সরবরাহ করা হইতেছিল। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলিলেন যে, তাহা না করিলে জাপান এক বৎসর আগেই ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করিয়া বসিত। এদিকে ঘড়ির কাঁটা শূন্য ঘণ্টার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ২৫শে জুলাই বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে, জাপানীদের ইন্দোচীনে প্রবেশের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র জাপানীদের ধনসম্পত্তি আটক করার আদেশ দেওয়া

হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ডোমিনিয়নসমূহ এবং ওলন্দাজ গভর্নমেন্টের পরামর্শ-ক্রমেই ইহা করা হইয়াছে। পরদিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও অনুরূপ এক আদেশ জারী করিয়া আমেরিকায় জাপানী ধন-সম্পত্তি আটক করিলেন। কিন্তু আগস্ট মাসে জাপানী গভর্নমেন্টের সনির্বন্ধ অনুরোধে আবার মার্কিন গভর্নমেন্টের সহিত আপোষ-আলোচনা শুরু হইল—চারি মাসের অধিক কাল, ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই আলোচনা চলিল। কিন্তু ধনসম্পত্তি আটক করিয়া আপোষ-আলোচনার অর্থ নিশ্চিত যুদ্ধের তারিখটাকে কিছু পিছাইয়া দেওয়া। ২৬শে অক্টোবর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আপোষের শর্ত হিসাবে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা দ্বারাও যুদ্ধ নিবারিত হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ, তিনি বলিলেন যে, জাপানকে তৈল সরবরাহ করা হইবে এবং ধনসম্পত্তি আটকের আদেশও প্রত্যাহার করা হইবে। কিন্তু উহার শর্ত এই যে, চীন হইতে সমস্ত জাপানী সৈন্য প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং জেনারেল চিয়াং কাইশেক ছাড়া আর কোন গভর্নমেণ্টকে সমর্থন করা চলিবে না। অর্থাৎ ইহার দ্বারা অবিলম্বে জাপানকে জেনারেল চিয়াং কাইশেক ও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত। নিশ্চিতরূপে ইহা জাপানী সাম্রাজ্যনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। জুলাই মাসে জাপানী ধনসম্পত্তি আটকের উপর মন্তব্য করিয়া ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট বলিতেছেন—

'These decisions made war certain—on any rational calculation.'

এবং অক্টোবর মাসে রুজভেল্টের আপোস শর্তের সমালোচনা করিয়া তিনি বলিতেছেন—

'The certainty of war was sealed by the conditions, which president Roosevelt stipulated on Oct. 26th…It was beyond any reasonable expectation that Japan would submit to such a complete "loss of face."'

(সংক্ষেপে—রুজভেল্টের এই সমস্ত কার্যের দ্বারা জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য ছিল।)—ইহা বৃটেনেরই খ্যাতনামা রণপণ্ডিতের অভিমত। জুলাই হইতে ডিসেম্বর মাসের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর স্রোত অনিবার্যরূপে যুদ্ধের দিকেই যাইতেছিল। ৬ই আগস্ট বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব জাপানকে ধমকাইয়া বলিলেন, থাইল্যাণ্ডে হস্তক্ষেপ করিলে ভাল হইবে না। ৩০শে আগস্ট বৃটিশ প্রজাদিগকে জাপান ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বর মাসে জাপানী সংবাদপত্রসমূহ রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য জার্মানীকে পরামর্শ দেয়। 'কারণ, বৃটেনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে।' ১৭ই অক্টোবর বৃটিশ গভর্নমেন্ট পুনরায় বর্মা রোড খুলিবার আদেশ দেন এবং ঐ তারিখেই জেনারেল তোজো প্রধানমন্ত্রী ও সমরসচিবের পদ গ্রহণ করেন। ১১ই নভেম্বর মিঃ সামনার ওয়েলস বলেন যে, যে-কোন মুহূর্তে জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিতে পারে। ১৩ই নভেম্বর ৬০ হাজার জাপ সৈন্য ইন্দোচীনের উত্তরে সমবেত হয় এবং সায়গন ও হ্যানয়তে দলে দলে নূতন সৈন্য আসিতে থাকে। ১৬ই নভেম্বর কানাডীয় সৈন্যরা হংকংয়ে পৌঁছায়। ৩০শে নভেম্বর জাপানী নৌবহরকে জাপানের দক্ষিণবর্তী দ্বীপ-সমূহের দিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। ২রা ডিসেম্বর 'প্রিন্স অব ওয়েলস' এবং 'রিপালস' সিঙ্গাপুরে পৌঁছায় এবং ৭ই ডিসেম্বর সকালবেলা অকস্মাৎ জাপানী বিমানবহর ও সাবমেরিন

পার্ল হারবার আক্রমণ করে—বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল।

রাজ্য ও বাণিজ্যগত এই যে মূলনীতির বিরোধ জাপান আমেরিকা ও বৃটেনের মধ্যে ছিল, উহার কোন আপোষ-মীমাংসা সম্ভব ছিল না। তথাপি জাপান যে আলোচনা চালাইতেছিল, উহাও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ছিল মাত্র। ১৯০৪ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধের আগেও ৫ মাস ধরিয়া জাপানী গভর্নমেন্ট জারের রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা চালাইয়াছিলেন এবং ৬ই ফেব্রুয়ারী সেই আলোচনা শেষ করিবার সময় জাপানীদের ধারণা হইল যে, আর কথাবার্তা চালাইয়া লাভ নাই। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্ল হারবারের উপর আক্রমণের আগেও চারি মাস (নূতন পর্যায়ে) ধরিয়া জাপান আমেরিকার সহিত আলোচনা চালাইয়াছিল। ২৮শে নভেম্বর তাঁরা বুঝিতে পারেন যে, 'ভাঙ্গা কাঁচ আর জোড়া' লাগিবার আশা নাই। দেখা যাইতেছে যে, একই ইতিহাস ও কৌশলের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। তবে, ১৯০৪ সাল ও ১৯৪১ সালের মধ্যে তফাৎ এই যে, পোর্ট আর্থার আক্রমণে টর্পেডো-বোট ব্যবহৃত হইয়াছিল, আর পার্ল হারবারের বেলা ব্যবহৃত হইয়াছে টর্পেডো-বোমারু।—অন্ততঃ লীডেল হার্টের ইহাই মত। ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গের যুদ্ধযাত্রায় যান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু মানসিক অবস্থা একই রহিয়া গিয়াছে।*

---

* গ্রন্থকার প্রণীত 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী', ১৯৪৫।

তৃতীয় অধ্যায়

পার্ল হারবার আক্রমণ

'সকাল ৮-১০, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সময়। বেলা ১-৪০ মিঃ পূর্বদেশীয় সময়। রবিবার, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১।'

'এই সময় একজন তরুণ বালককে দেখা গেল বাইকে চড়িয়া অতি দ্রুত হনলুলু থেকে পার্ল হারবারের দিকে যাইতে—যে পার্ল হারবার উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার সবচেয়ে বড় নৌ-ঘাঁটি। বালকের হাতে ওয়াশিংটন থেকে প্রেরিত একটি জরুরী বার্তা ছিল। মার্কিন সেনানী মণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল জর্জ মার্শাল এই জরুরী বার্তায় জানাইয়াছিলেন যে, জাপানের সঙ্গে আলোচনা ভাঙিয়া গিয়াছে, অতএব পার্ল হারবার যেন সামরিক দিক থেকে সতর্ক (এ্যালার্ট) থাকে। আর্মি রেডিও মারফৎ এই বার্তা পাঠানো সম্ভব হয় নাই (খারাপ অবস্থার জন্য) বলিয়াই 'কমার্শিয়াল চ্যানেল' মারফৎ হনলুলুতে এই বার্তা পাঠানো হইয়াছিল এবং হনলুলু অফিস থেকে বার্তাটি বালকের হাতে দিয়া তাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যথাসম্ভব দ্রুত এটি পার্ল হারবারে পেঁছাইয়া দেওয়ার জন্য। বালকটি তাই বাইকে চড়িয়া আগাইয়া যাইতেছিল। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ বোমা পড়িতে লাগিল! বালকটি তখন রাস্তার ধারে একটি খাদের মধ্যে আশ্রয় নিল এবং যতক্ষণ বোমা পড়িতে লাগিল ততক্ষণ কয়েক ঘণ্টা সেখানেই সে অপেক্ষা করিল।'

এই নাটকীয় কাহিনীটি উল্লেখ করিয়াছেন জনৈক মার্কিন ইতিহাসবিদ—অধ্যাপক স্নাইডার তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত পুস্তকে।[১]

তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, ঐদিন সকাল ৬-৪৫ মিনিটে নৌ-ঘাঁটির অদূরে পাহারারত একটি মার্কিন ডেস্ট্রয়ার ছোট্ট একটি জাপানী সাবমেরিনকে ডুবাইয়া দেয়। কিন্তু ডেস্ট্রয়ারের লোকেরা কল্পনাও করেন নাই যে, ওই ক্ষুদ্র জাপানী সাবমেরিন আক্রমণোদ্যত কোন শত্রু নৌ-বহরের অংশ হইতে পারে।

কেবল তাই নয়। আরও আশ্চর্য ঘটনা আছে। ঐদিন সকাল ৭টার কিছু পরে হনলুলুর একস্থানে স্থাপিত র‍্যাডার যন্ত্রে কতকগুলি বিমানের ছায়া ভাসিয়া উঠিল—১৩৭ মাইল দূর থেকে বিমানগুলি যেন ঝাঁক বাঁধিয়া আগাইয়া আসিতেছে। র‍্যাডারে এই দৃশ্য ধরা পড়ার পর কর্তব্যরত মার্কিন সৈন্যদ্বয়ের একজন তৎক্ষণাৎ তথ্যকেন্দ্রের অফিসার লেঃ কারমিট টেইলারকে টেলিফোনে ঘটনাটি জানাইয়া দিলেন। লেঃ টেইলার মনে করিলেন যে, ঐগুলি 'বি ১৭' মার্কিন বোমারু হইবে। কারণ, ওই শ্রেণীর বোমারুগুলির তখন মূল মার্কিন ভূখণ্ড (ক্যালিফোর্নিয়া) থেকে হাওয়াই দ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিকে আসার কথা ছিল।

বলা বাহুল্য যে, তথ্যকেন্দ্রের অফিসারের এই ভুল মারাত্মক ছিল। কারণ, কিছুক্ষণের মধ্যেই কিম্বা মাত্র আধঘণ্টা পরেই ১৮৯ টি জাপানী বম্বার আকাশের

১। The War 1939-1945—Louis L. Snyder, P. 249-50.

সাদা মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া পার্ল হারবারের উপর বোমা বর্ষণ করিতে লাগিল।[১]

কেবল পার্ল হরবার আক্রমণের মুহূর্তে এই ধরনের অদ্ভুত ঘটনা ও ভুলের সমাবেশ ঘটে নাই। ওয়াশিংটন ও টোকিওর মধ্যে কেমন এক বিভ্রান্তিকর এবং রহস্যজনক নাটকের যেন অভিনয় চলিতেছিল। যদিও পারস্পরিক আলোচনার নামে এই নাটকের অভিনয় চলিতেছিল ৯ মাস ধরিয়া, তবু শেষের দিকে জাপানের আক্রমণাত্মক মতলব সংক্রান্ত গোপনীয় সাঙ্কেতিক বার্তাগুলি ওয়াশিংটনের আদৌ অজ্ঞাত ছিল না। বরং তাঁরা এই গোপনীয় বার্তাগুলি প্রায় নিয়মিতভাবে ধরিতেছিলেন এবং মার্কিন নৌ-বিভাগের 'ম্যাজিক' নামীয় সংশ্লিষ্টশাখা-দপ্তর সেগুলির পাঠোদ্ধার করিতেছিলেন। কেবল টোকিও-ওয়াশিংটনের মধ্যেই নয়, টোকিও-বার্লিনের মধ্যে প্রেরিত গোপনীয় বার্তাও মার্কিন সরকার ধরিয়া ফেলিলেন। টোকিও থেকে ৩০শে নভেম্বর বার্লিনের জাপানী রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশ দেওয়া হইল রিবেনট্রপ ও হিটলারকে একথা জানাইয়া দেওয়ার জন্য যে, 'জাপান ও এ্যাংলো-স্যাকসন জাতিগুলির মধ্যে যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ বাধিবার ভয়ংকর বিপদ দেখা দিতে পারে!'—(চার্চিলের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৩)

কিন্তু এই সমস্ত গোপন তথ্য জানা সত্ত্বেও আলোচনায় ভাঁটা পড়িল না।

* * *

আরও স্মরণীয় যে, যদিও জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বৃটিশ ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আঘাতের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তথাপি একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারই যেন এঁদের সকলের হইয়া জাপানের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। জনৈক ঐতিহাসিক এজন্য কিছুটা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে মন্তব্য করিয়াছেন—

'By an act of curious diplomatic self-abnegation Churchill and his cabinet seemed quite ready to leave negotiations with Japan, in a matter affecting Austeralia and New Zeland as much as Malaya and Hongkong to the good sense of Americans.[২]

অর্থাৎ এক বিচিত্র কূটনৈতিক আত্মত্যাগের দ্বারা চার্চিল ও তাঁর মন্ত্রিসভা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, মালয় এবং হংকংয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাপানের সহিত আলোচনার জন্য একমাত্র আমেরিকার সুবুদ্ধির উপর ভরসা করিয়াই যেন নিশ্চিন্ত ছিলেন।···

এদিকে নভেম্বরের মাঝামাঝি ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ডেল হালের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত নোমুরার আলোচনায় সাহায্য করার জন্য বার্লিনের প্রাক্তন জাপানী দূত সাবুরু কুরোসো আসিয়া হাজির হইলেন। অতএব কূটনৈতিক নাটক বেশ জমিয়া উঠিল। কিন্তু তার আগেই ৫ই নভেম্বর তারিখ জাপানী নৌবিভাগের খুব গোপনীয় এক হুকুমনামার দ্বারা ('কম্বাইণ্ড ফ্লিট টপ্ সিক্রেট অপারেশন্যাল অর্ডার নাম্বার ওয়ান'—স্নাইডারের পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক) পার্ল হারবার আক্রমণের সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছিল। ২৫শে নভেম্বর এক বিরাট জাপানী নৌ-বহর কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের এক

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃঃ ২৫১।
২। Richard Storry—A History of Modern Japan, P. 211.

নির্জন স্থান থেকে প্রায় নিঃশব্দে উত্তর প্রশান্ত মহাসমুদ্রের দিকে যাত্রা করিল। 'ইম্পিরিয়েল জাপানীজ নেভী'র প্রধান সেনাপতি এডমিরাল ইসোরোকু ইয়ামামোতো স্বয়ং পার্ল হারবার আক্রমণের এই পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। আমেরিকার বিরুদ্ধে তাঁর গভীর বিদ্বেষ ছিল। তার কারণ নাকি এই যে, তিনি ছোটবেলা তাঁর পিতার সঙ্গে ঘুমাইবার সময় 'কালো জাহাজ'সহ আগত বিদেশী 'বর্বরদের' দ্বারা জাপানের 'পবিত্র ভূমি কলুষিত' হওয়ার অর্থাৎ ১৮৫৩ সালের কমোডোর পেরির অভিযান) কাহিনী শুনিতেন।[১]

যদিও জাপানের দিক থেকে আক্রমণের পরিকল্পনা আগেই স্থির হইয়া গিয়াছিল, তবু টোকিও এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে আলোচনার দীর্ঘ ধূম্রজালের সৃষ্টি হইল। দীর্ঘকাল টানা-হেঁচড়ার পর ২০শে নভেম্বর ১৯৪১, জাপান যে শেষ প্রস্তাব পেশ করে, তার মর্ম এই—

(১) একমাত্র ফরাসী ইন্দোচীনের যে অংশে জাপানী সৈন্য রহিয়াছে, সেখানে ছাড়া জাপানী ও মার্কিন গভর্নমেণ্ট দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসমুদ্রে সসৈন্যে প্রবেশ করিবে না,

(২) জাপান ও চীনের মধ্যে কিম্বা প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে ফরাসী ইন্দোচীন থেকে জাপানী সৈন্য প্রত্যাহৃত হইবে। (এই মীমাংসা ব্যবস্থায় রাজী হইলে জাপান ইতিমধ্যে ফরাসী ইন্দোচীনের দক্ষিণাংশ হইতে উত্তরাংশে সৈন্য সরাইয়া নিতে প্রস্তুত আছে।),

(৩) ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জে জাপান ও আমেরিকার যে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, উভয় গভর্নমেণ্টের পারস্পরিক সহযোগিতায় সেগুলি সংগৃহীত হইবে,

(৪) সম্পত্তি ও টাকাকড়ি আটক করার আগে উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে সম্পর্ক ছিল, তা পুনরুজ্জীবিত হইবে। জাপানের প্রয়োজন মত মার্কিন গভর্নমেণ্ট তৈল (পেট্রোল) সরবরাহ করিবেন এবং

(৫) জাপান ও চীনের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় বিঘ্নজনক কোন কার্য মার্কিন গভর্নমেণ্ট করিতে পারিবেন না।

বলা বাহুল্য যে, আপোষরফার শর্ত হিসাবে জাপানের এই প্রস্তাবগুলি আমেরিকার নিকট আদৌ গ্রহণের যোগ্য ছিল না। অতএব ২৬শে নভেম্বর মার্কিন সরকার পালটা প্রস্তাব দাখিল করিলেন—

(১) প্রশান্ত মহাসমুদ্র এলাকায় যাঁদের স্বার্থ রহিয়াছে সেই সমস্ত গভর্নমেণ্টের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি,

(২) ইন্দোচীনের ভূমিগত সার্বভৌমত্ব স্বীকার ও কোন প্রকার অর্থনৈতিক বিশেষ সুবিধা গ্রহণ না করা,

(৩) চীনের জাতীয় গভর্নমেণ্ট ছাড়া অন্য কোন গভর্নমেণ্টকে স্বীকার না করা,

(৪) চীনে সমস্ত বিদেশী শক্তির রাষ্ট্রাতিরিক্ত অধিকার পরিত্যাগ,

(৫) পারস্পরিক সম অধিকার সম্পন্ন ব্যবসাবাণিজ্যের শর্ত,

(৬) পারস্পরিক টাকা-পয়সা ও সম্পত্তি আটকের আদেশ প্রত্যাহার,

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ২৫৩

(৭) ডলার ও ইয়েন মুদ্রা বিনিময়ের হার নির্দিষ্ট করা ইত্যাদি।[১]

চার্চিল বলিয়াছেন যে, আমেরিকার এই পালটা প্রস্তাব পাঠ করিয়া জাপানী দূতেরা 'স্তম্ভিত' হইয়াছিলেন। অতএব এই পালটা প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল।

আসলে জাপান ওয়াশিংটনের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা তার আক্রমণের গূঢ় মতলবকে গোপন করিয়া রাখিতেছিল মাত্র। কেননা, আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পার্ল হারবার আক্রমণের সিদ্ধান্ত ৫ই নভেম্বর তারিখেই স্থির হইয়াছিল। অথচ ২০শে নভেম্বর তারিখ রাষ্ট্রদূত নোমুরা কর্ডেল হালের নিকট আপোষরফার শর্ত পেশ করেন এবং ২৭শে নভেম্বর হোয়াইট হাউজে রুজভেল্ট, হাল, কুরুসো ও নোমুরা এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন। এদিকে ২২শে নভেম্বর তারিখেই জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোগো গোপন সাঙ্কেতিক বার্তায় নোমুরাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, ২০শে নভেম্বরের প্রস্তাবই কিন্তু 'শেষ ও চূড়ান্ত প্রস্তাব' এবং ২৯শে নভেম্বরই উহার সময়সীমা। জাপানের পক্ষ থেকে এটাকে 'আলটিমেটাম' বা চরমপত্ররূপেই বিবেচনা করা উচিত।

মার্কিন নৌ-বিভাগের 'ম্যাজিক' দপ্তর টোগোর এই গোপন রেডিও সাঙ্কেতিক বার্তা ধরিয়া ফেলিল এবং পাঠোদ্ধার করিল। কিন্তু তবু হোয়াইট হাউজে আলোচনা চলিল।[২]

এই পারস্পরিক আলোচনা চলিল একেবারে শেষ মুহূর্তে—এমন কি আক্রমণের সময় পর্যন্ত। অথচ ৩রা ডিসেম্বর টোকিও থেকে গোপন সাঙ্কেতিক বার্তা আসিল
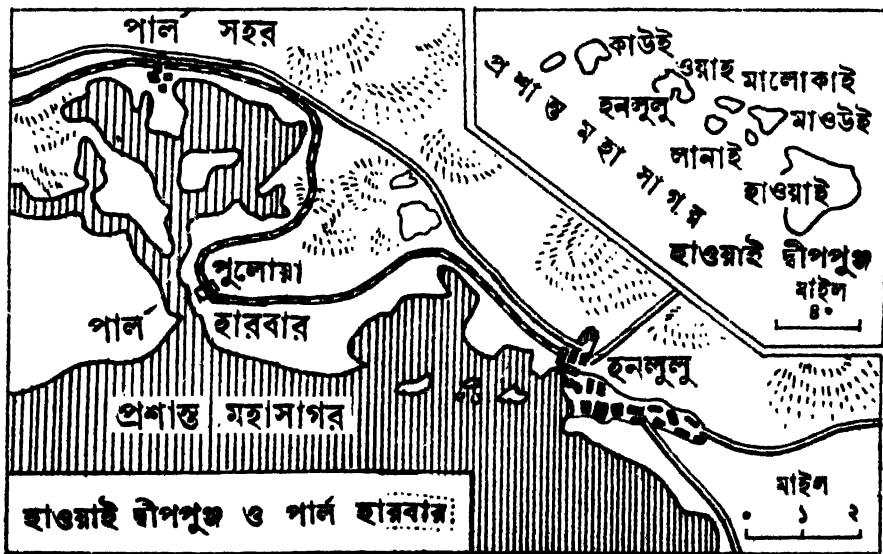
—'ইস্ট উইন্ডস্ রেনিং'—যার অর্থ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সমস্ত জাপানী দূতাবাসের গোপনীয় দলিলপত্র পোড়াইয়া ফেলার জন্য নির্দেশ। বলা বাহুল্য যে,

১। American Japanese Documents—১৯৪১ সালের ডিসেম্বর প্রকাশিত মার্কিন সরকারী দলিল।

২। Roosevelt and Hopkins—Sherwood, P. 421 (1948)

তখন ভাইস-এডমিরাল চুইচি নগুমোর নেতৃত্বে কয়েকটি ব্যাটলশিপ, ক্রুজার, বিমানবাহী জাহাজ, সাবমেরিন (২৫টি), ডেস্ট্রয়ার (১৬টি) এবং অন্যান্য নৌপোতসহ মোট ৭২টি যুদ্ধজাহাজের এক বিশাল নৌ-বহর সমুদ্রবক্ষে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল পার্ল হারবার অভিযানের জন্য।

৫ই ডিসেম্বর আবার জাপানীদের সাংকেতিক রেডিও বার্তা—
'ক্লাইম মাউণ্ট নিটাকা' অভিযানকারী নৌবহরের উদ্দেশ্যে পাঠানো হইল। এই বার্তাটিই ছিল আক্রমণের চরম নির্দেশ।[১]

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, জাপানের যে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদ্বয় ওয়াশিংটনে আপোষ-মীমাংসার কথাবার্তা চালাইতেছিলেন, তাঁরা তাঁদের গভর্নমেণ্টের আসল মতলব বা আক্রমণের পরিকল্পনার কথা জানিতেন না।[২]

এদিকে ৬ই ডিসেম্বর জাপানী সৈন্যেরা ইন্দোচীনে ঢুকিয়া পড়িল। পরিস্থিতি ক্রমেই সংকটজনক হইয়া উঠিতেছিল। তখন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট স্বয়ং জাপানের সম্রাট হিরোহিতের কাছে একটি ব্যক্তিগত আবেদন পাঠাইলেন—

'I address myself to your Majesty at this moment in the fervent hope that your Majesty may, as I am doing give thought in this definite emergency to ways of dispelling the dark clouds. I am confident that both of us, for thc sake of the peoples not only of our great countries but for the sakc of humanity in neighbouring countries have a scared duty to restore traditional amity and prevent further death and destruction in the word.[৩]

(সংক্ষেপে—এই চরম সংকট মুহূর্তে কালোমেঘের অন্ধকার দূর করিবার জন্য আপনার নিকট ব্যক্তিগতভাবে আমি এই আবেদন জানাইতেছি। কেবল আমাদের দুই মহানদেশের জনগণের কল্যাণের জন্যই নহে, উপরন্তু পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের জনগণের জন্যও আমাদের এই পবিত্র কর্তব্য রহিয়াছে যাতে পৃথিবীতে আর ধ্বংস ও মৃত্যুর বিস্তার না হয়।)

পরদিন রবিবার ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ রুজভেল্টের এই মর্মস্পর্শী আবেদনের জবাব টোকিও থেকে পাওয়া গেল না। সেদিন বেলা ১টার সময় (ওয়াশিংটন টাইম) জাপানের দূতদ্বয় কুরোসো ও নোমুরা পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্ডেল হালের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলেন। মিঃ হাল ১টা ৪৫ মিনিটের সময় সাক্ষাতে রাজী হইলেন। দূতদ্বয় আসিয়া হাজির হইলেন ২টা ৫ মিনিটের সময়; অর্থাৎ ২০ মিনিট বিলম্বে। তাঁরা রিসেপসন রুমে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন নাটকীয় মুহূর্ত কোন দেশের ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। কারণ, সেই মুহূর্তে কর্ডেল হাল রেডিও বার্তা পাইলেন যে, জাপানীরা পার্ল হারবার আক্রমণ করিয়াছে!

কর্ডেল হাল কুরোসো ও নোমুরাকে নিজের কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এডমিরাল নোমুরা মার্কিন প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়া জাপান সরকারের একটি দীর্ঘ জবাব

১। The War—Snyder, P. 250.
২। পূর্বোক্ত—পৃঃ ৪২২।
৩। The War—Snydcr, P. 255.

কর্ডেল হালের হাতে অর্পণ করিলেন। সেই জবাবের মধ্যে 'অনেক মিথ্যা ও মার্কিন গবর্ণমেণ্টের প্রতি যুদ্ধ বাধাইবার দোষারোপ' ও অভিযোগ ছিল। কর্ডেল হাল গম্ভীর মুখে সেই জাপানী জবাব পড়িলেন এবং তার পর দূতদ্বয়ের উদ্দেশ্যে এমন বাক্য বিস্ফোরণ ঘটাইলেন যে, 'আমেরিকার কুটনৈতিক ইতিহাসে তার কোন নজির নাই।'[১]

পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ডেল হাল ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন এবং জাপানী দূতদ্বয়ের উদ্দেশ্যে বলিলেন—

'I must say that in all my conversations with you during the last nine months I have never uttered one word of untruth. This is borne out absolutely by the record. In all my 50 years of public service I have never seen a document that was more crowded with infamous falsehoods and distortations—infamous falsehoods and distortations on a scale so huge that I never imagined that any government on this planet was capable of uttering them.'

অর্থাৎ 'আমি অবশ্যই আপনাদের বলবো যে, গত ৯ মাস ধরে আপনাদের সঙ্গে যে সমস্ত কথা আমি বলেছি, তার মধ্যে এক বর্ণও মিথ্যা ছিল না। নথিপত্র দেখলেই আমার এই কথার সত্যতা নিশ্চিত মিলবে। গত পঞ্চাশ বছরে আমার জন-জীবনে আমি এত জঘন্য মিথ্যা ও বিকৃতিতে ভর্তি এমন কুৎসিত দলিল আর কখনও দেখি নি —এমন বিপুল আকারে এই জঘন্য মিথ্যা ও বিকৃতি ঘটানো হয়েছে যে, আমি কখনও কল্পনা করতে পারি নি যে, এই ভূমণ্ডলে কোন গভর্নমেণ্ট সেগুলি উচ্চারণ করতে পারেন!'[২]

অতঃপর জাপানী কুটনীতিকদ্বয় নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।···

এমন অভাবনীয় ঘটনা এবং এমন অভাবনীয় দৃশ্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কদাচিত দেখা গিয়াছে। স্মরণীয় যে, পার্ল হারবারের উপর ৭ই ডিসেম্বর তারিখ যখন জাপানী আক্রমণ আসন্ন তখনও উভয় পক্ষের আপোষ-মীমাংসা প্রস্তাব উভয় গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্বেও আলোচনার ভান চলিতেছিল।

জনৈক সোভিয়েত ঐতিহাসিক এই ঘটনার উপর মন্তব্য করিতেছেন—

'Even then, just before Japan attacked US possessions, isolationists in the USA still wanted to induce Roosevelt to mediate between Japan and China, hoping that this would leand to a deal with the Japanesse Militarists. A few hours before japan attaeked Pearl Harbour the State Department and the Government were still discussing a draft for a 90 days armistice in China and the establishment of a Modus Vivendi'[৩]

অর্থাৎ মার্কিন ঘাঁটিগুলির উপর জাপানী আক্রমণের পূর্বাহ্নে পর্যন্ত আমেরিকার

১ পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২৫৬

২। —ঐ

৩। The Anti-Hitler Coalition—Issraceljan, Moscow, P. 83.

নির্লিপ্ততাবাদী রাজনীতিকগণ রুজভেল্টের উপর চাপ সৃষ্টি করিতেছিলেন চীন ও জাপানের মধ্যে বিরোধের মধ্যস্থতা করার জন্য। তাঁরা আশা করিতেছিলেন যে, এর দ্বারা জাপানী জঙ্গীবাদীদের সঙ্গে একটা মীমাংসা হইবে। এজন্য পার্ল হারবার আক্রান্ত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেও চীনে ৯০ দিনের যুদ্ধবিরতি ঘটাইবার জন্য একটা খসড়া পরিকল্পনা এবং চূড়ান্ত মীমাংসার আগে কাজ চালানো গোছের একটা আপোষ প্রস্তাব তৈয়ার হইয়াছিল, যাকে বলা যাইতে পারে "Modus Vivendi"

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সেদিনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রুজভেল্টের বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যা কম ছিল না এবং তাঁরা অধিকাংশই জঙ্গীবাদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। এই বিরোধী শক্তিগুলির চাপ সৃষ্টির ফলেই জাপান ও আমেরিকার মধ্যে এমন অদ্ভুত আলোচনা চলিতেছিল একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

কিন্তু যে Modus Vivendi-এর কথা সোভিয়েট ইতিহাসে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই 'সাময়িক কার্যকর খসড়া পরিকল্পনা' লইয়া শেষ পর্যন্ত জাপানী দূতদ্বয়ের সঙ্গে আর আলোচনা হয় নাই। কেননা, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের কাছে এই পরিকল্পনার অনুলিপি পাঠানো হইলে তিনি এবং চীনের পক্ষ থেকে চিয়াং কাইসেক প্রবল আপত্তি জানাইয়াছিলেন। কেননা, এই পরিকল্পনায় চীনের অসুবিধা ঘটিত। অতএব কর্ডেল হালও সেই প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিলেন।[১]

অর্থাৎ আসন্ন জাপানী আক্রমণের পটভূমিকায় এবং টোকিওর গোপন সাংকেতিক বার্তাগুলি ওয়াশিংটনের হাতে ধরা পড়া সত্ত্বেও এই অদ্ভুত কূটনৈতিক সংলাপ চলিতেছিল মাসের-পর-মাস।

* * *

কিন্তু এত কাণ্ড কীর্তনের পরেও পার্ল হারবারের উপর জাপানী আক্রমণকে 'অতর্কিত' এবং 'বিস্ময়কর' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে প্রামাণ্য ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক ইতিহাসগুলিতে। কেননা, বৃটেন ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, জাপান আক্রমণ করিতে উদ্যত বটে, তবে, সেই আক্রমণ ঘটিবে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে—উত্তরে পার্ল হারবারের দিকে নয়।

বিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক রবার্ট ই· শেরউড যিনি সেই সময়কার ঘটনাবলী সম্পর্কে একজন 'অথরিটি', তিনি বলিতেছেন—

'In London, as in Washington, on the eve of Pearl Harbour, the best informed thinking was that further Japanese aggression was imminent and that it would came in the south-west Pacific…'

অর্থাৎ 'লণ্ডনে এবং ওয়াশিংটনে যাঁরা সবচেয়ে বেশী খবর রাখিতেন, তাঁদের চিন্তা ছিল এই যে, জাপানের পক্ষ থেকে আরও আক্রমণ আসন্ন বটে, তবে, সেই আক্রমণ ঘটিবে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে…'

'এবং সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশ ও মালয় উপদ্বীপের সংযোগকারী যোজকের দিকে, যেটা পার্ল হারবার থেকে ৬ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। ৭ই ডিসেম্বরের আগে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া হোয়াইট, হাউজে যে সমস্ত সরকারী সামরিক প্রতিবেদন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ইত্যাদি পাঠানো হইতেছিল, সেগুলির কোথাও আমি একবারও এমন

১। Churchill. Vol. 3, P. 530-531.

কথার উল্লেখ দেখিতে পাই নাই যে, আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ হইতে পারে।'

পার্ল হারবারের আক্রমণ সম্পর্কে জাস্টিস ওয়েন জে. রবার্টস-এর নেতৃত্বে যে তদন্ত কমিশন গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিশনের রিপোর্টেও (৬ সপ্তাহ পরে প্রকাশিত) শেরউডের উপরি-উদ্ধৃত বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্বয়ং চার্চিলও বলিতেছেন যে, বৃটেন ও আমেরিকার এবং সম্ভবত রাশিয়ার বিরুদ্ধেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া জাপান ধ্বংসের পথ বাছিয়া লইবে, এটা 'অসম্ভব' বলিয়া মনে হইয়াছিল। কেননা যুক্তির দ্বারা এটা বুঝিতে পারা যাইতেছিল না। তবে, পাগলামি এক রকমের যন্ত্রণা এবং যুদ্ধের মধ্যে সেই যন্ত্রণা 'সারপ্রাইজ' বা অতর্কিত আক্রমণের বিহ্বলতা সৃষ্টি করে!

এই অতর্কিত আক্রমণের বিহ্বলতাই ঘটিল ৭ই ডিসেম্বর, রবিবার, ১৯৪১ পার্ল হারবার নৌ-ঘাঁটিতে—যার অবস্থান জাপান থেকে ৩,৫০০ মাইল (সামুদ্রিক) দূরে এবং যেটা ছিল প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। সেই 'সুন্দর সকাল-বেলা' নৌঘাঁটির অনেক লস্কর ও সৈন্য নিদ্রা কিংবা ছুটি উপভোগ করিতেছিল। অর্থাৎ এই ধরনের আক্রমণ তাদের কাছে যেন স্বপ্নের অগোচর ছিল। ফলে প্রচুর সংখ্যায় তারা মারা পড়িল। তখন নৌ-ঘাঁটিতে ৭০টি রণপোত ছিল—এগুলির মধ্যে ৮টি ছিল ব্যাটলশিপ বা বড় যুদ্ধজাহাজ। অধিকাংশ যুদ্ধজাহাজই ধ্বংস হইয়া গেল, ডুবিয়া গেল, কিংবা বিস্ফোরিত হইল—মাত্র একটি ব্যাটলশিপ দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়াছিল, আর বাকী সমস্তই ঘায়েল বা অকেজো হইয়া গেল।

সকাল ৮-২৫ মিনিটে প্রথম জাপানী বোমারু দল হানা দিল—বিমান থেকে টর্পেডো নিক্ষিপ্ত হইল, ছোঁমারা বিমান (ডাইভ বম্বার) প্রচণ্ড বোমা ও মেসিনগানের গুলি বর্ষণ করিল। সকাল ১০টার মধ্যেই তারা এই যুদ্ধ শেষ করিয়া সরিয়া পড়িল। আর পিছনে পড়িয়া রহিল ধোঁয়ায় অগ্নিকুণ্ডে আচ্ছন্ন বিধ্বস্ত একটা নৌ-বহর।···একটি আঘাতেই প্রশান্ত মহাসাগরের প্রভুত্ব জাপানীদের হাতে চলিয়া গেল এবং সারা পৃথিবীর রণনৈতিক ভারসাম্য আপাতত মূলগতভাবেই পরিবর্তিত হইয়া গেল!'—(চার্চিলের মন্তব্য)।

মেজর জেনারেল ফুলার লিখিতেছেন—পর পর তিনটি তরঙ্গের মত জাপানী বোমারুর দল দেখা দিল। এই অতর্কিত অভিযানে তারা জাহাজ, বিমানঘাঁটি ও ব্যারাকের উপর আক্রমণ চালাইল। ১৯টি জাহাজ ঘায়েল হইল, তবে, সৌভাগ্যক্রমে কোন বিমানবাহী মার্কিন জাহাজ সেই সময় নৌ-ঘাঁটিতে ছিল না। কিন্তু ক্ষতি হইল সর্বনাশকর, ২৭৯৫ জন সৈন্য ও অফিসার নিহত হইলেন, ৮৭৯ জন আহত হইলেন, ২৫ জন নিখোঁজ হইলেন, ৬টি জাপানী বিমানবাহী জাহাজ থেকে ৩৬০টি রণবিমান এই আক্রমণ চালাইয়াছিল। আর এই আক্রমণে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের জাপানী অধিবাসীরা পঞ্চম বাহিনীর কার্য করিয়াছিল (জাপানী বাসিন্দাদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫৭ হাজার)—এই অভিযোগ করিয়াছেন স্বয়ং মার্কিন নৌ-সচিব কর্নেল নক্‌স্। আমেরিকানদের মতে মাত্র ৬০ খানা জাপানী বিমান ধ্বংস হইয়াছিল।[৩]

১। Roosevelt and Hopkins—1948, . 424.
২। The Second World War—Vol. 3, P. 536.
৩। The Second World War—Fuller, P. 134.

কার্যত মাত্র দুই ঘণ্টার অতর্কিত বিমান আক্রমণে মার্কিন নৌবহরের বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। জাপানী বৈমানিকদের এই দুঃসাহসিক কার্য লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং চার্চিল তাঁদের দক্ষতাকে 'ruthless efficiency' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং মার্কিন লেখক স্নাইডার তাদের নিখুঁত লক্ষ্যভেদের ক্ষমতার উচ্চ প্রশংসা করিয়া 'devastatingly accurate' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সমগ্র প্রথম মহাযুদ্ধে আমেরিকার নৌশক্তির যে ক্ষতি হয় নাই, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হইয়াছিল এবারের জাপানীদের মাত্র এক ঘণ্টার আক্রমণে। ১৯১৬ সালের ৬ই এপ্রিল থেকে ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত আমেরিকার মাত্র খান-দশেক ছোট ছোট রণপোত ও নৌ-পোত নষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু একখানা বড় যুদ্ধজাহাজও খোয়া যায় নাই। কিন্তু এবার জাপানীদের একটিমাত্র আকস্মিক আঘাতেই সমগ্র মার্কিন নৌ-বহরের অর্ধেক খোঁড়া হইয়া গেল এবং প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌশক্তি কার্যত অবশ হইয়া পড়িল।

বলা বাহুল্য যে, সেদিন রবিবার অপরাহ্ণে আমেরিকার জনগণ (১৩ কোটি ২০ লক্ষ বাসিন্দা) পার্ল হারবারের এই আকস্মিক বিপর্যয়কর সংবাদ শুনিয়া প্রথমে বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া গেল। পরে অবশ্য তারা ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল এবং জাপানীদের উদ্দেশ্যে 'the yellow bastard' (পীত রংয়ের বেজন্মা) বলিয়া গালাগালি দিল।[১]

* * *

নিঃসন্দেহে আমেরিকার ইতিহাসে এমন বিপর্যয়কর ঘটনা খুব কমই হইয়াছে। বিশেষতঃ জাপানের তুলনায় আমেরিকা অনেক বেশী শক্তিমান ছিল। সুতরাং আক্রমণের ক্ষতির চেয়েও অপমানের আঘাতটা অনেক বেশী গুরুতর হইয়াছিল। মেজর-জেনারেল ফুলার মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই অতর্কিত ঘটনার পর 'আমেরিকানরা যেন হঠাৎ আবিষ্কার করিল যে, তারা আদম এবং ইভের মত উলঙ্গ এবং তারা এতদিন তাদের কল্পিত মূর্খের স্বর্গে বাস করিতেছিল।' অর্থাৎ পাঁচ মাস আগে জাপানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা করার পরেও জাপান পালটা সামরিক আঘাত হানিবে না, এমন ধারণা করাই আমেরিকার পক্ষে প্রচণ্ড ভুল হইয়াছিল।[২]

পার্ল হারবারের ঘটনা নিয়া অনেক তদন্ত হইয়াছে। মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে খোদ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে তদন্ত কমিশন গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিশন তদন্ত ও অনুসন্ধানের কিছু বাকী রাখেন নাই। ৪০টি খণ্ডে বিরাট রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাতে পার্ল হারবারে আমেরিকার বিপর্যয়ের মূল কারণস্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সামরিক বিভাগগুলির মারফৎ উপযুক্ত সময়ে 'সতর্কতার সুনিশ্চিত নির্দেশ' পাঠাইতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন—

"...the failure to send positive 'Aler' orders through the military departments"—(চার্চিলের মন্তব্য)।

অবশ্য এই ব্যর্থতার জন্য এই রিপোর্টের মেজরিটি অংশে উচ্চতম মার্কিন কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা হয় নাই বটে, কিন্তু মাইনরিটি রিপোর্টে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট

১। The War—Snyder, P. 259.

২। The Second World War—Fuller, P. 133.

থেকে শুরু করিয়া সংশ্লিষ্ট উচ্চতম সামরিক সেনাপতি ও মন্ত্রিদিগকে দায়ী করা হইয়াছে। জাপানী-মার্কিন আলোচনার মর্মকেন্দ্রে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ডেল হাল, কূটনৈতিক ব্যাপারে তাঁর বিশেষ গুরুদায়িত্বের কথা রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে।'[১]

* * *

কিন্তু পার্ল হারবার আক্রমণের সংবাদে সেদিনের পৃথিবীতে বোধহয় সবচেয়ে বেশী 'উল্লসিত' হইয়াছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার স্বয়ং মিঃ উইনস্টোন চার্চিল। তিনি তাঁর এই আনন্দের কথা গোপন তো রাখেন নাই বটেই, বরং জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন তাঁর মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত ইতিহাসে বা স্মৃতি গ্রন্থে (তৃতীয় খণ্ড)।

হিটলার কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হইয়াছিল, ২২শে জুন, রবিবার এবং সেদিনও চার্চিল যেভাবে এবং যে অবস্থায় সেই ঐতিহাসিক মহা-আক্রমণের খবর পাইয়াছিলেন, পার্ল হারবারের সংবাদও তিনি অনুরূপভাবেই পাইয়াছিলেন। ঘটনার এই সৌসাদৃশ্য বিস্ময়কর বটে। তাঁর স্মৃতিচারণের মর্ম এই—

'৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১, রবিবার সন্ধ্যা। চেকার্সে (বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারী পল্লীভবন) আমি একাই একটি টেবিলের ধারে বসেছিলাম উইনান্ট (মার্কিন রাষ্ট্রদূত) এবং আভেরিল হ্যারিম্যানের (বিশেষ মার্কিন প্রতিনিধি) সঙ্গে। রাত ৯টার সময় খবর বলা শুরু হলে আমি আমার ছোট্ট রেডিও সেটটি খুলে দিলুম। (হপকিন্স লিখেছেন যে, ১৫ ডলারের এই রেডিও সেটটি তিনিই চার্চিলকে উপহার দিয়েছিলেন।) রুশ ও লিবিয়া রণাঙ্গনের কিছু কিছু যুদ্ধের খবর শুনা গেল এবং একেবারে শেষে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে মার্কিন জাহাজ ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জে বৃটিশ জাহাজের উপর জাপানী আক্রমণ সম্পর্কে দু' চারিটি কথা বলা হলো। আমার ঠিক পরিষ্কার মনে নেই। কিন্তু আভেরিল হ্যারিম্যানও অনুরূপ কথা বললেন। যদিও আমরা তখন অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলুম, তবু চেয়ারের উপর উঠে বসলুম। এমন সময় 'বাটলার' পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন এবং বললেন—'হাঁ, হাঁ, আমরাও শুনেছি, জাপানীরা আমেরিকানদের আক্রমণ করেছে।' আমি তখন টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। কারণ, আমার মনে পড়লো যে, ১১ই ডিসেম্বের আমি ঘোষণা করেছিলাম যে, আমেরিকা আক্রান্ত হওয়ার একঘণ্টার মধ্যেই আমরাও যুদ্ধ ঘোষণা করবো। আমি অফিস ঘরে ঢুকলাম এবং অতলান্তিকের ওপারে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করার নির্দেশ দিলুম। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই টেলিফোনে রুজভেল্টের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। আমি জিগ্যেস করলুম—মিঃ প্রেসিডেণ্ট, জাপান সম্পর্কে এইসব কি শুনছি ?' তিনি জবাব দিলেন—'যা শুনেছেন খাঁটি সত্য। ওরা পার্ল হারবারে আমাদের আক্রমণ করেছে।'

'—We are all in the same boat now.'

'আমরা সকলেই এখন একই নৌকোয় !'···আমি জবাব দিলুম—'তা হলে ব্যাপারটা এখন সোজা হয়ে গেল। ভগবান আপনার কল্যাণ করুন !'—এই গোছেরই কিছু কথা আমি বলেছিলুম।'···

তারপর চার্চিল বলিতেছেন—'আশা করি কোন আমেরিকানই আমাকে ভুল বুঝবেন না, যদি আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করি যে আমেরিকাকে দলে পেয়ে সেদিন

১। The War—Snyder, P, 265.

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ (greatest joy) হয়েছিল। ১৭ মাস আমাকে একক যুদ্ধ করতে হয়েছে, আর ১৯ মাস ধরে দুঃসহ দায়িত্বের বোঝা (ডানকার্কের ঘটনা ও ফ্রান্সের পতনের পর) বহন করতে হয়েছে। কিন্তু আজ আমরা জয়ী। ইংলণ্ড বাঁচবে, বৃটেন বাঁচবে, কমনওয়েলথ অব নেশন্স এবং 'সাম্রাজ্য বাঁচবে।*

'আমার শিরায় মার্কিন রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমার মনে পড়ে গেল এডওয়ার্ড গ্রের একটি মন্তব্যের কথা। ত্রিশ বছরেরও বেশী আগে তিনি আমাকে বলেছিলেন—'আমেরিকা যেন একটা প্রকাণ্ড বয়লার। একবার যদি এর তলায় আগুন ধরানো যায়, তবে কি পরিমাণ শক্তি এ উৎপাদন করতে পারে, তার ঠিকঠিকানা নেই!' ভাবাবেগে ও উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে আমি সেদিন ঘুমুতে গেলাম এবং তৃপ্তির সঙ্গে এমন নিদ্রা দিলুম যে, মনে হলো আমি যেন রক্ষা পেয়ে গেছি!'

পরদিন সকালে (৮ই ডিসেম্বর) ঘুম থেকে উঠিয়াই চার্চিল স্থির করিলেন যে, তিনি ওয়াশিংটনে রুজভেল্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করিতে যাইবেন। বলা বাহুল্য যে, বৃটিশ গভর্নমেন্ট সঙ্গে সঙ্গেই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু কূটনৈতিক নিয়মকানুনের খুব কায়দামাফিক এই যুদ্ধ ঘোষণায় কেউ কেউ আপত্তি করিয়াছিলেন। জবাবে চার্চিল বলিলেন—'যাকে তোমার হত্যা না করে উপায় নেই, তার সম্পর্কে একটু ভদ্র হলে ক্ষতি কি?'[১]

এই অবস্থায়ও চার্চিলের রসিকতাবোধ ছিল, সন্দেহ নাই।

* * *

কিন্তু ইতিহাসের পরিহাস এই যে, চার্চিলের মত স্বয়ং রুজভেল্টও পার্ল হারবার আক্রান্ত হওয়ার ফলে 'স্বস্তির নিঃশ্বাস' ফেলিয়া বাঁচিয়াছিলেন। কেননা, রুজভেল্টও দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছিলেন যে, যদি জাপান একমাত্র বৃটিশ বা ডাচ উপনিবেশগুলি আক্রমণ করে, তবে, তিনি কি করিবেন? আমেরিকার হস্তক্ষেপ ছাড়া বৃটিশ, ডাচ কিম্বা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ডের আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই। এমন কি, জাপান ভারতবর্ষ বা মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত ধাওয়া করিতে পারে। সেই অবস্থায় আমেরিকা কি করিবে? যদি খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রান্ত না হয়, তবে কংগ্রেস বা নির্লিপ্ততাবাদীগণ, এমন কি আমেরিকার জনগণও কি ওলন্দাজ বা বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে রাজী হইবে? ১৯৪১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডনে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ইডেন যখন এই ধরনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মিঃ হপকিন্স তখন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। অথচ স্বয়ং রুজভেল্টই একদিন প্রচার করিতেছিলেন যে, হিটলারের জার্মানীই আসল শত্রু। তা'হলে ওলন্দাজ বা ইংরাজের উপনিবেশ রক্ষার জন্য আমেরিকানরা জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে যাইবে কেন?...

উপরে বর্ণিত রুজভেল্টের এই তীব্র মানসিক দ্বন্দ্বের কথা লিখিয়াছেন রবার্ট ই. শেরউড তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে।[২]

কিন্তু পার্ল হারবারের উপর জাপানী আক্রমণের ফলে রুজভেল্ট তাঁর এই মানসিক

---

* লক্ষ্য করার এই যে যুদ্ধের আগাগোড়াই চার্চিল বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। —লেখক

১। Churchill—Vol 3, P. 143.

২। Hopkins and Roosevelts—P. 429-30.

দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা পাইয়া গেলেন। কেননা, এক্ষণে আমেরিকা তার সমগ্র শক্তি নিয়া ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতে বাধ্য হইল।···

পার্ল হারবার আক্রমণের কয়েক ঘন্টা পর জাপানের সম্রাট হিরোহিতো সরকারীভাবে আমেরিকা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।···

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যখন তাঁর অফিস কক্ষে হপকিন্সের সঙ্গে লাঞ্চ খাইতেছিলেন, তখন বেলা ১-৪০ মিনিটের সময় (৭ই ডিসেম্বর) নৌ-সচিব কর্নেল নক্স তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, পার্ল হারবারের উপর বিমান আক্রমণ শুরু হইয়াছে এবং এটা কোন 'ড্রিল' নয়! (অর্থাৎ আমেরিকানদের নিজেদের মহড়া নয়!) হপকিন্স তখনও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, জাপানীরা হনলুলু আক্রমণ করিতে পারে! তিনি মনে করিলেন নিশ্চয়ই এই খবরের মধ্যে কোথাও ভুল আছে! তবে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মনে করিলেন, 'খবরটি সত্য হইতেও পারে'।

অবশেষে 'খবরটা পাকা' বলিয়া জানাইলেন এডমিরাল স্টার্ক বেলা ২-২৮ মিনিটের সময়। তখন রুজভেল্ট তাঁর 'পাত্র-মিত্র' নিয়া জরুরী বৈঠক করিলেন, তবে, বৈঠকে 'খুব একটা উত্তেজনা' ছিল না—একথা লিখিয়াছেন হপকিন্স তাঁর দিনলিপিতে।

সন্ধ্যাবেলা ক্যাবিনেট মিটিং অনুষ্ঠিত হইল এবং পরদিন বেলা সাড়ে ১২টার সময় কংগ্রেসের উভয় পরিষদের সম্মিলিত বৈঠকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই স্মরণীয় কথাগুলির দ্বারা তাঁর ঘোষণা শুরু করিলেন—

'Yesterday, December 7, 1941—a date which will live in infamy[১]

'৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১, গতকল্যের এই তারিখটি ইতিহাসে কুখ্যাত হইয়া থাকিবে···।

রুজভেল্টের এই ঘোষণা উপলক্ষে কংগ্রেসে কোন বিতর্ক হইল না। অথচ ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট উইলসন যখন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে চাহিলেন, তখন কিন্তু বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এবার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় কোন বিতর্ক হইল না, কোন মাননীয় সদস্য একটি বাক্যও উচ্চারণ করিলেন না। সেনেটে সর্বসম্মতিক্রমে যুদ্ধ ঘোষিত হইল, আর 'হাইজে' বা প্রতিনিধি পরিষদে একটিমাত্র ভোটে ভিন্নমত ধ্বনিত হইল। নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মন্টানার 'শান্তিবাদী' রিপাবলিকান মহিলা প্রতিনিধি জিনেট র‍্যানকিন বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। তিনি এই একক প্রতিবাদের কণ্ঠে মন্তব্য করিলেন,

'···Somebody should go on record to indicate that a "good democracy" does not always vote unanimously for war.'

অর্থাৎ কোন 'উৎকৃষ্ট গণতন্ত্রে' সকলে সর্বদাই যে একমত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে না, এই কথাটা রেকর্ড করার জন্যও কাহারও কাহারও ভিন্নমত প্রকাশ করা উচিত।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই শান্তিবাদী মহিলা প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন।[২]

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৪০৬

২। The War—Snyder, P. 260.

সেদিন জাপানের বিরুদ্ধে আমেরিকাব্যাপী প্রবল ক্রোধ ও উম্মাদনার দিনে একজন মহিলার পক্ষে এভাবে বিপক্ষে, ভোট দেওয়া নিশ্চয়ই তাঁর মতবাদের প্রতি সততা ও নিষ্ঠার পরিচায়ক ছিল।

* * *

৮ই ডিসেম্বর সকালে মার্কিন কংগ্রেসের সামনে রুজভেল্ট যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাতে নিশ্চয়ই চার্চিলের মত বাগ্মীতার চমক ছিল না, কিন্তু রুজভেল্ট যেন তাঁর প্রাণের কথা স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় বলিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, তিনি ইতিহাসের পরীক্ষার সামনে দাঁড়াইয়াছেন এবং বোধহয় এজন্যই কংগ্রেসে ভাষণ দেওয়ার সময় কেবল সস্ত্রীক যান নাই, সঙ্গে নিয়া গিয়াছিলেন মিসেস উডরো উইলসনকে— প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার প্রেসিডেণ্টের বিধবা পত্নীকে। সেদিন যেন সমগ্র মার্কিন জাতির পক্ষ থেকেই রুজভেল্ট তাঁর বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং হপকিন্স লিখিয়াছেন যে, জাপানীরা যে, যুদ্ধ ও শান্তির কঠিন প্রশ্নটির এমন সহজ মীমাংসা করিয়া দিবে, তাতে রুজভেল্ট যেন 'স্বস্তির নিঃশ্বাস' ফেলিয়া বাঁচিয়াছিলেন ![1]

কিন্তু তবু এদিক-ওদিক দু'চারজন গোঁড়া নির্লিপ্ততাবাদী ছিলেন যাঁরা সুযোগ পাইলেই রুজভেল্ট-প্রশাসনকে আক্রমণ করিতেন। অতএব পার্ল হারবারের মার্কিন বিপর্যয়ের কিছুকাল পরেই কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিস্টেম থেকে জনৈক বেতারভাষ্যকার (এলমার ডেভিস) যেন বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মন্তব্য করিলেন—

'কিছু কিছু স্বদেশপ্রেমিক মার্কিন নাগরিক আছেন, যাঁরা আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশ করেন যে, আমেরিকা যুদ্ধে জয়ী হইবে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা এই আশা করেন যে, রাশিয়া পরাজিত হইবে। আবার কেউ কেউ আশা করেন যে, আমেরিকা জয়লাভ করিবে, কিন্তু ইংলণ্ড হারিয়া যাইবে। আবার এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা আশা করেন আমেরিকা যুদ্ধে জয়লাভ করিবে বটে, কিন্তু রুজভেল্ট হারিয়া যাইবেন !'[2]

এভাবে রুজভেল্টের বিরুদ্ধবাদী কিছু কিছু রাজনীতিক, সাংবাদিক, লেখক ও ঐতিহাসিক—যেমন, ডবলিউ. এইচ. চেম্বারলিন, জর্জ মর্গানস্টার্ন, হ্যারি এলমার বার্নস, জন টি. ফ্লিন চার্লস সি ট্যানসিল প্রমুখ ব্যক্তিগণ তীব্র ও তিক্ত সমালোচনার সুরে বলিলেন—

'প্রেসিডেণ্ট এবং তাঁর পরামর্শদাতাগণ মুখে শান্তির কথা বলিয়া মার্কিন জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমেরিকাকে যুদ্ধের দিকে নিয়া গিয়াছেন। তিনি শান্তি ও যুদ্ধ সম্পর্কে দুমুখো নীতি অনুসরণ করিয়াছেন এবং বিরোধী নির্লিপ্ততাবাদীদের সঙ্গে তিনি যখন আর পারিয়া উঠিলেন না, তখন কৌশলে জাপানকে পার্ল হারবার আক্রমণে প্ররোচিত করিয়াছেন। রুজভেল্ট এবং তাঁর পরামর্শদাতাদের আচরণকে ক্ষমা করা যায় না। কেননা, তাঁরা কেবল দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতার জন্যই অপরাধী নন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা দায়িত্ব পালন করিতে চাহেন নাই। তাঁরা বিচার-বিবেচনা করিয়াই এই কার্য করিয়াছেন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধের বাইরে রাখিতে এবং জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ এড়াইতে চাহেন নাই !'[3]

১। পূর্বোক্ত—পৃষ্ঠা ৪৩৭।
২। ঐ
৩। The War—Louis L. Snyder. P. 266.

চতুর্থ অধ্যায়

পার্ল হারবার আক্রমণে হিটলারের বিস্ময়

জাপান-জার্মানী ও রাশিয়ার বিচিত্র সম্পর্ক

জাপান কর্তৃক অতর্কিতে পার্ল হারবার আক্রমণের ফলে পৃথিবীর চারিদিকে যে বিস্ময়ের তরঙ্গ খেলিয়া গেল, সেটা কেবল ইঙ্গ-মার্কিন মহল কিম্বা তাঁদের সমর্থকদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, খোদ হিটলারী দপ্তরেও এই বিস্ময় দেখা দিল। যদিও ইতালী, জার্মানী ও জাপান অ্যান্টি-কোমিন্টার্ন প্যাক্টের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল এবং এই তিন শক্তির মধ্যে একটা বাহ্যিক বুঝাপড়া ছিল, তবু হিটলার বিস্মিত হইয়াছিলেন কেন এবং তাঁর প্রতিক্রিয়াই বা কি হইয়াছিল ?

চার্চিল তাঁর মহাযুদ্ধের ইতিহাসে (তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৬) লিখিয়াছেন—

'বার্লিনের জাপানী রাষ্ট্রদূতের রিপোর্টে দেখা যায় যে, তিনি পরদিন বেলা ১টার সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে দেখা করিলেন এবং অবিলম্বে আমেরিকার বিরুদ্ধে জার্মানী ও ইতালীর যে যুদ্ধঘোষণা প্রয়োজন, একথা তাঁকে জানাইলেন।

'রিবেনট্রপ উত্তর দিলেন যে, হিটলার এখন পূর্ব প্রুশিয়াতে তাঁর সদর দপ্তরে কনফারেন্সে ব্যস্ত আছেন। কিভাবে যুদ্ধঘোষণা করিলে জার্মান জনগণ খুব খুশী হইতে পারে, সে-কথাও তিনি চিন্তা করিতেছেন।

'সৈন্যধ্যক্ষ জড্‌ল ন্যুরেমবার্গের মামলায় বলিয়াছেন যে, পার্ল হারবার আক্রমণের খবরে হিটলার এবং তাঁর স্টাফ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। 'রাত্রি দ্বিপ্রহরে তিনি (হিটলার) আমার চার্ট-রুমে প্রবেশ করিলেন, আমাকে ও ফিল্ড মার্শাল কাইটেলকে এই খবর দেওয়ার জন্য। তিনি সম্পূর্ণরূপেই অবাক হইয়াছিলেন।

'যদিও জার্মান নৌ-বিভাগ মার্কিন জাহাজগুলিকে আক্রমণের হুকুম দিয়াছিল পরদিনই ৮ই ডিসেম্বর তারিখ, তবু কিন্তু হিটলার সরকারীভাবে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন তিনদিন পর।'

সুতরাং এখানেই প্রশ্ন ওঠে, জাপানী আক্রমণের সংবাদে হিটলারের এমন অভিনব প্রতিক্রিয়ার কারণ কি এবং জার্মানী ও জাপানের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক ছিল ?— দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্যের মত এই তথ্যটাও কম কৌতুহলকর ছিল না। আসলে হিটলার চাহিয়াছিলেন জাপানকে আমেরিকার বিরুদ্ধে ভয় দেখাইবার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের জন্য—প্রকৃতপক্ষে আমেরিকাকে আক্রমণের জন্য নয়। অন্ততঃ যতক্ষণ পর্যন্ত না বৃটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া জার্মানীর হাতে ঘায়েল হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এমন কোন কাজ করা ঠিক নয় যাতে আমেরিকা জার্মানীর বিরুদ্ধে ইউরোপীয় যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধে আমেরিকার যোগদানের ফলে জার্মানীর যে পরাজয় ঘটিয়াছিল, সেই অভিজ্ঞতার কথা মনে রাখিয়াই হিটলার চাহিতেছিলেন আমেরিকাকে আপাততঃ দূরে রাখিতে। কিন্তু জাপানকে

কাজে লাগাইতে হইবে দূরপ্রাচ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এবং জাপান সেখানে আক্রমণ করিলে বৃটেন যেমন বিপন্ন হইবে, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগও পশ্চিমে অতলান্তিকের বদলে পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসমুদ্রে নিবদ্ধ হইবে—অন্ততঃ গোড়ার দিকে হিটলার এই ধরনের কূটনৈতিক কৌশলই খাটাইতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং ৫ই মার্চ, ১৮৪১ তারিখের 'একটি টপ সিক্রেট' বা সর্বাধিক গোপনীয় এক নির্দেশনামায় তিনি হুকুম দিলেন—'ত্রিশক্তি চুক্তির উদ্দেশ্য হইতেছে জাপানকে দিয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব "দূরপ্রাচ্যে বাস্তব-ব্যবস্থা অবলম্বন করানো" এবং এর দ্বারা বৃটিশ সামরিক শক্তি সেখানে আটকা পড়িবে, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগ প্রবাহিত হইবে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের দিকে।

'...দূরপ্রাচ্যে বৃটিশ শক্তির চাবিকাঠি হইতেছে সিঙ্গাপুর। সেটা দখল করিতে পারিলে ত্রিশক্তির যুদ্ধ-পরিচালনায় একটা চূড়ান্ত জয় হইবে।'

মনে রাখা দরকার, হিটলার তখন সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা করিতেছিলেন। 'সুতরাং পিছনের দিকে বৃটেনকে অজেয় রাখা তিনি নিরাপদ মনে করিলেন না। এজন্য জাপানকে দিয়া তিনি বৃটেনকে দুই ফ্রন্টের যুদ্ধের বিপাকে ফেলিতে চাহিয়াছিলেন।'[১]

এজন্য নাৎসী নেতারা জাপানকে বড় বড় গালভরা প্রতিশ্রুতি দিলেন, যখন ১৯৪১ বসন্তকালে জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাৎসুয়োকা বার্লিনে গিয়াছিলেন। তখন তাঁরা এমন ভরসাও দিয়াছিলেন যে, জাপান ও আমেরিকার মধ্যে সংঘর্ষ বাধিলে জার্মানী তৎক্ষণাৎ 'উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন' করিবে। 'আর রাশিয়া যদি জাপানকে আক্রমণ করে, তবে সে-ক্ষেত্রেও জার্মানী অবিলম্বে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আঘাত হানিবে।'[২]

অর্থাৎ জার্মানীর অনুকূলে জাপানকে যুদ্ধে নামাইবার জন্য তাকে ক্রমাগত উস্কানি দেওয়া হইল। কিন্তু জার্মান নেতারা যেমন তাঁদের রাশিয়া আক্রমণের গূঢ় সামরিক পরিকল্পনার কথা জাপানের নিকট বিশ্বাস করিয়া কোনদিন ফাঁস করেন নাই, জাপানও তেমনি তার আসল মতলবের কথা জার্মানীকে জানিতে দেয় নাই। অথচ ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে রাশিয়া আক্রমণের পর জার্মানী বার বার জাপানকে তাগাদা দিতেছিল পিছন থেকে সোভিয়েট রাশিয়াকে আঘাত হানিয়া ভ্লাডিভোস্টক বন্দর দখলের জন্য। এমন কি পরবর্তী দুই বছর ধরিয়া রিবেনট্রপ জাপানকে একই তাগাদা দিতেছিলেন। কিন্তু জাপান সরকারও বার বার সেই অনুরোধ এড়াইয়া গিয়া খুব ভদ্র ভাষায় জবাব দিতেছিলেন—'So sorry, please'—'খুব দুঃখিত, মাপ করবেন।'[৩]

অর্থাৎ জার্মানী ও জাপান দুই ফ্যাসিস্ট শক্তির মধ্যে বাহ্যিক মিত্রতা থাকিলেও বিপদের দিনে একে অপরের বন্ধু ছিলেন না। বরং এই দুইয়ের সম্পর্কের (১৯৪০ সাল থেকে) ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে জাপান চাহিয়াছে জার্মানী কর্তৃক ইউরোপীয় যুদ্ধারম্ভের পুরা সুযোগ নিতে, আর জার্মানী চাহিয়াছে পালটা জাপানকে নিজের

সামরিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাজে লাগাইতে। এজন্য রাশিয়াকে খতম করার উদ্দেশ্যে হিটলার যেমন চাহিতেছিলেন জাপানের সামরিক সহযোগিতা, তেমনি সেই সময় আমেরিকার সহিত সংঘর্ষ এড়াইবার জন্যও হিটলার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন কি, ৯ই জুলাই, ১৯৪১, রুজভেল্ট বৃটেনের হাত থেকে অতলান্তিক মহাসমুদ্রের আইসল্যাণ্ড দ্বীপ দখল করিয়া নিলেও এবং ফুরার কর্তৃক এটা মার্কিন 'আক্রমণাত্মক' কাজ (কেননা, জার্মানী বৃটেনের সঙ্গে যুদ্ধলিপ্ত ছিল এবং ওই সমুদ্রপথ 'লড়াইয়ের এলাকা' বলিয়া বিঘোষিত ছিল) বলিয়া বর্ণিত হইলেও হিটলার জার্মান নেভীকে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন কোন পালটা আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য। হিটলারের এই 'সংযম' লক্ষ্য করার মত। কিন্তু এই সংযম সত্ত্বেও জার্মানীর সহিত আমেরিকার অঘোষিত যুদ্ধ অনেক আগেই শুরু হইয়া গিয়াছিল। পশ্চিম অতলান্তিকে মার্কিন কনভয়গুলির উপর জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণ ও মার্কিন জাহাজগুলির পালটা আক্রমণেই এই অঘোষিত যুদ্ধের সূচনা করিয়াছিল এবং অক্টোবর মাসের (১৯৪১) সংঘর্ষে উভয় পক্ষের লস্করেরা হতাহত হইয়াছিল। কিন্তু 'কে প্রথম গুলি চালাইয়াছিল—এই অতলান্তিকের সংঘর্ষে ?'—এই প্রশ্নের জবাবে নিরপেক্ষ ইতিহাস বলিবে—'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।' কেবল অক্টোবর মাসের ঘটনাবলীতে নয়, তারও আগে এবং ১০ই এপ্রিল তারিখ একটি জার্মান ইউবোটের উপর মার্কিন নৌবহরই প্রথম 'জলবিস্ফোরকের' সাহায্যে আক্রমণ করিয়াছিল—একথা মার্কিন পক্ষই তাঁদের নৌ-ইতিহাসে স্বীকার করিয়াছিলেন।[১]

কিন্তু হিটলারের জার্মানী রুশ যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে আমেরিকাকে তেমন কোন উস্কানি দিতে চাহে নাই এবং জাপানকেও সে চাহিয়াছিল আমেরিকার বদলে বৃটেন বা রাশিয়াকে আক্রমণের জন্য। এমন কি ওয়াশিংটনে যখন জাপানী দূত নোমুরা ও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ডেল হালের মধ্যে সেই ইতিহাস-বিখ্যাত জাপ-মার্কিন আপোষ আলোচনা শুরু হইয়াছিল (মে মাসে, ১৯৪১) তখন জার্মানীর পক্ষ থেকে সেই আলোচনা 'সাবোতাজ' করার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নাই। মার্কিন ঐতিহাসিক উইলিয়াম শাইরার লিখিয়াছেন—

'In fact the Germans did their best to sabotage the Washington talks'.

অর্থাৎ ওয়াশিংটনের আলোচনার ভরাডুবি ঘটাইবার জন্য জার্মানী যথাসাধ্য তার চেষ্টা করিয়াছিল। টোকিওস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওট্ শেষ পর্যন্ত এমন প্রস্তাবও দিয়াছিলেন যে, যদি আমেরিকার সঙ্গে জাপানের আলোচনা চালাইতেই হয়, তবে জাপান যেন এই মর্মে একটি শর্ত উত্থাপন করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বৃটেনকে সাহায্য দেওয়া চলিবে না, অধিকন্তু জার্মানীর বিরুদ্ধে আমেরিকার শত্রুতা বন্ধ করিতে হইবে। আবার যখন আগস্ট মাসের মাঝামাঝি স্বয়ং জাপানের প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স কনোয়ে ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মধ্যে সাক্ষাৎ আলোচনার প্রস্তাব হইয়াছিল, তখনও জার্মানী প্রমাদ গণিয়াছিল এবং জার্মান রাষ্ট্রদূত পুনরায় জাপানী পররাষ্ট্র মন্ত্রকের নিকট এই আলোচনার বিরুদ্ধে 'বার্লিনের অসন্তোষ' জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।[২]

১। ঐ পুস্তক—পৃষ্ঠা ১০৫৪
২। ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ১০৫৬

মজার কথা এই যে, হিটলার এবং তাঁর অতিবুদ্ধিমান পরামর্শদাতাদের মনে এই কথাটা একবারও উদয় হয় নাই যে, জাপান ও আমেরিকার মধ্যে আপোষ-আলোচনা ভাঙ্গিয়া গেলে আমেরিকার পক্ষে এই মহাযুদ্ধে যোগদানেরই নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল—যে-সম্ভাবনা হিটলার এড়াইতে চাহিতেছিলেন।

১৮ই নভেম্বর যখন জাপ-মার্কিন আলোচনার সংকটজনক পর্যায় চলিতেছিল, তখন হঠাৎ টোকিও বার্লিনের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল যে, জার্মানী ও জাপানের মধ্যে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া উচিত যে, 'সাধারণ শত্রুর' সঙ্গে উভয়ের কেহ পৃথক সন্ধি করিবে না। কিন্তু রিবেনট্রপ তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, 'শত্রু' বলিতে জাপান কাকে বুঝাইতেছে? তাঁর ধারণা ছিল যে, জাপান রাশিয়াকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং 'নীতিগতভাবে' তিনি এই নূতন প্রস্তাবে রাজী হইয়াছিলেন।

এর পর যখন বার্লিনে সংবাদ পৌঁছিল যে, ওয়াশিংটনের সঙ্গে জাপানের আলাপ-আলোচনা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তখন হঠাৎ রিবেনট্রপ জাপানকে ভরসা দিলেন যে, জাপান ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ বাধিবামাত্র জার্মানী আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। জাপানও জার্মানীর কাছে এই প্রতিশ্রুতির জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল।[১]

কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও বলা যায় যে, জাপান সম্পর্কে জার্মানীর কোন সুসংবদ্ধ নীতি ও দৃঢ় মনোভাব ছিল না। নাৎসী নেতারা যেন ঝোঁকের মাথায় এক-এক সময় এক-এক প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু জাপান তার সংকল্পে ও মনোভাবে জার্মানীর তুলনায় অনেকটা অবিচল ছিল। এর প্রমাণ এই যে, জাপান ত্রিশক্তি চুক্তির দোহাই দিয়া পার্ল হারবার আক্রমণের পূর্বাহ্নে মুসোলিনীর ইতালীর কাছ থেকেও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিশ্চিত হইতে চাহিয়াছিল এবং পৃথক সন্ধি না করার জন্য একটি নূতন চুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল। মুসোলিনীও সানন্দে রাজী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু হিটলারের সম্মতি চাহিতেছিলেন। এদিকে রিবেনট্রপ ইতস্ততঃ করিতে-ছিলেন। কেননা, আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধযাত্রায় জার্মানী কর্তৃক লিখিত প্রতিশ্রুতি দানের অর্থ গত দুই বছরের নীতির সম্পর্কে বিপরীত আচরণ (অর্থাৎ আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে জড়াইয়া না-পড়ার নীতি)। জার্মানীর এই ইতস্ততঃ লক্ষ্য করিয়া টোকিও কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হইল যে, ফুরার বোধহয় 'quid proquo' নীতি অনুসরণ করিতে চান। অর্থাৎ জার্মানী যদি আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধযাত্রায় যোগদান করে, তবে, জাপানকেও সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধযাত্রায় যোগ দিতে হইবে।[২]

এই সন্দেহ টোকিওর পররাষ্ট্র দপ্তরকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। কিন্তু জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে আদৌ ইচ্ছুক ছিল না। সুতরাং টোকিও এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব এড়াইয়া যাইতে চাহিল।

টোকিওর সৌভাগ্যক্রমে বার্লিন বা হিটলার এই প্রশ্ন নিয়া আর মাথা ঘামাইলেন না। তখন ৬ই ডিসেম্বর মস্কো যুদ্ধে হিটলারেরও সঙ্কট দেখা দিয়াছিল, আর জাপান

১। ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ১০৬০
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১০৬৩

কর্তৃক পার্ল হারবার আক্রমণও একেবারে অত্যাসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ কেন যে, হিটলার সেই সন্ধিক্ষণে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার জন্য জেদ প্রকাশ করিলেন না, টোকিওর জঙ্গীবাদীরাও এটা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। এমন কি অন্য কেহও এর কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না।[১]

আসলে হিটলার বুঝিতেই পারেন নাই যে, জাপান ৭ই ডিসেম্বর তারিখ হঠাৎ পার্ল হারবার আক্রমণ করিয়া বসিবে। কেননা, তাঁর আগাগোড়া ধারণা ছিল যে, জাপান হয় সিঙ্গাপুর, কিংবা ভ্লাডিভোস্টক, অথবা যুগপৎ বৃটেন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ করিবে। নাৎসী নেতারা জাপানকে বরাবর সেদিকেই প্ররোচনা দিয়া আসিতেছিলেন। জাপানীরা কিন্তু আগাগোড়া পার্ল হারবার আক্রমণের মতলবের কথা জার্মানীর নিকট অত্যন্ত সযত্নে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং ৭ই ডিসেম্বর রাত্রিবেলা বার্লিনের পররাষ্ট্র দপ্তর যখন বিদেশী রেডিও মারফৎ এই সংবাদ শুনিলেন, তখন সেটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নাই। এমন কি যখন রিবেনট্রপকে এই সংবাদ দেওয়া হইল, তখন তিনি তো প্রথমে রাগিয়া আগুন হইলেন—কেন এমন আজগুবী খবর তাঁকে এত রাত্রে দেওয়া হইল !

এ জন্যই হিটলারও তাঁর সদর দপ্তরে গভীর রাত্রে পার্ল হারবার আক্রমণের সংবাদ পাইয়া একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন।

তবু হিটলার জাপানের এই অতর্কিত আক্রমণের প্রতি সমর্থন জানাইলেন। জাপানী সমর শক্তির উপর তাঁর অতিরিক্ত বিশ্বাস ছিল এবং জাপানের পরাক্রমে খুশী হইয়া ১৪ই ডিসেম্বর বার্লিনস্থিত জাপানী রাষ্ট্রদূতকে সম্মানজ্ঞাপক 'জার্মান ঈগল' স্বর্ণপদক উপহার দিলেন।

১১ই ডিসেম্বর হিটলার জার্মান রাইখস্টাগে বক্তৃতা দিয়া রুজভেল্টকে 'যুদ্ধবাজ' ও 'ইহুদীদের' দ্বারা প্ররোচিত বলিয়া তীব্র নিন্দা করিলেন এবং তাঁর নিজের 'প্রেস্টিজ রক্ষার' জন্য আগেই আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলেন। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ দাঁড়াইয়া উঠিয়া হিটলারের প্রতি উল্লাস প্রকাশ করিলেন।[২]

অতঃপর সেদিনই জার্মানী, ইতালী, ও জাপানের মধ্যে এই মর্মে একটি নূতন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল যে, তাঁরা একত্রে 'সাধারণ শত্রুর' বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবেন এবং কেহ কোন পৃথক সন্ধি স্বাক্ষর করিবেন না।[৩]

* * *

জাপানী সমরনেতাগণ অন্ততঃ এইটুকু বুঝিয়াছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়া বুদ্ধিমানের কার্য হইবে না। এ জন্য জার্মানীর বহু অনুরোধ সত্ত্বেও জাপান রাশিয়ার সহিত স্বাক্ষরিত নিরপেক্ষতার চুক্তি (১৩ই এপ্রিল, ১৯৪১) ভঙ্গ করে নাই। তিনটি বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে একই সময়ে যুদ্ধ করা জাপানী সমর শক্তির পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ছিল। কিন্তু কোন কোন সোভিয়েট ঐতিহাসিক মনে করেন যে, রাশিয়া আক্রমণ করিতে গিয়া জার্মানীর ব্যর্থতার ফলে জাপান সোভিয়েটকে আক্রমণ

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১০৬৫।
২। ঐ পৃষ্ঠা ১০৭৪।
৩। ঐ পৃষ্ঠা ১০৭৫।

করা থেকে ক্ষান্ত ছিল। এমন কি, ওয়াশিংটনের সঙ্গে আপোষ-আলোচনার ব্যর্থতার জন্যও জাপান রাশিয়া আক্রমণ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল।[১]

অর্থাৎ সোভিয়েট লেখকের মতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে টোকিওর আপোষ আলোচনা সার্থক হইলে জাপান যেমন পার্ল হারবার আক্রমণ করিত না, তেমনি জাপানের মাঞ্চুরিয়াস্থিত কোয়াণ্টাং আর্মি রাশিয়াকে আক্রমণ করিত। কিন্তু এই মতবাদের স্বপক্ষে কোন নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ এড়াইতে চাহিতেছিল বলিয়াই জাপান রাশিয়ার সঙ্গে নিরপেক্ষতার চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল—যদিও ওয়াশিংটনের রাষ্ট্রনেতারা পর্যন্ত এই চুক্তি পছন্দ করেন নাই। কেননা তাঁদের আশঙ্কা হইয়াছিল যে, এর ফলে জাপানী সৈন্যেরা রাশিয়ার দিক থেকে দায়মুক্ত হইয়া সম্ভবতঃ বৃটিশ বা মার্কিন অধিকারগুলির উপর আক্রমণ চালাইবে![২]

অপর পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়াও সেই সময় জাপানের সঙ্গে কোন যুদ্ধ চাহে নাই। স্ট্যালিন চার্চিলের নিকট প্রেরিত এক বার্তায় (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪১) জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, জাপানের সহিত স্বাক্ষরিত নিরপেক্ষতার চুক্তি রাশিয়ার পক্ষে ভঙ্গ করা সম্ভব নয়। তবে, জাপান আক্রমণ করিলে সোভিয়েট রাশিয়া তার উপযুক্ত জবাব দিবে।[৩]

কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাইবার জন্য বৃটেনের পক্ষ থেকে চেষ্টা হইয়াছিল জাপান কর্তৃক ডিসেম্বর মাসে বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পরেই। বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ইডেন যখন মস্কোতে ইঙ্গ-সোভিয়েট সহযোগিতা নিয়া আলোচনা করিতেছিলেন, তখন এই প্রসঙ্গ তিনিই তুলিয়াছিলেন। কিন্তু রুশ-জার্মান রণাঙ্গনের অবস্থা তখন অত্যন্ত কাহিল ছিল। সুতরাং স্ট্যালিন জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।[৪]

১। The Anit-Hitler Coalition—P. 80-82.
২। The Rise and Fall of the Third Reich—P. 1047.
৩। Correspondence—Stalin-Churchill-Roosevelt, Moscow, P. 21 22.
৪। দি এ্যান্টি-হিটলার কোয়ালিশন—পৃষ্ঠা ৮৭।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী অভিযান

মালয়-সিঙ্গাপুর এবং ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের পতন

জাপানী সাম্রাজ্যবাদ যেন এক সামুদ্রিক হিংস্র জন্তুর মত তার অক্টোপাশের বাহু বিস্তার করিল প্রশান্ত মহাসমুদ্রের চতুর্দিকে—১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর থেকে। আর ১৯৪১ সাল ছিল বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের একটি প্রকাণ্ড দুর্বৎসর। ১৯৪১ সালে নাৎসী জার্মানী সোভিয়েট রাশিয়ার 'অন্তহীন' ভূমিপথে যেভাবে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তা যেমন ছিল অভাবনীয়, তেমনি পূর্ব পৃথিবীতে জাপান সাগর, মহাসাগর, দ্বীপ, উপদ্বীপ, যোজক, প্রণালী, অরণ্য পর্বত ও তটভূমি ইত্যাদি ডিঙ্গাইয়া যেভাবে দেশদেশান্তরে নিজের হিংস্র থাবা বিস্তার করিল, সেটাও ছিল অভাবনীয়। অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ সালের ইউরোপে বা এশিয়া খণ্ডে মহাযুদ্ধের এমন অভিনব 'মহাকাব্যের' রূপ বোধহয় আর কখনও উম্ঘাটিত হয় নাই। আর কী বিশাল সাম্রাজ্য জাপানের দখলে আসিল মাত্র ৬ মাসের মধ্যে। ৩০ লক্ষ বর্গমাইল পরিমিত এক মহাসাম্রাজ্য, আর ১৫ কোটির অধিক অধিবাসীর এলাকা জাপানের জঙ্গী মুঠির মধ্যে আসিয়া গেল! দেশ, জাতি, মানুষ, প্রকৃতি এবং ভুগোলের এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য ইউরোপের নব অধিকৃত হিটলারী সাম্রাজ্যেও দেখা যায় নাই। জাপানী অভিযানের এই বৈচিত্র্য নিশ্চয়ই স্মরণে রাখার মত। কেননা এক অবিস্মরণীয় ভৌগোলিক পটভূমিকা ছিল এই দ্রুতগতি জাপানী অভিযানের পিছনে, যে বৈশিষ্ট্যের কথা লেখা হইয়াছিল ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী'তে :

'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের মানচিত্র যদি পাঠকবর্গ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে সহসা মনে হইবে যে, তাঁহারা যেন নিশীথ রাত্রির নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। অসংখ্য ছোটবড় বিন্দু আকাশের অগণিত নক্ষত্রের মত পূর্ব এশিয়ার তটভূমি হইতে আমেরিকার পশ্চিম তট পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। মহাসমুদ্রের বিস্তার এখানে কোথাও ৪ হাজার (টোকিও হইতে সানফ্রানসিস্কো সাড়ে-চার হাজার মাইল), কোথাও বা ৫/৬ হাজার মাইল কিম্বা বেশী হইবে। প্রশান্ত মহাসাগরে যেন আকাশের মতই বিস্তারলাভ করিয়াছে এবং আকাশের গায়ে অগণিত নক্ষত্রের মত অসংখ্য দ্বীপ মানচিত্রের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বীপগুলি কোথাও বা মৌচাকের মত ঝাঁক বাঁধিয়াছে, কোথাও বা ছায়াপথের মত দ্বীপের সারি বসিয়াছে, আবার কোথাও বা বহু দূরবর্তী গ্রহ-উপগ্রহের মত একটি আর-একটির কাছ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ্যাম, ইন্দোচীন, মালয় হইতে যদি অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত তাকানো যায়, তবে মনে হইবে কোনো দুষ্ট বালক যেন কালি ছিটাইয়া দিয়া দুরূহ মানচিত্র বিদ্যার উপর প্রতিশোধ লইয়াছে! দ্বীপগুলি এত কাছাকাছি ও ঘেঁষাঘেষি যে বোধহয় বিভিন্ন সঙ্কীর্ণ সমুদ্রপথের উপর দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিলেই মালয় হইতে অনায়াসে অস্ট্রেলিয়া বা নিউগিনি বা অন্য যে কোন

দ্বীপান্তরে যাওয়া যাইবে। মহাসমুদ্রের বুদ্বুদের মত এই দ্বীপগুলি আজ রক্তসমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছে এবং উহাদের বুক আজ বোমায় বিদীর্ণ ও গোলায় বিধ্বস্ত হইতেছে। এই দ্বীপের সংখ্যা কত, তাহা গণিয়া লাভ নাই। কারণ, একা জাপানেরই নাকি আড়াই হাজার দ্বীপ রহিয়াছে! পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই এমন মানচিত্র লইয়া ভৌগোলিক সংকটে পড়িবেন।

'তথাপি বলা যাইতে পারে, মালয়, সুমাত্রা জাভা যেন যেন তিনটি কচি বেগুনের মত লম্বমান হইয়া পড়িয়াছে এবং বোর্নিও দ্বীপকে যেন অগ্রভাগ কর্তিত শশার মত উহার পাশেই হেলাভরে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। আজিকার জাপ সংগ্রামের পক্ষে ঠিক এই স্থানটিই মর্মঘাতী। মালয় উপদ্বীপ যেখানে সুমাত্রা দ্বীপের মাঝামাঝি পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আমাদের বহু বিজ্ঞাপিত ও বহু পরিচিত সিঙ্গাপুর এবং কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্ব কোণ ধরিয়া তির্যক রেখা টানিলে ফিলিপাইনে পেঁছানো যাইবে। এই ফিলিপাইন ও উহার রাজধানী ম্যানিলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নৌ ও বিমানঘাঁটি।

কিন্তু সমুদ্রপথের সামরিক ভূগোল এখানেই শেষ হইল না। ম্যানিলা হইতে সোজা পূর্বদিকে সরল রেখা টানিলে গুয়াম্ দ্বীপ পাওয়া যাইবে। বৃটেনের পক্ষে যেমন সিঙ্গাপুর, আমেরিকার পক্ষে তেমনি গুয়াম। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে এই দুই রাষ্ট্রের যুদ্ধের চরম মীমাংসা এই দুই কেন্দ্রে ঘটিতে পারে। গুয়াম হইতে ঈষৎ ঈষাণ কোণের দিকে রেখা টানিলে ওয়েক দ্বীপ হাতে আসবে এবং ইহাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিমানঘাঁটি। আবার এখান হইতে একেবারে পূর্বদিকে সোজা পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের বিখ্যাত পার্ল হারবার (পোতাশ্রয়) এবং বাঙ্গালী পাঠকের উদ্ভট কল্পনায় সিঞ্চিত হনলুলুর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। হনলুলু হইতে মাত্র আড়াই হাজার মাইলের একখানা লাফ দিতে পারিলেই আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো বন্দরে পেঁছিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যাইবে! সিঙ্গাপুরহইতে ম্যানিলা হইয়া যদি সানফ্রান্সিস্কো পর্যন্ত দীর্ঘ রেখা টানা যায়, তাহা হইলে দোদুল্যমান সেতুর মত উহা কৌতূহলকর রূপ ধারণ করিবে এবং এই সেতুর এক-একটি প্রকাণ্ড ধাপকে বর্তমান ইঙ্গ-মার্কিন জাপ যুদ্ধের এক-একটি প্রাণকেন্দ্র বলা যাইতে পারে। ইহার সঙ্গে অবশ্যই পূর্ব এশিয়ার তটভূমিস্থিত হংকং বন্দর এবং ফরমোজা দ্বীপকে স্মরণে রাখিতে হইবে। কারণ, প্রশান্ত মহাসমুদ্রের যুদ্ধে ইহারাও নিতান্ত অশান্ত মূর্তি ধারণ করিবে। যুদ্ধকে সহজভাবে বুঝিতে হইলে এই জটিল মানচিত্রের সরল রূপটা চোখের সামনে রাখতে হইবে।'[১]

কিন্তু উপরের এই রণনৈতিক মানচিত্রের বর্ণনাও সম্পূর্ণ নয়। কেন না, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের এই বর্ণনার সঙ্গে ১৯৪২ সালের মে মাস পর্যন্ত যোগ করিলে (অর্থাৎ জাপানী আক্রমণের চরম সীমা পর্যন্ত) ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ, বঙ্গোপসাগর এবং সিংহল দ্বীপ পর্যন্ত পেঁছিতে হইবে। জাপানী আক্রমণের থাবা হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

* *

মেজর-জেনারেল ফুলার বলিতেছেন যে, জাপানের এই আক্রমণাত্মক অভিযান

১। গ্রন্থকার প্রণীত 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী' ১৯৪৩, মার্চ।

আসলে ছিল অর্থনৈতিক সংগ্রাম। কেননা, ১৯৪১, ২১শে জ্বলাই জাপান যখন পরাজিত ফ্রান্সের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বক্ষরের দ্বারা ফারাসী উপনিবেশ ইন্দোচীন 'সাময়িকভাবে' দখলের জন্য সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজ পাঠাইল, তখন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জাপানকে প্রতিনিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে জাপানের ৩৩ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের অর্থনৈতিক সম্পদ 'জমাট' বা আটক করিলেন এবং বৃটিশ ও ওলন্দাজ সরকারও জাপানের বিরুদ্ধে অনুরূপ অর্থনৈতিক শাস্তির ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। ফলে, তখন থেকেই জাপানের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন অর্থনৈতিক সংগ্রাম শুরু হইয়া গেল এবং 'এরই পালটা প্রতিরোধ হিসাবে জাপানের পক্ষেও যুদ্ধ না করিয়া উপায় ছিল না।'

এই অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রমাণ মিলিবে 'আক্রমণের উদ্বোধনের' পূর্ব মুহূর্তে সামরিক অধিনায়কদের নির্দেশের মধ্যে। যেমন আর্মি ও নেভির প্রধান সেনাপতিদ্বয়ের হুকুমনামায় এই কথাগুলি ছিল ঃ

'বৃটেন ও আমেরিকা আমাদের শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যের পথ সকল প্রকার উপায়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং আমাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক চূড়ান্তরূপে ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। ফলে, আমাদের সাম্রাজ্যের অস্তিত্বই বিপন্ন হইয়াছে।...এই অবস্থায় আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ না করিয়া উপায় নাই।

অতএব জাপান অস্ত্রধারণ করিল। কিন্তু হাজার হাজার মাইল সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়া আক্রমণ করিতে গেলে নৌবহর ও বিমানবহর ছাড়া উপায় কি? পার্ল হারবারের উপর বিমানবাহী জাহাজ থেকে টর্পেডো-বোমারু ও ছোঁমারা বিমানযোগে হানা দিয়া
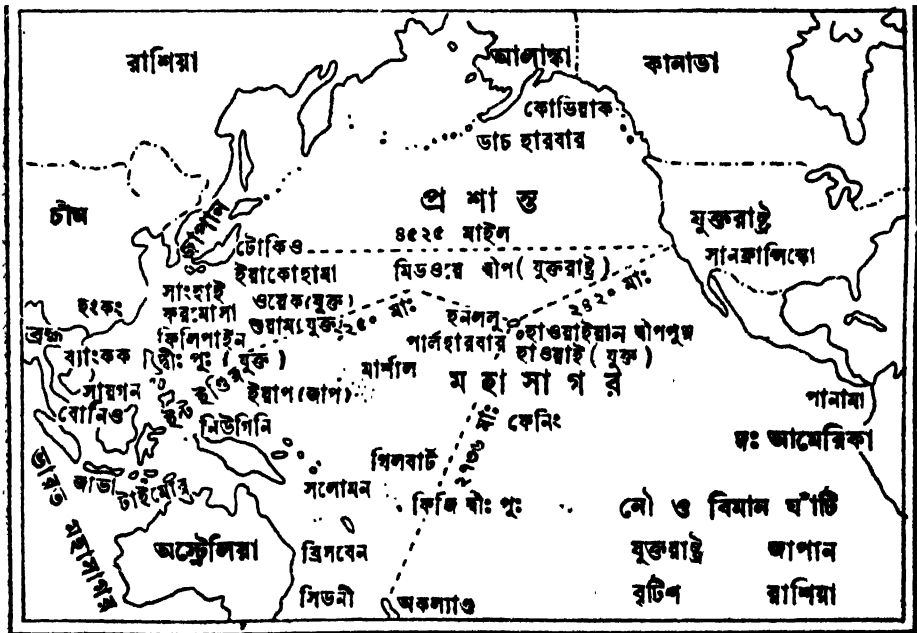
এই আক্রমণের বোধন করা হইল এবং প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এই যুদ্ধে মূলতঃ বিভিন্ন দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জের ঘাঁটি, বিমানবহর ও নৌবহর প্রাধান্য অর্জন করিল।

'জাপানের এই রণনৈতিক পরিকল্পনায় অপরিহার্য অংশ ছিল মালয়, ব্রহ্মদেশ,

১। The Second World War—1939-1945, P. 128.

সুমাত্রা, জাভা ও বোর্নিও দখল করা। কেননা, শ্রমশিল্পের উৎপাদনে জাপানের স্বয়ম্ভরতা অর্জন করার পক্ষে এই দেশগুলি দখল করার প্রয়োজন ছিল। কেবল তাই নয়, যদি শেষ পর্যন্ত চীন থেকে পশ্চাদপসরণ করিতে হয় তবে, এই দেশগুলির সম্পদই সেই ক্ষতি পূরণ করিবে।

'এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য যুদ্ধের সময় ফিলিপিন্স, সেলিবিস ও নিউগিনি দখল না করিয়াও উপায় ছিল না! কেননা, এর দ্বারা জাপানের পূর্ব পার্শ্বদেশ নিরাপদ হইবে এবং যদি আমেরিকার সঙ্গে কোন আপোষরফামূলক শান্তি-চুক্তি ঘটে, তবে, এই দেশগুলির বিনিময়ে দরকষাকষি করা যাইবে।'

'এই আক্রমণাত্মক রণক্রিয়া ('অফেনসিভ অপারেশন') মোটামুটি দুই অংশে বিভক্ত ছিল। জাপানী আর্মি বা সৈন্যবাহিনীর উপর ভার দেওয়া হইল মালয়, ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা ও লুজন (উত্তর ফিলিপিন্স) দখলের জন্য। আর নৌবহরের উপর দায়িত্ব দেওয়া হইল পার্ল হারবারের উপর হানাদারি এবং দক্ষিণ ফিলিপিন্স, বোর্নিও সেলিবিস, জাভা, নিউগিনি, বিসমার্ক, সলোমোন, গিলবার্ট, গুয়াম এবং ওয়েক—এই সমস্ত দ্বীপ অধিকারের জন্য। এই আক্রমণের সবচেয়ে বড় উপাদান গতিবেগ বা স্পীড। অতএব বিমানবাহিনীই ছিল সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।'[১]

আর সংখ্যায় এবং আক্রমণের দক্ষতায় জাপানী বিমানবাহিনী গোড়ার দিকে ইঙ্গ-মার্কিনের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিল। ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১, যখন জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে পার্ল হারবারের উপর আঘাত হানিল, তখন হাওয়াই দ্বীপ থেকে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত বিভিন্ন রণাঙ্গনে তাদের হাতে ছিল মোট ২৬২৫টি বিমান এবং সেই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে, জাপানী বিমান বাহিনী জাপানের স্থল ও নৌবাহিনীর অঙ্গীভূতরূপেই বা শাখারূপেই পরিচালিত হইত। অর্থাৎ এই বিমানবহর কোন আলাদা 'রণনৈতিক হাতিয়ার' হিসাবে স্বাধীন ও পৃথকভাবে পরিচালিত হইত না—(বৃটিশ বা মার্কিন বিমানবহর স্বাধীন ও পৃথকভাবে পরিচালিত হইত)।

এই সময় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে—পার্ল হারবার থেকে অস্ট্রেলিয়া-মালয় পর্যন্ত মার্কিন-বৃটিশ-ওলন্দাজ বা মিত্রপক্ষের হাতে ছিল মোট ১২৯০ টি প্লেন এবং এগুলির অধিকাংশই ছিল আবার সেকেলে অকেজো ধরনের।[২]

বিমানে যখন ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ দুর্বল ছিল, তখন প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-শক্তিতে মিত্রপক্ষের কি অবস্থা ছিল? সেই সময় বৃটিশ, মার্কিন, ওলন্দাজ—এই তিন পক্ষের মিলিত নৌশক্তি ছিল—বড় যুদ্ধ জাহাজ ১১, বিমানবাহী জাহাজ ৩, বড় ক্রুজার ১৪, হালকা ক্রুজার ২২, ডেস্ট্রয়ার ১০০ এবং সাবমেরিন ৬৯ খানা।

আর জাপানের ছিল বড় যুদ্ধ জাহাজ ১০, বিমানবাহী জাহাজ ১০, বড় ক্রুজার ১৮, হালকা ক্রুজার ১৮, ডেস্ট্রয়ার ১১৩ এবং সাবমেরিন ৬৩ খানা।

বাহ্যিক বিচারে উভয় পক্ষই প্রায় সমান সমান ছিল বটে, কিন্তু গুণগত ও অন্যান্য দিক দিয়া জাপান শ্রেষ্ঠ ছিল ও সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। যেমন, জাপানের বিমানবাহী জাহাজের ও বিমানবহরের শক্তি বেশী ছিল। ফলে, আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে বিমানশক্তি সে বেশী প্রয়োগ করিতে পারিয়াছিল। আর হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান

১। The Second World War—Maj. General Fuller, P. 132.

২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা—১৩২।

ছিল মিত্রপক্ষের ঘাঁটিগুলির মধ্যে, যেমন পার্ল হারবার ও সিঙ্গাপুর এই দুই ঘাঁটির মধ্যে সমুদ্রপথের দূরত্ব ছিল ৬ হাজার মাইল। অপরপক্ষে জাপানের যুদ্ধ-জাহাজগুলি অনেক বেশী আধুনিক, বেশী অস্ত্রসজ্জিত এবং অধিকতর গতিবেগসম্পন্ন ছিল। একমাত্র বৃটেনের 'প্রিন্স অব ওয়েলস' এই দিক দিয়া উৎকৃষ্টতর জাপানী বড় যুদ্ধ-জাহাজের সমকক্ষ ছিল।[১]

জাপানের যে সৈন্যবাহিনী বা আর্মি ছিল, তার মোট সংখ্যা ছিল ৫১ ডিভিসন। এর মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে সে মাত্র ১১ ডিভিসন সৈন্য নিয়োগ করিয়াছিল। অর্থাৎ আড়াই লক্ষের কিছু কম 'লড়িয়ে সৈন্য' বা ফাইটিং ট্রুপস নিয়োগ করা হইয়াছিল। তবে, সৈন্যবাহিনীর প্রশাসনিক লোকজনসহ এই সংখ্যা মোট প্রায় ৪ লক্ষ দাঁড়াইতে পারে। জাপানীদের মতে বৃটিশ পক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিল হংকং-এ ১১ হাজার, মালয়ে, ৮৮ হাজার, বর্মাতে ৩৫ হাজার—মোট ১ লক্ষ ৩৪ হাজার। আর আমেরিকানদের ছিল ফিলিপিন্সে মার্কিন সৈন্য ৩১ হাজার, ফিলিপিনো সৈন্য ১ লক্ষ ১০ হাজার, ডাচ ২৫ হাজার, আর স্থানিক বাহিনী বা মিলিশিয়া ৪০ হাজার।

উভয় পক্ষের এই রণনৈতিক অবস্থান ও সামরিক শক্তি বিবেচনা করিয়া ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট মন্তব্য করিতেছেন যে, জাপানের পক্ষে এই ধরনের আক্রমণাত্মক অভিযান একটা দুঃসাহসিক জুয়াখেলার সমান ছিল। তবে, আক্রমণের প্রারম্ভে তার সুবিধা ছিল অনেক রকম এবং তার সবচেয়ে যে বড় বিপদ ঘটিতে পারিত মার্কিন নৌ-বহরের পক্ষ থেকে, সেই বিপদ দূর করার জন্য সে গোড়াতেই পার্ল হারবারের উপর আঘাত হানিল। এডমিরাল ইয়ামামোতো ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে যখন সমগ্র জাপানী নৌ-বহরের প্রধান অধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন, তখনই তিনি অতি দ্রুত অতর্কিত আক্রমণের পরিকল্পনা করিলেন। কারণ, তাঁর মতে প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌবহর ছিল 'জাপানের গলার কাছে উদ্যত ছোরার মত'!

প্রশান্ত মহাসাগরের বহুদূর বিস্তৃত এলাকায় আক্রমণ করিতে হইবে বলিয়া এই অভিনব অভিযানের টাইম-টেবিল নির্ধারিত হইল গ্রীনউইচ মীন টাইম অনুসারে। কারণ, হাওয়াইতে যখন ৭ই ডিসেম্বর, মালয়ে তখন ৮ই ডিসেম্বর![২]

লীডেল হার্ট বলিতেছেন—জাপানী রণনৈতিক পরিকল্পনা দুই রকম উদ্দেশ্যের প্রতি নজর রাখিয়া রচিত হইয়াছিল—আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক। অধিকৃত অর্থনৈতিক সম্পদ রক্ষা করা ও সাফল্যের সঙ্গে আমেরিকার চ্যালেঞ্জের (জাপান জানিত যে, আমেরিকার শক্তি অনেক বেশী) সম্মুখীন হওয়া ছিল এর উদ্দেশ্য। সোভিয়েট রাশিয়ার কাছ থেকে জাপানের কোন ভয়ের কারণ ছিল না। কেননা, গোটা ইউরোপ ছিল অক্ষশক্তিবর্গের পদানত। আর সেই মুহূর্তে রাশিয়া ছিল জার্মানীর সহিত যুদ্ধে অত্যন্ত বিপন্ন। অতএব জাপান যদি উত্তরে আলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত আংটির মত একটি বিরাট বেষ্টনী সৃষ্টি করিতে পারে, তবে, আমেরিকা সেই বেষ্টনী ভাঙিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত জাপানের এই নূতন দখলদারি এবং বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ায় তার 'কো-প্রোসপারিটির' পরিকল্পনা মানিয়া

১। History of the Second World War—Liddell Hart. P. 208.

২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা ২০৮-২১০।

নিতে বাধ্য হইবে। অনুরূপভাবে হিটলারও চাহিয়াছিলেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে আর্চেঞ্জেল থেকে অস্ত্রখান পর্যন্ত একটি আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষার বিশাল প্রাচীর গড়িয়া তুলিতে।

নৌ ও বিমানবাহিনীর অসাধারণ কৃতিত্ব ও দুঃসাহস এবং সেই সঙ্গে জঙ্গল-যুদ্ধের ও কষ্টসহিষ্ণুতার আশ্চর্য দৃষ্টান্ত দেখাইল জাপানী সৈন্যেরা। নিঃসন্দেহে এর পিছনে ছিল দীর্ঘদিনের সামরিক প্রস্তুতি ও সৈন্যবাহিনীর সযত্ন প্রশিক্ষণ। বৃটেন বা আমেরিকা জাপানের এমন আকস্মিক বিদ্যুৎগতি আক্রমণের জন্য যেমন সামরিকভাবে প্রস্তুত ছিল না, তেমনি তারা জাপানী সামরিক শক্তিকেও তুচ্ছ করিয়াছিল।

ইংরাজীতে তখন A B C D Powers কিম্বা আমেরিকা, বৃটিশ সাম্রাজ্য, চীন ও ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ নামে যারা পরিচিত ছিল, তাদের সকলের বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে, এমন ধারণা লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে ছিল না। সুতরাং পার্ল হারবার আক্রমণের বিস্ময়-তরঙ্গ প্রশান্ত মহাসাগরের চারদিকে মিলাইয়া যাইতে-না-যাইতেই, আরও নাটকীয় এবং আরও চমকপ্রদ খবর পাওয়া গেল—দুইটি ভীমকায় বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ ডুবির খবর। ২রা ডিসেম্বর, ১৯৪১, 'প্রিন্স অব ওয়েলস' এবং রিপালস' নামে দুইটি প্রসিদ্ধ বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ আসিয়া পেঁৗছিল সিঙ্গাপুর নৌ-দুর্গের ঘাঁটিতে। মলয় উপদ্বীপে জাপানীদের সম্ভাব্য অবতরণ ও আক্রমণের বাধা দেওয়াই ছিল এই দুইটি বৃটিশ রণতরীর উদ্দেশ্য। ৩৫ হাজার টনের 'প্রিন্স অব ওয়েলস' ব্যাটলশিপ এবং ৩২ হাজার টনের ব্যাটল ক্রুজার 'রিপালস' যেন সমুদ্রের ভাসমান বিশাল নৌ-দুর্গের মত ছিল। এতে ১৪ ইঞ্চি ও ১৫ ইঞ্চি ব্যাসের কামান ও অস্ত্রসজ্জা যেমন ছিল, তেমনি ১৬ ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের বর্মের দ্বারা 'প্রিন্স অব ওয়েলস' যুদ্ধ-জাহাজের দুই পার্শ্বদেশ আচ্ছাদিত ছিল। প্রায় সিঙ্গাপুর নৌ-দুর্গের মতই এই যুদ্ধ-জাহাজ দুইটিও 'দুর্ভেদ্য' এবং সমুদ্রে ওদের নিমজ্জন 'অসম্ভব' বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল। কিন্তু এই অসম্ভবও সম্ভব হইল জাপানী বৈমানিকদের দুঃসাহসিক আক্রমণ এবং অত্যন্ত নিখুঁত লক্ষ্যভেদের ফলে।

১৯৪১, ৮ই ডিসেম্বর মালয় উপদ্বীপে জাপানীদের অবতরণের খবর পাওয়া মাত্র দূরপ্রাচ্যের বৃটিশ নৌবহরের প্রধান সেনাপতি এডমিরাল স্যার টম ফিলিপস দুইটি ভীমকায় যুদ্ধজাহাজ নিয়া জাপানীদের মোকাবিলা করার জন্য রওনা হইলেন। তিনি সাহসী ছিলেন বটে, কিন্তু অনভিজ্ঞ ছিলেন। বিমানবহরের উপযুক্ত পাহারা ছাড়া এত বড় যুদ্ধ-জাহাজ নিয়া যে শত্রুর কাছাকাছি যাইতে নাই, আধুনিক নৌ-যুদ্ধের এই মূল তথ্য তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন।[১]

ফলে, মারাত্মক বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। যখন সিঙ্গাপুর থেকে এই নৌ-বহর মাত্র ১৫০ মাইল এবং মালয় উপকূল থেকে মাত্র ৫০ মাইল দূরে ছিল তখন জাপানী পর্যবেক্ষণকারী বিমান এদের সন্ধান পাইল। খবর পাইয়া জাপানী বোমারুর দল বৃটিশ নৌ-বহরকে ধাওয়া করিল। শত্রু পিছনে লাগিয়াছে টের পাইয়া প্রিন্স অব ওয়েলস এবং রিপালস সিঙ্গাপুর নৌ-দুর্গের দিকে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে লাগিল ঘণ্টায় ৩০ নট (সামুদ্রিক মাইল) চরম গতিতে। কিন্তু পরদিন অঘটন ঘটিল।

১। The War 1939-1945— L. Snyder, P. 270.

দুইজন প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকের রিপোর্ট প্রাচ্যখণ্ডের এই যুদ্ধে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সেই দুটি এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

মিঃ পিটার ওয়ালটন সিঙ্গাপুর থেকে রেডিওযোগে লণ্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রে এই মর্মে বার্তা পাঠাইলেন—

'এডমিরাল ফিলিপস সিঙ্গাপুর থেকে জাহাজ দুটি নিয়ে যাত্রা করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল জাপানীদের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি উত্তর মালয়ে ও দক্ষিণ থাইল্যাণ্ডে, যেখানে জাপানীরা অবতরণ করবে, যথাসম্ভব তারই কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হবেন। আবহাওয়া প্রথম দিকে আমাদের সহায়ক হয়েছিল। বৃষ্টি ও মেঘের আড়াল ধরে
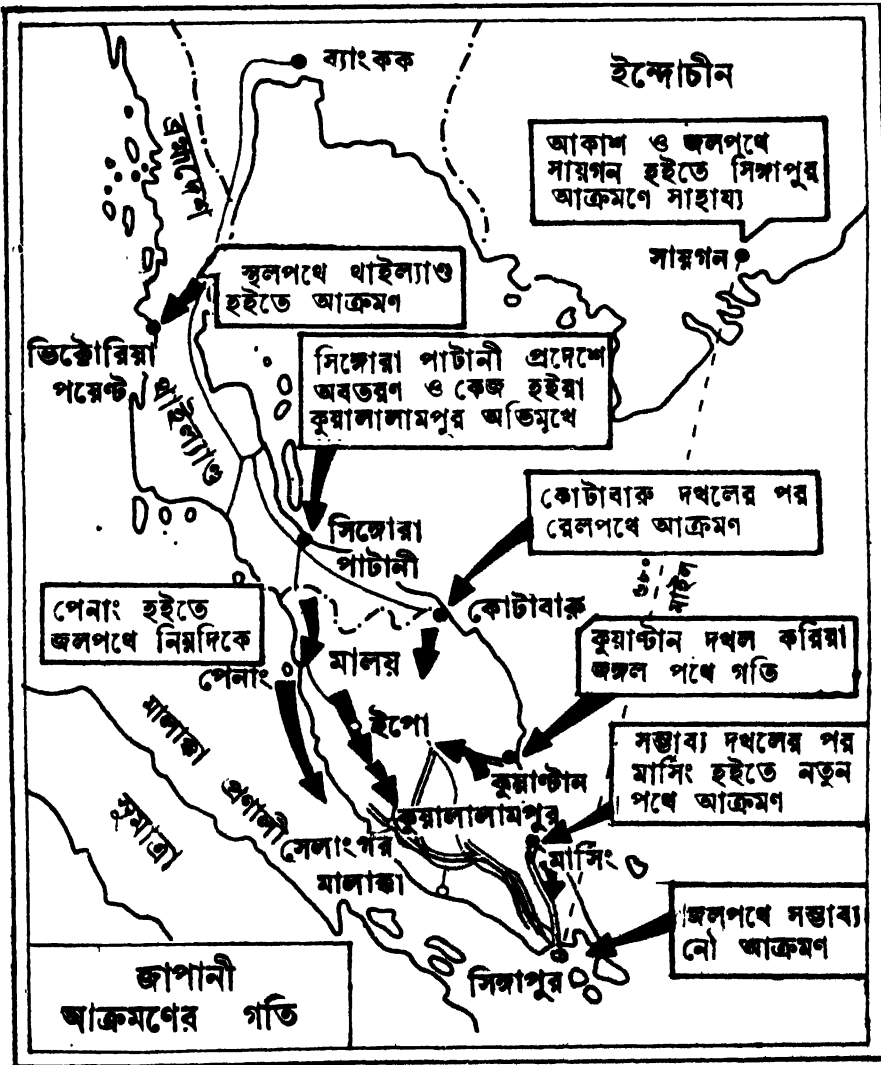
আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম। কিন্তু মঙ্গলবার অপরাহ্নে সূর্যাস্তের কিছু আগে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গেল। এই সময় একখানি জাপানী পর্যবেক্ষণকারী বিমান যুদ্ধ-জাহাজটিকে লক্ষ্য করে গেল। 'রিপালস' থেকে লাউডস্পীকারযোগে কমাণ্ডারের কণ্ঠস্বর শুন্য গেল—'শত্রুবিমান আমাদের ছায়ার মত অনুসরণ করছে।' খানিক

পরে ঘোষণা করা হলো যে, যে লড়াইয়ের জন্য আশা নিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম তা ত্যাগ করা হলো এবং যুদ্ধ-জাহাজ সিঙ্গাপুরে ফিরে যাচ্ছে।

'পরদিন সারা রাত ধরে জাহাজ দুটি বাহির সমুদ্রে চলতে লাগল। পরদিন সকালে আরও পর্যবেক্ষণকারী জাপানী বিমানের আবির্ভাবের পর বোমারুর দল দেখা দিল।

'বোমারুগুলি ঝাঁক বেঁধে এলো, অধিকাংশই টর্পেডো নিক্ষেপ করলো। আমি যতটা দেখতে পেয়েছি, তাতে মনে হলো যে, একটিমাত্র বোমাই একটা জাহাজে পড়েছিল। কিন্তু এর দ্বারা খুব-একটা মারাত্মক ক্ষতি হয় নি। তবে, টর্পেডোগুলিই আসল ক্ষতি করেছে। মোট ৬০ খানা জাপানী বিমান এসেছিল, ১৭ হাজার ফুট বা ৩ মাইলেরও অধিক উর্ধ্ব থেকে (মতান্তরে ১০ হাজার ফুট উপর থেকে—লেখক) তারা আক্রমণ করে। 'প্রিন্স অব ওয়েলসের' উপর তিনঘণ্টা ধরে আক্রমণ চালানো হয়। জাপানী টর্পেডো বিমানগুলি যুদ্ধ-জাহাজ দুটির গতিপথে টর্পেডো ছুঁড়তে থাকে। 'প্রিন্স অব ওয়েলস' সিগন্যালযোগে 'রিপালস'কে জিজ্ঞাসা করে যে সে আহত হয়েছে কিনা?

'উত্তরে 'রিপালস' বলে, এই পর্যন্ত ১৯টি টর্পেডো এড়িয়েছি। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ!'

কলম্বিয়া বেতারের সিসিল ব্রাউন নিউইয়র্কে বার্তা পাঠাইলেন—

'মালয়ের তীর থেকে অনেক দূরে দক্ষিণ চীন সাগরে যখন জাপানীদের দুরন্ত আক্রমণে রণতরী 'রিপালস্' ডুবে যায়, তখন আমি ওর আরোহী ছিলুম। জলের উপর পুরু পেট্রোলের (জাহাজ থেকে নির্গত) ভিতর দিয়ে যখন সাঁতার কাটছিলুম, তখন আধ মাইল দূরে 'প্রিন্স অব ওয়েলস'কেও সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যেতে দেখলুম। এবারের মহাযুদ্ধে বৃটিশ নৌ-বহরের এত বড় সংঘাতিক ক্ষতি আর হয়নি। 'রিপালস্' যখন একদিকে কাৎ হয়ে পড়েছিল, তখন অন্যান্য শত শত লোকের মত আমিও ২০ ফুট লাফ দিয়ে জলের উপর পড়লুম এবং পেট্রোলমিশ্রিত জল যাতে নাকে-মুখে না ঢোকে ও বিস্ফোরণের ধাক্কা না লাগে, তার জন্য যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সাঁতার দিয়ে যেতে লাগলুম। ইতালীর ট্যারাণ্টোতে* বৃটিশ বৈমানিকরা যে দুঃসাহসিকতার সহিত ইতালীয় নৌ-বহর আক্রমণ করেছিল, জাপানীরাও ঠিক তেমন দুঃসাহসের সঙ্গে খুব কাছে এসে আক্রমণ করলো। ৫০০ গজ দূরে দেখলুম ৬ খানা জাপানী প্লেন গুলিবিদ্ধ ও অগ্নিদগ্ধ হয়ে সমুদ্রে পড়ে যাচ্ছে। এডমিরাল স্যার টম ফিলিপস ও ক্যাপ্টেন লীচকে 'প্রিন্স অব ওয়েলস্' জাহাজের ব্রীজ থেকে জলে গড়িতে পড়তে দেখলুম—সেই শেষ দেখা!

'রিপালসে'র ক্যাপ্টেন উইলিয়াম টেন্যাণ্ট রক্ষা পেয়েছিলেন। তখন স্পষ্টতঃই বুঝা গেল যে, 'রিপালস্' ডুবছে এবং কামানসমূহের ধারে অনেকগুলি মৃতদেহ পড়ে আছে, তখন আমি ফ্ল্যাগ ডেকের উপরে দাঁড়িয়েছিলুম। সে-সময় জাহাজের মাইক্রোফোন মারফৎ ক্যাপ্টেন টেন্যাণ্টের নির্দেশ শুনা গেল।

* ১১ই নভেম্বর, ১৯৪০ ভূমধ্যসাগরের বৃটিশ বিমানবাহী যুদ্ধ-জাহাজ থেকে টর্পেডোবিমানযোগে ট্যারাণ্টোর ইতালীয় নৌবহরের উপর অত্যন্ত দুঃসাহসিক আক্রমণের দ্বারা পাঁচখানা যুদ্ধ জাহাজ ও ২ খানা সাহায্যকারী পোতকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল।

'All hands on deck. Prepare to abandon ship. God be with you.'

—'সকলে ডেকের উপর যাও। জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন!' কারুর কোন ত্রাসের ভাব ছিল না। এক-একটি আঘাতে 'রিপালেসে'র আয়ু শেষ হয়ে আসছিল এবং প্রতি আঘাতেই প্রত্যেকটি মানুষ শান্ত ও স্থিরচিত্তে স্ব স্ব কাজ করছিল। আমার নোটের খাতার রক্ষা পেয়েছিল। তবে, সেগুলি তৈলসিক্ত হয়ে গিয়েছিল। একটা ডেস্ট্রয়ার আমাদের তুলে নিল। কিন্তু অনেকের মত আমিও সম্পূর্ণ উলঙ্গ হলাম। কারণ, তেলের জন্য জামাকাপড় সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই জাহাজডুবির করুণ দৃশ্য ভোলবার নয়। 'রিপালস্' থেকে যখন মাত্র ৫০ ফুট দূরে ছিলুম, তখন রক্তাক্ত বীভৎস ক্ষতের মত ওর হালটা একবার ঊর্ধ্বে উঠলো এবং অতি দ্রুত অতলে তলিয়ে গেল! 'প্রিন্স অব ওয়েলস্' একদিকে কাৎ হয়ে পড়েছিল। রণতরীটি মিনিট দশেক আন্দোলিত হলো। একটা বিরাট দৈত্যের খোঁড়া পায়ের মত ওর একটা অংশ ঊর্ধ্বোত্থিত দেখা গেল, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।[১]

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালের পরিষ্কার সূর্যালোকে জাপানী বোমারু দলের দুঃসাহসিক আক্রমণের ফলে বৃটিশ নেভীর গৌরব এবং ভীমকায় যুদ্ধজাহাজ দুটি মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্রগর্ভে সমাধিলাভ করিল। মালয়ের অদূরবর্তী সমুদ্রে এই ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিল এবং এই অঞ্চলের নৌ-আত্মরক্ষার প্রাচীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সিপাই, লস্কর ও অফিসারসহ প্রিন্স অব ওয়েলস্ এবং রিপালস্ জাহাজ দুটিতে মোট প্রায় ৩ হাজার লোক ছিল। প্রধান নৌ-সেনাপতি স্যার টম ফিলিপস এবং ক্যাপ্টেন জে. সি. লীচসহ ৬ শতাধিক লোক সমুদ্রে প্রাণ হারাইলেন। বাকী দুই হাজার তিনশত জনকে উদ্ধার করা হইল।

বৃটিশ রয়েল নেভীর অতিকায় এই দুইটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ-জাহাজের এভাবে ডুবির খবরে মিত্রপক্ষীয় মহলে যতই দুর্ভাবনা, অসম্মান বোধ এবং আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়া থাকুক না কেন, সেদিন পরাধীন ভারতে কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে চাপা উল্লাসের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য মহাযুদ্ধের সেই অস্বাভাবিক দিনে সংবাদপত্রে বা প্রকাশ্যে এই উল্লাস প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় দাবী পূরণে অসম্মতির জন্য বৃটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে জনগণের স্বভাবতঃই তীব্র বিরোধিতা ছিল এবং সেজন্য জাপানের হাতে ইংরাজের মার খাওয়ার ফলে জনগণ যেন খানিকটা তৃপ্তি বোধ করিতেছিল!

বলা বাহুল্য যে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদে প্রায় বসিয়া পড়িলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তার মর্ম এই :

'১০ই ডিসেম্বর সকাল বেলা আমার বিছানার ধারের টেলিফোন বেজে উঠলো। নৌ-সচিবের কণ্ঠস্বর, কিন্তু কাশির জন্য কিছুটা অস্পষ্ট। তিনি বললেন—'প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, আমি আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, জাপানীরা প্রিন্স অব ওয়েলস্ এবং রিপালস্ ডুবিয়ে দিয়েছে...'

১। গ্রন্থকার প্রণীত 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী' থেকে উদ্ধৃত।

—'আপনি কি নিশ্চয় জানেন যে, এই খবর সত্যি ?'

'এই সংবাদ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নেই।'

'আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ যে, আমি একা ছিলুম। সারা যুদ্ধের মধ্যে আমি আর কখনও সরাসরি এত বড় আঘাত পাইনি। বিছানায় গড়িয়ে শুয়ে পড়ে এই সংবাদের পরিপূর্ণ ভয়াবহতা (full horror) আমি চিন্তা করতে লাগলুম। বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভু এবং আমরা কার্যত দুর্বল ও উলঙ্গ!'[১]

চার্চিলের এই বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের শক্তি সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরে যেন 'উলঙ্গ' হইয়া পড়িয়াছিল। পার্ল হারবার থেকে শুরু করিয়া জাপান একই সঙ্গে হংকং, গুয়াম, ওয়েক, ফিলিপিন্স, থাইল্যাণ্ড ও মালয়তে আক্রমণ চালাইল। ৯ই ডিসেম্বর গিলবার্ট দখল, ১০ই ডিসেম্বের দুইটি বিখ্যাত বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ খতম, ১১ই ডিসেম্বর গুয়াম দখল, ১২ই ডিসেম্বর ফিলিপিনের লুজোনে অবতরণ, ১৬ই ডিসেম্বর বোর্নিও দ্বীপের সারাওয়াকে অবতরণ, ১৮ই ডিসেম্বর হংকংয়ে অবতরণ, ২১শে ডিসেম্বর মিন্দানাওতে (ফিলিপিন্স) অবতরণ, ২২শে ডিসেম্বর ওয়েক দ্বীপ দখল, ২৩শে ডিসেম্বর রেঙ্গুনে বিমান আক্রমণ (ফলে কলিকাতা পর্যন্ত আতঙ্কের বিস্তার), ২৫শে ডিসেম্বর হংকংয়ের আত্মসমর্পণ এবং ২৬শে ডিসেম্বর ম্যানিলাকে খোলা শহররূপে ঘোষণা—পর পর এই সমস্ত বিষম উত্তেজনাপূর্ণ কাণ্ড ঘটিয়া গেল যেন বিদ্যুৎগতিতে এবং এভাবে ১৯৪১ সাল শেষ হইল।...

মালয় ও সিঙ্গাপুরের পতন

ম্যানিলা, হংকং ও সিঙ্গাপুর—এই ত্রিভুজের তিনটি বাহু ছিল দূরপ্রাচ্যের ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক শক্তির তিনটি কেন্দ্রবিন্দুর মত। কিন্তু দ্রুতগতিতে এগুলির পতন ঘটিল।

১৭ দিন অবরোধের পর বৃটিশ ঘাঁটি ও সুবিখ্যাত বন্দর হংকং ১০,৯৪৭ জন সৈন্যসহ জাপানের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। ফলে, মালয় উপদ্বীপ এবং পৃথিবী-বিখ্যাত বৃটিশ নৌ-ঘাঁটি ও দুর্গ সিঙ্গাপুরের অবস্থাও কাহিল হইয়া পড়িতে লাগিল। মালয়ে এবং সিঙ্গাপুরে উপনিবেশের ঐশ্বর্যে ও বিলাসে লালিত ইংরেজরা বেশ স্ফূর্তিতে ছিল—বিশেষভাবে রাত্রিগুলি কাটাইতেছিল। মদ ও আনুষঙ্গিক উপকরণের কোন অভাব ছিল না। আর প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের মিলনস্থলে সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রহরীরূপে দাঁড়াইয়াছিল প্রাচ্যের 'জিব্রাল্টার দুর্গের' মত দুর্ভেদ্য সিঙ্গাপুর। অতএব বৃটিশ সামরিক ও অসামরিক মহলে দুশ্চিন্তার, এমন কি বিশেষভাবে রণপ্রস্তুতিরও তাগিদ ছিল না। পৃথিবীর সেরা নৌ-দুর্গরূপে ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে সিঙ্গাপুর নৌ-দুর্গের নির্মাণ-কার্য শেষ হয়। প্রতিরক্ষার অস্ত্রসজ্জাসহ মোট খরচ পড়িয়াছিল ৬ কোটি পাউণ্ড (মেজর জেনারেল ফুলারের মত অনুসারে)। সিঙ্গাপুরের পোতাশ্রয়ে বৃহত্তম রণপোত আশ্রয় নিতে পারিত এবং এর উপকূলভাগে ১৫ ইঞ্চি ও ১৮ ইঞ্চি মুখের বৃহত্তম

১। Churchill—Vol. 3, P. 551.

কামানশ্রেণী সাজানো ছিল—প্রতিরক্ষার দিক থেকে। তৈলের ট্যাঙ্কগুলি অধিকাংশই ছিল মাটির তলায় এবং তটভূমির অধিকাংশ পাহাড় কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা ছিল।[১]

কিন্তু জাপানীরা চতুর, দক্ষ ও ধূর্ত ছিল। তারা সম্মুখভাগ দিয়া সিঙ্গাপুরের দিকে অগ্রসর হয় নাই—অথচ অস্ত্রসজ্জার মূল লক্ষ্য ছিল সম্মুখভাগ। তারা পিছনের দিক থেকে মালয়ের জঙ্গল দিয়া আগাইয়া আসিল—অত্যন্ত সন্তর্পণে ও সতর্কতার সঙ্গে।

'এই পিছনের দিকে প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কারণ, বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল যে, দক্ষিণ থাইল্যান্ড থেকে ১১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ এবং যে-পথ ভয়ঙ্কর জঙ্গলে সমাকীর্ণ, সেই পথ দিয়া কোন সৈন্যদলই অসহ্য উত্তাপ ও কষ্ট সহ্য করিয়া আগাইয়া আসিতে পারিবে না। সাধারণ বুদ্ধিতে তাঁরা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, এমন দুরধিগম্য হাঁটা-পথ দিয়া জাপানী সৈন্যদের থাইল্যান্ড থেকে সিঙ্গাপুরে পৌঁছিতে অন্ততঃ বছরখানেক সময় লাগিবে। আর সমুদ্রপথে সম্মুখভাগ দিয়া সিঙ্গাপুর জয় করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু চার্চিলের বিশ্বাস ছিল যে, সিঙ্গাপুরের পশ্চাৎভাগের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা প্রস্তুতই আছে। কিন্তু আসলে কোন ব্যবস্থাই ছিল না এবং চার্চিল এই কথাটা জানিতে পারিয়াছিলেন মাত্র ১৯শে জানুয়ারী (১৯৪২) তারিখ জেনারেল ওয়েভেলের কাছ থেকে প্রাপ্ত এক টেলিগ্রাম থেকে। একথা সত্যই অবিশ্বাস্য ছিল যে, সিঙ্গাপুরের বৃটিশ সেনানীদের মধ্যে কাহারও মাথায় এই প্রতিরক্ষার প্রশ্নটা আদৌ আসে নাই, এমন কি সেই সম্পর্কে তাঁরা কোন রিপোর্টও দেন নাই। এজন্যই জাপানী সৈন্যবাহিনীর পক্ষে এত অপ্রত্যাশিত সুবিধা ঘটিয়াছিল।'

—উপরের এই কথাগুলি বলিয়াছেন (সংক্ষেপে উদ্ধৃত) সিঙ্গাপুরের সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধের জাপানী পক্ষের অন্যতম সেনানী কর্নেল মাসানোবু তিসুজি, যিনি সামরিক পরিকল্পনার একজন নির্দেশক ছিলেন।

ব্রহ্মদেশের শেষ প্রান্ত বা দক্ষিণতম প্রান্ত থেকে মালয় উপদ্বীপ যেন দীর্ঘ পুচ্ছের মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এই পুচ্ছের সঙ্গে আবার যুক্ত হইয়াছে থাইল্যান্ড বা শ্যামদেশের সরু একফালি জমি। জাপানী সৈন্যবাহিনী জানুয়ারী মাসের প্রথম-ভাগে এখানে এবং মালয়ের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলভাগে অবতরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে পেনাং, সেলাংগড়, সিঙ্গোরা, কোটাবারু, কুয়াণ্টান ইত্যাদি দখল করিয়া একেবারে সিঙ্গাপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। মাত্র ৫৫ দিনের মধ্যে গোটা মালয় উপদ্বীপ জাপানীরা সাম্রাজ্যবাহিনীর হাত থেকে কাড়িয়া লইল। জাপানীরা মালয় আক্রমণে জঙ্গল যুদ্ধের এবং অনুপ্রবেশের যে কৌশল দেখাইতে লাগিল, তার তুলনা নাই। জঙ্গলের ভিতর দিয়া প্রায় নিঃশব্দে অনুপ্রবেশ বা Infiltration এবং পার্শ্বদেশ বেষ্টন বা Outflanking জাপানীদের এই রণকৌশল তখনকার দিনের পৃথিবীতে নূতন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল এবং মালয়রক্ষী সাম্রাজ্যবাহিনী কোথাও দাঁড়াইতে বা আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। এই রণদুর্মদ জাপানী সৈন্যরা অত্যন্ত সাহসী, চতুর,

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং কষ্টসহিষ্ণু ছিল। জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিবার সময় তাদের রেশন (বরাদ্দ খাদ্য) ছিল ভাজা বা শুকনো ভাত এবং এভাবে দিনের-পর-দিন তারা অরণ্য-অভিযানে অভ্যস্ত ছিল। কষ্ট সহ্য করার দিক থেকেও তাদের তুলনা ছিল না।

কিন্তু এই অভিনব জঙ্গল-যুদ্ধে বিভ্রান্ত, বিহ্বল এবং ক্লান্ত ও পরাজিত হইয়া সাম্রাজ্যবাহিনী একেবারে সরিয়া গেল দক্ষিণদিকে জহোর বারুতে, যেখানে শুরু হইয়াছে সিঙ্গাপুরের সীমানা। সেখানে ৩১শে জানুয়ারী মালয় যুদ্ধের অবসান ও সিঙ্গাপুরের সংগ্রাম শুরু হইল।

মালয়ের ঐশ্বর্য অপরিমিত। রবার, টিন, সোনা ও লোহার খনি, চাউল এবং কাঠ ইত্যাদির যে প্রলোভনে একদা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই উপদ্বীপ করায়ত্ত করিয়াছিল, ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে নূতন জাপানী সাম্রাজ্যবাদ সেটাকে যেন থাবা মারিয়া কাড়িয়া লইল! তারপর যে সিঙ্গাপুর দ্বীপ ও নৌ-দুর্গ প্রায় 'অজেয়' বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল, মাত্র ৭ দিনের যুদ্ধে সেই সিঙ্গাপুরকে "বিনাশর্তে
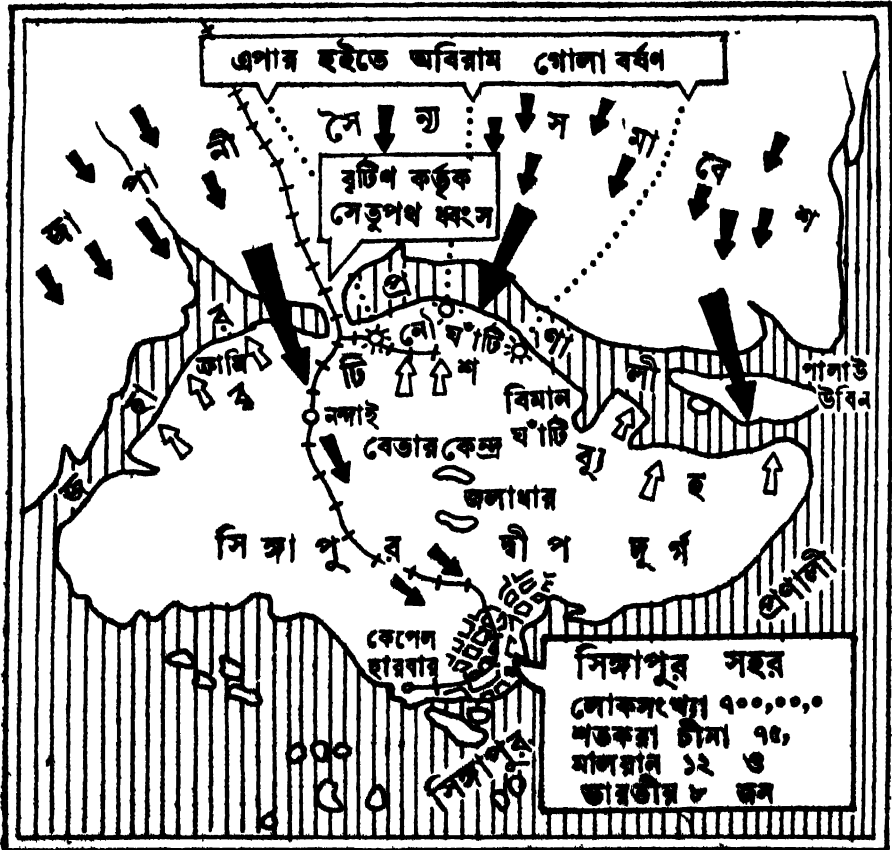
আত্মসমর্পণ' করিতে হইল জাপানী আক্রমণকারীদের নিকট! মালয়ী, চীনা ও ভারতীয়—প্রধানতঃ এই তিন জাতিগোষ্ঠীরাই ছিল এই উপদ্বীপের বাসিন্দা। মালয়ে এই জনসংখ্যা ছিল ৫৫ লক্ষ এবং সিঙ্গাপুরে ৭ লক্ষ। দৈর্ঘ্যে মালয় ছিল ৭০০ মাইল লম্বা, আর চওড়ায় ১৮০ মাইল এবং সিঙ্গাপুর ২৭ মাইল লম্বা ও প্রস্থে ১৪ মাইল। কিন্তু জাপানী আক্রমণকারীদিগকে বাধা দেওয়ার কোন সংকল্প বা ইচ্ছা

এই উপদ্বীপের জনগণের ছিল না। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের এটাই ছিল পরিণতি। অর্থাৎ ''প্রভু বদলের' এই খেলায় তারা যেন ছিল নিস্পৃহ দর্শক। কেবল মালয়ে নহে, গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই জাপানের সাম্রাজ্যবাদী অভিযানকে প্রতিরোধ করার তেমন কোন ইচ্ছা জনসাধারণের মধ্যে ছিল না। এমন কি যে সিঙ্গাপুর নৌ-ঘাঁটিতে ১২ হাজার শ্রমিক কাজ করিত, যুদ্ধ বাধিবার পর সেখানে ৮ শতের বেশী শ্রমিককে পাওয়া যায় নাই।*

অপরপক্ষে সাম্রাজ্যবাহিনীর মোট সৈন্যশক্তি জাপানীদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও উত্তর মালয়ের জঙ্গল থেকে সিঙ্গাপুরের সুরক্ষিত ঘাঁটি পর্যন্ত কোথাও তারা দাঁড়াইতে পারিল না। এমন কি, সিঙ্গাপুরে কোন প্রত্যাশিত অবরোধ-যুদ্ধও ঘটিল না—যদিও অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, অন্ততঃ ৬ মাস এই বিখ্যাত নৌ-ঘাঁটি আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। উত্তর বা পিছন দিক থেকে সিঙ্গাপুর দ্বীপের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ ঘটিল এবং ৮।৯ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিবেলা প্রবল গোলাবর্ষণের পর জহোর প্রণালী পার হইয়া জাপানীরা সিঙ্গাপুরের মর্মকেন্দ্রে আঘাত হানিল। পার্শ্ববর্তী ফরাসী ইন্দোচীনের ঘাঁটিগুলি আগেই জাপানীদের দখলে ছিল। সুতরাং মালয় ও সিঙ্গাপুর অভিযানে তারা প্রচুর বিমান-সহযোগিতা পাইল। কিন্তু বৃটিশ পক্ষের তেমন কোন বালাইও ছিল না। ফলে, সাম্রাজ্যবাহিনীর অবস্থা বিশেষভাবে কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল।

অপরদিকে সিঙ্গাপুর নৌ-ঘাঁটির প্রচণ্ড শক্তিশালী কামানসমূহ এবং প্রতিরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল সম্মুখের দিকে—যে খোলা সমুদ্র দিয়া জাপানীদের আক্রমণ প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু জাপানের চতুর রণনীতি বাছিয়া লইল বিপরীত পথ, পিছনের মালয়ের জঙ্গল-পথ দিয়া তাদের অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ ঘটিল। সুতরাং এই 'অজেয়' নৌ-দুর্গের অস্ত্রসজ্জা ও রক্ষাব্যবস্থা বাস্তব ক্ষেত্রে কোন কাজেই আসিল না। ফ্রান্সের বহু বিজ্ঞাপিত ম্যাজিনো লাইনের মত এক মর্মান্তিক প্রহসনে পরিণত হইল—(মেজর জেনারেল ফুলারের ইতিহাস, পৃঃ ১৩২)।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২, সিঙ্গাপুর নৌ-দুর্গের পতন ঘটিল এবং লেঃ জেনারেল এ. ই. পার্সিভ্যাল বৃটিশ, অস্ট্রেলিয়ান ও ভারতীয় সৈন্য নিয়ে গঠিত মোট ৮৫ হাজার সৈন্যবাহিনীসহ বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। (এই সৈন্যসংখ্যার মধ্যে ১৫ হাজার ছিল অ-লড়িয়ে)। সিঙ্গাপুরের গভর্নর স্যার সেণ্টন টমাসও সস্ত্রীক জাপানীদের হাতে বন্দী হইলেন।

বৃটিশ সরকারী মতে এই সমগ্র মালয় যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহিনীর মোট হতাহত হইয়াছিল ৮৭০৮ জন, কিন্তু বন্দী হইয়াছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার। সিঙ্গাপুর নৌ-দুর্গের এমন 'অপ্রত্যাশিত' ও দ্রুত পতনের ফলে জাপানী পক্ষের প্রধান সেনাপতি লেঃ জেনারেল ইয়ামাসিতা ও জাপানী সৈন্যবাহিনীর খ্যাতি যেন বিদ্যুৎগতিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। জাপানের সামরিক কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় সিঙ্গাপুর জয় হইল 'জাপানের ভাগ্য' এবং 'এশিয়ার নববিধানের' যুদ্ধ। এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য জোহোরের সুলতানের 'সবুজ প্রাসাদে' (যে অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদ অজস্র অর্থব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল) জেনারেল ইয়ামাসিতার সদর ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

* লেখক প্রণীত 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী' পৃঃ ১২৯।

সিঙ্গাপুরের পতন সংবাদে টোকিওর ইম্পিরীয়েল দপ্তর উল্লসিত হইয়া উঠিল এবং সম্রাটের অভিনন্দন বাণী তারযোগে আসিয়া পৌঁছিল। জেনারেল ইয়ামাসিতা আনন্দে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলিলেন—'তোমরা প্রায় একশ' দিন চমৎকার লড়াই করেছ। তোমাদের ধন্যবাদ। এখন তোমরা প্রাণভরে 'সাকে' (জাপানী মদ্য) পান করতে পারো!'

অতএব সদর দপ্তরে সিঙ্গাপুর জয়ের উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। সৈন্য ও অফিসারেরা দূর থেকে সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 'উত্তর-পূর্ব' দিকে মুখ করিয়া
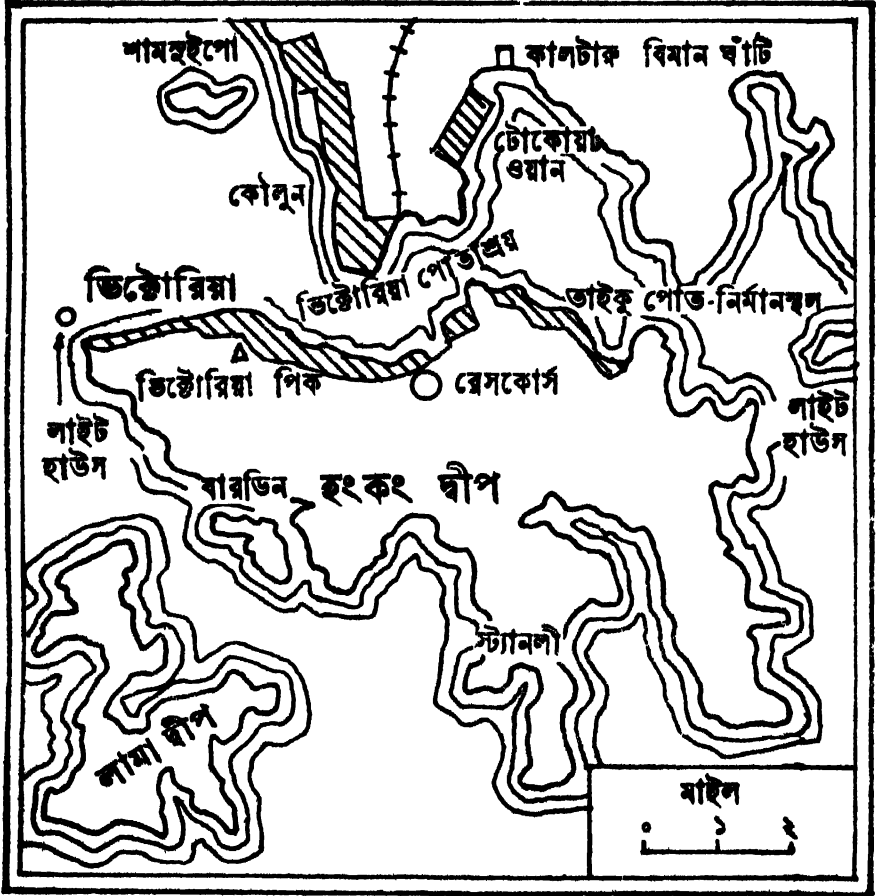
পানপাত্র ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিলেন। (অর্থাৎ টোকিওর দিকে সম্রাটের প্রাসাদের উদ্দেশ্যে) কিন্তু সেই মুহূর্তে আর্মি কমান্ডার আনন্দে ও আবেগে এত ভাবাপ্লুত হইলেন যে, তাঁর চোখের জল দুই গণ্ড বহিয়া মদের পাত্রে গড়াইয়া পড়িল!—এই বর্ণনা জাপানী সেনাপতি কর্নেল মাসানোবু তাসুজির বইতে।[১]

কিন্তু অপর দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্য ও মিত্রপক্ষীয় মহলে প্রায় আর্তনাদ ধ্বনিত হইল। কেননা, সিঙ্গাপুরের পতনের দ্বারা কার্যতঃ দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার-কিম্বা ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবেশদ্বার একেবারে খুলিয়া গেল। অর্ধ পৃথিবীর অধীশ্বররূপে বৃটেনের যে সাম্রাজ্য-গরিমা এতদিন সগৌরবে বিজ্ঞাপিত

১। Decisive Battle of the Second World War—edited by Peter Young, P. 133.

হইয়া আসিতেছিল, পর পর জাপানের প্রচণ্ড আঘাতের ফলে সেই ইম্পিরীয়েল মহিমা ও প্রেস্টিজ যেন ধূলোয় গুঁড়াইয়া গেল। ইংরাজদের লিখিত সামরিক ইতিহাসেও এই অপমানের কথা গোপন করা হইল না। সেই সময় বৃটিশ সামরিক সংবাদদাতাদের প্রেরিত বার্তায় এবং লেখকদের রচনায় সিঙ্গাপুরের পতনকে···

'···the most humiliating and impressive disaster which the British Empire had suffered for more than a century···'

বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল এবং বৃটিশ সৈনাপত্যের তীব্র নিন্দা করিয়া জাপানীদের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছিল—

'The five or six Japanese divisions had shown themselves first rate soldiers in attack disciplined, bold and resourceful and most ably led. They had used their advantages with rare skill, the co-ordination of their military effort by land, sea and air had produced the maximum effects (Hutchinson's Quarterly Record of the War, Vol. 10).[১]

সিঙ্গাপুরের পতনকে শীর্ষস্থানীয় বৃটিশ রণপণ্ডিত মেজর জেনারেল ফুলার তাঁর ইতিহাসে—

'The most disastrous campaign fought by Great Britain since Cornwallis's capitulation at York Town in 1781'—

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।*

ব্রিগেডিয়ার পিটার ইয়ং তাঁর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে মন্তব্য করিয়াছেন—

'In Britain's long military annals there is no more dismal chapter than the fall of Singapore. It is a sort of anthology of all that is worst in British military history'.[২]

আর বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার স্বয়ং উইনস্টোন চার্চিল তাঁর গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন যে সিঙ্গাপুরের পতন ছিল 'বৃটিশ ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক বিপর্যয় এবং বৃহত্তম আত্মসমর্পণের ঘটনা।'

সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে ১৭ই ফেব্রুয়ারী চার্চিল এক বেতার বক্তৃতা দিয়া বুঝাইতে চাহিলেন যে, জাপানীদের এই জয়লাভের মূল কারণ তাদের দীর্ঘকাল-ব্যাপী ব্যাপক যুদ্ধযাত্রার সামগ্রিক প্রস্তুতি। চার্চিলের মতে জাপানীরা অসাধারণ যোদ্ধা, জলে-স্থলে তাদের শক্তি অভূতপূর্ব, তারা নৃশংস, বেপরোয়া এবং এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। তিনি একটি তুলনা দিয়া বলিলেন যে, জাপানী সমরশক্তি যেন প্রশান্ত মহাসমুদ্রে ইঙ্গ-মার্কিন বাঁধ ভাঙ্গিয়া বন্যার মত সমস্ত কিছু ভাসাইয়া নিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কিম্বা পর্বতগাত্র থেকে স্খলিত ভয়ঙ্কর তুষারস্তূপের মত এই সমরশক্তি চারিদিকে ধ্বংসলীলা বিস্তার করিতেছে।

১। জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী, পৃঃ ১২৯, ১৯৪৩।

* উত্তর আমেরিকার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের সেনাপতিরূপে যুদ্ধ করিতে গিয়া কর্ণওয়ালিশ ইয়র্ক টাউনে যে পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, রণপণ্ডিত ফুলার সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ পরবর্তীকালে ভারতের গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। —লেখক

২। Decisive Battles of the Second World War—P. 97.

অতঃপর চার্চিল তীব্র ও তিক্তকণ্ঠে সকলকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলিলেন—

'No one must underrate any more the gravity and efficiency of the Japanese war machine. Whether in the air or upon the sea or man to man on land they have already proved themselves to be the most formidable, deadly and I am sorry to say, barbarous antagonists'.

জাপানীদিগকে 'বর্বর প্রতিদ্বন্দ্বী' বলিয়া গালাগালি দেওয়ার মধ্যে সাম্রাজ্যগবী চার্চিলের কণ্ঠে পরাজয়ের অপমানের জ্বালা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সন্দেহ নাই। তবু তিনি জ্বলন্ত ভাষায় আত্মবিশ্বাসের উপর জোর দিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়াসহ পৃথিবীর-তিন-চতুর্থাংশ মানুষ মিত্রপক্ষের দলে এবং 'সমগ্র মানব জাতির ভাগ্য আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে'—অতএব পরিণামে মিত্রপক্ষের জয় সুনিশ্চিত।[১]

* * *

ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের পতন

সিঙ্গাপুরের পতন ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চূড়ান্ত যুদ্ধগুলির (decisive battles) অন্যতম—অন্ততঃ এশিয়া বা প্রাচ্য খণ্ডে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের মানচিত্রের উপর চোখ বুলালেই বুঝা যাইবে সিঙ্গাপুর ছিল এই সমগ্র দ্বীপময় অঞ্চলের রণনৈতিক চাবিকাঠির মত। এই চাবিটি অতি দ্রুত জাপানীদের করায়ত্ত হইল এবং এই বিরাট এলাকার দুর্গদ্বার যেন সহজেই খুলিয়া গেল। বিশাল ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ ব্রহ্ম ও উত্তর ব্রহ্ম ইত্যাদি একে একে জাপানীদের হাতে আসিয়া গেল এবং জাপানী সমরশক্তি যেন ভারতবর্ষ অভিমুখে হাত বাড়াইল! সারা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সে কি উত্তেজনাপূর্ণ দিন! আজ সেকথা অবশ্য কল্পনা করাও কঠিন। এমন কি, সেই সমস্ত কাহিনীর সবিস্তার উল্লেখও সম্ভব নয়। এজন্য অত্যন্ত সংক্ষেপে মাত্র একটা রেখাচিত্র দেওয়া যাইতেছে:

'আজ যে দেশ ইন্দোনেশিয়া নামে সর্বত্র পরিচিত, আগে তার নাম ছিল ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ। অর্থাৎ পূর্ব ভারতীয় ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ—হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী ইউরোপের ক্ষুদ্র শক্তি হল্যান্ডের বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল সুদূর প্রাচ্যের এই দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করিয়া। ১৬০২ খৃস্টাব্দ থেকেই ওলন্দাজ বা ডাচদের দখলে আসিল জাভা, সুমাত্রা, সুন্দা, মালক্কা, সেলিবিস, বোর্নিও, নিউগিনি ইত্যাদি। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর আগে প্রাচীন ভারতের অর্ণবপোত এই মহাসমুদ্রে পৌঁছিয়াছিল এবং বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন আজও রহিয়াছে যবদ্বীপে, বালিদ্বীপে, যেমন রহিয়াছে শ্যাম দেশে ও কাম্বোডিয়ায়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয় দুঃসাহসিক শক্তিবর্গ পালখাটানো জাহাজে 'সাত সমুদ্র তের নদী' পার হইয়া এশিয়া মহাদেশের সর্বত্র যেন হানা দিল। অন্ততঃ সাড়ে-তিনশত বছর ধরিয়া ওলন্দাজ বণিক ও শাসকদের একাধিপত্য ছিল এই 'দ্বীপময় ভারতে'। এই বিশাল সম্পত্তির স্থলভাগের আয়তন ছিল ৭ লক্ষ ১৫ হাজার বর্গমাইল এবং অর্থনৈতিক সম্পদ ছিল অতুলনীয়। সোনা, লোহা, কয়লা, টিন, পেট্রোল, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি খনিজ সম্পদ, চা, চিনি, কফি, চাউল,

১। The Second Great War—Sir John Hammerton, Vol. 6, P. 2515.

তামাক ইত্যাদি উৎপন্ন দ্রব্য—কর্পূর, লবঙ্গ,এলাচ, দারুচিনি ইত্যাদি মশলা—সেগুন, লোহাকাঠ, ওক ইত্যাদি বৃক্ষ ও কাষ্ঠ সম্পদ এবং বিশাল অরণ্যের অসংখ্য জন্তু-জানোয়ারের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যে ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ যে কোন সাম্রাজ্যকামীর পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয় ছিল এবং একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অভিযানের পিছনে জাপানীদের অন্যতম মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক।

'এই ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল জাভার রাজধানী বাটাভিয়ায় এবং ইহার প্রধান নৌ-ঘাঁটি ছিল সুরাবায়া। ১৯৪১, ডিসেম্বর মাসে চার্চিল-রুজভেল্টের ওয়াশিংটন বৈঠকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের যে রণপরিকল্পনা স্থির হইয়াছিল, জেনারেল ওয়েভেল নিযুক্ত হইলেন উহার সর্বপ্রধান সেনাপতি এবং এই সেনাপতি তাঁহার শিবির স্থাপন করিলেন সুরাবায়া নৌ-ঘাঁটিতে। জাপানীরা প্রায় একযোগে আক্রমণ চালাইল বোর্নিও, জাভা, সুমাত্রা, টাইমুর, নিউগিনি ইত্যাদির উপর। তাদের আক্রমণ পরিকল্পনা যেন পাখার মত ছড়াইয়া পড়িল দ্বীপ হইতে উপদ্বীপে, দেশ হইতে দেশান্তরে, সমুদ্র হইতে প্রণালী পথে এবং প্রণালী হইতে তীর-ভূমিতে—জাহাজ ও এরোপ্লেন হইল প্রধান বাহন। ম্যানিলা হইতে সুরাবায়া, ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট হইতে মোর্স্বি,—এই বিশাল দ্বীপময় সামুদ্রিক দেশে জাপানী সমরশক্তি প্রথমতঃ আকাশ হইতে নামিয়া আসিল একটা প্রকাণ্ড ঝড়ের মত। তারপর সেই ঝড় রণতরী, সৈন্য এবং গোলাগুলির আশ্রয় করিয়া সমগ্র তীরভূমি ও স্থলভাগ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল অতি দ্রুত—বজ্র ও বিদ্যুতের মত ইহা ফাটিয়া পড়িল সমগ্র ওলন্দাজ সাম্রাজ্যে!'[১]

অবশ্য এই ওলন্দাজ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য লাখখানেক 'দেশীয় সৈন্য' ছিল, কিন্তু তাদের অস্ত্রসজ্জা ছিল সেকেলে, এবং ওলন্দাজদের নৌ-শক্তিও ছিল সামান্য। এই নৌ-শক্তির সঙ্গে বৃটিশ, অস্ট্রেলিয়ান ও মার্কিন নৌ-বহরের সামান্য কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ একত্র হইয়া বাধা দিতে চাহিল বটে এবং ম্যাকাসার প্রণালীর নৌ-যুদ্ধে (২৩-২৮ জানুয়ারী, ১৯৪২) কিছুটা সাফল্যও অর্জন করিল; কিন্তু ২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে তিন দিন ধরিয়া জাভা সাগরে যে নৌ-যুদ্ধ হইল, তাতে জাপানী নৌ-বহরের হাতে মিত্রপক্ষের সমগ্র নৌ-বহর (৫ খানা ক্রুজার, ৬ খানা ডেস্ট্রয়ার ও অন্যান্য পোত) একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। জাভা অভিযানে জাপানী নৌ-বহরে ছিল আনুমানিক ১৪টি ক্রুজার, ১১টি বিমানবাহী জাহাজ, ৫৫টি টর্পেডো পোত এবং ১৫টি সাবমেরিন। এই নৌ-বহর ৫০টি জাপ সৈন্যবাহী জাহাজকে চৌকি দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। জাভা সমুদ্রের এই 'বিখ্যাত নৌ-যুদ্ধে' মিত্রপক্ষ ঘায়েল হওয়ার পর ৯ই মার্চের মধ্যে ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ জাপানীদের অধিকারে গেল এবং ওলন্দাজ গভর্নর জেনারেল ডঃ ভ্যান মুক পলাইয়া অস্ট্রেলিয়ায় চলিয়া গেলেন।

অর্থাৎ নতুন সাম্রাজ্যবাদ পুরানো সাম্রাজ্যবাদকে গ্রাস করিল।

আর এদিকে পরাজিত জেনারেল ওয়েভেল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের 'এ বি ডি এ' নামে পরিচিত চতুঃশক্তির (আমেরিকান, বৃটিশ, ডাচ ও অস্ট্রেলিয়ান) রণাঙ্গনের সুপ্রীম কমাণ্ডারের দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন এবং প্রধান সেনাপতির নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন, ৩রা মার্চ, ১৯৪২।

১। জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী পৃঃ ১৩২-৩৩।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রহ্মদেশের পতন

প্রশান্ত থেকে ভারত মহাসাগরের দিকে

প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌ-শক্তির অন্যতম কেন্দ্র ছিল ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জ—যে দ্বীপপুঞ্জ ৭ হাজার ৮৩টি দ্বীপ নিয়া গঠিত। ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত এই দ্বীপপুঞ্জ স্পেনীয়দের দখলে। তারপর স্পানিশ-আমেরিকান যুদ্ধে স্পেনের পরাজয়ের পর সন্ধি-চুক্তি অনুসারে আমেরিকার দখলে চলিয়া যায়। কিন্তু ফিলিপিন্সকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, যদিও উহার সামরিক দিকটা সম্পূর্ণই ছিল আমেরিকার হাতে। কেননা, প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌ-আধিপত্য এবং বাণিজ্যিক আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। উত্তরে লুজন এবং দক্ষিণে মিণ্ডানাও—এই দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ এবং ম্যানিলা উপসাগরে ম্যানিলা ছিল 'দূর প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক পোতাশ্রয়'। ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জের উৎপত্তি মূলত আগ্নেয়গিরি থেকে। সুতরাং এখানে অনেক বড় বড় পাহাড়, অসংখ্য হ্রদ ও নদী আছে। সমতল ভুমি উর্বর ও শস্যশালী এবং খনিজ সম্পদও এখানে প্রচুর। এখানকার তামাক ও চুরুট প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ অর্থনৈতিক দিক থেকে ঔপনিবেশিক রাজত্ব কায়েম করার পক্ষে লাভজনক। আর প্রশান্ত মহাসাগরের নৌ-রণনীতির দিক থেকে ফিলিপিন্স যে গুরুত্বপূর্ণ সেকথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত জানা সত্বেও এবং 'জাপানী আগ্রাসী মনোভাব' নিয়া অনেক চেঁচামেচি করা সত্বেও প্রতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে জাপানীদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন মহলে একটা তাচ্ছিল্যের মনোভাব ছিল এবং জাপানীদের তারা 'পীত বানর' বলিয়া অবজ্ঞার চোখে দেখিত![১] বলা বাহুল্য যে, এর ফল হাতে হাতেই ফলিয়া গেল।

ফিলিপিন্সের পক্ষে হংকং ও গুয়াম ছিল দুই পার্শ্বদেশের ইঙ্গ-মার্কিন নৌ-ঘাঁটি। কিন্তু ১৩ই ও ২৫শে ডিসেম্বর এই দুই ঘাঁটির পতন হওয়ার পর ফিলিপিন্স বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং তখন একমাত্র নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তির উপর নির্ভর করা ছাড়া ফিলিপিনোদের আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু সেই শক্তি ছিল নিতান্তই সীমাবদ্ধ। জেনারেল ডগলাস ম্যাক-আর্থার যিনি প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে ও জাপানের আত্ম-সমর্পণের ঘটনায় পরবর্তীকালে প্রভুত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন (কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধে—১৯৫০-৫৩—তীব্র সমালোচনার পাত্র হইয়াছিলেন) তিনি ছিলেন ফিলিপিন্সের সামরিক বাহিনীর অধিকর্তা। তাঁর অধীনে মার্কিন সৈন্য ছিল ১৯ হাজার, ফিলিপিনো স্কাউট ১২ হাজার—এরা মোটামুটি দক্ষ সৈন্য ছিল বটে, কিন্তু আর যে প্রায় ১ লক্ষ

১। The pecond World War—J. F. C. Fuller, P. 153.

নতুন ফিলিপিনো সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাদের না ছিল উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, না ছিল পুরাপুরি কোন অস্ত্রসজ্জা। সুতরাং জাপানী বিমানবহর, নৌ-বহর ও সৈন্যদলের যুগপৎ আক্রমণের মুখে এরা টি'কিতে পারিল না। ডিসেম্বর মাসের শেষেই ম্যানিলা 'খোলা শহর' বলিয়া ঘোষিত হইল, কিন্তু তবু জাপানী বোমারুর ধ্বংসাত্মক আক্রমণ থেকে রেহাই পাইল না। ২৪ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে নির্মিত ক্যাভাইট নৌ-ঘাটিটি সঙ্গে সঙ্গে হাতছাড়া হইয়া গেল এবং ২রা জানুয়ারী, ১৯৪২, ম্যানিলা শহরের পতন ঘটিল।

কিন্তু ফিলিপিন্সের আসল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল বাতান উপদ্বীপে—যে উপদ্বীপ পাহাড়, অরণ্য, নদী ও সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। সুতরাং আত্মরক্ষার পক্ষে একেবারে আদর্শস্থানীয় ছিল। বিশেষত এই স্থানে উপসাগরের সংকীর্ণ প্রবেশপথে ছিল ডানদিকে কোরিজিডোর দুর্গ ও বামদিকে ক্যাভাইট নৌ-ঘাটি। এখানে তিন মাসের অধিককাল ধরিয়া জেনারেল ম্যাক-আর্থার শ্রেষ্ঠতর জাপানী শক্তির বিরুদ্ধে যে দীর্ঘ অবরোধ যুদ্ধ চালাইলেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে আর কোন সেনাপতি ও সৈন্যদল সেই কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ম্যাক-আর্থার পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিবার পর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁকে পুনরায় আহ্বান করেন এবং তিনি সানন্দে ফিলিপিন্স রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজধানী ম্যানিলা থেকে তিনি হটিয়া গিয়া কোরিজিডোর থেকে ৩০।৩৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত দুর্গম উপদ্বীপ বাতানে প্রধান ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, আর লেঃ জেনারেল ওয়েনরাইট কোরিজিডোর দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন। মনে রাখা দরকার—'ফিলিপাইন দ্বীপ অতি বিচিত্র আকৃতির। উহা যেন একটা লম্বা ফিতার মত। এই ফিতা কোথাও কোথাও ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া যেন বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহার ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য দ্বীপ, উপদ্বীপ, উপসাগর, খাঁড়ি, জলপথ ও প্রণালী। জাপানীরা বিমান আধিপত্য বিস্তার করিয়া উহার ফাঁকে ফাঁকে দ্বীপ ও উপদ্বীপে নৌ-বহরসহ ঢুকিয়া পড়ে এবং প্রচুর স্থলসৈন্য নামাইয়া ক্রমে ক্রমে উত্তরে লুজন দ্বীপ থেকে পশ্চিমাংশের মিন্দোরো এবং দক্ষিণাংশের মিণ্ডানাও দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়া নেয়।' জাপানীরা এই শেষোক্ত দ্বীপপুঞ্জে তাদের প্রধান ঘাঁটি তৈয়ার করিয়াছিল।...

বাতান উপদ্বীপে ফিলিপিনো-মার্কিন সৈন্যদল ও জাপানীদের মধ্যে সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ ধরিয়া তীব্র, তিক্ত এবং দুঃসাহসিক লড়াই অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু জাপানী আক্রমণে আতঙ্কিত হইয়া কয়েক হাজার নর-নারী আশ্রয়প্রার্থীরূপে বাতানের অল্প-পরিসর জায়গায় আসিয়া ভীড় করে। ফলে, খাদ্যদ্রব্য এবং ঔষধপত্রের অত্যন্ত টান পড়িয়া যায়। শেষ পর্যন্ত গোলাগুলিরও অভাব ঘটে। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও বাতান রক্ষীরা আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম চালাইতে থাকে। তাদের দুর্দশা চরমে পেঁীছিয়াছিল। এই সময় বাতানের 'শৃগাল গর্তে' সৈন্যদের মুখে মুখে একটা চমৎকার ছড়া চলতি হইয়াছিল, তার প্রথম দু' লাইন এই ঃ

"—We are the battling bastards of Battan,
No Mama, no Papa, no uncle Sam".

অর্থাৎ—

বাতানরক্ষী জঙ্গী মোরা বে-আইনী সন্তান।
(মোদের) মাও নেই, বাবাও নেই, নেইকো খুড়ো শ্যাম।

ছড়ার এই দুই লাইনের মধ্যেই বাতান রক্ষীদের মর্মান্তিক অবস্থা ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'শ্যাম খুড়ো' বা মার্কিন মুল্লুক থেকে কোন সাহায্য আসিল না এবং 'বাতানের মা-বাপশূন্য বে-আইনী সন্তানেরা' শৃগাল গর্তের পরিখার মধ্যে অর্ধভুক্ত অবস্থায় এবং জ্বর ও আশাময় ইত্যাদি ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তার আগে মালয় ও সিঙ্গাপুর বিজয়ী জেনারেল ইয়ামাসিতাকে এখানে জাপানী সৈন্যদের ভার নিতে হইয়াছিল এবং প্রবল গোলাবর্ষণের দ্বারা এই 'বিরক্তিকর দীর্ঘ অবরোধ' তিনি ভাঙিয়া ফেলিলেন। ১১ই এপ্রিল বাতান আত্মসমর্পণ করিল এবং ৬ই মে কোরিজিডোর দুর্গের পতন ঘটিল। জেনারেল ওয়েনরাইট সসৈন্যে বন্দী হইলেন। এভাবে ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল।

অবশ্য বাতানের পতনের আগেই ওয়াশিংটন থেকে সদর দপ্তরের নির্দেশে জেনারেল ম্যাক-আর্থার তাঁর স্ত্রীপুত্র ও স্টাফসহ গোপনে রাত্রিবেলা চারটি মোটর-টর্পেডো
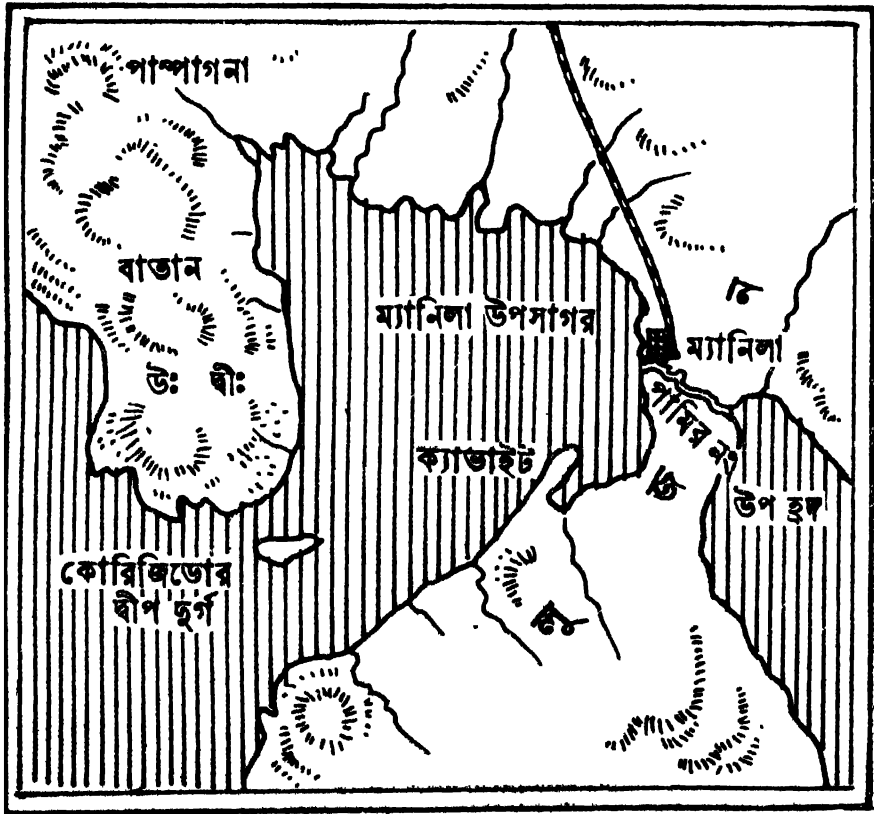
বোটযোগে প্রথমে সমুদ্রপথে বাতান ত্যাগ করেন এবং পরে বিমানযোগে অস্ট্রেলিয়ার ডারুইন বন্দরে পৌঁছিলেন। সেখানে তিনি অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের নূতন রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।...

জাপানীদের যুদ্ধযাত্রা ও সামরিক সংগঠন কিরূপ নিখুঁত ছিল, সেকথা বুঝাইতে

গিয়া জেনারেল ম্যার্ক-আর্থারের এডিকং কর্নেল ক্যারলোস্ পি. রমোলো তাঁর পুস্তকে ("I saw the fall of the Phillipines") লিখিয়াছেন যে, সর্বপ্রকার যুদ্ধাস্ত্র এবং উপকরণ তো বটেই, তাদের সঙ্গে অতিরিক্ত টুথব্রাশ ও মোজা পর্যন্ত ছিল। আর চিত্তবিনোদনের জন্য নার্সের ও সাহায্যকারিণীর নাম করিয়া ছিল যুবতী নারীর দল, যারা কার্যত ছিল গণিকা। মার্কিন ফিলিপিনো সৈন্যদের কাছে এই স্ত্রীলোকেরা অশ্লীল ভাষায় 'আঘাতসহ্যকারিণী' রূপে পরিচিতা ছিল! কিন্তু এই সমস্ত নারী সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও বাতানের গ্রাম্য অঞ্চলে জাপানী সৈন্যেরা মেয়েদের সন্ধান করিত এবং এভাবে অনেক মেয়ের উপর তারা পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে। এরলিন্দা নাম্নী একটি সুন্দরী তরুণী যিনি 'বিউটি কুইন' রূপে ঘোষিতা হইয়াছিলেন তাঁর স্বদেশের এক প্রতিযোগিতায়, তার উপর জাপানী সৈন্যেরা বহুবার বলাৎকার করিয়াছিল এবং তাঁর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ একটি 'শৃগাল গর্তে' পাওয়া গিয়াছিল।

নারীদের প্রতি এই অত্যাচারের অভিযোগ স্বয়ং বৃটিশ সরকার কর্তৃক উত্থাপিত হইয়াছিল কমন্স সভায় ১০ই মার্চ, ১৯৪২, বিখ্যাত বন্দর হংকংয়ের পতনের পর। অভিযোগে বলা হইয়াছিল যে, এশিয়াটিক এবং ইউরোপীয়ান উভয় দেশীয় নারীদের উপর জাপানীরা বলাৎকার করিয়াছিল এবং একটা গোটা চীনা পল্লীকে গণিকালয় বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। আর বন্দীদের উপর অত্যাচারের তো কোন কথাই নাই।[১]

* * *

ফিলিপাইনের সাম্প্রতিক ইতিহাসে জাপানীদের বিরুদ্ধে বাতানের অবরোধ যুদ্ধ এবং অতুলনীয় আত্মত্যাগ এক জাতীয় কাহিনীরূপে কীর্তিত হইয়াছে। এমন কি এই যুদ্ধের স্মৃতি হিসাবে প্রতি বছর 'বাতান দিবস' উদ্যাপিত হইয়া থাকে।

* * *

[এই গ্রন্থের লেখক ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে ম্যানিলাতে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়া এই 'বাতান দিবসের' উদ্যাপন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং ফিলিপিন্সে জাপানী আক্রমণের স্মৃতিচিহ্নগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন]

ব্রহ্মদেশের পতন

মালয় ও সিঙ্গাপুর দখলের পর জাপানীদের লক্ষ্য দাঁড়াইল রেঙ্গুন ও বর্মা রোড অধিকার করা। একদিকে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করিয়া রাখা এবং অন্যদিকে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক শক্তির পক্ষ থেকে বার্মা রোড ধরিয়া চীনে সরবরাহ প্রেরণের পথ বন্ধ করা—মুখ্যত জাপানীদের ছিল এই রণনৈতিক উদ্দেশ্য। কেননা, ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে চীনের যুদ্ধ ছিল জাপানের কাছে অতিরিক্ত মাথাব্যথার মত—যে নবপর্যায়ের যুদ্ধ ১৯৩৭ সাল থেকে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু মালয় ও সিঙ্গাপুরের পতনের পর জাপানীদের পক্ষে ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা আদৌ কঠিন ছিল না—যদিও এই গোটা অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগোলিক সংস্থান অতি বিচিত্র ছিল। মালয় ও দক্ষিণ-প্রান্তিক ব্রহ্ম বা টেনাসেরিম বিভাগ একই ভূভাগের সংলগ্ন। এমন কি অবিচ্ছিন্ন বলিয়া এই অংশের যুদ্ধ অনিবার্যরূপে মালয় সংগ্রামের

১। 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী'—হংকং এবং ফিলিপাইন অধ্যায়।

সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল। দীর্ঘ সুতার মত এই অরণ্যময় টেনাসেরিম বিভাগ মালয় উপদ্বীপের সঙ্গে সংযুক্ত এবং জাপানীদের হানাদারিও শুরু হইয়াছিল ডিসেম্বর মাস থেকেই। কিন্তু ব্রহ্মদেশের দিকে আসল অভিযান শুরু হইল ২১শে জানুয়ারী, ১৯৪২ থেকে এবং শেষ হইল মে মাসে। দক্ষিণ ব্রহ্ম ও শ্যামের সীমান্ত অঞ্চলে কাওয়াকারিক গিরিসংকট—বিখ্যাত বন্দর মৌলমেনের ৪৫ মাইল পূর্বে রণনীতির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য ছিল। কেননা এখান দিয়া ছিল শ্যাম থেকে নিম্ন ব্রহ্মে প্রবেশের পথ এবং জাপানীরা সহজেই এগুলি দখল করিয়া লইল। বিশেষত ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ড ছিল জাপানের কবলিত এবং শ্যামদেশীয় সৈন্যেরা জাপানের হইয়া যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। মৌলমেন থেকে দক্ষিণ ব্রহ্মের টেনাসেরিম বিভাগের ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট পর্যন্ত দীর্ঘ লম্বমান এলাকা, আর সেই সঙ্গে রেঙ্গুন ও বার্মা রোড—'এই সুদীর্ঘ ১ হাজার ৬ মাইল ফ্রণ্টে ছিল মাত্র দুই ডিভিসন দুর্বল বৃটিশ সৈন্য!'[১]

ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য এবং এদিকে লক্ষ্য করিয়াই রণপণ্ডিত জে. এফ. সি. ফুলার বলিয়েছেন যে, এই অবস্থায় জাপানীদের আসল সমস্যা 'ট্যাকটিক্স' বা রণকৌশলের ছিল না, ছিল 'লজিস্টিক্স' বা যোগাযোগ ও সরবরাহের, কিম্বা আরও সহজে বলা যায়—লড়াইয়ের নয়, রাস্তার! কেননা, যদিও একশত বছরের অধিককাল ধরিয়া ব্রহ্মদেশ বৃটিশ শাসনের অধীন ছিল, তবু ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত ধরিয়া কোন পাকা রণনৈতিক সড়ক তৈরী হয় নাই। এই সীমান্তে ছিল মাত্র ৩টি কাঁচা রাস্তা, পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া যেগুলি বর্ষাকালে দুরধিগম্য ছিল। আর খাস ব্রহ্মের অভ্যন্তরে মাত্র রেঙ্গুন-মিটকিয়ানা-লাসিও এবং রেঙ্গুন-প্রোম রেলপথ ছাড়া আর জলপথে প্রধান যোগাযোগ ছিল দক্ষিণ থেকে উত্তরে—প্রধানত ইরাবতী নদী দিয়া।

জনৈক আমেরিকান ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, তার মূলে ছিল একচেটিয়া বৃটিশ জাহাজী কোম্পানীগুলির বিরোধিতা।[২]

সম্ভবত এজন্যই কলিকাতা থেকে বঙ্গোপসাগরের জলপথে এই সমস্ত বৃটিশ জাহাজে রেঙ্গুনে যাতায়াত করা ছাড়া ভুমিপথের কোন উৎকৃষ্ট বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। অতএব কলিকাতা থেকে চীনের রাজধানী চুংকিংয়ে যুদ্ধের সরবরাহ পাঠাইতে গেলে কলিকাতা বন্দরে সেগুলি জাহাজ বোঝাই করিতে হইবে এবং এভাবে ৭৫০ মাইল সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়া সেগুলি রেঙ্গুনে পৌঁছিত। আবার রেঙ্গুন থেকে রেলপথে ৫০০ মাইল অতিক্রম করিয়া সেগুলি পৌঁছিত লাসিওতে (উত্তর ব্রহ্ম) এবং সেখান থেকে ৯০০ মাইল দীর্ঘ চীন-ব্রহ্ম সড়ক ধরিয়া চুংকিংয়ের দিকে। এজন্যই যুদ্ধের সময় বার্মা রোডের গুরুত্ব এত বাড়িয়া গিয়াছিল।

সড়ক ও যোগাযোগের এই অভিনব অবস্থাটা বৃটিশ ও জাপানী উভয়পক্ষের নিকটই একটা সমস্যার মত দেখা দিল বটে, কিন্তু বৃটিশ পক্ষের ছিল পশ্চাৎ অপসরণ, আর অপর পক্ষের ছিল অগ্রগমনের সমস্যা! এই সঙ্গে জাপানীদের ছিল আকাশপথে একাধিপত্য। সুতরাং ইংরাজপক্ষের অবস্থা একেবারে কাহিল ছিল।[৩]

১। The Second World War—J. F. C. Fuller, P. 145.

২। The War—Snyder, P. 282.

৩। J. F. C. Fuller—P. 145.

২১শে জানুয়ারী থাইল্যাণ্ড থেকে কারাওয়াক গিরিসংকট দিয়া বিজয়ী জাপানী সৈন্যেরা প্রবেশ এবং কয়েকদিনের মধ্যেই মৌলমেন বন্দর দখল করিয়া নিল। রেঙ্গুনের পর এটিই ছিল ব্রহ্মদেশের সেরা বন্দর এবং সেগুন কাঠের যে ঐশ্বর্যের জন্য বর্মাদেশ বিখ্যাত ছিল সেই সেগুন কাঠ সেলুইন নদী দিয়া ভাসাইয়া মৌলমেনে আনা হইত বিভিন্ন স্থানে পাঠাইবার জন্য। মৌলমেনের পতনের ফলে রেঙ্গুনে পৌঁছিবার দুয়ারও খুলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে আর-একটি জাপানী বাহিনী শান্ রাজ্য অঞ্চল থেকে উত্তর ব্রহ্মের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইল এবং রেঙ্গুনের দিকে চাপ সৃষ্টি করিল। আর উত্তরে যেখানে বার্মা শেষ হইয়াছে, সেই চীন-ব্রহ্ম সড়কের লাসিও বিপন্ন করিয়া তুলিল। আত্মরক্ষাকারী বৃটিশ বাহিনী কোথাও যেন দাঁড়াইতে পারিল না এবং তারা একে একে ব্রহ্মের বিখ্যাত নদীগুলি—সালুইন, বিলিন ও সিতাংয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সেগুলি পিছনে ফেলিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইল। (চার্চিল বলিয়াছেন যে, সিতাং নদীর যুদ্ধে বিপর্যয়ই বার্মার ভাগ্য চূড়ান্তরূপে নির্ণয় করিয়াছিল।—চার্চিলের মহাযুদ্ধের ইতিহাস চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭) জাপানীরা কেবল জঙ্গল যুদ্ধেই কৃতিত্ব দেখাইল না, খরস্রোতা চওড়া নদীগুলি পার হওয়ারও কৃতিত্ব দেখাইল। এভাবে রেঙ্গুন যখন উত্তর দিক থেকে বিপদে পড়িল, তখন জাপানীদের আর-এক বাহু মার্তাবান উপসাগর পার হইয়া রেঙ্গুন শহরকে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে আঘাত হানার জন্য উদ্যত হইল। এই অবস্থায় ৭ই মার্চ, ১৯৪২, রেঙ্গুন পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত হয়। অথচ ব্রহ্মের বৃটিশ গভর্নর স্যার রেজিনাল্ড ডরম্যান-স্মিথ এর আগে বড়াই করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তোবুকের (আফ্রিকা) মত রেঙ্গুনেও দীর্ঘ অবরোধ যুদ্ধ হইবে এবং রেঙ্গুন রক্ষায় শেষ সৈন্যদল প্রাণ দিবে!*

কিন্তু কার্যত এই সমস্ত কিছুই ঘটে নাই। লেঃ জেনারেল টি. জে. হাটন ২৮শে ডিসেম্বর থেকে ব্রহ্ম রণাঙ্গনের যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিলেন। কিন্তু ক্রমাগত পরাজিত ও পিছু হটার ফলে (সেই সময় 'withdrawal' শব্দটি সামরিক ইস্তাহারে ক্রমাগত উল্লিখিত হইতে থাকায়, এই শব্দটি ভারতীয় পাঠকদের নিকট প্রচুর বিদ্রূপ উদ্রেক করিয়াছিল) মেজর জেনারেল স্যার হ্যারল্ড আলেকজাণ্ডার তাঁর কাছ থেকে সৈন্যাপত্যের ভার নিলেন প্রধানত সৈন্যদলকে ব্রহ্মদেশ থেকে সরাইয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে।

এর পর শুরু হইল দুই মাস ধরিয়া যেন উভয় পক্ষের সৈন্যদলের মধ্যে বিষম এক লুকোচুরি খেলা। অর্থাৎ 'পলায়মান' বৃটিশ-ভারতীয় সৈন্যদিগকে 'অগ্রসরমান' জাপানী সৈন্যরা বার বার 'ধরিতে' চাহিল এবং বার বার ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যরা ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। জাপানী সৈন্যেরা ইরাবতী, সিতাং ও সালুইন নদীর তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং মিত্রপক্ষের সৈন্যদিগকে ভারত, চীন এবং হিমালয়ের পাদদেশের দিকে যেন তাড়াইয়া দিতে লাগিল। দুই ডিভিসন বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্য কোন মতে প্রাণ হাতে করিয়া ভয়ংকর পাহাড় জঙ্গলের দুর্গম পথ ধরিয়া এবং আশ্রয়প্রার্থীদের ভিড়ের মধ্য দিয়া আসাম সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিল। এই সমস্ত

* গ্রন্থকার সেই সময় 'যুগান্তর' পত্রিকায় ব্রহ্মের ইংরাজ লাটের এই ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী'।—পৃষ্ঠা ২০২।

বাহিনী একমাত্র সংখ্যা শক্তি ছাড়া জাপানীদের সঙ্গে অন্য কোন দিক দিয়াই তুলনীয় ছিল না।

ইতিমধ্যে চীন থেকে জেনারেল চিয়াং কাইশেক যে দুইটি চীনা বাহিনী (৫নং ও ৬নং আর্মি) ব্রহ্মদেশ রক্ষার জন্য উত্তরবর্তী অঞ্চলে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁদের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়করূপে আসিলেন লেঃ জেনারেল জোসেফ ডব্লিউ. স্টিলওয়েল। (তিনি কিছুদিনের জন্য চীন-ব্রহ্ম-ভারত রণাঙ্গনের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি ছিলেন।) কিন্তু এই চীনা সৈন্যেরাও কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বরং জেনারেল স্টিলওয়েল দক্ষিণ ব্রহ্মে আটকা পড়িলেন। কেননা, থাইল্যান্ড থেকে আগত জাপানীরা ইতিমধ্যে বর্মা রোড বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং স্টিলওয়েলের এখন সমস্যা দাঁড়াইল কিভাবে জাপানীদের পার্শ্ববেষ্টনীর হাত কাটাইয়া দ্রুত উত্তর দিক দিয়া উদ্ধার পাওয়া যায়।[১]

১৯৪২-এর মে মাসে এভাবেই শুরু হইল জেনারেল স্টিলওয়েলের সেই ঐতিহাসিক পশ্চাদপসরণ, যে ঘটনাকে মার্কিন পুস্তকে 'পলায়নের মহাকাব্য' রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কেননা, পাহাড়, জঙ্গল, পার্বত্য নদী এবং ভয়ংকর বিষধর সর্প ও জন্তু জানোয়ার ভর্তি এই ভয়াবহ দুর্গম স্থান অতিক্রম করা এক দুঃসাধ্য অভিযানের মত ছিল। মার্কিন ঐতিহাসিক বলিতেছেন—

'It was one of the most bitter retreats of modern times'.

অনেক সৈন্য এই 'লং মার্চে' প্রাণ হারাইল এবং বাকিরাও খুব বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

জেনারেল আলেকজান্ডারের অধীন ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যদলেরও অনুরূপ দশাই হইল এবং তারাও জাপানী বোমা ও মেসিনগানের মুখে কোন মতে চিন্দুইন নদী পার হইয়া আসাম সীমান্তে পৌঁছিল। মধ্যব্রহ্ম থেকে এভাবে একাদিক্রমে তাদের ৬০০ মাইল অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। আর জেনারেল স্টিলওয়েলের সৈন্যেরাও চিন্দুইন নদী দেশী নৌকায় পার হইয়া ২০শে মে তারিখ ইম্ফলে পৌঁছিল। এই উভয় বাহিনীর সৈন্যেরাই জাপানীদের হাতে প্রচণ্ড মার খাইয়াছিল এবং যেভাবে পলাইয়া আসিল, তার কোন তুলনা নাই। মার্কিন সেনাপতি স্টিলওয়েল দুরধিগম্য ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যখন ইম্ফলে আসিয়া 'জঙ্গলের ভিতর থেকে' নির্গত হইলেন, তখন তাঁর মুখ দিয়া এই মর্মান্তিক বাক্যটি বাহির হইয়া আসিল:

'The Japs ran us out of Burma. We took a hell of beating.'

অর্থাৎ জাপানীরা বর্মা মুল্লুক থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা কী যে প্রচণ্ড মার খেয়েছি![২]

একজন সেনাপতির মুখে এই কাতরোক্তি! এই থেকেই বুঝা যাইবে বর্মা যুদ্ধে বৃটিশ-ভারতীয়-চীনা বাহিনী কিরূপ চরম দুর্দশার মধ্যে পড়িয়াছিল।...

১৯৪২-এর মে মাসের মাঝামাঝির মধ্যেই ব্রহ্মের অধিকাংশ জাপানীদের করতলগত হইল। তবে, বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর তিন-চতুর্থাংশ পলাইয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু সামরিক সম্ভার ও ভারী অস্ত্রাদি সমস্তই পিছনে ফেলিয়া আসিতে

১। The War—Snyder, P. 283.

২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৮৩।

হইল। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা ৮০০ মাইল দীর্ঘ বিখ্যাত বর্মা রোড বিচ্ছিন্ন ও বন্ধ হইয়া গেল। ফলে, চিয়াং কাইশেকের নিকট চীনে সামরিক সরবরাহ পাঠানো এক সংকটজনক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। তখন এক অভাবনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল।
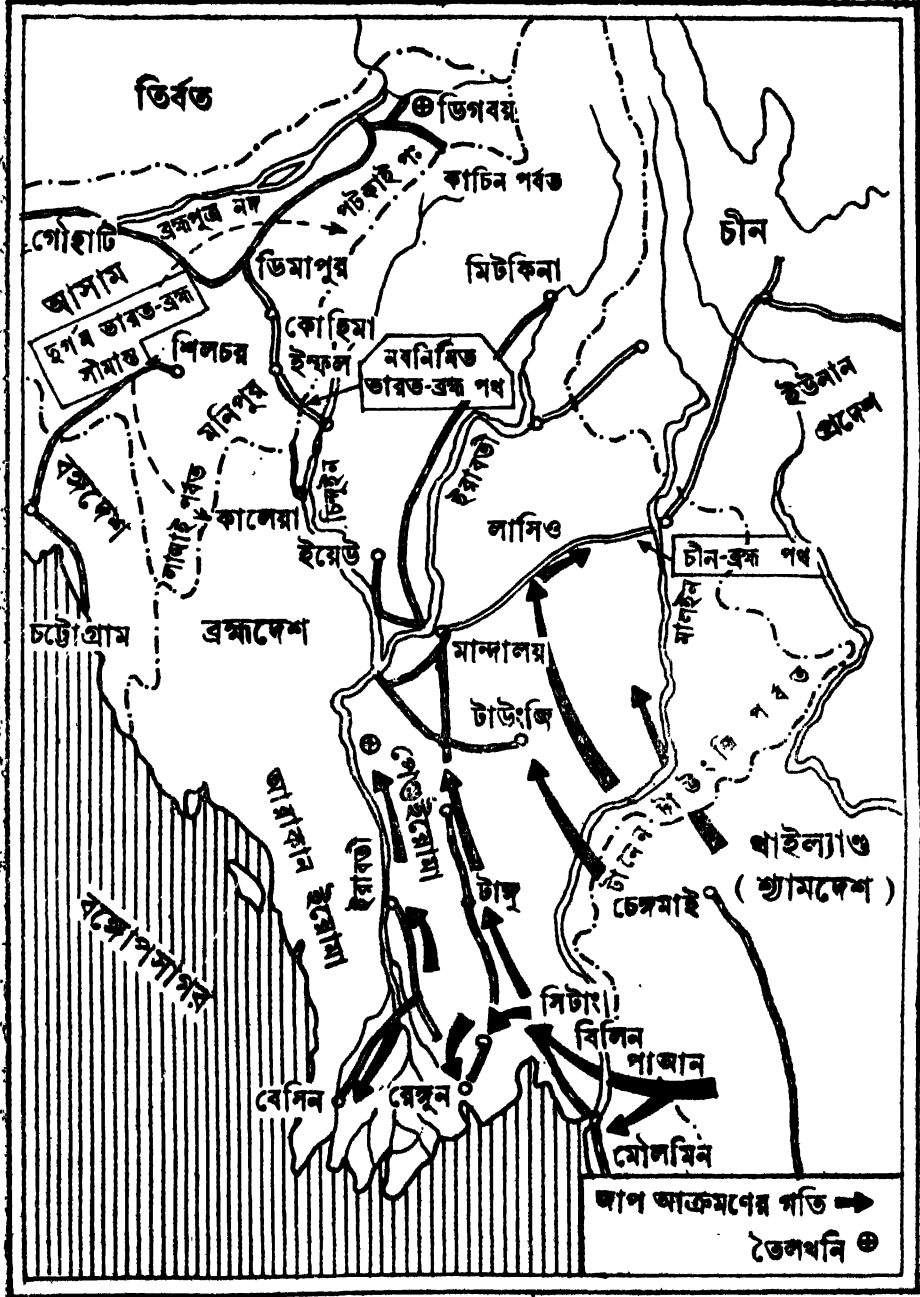
গগনচুম্বি হিমালয়ের উপর দিয়া ভারত থেকে চীনে বিমানযোগে সরবরাহ দেওয়ার দুঃসাহসিক উড্ডয়ন শুরু হইল। মার্কিন বৈমানিকেরা ট্রান্সপোর্ট প্লেনযোগে এই বিপজ্জনক 'হিমালয়ের কুঁজের' উপর দিয়া ৫ ঘণ্টাব্যাপী উড়িয়া গিয়া কুনমিংয়ে

পৌঁছিতেন। এই অভিযানে ২৪ হাজার ফুট পর্যন্ত উচ্চ হিমালয় চূড়া পার হইতে হইত এবং কুনমিং থেকে সরবরাহগুলি ভূমিপথে চুংকিং-এ পাঠানো হইত। এভাবে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মাত্র ৩২০০ টন সরবরাহ দিতে পারা গিয়াছিল, যেগুলি তখনকার দিনের জরুরী সামরিক প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই ছিল।[১]

ব্রহ্মযুদ্ধ ও রেঙ্গুনের পতনের প্রতিক্রিয়া

ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষার পক্ষে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ভারত ও ব্রহ্ম একই রণনৈতিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কাঠামোর বিচারে উভয়ে ছিল যমজ ভাইয়ের মত। অধিকন্তু উনবিংশ শতক থেকে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী ও বাঙালী সেখানে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হইবার পর জীবিকার প্রয়োজনে বনবাস করিতেছিল। তাদের মধ্যে ছিল নানাপ্রকার ব্যবসায়ী, বৃত্তিধারী-উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক ও চাকুরিজীবী প্রভৃতি। অপারাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ব্রহ্মের প্রবাস জীবনের স্মৃতি যেন অবিচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে কেবল ভারত কিম্বা দক্ষিণ ভারতের বণিক ও শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়ের নয়, সাহিত্যিক ও চাকুরিজীবিদের সম্পর্কও যেন নিবিড়ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। আর বৃটিশ সাম্রাজ্যের গরিমার জন্য ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের মনে বৃটিশ সিংহের দাপট ও ও শক্তির প্রতি যেন পরোক্ষেই একটা ভয়মিশ্রিত ভক্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই ব্রহ্মদেশে দুর্ধর্ষ জাপানী বাহিনীর একটি আঘাতেই ছিন্নমূল বৃক্ষের মত একেবারে মাটিতে পড়িয়া গেল। এই ঘটনায় ভারতীয় চিত্তে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল—যদিও এই প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছিল জাপানী যুদ্ধের আরম্ভের পর হইতেই।

রেঙ্গুন তথা ব্রহ্মদেশের পতন সেই সময়কার ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর ছিল বলিয়া তখনকার দিনের লেখা 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী' থেকে কিছু কিছু সংশ্লিষ্ট অংশ এখানে তুলিয়া দেওয়া গেল। বিশেষত সেই অংশের উপর জোর দেওয়া গেল, যেখানে মিত্র বাহিনী ব্রহ্ম থেকে চিন্দুইন নদীপথ ধরিয়া পলায়মান ছিল। কেননা এই পরিত্রাণ ছিল এক স্মরণীয় ঘটনা :

'জাপানীরা পেগুর সন্নিকটে আসিয়া পড়ায় এবং রেঙ্গুন জলে, স্থলে ও আকাশ-পথে একান্তরূপে বিপন্ন হওয়ায় ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনীকে রেঙ্গুন হইতে সরাইয়া নেওয়া হয়। নয়াদিল্লী হইতে ৯ই মার্চ (১৯৪২) ঘোষণা করা হইল যে, দুইদিন আগে রেঙ্গুনের কলকারখানা, ডক ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া দিয়া রেঙ্গুন পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশের গভর্নর বেতারযোগে এক বক্তৃতা দেন। রেঙ্গুনে ধ্বংসকার্য সমাপ্ত করিবার আগে পর্যন্ত অ-সামরিক কর্মচারী, লোকজন ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরাইয়া ফেলা হয়। রেঙ্গুনের প্রথম দিনের বিমানহানায় যে অভূতপূর্ব ক্ষতি হইয়াছিল, বিমান আক্রমণের ইতিহাসে তাহা অভিনব। (এই প্রথম বিমান আক্রমণ ঘটিয়াছিল ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪১)। সরকারী মতে দুইবার প্রচণ্ড বিমানহানায় রেঙ্গুনে ১১০২ জন নিহত ও ১৬৫০ জন আহত হইয়াছিল। কিন্তু বেসরকারী মতে রেঙ্গুনে হতাহতে সংখ্যা ৫ হাজারের কম নহে। এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত সংবাদ ব্রহ্মদেশ ছাড়াইয়া কলিকাতা এবং ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৮৪।

লক্ষ লক্ষ লোক পাগলের মত ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়া জলপথে ও স্থলপথে (স্থলপথেই বেশীর ভাগ) আসাম চট্টগ্রাম ও কলিকাতায় আসে। ব্রহ্ম প্রত্যাগত ও অবর্ণনীয়রূপে দুর্দশাগ্রস্ত নরনারী ব্রহ্মদেশ ও রেঙ্গুন সম্পর্কে নানা সত্যমিথ্যা আজগুবী গুজব প্রচার করিতে থাকে। এই হিড়িকে কলিকাতা হইতেও কয়েক লক্ষ লোক গ্রাম্য অঞ্চলে সরিয়া পড়ে।'—(পৃষ্ঠা ২১৫)।

'…প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর—এই তিনদিক বেষ্টিত হওয়ায় জেনারেল আলেকজাণ্ডারের সৈন্যেরা বিনাযুদ্ধে রেঙ্গুন ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইতিপূর্বে গভর্নরের ঘোষণা অনুযায়ী রেঙ্গুনে কোন দীর্ঘস্থায়ী অবরোধ যুদ্ধ হওয়া দূরের কথা, খণ্ডযুদ্ধও অনুষ্ঠিত হয় নাই। তাড়াতাড়ি লোকাপসারণ ও ধ্বংসকার্য সাধন করিয়া রেঙ্গুন হইতে সরিয়া পড়া হয়। রেঙ্গুনের ৬ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে শেষ পর্যন্ত মাত্র সামান্য কয়েক হাজারে দাঁড়াইয়াছিল। ইহার সঙ্গে পোড়ামাটির নীতি অনুসৃত হওয়ায় রেঙ্গুন শ্মশানভুমিতে পরিণত হয়।

'একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলিতেছেন যে, পোড়ামাটির নীতি অনুসরণের জন্য রেঙ্গুনে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ৪০ মাইল দূর থেকে অগ্নিশিখা দেখা গিয়াছিল। সমগ্র শহরে প্রচণ্ডভাবে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। দৃশ্যটা যেন ডানকার্কেরই মত। ডক, গুদাম, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি অসামরিক জিনিসগুলি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। কর্ণপটাহভেদী বিস্ফোরণের পর আগুন জ্বলিয়া উঠে। অ-সামরিক দ্রব্যগুলি বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সিরিয়ামের বিরাট তৈল শোধনাগার ধ্বংসকার্যে এমন একজন লোককে নিয়োগ করা হইয়াছিল, যিনি গত বৎসর রাশিয়ানদের ধ্বংসকার্য দেখিয়া আসিয়াছিলেন। ৩০০ মাইল উত্তরে তৈলকূপ হইতে যে বিরাট নলের দ্বারা সিরিয়ামে তৈল আনা হইত, তাহাও কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

'৭ই মার্চ রেঙ্গুন সরকারীভাবে পরিত্যক্ত হয়। আর ৮ই মার্চ সকালে জাপানীরা রেঙ্গুনে প্রবেশ করে। রেঙ্গুনের পতনের দ্বারা ব্রহ্ম যুদ্ধের প্রাণকেন্দ্র নষ্ট হইয়া গেল এবং চীন-ব্রহ্মের সংযোগও বিনষ্ট হইতে বসিল। শত্রু ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।'—(পৃষ্ঠা ২১৭-১৮)

ভারত ও ব্রহ্মদেশের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়েভেল নয়াদিল্লী থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে স্বীকার করেন—'অপ্রত্যাশিত দ্রুততার সহিত জাপানীরা অগ্রসর হয় এবং আমাদের নূতন রণসম্ভার পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইয়া যায়। মালয়, সিঙ্গাপুর বা ব্রহ্মদেশ—গোটা সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। এই স্থানে প্রস্তুত থাকিতে হইলে বিপন্ন মধ্যপ্রাচ্য ও বৃটেন হইতে সৈন্য আনিতে কিম্বা রাশিয়াকে সাহায্য প্রেরণ বন্ধ রাখিতে হইত।…

'মালয়ে শত্রুপক্ষ আকাশে ও সাগরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। মালয় রক্ষাকল্পে যে সমস্ত সৈন্য নিয়োগ করিতে হইয়াছিল, তাহারা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ছিল না, ঘন জঙ্গলে যুদ্ধ চালাইবার উপযোগী ট্রেনিংও ছিল না। রেঙ্গুনে ও দক্ষিণ ব্রহ্মের হস্তচ্যুতি কোন কোন বিষয়ে সিঙ্গাপুরের চেয়েও গুরুতর ক্ষতিজনক, সন্দেহ নাই।'—(পৃষ্ঠা ২১৯)

'ব্রহ্ম রণাঙ্গনের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে প্রথমেই চোখে পড়িবে নদীগুলি। সালুইন, চিন্দুইন, সিতাং ও ইরাবতী—প্রধানত এই নদীগুলিই ব্রহ্মদেশ

খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। এই নদীগুলির তীর ধরিয়া মিত্রশক্তি বাহিনী জাপানীদিগকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে এবং একটি নদী তীর হইতে হটিবার পর তাহারা আর একটি নদীতীরে গিয়া ব্যূহ রচনা করিয়াছে। কিন্তু জাপানীরা শক্তির প্রাচুর্যে এবং আধুনিক রণকৌশলের 'ইনফিলট্রেশন' বা অনুপ্রবেশ নীতির দ্বারা প্রতিপক্ষের ব্যূহগুলিকে বিদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। অধিকাংশ বড় নদীগুলি (ইরাবতী ১৩০০ মাইল দীর্ঘ) ব্রহ্মদেশের উত্তর-দক্ষিণ ভেদ করিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। কেবল যে নদীগুলিই উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি চলিয়া গিয়াছে এমন নহে। যে কয়টি বড় রাস্তা ও রেলপথ রহিয়াছে, সেগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদীসমূহের সহিত যেন সমান্তরাল রেখায় উত্তর-দক্ষিণ অতিক্রম করিয়াছে। রণাঙ্গনগুলির দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থ সামান্য ছিল। আত্মরক্ষার পক্ষে ইহা বিঘ্নজনক ছিল।...

'এভাবে ব্রহ্ম রণক্ষেত্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে। ইংরাজ সেনাপতি জেনারেল আলেকজাণ্ডার ও মার্কিন সেনাপতি জেনারেল স্টিলওয়েল—দুই রণক্ষেত্রের অধিনায়ক। মার্কিন সেনাপতির অধীনে রহিয়াছে চীনা সৈন্যদল।[১]

'সিতাংয়ের পর পেগু ও রেঙ্গুন ছাড়িয়া জেনারেল আলেকজাণ্ডার শেষ পর্যন্ত প্রোম ত্যাগ করিয়া একেবারে ইরাবতীর তীর ধরিয়া উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছেন। অপর পক্ষে মার্কিন সেনাপতি চীনা সৈন্যদলসহ ছিলেন সিতাং নদীর ধারে। তিনি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন। রেঙ্গুন-মান্দালয় রেলপথ ইহারই সমান্তরাল রেখায় চলিয়া গিয়াছে। এখানে চীনা সৈন্যেরা টাঙ্গু শহরে যথেষ্ট বাধা দেওয়া সত্ত্বেও আরও উত্তরে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, আলেকজাণ্ডার ও স্টিলওয়েল—এই দুই সেনাপতি মোটামুটি ইরাবতী ও সিতাং এই দুইদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারা পরস্পর হইতে ৬০ মাইল ব্যবধানে আছেন এবং এই ৬০ মাইলের মধ্যে পাহাড় ও জঙ্গল রহিয়াছে অনেক। কিন্তু জাপানীরাও সিতাং ও ইরাবতীর উপত্যকা ধরিয়া ক্রমশ উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া মিত্রশক্তির দুই বাহিনীকে নষ্ট করিতে চাহিবে।'—(পৃষ্ঠা ২৩৭-৩৮)

'...রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে জেনারেল আলেকজাণ্ডার ও স্টিলওয়েলের সৈন্যেরা পাহাড়ে, জঙ্গলে ও সংকীর্ণ রাস্তার ধারে ধারে জাপানীদের দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার বিপদে পড়িয়াছিল। অপরপক্ষে বর্মীদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। বৃটিশ বাহিনীকে সাহায্য করা দূরের কথা, উপরন্তু 'স্বাধীন বর্মী সৈন্যদল' গঠন করিয়া জাপানীদের সহিত সহযোগিতা ও সাম্রাজ্যবাহিনীর সহিত শত্রুতা করিয়াছে।—(পৃষ্ঠা ২৪৭)

'...এদিকে চীনা সৈন্যেরা মাউংজিতে এবং বৃটিশ সৈন্যেরা ইরাবতীর রণক্ষেত্রে ঘোরতর বিপদে পড়িত। উভয় সৈন্যদলই বেষ্টিত ও বিচ্ছিন্ন হইবার জো হইল। সালুইনের পূর্বতীরে ছত্রভঙ্গ ৬নং চীনা আর্মির দলগুলি কোনওক্রমে টাউঞ্জিং হইতে

১। মেজর জেনারেল ফুলার তাঁর মহাযুদ্ধের ইতিহাসে (পৃষ্ঠা ১৪৭) বলিয়াছেন যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ চীনা আর্মির প্রত্যেকটি মাত্র ২ থেকে ৩ হাজার সৈন্যের তিন ডিভিসন নিয়া গঠিত ছিল। তারা ছিল চীনা সেনাপতি জেনারেল লো চো-ইং-এর অধীনে এবং স্টিলওয়েল ছিলেন তাঁর সামরিক পরামর্শদাতা। লো চো-ইং আবার চিয়াং কাইশেকের চূড়ান্ত নির্দেশের অধীন ছিলেন। কিন্তু এর ফলাফল ভাল হয় নাই।

উত্তর দিকে সরিয়া পড়িল এবং ৬ই মে (১৯৪২) তারিখে মেমিওতে পেঁাছিল। সেখানে জাপানীদের সহিত কিছুকাল সংঘর্ষের পর শেষ পর্যন্ত তাহারা য়ুথানের দিকে চলিয়া গেল। সিতাং উপত্যকার ৫নং চীনা আর্মিও অনুরূপ বিপদে পড়িয়া উত্তর দিকে পশ্চাদপসরণ করিল। এক ডিভিসন চীনা সৈন্য মান্দালয়ে পেঁাছিল বটে, কিন্তু ১লা মে তাহারা শহর ছাড়িতে বাধ্য হইল। ২রা মে জাপানীরা মান্দালয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিল শহরের কিছুই অবশিষ্ট নাই। সমস্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। ডোমেই এজেন্সীর (জাপানী) একজন সংবাদদাতা শহর সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন—

'রাস্তাঘাটে জনপ্রাণী নাই। এমন কি, একটা কুকুর পর্যন্ত নাই।'

'ব্রহ্ম রাজগণের প্রাচীন ঐশ্বর্যশালী রাজধানী মান্দালয়ের এই অবস্থা।'—(পৃষ্ঠা ২৫২)

'বৃটিশ বাহিনী ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্যই ইরাবতী ত্যাগ করিয়া আসিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্ পথ দিয়া তাহারা ভারতবর্ষে পেঁাছিবে? জেনারেল আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে দুইটি পথের সম্ভাবনা দেখা দিল—একটি হইতেছে অনেক উত্তরে মিচিনা অভিমুখে এবং অন্যটি হইতেছে উত্তর-পশ্চিমে কলেওয়া হইয়া ও চিন্দুইন নদী পার হইয়া আসামে। কিন্তু কার্যত পথ বাছাই করিবার কোন সুযোগ বা সময় রহিল না। একে তো আসন্ন বর্ষা ও দ্রুত অগ্রসরমান শত্রু ছিলই, তাহা ছাড়া মিচিনাগামী রেলপথ ব্যবহারের অযোগ্য ছিল এবং আর কোন রাস্তা ছিল না। অন্যদিকে চীন-ব্রহ্ম সড়কে যে সমস্ত জাপাপী সৈন্য পেঁাছিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা মিচিনা বিপন্ন হওয়ার একান্ত আশঙ্কা ছিল।…অতএব উপায়ান্তর না থাকায় জেনারেল আলেকজাণ্ডারকে পাকেকু হইয়া মণিওয়ার উত্তর দিকে চিন্দুইন নদীর পশ্চিম তীর অভিমুখে, আর সোয়েব্যের ভিতর দিয়া চিন্দুইনের পূর্বতীর ধরিয়া আসাম ও মণিপুরের দিকে যাত্রা করিতে হইল।…

'জাপানীরাও মিত্রবাহিনীকে পাকড়াও করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিল না। তাহারা চিন্দুইনের পথ অবরোধ করিবার জন্য মণিওয়ার উপর আক্রমণ করিল। তবে, ১৭নং ডিভিসন ও বর্মা সৈন্যদলের একাংশ মণিওয়া হইতে জাপানীদিগকে হটাইয়া দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। বাকি বৃটিশ সৈন্য ও একটি সাঁজোয়া ব্রিগেড আভা সেতু হইতে সোয়েবু পর্যন্ত পৃষ্ঠরক্ষী সৈন্যের কাজ করে। সোয়েবু হইতে ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে তাহারা অন্যান্য চিন্দুইন বাহিনীর সহিত মিলিত হয় এবং তারপর কালেওয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু জাপানীরা কালেওয়ার দক্ষিণে সোয়েগাইনের খেয়াঘাট পর্যন্ত মিত্রবাহিনীকে অনুসরণ করে। তারা নদীতীরের রাস্তায় বোমা ও মেসিনগণের গুলি চালাইতে থাকে। ফলে, এক সময় মিত্রবাহিনীর নিরাপত্তা সম্পর্কে নিদারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিত্রবাহিনী নদী পার হইয়া কালেওয়াতে পেঁাছিতে সমর্থ হয় এবং দুর্গম জঙ্গল ও পাহাড়ের পথে অশেষ কষ্ট স্বীকারের পর আসাম ও মণিপুর সীমান্তে পেঁাছিতে সমর্থ হয়।

'জেনারেল স্টিলওয়েলের ৫নং চীনা আর্মিও ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিল। জেনারেল স্টিলওয়েল চীনা ও বর্মী অফিসার ও নার্সসহ ১০৪ জনের একটি দলসহ ১৮ দিন ধরিয়া পাহাড় ও জঙ্গল পথের অবর্ণনীয় দুর্ভোগের পর মধ্যব্রহ্ম হইতে আসামে উপস্থিত হন।

'মিত্রবাহিনীর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পথে বর্মা মুলুক হইতে ভারতীয় শরণার্থী দলও যোগ দেয়। দক্ষিণ ব্রহ্মে জাপ আক্রমণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে ভারতীয়গণ সর্বপ্রকার যানবাহনে ও সমস্ত রকম পথ ধরিয়া ভারত অভিমুখে রওনা হয়। মোট ৪ লক্ষেরও অধিক ভারতবাসী আসাম, চট্টগ্রাম ও কলিকাতায় পেঁছায়।* ইহাদের মধ্যে অতি সামান্য সংখ্যাই সমুদ্রপথে বা আকাশ পথে ফিরিতে পারিয়াছে। অধিকাংশই আসিয়াছে জঙ্গল ও পাহাড়ের হাঁটাপথে।...মিত্রবাহিনী আসামে পেঁছিবার পর ব্রহ্মদেশে প্রবল বর্ষা শুরু হইল।...

'২৮শে মে তারিখ (১৯৪২) নয়াদিল্লী হইতে জেনারেল ওয়েভেল ঘোষণা করিলেন যে, আপাতত ব্রহ্মযুদ্ধের অবসান হইল।'—(পৃষ্ঠা ২৫৩-৫৭)

ভারতবর্ষ অভিমুখে ?

ব্রহ্মদেশের পতনের পর প্রচণ্ড গবেষণা শুরু হইয়াছিল জাপানী আক্রমণের পরবর্তী লক্ষ্য নিয়া। জাপান ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবে, কিম্বা অস্ট্রেলিয়া দখল করিবে ? এবং এজন্য দুই দেশেই উৎকণ্ঠিত সমর সজ্জা ও সতর্কতা শুরু হইয়াছিল। কিন্তু কার্যত জাপানী আক্রমণাত্মক অভিযানের উত্তাল তরঙ্গ ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯৪২ সালের মে মাস পর্যন্ত কিম্বা ছয় মাসকাল শীর্ষবিন্দুতে উঠিয়া যেন শান্ত হইয়া গেল। কিন্তু এই ছয় মাসের মধ্যে হাজার হাজার মাইল সমুদ্রপথের কোটি কোটি মানুষ অধ্যুষিত দেশ ও দ্বীপগুলি জাপান কাড়িয়া লইল এবং এক বিরাট সাম্রাজ্য নিম্পনীদের হাতে আসিল। কিন্তু এই সুবিশাল সাম্রাজ্য দখল করিতে গিয়া জাপানী সামরিক বাহিনীর মাত্র ১৫ হাজার সৈন্য ও ৩৮১টি বিমান নষ্ট হইয়াছিল। এত 'অল্প খরচে' এমন বিরাট ভুভাগ দখল করা সত্যই অভাবনীয় ছিল।[১]

আকাশ ও সমুদ্রপথে জাপানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত। সুতরাং ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু বৃটিশ সামরিক শক্তির এই দুর্দশা দেখিয়া কমনওয়েলথের অন্যতম সেরা অংশীদার অস্ট্রেলিয়া আর 'মাদার কান্ট্রির' অর্থাৎ মাতৃভুমিরূপী বৃটেনের উপর ভরসা রাখিতে পারিল না। অস্ট্রেলিয়ার গভর্নমেন্ট প্রতিরক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, এমন কি বার্মার প্রতিরক্ষায় চার্চিলের সহযোগিতার আবেদন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ কার্টিন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এই ব্যাপার নিয়া দুই দেশের মধ্যে যথেষ্ট মন কষাকষির সৃষ্টি হইয়াছিল।[২]

তবে, ভাগ্যক্রমে জাপান অস্ট্রেলিয়া আক্রমণ করিল না, এমন কি সসৈন্যে ভারতবর্ষেও প্রবেশ করিল না। কিন্তু ভারতের উপর প্রচণ্ড স্নায়ুযুদ্ধের চাপ

* লক্ষ লক্ষ ভারতীয় এভাবে বর্মাদেশ থেকে পালাইয়া আসিবার সময় দুর্গম পাহাড় অরণ্যপথে অবর্ণনীয় কষ্ট ও দুর্ভোগের মধ্যে পড়িয়াছিল। সেই সময় সারা ভারতে এই শরণার্থীদের নিয়া তোলপাড় হইয়াছিল এবং এদের পুনর্বাসন যেমন সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছিল, তেমনি জাপানী আক্রমণ সম্পর্কে খুব আতঙ্কও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।—লেখক

১। মেজর জেনারেল ফুলার—পৃষ্ঠা ১৫২।

২। চার্চিল—৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৩৬ এবং ১৪৪।

পড়িল। কেননা, জাপানীরা চট্টগ্রাম ও বর্মা সীমানার আকিয়াব পর্যন্ত দখল করিয়া নিল (৭ই মে) এবং তার আগেই জাপানী নৌবহর বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বিনা বাধায় কাড়িয়া নিয়াছিল—২৫শে মার্চ, ১৯৪২। এপ্রিল মাসে সিংহলের ত্রিংকোমালি নৌ-ঘাঁটিতে জাপানী বোমারু হানা দিল এবং বঙ্গোপসাগরে একখানি
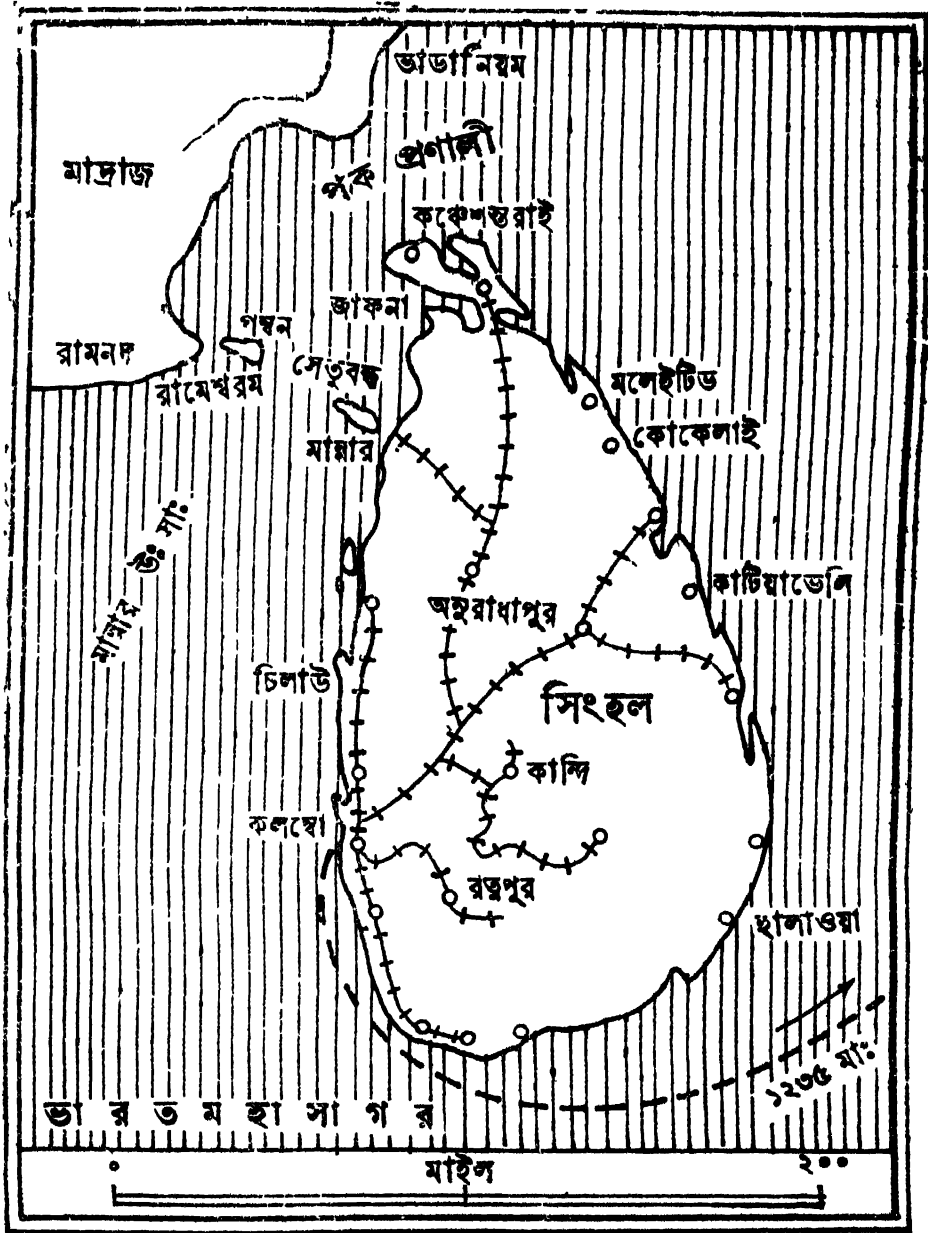
বৃটিশ বিমানবাহী পোত 'হার্মিস' ও ২টি ক্রুজার 'ডর্সেটসায়ার' ও 'কর্নওয়াল' ডুবাইয়া দিল। ৮ই ও ৯ই মে বাংলাদেশে প্রথম বোমা বর্ষিত হইল চট্টগ্রামে পর পর দুইদিন এবং কলিকাতায় প্রথম জাপানী বোমা বর্ষিত হইয়াছিল ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪২।...

জাপানী সমরশক্তি ও নৌশক্তির এই বিক্রমে চার্চিল পর্যন্ত আশংকা করিয়াছিলেন (রুজভেল্টের নিকট প্রেরিত এক আবেদনে) যে, জাপানীরা কলিকাতা দখল করিয়া নিতে পারে এবং জাপানী নৌ-শক্তি ভারত মহাসাগরের পশ্চিমাংশ থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে।[১]

এদিকে ১৯৪১ সালের বর্ষাকাল থেকেই কলিকাতায় ব্ল্যাক আউট এবং এ-আর-পি'র ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল এবং মহাযুদ্ধের অবসান না-হওয়া পর্যন্ত এই সমস্ত সতর্কতামূলক অসামরিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়েভেল মে মাসের এক বেতার বক্তৃতায় সম্ভাব্য প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষকে তিনটি পৃথক রণাঙ্গনে ভাগ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করিলেন —পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গন। কিন্তু ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অসন্তোষ ও স্বাধীনতার দাবী তীব্র বিক্ষোভ সঞ্চার করিতেছিল। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধে দেখা গেল যে, জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় না, আবার স্বাধীনতা ছাড়া এই সহযোগিতা পাওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু ইংরাজ, ফরাসী বা ওলন্দাজ কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই ঔপনিবেশিক জমিদারী ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল না। জাপানের হাতে এই সমস্ত সাম্রাজ্যের এত দ্রুত পতন ঘটিবার অন্যতম মূল কারণ ছিল ইহাই। তবু, জাপান যখন পূর্বদিকে একে একে সমস্ত দ্বীপ, উপদ্বীপ ইত্যাদি জয় করিয়া ক্রমশঃ ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন চার্চিল মন্ত্রিসভা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ২২শে মার্চ তারিখ নয়াদিল্লীতে পাঠাইলেন ভারতবর্ষকে যুদ্ধের পর ডোমিনিয়ন স্টেটাস দানের প্রতিশ্রুতিসহ। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস তথা ভারতীয় জনমত কর্তৃক এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল। ফলে, ১৯৪২ সালে বৃটিশ-ভারতীয় সম্পর্ক গভীর সংকটের সৃষ্টি করিল।

এদিকে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে জাপানী আক্রমণের আশংকা দীর্ঘকাল পর্যন্ত দুঃস্বপ্নের কালো ছায়া বিস্তার করিয়া রহিল।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ১৬১-৬২।

সপ্তম অধ্যায়

ফ্যাসিবিরোধী মহাজোট

ইঙ্গ-মার্কিন রণনীতি ও কূটনীতি

প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের দিকে জাপানের ব্যাপক ও অভাবনীয় আক্রমণের ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যেমন বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করিল (ডিসেম্বর, ১৯৪১) তেমনি হিটলার কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর যে ফ্যাসি-বিরোধী মহাজোটের সূত্রপাত হইয়াছিল—মার্কিন, ওলন্দাজ ইত্যাদি শক্তির বিরুদ্ধে জাপানী যুদ্ধযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে সেই মহাজোট আরও দৃঢ় আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিল। কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনই জাপানের বিরুদ্ধে পালটা যুদ্ধ ঘোষণা করিল না ; অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা (ইউনিয়ন), ভারত, নেদারল্যাণ্ডস ও লাতিন আমেরিকার অনেকগুলি দেশ এবং 'স্বাধীন ফ্রান্সের' ন্যাশন্যাল কমিটি, পোল্যাণ্ড, গ্রীস, মিশর, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং চীনও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল কিম্বা কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যদিও ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই থেকে, কিম্বা জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণের পর থেকে চীন ও জাপান পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন চার বছরেরও অধিককাল পর ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪১। অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত চীন ও জাপানের মধ্যে যে 'অঘোষিত যুদ্ধ' চলিতেছিল, উভয়পক্ষের কেউ সেটাকে আইনমাফিক সরকারী স্বীকৃতি দেন নাই।

প্রশান্ত মহাসমুদ্রে জাপানী সামরিক অভিযান কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম প্রধান অংশীদারে পরিণত করিল না, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বৃটেন ও আমেরিকার মৈত্রী ও সহযোগিতাও বিংশ শতকের ইতিহাসে কূটনীতি ও রণনীতির এক অভূতপূর্ব অধ্যায়ের সৃষ্টি করিল। অবশ্য এই কূটনীতির ইতিহাসে বহু বাঁক ছিল, বহু উঠানামা ছিল, এমন কি সময় সময় সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার বিপজ্জনক ঝোঁকও দেখা দিয়াছিল, তথাপি হিটলার-মুসোলিনী-তোজোর বিরুদ্ধে স্ট্যালিন-চার্চিল-রুজভেল্টের মহামৈত্রী ১৯৪১-১৯৪৫ সালের পৃথিবীতে এক আশ্চর্য দৃশ্যের অবতারণা করিল। এর ফলে ধনতান্ত্রিক জগৎ ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যেমন দ্বিখণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, তেমনি ইউরো মার্কিন সমাজের গণতান্ত্রিক শক্তি ও উপাদানগুলি সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে একত্র হাত মিলাইয়া ফ্যাসিজমকে পর্যুদস্ত করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনা মহাযুদ্ধের পরবর্তী আন্তর্জাতিক জগতকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল এবং প্রায় সারা পৃথিবীতে এক নূতন রূপান্তর আনিয়াছিল।…

বলা বাহুল্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমশিল্পক শক্তি বা 'ইণ্ডাস্ট্রিয়েল পাওয়ার' ছিল অসাধারণ। সমগ্র পুঁজিবাদী জগতের সমস্ত কলকারখানা একত্রে যে উৎপাদন করিত, একা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই তার শতকরা ৫০ ভাগ উৎপাদন করিত। জনৈক

মার্কিন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ (S. Cease) ১৯৩৫-৩৮ সালের তথ্যের গড়পড়তা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে জার্মানী, ইতালী, জাপান ও ফ্রান্সের মিলিত শক্তির তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই মূল শ্রমশিল্পগুলির দ্বিগুণেরও বেশী উৎপাদন করিত।[১] সুতরাং এই বিরাট শক্তি বৃটিশ ও সোভিয়েট এবং অন্যান্য শক্তির সঙ্গে একত্র হইল।

কিন্তু আগেই বলা হইয়াছে যে, ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে এই মহামৈত্রী বা মহাজোটের গতিপথ স্বচ্ছন্দ ও মসৃণ ছিল না। অনেক জটিলতার দ্বারা এই পথ বন্ধুর ছিল। এমন কি, বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যেও স্ব স্ব স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে মাঝে মাঝে মতের মিল ও মনের মিলে বাধা ঘটিত। যেমন, প্রথমেই উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জাপানী আক্রমণ ও আমেরিকার যুদ্ধে যোগদানের ফলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন বটে, (আমেরিকার সাহায্যে যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনায়) কিন্তু তাঁর মনে প্রথমেই আশঙ্কা দেখা দিল যে, এখন থেকে সমগ্র মার্কিন সামরিক শক্তি একমাত্র প্রশান্ত মহাসাগরের দিকেই নিয়োজিত হইবে না তো ? সুতরাং চার্চিল রাতারাতি ছুটিলেন ওয়াশিংটন অভিমুখে রুজভেল্টের সঙ্গে পরামর্শের জন্য। অতলান্তিক পাড়ি দিয়া চার্চিল তাঁর বড় বড় সামরিক ও অ-সামরিক উপদেষ্টাসহ 'ডিউক অব ইয়র্ক' জাহাজযোগে ওয়াশিংটনে পৌঁছিলেন ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪১। কিন্তু জাহাজে বসিয়া চার্চিলের অবসরবিনোদনের উপায় ছিল না। তিনি মুখে মুখে প্রত্যহ ৪।৫ ঘণ্টা ডিক্টেশনের দ্বারা তিনটি পৃথক সামরিক পরিকল্পনা তৈরী করিলেন মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য।[২]

ওয়াশিংটনে চার্চিল যে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সম্মেলনে যোগ দিলেন, তার সাংকেতিক নাম ছিল 'আর্কাডিয়া', হোয়াইট হাউজে তিনি স্বয়ং প্রেসিডেন্টের অতিথি ছিলেন। উপরের তলার হলঘরের একদিকে যে প্রশস্ত শয়নকক্ষটা প্রায়শঃই চুপচাপ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, সেটা এখন যেন হঠাৎ সজাগ ও সচকিত হইয়া উঠিল এবং সমগ্র অবস্থার অসাধারণ পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। বিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক মিঃ শেরউড এক মনোজ্ঞ বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, 'এই পরিত্যক্ত কক্ষটা রাতারাতি একেবারে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মর্মকেন্দ্রে পরিণত হইল। বড় বড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, পদস্থ অফিসার, আর হোমরাচোমরা সেক্রেটারিগণ অনবরত লাল চামড়ার ডিসপ্যাচ কেস হাতে নিয়া ছুটাছুটি করিতেন। এই সমস্ত অফিসারকে সত্যি সত্যি 'অফিসিয়েল' দেখাইত, আর হোয়াইট হাউজের মার্কিন কর্মচারীরা হাঁ করিয়া সেই অভিনব দৃশ্য দেখিতেন। কিন্তু বৃটিশপক্ষ বিস্ময়ে দেখিতেন যে, প্রেসিডেন্টের চারদিকে ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করিয়াও কেমন একটা শান্ত, নির্বিকার আবহাওয়া। সারা হোয়াইট হাউজে সশস্ত্র পাহারার কোন জাঁকজমক নাই। অথচ রুজভেল্টের যত বডিগার্ড বা দেহরক্ষী ছিল, চার্চিলের তেমন ছিল না, খুনখারাপির ভয় বৃটিশপক্ষের অবশ্য তেমন ছিল না। আর হোয়াইট হাউজে চার্চিল যখনই আসিতেন, তখনই উৎকৃষ্টতর খানা, এবং বলাই বাহুল্য মদের ফোয়ারা বহিয়া যাইত।'...চার্চিল ও রুজভেল্ট উভয়েই সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত কথাবার্তা ও আলোচনায় মগ্ন থাকিতেন এবং এই সমস্ত আলোচনা কেবল

১। The Anti-Hitler Coalition—P. 87-88.
২। চার্চিল—দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭০।

সামরিক বিষয় নিয়াই নয়, 'পৃথিবীর ইতিহাসের একটা বৃহৎ অংশ নিয়াও আলোচনা হইত।'[১]

হোয়াইট হাউজে চার্চিলের এই আতিথ্য লাভ থেকেই মহাযুদ্ধের সময় সেই বিখ্যাত গল্পটা চালু হইয়াছিল বাথরুম থেকে চার্চিলের বাহির হওয়া সম্পর্কে। হপকিন্স বলিয়াছেন যে একদিন রুজভেল্টকে তাঁর 'চাকাওয়ালা চেয়ার'যোগে* অতিথির কক্ষের কাছে নেওয়া হইয়াছিল এবং রুজভেল্ট যখন সেই ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় দেখা গেল চার্চিল তাঁর বাথরুম থেকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছেন। বিব্রত রুজভেল্ট তৎক্ষণাৎ 'ক্ষমা চাহিয়া' প্রস্থানোদ্যত হইলে চার্চিল প্রতিবাদের সুরে বলেন, এতে ক্ষমা চাওয়ার কিছু নাই। কেননা, 'গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে লুকাইবার কিছু নাই!'

'The Prime Minister of Great Britain has nothing to conceal from the President of the United States.'

—এই শেষের কথাগুলি এক মুখরোচক গল্পরূপে সেই সময় ভারতবর্ষে পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মার্কিন ঐতিহাসিক শেরউড স্বয়ং চার্চিলকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে চার্চিল জবাব দিয়াছিলেন যে, এই সমস্ত বাজে গল্প। তিনি কখনও অন্তত একটা তোয়ালে কোমরে না জড়াইয়া প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা করিতেন না!

'আর্কাডিয়া' সম্মেলনের কর্মসূচীর প্রথম আলোচ্য বিষয়ই ছিল 'যৌথ রণনীতির মৌলিক ভিত্তি'। যদিও বৃটিশ পক্ষের আশঙ্কা ছিল যে, আমেরিকা হয়তো সর্বাগ্রে জাপানের বিরুদ্ধেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবে, তবু আলোচনা বৈঠকের গোড়াতেই জর্জ মার্শাল ও এডমিরাল স্টার্ক 'যৌথ রণনীতির মৌলিক ভিত্তি' হিসাবে যে মার্কিন প্রস্তাব দাখিল করিলেন, তাতে দেখা গেল যে, জার্মানী বা ইউরোপ এবং অতলান্তিক মহাসমুদ্রকেই সমগ্র রণাঙ্গনের মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। কেননা, জাপান মহাযুদ্ধে যোগ দিলেও জার্মানীর পরাজয়ই চূড়ান্ত জয়লাভের আসল চাবিকাঠি—জার্মানীর পরাজয়ের পর ইতালীর পতন ও জাপানের পরাজয় ও অবশ্যম্ভাবী।[৩]

১৯৪১, ২২শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৪২, ১৪ই জানয়ারী পর্যন্ত দীর্ঘ তিন সপ্তাহ ধরিয়া ওয়াশিংটনে যে সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হইল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য ছিল। কেননা, এই সর্বপ্রথম ফ্যাসিস্ট ব্লকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বৃটিশ ও মার্কিন নেতারা পরস্পরের সহযোগী হইয়াছিলেন। আগেই বলা হইয়াছে যে, চার্চিল ওয়াশিংটনে আসিবার পথেই তিনটি সামরিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। বৃটিশ সেনানী প্রধানগণ এই পরিকল্পনাগুলি অনুমোদন করিয়াছিলেন। এখানে উল্লেখ করা বাহুল্য

১। শেরউড—রুজভেল্ট এণ্ড হপকিন্স, পৃষ্ঠা ৪৪২।

* রুজভেল্ট পোলিও রোগে আক্রান্ত ছিলেন বলিয়া তাঁর পা অবশ ছিল এবং তিনি হুইল চেয়ার ব্যবহার করিতেন।

২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৪৪২।

৩। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা ৪৪৫।

যে, প্রধানমন্ত্রী চার্চিল একজন সমর নেতাও ছিলেন এবং তিনি তাঁর মতামত চাপাইয়া দিতেন কিম্বা সেনানীমণ্ডলীর উপর তিনি প্রভুত প্রভাব খাটাইতেন। 'কিন্তু রুজভেল্ট সাধারণত তাঁর সেনানী প্রধানগণের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া চলিতেন। এমন কি, সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে রুজভেল্ট তাঁর সেনানীমণ্ডলীর প্রধানগণের মতামত একবার কিম্বা দুইবারের বেশী উপেক্ষা করেন নাই।'[১]

চার্চিলের তিনটি রণনৈতিক পরিকল্পনার প্রথমটিতে ইউরোপীয় রণাঙ্গনের অবস্থা বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল এবং পালটা সোভিয়েট অভিযানের উপর গুরুত্ব দিয়া বলা হইয়াছিল যে, 'বর্তমান মুহূর্তে যুদ্ধের সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে রুশ রণাঙ্গনে হিটলারের ব্যর্থতা ও ক্ষতি। অবশ্য জার্মান আর্মি ও নাৎসী রাজত্বের কী পরিমাণ বিপর্যয় ঘটিবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়।' এই দলিলে উত্তর আফ্রিকার লিবিয়াতে বৃটিশ বাহিনীর রণক্রিয়ার এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়া এমন দৃঢ় আশা প্রকাশ করা হইল যে, সাইরেনাইকার (লিবিয়া) বৃটিশ পক্ষের নিশ্চিতই জয় হইবে। এই দুই সূত্র থেকে—অর্থাৎ সোভিয়েট-জার্মান ফ্রণ্টে হিটলারী প্ল্যানের ব্যর্থতা এবং লিবিয়াতে বৃটিশের প্রত্যাশিত জয়, এই দুই থেকে দলিলে এই সিদ্ধান্ত করা হইল যে, উত্তর আফ্রিকার দিকেই ইঙ্গ-মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে। উপসংহারে চার্চিলের বক্তব্য ছিল এই—'১৯৪২ সালে পশ্চিম দিকের যুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযানের মূল লক্ষ্য হইল উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার সমগ্র ফরাসী অধিকৃত রাজ্যগুলি বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক দখল ও নিয়ন্ত্রণ করা। অধিকন্তু বৃটেন কর্তৃক টিউনিস থেকে লিভাণ্ট পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকার তীর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা—এভাবে ভুমধ্যসাগর দিয়া পূর্বদিকে এবং সুয়েজ খাল পর্যন্ত নৌ-বহরের পথ মুক্ত রাখা।'[২]

উত্তর আফ্রিকার এই প্রস্তাবিত অভিযানের প্রথম সাংকেতিক নাম রাখা হইয়াছিল 'জিমনাস্ট', তারপর 'সুপার জিমনাস্ট' এবং শেষ পর্যন্ত এর চূড়ান্ত নামকরণ হইল 'টর্চ'। ১৯৪২'-এর মার্চ মাসের গোড়ায় এই অভিযান শুরু করার প্রস্তাব করা হইল। কিন্তু জেনারেল অকিনলেকের নেতৃত্বে লিবিয়ার অভিযানে বৃটিশ পক্ষের বিষম পরাজয় ঘটিল, ফলে এই অভিযান চার মাস বিলম্বিত হইল।

দ্বিতীয় দলিলে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন যুক্ত অভিযানের এবং দখলীকৃত স্থানগুলি পুনরুদ্ধারের প্রস্তাব করা হইল। মোটামুটি তারিখ স্থির করা হইল ১৯৪২, মে মাস।

তৃতীয় দলিলে বলা হইল যে, ১৯৪২ সালের জন্য এই বৃটিশ রণ-পরিকল্পনা যদি সার্থক হয়, তবে, ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে ইউরোপীয় ভুভাগে অবতরণের জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। চার্চিলের মতে এই প্রস্তাবিত অভিযানে প্রথম পর্যায়ে ৪০ টি সাঁজোয়া ডিভিসন এবং ১০ লক্ষ অন্যান্য সৈন্যের দরকার হইবে।

দলিলে ঘোষণা করা হইল—'পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপের পদানত দেশগুলির মুক্তির উদ্দেশ্যে পর পর কয়েকটি উপযুক্ত স্থানে পৃথক পৃথকভাবে কিম্বা একসঙ্গে অবতরণের জন্য আমাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে! বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনীকে এতটা

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা—৪৪৬।
২। চার্চিল—দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৪, ৫৭৮।

শক্তিসহ অবতরণ করিতে হইবে, যাতে অধিকৃত দেশের জনগণ বিদ্রোহ ঘটাইতে পারেন।'[১]

'আর্কাডিয়া' সম্মেলনে বৃটিশ ও মার্কিন দলিল নিয়া আলোচনার পর দেখা গেল যে উভয় পক্ষই সামরিক লক্ষ্যের দিক দিয়া একমত হইয়াছেন এবং জাপানের তুলনায় জার্মানীকেই এক নম্বর শত্রু বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু ইউরোপে সসৈন্যে অবতরণের বদলে বৃটিশ প্রস্তাব অনুযায়ী উত্তর আফ্রিকা অভিযানের সিদ্ধান্তই গৃহীত হইল। অর্থাৎ ১৯৪২ সালে ইউরোপে জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আঘাত হানার কিম্বা সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির কোন পরিকল্পনা হইল না। সম্মেলনে যে সমস্ত রণনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হইল এবং চার্চিল যে সমস্ত প্রস্তাব দাখিল করিলেন, সেগুলির দ্বারা দ্রুত যুদ্ধজয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না—এই সমালোচনা ধ্বনিত করিয়াছেন স্বয়ং মার্কিন ঐতিহাসিক ট্রাম্বুল হিগিন্স। তিনি বলিয়াছেন—'এই সমস্ত প্রস্তাব মূলতঃ ১৯৩৯ সালের সেই ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিরক্ষামূলক রণপরিকল্পনারই নামান্তর মাত্র।'[২]

অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে পশ্চিম রণাঙ্গনে যে 'Phoney War' বা 'ভেজাল যুদ্ধ চালিয়াছিল ইঙ্গ-মার্কিন পরিকল্পনা ছিল তারই অনুরূপ। ১৯৪২ সালের জন্য বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষ যে আত্মরক্ষার রণনীতি বা ডিফেন্সিভ পলিসি গ্রহণ করিলেন, তার মূল কথা ছিল জার্মানীর বিরুদ্ধে বিমান আক্রমণ ও সমুদ্রপথে অবরোধ। এর বেশী প্রত্যক্ষ আঘাতের পরিকল্পনা ছিল না।

ওয়াশিংটন সম্মেলনে ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষ পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার যে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন, তার ফলে এ্যাংলো-আমেরিকান কম্বাইণ্ড চীফস অব স্টাফ কিম্বা ইঙ্গ-মার্কিন সেনানীমণ্ডলীর প্রধানদের যুক্ত সংস্থা গড়িয়া উঠিল। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের রণনৈতিক পরিকল্পনা ও নীতিগুলি সংশ্লিষ্ট দেশের প্রধানগণের নির্দেশে পরিচালনা করা, গোলাবারুদ ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় মালমশলার বিলিব্যবস্থা এবং পরিবহণ ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা। এই যুক্ত সংস্থার সদস্য হইলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট, বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী এবং এই দুই দেশের নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনীর প্রধানগণ। যুদ্ধের সময় এই সংস্থার ৮ বার সম্মেলন হইয়াছিল এবং এর সদর দপ্তর ছিল ওয়াশিংটনে।'[৩]

আসলে এই নূতন সংস্থা ছিল উভয় পক্ষের যৌথ সৈন্যাপত্য বা ইউনিফাইড কমাণ্ড এবং এই যৌথ সৈন্যপত্যের গঠনে গোড়ার দিকে উভয় পক্ষের মধ্যে কিছু মতবিরোধ ঘটিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পশ্চিম রণাঙ্গনে এই ধরনের সম্মিলিত কমাণ্ড লইয়া যথেষ্ট গোলযোগ ও বিরোধ দেখা দিয়াছিল এবং '১৯১৮ সালের আগে পর্যন্ত অনাবশ্যকভাবে অনেক রক্ত, অনেক মূলাবান সময় ও দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছিল।'[৪] ওয়াশিংটন সম্মেলনে চার্চিল ও রুজভেল্টের মধ্যে এই সম্পর্কে আলোচনার পর ঐক্যবদ্ধ সৈনাপত্যের মূলনীতি গৃহীত হইল এবং প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে জাপানের

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৫৮১-৮২।
২। দি এ্যান্টি-হিটলার কোয়ালিশন—পৃষ্ঠা ৯২।
৩। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা ৯৩।
৪। শেরউড—রুজভেল্ট এণ্ড হপকিন্স, পৃষ্ঠা ৪৫৭।

বিরুদ্ধে এ-বি-ডি-এ এলাকায় জেনারেল ওয়েভেলকে সুপ্রীম কমাণ্ডারের পদে নিয়োগ করা হইল। কিন্তু বৃটিশ সেনাপতিগণ গোড়াতে এই নিয়োগে আপত্তি করিয়াছিলেন এই সন্দেহে যে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি চাপাইবার উদ্দেশ্যেই আমেরিকানরা একজন বৃটিশ সেনাপতির ঘাড়ে এই দায়িত্ব চাপাইতেছেন।

অবশ্য জেনারেল ওয়েভেলকে এত বড় মর্যাদা দেওয়া সত্ত্বেও বেচারা সুপ্রীম কমাণ্ডারের পদগৌরব খাটাইবার বেশী সুযোগ পাইলেন না। কেননা, অতি দ্রুত তাঁকে পাততাড়ি গুটাইয়া ভারতে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল।

ওয়াশিংটন বৈঠকে আর একটি ঐতিহাসিক কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, যার গুরুত্ব মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল পর্যন্তও অনুভূত হইতেছে। এটা হইতেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা—

'Declaration of the United Nations'.—

যে ঘোষণার ভিত্তিতে ফ্যাসিবাদকে পরাভূত করার জন্য মিত্রশক্তিবর্গের মহারণনীতি বা গ্রাণ্ড ষ্ট্র্যাটিজির উদ্ভব এবং মহাজোট গঠিত ও দৃঢ় হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের বড়দিনের পূর্বাহ্নে রুজভেল্ট 'এসোসিয়েটেড পাওয়ার্সের' পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা-বাণী রচনা করিলেন এবং চার্চিল আর-একটি খসড়া তৈরী করিলেন। এই উভয় খসড়া মিলাইয়া যে চূড়ান্ত ঘোষণা তৈরী হইল, তার নামকরণ স্বয়ং রুজভেল্ট বদল করিয়া 'ইউনাইটেড নেশন্স' রাখিলেন। ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী ওয়াশিংটন থেকে ইউনাইটেড নেশন্স-এর ঘোষণারূপে যে ঐতিহাসিক বিবৃতি প্রচারিত হইল, তাতে বৃটেন, আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়াসহ ২৬টি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর দেওয়া হইল। 'ইউনাইটেড নেশন্স'—এই নামকরণ রুজভেল্টের খুব পছন্দ ছিল এবং চার্চিল তাতে সায় দিয়া রুজভেল্টকে বলিলেন যে, ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি লর্ড বাইরনের সুবিখ্যাত 'চাইল্ড হেরাল্ড' কবিতায় এই শব্দটির উল্লেখ আছে, যেমন—

'Here, where the sword
United Nations drew,
Our countrymen were
Warring in that day;
And this is much—and all—
Which will not pass away'[১]

(রণবিদ্যায়, কূটনীতিতে, ইতিহাসে এবং কাব্যে ও সাহিত্য ইত্যাদিতেও উইনস্টোন চার্চিলের পারদর্শিতা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করার মত। তাঁর মহাযুদ্ধের বইতে অনেকবার অনেক কবিতার উল্লেখ করা হইয়াছে।)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে ২৬টি রাষ্ট্রের এই নূতন ঘোষণার মধ্যে অতলান্তিক সনদের (১৯৪১, ১৪ই আগস্ট) নীতি ও উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করা হইল এবং মুখবন্ধে ঘোষণা করা হইল—

'Being convinced that complete victory over their enemies is essential to defend life, liberty, independence and religious freedom, and to preserve human rights and justice in their own lands as well

১। চার্চিল—দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০৫।

as in other lands and that they are now engaged in a common struggle against savage and brutal forces seeking to subjugate the world,. DECLARE :

(1) Each Government pledges itself to employ its full resources,. military or economic, against those members of the Tripartite Pact and its adherents with which such Government is at war.

(2) Each Government pledges itself to co-operate with the Governments signatory hereto, and not to make a separate armistice or peace with the enemies.' [Churchill—Vol. 3, p. 605-6.]

নিঃসন্দেহে এই ঘোষণা অত্যন্ত মূল্যবান ছিল এবং যে ২৬টি গভর্নমেন্টের স্বাক্ষরে প্রথম এই ঘোষণা প্রচারিত হইল, তাতে ভারতবর্ষেরও নাম ছিল—যদিও পরাধীন ভারত এবং সেই ভারতের নাম দেওয়া হইবে কিনা, তা নিয়া উচ্চতম বৃটিশ মহলে মতভেদ ছিল। অবশ্য ভারতের প্রাক্তন বড়লাট লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ভারতের নাম দেওয়ার পক্ষে ছিলেন।[১]

কিন্তু মুখবন্ধে 'ধর্মাচরণের স্বাধীনতা' বা 'রিলিজিয়াস ফ্রিডম' শব্দটি নিয়া ওয়াশিংটনস্থিত সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত লিটভিনোফের সঙ্গে রুজভেল্টের কিছুটা বিতর্ক হইয়াছিল। কেননা, স্ট্যালিনের বিনা সম্মতিতে এই শব্দটি ঘোষণাপত্রে গ্রহণ করিতে লিটভিনোফ ইতস্তত করিতেছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত মস্কো সম্মত হইয়াছিল। কিন্তু চার্চিল এই উপলক্ষে কিছুটা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রেসিডেন্ট 'ধর্মাচরণের স্বাধীনতা' সম্পর্কে লিটভিনোফের সঙ্গে একা অনেকক্ষণ কথা বলিয়াছিলেন এবং 'আত্মা' ও 'নরকের ভয়' নিয়া যে সমস্ত আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই গল্প শুনিবার পর—'আমি মিঃ রুজভেল্টকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম যে, আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যদি তিনি হারিয়া যান, তবে, তাঁকে আমি ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপের পদে নিয়োগের জন্য নিশ্চয়ই সুপারিশ করিব!'[২]

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার এই যে, স্বাক্ষরকারী গভর্নমেন্টসমূহ ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করার এবং 'জনগণের জীবন, স্বাধীনতা, ধর্ম, মানবিক অধিকার ও ন্যায়বিচার' রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সমস্ত সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি নিয়োগের জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কেহ শত্রুর সঙ্গে কোন পৃথক যুদ্ধবিরতি বা সন্ধি করিবেন না।

'Thus, the United Nations Declaration put a legal seal to the military political alliance of the anit-fascist states'.

অর্থাৎ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণার দ্বারা ফ্যাসিবিরোধী রাষ্ট্রগুলির সামরিক ও রাজনৈতিক মৈত্রীকে বিধিবদ্ধ বা আইনের রূপ দেওয়া হইল।[৩]

নাৎসী নেতাদের পক্ষ থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গকে একটা নূতন জেহাদে প্ররোচিত করার চেষ্টা এভাবে চূর্ণ হইয়া গেল এবং বিশ্ব শত্রুকে

১। শেরউড—রুজভেল্ট এন্ড হপকিন্স, পৃষ্ঠা ৪৪৭।
২। চার্চিল—তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০৪।
৩। দি এ্যান্টি-হিটলার কোয়ালিশন, পৃষ্ঠা—৮৯।

ইতিহাসে এক আশ্চর্য মৈত্রী ও মহাজোট দেখা দিল—সর্বত্র স্বাধীনতাকামী মানুষ ফ্যাসিজমের পরাজয়ের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল।

কিন্তু ওয়াশিংটন সম্মেলন কিংবা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা সত্ত্বেও একথা মনে রাখা দরকার যে, এই মহামৈত্রীর মধ্যে তেমন কোন মনের মিল, এমন কি মতের মিলও ছিল না—কেবল যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনের তাগিদে বাহ্যত সহযোগিতার মনোভাব ছিল। অবশ্য ওয়াশিংটন বৈঠকে ইঙ্গ-মার্কিন রণনীতির মধ্যে সংহতি ও ঐক্যবিধান করা হইয়াছিল এবং জাপানের বদলে জার্মানীকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় চার্চিল এক দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পাইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যই অনেক বিষয়ে মানিয়া নিতে হইয়াছিল। কেননা, অর্থনৈতিক বল, অস্ত্রবল, লোকবল ইত্যাদি গুরুতর প্রশ্নের বিবেচনায় আমেরিকার যে শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, চার্চিল ও বৃটিশ রণনেতাদিগকে সেই শ্রেষ্ঠত্বের নিকট নত হইয়া চলিতে হইতেছিল। 'এমন কি, বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রধান সেনাপতি নিয়োগের ব্যাপারেও আমেরিকার দাবীই মানিতে হইতেছিল। চার্চিল এজন্য ক্ষুব্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর পক্ষে কোন উপায়ও ছিল না।' 'ফলে, ওয়াশিংটনে সম্মেলনের ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রী সত্ত্বেও বৃটেনের পক্ষে কার্যত কোন স্বাধীন নীতি অনুসরণের সুযোগ রহিল না। শক্তির ভারসাম্য ইংরাজের অনুকূলে ছিল না।'[১]

অপর দিকে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া একটা মহাজোটের মধ্যে পরস্পরের নিকটতর হইল বটে, কিন্তু এই জোর তেমন দৃঢ়সংবদ্ধ হইতে পারিল না। কেননা, ওয়াশিংটন সম্মেলনেই লক্ষ্য করা গেল যে, সোভিয়েট রাশিয়াকে বাদ দিয়াই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রশ্ন ও রণনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হইল।

'It should be noted that the British and US Governments adopted important decisions on the course of the entire Second World War without co-ordinating them with the Soviet Union, although the latter bore the main burden of the War against nazi Germany and her European allies'.[২]

অর্থাৎ 'সমগ্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতিপথেই বৃটিশ ও মার্কিন গভর্নমেণ্ট সোভিয়েট ইউনিয়নের নীতির সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য বিধান না করিয়াই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করিলেন, যদিও নাৎসী জার্মানী ও তার ইউরোপীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়াই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বোঝা বহন করিতেছিল।'

অথচ সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট বরাবরই ঘনিষ্ঠতর সামরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আগ্রহী ছিলেন। এমন কি, সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গনের বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্যেরা যোগদান করুক, এমন ইচ্ছা যুদ্ধের গোড়াতেই সোভিয়েট সরকার প্রকাশ করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে বৃটেন যদি ইউরোপের কোন অংশে সৈন্য অবতরণ করায়, তবে সোভিয়েট সৈন্যেরাও তাতে যোগ দিতে রাজী আছে। একথাও ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষকে বলা হইয়াছিল। সোভিয়েট লেখক ভিক্টর ইজরায়েলজান বলিয়াছেন যে, অবশেষে সোভিয়েট সরকারের নিজেদের উদ্যোগেই কিছু বিদেশী সৈন্য, যেমন—

১। British Foreign Policy During World War II—P. 226.

২। The Anit-Hitler Coalition—P. 94.

পোলিশ, চেকোশ্লোভাক ও ফ্রেঞ্চ রুশ-জার্মান রণাঙ্গনে যোগ দিয়াছিলেন, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সোভিয়েট রাশিয়া ব্যাপক সামরিক সহযোগিতা ও মহাজোটের ঐক্যবদ্ধ রণনীতি অনুসরণে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ওয়াশিংটনে ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ সৈনাপত্যের প্রতিষ্ঠা সোভিয়েটের সঙ্গে কোন সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে নাই।[১]

প্রকৃতপক্ষে 'আর্কাডিয়া' সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও রণনৈতিক আলোচনার সময় কোন সোভিয়েট প্রতিনিধিকে 'পর্যবেক্ষক' হিসাবেও আমন্ত্রণ করা হয় নাই। চার্চিল তাঁর যুদ্ধের বইতে স্বীকার করিয়াছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে কোন আলোচনা করা হয় নাই। সম্মিলিত কমাণ্ডের স্টাফ কমিটিতে তাঁদের কোন প্রতিনিধিকেও গ্রহণ করা হয় নাই। কেননা, চার্চিলের মতে এর কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, 'সোভিয়েট রণাঙ্গন ছিল বহুদূরবর্তী, নিরবচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র রণাঙ্গন মাত্র যার সঙ্গে সংহতি সাধন সম্ভব ছিল না।' 'কিন্তু তেহরান, ইয়ালটা ও পটস্‌ডাম সম্মেলনগুলিতে ইঙ্গ মার্কিন-রুশ সেনানীমণ্ডলী গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার একত্র হইয়াছিলেন।'

'আলোচনায় একত্র হইয়াছিলেন' বটে, কিন্তু সোভিয়েট রণনীতি ও রণক্রিয়ার সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও ঐক্যবিধান করিয়া ইঙ্গ-মার্কিন রণনীতি হাতে-কলমে অনুসৃত হইয়াছিল কিনা, সেই আসল প্রশ্ন সম্পর্কে চার্চিল নীরব রহিয়াছেন। যদিও মার্কিন মহল সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের মত এতটা কট্টর ছিলেন না, এমন কি মাঝে মাঝে সোভিয়েটের প্রতি আন্তরিকতাও দেখাইয়াছেন, তবু ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থে শেষ পর্যন্ত হাত গুটাইয়া রহিয়াছেন কিংবা বৃটেনের দিকেই সায় দিয়াছেন।

* * *

১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বা ইউনাইটেড্ নেশন্সের পক্ষ থেকে ২৬টি গভর্নমেণ্টের স্বাক্ষরিত ঘোষণা-বাণীতে ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গকে পরাভূত করার মহৎ সংকল্প প্রচারিত হইলে কি হইবে, ওই বছরের অন্তত অর্ধেক কাল ধরিয়া ক্রমাগত বিপর্যয়ের-পর-বিপর্যয় ঘটিতে লাগিল। শেরউড তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসে এই সময়টাকে 'Winter of Disaster' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত বিপর্যয়ের মুখে ওয়াশিংটন সম্মেলনের গুরুগম্ভীর দলিলপত্রগুলিকে যেন 'কতকগুলি ছেঁড়া কাগজের টুকরা' বলিয়া মনে হইতে লাগিল। 'বৃটেনের সঙ্গে ৭৫০ মিলিয়ন রুশ, মার্কিন, চীনা একত্রে যুদ্ধের মিত্র হওয়া সত্ত্বেও বৃটেন এমন সমস্ত চরম অসম্মানজনক ও অবর্ণনীয় পরাজয় বরণ করিতে লাগিল, যেগুলি ইংরাজ জাতির সমগ্র ইতিহাসও ঘটে নাই।' 'অধিকন্তু যে জাপানী শক্তিকে তুচ্ছ করা হইয়াছিল, সেই শক্তি মিত্রপক্ষের সমস্ত হিসাব-নিকাশ ভণ্ডুল করিয়া দিল এবং এমন একটা হতবুদ্ধিকর তাড়িৎগতিতে সে আগাইয়া যাইতে লাগিল যে, লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের মানচিত্রকক্ষের দেওয়ালগুলিতে পিনের চিহ্নগুলি পর্যন্ত আসল তারিখের অনেক পিছনে পড়িয়া যাইতে লাগিল।' মিঃ শেরউড পার্ল হারবারের পরবর্তী এই দূর বিস্তৃত জাপানী অভিযানকে এমন একটা 'হাতপাখার' সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, যার 'হাতলটা' রহিয়াছে টোকিওতে, কিন্তু 'পাখাগুলি' ছড়াইয়া পড়িয়াছে বহু দূর দূরান্তর—'যার ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য ৩ হাজার

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃঃ ১৪।
২। চার্চিল—তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০৯।

মাইলেরও বেশী, পূর্বদিকে যার বিস্তৃতি মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে, দক্ষিণমুখী অস্ট্রেলিয়ার উপকূলের দিকে এবং পশ্চিমমুখী ভারতবর্ষের তীর অভিমুখে। পৃথিবীতে বোধহয় এত দ্রুত এত বড় সাম্রাজ্য আর কখনও অর্জিত হয় নাই।'[১]

কিন্তু এর ফলে অবস্থা কী দাঁড়াইল? ওয়াশিংটনের বৈঠকে চার্চিল-রুজভেল্টের যে অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল, তার উপর প্রচণ্ড চাপ পড়িল এবং এঁদের তুলনায় যে কোন অপেক্ষাকৃত কম ধৈর্যশীল মানুষের সহনশীলতা বোধহয় ভাঙিয়া পড়িত! কিন্তু বৃটিশ ও মার্কিন জনমত এই গভীর দুর্যোগের মধ্যেও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিল।...কিন্তু সমগ্র পরিস্থিতির অত্যন্ত গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা ডাকিয়া আনিল:

'The most dreadful of all prospects, which came parilously close to realization, was that of a German breakthrough into the Middle East and a Japanese march through India which have enabled the two powerful Axis partners to join up and pool resources.'[২]

সোজা কথায় মধ্যপ্রাচ্য দিয়া জার্মানীর এবং ভারতবর্ষের ভিতর দিয়া জাপানের একত্রে পরস্পরের হাত মিলাইবার বিপজ্জনক সম্ভাবনা দেখা দিল, যে সম্ভাবনার আশঙ্কায় স্বয়ং চার্চিলও খুব উৎকণ্ঠিত ছিলেন।

কিন্তু কার্যতঃ জাপান ও জার্মানীর মধ্যপ্রাচ্য মিলন না ঘটিয়া থাকিলেও সেদিন এমন সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল যে, শেরউডের ভাষায়—

—'best informed sources would not dare to bet against it'

'এমন কি, সর্বোত্তম ওয়াকেফহাল ব্যক্তিরাও এই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে বাজি ধরিতে সাহসী ছিলেন না'!

যে জাপানকে 'উদীয়মান সূর্যের' দেশ বলা হইত, সেই সূর্য যেন সত্য সত্যই অত্যন্ত তীব্র দাবদাহ লইয়া পরিপূর্ণরূপে উদিত হইল এবং পূর্ব পৃথিবীতে তার ছটায় যেন চোখ ধাঁধাইয়া যাইতে লাগিল। যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তির উপর এই বিশাল এলাকার নিরাপত্তা নির্ভরশীল ছিল, সেই শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র ইতিহাসে (শেরউডের মন্তব্য অনুসারে) কোনদিন কোন প্রেসিডেণ্টকে যে অভাবনীয় দায়িত্ব বহন করিতে হয় নাই সেই দায়িত্ব আসিয়া পড়িল রুজভেল্টের ঘাড়ে—যাঁকে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হপকিন্সের নিকট এক চিঠিতে বর্ণনা করিলেন 'কমাণ্ডার-ইন-চীফ অব দি ইউনাইটেড নেশন্স'রূপে!

কিন্তু 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান সেনাপতির' দায়িত্ব আরও জটিল হইয়া পড়িল উইনস্টোন চার্চিলের জন্য—সেই গর্বিত, উদ্ধত মানুষটি, যাঁকে কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি দুর্লভতম নিখুঁত ভাষায় এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন—'অর্ধেক আমেরিকান, কিন্তু পুরোটা ইংরাজ'—

'...half American and all English!'[৩]

বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষের জাতীয় দাবী নিয়া, কর্জ ও ইজারা এবং যুদ্ধের পরবর্তীকালে

১। শেরউড—রুজভেল্ট এণ্ড হপকিন্স, পৃষ্ঠা ৪৯০-৯১
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ৪৯১।
৩। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৫০৬

'ইম্পিরিয়েল প্রেফারেন্স' নীতি বজায় রাখার বিতর্কিত প্রসঙ্গ নিয়া এই সময় চার্চিল ও রুজভেল্টের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ ঘটিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সেজন্য তাঁদের মন্তব্যগুলি মার্কিন ইতিহাসে ধ্বনিত হইয়াছে। এই মন্তব্য প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয় যে, চার্চিলের পিতা ইংরাজ এবং মাতা আমেরিকান ছিলেন।

* * *

কেবলমাত্র প্রশান্ত মহাসাগর ও পূর্ব এশিয়া থেকেই এই সময় (১৯৪২-এর জানুয়ারী) ইঙ্গ মার্কিন পক্ষের দুঃসংবাদ আসিল না, উত্তর আফ্রিকাতেও বৃটেনের নিদারুণ আশাভঙ্গ ঘটিল। কেননা, বৃটিশ পক্ষের খুব আশা ছিল যে, ইতালীয়-জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক আঘাত হানিয়া তাদের চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারিবে এবং কার্যতঃ ১০ই জানুয়ারীর মধ্যে ইতালীয়-জার্মান বাহিনী উত্তর আফ্রিকার ঘাটিগুলি ত্যাগ করিয়া এল আঘালিয়ার দক্ষিণ দিকে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু ২১শে জানুয়ারী এই সমস্ত সৈন্য অকস্মাৎ এক পালটা অভিযান চালাইয়া বৃটিশ পক্ষের অগ্রবর্তী সৈন্যদলকে ঘায়েল করিয়া ফেলিল। তারা উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতে লাগিল। বেংগাজী বন্দর দখল করিয়া নিল এবং জানুয়ারীর শেষে এল গাজালা লাইন পর্যন্ত পৌঁছিল।

বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষের সামরিক পরিস্থিতির এই অবনতির জন্য মার্কিন জেনারেল স্টাফ ১৯৪২ সালের বসন্তকালে নূতন রণনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নিকট এক দীর্ঘ তারবার্তায় যে সমস্ত প্রস্তাব করিলেন, সেগুলির মর্ম এই ঃ

১. প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমস্ত প্রকার রণক্রিয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

২. বৃটেনের দায়িত্ব থাকিবে সিংগাপুর থেকে পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগর এবং লিবিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত।

(উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ইংগ-মার্কিনের অবতরণ পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রহিল)।

৩. উত্তর ও দক্ষিণ অতলান্তিক মহাসমুদ্র এবং পশ্চিম ইউরোপীয় ভূখণ্ডের জন্য ইংগ-মার্কিনের যৌথ দায়িত্ব থাকিবে।

এই প্রসংগে রুজভেল্ট বিশেষভাবে উল্লেখ করিলেন যে, 'এবার গ্রীষ্মকালেই ইউরোপীয় মহাদেশে একটি নূতন রণাংগন খোলার বিষয়ে তিনি ক্রমশঃ অধিকতর আগ্রহী হইয়া উঠিতেছেন।'

তিনি সোভিয়েট রাশিয়াকে সাহায্যের জন্য সর্বপ্রকাশ মালমশলা সরবরাহ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তার উপরেও জোর দিলেন।

বলা বাহুল্য যে, চার্চিল এই সমস্ত প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন এবং ওয়াশিংটনে ও লণ্ডনে এই উদ্দেশ্যে একটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করিলেন।[১]

এই সময় মার্কিন আর্মির সদর দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন জেনারেল ডুইট ডি. আইজেনহাওয়ার (যিনি পরবর্তীকালে ইংগ-মার্কিন পক্ষের সর্বোচ্চ অধিনায়করূপে

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫১০।

খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন) তাঁর দপ্তর উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্স আক্রমণের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈয়ার করিল। এই প্ল্যান অনুসারে প্রস্তাব করা হইল যে, ইংলিশ চ্যানেল যেখানে সবচেয়ে সংকীর্ণ সেখান দিয়া চ্যানেল অতিক্রম করা হইবে এবং ফরাসী উপকূলের ক্যালে ও লে হেভার বন্দর দুইটির মধ্যে অবতরণ করা হইবে। এই দলিলের উপসংহারে বলা হইল—'একমাত্র জার্মানীর বিরুদ্ধেই এক সংগে রুশ-মার্কিন-বৃটিশ বাহিনীর অধিকাংশ যোদ্ধ সৈন্যদের নিয়োগ করা যাইতে পারে'।

ফ্রান্সে একটা বড় রকমের অবতরণ অভিযান ঘটাইবার জন্য যে উদ্যোগ-আয়োজনের পরিকল্পনা করা হইল, তার সাংকেতিক নাম দেওয়া হইল 'অপরেশন বোলেরো' (Bolero) এবং মোটামুটি স্থির হইল যে, ১৯৪৩, ১লা এপ্রিলের আগেই এটা কার্যে পরিণত করা হইবে। এই রণক্রিয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিবে ৩০ ডিভিসন সৈন্য, ৩000 জঙ্গী বিমান, আর বৃটেন দিবে ১৮ ডিভিসন সৈন্য ও ২৫00 বিমান।

কিন্তু এই 'বৃহত্তর' অভিযান হাতে-কলমে শুরু হওয়ার আগে জরুরী অবস্থায় আর-একটি 'ক্ষুদ্রতর' অভিযানের পরিকল্পনা করা হইল। অর্থাৎ আমেরিকানদের বিবেচনায় রুশ রণাঙ্গনের অবস্থা যদি ইতিমধ্যে একেবারেই সঙ্গীন হইয়া উঠে, তখন ইউরোপীয় ভূভাগে এই 'ক্ষুদ্রতর' অভিযান করা হইবে এবং এর সাংকেতিক নাম দেওয়া হইল 'শ্লেজহ্যামার'—১৯৪২-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর নাগাদ এই পরিকল্পনা কাজে লাগানো হইবে।[১]

অবশ্য অন্যান্য কয়েকটি পরিকল্পনার কথাও এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করা হইয়াছিল, যেমন—উত্তরবর্তী নরওয়েতে অবতরণ, স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী পিরানিজ পার্বত্য এলাকায় বা পিরানীয়ান উপদ্বীপে আক্রমণ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রণক্রিয়ার সংগঠন এবং জার্মানীর উপর ব্যাপকভাবে বোমা বর্ষণ।

এই জরুরী দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রস্তাবের পিছনে আমেরিকান সেনানীমণ্ডলীর মনে এই উদ্বেগ ছিল যে ১৯৪২ সালের নূতনতর জার্মান অভিযানের মুখে সোভিয়েট রাশিয়া টিঁকিয়া নাও থাকিতে পারে এবং যদি রাশিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, তবে, সেই অবস্থায় কী হইবে ?—রাশিয়ার পরাজয়ের পর হিটলারী জার্মানী নিশ্চয়ই পশ্চিমের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে। সুতরাং সেই দুর্যোগ রোধ করার জন্য আগেই মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রস্তুত থাকা উচিত এবং তারই জন্য অপেক্ষাকৃত আগে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার এই পরিকল্পনা।

কিন্তু সরকারী স্তরে এই পরিকল্পনা নিয়া মাথা ঘামাইবার পিছনে আরও একটি বড় কারণ ছিল। তখন ফ্যাসিজম বিরোধী এবং সোভিয়েট পক্ষপাতী পৃথিবীর নানা দেশে—বিশেষ করে বৃটেনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও জনমত দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জন্য দাবী জানাইতেছিল। সোভিয়েটকে হাতে-কলমে সাহায্যদানের দাবীতে জনমত সোচ্চার হইয়া উঠিল এবং অসংখ্য শহরে জনপদে সভাসমিতি শোভাযাত্রা এবং আবেদন-নিবেদন অনুষ্ঠিত হইল। বৃটিশ ও মার্কিন জনগণ তাঁদের সরকারের উপর চাপ দিতে লাগিল সুনির্দিষ্ট পন্থা গ্রহণের জন্য। লণ্ডনে এবং ওয়াশিংটনে এই দাবী আর সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করার জো ছিল না।

তখন রুজভেল্ট ৩রা এপ্রিল, ১৯৪২, চার্চিলকে এক পত্রে লিখিলেন :

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ৫২০।

'Your people and mine demand the establishment of a front to draw of pressure on the Russian, and these people are wise enough to see that the Russians are to-day killing more Germans and destroying more equipment than you and I put together.'

অর্থাৎ আপনার এবং আমার দেশের জনগণ রাশিয়ার উপর চাপ কমাইবার জন্য একটি নূতন রণাঙ্গন খোলার দাবী জানাইতেছে। কারণ, তাঁরা বুদ্ধিমানের মত দেখিতেছেন যে, আপনি ও আমি একত্রে যা পারিতেছি না, তার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যায় জার্মান সৈন্য ও অস্ত্রসম্ভার সাবাড় করিতেছে একা রাশিয়ানরা!

রুজভেল্টে ডগলাস ম্যাক-আর্থারের (প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন সেনপতি) নিকটও এক পত্রে অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ২৫টি জাতি একত্রে যে কার্য করিতে পারিতেছেন না, একা রাশিয়ার চেষ্টায় তার চেয়েও বেশী হইতেছে। সুতরাং প্রেসিডেণ্টের মতে 'সোভিয়েট রাশিয়ার ১৯৪২ সালের এই মহান চেষ্টার পিছনে অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়া সহায়তা করাই সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত এবং রুশ-রণাঙ্গন থেকে জার্মান সৈন্যবাহিনী ও বিমান বাহিনীর চাপ হ্রাস করার জন্য আমাদেরও পরিকল্পনা করা উচিত।'[২]

রাশিয়া ও যুদ্ধ সম্পর্কে এই সমস্ত চিন্তাভাবনার ফলেই রুজভেল্ট হ্যারি হপকিন্স ও জর্জ মার্শালকে লণ্ডনে পাঠাইলেন মার্কিন পরিকল্পনা সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য। ৮ই এপ্রিল তাঁরা লণ্ডনে পেঁাছিলেন এবং বৃটিশ নেতাদের সংগে পর পর কয়েকটি বৈঠকে মিলিত হইলেন। এই সমস্ত আলোচনার ফলে মার্কিন প্রতিনিধিদের ধারণা জন্মিল যে, ১৯৪৩ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাংগন খোলার জন্য আমেরিকার পরিকল্পনা বৃটেন সমর্থন করিতেছে। এমন কি দরকার হইলে ১৯৪২ সালেও মিত্রপক্ষ অবতরণ করিতে পারেন। ১৪ই এপ্রিল বৃটিশ সুপ্রীম কমাণ্ডের একটি বৈঠকে বড় বড় সামরিক পুরুষদের উপস্থিতিতে পুরাপুরি মার্কিন পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হইল এবং জর্জ মার্শাল যখন বলিলেন—'শ্লেজ হ্যামার' নামে যে জরুরী রণক্রিয়ার পরিকল্পনা আছে, দরকার হইলে সেটা ১৯৪২ সালের শরৎকালের আগেই প্রযুক্ত হইতে পারে, তখন কিন্তু কেহই কোন আপত্তি করিলেন না।[৩]

মার্শাল এবং হপকিন্স তাঁদের লণ্ডন আলোচনার সাফল্যে খুশী হইয়া ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আসলে বৃটিশ সরকারের অনুমোদন ছিল একটা গতানুগতিক ব্যাপার মাত্র। কেননা, বৃটিশ সেনাপতি এ্যালান ব্রুক বলিয়াছেন যে, বৃটিশ সেনানীমণ্ডলী কখনও ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় রণাংগন খোলার প্রস্তাব গভীর-ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই।[৪]

এই কথা যে সত্য, তার প্রমাণ এই যে, কয়েক মাস পরে স্বয়ং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীই স্বীকার করিয়াছেন যে, 'তাঁর স্টাফের মধ্যে এমন কোন দায়িত্বশীল অফিসার ছিলেন

না, যিনি মনে করিতেন যে, ১৯৪২ সালে উত্তর-পশ্চিমে (ফ্রান্সে) কোন অবতরণ করানো সম্ভব। তিনি আর একটি ডানকার্ক ঘটিতে দিতে রাজী ছিলেন না।'[১]

এই সমস্ত ঘটনার উপর মন্তব্য করিয়া সোভিয়েট ঐতিহাসিক মিঃ ইজরায়েলজান বলিতেছেন যে, চার্চিল তাঁর বইতে যে সমস্ত স্বীকৃতি দিয়াছেন, সেগুলির সোজা অর্থ এই যে, তিনি লণ্ডন বৈঠকের আলোচনায় 'double dealing' বা দুমুখো নীতি চালাইতেছিলেন' 'কারণ, কূটনীতি ও প্রভাব খাটাইয়া আমাকে এমনভাবে চলিতে হইতেছিল, যাতে আমাদের প্রিয় মিত্রের সংগে আমরা একত্রে মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিতে পারি। এই মিত্রের সহযোগিতা ছাড়া সারা পৃথিবী একমাত্র ধ্বংস ছাড়া আর কিছুরই সম্মুখীন হইত না।'[২]

বৃটিশ ও মার্কিন রণনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে যে মতবিরোধ ছিল, তার পিছনে ছিল উভয়ের স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ওপর প্রভাব বিস্তারের মতলব। কিন্তু এই মতপার্থক্য সত্ত্বেও ১৯৪২ সালের আরম্ভে বৃটিশ ও মার্কিন গভর্নমেণ্ট পরস্পরের পরিকল্পনার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য বৃটিশ সরকার যে, তখন দ্বিতীয় রণাঙ্গনের বিরোধী ছিলেন, তার মূল কারণ ছিল চার্চিল কর্তৃক বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ এবং জার্মানী ও রাশিয়ার পারস্পরিক লড়াইয়ে উভয়ের শক্তিক্ষয়ের জন্য অপেক্ষা।

১। চার্চিল-রুজভেল্ট-স্ট্যালিন—হার্বার্ট ফীজ, পৃষ্ঠা ৫২।
২। দি এ্যাণ্টি-হিটলার কোয়ালিশন, পৃষ্ঠা ৯৮।

অষ্টম অধ্যায়

ইঙ্গ-সোভিয়েট মৈত্রীর তাৎপর্য

যদিও নাৎসী জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণের পরেই ১২ই জুলাই, ১৯৪১, মস্কোতে বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে পরস্পরকে যুদ্ধ পরিচালনায় সহায়তা করার উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তবু এই চুক্তি যথেষ্ট ছিল না। যেমন, জার্মানীর বিরুদ্ধে 'যুদ্ধে সহায়তা দানের' কথা বলা হইল বটে, কিন্তু জার্মানীর উপগ্রহস্বরূপ রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড, শ্লোভাকিয়া ও হাংগেরী—যারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, সেই সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে বৃটেন যুদ্ধ ঘোষণা করা থেকে ক্ষান্ত ছিল। ফলে, এই চুক্তি 'সম্পূর্ণ' ছিল না। ওদিকে ১৯৪২ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্ম কালে অক্ষ শক্তিবর্গের অভিযান প্রচণ্ড হইয়া উঠিল এবং পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধে মিত্র শক্তিবর্গের সংকট তীব্রতর হইল। ফলে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের দাবী যেমন প্রবলতর হইতে লাগিল, তেমনি বৃটেন, রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে কোয়ালিশন দৃঢ়তর করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল। এই অবস্থায় বৃটেনের সঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ মৈত্রীচুক্তি ও সন্ধি স্বাক্ষরের জন্য সোভিয়েট রাশিয়া অনেক দিন ধরিয়া যে আলোচনা চালাইতেছিল, তার পরিসমাপ্তি ঘটাইবার সুযোগ দেখা দিল—প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্তৃক সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভকে ওয়াশিংটন যাওয়ার নিমন্ত্রণের জন্য। মে মাসে মলোটোভ ওয়াশিংটন যাত্রার পথে লণ্ডনে আসিয়া হাজির হইলেন নূতন সন্ধিচুক্তি আলোচনার জন্য। তখন বৃটেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি মনোভাব খুব অনুকূল ছিল। হিটলারী শক্তির বিরুদ্ধে লালফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য বৃটেনসহ সর্বত্র গভীর সহানুভূতি ও প্রশংসার উদ্রেক করিয়াছিল। বৃটেনে বহু এ্যাংলো-সোভিয়েট ফ্রেণ্ডশিপ সোসাইটি গড়িয়া উঠিল এবং রাশিয়ার স্বপক্ষে বহু জনসভা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।[১]

কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও বৃটেনের সহিত মৈত্রীচুক্তির আলোচনায় প্রথমেই সবচেয়ে বড় বিঘ্ন দেখা দিল সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিম সীমানার প্রশ্নে। অবশ্য ১৯৪১, ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী যখন মস্কোতে গিয়াছিলেন তখনই স্ট্যালিন ও মলোটোভ এই সীমানা মানিয়া লওয়ার জন্য ইডেনের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন। অর্থাৎ জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়ার আক্রমণের সময় ফিনল্যাণ্ড ও রুমানিয়া এবং পোল্যাণ্ডের সঙ্গে রাশিয়ার যে নূতন সীমানা ছিল, আর বাল্টিক রাজ্যগুলি যে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, সেই সমস্তই মানিয়া লওয়ার জন্য বৃটেনের নিকট দাবী করা হইল। কিন্তু 'অতলান্তিক সনদের মূল নীতি বিরোধী' এই যুক্তিতে প্রথম ওয়াশিংটন থেকে এই দাবীই বিরোধিতা করা হইল।[২]

ইডেন অবশ্য তাঁর কুটবুদ্ধি খাটাইয়া মস্কো আলোচনার সময় প্রস্তাব করিয়াছিলেন

১। দি এ্যান্টি-হিটলার কোয়ালিশন. পৃষ্ঠা ৯৯।

২। Russia At War—1941-1945—Alexander Werth. P. 349.

যে, সীমানা সংক্রান্ত এই প্রশ্নগুলির বিবেচনা যুদ্ধ-পরবর্তী শান্তি বৈঠকের অধিবেশন পর্যন্ত স্থগিত রাখা হোক। মার্কিন গভর্নমেণ্টও এই বিষয়ে একমত ছিলেন। কিন্তু মার্কিন ঐতিহাসিক উইলিয়াম হার্ডি ম্যাকনিল বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার পশ্চিম সীমানা সংক্রান্ত প্রশ্নটি শান্তি বৈঠক পর্যন্ত স্থগিত রাখায় অনুরোধের পিছনে বৃটিশ ও লণ্ডনের 'প্রবাসী পোলিশ সরকারের' মনে এই ধারণা ছিল যে, যুদ্ধ পরবর্তীকালে সোভিয়েট ইউনিয়ন ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের তুলনায় অনেক দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং তখন রাশিয়াকে এই সমস্ত শক্তির চাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে হইবে।[১]

কিন্তু সোভিয়েটের এই নূতন সীমানার দাবীর প্রতি বিরূপতা ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল। অবশ্য চার্চিল বা বৃটিশ সরকারের উদারতার জন্য তাঁদের মনোভাবের এই পরিবর্তন ঘটে নাই। এই পরিবর্তনের আসল কারণ প্রধানত তিন প্রকার—

১. ১৯৪২ সালের বসন্ত কালে ক্রমাগত যুদ্ধে নিদারুণ পরাজয়ের জন্য বৃটেনের রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি সংকটজনক হইয়া উঠিল,

২. বৃটিশ জনগণ বার বার এই পরাজয়ের জন্য বিরক্ত ও অতিষ্ঠ হইয়া পড়িল ও সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতার জন্য দাবী জানাইতে লাগিল এবং

৩. মস্কোর যুদ্ধে লালফৌজের আশ্চর্য প্রতিরোধ ও জয়লাভের জন্য সর্বত্র সোভিয়েটের প্রশংসা ধ্বনিত হইতে লাগিল।

এই সময় বৃটিশ সামরিক শক্তির বিপর্যয়ের জন্য লণ্ডনের সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক 'দি ইকোনোমিস্ট' পত্রিকা (যার মতামত রক্ষণশীল) পর্যন্ত প্রায় আর্তকণ্ঠে লিখলেন— **'Britain is loosing the war'**. অপর পক্ষে বৃটিশ ও মার্কিন সেনাপতিরা ২৩শে ফেব্রুয়ারী 'রেড আর্মি' ডে' উপলক্ষে লালফৌজের গুণকীর্তন করিয়া এই আশা ব্যক্ত করিলেন যে, 'তাঁরা একত্রে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ করিবেন।' জেনারেল ম্যাক-আর্থার প্রশান্ত মহাসাগর থেকে তারবার্তায় রাশিয়াকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিলেন—

'The hopes of civilisation rest on the worthly banners of the courageous Russian Army...The scale and grandeur of this effort (the battle of Moscow) makes it as the greatest military achievement in all history.'[২]

ফলে, চার্চিলও স্বীকার করিলেন যে, 'এই সমস্ত ঘটনার চাপে' পড়িয়া সোভিয়েট সীমানা সম্পর্কে তিনিও মত পরিবর্তনে বাধ্য হইলেন। ইডেন, হ্যালিফ্যাক্স প্রভৃতি বৃটিশ নেতারাও সোভিয়েট দাবীর নায্যতা উপলব্ধি করিলেন। কেননা, তাঁরাও অনুভব করিলেন যে, সোভিয়েট সরকার তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরীক্ষাগুলিকে বিদেশী হস্তক্ষেপ ও যুদ্ধের ভয়মুক্ত হইয়া চালাইয়া যাইতে চাহেন এবং এজন্য সর্বাগ্রে চাই 'রাশিয়ার নিরাপত্তার সর্বোত্তম গ্যারেণ্টি।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেন ৩০শে মার্চ ওয়াশিংটনে প্রেরিত একটি টেলিগ্রামে ১৯৪০ সালের সোভিয়েট সীমানা মানিয়া লইবার পক্ষে এমন যুক্তিও দেখাইলেন যে, যেহেতু বৃটেন আপাতত দ্বিতীয় রণাঙ্গন

খুলিয়া স্ট্যালিনকে কোন সামরিক সাহায্য দিতে কিম্বা প্রচুর পরিমাণে সামরিক মালপত্র সরবরাহ করিতে পারিতেছেন না, সেই হেতু—

'Great Britain is forced to conclude this treaty with Stalin as a Political substitute for material military assistance'—

সামরিক সাহায্যের বদলে এই রাজনৈতিক সহায়তা।[১]

বৃটেনের খ্যাতনামা কূটনৈতিক নেতা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এই সময় (১৮ই ফেব্রুয়ারী) সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে প্রবল প্রচারকার্য শুরু করিলেন এবং বৃটেনের সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিস্থানীয় এম. পি.-দের (প্রায় তিনশত) এক সভায় সোভিয়েট রাশিয়ার পশ্চিম সীমানা মানিয়া লইয়া রাশিয়ার সহিত মৈত্র ও পূর্ণ দাবী অত্যন্ত জোরের সঙ্গে উত্থাপন করিলেন। এই সময় বৃটিশ জনমত রাশিয়ার অনুকূলে এত প্রবল ছিল এবং স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের জনপ্রিয়তা এমন বাড়িয়া গেল যে চার্চিলের বদলে ক্রিপসকে বৃটেনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী বলিয়া রাজনৈতিক মহলের অনেকে গণ্য করিতে লাগিলেন।[২]

কিন্তু সোভিয়েটের নূতন সীমানার স্বীকৃতি দিতে কিম্বা ইঙ্গ-সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তির মধ্যে সেই সীমানাকে অন্তর্ভুক্ত করিতে দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও স্বয়ং রুজভেল্টের তীব্র আপত্তি ছিল। সোভিয়েট লেখকদের (ভি. ট্রুখানোভস্কি এবং ভি. ইজরায়েলজান প্রমুখ) মতে এই আপত্তির কারণ ছিল এই যে, আমেরিকা চাহে নাই যে রাশিয়ার সঙ্গে বৃটেনের সম্পর্কের উন্নতি ঘটুক কিম্বা বৃটেন মার্কিন নির্ভরতার দায় থেকে মুক্তি লাভ করুক; এমন কি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে অর্থনৈতিক সাহায্য ও দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রতিশ্রুতি দিয়া সীমানা সংক্রান্ত দাবী থেকে তাকে নিরস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন।[৩]

এই অবস্থায় সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট স্বভাবতঃই উভয় সঙ্কটে পাড়লেন। তাঁরা সীমানার দাবীতে অবিচল থাকিয়া দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সম্ভাবনা বানচাল করিয়া দিবেন কিম্বা সীমানার দাবী আপাতত স্থগিত রাখিয়া বৃটেনের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর করিবেন? অবশেষে প্রস্তাবিত সন্ধিচুক্তির খসড়া থেকে সীমানার প্রশ্নটি বাদ দিয়া সোভিয়েট গভর্নমেন্ট বৃটিশ সরকারের সংগে নূতন চুক্তিতে স্বাক্ষর দিলেন ২৬শে মে, ১৯৪২। দুই প্রকারের সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইল—

একটি চুক্তি নিষ্পন্ন হইল যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য সর্বপ্রকার সামরিক ও অন্যান্য সাহায্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এবং শত্রুপক্ষের সঙ্গে কোন পৃথক সন্ধি না করার প্রতিশ্রুতিতে। আর দ্বিতীয় চুক্তি নিষ্পন্ন হইল যুদ্ধোত্তর পারস্পরিক সহযোগিতা এবং শান্তি রক্ষার জন্য। সন্ধির এই দ্বিতীয় অংশের মেয়াদ ছিল ২০ বছরের জন্য।

সেই সময় বৃটেন ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে এই মৈত্রীচুক্তির গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। কেননা, এত দিন পর্যন্ত বৃটেনের শাসক শ্রেণী ও রক্ষণশীল সমাজ যে সোভিয়েট বিরোধিত করিয়া আসিতেছিলেন এবং এবং মিউনিক চুক্তির তোষণ নীতির দ্বারা যে কূটনৈতিক পন্থা অনুসরণ করিতেছিলেন, ইঙ্গ-সোভিয়েট সামরিক রাজনৈতিক

১। ঐ—পৃষ্ঠা ২৪৯
২। ঐ—পৃষ্ঠা ২৫০
৩। ঐ—পৃষ্ঠা ২৫১

মৈত্রী সেই পথের অবসান ঘটাইল এবং এক নূতনতর সহযোগিতা ও সম্প্রীতির দ্বার উন্মুক্ত হইল।[১]

সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে এই মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা বৃটিশ সরকার ১৯৪২ সালের বসন্তকালে ফ্যাসিস্ট যুদ্ধের বিপদ থেকে অনেকটা রেহাই পাইতে চাহিয়াছিলেন। বৃটিশ নেতাদের মনোভাব থেকেই এমন ধারণা করা যাইতে পারে। বৃটিশ ধনিক সমাজের অন্যতম সেরা নেতা চার্চিলের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী স্বনামধন্য লর্ড বীভারব্রুক নিউইয়র্কে ২৩ শে এপ্রিলের এক বক্তৃতায় বলিলেন—'১৯৪২ সালেই রাশিয়া জয়লাভ করিতে পারে এবং যুদ্ধ খতম হইয়া যাইতে পারে, হয়তো সেটা নিতান্তই একটা চান্স বা ভাগ্যের কথা। কিন্তু একথা সুনিশ্চিত যে, যদি রাশিয়া পরাজিত হয় এবং যুদ্ধ থেকে অপসৃত হয়, তবে আমাদের বরাতে আর কখনও যুদ্ধে জয় ঘটিবে না।'[২]

সুতরাং দেখা যাইতেছে সোভিয়েট রাশিয়া ও বৃটেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত এই সামরিক ও রাজনৈতিক মৈত্রীচুক্তি কেবল চেম্বারলেনীয় দৃষ্টিভঙ্গীরই সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটাইল না, ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় বৃটেনকেও নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিবার সুযোগ দিল এবং ইংগ-মার্কিন-সোভিয়েট মহাজোটের পক্ষে সহযোগিতার ক্ষেত্রে আরও প্রশস্ত করিয়া তুলিল।

১। ঐ—পৃষ্ঠা ২৫৫

২। A History of Anglo-Soviet Relation—W. P and Zeldak Coates. P. 709.

নবম অধ্যায়

দ্বিতীয় রণাঙ্গনের রাজনীতি

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের চাতুর্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের বিতর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় জুড়িয়া আছে। কেননা, ১৯৪১-এর জুন মাস থেকে হিটলারী যুদ্ধের সমস্ত প্রচণ্ডতা প্রধানতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল এবং রাশিয়া প্রচণ্ড ক্ষয় ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে নাৎসী জার্মানীকে প্রতিরোধ করিয়া চলিতেছিল। রাশিয়ার উপর থেকে নাৎসী সামরিক শক্তির অভুতপূর্ব চাপ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে স্বভাবতঃই সোভিয়েট নেতারা ইঙ্গ-মার্কিনের নিকট আবেদন জানাইলেন। ১৯৪১, ৮ই জুলাই ওয়াশিংটনস্থিত সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত লিটভিনোফ ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জন্য দাবী জানাইলেন। ৬ই নভেম্বর স্ট্যালিন এই দাবীর পুনরাবৃত্তি করিলেন এবং ১৯৪২-এর ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি পুনরায় এই দাবী তুলিলেন। লণ্ডনে সোভিয়েট দূত মিঃ মৈস্কি এই দাবীর প্রতিধ্বনি করিলেন এবং লণ্ডনের সংবাদপত্রগুলি এই দাবী সমর্থন করিলেন। 'ডেলী মেল' (রক্ষণশীল) লিখিলেন—'যদি রাশিয়ার পতন ঘটে, তবে আমাদেরও আর জয়ের আশা নাই।'[১]

কিন্তু ১৯৪১ সালে চার্চিল তথা বৃটেন দ্বিতীয় রণাঙ্গনের দাবী গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য যুদ্ধরত ছিল না। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে জাপান কর্তৃক প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযানে শুরু হওয়ার পর মহাযুদ্ধ পৃথিবীব্যাপী ছড়াইয়া পড়িল এবং মিত্রপক্ষের সংকট শুরু হইল। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে নূতন করিয়া হিটলারী অভিযানের হিংস্রতা শুরু হইবে, এই তথ্য প্রায় কোথাও অজানা ছিল না। জার্মান হাইকমাণ্ড শ্রেষ্ঠতর সামরিক শক্তির—সৈন্য ও সমরোপকরণের সমাবেশ ঘটাইতে পারিলেন। কারণ, পশ্চিম ইউরোপ সম্পর্কে জার্মানী নিশ্চিন্ত ছিল। সেখানে মিত্রপক্ষের দিক থেকে কোন আক্রমণ ছিল না। ফলে, জার্মানী তার বাছাই-করা সৈন্য ও সমস্ত রিজার্ভ বা মজুত বাহিনী রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিয়োগ করার সুযোগ পাইল। ১৯৪২ সালের মার্চ থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে অতিরিক্ত ৮০ ডিভিসন সৈন্য সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গনে প্রেরিত হইল এবং শরৎকালের মধ্যে জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে মোট ২৬২ ডিভিসন ও ১৬ ব্রিগেড সৈন্য পাঠাইল। আর রাশিয়া জার্মানীর এবং তার সহযোগী শক্তিবর্গের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে একক লড়িয়া যাইতে বাধ্য হইল। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে যে প্রচণ্ড হিটলারী অভিযান—বিশেষভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে শুরু হইল, সেই চাপ কমাইবার জন্য মিত্র শক্তিবর্গের উচিত ছিল ইউরোপে হিটলারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করা। মার্কিন ও বৃটিশ জনমতও এই আক্রমণাত্মক অভিযানের পক্ষপাতী ছিল এবং

বৃটিশ ও মার্কিনবাহিনীর এই আক্রমণ চালাইবার উপযুক্ত সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিও ছিল।[১]

কিন্তু দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার যে দাবী ছিল বহুলাংশে সামরিক বা রণনৈতিক, তাকে কেন্দ্র করিয়া এক বিচিত্র রাজনৈতিক খেলা শুরু হইল লণ্ডনের ও ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়াশীল মহলে—যে খেলার নাটের গুরু ছিলেন স্বয়ং চার্চিল। নানা প্যাঁচ কষিয়া এবং অজুহাত দেখাইয়া তিনিই ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার দাবী চাপা দিতে লাগিলেন। অথচ আগেই বলা হইয়াছে যে, জনমত ছিল এই রণাঙ্গন খোলার অনুকুলে। এমন কি বৃটেনের শীর্ষস্থানীয় নেতা স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস এবং লর্ড বিভারব্রুক (যিনি অসুস্থতার জন্য ইতিমধ্যে যুদ্ধমন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করিয়াছিলেন) প্রকাশ্যে ও প্রাইভেট আলোচনায় এবং জনসভার দ্বিতীয় রণাঙ্গনের দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। ফলে, চার্চিল ক্রমশঃ নরম এবং রুজভেল্ট ক্রমশঃ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন।

এদিকে সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভ লণ্ডনে ইঙ্গ-সোভিয়েট সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের পর ২৯শে মে ওয়াশিংটনে আসিয়া হাজির হইলেন রুজভেল্টের আমন্ত্রণ অনুসারে। মলোটোভ লণ্ডনে থাকাকালীন চার্চিলের সঙ্গে দ্বিতীয় রণাঙ্গন নিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। কৌশলী চার্চিল এমনভাবে কথাবার্তা চালাইয়াছিলেন যাতে মলোটোভের মনে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে আশা জাগিয়াছিল। কিন্তু মলোটোভ ওয়াশিংটনে পোঁছিবার আগেই চার্চিলের কাছ থেকে রুজভেল্ট যে তারবার্তা পাইলেন, তাতেই 'প্রথম বিপদ সংকেত' পাওয়া গেল। অর্থাৎ চার্চিল ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া আক্রমণে রাজী নন।[২]

মলোটোভ ওয়াশিংটনে রুজভেল্ট এবং তাঁর সামরিক ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদের নিকট ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জরুরী প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, 'এই দাবী সামরিক এবং রাজনৈতিক উভয় প্রকারেরই, কিন্তু আপাতঃ রাজনীতির দিকটাই বড় হইয়া উঠিতেছে।' ১৯৪২ সালে রাশিয়ার বিপদ সম্ভাবনার দিকটাও চিন্তা করা দরকার এবং এই বছরই হিটলারের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনের মারফৎ পশ্চিম দিকে আঘাত হানা প্রয়োজন। যদি মহাজোটের সঙ্গে বৃটেন ও আমেরিকা একটি নূতন রণাঙ্গন খুলিয়া অন্ততঃ ৪০ ডিভিসন নাৎসী সৈন্য রুশ রণাঙ্গন থেকে সরাইয়া নিতে পারেন, তবে সোভিয়েট-জার্মান শক্তির আনুপাতিক হারের এমন পরিবর্তন ঘটিয়া যাইবে যে, এই বছরই হিটলারের পরাজয় ঘটিতে পারে। কিংবা তার পতন অবশ্যম্ভাবী হইবে।[৩]

মলোটোভ আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯৪৩ সাল সম্পর্কে এমন সতর্কবাণী উচ্চারণ করিলেন যে, ১৯৪২ সালের তুলনায় আগামী বছর মিত্রশক্তির পক্ষে আরও কঠিন হইতে পারে। কারণ, হিটলার সমগ্র ইউরোপের প্রভু হইয়া বসিতে পারে। এমন কি, জার্মানীর আঘাত এত প্রচণ্ড হইতে পারে যে, তারা গোটা উক্রাইন ও ককেশাস পর্যন্ত দখল করিয়া নিতে পারে।

১। The Anti-Hitler Coalition—Page 111
২। রুজভেল্ট এণ্ড হপকিন্স—পৃষ্ঠা ৫৫৬।
৩। ঐ পুস্তক—পৃষ্ঠা ৫৬২-৬৩।

যদিও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর মলোটোভের সঙ্গে আলোচনার জন্য ৯ দফার একটা ফর্দ দিয়াছিলেন, তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেগুলির একটির সঙ্গেও ইউরোপীয় যুদ্ধের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না।[০]

(এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটি ছিল আলাস্কা দিয়া সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিমান সার্ভিস প্রবর্তন, তুরস্কের সঙ্গে বিরোধে মধ্যস্থতা, ১৯৩৯ সালের জেনেভা যুদ্ধবন্দী আইন ইত্যাদি)।

রুজভেল্ট অবশ্যই রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং মলোটোভের সঙ্গে আলোচনার পর তিনি মার্কিন সেনানী মণ্ডলীর বড় কর্তা জর্জ মার্শালের সঙ্গে পরামর্শের পর তিনি মলোটোভকে এই বছরেই (১৯৪২) দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ভরসা দিলেন। এমন কি ১১ই জুন, ১৯৪২, যে ইস্তাহার প্রকাশিত হইল, তাতে মলোটোভকে নীচের কথাগুলি উল্লেখ করার অনুমতি দেওয়া হইল—বাহ্যত যার অর্থ দাঁড়ায় দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান, কিন্তু যেগুলি নিয়া পরবর্তীকালে বহু বিতণ্ডা হইয়াছিল। সেই বিতর্কিত বাক্যাংশ দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে ছিল এই ঃ

'In the course of the conversation full understanding was reached with regard to the urgent tasks of creating a Second Front in Europe in 1942.

অর্থাৎ ১৯৪২ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জরুরী কর্তব্য সম্পর্কে (মলোটোভের সঙ্গে) আলোচনার সময় সম্পূর্ণ বুঝাপড়া হইয়াছিল।[১]

লণ্ডনে ইঙ্গ-সোভিয়েট মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর এবং ওয়াশিংটনে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে এই প্রতিশ্রুতিমূলক ইস্তাহার প্রকাশিত হওয়ার পর মলোটোভ যখন মস্কোতে ফিরিয়া গেলেন, তখন বৃটিশ-মার্কিন-সোভিয়েট জোট সম্পর্কে রাশিয়ার সংবাদপত্রে ও জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড আশা জাগিয়াছিল। এমন কি, এই ঘটনার প্রতি এত গুরুত্ব দেওয়া হইল যে, সুপ্রীম সোভিয়েটের এক বিশেষ অধিবেশন ডাকা হইল—যে অধিবেশনে সোভিয়েট ইউনিয়নের দূরদূরান্তের সদস্যগণ এবং 'ভারতীয় শাড়ীর মত সুন্দর উজ্জ্বল প্রাচ্য সজ্জায় সজ্জিতা বহু মহিলা পর্যন্ত যোগ দিয়াছিলেন।' এই অধিবেশনের কক্ষে স্ট্যালিন ঢুকিবামাত্র উৎসাহী সদস্যগণ দাঁড়াইয়া উঠিয়া কয়েক মিনিটের জন্য স্ট্যালিনের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন।[২]

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভের বক্তৃতা ও দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে ভরসার কথা শুনিয়া সদস্যগণ করতালি ধ্বনি দিয়া তাঁকে অভিনন্দিত করিলেন।...

কিন্তু শীঘ্রই সোভিয়েট জনগণের এই উৎসাহ নিভিয়া গেল এবং সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের মনে ইঙ্গ-মার্কিন সততা সম্পর্কে সন্দেহ জাগ্রত হইল। কেননা, ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রস্তাব চার্চিলের কূটবুদ্ধির পাহাড়ে ঠেকিয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

* * *

দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলা সম্পর্কে ১১ই জুনের সেই বিখ্যাত ইস্তাহারটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লণ্ডনে ও ওয়াশিংটনে পর্দার আড়ালে কূটনৈতিক সাড়া শুরু হইয়া

০। ফ্লেমিং—কোল্ড ওয়ার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৯।
১। রুজভেল্ট এণ্ড হপকিন্স—পৃষ্ঠা ৫৭৭।
২। Alexander Werth—Russia at War, P. 354.

গিয়াছিল। মার্কিন কর্তৃপক্ষের দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি কার্যক্ষেত্রে যাতে রূপায়িত হইতে না পারে, তার জন্য বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্যাঁচ কষিবার কোন ত্রুটি ছিল না। মলোটোভের নেতৃত্বে সোভিয়েট ডেলিগেশন ওয়াশিংটন ত্যাগ করার পর মুহূর্তেই চার্চিলের পক্ষ থেকে এ্যাডমিরাল লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সকাশে গিয়া হাজির হইলেন। ভারতে বৃটিশ রাজত্বের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আমাদের দেশে এত পরিচিত যে, তাঁর সম্পর্কে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র। 'নীল রক্তের' অধিকারী এই অভিজাত শ্রেষ্ঠ (তিনি ইংলণ্ডের রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত—রাজার খুল্লতাত ভ্রাতা) চার্চিলেরও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। পরবর্তীকালে জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের পালটা অভিযানে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুপ্রীম কমাণ্ডারের পদে ছিলেন। অর্থাৎ বৃটিশ সেনানী মহলে তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন ৩রা জুন, ১৯৪২, ওয়াশিংটনে পেঁাছিলেন এবং দুই সপ্তাহ সেখানে অবস্থান করিলেন। তিনি এই দুই সপ্তাহ ধরিয়া রুজভেল্ট ও মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলীকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন কেন ১৯৪২ সালে ফ্রান্সে সসৈন্যে অবতরণ করা কষ্টকর। সেখানে ইতিপূর্বেই ২৫ ডিভিসন জার্মান সৈন্য রহিয়াছে, অতএব পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মান সৈন্যের চাপ কমাইবার কোন সুযোগ নাই। অধিকন্তু ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া উপকূলে অবতরণের জন্য যে ধরনের পোত (ল্যাণ্ডিং ক্রাফট) দরকার, সেই সমস্ত পোতের একান্ত অভাব রহিয়াছে। সুতরাং মাউণ্টব্যাটেনের আলোচনা থেকে মার্কিন সামরিক মহলে ধারণা হইল যে, ফ্রান্সে অবতরণের প্রস্তাব বৃটিশ রণনীতিবিদদের বিবেচনায় বাস্তবতাসম্মত নয়। তবু ১৯৪২ সালে নিশ্চয়ই ইঙ্গ-মার্কিন মহল চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, কিছু রণক্রিয়া দরকার এবং সেটা ঘটানো উচিত উত্তর আফ্রিকায়, সেখান থেকে বলকানের ভিতর দিয়া বেলগ্রেড হইয়া ওয়ারশ' পেঁাছানো যাইবে।[১]

মাউণ্টব্যাটেন যেটুকু রাখিয়া-ঢাকিয়া বলিয়াছিলেন, চার্চিল সেটুকুও ফাঁস করিয়া দিলেন। তিনি ১৯শে জুন সদলবলে ওয়াশিংটনে পেঁাছিয়া সরাসরি রুজভেল্টকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন কেন ফ্রান্সে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা সম্ভব নয়। ইউরোপের বদলে তিনি উত্তর আফ্রিকা আক্রমণের উপর জোর দিলেন। চার্চিল জানিতেন যে, 'নৌ-বিভাগীয় পুরুষ' হিসাবে রুজভেল্টের নৌ-অভিযানের প্রতি একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। সুতরাং উত্তর আফ্রিকা অভিযান তিনি পছন্দ করিবেন। কিন্তু এভাবে পূর্বেকার সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ মলোটোভের কাছে প্রদত্ত দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রতিশ্রুতি) বদল করার জন্য জেনারেল মার্শাল মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে ক্ষোভ ও বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু চার্চিল বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের ও ফরাসী রণক্ষেত্রের অজস্র রক্তপাতের স্মৃতিতে তখনও বিচলিত ছিলেন। অতএব ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার প্রস্তাবে যেন তিনি 'রক্তনদীর বিভীষিকা' দেখিতে লাগিলেন![২]

নিউইয়র্ক থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে হাইড পার্কে রুজভেল্টের পারিবারিক ভবনে (হাজার হাজার বিঘার উপর অবস্থিত এই বিশাল পল্লীভবন ছিল এক বৃহৎ

১। D. F. Fleming—Cold War (1917-1960)—Vol. I, P. 150.

২। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৫০।

জমিদারীর মত। জীবনযাত্রার উপকরণে প্রাচুর্য এবং প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য কোনটারই এখানে অভাব ছিল না।) দ্বিতীয় রণাঙ্গনের বিষয় নিয়া চার্চিল ও রুজভেল্টের মধ্যে প্রথম আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। চার্চিল এই আলোচনার জন্য একটি স্মারকলিপি তৈয়ারী করিয়া নিয়া গিয়াছিলেন। এই স্মারকলিপিতে তিনি পরিষ্কার করিয়াই বলিলেন যে, ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরে উত্তর ফ্রান্সে ৬ বা ৮ ডিভিসন সৈন্যসহ অবতরণের পরিকল্পনা নিয়া প্রস্তুতি চলিতেছিল বটে, কিন্তু ১৯৪২ সালের এই 'সীমাবদ্ধ রণক্রিয়া' যদি বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে, তাহলে বৃটিশ সরকার এমন হঠকারী অভিযানে রাজী নন।

অর্থাৎ 'শ্লেজ হ্যামার'-এর বদলে চার্চিল ও বৃটিশ সেনাপতিরা 'জিমন্যাস্ট' বা উত্তর আফ্রিকা অভিযানই শ্রেয় ও বাস্তববুদ্ধিসম্মত বলিয়া দাবী করিলেন। কিন্তু রুজভেল্ট ও তাঁর সামরিক পরামর্শদাতারা গ্রীষ্মকালীন জার্মান অভিযানের মুখে রাশিয়ার অনিশ্চিত ভাগ্যের কথা বিবেচনা করিয়া 'শ্লেজ হ্যামার'-এর পরিকল্পনা করিয়াছিলেন যার দ্বারা ফ্রান্সে অবতরণ ও দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করা যাইতে পারে। কিন্তু চার্চিলের সঙ্গে আলোচনায় বুঝা গেল বৃটিশ সরকার ১৯৪২ সালে ফ্রান্সে অবতরণে আদৌ রাজী নন।

খ্যাতনামা মার্কিন ঐতিহাসিক মিঃ শেরউড লিখিয়াছেন যে, 'দ্বিতীয় রণাঙ্গন নিয়া এভাবে অতি তীব্র ও তিক্ত বিতর্কের শুরু হইল' এবং মার্কিন ও রুশ মহলে চার্চিলই এই ব্যাপারে পাকা দুষমনরূপে চিহ্নিত হইলেন। এমন কি চার্চিল যখন মস্কোতে এই বিষয়ে স্ট্যালিনের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন স্ট্যালিন তাঁর মুখের উপর 'নেহাৎ কাঠখোট্টার মত' বৃটিশের বিরুদ্ধে 'কাপুরুষতার' অভিযোগ করিয়াছিলেন![1]

এর পর হাইড পার্ক থেকে হোয়াইট হাউজে আলোচনার সময় লিবিয়াতে বৃটিশ যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে ২১শে জুন, রবিবার সকালবেলা রুজভেল্ট চার্চিলের হাতে এক টুকরা কাগজ দিলেন, যাতে তোব্রুকের পতন সংবাদ ছিল। এর আগের বছর ৮ মাসের অধিক বা ৩৩ সপ্তাহ ধরিয়া তবব্রুক অবরুদ্ধ অবস্থায় আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছিল। এক্ষণে রোমেলের মাত্র একটি আঘাতে এবং ট্যাঙ্ক যুদ্ধের নৈপুণ্যে এক দিনের মধ্যেই তোব্রুক ধরাশায়ী হইল। এই খবরে চার্চিল একেবারে মুষড়াইয়া পড়িলেন এবং তাঁর মহাযুদ্ধের পুস্তকে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—

'This was one of the heaviest blows I can recall during the war. Not only were its milltary effects grievous, but it had affected the reputation of the British armies.—[2]

তোব্রুকের পতন বা উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে রোমেলের হাতে বৃটিশ পক্ষের এই বিপর্যয়ের পর ফ্রান্সে অবতরণের বিপক্ষে চার্চিলের মতামত আরও কঠোর হইল। তিনি হোয়াইট হাউজের এক দীর্ঘ নৈশ আলোচনা সভায় আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগর হইয়া বলকান অভিমুখে জার্মানীর 'নরম তলপেটে' আঘাত হানার (এটি ছিল চার্চিলের একটি বাতিকগ্রস্ত রণনৈতিক তত্ত্ব) জন্য 'এমন এক চিত্ত-চমৎকারী, গভীর আবেগপূর্ণ ভাষণ দিলেন, যেটা ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা বক্তৃতা' এবং 'যদিও

১। রুজভেল্ট এন্ড হপকিন্স—পৃষ্ঠা ৫৯০।
২। The Second World War, Vol. 4, P. 43.

জেনারেল মার্শালের পক্ষ থেকে কর্নেল ওয়েডমেয়ার যুক্তি তর্ক, তথ্য ও প্রমাণযোগে চার্চিলের বক্তব্য ধূলিসাৎ করিয়া দিলেন। তবু চার্চিল এক ইঞ্চি নড়িলেন না!'[১]

* * *

ওয়াশিংটন থেকে চার্চিল তড়িঘড়ি করিয়া ফিরিয়া আসিলেন লণ্ডনে এবং এক ক্রুদ্ধ জনমত ও বিক্ষুব্ধ পার্লামেণ্টের সম্মুখীন হইলেন লিবিয়া বা উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে রোমেলের নিকট পরাজয়ের জন্য। কমন্সসভায় চার্চিলের বিরুদ্ধে এক অনাস্থা প্রস্তাব উত্থিত হইল, লর্ড উইণ্টারটন চার্চিলের পদত্যাগ দাবী করিলেন। কিন্তু চার্চিলের কৃতিত্ব এই যে, তিনি এই পার্লামেণ্টারী ঝড় পার হইয়া আসিলেন এক বলিষ্ঠ বক্তৃতার জোরে। চার্চিলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ৪৭৩-২৫ ভোটে নাকচ হইয়া গেল। তবু জনমতের এই ক্রুদ্ধ অভিব্যক্তি দেখিয়া তিনি অনুভব করিলেন যে, বৃটিশ সামরিক মর্যাদা বাঁচাইবার জন্য একটা জরুরী কিছু করিতেই হইবে। অতএব উত্তর আফ্রিকায় ইঙ্গ-মার্কিন অবতরণ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে এবং অন্য দিকে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির দায়িত্বও এড়ানো যাইবে, আর সোভিয়েট রাশিয়াকে একাকী জার্মান আসুরিক শক্তির সহিত মুখোমুখি লড়িয়া বলক্ষয়ের মধ্যে পড়িতে হইবে।—এই কূটকৌশল এবং দুমুখো নীতিই অনুসরণ করিতে চাহিলেন। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—

'জুলাই মাসে যখন রাজনৈতিক দিক দিয়া আমার অবস্থা ছিল একেবারেই কাহিল, আর সামরিক দিক দিয়া কোন প্রকার সাফল্যের আশা ছিল না, সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এমন একটা সিদ্ধান্ত আমাকে আদায় করিয়া আনিতে হইয়াছিল, যে সিদ্ধান্ত পরবর্তী দুই বছর কাল ধরিয়া যুদ্ধের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। সেই সিদ্ধান্ত হইল ১৯৪২ সালে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমণের সমস্ত প্ল্যান পরিত্যাগ এবং একটি প্রকাণ্ড ইঙ্গ-মার্কিন অভিযাত্রী বাহিনীসহ শরৎকালে বা শীতকালে ফরাসী উত্তর আফ্রিকা দখল।'[২]

যদিও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং জেনারেল মার্শাল প্রভৃতি ১৯৪২ সালেই ইউরোপে অবতরণ ও দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু লণ্ডনের এবং ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়াশীল মহল সেই সংকল্প নষ্ট করিরা দেওয়ার জন্য কলকাঠি নাড়িতে লাগিলেন।

আর রুজভেল্টও ক্রমশঃ সেই দিকে ঝুঁকিতে লাগিলেন এবং শেষ পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার দিকেই মনযোগ দিলেন। মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল মহল সোভিয়েট রাশিয়ার বিরোধী ছিলেন, তাঁরা চাহিতেছিলেন জার্মানীর সহিত যুদ্ধে রাশিয়া হৃতবল হোক এবং সেই সঙ্গে তাঁদের এই ধারণাও ছিল যে, ১৯৪২ সালের হিটলারী গ্রীষ্মাভিযানে রাশিয়া খতম হইবে না। অতএব দ্বিতীয় রণাঙ্গনের দরকার নাই। অধিকন্তু মার্কিন একচেটিয়া কারবারের মুনাফা শিকারীরা উত্তর আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি দিলেন। ফ্রান্সের এই দুঃসময়ের সুযোগে তাঁরা ফরাসী উপনিবেশগুলি হাত করিতে চাহিলেন। কিন্তু তার জন্য চাই বৃটেনের আগেই সেখানে পেঁছানো

১। ডি. এফ. ফ্লেমিং—দি কোল্ড ওয়ার, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫১।

২। চার্চিল—দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩২-৩৩।

৩। British Foreign Policy During World War II, Moscow, P. 260.

বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই সমস্ত পরিকল্পিত প্রস্তাব নিয়া যে মতভেদ ও বিতর্ক চলিয়াছিল, তার চূড়ান্ত মীমাংসার উদ্দেশ্যে চার্চিল-সরকারের সংগে আলোচনার জন্য রুজভেল্ট হপকিন্স ও জর্জ মার্শালকে লণ্ডনে পাঠাইলেন। অবশ্য রুজভেল্ট তখন মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন বৃটেনের সহিত একত্রে উত্তর আফ্রিকা অভিযানে যাওয়ার জন্য এবং তিনি লণ্ডনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য এক সপ্তাহের সময় দিলেন। তবু, তিনি মার্কিন প্রতিনিধিদ্বয়কে নির্দেশ দিলেন যে, ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সালের ইংগ-মার্কিন সামরিক পরিকল্পনা স্থির করিতে গিয়া উত্তর ফ্রান্সে অবতরণ ও রাশিয়ার উপর জার্মানীর চাপ হ্রাস করা যায় কিনা, সেটাও নিশ্চয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু যদি এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়, তবে, ১৯৪২ সালে মার্কিন সৈন্যেরা কোথায় আঘাত হানিবে, সেটাও পাকাপাকি স্থির করিতে হইবে এবং সেই সংগে মধ্যপ্রাচ্যকে সুরক্ষিত রাখার কথাও ভাবিতে হইবে।[১]

কিন্তু মার্কিন ঐতিহাসিক ট্রাম্বুল হিগিন্স (দ্বিতীয় রণাংগন সম্পর্কে তাঁর পুস্তক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) বলিতেছেন যে, হপকিন্স-মার্শাল মিশন ১৮ই জুলাই তারিখে দ্বিতীয়বার লণ্ডনে পৌঁছিবার আগেই কার্যত 'শ্লেজহ্যামার' পরিকল্পনা (ফ্রান্সে আক্রমণ) গতায়ু হইয়াছিল!

এই সিদ্ধান্তের পিছনে চার্চিলের মনোভাব এই ছিল যে, ১৯৪২ সালে রাশিয়ার পতন কিম্বা জয় সম্ভাবনার ভিত্তির উপরেই ফ্রান্সে অবতরণের কথা চিন্তা করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু জয়পরাজয়ের বাইরে একটা মধ্যবর্তী অবস্থারও উদ্ভব হইতে পারে। অতএব দ্বিতীয় রণাংগন সৃষ্টির দ্বারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে চাপ হ্রাস করার জন্য এত তাড়া কিসের? তার চেয়ে বরং জার্মানী ও রাশিয়া পরস্পরের রক্ত মোক্ষণ করিতে থাকুক।[২]

হপকিন্স ও মার্শাল বৃটিশ পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করিয়া বুঝিলেন যে, তাঁরা দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার পক্ষপাতী নন। তখন হপকিন্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রধান সেনাপতির' (প্রেসিডেণ্ট পদের অধিকারীই মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ) চূড়ান্ত মতামত জানিতে চাহিলেন এবং রুজভেল্টও উত্তর আফ্রিকার অনুকূলেই মত দিলেন। ট্রাম্বুল হিগিন্স লিখিয়াছেন যে, ২৫শে জুলাই রাত্রিবেলা হপকিন্স প্রেসিডেণ্টকে এমন একটি তারবার্তা পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যেটা সংক্ষিপ্ততম রচনার জয়স্তম্ভের মত! একটি মাত্র শব্দ ছিল এই তারবার্তায়—'আফ্রিকা'। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টেরও তেমনি সংক্ষিপ্ত জবাব—'থ্যাংক গড!' (ভগবানকে ধন্যবাদ)।[৩]

সুতরাং ১৯৪২ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রস্তাব সুনির্দিষ্টরূপেই পরিত্যক্ত হইল। ফলে, দাঁড়াইল এই যে, ১৯৪২ সালের উত্তর আফ্রিকা অভিযানে এত লোকজন, জাহাজ, নৌবল, বিমানবল ইত্যাদি সংগ্রহ ও সমাবেশ করিতে হইল যে, ১৯৪৩ সালের প্রস্তাবিত ইউরোপীয় অভিযানের বা দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির আর সুযোগ রহিল না। মার্কিন সেনাপতি জর্জ মার্শাল, মার্কিন সমরসচিব স্টিমসন, এমন কি বৃটিশ সেনানীদের বড়কর্তা ফিল্ড মার্শাল স্যার জন ডীল পর্যন্ত সুস্পষ্ট

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৬০।
২। ঐ—পৃষ্ঠা ২৬১।
৩। ঐ পুস্তক—পৃষ্ঠা—ঐ।

বলিয়াছিলেন যে, ১৯৪২ সালে যদি উত্তর আফ্রিকা আক্রমণ করা হয়, তবে, ১৯৪৩ সালে ফ্রান্সে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির উপযোগী শক্তি সমাবেশ করার জন্য বৃটেনে কোন প্রস্তুতি ঘটানো সম্ভব হইবে না।[১]

উত্তর আফ্রিকা অভিযানের এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর ওর নূতন সাঙ্কেতিক নাম হইল 'টর্চ'।

বলা বাহুল্য যে, বৃটিশ ও মার্কিন সরকার কর্তৃক দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সংবাদ জুলাই মাসের মাঝামাঝিতেই সোভিয়েট সরকারের নিকট পৌঁছিল এবং স্ট্যালিন ২৩শে জুলাই তারিখে চার্চিলের নিকট প্রেরিত এক বার্তায় এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। তিনি লিখিলেন—'আমার আশংকা এই যে, ব্যাপারটা একটা অসংগত পরিণতির দিকে মোড় নিতেছে। সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গনের পরিস্থিতির বিবেচনায় আমি সর্বাধিক দৃঢ়তার সংগে একথা না বলিয়া পারিতেছি না যে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রস্তাব স্থগিত রাখা সোভিয়েট সরকার বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নন।'[২]

সোভিয়েট নেতাদের প্রতিবাদের এবং আশাভঙ্গের যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। কারণ, উত্তর আফ্রিকা সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্তের দ্বারা রাশিয়ার সংগে প্রতিশ্রুতি ভংগ না করিয়া ইংগ-মার্কিন পক্ষ অনায়াসে ১৯৪২ সালেই উত্তর ফ্রান্সে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিতে পারিতেন। সোভিয়েট ঐতিহাসিকদের (ভি. ট্রুখানোভস্কি ও ভি. ইস্রায়েলজান) মতে জার্মানী যখন পূর্ব রণাঙ্গনে তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিল, তখন এক বছর ধরিয়া মার্কিন ও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁদের সামরিক শক্তি সংগঠিত করিতেছিলেন। সৈন্যবাহিনী ও যান্ত্রিক সজ্জা উভয় দিক দিয়াই তাঁদের শক্তি উপযুক্ত ছিল।[৩]

পশ্চিম ইউরোপে জার্মান প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা আদৌ উৎকৃষ্ট ছিল না। বরং সেখানকার জনগণ মিত্রপক্ষের সম্ভাব্য আক্রমণের প্রতীক্ষায় ছিলেন। এর প্রমাণ এই যে, ভিসি সরকারের মার্কিন রাষ্ট্রদূত এ্যাডমিরাল লীহাই তাঁর সরকারের নিকট এপ্রিল মাসে এই মর্মে রিপোর্ট দিয়াছিলেন যে, 'অধিকৃত এলাকার ফরাসী জনগণ এই সম্ভাবনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এবং অনধিকৃত এলাকার জনগণের কাছ থেকেও অনুরূপ মর্মে অনেক চিঠিপত্র ও মতামত পাওয়া যাইতেছে। আমার বিশ্বাস ফরাসীদের মনে নিঃসন্দেহে এমন অনুভূতি আছে যে, (মিত্রপক্ষের দিক থেকে) এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার একান্তই দরকার আছে এবং এই উদ্যোগ অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি নিতে হইবে।[৪]

চার্চিল পশ্চিম ইউরোপে জার্মান সৈন্যশক্তির দোহাই দিয়া ফ্রান্সে অবতরণের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় পশ্চিম ইউরোপে জার্মানীর শক্তি কতটা ছিল ?—একথা সর্বজনবিদিত যে, ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে জার্মানী পূর্ব রণাঙ্গনে অভূতপূর্ব সৈন্যশক্তির সমাবেশ ঘটাইয়াছিল। ১৯৪২-এর জানুয়ারী মাসে হিটলারের সমগ্র স্থলবাহিনীর শতকরা ৭০ ভাগ সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত ছিল সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গনে এবং ১৯৪২-এর ১লা জুলাই তারিখের মধ্যে এই শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৬১ এবং রুজভেল্ট এণ্ড হপকিন্স, পৃষ্ঠা ৫৯০।
২। Correspondence—Stalin-Churchill-Roosevelt. Vol. 1, P. 56.
৩। British Foreign Policy During World War II—P. 257.
৪। রবার্ট ই. শেরউড—পৃষ্ঠা ৫৩৯-৪০।

৭৬.৩ ভাগে দাঁড়াইল। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গনে এত বেশী সংখ্যক সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছিল যে, এর আগে বা পরে এত বেশী হিটলারী সৈন্য আর কখনও নিযুক্ত হয় নাই।[১] সুতরাং চার্চিলের জবাবে বলা যায় যে, পশ্চিম ইউরোপে কত সংখ্যক জার্মান সৈন্য ছিল? তারপর এই সৈন্যদলের গুণ বা যোগ্যতাই বা কতটুকু ছিল? যুদ্ধের পর জার্মান সেনাপতিরাই যেমন, লেঃ জেনারেল বডো জিমারম্যান স্বীকার করিয়াছেন যে, পশ্চিম ইউরোপে ভালো ভালো যে সমস্ত সৈন্য ছিল, তাদের বাছাই করিয়া পূর্ব রণাঙ্গনে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং 'নিকৃষ্টতর সৈন্যের' দ্বারা ফাঁক পূরণ করা হয়। আবার এই সমস্ত সৈন্যেরাও যখন উপযুক্ত লড়িয়ে হইয়া উঠিত, তখন তাদেরও পূর্ব রণাঙ্গনে পাঠাইয়া দেওয়া হইত।

তার পর ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যবাহিনীর অবতরণ সম্ভাবনায় বাধা দেওয়ার জন্য যে প্রতিরক্ষাব্যূহ জার্মানী গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং বৃটিশ মহল যে ব্যূহগুলির উপর এত জোর দিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে সেগুলিও দুর্লঙ্ঘ্য বা দুর্ভেদ্য ছিল না। পশ্চিম ইউরোপের এই সমস্ত প্রতিরক্ষা-প্রাচীর 'অতলান্তিক প্রাচীর' নামে অভিহিত ছিল এবং এগুলি সম্পর্কে জার্মান জেনারেলরাই স্বীকার করিয়াছেন যে, মাত্র ১৯৪২ সালের বসন্তকালে এগুলির নির্মাণ কার্য শুরু হইয়াছিল এবং এগুলির দুর্ভেদ্যতা একমাত্র গোয়েবলসের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল।[২]

১৯৪২ সালে পশ্চিম ইউরোপে অবতরণের বিরুদ্ধে চার্চিল আর-একটি 'জোরালো যুক্তি' দেখাইয়াছিলেন—অবতরণ-নৌকা বা ল্যান্ড-ক্রাফট-এর অভাব। কিন্তু এই যুক্তিও ধোপে টিঁকে না। কারণ, ১৯৪২ সালেই উত্তর আফ্রিকা অভিযানে যে প্রচুর সংখ্যক অবতরণ নৌকা ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেগুলি কোথা হইতে আসিয়াছিল? মার্কিন ঐতিহাসিক ট্রাম্বলু হিগিন্স বলিয়াছেন যে, ১৯৪২ সালের শেষে, অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকা অভিযানের পর অবতরণ-নৌকার নির্মাণ 'একেবারে বেপরোয়াভাবে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অতএব উপযুক্ত নৌকার অভাব ছিল, এমন যুক্তি নিতান্তই 'বাজে'! মিঃ শেরউডও এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, 'আগে নৌ-বিভাগের নির্মাণ কার্য তালিকায় অবতরণ-নৌকার স্থান ছিল দশের কোঠায়। কিন্তু উত্তর আফ্রিকা অভিযানের আগে অক্টোবর মাসে তার স্থান উপরে চড়িয়া বসিল দুইয়ের কোঠায় কিংবা বিমান বাহী জাহাজগুলির পরেই। কিন্তু পরের মাসেই এগুলির স্থান নামিয়া গেল বারোর কোঠায়!'[৪]

অতএব এই সমস্ত তথ্য ও যুক্তি থেকে দেখা যাইতেছে যে, চার্চিল তথা বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ ১৯৪২ সালেই পশ্চিম ইউরোপে আমেরিকার সঙ্গে একত্রে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিতে পারিতেন—যদি সেই সময় বিপন্ন সোভিয়েট রাশিয়াকে হাতে-কলমে সহায়তা করার কিম্বা পূর্ব রণাঙ্গন থেকে হিটলারী সৈন্যের চাপ হ্রাস করার আন্তরিক ইচ্ছা তাঁদের থাকিত। কিন্তু তার বদলে লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের সোভিয়েট বিরোধী মহল অপেক্ষা করিয়াছিলেন রাশিয়া ও জার্মানীর শক্তি ক্ষয়ের জন্য এবং বিশেষভাবে চার্চিল চাহিয়াছিলেন আগে ভূমধ্যসাগরের দিকে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার জন্য।

১। এ্যান্টি-হিটলার কোয়ালিশন পৃষ্ঠা ১১৭।
২। বৃটিশ ফরেন পলিসি, পৃষ্ঠা ২৬৬।
৩। ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৬৬।
৪। রুজভেল্ট এ্যান্ড হপকিন্স, পৃষ্ঠা ৫৫৪।

দশম অধ্যায়

মস্কোতে চার্চিল-স্ট্যালিন সাক্ষাৎ

দ্বিতীয় রণাঙ্গনের বিতর্ক

১৯৪২ সালে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলা হইবে না, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সেই 'দুঃসংবাদ' কিভাবে স্ট্যালিনকে দেওয়া যায় সেকথা চিন্তা করিয়া ইঙ্গ-মার্কিন মহল কিছুটা উদ্বেগ বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বয়ং চার্চিল এই উদ্বেগের অবসান ঘটাইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি নিজেই মস্কোতে গিয়া স্ট্যালিনকে বুঝাইবেন। কিন্তু একা নন, সঙ্গে আভেরিল হ্যারিম্যানও যাইবেন খোদ রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসাবে। অর্থাৎ স্ট্যালিনকে বুঝানো হইবে যে, ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ এই সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হইয়া চলিতেছেন।

১২ই আগস্ট, ১৯৪২ সন্ধ্যাবেলা চার্চিল ও হ্যারিম্যান বড় বড় সামরিক পুরুষদের সঙ্গে নিয়া মস্কোতে পেঁাছিলেন। এই যাত্রায় চার্চিলের সঙ্গে অন্যান্য বড় বড় সামরিক পুরুষদের মধ্যে ছিলেন লর্ড ওয়েভেল—যিনি ব্রহ্ম-ভারত রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি এবং তারপর ভাইসরয় বড়লাটরূপে ভারতবাসীর নিকট ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। লর্ড ওয়েভেল রুশ ভাষা জানিতেন এবং তা ছাড়া তিনি সাহিত্যরসিক ছিলেন। চার্চিল তাঁর মস্কো যাত্রার স্মৃতি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, যে অশুভ বলসেভিক রাষ্ট্রকে তিনি জন্মলগ্নেই গলা টিপিয়া মারিতে চাহিয়াছিলেন, যাকে তিনি সেদিনও—হিটলারের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত সভ্য মানুষের স্বাধীনতার শত্রু বলিয়া মনে করিতেন, সেই দেশে গিয়া আজ তিনি কি বলিবেন? সাহিত্যরসিক লর্ড ওয়েভেল অবশ্য সমগ্র অবস্থাটা একটা কবিতার মধ্যে পরিস্ফুট করিয়াছিলেন। এই কবিতার কয়েকটি স্তবক ছিল এবং প্রত্যেকটি স্তবকের শেষেই এই লাইনটি ছিল:

"No Second Front in nineteen forty two!"

সুতরাং চার্চিলের মনে হইতেছিল যে, তিনি যেন উত্তর মেরুতে প্রকাণ্ড একটা বরফের পিণ্ড নিয়া যাইতেছেন।[১]

মস্কো বিমান বন্দরে চার্চিলকে যথারীতি সাড়ম্বর অভ্যর্থনা জানানো হইয়াছিল। মলোটোভ তাঁকে নিজের মোটরে মস্কো থেকে ৮ মাইল দূর ৭নং স্টেট ভিলাতে নিয়া গেলেন। চার্চিল লিখিয়াছেন—মস্কো শহরের ভিতর দিয়া যাওয়ার সময় দেখিলাম রাস্তাগুলি জনশূন্য। একটু হাওয়া পাওয়ার জন্য আমি গাড়ীর জানালাটা একটু ফাঁক করিতে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম জানালার কাঁচ দুই ইঞ্চিরও বেশী পুরু! আমার জীবনে যত অভিজ্ঞতা ছিল, এটা কিন্তু সেই সমস্ত রেকর্ড ছাড়াইয়া গেল। আমাদের দোভাষী প্যাভলেভ বলিলেন—'মন্ত্রী মহাশয়ের মতে এটাই বেশী বিচক্ষণতাসম্মত।' অর্থাৎ 'নিরপত্তার জন্য এই সতর্কতা।'

১। চার্চিল—দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২৮।

সেই ৭নং ভিলা বা রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় প্রবেশ করিয়া চার্চিল যে খুব মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই প্রমাণও পাওয়া যায় তাঁর মনোরম বর্ণনার মধ্যে। ২০ একর জমির ওপর এই রাষ্ট্রীয় অতিথিভবনে রাজোচিত জাঁকজমকের কোন অভাব ছিল না। এই ভবন ছিল বহু মূল্যবান বৃক্ষ, লতাপাতা ও পুষ্পোদ্যানে শোভিত বড় বড় ঝরনা, আর সুবৃহৎ কাঁচের চৌবাচ্চায় ছিল সোনালী মাছ। চার্চিল লিখিয়াছেন যে, তিনি প্রত্যহ সকালে নিজের হাতে এই সোনালী মাছগুলিকে খাওয়াইতেন। এই ভবনের আসবাবপত্র, সাজসজ্জা, বেডরুম, বাথরুম ইত্যাদি সমস্তই একেবারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর উপযোগী রাজোচিত ছিল এবং মেঝেগুলি ছিল একেবারে স্বচ্ছ কাঁচের মত চকচকে-ঝকঝকে। এই ভবনে তাঁর এ. ডি. সি. হিসাবে কাজ করার জন্য যে রুশ ভদ্রলোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁকে চার্চিল সৌজন্য ও ভদ্রতার প্রতিমূর্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং অনুমান করিয়াছেন যে, তিনি নিশ্চয়ই একজন প্রাক্তন রাজবংশের লোক।

এই ভবনের প্রায় একশত গজ দূরে বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভূগর্ভ নিম্ন যে শেলটার ছিল, চার্চিল সেটির কথা উল্লেখ করিতেও ভুলেন নাই। সেখানকার ব্যবস্থাও সর্বাধুনিক আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। দুইদিকের লিফট সহযোগে ৮০ থেকে ৯০ ফুট নীচে নামিয়া যাওয়া যাইত। বর্ণাঢ্য বড় বড় ৮/১০ টি কক্ষ ছিল পুরু কংক্রীটের তৈরী এবং প্রচুর আলোকে উজ্জ্বল ছিল।

আতিথেয়তার জন্য রাষ্ট্রীয় ভবনে এত নিখুঁত আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবস্থা ছিল যে, চার্চিল তাঁর অপূর্ব বর্ণনার মধ্যে 'totalitarian lavisl-ness' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য তো ছিলই। আর ছিল সুরারসিক চার্চিলের জন্য ভোদকা থেকে শুরু করিয়া উৎকৃষ্টতম জার্মান ও ফরাসী মদ্য। কিন্তু চার্চিল বলিতেছেন যে, তখন এত খাদ্য ও এত মদ্য গ্রহণের মেজাজ ছিল না এবং উদরে দেওয়ার মত শক্তিও ছিল না। সন্ধ্যা ৭টার সময় ক্রেমলিনে স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ছিল।

উল্লেখযোগ্য যে, কাইরো থেকে দীর্ঘ একটানা বিমান যাত্রার পর চার্চিল কোন বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন না। নির্ধারিত সময়ে ক্রেমলিনে গিয়া হাজির হইলেন।[১]

এই প্রথম সাক্ষাৎকার সম্পর্কে চার্চিল লিখিয়াছেন—

'I reached the Kremlin, and met for the first time the great Revolutionary Chief and profound Russian statesman and warrior with whom for the next three years I was to be in intimate, rigorous, but always exciting and at times even genial, association'.[২]

'আমি ক্রেমলিনে পৌঁছিলাম এবং সেই প্রথম বিপ্লবের মহানায়ক, প্রখর রুশ কূটনীতিবিদ এবং যোদ্ধার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল—যাঁর সঙ্গে পরবর্তী তিন বছর কাল আমার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ, কঠোর কিন্তু সর্বদাই উত্তেজনাপূর্ণ, এমন কি সময় সময় সৌজন্যপূর্ণ সাহচার্যও বটে।'

চার্চিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে এই প্রথম সাক্ষাৎকার নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। কেননা দুই বিপরীত চরিত্রের লোক মহাযুদ্ধের বিপাকে পড়িয়া এই প্রথম পরস্পরের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনায় মিলিত হইলেন এবং সেদিনের ও পরবর্তীকালের পৃথিবীর

১। চার্চিল—ঐ পুস্তক পৃষ্ঠা ৪২৯, ৪৩৭

২। চার্চিল—ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪২৯

ভাগ্যের সূচনাও যেন তখন থেকে শুরু হইল। বলা বাহুল্য যে, রণনীতি, রাজনীতি ও কূটনীতির—অনেক বিষয়ের সঙ্গেই দুইজনের মতের মিল ছিল না। তবু উভয়ের সাধারণ শত্রু হিটলারকে পরাজিত করিতে গিয়া সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্যবাদী—ইতিহাসের দুই অদ্ভুত পুরুষ ক্রেমলিনের একই কক্ষে মিলিত হইলেন। এই প্রথম সাক্ষাৎ প্রায় চার ঘণ্টা ধরিয়া চলিয়াছিল। এই সাক্ষাতের সময় চার্চিলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হ্যারিম্যান, মস্কোস্থিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত এবং দোভাষীগণ।

১৯৪২ সালে কেন দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা সম্ভব নয় সেকথা বুঝাইবার জন্যই চার্চিলের মস্কো আগমন। স্ট্যালিনের সঙ্গে গোড়াতেই তিনি 'নিতান্ত সরলভাবে' আলোচনা শুরু করিলেন 'বাস্তব অবস্থা' ব্যাখ্যা করার জন্য। তিনি বলিলেন যে, সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভ যখন লণ্ডনে গিয়াছিলেন, তখন তিনি ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে তাঁকে কোন কথা দেন নাই, তবে, ফ্রান্সে অবতরণের একটা পরিকল্পনা নিয়া চিন্তা করা হইতেছে এমন কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪৩ সালের বসন্তকালে একটি বৃহৎ অভিযানের জন্য তাঁরা তৈরী হইতেছেন। চার্চিল বুঝাইলেন যে, সেই অভিযানের জন্য ১০ লক্ষ মার্কিন সৈন্যের বৃটেনে জড়ো হওয়ার কথা। যে ২৭ ডিভিসন মার্কিন অভিযাত্রী সৈন্য প্রস্তুত হইবে, বৃটেন তার সঙ্গে আরও ২১ ডিভিসন যোগ দিবে। ইতিমধ্যে মাত্র আড়াই ডিভিসন মার্কিন সৈন্য পেঁাছিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত অভিযানের জন্য যে উপযুক্ত সংখ্যক অবতরণ-নৌকা দরকার, বর্তমানে তার অভাব আছে। মাত্র ৬ ডিভিসন সৈন্য ফ্রান্সের উপকূলে নামানো যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হইবে না, বরং অনিষ্ট হইবে এবং 'বিপর্যয় ডাকিয়া আনা হইবে মাত্র।' ফলে, ১৯৪৩ সালের প্রস্তাবিত অভিযানও এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

কিন্তু স্ট্যালিন চার্চিলের এই সমস্ত যুক্তি গ্রহণ করিলেন না। তিনি গম্ভীর মুখে বলিলেন যে, যারা বিপদের ঝুঁকি নিতে ভয় পায়, তারা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে না। চার্চিল এর জবাবে বলিলেন যে, ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া আক্রমণ চালানো এত সহজ নয়। যদি সহজ হইত, তবে ১৯৪০ সালে হিটলার ইংলণ্ড আক্রমণ করিলেন না কেন? অথচ তখন ইংলণ্ডে মাত্র ২০ হাজার ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈন্য, ২০০ কামান এবং ৫০টি ট্যাঙ্ক ছিল।...

স্ট্যালিন ও চার্চিলের মধ্যে এভাবে প্রায় ঘণ্টাদুয়েক ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া ফ্রান্সে অবতরণ নিয়া বিতর্ক হইল।—কিন্তু দুজনের কেউ পরস্পরের যুক্তি গ্রহণ করিলেন না। অবশেষে স্ট্যালিন বলিলেন যে, যদি ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ এই বছর ফ্রান্সে অবতরণ করিতে সক্ষম না হইয়া থাকেন, তবে অবশ্যই এই বিষয়ে তাঁর আর তাগাদা দেওয়া উচিত নয়। তবে সৌভাগ্যক্রমে আলোচনা প্রসঙ্গে জার্মানীর উপর বোমাবর্ষণ নিয়া উভয়ে একমত হইলেন—'স্ট্যালিন জার্মান জনগণের নৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে আঘাত হানার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিলেন।'

অর্থাৎ দ্বিতীয় রণাঙ্গনের বদলে জার্মানীর বিরুদ্ধে বোমারু অভিযান অনুষ্ঠিত হইবে, চার্চিলের সঙ্গে কথাবার্তায় স্ট্যালিন এইটুকু প্রতিশ্রুতি পাইলেন। এবং চার্চিল ও স্ট্যালিন পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে আলোচনা চালাইলেন যেন এই প্রস্তাবিত বোমারু অভিযানের ফলে জার্মানীর সমস্ত কল-কারখানা ও ঘরবাড়ী ধ্বংস হইয়া যাইবে।

ইতিমধ্যে স্ট্যালিনের গম্ভীর মুখ কিছুটা প্রসন্ন হইল। তখন কৌশলী চার্চিল

'টর্চ' বা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা অভিযানের পরিকল্পনাটা উত্থাপন করিলেন এবং বলিলেন যে, ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির পক্ষে ফ্রান্সই একমাত্র উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। আরও স্থান আছে, তিনি মার্কিন প্রেসিডেণ্টের অনুমতিক্রমে 'খুব গোপনে' সেই পরিকল্পনাটা জানাইবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন।

চার্চিলের মুখে উত্তর আফ্রিকা অভিযানের এই পরিকল্পনার কথা স্ট্যালিন খুব আগ্রহভরে শুনিলেন। অক্টোবর মাসের মধ্যেই এই অভিযান শুরু হওয়ার কথা এবং শত্রুর কবল থেকে ভূমধ্যসাগর মুক্ত হওয়ার ফলে যে সমস্ত সামরিক সুবিধা হইবে, চার্চিল সেগুলির বর্ণনা দিয়া বলিলেন যে, এর ফলে আর-একটা রণাঙ্গন খুলিয়া যাইতে পারে। 'সেপ্টেম্বর মাসে আমরা মিশরে অবশ্যই জয়লাভ করিব। আর অক্টোবর মাসে উত্তর আফ্রিকা—ওদিকে উত্তর ফ্রান্সে শত্রু তো আটক থাকিবেই। যদি এই বছরটা আমরা উত্তর আফ্রিকা দখল করিতে পারি, তবে হিটলার-অধিকৃত ইউরোপের তলপেটে আমরা আঘাত করিতে পারিব। এই অভিযানকে অবশ্যই ১৯৪৩ সালের পরিকল্পিত অভিযানের সঙ্গে একত্রে চিন্তা করিতে হইবে।'

এই সময় চার্চিল তাঁর সেই বিখ্যাত 'কুমীরের চিত্র' আঁকিয়া স্ট্যালিনকে সমগ্র রণনৈতিক পরিকল্পনাটা বুঝাইতে চাহিলেন।[১]

(চার্চিল অঙ্কনবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন।) চার্চিলের এই চিত্র অনুসারে ভূমধ্যসাগর ছিল কুমীরের তলপেটের মত। সেখানে তো আঘাত হানা হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে কুমীরের প্রলম্বিত নাক ও মুখ—অর্থাৎ উত্তর ফ্রান্সের উপরেও আঘাত করা হইবে।

চার্চিল কর্তৃক এই বর্ণনায় স্ট্যালিনের আগ্রহ বাড়িয়া গেল এবং তিনি উৎসাহভরে বলিয়া ফেলিলেন—'ঈশ্বর করুন, এই অভিযান যেন সার্থক হয়!'

(মার্কিন ঐতিহাসিক শেরউড তাঁর পুস্তকে মন্তব্য করিয়াছেন যে, স্ট্যালিনের পক্ষে ঈশ্বরের দোহাই দেওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়, কেননা ছোটবেলায় তিনি ধর্মীয় বিদ্যায়তনে পড়িয়াছিলেন।)

চার্চিল এই অভিযানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, উত্তর আফ্রিকা দখল করিতে পারিলে ইউরোপেও সাহায্য দেওয়া যাইবে। ইতালী জয় করা সম্ভব হইবে এবং তুরস্ক ও দক্ষিণ ইউরোপের উপর এর গভীর প্রভাব পড়িবে। যদি এই বছর উত্তর আফ্রিকা জয় করিতে পারা যায়, তবে আগামী বছর হিটলারের উপর মারাত্মক আক্রমণ চালানো যাইবে।

'টর্চের' এই পরিকল্পনায় স্ট্যালিনের আগ্রহ বাড়িয়া গেল এবং চার্চিলের সঙ্গে তাঁর আলোচনার সুরেরও পরিবর্তন ঘটিল। কিন্তু তিনি এই প্রস্তাবিত পরিকল্পনার সম্ভাব্য রাজনৈতিক জটিলতার কথাও উত্থাপন করিলেন—মিত্রপক্ষ উত্তর আফ্রিকার ফরাসী রাজ্যগুলি দখল করিলে ভিসি ফ্রান্স ও জার্মানীর পক্ষে যোগ দিবে এবং স্পেনও কি তাদের সঙ্গে জুটিবে?

চার্চিল তাঁকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, ভিসি ফ্রান্স সম্ভবতঃ দ্য গলপন্থীদের উপর গুলি চালাইবে, কিন্তু আমেরিকানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিবে না। চার্চিলের সঙ্গী হ্যারিম্যানও বলিলেন যে, উত্তর আফ্রিকা থেকে তাঁদের গোয়েন্দারাও অনুরূপ রিপোর্ট দিয়াছেন।

১। চার্চিল—ঐ পুস্তক, পৃঃ ৪৩৩।

এই সময় স্ট্যালিন যেন টর্চ পরিকল্পনার গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চারটি মূল কারণ উল্লেখ করিলেন। যথা—

১· মিত্রপক্ষের এই অভিযানের দ্বারা রোমেলের বা জার্মানীর পশ্চাদ্ভাগে আঘাত হানা হইবে।

২· স্পেনের ভীতির সঞ্চার হইবে ও নিরপেক্ষ থাকিতে বাধ্য হইবে।

৩· এর ফলে ফ্রান্সে ফরাসী ও জার্মানদের মধ্যে লড়াই লাগিয়া যাইবে।

৪· ইতালীকে সমগ্র যুদ্ধের ধকলের মুখে পড়িতে হইবে।

স্ট্যালিনের মুখে এই বিশ্লেষণ শুনিয়া চার্চিল মুগ্ধ হইলেন। তিনি তাঁর পুস্তকে স্ট্যালিনের প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—

'এই অপূর্ব বিবৃতি আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। কারণ, এই বিবৃতিতে বুঝা গেল যে-সমস্যা স্ট্যালিনের কাছে এতক্ষণ সম্পূর্ণরূপেই অভিনব ছিল, সেটি যেন রাশিয়ান ডিক্টেটর অতি দ্রুত এবং সম্পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। আমরা সকলে মিলিয়া মাসের-পর-মাস ধরিয়া যে সমস্ত প্রশ্ন নিয়া কসরৎ করিতেছিলাম, সেগুলি যেন তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যেই উপলব্ধি করিলেন, খুব কম জীবিত ব্যক্তির পক্ষেই এটা সম্ভব ছিল। সমস্যাগুলি তাঁর কাছে যেন বিদ্যুৎ ঝলকের মত স্পষ্ট হইয়া গেল।'

মার্কিন প্রতিনিধি হ্যারিম্যানও স্ট্যালিনের এই রণনৈতিক প্রজ্ঞায় চমৎকৃত হইলেন। তিনি রুজভেল্টের নিকট এক বার্তায় এ-কথা স্বীকার করিলেন।···

প্রথম দিনের ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের সাক্ষাতের পর চার্চিল মনে করিলেন যে, 'বরফ গলিয়াছে' এবং তিনি প্রসন্নচিত্তেই তাঁর রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় ফিরিয়া গেলেন —ক্লান্তি সত্ত্বেও দ্বিপ্রহর রাত্রির পর লণ্ডনে তাঁর যুদ্ধ-মন্ত্রিসভার নিকট স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে টেলিগ্রাম পাঠাইলেন এবং বেশ তৃপ্তির সঙ্গে 'গভীর ও দীর্ঘ নিদ্রা' দিলেন।

* * *

পরদিন ১৩ই আগষ্ট কিন্তু চার্চিলের এই প্রসন্ন মনোভাব আর রহিল না। প্রথমে মলোটোভের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু কথাবার্তা সন্তোষজনক হইল না। কারণ, মলোটোভ বলিলেন যে, তাঁদের উত্তর আফ্রিকায় রণ-পরিকল্পনা নিতান্তই 'দ্ব্যর্থবোধক'। অধিকন্তু তিনি চার্চিলকে দুই মাস আগেকার লণ্ডনে ও ওয়াশিংটনে প্রদত্ত দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রতিশ্রুতির কিম্বা সেই ইস্তাহারের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন।···

ঐদিন রাত্রি ১১টার সময় ক্রেমলিনে স্ট্যালিন, মলোটোভ, চার্চিল, হ্যারিম্যান, জেনারেল ওয়েভেল প্রমুখ উচ্চতম পর্যায়ের রণনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল, তাতে স্ট্যালিন তাঁর নিজের স্বাক্ষরিত এমন একটি স্মারকলিপি পেশ করিলেন, যার জন্য চার্চিল বা হ্যারিম্যান বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ, আগের দিন চার্চিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে গোড়ার দিকে অনেক অপ্রিয় কথার পরেও শেষ পর্যন্ত 'টর্চ' বা উত্তর আফ্রিকা অভিযানের পরিকল্পনা স্ট্যালিন কর্তৃক প্রশংসিত হওয়ায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও রুজভেল্টের প্রতিনিধি উভয়েই ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন সংক্রান্ত দুঃসংবাদ তো বলাই হইয়া গিয়াছে, আর স্ট্যালিনও বৈঠকের শেষে যখন সদ্ভাব দেখাইয়াছেন, তখন আর দুশ্চিন্তার কারণ নাই। কিন্তু এই

স্মারকলিপিতে স্ট্যালিন ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষকে—বিশেষভাবে বৃটেনকে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার জন্য সোজাসুজি এবং কর্কশভাবে আক্রমণ করিলেন। তিনি বলিলেন—

মস্কোতে চার্চিলের সঙ্গে ১২ই আগস্টের বৈঠকের পর তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ১৯৪২ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা অসম্ভব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মলোটোভ যখন লণ্ডনে গিয়াছিলেন, তখন ১৯৪২ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছিল এবং ১২ই জুনের সোভিয়েট ইস্তাহারে সেকথা প্রকাশ করাও হইয়াছিল। এটা সকলেরই জানা কথা যে, ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে পূর্ব রণাঙ্গনের জার্মান সৈন্যের চাপ হ্রাস করা, পশ্চিম দিকে জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য একটি শক্তিশালী ঘাঁটি সৃষ্টি করা এবং ১৯৪২ সালের সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গনের কঠিন পরিস্থিতিকে হালকা করা।

'এটা সহজেই বুঝা উচিত যে, ১৯৪২ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হইবে, এটা হিসাব করিয়াই সোভিয়েট কমাণ্ড তাঁদের গ্রীষ্ম ও শরৎকালীন রণপরিকল্পনা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।'

'এটা সহজ বুদ্ধির কথা যে, এক্ষণে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিতে অস্বীকার করায় গোটা সোভিয়েট জনমতের উপর মারাত্মক আঘাত হানা হইতেছে এবং রণাঙ্গনে লালফৌজের অবস্থানকে জটিল করিয়া তোলা হইতেছে এবং সোভিয়েট কমাণ্ডের রণ-পরিকল্পনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইতেছে।...'

'আমার এবং আমার সহকর্মীদের নিকট এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, ১৯৪২ সালেই ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির সর্বোত্তম সুযোগ রহিয়াছে। কেননা, জার্মান সৈন্যবাহিনীর প্রায় সমস্ত সৈন্য এবং সর্বোৎকৃষ্ট বাহিনীগুলি পূর্ব রণাঙ্গনে অপসৃত হইয়াছে, আর ইউরোপে রহিয়াছে নগণ্য সংখ্যক সৈন্যদল। আর সেই সৈন্যেরাও খুব নিকৃষ্ট শ্রেণীর। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার যেমন উত্তম সুযোগ রহিয়াছে, ১৯৪৩ সালেও সেই সুযোগ থাকিবে কিনা, তা আদৌ বুঝা যাইতেছে না। সুতরাং আমাদের স্পষ্ট অভিমত এই যে, বিশেষভাবে ১৯৪২ সালেই ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা সম্ভব এবং তা কার্যকর করা উচিত।...'[১]

স্ট্যালিনের এই স্মারকলিপিকে কেন্দ্র করিয়া সেদিন রাত্রে ক্রেমলিন প্রাসাদে দুই ঘন্টা ধরিয়া তীব্র ও তিক্ত বিতর্ক চলিল। স্ট্যালিন চার্চিল ও হ্যারিম্যানকে পরিষ্কার জানাইয়া দিলেন যে, 'টর্চ' বা উত্তর আফ্রিকা অভিযানে সোভিয়েট সরকারের কোন আগ্রহ নাই। এমন কি পশ্চিমী মিত্রবর্গ সোভিয়েট ইউনিয়নকে যে সমস্ত সরবরাহ যোগান দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সেই সমস্তও ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া স্ট্যালিন তাঁদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করিলেন।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, এই দোষারোপ যুক্তিহীন ছিল না। কিম্বা স্ট্যালিনের উষ্মা প্রকাশও অকারণ ছিল না। কারণ, কেবল দ্বিতীয় রণাঙ্গন নিয়াই চার্চিল চালবাজি করেন নাই, ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে যখন হিটলারী অভিযান পূর্ব রণাঙ্গনে মারাত্মক হইয়া উঠিতেছিল, তখন রাশিয়াকে উত্তর মেরু সমুদ্র পথে নরওয়ের

১। রুজভেল্ট এ্যাণ্ড হপকিন্স—পৃষ্ঠা ৬১৯।

উত্তর দিক হইয়া মরমনস্ক বন্দরে যে সামরিক সরবরাহ যোগান দেওয়ার কথা ছিল, সেই সরবরাহ পাঠানো পর্যন্ত চার্চিলের নির্দেশে বন্ধ হইয়া গেল। অজুহাতস্বরূপ বলা হইল যে, গ্রীষ্মকালের দিবাভাগের আলো এত দীর্ঘস্থায়ী হয় যে, কনভয়গুলি (PQ—17 নামে এই কনভয় পরিচিত ছিল) সহজেই শত্রুপক্ষের শিকার হইয়া পড়ে। জার্মান সাবমেরিন, টর্পেডো ও বিমান আক্রমণে বহু মালবাহী জাহাজ ধ্বংস হইয়াছিল। ৩৪টি জাহাজের মধ্যে ২৩টি মাত্র পৌঁছিয়াছিল এবং ২ লক্ষ টন মালের মধ্যে মাত্র ৭০ হাজার টন সরবরাহ দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েট পক্ষের অভিযোগ এই যে, বৃটিশ নৌ-বিভাগের ভুল নির্দেশের জন্যই এভাবে সামরিক সম্ভারবাহী পোতগুলি নষ্ট হইয়াছিল এবং সেকথা পরবর্তীকালে চার্চিলও স্বীকার করিয়াছিলেন।[১]

কিন্তু জুলাই মাসে চার্চিল যখন স্ট্যালিনকে এই কনভয় বন্ধ রাখার কথা জানাইয়াছিলেন এবং স্ট্যালিন ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তখন রুজভেল্ট ২৯শে জুলাইয়ে এক বার্তায় চার্চিলকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—'মনে রাখবেন আমাদের মিত্রের ব্যক্তিত্বের কথা, আর মনে রাখবেন কি ভয়ংকর বিপদ ও বিঘ্নের মধ্যে তিনি পড়েছেন!...'[২]

এই 'ভয়ংকর বিপদের' চিত্রই স্ট্যালিন চার্চিলের সামনে মস্কোর প্রথম দিনেই (১২ই আগস্ট) আলোচনায় তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন। হিটলারী জার্মানী পূর্ব রণাঙ্গনে সমস্ত শক্তি দিয়া আক্রমণ চালাইতেছে এবং বাকু ও স্ট্যালিনগ্রাডে পৌঁছিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। সমস্ত ইউরোপ ঝাঁটাইয়া জার্মানরা যাবতীয় সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে এবং ওদের সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করিতে পারা সম্ভব হইবে কিনা, তাও সন্দেহের বিষয়। এমন কি, যে মস্কো রণাঙ্গনে অবস্থা ভালো বলিয়া মনে হইতেছিল, সেখানেও জার্মান আক্রমণ ঠেকানো যাইবে কিনা, সেই বিষয়েও আগে থেকে কোন গ্যারাণ্টি দেওয়া যায় না।

কিন্তু এর জবাবেও চার্চিলের সেই এক কথা। ১৯৪২ সালে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ ফ্রান্সে সসৈন্যে অবতরণ ও দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিতে সক্ষম নয়। কিন্তু এর বদলে উত্তর আফ্রিকার অভিযান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। ফলে স্ট্যালিন পরদিন তাঁর স্মারকলিপিতে কড়া কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মনে রাখা দরকার সেই সময় সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গনে সর্বাধিক জার্মান সৈন্যের (২৮০ ডিভিসন) সমাবেশ ঘটিয়াছিল। অথচ চার্চিল ১৪ই আগস্ট স্ট্যালিনের স্মারকলিপির জবাবে যে উত্তর দিলেন, তাতে তিনি বুঝাইতে চাহিলেন যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে সেই বিতর্কিত ১১ই জুনের ইস্তাহারের দ্বারা শত্রুপক্ষকে সাফল্যের সঙ্গে 'ধোঁকা দেওয়া' হইয়াছিল। কিন্তু হিসাবে দেখা যায় যে, শত্রুপক্ষ মোটেই বিভ্রান্ত হয় নাই। কেননা, ১৯৪২-এর জানুয়ারী মাসে পূর্ব রণাঙ্গনে যেখানে জার্মানীর স্থলবাহিনীর ৫০ শতাংশ সমাবেশ করা হইয়াছিল, সেখানে ১লা জুলাই তারিখের মধ্যে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইল শতকরা ৭৬·৩ ভাগ।—(একথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।)[৩]

১। এ্যান্টি-হিটলার কোয়ালিশন—পৃষ্ঠা ১১৯।
২। চার্চিল-রুজভেল্ট-স্ট্যালিন—পৃষ্ঠা ৭২।
৩। এ্যান্টি-হিটলার কোয়ালিশন—পৃষ্ঠা ১১৭।

চার্চিল তাঁর লিখিত উত্তরে স্ট্যালিনের উদ্দেশ্যে আরও বলিলেন যে, বৃটেন বা আমেরিকা দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নাই। ১০ই জুন, ১৯৪২, তিনি লণ্ডনে মলোটোভকে এই বিষয়ে যে স্মারকলিপি দিয়াছিলেন, তাতে তিনি অবশ্য পরিষ্কার একথা জানাইয়াছিলেন—'সুতরাং আমরা কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না।' কিন্তু চার্চিল সেই স্মারকলিপির ৫নং প্যারার আরম্ভে একেবারে স্পষ্ট রূপে বলিয়াছিলেন—

'We are making preparations for a landing on the continent in August or September, 1942'.[1]

'১৯৪২ সালের আগস্ট বা সেপ্টেম্বরে ইউরোপীয় ভূভাগে অবতরণের জন্য আমরা প্রস্তুতি ঘটাইতেছি।'—একথা লিখিতভাবে দেওয়ার পর কি এমন ধারণাই জন্মে না যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে ? কিন্তু চার্চিল যে এমন কথার দ্বারা ধূম্রজাল সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন, তার প্রমাণ এই যে, ফ্রান্সে অবতরণের বিন্দুমাত্র আয়োজনও ১৯৪২ সালে করা হয় নাই।

সুতরাং দ্বিতীয় রণাঙ্গন সংক্রান্ত ইস্তাহারের দ্বারা শত্রুপক্ষকে ধোঁকা দিতে পারা গিয়াছে কিম্বা কোন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয় নাই, এমন ব্যাখ্যার দ্বারা চার্চিল বরং রাশিয়াকেই ধোঁকা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু স্ট্যালিনকে ভুল বুঝানো কঠিন ছিল। সুতরাং সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গনে ২৮০ ডিভিসন হিটলারী সৈন্য সমাবেশের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন যে, ফ্রান্সে এই সময় ৬ বা ৭ ডিভিসন সৈন্য মিত্রপক্ষের পক্ষে অবতরণ করানো তেমন কোন অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। কিন্তু চার্চিল আবার ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার প্রকাণ্ড বিপদের উপর জোর দিলেন।

এই সময় স্ট্যালিন চার্চিলের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করিলেন যে, 'যদি বৃটিশ পদাতিক সৈন্যেরা রাশিয়ানদের মত জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে পারিত, এমন কি বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর (আর. এ. এফ.) মতও লড়িতে পারিত, তাহলে জার্মানদের জন্য বৃটিশের এত ভয় পাওয়ার কারণ ঘটিত না।'

এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ চার্চিল জবাব দিলেন—

'I pardon that remark only on account of the bravery of the Russian troops.'

অর্থাৎ 'রুশ সৈন্যদের অসাধারণ বীরত্বের কথা ভেবেই আমি এই মন্তব্য ক্ষমা করলুম!'

এই প্রকার তীব্র ও উত্তপ্ত তর্কবিতর্কের এক সময় চার্চিল ইঙ্গ-মার্কিন নীতির সমর্থনে এমন উদ্দীপনাপূর্ণ জোরালো বক্তৃতা দিলেন যে, তাঁর দোভাষী নোট নিতে ভুলিয়া গেলেন এবং হাঁ করিয়া চার্চিলের বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। ব্যাপারটা চার্চিলের দৃষ্টি এড়াইল না, তিনি দোভাষীর উপর চটিয়া গেলেন এবং আবার সেই বক্তৃতা অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্তি করিলেন।

এই ঘটনায় স্ট্যালিন খুব কৌতুক বোধ করিলেন এবং মাথাটা চেয়ারের উপর হেলান দিয়া হো হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, আর চার্চিলের উদ্দেশ্যে

১। স্ট্যালিন-চার্চিল-রুজভেল্ট পত্রাবলী, প্রথম খণ্ড (ইংরাজী) পৃঃ ৬২ এবং ৩৮৫।
২। রুজভেল্ট এ্যাণ্ড হপকিন্স—পৃষ্ঠা ৬২০।

বলিলেন—'আপনার ভাষা আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু আপনার বলিষ্ঠ মনোভাবের ('স্পিরিট') আমি তারিফ করছি।' —(হ্যারিম্যানের রিপোর্ট)[১]

স্ট্যালিনের এই সরস মন্তব্যের পর আবহাওয়া কিছুটা হালকা হইয়া গেল এবং পরদিন ১৪ই আগস্ট রাত্রি ৮টায় ক্রেমলিনে ডিনারের জন্য হ্যারিম্যান ও চার্চিল নিমন্ত্রিত হইলেন। বলাই বাহুল্য যে, উভয় পক্ষের সেরা পদস্থ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই ভোজ উৎসবে স্ট্যালিন বেশ খোস মেজাজে চার্চিলের সঙ্গে গল্প করিলেন এবং বার্নার্ড শ' ও লেডী অ্যাস্টরের সঙ্গে মস্কোতে তাঁর (স্ট্যালিনের) সাক্ষাতের কথা থেকে শুরু করিয়া হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা এবং চার্চিল কর্তৃক ১৯৪১-এর এপ্রিল মাসে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের মাধ্যমে স্ট্যালিনকে সতর্কীকরণের প্রসঙ্গও উঠিয়াছিল। তখন স্ট্যালিন বলিলেন—

'হ্যাঁ, আপনার টেলিগ্রামের কথা আমার মনে আছে। কিন্তু আমাকে সতর্ক করার (ওয়ার্নিং) কোন দরকার ছিল না। কারণ, আমি জানতুম যে, যুদ্ধ আসছে, তবে—আমি ভেবেছিলাম আরও ৬ মাসের মত সময় আমি পাবো।'[২]

[১৯৪০-৪১ সালে হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা সংক্রান্ত নানা গুজব ও সংবাদ বিষয়ে স্ট্যালিন ও রুশ নেতারা সজাগ ছিলেন কিনা, সেই প্রসংগে স্ট্যালিনের এই মন্তব্য নিশ্চয়ই মূল্যবান।]

ডিনার শেষে রাত্রি দেড়টার সময় চার্চিল বিদায় নিলেন এবং স্ট্যালিন ক্রেমলিনের দীর্ঘ দরদালান পার হইয়া ও সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া একেবারে প্রধান প্রবেশ ফটকে চার্চিলকে অভিবাদন এবং করমর্দনপূর্বক বিদায় দিলেন।

অবশ্য মস্কোতে চার্চিল-স্ট্যালিন বৈঠক ছাড়াও বৃটিশ সেনাপতিদের সংগে রুশ সেনানীদেরও বৈঠক হইয়াছিল। কিন্তু চার্চিল লিখিয়াছেন যে, সেই সমস্ত বৈঠকেরও মূল কথা ছিল অবিলম্বে দ্বিতীয় রণাংগন খোলার দাবী। তবে, চার্চিলের মতে সেটা ছিল অবাস্তব। কিন্তু চার্চিলের সংগে স্ট্যালিনের ব্যক্তিগত আলোচনায় নানা সামরিক বিষয় উঠিয়াছিল এবং ককেশাসের দিকে জার্মান অভিযান যে নিশ্চিতই প্রতিরুদ্ধ হইবে এবং জার্মানরা যে ককেশাস পার হইতে পারিবে না সে বিষয়ে স্ট্যালিনের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় চার্চিল লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আর চার্চিলের স্বীকৃতি অনুসারেই স্ট্যালিনের অকপটতার ও আত্মবিশ্বাসের আর একটি প্রমাণ এই যে, হিটলারী আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়ার বিরাট পালটা অভিযানের (কাউন্টার অফেন্সিভ অন এ গ্রেট স্কেল) যে পরিকল্পনা হইতেছে সে কথাও তিনি চার্চিলকে 'গোপনে' বলিয়াছিলেন।[৩]

এই পরিকল্পিত পালটা অভিযানের শেষ পরিণতি ছিল স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মান বাহিনীর ঐতিহাসিক পরাজয়। কিন্তু স্ট্যালিন আগস্ট মাসেই চার্চিলকে এর আভাস দিয়াছিলেন, যেটা সর্বাধিনায়ক স্ট্যালিনের দূরদৃষ্টির ও অসাধারণ রণনৈতিক দক্ষতার পরিচায়ক।

১। ঐ পুস্তক,—ঐ পৃষ্ঠা।
২। চার্চিল—দি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৩।
৩। পূর্বোক্ত পুস্তক—পৃঃ ৪৪৫।

পরদিন ১৫ই আগস্ট সন্ধ্যাবেলা চার্চিল স্ট্যালিনকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে গেলে স্ট্যালিন সহসা অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সুরে বলিলেন—

'আপনি ভোরবেলা চলে যাচ্ছেন ? আসুন না আমার বাড়ীতে। দুজনে মিলে একটু ড্রিংক (মদ্যপান) করা যাক ?'

মদ্যরসিক চার্চিল জবাব দিলেন—'নীতি হিসাবে ('অন প্রিন্সিপল্') এমন প্রস্তাবে আমি সর্বদাই রাজী !'

সুতরাং স্ট্যালিন চার্চিলকে পথ দেখাইয়া চলিলেন, ক্রেমলিনে তাঁর নিজস্ব আবাসের দিকে। মস্কোতে চার্চিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে এই একান্ত ব্যক্তিগত নিবিড় ও অন্তরঙ্গ সাক্ষাতের যে বর্ণনা চার্চিল দিয়াছেন, তা নানা দিক থেকেই স্মরণীয় এবং মূল্যবান।

চার্চিল লিখিয়াছেন—'স্ট্যালিনের মাঝারি গোছের ও সাদাসিধে এই বাসগৃহে (এপার্টমেণ্ট) ডাইনিং রুম ও বাথরুমসহ মাত্র চারটি কক্ষ ছিল। স্ট্যালিন নিজেই ঘরগুলি দেখিয়ে দিলেন। এমন সময় একজন বর্ষীয়সী গৃহকর্ত্রী (হাউজকীপার) ঢুকলেন এবং পরে একটি সুন্দরী মেয়ে, মাথায় লালচুল, এসে হাজির হলো। মেয়েটি তাঁর বাবাকে চুমো খেল এবং একনজরে আমার দিকে তাকিয়ে দেখলো—আমার মনে হলো, মেয়েটি যেন তার চোখের ভাষায় আমাকে বুঝিয়ে দিল—

'দ্যাখো, আমরা যে বলসেভিক, আমাদেরও ঘর সংসার আছে !'

স্ট্যালিনের মেয়ে টেবিল সাজাতে লাগলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গৃহকর্ত্রী কয়েকটি ডিস নিয়ে এসে হাজির হলো।*

ইতিমধ্যে স্ট্যালিন নিজেই মদের বোতলের ছিপিগুলি খুলতে লাগলেন। নানা-প্রকারের মদ এবং অনেকগুলি বোতল টেবিলের উপর সাজানো হলো।

এর পর স্ট্যালিন বললেন—'মলোটোভকে ডাকলে কেমন হয় ? সে তো যুগ্ম ইস্তাহার (সোভিয়েট-বৃটিশ) রচনা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে। আমরা টেবিলে বসেই সেটা শেষ করে ফেলতে পারি ? আর জানেন মলোটোভের কিন্তু একটা গুণ আছে— সে বেশ 'টানতে' (ড্রিংক করতে) পারে !'

মলোটোভ এলেন। চার্চিলের দোভাষী মেজর বার্স (Birse) এবং স্ট্যালিনের দোভাষী প্যাভেলভ—তাঁরাও এলেন। রাত্রি ৮-৩০ থেকে ডিনারের পানভোজন জমে উঠল এবং চললো দুপুর গড়িয়ে ২-৩০ মিঃ পর্যন্ত। অনেক প্রকারের ডিস ও বহু প্রকারের মদ—যেগুলি খেয়ে চার্চিল খুব তারিফ করলেন।

ডিনার টেবিলে স্ট্যালিন ও চার্চিল অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন—উত্তর মেরু সমুদ্রপথের কনভয় (জুন মাসে) বন্ধ হওয়া থেকে রাশিয়ার কালেকটিভ ফার্ম

---

* চার্চিল ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ক্রেমলিনে স্ট্যালিনের যে সুন্দরী মেয়েটিকে দেখেছিলেন, তিনিই স্বনামধন্যা স্বেৎলেনা এ্যালিলুয়েভা। ১৯৬৭ সালে জন্মভূমি রাশিয়া ত্যাগ করে ভারতবর্ষে এসেছিলেন পরলোকগত ভারতীয় স্বামীর দেশ দেখার জন্য। কিন্তু ১৯৬৭, ৬ই মার্চ তিনি নয়াদিল্লীর মার্কিন দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান, সেখানে একজন আমেরিকান নাগরিককে বিবাহ করেন—তৃতীয় বিবাহ, পর পর রুশ, ভারতীয় এবং আমেরিকান। প্রথম বিবাহের দুটি সন্তান এবং তৃতীয় বিবাহের একটি কন্যা আছে। কিন্তু ১০ই মে ১৯৭৩, এই বিবাহও ছিন্ন হয়ে গেছে। স্বেৎলেনার বয়স তখন ৪৮ এবং তৃতীয় স্বামীর বয়স ৬০ বছর। স্বেৎলেনা দুটি বই লিখে পৃথিবীব্যাপী চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন এবং উপার্জন করেছেন ৪০ লক্ষ ডলার। কিন্তু সংবাদপত্রের রিপোর্টে প্রকাশ তিনি অসুখী এবং নিঃসঙ্গ।—লেখক, মে, ১৯৭৩।

ও চাষীদের উপর পীড়ন নীতির কথা। স্ট্যালিন স্বীকার করলেন যে, চার বছর ধরে এই কার্য করতে হয়েছিল—চাষের ক্ষেতে যান্ত্রিকতা প্রবর্তন না করলে রাশিয়াকে নিয়মিত দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব ছিল না।

এই বৈঠকে স্ট্যালিন ও চার্চিল হাস্যপরিহাস এবং ব্যংগকৌতুকও যথেষ্ট করেছিলেন। যেমন, চার্চিল স্ট্যালিনের উদ্দেশ্যে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন—'মার্শাল কি জানেন, তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভ সম্প্রতি ওয়াশিংটন থেকে একা একা নিউইয়র্ক দেখতে গিয়ে কী ফ্যাসাদে পড়েছিলেন ?···'

যদিও মলোটোভের মুখ এই প্রশ্নে খুব গম্ভীর হয়ে গেল (সম্ভবত রসিকতা মলোটোভের বরদাস্ত হতো না), স্ট্যালিন কিন্তু কৌতুকোজ্জ্বল মুখে জবাব দিলেন—

'মলোটোভ আদপে নিউইয়র্কেই যান নি, উনি গিয়েছিলেন শিকাগো শহরে, যেখানে অন্যান্য গুণ্ডারা (গ্যাংস্টার) থাকে !···

রাত্রি দেড়টার সময় একটা নূতন খাবারের ডিস এলো—সাকিং-পিগ্ (শূকর ছানা)। স্ট্যালিন এতক্ষণ পর্যন্ত ডিসগুলি শুধু চেখে দেখছিলেন। কিন্তু এবার তিনি একাই সেই 'শূকর ছানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন'।

সাধারণত রাত্রির এই সময়েই স্ট্যালিন তাঁর নৈশ আহার গ্রহণ করতেন।

আহার সমাধা করে হঠাৎ তিনি উঠে পাশের ঘরে গেলেন। সেই ঘরে তিনি রাত ২টা থেকে বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে পাঠানো রিপোর্ট শুনতেন···

রাত্রি ২-৩০ মিনিটে যুগ্ম ইস্তাহার তৈরী হওয়ার পর চার্চিল স্ট্যালিন ও মলোটোভের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং রাষ্ট্রীয় অতিথিশালার দিকে রওনা হলেন। ভোর ৫-৩০ মিনিটের সময় তিনি মস্কো থেকে বিমানযোগে তেহরান যাত্রা করলেন এবং প্লেনে ঘুমিয়ে পড়লেন।[১]

* * *

উপরের এই চিত্তাকর্ষক কাহিনীর সমস্তই চার্চিলের বর্ণনা থেকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল।

কিন্তু এই দুই বিশ্ববিখ্যাত নেতার ব্যক্তিগত জীবনের যে চিত্র এই নিভৃত ও নিবিড় সাক্ষাতের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, নিঃসন্দেহে তা অসাধারণ। মহাযুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর দুর্দিনের পটভূমিকায় দুই সমর-নায়কের শিরা ও স্নায়ুর শক্তি এবং সেই সঙ্গে সমগ্র পরিস্থিতি স্থিরচিত্তে বিবেচনা করা ও উপলব্ধি করার মত মানসিক বল, আর ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের শক্তি একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার ছিল। চার্চিল সম্পর্কে একথা উল্লেখ করা দরকার যে ক্রেমলিনে একমাত্র শেষের দিনেই ক্রমাগত ৭ ঘণ্টা ধরিয়া আলাপ, আলোচনা ও বৈঠক করিয়াছিলেন স্ট্যালিনের সঙ্গে। তারপর রাত্রি সাড়ে-তিনটায় রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট দীর্ঘ তারবার্তা পাঠাইলেন এবং তারপর একটানা সাড়ে ৯ ঘণ্টা বিমানযাত্রায় বাহির হইলেন তেহরানের দিকে। মার্কিন ঐতিহাসিক শেরউড মন্তব্য করিয়াছেন যে, ৬৮ বছর বয়সে চার্চিলের এই 'স্ট্যামিনা' নিঃসন্দেহে অসাধারণ ছিল, কেবল ৬৮ বছরের নয়, ২১ বছরের ঊর্ধ্বে যে কোন বয়সের মানুষের পক্ষেই এটা অসাধারণ।[২]

১। চার্চিল—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৬ ৪৭।

২। রুজভেল্ট এ্যাণ্ড হপকিন্স—পৃষ্ঠা ৬২২।

বলাই বাহুল্য যে, মস্কোতে চার্চিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের সমস্ত প্রয়োজনীয় রিপোর্টই অতলান্তিক পার হইয়া রুজভেল্টের নিকট পেঁৗছিতেছিল। স্বয়ং চার্চিল এবং হ্যারিম্যান এই রিপোর্ট পাঠাইতেছিলেন। মস্কো বৈঠকের শেষে চার্চিল রুজভেল্টকে জানাইয়াছিলেন যে, 'সর্বোত্তম সদিচ্ছার' মধ্যে বৈঠকগুলি শেষ হইয়াছে এবং সত্যকার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে।'

যদিও ১৯৪২ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার আর আশা ছিল না এবং চার্চিল ও হ্যারিম্যানের সঙ্গে স্ট্যালিনের সাক্ষাতের পর এটা বিশেষভাবে পরিষ্কার হইয়া গেল এবং যদিও সোভিয়েট পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিশ্রুতি (দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে) ভঙ্গের অভিযোগ বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষ সরাসরি অস্বীকার করিলেন, তবু স্ট্যালিন তাঁর শক্তিশালী রণমিত্রদের সঙ্গে বিরোধ করিলেন না, এই অবস্থাটা মোটামুটি মানিয়াই নিলেন।

অবশ্য এই সমস্ত বৈঠকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে স্ট্যালিনের সাক্ষাতের কথাও আলোচিত হইয়াছিল এবং স্ট্যালিন নিজেই একবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সাধারণত শীতকালে সামরিক ব্যাপার নিয়া তিনি কম ব্যস্ত থাকেন, অতএব ডিসেম্বর মাসে আইসল্যাণ্ডে রুজভেল্টের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হইতে পারে।

জবাবে হ্যারিম্যান বলিয়াছিলেন যে, প্রেসিডেণ্টের পক্ষে হয়তো আইসল্যাণ্ডে আসা সম্ভব হইতে পারে' কিন্তু স্ট্যালিনের পক্ষে এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবে!

স্ট্যালিন নিরুদ্বিগ্নচিত্তে এর জবাব বলিলেন—'He had good planes for the trip'—এই ভ্রমণের জন্য তাঁর খুব ভালো বিমান আছে।[১]

মস্কো বৈঠকের শেষে রিপোর্ট পাওয়ার পর রুজভেল্ট স্ট্যালিনের নিকট সরাসরি এক তারবার্তায় জানাইলেন যে, চার্চিলের সঙ্গে একত্রে এই বৈঠকে যোগ দিতে না পারায় তিনি খুবই দুঃখিত। কিন্তু পূর্ব রণাঙ্গনের সামরিক পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সচেতন এবং একথাও তিনি জানেন যে, হিটলারের জার্মানীই প্রকৃত শত্রু… 'যত শীঘ্র সম্ভব এবং যত শক্তি নিয়া সম্ভব আমরা আসিতেছি—আমার এই কথা আপনি বিশ্বাস করুন।'

তারপর রাশিয়ার প্রশংসা করিয়া রুজভেল্ট তাঁর বার্তায় উল্লেখ করিলেন—

'Americans understand that Russia is bearing the burnt of the fighting and the casualities this year and we are filled with admiration for the magnificent resistance you are putting up'.[২]

চার্চিল-স্ট্যালিন-রুজভেল্টের মধ্যে পৃথিবীর ইতিহাসের যে আশ্চর্য ও অভিনব কোয়ালিশনের সৃষ্টি হইয়াছিল ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে মস্কোর এই বৈঠকে তীব্র ও তিক্ত মতভেদ সত্ত্বেও মহাযুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনে সেই কোয়ালিশনের ভিত্তি পাকা হইল এবং একটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূত্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

১। হার্বার্ট ফীজ—চার্চিল-রুজভেল্ট-স্ট্যালিন—পৃষ্ঠা ৭৯।
২। শেরউড—পৃষ্ঠা ৬২২।

একাদশ অধ্যায়

১৯৪২—সাল জলে স্থলে মিত্রপক্ষের সঙ্কট

নাৎসী আগ্রাসনের চরম পর্যায়ে

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ড আক্রমণ থেকে যে নাৎসী আগ্রাসনের শুরু ১৯৪২ সালে সেই আগ্রাসন চরম পর্যায়ে পেঁছিল এবং মিত্রপক্ষের সংকট ঘনীভূত হইল। এই সংকট জলে-স্থলে প্রায় সমান আকার ধারণ করিল। এই সময় যদি ইউরোপের মানচিত্রের দিকে তাকানো যাইত, তবে দেখা যাইত হিটলারী জার্মানী উত্তর প্রান্তে নরওয়ের নার্ভিক বন্দর থেকে একেবারে দক্ষিণে গ্রীসের শেষ প্রান্ত এবং পশ্চিম দিকে ফরাসী-স্পানিশ সীমানা থেকে পূর্ব দিকে সারা ইউরোপীয় ভূখণ্ড এবং রাশিয়ার পশ্চিমাংশ ও উক্রাইনের বিশাল সমতলভূমি পার হইয়া ডন ও ভল্গা পর্যন্ত পেঁছিয়াছে। আর-একটি বাহু ককেশাস পর্বতের সীমানা থেকে যেন ইরানের দিকে হাত বাড়াইতে চলিয়াছে। আর উত্তর আফ্রিকার মরুভূমি ডিঙ্গাইয়া জার্মান সমরশক্তি যেন সুয়েজ খাল ও মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইউরোপ ও আফ্রিকার এই নাৎসী আগ্রাসনের চিত্রের সঙ্গে পূর্ব পৃথিবীর মানচিত্র যোগ করিলে দেখা যাইত জাপান প্রশান্ত মহাসমুদ্র, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ও বঙ্গোপসাগর পার হইয়া এবং মালয় ও ব্রহ্মদেশ ভেদ করিয়া একেবারে ভারতবর্ষের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। পশ্চিম ও পূর্ব গোলার্ধে দুই ফ্যাসিস্ট শক্তি রাতারাতি এক অভাবনীয় মহাসাম্রাজ্যের 'মালিক' হইয়া বসিয়াছে এবং উভয় দিক হইতে প্রসারিত এই দীর্ঘ রণনৈতিক বাহু ফ্যাসিস্ট 'গ্রাণ্ড স্ট্রাটিজির' অঙ্গস্বরূপ ভারত-ইরান সীমান্ত অঞ্চলে পারস্পরিক হাত মিলাইবার আশঙ্কা জাগাইল। নাৎসী আগ্রাসন যেমন তরঙ্গশীর্ষে উঠিল, তেমনি মিত্রপক্ষের দুর্দিন যেন কালো ছায়া বিস্তার করিল। সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল এবং উদারতাবাদী রুজভেল্ট উভয়েই এই সংকটের কথা বিবেচনা করিয়া বিচলিত হইলেন। এই মনোভাবেরই ব্যাখ্যা করিয়া মার্কিন ঐতিহাসিক শেরউড লিখিয়াছেন—

'The most dreadful of all prospects, which came perilously close to realization was that of a German berakthrough into the Middle East and a Japanese march through India, which would have enabled the two powerful Axis partners to join up and pool resources.'[১]

অর্থাৎ ভারতের মধ্য দিয়া জাপানের আর মধ্যপ্রাচ্য ভেদ করিয়া জার্মানীর—এই দুই অক্ষশক্তির পক্ষে পরস্পরের হাত মিলাইবার সর্বাপেক্ষা মারাত্মক সম্ভাবনা বিপজ্জনক সাফল্যের সীমায় আসিয়া পেঁছিয়াছিল।

উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির যুদ্ধে জেনারেল রোমেল তখন বাজিমাত করিয়াছিলেন এবং 'মরুভূমির মায়াবী'রূপে সারা পৃথিবীতে তাঁর সামরিক প্রতিভার দ্বারা আশ্চর্য

১। Roosevelt and Hopkins, Page 491.

চমক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মিশর, আলেকজান্দ্রিয়া ও সুয়েজ খাল যায় যায় অবস্থা হইয়াছিল। আর হিটলারী দুর্ধর্ষ সৈন্যরা ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মাভিযানে উক্রাইনের ডন নদী পার হইয়া বিখ্যাত ভল্গার দিকে, আর দক্ষিণের তৈলসমৃদ্ধ অঞ্চল ককেশাস-বাকু-বাটুম এবং ইরানের দিকে মুখ করিয়াছিল। এদিকে আশ্চর্য গতিবেগে জাপান পূর্ব পৃথিবীতে নিদারুণ বিস্ময় উদ্রেক করিয়া ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং মার্কিন সমর-নেতা জেনারেল জর্জ মার্শাল পর্যন্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন—

'Few people then knew how close Germany and Japan were of complete domination of the world and how thih the spread to Allied survival has been stretched."[১]

অর্থাৎ খুব কম লোকেই তখন জানিত জার্মানী ও জাপান একত্রে সারা দুনিয়ার উপর দখলদারি বিস্তারের জন্য পরস্পরের কত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল এবং মিত্রপক্ষের রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা কত সংকীর্ণ ছিল!

সোজা কথায় সারা পৃথিবীতে তখন ফ্যাসিস্ট আধিপত্য বিস্তারের সম্ভাবনা ছিল এবং সেই সম্ভাবনার আশংকা চার্চিল-রুজভেল্ট পর্যন্ত উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। মধ্যপ্রাচ্যে যাতে জার্মানী ও জাপানের মিলন ঘটিতে না পারে, তার জন্য অতলান্তিকের এপারে-ওপারে দুর্ভাবনা কম ছিল না। অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়া বা স্ট্যালিনেরও উদ্বেগ ছিল এবং জার্মানীর নূতন আক্রমণ ও অগ্রগতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এই জন্যই ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জন্য বার বার তাগিদ দেওয়া হইতেছিল। এমন কি সেই দাবী মিত্রপক্ষের পক্ষপাতী বিভিন্ন দেশের—বিশেষভাবে সোভিয়েট পক্ষপাতী জনগণের পক্ষ থেকে বার বার উত্থাপিত হইয়াছিল। (আগের অধ্যায়গুলি দ্রষ্টব্য) কিন্তু বিশেষভাবে উইনস্টোন চার্চিল ও বৃটিশ সেনানীমণ্ডলীর বিরুদ্ধতার জন্য দ্বিতীয় রণাঙ্গন ১৯৪২, এমন কি ১৯৪৩ সালেও খোলা হইল না। সুতরাং ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গ তাদের আগ্রাসী পরিকল্পনা নিয়া আগাইয়া যাইতে কোন দ্বিধা বা সংশয় বোধ করিল না। পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের আশঙ্কাশূন্য হইয়া হিটলার সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে নূতন অভিযানে মাতিয়া উঠিলেন, বাছাই করা নূতন নূতন ডিভিসন পূর্বদিকে পাঠাইলেন। রাশিয়া নূতন সংকটের সম্মুখীন হইল। কিন্তু এই সময় রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারী দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযানের তীব্রতার মুখে যেন দ্বিতীয় রণাঙ্গনের দাবীর জবাবেই ক্রেমলিনকে 'আশ্বস্ত' করার জন্য বৃটিশ পক্ষ ফরাসী উপকূলের দিয়েপে এক কমাণ্ডো হানাদারি ঘটাইলেন। ১৯৪২-এর ১৯শে আগস্ট ৬ হাজার সৈন্য লইয়া গঠিত (যার মধ্যে ৫ হাজারই ছিল কানাডীয়) এই হানাদারি বাহিনী ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া যে অতর্কিত আক্রমণ চালাইল, জার্মানদের পালটা গোলাগুলি বর্ষণে সেটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল এবং এই কমাণ্ডো বাহিনীর অর্ধেক সৈন্যই হতাহত হইল।···

আসলে দিয়েপের উপকূলে এই হানাদারি আক্রমণ ঘটাইবার পিছনে চার্চিলের একটা সূক্ষ্ম চাল ছিল, একথা প্রমাণ করা যে, ১৯৪২ সালে ফ্রান্সে কোন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি সম্ভব নয়।

১। স্নাইডার—পৃষ্ঠা ২৯৬।

*　　　　*　　　　*

এদিকে বৃটিশ, মার্কিন ও ওলন্দাজ শক্তিবর্গ ১৯৪২ সালে জাপানী সমর শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য কার্যত কোন উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিল না। কেবল রণনৈতিক প্রশ্নেই যে তাদের ভ্রান্তি ছিল, এমন নয়। রাজনৈতিক প্রশ্নে তাদের ভ্রান্তি আরও গভীর, আরও মারাত্মক ছিল। কেননা পূর্ব পৃথিবীর এই বিরাট অঞ্চলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণরূপে ঔপনিবেশিক ও জাত্যাভিমানের দ্বারা আচ্ছন্ন। সাদা, কালো ও পীত রংয়ের বর্ণবৈষম্য যেমন উগ্র ছিল, তেমনি দুই শতকের বণিকবৃত্তি ও সাম্রাজ্যবাদ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরাধীন জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। এমন কি মহাযুদ্ধের এত বড় সংকটেও তারা স্থানীয় জনগণকে বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাদের জাতীয় দাবী এবং স্বাধীনতার দাবীর প্রতি কোন শ্রদ্ধা দেখাইতে পারিল না। ফলে, জাপানী সামরিক আগ্রাসন ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে মার্কিন, বৃটিশ ও ওলন্দাজ শাসকবর্গকে সহায়তা ও সহযোগিতা দেওয়ার জন্য জনগণ অগ্রসর হইয়া আসিল না। বরং পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা নূতন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে মার খাইতেছে এবং জব্দ হইতেছে—যে মার তারা নিজেরা দিতে পারে নাই, কিন্তু অপরে দিতেছে—এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখিয়া তারা যেন কিছুটা তৃপ্তি বোধ করিল। ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী জনগণের চিত্তে এই ধরনের একটা চাপা মনোভাব ছিল। কারণ, বৃটিশ বা ওলন্দাজ প্রভুরা মনে মনে আশংকা করিতেছিলেন যে, যদি জনগণের সহায়তা গ্রহণ করিয়া জাপানের আগ্রাসী অভিযানকে প্রতিহত করিতে হয়, তবে, শেষ পর্যন্ত জনগণের স্বাধীনতার দাবীকে মানিয়া নিতে হইবে এবং সারা দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ব্যাপক, শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠিবে। তার চেয়ে বরং স্থানীয় রাজা-জমিদার-বণিক-মুৎসুদ্দি শ্রেণীর সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করা ভালো, তবু জনগণের দাবী মানিয়া লওয়া হইবে না।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের জয়যাত্রার পূর্বে পৃথিবীতে ও ভারতবর্ষে যে সংকট ১৯৪২ সালে দেখা দিয়াছিল, সেই সংকটের মুখেও বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের মনোবৃত্তি কিরূপ ছিল, সেটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন জনৈক সোভিয়েট ঐতিহাসিক। তিনি লিখিয়াছেন—

'The British colonialists clung desperately to their positions in India. They. would rather have it captured by the Japanese than allow the Indian national liberation movement to develop. If worse came to the worst, they reckoned that India's occupation by Japan would be no more than temporary, and that it would help crush India's liberation movement. Rather than loose the country entirely the imperialists prefered defeat.'[১]

সোজা কথায় জাপানীরা যদি ভারতবর্ষ দখল করিয়া নেয়, সেও ভালো, তবু ভারতীয়দের স্বাধীনতার দাবী মানিয়া লওয়া হইবে না। কেননা, বৃটিশ ঔপনিবেশিক-

---

১। The Second World War—G. Deborin, Moscow, P. 243.

বাদীদের ধারণা ছিল যে ভারতে জাপানী দখলদারি হইবে সামরিক এবং তার ফলে ভারতীয়দের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন চূর্ণ হইয়া যাইবে।

সোভিয়েট লেখকের এই বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই ভিত্তিহীন ছিল না এবং তার প্রমাণ স্বয়ং চার্চিল ও বৃটিশ মন্ত্রিসভা কর্তৃক ভারতের জাতীয় দাবীর বিরোধিতা। তবু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের প্রচণ্ড অগ্রগতি ও বৃটিশ প্রেস্টিজ সম্পূর্ণরূপে ধূলায় লুটাইবার এবং ভারত সাম্রাজ্য বিপন্ন হইবার ফলে চার্চিল মন্ত্রিসভা ভারতের জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস ও স্বাধীনতাকামী জনগণের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করার জন্য মার্চ মাসে "ক্রিপস মিশনের' কথা ঘোষণা করিলেন এবং ১১ই এপ্রিল ১৯৪২, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতবর্ষে আসিলেন। কিন্তু ক্রিপস মিশন যুদ্ধের সময় ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে অস্বীকৃত হইল, কেবলমাত্র যুদ্ধ জয়ের পর ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়ার (তাও ভারত ব্যবচ্ছেদের সম্ভাবনাসহ) প্রস্তাব করিল। বলা বাহুল্য যে, জাতীয় কংগ্রেস এমন অসম্মানজনক প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিল। পরিণামে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ বৃটিশ শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে বন্দী হইলেন এবং ১৯৪২ সালের বিখ্যাত 'আগস্ট বিদ্রোহ' আত্মপ্রকাশ করিল।

অর্থাৎ ভারতবর্ষে নিদারুণ সংকট দেখা দিল এবং জাপানের বিরুদ্ধে কোন সফল প্রতিরোধ গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা রহিল না। যদিও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ভারতের জাতীয় দাবী মানিয়া লইয়া জাপানকে প্রতিহত করার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু সাম্রাজ্যবিলাসী গোঁড়া রক্ষণশীল চার্চিল বিন্দুমাত্র টলিলেন না। ক্রিপস মিশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের এই রাজনৈতিক সংকট চলিল মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত এবং এটা বৃটিশ সাম্রাজ্যবিলাসিতারই চরম পরিণতি ছিল। সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই তখন এই অবস্থা।

১৯৪২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত (এর পর এল্ আলামিনে ও স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মান শক্তির বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শুরু হইয়াছিল) ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জের অগ্রগতির জন্য কেবল যে স্থলপথেই মিত্রশক্তিবর্গের সংকট ঘনাইয়া আসিয়াছিল এমন নয়। এই সংকট জলপথে আরও তীব্র এবং আরও গভীর হইয়াছিল। যদিও যুদ্ধ বলিতে সাধারণ পাঠক কেবল স্থল যুদ্ধের জয়পরাজয়ই বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া থাকেন, তবু মনে রাখিতে হইবে যে-কোন দেশের যুদ্ধযাত্রা ও আত্মরক্ষার পক্ষে জল বা সমুদ্রপথের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, যোগাযোগ বাণিজ্য, সরবরাহ এবং যোগান দেওয়ার প্রশ্নে যদি সমুদ্রপথ মুক্ত ও অব্যাহত না থাকে, তবে, বিপদের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ইতালী, সোভিয়েট রাশিয়া বা জাপান সকলের পক্ষেই জলপথের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। সুতরাং ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের মত এবারের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও সমুদ্রপথে সরবরাহ অবরোধ এবং নৌযুদ্ধ প্রবল হইয়া উঠিল। জার্মানী নৌবল-প্রধান রাষ্ট্র নয়, কিন্তু সমুদ্রপথে টেরোরিজম্ বা সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টিতে সে ওস্তাদ ছিল এবং তার এই অভিজ্ঞতা বিগত মহাযুদ্ধ থেকেই। এবার যখন ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ বাধিল তখন কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সের সম্মিলিত শক্তির তুলনায় জার্মানীর নৌশক্তি ছিল সামান্য। যেমন—

		বৃটেন	ফ্রান্স	জার্মানী
ব্যাটলশিপ	...	১২	৫	৩
ব্যাটল ক্রুজার	...	৩	২	২
ক্রুজার	...	৬২	১৯	৪
বিমানবাহী জাহাজ	...	৭	২	—
ডেস্ট্রয়ার	...	১৭৮	৬৯	২১
সাবমেরিন	...	৫৬	৭৫	৫৭

অর্থাৎ মোট টনের হিসাবে একমাত্র বৃটিশ নৌবহর জার্মানীর তুলনায় ৯ গুণ বেশী ছিল। কিংবা বলা যাইতে পারে যে, বৃটিশ নৌবহরের শক্তি যখন ২০ লক্ষ টন পরিমাণ ছিল, তখন জার্মানীর ছিল মাত্র ২ লক্ষ ৩৫ হাজার টন![১]

এর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌশক্তির কথাও চিন্তা করিতে হইবে। কিন্তু মার্কিন নৌবলের বিরুদ্ধে জাপানী নৌশক্তি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপান অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা মার্কিন নৌবলকে কাবু কিংবা অবশ করিয়া ফেলিয়াছিল। জাপানের এই আক্রমণের পর ১৯৪১—ডিসেম্বর থেকে ১৯৪২ জানুয়ারীতে ওয়াশিংটনে যে চার্চিল-রুজভেল্ট বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাতে আগে জার্মানীকে পরাজিত করার উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছিল এবং এজন্য জার্মানীর চারদিকে একটা বেষ্টনী বা রিং সৃষ্টি করার রণনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হইল। জার্মানীর বিরুদ্ধে আংটির মত এই বেষ্টনী গড়িয়া তোলার অন্যতম উদ্দেশ্যরূপেই অতলান্তিক মহাসাগরের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল।

'They adopted as one of their main strategic aims the drawing of a ring round Germany. In order to establish such a ring, they proposed to sustain Russian attempts to hold a line from Archangel to the Black sea ; arm and support Turkey : strengthen the British hold or the Middle East ; gain possession of the whole of North Africa ; and extend the line along the western seaboard of Continental Europe by reasserting control of the Atlantic......'[২]

'উত্তর ও পশ্চিম দিক' থেকে জার্মানীকে সমুদ্র পথে ঘিরিয়া ধরা এবং পশ্চিম ইউরোপীয় ভুভাগের সমুদ্র তীর ধরিয়া অবরোধ সৃষ্টি করা এবং বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সরবরাহ ও বাণিজ্য অব্যাহত রাখার অত্যাবশ্যক প্রয়োজনেই অতলান্তিক মহাসমুদ্রের পথ খোলা রাখার যেমন দরকার হইয়াছিল, তেমনি এর ফলেই অতলান্তিক নৌযুদ্ধেরও উদ্ভব হইয়াছিল। ইতিহাসে এটাই 'ব্যাটল অব দি আটল্যান্টিক' নামে খ্যাত।

অবশ্য উভয়পক্ষেরই প্রথম মহাযুদ্ধের অবরোধ ও সমুদ্রপথের অভিজ্ঞতা ছিল। সুতরাং বৃটিশ নৌ-কর্তৃপক্ষ অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে যখন স্কটল্যান্ড থেকে নরওয়ে পর্যন্ত গোটা উত্তর সমুদ্রের পথ এবং ইংলিশ প্রণালী ধরিয়া মাইনের বেড়াজাল

১। দি ওয়ার—লুই স্নাইডার, পৃষ্ঠা ১৬৭।
২। The Second World War—Basil Collitr. Fontana, P. 972, 292.

পাতিলেন, জার্মানীও তেমনি পালটা এক নূতন উদ্ভাবনী বুদ্ধির পরিচয় দিল। জার্মান বিজ্ঞানীদের নবতম আবিষ্কার এই চুম্বক বা ম্যাগনেটিক মাইন বৃটেনের বন্দরগুলির প্রবেশপথে পাতিয়া রাখিয়া বিষম বিপদ ঘটাইল। কেননা দূরে থেকে লোহ ও চুম্বকের পারস্পরিক আকর্ষণে এই মাইনগুলি আপনা থেকেই বিস্ফোরিত হইয়া জাহাজগুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিত। প্রচুর সংখ্যক বৃটিশ জাহাজের এভাবে নিমজ্জন ঘটিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভে এটাই ছিল জার্মানীর প্রথম 'গোপন অস্ত্র', যার জন্য প্রভূত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। ১৯৪১ সালের নভেম্বরের শেষ ভাগে চার্চিলের জরুরী নির্দেশক্রমে এই চুম্বক মাইনের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হইল। কেবল চুম্বক মাইন নয়, জার্মানী বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির আর-একটি অভিনবত্বেরও পরিচয় দিয়াছিল—এমন টর্পেডো তৈয়ার হইল যেগুলি জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ 'শুনিতে' পাইত এবং সেই শব্দ ধরিয়া টর্পেডোগুলি ছুটিয়া যাইত। এর প্রতিষেধক হিসাবে মিত্রপক্ষ আবার 'noise makers' যা 'গোলমাল সৃষ্টিকারী যান্ত্রিক পদ্ধতি আবিষ্কার করিলেন।[১]

১৯৩৯ সাল থেকে এভাবে সমুদ্রে সমুদ্রে যে রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিল এবং 'জলদেবতারা' প্রায় সর্বত্র যেভাবে জলযুদ্ধে মাতিয়া উঠিলেন, সেই কাহিনী কম রোমাঞ্চকর এবং কম উত্তেজনাপ্রদ নয়। কিন্তু সেগুলির বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। সংক্ষেপে রেখাচিত্র হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মিত্রপক্ষের তুলনায় নৌশক্তিতে হীনবল হওয়া সত্ত্বেও জার্মানী ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সালের শেষ অর্ধভাগ পর্যন্ত সমুদ্রপথে মিত্রপুঞ্জের জাহাজগুলির একেবারে 'ভরাডুবি' ঘটাইয়াছিল। এই বিষয়ে তারা কোন আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের মর্যাদা রাখে নাই। এজন্য নিরপেক্ষ শক্তিগুলির অনেক জাহাজও ধ্বংস হইয়াছিল। গ্রাণ্ড এডমিরাল কার্ল ডোয়েনিৎস, এডমিরাল এরিক রেইডার প্রমুখ ব্যক্তিরাই ছিলেন জার্মান নৌবিভাগের বড়কর্তা এবং তাঁরা গোড়া থেকেই সমুদ্রপথে অবাধ দৌরাত্ম্যের পথ ধরিলেন। আকাশমার্গে প্লেন, সমুদ্রপৃষ্ঠে হানাদারি রণপোত এবং সমুদ্রতলার ইউবোট বা সাবমেরিন—অর্থাৎ নৌযুদ্ধের কিংবা আরও সহজ কথায় নৌপথে সন্ত্রাসবাদীয় আক্রমণের সর্বাত্মক পন্থা অনুসৃত হইল। অথচ গোড়াতে জার্মানীর সাবমেরিনের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৭। কিন্তু এই সামান্য সংখ্যার দ্বারাই সমুদ্রপথে 'টেরোরিজম' সৃষ্টি হইল। টেরোরিজম বা সন্ত্রাস এই অর্থে যে, এটা কোন নিয়মিত প্রকাশ্য যুদ্ধ ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতর্কিত আক্রমণে 'গুপ্তহত্যার' মত কৌশল অনুসৃত হইত। অবশ্য এই প্রকার 'গুপ্তহত্যা' ছাড়াও জার্মান নৌবহরের বিখ্যাত যুদ্ধ-জাহাজগুলি প্রকাশ্য সমুদ্রে এবং খোলাখুলিভাবে এমন সমস্ত আক্রমণ ও নৌযুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছিল, যার জন্য তারা প্রভূত কৃতিত্বের দাবী করিতে পারে। তাদের সাহস, তাদের দক্ষতা, তাদের কৌশল, এমন কি 'অজ্ঞাত স্থান, থেকে জ্বালানী সংগ্রহের গোপন ব্যবস্থা ইত্যাদি এত উঁচুদরের ছিল যে, বৃটিশ ও মার্কিন ঐতিহাসিকরাও তাদের প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। এই সমস্ত নৌযুদ্ধে ও সমুদ্রের পাহারাদারি কার্যে বিমানবহরের কার্যকারিতা ও মুখ্য ভূমিকাও হাতেকলমে প্রমাণিত হইয়া গেল এবং বিমান শক্তি ছাড়া আধুনিক সংগ্রাম যে অচল সেই তথ্যও স্পষ্ট হইয়া গেল।

১। লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা ১২৮।

কিন্তু নিষ্ঠুরতা ও বে-আইনী কার্য'ও অতলান্তিক ও অন্যান্য সমুদ্রের এই সমস্ত নৌযুদ্ধে কম ঘটে নাই। যেমন, বৃটেন কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার (৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) ১২ ঘণ্টার মধ্যেই 'আথেনিয়া' নামক একটি যাত্রী-জাহাজকে অনতিদূরে টর্পেডো মারিয়া ডুবাইয়া দেওয়া হইল। অথচ ১১০২ জন যাত্রীর অধিকাংশই বৃটিশ নাগরিক ছিলেন না এবং এভাবে 'নির্দোষ' যাত্রী-জাহাজকে সমুদ্রে ডুবাইয়া দেওয়া বে-আইনী। কিন্তু জার্মানরা আইনকানুনের তোয়াক্কা রাখিত না। এই ঘটনার মাত্র ১৩ দিন পর বৃটিশ নৌবহরের প্রকাণ্ড যুদ্ধজাহাজ 'কারেজাস' (২২,৫০০ টন) অতলান্তিকে আক্রান্ত হইয়া ডুবিয়া গেল। এভাবে জার্মান নৌবহর ও ইউ-বোটগুলির ভয়াবহ আক্রমণ ও আঘাত শুরু হইল, যেগুলির মধ্যে কয়েকটি ছিল দুঃসাহসিক কার্যের চরমতম। যেমন, বৃটেনের বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজের অন্যতম ২৯,১৫০ টনের 'রয়েল ওক'কে স্কাপা ফ্লোর (স্কটল্যাণ্ড) সুরক্ষিত নৌঘাঁটির মধ্যে ঢুকিয়া জার্মান নৌসেনানী লেঃ প্রিয়েন ইউ-৪৭ যোগে ধ্বংস করিয়া আবার নিরাপদে ফিরিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন—১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৯। ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসে জার্মানীর সুবিখ্যাত 'পকেট ব্যাটলশিপ' তিনখানার অন্যতম 'গ্রাফ্ স্পী', যাকে নৌ নির্মাণ বিদ্যার বিস্ময়, এমন কি 'মিরাক্যাল' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, দৈর্ঘ্য অনুসারে যার গতিবেগ, অস্ত্রসজ্জা ও গোলাগুলি নিক্ষেপণের ক্ষমতা 'অতুলনীয়' ছিল, সেই 'অসাধারণ সুন্দর' ছুরির ফলার মত উজ্জ্বল যুদ্ধজাহাজটি সারা পৃথিবীব্যাপী চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। অতলান্তিক মহাসমুদ্রে এই ক্ষুদে যুদ্ধজাহাজের দাপটে মিত্রপক্ষ অস্থির ছিলেন।[১] অবশেষে তিনখানা বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ দক্ষিণ অতলান্তিকে এর সন্ধান পাইয়া একে তাড়া করে এবং গ্রাফ্ স্পীর পক্ষে উপায়ান্তর না থাকায় দক্ষিণ আমেরিকার নিরপেক্ষ বন্দর মন্টেভিডোতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজগুলি অদূরে সমুদ্রে অপেক্ষা করিতে থাকে গ্রাফ্ স্পীর বহির্গমনের জন্য। অবশেষে ১৭ই ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ন ৬টায় যখন তীরে দণ্ডায়মান ৩ লক্ষ লোক অপরিসীম আগ্রহে এক চাঞ্চল্যকর নৌযুদ্ধের জন্য হাঁ করিয়া ছিল, ঠিক সেই সময় দেখা গেল অকস্মাৎ এক ভয়ংকর বিস্ফোরণে ৩ মিনিটের মধ্যে গ্রাফ্ স্পী ডুবিয়া গেল। অবশ্য উহার ঠিক আগেই ক্যাপ্টেন ল্যাংসডর্ফ ও লস্করেরা বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন এবং জাহাজের ধৃত বৃটিশ বন্দীদের মুক্তিও দিয়াছিলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন ল্যাংসডর্ফ (১৯১৬ খৃস্টাব্দের ইতিহাস-বিখ্যাত জুটল্যাণ্ড নৌযুদ্ধের অভিজ্ঞ সেনানী) মনের দুঃখে রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন।

প্রকাশ যে, হিটলারের নির্দেশেই এই সুবিখ্যাত যুদ্ধজাহাজের আত্মনিমজ্জন ঘটিয়াছিল।*

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৭৫-৭৭

* এখানে একটি ব্যক্তিগত কাহিনী উল্লেখ না করে পারছি না। গ্রাফ স্পীর' আত্মনিমজ্জন উপলক্ষে পৃথিবীব্যাপী যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, আমি তখন দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকরূপে 'জাহাজের জহরব্রত' নামে যে সম্পাদকীয় লিখেছিলাম, তাতে সেদিনের গভর্নমেণ্ট আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কারণ সেই প্রবন্ধে আমি পাঠান-মোগল আমলে বিজয়ী মুস্লিম শত্রুদের হাতে সম্মানহানির আশংকায় রাজপুত নারীদের স্বেচ্ছায় অগ্নিতে আত্মবিসর্জনের কাহিনীর তুলনা দিয়েছিলাম গ্রাফ স্পীর ঘটনার সঙ্গে। বাংলা সরকারের তদানীন্তন হোম সেক্রেটারি মিঃ পোর্টার আই. সি. এস খুবে ক্রুদ্ধ ছিলেন, তিনি আমাকে 'বিপজ্জনক সম্পাদক' ও 'আগুনখেকো' সম্পাদকরূপে চিহ্নিত করেছিলেন। তখন ডা. তরক্ষা আইনের

জার্মান নৌবহরের গৌরব এবং সুবিখ্যাত ও সুবৃহৎ যুদ্ধজাহাজ 'বিসমার্ক' বৃটিশ কনভয়ের উপর বহু উৎপাত সৃষ্টির পর ১৯৪১ সালের মে মাসে উত্তর সাগরে বৃটিশ নৌবহরের বড় বড় যুদ্ধজাহাজের পাল্লায় পড়িয়াছিল। ফলে, ২৪শে মে থেকে ২৭শে মে পর্যন্ত এক নাটকীয় পশ্চাদ্ধাবন ও নৌ-সংগ্রামের অনুষ্ঠান হইয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত বিসমার্ক 'বীরের মত' তার উত্তোলিত পতাকাসহ অতলান্তিকের অতল গর্ভে ডুবিয়া যায়। এভাবে বৃটিশ নৌবহরের বহু মারাত্মক ক্ষতির জবাবে অন্তত এই ধরনের কয়েকটি প্রতিশোধ মিত্রপক্ষ নিতে পারিয়াছিলেন। তবু মোটের উপর সমুদ্র পথে জার্মান নৌবিভাগের কৃতিত্ব প্রশংসনীয় ছিল। যেমন, বলা যাইতে পারে—১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রান্সের ব্রেস্ট বন্দর থেকে শার্নহোর্স্ট, গেনিসেনাউ (Gneisenau) ও প্রিন্স ইউজেন নামক তিনখানা যুদ্ধজাহাজ যেভাবে ইংলিশ চ্যানেলে বৃটিশ নৌবহরের ও বিমানবহরের নাকের ডগা দিয়া টর্পেডো ও ডেস্ট্রয়ারের আড়াল সৃষ্টিপূর্বক ফরাসী, বেলজিয়ান ও ডাচ উপকূল ধরিয়া একেবারে জার্মানীর স্বদেশের ঘাঁটিতে হেলিগোল্যান্ডে গিয়া পোঁছিয়াছিল, সেটা সত্যই অসাধারণ ছিল। মার্কিন ঐতিহাসিক স্নাইডার এই ঘটনাকে 'অবিশ্বাস্য' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাঁর গ্রন্থে।

* * *

বলাই বাহুল্য যে, ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে পশ্চিম দিকে জার্মানীর বিরুদ্ধে আসল যুদ্ধ হইয়াছিল অতলান্তিক মহাসমুদ্রে। অবশ্য মূলত মিত্রপক্ষের তরফ থেকে এটা ছিল অর্থনৈতিক যুদ্ধ বা অবরোধ যুদ্ধ এবং জার্মান নৌবহর তার জবাবে অতলান্তিক ও অন্যান্য জলপথে ব্যাপক ও অবাধ নৌসন্ত্রাস শুরু করিয়াছিল। এই সন্ত্রাস থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অতলান্তিকে মিত্রপক্ষ কনভয় প্রথা (প্রচুর যুদ্ধজাহাজ ও বিমানের পাহারায় একসঙ্গে বহু পণ্যবাহী ও অস্ত্রবাহী বাণিজ্য-জাহাজের যাত্রা) প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মিত্রপক্ষের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হইয়াছিল—বিশেষত ১৯৪২ সালে। উইলিয়াম শাইরারের মতে ১৯৪২ সালে জার্মান সাবমেরিনগুলি প্রধানত বৃটিশ পক্ষের ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টন পরিমিত জাহাজী শক্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এই পরিমাণ জাহাজ পুনরায় নির্মাণের শক্তি তখন পশ্চিমের ছিল না। ইংরাজ ঐতিহাসিক মিঃ ব্যাসিল কোলিয়র লিখিয়াছেন যে, পশ্চিম দিকে সমুদ্র পথের এই যুদ্ধে অক্ষশক্তিবর্গই লাভবান হইয়াছিল। কারণ, সারা বছরে বৃটিশ, মিত্রপক্ষীয় ও নিরপেক্ষ শক্তিবর্গের মোট প্রায় ৮ মিলিয়ন বা ৮০ লক্ষ টন পরিমিত জাহাজ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল। একমাত্র উত্তর অতলান্তিকেই এই ক্ষতির পরিমাণ ভারত মহাসাগরের তুলনায় ৮ গুণ, দক্ষিণ অতলান্তিক বা প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনায় ১০ গুণ বেশী হইয়াছিল। এইগুলির অধিকাংশই ঘটিয়াছিল জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণের দ্বারা, বছরের শেষে যার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল চারশত।[১]

সর্বাত্মক দাপট এবং সেই আইন অনুসারে আমাকে বহুবার ওয়ার্নিং (সতর্কীকরণ) দিয়েছিলেন এবং আমাকে সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণের জন্য চাপ সৃষ্টিও করেছিলেন। কিন্তু মিঃ পোর্টারের সহযোগী মিঃ এ. বি. চ্যাটার্জি আই. সি. এস আমার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তখন আমার লেখা নিয়ে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল।—লেখক

১। দি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার—ব্যাসিল কোলিয়র, পৃষ্ঠা ৩০৪।

অথচ যুদ্ধারম্ভে জার্মানীর মাত্র ৫৬ কিংবা ৫৭ খানা সাবমেরিন ছিল। কিন্তু সেই সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রণপণ্ডিত লিডেল হার্ট লিখিয়াছেন যে, ১৯৪২ সালের শেষ অর্ধভাগে এবং ১৯৪৩ সালের সালের প্রথম অর্ধভাগে অতলান্তিকের যুদ্ধে মিত্রপক্ষের সংকট চরমে উঠিয়াছিল। মহাযুদ্ধের সাড়ে-পাঁচ বছরে জার্মানী ১১৫৭ খানা ইউ-বোট তৈয়ার করিয়াছিল, এর মধ্যে ৭৮৯ খানা নষ্ট হইয়াছিল। এ ছাড়া ৭০০ খানা অতি ক্ষুদে সাবমেরিনও তারা ব্যবহারে লাগাইয়াছিল। আর জার্মানী, ইতালী ও জাপান মিলিয়া মিত্রপক্ষের মোট ২৮২৮ খানা জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছিল, টনের হিসাবে যার পরিমাণ ছিল ১৫ মিলিয়ন বা দেড় কোটি টন! এর অধিকাংশই ঘটিয়াছিল জার্মানদের দ্বারা, যারা একাই মিত্রপক্ষের (অধিকাংশ বৃটিশ) ১৭৫ খানা যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল।

বিস্কে উপসাগরে ফরাসী নৌঘাঁটিগুলি চার বছর ধরিয়া জার্মানদের দখলে থাকায় জার্মান নৌবহরের খুব সুবিধা হইয়াছিল।[১]

অতলান্তিকে মিত্রপক্ষের এই ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি যে বিপর্যয়ের কিনারায় পৌঁছিয়াছিল, তার প্রমাণ এই যে, মার্কিন ঐতিহাসিক রবার্ট শেরউড তাঁর পুস্তকে প্রায় আর্তনাদের সুরে এই সংকটের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং নৌবিভাগের উদ্ধৃতির মধ্যে—

'The massacre enjoyed by the U. Boats along our Atlantie costs··· এই কথাগুলির উপর জোর দিয়াছেন। এর ফলে বৃটেনে, রাশিয়ায়, আফ্রিকায় ও মধ্যপ্রাচ্যে সরবরাহ দেওয়া খুব বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছিল।[২]

* * *

আগেই বলা হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালে জার্মানী, ইটালী ও জাপানের আগ্রাসন ইউরোপে, উত্তর আফ্রিকায় ও এশিয়াতে তুঙ্গশীর্ষে উঠিয়াছিল এবং প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, ভূমধ্য সাগর ও অতলান্তিক মহাসাগর কিম্বা প্রায় সমস্ত জলপথে মিত্রশক্তির দারুণ সংকট দেখা দিয়াছিল। স্বভাবতঃই ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জ তখন নিজেদের বলদর্পিতার গর্বে আত্মহারা। তারা পৃথিবীতে নিউ অর্ডার বা নয়া কানুন প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু ইউরোপে জার্মানী ও পূর্ব এশিয়াতে জাপান কি এই 'নিউ অর্ডার' অর্থে পরাধীন ও উৎপীড়িত জাতিগুলিকে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত ছিল, কিম্বা এই নয়া কানুন প্রচলিত সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও পীড়নের চেয়ে অধিকতর নিষ্ঠুর ও জঘন্যতর জাতিবিদ্বেষ ও ঘৃণার বাহক ছিল? যদিও নাৎসী নায়ক হিটলার নিউ অর্ডার প্রতিষ্ঠার নামে ইউরোপের গগন বিদীর্ণ করিতেছিলেন, তবু কিন্তু সরকারীভাবে এর কোন পরিকল্পনার দলিল প্রস্তুত ছিল না। বরং যুদ্ধের শেষে ধৃত কাগজপত্রে দেখা যায় যে নিউ অর্ডারের অর্থ হইতেছে বৃহত্তর জার্মান রাষ্ট্র বা গ্রেটার জার্মান রাইখের প্রতিষ্ঠা—সমগ্র অধিকৃত ইউরোপের ধনসম্পদ, কাঁচামাল ও লোক বল ভাঙাইয়া এবং লুঠ ও শোষণ করিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জার্মান জাতির এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃহত্তম রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা, যেটা অন্তত 'হাজার বছর টিঁকিবে' এবং স্বয়ং ফুরার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ ও নেতারূপে কীর্তিত হইবেন! বলাই বাহুল্য যে, নাৎসী দর্শনে জার্মানরা হইতেছে 'মাস্টার রেস'

১। হিস্ট্রি অব দি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার—ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট, পৃষ্ঠা ৩৯৪।
২। রুজভেল্ট এ্যান্ড হপকিন্স—পৃষ্ঠা ৪৯৮।

বা প্রভু জাতি এবং পদানত ইউরোপের জাতিগুলি হইবে এই 'প্রভু জাতির' ক্রীতদাস ! বিশেষভাবে ইহুদীরা এবং পূর্ব ইউরোপের শ্লাভ, পোল, চেক ও রুশ প্রভৃতি জাতির লোকরা বিশুদ্ধ জার্মান আর্যদের বিবেচনায় সাব-হিউম্যান বা নীচু স্তরের মানুষ। অতএব এদের মধ্যে ইহুদীদের সমূলে সংহার করিতে হইবে। অন্যান্য জাতির (পোল, চেক, রুশ প্রভৃতির) বুদ্ধিজীবীদের সাবাড় করিতে হইবে এবং বাকী লোকগুলিকে জার্মানীর জন্য দাস-শ্রমিকের কাজে নিয়োগ করিতে হইবে। ১৯৪০ সালের অক্টোবর থেকেই এই সমস্ত পৈশাচিক পরিকল্পনা এবং এগুলি কোন গালগল্প বা ফ্যাসিস্ট বিরোধীদের অতিরঞ্জিত প্রচার নয়। নাৎসীদের সরকারী কাগজপত্রে এগুলি ধরা পড়িয়াছে। স্বয়ং হিটলারের মস্তিষ্ক থেকেই এগুলি উদ্ভূত।[১]

পদানত দেশগুলির ২০ কোটি মানুষের উপর ৮ কোটি আর্য জার্মানদের লর্ডগিরি করার সুবর্ণ মুহূর্ত উপস্থিত। হিটলার সর্বকালের সর্বশক্তিমান দণ্ডমুণ্ডের কর্তারূপে দুনিয়ার উপর ফ্যাসিস্ট রাজত্বের স্টীম-রোলার চালাইয়া যাইবেন। এমন অপূর্ব সুযোগ জার্মানীর ইতিহাসে আর কখনও কি আসিয়াছে ? নিঃসন্দেহে ফুরার সেরা জার্মান এবং সেরা 'আর্য নরডিক'। এই সেরা জার্মানীর বাছাই-করা সামরিক শাসনকর্তারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে এক-একজন ডেপুটি ফুরারের ক্ষমতা নিয়া গদীতে আসীন হইলেন।

নিউ অর্ডার বা নয়া কানুন অনুসারে অধিকৃত দেশগুলিকে বাহ্যতঃ দুই-তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইল বটে, কিন্তু কার্যতঃ এগুলি সমস্তই ছিল নাৎসীদের লুঠ, প্রবঞ্চনা ও ব্যভিচারের লীলাভূমি মাত্র। অপর দিকে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীদের অনুরূপ বিভিন্ন জাতি, অধিজাতি, মাইনোরিটি ও ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্যের সুযোগ নিয়া সেই সুপরিচিত 'ডিভাইড্ এ্যান্ড রুল' নীতি—পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলগুলি সম্পর্কে অনুসৃত হইল। অস্ট্রিয়া সুদেতেনল্যান্ড, আলসাস-লোরেন মেমেল, ডানজিগ, তেসচেন, ইউপেন (Eupen), ম্যালমেডি, লাকসেমবুর্গ, শ্লোভেনিয়া এবং পূর্ব ও পশ্চিম প্রুশিয়ার অঞ্চলগুলি নাৎসী জার্মানীর সহিত যুক্ত হইল। আর চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ডকে বৃহত্তর জার্মান রাইখের অংশরূপে বিবেচনা করা হইল। তবে চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যবর্তী অংশ বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইল।[২]

কিন্তু ইউরোপে নাৎসী দখলদারির এই মহাসমুদ্রের মধ্যে মাত্র কয়েকটি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ হিসাবে দ্বীপের মত ভাসিতেছিল। যেমন—স্পেন, পর্তুগাল, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, আয়র্লন্ড ও তুরস্ক। কিন্তু এগুলির মধ্যে আবার কেউ ফ্যাসিস্ট পক্ষপাতী, আবার কেউ বা মিত্রপক্ষের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল।

যদিও ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জের আগ্রাসন চরম পর্যায়ে চলিতেছিল, তবু জানা দরকার যে, সোভিয়েট রাশিয়ার আশ্চর্য প্রতিরোধের সঙ্গে অধিকৃত ও পরাধীন দেশগুলির প্রায় সর্বত্র বিদ্রোহ, গেরিলা যুদ্ধ, 'ভূগর্ভের' গুপ্ত আন্দোলন ও পার্টিজান-যুদ্ধ সংগঠিত ও পরিচালিত হইতেছিল।

১। শাইরার—১১১৬—পৃষ্ঠা ১৭।
২। লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা ২৯৮-৯৯।

প্রথম অধ্যায়

ষ্ট্যালিনগ্রাডের চরম যুদ্ধ ঃ আফ্রিকা পুনরুদ্ধার

রোমেলের রোমাঞ্চকর মরুযুদ্ধ ঃ আলামিনের পরাজয়

'সৈনিক হিসাবে আমি তাঁকে সেলাম জানাই'—জার্মান সেনাপতি রোমেলের উদ্দেশ্যে এই শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন উত্তর আফ্রিকার মরুভূমি যুদ্ধে তাঁরই এককালের প্রতিদ্বন্দ্বী মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ পক্ষের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল স্যার ক্লড জে. ই অকিনলেক—রোমেল সংক্রান্ত একটি জীবনীগ্রন্থের (ডেসমন্ড ইয়ং লিখিত) ভূমিকায়। রোমেলের সঙ্গে যুদ্ধে –১৯৪১ সালে গ্রীষ্মকাল থেকে ১৯৪২ সালের আগস্ট পর্যন্ত—জেনারেল অকিনলেক যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তারই ফলে রোমেলকে একজন অসাধারণ 'সেনাপতি ও মানুষ' হিসাবে তিনি অকপট শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন —শত্রুপক্ষের কাছ থেকে এমন সম্মাননা লাভ যে-কোন সেনাপতির পক্ষেই দুর্লভ।

কিন্তু কেবল এই সম্মাননা নয়, সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, মধ্যপ্রাচ্য রণাঙ্গনের প্রধান অধিনায়ক হিসাবে জেনারেল অকিনলেককে একটি অদ্ভুত বিজ্ঞপ্তি বা হুঁশিয়ারী জারী করিতে হইয়াছিল তাঁর নিজের সৈন্যদল ও সেনানীবৃন্দের মধ্যে 'আমাদের বন্ধু রোমেল' সম্পর্কে! সামরিক ইতিহাসে এমন বিজ্ঞপ্তি কদাচিৎ দেখা যায়। সুতরাং এটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির যোগ্য ঃ

To : All Commanders and chiefs of staff.

From : Headquarters, B. T. E. and M. E. F.

There exists a real danger that our friend Rommel is becoming a kind of magician or bogey-man to our troops, who are talking far too much about him. He is by no means a superman, it would still be highly undesirable that our men should credit him with supernatural powers.

I wish you to dispel by all possible means the idea that Rommel represent something more than an ordianry general. The important thing now is to see to it that we do not always talk of Rommel when we mean the enemy in Libya. We must refer to 'the Germans' or 'the Axis powers' or 'the enemy' and not always keep harping on Rommel. Please ensure that this odrer is put into immediate effect, and impress upon all Commanders that, from a psychological point of view, it is a matter of the highest importance.

(Signed) C. J. Auchinleck,
Genral,
Commander-in-Chief, M. E. F.[১]

১। Rommel the Desert Fox—Desmond Young, Fontapa Books, P. 23.

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে জেনারেল রোমেল যে কিম্বদন্তীর নায়কে পরিণত হইয়াছিলেন এবং তাঁকে কেন্দ্র করিয়া যে অজস্র গল্প, গুজব ও উপাখ্যান চারদিকে ছড়াইয়া, পড়িয়াছিল, আর তাঁর নামের প্রভাব যে যাদুমন্ত্রের মত মিত্রবাহিনীর সৈন্যদলের উপরও মোহ বিস্তার করিয়াছিল, তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ উপরে উধৃত ওই বিজ্ঞপ্তিটি। লক্ষ্য করার এই যে, এই বিজ্ঞপ্তি-পত্রে বৃটিশপক্ষীয় প্রধান সেনাপতি শত্রুপক্ষের সেনাপতিকে 'আমাদের বন্ধু রোমেল' বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন এবং হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছেন যে, 'রোমেল যেন আমাদের সৈন্যদলের নিকট একজন যাদুকর বা জুজুতে পরিণত হইতে চলিয়াছেন, এবং 'আমাদের সৈন্যরা তাঁকে অলৌকিক শক্তির অধিকারীরূপে প্রচার করিতেছেন।' 'কিন্তু তিনি কোনমতেই একজন অতি-মানয নন!' 'লিবিয়ার যুদ্ধে যখন আমরা শত্রুপক্ষকে উদ্দেশ করি, তখন যেন আমরা সর্বদাই রোমেলের নাম উচ্চারণ না করি'।...'সৈন্যধ্যক্ষরা যেন মনে রাখেন যে, মনস্তত্বের দিক থেকে এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।'

শত্রুপক্ষের একজন সেনাপতি কতখানি অদ্ভুতকর্মা ও ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের প্রধান অধিনায়ককে এমন বাক্য ব্যবহার করিতে হয় যে, 'উনি কিছু অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কিম্বা অতিমানব বা সুপারম্যান নন!' অথচ 'সুপারম্যান' বিশেষণটি এভাবে ব্যবহারের দ্বারাই কিন্তু কার্যতঃ রোমেলের প্রতিভাকে মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের দিক থেকে অতিমানবত্বের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। মনে রাখা দরকার, সেই সময় উত্তর আফ্রিকায় আসন্ন যুদ্ধের ফলাফলের উপর বৃটেনের বা বৃটিশ সাম্রাজ্যর ভাগ্য নির্ভর করিতেছিল। কেননা, রোমেল বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান দুর্গদ্বার সুয়েজ খাল বা মিশর বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন।

১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি কায়রোতে এবং মধ্য প্রাচ্যে বৃটিশ প্রেস্টিজ একেবারে শীর্ষবিন্দুতে উঠিয়াছিল। কেননা এর আগের দুই মাসে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহিনীর হাতে আফ্রিকার ইটালীয় সাম্রাজ্য চুরমার হইয়া গিয়াছিল। ১০ ডিভিসন ইটালীয় সৈন্যবাহিনীর প্রায় সবই সাবাড় হইয়া গিয়াছিল এবং একমাত্র ধরাই পড়িয়াছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার সৈন্য। সুতরাং মিশরের জাতীয়তাবাদী মহলের বৃটিশবিরোধী মনোভাব সত্বেও কায়রোতে তখন ইংরাজদের মহাসমাদর। নীল নদের তীরে বড় বড় হোটেলে খুব আদর-আপ্যায়ন এবং ধনী স্ফীতকায় পাশাদের বাগানবাড়ীর পার্টিতে বৃটিশ অফিসারদের নিয়ে ফুর্তির ফোয়ারা। তরুণী টেলিফোন গার্ল বা হাসপাতালের যুবতী নার্সরা বেশ বাঁকা কটাক্ষেই সাম্রাজ্যবাহিনীর কোন কোন বীর সৈন্যের দিকে তাকাইয়া দেখিত!—(এই ধরনের বর্ণনা দিয়াছে ব্রিগেডিয়ার ডেসমণ্ড ইয়ং তাঁর বিখ্যাত বইতে)।

কিন্তু দুই মাসের মধ্যেই এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল এবং যত দ্রুত বৃটিশ সৌভাগ্য-সূর্যের উদয় হইয়াছিল, ঠিক তত দ্রুতই সেই সূর্য ডুবিয়া গেল। কায়রোতে আতঙ্কের সঞ্চার হইল। ক্রমে জানা গেল বিপর্যয়ের গভীরতা—বেঙ্গাজী বন্দর পরিত্যক্ত, ইংলণ্ড থেকে সদ্য আগত দ্বিতীয় সাঁজোয়া ডিভিসন খতম, এর সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর-জেনারেল গ্যাম্বিয়ার-প্যারি সদর দপ্তরসহ লোপাট, অর্থাৎ ধৃত। তৃতীয় ভারতীয় মোটর ব্রিগেড পর্যুদস্ত, নবম অস্ট্রেলীয় ডিভিসন তোব্রুকে, লেঃ জেনারেল স্যার রিচার্ড ও' কোনারকে তাঁর কৃতিত্বের জন্য মাত্র সম্প্রতি 'স্যার' উপাধি

ও প্রমোশন দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেই বেচারা আরও দুইজন সেনানীসহ—লেঃ জেনারেল ফিলিপ নিম ভি. সি. (ভিক্টোরিয়া ক্রশপ্রাপ্ত বীরত্বের জন্য) ও লেঃ কর্নেল জন কোম্বে শত্রুর হাতে বন্দী। একে একে বার্ডিয়া, সোলাম ও ক্যাপুজোর পতন। শেষপর্যন্ত জেনারেল ওয়েভেল পর্যন্ত মধ্য রণাঙ্গনের অধিনায়কত্ব থেকে অপসারিত। (তৃতীয় পর্বের উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

পর পর এই সমস্ত বিপর্যয় সাইরেনাইকা কিম্বা লিবিয়ার উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে ঘটিয়া গেল। কিন্তু ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালের প্রথম ভাগে যদি কেউ কায়রোর রাস্তায় যে-কোন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করিতেন—'এত সব ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ কি ?' —তবে অনিবার্যভাবেই একটি মাত্র শব্দ শুনিতে পাইতেন—'রোমেল'।—[১]

এভাবে রোমেলের নামের যাদু হাটে-মাঠে-ঘাটে শহরে বন্দরে ও সামরিক মহলে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁর এই নামে খ্যাতি বহু দূরবর্তী মরুভূমির শুষ্ক বালুরাশি অতিক্রম করিয়া শ্যামল বঙ্গভূমির গঙ্গাতীরে পর্যন্ত নূতন হিল্লোল তুলিল। এই কৌতুহল, এই সম্মাননা বোধ বীরত্ব ও সামরিক কৃতিত্বের জন্য শত্রু বা মিত্রের প্রশ্ন এখানে বড় ছিল না। অথচ রোমেল উত্তর আফ্রিকাতে ছিলেন ঠিক দু' বছরের সামান্য একটু বেশী। কিন্তু এর মধ্যেই তিনি অসামান্য কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন।
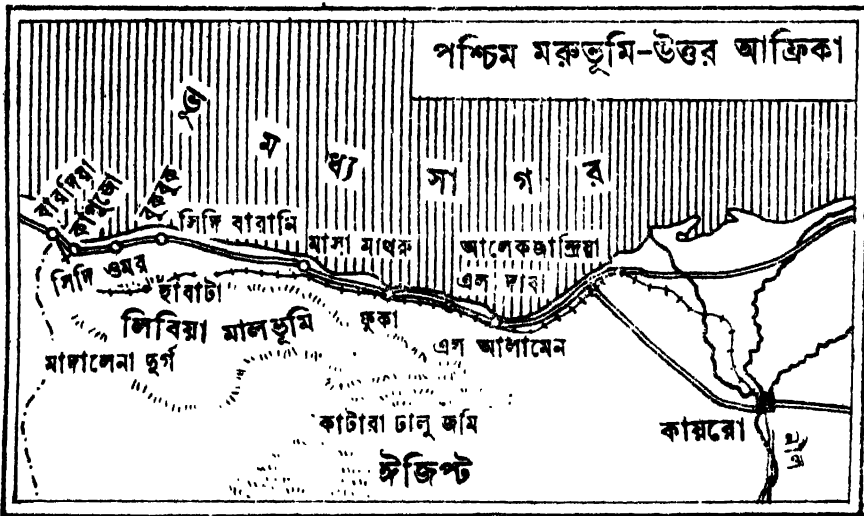
আফ্রিকার ইংরাজের হাতে মুসোলিনীর রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর হিটলার তাঁর ফ্যাসিস্ট মিত্রকে উদ্ধারের জন্য অপেক্ষাকৃত যে তরুণ সেনাপতিকে পাঠাইয়াছিলেন লিবিয়ার সংগ্রাম ক্ষেত্রে, তাঁরই নাম এরউইন রোমেল—তখন তিনি সদ্য লেঃ জেনারেলের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং তখনই তিনি তাঁর সামরিক দক্ষতার জন্য হিটলার ও জার্মান জনগণের কাছে যথেষ্ট খ্যাতিমান ছিলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ তিনি লিবিয়ার জার্মান সৈন্যদের অধিনায়কের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৩রা এপ্রিল তারিখ তিনি তাঁর প্রথম আক্রমণ শুরু করেন এবং মাত্র দশ দিনের বিদ্যুৎগতি অভিযানে তিনি উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ পুনরায় উদ্ধার করিয়া নেন।—[২]

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা—২২।
২। দি ওয়ার—লুই অল. স্নাইডার, পৃষ্ঠা ২০০-১।

১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে আফ্রিকার প্রথম যুদ্ধেই রোমেলের যে জয়যাত্রা শুরু হল, সেটা একটানা কিম্বা অবিচ্ছেদ্য ছিল না। কেননা, মাঝে মাঝে ছোটখাটো পরাজয় এবং বিপত্তি ও ভাগ্যপরিবর্তনও ঘটিয়াছে বটে, যেমন—১লা মে তারিখ তাঁর তোব্রুক বন্দর দখলে ব্যর্থতা, কিন্তু সেগুলি যেন ছিল নিতান্তই সাময়িক। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪১ সালের প্রায় সারা বছর ধরিয়াই বৃটিশ পক্ষের জেনারেল ওয়েভেল এবং পরে জেনারেল অকিনলেকের সঙ্গে বার বার যুদ্ধে ও সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ভাগ্যের ওঠানামা ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু মোটের উপর রোমেলের রণ-নৈপুণ্যের বিদ্যুৎ-দীপ্তি মরুভূমির ঘোলাটে আকাশকে বার বার যেন ঝলসিয়া তুলিয়াছে। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে আচম্বিতে রোমেল এমন পালটা আক্রমণ চালাইলেন যে, বৃটিশ পক্ষ একেবারে গাজার দিকে বিতাড়িত হইল—অর্থাৎ আগের বারের সমস্ত 'হৃত রাজ্য' তিনি যেন একটি আঘাতেই পুনরায় দখল করিয়া নিলেন। মে মাসের পর আবার তাঁর খরদীপ্তি অভিযান শুরু হইল। তিনি আগাইয়া চলিলেন, যে তোব্রুক বন্দর ৯ মাস পর্যন্ত অবরুদ্ধ থাকিয়া আফ্রিকার যুদ্ধে নূতন ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিয়াছিল, সেই বিখ্যাত বন্দরটি তিনি মাত্র একদিনের যুদ্ধে কাড়িয়া নিলেন! ফলে ইংলণ্ডে শুনা গেল আর্তনাদ, আর অক্ষশক্তি মহলে জয়নাদ—বিজয়ী রোমেল সদর্পে মিশরের সীমানা পার হইয়া গেলেন। মার্সামাত্রু, বেগাস ও এল ডাবা অতিক্রম করিলেন। এল আলামিনে পৌঁছিয়া গেলেন এবং হাজির হইলেন একেবারে সুবিখ্যাত আলেকজেন্দ্রিয়ার প্রবেশ দ্বারে। আফ্রিকায়, মিশরে ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের হুলস্থুল পড়িয়া গেল—জেনারেল রোমেল খ্যাতির তুঙ্গশীর্ষে উঠিলেন। শত্রু-মিত্র সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। হিটলারের সেনাবাহিনীর মধ্যে এমন সেনাপতি বোধ হয় আর নাই যার নাম শুনিবামাত্র বিপক্ষ দল রণে ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। অথচ তেমন কাণ্ডই ঘটিয়াচিল রোমেলকে নিয়া। কেননা রোমেল আলামিনে পৌঁছিয়াছেন, এই সংবাদ রটনা হওয়ামাত্র বৃটিশ নৌবহর আলেকজেন্দ্রিয়া বন্দর ছাড়িয়া পালাইয়া গেল। বৃটেনের সেরা সমর ঐতিহাসিক ক্যাপ্টেন লীডেরল হার্ট পর্যন্ত লিখিয়াছেন—

'The news that Rommel had reached Alamein had led the British fleet to leave Alexandria, and withdrew through the Suez Cannal into the Red Sea. Clouds of smoke rose from the chimneys of the military headquarters in Cairo as their files were hastily burned. In grim humour, soldiers called it "Ash Wednesday".…'

বৃটিশ নৌবহর সোজা সুয়েজ খাল ধরিয়া লোহিত সাগরে চলিয়া গেল। আর কায়রোর সামরিক দপ্তরে দলিলপত্র পোড়াইবার তাড়াহুড়া পড়িয়া গেল। সেই ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া আকাশে উঠিতে লাগিল। আর সৈন্যেরা মর্মান্তিক বিদ্রূপের সংগে ওই দিনটিকে 'ভস্মাচ্ছন্ন বুধবার' বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল…

লীডেল হার্ট আরও লিখিয়াছেন—রাশি রাশি পোড়া কাগজ যেন 'কালো বরফ ঝড়ের' মত উত্থিত হইতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া কায়রোর অধিবাসীরা স্বভাবতঃই ধরিয়া লইলেন যে, ইংরাজরা মিশর ছাড়িয়া পালাইতেছে। ফলে, দলে দলে জনতা ভিড় করিল রেলওয়ে স্টেশনে, তারাও কায়রো ছাড়িয়া পালাইতে চাহিল। আর

বাইরের পৃথিবীতে যখন এই সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন সকলেই ভাবিলেন বৃটেন মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে খতম হইয়াছে।[১]

অথচ রোমেল কিন্তু তখনও আলেকজেন্দ্রিয়ায় পৌঁছেন নাই। অন্তত ৬৫ মাইল দূরে ছিলেন। কিন্তু তাঁর নামের খ্যাতি ও ভীতি এমনই আতঙ্কজনক হইয়াছিল যে, বৃটিশ পক্ষ মিশর থেকে পলায়নে উদ্যোগী হইয়াছিলেন—যদিও শেষ পর্যন্ত ভাগ্যলক্ষ্মী বৃটেনের প্রতিই প্রসন্ন হইয়াছিলেন।

রোমেল মিশরের দ্বারদেশে আলামিনের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছিলেন, তাঁর খ্যাতির চরম বিন্দুও সেই সীমানায়। কিন্তু হিটলার তখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেশায় আচ্ছন্ন। আর জার্মান হাইকমাণ্ডের তিন নায়ক কাইটেল, জডল ও হ্যালডার—এঁরা তিনজনেই ছিলেন রোমেলের প্রতি বিরূপ। রোমেল হাইকম্যাণ্ডের অন্তর্গত ছিলেন না। অথচ সারা জার্মানীতে তাঁর জনপ্রিয়তার অন্ত নাই এবং তাঁর সামরিক প্রতিভার জন্য হিটলারের নিকটও তার ভয়ানক সমাদর। সুতরাং হাইকম্যাণ্ডের প্রভাবশালী তিন নায়ক রোমেলের প্রতি মনে মনে ঈর্ষাকাতর ছিলেন। যদিও অল্পদিনের মধ্যেই বিখ্যাত 'আফ্রিকা কোর' এবং তার অধিনায়ক জেনারেল রোমেল মরুভূমির নূতন রণ-অশ্ব ট্যাঙ্কের সাহায্যে যান্ত্রিক যুদ্ধের চমকপ্রদ কৃতিত্ব দেখাইলেন, তথাপি রাশিয়ার তুলনায় আফ্রিকার যুদ্ধকে হিটলার ও তাঁর হাইকম্যাণ্ড তেমন গুরুত্ব দিয়া বিচার করিলেন না। অবশ্য তাঁরা একথা জানিতেন যে, মিশরের পতন ঘটিলে বৃটেনের সমূহ বিপদ ঘটিবে, অতএব রোমেল ও আফ্রিকা কোরের জয়াভিযানের জন্যই হিটলার উৎসুক ছিলেন। কিন্তু এই চরম জয়ের জন্য যে মালমশলা, যন্ত্রপাতি, ট্যাংক, প্লেন ও পেট্রোল ইত্যাদির প্রয়োজন সেই অত্যাবশ্যক সামগ্রিক উপকরণগুলি সরবরাহ করার গরজ হিটলার, কাইটেল বা জডল কারুরই ছিল না। এমন কি ভূমধ্যসাগরের রণনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কেও এঁদের ধারণা খুব স্পষ্ট ও গভীর ছিল না, একমাত্র নৌ-বিভাগের কর্তা এডমিরাল রেইডারের ছাড়া। অথচ রাশিয়ার বিরুদ্ধে গ্রীষ্মাভিযান এবং ককেশাসে ও স্ট্যালিনগ্রাদের দিকে অগ্রগতির উন্মাদনায় হিটলার ও তাঁর সামরিক সহচরগণ উত্তর আফ্রিকায় রোমেলকে উপযুক্ত সরবরাহ দিতে সক্ষম ছিলেন না। কিন্তু সামরিক সরবরাহ ছাড়া যুদ্ধ চালনা কিভাবে সম্ভব? অথচ প্রায় দুই বছর ধরিয়া রোমেল এক অদ্ভুত দুঃসাহসিক যুদ্ধ চালাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁর মালমশলা ফুরাইয়া আসিয়াছিল, তাঁর সৈন্যেরা ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি রোমেলের যেন উৎসাহের অভাব ছিল না। অন্যতম জার্মান সেনাপতি জেনারেল বেয়ারমেইন কবুল করিয়াছেন যে, ৩০শে জুন (১৯৪২) রোমেল যখন এল আলামিনের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিলেন, আলেকজেন্দ্রিয়া বন্দর যখন মাত্র ৬৫ মাইল দূরে ছিল, তখন রোমেলের হাতে অবশিষ্ট ছিল মাত্র ১২টি জার্মান ট্যাংক![২]

কিন্তু মিশরের দ্বারদেশে পৌঁছিবার আগে ২১শে জুন সকালবেলা রোমেল যখন হিটলারের সদর দপ্তরে রিপোর্ট পাঠাইলেন যে, ৯ মাসের অবরুদ্ধ তোব্রুক তাঁর হাতের মুঠোয় আসিয়া গিয়াছে, তখন পরদিন হিটলার বেতারযোগে তাঁকে জানাইয়া দিলেন

১। ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট—দি হিস্ট্রি অব দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার—পৃষ্ঠা ২৮৩।

২। ব্রিগেডিয়ার ডেসমণ্ড ইয়ং—রোমেল, পৃষ্ঠা ১৪১।

যে, তাঁকে ফিল্ড মার্শাল পদবীতে ভূষিত করা হইল। জার্মান সেনানী বাহিনীর সর্বকনিষ্ঠরূপে মাত্র ৫০ বছর বয়সে রোমেল এই সর্বোচ্চ সামরিক সম্মানের অধিকারী হইলেন। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর দপ্তরে টিনের কৌটার আনারসের টুকরা আর ছোট্ট গ্লাসে সামান্য একটু হুইস্কির দ্বারা ফিল্ডমার্শাল পদবী লাভের 'উৎসব' সমাধা করিলেন।

রোমেলের হাতে তোব্রুকের পতনের ঠিক আগের মুহূর্তে অবরুদ্ধ বন্দরের কমাণ্ডার লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের পেট্রোল, রসদ এবং পানীয় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তবু আফ্রিকা কোরের হাতে কিছু ধরা পড়িয়াছিল। সেই ধরা-পড়া ভাণ্ডার থেকেই এক বোতল হুইস্কি রোমেলের এই 'উৎসবের' জন্য দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ডিনার শেষে রোমেল তাঁর স্ত্রীকে লিখিয়া পাঠাইলেন—'হিটলার আমাকে ফিল্ড মার্শাল পদবীতে উন্নীত করেছেন। কিন্তু এর চেয়ে যদি তিনি আমাকে আরও এক ডিভিসন সৈন্য দিতেন, তবে আমি বেশী খুশী হতাম।'[১]

তাঁর এই মন্তব্য থেকেই বুঝা যাইতেছে যে, কি পরিমাণ সরবরাহ বা সামরিক বলবৃদ্ধির অভাবের মধ্যে তিনি ছিলেন। অথচ ত্রিপোলিতে অবতরণের মাত্র ১৬ মাসের মধ্যেই তিনি তাঁর সামরিক জীবনের চরম ধাপে পৌঁছিলেন। অথচ এর আগে মরুভূমিতে যুদ্ধের সঙ্গে তিনি আদৌ পরিচিত ছিলেন না। তথাপি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের এই যুদ্ধকে তিনি দ্রুত আরত্ত করিলেন—যেন মরুভূমির 'স্বাভাবিক' যোদ্ধা বেদুইনদের মত। এমন কি যে মরুঝড়ে আরবরা পর্যন্ত কাবু হইত, রোমেল তাকেও উপেক্ষা করিলেন। কেবল বলিতেন—'ওটা অতিরিক্ত নুইসেন্স!' মরুভূমির কোন ট্রেনিংও আফ্রিকা বাহিনীর ছিল না, যদিও এই যুদ্ধের গোড়াতে তেমন একটা প্রচার কার্যত বিশ্বাস উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু রোমেলের কৃতিত্ব এমন অদ্ভুত ছিল যে, তিনি জার্মান বাহিনীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মরু যোদ্ধারূপে প্রতিভাত হইলেন।

মিশরের দ্বারদেশ থেকে শূন্য হাতে ফিরিবার ইচ্ছা নিশ্চয়ই ফিল্ড মার্শাল এরুইন রোমেলের ছিল না যদিও তাঁর আফ্রিকা কোর বহু যুদ্ধে ক্লান্ত এবং তাঁর সরবরাহ নিঃশেষিত প্রায় ছিল। তবু তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর নেতৃত্ব, তাঁর সৈনাপত্যের অসাধারণ পটুত্ব—বেপরোয়া আক্রমণ ও বিপদের ঝুঁকি নেওয়ার অদ্ভুত সাহস তাঁকে সৈন্যদলের নিকট প্রিয় থেকে প্রিয়তর করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে, শত্রু-মিত্র উভয়ের কাছেই আফ্রিকা কোর মানে দাঁড়াইল 'রোমেল'। আর 'যেখানে রোমেল সেখানেই রণক্ষেত্র'। ব্রিগেডিয়ার ডেসমণ্ড ইয়ং উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁর গ্রন্থে রোমেলের এই সমস্ত প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, সেনাপতি হিসাবে তিনি ছিলেন একজন 'স্বাভাবিক নেতা' এবং সহজাত প্রেরণাবশেই তিনি যেন ব্যক্তিগত নেতৃত্বের উপর বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, কোন নৌ-সেনাপতি যেমন উপকূলের ঘাঁটিতে দাঁড়াইয়া নৌ-যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন না, তেমনি মরুভূমির যুদ্ধও দূরে থেকে জয় করা যায় না। তিনি সোজাসুজি রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেন এবং দপ্তরের বা অপরের মাধ্যমে যুদ্ধের অবস্থা সংক্রান্ত সংবাদ জানিবার জন্য অপেক্ষায় থাকিতেন না। তিনি তাঁর নিজস্ব বিমানে, ট্যাঙ্কে, আর্মার্ড কারে, ভক্স্ ওয়াগনে কিম্বা

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃঃ ১৪২।

পায়ে হাঁটিয়া পর্যন্ত রণক্ষেত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁর সম্পর্কে সত্যই বলা যায় যে, 'তিনি যেন ঘূর্ণি-বার্তার পিঠে চড়িয়া বসিতেন এবং ঝড়ের গতি নিয়ন্ত্রণ করিতেন।'

"ride in the whirl wind and direct the storm"

এই ব্যক্তিগত নেতৃত্বের প্রশ্নে রোমেল ছিলেন নেপোলিয়ন এবং ডিউক অব ওয়েলিংটনের সমধর্মী। এমন কি, তিনি যেন সহজাত বুদ্ধির গুণে আসন্ন বিপদ সম্পর্কেও উপলব্ধি করিতে পারিতেন এবং এমন ঘটনাও তাঁর জীবনে ঘটিয়াছে, যখন তিনি নিজেই সম্ভাব্য বিপদের স্থান থেকে মাত্র ২০০ গজ দূরে সরিয়া গিয়াছেন এবং ঠিক তার পরেই শত্রুর গোলা আসিয়া সেখানে পড়িয়াছে![1]

একজন তরুণ জার্মান অফিসাব বলিয়াছেন যে, রোমেল যেন অশ্বের মত শক্তিধর ছিলেন। যুবকরাও তাঁর সঙ্গে পারিয়া উঠিতেন না এবং তাঁর 'খাদ্য, মদ বা ঘুমেরও' দরকার হইত না। নেপোলিয়নের মত তিনিও যত্রতত্র যে-কোন অবস্থায়—মোটর ট্রাকে বা টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া কয়েক মিনিট ঘুমাইয়া নিতে পারিতেন। এমন কি, কোন জরুরী বার্তা দেওয়ার জন্য তাঁকে ডাকিবারও দরকার হইত না। 'তিনি যেন এক চোখ খোলা রেখেই ঘুমাতেন এবং ডাকবার আগেই জেগে উঠতেন।'

বলা বাহুল্য যে রোমেলকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির রাজ্যে বহু গল্প ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং তিনি সত্য সত্যই 'কিংবদন্তীর নায়কে' পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁকে নাকি সেখানে সেখানে যুদ্ধরত সৈন্যদের ট্যাংকের পাশে দেখা যাইত। মরুভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সীমানা ঠিক রাখা কঠিন হইত। এজন্য কোন কোন সময় তিনি শত্রুপক্ষের এলাকার মধ্যেও ঢুকিয়া পড়িতেন এবং তাঁর নিজের গাড়ীতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। একবার এভাবে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'মামুদ' গাড়ী (রণক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য বৃটিশ বর্মাবৃত এক ধরনের ট্রাক) নিজেই চালাইয়া নিয়া একটি সামরিক হাসপাতালে প্রবেশ করিলেন ওটা পরিদর্শনের জন্য। বৃটিশ ও জার্মান উভয় শ্রেণীর আহত সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য এটি ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতাল। কিন্তু ওটি তখন সম্পূর্ণরূপেই বৃটিশ দখলে ছিল। রোমেল যখন হাসপাতালে প্রবেশ করিয়া অবস্থাটা বুঝিতে পারিলেন, তখন কিন্তু কোনো ভাবান্তর দেখাইলেন না। অথচ আহত জার্মান সৈনেরা তাঁর দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া গেল এবং শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে লাগিল। এদিকে যে বৃটিশ মেডিক্যাল অফিসার ঘুরিয়া ঘুরিয়া রোমেলকে হাসপাতালটি দেখাইতেছিলেন, তিনিও কিছু বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বরং রোমেলকে একজন 'পোলিশ জেনারেল' বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। রোমেল তাড়াতাড়ি হাসপাতাল পরিদর্শন শেষ করিয়া যখন তাঁর গাড়ীতে গিয়া চাপিয়া বসিলেন এবং বিদায়সম্ভাষণ স্বরূপ বৃটিশ অফিসারের সঙ্গে স্যালুটই পর্যন্ত বিনিময় করিলেন, এবং পরে যখন তিনি তার গাড়ীতে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইয়া নাগালের বাইরে চলিয়া গেলেন, তখন হঠাৎ পরিচয় ফাঁস হইয়া যাওয়ায় একটা 'ধরু ধরু' সোরগোল উঠিল।

এই ধরনের নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী রোমেলকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। ব্যক্তিগতভাবে রোমেল ছিলেন অত্যন্ত সংযত চরিত্রের লোক। নিজের

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ১৪৭, ১৪৯।

স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন এবং অন্য কোন নারীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। আর পরাজিত শত্রুর সঙ্গে তিনি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতেন, এমনকি ভারতীয় বন্দীরাও তাঁর কাছে সহৃদয় ব্যবহার পাইয়াছেন। মরুভূমির দুর্লভ বস্তু 'তৃষ্ণার জল' পর্যন্ত ভারতীয় বন্দী ও আফ্রিকা কোরের সৈন্যেরা—এমন কি রোমেলও স্বয়ং সমান ভাগাভাগি করিয়া খাইতেন। অবশ্য বৃটিশ পক্ষও জার্মান-ইতালীয় সেনাপতিদের সম্পর্কে অনুরূপ মানবিক ব্যবহার করিয়াছিলেন। জেনারেল অকিনলেক, জেনারেল মণ্টগোমারী প্রভৃতি এই দিক দিয়া সৎ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অন্যত্র এই দৃষ্টান্তের অভাব তো ছিল বটেই, বরং অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতা বন্দীদের উপর অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এজন্য আফ্রিকার যুদ্ধকে 'ভদ্রলোকের যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। স্বয়ং রোমেল হিটলারের বন্দী সংক্রান্ত সমস্ত নিষ্ঠুরতার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এমন কি, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৪২ তারিখের সেই কুখ্যাত আদেশটি রোমেলের হাতে পেঁাছিবামাত্র তিনি সেটিকে (সমস্ত বন্দীকে হত্যার নির্দেশ) পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন।[১]

যদিও রোমেল গোড়ায় হিটলারের অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন এবং হিটলারকে একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ বলিয়া মনে করিতেন, তবু তিনি তাঁর অন্ধ ভক্ত ছিলেন না (পরবর্তীকালে তিনি প্রচণ্ডভাবে হিটলারের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন) এবং নাৎসী পার্টির সঙ্গে, রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না।

বৃটিশ ও মার্কিন মহলে রোমেলের প্রশংসার অন্ত ছিল না। মেজর-জেনারেল জে. এফ. সি. ফুলারের মত ধুরন্ধর রণপণ্ডিত পর্যন্ত তাঁর সৈনাপত্য ও গতিশীলতার অত্যন্ত উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁর সম্পর্কে একটি মার্কিন পুস্তকে বলা হইয়াছে—'জার্মান সৈন্যের মধ্যে যা-কিছু উৎকৃষ্ট গুণ ছিল, রোমেল যেন তার প্রতিমূর্তিস্বরূপ ছিলেন।'[২]

আর ইংরাজ সামরিক লেখক বলিয়াছেন যে, রোমেলের বিরুদ্ধে যাঁরা যুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁরা রোমেলের আচরণে মুগ্ধ হইয়া জার্মানীর সেই পুরাতন প্রবাদ-বাক্য স্মরণ করিতেন—

'...the next best thing to a good friend is a good enemy' —

—একজন উৎকৃষ্ট বন্ধুর পরেই সবচেয়ে ভালো একজন উৎকৃষ্ট শত্রু।'[৩]

* * *

কিন্তু সেই 'উৎকৃষ্ট শত্রু' যখন ২১শে জুন অবরুদ্ধ তোব্রুক বন্দরকে একটি মাত্র আঘাতে কাড়িয়া লইয়া সোজা আসিয়া দাঁড়াইলেন আলেকজেন্দ্রিয়া বন্দরের প্রবেশমুখে (৩০শে জুন, ১৯৪২) তখন কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন মহলে নিদারুণ উত্তেজনা ও নিরতিশয় উৎকণ্ঠা দেখা দিল। কারণ, কায়রো ও সুয়েজ খাল বেদখল হইয়া গেলে এবং দক্ষিণ রাশিয়ার ভিতর দিয়া হিটলারের পরিকল্পিত দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযান সফল হইলে মধ্যপ্রাচ্য অক্ষশক্তিবর্গের হাতে চলিয়া যাইবে এবং ভারতবর্ষসহ গোটা বৃটিশ সাম্রাজ্য নিদারুণ বিপদে পড়িবে। হিটলার এবং মুসোলিনী উভয়েই সামরিক দিক থেকে এটা

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা ১৬৭।
২। লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৩৪৮।
৩। ডেসমণ্ড ইয়ং—পৃষ্ঠা ১৫২।

চাহিতেছিলেন, বিশেষভাবে মুসোলিনী। কেননা, মুসোলিনীর এই দুর্ভাবনা ছিল যে, একা হিটলার গোটা ইউরোপ দখল করিয়া নিতেছেন, আর তিনি পিছনে পড়িয়া যাইতেছেন, এটা চলিতে পারে না। সুতরাং আফ্রিকাটা অন্ততঃ তাঁর নিজস্ব দখলে আনা চাই। এজন্যই ১৯৪০-৪১ সালে ইউরোপে হিটলারের পাশাপাশি ভূমধ্যসাগরে, বলকানে ও আফ্রিকায় 'Parallel War' বা 'সমান্তরাল যুদ্ধ' তিনি চাহিতেছিলেন— যদিও ওগুলির সর্বত্রই তিনি ব্যর্থকাম হইয়াছেন, তবু মিশরে ছিল তাঁর শেষ আশা।[১]

আর মিশর তো দখল হইয়া যাইবেই। অতএব মুসোলিনী তাঁর বিজয় উৎসবের তোড়জোড় করিলেন। কারণ, জেনারেল রোমেল ছিলেন ইতালীয় জার্মান যুদ্ধবাহিনীর অধিনায়ক ও মুসোলিনীর চরম কর্তৃত্বের অধীন। ফলে, রোমেল কর্তৃক জয়লাভের অর্থ ইতালীর চরম জয়। সুতরাং মুসোলিনী ২৯শে জুন বিমানযোগে সাইরেনাইকায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে লিবিয়ার উপকূলে ডের্নো নামক স্থানে মুসোলিনীর প্রিয় সাদা ঘোড়াটি আগেই আনিয়া রাখা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য—মিশর জয়ের পর মুসোলিনী স্বয়ং নবলব্ধ 'সাম্রাজ্যের মার্শাল' হিসাবে তুষারশুভ্র ইউনিফর্ম পরিয়া ওই শ্বেতাশ্বরোহণে আলেকজেন্দ্রিয়ায় প্রবেশ করিবেন দিগ্বিজয়ীর মত। তাঁর কোমরবন্ধে ঝুলানো থাকিবে সেই বিখ্যাত তরবারি—'Swoɪd of Islam' যেটা লিবিয়ার গভর্নর মার্শাল ব্যালবো তাঁকে একদা উপহার দিয়াছিলেন। আর বলাই বাহুল্য যে, মিশরকে শাসনের জন্য তাঁর নবনিযুক্ত গভর্নরও তাঁর সঙ্গেই এই উৎসবে যোগ দিবেন। এমন কি মিশরের জন্য একটা খসড়া শাসনতন্ত্রও তিনি রচনা করিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু মুসোলিনীর দুর্ভাগ্য, এত বড় আয়োজন একেবারেই ব্যর্থ গেল। তাঁর সাদা ঘোড়া ডের্নোর আস্তাবলেই পড়িয়া রহিল এবং সেই বিখ্যাত তরবারিও খাপ থেকে আর খোলা হইল না। ইতালীয় সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে মুসোলিনী অবশ্যই কয়েকটি যুদ্ধবন্দী শিবির ও সেনাদল পর্যবেক্ষণ করিলেন। কিন্তু ওই পর্যন্ত, কায়রোতে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করা দূরের কথা, রণাঙ্গনের ৫০০ মাইল দূরে বার্ডিয়া থেকেই তাঁকে ফিরিয়া আসিতে হইল শূন্য হাতে—তিন সপ্তাহ পর। তখন তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য, পেটে তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা (আন্ত্রিক ক্ষত) এবং তাঁর ওজন হ্রাস পাইল ৫০ পাউন্ড।[২]

* * *

উত্তর আফ্রিকায় মুসোলিনীর সাম্রাজ্যের স্বপ্ন চূর্ণ হইয়া গেল এবং কার্যতঃ অক্ষশক্তিবর্গ আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগর থেকে বিতাড়িত হইলেন। কিন্তু এই ব্যর্থতার জন্য ফিল্ড মার্শাল রোমেল ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ছিলেন কিনা সন্দেহ। কেননা, যে বিরুদ্ধ অবস্থা এবং যে অদ্ভুত বিপাকের মধ্যে তিনি পড়িয়াছিলেন, তা অবর্ণনীয়।

রোমেল অতি দ্রুত আগাইয়া আসিয়াছিলেন।

ফলে তাঁর যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে প্রকাণ্ড দূরত্বের সৃষ্টি হইল। তোব্রুক থেকে ৩০০ মাইল এবং বেঙ্গাজী থেকে ৬০০ মাইল দূরে এল আলামিন—আফ্রিকা কোর বা জার্মান-ইতালীয় বাহিনীর জন্য সমস্ত সরবরাহ এই বেঙ্গাজী বন্দরেই

খালাস করিতে হইত। কিন্তু এই সরবরাহ দেওয়া ও যোগাযোগ রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। হিটলার তখন পূর্বদিকে সোভিয়েট রাশিয়া নিয়া ব্যস্ত এবং হাইকমাণ্ডের নায়কেরা রোমেলের প্রতি ছিলেন ঈর্ষান্বিত ও বিরূপ। অথচ রোমেলের তখন দরকার ছিল—আরও সৈন্য, আরও ট্যাংক, আরও প্লেন, আরও পেট্রোল ইত্যাদি যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ। কিন্তু হাইকমাণ্ড হাত গুটাইলেন এবং যেটুকু সরবরাহ ইতালী থেকে বেঙ্গাজী বন্দরের দিকে রওনা হইত, তার অধিকাংশই বৃটিশ বিমান বা নৌবহরের দ্বারা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইত। আর মরুভূমির যুদ্ধে সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন ছিল জলের। কিন্তু এল আলামিন এলাকায় যে সমস্ত জলের কূপ ছিল ইংরাজেরা আগেই সেগুলি নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ফলে, ইতালীয়-জার্মান বাহিনীর জন্য প্রত্যেকটি জলের বিন্দু স্থলপথের যানবাহনের মাধ্যমে অত্যন্ত দূর থেকে বহন করিয়া আনিতে হইত।

অথচ সরবাহের চাবিকাঠি ছিল মাল্টা দ্বীপে। অর্থাৎ মাল্টা দ্বীপ যাদের কর্তৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণে থাকিবে, তারাই ভূমধ্যসাগরের এই স্থলে সরবরাহ ব্যবস্থার উপরেও নিয়ন্ত্রণ খাটাইতে পারিবে। জেনারেল রোমেল এজন্য মাল্টা দ্বীপ দখলের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ, ১৯৪১ সালের শেষ অর্ধভাগে রোমেলের জন্য প্রেরিত সরবরাহগুলি ইংরাজেরা এমন ভয়ংকরভাবে (শতকরা ৭৫ ভাগ পর্যন্ত) সমুদ্রগর্ভে ডুবাইয়া দিতে লাগিল যে, শেষ পর্যন্ত নাৎসী হাইকমাণ্ড মাল্টা সম্পর্কে সজাগ হইলেন এবং অধিকৃত সিসিলি দ্বীপ থেকে পালটা আক্রমণ চালাইলেন। এমন কি আলেকজেন্দ্রিয়া বন্দরে নোঙ্গর-করা-অবস্থায় দুইটি বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ (কুইন এলিজাবেথ ও ভ্যালিয়েণ্ট) পর্যন্ত তরুণ ইতালীয় বৈমানিকেরা ডুবাইয়া দিল। কিছুকাল পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু মাল্টা দ্বীপ দখলের জন্য 'অপারেশন হারকিউলিস' পরিকল্পনা আর কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইল না। মিশর জয় না করা পর্যন্ত হিটলার জুন মাসে সেই পরিকল্পনা 'স্থগিত' রাখিলেন। এবং ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস থেকে আবার ভূমধ্যসাগরের উপর বৃটিশ প্রভুত্ব পুরাপুরি প্রতিষ্ঠিত হইল। অর্থাৎ আফ্রিকার মরুভূমি যুদ্ধে সরবরাহ বজায় রাজার জন্য যে তিনটি ঘাঁটি—জিব্রাল্টার, মাল্টা ও আলেকজেন্দ্রিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল, সেই তিনটিই ছিল পুরাপুরি ইংরাজের হাতে। হিটলারের এই রণনৈতিক ব্যর্থতার খেসারৎ দিতে হইল রোমেলকে, কেননা রোমেল উপযুক্ত সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হইলেন। 'অথচ মরুভূমি যুদ্ধের ১০ ভাগের ৯ ভাগ নির্ভর করিত সরবরাহের উপর।'[১]

একমাত্র পেট্রোলই দরকার হইত অসম্ভব পরিমাণে। বৃটিশ পক্ষ কনভয়যোগে যে সমস্ত পেট্রোল মজুত করার উদ্দেশ্যে আনয়ন করিতেন, সেই কনভয়ের জন্যই প্রত্যহ ১ লক্ষ ৮০ হাজার গ্যালন তৈলের দরকার হইয়াছিল।[২]

মরুভূমি যুদ্ধে যন্ত্রদানবের ক্ষুধা মিটাইতে গিয়া কী পরিমাণ সরবরাহের প্রয়োজন হইত, তার আর-একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মিত্রপক্ষের বিখ্যাত অষ্টম বাহিনীর মাত্র এক ডিভিসন সাঁজোয়া সৈন্যদলের জন্য প্রত্যহ প্রায় ৭০ হাজার গ্যালন গ্যাসোলিন, ৩৫০ টন গোলাবারুদ এবং ৫০ টন যন্ত্রাংশ বা স্পেয়ার পার্টস-এর দরকার

১। জে. এফ. সি. ফুলার—পৃঃ ২০৯।
২। ডেসমণ্ড ইয়ং—পৃঃ ১২৬।

হইত। সুতরাং যে পক্ষে সরবরাহের পরিমাণ বেশী, সেই পক্ষেরই যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনাও বেশী ১

অতএব এই দিক দিয়া রোমেলের অদৃষ্টে যে বিড়ম্বনা অপেক্ষা করিতেছিল, তা বলা বাহুল্য মাত্র।

* * *

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে এল আলামিনের যুদ্ধ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—বিশেষত বৃটিশ পক্ষের দিক থেকে এবং অষ্টম বাহিনীর স্বনামধন্য সেনাপতি মণ্টগোমারি এই রণক্ষেত্র থেকেই পৃথিবীব্যাপী খ্যাতির অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু জেনারেল মণ্টগোমারির আগেই জেনারেল অকিনলেকের হাতে রোমেল কিন্তু পরাজিত হইয়াছিলেন ১লা থেকে ৩রা জুলাইয়ের 'প্রথম আলামিনের' যুদ্ধে। এমন কি জেনারেল অকিনলেকের জন্যই রোমেলের মিশরে পরাজয়ের মধ্যে বিশেষজ্ঞ মতানুসারে প্রথমটিই ছিল 'সবচেয়ে কঠোর ভাগ্যপরীক্ষামূলক।'

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এই যে, জেনারেল ওয়েভেলের মত জেনারেল অকিনলেকও আফ্রিকার যুদ্ধে সেই খ্যাতি সেই সম্মান পান নাই। কারণ, জুলাইয়ের পর আগস্টের শেষে কিম্বা অক্টোবর মাসে আলামিনের রণক্ষেত্রে যে চূড়ান্ত যুদ্ধ হইয়াছিল এবং যার ফলে রোমেল শেষ পর্যন্ত আফ্রিকা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই শেষের যুদ্ধগুলি বৃটিশ পক্ষের প্রচার গুণে এত খ্যাতি লাভ করিয়াছে যে, আলামিনের যুদ্ধ বলিতে রোমেল-বনাম মণ্টগোমারির যুদ্ধই যেন 'আলামিনের একমাত্র যুদ্ধরূপে' ইতিহাসে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে।

আগেই বলা হইয়াছে যে, রোমেল যখন আলামিন সীমানায় পৌঁছিলেন, তখন তাঁর ইতালীয়-জার্মান বাহিনী বা আফ্রিকা কোরের সৈন্যেরা ক্লান্ত এবং উপযুক্ত বিমান ও ট্যাংক-শক্তি তাঁর ছিল না। কিন্তু রোমেল ভাবিলেন আগেকার যুদ্ধগুলির মত তিনি এবারও হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বাজিমাত করিবেন। কিন্তু অষ্টমবাহিনী ও জেনারেল অকিনলেক অনেকদিন ধরিয়াই প্রস্তুত ছিলেন এবং সবরকম আটঘাট বাঁধিয়া রোমেলকে হটাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং আলামিন রণক্ষেত্রের ভৌগোলিক সংস্থানও রোমেলের অনুকূলে ছিল না। ফলে, এবার তাঁর আকস্মিক আক্রমণের রণকৌশল ও আনুষঙ্গিক প্ল্যানগুলি বানচাল হইয়া গেল। তিনি হটিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাঁর বাকী যান্ত্রিক সৈন্যদেরকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। এরপর কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আলামিন রণক্ষেত্রে অচল অবস্থার উদ্ভব হইল। কিন্তু যুদ্ধের এই ফলাফলের জন্য লণ্ডনের সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং স্বয়ং চার্চিল চটিলেন। কারণ তিনি অতি দ্রুত উত্তর আফ্রিকা যুদ্ধের চূড়ান্ত মীমাংসা চাহিতেছিলেন। সুতরাং তিনি অষ্টম বাহিনীর সৈনাপত্যে গুরুতর পরিবর্তন ঘটাইলেন মস্কো থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে—আগস্ট মাসে। অকিনলেকের বদলে জেনারেল আলেকজাণ্ডার (ব্রহ্মদেশের সাম্প্রতিক প্রধান সেনাপতি) মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান অধিনায়কের পদে এবং জেনারেল গট্ অষ্টম বাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ৭ই আগস্ট, ১৯৪২, জেনারেল গট্ শত্রুপক্ষের গুলিতে বিমান দুর্ঘটনায় (কায়রো যাত্রার

১। লুই এল. স্নাইডার—পৃঃ ৩৪৪।
২। ক্যাপ্টেন লিডেল হার্ট—'দি হিস্ট্রি অব দি সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার'—পৃঃ ২৮৩।

পথে) নিহত হইলেন। তখন চার্চিলের নজর পড়িল লেঃ জেনারেল বি. এল. মণ্টগোমারির উপর, ১৯৪০ সাল থেকে যিনি 'নিষ্কর্মা' বসিয়া ছিলেন।[১]

* * *

এল আলামিনের ঐতিহাসিক রণক্ষেত্রে দুই প্রতিভাধর সেনাপতি পরস্পরের মুখোমুখি হইলেন আফ্রিকার মরুভূমি যুদ্ধের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য। লেঃ জেনারেল বার্নার্ড এল. মণ্টগোমারীর আগে বিশেষ কোন পরিচিতি বা খ্যাতি ছিল না। কিন্তু রোমেলের সঙ্গে তাঁর কতকগুলি সাদৃশ্য ছিল যেমন—রোমেলের মত মণ্টগোমারীর পরিবারেরও কোন মিলিটারি ট্রাডিশন ছিল না, বরং তিনি ছিলেন বিশপ বা ধর্মযাজকের ছেলে, জাতিতে আইরিশম্যান,—দেখিতে নিরীহ স্কুল মাস্টারের মত। রোমেলের বাবাও ছিলেন স্কুল মাস্টার, তবে পিতাপুত্র দুজনেই অঙ্কে মেধাবী ছিলেন। মণ্টগোমারী এবং রোমেল উভয়ের জন্মই নভেম্বর মাসে—কিন্তু প্রথম জন ১৮৮৭ সালে এবং দ্বিতীয় জন ১৮৯১ সালে। দুইজনেই বাহ্যত দেখিতে শান্ত—মণ্টগোমারী তো বেশ ভালো মানুষ গোছের—কিন্তু ভয়ানক তেজী এবং আত্মবিশ্বাস-পরায়ণ, এমন কি কিছুটা দাম্ভিকও বটেন। রোমেলের মত ব্যক্তিজীবনে মণ্টগোমারীও ছিলেন অত্যন্ত সংযত ও 'বিশুদ্ধ' চরিত্রের লোক—খাদ্য, মদ্য এবং স্ত্রীলোক সম্পর্কে ভয়ানক সাবধানী, এমন কি গোঁড়া প্রকৃতির। কোন প্রকার নেশার অভ্যাস তাঁর ছিল না। প্রকাশ যে, উত্তর আফ্রিকা মরুভূমি যুদ্ধের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সেখানে গেলে তিনি মণ্টগোমারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, মরুভূমির এই কঠোর অবস্থার মধ্যে তিনি তাঁর স্বাস্থ্য এত ভালো রাখিলেন কিভাবে? তখন তিনি সগর্বে জবাব দিয়াছিলেন—'আমি মদও খাই না, ধূমপানও করি না। কাজেই আমার শরীর ষোল আনাই সুস্থ থাকে!'

কিন্তু চার্চিলও দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনিও তৎক্ষণাৎ তুড়ুক জবাব দিলেন—'আমি মদও খাই এবং ধূমপানও করি—তবু আমার শরীর কিন্তু ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনাই ভালো থাকে!'*

রোমেলের মত মণ্টগোমারীও সৈন্যদলের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং তাঁদের শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। অথচ দেখিতে তিনি জাঁদরেল ছিলেন না, তাঁর চেহারা ছিল পাতলা, কিন্তু মজবুত গড়ন, কিছুটা খর্বাকৃতির, কিন্তু ইস্পাতের মত কঠিন, আর তাঁর তীক্ষ্ম নীল চোখ দুটির দৃষ্টি যেন ছিল মর্মভেদী। তাঁর আত্মবিশ্বাস এত বেশী ছিল যে, উত্তর আফ্রিকায় অষ্টম বাহিনীর সৈনাপত্যের দায়িত্ব পাইয়াই তিনি আলামিন রণক্ষেত্রের অবস্থার দিকে তাকাইয়া সদর্পে ঘোষণা করিলেন—'গাণিতিক হিসাবেই এখন এটা সুনিশ্চিত যে, 'আমি শেষ পর্যন্ত রোমেলকে সাবাড় করতে পারবো!'[২]

এল আলামিন রণক্ষেত্রের ভূপ্রকৃতির গঠন এমন বিচিত্র ছিল যে, কোন পক্ষেরই পার্শ্বদেশের মহড়ায় বা পরিবেষ্টনের দ্বারা বাজিমাত করার সম্ভাবনা ছিল না। উত্তরদিকে ছিল ভূমধ্যসাগরের উপকূল ভাগ, আর নীচের দিকে দক্ষিণে ছিল দুরধিগম্য

'কোয়াটারা ঢালুভূমি' এবং তার সন্নিহিত পিরামিড আকৃতির ৬০০ ফুট উঁচু পাহাড়। গোটা অঞ্চলটাই ছিল অত্যন্ত কঠিন, কর্কশ, বালুকাহীন শক্ত মাটির দেশ, আর অসংখ্য ক্ষুদে ক্ষুদে পাহাড়ে ভর্তি—এই পাথুরে মাটিতে 'শেয়ালের গর্ত' খনন করিয়া সৈন্যদের আশ্রয়লাভের সুযোগ ছিল না, ছোট ছোট পাথুরে দেওয়াল তুলিয়া সৈন্যদের আত্মরক্ষার ঘাঁটি তৈয়ার করিতে হইত। সমগ্র উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গনের তুলনায়ই এল আলামিনের ভৌগোলিক সংস্থান এমন ভিন্ন রকমের ছিল যে, যে কোন বিজয়ী পক্ষেরই সোজাসুজি শত্রুব্যূহ ভেদ না করিয়া অগ্রসর হওয়ার উপায় ছিল না। কারণ, পার্শ্ব বেষ্টনের কোন সুযোগ ছিল না। স্বয়ং চার্চিলও একথা স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আলামিনের যুদ্ধ অন্য যে কোন মরুযুদ্ধের তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। রণাঙ্গন ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাগুলি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও গভীর।

এদিকে রোমেলের সরবরাহে যখন ক্রমাগত ঘাটতি পড়িতেছিল এবং বার বার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও হিটলারী হাইকমাণ্ড রোমেলকে বিমুখ করিতেছিল, এমন কি ২৭শে আগস্ট তারিখ ৬ হাজার টন পেট্রোলের প্রতিশ্রুতি দিয়াও যখন শেষ মুহূর্তে—আলম-এল-হালফার গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের আগে—তা রক্ষা করা হইল না, তখন অন্যদিকে বৃটিশ পক্ষে যেন সরবরাহের বান ডাকিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, অনেক-দিন ধরিয়াই বৃটিশ পক্ষ মধ্যপ্রাচ্যের ঘাঁটিতে প্রচুর সামরিক বল সংহত করিতেছিল। অবশ্য ধীরে ধীরে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ট্যাংক, কামান, গোলাগুলি, মোটর-যানবাহন, জ্বালানী ইত্যাদি প্রচুর সামরিক দ্রব্য ও অস্ত্র আনয়ন করা হইতেছিল পোর্ট-সৈয়দ, সুয়েজ ও আলেকজেন্দ্রিয়া বন্দরে। ১৯৪২ সালের অক্টোবরের আরম্ভে ১৮টি জাহাজের এক সুবৃহৎ কনভয়যোগে নূতন নূতন সমরসম্ভার—ট্যাংক, জীপ, ট্রাক, কামান ও প্লেন ইত্যাদি শত শত ও হাজার হাজার সংখ্যায় মিশরে আসিয়া পেঁছিল। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে আমেরিকার নূতন শক্তিশালী গ্রাণ্ট ও শেরমন ট্যাংক, যে ট্যাংকগুলি অগ্নিনিক্ষেপক ক্ষমতায় ও অন্যান্য উৎকর্ষতায় জার্মান ট্যাংকের চেয়ে ভালো কিম্বা সমকক্ষ ছিল এবং এতদিন পর্যন্ত যার অভাবে অষ্টম বাহিনীর সৈন্যেরা রোমেলের সঙ্গে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। কেবল অস্ত্রশস্ত্রেই যে মিত্রপক্ষ অধিকতর বলীয়ান হইল, এমন নয়, এল আলামিনের সন্নিহিত উৎকৃষ্ট জলের প্রস্রবণগুলিও তাদের হাতেই ছিল।

চার্চিল নিজেই বলিয়াছেন যে, অষ্টম আর্মির সামরিক শক্তি (মণ্টগোমারীর সৈনাপত্য গ্রহণের পর থেকে) আগে কখনও এত বৃদ্ধি পায় নাই। ইংলণ্ড থেকে দুইটি নূতন পুরো ডিভিসন অষ্টম বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হইল। এক হাজারের অধিক ট্যাংক—যেগুলির অর্ধেক ছিল অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মার্কিন 'গ্রাণ্ট' ও 'শেরমন'—সেগুলি আনা হইল। অর্থাৎ বৃটিশ পক্ষ ইতালীয়-জার্মানদের তুলনায় 'দ্বিগুণ শক্তি' এবং 'গুণের দিক থেকে অন্তত সমতা' অর্জন করিল। আর পশ্চিম মরুভূমির যুদ্ধে এই প্রথম এত গোলন্দাজী শক্তি কেন্দ্রীভূত করা হইল যে, আগে তা কখনও ঘটে নাই। এয়ার-মার্শাল কানিংহ্যামের অধীনে সামরিক বিমানের সংখ্যা দাঁড়াইল ৫৫০ এবং মাল্টার ঘাঁটিতে ও অন্যত্র আরও ৬৫০টি বিমান।[১]

১। উইনস্টোন চার্চিল—চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৫২৬ এবং ৫৩৯।

অর্থাৎ বৃটিশ পক্ষে মণ্টগোমারীর শক্তি দাঁড়াইল ৪টি আর্মার্ড (বর্মাবৃত) ডিভিসন ও ৭টি পদাতিক ডিভিসনসহ মোট ২ লক্ষ লড়িয়ে সৈন্য, ১১০০টি ট্যাংক, ১ হাজার ফিল্ড-গান এবং সহস্রাধিক ট্যাঙ্কমারা কামান ইত্যাদি। আর বিমান শক্তি দাঁড়াইল ১২ শত থেকে ১৩ শতের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে বিমানশক্তিতে অষ্টম বাহিনী অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এবং উত্তর আফ্রিকার আকাশে তাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইতিমধ্যে আফ্রিকা কোরও অবশ্য সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে কয়েক সপ্তাহ সময় পাইয়াছিল। কিন্তু রোমেল হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া জার্মানীতে চিকিৎসার জন্য চলিয়া গেলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে জেনারেল জর্জ স্টুম (Stumme) দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। এই সময় ইতালীয় জার্মান বাহিনীর লড়িয়ে সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াইল এক লক্ষের মত—৭টি আর্মার্ড ডিভিসন ও ৮টি মোটরায়িত পদাতিক ডিভিসনসহ (যদিও ডিভিসনগুলির সৈন্যশক্তি অত্যন্ত কম ছিল) মোট আফ্রিকা কোরের হাতে ছিল মাত্র ২০০ উৎকৃষ্ট ট্যাংক, আর ৩০০ থেকে ৩৫০টি নিকৃষ্ট ট্যাংক।[১]

স্বয়ং মণ্টগোমারী লিখিয়াছেন যে, আলামিনের রণক্ষেত্রের উত্তর ও দক্ষিণ অংশ মাইনের গভীর বেড়াজালে আচ্ছন্ন ছিল। সাধারণভাবে এই সমস্ত মাইনের জাল ৫ হাজার থেকে ৯ হাজার গজ পর্যন্ত চওড়া ছিল এবং কোন পক্ষেরই অতর্কিত আক্রমণের বিস্ময় ঘটানো সম্ভব ছিল না।[২]

কিন্তু রোমেল অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও জার্মানীতে ফিরিয়া যাওয়ার আগে রণে ক্ষান্ত দিতে চাহিলেন না, বরং তাঁর স্বভাবসুলভ আক্রমণাত্মক ঝোঁকের জন্য তিনি ৩১শে আগস্ট তারিখ আলম এল হালফার দিকে আঘাত হানিলেন। কিন্তু ওখানে বৃটিশের সুরক্ষিত এলাকায় তিনি চতুর মণ্টগোমারীর ফাঁদে পড়িলেন। কারণ জায়গাটা ট্যাংকের পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত ছিল না। কিন্তু বৃটিশ পক্ষ কারসাজিপূর্বক এমন একটি ভুয়া মানচিত্র রোমেলের হাতে ধরাপড়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যার ফলে আলম এল হালফার শৈলশিরার এলাকা সম্পর্কে রোমেলের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। অতএব তিনদিনের ব্যর্থ যুদ্ধের পর রণে ভঙ্গ দিয়া আলামিনের গোড়াকার অবস্থানে ফিরিয়া গেলেন এবং চিকিৎসার জন্য জার্মানীতে প্রস্থান করিলেন। তখন সাময়িকভাবে দায়িত্ব পড়িল জেনারেল স্টুমের উপর, যে কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে।[৩]

মণ্টগোমারীও বুদ্ধিমানের মত তখনই রোমেলকে আর ঘাঁটাইতে গেলেন না। আরও প্রস্তুতি এবং আরও উপযুক্ত মুহূর্তের জন্য প্রায় সাত সপ্তাহ অপেক্ষা করিলেন। অর্থাৎ আলামিন অঞ্চলের দ্বিতীয় বারের যুদ্ধেও বৃটিশ পক্ষ রোমেলকে উত্তর আফ্রিকা থেকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারিলেন না।

মণ্টগোমারী যে সময় পাইলেন, সেই সময়ের মধ্যে তিনি অষ্টম বাহিনীর সৈন্য ও সেনানায়কদিগকে ঝাড়াই-বাছাই করিয়া আসন্ন চরম যুদ্ধের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। এই বিষয়ে তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল, যেমন দক্ষতা ছিল তাঁর রণনীতিতে

১। Basil Collier—P. 368-69.

২। Decisive Battles of the Second World War—edited by Peter Young, P. 167.

৩। লুই স্নাইডার—পৃঃ ৩৫০।

এবং রণকৌশলের সংগঠকরূপে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ পক্ষের তিনি অন্যতম সেরা সেনাপতি ছিলেন, সন্দেহ নাই। তিনি গতানুগতিক চিন্তাধারার দ্বারা পরিচালিত হইতেন না এবং যান্ত্রিক যুদ্ধের প্রকৃতি ও সমস্যা সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি অত্যন্ত সতর্ক। খুঁটিনাটি ব্যাপারেও খুব হিসাবী এবং দৃঢ় সংকল্পের লোক ছিলেন। আর সৈন্যদের আনুগত্য ও সহযোগিতা তিনি সহজেই লাভ করিতে পারিতেন। মার্কিন জেনারেল আইজেনহাওয়ারও এই সমস্ত বিষয়ে মণ্টগোমারীর উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।[১]

জেনারেল আলেকজাণ্ডার ও মণ্টগোমারীর উপর চার্চিলের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল একমাত্র যুদ্ধজয় বা কোন ভূমিখণ্ডের জয় নয়। এবার রোমেলের গোটা ইতালীয়-জার্মান বাহিনীকে সংহার ও অক্ষশক্তিকে আফ্রিকা থেকে বহিষ্কার করিতে হইবে এবং মিশর ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তাবিধান করিতে হইবে। মধ্যপ্রাচ্যের বৃটিশ সেনাপতিরা সেভাবেই প্রস্তুত হইতে ছিলেন। মণ্টগোমারী এজন্য সৈনাপত্য গ্রহণের পরেই কাইরোতে পিছু হটার সমস্ত পরিকল্পনা বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন এবং চূড়ান্ত জয়ই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অপরদিকে রোমেলও মিশর জয়ের জন্য কৃতসংকল্প ছিলেন এবং যেখানে আসিয়া তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখান থেকে যেন হাত বাড়াইলেই বিখ্যাত নীলনদের উপত্যকা জয় এবং কায়রো ও আলেকজেন্দ্রিয়াকে ছিনাইয়া নেওয়া যাইতে পারে। আফ্রিকায় এতদিন ধরিয়া অনেকগুলি বিদ্যুৎগতি জয়ের চমক তিনি দেখাইয়াছেন এবং যেভাবে তিনি আগাইয়া আসিয়াছেন, তাতে বাকী ৬০ মাইল অতিক্রম করিতে আর কতক্ষণ? কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এল আলামিনের ভূপৃষ্ঠ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং এই রণাঙ্গন ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ, মাত্র ৪০ মাইল লম্বা এবং এর উত্তর দিকে অগাধ সমুদ্র, অর্থাৎ ভূমধ্যসাগর, আর দক্ষিণ দিকে 'কোয়াটারা ঢালু জমির' দুরধিগম্যতা—যার সীমানায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাথুরে মাথাগুলি যেন পাঁচিলের মত বুক সমান উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—অন্ততঃ ছবির উপর চোখ বুলাইলে এমন ধারণাই জন্মে। সোজা কথায় উত্তরে সমুদ্র আর দক্ষিণে পাথুরে ঢালু জমি—এই দুই দিক দিয়া কোন সৈন্যদলের পক্ষে পাশ কাটাইয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল। সুতরাং মধ্যবর্তী অংশটার দুই দিকে সারি সারি থাকের মত মাইন পাতিয়া ও কাঁটাতারের বেড়া দিয়া আত্মরক্ষার প্রাচীর গড়িয়া তোলা হইল। কিন্তু এগুলি গড়িয়া তোলা হইল জরুরী কোন সঙ্কটের জন্য। কারণ, রোমেল কেবল আত্মরক্ষার লড়াই নিয়া থাকিবেন, এমন পাত্রই তিনি ছিলেন না। বহু যুদ্ধে তাঁর সৈন্যদল ক্লান্ত এবং তাঁর সমরসম্ভারও উপযুক্ত ছিল না বটে, কিন্তু সেনাপতি হিসাবে তাঁর সাহস ও ইচ্ছাশক্তি ছিল অসাধারণ এবং রণনেতা হিসাবে তাঁর প্রতি সৈন্যদলের বিশ্বাসও ছিল অগাধ। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন তিনি শত্রুপক্ষকে বিশ্রাম দিবেন না, তাক তাকে থাকিবেন এবং সুযোগ বুঝিয়া হঠাৎ এমন দ্রুতগতি আক্রমণ করিয়া বসিবেন যে, আলামিনের লাইন ভেদ করিয়া একেবারে সুয়েজ খালে পৌঁছিয়া যাইবেন।

কিন্তু মণ্টগোমারী যেন পূর্বাহ্নেই রোমেলের মনোভাব এবং আক্রমণের কৌশল আন্দাজ করিতে পারিয়াছিলেন। চার্চিল লিখিয়াছেন যে, মণ্টগোমারীর কৃতিত্ব এই

১। স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৩৪৭।

যে, তাঁর এই সমস্ত অনুমান সার্থক হইয়াছিল। রোমেলকে চূড়ান্ত আঘাত হানিবার জন্য মণ্টগোমারী—সৈন্যশক্তি, অস্ত্রশক্তি, গোলাগুলির-শক্তি এবং বিমানশক্তিতে শ্রেষ্ঠতা ও প্রাধান্য অর্জনের জন্য অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু রোমেল মরুভূমির যুদ্ধে এমন খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন—যে খ্যাতির জন্য মিত্রশক্তি মহলে তাঁর ডাকনাম ছিল (ডেজারট্ ফক্স) বা 'মরুভূমির শেয়াল'—তার ফলে মণ্টগোমারীর 'মানুষের পক্ষে যতদূর আয়োজন করা সম্ভব' তা করা সত্ত্বেও (চার্চিলের বর্ণনা অনুযায়ী) নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছিলেন না। সুতরাং তিনি এক প্রকাণ্ড চাতুর্য-নীতি ও 'ধাপ্পা দেওয়ার' রণকৌশল অবলম্বন করিলেন—উদ্দেশ্য 'মরুভূমির শেয়াল'কে শিকারীর মত ফাঁদে ফেলিয়া সংহার করা।

রণকৌশলের এই পরিকল্পিত চাতুর্যনীতি অনুসারে আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাস ধরিয়া মণ্টগোমারী এমন ভঙ্গী দেখাইতে লাগিলেন যেন তিনি তাঁর মূল বা প্রধান আক্রমণ চালাইবেন দক্ষিণ দিক (কোয়াটারা ঢালু জমির এলাকা) থেকে অথচ আসলে তিনি তাঁর মূল আক্রমণ চালাইবার সামগ্রিক প্রস্তুতি খাটাইতেছিলেন উত্তর দিকে—ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী এলাকায়। উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে এই ধাপ্পা দেওয়ার কৌশল পুরাপুরি সফল হইয়াছিল এবং এল আলামিনের উত্তরাঞ্চলে এই যুদ্ধায়োজন এমন গোপনীয়তার সঙ্গে সম্পন্ন হইয়াছিল যে, জার্মান পক্ষের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ পর্যন্ত যথার্থ সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। আমেরিকা থেকে সদ্য সদ্য আনা অত্যন্ত উচ্চগুণসম্পন্ন শত শত শেরমন ট্যাংক লুকাইয়া ফেলা হইল। রাত্রির অন্ধকারে বড় বড় কামান আনা হইল, আর দক্ষিণ দিকে অজস্র 'ডামি' বা নকল ট্যাংক, নকল লরী, নকল কামান সাজানো হইল। এমনকি 'ডামি' পাইপ লাইন, 'ডামি' পেট্রোল-স্টেশন থেকে শুরু করিয়া নকল বেতারঘাঁটি পর্যন্ত তৈয়ার করা হইল এবং এগুলি তৈয়ার করিতে গিয়া এমন ভঙ্গী দেখানো হইল যে নভেম্বর মাসের আগে এগুলি 'রেডি' হইবে না। সমগ্র আয়োজনটাই একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পা ও গভীর গোপনীয়তার মধ্যে এমনভাবে তৈয়ার করা হইতে লাগিল যে, কাকপক্ষীতেও এগুলির আসল উদ্দেশ্য টের পাইল না। আর বৃটিশ বিমানবহর আকাশে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করায় অক্ষশক্তির পর্যবেক্ষক বিমানগুলি ধারেকাছেও ঘেঁষিতে পারে নাই। ফলে, জার্মান সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ রোমেলের দপ্তরে সম্পূর্ণ ভুল রিপোর্ট পাঠাইল। এমন কি, আক্রমণের তারিখটা পর্যন্ত তারা জানিতে পারিল না—

'...and by the entirely wrong information supplied by the German Intelligence, the deception was so successful that the date of the attack the direction of the main thrust and the location of the armour were completely hidden from the Germans'—[১]

সোজা কথায় মণ্টগোমারীর এই নিশ্চিদ্র চাতুর্য-নীতির এত সাফল্য হইল যে, রোমেল শত্রুপক্ষের আসল আক্রমণের গতিপথটাও টের পান নাই।

সুতরাং ৩১শে আগস্ট, ১৯৪২ রোমেল দক্ষিণ দিকে আলম এল হালফা অভিমুখে যে আক্রমণ চালাইলেন, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল এবং রোমেল জয়ের আশা নাই বুঝিতে পারিয়া তিন দিন পরেই রণে ভঙ্গ দিলেন। এই সময় তিনি খুব অসুস্থ হইয়াও

১। Rommel—Desmond Young—P. 188.

পড়িলেন এবং চিকিৎসার জন্য স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। রোমেলের অনুপস্থিতিতে জেনারেল স্টুম সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

এই অবসরে প্রায় সাত সপ্তাহ ধরিয়া জেনারেল মণ্টগোমারী তাঁর চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য নিখুঁত প্রস্তুতি চালাইলেন।

অবশেষে বিখ্যাত এল আলামিন রণক্ষেত্রের সেই ঐতিহাসিক দিন আসিল—২৩শে অক্টোবর, ১৯৪২-এর সেই চন্দ্রালোকিত রাত্রি। পূর্ণিমার রাত!

কিন্তু পূর্ণিমা রাত্রের প্রয়োজন হইল কেন? স্বয়ং মণ্টগোমারীই লিখিয়াছেন—

এই রণক্রিয়ার জন্য পূর্ণিমার রাত একেবারে অপরিহার্য ছিল। যেহেতু কোন উন্মুক্ত পার্শ্বদেশ ছিল না, সেহেতু মাইনের বেড়াজাল ছিন্ন করিতে এবং শত্রুপক্ষের ব্যূহের মধ্যে ছিদ্র সৃষ্টি করিতে রাত্রিবেলার দরকার হইয়াছিল। সেদিকে থেকে ২৩-২৪ অক্টোবরের রাত্রিই আমাদের অভিযান আরম্ভ করার পক্ষে সবচেয়ে কাজের তারিখ ছিল।[১]

এল আলামিনের যুদ্ধ

বৃটিশ আক্রমণের সময় অক্ষশক্তির দখলে
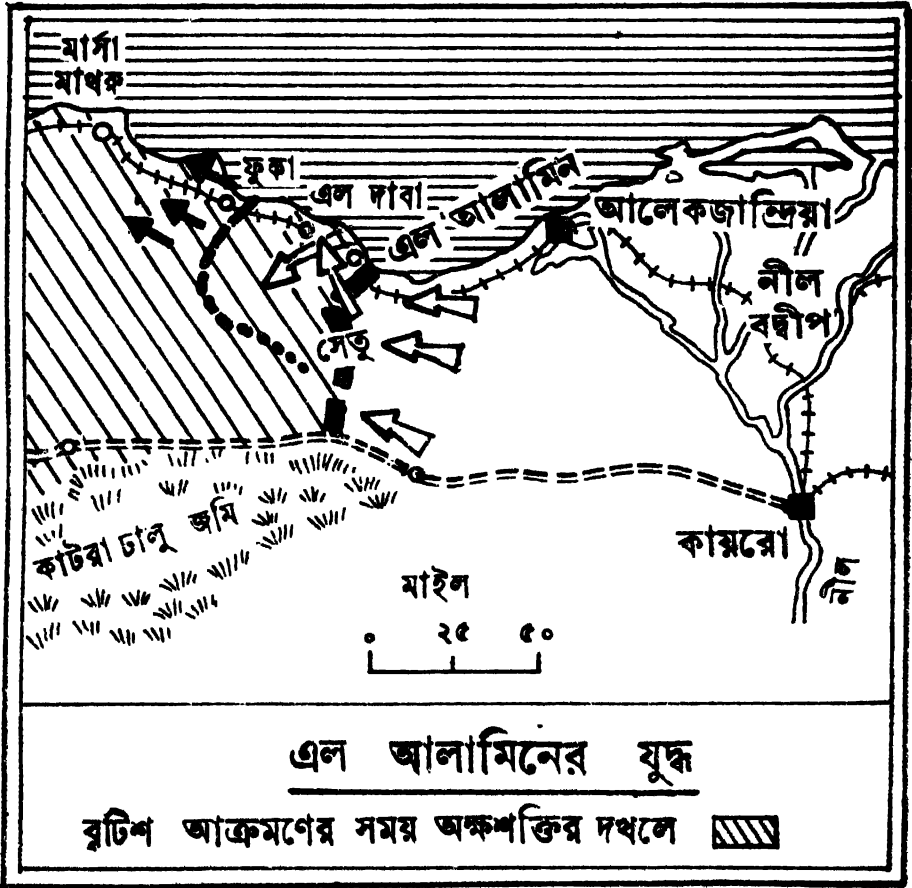
তখন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীর সৈন্যেরা মাত্র ৪০ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনের মুখোমুখি অপেক্ষা করিতেছিল। মণ্টগোমারীর দক্ষিণ পার্শ্ব আর রোমেলের বাম পার্শ্ব ছিল উত্তর দিকে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে।

১। Decisive Battle of the Second World War—P. 167.

অর্থাৎ রোমেলের গোটা যান্ত্রিক বাহিনী উত্তরে ও দক্ষিণ দিকে বিভক্ত ছিল এবং জার্মান পদাতিক বাহিনীর অধিকাংশই ছিল উত্তরে, মধ্যভাগে কিছু কিছু ইতালীয় সৈন্য এবং বাকী ইতালীয় বাহিনীর সমস্তই দক্ষিণ দিকে—মোট প্রায় ১২ ডিভিসনের মত। আর মণ্টগোমারীর সৈন্যেরা রণক্ষেত্রের আগাগোড়া প্রায় সমানভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল। সর্বোৎকৃষ্ট ট্যাংকের শক্তিতে তারা সুসজ্জিত ছিল। আর গোলন্দাজী শক্তিতে (বোমারু বিমানসহ) অতুলনীয়।

২৩-২৪ অক্টোবর পূর্ণিমা রাত্রির অপূর্ব জ্যোৎস্নায় যখন সমগ্র মরুভূমি উদ্ভাসিত ও মায়াচ্ছন্নের মত প্রতিভাত হইতেছিল তখন রাত্রি ৯-৪০ মিনিটে হঠাৎ মিত্রপক্ষের সহস্র কামান একযোগে গর্জন করিয়া উঠিল। উত্তর দিকে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ৬ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে বৃটিশ কামানগুলি মাত্র ২৩ গজ দূরে দূরে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ভয়াবহ বজ্রনিনাদে কামানগুলি সাংঘাতিক অগ্নি উদ্গীরণ এবং শত্রুপক্ষের লাইন বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। ২০ মিনিট ধরিয়া গোলাগুলির এই তাণ্ডব চলিবার পর অষ্টম বাহিনীর বৃটিশ, অস্ট্রেলিয়ান হাইল্যাণ্ডার, ভারতীয়, নিউজিল্যাণ্ডীয়, দক্ষিণ আফ্রিকান, এমন কি 'স্বাধীন' ফরাসী সৈন্যেরা (অষ্টম বাহিনীর গড়ন ছিল পাঁচ-মেশালি) আক্রমণ শুরু করিল।

'The whole front was in movement; and the enemy was for a time at a loss to know which and where was the main thrust.'

—সমগ্র রণক্ষেত্র গতিশীল হইয়া উঠিল এবং শত্রুপক্ষ কিছুক্ষণ ধরিয়া বুঝিয়া উঠিতেই পারিল না যে, কোন্‌টা এবং কোন্‌ দিকে আসল আক্রমণ ঘটিতেছে।[১]

'জার্মান সৈন্যদের অবস্থানের উপর বড় বড় হাজার কামানের অগ্নিগোলক নিক্ষেপ্ত হইতে লাগিল এবং রাত্রির আকাশ বারবার বিদ্যুৎ চমকের মত ঝলসিয়া উঠিতে লাগিল। বজ্রনির্ঘোষের মত কর্ণপটাহ বিদীর্ণকারী শব্দ আসিতে লাগিল। শত্রুর উপর কামানের গোলাবর্ষণের এই শব্দ মনে হইল দশ হাজার রণডঙ্কার গুম্‌ গুম্‌ ধ্বনির সঙ্গে যেন কোন ভয়ংকর শিলাবৃষ্টির ঝড় যেন কোন শহরের অজস্র টিনের চালার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এর ফল হইল বিপর্যয়কর।'

তারপর—

'Four hour later the barrage was lifted. For a few minutes there was a strange silence, in almost shocking contrast to the thunderous chorus of the barrage. Then suddenly, unearthly cries at first feeble but soon gathering volume, rose out of the desert. It was the weired shout of the charging foot soldier, that inhuman cry heard on a thousand battiefields.[২]

প্রত্যক্ষদর্শীদের এই জ্বলন্ত বর্ণনা থেকে উপরের যে উদ্ধৃতি দেওয়া হইল, তা থেকেই বুঝা যাইবে বৃটিশ পক্ষ এল আলামিনের রণাঙ্গনে ইতালীয়-জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে কী ভয়ংকর পরিমাণ গোলাগুলির শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়াছিল। চার্চিলও স্বীকার করিয়াছেন যে, এত গোলন্দাজী শক্তি মরুভূমির যুদ্ধে আর কখনও প্রযুক্ত হয় নাই।…

১। The Second Great War—Sir John Hammerton—Vol. vi, P. 2530.

২। Snyder—The War, P. 351.

আলামিনের জার্মান শিবির থেকে ২০০০ মাইল দূরবর্তী হিটলারের সদর যুদ্ধ-দপ্তরে (পূর্ব প্রুশিয়ায়) জরুরী রেডিও-বার্তা গেল আসন্ন বিপর্যয়ের আশংকায়। পীড়িত রোমেল তখন অস্ট্রিয়ার এক পার্বত্য নিবাসের হাসপাতালে। হিটলার সেখানে তাঁকে ফোন করিলেন ২৪শে অক্টোবর—'আফ্রিকা থেকে দুঃসংবাদ আসছে! সেখানে অবস্থা খুব খারাপ। তুমি কি সেখানে যেতে পারবে ?'

মাত্র ৩ সপ্তাহ হইল রোমেলের চিকিৎসা চলিতেছিল। শরীর তখন অত্যন্ত রুগ্ন কিন্তু সেই অবস্থাতেই রোমেল পরদিন ২৫শে অক্টোবর বিমানযোগে ছুটিয়া গেলেন তাঁর প্রিয় আফ্রিকা কোরকে উদ্ধারের জন্য। কিন্তু রোমেল পেঁছিবার আগেই আলামিনের যুদ্ধ খতম হইয়া গিয়াছিল। 'আমাদের কোন পেট্রোল ছিল না। আর রোমেলেরও কিছু করিবার ছিল না—একথা বলিয়াছেন জার্মান জেনারেল ক্রেমার ও জেনারেল বেয়ারলেইন।[১]

প্রথম পর্যায়ে ৯ দিন ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩ দিন এই মোট ১২ দিনের অবিশ্রান্ত যুদ্ধে এল আলামিনে অক্ষশক্তির রণাঙ্গন বিদীর্ণ, বিধ্বস্ত এবং যান্ত্রিক ও পদাতিক বাহিনী পযুর্দস্ত হইয়া গেল। উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে ধাপ্পা দেওয়ার যে নিখুঁত রণকৌশল মণ্টগোমারী অনুসরণ করিয়াছিলেন, তা পরিপূর্ণ সাফল্যলাভ করিল। এখানকার 'টেল এল আকোয়ারিক' (যার অর্থ 'শয়তানের পাহাড়'—নামটি সার্থক।) নামক স্থানে যে ভয়ংকর ট্যাংকযুদ্ধ হইল, তাও ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অক্ষশক্তির মোট ৫০০ খানারও বেশী ট্যাংক ধ্বংস হইয়া গেল - এর মধ্যে ২৮০ খানা ছিল উৎকৃষ্ট জার্মান ট্যাংক এবং প্রায় ৩১০ খানা অতি নিকৃষ্ট ও অকেজো ইতালীয়ান ট্যাংক।

কিন্তু মণ্টগোমারীর মার্কিন ট্যাংকগুলি গোলাগুলি শক্তিতে অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ ছিল এবং এই যুদ্ধে বৃটিশ পক্ষ কার্যতঃ সৈন্য, অস্ত্র ও সমরসম্ভারের সেই সনাতন রণকৌশলের গুণে জয়ী হইল—এই মন্তব্য করিয়াছেন ইংরেজ পক্ষেরই সেনানী ডেসমণ্ড ইয়ং।

এই যুদ্ধের গোড়াতেই জার্মান পক্ষের জেনারেল ফন স্টুম অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া রণক্ষেত্রেই মারা গেলেন এবং পরে জেনারেল রিটার ফন থোমা ও ৯ জন ইতালীয় সেনাপতি বন্দী হইলেন।

মেজর-জেনারেল জে. এফ. সি. ফুলার (বৃটিশ) লিখিয়াছেন যে, আলামিনের যুদ্ধের মত মিত্রপক্ষের এত বড় স্থলযুদ্ধের জয় ইতিপূর্বে আর হয় নাই এবং বৃটিশ ইতিহাসেরও এটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত জয়। রোমেলের ক্ষতির পরিমাণ হইয়াছিল ভয়াবহ—হতাহত ও ধৃত নিয়া ৫৯ হাজার সৈন্য। এর মধ্যে ৩৪ হাজার জার্মান। আর ট্যাংক নষ্ট হইল ৫০০ কামান ৪০০ এবং হাজার হাজার যানবাহন। বৃটিশ পক্ষের ক্ষতির পরিমাণ ছিল হতাহত ও নিখোঁজ নিয়া ১৩৫০০ সৈন্য এবং ট্যাংক অকেজো হইয়াছিল ৪৩২ খানা। কিন্তু এই সমস্ত প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও রোমেল যেভাবে ৫০০ মাইল দূরবর্তী বেঙ্গাজী পর্যন্ত এক দৌড়ে পশ্চাদপসরণ করিয়াছিলেন, তার কোন তুলনা নাই—

'Rommel was conducting a masterly retreat...'[২]

১। রোমেল—ডেসমণ্ড ইয়ং—পৃঃ ১৮৬।
২। জে. এফ. সি. ফুলার—পৃষ্ঠা ২৩৮।

পরাজিত, অসুস্থ ও ভগ্নহৃদয় রোমেল ৫রা নভেম্বর আলামিনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যখন পশ্চাদপসরণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁর হতে মাত্র ৮০টি ট্যাংক অবশিষ্ট, আর মণ্টগোমারীর ৬০০। কিন্তু হিটলার এই সময় এক কড়া নির্দেশ জারী করিয়া হুকুম দিয়াছিলেন যে, মিশর দখলের এই সংগ্রাম পরিত্যাগ করা চলিবে না। কিন্তু এই হুকুম শেষ পর্যন্ত মানা সম্ভব হইল না। কারণ, আর যুদ্ধ চালানোর অর্থ ছিল আত্মহত্যা।

২৫ হাজার ইতালীয় ও ১০ হাজার জার্মান সৈন্য এবং মাত্র ৬০টি ট্যাংক নিয়া রোমেল যেভাবে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী সড়ক ধরিয়া এবং সমবেত বৃটিশ অষ্টম বাহিনীর বোমারু বিমান ও নৌ-কামানের নিক্ষিপ্ত গোলাগুলি এড়াইয়া ফিরিয়া গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৫০০ মাইল দীর্ঘ 'পলায়ন পর্ব'' শেষ করিয়া টিউনিসিয়ায় পৌঁছিলেন সেই কাহিনীও অদ্ভুত এবং রোমাঞ্চকর। আরও আশ্চর্য এই যে, আলমিনের এত বড় 'ঐতিহাসিক যুদ্ধে' জয়লাভ করিয়াও মণ্টগোমারীর সৈন্যরা রোমেলকে কোথাও আটকাইতে বা ধরিতে পারিল না।

মিত্রপক্ষের সামরিক ঐতিহাসিকগণ এবং স্বয়ং চার্চিল রোমেলের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

'Throughout the African campaign Rommel proved himself a master in handling mobile formations, especially in regrouping rapidly after an opertion and following up success. He was a splendid military gambler, dominating the problems of supply and scornful of opposition···(He was) a great general. He also deserves our respect because, although a loyal soldier, he came to hate Hitler and all his works···'[১]

চার্চিলের মত বিশ্ববিখ্যাত রণনায়কের মুখে শত্রুপক্ষের সেনাপতির এই প্রশংসা নিশ্চয়ই গভীর তাৎপর্যব্যঞ্জক। এত বড় শত্রুকে পরাজিত করিয়া চার্চিল স্বভাবতই খুব উল্লসিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ পূর্বদিকে জার্মানীর বিরুদ্ধে একক সোভিয়েট রাশিয়ার দুর্জয় প্রতিরোধের মুখে যখন ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের বিরুদ্ধে চারদিকে সমালোচনা ধ্বনিত হইতেছিল, তখন আলামিনের যুদ্ধ জয় মিত্রপক্ষের যেন মুখরক্ষা করিল। চার্চিল বৃটেনের সর্বত্র গির্জায় গির্জায়ঘণ্টাধ্বনি করিয়া আফ্রিকার যুদ্ধে চূড়ান্ত জয় ঘোষণা করিলেন এবং বৃটিশ সামরিক ইতিহাসের একটা 'গৌরবপূর্ণ অধ্যায়' বলিয়া এই যুদ্ধকে বর্ণনা করিলেন এবং মন্তব্য করিলেন—

'Before Alamein we never had a victory. After Alamein we never had a defeat.'

'আলামিনের আগে আমাদের কখনও যুদ্ধ জয় ঘটে নাই এবং আলামিনের পরে আমাদের আর পরাজয়ও ঘটে নাই।'[২]

৮ই নভেম্বর 'টর্চ' রণপরিকল্পনা অনুযায়ী ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ সসৈন্যে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার আলজেরিয়া ও মরক্কোতে অবতরণ করিলেন। ফলে, রোমেল সম্মুখে ও

১। লুই এল. স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৩৪৮।
২। চার্চিল—চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪১।

পশ্চাতে দুই দিকের শত্রু পক্ষের মধ্যে পড়িলেন। এভাবে বেকায়দায় পড়িয়া অবর্ণনীয় দুঃসহ অবস্থার মধ্যে উত্তর আফ্রিকায় অক্ষ শক্তির যুদ্ধ চূড়ান্তরূপে শেষ হইয়া গেল ৮ই মে তারিখ, ১৯৪৩ সালে। 'আফ্রিকা কোর' চার দিন পর আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল।

কিন্তু আলামিনের যুদ্ধজয় উপলক্ষে মিত্রপক্ষের মহল এবং বিশেষভাবে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল থেকে শুরু করিয়া সামরিক লেখক ও ঐতিহাসিকগণ এমন প্রচার করিয়াছেন যে—মনে হয় যেন স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ ও আলামিনের যুদ্ধ একই পর্যায়ের এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এটি ভাগ্য নিয়ামক বা চূড়ান্ত সংগ্রামের মতই যুগান্তকারী। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে প্রচার কার্যের অতিরঞ্জন এবং সোভিয়েট রাশিয়া ও লাল ফৌজের কীর্তিকে পরোক্ষে অবমূল্যায়ন করার কৌশলপূর্ণ চেষ্টা মাত্র। আলামিনের যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল সন্দেহ নাই এবং রোমেলের মত প্রতিভাবান সেনাপতি ও আফ্রিকা কোরের পরাজয়ের ফলে আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগর শত্রু-মুক্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চূড়ান্ত ভাগ্য নিয়ামকের অনুরূপ সংগ্রাম ছিল না, —কেননা এই যুদ্ধের দ্বারা দুর্ধর্ষ হিটলারী বাহিনী ও ফ্যাসিস্ট সামরিক শক্তির উপর কোন মারাত্মক প্রত্যক্ষ আঘাত হানা হয় নাই যদিও মণ্টগোমারী ও অষ্টম বাহিনীর কৃতিত্বকে নিশ্চয়ই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বৃটিশ পক্ষের প্রচার যে অতিরঞ্জিত ছিল, সেটা অন্যতম বিশিষ্ট মার্কিন সেনাপতি জেনারেল এ্যালবার্ট সি. ওয়েডমেয়ার পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, চার্চিল এই যুদ্ধজয় নিয়া বাড়াবাড়ি করিয়াছেন।

'Churchill greatly exaggerated the magnitude of the Allied victary in Africa. Montgomery had an overwhelming force—manpower, fire-power, and air support—a marked advantage over Rommel. Never-the less, the German Desert Fox was able to outsmart the British for a considerable length of time. His generalship was so outstanding that the British troops who fought him carried pictures of Rommel in their knapsacks.'[১]

আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যে ইংরাজ সৈন্যেরা রোমেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন. কেবল যে তাঁরা রোমেলের ফটো পকেটে বহন করিতেন, এমন নয়। স্বয়ং তাঁদের প্রধান সেনাপতি মণ্টগোমারী মহাযুদ্ধের শেষে ইংলণ্ডে তাঁর যে বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছেন, সেখানে তিনি উত্তর আফ্রিকা যুদ্ধের সেই ভ্যানটি রাখিয়া দিয়াছেন, যেটি তিনি সদর দপ্তররূপে যুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং ভ্যানের গায়ে তিনি রোমেলের একটি প্রকাণ্ড চিত্রও টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছেন।[২] শত্রু পক্ষের ফিল্ড-মার্শাল রোমেলের প্রতিভার প্রতি মিত্রপক্ষের ফিল্ড-মার্শাল লর্ড মণ্টগোমারীর এর চেয়ে বড় শ্রদ্ধা প্রদর্শন আর কি হইতে পারে?

১। V. Trukhanovsky—The British Foreign Policy During World War II, P. 297.

২। The Path To Leaderslip—F. M. Montgomery. New York, Putnam.

দ্বিতীয় অধ্যায়

জেনারেল দ্য গলের অভ্যুদয়

ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কের আবর্ত

'আমি কোনও-না-কোনভাবে সারা জীবনই ফ্রান্সের কথা চিন্তা করে এসেছি ;—ভাবাবেগের দ্বারাও বটে, যুক্তির দ্বারাও বটে। আমার ভাবলোকের কল্পনায় ফ্রান্স ছিল রূপকথার রাজকন্যার মত। অথবা প্রাচীরগাত্রে আঁকা ম্যাডোনার ছবির মত ; ইতিহাসের মহিমান্বিত ও অনন্যসাধারণ ভূমিকায় যিনি ছিলেন আগে থেকেই উৎসর্গীকৃত।…

আমার চিন্তায় একমাত্র মহনীয়তা ছাড়া ফ্রান্স যথার্থ ফ্রান্স হয়ে উঠতে পারে না।'

'…to my mind Franch cannot be France without greatness.'

জেনারেল দ্য গলের সমস্ত চিন্তা ভাবনার মূলে ছিল এই বীজমন্ত্র এবং এই মন্ত্রের বলেই তাঁর সমগ্র জীবন যেন এক বৃহৎ বনস্পতির উত্তুঙ্গ মহিমার মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশ্য তাঁর এই জাতীয় গরিমাবোধের বীজ উপ্ত হইয়াছিল তাঁর পারিবারিক জীবনে। তাঁর অবিস্মরণীয় আত্মকাহিনীতে দেখা যায় যে, তাঁর পিতামাতার কাছ থেকেই তিনি এই আশ্চর্য দেশপ্রেমের উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। দ্য গল অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে তাঁর বাবা-মায়ের এই গভীর দেশাত্মবোধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[১]

এই উত্তরাধিকার তাঁর সমগ্র জীবনে এক গভীর প্রেরণা যোগাইয়াছিল। কার্যত যুদ্ধ ও সংগ্রামের মধ্যেই তাঁর সারা জীবন কাটিয়াছে এবং তরুণ বয়স থেকেই তিনি সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের বিজয় গৌরবের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একেবারে আরম্ভে ফ্রান্সের দুর্গতি, দৈন্য ও পতনে তিনি যে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পাইয়াছিলেন, সেই বেদনাই তাঁকে ফ্রান্সের লুপ্ত মহিমা উদ্ধারে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ১৯৪০-১৯৪২ সালে এই বছরগুলিতে তাঁর সেই কীর্তিমণ্ডিত জীবনের বনিয়াদ তৈয়ার হইয়াছিল—যখন জেনারেল চার্লস দ্য গল দেখা দিলেন সমুদ্র পারবর্তী ফরাসী সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে ফ্রান্সের স্বাধীনতা রক্ষার অদম্য যোদ্ধারূপে। হিটলারী জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণের ঘোরতর কলঙ্ক থেকে ফরাসী জাতিকে পুনরুদ্ধারের জন্য এবং একই সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন চাতুর্য নীতির কবল থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম ফ্রান্সের রাষ্ট্রিক মর্যাদা ও অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য দ্য গলের সংগ্রাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে।

এই দিক দিয়া আমাদের স্বদেশের নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দ্য গলের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। সুভাষচন্দ্রের অপরিমেয় দেশপ্রেম, বৃটিশ সাম্রাজ্য শক্তির বিরুদ্ধে কঠিনতম

১। The Complete War Memoirs of Charles De Gaulle. Siman & Schuster, New York, 1967—P. 3.

আঘাত হানার বজ্রকঠোর সংকল্প, সংগঠন গড়িয়া তোলার আশ্চর্য নৈপুণ্য, নিজের শক্তির উপর অবিচলিত বিশ্বাস এবং বন্ধনমুক্তির ব্যাকুলতা, বিরোধী ও সমালোচকদের সম্পর্কে অস্থিরতা, জাতীয় কংগ্রেসের প্রবীণ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং ছদ্মবেশে ভারত ত্যাগপূর্বক জার্মানীতে গমন এবং শেষ পর্যন্ত জাপান থেকে সিঙ্গাপুর হইয়া ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বারা ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতরণ—এই সমস্ত অদ্ভুত নাটকীয় ঘটনাবলীর সঙ্গেই জেনারেল দ্য গলের কাহিনীর প্রচুর মিল আছে। বলা যাইতে পারে ফরাসী দেশপ্রেমের 'বাণীমূর্তি" দ্য গল, আর ভারতের দেশাত্মবোধের জীবন্ত মূর্তি সুভাষচন্দ্র—এই দুই নায়কই পৃথিবীর দুই প্রান্তে পরাধীন দেশের ইতিহাসের নব দিগন্ত খুলিয়া দিয়াছিলেন।

বিরুদ্ধ অবস্থা ও অস্বস্তিকর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দ্য গলও সুভাষচন্দ্রের মতই গোপনে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বিদেশ চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—তবে, সুভাষচন্দ্রের মত দুর্গম ও সুদীর্ঘ পথের দুঃসাহসী ছদ্মবেশী যাত্রীরূপে নয়। ২২শে জুন, ১৯৪০, ফ্রান্স আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করিয়াছিল, সেই কলঙ্কিত তারিখের পাঁচ দিন আগে ১৭ই জুন দ্য গল একখানি বৃটিশ বিমানে ফ্রান্স ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্ত্রীও সন্তানগণসহ ব্রেস্ট বন্দর থেকে শেষ জাহাজে করিয়া বৃটেনে স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। সরকারী মর্যাদা হিসাবে দ্য গল তখন সেনাবাহিনী থেকে সবে মাত্র প্রতিরক্ষা দপ্তরের সহকারী মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে তিনি আশ্রয় নিলেন প্রায় রিক্ত এবং অপরিচিত 'বাস্তুহারা'র মত। তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি তখন সমুদ্রতীরে পরিত্যক্ত বালকের মত, যাকে একাই নিজের শক্তিতে সমুদ্র সাঁতরাইয়া পার হইতে হইবে! অবশ্য দ্য গল বালক ছিলেন না, তাঁর বয়স তখন ৪৯, কিন্তু স্বদেশ-বিদেশে তখন তিনি সত্যই পরিত্যক্ত—ফ্রান্সে তখন প্রায় সমস্ত সরকারী নেতাই হিটলারী জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পণের জন্য উদগ্রীব। যুদ্ধ চালনা বা প্রতিরোধ করার পক্ষে কেউ ছিল না। অথচ দ্য গল সংগ্রামশীল, হিটলারের নিকট পরজয় স্বীকার করিতে রাজী নন—প্রতিরোধ চালাইয়া যাইতে উৎসুক। কিন্তু সম্বল কোথায়? সম্পদ কোথায়? সামরিক বাহিন ও সংগঠন কোথায়? তখন তাঁর অবস্থা 'ঝড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের' অসহায় নিঃসঙ্গ নাবিকের মত—যে নাবিক 'ঝড়ের দাপটে ইংলণ্ডের তীরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন।' তথাপি এই অবস্থায়ও তিনি 'জাতীয় মুক্তির ব্রতে আপোষ মীমাংসা বা কম্প্রোমাইজ' করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।[১]

এখানে স্মরণীয় যে, সুভাষচন্দ্রও 'আপোষহীন বিরামহীন সংগ্রামে' বিশ্বাসী ছিলেন এবং জাতীয় কংগ্রেসের প্রবীণ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধিয়াছিল ওই আপোষরফার প্রশ্নে।

কিন্তু দ্য গল ইংলণ্ডে একটা বড় আশ্রয় ও বড় সহায় পাইয়াছিলেন স্বয়ং উইনস্টোন চার্চিলকে। প্রথম সাক্ষাতেই চার্চিল দ্য গলের সংকল্প ও সাহসিকতার জন্য তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং বলাই বাহুল্য যে, চার্চিলের অসাধারণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিভা ও যুদ্ধ চালাইবার দৃঢ়তার জন্য দ্য গলও তাঁর

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৮০-৮৩।

গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং সেকথা—তিনি অকপটের স্বীকারও করিয়াছেন তাঁর আত্মজীবনীতে।

চার্চিল অবিলম্বেই দ্য গলকে সহায়তা দিলেন এবং ১৮ই জুন সন্ধ্যা ৬টায় দ্য গল চার্চিলের সম্মতিক্রমে বি. বি. সি. থেকে তাঁর সেই বিখ্যাত বেতার ভাষণ প্রচার করিলেন ফরাসী জাতির উদ্দেশ্যে, যে বেতার বক্তৃতায় তিনি ফরাসী নরনারীকে প্রতিরোধের জন্য এবং হতাশ না হইবার জন্য দীপ্তকণ্ঠে আহ্বান জানাইলেন। তিনি বলিলেন :

'এই যুদ্ধের শেষ কথা কি বলা হইয়াছে ? আমরা কি অবশ্যই সমস্ত আশা ত্যাগ করিব ? আমাদের এই পরাজয় কি চূড়ান্ত এবং প্রতিকারহীন ? এই সমস্ত প্রশ্নের জবাবে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিব—না।'…

'Whatever happens, the flame of French resistance must not and shall not die.'

যাহাই ঘটুক না কেন, ফরাসী প্রতিরোধের শিখা কোন মতেই নির্বাপিত হইবে না, নিশ্চিতরূপেই হইবে না।[১]

দ্য গল এভাবে ফ্রান্সের পক্ষ থেকে দুর্জয় প্রতিরোধের আহ্বান জানাইলেন বটে, কিন্তু হিটলারের নিকট পরাজয় স্বীকারকারী ফরাসী সরকারী মহল চটিলেন। লণ্ডনের তথাকথিত ফরাসী দূতাবাস থেকে দ্য গলকে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান জানান হইল। কিন্তু দ্য গল সাড়া না দেওয়াতে প্রথমে তাঁর প্রতি কারাদণ্ডের হুকুম হইল, পরে তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রচারিত হইল—৩০শে জুন, ১৯৪১।

উত্তর আফ্রিকায় ও ফরাসী ইন্দোচীনে তখনও বিশাল ফরাসী সাম্রাজ্য অটুট ছিল। তিনি এই সাম্রাজ্যের সামরিক নেতাদের কাছে আবেদন জানাইলেন শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ না করার জন্য এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য।

ওদিকে দ্য গলও নিজের অন্তরে তাগিদ অনুভব করিলেন ফ্রান্সের এই গভীরতম দুর্দিনে স্বাধীনতার সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য—যেন ফ্রান্সের ঐতিহাসিক দায়িত্ব তাঁর একার ঘাড়েই আসিয়া পড়িয়াছে। 'কিন্তু তরবারিহীন ফ্রান্সের অর্থ কি ?'

'But there is no France without a sword'.

সুতরাং এই তরবারি যোগাড় করিতে হইবে—'ফ্রি ফ্রান্স' 'ফাইটিং ফ্রান্স' গড়িয়া তুলিতে হইবে। দ্য গল বৃটেনে অবস্থিত ফরাসীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাইলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যেমন সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণকারী ভারতীয় বন্দী সৈন্যদের সাহায্য পাইয়াছিলেন এবং সেই সৈন্যবাহিনী থেকেই যেমন আজাদ হিন্দ বাহিনীর উদ্ভব হইয়াছিল, তেমনি নরওয়ে-বেলজিয়ান-ফরাসী রণক্ষেত্রের যে সমস্ত হাজার হাজার সৈন্য সেই সময় ইংলণ্ডে আশ্রয় পাইয়াছিলেন (বহু আহত সৈন্য বৃটিশ হাসপাতালে ছিলেন) তাঁদের মধ্য থেকে কিছু কিছু সৈন্য—যদিও গোড়ায় খুব সামান্য সংখ্যক—দ্য গলের আবেদনে সাড়া দিলেন। এভাবেই 'স্বাধীন ফ্রান্সের' প্রথম লড়িয়ে সৈন্য বা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হইল।[২]

১৯৪১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর দ্য গল ন্যাশনাল কমিটি গঠন করিলেন এবং এই

১। ঐ—পৃষ্ঠা ৮৪।

২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ৮৮।

সময় 'ফাইটিং ফ্রান্সে'র কাজও খুব অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। ১৯৪১-এর গ্রীষ্মকাল থেকে পরবর্তী বছরের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত দ্য গল ও তাঁর সংগঠন মিত্রশক্তিবর্গের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য যে কর্মতৎপরতা চালাইয়া যাইতেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা সার্থক হইয়াছিল, অবশ্য অনেক কাঠখড় পোড়াইবার পর। একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া সরলভাবে এবং অতিদ্রুত দ্য গলকে 'স্বাধীন ফ্রান্সে'র প্রতিনিধিরূপে স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন। এই সময় এক নাগাড়ে ৮ মাস তিনি কাটাইয়াছিলেন আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে ফ্রান্সের স্বাধীনতার শিখাটিকে প্রজ্বলিত রাখার জন্য। এজন্য দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম তাঁকে করিতে হইয়াছিল এবং সেই সময় হতাশায়, অবসন্ন ও দলাদলিতে বিধ্বস্ত ফ্রান্সের তথাকথিত সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্য থেকে এত বিরোধিতা তাঁকে সহ্য করিতে হইয়াছিল যে, সেই কাহিনী যেমন দীর্ঘ, তেমনি ক্লান্তিকর। অথচ এই প্রচণ্ড বিরুদ্ধ অবস্থার বিরুদ্ধে লড়িয়াই দ্য গলকে দিনের-পর-দিন এবং মাসের-পর-মাস আগাইয়া যাইতে হইয়াছিল এবং তাঁর প্রার্থিত 'ফ্রান্সের গ্রেটনেস' বা মহনীয়তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এক কঠিন ব্রত উদ্যাপন করিতে হইয়াছিল। কারণ, এই বিরুদ্ধতা কেবল দলাদলিতে বিদীর্ণ ফরাসী সমাজের (স্বদেশের ও সাম্রাজ্যের) ভিতর থেকেই আসে নাই, মিত্রপক্ষরূপে পরিচিত বৃটেন ও আমেরিকার সরকারী মহল থেকেও আসিয়াছিল। দ্য গলের ব্রত বা মিশন বিশেষভাবে বিঘ্ন-সঙ্কুল হওয়ার কারণও ছিল ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব।

চার্চিল ও রুজভেল্টের সঙ্গে দ্য গলের মতবিরোধ মহাযুদ্ধের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে পরিণত হইয়াছে এবং যদিও ইঙ্গ-মার্কিন ঐতিহাসিকগণ সেই সময় এই বিরোধের জন্য সমস্ত দোষ দ্য গলের 'অহমিকা'র ও 'বদ মেজাজের' ওপর চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বলা যাইতে পারে যে, আসলে সমুদ্র পারবর্তী ফরাসী সাম্রাজ্য নিয়া বৃটেন ও আমেরিকার ফরাসী জাতীয় স্বার্থবিরোধী মনোভাবই এর মূলে ছিল। অথচ গোড়ার দিকে ১৯৪০-৪১ সালে স্বয়ং চার্চিল দ্য গলের গভীর অনুরাগী ও সমর্থক ছিলেন।

১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকালে পশ্চিম রণাঙ্গনের যখন চরম অবস্থা, যখন ফ্রান্সের নায়কেরা হিটলারী ফ্যাসিজমের নিকট পরাজয় স্বীকারে উৎসুক, তখন যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন আত্মসমর্পণের বিরোধী ছিলেন, পল রেনোঁ এবং দ্য গল ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৯৫০, ১১ই জুন চার্চিল যখন চতুর্থবার যুদ্ধরত ফ্রান্সের অবস্থা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ফরাসী নেতাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য গিয়াছিলেন, তখন পল রেনোঁ ও দ্য গল পরাজয় স্বীকার না করিবার এবং প্রয়োজন হইলে শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালাইবার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ ইউনিয়ন গঠনের যে প্রস্তাব চার্চিল দিয়াছিলেন, দ্য গল তা সোৎসাহে সমর্থন করেন এবং চার্চিলের মতই সমুদ্র পারবর্তী সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালাইবার দৃঢ়তার উপর জোর দিয়াছিলেন।

১৬ই জুন লণ্ডনে দ্য গল চার্চিলের সঙ্গে ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটের ক্যাবিনেট রুমে গিয়া দেখা করেন। তখন চার্চিল এই 'অতি দীর্ঘকায় শান্ত চেহারা'র লোকটির কথাবার্তা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং যে সপ্রশংস মন্তব্য করেন, তা

।াগ্য।

—'Here is the Constable of France'.

—'ইনি হচ্ছেন ফ্রান্সের দুর্গরক্ষী'।

সত্যি সত্যি পরবর্তী কালের ইতিহাসে জেনারেল দ্য গল নিজেকে ফ্রান্সের স্বাধীনতার 'দুর্গরক্ষীরূপে' প্রমাণিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই 'দুর্গরক্ষী'কে পরদিন ফ্রান্স থেকে পলাইয়া আসিতে হইল আত্মরক্ষার জন্য—(লণ্ডন-প্যারিস বিমানে দু'ঘণ্টা পথ), তাঁর নিরাপত্তাও বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। চার্চিলের পরিকল্পনা অনুসারে যে বৃটিশ বিমানে করিয়া তিনি বর্দো থেকে পাহারারত পুলিশকে বোকা বানাইয়া ইংলণ্ডে চলিয়া আসিলেন, চার্চিল সেই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'ওই ছোট্ট প্লেনটিতে দ্য গল যেন সমগ্র ফ্রান্সের মর্যাদা বহন করিয়া আনিলেন।'[১]

আফ্রিকার ফরাসী সাম্রাজ্য থেকে দ্য গল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার সংকল্প ঘোষণা করিলেন। চার্চিলের মতে তখন ওখানকার ফরাসীরা হিটলারের নিকট পরাজয় স্বীকারে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। সুতরাং তাঁদের নিকট দ্য গল 'ঘোরতর অন্ধকারে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত প্রতিভাত হইয়াছিলেন।'

কিন্তু এই 'উজ্জ্বল নক্ষত্রে'র অত্যুগ্র আলো শীঘ্রই চার্চিলের পক্ষে অস্বস্তিকর হইয়া উঠিল। কারণ, ফরাসী নৌবহরগুলি এবং সেই সঙ্গে ফরাসী নৌ-ঘাঁটি ও বন্দরগুলি হাত করিবার জন্য—অন্তত হিটলারকে সেগুলি থেকে বঞ্চিত করিবার জন্য চার্চিল অস্থির হইয়া উঠিলেন। এজন্য ১৯৪০, সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে গুরুত্বপূর্ণ ডাকার বন্দর ও সেখানকার জাহাজগুলি দখল করার জন্য চার্চিলের নির্দেশে যে বৃটিশ অভিযান অনুষ্ঠিত হইল, দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইল। এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসাবে বৃটিশ পক্ষ সন্দেহ করিলেন যে, লণ্ডনের ও লিভারপুলের ফরাসী বাসিন্দাদের মধ্য থেকে কেহ নিশ্চয়ই ডাকারের ফরাসী কর্তৃপক্ষকে আগেই 'গোপনীয় সংবাদ' জানাইয়া দিয়াছিল এবং যেহেতু এই ফরাসী কর্তৃপক্ষ ছিলেন ভিসি সরকারের অনুগত, সেহেতু তাঁরা বৃটিশ নৌ-অভিযাত্রীদিগকে প্রচণ্ড বাধা দিয়া ঘায়েল করিয়াছিলেন।

এদিকে জেনারেল দ্য গল ডাকারে বৃটিশ অভিযানের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করিলেন এবং এমন অভিমত ব্যক্ত করিলেন যে, এই 'সরাসরি অভিযানের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব' তাঁর নিজের হাতে থাকা উচিত ছিল এবং দরকার হইলে তিনি ও তাঁর সশস্ত্র স্বেচ্ছাসৈনিকেরা তাঁর 'নিজ দেশবাসীর বিরুদ্ধে' যুদ্ধ চালাইতেন। কিন্তু ডাকারে দ্য গলের নেতৃত্বকে অস্বীকার করা হইল।

দ্য গলের সঙ্গে চার্চিল ও বৃটেনের প্রথম বিরোধের সূত্রপাত এখন থেকে।...

পরবর্তীকালে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ইঙ্গ-মার্কিন অভিযানের সময় দ্য গলের প্রতি বৃটেন ও আমেরিকা উভয়ের বিরূপতা খুব উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এর মূলে এক দিকে যেমন ছিল ফরাসী নেতাদের নিজেদের মধ্যে দলাদলি ও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের প্রভাব, তেমনি অন্য দিকে আবার যুদ্ধরত বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও স্ববিরোধিতা ছিল এবং ইতিহাসের দিক থেকে সেটাও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

১। দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার—চার্চিল। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৯, ১৯২।

দ্য গল স্বয়ং তাঁর আত্মজীবনীতে এই স্ববিরোধীতার কথা অত্যন্ত নিপুণভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্য গল লিখিয়াছেন যে, ১৯৪২ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারীবর্গ এবং বিশিষ্ট নেতারা অনুভব করিতেছিলেন যে, হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে যে কোয়ালিশন বা মহাজোট গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁরা হইতেছেন তার আসল নিয়ামক। এদিকে বৃটিশ ও মার্কিন উভয়ের সামরিক প্ল্যানই যেন 'রহস্যাবৃত' ছিল। দ্য গল এই রহস্যের সন্ধান করিলেন।·· ইংলন্ডে যে অগ্রবর্তী মার্কিন সৈন্যদল আসিয়া ঘাঁটি স্থাপন করিল, তারা লণ্ডনের সমস্ত রাস্তাঘাট ও পানশালাগুলি পর্যন্ত ছাইয়া ফেলিল। জেনারেল আইজেনহাওয়ার, জেনারেল ক্লার্ক, এডমিরাল টস্টার্ক ও জেনারেল স্পাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় রণাঙ্গনের স্থল, নৌ, ও বিমান-বাহিনীর কর্তারা বৃটেনের পুরাতন সামরিক দপ্তরগুলির পাশে 'ঝকঝকে নূতন যন্ত্রপাতি' লইয়া যে সমস্ত শিবির স্থাপন করিলেন, তাতে বৃটিশ সামরিক নেতাদের মুখ শুকাইয়া গেল। কেননা, তাঁরা নিজেরা আর নিজেদের দেশের মালিক নন, এতকাল যে মুখ্য ভূমিকা তাঁদের ছিল, সেই গৌরব থেকে তাঁরা এখন বঞ্চিত।[১]

ইংলন্ডের জনচিত্তে, এমন কি সরকারী মহলেও এই মার্কিন মাতব্বরি যেন ক্রমশঃই অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু উপায় কি? আমেরিকার বিপুল সমরাস্ত্রের সাহায্যে এবং কর্জ ও ইজারার বন্ধন ইংলন্ডকে নত করিয়া রাখিয়াছিল। আর স্বয়ং চার্চিল চাতুর্যপূর্ণ নীতির জন্য হোক কিম্বা বিশ্বাসবশেই হোক এমন ভান করিতেছিলেন যে, তিনি যেন 'রুজভেল্টের লেফটেনান্ট' বা সহকারী ছাড়া আর কিছু নন! কিন্তু দ্য গলের নিকট তখনই বৃটেনের এই অবস্থা ইউরোপের ভবিষ্যতের পক্ষে দুর্লক্ষণ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল।

আমেরিকানরা সেই সময় তাঁদের রণনীতি লইয়া দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। স্বয়ং রুজভেল্ট এবং তাঁর পরামর্শদাতারা দুইটি বিকল্প পরিকল্পনা লইয়া মাথা ঘামাইতেছিলেন। তখন জার্মানীর সহিত জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে বিব্রত সোভিয়েত রাশিয়া দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জন্য তারস্বরে দাবী করিতেছিলেন। আমেরিকা তাঁদের বিপুল সমরাস্ত্র নিয়া যেমন এদিক দিয়া চিন্তা করিতেছিলেন এবং ইংলন্ড থেকে প্রণালী পার হইয়া ফ্রান্সে অবতরণের কথা ভাবিতেছিলেন, অন্য দিকে তেমনি তাঁরা উত্তর আফ্রিকা অভিযানের কথাও গভীরভাবে চিন্তা করিতেছিলেন। দ্য গল বলিতেছেন—

'This was the first time in history that the Americans found themselves constrained to take the lead in operations of a major scope. Even during World War I they had not appeared in force on the field of battle until the last engagements, and even then it was a contributory factor and so to speak, in the capacity of a subordinate. Since, 1939 however the United States had felt obliged to become a first rate military power.'[২]

অর্থাৎ 'ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম আমেরিকানরা একটা বড় রকমের যুদ্ধে নিজেদের

১। দ্য গলের যুদ্ধকালীন আত্মকাহিনী (ইং) পৃষ্ঠা ৩০৮।

২। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃঃ ৩০৯।

যোগদানের বাধ্যবাধকতা অনুভব করিলেন। এমন কি, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েও একেবারে শেষ পর্যায়ের সংগ্রামে ছাড়া তাঁরা সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। এমন কি তখনও তাঁদের যুদ্ধ ছিল আনুষঙ্গিক এবং তাঁদের অবস্থাটা ছিল অধঃস্তনের মত। কিন্তু ১৯৩৯ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁদেরকে একটি প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তিতে পরিণত হইতে হইবে।

আমেরিকার সামরিক অবস্থান সম্পর্কে এই মনোজ্ঞ বিশ্লেষণের পর দ্য গল বৃটেনের মনোভাব সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা ও টিপ্পনি দিয়াছেন, তা আরও উপভোগ্য এবং স্মরণযোগ্য। তিনি বলিতেছেন—

'...বিশেষত ইংরাজদের তাড়াহুড়া করার কোন গরজ ছিল না। কারণ, তাঁরা অনুভব করিলেন যে, তাঁদের নেতৃত্ব যখন গিয়াছে এবং মূলত যুদ্ধজয়ের গৌরব যখন তাঁদের প্রাপ্য হইবে না, তখন তাঁদের ক্ষয়ক্ষতি যাতে অত্যন্ত সামান্য হয়, সেদিকে তাঁদের খুব নজর ছিল। অতএব বড় রকমের যুদ্ধগুলিকে যদি এই সময় স্থগিত রাখিতে পারা যায়—তবে, ইতিমধ্যে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং বৃটিশ সৈন্যদেরও মিতব্যয়িতার সহিত পরিচালনা করা যাইবে। অধিকন্তু বৃটিশ নেতারা দেখিতে পাইলেন যে, মার্কিন অস্ত্রসজ্জা ক্রমশই পাহাড়ের মত স্তূপীকৃত হইতেছে। অতএব লণ্ডন হিসাব করিয়া দেখিল যে, ইতিপূর্বেই মিত্রপক্ষের সমর-সম্ভারগত যে শ্রেষ্ঠতা রহিয়াছে, ১৯৪৩ সালে সেই শ্রেষ্ঠতা আরও প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে এবং ১৯৪৪ সালে তা অপরিমিত হইবে। তা ছাড়া রাশিয়ার রণাঙ্গনে জার্মানী যখন প্রতিদিন ঘায়েল হইতেছে, তখন নূতন বিপদের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আর-একটি ডানকার্কের ঝুঁকি লইয়া লাভ কি?'[১]

'এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, ইংলণ্ডের রণনীতি তার চিরন্তন সাম্রাজ্য নীতির সঙ্গে জড়িত—যার গতিমুখ প্রধানত ভূমধ্যসাগরের দিকে। এই ভূমধ্যসাগর এলাকায় বৃটেনের যে সমস্ত দখলদারী ছিল, যেমন—মিশরে, আরব রাজ্যগুলিতে, সাইপ্রাসে, মালটায় ও জিব্রালটারে এবং যেগুলি তারা রক্ষা করিতেছিল, সেগুলি ছাড়াও তারা লিবিয়াতে, সিরিয়ায়, গ্রীসে এবং যুগোশ্লাভিয়ায় নূতন ঘাঁটি দখলে অত্যন্ত উৎসুক ছিল। সুতরাং বৃটিশ নেতারা ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণাত্মক রণনীতি ওই দিকেই পরিচালনা করিতে চাহিয়াছিলেন।'[২]

দ্য গলের এই বর্ণনার মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যনীতি ও রণনীতি এবং কূটনীতি ও স্বার্থপরতার নীতি পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর সে জন্যই চার্চিল প্রমুখ বৃটিশ নেতারা ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির দ্বারা জার্মানীকে প্রত্যক্ষ আঘাত হানিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু এই বিষয়ে দ্য গলের মনোভাব সোভিয়েতের অনুকূলে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির পক্ষেই ছিল। কেননা, ফ্রান্সে অবিলম্বেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি হইলে ফ্রান্সের জাতীয় সংহতি ও মুক্তিও ত্বরান্বিত হইবে, এমন বিশ্বাস ছিল দ্য গলের। সুতরাং তিনি লিখিয়াছেন—

'...কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি সরাসরি ইংলণ্ড থেকে ইউরোপে আক্রমণের পক্ষপাতী ছিলাম। কেননা অন্য কোন রণক্রিয়ার দ্বারাই সমগ্র যুদ্ধের অবস্থা চরমে

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৩০৯।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩১০।

উঠিতে পারিত না। কারণ, ফ্রান্সের পক্ষে সেই মীমাংসাই ছিল সর্বোত্তম যার দ্বারা আক্রমণের অগ্নিপরীক্ষা সংক্ষেপিত হইবে এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ত্বরান্বিত হইবে। অর্থাৎ খাস ফ্রান্সের মাতৃভূমিতে যুদ্ধ চালাইতে হইবে।

'দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে আমাদের এই মনোভাবের কথা ২৩শে জুলাই তারিখ জেনারেল জর্জ মার্শাল, জেনারেল কিং এবং জেনারেল আইজেনহাওয়ার প্রভৃতিকে জানাইয়া দিলাম।'[১]

'কিন্তু শীঘ্রই স্পষ্ট বুঝা গেল যে, ইঙ্গমার্কিন বাহিনী ১৯৪২ সালে ফ্রান্সে অবতরণের ঝুঁকি লইবেন না। সুতরাং তাঁরা উত্তর আফ্রিকার দিকেই ঝুঁকিলেন, অবশ্য আমাদের সহযোগিতা বাদ দিয়া। মরক্কো, আলজিরিয়া ও টিউনিসিয়ার সঙ্গে ফ্রী ফ্রান্সের কোন সম্পর্ক থাকুক, এটা আমেরিকানরা চাহিতেছিলেন না।'[২]

বৃটিশ-মার্কিন রণনীতি, দ্বিতীয় রণাঙ্গন, উত্তর আফ্রিকায় অভিযান এবং বৃটিশ কূটনীতি ও মনোভাব ইত্যাদি সম্পর্কে জেনারেল দ্য গলের উপরি-উদ্ধৃত এই তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ থেকেই সমগ্র অবস্থাটা স্পষ্ট বুঝা যাইবে এবং সেই সঙ্গে এই আভাষও পাওয়া যাইবে কেন পরবর্তীকালে দ্য গলের সঙ্গে চার্চিল-রুজভেল্টের এত বিরূপতার সৃষ্টি হইয়াছিল।

সোভিয়েট ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, জার্মানী, জাপান ও তাদের মিত্রদিগকে সংহার করার ব্যাপারে চার্চিল রণনীতির চেয়ে কূটনীতির উপর অনেক বেশী, এমন কি অতিরিক্ত জোর দিতেন এবং মনে করিতেন হাতে-কলমে যুদ্ধের চেয়েও কূটনৈতিক অস্ত্রের দ্বারাই অনেক বেশী ঘায়েল করা যাইবে। চার্চিল মনে মনে ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, বৃটিশ যদি কেবল মাত্র বিমান আক্রমণ ও ট্রাঙ্ক আক্রমণের দ্বারা সহায়তা করে, তবে, ফ্যাসিস্ট দখলীকৃত রাজ্যগুলিতে জনগণ বিদ্রোহ এবং আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করিবে—তারা নিজেরাই আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে। চার্চিলের আরও ধারণা ছিল যে, আমেরিকা যুদ্ধে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানী চূড়ান্ত যুদ্ধের দিকে না গিয়া সন্ধিপ্রার্থী হইবে। চার্চিল ও বৃটিশ রণনীতির এই ধারণা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল ভিসি সরকারের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের ব্যাপারে। চার্চিলের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সরকারীভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর 'ভিসি সরকারের মনের ও হৃদয়ের পরিবর্তন হইবে।'[৩]

এই পরিবর্তন এত দূর হইবে বলিয়া তার ধারণা ছিল যে, ফ্রান্সে অবস্থিত ফরাসী নৌ-বহরগুলি উত্তর আফ্রিকার দিকে যাত্রা করিবে এবং পেঁতা গভর্নমেণ্ট নিজেরাই বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যদিগকে ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় প্রবেশের জন্য আমন্ত্রণ জানাইবে। এই প্রসঙ্গে বৃটিশ ঐতিহাসিক এল. উডওয়ার্ড লিখিয়াছেন যে, চার্চিল গম্ভীরভাবেই চিন্তা করিয়াছিলেন যে, ভিসি গভর্নমেণ্ট ফ্রান্সকে মিত্রপক্ষের দলে টানিবেন, কেননা ভিসির নেতাদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা এর উপরেই নির্ভর করিতেছিল। এ জন্যই চার্চিল পেঁতা সরকারের সঙ্গে কিছুটা নরম ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করিতে

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩১২।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩১৪।
৩। British Foreign Policy During World War II—V. Trukhanovsky, P. 283-84.

চাহিয়াছিলেন, যদিও বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর এর বিরোধী ছিল। কিন্তু লাভাল ও পেঁতা সরকার জার্মানীর জয়ের উপরেই আস্থা রাখিয়াছিলেন। সুতরাং চার্চিলের পছন্দমত সম্পর্ক স্থাপনে ভিসি সরকার রাজী হইল না। ফলে, মূলত ভিসির সঙ্গে মার্কিন নীতি ও বৃটিশ নীতির তেমন কোন তফাত ছিল না—শুধু ডিগ্রির তফাত ছিল। অর্থাৎ বৃটিশরা বা মার্কিন পক্ষ কেহই ভিসির সঙ্গে পুরাপুরি বিচ্ছেদ চাহেন নাই। কেননা তাঁরা অনুভব করিয়াছিলেন যে, অক্ষ শক্তিবর্গ যতই যুদ্ধ করিতে থাকিবে, ভিসি গভর্নমেণ্টও ততই ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষকে তোয়াজ করিতে চাহিবে। অপর পক্ষে জেনারেল দ্য গল কিন্তু মিত্রপক্ষের ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশে ক্রমশ আরও জোরের সঙ্গে বাধা দিবেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সেই সাম্রাজ্য রক্ষা করিবেন।

এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই ১৯৪২ সালে জেনারেল দ্য গলের সঙ্গে বৃটিশ সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। এমন কথাও তাঁরা ভাবিয়াছিলেন যে, 'স্বাধীন ফ্রান্স' আন্দোলনের সুযোগে তাঁরা ফরাসী উপনিবেশগুলি হাতড়াইতে পারিবেন। কিন্তু জেনারেল দ্য গল সময় সময় সামরিক পরিস্থিতি পর্যন্ত উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত গোঁড়ামির সঙ্গে ফরাসী রাজ্যগুলিতে বৃটিশ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বাধা দিতে লাগিলেন।[১]

এখানে লক্ষ্য করার এই যে, যতদিন পর্যন্ত জেনারেল দ্য গলের নীতি ও পদ্ধতি বৃটেনের মূলগত রণনীতি ও পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, ততদিন বৃটেন 'ফ্রী ফ্রেঞ্চ মুভমেণ্ট' সমর্থন করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, বৃটিশ পক্ষ কেবল অক্ষশক্তিবর্গের পরাজয় চাহিতেছেন না, তাঁরা ফরাসী ঐতিহ্য ও সাম্রাজ্যও কাড়িয়া নিতে চান, তখনই দ্য গলের সঙ্গে তাঁদের সংঘাত বাধিল।

'It was this that lay at the back of the strained relations between the Churchill Government and the movement headed by de Gaulle, and not the Free French leader's obduracy as Churchill and British historians would have us believe.'[২]

দ্য গলের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা ইত্যাদির যে সমস্ত অভিযোগ ইঙ্গ-মার্কিন মহল থেকে প্রচারিত হইয়াছিল, তার মূলে ছিল ফরাসী উপনিবেশ নিয়া মিত্রপক্ষ ও দ্য গলের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর আসমান-জমিন ফারাকের জন্য।

ক্রমে বৃটিশ সরকার দ্য গলের প্রতি এতটা বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিলেন যে, 'স্বাধীন ফ্রান্স আন্দোলনের' অধিকর্তারূপে তাঁরা দ্য গলের বদলে অন্য কোন পছন্দসই ফরাসী নেতার খোঁজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দ্য গলের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব এত বেশী ছিল যে, তাঁর বদলে বৃটিশ ক্রীড়নকরূপে কোন ফরাসী নেতাকেই পাওয়া গেল না। তখন অগত্যা দ্য গলকে সহ্য করিতে হইল বটে, কিন্তু দ্য গল যাতে ফরাসী সাম্রাজ্যে ও ঔপনিবেশগুলিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে না পারেন, তার জন্য চার্চিল সরকারের চেষ্টার অবধি ছিল না। বৃটেনের নানা কৌশলে দ্য গলের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং দ্য গলের অধীন সৈন্যদলের শক্তি যাতে বৃদ্ধি না পায়, তেমন মতলব খাটাইতে লাগিলেন। এমন কি, এরই জেরস্বরূপ বৃটিশ ও মার্কিন উভয় সরকারই

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৮৪-৮৫।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ২৮৫।

১৯৪২ সালের বসন্তকালে দ্য গলের ফ্রেঞ্চ ন্যাশন্যাল কমিটিকে ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকার হিসাবে মানিয়া নিতে অস্বীকৃত হইলেন—যদিও ইউরোপের অন্যান্য অধিকৃত দেশের আশ্রয়প্রার্থী গভর্নমেন্টগুলি সম্পর্কে তাঁরা উদার নীতিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে দ্য গল ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে সম্পর্কের এমন অবনতি ঘটিল যে, উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হইবার জো হইল। তখন দ্য গলের পক্ষ থেকে মস্কোতে এমনও জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠানো হইল যে, যদি বৃটেন ও দ্য গলের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে, তবে, সোভিয়েট রাশিয়া তাঁকে এবং তাঁর সৈন্যদলকে রাশিয়াতে আশ্রয় দিতে রাজী আছেন কিনা ?[১]

এই চরম অবস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছিল মাদাগাস্কার উপলক্ষে। ১৯৪২-এর ৫ই মে থেকে ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত মাদাগাস্কার দ্বীপে যে বৃটিশ অভিযান অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, জেনারেল দ্য গলের সঙ্গে তা নিয়া চার্চিলের তীব্র বিরোধ দেখা দিয়াছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মাদাগাস্কার দ্বীপ যদিও ভারত মহাসাগরে অবস্থিত, তথাপি কার্যত এটি আফ্রিকার চৌহদ্দিরই অন্তর্গত—মাঝখানে অবশ্য মোজাম্বিক প্রণালী। এটি পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম দ্বীপ, আয়তন প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার বর্গমাইল।—রাজধানী তেনানারিভো। যদিও এই বিশাল দ্বীপ ফ্রান্সের শাসনাধীন ছিল, তবু আসলে ফ্রান্সের চেয়ে এর আয়তন অনেক বড় ছিল এবং ইংলণ্ড ও ওয়েলসের চেয়ে চার গুণ বড় ছিল। এর ভূ প্রকৃতি অত্যন্ত কঠোর ও কর্কশ। এত বড় দ্বীপের মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩৭ লক্ষ ৯৮ হাজার এবং এদের মধ্যে ফরাসীদের সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার। ফরাসী গভর্নমেন্ট কয়েদীদের নির্বাসনে দেওয়ার জন্য এই দ্বীপ ব্যবহার করিতেন বটে, (বৃটিশ ভারতীয় আমলের আন্দামান দ্বীপের মত) কিন্তু এর রণনৈতিক গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। কেননা, আফ্রিকা থেকে পারস্য উপসাগর, মিশর ভারত ও সিংহলের সামুদ্রিক যোগাযোগের পথে ছিল এর অবস্থান। এখানে পৃথিবীর অন্যতম সেরা পোতাশ্রয় এবং অন্যান্য জাহাজী আশ্রয় এবং প্রায় ১৫০টি বিমান ময়দান ছিল। তখন জাপানীরা পূর্ব দিক থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছিল। সুতরাং বৃটিশ সরকার প্রমাদ গণিলেন। চার্চিল বলিয়াছেন যে, যদি কোন দিন জাপানীরা আসিয়া হঠাৎ ভারত মহাসাগরে দ্বীপটি দখল করিয়া নেয়, এই দুশ্চিন্তায় তখন তিনি আতঙ্কবোধ করিলেন।[২]

সুতরাং চার্চিল তাঁর 'আতঙ্ক' দূর করার জন্য মাদাগাস্কার দ্বীপে নৌ ও বিমান অভিযান চালাইলেন এবং কয়েক মাস লাগাইয়া দিলেন এই দ্বীপ সম্পূর্ণ দখল করিতে —দ্বীপটি ছিল ভিসি সরকারের অধীন। কিন্তু বৃটিশ কর্তৃক এই দ্বীপের বিরুদ্ধে অভিযানের আগে দ্য গল প্রস্তাব করিয়াছিলেন ফ্রী ফ্রান্সের নেতৃত্বে এই দ্বীপের দখল নেওয়া হোক। কিন্তু চার্চিল সরকার তাতে কর্ণপাত করেন নাই, বরং দ্য গলের অজ্ঞাতসারেই এই দ্বীপ দখলের অভিযান সংগঠিত ও কার্যক্ষেত্রে অনুসৃত হইল। শুধু তাই নয়। বৃটিশ সরকার মাদাগাস্কার দ্বীপে অবতরণের আগে স্থানীয় শাসনকর্তাকে —(যিনি ভিসি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন)—জানাইলেন যে, যদি বিনা বাধায় বৃটিশ সৈন্যদিগকে অবতরণ করিতে দেওয়া হয়, তবে, তাঁকে অর্থাৎ গভর্নর ও

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ২৫৮।
২। The Second Great War—Vol. VI, P. 2239.

তাঁর দল-বলকে স্ব স্ব পদে অবস্থান করিতে দেওয়া হইবে এবং দ্য গলের ফ্রী ফ্রান্সের সঙ্গে তাঁদের কোন সহযোগিতা করার দরকার হইবে না। নিঃসন্দেহে দ্য গলকে না জানাইয়া ভিসি সরকারের সঙ্গে এই ধরনের বুঝাপড়া করার চেষ্টা অত্যন্ত আপত্তিজনক ছিল। যদিও মাদাগাস্কার দখলের পর শেষ পর্যন্ত দ্য গলের সঙ্গে বৃটেনের একটা চুক্তি হইয়াছিল এবং শাসনভার ফ্রী ফ্রান্সের হাতেই দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি মাদাগাস্কার অভিযানের এই সমস্ত ঘটনা নিয়া চার্চিলের সঙ্গে দ্য গলের তীব্র সংঘাতের সৃষ্টি হইয়াছিল। কেননা, দ্য গলের সন্দেহ হইয়াছিল যে, ফ্রান্সের অন্যান্য উপনিবেশ সম্পর্কেও বৃটেন একই ধরনের কৌশল অনুসরণ করিতে পারে এবং ফ্রান্সের সার্বভৌমত্বের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে। অবশ্য চার্চিল মাদাগাস্কারে বৃটিশ অভিযানের সাফাই স্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, যদি বৃটেন 'একাকী' এই অভিযান করে, তবে, ভিসি সরকারের পক্ষ থেকে সবচেয়ে কম বাধা আসিবে।[১]

কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া ও লেবাননের ব্যাপারেও দ্য গলের সঙ্গে বৃটেনের অনুরূপ বিরোধ বাধিয়াছিল। বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ এখানে ফরাসী আধিপত্য খর্ব করার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন কি দ্য গলকে এই সময় লণ্ডন ত্যাগ করিয়া মধ্যপ্রাচ্যে আসিতে দিতে পর্যন্ত সম্মত ছিলেন না। অথচ বৃটিশ প্রতিনিধিগণ সিরিয়া ও লেবাননের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনবরত হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন। দ্য গল এক সময় বিরক্ত হইয়া সিরিয়া-লেবানন থেকে বৃটিশ পক্ষকে জোরপূর্বক অপসারণের ভয় পর্যন্ত দেখাইয়াছিলেন। ফলে, বৃটিশ সরকারও পালটা হুমকী দিয়াছিলেন যে, সিরিয়া ও লেবাননে ফরাসী প্রশাসন ও ফরাসী সৈন্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বৃটিশ সরকার ৫ থেকে ৬ লক্ষ পাউণ্ড পর্যন্ত যে মাসিক বরাদ্দ দেন, সেটা একেবারেই কমাইয়া দেওয়া হইবে!

তখন ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৪২) লণ্ডনে চার্চিলের সঙ্গে দ্য গলের যে সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তাতে সিরিয়া ও মাদাগাস্কার প্রসঙ্গ নিয়া চার্চিলের মেজাজ সপ্তমে চড়িয়া গেল। দ্য গলের প্রতিবাদ---বিশেষত ফরাসী সার্বভৌমত্বের উপর বৃটিশ হস্তক্ষেপের অভিযোগ করার চার্চিল যে ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন এবং চিৎকার করিয়া বলিলেন:

'You claim to be France! You are not France! I do not recognize you as France.'

তারপর চার্চিল আরও গলা চড়াইয়া বলিলেন—

'France! Where is France now? Of course I do not deny that 'General de Gaulle and his followers are an important and honourable part of the French people, but certainly another authority besides his could be found which would also have its value'—[২]

চার্চিলের এই ক্রুদ্ধ বিস্ফোরণের মধ্যে লক্ষ্য করার এই যে, চার্চিল যেমন ফ্রান্সের কোন পৃথক অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করিতেছিলেন, তেমনি ফ্রী ফ্রান্সের নেতৃত্ব পদে দ্য গলের পরিবর্তে অন্য কোন নেতার কথাও চিন্তা করিতেছিলেন, যদিও কার্যত তা সম্ভব হয় নাই। তথাপি এই বৈঠকে দ্য গলের সঙ্গে ঝগড়া এমন চরমে উঠিয়াছিল যে, বৃটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

১। British Foreign Policy During World War II, P. 286.
২। War Memoirs of Charles de Gaulle, P. 341.

চার্চিলও এই সমস্ত বিরোধের কথা আদো গোপন করেন নাই। বরং তিনি খোলাখুলিই লিখিয়াছেন যে, দ্য গলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে গিয়া ওয়াশিংটনের সঙ্গেও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কারণ, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট দ্য গলকে আদো পছন্দ করিতেন না এবং উত্তর আফ্রিকা অভিযানের সময় দ্য গলের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ মার্কিন দপ্তরে পোঁছিতেছিল এবং আমেরিকা দ্য গলের উপর অত্যন্ত খাপ্পা ছিল। এমন কি মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর থেকে এমন অভিযোগও পাওয়া গিয়াছিল যে, বৃটেনের কাছ থেকে দ্য গল যে অর্থ পাইতেন, সেই অর্থ দিয়া তিনি এক সময় 'রিচিলিউ' যুদ্ধজাহাজের লস্করদিগকে ঘুষ দিয়া নিজের দলে টানিতে চাহিয়াছিলেন। চার্চিল বলিতেছেন যে, বৃটেনের টাকা কার্যত আমেরিকারই টাকা। কেননা, মার্কিন সাহায্যের উপর বৃটেন একান্ত নির্ভরশীল ছিল। 'এই সময় আমি দ্য গলের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম। কেননা আমি অনুভব করিতেছিলাম যে, দ্য গলকে যদি আমি ক্রমাগত সমর্থন করিয়া যাই, তবে, শেষ পর্যন্ত আমেরিকার সঙ্গেও আমাদের ছাড়াছাড়ি হইতে পারে।'

সুতরাং চার্চিলের মতে—

'It hung in the balance whether we should not break finally at this juncture with this most difficult man.'—[১]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চার্চিলকে এই 'most difficult man' বা সবচেয়ে বেয়াড় মানুষটির সঙ্গেই জোড়াতালি দিয়া সম্পর্ক বজায় রাখিতে হইয়াছিল। কেননা, উভয়েরই উভয়কে প্রয়োজন ছিল যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনে।

ফ্রান্স ও দ্য গলের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পর্ক ভালো ছিল। বিশেষত ইঙ্গ-মার্কিনের সঙ্গে দ্য গলের সম্পর্কের বিবেচনায় রাশিয়ার সঙ্গে গোড়া থেকেই এই সম্পর্ককে সরল, সৎ ও আন্তরিক বলা যাইতে পারে। যদিও জার্মানীর হাতে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর পেতাঁর ভিসি সরকারের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তবু এই সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের পর। কিন্তু ফ্রী ফ্রান্সের অধিনায়করূপে দ্য গলের আবির্ভাবের পর ১৯৪১, আগস্ট মাসেই রাশিয়ার সঙ্গে দ্য গলের সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দ্য গল বিশ্বাস করিতেন যে, রাশিয়ার যুদ্ধে যোগদানের দ্বারা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, যখন ফ্রান্সের পক্ষেও অধিকতর সুযোগ আসিয়াছে এবং 'পরিণামে জার্মানী যে চূর্ণ হইবে' এই বিষয়ে তাঁর কোন সংশয় ছিল না।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১, লণ্ডনস্থিত সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মঃ মইস্কি দ্য গলকে জানাইলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া তাঁকে স্বাধীনতাকামী সমস্ত ফরাসীদের—'তাঁরা যেখানেই থাকুন না কেন'—নেতারূপে মানিয়া নিতে এবং জার্মানী ও তার মিত্রবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্ভবপর সমস্ত সাহায্য দিতেই সম্মত আছেন।

এদিকে দ্য গলও রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র ছিলেন। সুতরাং সিরিয়া থেকে এক ডিভিসন ফরাসী সৈন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু বাহ্যত বৃটেন তাতে বাধা দিল। তখন দ্য গল

১। Churchill—Vol. IV, P. 716.
২। রাশিয়া এ্যাট ওয়ার—পৃঃ ৮২১।

ফরাসী প্রতিরোধের প্রতীক হিসাবে ৩০ জন বিমান সৈন্য ও ৩০ জন বিমানকর্মীকে রাশিয়ায় পাঠাইলেন এবং এই সমস্ত সৈন্য যথেষ্ট বীরত্বের সঙ্গে রাশিয়াতে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন। এভাবে ফ্রী ফ্রান্স ও দ্য গলের সঙ্গে রাশিয়ার সামরিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের সূত্রপাত হইল এবং রাশিয়ার সাহায্য ও সহযোগিতা এত মূল্যবান ছিল যে, এই সহযোগিতা ছাড়া সম্ভবত ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে ফ্রী ফ্রান্সের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের তীব্র বিরোধিতার মুখে দ্য গল টিকিয়া থাকিতে পারিতেন না।[১]

১৯৫৩ সালের জুন মাসে আলজিরিয়াতে ফ্রী ফ্রান্সের ন্যাশনাল লিবারেশন কমিটির পক্ষ থেকে মিত্রশক্তিবর্গের নিকট কূটনৈতিক স্বীকৃতির জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইল, তাতে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ নানাভাবে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া এই স্বীকৃতিদানে ইচ্ছুক জানিতে পারিয়া বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্ট্যালিনের নিকট এক পত্রে তাঁদের 'আশংকার' কথা ব্যক্ত করিলেন। ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নিকট থেকে এভাবে বাধা আসায় এই ব্যাপারে কিছুটা বিলম্ব হইল বটে, কিন্তু ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসেই সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট দ্য গলের কমিটিকে সরাসরি স্বীকৃতি দিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত ২৬শে আগস্ট বৃটেন এবং আমেরিকাও এই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তবু সেই স্বীকৃতি পত্রে নানা শর্ত হাতে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে খাস রাজধানী প্যারিসে যখন দ্য গলের গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন সেই সরকারকে 'অস্থায়ী ফরাসী সরকার'রূপে মানিয়া লওয়ার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের উপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৯৪১ সাল থেকেই দ্য গল ও রাশিয়ার সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল।[২]

প্রকৃতপক্ষে ফরাসী জনসাধারণের যে বিপুলতম অংশ ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের স্বপক্ষে ছিল জেনারেল দ্য গল ফ্রী ফ্রান্সের নেতারূপে তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ও প্রভাব অর্জন করিয়াছিলেন। বিশেষত ফ্রী ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি যে ঐতিহাসিক প্রতিরোধ আন্দোলন চালাইতেছিলেন প্রচণ্ডতম বিপদ ও ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও, সেই পার্টির পক্ষ থেকেও দ্য গলকেই সমর্থন জানান হইতেছিল। অপর পক্ষে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির এই সমর্থনের জন্য সোভিয়েট রাশিয়াও দ্য গলকে পুরোপুরি প্রত্যক্ষ সমর্থন দিতেছিলেন। এই 'কমিউনিস্ট সম্পর্কে'র জন্যই ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের সোভিয়েট বিরোধীরা দ্য গলের প্রতি এত খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন এবং উত্তর আফ্রিকায় তাঁকে প্রতি পদে পদে বাধা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও দ্য গলের অগ্রগতিকে কেউ আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। পরবর্তী অধ্যায় এই দিক দিয়া আরও নাটকীয়।

১। ঐ—পৃঃ ৮২২।
২। ঐ—পৃঃ ৮২৩।

তৃতীয় অধ্যায়

উত্তর আফ্রিকায় ইঙ্গ-মার্কিন অভিযান

ফরাসী সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার ?

১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় যে অভিযান করিয়াছিলেন, তার সাংকেতিক নাম রাখা হইয়াছিল 'অপারেশন টর্চ'। কিন্তু এই টর্চ প্রকৃতপক্ষে সামরিক অভিযানের কোন 'আলোক বর্তিকা' ছিল না, ছিল কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিযানের রণনৈতিক মশালের মত। একদিকে সোভিয়েট রাশিয়াকে বুঝানো যে, ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার বদলে আফ্রিকায় যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হইল, তার দ্বারা হিটলার-অধিকৃত ইউরোপের 'নরম তলপেটে আঘাত' করা হইল (চার্চিলের ভাষা) আর অন্য দিকে হিটলারকে উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী সাম্রাজ্য ও উপনিবেশগুলি দখল করা থেকে বঞ্চিত করা হইল। কিন্তু আসলে এই অভিযানের সামরিক গুরুত্ব যত না বেশী ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক গুরুত্ব। কেননা, বিশাল ফরাসী সাম্রাজ্যের উপর ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ হিটলারকে বঞ্চিত করার নাম করিয়া নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, যার জন্য ফ্রী ফ্রেঞ্চ নেতা জেনারেল দ্য গলের সঙ্গে এত বিরোধ ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল। যদি বলা যায় যে, ইঙ্গ মার্কিন পক্ষ প্রায় বিনা যুদ্ধে এই সামরিক অভিযানে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন এবং তাও পাঁচ মাসের চেষ্টায়—যে সময়ের মধ্যে রোমেল তাঁদেরকে অন্ততঃ একবার বিপদে ফেলিয়াছিলেন, তাহলে নিশ্চয়ই অতিরঞ্জন করা হইবে না। কেননা, উত্তর আফ্রিকায় অবতরণের কিছুকাল পরেই সেখানকার ফরাসী কর্তৃপক্ষ রণে ভঙ্গ দিয়া মিত্রবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও উত্তর আফ্রিকার এই বিচিত্র রণাঙ্গনে সামরিক যুদ্ধের চেয়ে রাজনৈতিক যুদ্ধই বড় হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অভিনব রাজনৈতিক লড়াইয়ের জন্যই উত্তর আফ্রিকার এই অভিযান ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অপারেশন টর্চ কোন কোন সময় এমন বিভ্রাটের মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল যে, এখানে অনায়াসে একটা রাজনৈতিক লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়া যাইতে পারিত। কেননা, ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী রাজনীতি ও রণনীতির সংঘাতে আবহাওয়া ভয়ানক রকম গরম হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে, এখানকার অভিযানে গোয়েন্দা রহস্যের চমক থেকে দল ভাঙ্গাভাঙ্গির, এমন কি রক্তারক্তির ট্র্যাজিক নাটক পর্যন্ত অভিনীত হইয়া গিয়াছে।

*　　　*　　　*

দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির দাবীকে চাপা দিয়া ১৯৪২ সালের জুন মাসে ওয়াশিংটনে চার্চিল-রুজভেল্টের বৈঠকে 'মধুর অভাবে গুড়ের' মত উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় অভিযান চালাইবার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল—যদিও মার্কিন সেনানীমণ্ডলী এর পক্ষপাতী ছিলেন না। এমন কি জেনারেল আইজেনহাওয়ার যখন এই সিদ্ধান্তের কথা প্রথম শুনিয়াছিলেন, তখন তিনি '২২শে জুলাই, ১৯৪২ তারিখটিকে ইতিহাসের সবচেয়ে

'কালো দিবস' বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ফ্রান্সে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার বদলে আফ্রিকার এই অভিযানকে স্বয়ং মার্কিন সমর-সচিব স্টিমসন 'unnecessary diversion' বা 'অনাবশ্যক ভিন্নমুখীকরণ' বলিয়া সমালোচনা করিয়াছিলেন।[১]

কিন্তু এই সমালোচনা সত্ত্বেও উইনস্টোন চার্চিল ও বৃটিশ সমর-নেতাদের উদ্যোগে ও কৌশলে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টই এই অভিযানের জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেননা, সেই সময় রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারের দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযান পূর্ণবেগে চলিতেছিল এবং স্ট্যালিনগ্রাদ অভিমুখে অনুষ্ঠিত হইতেছিল ঐতিহাসিক আক্রমণ। রুজভেল্ট স্ট্যালিন ও রাশিয়ার নিকট প্রমাণ করিতে চাহিতেছিলেন যে, মিত্রপক্ষ নিষ্ক্রিয় বসিয়া নাই। ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া ফ্রান্সে আক্রমণ যখন সম্ভব হইতেছে না, তখন অন্ততঃ ভূমধ্যসাগর শত্রুমুক্ত করিয়া দক্ষিণ ইউরোপ থেকে হিটলারী দুর্গের উপর ভাবী আক্রমণের দরজা উন্মুক্ত করা হইবে। রুজভেল্টেরই উৎসাহে এই অভিযানের গোড়াকার সাংকেতিক নাম 'অপারেশন জিমনাস্ট' বদল করিয়া নূতন রাখা হইল 'অপারেশন টর্চ'।

কিন্তু এই অপারেশনের এলাকা ছিল ফরাসী অধিকৃত উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এবং এই সাম্রাজ্যের ফরাসী শাসন ও সামরিক কর্তাদের অধিকাংশই ছিলেন পেতাঁর ভিসি ফ্রান্সের প্রতি অনুগত। অর্থাৎ ফরাসী রাষ্ট্রের মূল সার্বভৌমত্বের দাবীদার। কেননা এই সাম্রাজ্য ছিল হিটলারী অধিকৃত ফ্রান্সের বাইরে। এবং 'ভিসি ফ্রান্স' সরকারীভাবে বৃটেন বা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল না। সুতরাং আইনের বিবেচনায় ভিসি সরকারের অধীন ফরাসী সাম্রাজ্য 'নিরপেক্ষ' ছিল। অথচ মার্শাল পেঁতা ও ভিসি সরকার কার্যতঃ ছিলেন ফ্যাসিস্ট জার্মানীর তাঁবেদার। সুতরাং মহাযুদ্ধের এই সংকটে এই তাঁবেদার রাষ্ট্রের 'নিরপেক্ষতার' প্রতি মর্যাদা দেখানো সম্ভব ছিল না। তবু একথা সত্য যে, ইতিহাসে এই প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি নিরপেক্ষ দেশের উপর 'বিনা প্ররোচনায় আক্রমণে' উদ্যত হইয়াছিল, যার ফলে অপারেশন টর্চের অর্থ ছিল—'ফরাসীরা আমেরিকানদের গুলি করিয়া হত্যা করিতেছে। আর আমেরিকানরা ফরাসীদের গুলি করিয়া খুন করিতেছে। যেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একটা মর্মান্তিক ছাপার ভুল।'[২]

সুতরাং মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গীতে এই 'মশাল রণক্রিয়া' দুঃখের অথচ প্রয়োজনের দিক থেকে অত্যাবশ্যক ছিল।

'From the American point of view, Torch was a regrettable but absolutely necessary operation. This was the first time in history that the United States had planned what amounted to an unprovoked attack upon a supposedly neutral country. But Vichy had collaborated with Hitler, and as a Satellite Axis Country in an all-out war it could not expect the safety of neutralism'[৩]

তবু, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ইঙ্গমার্কিন সৈন্যবাহিনীর অবতরণের আগে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মার্শাল পেতাঁকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে আক্রমণের একটি ব্যাখ্যামূলক বার্তা যথোচিত ভদ্র ভাষায় পাঠাইয়াছিলেন, যার উত্তরে বৃদ্ধ পেতাঁ একটি কাঠখোট্টা সংক্ষিপ্ত জবাবে বলিলেন—'এটি আক্রমণের ছুতো মাত্র। আমাদের সম্মান বিপন্ন। সুতরাং আমরা আত্মরক্ষা করিব। এই হুকুমই আমি দিতেছি।'[১]

অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ফরাসীদের সহিত ইঙ্গ-মার্কিন অভিযাত্রীবাহিনীর যুদ্ধের সম্ভাবনা লণ্ডনে এবং ওয়াশিংটনে দারুণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিল। ১৯৪০ সালের পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধের পর থেকেই ফ্রান্স বৃটেনের উপর অত্যন্ত খাপ্পা ছিল। এজন্য বৃটেনকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটনের নেতারা একমাত্র মার্কিন সৈন্য ও সেনাপতিদেরকে এই অভিযানের মুখ্য ভূমিকায় নামাইতে চাহিলেন। এমন কি, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট চার্চিলের নিকট এমন প্রস্তাবও করিয়াছিলেন যে, বৃটিশ সৈন্যদিগকে মার্কিনবাহিনীর সামরিক ইউনিফর্ম পরানো হোক। অবশ্য কার্যতঃ এতদূর অগ্রসর না হইলেও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা অভিযানে আমেরিকাই মুখ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, যার জন্য আবার বৃটিশ নেতাদের 'হিয়া দগদগি পরাণ পুড়নি' ঘটিয়াছিল!

উত্তর আফ্রিকা অভিযানে চর্চিলের মনে অবশ্য আর একটি প্রশ্নও উঁকি মারিতেছিল। আগস্ট মাসে (১৯৪২) মস্কোতে স্টালিনের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি স্টালিনের মুখ থেকেই আভাস পাইয়াছিলেন যে, লালফৌজের পক্ষ থেকে হিটলারী বাহিনীর পালটা আক্রমণাত্মক অভিযান অনুষ্ঠিত হইবে। এই গোপন তথ্য জানিতে পারিয়া চার্চিল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বরং চিন্তান্বিত হইলেন। কেননা, প্রতিভাশালী চার্চিল আন্দাজ করিয়াছিলেন যে, পূর্ব রণাঙ্গনেই চরম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইবে এবং এই যুদ্ধ জয়ের সমস্ত গৌরব তখন সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাপ্য হইবে, যার ফলে পৃথিবীব্যাপী বৈপ্লবিক উপাদানগুলি শক্তিশালী হইবে। সুতরাং তার আগে বৃটিশ বা ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের একটা উল্লেখযোগ্য জয় অর্জন করা দরকার—যে-জয়ের দ্বারা তিনি বৃটিশ কমনওয়েলথ ও মার্কিন জনমতের কাছে মুখ দেখাইতে পারিবেন। আফ্রিকায় রোমেলের বিরুদ্ধে অষ্টম বাহিনীর রণক্রিয়াগুলির মূলে ছিল এই চিন্তা। কিন্তু রোমেলকে পরাজিত করা আদৌ সহজ ছিল না, বরং রোমেল এক 'কিংবদন্তীর নায়কে' পরিণত হইয়াছিলেন। তখন রোমেলের ইতালী-জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে দুই দিক থেকে—পূর্ব ও পশ্চিম থেকে সাঁড়াশীর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকাতেও ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর অবতরণের প্রয়োজন অনুভূত হইল এবং রুজভেল্টও ৩০শে অক্টোবরের আগেই এই অবতরণ চাহিতেছিলেন। কেননা সেই সময় কংগ্রেসের নির্বাচনে রুজভেল্ট তাঁর ডেমোক্রাট পার্টির অনুকূলে মার্কিন ভোটদাতাদের সমর্থন ও সহানুভূতি উদ্রেক করিতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু আগেই বলা হইয়াছে যে, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ফরাসী সাম্রাজ্যের জন্য এবং অপরদিকে জিব্রাল্টার ও স্পেন এই অভিযান পথে পড়ায় রাজনৈতিক ও রণনৈতিক জটিলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পাছে বৃটিশ নেতৃত্বের অভিযানে ফরাসীদের ক্রোধ ও প্রতিরোধ জাগ্রত হয়, এজন্য সমগ্র অভিযাত্রী বাহিনীর নেতৃত্ব পদ দেওয়া হইল জেনারেল ডুইট আইজেনহাওয়ারকে, বৃটিশ সেনাপতিরা দ্বিতীয়

১। শেরউড—পৃষ্ঠা ৬৪৫।

সারির নেতৃত্ব পাইলেন। এতে মার্কিন সামরিক মহল খুশী হইলেন বটে, কিন্তু ইংরেজদের মন অপ্রসন্ন হইল। কারণ, পাছে আমেরিকা এই নেতৃত্বের সুযোগ নিয়া ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে ও ভূমধ্যসাগরীয় বৃটিশ এলাকায় নিজেদের প্রভাব বিস্তৃত করে, এই চিন্তা বৃটিশ সামরিক ঈর্ষা উদ্রেক করিল। দ্বিতীয়তঃ আফ্রিকার সুদীর্ঘ উপকূলে ইঙ্গ মার্কিন অভিযাত্রী বাহিনীর অবতরণের স্থান লইয়াও বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। কেননা বৃটিশ পক্ষ চাহিতেছিলেন, রোমেলের দ্বারা বিপন্ন মণ্টগোমারীর অষ্টম বাহিনীর উপর চাপ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের যতটা সম্ভব পূর্ব দিকে ও অষ্টম বাহিনীর কাছাকাছি অবতরণ করিতে এবং এজন্য আলজিয়ার্সই তাঁদের পছন্দসই ছিল। কেননা, এই স্থানটিই চার্চিলের মতে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় 'সবচেয়ে নরম তলপেটের মত সবচেয়ে সুবিধাজনক আঘাতের স্থান ছিল।'[১]

অপরপক্ষে আমেরিকানরা আলজিয়ার্সে অবতরণের প্রস্তাবে ভীত হইয়াছিলেন। কেননা, তাঁদের আশংকা ছিল যে, ভূমধ্যসাগরে এই প্রস্তাবিত অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় যদি স্পেনের জেনারেল ফ্রাংকো জিব্রাল্টারের পথ বন্ধ করিয়া দেন, কিম্বা হিটলারই বদলা নেওয়ার জন্য স্পেন দখল করিয়া বসেন, তাহলে নিদারুণ বিভ্রাট দেখা দিবে। উভয় পক্ষের এই বিরোধের শেষ পর্যন্ত একটা আপোষরফা হইল—স্থির হইল যে, একটা অভিযাত্রী বাহিনী আফ্রিকায় অতলান্তিকের তীরে ক্যাসাব্লাংকায় এবং অপর দুইটি ভূমধ্যসাগরের ওরান ও আলজিয়ার্সে অবতরণ করিবে।[২]
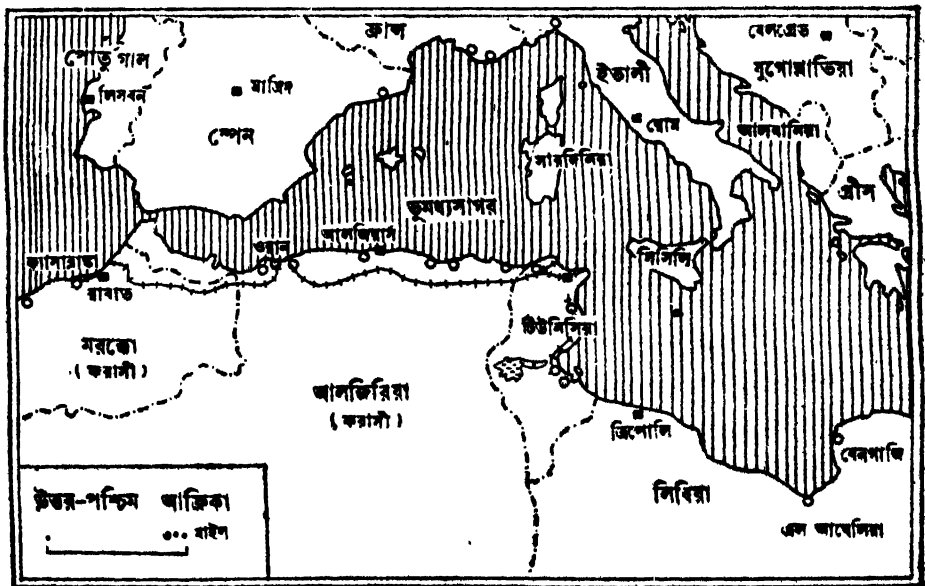
তৃতীয়তঃ গোল বাধিল অভিযাত্রী বাহিনীর গঠন নিয়া, যে-কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মার্কিন পক্ষের বক্তব্য ছিল এই যে, দ্য গলের ফ্রি-ফ্রান্স ও বৃটিশবাহিনীকে

১। Herbert Feis—P. 89.
২। বৃটিশ করেন পালিসি—পৃষ্ঠা ২৮৯।

ভিসি সরকার বরদাস্ত করিবে না। অতএব প্রথম অবতরণের পর্যায়ে পুরোপুরি মার্কিন বাহিনীরই নেতৃত্ব থাকিবে। বৃটিশ নৌ ও বিমানবাহিনী কেবলমাত্র ঠেকা দিবে। কিন্তু ইংরেজরা আশংকা করিল যে, এই সুযোগে উত্তর আফ্রিকায় মার্কিন প্রভুত্ব শিকড় গাড়িয়া বসিবে। সুতরাং আগস্ট মাসে উভয় পক্ষের মন কষাকষি এমন অবস্থায় পেঁৗছিল যে, অভিযাত্রী বাহিনীর সংগঠন কার্যের প্রস্তুতি পর্যন্ত স্থগিত রহিল। অবশেষে ৫ই নভেম্বর উভয় পক্ষের মধ্যে এই মর্মে আপোষরফা হইল যে, আলজিয়ার্সে যে সৈন্যদল অবতরণ করিবে, তাদের মধ্যে বৃটিশ সৈন্যের আধিক্য থাকিবে বটে, কিন্তু এই সৈন্যদলের অগ্রবর্তী বাহিনী হইবে আমেরিকান। আর ওরানে এবং ক্যাসাব্ল্যাংকাতে প্রায় সম্পূর্ণ রূপে মার্কিন বাহিনীই অবতরণ করিবে—সামরিক নেতৃত্বও আমেরিকানদের হাতেই থাকিবে, তবে বৃটিশ নৌ ও বিমানবাহিনী সহযোগিতা করিবে। আর রণনৈতিক পরিকল্পনার দিক দিয়া স্থির হইল যে, বৃটিশ অষ্টম বাহিনী রোমেলের বাহিনীকে যতদূর পশ্চিমে সম্ভব—মিশর ও সাইরেনাইকা পার করিয়া ত্রিপোলিটানিয়া পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাড়াইয়া নিয়া আসিবে এবং তখন রোমেল সাঁড়াশীর দুই বাহুর চাপে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইবেন।[১]

এভাবে উভয় পক্ষের টানাহেঁচড়া এবং সামরিক পরিকল্পনার অদল-বদলে উত্তর আফ্রিকার টর্চ অভিযানে যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া গেল। কিন্তু চার্চিল 'সুবোধ বালকের' মত এই সমস্তই মানিয়া নিলেন এবং অতলান্তিকের এপারে-ওপারে যে বিপুল পরিমাণ তারবার্তার বিনিময় হইতেছিল, তার পরিসমাপ্তি ঘটিল চার্চিলের সম্মতির জবাবে রুজভেল্টের একটি মাত্র শব্দের টেলিগ্রামে—'Hurrah!'

রণপণ্ডিত লীডেল হার্ট এই প্রসঙ্গের উপর বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন—এভাবে অতলান্তিকের এপারে-ওপারের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা'—the transatlantic essay competition' শেষ হইয়া গেল। আর চার্চিল ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখ রুজভেল্টের নিকট 'বশ্যতা স্বীকার' করিয়া তার করিলেন—

'In the whole of Torch, military and political, I consider myself your lieutenant, asking only to put my view-point plainly before you.'[২]

বৃটিশ সাম্রাজ্য-স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য চার্চিল আমেরিকার নিকট কতটা নতি স্বীকার করিয়া চলিতেছিলেন, এই সমস্ত ঘটনা তারও প্রমাণ বটে।...

কিন্তু উত্তর আফ্রিকার নাটকের এখানেই শেষ নয়। এমন বহু চাঞ্চল্যকর ঘটনার সমাবেশ হইয়াছিল, যেগুলির বিস্তৃত উল্লেখ করা দূরের কথা, কেবল সামান্য রেখাচিত্র দেওয়া যাইতে পারে। যেমন, এই অভিযানের প্রস্তুতিপর্বে গোপন গোয়েন্দাগিরির একটা প্রকাণ্ড ভূমিকা ছিল। রবার্ট ডি. মারফি ছিলেন এই গোয়েন্দাগিরির প্রধান নায়ক। তিনি মার্কিন রাষ্ট্র দপ্তরের একজন সিনিয়র এবং 'ঘুঘু' অফিসার ছিলেন। ১৯৪০ সাল থেকেই তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিরূপে ভিসি সরকারের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তাঁর আসল কাজ ছিল ইঙ্গ-মার্কিনের স্বপক্ষে যতদূর সম্ভব ফরাসী সমর্থন, বিশেষভাবে উত্তর আফ্রিকার ফ্রি ফ্রেঞ্চের সমর্থন আদায় করা।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২৯০।
২। History of The Second World War—Liddell Hart, P. 316.

সামরিক এই গোপন দৌত্যকার্যের দপ্তর থেকে লণ্ডনে এবং ওয়াশিংটনে সামরিক ও অ-সামরিক প্রচুর মূল্যবান সংবাদ জমা হইতেছিল। কোন্ কোন্ অফিসার ও ফরাসী নেতা মিত্রশক্তির পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে, ওই অঞ্চলের ফরাসী সামরিক ও নৌবলের অবস্থান ও অবস্থা কি, ইত্যাদি বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রবার্ট মারফি যত্ন ও কৌশলের সঙ্গে সংগ্রহ করিতেছিলেন। এই সমস্ত মূল্যবান সংবাদ ইঙ্গ-মার্কিন অভিযানের পক্ষে খুব সহায়ক হইয়াছিল। রবার্ট মারফির এই গোয়েন্দাগিরির সহায়তার জন্য তাঁর সঙ্গে ৫টি 'Top Secret Transmitter' ও রিসিভার লুক্কায়িত ছিল।

তিনি তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক যে মনোজ্ঞ পুস্তক লিখিয়াছেন, তাতে বহু আগ্রহোদ্দীপক এবং কৌতুকপ্রদ কাহিনী আছে, যেগুলি সেদিনের উত্তর আফ্রিকার অবস্থা জানিবার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক ছিল।[১]

'আফ্রিকার পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপ' এই শিরোনামার অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন যে, ফরাসী আফ্রিকার অধিকাংশ সিভিলিয়ানই বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে নিরপেক্ষ সাজিয়াছিলেন। তাঁদের মতে এত বিলম্বে কিছু করিবার ছিল না এবং 'মুক্তিলাভের' জন্য তাঁদের আদৌ কোন গরজ ছিল না। তাঁদের স্পষ্ট মত ছিল ফরাসী আফ্রিকার উচিত যুদ্ধের বাইরে থাকা। আসলে তাঁদের অনেকেই প্রচুর টাকা কামাইতেছিলেন। এঁদের মধ্যে যে সমস্ত ইউরোপীয় প্রচুর ভূমির মালিক ছিলেন, তাঁরাই ছিলেন সবচেয়ে ধনী এবং প্রভাবশালী গোষ্ঠী।* তখন যুদ্ধের মওকায় খাদ্য-দ্রব্য ও বহু প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবারাহের জন্য খোলাবাজারে ও কালোবাজারে টাকার যেন বান ডাকিয়াছিল। দেশী-বিদেশী—আরব, বারবার এবং ইউরোপীয় ধনিক-বণিক নির্বিশেষে সকলেই প্রভূত অর্থের মালিক হইতেছিলেন। সুতরাং সত্যকার জঙ্গী দেশপ্রেমিকের সংখ্যা ছিল খুব সামান্য।[২]

রবার্ট মারফির গোয়েন্দাগিরি আমেরিকার খুব কাজে লাগিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর সরবরাহ করা কিছু কিছু তথ্যের জন্য বিভ্রাটও বাধিয়াছিল কম নয়। যেমন এডমিরাল দারলাঁ ও জেনারেল জিরোর প্রসঙ্গ। জেনারেল হেনরি জিরো পলায়নের ব্যাপারে হীরো ছিলেন। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যেমন, তেমনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে জার্মান বন্দীশালা থেকে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে পলাইয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। পর পর দুই বার তাঁর এই রোমাঞ্চকর পলায়নের জন্য তাঁর খুব নামডাকও হইয়াছিল এবং উত্তর আফ্রিকার ফরাসী সেনাপতিরা রবার্ট মারফির নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, জেনারেল জিরোর মত সাহসী ও প্রধান সেনাপতি যদি সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তবে ফরাসী সৈন্যেরা তাঁর পতাকাতলে সমবেত হইতে এবং মিত্রপক্ষেও যোগ দিতে রাজী হইবেন।

কিন্তু পরবর্তীকালের ঘটনাবলীতে মারফির এই মতামত যেমন ভুল প্রমাণিত হইয়াছিল, তেমনি এডমিরাল দারলাঁ মার্কিন পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ফ্যাসিজমের দালালির জন্য তাঁকে নিয়া অতলান্তিকের এপারে-ওপারে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল।

১। Diplomat Among Warriors—Robert Murphy. Collins, London 1964—P. 140.

* এখানে স্মরণযোগ্য যে, যুদ্ধের পর আলজিরিয়ার স্বাধীনতা [illegible] এই [illegible] ভূমি[illegible]
মালিক গোষ্ঠীই সবচেয়ে বেশী বাধা দিয়াছিল।—লেখক।

২। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৪২।

তাছাড়া আর-একটি হলিউড মার্কা লোমহর্ষক ঘটনারও অবতারণা হইয়াছিল। আলজিয়ার্সে হাতে-কলমে অবতরণের আগে সত্যি সত্যি সেখানকার ফরাসী সেনাপতিদের মনোভাব বাস্তবে কি রূপ ধারণা করে তা যাচাই করিয়া দেখার জন্য একটি ছোটখাটো মার্কিন ডেলিগেশন পূর্বাহ্নে পাঠাইবার আয়োজন হইয়াছিল। কথা ছিল আলজিয়ার্সের ফরাসী সেনাপতিদের প্রধান জেনারেল চার্লস ইমানুয়েল মাস্টের সঙ্গে মার্কিন সেনাপতিদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে রোমান্টিক, সেই মেজর জেনারেল মার্ক ক্লার্ক যোগাযোগ করিবেন। এই রোমাঞ্চকর অভিযানের জন্য সাবমেরিন, প্লেন ইত্যাদি কোন কিছুরই ত্রুটি ছিল না। রাত্রিবেলা চুপে চুপে ও আলোর সিগন্যালের সাহায্যে এবং প্রচুর সতর্কতা সহকারে এঁদেরকে তীরভূমিতে অনেক কষ্টে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্থানীয় গোয়েন্দা পুলিশের সন্দেহ জাগ্রত হওয়ায় ব্যাপারটা ভণ্ডুল হইয়া গেল। যাদের সঙ্গে যোগসাজসে রাত্রিবেলা এই দুঃসাহসিক অবতরণ ঘটানো হইয়াছিল, বেগতিক দেখিয়া তারা পালাইয়া গেল। আর বেচারা জেনারেল ক্লার্ক এবং তাঁর মুষ্টিমেয় সঙ্গীরা কোনও ক্রমে প্রাণ হাতে করিয়া তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রের জল ভাঙিয়া ডিঙ্গি করিয়া পালাইয়া আসিলেন। পুলিশের তাড়া খাইয়া তাঁরা এক সময় ভূগর্ভস্থ সেলারে (মদ্যশালা) আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।[১]

* * *

আফ্রিকার ফরাসী সাম্রাজ্যের উপর অক্ষ শক্তিবর্গেরও দৃষ্টি ছিল না, এমন নয়। এমন কি ১৯৪১ সালের বসন্তকালে জার্মানরা এই সমস্ত উপনিবেশ দখল করিয়া নিতে পারে, এমন আশংকা আলজিয়ার্সের ফরাসী সদর দপ্তরেও দেখা দিয়াছিল। কিন্তু দুই সামরিক পুরুষ—উভয়েই বৃদ্ধ এবং উভয়েই পঞ্চতারকাসমন্বিত জেনারেল। ফরাসী প্রশাসনের শীর্ষস্থানে ছিলেন—মার্শাল পেতাঁ (৮০ বছর) এবং জেনারেল ওয়েগাঁ (৭২ বছর)। তিনি প্রথমে ভিসিতে ছিলেন জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রিরূপে, পরে তিনি গোটা ফরাসী সাম্রাজ্যের ডেলিগেট-জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। তিনি অবশ্য মুখে বলিতেন যে, জার্মানরা ফরাসী সাম্রাজ্য কাড়িয়া নেওয়ার চেষ্টা করিলে তিনি বাধা দিবেন। কেননা, তখন তাঁর নেতৃত্বাধীনে নৌ-বিমান ও স্থলসহ মোট এক লক্ষ নিয়মিত সৈন্য ছিল এবং দরকার হইলে আরও দুই লক্ষ রিজার্ভ সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারিত। চার্চিলের সঙ্গে দ্য গলের বিরোধ হওয়ার সময় চার্চিল জেনারেল ওয়েগাঁর নিকট লোক মারফৎ এক চিঠি দিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, তিনি ভিসি সরকারের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া আফ্রিকাতে নূতন স্বাধীন ফরাসী গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা দিতে রাজী আছেন কিনা, যদি রাজী থাকেন তবে বৃটিশ সরকার তাঁকে পুরাপুরি সমর্থন দিবেন। কিন্তু ওয়েগাঁ মার্শাল পেতাঁর অমতে ও অজ্ঞানসারে এমন প্রস্তাব গ্রহণে রাজী ছিলেন না। অপর পক্ষে, হিটলার ভূমধ্যসাগর ও আফ্রিকার প্রশ্নটিকে কোনদিনই তেমন গভীরভাবে ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন নাই। মহাযুদ্ধের পরবর্তী ধৃত দলিলপত্র থেকে জানা যায় যে, গোয়েরিং এবং গুডেরিয়ান হিটলারকে স্পেন দখলপূর্বক নয় মাইল চওড়া জিব্রাল্টার প্রণালী পার হইয়া ফরাসী আফ্রিকা দখলের জন্য যথেষ্ট প্ররোচনা দিয়াছিলেন। কিন্তু হিটলার দক্ষিণের বদলে

১। স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৩৫৭।

পূর্বে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকিলেন।[১] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের এটা ছিল অন্যতম মারাত্মক ভুল।

অথচ ফরাসী আফ্রিকাতে তখন প্রচুর সোনা মজুত রাখা হইয়াছিল। জার্মানরা প্যারিসে প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তে ব্যাংক অব ফ্রান্সের মজুত সোনা একটি মার্কিন ক্রুজার যোগে আফ্রিকাতে চালান দেওয়া হইয়াছিল। সেই সোনারই একটা অংশ—প্রায় ১৫০০ টন ফরাসী সোনা ডাকার বন্দর থেকে ৪০০ মাইল দূরে ফরাসী সুদানের কেইজ (Keyes) শহরের দুর্গে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। ২০০ টন বেলজিয়ান সোনা এবং ৬৪ টন পোলিশ সোনাও সেই সঙ্গে মজুত রাখা হইয়াছিল। কিন্তু এই সোনা আবার জার্মানদের ফেরত পাঠানো হইয়াছিল যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুসারে। তবে, মিত্রপক্ষের সৌভাগ্যক্রমে ফরাসী নৌবহরের মত ফরাসী সোনাও জার্মানদের হাতে পড়ে নাই।[২]

প্রত্যক্ষদর্শী রবার্ট মারফির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই সময় ফরাসী আফ্রিকার অবস্থা অজস্র সমস্যায় অত্যন্ত জটিল ও ভয়াবহ ছিল। গোটা ইউরোপীয় মহাদেশের জটিল প্রশাসনিক ও জাতিগত সমস্যাই যেন আফ্রিকাতে মূর্ত ছিল। ফরাসী আফ্রিকায় বহু জাতি, উপজাতি, অধিজাতি ইত্যাদির বাস ছিল। আরব, বারবার ও নিগ্রো জাতি ও উপজাতীয় লোকদের সংখ্যা ইউরোপীয়দের তুলনায় ১০ থেকে ২০ গুণ বেশী ছিল এবং এদের অনেকেই আবার লড়াইতে ওস্তাদ ছিল। অথচ এদের সকলের উপরে ছিল ফ্রান্সের শাসন। সুতরাং প্রশাসনিক সমস্যার কথা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

বিশেষতঃ হিটলার কর্তৃক ইউরোপের বহু দেশ দখলের পর আফ্রিকার অবস্থা আরও দ্রুত জটিল হইয়া পড়িতে লাগিল। কেননা, অধিকৃত ইউরোপের তুলনায় আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় তীরবর্তী অঞ্চল জীবন যাপনের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল ছিল। সুতরাং যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ থেকে দলে দলে লোক জাহাজ ভর্তি হইয়া আফ্রিকায় আসিতে লাগিল। যুদ্ধ বাধিবার পর অন্ততঃ দুই লক্ষ ইউরোপীয়ান নাৎসী অত্যাচার, জার্মান সামরিক শাসন ও অর্ধভুক্ত অবস্থা থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় আসিয়া হাজির হইল। এই সমস্ত অজস্র আশ্রয়প্রার্থীর মধ্যে যেমন নিঃস্ব বাস্তুচ্যুত ছিল, তেমনি অনেক ধনী ব্যক্তিও ছিল। ব্যাংকাররা ও বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাঁদের অর্থ এখানে মজুত করিতে, খাটাইতে ও মূলধন হিসাবে নিয়োগ করিতে লাগিল। হরেক রকমের লোক এবং হরেক রকম রাজনৈতিক মতবাদের ও মতলববাজের লোক আসিয়া ভীড় করিতে লাগিল। খোলার ঘর ও বস্তি থেকে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা পর্যন্ত এদের দখলে গেল এবং সন্ত্রাসবাদী পুরুষ ও বিপজ্জনক স্ত্রীলোক পর্যন্ত এখানে আসিয়া জুটিল। কমিউনিস্ট, স্পেনীয় লয়ালিস্ট, ইউরোপীয় আশ্রয়প্রার্থী ইহুদী এবং আড়াই হাজার পলাতক পোল ১৯৩৯ সালে ফ্রান্স হইয়া আফ্রিকায় আসিয়া তাঁবু ফেলিয়াছিল।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে ফরাসী আফ্রিকার অবস্থা তখন নিদারুণ বিস্ফোরণমুখী ছিল।[৩]

১। রবার্ট মারফি—পৃষ্ঠা ১০৭।
২। ঐ পুস্তক—পৃষ্ঠা ১০৯।
৩। ঐ—পৃষ্ঠা ১৩৫।

রবার্ট মারফি লিখিয়াছেন যে, উত্তর আফ্রিকার এই প্রকার অবস্থা সম্পর্কে বড় বড় সামরিক নেতাদের কোন জ্ঞান ছিল না। বরং জেনারেল আইজেনহাওয়ার প্রভৃতির ধারণা ছিল—আফ্রিকা বলিতে বুঝায় আদিম বর্বরদের জংলী দেশ ও অরণ্যের অভ্যন্তরে মাটির কুঁড়ে ঘর। কিন্তু তাঁরা জানিতেন না যে, ফরাসী উত্তর আফ্রিকা আমেরিকার কালিফোর্নিয়া শহরের মতই উন্নত ও আধুনিক ছিল।[১]

* * *

উত্তর আফ্রিকায় ইঙ্গ-মার্কিন অভিযানের পূর্ব মুহূর্তে ফরাসী আফ্রিকার এই জটিল চিত্র মনে রাখা দরকার। কেননা আগেই বলা হইয়াছে এই অভিযানে সামরিক প্রশ্নগুলির চেয়ে রাজনৈতিক সমস্যাগুলিই সবচেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছিল।

এল আলামিনে মণ্টগোমারীর অভিযানের ১৪ দিন এবং রোমেলের পরাজয়ের ৮ দিন পর ৮ই নভেম্বর, ১৯৪২, শেষ রাত্রি ৩টার সময় ইঙ্গ-মার্কিন অভিযাত্রী বাহিনী উত্তর আফ্রিকার ১২০০ মাইল উপকূল ধরিয়া ক্যাসাব্লাংকা, ওরান এবং আলজিয়ার্স—এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে অবতরণ করিল। এই অভিযান অতি বৃহৎ আকারে অনুষ্ঠিত হইল—৫০০ যুদ্ধজাহাজ, ৩৫০টি পরিবহন ও মাল জাহাজের এক বিরাট আর্মাডা যেন উপকূলভাগ ছাইয়া ফেলিল। জিব্রাল্টার থেকে বৃটিশ বিমানবহর এই অভিযানের পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশ রক্ষা করিল। আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্স ছিল ফরাসী উত্তর আফ্রিকার সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সদর ঘাঁটি। এখানে মার্কিন সেনাপতি মেজর-জেনারেল চার্লস রাইডারের নেতৃত্বে ও বৃটিশ সৈন্যদের সহযোগিতায় ইস্টার্ন টাস্কফোর্স অবতরণ করিল এবং বিনা যুদ্ধেই আলজিয়ার্স আত্মসমর্পণ করিল।

আলজিয়ার্স থেকে ১৩০ মাইল পশ্চিমে ওরানও দুই দিনেই দখল হইয়া গেল।

সামান্য কিছু বাধা পাওয়ার পর ক্যাসাব্লাংকাও দখল হইয়া গেল তিন দিন পর। ক্যাসাব্লাংকা মরক্কোর অন্তর্গত এবং অতলান্তিকের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এখানে ইঙ্গ মার্কিন অভিযাত্রী বাহিনীর অবতরণ বেশ কষ্টসাধ্য হইয়াছিল প্রাকৃতিক কারণে ও উৎকৃষ্ট যোগাযোগের অভাবে। আলতাই পর্বতের পাদদেশ ধরিয়া যে সংকীর্ণ সেকেলে রেলপথটি পূর্ব দিকে বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, সেই পথটিই ছিল সারা উত্তর আফ্রিকায় ওরান, আলজিয়ার্স ও টিউনিসে সাপ্লাই দেওয়ার একমাত্র স্থলপথের অবলম্বন।

জাহাজ, যানবাহন, যন্ত্রসজ্জা এবং সমুদ্র-পারবর্তী নিখুঁত অভিযানের দিক থেকে অপারেশন টর্চ নিশ্চয়ই একটা ঐতিহাসিক অভিযানের মত ছিল। তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ পঁচাশি হাজার সৈন্য, কুড়ি হাজার যানবাহন এবং দুই লক্ষ টন মালপত্র ও সমরাস্ত্র ক্যাসাব্লাঙ্কা, ওরান ও আলজিয়ার্সে নামানো হইল। নৌ, বিমান ও স্থল সৈন্যের সমবায়ে এতবড় অভিযান সংগঠিত করা নিশ্চয়ই কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল। তবে, সামরিক দিক থেকে অভিযাত্রী বাহিনীকে তেমন কোন বিপদে পড়িতে হয় নাই। কেননা, সৌভাগ্যগ্রামে ফ্রাংকোর স্পেন কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে নাই, জিব্রাল্টারে হস্তক্ষেপ করে নাই এবং স্থানীয় ফরাসী কর্তৃপক্ষও বাধা দেন নাই—যদিও আক্রমণকারীদের সম্পর্কে জনমত দ্বিধা-বিভক্ত ছিল এবং জমিদার, বড়লোক, মালিক, ব্যবসায়ী

১। রবার্ট মারফি—পৃষ্ঠা ১২৮।

ও প্রশাসক শ্রেণী স্ব স্ব স্বার্থের কারণে ও ভিসি সরকারের প্রতি আনুগত্যের জন্য অভিযাত্রীদের বিরোধী ছিল। তবু তারা শেষ পর্যন্ত এটাকে প্রায় নিয়তির বিধানের মতই মানিয়া নিল।

তথাপি প্রশ্ন থাকিয়া গেল। সারা উত্তর আফ্রিকা জুড়িয়া ১৪ ডিভিসন ফরাসী সৈন্য অটুট ছিল এবং যদিও তাদের অস্ত্রসজ্জা ও নৈতিক বল (ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের জন্য) ভালো ছিল না, তবু এই আক্রমণ উপলক্ষে তারা যে কোন গোলমাল বাধাইবে না, এমন গ্যারেণ্টি ছিল না। দ্বিতীয়তঃ ফরাসী সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারা সকলেই কি এই ইঙ্গ-মার্কিন অভিযানকে বিনা প্রতিবাদে ও নিঃশব্দে মানিয়া নিবেন কিংবা তাঁদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ সংগঠিত হইবে ?—এই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এমন কি মিত্রপক্ষের নিকট অতিশয় উদ্বেগজনক ছিল। কারণ, সেই ক্ষেত্রে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের অস্ত্র ধারণ করিতে হইত। এই মর্মান্তিক সম্ভাবনা দূর করার জন্যই মিত্রপক্ষের রাজনৈতিক ভূমিকা অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছিল।

* * *

১৯৪০-৪২ সালে ভিসিতে ও উত্তর আফ্রিকায় মার্কিন দূত রবার্ট মারফির কূটনৈতিক ও গোপন কার্যাবলী কিংবা গোয়েন্দাগিরি ইঙ্গ-মার্কিন অভিযানে কাজে লাগিল। ফ্রান্সের আফ্রিকাস্থ সৈন্যবাহিনীর পক্ষ থেকে যাতে কোন বাধা না আসে এজন্য জেনারেল জিরোকে আগেই ভজানো হইয়াছিল। এক্ষণে অবতরণের পূর্বাহ্নে অভিযাত্রী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইজেনহাওয়ারের জিব্রাল্টারস্থিত সদর দপ্তরে (পাহাড়ের গুহায় পাথর কাটিয়া এই দপ্তর স্থাপিত হইয়াছিল) জিরোকে আনা হইল। কিন্তু জিরো আসিয়াই দাবী করিলেন যে, তাঁকে সমস্ত বৃটিশ-মার্কিন অভিযাত্রী বাহিনীর প্রধান অধিনায়কের পদে নিয়োগ করিতে হইবে, অন্যথা ফরাসী সেনাপতিরা ফরাসী রাজ্যে ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণ বরদাস্ত করিবেন না। বলা বাহুল্য যে, একথা শুনিয়া আইজেনহাওয়ারের চক্ষু চড়কগাছ, এবং জিরোকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। ৯ই নভেম্বর জিরোকে বিমানযোগে আলজিয়ার্সে আনা হইল —ফরাসী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা আপোষ রফার ফর্মুলা আবিষ্কারের আশায়। কিন্তু মিত্রপক্ষ জিরোকে উপেক্ষা করিলেন। তখন জেনারেল জিরোর বদলে এডমিরাল দারলাঁর ডাক পড়িল।

এখানে বিশেভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, ফ্রী ফ্রান্সের নেতা জেনারেল চার্লস দ্য গলকে বৃটিশ ও মার্কিন উভয় পক্ষই সম্পূর্ণ এড়াইয়া গিয়া এবং তাঁকে কোন কিছু না জানাইয়া অপারেশন টর্চের এই অভিযান শুরু করিয়াছিলেন। দ্য গলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, তাঁর 'লণ্ডনের আড্ডা'কে বিশ্বাস করা যায় না। কেননা, তাঁর ওই আড্ডা থেকে গোপনীয় সংবাদ পাচার হইয়া যাওয়াতেই ডাকার আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল এবং সেখানকার ফরাসীরা ইংরাজদের তীব্রভাবে বাধা দিয়াছিল।

রবার্ট মারফি লিখিয়াছেন যে, আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক ওয়ালটার লিপম্যানের নেতৃত্বে কয়েকজন প্রভাবশালী মার্কিন সমালোচক গত দুই বছর ধরিয়া প্রেসিডেণ্ট এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের নিকট তীব্র চাপ সৃষ্টি করিতেছিলেন জেনারেল দ্য গলের আন্দোলনকেই ফরাসী জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলন হিসাবে মানিয়া লওয়ার জন্য। সুতরাং এই সমস্ত প্রখ্যাত সাংবাদিক

আমেরিকার সঙ্গে ভিসিস্থিত ফরাসী সরকারের সম্পর্ককে ক্রমাগত তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু রুজভেল্ট এবং চার্চিল উভয়েই একমত ছিলেন যে, দ্য গলকে কিছুতেই আফ্রিকার অভিযান সম্পর্কে কোনো সংবাদ দেওয়া হইবে না। কেননা, তাঁদের অভিযোগ এই যে, দ্য গলের লণ্ডনস্থিত সদর দপ্তর থেকে গোপনীয় সংবাদ ফাঁস হইয়া যায়।'

অতএব দ্য গলের বদলে অন্য কোন শক্তিশালী ফরাসী নেতাকে খাড়া করিতে গিয়াই ওয়েগাঁ, জিরো এবং দারলাঁ পর পর এই তিনজনের উপর নেকনজর পড়িয়াছিল। অবশ্য এই রাজনৈতিক মহড়ার পিছনে বৃটিশ ও মার্কিন স্ব স্ব কূটনৈতিক উদ্দেশ্যেরও খেলা ছিল—যদি দ্য গলের মত উগ্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেশপ্রেমিককেও এড়াইয়া কোন বশংবদ নেতাকে পাওয়া যায়, তবে ফরাসী সাম্রাজ্যে ও উপনিবেশের উপর বৃটেনের কিংবা আমেরিকার মাতব্বরি খাটাইবার সুযোগ পাওয়া যাইবে। এই কূটনৈতিক প্যাঁচ খাটাইতে গিয়াই ফরাসী রাজনীতির আবর্তে মিত্রশক্তিকে জড়াইয়া পড়িতে হইল। কারণ—ওয়েগাঁ, জিরো ও দারলাঁ এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন মনে মনে ফ্যাসিজমের পক্ষপাতী। বিশেষতঃ নৌ-সেনাপতি দারলাঁ কেবল ভয়ানক রকমের বৃটিশ বিরোধীই ছিলেন না, হিটলারী জার্মানীর একজন 'কুখ্যাত' দালালরূপেও পরিচিত ছিলেন। অথচ ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ এড়াইতে গিয়া মিত্রপক্ষ রবার্ট মারফির গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে এই ব্যক্তিকেই হাত করিলেন। অবশ্য একথাও সত্য যে, এডমিরাল দারলাঁ খুব দক্ষ নৌসেনানী ছিলেন। আধুনিক ফরাসী নৌবহরের তিনিই ছিলেন জন্মদাতা ও সংগঠক এবং সমস্ত নৌবাহিনীর উপর তাঁর প্রবল আধিপত্য ছিল। সরকারীভাবে তিনি ছিলেন সমগ্র ফরাসী জল-স্থল-বিমান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। সুতরাং দারলাঁকে এড়াইয়া 'বিনা যুদ্ধে' ফরাসী সাম্রাজ্য হাত করাও ইঙ্গ-মার্কিনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অধিকন্তু দারলাঁ ছিলেন বৃদ্ধ মার্শাল পেতাঁর রাষ্ট্রপ্রধান পদের ঘোষিত উত্তরাধিকারী। সুতরাং কার্যতঃ দারলাঁর হাতেই ছিল আফ্রিকান ফরাসী রাজ্যের 'সরকারী' চাবিকাঠি।

কিন্তু দারলাঁকে নিয়াই চূড়ান্ত রাজনৈতিক কেলেঙ্কারী এবং তিক্ততম বিতর্কের সৃষ্টি হইল। এই বিতর্কের প্রথম সূত্রপাত হইল ৭ই নভেম্বর রাত্রে (মিত্র বাহিনীর অবতরণের সন্ধিক্ষণে) আলজিয়ার্সে দারলাঁর আকস্মিক উপস্থিতির ঘটনা নিয়া। কিন্তু সেই সময় দারলাঁর একমাত্র শিশুপুত্র পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া আলজিয়ার্সে মরণাপন্ন ছিল এবং দারলাঁ এই পুত্রের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। অতএব সেখানে তাঁর উপস্থিতি অস্বাভাবিক ছিল না—যদিও যোগাযোগটা সন্দেহজনক ছিল। অধিকন্তু যদিও দারলাঁ একান্তরূপে বৃটিশ বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তিনি আমেরিকানদের পক্ষপাতী ছিলেন এবং উত্তর আফ্রিকায় তিনি মার্কিন-ফরাসী যুগ্ম অভিযানের জন্যও ইচ্ছুক ছিলেন। সুতরাং রবার্ট মারফির সঙ্গে আগে থেকেই কথাবার্তা অনুসারে দারলাঁ মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং ৮ই ও ৯ই নভেম্বর দারলাঁ নির্দেশ জারি করিলেন, ফরাসী বাহিনীকে যুদ্ধে ক্ষান্ত দেওয়ার জন্য।

দারলাঁকে দিয়া এভাবে কার্যোদ্ধার করাইবার ফলে বৃটেন, আমেরিকার এবং প্রায় সর্বত্র উদারনৈতিক মহলে তীব্র সমালোচনার উদ্রেক করিল। জেনারেল আইজেনহাওয়ার

১। রবার্ট মারফি—পৃষ্ঠা ১৩৩।

এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বিশেষভাবে আক্রমণের লক্ষ্য হইলেন। অতলান্তিকের এপারে-ওপারে যে সমস্ত সমালোচনা ধ্বনিত হইল, তার সারমর্ম এই :

'If we will make a deal with a Darlan in French territory, then presumably we will make one with a Goering in Germany or with a Matsuoka in Japan."

অর্থাৎ যদি আমরা ফরাসী রাজ্যে একজন দারলাঁর সঙ্গে লেনদেন করিতে পারি, তবে জার্মানীতে একজন গোয়েরিংয়ের সঙ্গে এবং জাপানে একজন মাৎসুয়োকার সঙ্গেই বা লেনদেন করিতে পারিব না কেন ?[১]

বলাই বাহুল্য যে, দারলাঁকে দিয়া উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় জেনারেল আইজেন-হাওয়ার কর্তৃক এই রাজনৈতিক কার্যোদ্ধারের চেষ্টা রুজভেল্টের পুরাপুরি সমর্থন লাভ করিল এবং তিনি এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে এটা সমর্থন করিলেন, যদিও তিনি আইজেনহাওয়ারকে এক বিশেষ বার্তায় জানাইলেন—'আমরা দারলাঁকে বিশ্বাস করি না' এবং 'দারলাঁর মত একজন হিটলারী দালালকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজে লাগাইতেও চাই না।'

এদিকে স্ট্যালিনও চার্চিলের নিকট এক বার্তায় দারলাঁর ব্যাপারে মিত্রপক্ষকে সমর্থন করিলেন—

"It seems to me that the Americans used Darlan not badly in order to facilitate the occupation of Northern and Western Africa. The military diplomacy must be able to use for military purposes not only Darlan but, 'Even the Devil himself and his grand ma."

সংক্ষেপে—'সামরিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দরকার হইলে কেবল দারলাঁকে নয়, শয়তানকে এবং তার ঠাকুরমাকেও ব্যবহার করিতে হইবে।'[২]

স্ট্যালিন তাঁর তারবার্তায় কোন ঘোরপ্যাঁচ করেন নাই। সোজাসুজিই বলিয়াছেন যে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় সামরিক কূটনীতির সাফল্য লাভের জন্য দারলাঁকে ব্যবহার করিয়া আমেরিকা কোন খারাপ কাজ করেন নাই। পুরাতন রাশিয়ার একটি প্রবাদবাক্যে আছে যে, কার্যোদ্ধারের জন্য শয়তানের ঠাকুরমাকেও খোসামোদ করা যাইতে পারে।

কিন্তু চার্চিল এই বিষয়ে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, তা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচায়ক। তিনি গোড়াতে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের নিকট যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, সেটা মার্কিন সেনাপতি তাঁর পুস্তকে ('ক্রুসেড ইন ইউরোপ') . . করিয়াছেন-

"If I could meet Darlan, much as I hate him, I would cheerfully crawl in my hands and knees for a mile if by doing so, I could get him to bring that fleet of his into the circle of Allied Forces."

অর্থাৎ 'যদিও আমি দারলাঁকে খুব ঘৃণা করি, তবু আমি হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে মাইলখানেক গিয়েও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজী আছি, যদি এর ফলে তাঁর নৌবহরগুলি মিত্রপক্ষের দলে পাই।'[৩]

১। Robert E. Sherwood—P. 651.

২। ঐ পুস্তক—পৃষ্ঠা ৬৫১।

৩। রবার্ট মার্ফি—পৃষ্ঠা ১৫২।

আর জেনারেল আইজেনহাওয়ার মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি উত্তর আফ্রিকায় 'এক বিপজ্জনক রাজনৈতিক সমুদ্রে পড়িয়াছেন', 'যেখানে সামরিক নৈপুণ্যে ও কৃতিত্বে সামান্যই পথ দেখাইতে পারিবে।'[১]

এ জন্যই ফরাসী আফ্রিকার প্রধান সেনাপতি দারলাঁকে কাজে লাগাইতে চাহিয়াছিলেন ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর প্রধান আইজেনহাওয়ার এবং যদিও চার্চিল দারলাঁর ব্যাপারে আইজেনহাওয়ারের উদ্দেশ্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট সমর্থন জানাইয়াছিলেন, তবু 'উত্তর আফ্রিকার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাবলীতে' এবং 'ইউরোপের মহান ত্রাণকর্তারূপে আমেরিকার আকস্মিক ভূমিকায়' ইংরাজরা মার্কিন মাতব্বরিতে আদৌ প্রসন্ন ছিলেন না—এ কথা লিখিয়াছেন বিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক রবার্ট ই. শেরউড। এই প্রসঙ্গে কমন্স সভায় চার্চিলের তাৎপর্যপূর্ণ বক্তৃতার ইঙ্গিতটুকুও তিনি দিয়াছেন। কারণ, চার্চিল তাঁর বক্তৃতায় পরিষ্কার বলিয়াছিলেন, 'সামরিক বা রাজনৈতিক কোন ভাবেই উত্তর আফ্রিকার ঘটনাবলীর উপর আমরা কোন নিয়ন্ত্রণ খাটাইতেছি না।' অবশ্য দারলাঁর সঙ্গে আমেরিকার দহরম-মহরমের কথা চার্চিল আগে জানিতেন না, একথাও তিনি পরবর্তীকালে শেরউডকে জানাইয়াছিলেন।[২]

বলাই বাহুল্য যে, দারলাঁ সম্পর্কে মিত্রপক্ষের নেতৃবৃন্দের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং দারলাঁ তিক্তভাবে মন্তব্য করিয়াছিলেন—

"I am only a lemon which the Americans will drop after they have squeezed it dry !"

অর্থাৎ 'আমার অবস্থা নেবুর মত। আমেরিকানরা এটা নিংড়িয়ে রস বের করে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিবেন !'[৩]

দারলাঁর পরিণতি অবশ্য রস নিংড়ানো নেবুর চেয়েও মর্মান্তিক ও ভয়াবহ হইয়াছিল। কারণ, দার্লাঁকে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। ২৪শে ডিসেম্বর আলজিয়ার্সে তিনি যখন তাঁর দপ্তরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, তখন হঠাৎ একজন যুবক তাঁকে গুলি করিয়া হত্যা করে। এই হত্যার রহস্য আজও জানা যায় নাই, তবে আততায়ী একজন ভিসি বিরোধী রাজতন্ত্রবাদী ছিলেন এবং তাঁকে সঙ্গে সঙ্গেই তথাকথিত সামরিক বিচারের পর 'কোতল' করা হইয়াছিল। এত তাড়াতাড়ি তাঁকে 'কোতল' করাও এক রহস্যজনক ব্যাপার। আরও অদ্ভুত এই যে, স্বয়ং দারলাঁ নিজে তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কা করিতেছিলেন। তাঁর হত্যাকাণ্ডের মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে রবার্ট মারফির সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়ার সময় দারলাঁ তাঁকে কথায় কথায় নিতান্ত নিরাসক্তভাবে বলিয়াছিলেন—'জানেন, আমাকে খুন করার চারটা প্ল্যান রয়েছে ?' এমন কি, তাঁর নিহত হওয়ার পর আফ্রিকার প্রধান সেনাপতি কে কে হইতে পারেন, তেমন কিছু নামের লিস্টসহ একটি কাগজের টুকরাও তিনি রবার্ট মারফিকে দেখাইয়াছিলেন। নিজের খুন হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি এমনভাবে আলোচনা করিতেছিলেন, যেন ব্যাপারটার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই ![৪]

১। রবার্ট মারফি—পৃষ্ঠা ১৩৬।
২। রুজভেল্ট এ্যান্ড হপকিন্স—পৃষ্ঠা ৬২২।
৩। ঐ পুস্তক,—পৃষ্ঠা ৬৫৪।
৪। Robert Murphy. P. 181.

দারলাঁর এমন মর্মান্তিক পরিণতি ঘটিয়া থাকিলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁর জন্যই মিত্রপক্ষ এত সহজে এবং প্রায় বিনা যুদ্ধে ফরাসী উত্তর আফ্রিকা দখলে আনিতে পারিয়াছিলেন এবং তিনি নিজে একজন দক্ষ সামরিক পুরুষ ছিলেন। মার্কিন ইতিহাসকারগণ লিখিয়াছেন যে, দারলাঁ যে সমস্ত কার্য করিয়াছেন, সেগুলির পিছনে মার্শাল পেতাঁরই অনুমোদন ও ইচ্ছা ছিল।

দারলাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুর পর জেনারেল জিরোকে আলজিয়ার্সের ফরাসী কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ তাঁর শূন্য পদে নিয়োগ করিলেন। কিন্তু তার অনেক আগেই, অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিন অভিযাত্রী বাহিনীর উত্তর আফ্রিকায় অবতরণের মুহূর্তেই ভিসি সরকার আমেরিকার সহিত কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন।

আর হিটলার ১১ই নভেম্বর তারিখ প্রতিশোধ নিলেন সমগ্র অনধিকৃত ফ্রান্স দ্রুত দখলের দ্বারা এবং মিত্রপক্ষকে আফ্রিকায় বাধাদানের জন্য তিউনিসিয়ায় নূতন সৈন্য প্রেরণের দ্বারা;

কিন্তু ভাগ্যক্রমে ফরাসী নৌবহর হিটলারের হাতে পড়িল না। টুলোঁ বন্দরের ফরাসী নাবিকেরা দেশপ্রেমের আশ্চর্য দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। তাঁরা ষাটটি যুদ্ধ জাহাজ নিজেরাই ধ্বংস করিয়া দিলেন।

এদিকে মিত্রপক্ষ এক 'প্রকাণ্ড জয়' অর্জন করিলেন। বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, মাত্র চার দিনের মধ্যে মিত্রপক্ষ উত্তর আফ্রিকার দেড় হাজার মাইল দীর্ঘ বিশাল ভূমি দখল করিলেন। আর এই সুবৃহৎ অঞ্চল দখল করিতে গিয়া তাঁদের মাত্র ৮৬০ জন সৈন্য নিহত বা নিখোঁজ হইল, আর আহত হইল মাত্র ১০৫০ জন সৈন্য।

অপারেশন টর্চের এই অপ্রত্যাশিত সাফল্যে চার্চিল তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি উচ্চারণ করিলেন:

"This not the end. This is not even the beginning of the end. But it is perhaps, the end of the beginning!"[২]

'এখানেই শেষ নয়। এমন কি এটা শেষেরও আরম্ভ নয়। কিন্তু সম্ভবতঃ এটা আরম্ভের শেষ!'

যদিও উত্তর আফ্রিকার পুনরুদ্ধার যুদ্ধের কোন চূড়ান্ত পর্ব ছিল না, তবু একথা সত্যি যে, এক দিকে স্ট্যালিনগ্রাদ এবং অন্য দিকে আলামিন ও উত্তর আফ্রিকার জয় হিটলারী পতনের আরম্ভকে পূর্ণতা বিধান (দি এণ্ড অব্ দি বিগিনিং) করিতেছিল। সেখানেই এই জয়ের গভীর সার্থকতা ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্যাসাব্লাঙ্কা : নিঃসর্ত আত্মসমর্পণের দাবী

দ্য গলের কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠা

আফ্রিকার অপারেশন 'টর্চের' সাফল্যের জন্য স্ট্যালিন ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষকে অভিনন্দন-জ্ঞাপক তারবার্তা পাঠাইলেন বটে, কিন্তু ইঙ্গিতে একথাও স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, উত্তর আফ্রিকার এই সাফল্য ইউরোপীয় দ্বিতীয় রণাঙ্গন নয়।

'Allow me to express my confidence that the promises about the opening of the Second front in Europe given by you Mr President, and by Mr. Churchill in regard to 1942, and in any case in regard to the spring of 1943, will be fulfilled.'[১]

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট এই কটুস্বাদের টেলিগ্রামে স্ট্যালিন-চার্চিল ও রুজভেল্টকে ১৯৪২ সালের প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে দস্তুরমত খোঁচা দিলেন এবং কিঞ্চিৎ শ্লেষের সঙ্গে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, অন্ততঃ ১৯৪৩ সালের বসন্তকালে যেন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হয়।

স্ট্যালিনের এই কটুস্বাদের তারবার্তাটি মহাযুদ্ধের সময় প্রকাশ করা হয় নাই। কেননা, দ্বিতীয় রণাঙ্গন নিয়া কথাখেলাপের এই অপ্রিয় ব্যাপারটা তখন চাপিয়া যাওয়াই ইঙ্গ-মার্কিনের পক্ষে একমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ ছিল।

কিন্তু তখন স্ট্যালিনগ্রাদের দিকে যে ঐতিহাসিক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইতেছিল এবং লালফৌজের পালটা আক্রমণে হিটলারী বাহিনীর যে বিপদ দেখা দিয়াছিল, তার গুরুত্ব মিত্রপক্ষের উপলব্ধির বাইরে ছিল না। তাঁরা অনুভব করিতেছিলেন যে, পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধ ক্রমশঃ চরম পর্যায়ের দিকে যাইতেছে। এই অবস্থায় ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নূতন করিয়া পর্যালোচনা দরকার। কিন্তু 'নেকস্ট ওয়ার মুভ' বা পরবর্তী যুদ্ধযাত্রা স্থির করার জন্য চাই স্ট্যালিনের সঙ্গে পরামর্শ। চার্চিল ও রুজভেল্ট উভয়েই একমত ছিলেন যে, স্ট্যালিনের সঙ্গে পর্যালোচনা ও পরামর্শ ছাড়া যুদ্ধের পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করা যাইবে না। এজন্য প্রেসিডেণ্ট বিশেষভাবে পত্র দিলেন এবং দুই বার স্ট্যালিনকে জরুরী তাগাদা দিলেন, কোথাও তিন প্রধানের একত্র মিলিবার জন্য। কিন্তু তখন স্ট্যালিনগ্রাদে গুরুতর যুদ্ধ চলিতেছিল এবং সুপ্রীম কম্যাণ্ডার হিসাবে স্ট্যালিন নিজেই সেই যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিলেন। সুতরাং এই সময় রুজভেল্ট ও চার্চিলের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার বাইরে কোথাও বৈঠকে যোগ দিতে স্ট্যালিন তাঁর অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন।

তখন ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪২, স্থির হইল যে, উত্তর আফ্রিকায় মরক্কোর ক্যাসাব্লাঙ্কা শহরে চার্চিল ও রুজভেল্ট পরামর্শ বৈঠকে একত্র মিলিত হইবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এডমিরাল দারলার আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের জন্য এই বৈঠক ১৪ই জানুয়ারীর আগে

১। Diplomat Among Warriors—Robert Murphy—P. 205.

অনুষ্ঠিত হইতে পারিল না। ১৪ই থেকে ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৪৩, দশ-এগারো দিন ধরিয়া ক্যাসাব্লাংকায় চার্চিল ও রুজভেল্টের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদিও এই বৈঠক মূলতঃ ছিল সামরিক, তবু ফরাসী ও ইউরোপীয় রাজনীতির সঙ্গে এই বৈঠক গভীরভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং এই বৈঠকের মূল সিদ্ধান্তগুলি মহাযুদ্ধের পরবর্তী আমেরিকার ইউরোপীয় সম্পর্ককে পর্যন্ত প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।[১]

কিন্তু স্ট্যালিন এই বৈঠকে যোগ দিতে না পারায় রুজভেল্ট ক্যাসাব্লাংকা বৈঠককে একমাত্র সামরিক বিষয়ের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে চাহিলেন। সুতরাং এই বৈঠকে তিনি চার্চিলের অনুরোধ সত্ত্বেও বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইডেন কিম্বা মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্ডেল হালের যোগদানের প্রশ্ন বাতিল করিয়া দিলেন।[২]

কিন্তু এই বৈঠকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পটভূমিকা যেমন নাটকীয় ছিল তেমনি আজগুবী ছিল এখানকার নিরাপত্তার বিধান। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ ও আর্মি ক্যাসাব্লাংকা বৈঠকে রুজভেল্টের সশরীরে উপস্থিতি পছন্দ করিতেছিলেন না। কারণ অঞ্চলটায় ফ্যাসিস্ট পঞ্চম বাহিনীর কার্যকলাপ বেশ জোরদার ছিল এবং জার্মান বোমারুগুলি কখনও কখনও এখানে হানাও দিতেছিল। অতএব খাস কাসাব্লাংকা শহরকে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ রুজভেল্টের পক্ষে নিরাপদ মনে করিলেন না। কিন্তু শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে একটি গোলাকার টিলার উপর 'আনফা' নামে যে আধুনিক হোটেল এবং উহার চারদিকে যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর ভিলা ছিল, সেই এলাকাটিকেই অধিকতর নিরাপদ বলিয়া বিবেচনা করা হইল এবং সেগুলিই মান্যবর অতিথিদের অবস্থানের জন্য নির্দিষ্ট হইল। এখানকার উদার আকাশ, নীল সমুদ্রতরঙ্গ, লাল কাঁকরের প্রশস্ত পথে পাম গাছের সারি, আর পিছনের পটভূমিকায় ক্যাসাব্লাংকা শহরের সাদা রঙের বাড়ীগুলি এমন এক মনোহর ও রোমাঞ্চকর দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল যে, স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট হোয়াইট হাউসের গুরুভার কর্ম থেকে মুক্তি পাইয়া যেন স্কুলপালানো বালকের মত ছুটি উপভোগ করিতেছিলেন। তাঁর এই ছুটির মেজাজের জন্যই কতকগুলি গুরুতর 'জটিল সমস্যা নিয়াও' তিনি যেন 'ছেলেমানুষের মত আচরণ' করিতেছিলেন![৩]

তিনি সম্মেলনে বার বার তাঁর খুশীর মেজাজ প্রকাশ করিতেছিলেন।

কিন্তু নিরাপত্তার ব্যবস্থা এত কঠোর ছিল যে, মনে হইতেছিল রুজভেল্ট যেন একটি জেলখানায় আছেন। আসলে জেলখানার চেয়েও কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। সমগ্র এলাকাটি পর-পর তিনসারি বেড়া দিয়া ঘেরাও করা হইয়াছিল এবং দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া মিলিটারী পুলিশ সশস্ত্র পাহারা দিতেছিল। আর যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি এখানে যাতায়াত করিতেন, তাঁদের প্রত্যেকের জন্য কয়েক ঘণ্টা পর পর নূতন পাশ (অনুমতিপত্র) বিলি করা হইত। নিরাপত্তার খাতিরে মরক্কো দেশীয় কোন ভৃত্যকেই বিশ্বাস করা হইত না। এদের বাদ দিয়া সম্পূর্ণরূপে মার্কিন বা বৃটিশ সৈন্য নিয়োগ করা হইল। কারণ, এই জাঁক-জমকপূর্ণ 'বন্দীশালা'র মধ্যে

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা—২০৭।
২। রবার্ট ই শেরউড, পৃষ্ঠা—৬৬২।
৩। রবার্ট মার্ফি—পৃষ্ঠা ২০৮।

যাঁরা অবস্থান করিতেন, তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব দিক থেকে উচ্চতম পদের ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

এই অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে শহরবাসীর এই বিচিত্র বিলাসবহুল হোটেলের সুবৃহৎ ভোজন কক্ষে এবং রুজভেল্টের প্রাসাদোপম ভিলাতে একই সঙ্গে দুটি বৃহৎ বিশ্ব-সমস্যার আলোচনা অনুষ্ঠিত হইতেছিল। একটি কক্ষে মার্কিন ও বৃটিশ শীর্ষস্থানীয় রণনেতাগণ পৃথিবীব্যাপী সামরিক সমস্যা ও রণনীতি নিয়া তর্ক-বিতর্ক করিতেছিলেন। আর রুজভেল্টের কক্ষে স্বয়ং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে চলিতেছিল ফরাসী রাজনীতির জটিল গ্রন্থিমোচনের চেষ্টা—এই চেষ্টার গোড়ায় ছিল জেনারেল জিরোর সঙ্গে পরামর্শ এবং তারপর তার সঙ্গে যুক্ত হইল জেনারেল দ্য গলের নাটকীয় আবির্ভাব।[১]

জেনারেল জর্জ মার্শাল, লেঃ জেনারেল ডুইট আইজেনহাওয়ার, এ্যাডমিরাল উইলিয়াম লীহাই, এ্যাডমিরাল আর্নেস্ট কিং, লেঃ জেনারেল আর্নল্ড, লেঃ জেনারেল সমারভেল এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা হ্যারী হপকিন্স ও অ্যাভেরিল হ্যারিম্যান প্রমুখ নামকরা মার্কিন নেতারা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। আর বৃটিশ পক্ষে ছিলেন নৌবহরের সর্বোচ্চ নায়ক এ্যাডমিরাল স্যার ডাডলী পাউণ্ড, ফিল্ড মার্শাল স্যার জন ডিল, জেনারেল স্যার এ্যালান ব্রুক, এয়ার চীফ মার্শাল স্যার চার্লস পোরট্যাল, ভাইস এ্যাডমিরাল লর্ড লুই মাউণ্ট-ব্যাটেন এবং মেজর জেনারেল স্যার হ্যাস্টিংস ইজমে।*

সুতরাং বৃটিশ-মার্কিন দু-দিক থেকেই এই শীর্ষসম্মেলন জমাটি ছিল। কিন্তু আমেরিকানদের চেয়ে বৃটিশরা অনেক বেশী পাকাপোক্ত ও অনেক বেশী প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। কারণ, আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতি নিয়া দুই পক্ষের মধ্যে যে প্রবল মতভেদ ছিল, তা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরকে আমেরিকান জেনারেল স্টাফ একটা 'সাময়িক ব্যাপার' বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা ভাবিয়াছিলেন যে, এই অঞ্চলকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অক্ষশক্তিবর্গের কবলমুক্ত করার পর তাঁরা দ্রুত ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবেন এবং সেখান থেকে ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া ইউরোপীয় ভূখণ্ড আক্রমণের জন্য তোড়জোড় করিবেন। আর আমেরিকার স্বার্থের দিক থেকে তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল জাপানকে আঘাত করা। সুতরাং আমেরিকান নেভী প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের এলাকাকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য ব্যস্ত ছিল। সোজা কথায় বলা যায় যে, আমেরিকান স্থলবাহিনীর প্রথম লক্ষ্য ছিল ইউরোপ, আর আমেরিকান নৌবাহিনীর প্রথম লক্ষ্য ছিল জাপান। কিন্তু বৃটিশ সামরিক লক্ষ্যের সঙ্গে এর মিল ছিল না। ইংরাজদের কাছে ভূমধ্যসাগর ছিল সাম্রাজ্যের প্রাণ-প্রবাহের মত এবং সাম্রাজ্য ছাড়া বৃটেনের গৌরব ও প্রতিপত্তি কতটুকু? অতএব অন্যান্য সমস্ত রণাঙ্গনে যাহাই ঘটুক না কেন, ভূমধ্যসাগর, মিশর সুয়েজ খাল রক্ষার জন্য ইংরাজরা প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় ইংরাজ ও আমেরিকানরা একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া অভিযানে নামেন নাই—বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষাই ছিল ইংরাজদের পক্ষে সবচেয়ে কড়া কথা।

১। রবার্ট মারফি—পৃষ্ঠা ২০৮।

* শেষোক্ত দুই ব্যক্তি (মাউণ্টব্যাটেন ও ইজমে) ১৯৪৭ সালে ভারতের পার্টিশানের সময় প্রায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন।

চার্চিল ছিলেন অত্যন্ত কৌশলী সুতরাং তিনি ক্যাসাব্লাংকা সামরিক সম্মেলনে বসিবার আগে তাঁর সেনানীমণ্ডলীকে সতর্ক করিয়া দিলেন—যেন আমেরিকানদের সঙ্গে মতভেদ নিয়া কোনমতেই বাড়াবাড়ি করা না হয়, যেন ধৈর্যসহকারে কমপ্রোমাইজ বা দুই পক্ষের অভিমতের মধ্যে আপোষরফার চেষ্টা করা হয় এবং বৃটিশ পক্ষের মতামত যেন জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা না হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যিক সেনানীমণ্ডলীর বড় কর্তা ফিল্ড মার্শাল লর্ড এ্যালান ব্রুকের 'টার্ন অব দি টাইড্'—(১৯৫৭) নামক ডায়েরী পুস্তকে দেখাযায় ক্যাসাব্লাংকায় বৃটিশ পক্ষ আগে থেকেই কত সাবধানে ও কত কৌশল খাটাইয়া এই রণনৈতিক বিতর্কে যোগ দিয়াছিলেন এবং চার্চিল তাঁদের হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছিলেন যে, 'পাথরের উপর বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে' (the dropping of water on stone) যেমন দীর্ঘ সময় লাগে, তেমন ধৈর্যপূর্ণ কৌশল যেন আমেরিকানদের সম্পর্কে অবলম্বন করা হয়। তিনি নিজেও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে অনুরূপ নীতিই অবলম্বন করিবেন। বলাই বাহুল্য যে, চার্চিলের এই কৌশল খুব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।[১]

চার্চিলের ও বৃটিশ পক্ষ এই কৌশল খাটাইবার জন্য এতটা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন যে, যদিও রুজভেল্ট তাঁর দলবলের সংখ্যা ন্যূনতম রাখিয়াছিলেন, চার্চিল কিন্তু প্রচুর লোকজন এবং সেই সঙ্গে একটা ভাসমান রেফারেন্স লাইব্রেরি পর্যন্ত নিয়া আসিয়াছিলেন ঃ

'the British brought to Casablanca a six-thousand ton ship convetred into a reference library. It was crammed with all the essential files from the war office and had complete staff of file clerks. The outcome of such thoughtful preparation was inevtiable. The 'Compromise' was adapted.'[২]

অর্থাৎ বৃটিশ সমর দপ্তরের যাবতীয় প্রয়োজনীয় ফাইল ও কেরানীসহ একেবারে ৬ হাজার টনের জাহাজ ভর্তি গোটা রেফারেন্স লাইব্রেরি চার্চিল আনিয়াছিলেন তাঁর সঙ্গে। সুতরাং এমন প্রস্তুতির ফলে 'আপোষরফা'ও অনিবার্য ছিল।

বৃটিশ রণনৈতিক পরিকল্পনার মর্ম ছিল এই যে, ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে উত্তর আফ্রিকার অক্ষশক্তিবর্গের বাকী শক্তি নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর ভূমধ্যসাগরের পথ যখন মিত্রশক্তিবর্গের নৌবহরের নিকট উন্মুক্ত হইয়া যাইবে, তখন ইঙ্গ-মার্কিন সম্মিলিত পক্ষের জল-স্থল-বিমান শক্তি একত্রে আফ্রিকার ঘাঁটি থেকে হিটলারী ইউরোপের সবচেয়ে নরম অংশের উপর—দক্ষিণ দিক থেকে আঘাত হানবে।

এই প্রস্তাবিত আঘাত সবচেয়ে বেশী পড়িবে ইতালীর বিরুদ্ধে—যে ইতালীর নৈতিক শক্তি ইতিমধ্যেই ভাঙ্গিয়া পড়ার মুখে এবং এর ফলে বলকান অঞ্চলেও স্নায়বিক দৌর্বল্য ও উত্তেজনা দেখা দিবে এবং খুব সম্ভবত তুরস্কও মিত্রপক্ষের দলে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হইবে। সোভিয়েট রাশিয়াকে যতদূর সম্ভব সহায়তা দেওয়া হইবে জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্যাপকতম বোমারু অভিযান চালানো হইবে। তখন ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডে এক বিশাল ইংগ-মার্কিন বাহিনী গড়িয়া তোলা

১। রবার্ট মারফি—পৃষ্ঠা ২১০
২। ঐ পুস্তক—পৃষ্ঠা ২১১

হইবে, যারা ১৯৪৪ সালে ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া ইউরোপে আক্রমণ চালাইবে। আর দূর-প্রাচ্যে চেষ্টা করা হইবে চীনের সঙ্গে বর্মা রোডের সংযোগ পুনরায় খুলিবার জন্য এবং ইতিমধ্যে ন্যূনতম শক্তির সহায়তায় জাপানকে আটকাইয়া রাখার চেষ্টা করা হইবে।[২]

বৃটিশ পক্ষ এই রণনৈতিক পরিকল্পনাসহ একেবারে তৈয়ার হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমেরিকানদের এই ধরনের পূর্ব সংকল্পিত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। ফলে, আলোচনা বৈঠকে বৃটিশ ও মার্কিন সেনাপতিমণ্ডলী ও টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অত্যন্ত তিক্ত, তীব্র এবং সময় সময় খুব দীর্ঘ তর্কবিতর্কের ও মতবিরোধের অবতারণা হইয়াছিল। আমেরিকার পক্ষে এ্যাডমিরাল কিং ছিলেন খুব কড়া ধাতের নৌ-যোদ্ধা, তিনি এত কড়া ছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁর সম্পর্কে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন যে, 'কিং যেন তলোয়ার দিয়া দাড়ি চাঁচেন!'

এ্যাডমিরাল কিং জাপানের বিরুদ্ধে অবিলম্বেই সর্বাত্মক যুদ্ধ চালাইবার পক্ষপাতী ছিলেন এবং এজন্য তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, সমস্ত যুদ্ধ প্রচেষ্টার অন্তত শতকরা ৩০ ভাগ জাপানের বিরুদ্ধে এবং ৭০ ভাগ বাকী পৃথিবীর রণাঙ্গনে নিয়োগ করা হোক। কারণ, কিংয়ের কাছে ইউরোপীয় রণাঙ্গন যেন একটা বড় রকমের ন্যুইসেন্স বলিয়া মনে হইতেছিল।

বৃটিশ পক্ষের এয়ার চীফ মার্শাল স্যার চার্লস পোরটাল এ্যাডমিরাল কিংয়ের মনোভাব সম্পর্কে রসিকতা করিয়া মন্তব্য করিলেন—'ব্যাপারটা যেন এমন এক ধনী ব্যক্তির উইল সম্পাদন করার মত, যিনি তাঁর বিষয় সম্পত্তির বেশীর ভাগ তাঁর উপপত্নীকে দিয়া যাইতে চান, তবে স্বীয় পত্নীকেও কিছু না দিলে চলে না কিন্তু সমস্যা দাঁড়াইয়াছে স্বীয় পত্নীকে ভদ্রভাবে কত কম দিতে পারা যায়!'[৩]

এই সম্মেলনে আর একটা বিরোধের প্রশ্নও দেখা দিয়াছিল—ইতালীকে কোন্ দ্বীপ থেকে, সিসিলি না সার্দিনিয়া থেকে আক্রমণ করা হইবে? সেনাপতিদের এই বিতর্কের মীমাংসা করিয়া দিলেন স্বয়ং চার্চিল-রুজভেল্ট। তাঁরা সিসিলি দ্বীপ থেকেই ইতালীকে আক্রমণ করা শ্রেয় বলিয়া স্থির করিলেন। এই বৈঠকে উত্তর আফ্রিকায় উচ্চতর সৈনাপত্যে বা 'হায়ার কমাণ্ডে' মার্কিন সেনাপতিরাই (জেনারেল আইজেনহাওয়ার প্রধান সেনাপতি) বেশী সম্মানের পদ পাইলেন এবং বৃটিশ পক্ষ সেটা আপোষ-মীমাংসার খাতিরে মানিয়া নিলেন।

* * *

সাম্রাজ্যবাদের নেশা

ক্যাসাব্লাংকা সম্মেলনে অনেকগুলি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, যেগুলির মধ্যে প্রচুর নাটকীয়তাও ছিল। কেবল ইঙ্গ-মার্কিন রণনৈতিক আপোষ নাটকের অভিনয়ই বড় কথা ছিল না, ছিল ফরাসী সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ এবং জেনারেল জিরো ও জেনারেল দ্য গল নিয়া অতি নাটকীয়, এমন কি সময় সময় ট্র্যাজিডি-কমেডির অভিনয়। আর ছিল ক্যাসাব্লাংকা বৈঠক থেকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা—অক্ষশক্তিবর্গের নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবী।...

২। দি ওয়ার—লুই স্নাইডার, পৃষ্ঠা ৩৩৬
৩। লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৩৬৪

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে, হিটলারের হাতে পরাজিত ফ্রান্সের গণতন্ত্রবাদী নেতৃবৃন্দ যতই অক্ষশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত থাকুন না কেন, সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ সম্পর্কে কিন্তু তাঁরা যথেষ্ট গোঁড়া ছিলেন। অর্থাৎ এই বিষয়ে জেনারেল দ্য গল, জেনারেল জিরো, বা এ্যাডমিরাল দারলাঁ প্রমুখ নেতাদের নিজেদের মধ্যে বিশেষ কোন মতভেদ ছিল না। উপনিবেশগুলির মুক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদের অবসান হওয়া উচিত—অন্তত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এমন মনোভাবের পরিচয় দ্য গলের কাছেও পাওয়া যায় নাই। বরং সেই সময় তিনি সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেই চাহিয়াছিলেন—অবশ্য সাম্রাজ্যের ঘাঁটি থেকে ফরাসী মাতৃভূমির উদ্ধার চেষ্টায় তখন তার প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু নীতি ও মতাদর্শের দিক থেকে অন্তত তখন পর্যন্ত তিনি সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের বিরোধী ছিলেন না।

ইতিহাসের দিক থেকে বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতকে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ প্রায় গোটা আফ্রিকা মহাদেশের মালিক সাজিয়া বসিয়াছিল। ১৮৭৬-১৯০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ আফ্রিকা মহাদেশের এক-দশমাংশ ভূমি থেকে নয়-দশমাংশ ভূমি অর্থাৎ প্রায় সমস্তটাই দখল করিয়া নিয়াছিল। একমাত্র ফ্রান্সই ১৮৮৪-১৯০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে ৩৫,৮৩,৫৮০ বর্গমাইল জমি এবং ৩,৬৫,৫৩০০০ জনসংখ্যার মালিক হইয়া বসিল। (এই তথ্য এই গ্রন্থের গোড়াতেই উল্লেখ করা হইয়াছে।) এ ছাড়া ইন্দোচীনে, ভারতে এবং সারা পৃথিবীতেই ফ্রান্সের বহু ছোট-বড় উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য ছড়ানো ছিল। এই সাম্রাজ্যের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৫০ লক্ষ। (লণ্ডনের ডেলী টেলিগ্রাফ প্রকাশিত তথ্য।) সুতরাং এই বিশাল সাম্রাজ্য নিয়া সংঘাতও অনিবার্য ছিল।

রবার্ট মারফি লিখিয়াছেন যে, ফ্রান্সের কাছে সমুদ্র পারবর্তী সাম্রাজ্য নিদারুণ গোলমেলে ব্যাপার ছিল। বংশপরম্পরায় এটা বিস্ফোরণের মত অবস্থায় চলিয়া আসিতেছিল—

"No problem has been more disturbing to France that her overseas empire. This has been an explosive issue for generations—as it still is today..."

অতঃপর রবার্ট মারফি প্রথম মহাযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা শীর্ষস্থানীয় ফরাসী রাষ্ট্রনীতিবিদ জর্জ ক্লেমেশ্যঁর অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন :

'I have always been opposed to colonial ventures for France, and always will be. We can never be good colonists, and should not try. It was Bismarck who treacherously encouraged France to embark on schemes for colonial expansion knowing that they would weaken her. He it was who incited France to go into Tunisia. And it was Napoleon that evil genius of France who plunged France into adventures overseas and was responsible for the comparative weakness of his country.'[১]

'ফ্রান্স কর্তৃক দুঃসাহসিক ঔপনিবেশিক চেষ্টায় আমি সর্বদাই বিরোধীতা করিয়া

১। Diplomat Among Warriors—Robert Murphy, P. 212.

আসিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও করিব। আমরা কখনও ভালো ঔপনিবেশিক হইতে পারিব না এবং তেমন চেষ্টাও আমাদের করা উচিত নয়। ফ্রান্সকে দুর্বল করা হইবে জানিয়াও যিনি এই সমস্ত ঔপনিবেশিক রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনায় বিশ্বাসঘাতকের মত উৎসাহ দিয়া আসিতেছিলেন, তিনি হইতেছেন বিসমার্ক। ফ্রান্সকে টিউনিসিয়া অভিযানে তিনিই উস্কানি দিয়াছিলেন এবং নেপোলিয়ন ছিলেন ফ্রান্সের পক্ষে সেই দুষ্ট প্রতিভা যিনি ফ্রান্সকে সমুদ্র পারবর্তী দুঃসাহসিক অভিযানে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং এর দ্বারা তাঁর দেশকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল করার ব্যাপারে তিনিই দায়ী ছিলেন।'

সম্ভবতঃ ফরাসী রাষ্ট্রনীতিবিদ ক্লেমেঁশ্যর সাম্রাজ্য-বিরোধিতা যে মনোভাব থেকে, রুজভেল্টেরও তেমন মনোভাবই ছিল। কিন্তু রুজভেল্টের এই সাম্রাজ্য বিরোধিতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির সুযোগ ঘটিয়াছিল এই কারণে যে, তিনি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিজেকে ফ্রান্সের ভাগ্যনিয়ামকরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন এবং ফরাসী সাম্রাজ্য ও উপনিবেশগুলির বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্কেও চিন্তা করিতেছিলেন। এমন কি, তিনি রবার্ট মারফি, জেনারেল আইজেনহাওয়ার প্রমুখ বিশিষ্ট মার্কিন নেতাদের সঙ্গে আলোচনা পর্যন্ত করিয়াছিলেন কিভাবে ডাকার, ইন্দোচীন ও অন্যান্য ফরাসী উপনিবেশগুলির কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করা যাইতে পারে। ফরাসী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, ফরাসী আইন-কানুন পর্যন্ত পরিবর্তনের কথা তিনি ভাবিতেছিলেন। অথচ এই গুরুতর পদক্ষেপের কথা চিন্তা করিতে গিয়া তাঁর মনে একবারও উদয় হইল না যে, যাঁরা ফরাসী সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে চান, তাঁদের সঙ্গে এই নিয়া তুমুল সংঘর্ষ বাধিবে। কাজেও তা'ই ঘটিয়াছিল। কারণ, ফরাসী সাম্রাজ্য সম্পর্কে রুজভেল্টের ব্যক্তিগত নীতিও খুব পরিচ্ছন্ন ছিল না। এমন কি তিনি সুনির্দিষ্টভাবে মনঃস্থির করিতেও পারেন নাই। সবচেয়ে বড় কথা—যেকথা রবার্ট মারফি খুব জোরের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন—

"Roosevelt never could quite make up his mind whether we had 'occupied' or 'liberated' French Africa."[১]

অর্থাৎ ফরাসী সাম্রাজ্যকে 'দখল' করা হইল, কিম্বা 'মুক্ত' করা হইল, এটা রুজভেল্ট কখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

সম্ভবত এজন্যই রুজভেল্ট বার বার দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন যে, দ্য গল বা অন্য কাউকেই তিনি ফ্রান্সের ভাবী গভর্নমেণ্টরূপে স্বীকার করিতে রাজী নন, যুদ্ধ জয়ের পর ফরাসী জনগণ সেটা স্থির করিবেন। অথচ ফরাসী সাম্রাজ্যের সঙ্গে আমেরিকার অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রস্তাব প্রায় অর্থনৈতিক প্রভুত্বের সীমানায় গিয়া পেঁাছিতেছিল। একদিকে চার্চিল যখন সদর্পে ঘোষণা করিতেছিলেন যে, 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের কারবারে লালবাতি জ্বালাইবার জন্য তিনি সম্রাটের প্রধানমন্ত্রীর পদে বসেন নাই', অন্যদিকে তখন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ফরাসী সাম্রাজ্য নিয়া অত্যন্ত সংশয়াচ্ছন্ন মনোভাবের পরিচয় দিলেন—এই সাম্রাজ্য 'দখল' করা হইল, না 'মুক্ত' করা হইল, এমন গুরুতর বিষয়েও তিনি মনস্থির করিতে পারিলেন না। অথচ ব্যক্তিগতভাবে রুজভেল্ট নিশ্চয়ই চার্চিলের মত সাম্রাজ্যবিলাসী ছিলেন না, বরং তিনি সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের বিরোধীই ছিলেন।

১। Diplomat Among Warriors—Robert Murphy, P. 184.

তথাপি ভিসি ফ্রান্স, দ্য গল ও ফরাসী সাম্রাজ্য নিয়া রুজভেল্টের দোদুল্যমানতা ও দ্বিধাজড়িত নীতির জন্য আমেরিকার বিরুদ্ধে যে সমালোচনা ধ্বনিত হইয়াছিল, তার জন্য 'গণতন্ত্রবাদী' রুজভেল্টের ব্যক্তিগত দায়িত্বও কম ছিল না। সম্ভবত এই কারণেই সোভিয়েত পুস্তকে অভিযোগ করা হইয়াছে যে; উত্তর আফ্রিকার কাঁচামাল, শ্রমশিল্প ইত্যাদিসহ গোটা অর্থনৈতিক জীবন আমেরিকা তার নিজস্ব কবজায় আনিতে চাহিয়াছিল।[১]

* * *

ক্যাসারাঙ্কার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে চার্চিল, রুজভেল্ট এবং আইজেনহাওয়ার ফরাসী রাজনীতির জটিল প্যাঁচের মধ্যে জড়াইয়া পড়িলেন। দারলাঁ, জিরো ও দ্য গল পর পর এই তিন ফরাসী নেতাকে নিয়া এমন খেলা শুরু হইয়াছিল যে, বিরোধীপক্ষ, বিশেষভাবে শত্রুপক্ষ বিদ্রূপ করিতে লাগিল যে, "মিত্রপক্ষের প্রত্যেকের এক-একটি করিয়া 'পোষা' ফরাসী ভদ্রলোক আছেন" !—

"...that each Ally had its own 'pet Frenchman'—"[২]

এই অপবাদ দূর করার জন্য চার্চিল রুজভেল্টের নিকট তাগিদ দিতে লাগিলেন যে, জেনারেল জিরো ও জেনারেল দ্য গলের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা আপোষ-মীমাংসা করা দরকার। এজন্য ক্যাসারাঙ্কা সম্মেলন শুরু হওয়ার আগেই আলজিয়ার্সের ফ্রেঞ্চ ইম্পিরীয়েল কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থির হইল যে, জিরো ও দ্য গলকে যুগ্মভাবে ফরাসী আফ্রিকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে ফাইটিং ফ্রেঞ্চের নেতা জেনারেল দ্য গল প্রায় 'ফাইটিং মুড'-এ ঝড়ের মূর্তিতে আসিয়া হাজির হইলেন ক্যাসারাঙ্কায় ২২শে জানুয়ারী, ১৯৪৩। বলাই বাহুল্য যে, একদিকে মার্কিন পৃষ্ঠপোষিত জেনারেল হেনরী জিরো এবং অন্যদিকে বৃটিশ পৃষ্ঠপোষিত জেনারেল দ্য গল, এই দুই নেতৃত্বকে কেন্দ্র করিয়া ফরাসীদের মধ্যেও বিতণ্ডা দেখা দিয়াছিল এবং এই বিতণ্ডায় আবার প্ররোচনা দেওয়া হইতেছিল ইঙ্গ-মার্কিন দুই মহল থেকে। অথচ এই দুইয়ের মধ্যে আপোষ না হইলে উত্তর আফ্রিকার রাজনীতিতে ও রণনীতিতে আরও বিভ্রাট বাধিবার সম্ভাবনা। দ্য গলকে চার্চিল যতই 'বেয়াড়া মানুষ' বলিয়া মনে করুন না কেন, আসলে তাঁর অদম্য সাহস ও হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য তাঁর 'একগুঁয়েমী' তাঁকে ইংলণ্ডেও জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল এবং বৃটিশ ও মার্কিন সংবাদপত্রে তিনি সমর্থন পাইতেছিলেন। সুতরাং বৃটিশ পক্ষ অনুধাধন করিতেছিলেন যে দ্য গলকে বাদ দিয়া উত্তর আফ্রিকার সমস্যার কোন মীমাংসা করা যাইবে না। এত দিন পর্যন্ত দ্য গল এবং তাঁর লণ্ডন কমিটিকে সমর্থন করিয়া আসায় বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রেস্টিজের প্রশ্নও ছিল এবং সেই সঙ্গে আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—আর্থিক সাহায্য। চার্চিলের বিশেষ দূত হ্যারল্ড ম্যাকমিলান (যিনি ১৯৬১ সালে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন, আর দ্য গল হইয়াছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট) বলিয়াছেন যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ১৯৪০ সাল থেকে দ্য গলের পিছনে ৭০ মিলিয়ন পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছিলেন! এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের কথাও উপেক্ষা করার মত ছিল না।[৩]

১। British Foreign Policy During World War II, P. 292.

২। Sherwood - P. 655.

৩। রবার্ট মার্ফি—পৃষ্ঠা ২১৪।

সুতরাং দ্য গল ও জিরোর মধ্যে আপোষরফার ব্যাপারে বৃটেনের স্বার্থও কম ছিল না। কেননা, আলজিয়াসে'র ইম্পিরীয়েল কাউন্সিল ও লণ্ডনে দ্য গলের কমিটি উভয় সংগঠনের একত্র সংমিশ্রণ ঘটিলে বৃটেনের ঘাড় থেকে অন্তত দ্য গলকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার বোঝাটা নামিয়া যাইবে। এখানে মনে রাখা দরকার যে, আমেরিকায় ফ্রান্সের যে সোনা মজুত ছিল, সেটা মার্কিন গভর্নমেণ্ট আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফলে, এর কোন সুবিধা দ্য গলের লণ্ডন কমিটি পাইতেছিলেন না—বিশেষত দ্য গলকে মার্কিন সরকারী মহল আদৌ পছন্দও করিতেন না। অথচ দ্য গলের ব্যাপার নিয়া বৃটেন ও আমেরিকায় সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা হইতেছিল। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেণ্ট উভয়েই স্থির করিলেন যে, এর অবসান ঘটাইতে হইবে। উভয় ফরাসী নেতার মধ্যে 'মিলন' ঘটানো কিম্বা রুজভেল্টের ভাষায় উভয়ের 'জোরপূর্বক বিবাহ' দেওয়ার (শটগান ম্যারেজ) জন্য তোড়জোড় হইল—রুজভেল্টই এই ব্যাপারে উদ্যোগী হইলেন। তিনি খুশীর মেজাজে মন্তব্য করিলেন—

'My job was to produce the bride in the person of General Giraud while Churchill was to bring in General de Gaulle to play the role of bridegroom in a shotgun wedding.'

অতএব রুজভেল্ট কনেরূপী জিরোকে এবং চার্চিল বররূপী দ্য গলকে হাজির করাইবার জন্য তোড়জোড় করিলেন।

কিন্তু 'বর ও বধূর' অভ্যর্থনার জন্য যে তোড়জোড়ই করা হইল না কেন, 'বর' কিন্তু সহজে বাগ মানিলেন না। ক্যাসাব্লাঙ্কার উপকণ্ঠে আনদাতে জিরো ও দ্য গলের জন্য কিম্বা 'বিয়ের পার্টি'র জন্য একই ধরনের দুইটি ভিলা সংরক্ষিত রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে ঢুকিয়াই দ্য গলের মেজাজ বিগড়াইয়া গেল। কারণ, সর্বত্র এমন কড়া আমেরিকান ও বৃটিশ সশস্ত্র পাহারা যে, অতিথিদের আবাসগুলিকে বন্দীশালার মত মনে হইতেছিল। সুতরাং দ্য গল বিরক্তিতে ফাটিয়া পড়িলেন এবং জেনারেল জিরোর সঙ্গে দেখা হইতেই বলিয়া ফেলিলেন—'কাঁটা তারের বেড়ায় ঘেরা এই বন্দীশালার মধ্যে—পরের বাড়ীতে আমরা বিদেশী শক্তির মধ্যে কেন?'...

স্পষ্টতই দ্য গল ফরাসী আফ্রিকাকে নিজেদের দেশ বলিয়া এবং ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষকে 'বিদেশী' বলিয়া মনে করিতেছিলেন। এমন কি, রবার্ট মারফিকে তিনি তিরিক্ষি মেজাজে এমনও বলিয়াছিলেন যে, আগে জানিলে তিনি কখনও 'মার্কিন কাঁটাতার ও মার্কিন সঙ্গীনে ঘেরা' বাড়ীতে অবস্থান করিতে কখনও রাজী হইতেন না।...

সুতরাং বুঝা যাইতেছে দ্য গল চার্চিলের পীড়াপীড়িতে লণ্ডন থেকে ক্যাসাব্লাঙ্কাতে আসিতে বাধ্য হইলেও তিনি তাঁর নিজের কোট ছাড়িতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। বরং উত্তর আফ্রিকার ফরাসীদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা ঘটাইবার এই পরিকল্পনাকে তিনি চার্চিল-রুজভেল্ট ও তাঁদের এজেণ্টদের কারসাজি বলিয়া মনে করিলেন। অপর পক্ষে চার্চিল দ্য গলকে 'অদ্ভুতপূর্ব' ব্যক্তি বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কারণ, 'যাঁর চাল নাই, চুলো নাই যিনি নিজের দেশ থেকে নির্বাসিত, যাঁর মাথার উপর মৃত্যুদণ্ড ঝুলিতেছে এবং যিনি একমাত্র বৃটিশ সরকারের এবং ইদানীং আমেরিকার কৃপার উপর নির্ভরশীল, তাঁর এত দেমাক কেন? কেনই-বা তিনি সকলকে অগ্রাহ্য করিতেছেন?'—চার্চিলের মনোভাব ছিল এই।

অতএব ক্যাসাব্লাঙ্কায় চার্চিল রুজভেল্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনার সময় দ্য গল যখন চার্চিলকে বলিলেন যে, উত্তর আফ্রিকায় অবতরণের আগে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ছিল, চার্চিল তখন ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন এবং তাঁর মুখের উপর আঙ্গুল নাচাইয়া তাঁর 'অননুকরণীয়' ফরাসী ভাষায় চিৎকার করিয়া বলিলেন, 'জেনারেল, আপনার সোজা জানা উচিত যে, যুদ্ধজয়ের পথে আপনি এভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারেন না।'

কিন্তু দ্য গল চার্চিলের এই ক্রুদ্ধ মন্তব্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই তাঁর বক্তব্য বলিয়া গেলেন। অর্থাৎ চার্চিল ও রুজভেল্টের কোন পরিকল্পনাই দ্য গলকে টলাইতে পারিল না কিম্বা তাঁদের নিজেদের ইচ্ছামত দ্য গলকে দলেও টানিতে পারিলেন না।

এই সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী রবার্ট মারফি দ্য গলের কূটনৈতিক কৌশলের, তাঁর দৃঢ়তার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ক্যাসাব্লাংকাতে চার্চিল-রুজভেল্ট ফরাসী সমস্যার মীমাংসার উদ্দেশ্যে যে অভিনয়-মঞ্চই সাজাইয়া থাকুন না কেন, দ্য গল কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই আসরে প্রবেশ করিয়া পাকা খেলোয়াড়ের মত 'নিজের খেলা' দেখাইয়া চলিয়া গেলেন।

'This professional soldier, who never participated even in lanoitna politics before the war, now put on such a sparkling performance in international power politics that he took the star role away from the greatest English speaking politicians.'[১]

এই মন্তব্যের সোজা বাংলা এই যে, চার্চিল-রুজভেল্টের মত দুই শীর্ষ কূটনৈতিক নেতাও দ্য গলের কাছে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে হারিয়া গেলেন—যে দ্য গল একজন সৈনিক ছিলেন বটে, কিন্তু কোন দিন জাতীয় রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ করেন নাই।

দ্য গল ফ্রান্সের স্বাতন্ত্র্য ও গৌরবকে হারাইতে কখনও রাজী হন নাই। সুতরাং চার্চিল-রুজভেল্ট তাঁকে ফরাসী আফ্রিকায় সত্যকার ক্ষমতার আসন থেকে দূরে সরাইয়া রাখার জন্য নানা জোড়াতালির কৌশল খাটাইলেও দ্য গল সেই ফাঁদে ধরা দেন নাই। তাঁর এই একগুঁয়েমির জন্যই ক্যাসাব্লাংকা বৈঠকে তাঁকে কেন্দ্র করিয়া নানা মুখরোচক গল্পের প্রচার করা হইয়াছিল। যেমন, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্য গলের সাক্ষাতের সময় দ্য গল গর্বভরে নিজেকে ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা (প্রথম মহাযুদ্ধের) ক্লেমেঁশ'র সঙ্গে তুলনা দিয়াছিলেন। পরদিন আবার দ্বিতীয় সাক্ষাতের সময় দ্য গল নিজেকে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ বীরাঙ্গনা ও উপকথার নায়িকা জোয়ান অব আর্কের সঙ্গে তুলনা দিয়াছিলেন। তখন রুজভেল্ট নাকি বলিয়াছিলেন যে, তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না যে, দ্য গলকে তিনি কোন্ বীরত্বের পর্যায়ে ফেলিবেন—কারণ, দ্য গল তো আর একই সঙ্গে উক্ত দুজনের মত হইতে পারেন না। (যেহেতু একজন পুরুষ, অন্যজন নারী।)[২]

জিরো ও দ্য গলের মধ্যে 'মিলন' নিয়াও ক্যাসাব্লাংকাতে নানা ঠাট্টা-বিদ্রূপ শোনা গিয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও দুইয়ের মধ্যে সত্যকার মতের ও মনের মিলন ঘটে

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা ২১৯।
২। শেরউড—পৃষ্ঠা ৬৮৬।

নাই এবং দ্য গলকে আফ্রিকার আসল ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রাখাও যায় নাই। তবে, চার্চিল-রুজভেল্টের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া দ্য গল শেষ পর্যন্ত জেনারেল জিরোর সঙ্গে একটি যুগ্ম বিবৃতিতে স্বাক্ষর দিতে রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময় হঠাৎ রুজভেল্ট ফটো তুলিবার এক প্রস্তাব করেন। সেদিন ছিল ২৪শে জানুয়ারী ক্যাসারাংকা সম্মেলনের শেষ দিন। কিন্তু এত বড় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের সংবাদ সংবাদপত্রসমূহের নিকট আগে গোপন করিয়া রাখা হইয়াছিল। সুতরাং ওই দিন আলজিয়ার্স থেকে সামরিক সংবাদদাতা ও ফটোগ্রাফারগণকে বিমানযোগে আনিয়া হাজির করা হইল। কিন্তু তাঁরা চার্চিল-রুজভেল্টকে ওই অবস্থায় ওখানে দেখিয়া যেন নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না! তাঁদের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। অধিকন্তু প্রেসিডেণ্ট প্রস্তাব করিলেন যে, দ্য গল ও জিরো পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করুন এবং সেই অবস্থার ফটো তোলা হোক। মার্কিন ঐতিহাসিক শেরউড মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই ঘটনায় কে বেশী অবাক হইয়াছিলেন, দ্য গল, না বাকী তিনজন, (জিরো, চার্চিল ও রুজভেল্ট) বলা কঠিন।[১]

কিন্তু জিরো ও দ্য গলের মধ্যে এই বাহ্যিক মিলন ঘটাইতে পারিয়া চার্চিল-রুজভেল্ট কিন্তু ভারী খুশী হইয়াছিলেন। এমন কি, রুজভেল্ট মনে করিয়াছিলেন যে, উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী রাজনৈতিক দলাদলির প্যাঁচ খুলিয়া গেল এবং একটা মীমাংসা হইয়া গেল। কিন্তু রুজভেল্টের এই ধারণা ভুল ছিল। কারণ, আলজিয়ার্সের কমিটিতে দ্য গলের প্রতিনিধিদের ক্রমেই আধিপত্য ঘটিতে লাগিল এবং পাঁচ মাসের মধ্যেই জেনারেল জিরো পিছনে হটিয়া গিয়া সত্য সত্যই 'জিরোতে' (শূন্য) পরিণত হইলেন এবং ফরাসী উত্তর আফ্রিকার জেনারেল দ্য গল পূর্ণ গৌরবে ও অধিকারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন—যদিও রুজভেল্ট কখনও এটা স্বীকার করেন নাই।

ক্যাসারাংকা বৈঠকে নানা রসের অবতারণা হইয়াছিল—হাস্য, করুণ, কৌতুক ও রোমাণ্টিক ঘটনারও কমতি ছিল না। যেমন, ক্যাসারাংকা থেকে ১৫৮ মাইল দূরে মারকোস একটা নামকরা পুরাতন জায়গা ছিল। চার্চিল রুজভেল্টের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, 'বরফাচ্ছন্ন আলতাই পর্বতে সূর্যাস্ত না দেখিয়া' উত্তর আফ্রিকা থেকে বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া যায় না। চার্চিলের মতে সাহারার মরুভূমিতে মারাকাস ছিল প্যারিস। যুগ যুগ ধরিয়া ওখানে আফ্রিকার নানা দিগন্ত থেকে ক্যারাভান আসিয়া মিলিত হইত। তারপর এখানকার বাজারে ছিল হাত দেখা, সাপের খেলা, খাদ্য ও মদ্যের ফোয়ারা এবং ঠকাবার ও জুয়াচুরির কারবার ও নানা প্রকার ফুর্তির আয়োজন আর গোটা আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে এত বড় সংঘবদ্ধ গণিকালয় আর কোথাও ছিল না। বহু প্রাচীন কালের ঐতিহ্যমণ্ডিত এই মারাকাস।[২]

চার্চিল-রুজভেল্ট এখানে একদিন কাটাইলেন। কিন্তু ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্তনের পর রুজভেল্টের মারাকাস পরিদর্শনের সংবাদ যখন সবিস্তারে প্রকাশিত হইল, তখন 'লা সাদিয়া' নামক প্রাসাদের সুরম্য ও সুসজ্জিত গৃহের কর্ত্রী সংবাদপত্রে সেই বিবরণ পড়িয়া চটিয়া লাল হইলেন। কারণ, ওই বাড়ী তখন খালি অবস্থায় দখল করিয়া

১। ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ৬৯৩।
২। চার্চিল, চতুর্থ খণ্ড—পৃষ্ঠা ৬২২।

রুজভেল্টের থাকা ও শোয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যদিও ৬টি অতি বৃহৎ বেডরুম ছিল। তবু নিরাপত্তার খাতিরে রুজভেল্টকে নীচের তলার যে শয়নকক্ষে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে সেটি ছিল গৃহকর্ত্রীর নিজের শয়নকক্ষ। অতএব সংবাদপত্রে সেই বিবরণ পড়িয়া গৃহকর্ত্রী মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নিকট প্রতিবাদের-পর-প্রতিবাদপত্র পাঠাইতে লাগিলেন—বিনা অনুমতিতে রুজভেল্টকে কেন তাঁর বেডরুমে শুইতে দেওয়া হইল? শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলা এই ব্যাপার নিয়া ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করার ভয় দেখাইলেন। রবার্ট মারফি এই মজার ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, জীবনে তিনি নানা দুরূহ কূটনৈতিক সমস্যায় পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু ওই মহিলাকে তাঁর পক্ষে বুঝানো কঠিন হইল যে, তাঁর শয়নকক্ষ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা যায় না।[১]

(এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চার্চিল এই মারাকাসে অবস্থানের সময় একটি চিত্র বা পেন্টিং আঁকিয়াছিলেন এবং গোটা যুদ্ধের মধ্যে সেটিই ছিল তাঁর একমাত্র অঙ্কিত চিত্রকলা। এবং সেটি তিনি রুজভেল্টকে উপহার দিয়াছিলেন। চার্চিল যেন সর্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন!)

এখানে চার্চিলের সুরাপানের আসক্তি সম্পর্কেও একটি সরস ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন মিঃ হ্যারী হপকিন্স। ক্যাসাব্লাঙ্কা বৈঠকের শেষ দিকে একদিন সকালে হপকিন্স চার্চিলের বাসভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন রুজভেল্টের কাছ থেকে কোনও একটি বার্তা নিয়া। হপকিন্স যথারীতি চার্চিলের বেডরুমে গিয়া হাজির হইলেন সাক্ষাতের জন্য। চার্চিলের পরনে তখন ছিল গোলাপী রংয়ের ড্রেসিং গাউন, আর টেবিলের উপর ব্রেকফাস্ট প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এক বোতল মদ বা ওয়াইন। বিস্মিত হপকিন্স এই সময় মদ কেন জিজ্ঞাসা করিতে চার্চিল উত্তর দিলেন যে, সরতোলা দুধ তাঁর খুব অপছন্দ, অথচ মদে তাঁর অরুচি নাই। অতএব এই দুইয়ের মধ্যে তিনি মদটাই বাছিয়া নিয়াছেন! অতঃপর চার্চিল হপকিন্সকেও মদ খাওয়ার সুপারিশ করিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁর বয়স এখন ৬৮ বছর, কিন্তু তিনি দিব্যি আছেন। আর তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা এই যে, ডাক্তারেরা বরাবরই ভুল বলে! সুতরাং তাঁর পক্ষে আজ বা কাল, কখনও মদ ছাড়ার প্রশ্ন নাই![২]

ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু রাজনৈতিক ছিল না, ছিল সম্পূর্ণরূপে সামরিক। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন নেতারা ফরাসী রাজনীতির জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। তার একটা বড় কারণ এই ছিল যে, বৃটিশ ও মার্কিন উভয় পক্ষই ফরাসী আফ্রিকার উপর মাতব্বরি করিবার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করিয়াছিলেন। দ্য গলের প্রতি মার্কিন বিরূপতার জন্য এই রাজনৈতিক জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এজন্য দ্য গলও মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতি অত্যন্ত তিক্ত মনোভাব পোষণ করিতেন। এই তিক্ত মনোভাব তাঁর ফুটিয়া উঠিয়াছে স্বয়ং রুজভেল্ট সম্পর্কে তাঁর নিম্নলিখিত মন্তব্যে—

'But from the moment America entered the war, Roosevelt meant the peace to be an American peace, convinced that he must be

---

১। রবার্ট মারফি—পৃষ্ঠা ১৯৬।

২। রুজভেল্ট অ্যান্ড হপকিন্স—রবার্ট শেরউড, পৃষ্ঠা ৬৮৮।

the one to dictate its structure, that states which had been overrun sould be subject to his judgement, and that France in particular should recognise him as its saviour and its arbiter.'[১]

অর্থাৎ সংক্ষেপে—আমেরিকার যুদ্ধে যোগদানের পর থেকে রুজভেল্টের নিশ্চিত ধারণা হইল যে, যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নের একমাত্র নিয়ামক হইবে আমেরিকা এবং ফ্রান্সসহ যে সমস্ত দেশ শত্রু কবলিত হইয়াছে, সেগুলির একমাত্র ত্রাতা ও সালিশরূপে রুজভেল্টকেই স্বীকার করিয়া নেওয়া উচিত।

কেবল যে দ্য গলই আমেরিকা সম্পর্কে এই ধরনের মনোভাব পোষণ করিতেন, এমন নয়। বৃটেনের সঙ্গেও রণনৈতিক প্রশ্ন নিয়া আমেরিকার খুব মন কষাকষি হইয়াছিল, যে কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ক্যাসাব্লাংকা বৈঠকে উভয় পক্ষ তীব্র মতভেদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু আপোষরফা স্বরূপ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্থির হইল ঃ

১· আগামী গ্রীষ্মকালে সিসিল দ্বীপের উপর আক্রমণের দ্বারা ভূমধ্যসাগরীয় অভিযানের বোধন করা হইবে। এবং ভূমধ্যসাগরের যোগাযোগের পথ নির্বিঘ্ন করা হইবে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে একদিকে রাশিয়ার চাপ কমানো এবং অন্য দিকে ইতালীকে যুদ্ধক্ষেত্রে কুপোকাত করার উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করা।

খুব সম্ভাবতঃ এই সমস্ত রণক্রিয়ার ফলে তুরস্ককে একজন সক্রিয় সহযোগীরূপে পাওয়া যাইবে। (চার্চিল তুরস্ককে মিত্রপক্ষে যোগদান করাইবার জন্য অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। বলকান অঞ্চলের বিরুদ্ধে তুরস্কের বিমান ও সেন্যশক্তির সহায়তা লাভ করা এবং বসফোরাস প্রণালীর উম্মুক্ত করা—যাতে সংক্ষিপ্তপথে রাশিয়াতে কনভয় পাঠানো যায়। এই সমস্ত উদ্দেশ্য পূরণের আশাতেই তুরস্কের এতটা সহযোগিতা ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ চাহিতেছিল। অবশ্য তুরস্ক এই ইচ্ছা পূরণ করে নাই।)

২· ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া ইউরোপীয় ভূভাগ সরাসরি আক্রমণের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনীর সমাবেশ করা।

৩· স্থলপথে এই অক্রমণের উদ্দেশ্যে যত বেশী সম্ভব জার্মানীর বিরুদ্ধে বিমান আক্রমণ সংহত করা।

৪· সমুদ্রপথে জার্মান সাবমেরিনের উৎপাত দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫· সোভিয়েট রাশিয়াকে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণ সরবরাহ যোগান দিয়া সহায়তা করা।

৬· জাপানের বিরুদ্ধে রণক্রিয়া চালাইয়া যাইতে হইবে, তবে একটা সীমাবদ্ধ আয়তনের মধ্যে যাতে—জার্মানীকে আক্রমণের কোন সুয়োগ নষ্ট না হয়। জার্মানীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাপানকে পরাভূত করাব জন্য পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালানো হইবে।

৭· ব্রহ্মদেশ পুনরায় দখল এবং ক্যারোলিন ও মার্শাল দ্বীপ পুনরায় উদ্ধারের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।[২]

বিতর্কের ও মতবিরোধির অনেক ঝড়-ঝঞ্জা পার হইয়া ক্যাসাব্লাংকা সম্মেলনের শেষের দিনে ইঙ্গ-মার্কিন সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলী মোটামুটি যে রণ-পরিকল্পনা

১। War Memoirs of de Gaulle, P. 392.

২। স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৩৬৭।

গ্রহণ করিলেন, তার সারমর্ম হইল দক্ষিণ দিক হইতে (ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা জার্মানী অধিকৃত ইউরোপের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত করা, ১৯৪৪ সালে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম-পূর্বক জার্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণ করা এবং জার্মানীর পরাজয়ের পর জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান করা।

এই রণনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর ক্যাসাব্লাংকা সম্মেলনের সাংবাদিক বৈঠকে একটা বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিল, যেটা মহাযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। কেননা, সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের সহিত রুজভেল্ট ও চার্চিলের এই বৈঠকে সর্বপ্রথম রুজভেল্ট তাঁর সেই ঐতিহাসিক ঘোষণা—ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের নিকট বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের দাবী প্রচার করিলেন।

এই আকস্মিক ঘোষণায় সেদিনের বৈঠকে উপস্থিত স্বয়ং চার্চিল যেমন বিস্মিত হইয়াছিলেন, তেমনি কার্যত সারা জগৎ। কেননা, হঠাৎ একটা প্রেস কনফারেন্সে যুদ্ধরত মিত্রপক্ষের তরফ হইতে এমন একটা গভীর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ছিল। অথচ রুজভেল্ট কিন্তু কথাটাকে সরলভাবেই প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁর বক্তব্যকে এই বলিয়া শুরু করিয়াছিলেন যে, জার্মানীর এবং জাপানের সমরশক্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না করিয়া ফেলিলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না,-এ কথাটা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু কাগজে-কলমে কেউ লিপিবদ্ধ করেন নাই।

'আপনারা, ইংরাজেরা নিশ্চয়ই সেই পুরাতন কাহিনীটা (আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়কার) জানেন—আমাদের একজন জেনারেল ছিলেন, তাঁর নাম ছিল ইউ. এস. গ্র্যান্ট—আমার এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ছোটবেলায় আমরা তাঁকে 'Unconditional Surrender Grant বলে ডাকতুম।* জার্মানী, জাপান ও ইতালীয় সমর শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার অর্থ জার্মানী, জাপান ও ইতালী কর্তৃক Unconditional Surrender অর্থাৎ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। এর দ্বারা পৃথিবীর শান্তি মোটামুটি নিশ্চিত হইবে। কিন্তু এর অর্থ জার্মান, ইতালীয় বা জাপানী জনগণের নিশ্চিহ্নকরণ নয়।

মার্কিন সেনাপতি ও প্রেসিডেন্ট—গৃহযুদ্ধের সময় ১৮৬২ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে টেনেসিতে একটি দুর্গ দখলের ব্যাপারে ওই নামে (Unconditional Surrender Grant) খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ‡

কিন্তু এ কথার অর্থ সেই মতবাদের ধ্বংসসাধন যে মতবাদের উপর দাঁড়াইয়া ওই সমস্ত দেশ অন্যান্য জাতিকে পরাভূত এবং পদানত করিয়াছে।

বিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক রবার্ট ই. শেরউড লিখিয়াছেন যে, ক্যাসাব্লাংকা প্রেস কনফারেন্সে রুজভেল্ট কর্তৃক হঠাৎ 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবী উত্থাপন করা সম্পর্কে মিঃ চার্চিলও পূর্বাহ্নে কিছু জানিতেন না। তিনিও প্রথম প্রেসিডেন্টের মুখ থেকে ওই কথাগুলি শুনিতে পান এবং তিনিও অবাক হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ রুজভেল্টের বক্তব্য সমর্থন করেন যদিও তিনি নিজে থেকে এমন দাবী উত্থাপন করিলেন

* U. S. Glant-এর পুরা নাম Ulysses Simpson Grant (১৮৮২-১৮৮৫)

‡ আমাদের দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকেও তাঁর দৃঢ়তার জন্য রসিকতাপূর্বক ইংরাজীতে Surrender—Not Banerjee নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। কেননা, সুরেন বাঁড়ুজ্যে বৃটিশের কাছে কাছে নতি স্বীকার করিতে চাহেন নাই।—লেখক

না। কিন্তু এর দ্বারা যুদ্ধ প্রলম্বিত হইয়াছে এমন অভিযোগ চার্চিলও স্বীকার করেন না। কারণ, 'হিটলারের সঙ্গে কোন প্রকার আলোচনা করাই অসম্ভব ছিল। কারণ, সে ছিল উন্মাদ, অথচ চরমতম ক্ষমতার অধীকারীরূপে সে শেষ পর্যন্ত দেখিয়া ছাড়িত। কাজেও সে তাই করিয়াছে এবং আমরাও শেষ পর্যন্ত তাই করিয়াছি।'

'কিন্তু 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে'র দাবীটা এমনভাবে ক্যাসারাঙ্কা বৈঠকে উপস্থাপিত হইয়াছিল যে, মনে হয় যেন রুজভেল্টের মুখ থেকে ফস করিয়া কথাটা হঠাৎ বাহির হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আসলে তা নয়। এই বৈঠকের প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে রুজভেল্টের ব্যক্তিগত দূত হ্যারি হপকিন্স ছিলেন অন্যতম। তিনি এই সম্মেলনের প্রতিবেদনে লিখিয়াছেন যে, রুজভেল্ট সাংবাদিক বৈঠকে পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁর হাতে নোটবুক ছিল এবং সেই নোট থেকেই তিনি কথা বলিতেছেন। এমন কি, সম্মেলনের গৃহীত ফটোতেও তাঁকে দেখা যায় যে, তিনি সেই 'পূর্বাহ্নে সযত্নে প্রস্তুত নোট বইয়েরই কতকগুলি পৃষ্ঠা থেকে' তাঁর বক্তৃতা দিতেছেন।

যদিও তাঁর এই আকস্মিক ঘোষিত সিদ্ধান্ত নিয়া চারিদিকে তুমুল বিতর্ক হইয়াছিল—অর্থাৎ বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের দাবী উত্থাপিত করার ফলে জার্মানী ও জাপান শেষ পর্যন্ত মৃত্যুপণ লড়াই চালাইয়া গিয়াছে, তথাপি রুজভেল্ট কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্ত থেকে এক পা'ও নড়িতে রাজী হন নাই। কারণ, সেই সময়ের ঘটনাবলীতে (বিশেষত দারলাঁ উপলক্ষে) ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র বিতৃষ্ণা দেখাইবার জন্য তিনি তাঁর সংকল্পে অবিচলিত ছিলেন। আসলে নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণের দাবীটা যদি হঠাৎই সাংবাদিক বৈঠকে প্রকাশ করা হইয়া থাকে, তবু ওটাই ছিল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রকৃত মনের কথা।

'—It was a true statement of Roosevelt's considered policy and he refused all suggestions that he retract the statement or soften it and continued refusal to the day of his death. In fact he restated it a great many times."[১]

অর্থাৎ আমৃত্যু রুজভেল্ট তিনি তাঁর ওই বিবৃতি আঁকড়াইয়া ছিলেন।

নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবী তুলিবার পিছনে রুজভেল্টের মনে এই ভাব ছিল যে, ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের সঙ্গে কোন প্রকার আপোষ করা হইবে না কিম্বা আপোষ-মূলক কোন সন্ধিচুক্তির দ্বারা এমন কোন সুযোগ বা ছুতা রাখা হইবে না, যাতে ভবিষ্যতে হিটলারের মত কোন লোক আবার দেখা দিতে পারেন এবং প্রচার করিতে পারেন যে, তাঁরা যুদ্ধে পরাজিত হন নাই।

কিন্তু ক্যাসারাঙ্কাতে হঠাৎ রুজভেল্ট ও চার্চিল কেন ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের দাবী তুলিলেন, সেই সম্পর্কে আর একটি ব্যাখ্যাও আছে। জনৈক মার্কিন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন:

চার্চিল-রুজভেল্ট ১৯৪৩ সালের জানুয়ারীতে ক্যাসারাঙ্কা বৈঠকে জার্মানী, ইতালী ও জাপানের বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের দাবী তুলিলেন, এবং ঘোষণা করিলেন যে, একমাত্র বিনা শর্তে ছাড়া তাঁরা যুদ্ধের অবসান মানিয়া লইবেন না। রুজভেল্ট এই দাবীর প্রেরণা পাইয়াছিলেন স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে—যদিও

১। 'Roosevelt and Hopkins'—P. 696.

পররাষ্ট্র দপ্তর পরবর্তীকালে এই দাবী সম্পর্কে ঠাণ্ডা মারিয়া গিয়াছিলেন।··· একমাত্র মার্কিন গৃহযুদ্ধে জেনারেল গ্রান্টের স্মৃতিই এর পিছনে ছিল না, আরও কিছু আশু ও জরুরী প্রয়োজন ছিল। যখন পশ্চিমের দুই নেতা দেখিতে পাইলেন যে, অদূরভবিষ্যতে তাঁরা জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোন সামরিক আঘাত হানিতে পারিতেছেন না, তখন তাঁরা দুনিয়ার কানে বাজিতে পারে, এমন জমকালো কিছু করিতে চাহিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁরা অনুভব করিলেন যে, স্ট্যালিনকে ভরসা দেওয়া দরকার যে, তাঁরা জার্মানীর সঙ্গে পৃথক কোন শান্তি চুক্তি করিতে যাইতেছেন না এবং স্ট্যালিনও যেন তেমন কিছু না করেন।

'The most pressing aim of the declaration was to hold the grand alliance together at a time when Stalin was disappointed and angry and when both Japan and Italy were working for a separate peace between Germany and the USSR···'[১]

অর্থাৎ স্ট্যালিন যখন হতাশ এবং ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন (দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে) এবং যখন জাপান ও ইতালী জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে পৃথক সন্ধি ঘটাইবার চেষ্টায় ছিল, তখন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবীর ঘোষণা চার্চিল ও রুজভেল্টের নিকট অত্যন্ত জরুরী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

তখনকার অবস্থা বিবেচনায় এই ব্যাখ্যা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু রুজভেল্টের সমালোচকের সংখ্যা আমেরিকায়ও কম ছিল না। তাঁরা তৎক্ষণাৎ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, এমন চরম দাবী তোলাই মিত্রপক্ষের যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতির পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক ভুল হইয়াছে—

'Critics immediately pounced upon the term unconditional surrender and denounced it as one of the greatest mistakes of Allied policy during the war.'

এই সমালোচকদের মতে মহাযুদ্ধ এর দ্বারা অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘায়ত হইয়াছিল। ফলে, অজস্র লোকের প্রাণবলি হইয়াছিল।[২]

কিন্তু রুজভেল্টের বিরুদ্ধবাদীরা যত চিৎকারই করিয়া থাকুন না কেন, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবী যুদ্ধের গতিপথের উপর বিশেষ কোন দাগ কাটিতে পারে নাই এবং এর দ্বারা হিটলার-মুসোলিনী-তোজোর উপর নূতন কোন প্রভাবও পড়ে নাই। তবে, একথা বোধ হয় সত্য যে, এমন একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত স্ট্যালিন-রুজভেল্ট-চার্চিলের কোন সম্মিলিত পরামর্শ বৈঠক থেকে উপস্থাপিত হওয়া উচিত ছিল—যদিও রুজভেল্টের এই দাবীর সঙ্গে পরবর্তীকালে স্ট্যালিনও একমত হইয়াছিলেন।

* * *

উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ফরাসী সাম্রাজ্যে 'অপারেশন টর্চ' কার্যত বিনা বাধায় দ্রুত সাফল্য অর্জন করিল বটে, কিন্তু টিউনিস ও ত্রিপোলীসহ বাকী উত্তর-আফ্রিকার অক্ষশক্তি বাহিনীকে কাবু করিতে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষের পাঁচ মাস লাগিয়া গেল। অবশ্য প্রাকৃতিক বিঘ্ন রাস্তাঘাটের অভাব ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রচণ্ড অসুবিধা ছিল। কিন্তু অন্যদিকে মিশরের এল আলামিন রণক্ষেত্রে পরাজিত ও বিপর্যস্ত

১। 'Total War'—pp. 444—445.

২। লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৩৬৭

জেনারেল রোমেলের ইতালীয়-জার্মান বাহিনীও ১৪০০ মাইল পিছু হটিয়া আসিয়াছিল দ্রুত পলায়মান অবস্থায় এবং তাদের দশা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। এই অবস্থায় রোমেল এক সময় উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে সম্পূর্ণ ক্ষান্ত দিয়া আফ্রিকা ত্যাগ করিতেও চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হিটলার যথারীতি অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। অবশ্য দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে নূতন চার ডিভিসন সৈন্য হিটলার পাঠাইয়াছিলেন বিখ্যাত বিজার্টা বন্দরে ও টিউনিসে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য। এই শেষ পর্যায়ের যুদ্ধেও রোমেল তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন এবং ক্যাসারিন পাশের যুদ্ধে অদ্ভুতকর্মা রোমেলের জন্য মিত্র বাহিনীর মনে আবার ভয় ঢুকিয়া গিয়াছিল, এবং মিত্রবাহিনী দ্বিখণ্ডিত হওয়ার জো হইয়াছিল। ম্যারেথ লাইনের যুদ্ধও খুব উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল এবং এখানে জার্মানরা প্রতিরক্ষার 'দুর্ভেদ্য' ঘাঁটিসমূহ গড়িয়া তুলিয়াছিল। ১৪০০ মাইল পশ্চাদ্ধাবনের পর জেনারেল মণ্টগোমারীর অষ্টম বাহিনী ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৪৩ ত্রিপোলী দখল করিয়া নিয়াছিল। কিন্তু মার্চ মাসের আগে মিত্রপক্ষ টিউনিস দখল করিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে 'দুর্ভেদ্য' ম্যারেথ লাইনের উপর মণ্টগোমারী আফ্রিকায় প্রচণ্ড মরুঝড় 'খামসিন'-এর উৎপাত সহ্য করিয়াও যে 'সম্মুখ যুদ্ধ' চালাইয়াছিলেন, তাতে তিনি সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন।

জেনারেল প্যাটন, জেনারেল এণ্ডারসন, জেনারেল মণ্টগোমারী—ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের এই তিন বিশিষ্ট সেনানায়কের নেতৃত্বে ও যুগপৎ অগ্রগতিতে শেষ পর্যন্ত মিত্রবাহিনী টিউনিসিয়া দখল করিয়া নিতে পারিলেন। ৭ই মার্চ, ১৯৪৩, অপরাহ্ণ ৩।৪০ মিনিটে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যদল টিউনিসে বিজয়ীর মত প্রবেশ করিল। তার আগেই জেনারেল রোমেল আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া জার্মানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁর প্রিয় এবং সুবিখ্যাত 'আফ্রিকা কোর'-এর কীর্তিমণ্ডিত কার্যকলাপও এখানেই শেষ হইয়া গেল। অক্ষশক্তির ২ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করিল এবং ইতিহাস বিখ্যাত পুরাতন কার্থেজ নগরীকে—যে নগরীকে খৃঃ পূঃ ১৪৬'য়ে রোমানরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল, সেখানেই এই যুদ্ধের যবনিকা পড়িল। মুসোলিনীর আফ্রিকান সাম্রাজ্য, যার আয়তন ইতালীর চেয়ে দশ গুণ বড়, আর জনসংখ্যা ছিল ১৫ মিলিয়ন, সেই সুবিশাল সাম্রাজ্যও পুরাতন কার্থেজের মতই ধ্বংসের কাহিনীতে পরিণত হইল!

টিউনিসিয়ার যুদ্ধে মিত্রপক্ষের ৭০ হাজারেরও কম সৈন্য হতাহত হইল। যদিও আমেরিকার নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল, তবু তাদের মাত্র ২০ হাজার সৈন্য হতাহত হইল। রুশ বা পূর্ব রণাঙ্গনের তুলনায় এই সমস্ত সংগ্রামের প্রচণ্ডতা কত কম ছিল, এই সংখ্যাগুলিই তার প্রমাণ—যদিও মিত্রপক্ষের প্রচারবিদরা আফ্রিকার এই যুদ্ধকে অসামান্য গুরুত্ব দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং এটা যে ইউরোপীয় দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সমতুল্য, পরোক্ষে এমন কথাও প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তবে, একথা সত্য যে, এই জয়ের ফলে ভূমধ্যসাগর, সুয়েজ খাল ও ভারতবর্ষের সামুদ্রিক পথ বিপদমুক্ত হইল এবং বৃটেন ও বৃটেশ সাম্রাজ্যের পক্ষে সুবিধা হইল। এক কথায় রুজভেল্টের সহযোগিতায় চার্চিল লাভবান হইলেন!

* * *

আফ্রিকার যুদ্ধে সরবরাহের প্রশ্ন প্রায় জীবন-মৃত্যুর মত গুরুতর ছিল এবং যথাসময়ে উপযুক্ত সরবরাহের অভাব রোমেলের মত খ্যাতিমান সেনানায়কেরও যে বিপদ

ঘটিয়াছিল মিশরের রণক্ষেত্রে, সেকথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই যুদ্ধের উপসংহার পর্বেও সরবরাহের প্রশ্ন বিষম গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল। মিশরের পর অষ্টম বাহিনীর অধিনায়ক মণ্টগোমারী রোমেলের আফ্রিকা কোরকে ক্রমাগত ১৪০০ মাইল পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ৮০ দিনে ট্রিপোলীতে পৌঁছিলেন। তাঁকে সরবরাহ দেওয়ার জন্য এক লক্ষ ট্রাকের বেশী নিয়োগ করিতে হইয়াছিল।[১]

রোমেলের পশ্চাদপসরণও এজন্যই স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং তাঁকে অনুসরণ করিতে গিয়া মণ্টগোমারীর কম হয়রাণ হইতে হয় নাই। কেননা, জীবনধারণের প্রতিটি বস্তু তাঁকে সংগ্রহ ও সঙ্গে নিতে হইয়াছিল—বিশেষভাবে মরুভুমিতে জল, আর সুদীর্ঘ রাস্তার জন্য পেট্রোল। তাঁর এই 'ধাবমান যুদ্ধের' এক পর্যায়ে তাঁকে সপ্তাহে ত্রিশ লক্ষ গ্যালন পেট্রোল এবং আট হাজার টনের অধিক গোলাবারুদ সরবরাহ দিতে হইয়াছিল! গড়পড়তা প্রতি দিন প্রতিটি সৈন্যের জন্য ৫ পাউণ্ড খাদ্য দরকার হইত, আর প্রতি সপ্তাহে ৫০টি সিগারেট ও দুইটি দিয়াশলাই। আর অষ্টম বাহিনীর জন্য দৈনিক জলের দরকার হইতে ৫০০০ টন। কিন্তু স্থানীয় কূপগুলি থেকে এই জল সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। এজন্য অর্ধেক পরিমাণ জল দূরবর্তী নীল নদ থেকে পাইপ লাইন দিয়া তোব্রুক পর্যন্ত আনা হইত এবং নীল নদের আরও ১৫০০ টন জল আনা হইত জাহাজযোগে বেঙ্গাজী বন্দর পর্যন্ত। সরবরাহের এই সামরিক সংগঠন গড়িয়া তোলার জন্য কোয়ার্টার-মাস্টার জেনারেল লিণ্ডলেন মিত্রপক্ষের প্রশংসার পাত্র হইয়াছিলেন।[২]

* * *

২৪শে জানুয়ারী মধ্যাহ্নে চার্চিল-রুজভেল্ট খুব হৃষ্টচিত্তে ক্যাসাব্লাঙ্কা ত্যাগ করিলেন মোটরযোগে—প্রেস কনফারেন্সের পর। তাঁরা যখন আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তখন অন্তত রুজভেল্ট এই ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন যে, দ্য গলকে বাগ মানানো গিয়াছে। কিন্তু দ্য গল তাঁর কূটনৈতিক প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের গুণে ফরাসী আফ্রিকার শাসনক্ষমতার শীর্ষস্থানে উঠিয়া গেলেন এবং জিরো পিছনে ছিটকাইয়া পড়িলেন—যদিও রুজভেল্ট কোন দিন দ্য গলকে স্বীকার করিতে চাহেন নাই। তথাপি দ্য গল কার্যত স্বাধীন ফরাসী গভর্নমেণ্ট গঠন ও মন্ত্রিসভা তৈয়ার করিলেন এবং ১৯৪৩ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে দ্য গলের কমিটিই পুরাপুরি ফরাসী সরকারের স্থান গ্রহণ করিল এবং ফরাসী আফ্রিকাসহ বৃটেন-আমেরিকা-সোভিয়েট রাশিয়া সকলেই এটা মানিয়া নিল। ক্যাসাব্লাঙ্কাতে দ্য গলের কূটনৈতিক জয় হইয়াছিল, তাতে কোন সন্দেহ নাই।[৩]

১। লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৩৭১।

২। 'The Second Great War'—Sir John Hammertion. London 1948, Vol vi, P. 2559.

৩। 'Diplomat Among Warriors'—Robeat Murphy, P. 231.

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযানের আগে

১৯৪২ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারের দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযানকে প্রসিদ্ধ সমর ঐতিহাসিক আলেকজাণ্ডার ভার্থ 'The Blaek Summer of 1942' এই শিরোনামায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা অতিশয়োক্তি ছিল না। কেননা, ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকাল রাশিয়ার পক্ষে সত্য সত্যই 'কালো গ্রীষ্মের' চরম দুর্দিন নিয়া দেখা দিয়াছিল, যখন দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব রাশিয়াতে হিটলারী আক্রমণ নিদারুণ ভয়ংকর রূপ ধারণ করিয়াছিল এমন কি, ১৯৪১-এর গ্রীষ্মের মত নূতন করিয়া রাশিয়ার আসন্ন পতন সম্পর্কেও জল্পনা-কল্পনার উদ্রেক করিয়াছিল। অবশ্য ১৯৪২ সালের সেই অভিযানই ছিল পূর্ব রণাঙ্গনে হিটলারী আক্রমণের চরম সীমা।

কিন্তু ১৯৪২-এর নিদাঘ তাণ্ডবে মাতিবার আগে জার্মানবাহিনী কি অবস্থায় ছিল? ১৯৪১-৪২ সালের নিদারুণ ঠাণ্ডা ও লালফৌজের শীতকালীন আক্রমণের ধাক্কা তারা কিভাবে সামলাইয়া উঠিয়াছিল? যদি পশ্চিমী সামরিক লেখকেরা পূর্ব রণাঙ্গনের ঠাণ্ডার উপর অতিরিক্ত জোর দিয়াছেন, অন্য দিকে সোভিয়েট লেখকেরা এটাকে প্রায় অগ্রাহ্যই করিয়াছেন, তবু কিন্তু আসল সত্য এই যে, রাশিয়ার শীতের জন্য জার্মান-বাহিনী সত্যই খুব জব্দ হইয়াছিল। কারণ, শীতকালীন যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। হিটলার ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, ছয় সপ্তাহের মধ্যে জার্মানীর 'অপরাজেয় বাহিনী'র হাতে রাশিয়া খতম হইয়া যাইবে। সুতরাং শরৎ পার হইয়া শীতের প্রচণ্ডতার মুখে পড়িতে হইবে, এই হিসাব হিটলারী কমাণ্ডের ছিল না। অথচ সারা শীতকালে বিশাল সোভিয়েট রাশিয়া ইউরোপে ও এশিয়ায়, যার মোট আয়তন ৮৫ লক্ষ বর্গমাইল, সেই বিরাট উপ-মহাদেশ যেন বরফের ঘুমন্ত সাম্রাজ্য! কিন্তু এই 'বরফ সাম্রাজ্যে' 'সেনাপতি শীত' যতই দুর্দান্ত হোক, আসলে অপরাজেয় নহে। এর নজীর রহিয়াছে প্রথম মহাযুদ্ধে। ১৯১৪-১৫ সালের নভেম্বর-মার্চ কিম্বা সারা শীতকাল যদিও পশ্চিম রণাঙ্গনে কোন সাড়া-শব্দ ছিল না, কিন্তু পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ চলিয়াছিল। অবশ্য ১৯৪১-৪২ সালের জার্মানবাহিনীর মত সেই যুদ্ধ রাশিয়ার ভিতরের দিকে অনুষ্ঠিত হয় নাই। তথাপি পোল্যাণ্ড ও পূর্ব প্রুশিয়ায় সেদিনের শীতও কম কঠিন ছিল না। জেনারেল লুডেনডর্ফ, জেনারেল ম্যাকেনসন ও জেনারেল হিণ্ডেনবুর্গ ১৯১৫ সালের বসন্তকালে পশ্চিম রণাঙ্গনে পুনরায় যুদ্ধারম্ভের আগেই শীতের দিনে রাশিয়াকে খতম করিতে চাহিয়াছিলেন। আর গ্রাণ্ড ডিউকের তাড়নায় জেনারেল র‍্যাডকো, রাস্কি প্রভৃতিও জার্মানদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাতিয়াছিলেন। সুতরাং ১৯১৪-১৫ সালের শীতকালে যা সম্ভব হইয়াছে, ১৯৪১-৪২ সালে তা সম্ভব হইবে না কেন? লালফৌজ এই শীতকালীন যুদ্ধের জন্য অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত হইয়াছিল এবং এটা রুশ সামরিক কর্তৃপক্ষের সতর্কতা ও সচেতনতার পরিচায়ক ছিল। শীতাভিযানের জন্য যে সমস্ত বাহিনী প্রস্তুত হইল, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে খ্যাত ছিল কসাক সৈন্যদল! রাশিয়ার ঐতিহ্যমণ্ডিত এই অশ্বারোহী

কসাক সৈন্যবাহিনীকে এতদিন জার্মান যান্ত্রিক সজ্জা ও সংঘাতের জন্য রুশেরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে পারে নাই। অথচ শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরিয়া প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এই অশ্বারোহী সৈন্যদলই ছিল ট্যাঙ্ক বা মোটরারূঢ় বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত, এবং রণক্ষেত্রের গতিবেগের বাহন, তথাপি এই সম্পূর্ণ যান্ত্রিক যুদ্ধের দিনেও রুশ সামরিক কর্তৃপক্ষ এদেরকে বাতিল করেন নাই। বরং ১৯৪০ সাল থেকে এদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং নূতন গোলাগুলির বলবৃদ্ধিসহ এমনভাবে এদের পুনর্গঠন করেন যে, এই সমস্ত কসাকবাহিনী যেন 'যান্ত্রিক অশ্বারোহী' সৈন্যে পরিণত হইল। ঠাণ্ডা, বরফ বা তুষার এরা আদৌ গ্রাহ্য করিত না। এদের সঙ্গে আবার যুক্ত হইল বিশেষভাবে বরফের উপযোগী স্কী-ব্যাটেলিয়ন, শ্লেজবাহিত পদাতিক সৈন্যদল—শ্লেজের সঙ্গে যন্ত্র ও ইঞ্জিন পর্যন্ত যুক্ত হইয়াছিল।

অপরপক্ষে জার্মানীর শীতকালীন অভিযানের জন্য কোন প্রস্তুতিই ছিল না, এমন ধারণা সত্য নয়। সেই সময়কার বিদেশী সংবাদপত্রে এই মর্মে রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল যে, অধিকৃত ইউরোপের বয়নশিল্পের কারখানাগুলি একমাত্র জার্মানবাহিনীর সাজসজ্জা ও পোশাক উৎপাদনের জন্যই নিযুক্ত ছিল। কিন্তু শীতকালীন খাদ্য, পানীয়, জ্বালানী ও আশ্রয়স্থলের জন্য যে ব্যবস্থাই করা হোক না কেন, উহা কখনও যথোপযুক্ত ছিল না। কেননা, সমস্যাটা কেবল কোনমতে টিকিয়া থাকা নয়। নিদারুণ শীতে রুশ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং সুস্থ শরীর বজায় রাখা। এই নির্দয় শত্রুর দেশে কোন নিরাপদ আশ্রয় ও খাদ্য মিলিবার সম্ভাবনা ছিল না—স্ট্যালিনের নির্দেশে যথাসম্ভব সমস্ত-কিছু জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু জার্মানরা আপন সীমান্ত থেকে ৬০০ মাইল দূরে সরিয়া আসিয়াছে—এই দূর পথের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। রাশিয়ার দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের দুর্দশা দেখিয়া জার্মান রণপণ্ডিত ক্লাডসেভিৎস মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, রণক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইলে দ্বিগুণ চওড়া রাস্তার প্রয়োজন, কিন্তু রাশিয়ায় দরকার তিনগুণ! সুতরাং এই ক্ষেত্রেও জার্মানবাহিনীর আত্মরক্ষার জন্য বড় বড় রাস্তা ও রেলওয়ে কেন্দ্রের নিকট তাদের আশ্রয় না লইয়া উপায় কি? খারকোভ, কুরস্ক, ওরেল, ব্রিয়ানস্ক, ভিয়াজমা, জেভ ও স্টারা-রুশা—এই শহরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া আত্মরক্ষার শক্তিশালী বিন্দু বা 'স্ট্রং পয়েন্টস্' গড়িয়া উঠিল। ১৯১৪-১৮ সালের পশ্চিম রণাঙ্গনের মত কেবল পরিখার-পর-পরিখা কাটিয়া কিম্বা খাদের পর-খাদ খুঁড়িয়া এবং এগুলির সঙ্গে যোগাযোগের লাইন যুক্ত করিয়া একমাত্র মাটির আশ্রয়ে আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বিত হইল না। হিটলার নূতন ধরনের প্রণালী অবলম্বন করিলেন। বড় বড় শহর, রেলওয়ে স্টেশন বা জংশনগুলি ছিল এই আত্মরক্ষার লাইনে বৃহৎ গ্রন্থির মত। এই গ্রন্থিগুলি আবার 'শজারু-ব্যূহ' বা 'Hedgehog defence'-এ পরিণত হইল। শজারু যখন বনে-জঙ্গলে আত্মরক্ষা বা আক্রমণের জন্য সজাগ হইয়া উঠে, তখন উহার অসংখ্য কাঁটা বল্লমের মত খাড়া হইয়া উঠে এবং এই 'কাঁটার বেড়া' ডিঙ্গাইতে না পারিলে ওই ক্ষুদ্র জীবটির মূলদেহের সন্ধান পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্র বন্যপ্রাণী শজারুর এই 'স্বাভাবিক আত্মরক্ষার' কৌশলই আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় প্রতিফলিত হইয়াছে।[১]

১। গ্রন্থকার প্রণীত রুশ-জার্মান সংগ্রাম ১৯৪৭ সাল—পৃষ্ঠা ১৬৮।

হিটলার এই সমস্ত ঘাঁটিকে ছোট দুর্গকেন্দ্র পরিণত করিলেন। এগুলি যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। এই সমস্ত বড় বড় কেন্দ্রে এক লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ পর্যন্ত সৈন্য ধরিতে পারিত। ঊনবিংশ শতকে যেমন সৈন্যদলের বড় বড় ছাউনী বা তাঁবু পড়িত, এগুলিও কতকটা সেই ধরনের ছিল এবং এগুলি বহু শত বর্গমাইল নিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল অথবা লিবিয়ার মরুভূমির যুদ্ধে যে ধরনের 'বাক্স'—অর্থাৎ চতুর্দিকে আত্মরক্ষার বেষ্টনীসহ ব্যূহ তৈয়ার হইয়াছিল, এই শজারু-ব্যূহও সেই ধরনের ছিল। অথবা মধ্যযুগে অশ্বরোহী সৈন্যদের আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য সুইস বল্লমধারীরা যেভাবে চারদিকে ব্যূহ সাজাইয়া রাখিত, এই শজারু-ব্যূহ ছিল অনেকটা সেই ধরনের।[১]

এই শীতকালীন যুদ্ধে রুশরা জার্মানদের তুলনায় অনেক বেশী পটু ছিল এবং তারা যুদ্ধ করিতেছিল স্বদেশের মাটিতে, তাদের নৈতিক বলও স্বভাবতঃই বেশী ছিল। ঠাণ্ডা ও বরফের মধ্যে কসাক ও শ্লেজবাহিত পদাতিক এবং স্কী-সৈন্যদের আক্রমণ ছিল দুর্ধর্ষ, আবার তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছিল দুরন্ত গেরিলা যোদ্ধারা। উত্তরে লেনিনগ্রাদ এলাকা থেকে মধ্য রণাঙ্গন পার হইয়া দক্ষিণে ট্যাগানরগ বা কৃষ্ণ সাগরের সন্নিহিত উপকূলভাগ পর্যন্ত নিয়মিত রুশবাহিনীর যেমন আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল, তেমনি গেরিলারা এই সমস্ত শজারু-ব্যূহের উপর হানা দিয়া এগুলিকে ক্ষত-বিক্ষত করিতেছিল। জার্মানদের রণক্ষেত্রের বহুদূর পিছনে গেরিলারা আক্রমণ চালাইয়াছিল। জার্মানবাহিনী এই ধরনের আক্রমণ ও যুদ্ধে অভ্যস্ত ছিল না। ফলে তারা যথেষ্ট নাজেহাল হইল এবং এই ধরনের আক্রমণ ও যুদ্ধ নৃশংসতার চরমে উঠিল। একখানি জার্মান পত্রিকা (নিউ জরিকার জিটাং) লিখিল যে, এমন হিংস্র যুদ্ধ আধুনিক ইউরোপ আগে কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই—এটা নিছক বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডের যুদ্ধ বা 'ম্যাড বুচারী' মাত্র।[২]

এই শীতকালীন যুদ্ধে যদিও জার্মানদের ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল প্রচণ্ড, তবু মোটামুটি তারা আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল এবং লালফৌজ সর্বত্র তাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখিতে পারিলেও, তাদের সর্বাধিক লাভ হইয়াছিল উত্তর রণাঙ্গনের লেনিনগ্রাদ এলাকায়। জানুয়ারী মাসে, ১৯৪২, লাডোগা হ্রদের জমাটবাঁধা বরফের উপর দিয়া তারা একটি রেল ও মোটর রোড তৈয়ার করিয়া ফেলিল এবং অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদের সঙ্গে পুনরায় বাইরে থেকে একটা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিল। এটি ছিল লালফৌজের পক্ষে প্রভূত কৃতিত্বের পরিচায়ক। আর মধ্য রণাঙ্গনের কালুগাও লালফৌজ জার্মানদের হাত থেকে কাড়িয়া লইল। এটি ছিল শজারু-ব্যূহের একটি বৃহত্তম ঘাঁটি। এ ছাড়া দক্ষিণ রণাঙ্গনের খারকোভোর মত নামকরা শহর লালফৌজের প্রত্যাক্রমণে বিপন্ন হইলেও এটির উদ্ধার সম্ভব হইল না। তবে, খারকোভের দক্ষিণে লাজোভায়া শহরটি রুশ সৈন্যরা আবার উদ্ধার করিল।

১৯৪১-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪২-এর এপ্রিল এই পাঁচ মাস পূর্ব রণাঙ্গন শীত-কালীন যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল এবং এই যুদ্ধে সমস্ত রণাঙ্গনে বড় রকমের ফল না আসিলেও অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদের একটা প্রকাণ্ড লাভ হইয়াছিল। যদিও উপরেই

১। জে. এফ. সি. ফুলার—পৃঃ ১৭৬।
২। পূর্বোধৃত পুস্তক—পৃঃ ১৭৭।

একথা বলা হইয়াছে, তবু বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, লেনিনগ্রাদের আত্মরক্ষার ইতিহাসে এটি স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ডিসেম্বর মাসের পালটা আক্রমণে লালফৌজ লেনিনগ্রাদ ভলোগদগামী রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন টিকভিন দখল করিল এবং ভলকোভ নদী অতিক্রম করিয়া স্লুয়েস্সবুর্গের কয়েক মাইলের মধ্যে লাডোগা হ্রদের দক্ষিণ তীরে পেঁৗছিল এবং ফিনিশ ও জার্মান সৈন্যদের মিলনে বাধা দিল। ইতিমধ্যে লাডোগা হ্রদ জমিয়া পাথর হইয়া গেল। হ্রদের এই বরফ-কঠিন বুকের উপর দিয়া ষাট মাইল দীর্ঘ দুই সারি রেল লাইন (ডবল ট্র্যাক্) রুশরা স্থাপন করিল। অবরুদ্ধ ও ক্ষুধার্ত লেনিনগ্রাদের পূর্ব পার্শ্বে যেন একটা গবাক্ষপথের সৃষ্টি হইল এবং তিন মাস ধরিয়া (মার্চ পর্যন্ত) এই রেলপথযোগে মস্কো ও রাশিয়ার অন্যান্য অংশ হইতে সরবরাহ পেঁৗছিতে লাগিল। অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদ মহানগরীতে এই অবস্থায়ও যে সমস্ত সমরসম্ভার উৎপন্ন হইত, সেগুলিও এই পথ দিয়া রাশিয়ার অন্যান্য অংশে পাঠানো হইত এবং রেলপথের সঙ্গে মোটরলরীও সরবরাহ যোগান দিত। অর্থাৎ বরফাস্তীর্ণ লাডোগা হ্রদের রেলপথ অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদকে অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ দিয়াছিল। এই ঘটনা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১]

রণপণ্ডিত ফুলার বলিতেছেন যে, এই শীতকালীন যুদ্ধে রাশিয়ার তিন রকমের লাভ হইয়াছিল। প্রথমতঃ রাশিয়ানদের উপর এই নৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং সারা পৃথিবীতে রাশিয়ার অনুকূলে মনোভাবের সৃষ্টি। অন্যপক্ষ জার্মানদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া। হিটলার নভেম্বর মাসেই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, রাশিয়া সাবাড় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শীতকালীন যুদ্ধে এর বিপরীত প্রমাণ মিলিল। দ্বিতীয়তঃ জার্মানবাহিনী পিছনে হটিয়া গিয়া শজারু-ব্যূহের আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বনে বাধ্য হওয়ায়, তাদের পরবর্তী গ্রীষ্মকালীন অভিযান আরম্ভ করার পক্ষে রণক্ষেত্রের দূরত্ব অনেক মাইল বৃদ্ধি পাইল এবং তৃতীয়তঃ জার্মান সামরিক মতবাদে যে বস্তুটা সবচেয়ে ভীতির ছিল, সেই 'War of attrition' বা বলক্ষয়কারী সংগ্রামের আবর্তে বা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে জার্মানীকে পড়িতে হইল। অপরপক্ষে তুষারদংশনে এবং শত্রুর আক্রমণে জার্মান বাহিনী যেমন যথেষ্ট ঘায়েল হইল, তেমনি অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলিতে সৈন্যদের পুনর্বিন্যাসে ও প্রশিক্ষণে প্রচুর বাধার সৃষ্টি হইল। সোজা কথায়, সজারু-ব্যূহের শীতকালীন আত্মরক্ষার যুদ্ধে জার্মান সমরযন্ত্রের সেই আগেকার ধার আর রহিল না।[২]

ক্যাপ্টেন লীডেল হার্টও লিখিয়াছেন যে, শীতকালীন যুদ্ধের জন্য 'অপ্রস্তুত' জার্মানবাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হইল এবং তাদের আগেকার সৈন্যবাহিনীর পুনর্বিন্যাসে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি হইল। ডিভিসনগুলির শক্তি হ্রাস পাইয়া এক-তৃতীয়াংশ শক্তিতে দাঁড়াইল এবং কোন কোন ডিভিসন নামে মাত্র ডিভিসন রহিল, কিন্তু শক্তি দাঁড়াইল মাত্র ২।৩ ব্যাটেলিয়নে। সৈন্যদলের সংগঠনেও এজন্য পরিবর্তন ঘটাইতে হইল—৯-এর বদলে সাতটি ব্যাটেলিয়ন দিয়া পদাতিক ডিভিসন গঠন করিতে হইল। ১৯৪১ সালের সেই সামরিক শক্তি আর ফিরিয়া আসিল না।...

জার্মানীতে ও বার্লিনে সেই কলোচ্ছ্বাস আর রহিল না। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মে ও শরৎকালে জার্মানীতে জয়াভিযানের যে উৎসব দেখা দিয়াছিল, ক্রমে সেই উচ্ছ্বাস

১। রুশ-জার্মান সংগ্রাম—পৃঃ ১৭৫।
২। জে. এফ. সি. ফুলার—পৃঃ ১৭৮।

প্রশ্নীভূত হইয়া আসিল। রাশিয়ার বিশাল স্তেপভূমিতে জয়-কোলাহল মিলাইয়া যাইতে লাগিল এবং গোয়েবলসের প্রচারযন্ত্র যতই হিটলারী গৌরব সম্পর্কে মুখরিত হোক না কেন, রণক্ষেত্র থেকে পাঠানো সৈন্যদের চিঠিতে ভিন্নসুরের আভাস ধ্বনিত হইত। যুদ্ধের বুঝি শেষ নাই। দ্রুত অবসানের কোন সম্ভাবনা নাই—সারা পৃথিবীতে এই যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িল। ডিসেম্বর মাসের পূর্ব রণাঙ্গনের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের মহাসংগ্রাম যুক্ত হইল। সুতরাং ক্রমে জার্মানদের মধ্যেও সংশয় ও আত্মজিজ্ঞাসা দেখা দিল। স্পষ্টবক্তা কেউ কেউ বলিয়াই ফেলিলেন—

We are being destroyed by our victories.'

—'আমরা আমাদের জয়লাভের দ্বারাই ধ্বংস হইতেছি।'[১]

কিন্তু হিটলার বুঝাইতে চাহিলেন, রুশদের গালাগালি দিলেন—'রুশরা নিষ্ঠুর, পশুবৎ এবং জানোয়ারের তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী!' তিনি এক সময় স্বীকার করিলেন যে, রুশদের সামরিক শক্তির পরিমাপ করা সম্পর্কে তাঁর ভুল হইয়াছিল।

'আমরা এক বিষয়ে ভুল করিয়াছিলাম। এই শত্রু জার্মানদের বিরুদ্ধে কী সাংঘাতিক প্রস্তুতি করিয়াছিল, কেবল জার্মানীকে নয়, গোটা ইউরোপকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কী অভূতপূর্ব বিপদ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল, তা আমরা আগে বুঝিতে পারি নাই। এই বিষয়ে আমাদের ভুল হইয়াছিল।'[২]

লেনিনগ্রাদের অবরোধে, মস্কোর যুদ্ধে সম্ভবতঃ হিটলার এই ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং তারপর ১৯৪১ ৪২ সালের শীতকালে লালফৌজের ও গেরিলাদের প্রচণ্ড আঘাতে হিটলারী দম্ভ আরও ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। কী পরিমাণ জার্মান সৈন্য এই সমস্ত যুদ্ধে নষ্ট হইয়াছিল?—

১৯৪২ সালের ১০ই মে উইনস্টোন চার্চিল রাশিয়ার শীতকালীন অভিযান সম্পর্কে বলেন—'কত লক্ষ জার্মান সৈন্য রুশ রণাঙ্গনে ও বরফের মধ্যে প্রাণ হারাইয়াছে, তা সঠিক কেউ বলিতে পারে না। তবে, একথা নিশ্চিত যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সাড়ে-চার বছরে যত জার্মান সৈন্য নিহত হইয়াছিল, রাশিয়ায় ইতিমধ্যেই তার চেয়ে অনেক বেশী সৈন্য মারা পড়িয়াছে। বোধ হয় এটাও কম করিয়াই বলা হইল।' প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর ১৮ লক্ষ সৈন্য নিহত হইয়াছিল। সুতরাং চার্চিলের মতে ১৯৪১-৪২-এর শীতকালীন অভিযানে জার্মানীর মাসে সাড়ে চারি লক্ষেরও অধিক সৈন্য নষ্ট হইয়াছে।'[৩]

কিন্তু প্রতিপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে যুদ্ধচলাকালীন বিবৃতি নিশ্চয়ই নির্ভরযোগ্য নয়। বরং নির্ভরযোগ্য সংখ্যা পাওয়া যায় যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রকাশিত তথ্যগুলি থেকে। বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক-ঐতিহাসিক মিঃ উইলিয়াম শাইরার লিখিয়াছেন যে, পূর্ব রণাঙ্গনে শীতকালীন যুদ্ধে জার্মানীর মোট ১১,৬৭,৮৩৫ জন সৈন্য আহত হইয়াছিল। পীড়িত সৈন্য-সংখ্যা বাদ দিয়াই এই হিসাব ধরা হইয়াছে।

আর-একজন সুবিখ্যাত বৃটিশ সাংবাদিক-ঐতিহাসিক একেবারে জার্মান সরকারী রেকর্ড ঘাঁটিয়া বলিয়াছেন যে, ২২শে জুন, ১৯৪১ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২

১। শাইরার—পৃষ্ঠা ৩৭৩।
২। পূর্বোক্ত পুস্তক—ঐ পৃষ্ঠা।
৩। রুশ-জার্মান সংগ্রাম—পৃষ্ঠা ২০৬।

পর্যন্ত পূর্ব রণাঙ্গণে ৪৭,৩০৩ এবং তুষারদংশনে অন্ততঃ ১,১২,৬২৭ জন সৈন্য মারা পড়িয়াছিল।[১]

অতএব হিটলারের দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযানে জার্মান সেনাপতিগণ যথোপযুক্ত সৈন্য-সংখ্যার অভাব বোধ করিলেন। পূর্ব রণাঙ্গনে প্রচণ্ড লোকক্ষয়ের জন্য গোড়াতেই প্রয়োজন হইল নূতন সৈন্য রিক্রুটের। এজন্য জার্মানীর সমগ্র সৈন্যসংখ্যা সমাবেশের প্রয়োজন হইল।

খাতাপত্রে জার্মানীর কর্মক্ষম সাবালক পুরুষের সংখ্যা ছিল এক কোটি ৪৫ লক্ষ—অবশ্য কৃষিকার্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও যান-বাহনের কর্মনিরত পুরুষদের সংখ্যা বাদ দিয়া। তথাপি দেখা গেল যে, বিদেশী শ্রমিক নিয়োগ করা সত্ত্বেও যুদ্ধের জন্য কাজের চাপ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে এবং আরও লোকের প্রয়োজন। সমস্ত প্রকার ব্যবসায় ও বৃত্তি হিসাব করিলে পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়াসহ জার্মানীতে রুটি অর্জনকারীর জনসংখ্যা ছয় কোটির চেয়ে খুব বেশী ছিল না। অধিকৃত দেশগুলিতে এই সংখ্যা ছিল চার কোটি। জার্মানীর মিত্র দেশগুলিতে রুটি অর্জনকারীদের সংখ্যা ছিল তিন কোটি ৭৫ লক্ষ। এই হিসাবে জার্মানীর পক্ষে মোট ১৪ কোটি সক্ষম লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু অপর দিকে সমরাস্ত্রের কারখানার জন্য উপযুক্তসংখ্যক লোকের দরকার ছিল। আর দরকার ছিল ইউরোপের অধিকৃত দেশগুলিতে খাদ্য জোগান দেওয়ার দায়িত্ব পালন করা বিজেতা হিসাবে। সুতরাং এই সমস্ত দাবী পূরণের পর জার্মানীর বাকী লোকসংখ্যা যথোপযুক্ত ছিল না—নাৎসীদের অভিযোগের এটাই ছিল মূল কথা।

কিন্তু এত শ্রমিক কোথা হইতে পাওয়া যাইবে? অবশ্য জার্মানীর সামনে দুইটি পথ খোলা ছিল—প্রথমতঃ বিদেশ থেকে আমদানি করা শ্রমিক এবং দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলোক। ১৯৪১ সালের বসন্তকালের হিসাবে দেখা যায় যে, উৎপাদনের জন্য মোট দুই কোটি ৫০ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত হইয়াছিল। এর সঙ্গে বোধ হয় যুক্ত হইল আরও বিশ লক্ষ যুদ্ধবন্দী রাস্তাঘাট, ক্ষেতখামার ও কলকারখানার কাজে। আর স্ত্রীলোকের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৩৯ সালে শ্রমশিল্পের কাজে আশি লক্ষ স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইয়াছিল—এই সংখ্যাটাকে এক কোটিতে দাঁড় করাইবার চেষ্টা হইল। বলা বাহুল্য যে, কর্মচারী ও শ্রমিকের সংখ্যা বাঁচাইবার জন্য যত প্রকার কৌশল ও কঠোরতা অবলম্বন সম্ভব, তেমন চেষ্টা করা হইল, দেশব্যাপী মিতব্যয়িতার চেষ্টা হইল, গৃহস্থালী দ্রব্যের ব্যবহার কমাইয়া দেওয়া হইল, হাতের বদলে যথাসম্ভব মেসিনের দ্বারা কাজ চালাইবার চেষ্টা হইল। সহজ কথায় লক্ষ্য দাঁড়াইল নূতন সৈন্যদল সংগ্রহ ও নূতন অস্ত্রসম্ভার উৎপাদন।

অতএব নাৎসী বড়কর্তারা নূতন সৈন্য সংগ্রহের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিতে। জেনারেল কাইটেল গেলেন বুদাপেস্টে ও বুখারেস্টে। আর গোয়েরিং গেলেন রোমে মুসোলিনীকে ভজাইবার জন্য। কিন্তু গোয়েরিংয়ের বিচিত্র সাজসজ্জা ও হীরক অলঙ্কার সেখানে ইতালীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিয়ানোর বিদ্রূপ উদ্রেক করিল। তিনি মন্তব্য করিলেন—গোয়েরিংকে বড় দরের 'অপেরা বেশ্যার মত' দেখাইতেছিল। মুসোলিনী অবশ্য গোয়েরিংকে মার্চ মাসে দুই ডিভিসন সৈন্য দেওয়ার

প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু পূর্ব রণাঙ্গনে হিটলারের জয়লাভ সম্পর্কে তিনি তাঁর সংশয় চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না।[১]

তখন হিটলার স্বয়ং মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত করিলেন। ২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল স্যালজবুর্গের একটি চটকদার পুরানো প্রাসাদে—যেটিকে ফ্রান্স থেকে আহৃত মূল্যবান আসবাবপত্র, কার্পেটে ও চিত্রাবলীতে জমকালোরূপে সাজানো হইয়াছিল, সেখানে হিটলার ও মুসোলিনীর আবার সাক্ষাৎ হইল। এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউণ্ট চিয়ানো লিখিয়াছেন যে, তিনি এই প্রথম ফুরারকে 'ক্লান্ত' দেখিলেন। 'রাশিয়ায় শীতের মাসগুলিতে হিটলারের শরীরের উপর বিষম ধকল গিয়াছে। এই প্রথম তাঁর চুলে পাক ধরিয়াছে।'

হিটলারের প্রিয়তম ভক্ত গোয়েবলসও এই সময় (মার্চ মাসে) হিটলারের সদর দপ্তরে তাঁর প্রভুকে অসুস্থ দেখিয়া প্রায় আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিলেন। গোয়েবলস তাঁর ডায়েরীতে মন্তব্য করিয়াছেন—'ইতিমধ্যেই তাঁর চুল যেন সাদা হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন যে, মাঝে মাঝে তাঁর মাথা ভয়ানক ঝিনঝিন করে। ফুরারের এই অবস্থা দেখিয়া সত্যই আমার খুব কষ্ট হইল তুষার ও বরফ সম্পর্কে ফুরারের একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা কিম্বা দৈহিক প্রতিক্রিয়া আছে। ফুরারের সবচেয়ে দুশ্চিন্তা হইতেছে যে, রাশিয়া এখনও নিদারুণ বরফে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।'

পূর্ব রণাঙ্গনে শীতকালীন যুদ্ধের কী প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছিল ব্যক্তিগতভাবে খোদ হিটলারের উপর পর্যন্ত, এই সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শীর নির্ভরযোগ্য বিবরণ তার প্রমাণ। সুতরাং জার্মানবাহিনীর অবস্থাও অনুমান করা যাইতে পারে।...

হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে আলোচনা শুরু হইল। কিন্তু আলোচনা অর্থে একমাত্র হিটলারই বক্তা, আর বাকি সকলে শ্রোতা মাত্র। হিটলার একটানা ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট বকিয়া গেলেন, কোথাও থামিলেন না। যুদ্ধ, শান্তি, ধর্ম, আর্ট, দর্শন ও ইতিহাস—এমন কোন বিষয় ছিল না যা নিয়া হিটলার তাঁর বিদ্যা জাহির না করিলেন। সকলেই বোধহয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। মুসোলিনী বার বার তাঁর রিস্টওয়াচের ওপর তাকাইতে লাগিলেন। জেনারেল জডল বহু চেষ্টা করিয়াও মাথা খাড়া রাখিতে পারিলেন না। শেষ পর্যন্ত চৌকির উপর ঘুমাইয়া পড়িলেন। আর বশংবদ কাইটেল কোনমতে তাঁর মাথা খাড়া করিয়া রাখিলেন, তিনি হিটলারের বড় কাছাকাছি বসিয়াছিলেন।...

কথার এই 'গলিত তুষার স্তূপের' পর অবশ্য হিটলারী হাইকমাণ্ড বুঝিতে পারিলেন যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযানে তাঁরা তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে মোট ৫২ ডিভিসন সৈন্য পাইবেন। অর্থাৎ ১৩ ডিভিসন হাঙ্গেরীয়ান, ২৭ ডিভিসন রুমানিয়ান, ৯ ডিভিসন ইতালীয়ান, ২ ডিভিসন শ্লোভাক এবং ১ ডিভিসন স্পেনীয়। পূর্ব রণাঙ্গণের দক্ষিণ অংশে যে ৪১ ডিভিসন নূতন সৈন্য নিয়োগ করা হইবে, তার অর্ধেক বা ২১ ডিভিসন ছিল এই তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির—হাঙ্গেরীয় ১০, ইতালীয় ৬ এবং রুমেনীয় ৫ ডিভিসন। এদের সামরিক যোগ্যতা যদিও সন্দেহজনক ছিল, তবু জার্মানীর পক্ষে এদেরকে গ্রহণ না করিয়া উপায় ছিল না—যদিও এর অভিষ্যৎ ফলাফল গুরুতর হইয়াছিল।[২]

১। শাইরার—পৃঃ ১০৮৬।
২। পূর্বোধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ১০৮৬-১০৮৭।

অপরপক্ষে রাশিয়ারও প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল। হিটলার কর্তৃক ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মাভিযানের ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্র সাড়ে ৬ কোটি থেকে ৭ কোটি নর-নারী-অধ্যুষিত অঞ্চল হারাইয়াছিল এবং ১৯৪১ সালের জুন মাস থেকে ১৯৪২ সালের মে মাস পর্যন্ত রাশিয়ার সম্ভবতঃ ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ভূমিগত ও শ্রমশিল্পের ক্ষতিও হইয়াছিল বিপর্যয়কর।[১]

একজন বৃটিশ সমর-ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, প্রথম গ্রীষ্মাভিযানে রাশিয়ার প্রায় সমগ্র ট্যাঙ্কবহর—২০ হাজার ট্যাঙ্ক নষ্ট হইয়াছিল। অর্থনৈতিক ক্ষতি হইয়াছিল বিপর্যয়কর। ১৯৪০ সালের সংখ্যাকে যদি ১০০ বলিয়া ধরা যায়, তবে দেখা যাবে কয়লা নষ্ট হইয়াছে শতকরা ৫৭ ভাগ, কাঁচা লোহা ৬৮ ভাগ, ইস্পাত ৫৮ ভাগ, এলুমিনিয়াম ৬০ ভাগ এবং শস্য ৩৮ ভাগ। সোজা কথায় ১৯৪১ সালে হিটলারী আক্রমণের ফলে রাশিয়ার শ্রমশিল্পের উৎপাদন শক্তির অন্ততঃ অর্ধেক ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল।[২]

মেজর-জেনারেল ফুলার বলিতেছেন যে, ১৯৪১-এর জুন মাস থেকে জার্মানীর আক্রমণ ও সোভিয়েট ভূমি দখল করার ফলে রাশিয়ার মোট ১৮ কোটি ৪০ লক্ষ জনসংখ্যা হ্রাস পাইয়া ১২ কোটি ৬০ লক্ষে দাঁড়াইয়াছিল। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের উপর সোভিয়েট সরকারের কোন প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আর অর্থনৈতিক দিক দিয়া অবর্ণনীয় ক্ষতি হইয়াছিল। যেমন—খাদ্যদ্রব্য ৩৮ শতাংশ, কয়লা ও বৈদ্যুতিক শক্তি ৫০ ভাগ, লৌহ ও ইস্পাত ৬০ ভাগ, ম্যাঙ্গানিজ ও এলুমিনিয়াম ৫০ ভাগ এবং রাসায়নিক শ্রমশিল্প শতকরা ৩৩ ভাগ।[৩]

কোন কোন বিশিষ্ট আমেরিকান লেখকের মতে ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালীন অভিযানের প্রথম তিন মাসেই রাশিয়ার অন্ততঃ ৩০ লক্ষ সৈন্য ও ১৮ হাজার ট্যাঙ্ক নষ্ট হইয়াছিল।[৪]

প্রখ্যাত সমর-ঐতিহাসিক আলেকজাণ্ডার ভার্থ তাঁর রাশিয়ার যুদ্ধের প্রামাণিক গ্রন্থে 'রাশিয়া এ্যাট ওয়ার' লিখিয়াছেন যে, সোভিয়েট শ্রমশিল্পের যে কেবল নিদারুণ ক্ষতি হইয়াছিল, এমন নয়। শ্রমিকের সংখ্যাও প্রচণ্ডভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। সমগ্র সোভিয়েট অর্থনীতিতে ও শ্রমশিল্পে শ্রমিক ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা ১৯৪০ সালে ৩১·২ মিলিয়ান (৩ কোটি ১২ লক্ষ) থেকে হ্রাস পাইয়া ২৭·৩ মিলিয়নে (২ কোটি ৭৩ লক্ষ) দাঁড়াইয়াছিল। নভেম্বর মাসে এই সংখ্যা আরও হ্রাস পাইয়া ১৯·৮ মিলিয়নে (১ কোটি ৯৮ লক্ষ্য) দাঁড়াইল। কিছু শ্রমিককর্মচারী অধিকৃত এলাকাগুলিতে আটকা পড়িয়া রহিল।

সোভিয়েট রাশিয়ার সরকারী সামরিক ইতিহাসেও স্বীকার করা হইয়াছে যে, ১৯৪১ সালের শরৎকালে সামরিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়া রাশিয়া 'সবচেয়ে দুর্দিনের' ভিতর পড়িয়াছিল। কলকারখানা বা শ্রমশিল্পের উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগের বেশী হ্রাস পাইয়াছিল।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, নাৎসী জার্মানীর সর্বাত্মক আক্রমণে সোভিয়েট রাশিয়ায় এই সামরিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়া যাওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়া কিন্তু ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অথচ অন্য যে কোন রাষ্ট্র হইলে সম্ভবত ভাঙ্গিয়া পড়িত। এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সর্বনাশ থেকে সোভিয়েট রাশিয়া যে উপায়ে আত্মরক্ষা করিল, তাও যাদুবিদ্যার মত কম বিস্ময়কর নহে। যে সমস্ত কলকারখানা ও শ্রমশিল্প জার্মান আক্রমণের সম্ভাবনার মুখে পড়িল, সেগুলির অধিকাংশই সোভিয়েট সরকার বহুদূরে পিছনে—পূর্বদিকে সরাইয়া ফেলিলেন। এই সমস্ত শ্রমশিল্পের অধিকাংশই ছিল ইউরোপীয় রাশিয়ায়। কিংবা সোজা কথায় বলা যাইতে পারে, উত্তরে লেনিনগ্রাদ এলাকা, মধ্যে মস্কো এলাকা এবং দক্ষিণে উক্রাইনের মধ্য ও পূর্ব এলাকায়। মধ্য ও পূর্ব উক্রাইনের খারকোভ, নীপ্রোপেট্রোভস্ক, ক্রিভয় রগ, মারিয়ুপোল ও নিকোপোল এবং ডন অববাহিকা অঞ্চল শ্রমশিল্প ও কলকারখানায় শীর্ষ স্থান দখল করিয়াছিল। অর্থাৎ মস্কো ও লেনিনগ্রাদের মতই গুরুত্বসম্পন্ন ছিল। সোভিয়েট সরকার একটি বিষয়ে গোড়া থেকেই বুদ্ধিমানের মত সতর্ক হইলেন। হিটলারী বাহিনী লেনিনগ্রাদ, মস্কো, খারকোভ, কিংবা ডন অববাহিকা দখল করিতে পারুক, আর না-পারুক, সোভিয়েট সরকার কোন 'ভাগ্যের' অপেক্ষায় বা 'চান্সের' অপেক্ষায় রহিলেন না। তাঁরা হিটলারী আক্রমণের আশংকা ও সম্ভাবনা থেকে সমস্ত প্রয়োজনীয় সামরিক শ্রমশিল্প ও কারখানা বহুদূরে পূর্বাঞ্চলের দিকে অপসারণ করিলেন। কারণ, তাঁরা জানিতেন যে, এই সমস্ত শ্রমশিল্প যুদ্ধরত রাশিয়ার পক্ষে জীবন-মৃত্যুর তুল্য। সুতরাং এগুলিকে বাঁচাইতে হইবেই, কেবল বাঁচানো নহে, পুনরায় পূর্ণোদ্যমে এগুলির উৎপাদন ঘটাইতে হইবে।

"This transplantion of industry in the second half of 1941 and the beginning of 1942 and its 'rehousing' in the east must rank among the most stuependous organisational and human achievement of the Soviet Union during the war."—[১]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে সোভিয়েট রাশিয়ার এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে অসাধারণ। যুদ্ধের একেবারে গোড়া থেকেই শ্রমশিল্প ও কারখানাগুলি উরল পার্বত্য অঞ্চলে, ভল্গাবিধৌত দেশে, পশ্চিম সাইবেরিয়ায় এবং মধ্য এশিয়ায় স্থানান্তরিত হইতে লাগিল। বিশাল সোভিয়েট ইউনিয়নের ভৌগোলিক আয়তনও এই বিষয়ে সহায়ক হইয়াছিল। কেননা, নিরাপদ দূরত্বে অপসারণের স্থান পাওয়া গিয়াছিল।

কি পরিমাণ শ্রমশিল্প ও কলকারখানা কত দ্রুত অপসারিত হইয়াছিল? মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে হাজার হাজার!

"Altogether between July and November 1941 no fewer than 1523 industrial enterprises, including 1360 large war plants had been moved to the east—226 to the Volga area, 667 to the Urals, 244 to Western Siberia, 78 to Eastern Siberia, 308 to Kazakhastan and Central Asia.

"The 'evacuation cargoes' amounted to a total of one and a half million railway wagon loads!

১। আলেকজান্ডার ভার্থ—পৃঃ ২০৮।

"The transplantation of industry to the east at the height of the German invasion in 1941 is, of course, an altogether unique aciheve-ment..."—১

এমন অসাধ্য সাধন সম্ভবত একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। এটাকে এক ধরনের মিরাক্যাল বা অলৌকিক ঘটনাও বলা যাইতে পারে। সংগঠনের বিস্ময় ও শ্রমিক কর্মীদের নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য ও দেশবাসীর সহযোগিতাও সেই সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। অন্যথা সহস্রাধিক মাইল দূরে এভাবে শত শত বা হাজার হাজার কল-কারখানা কিংবা ১½ লক্ষ রেল-ওয়াগন ভর্তি মাল সরাইয়া নেওয়া সম্ভব হইত না। তবু কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, একেবারে সমস্ত কারখানাই অপসারণ করা নানা কারণে সম্ভব হয় নাই।

মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট সরকারীভাবে দাবী করিয়াছিলেন যে, জার্মানদের হাতে ৬০ লক্ষ গৃহ ধ্বংস হইয়াছিল, ফলে ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোক নিরাশ্রয় হইয়াছিল, ৭০ লক্ষ ঘোড়া, ১ কোটি ৭০ লক্ষ পশু ইত্যাদি জার্মানদের 'উদরে' গিয়াছে বা অপহৃত হইয়াছে। এ ছাড়া জার্মানী ও তার মিত্ররা ৩১৮৫০টি কারখানা—যে-গুলিতে যুদ্ধের আগে ৪০ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল, সেগুলিকে ধ্বংস করিয়াছে। ধ্বংস বা অপহৃত হইয়াছে ২,৩৯,০০০ ইলেকট্রো-মোটর এবং ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মেসিনটুল।

আলেকজান্দার ভার্থ বলিতেছেন যে, যদি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের দিকে নজর রাখিয়াও মিঃ মলোটোভ প্যারিসের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত সম্মেলনে এই বক্তৃতা দিয়া থাকেন (২৬ আগস্ট, ১৯৪৬) তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ব দিকে কল-কারখানা অপসারণ করা সত্ত্বেও অনেকগুলি পিছনে রহিয়া গিয়াছিল।

বলাই বাহুল্য যে, অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া এই সমস্ত কল-কারখানার পুনর্বিন্যাস করিতে হইয়াছে, বহু জায়গাতেই উপযুক্ত খাদ্য ও আশ্রয় ছিল না। যুদ্ধের দরুন অবস্থা বর্ণনাতীতরূপে ভয়াবহ ছিল। তবু মাতৃভূমি রক্ষার জন্য লোকেরা অর্ধভুক্ত অবস্থায়ও কাজ করিয়াছে—১২ ঘণ্টা, ১৩ ঘণ্টা, কোন কোন সময় এক নাগাড়ে ১৪।১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত। (মার্কিন লেখক পিটার ক্যালভোসোরেসি বলিয়াছেন যে, পূর্ব দিকে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ শ্রমিককর্মচারীকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।) তারা শুধু 'স্নায়ুমণ্ডলীর শক্তি'র উপর বাঁচিয়াছিল। অনেকে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া মারাও গিয়াছে। সাইবেরিয়ার সেই ভয়াবহ ঠাণ্ডায় (হিমাঙ্কের নীচে) অনেক শ্রমিককে প্রতিদিন পায়ে হাঁটিয়া এবং ৩ থেকে ৬ মাইল পর্যন্ত অতিক্রম করিয়া কারখানায় ডিউটি দিতে হইত এবং ডিউটি চলিত ১২ ঘণ্টা কিংবা তার চেয়েও বেশী। এই অমানুষিক পরিশ্রমের পর আবার তাদের পায়ে হাঁটিয়া বাড়ীতে ফিরিতে হইত এবং এই অবস্থা চলিয়াছিল দিনের-পর-দিন, মাসের-পর-মাস।

আরও আশ্চর্য কাহিনী এই যে, ৯ই নভেম্বর (১৯৪১) তারিখ যখন জার্মানরা 'মস্কোর আসন্ন পতন' নিয়া উচ্ছ্বাস করিতেছিল, তখন সেই চরম মুহূর্তে স্টেট ডিফেন্স কমিটি এই কড়া নির্দেশ জারী করিলেন যে, পূর্ব দিকে উৎপাদন ত্বরান্বিত করিতে হইবে এবং বিশেষভাবে সমরশিল্পের তালিকায় ১৯৪২ সালেই ২২ হাজার প্লেন

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ২১১।

এবং ২২ থেকে ২৫ হাজার (ছোট, বড় ও মাঝারি) ট্যাংক উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিতে হইবে।[১]

এক বছরে উৎপাদনের লক্ষ্যগুলিও মনে রাখার মত। কী মূল্যে যুদ্ধজয় করিতে হইয়াছে, তা ভাবিলে অভিভূত হইতে হয়! বিশেষত ভয়াবহ খাদ্যসংকটের পটভূমিকায় এই সমস্ত অবস্থা বিচার করা দরকার। কেননা, ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে জার্মানরা রাশিয়ার যে সমস্ত অঞ্চল দখল করিয়া নিল, সেগুলিতে শতকরা ৩৮ ভাগ গম ও তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য ও শতকরা ৮৪ ভাগ চিনি উৎপন্ন হইত। আর ওই সমস্ত অধিকৃত ভূভাগে ছিল শতকরা ৩৮ ভাগ গোমহিষাদি পশু ও শতকরা ৬০ ভাগ শূকর। অর্থাৎ মাংসজাতীয় খাদ্যেরও নিদারুণ অভাব দেখা দিল। সুতরাং যুদ্ধরত রাশিয়াকে কেবল সমরশিল্প ও শ্রমশিল্প উৎপাদনের জন্যই পূর্ব দিকের উপর নির্ভর করিতে হইল না, খাদ্য উৎপাদনের জন্যও পূর্বাঞ্চল সবচেয়ে বড় আশ্রয় হইয়া দাঁড়াইল। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালীন অভিযানে ডন অববাহিকা ও কিউবান অঞ্চল জার্মানরা দখল করিয়া নেওয়ায় ভল্গার তীরবর্তী দেশ—উরল, পশ্চিম সাইবেরিয়া ও কাজাকাস্থান থেকে রাশিয়াকে নতুন উদ্যমে খাদ্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করিতে হইল।

১৯৪২ সালের মধ্যভাগে রাজধানী মস্কো শহর যদিও অপরাজেয় ছিল, তবু শহরবাসীদিগকে অপরিমিত মূল্য দিতে হইয়াছিল। তাদের অদৃষ্টে শীতকালটা গিয়াছে ভয়ংকর অভিশাপের মত। উপযুক্ত খাদ্য নাই, পরিচ্ছদ নাই, ঘরে জ্বালানী ও ঘর গরম করার উপাদান নাই। অথচ নিদারুণ ঠাণ্ডায় (তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে) মাত্র দুটি কম্বল বা ওভারকোট (যদি তাও জুটিত) গায়ে দিয়া ঘুমাইতে হইত। ওদিকে বরফ জমিয়া জলের পাইপ ফাটিয়া যাইত, পাইখানা অব্যবহার্য হইয়া পড়িত। এই অবস্থার খাদ্যদ্রব্য দুর্লভ ছিল। আলু ও শাকসবজী বিশেষ পাওয়া যাইত না, রেশনেও অনেক জিনিস মিলিত না—যদিও মাথাপিছু দৈনিক ১৪ আউন্স থেকে ২৮ আউন্স রুটির বরাদ্দ ছিল। তবে, রেল ও গুরু কায়িক শ্রমের কর্মীরা এবং সৈন্য ও প্রতিরক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত ব্যক্তিরা মোটামুটি রেশন-নির্দিষ্ট জিনিস পাইতেন। দোকানে বাজারে গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য জিনিস পাওয়া যাইত না। চিনি, তামাক, স্নেহজাতীয় পদার্থ ও দুধ একেবারেই দুর্লভ ছিল। তবে, কোন কোন সময় 'আজগুবী দাম' দিলে কোন কোন বস্তু হয়তো পাওয়া যাইত। মস্কোর রাস্তায় যে সমস্ত লোক দেখা যাইত, তাদের চেহারা ছিল বিবর্ণ এবং 'ঝড়ো কাকে'র মত।[২]

এই প্রকার মর্মান্তিক ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে ১৯৪২ সালে সোভিয়েট রাশিয়াকে হিটলারের দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযানের মুখোমুখী দাঁড়াইতে ও প্রতিরোধ করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের এটা ছিল পরম বিস্ময়!

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২১৩, ২১৭।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৩৪৩-৪৪।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্বিতীয় অভিযানের লক্ষ্যবদল

১৯৪১ সালের গ্রীষ্মাভিযানে হিটলারী জার্মানী সোভিয়েট রাশিয়াকে সাবাড় করিতে ব্যর্থ হইল। কিন্তু তার দুরাশা ছিল বিপুল। বালটিক সাগর থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সহস্রাধিক মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে কিম্বা উত্তরে লেনিনগ্রাদ, মধ্যস্থলে মস্কো এবং দক্ষিণে উক্রাইন—গোটা ইউরোপীয় রাশিয়াকে হিটলার গ্রাস করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এক মাত্র দক্ষিণের কিয়েভ অঞ্চলে চমকপ্রদ জয় ছাড়া হিটলার বাকী উত্তরাংশের লেনিনগ্রাদে বা মস্কোতে কোন চূড়ান্ত জয় অথবা লালফৌজকে সাবাড় করিতে পারিলেন না। অধিকন্তু মস্কোতে পরাজিত হইলেন। কিন্তু তবু হিটলার নত হইবেন না, শূন্য হাতে বার্লিনে ফিরিয়া যাইবেন না—১৯৪২ সালে রাশিয়াকে জয় করিতেই হইবে। 'বর্বর বলশেভিকদের' মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। পশ্চিমের ঐতিহাসিকগণ—যেমন চেস্টার উইলমট, ক্যাপটেন লিডেলহার্ট প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, হিটলারের সেনাপতিদের কেহ কেহ হিটলারকে দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযানে—বিশেষতঃ লেনিনগ্রাদের দিকে আক্রমণ চালাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁদের মত দ্বিতীয়বার আক্রমণাত্মক অভিযান চালাইবার মত সম্পদ ও শক্তি জার্মান বাহিনীর নাই। তার চেয়ে বরং 'রণনৈতিক আত্মরক্ষার' নীতি অবলম্বন করিয়া লালফৌজের শক্তি ক্ষয়ের অপেক্ষায় থাকা উচিত। ইতিমধ্যে জার্মান বাহিনীর শক্তি সংরক্ষিত বা মজুত করা উচিত, 'পশ্চিম দিকের চূড়ান্ত যুদ্ধের' অপেক্ষায়।[১]

কিন্তু হিটলার এই পরামর্শ অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করিলেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া যাওয়া এবং রাশিয়া জয় করা যেন তাঁর এক দুর্দমনীয় নেশায় দাঁড়াইয়া গেল। সুতরাং অধিকৃত সমস্ত সম্পদ ও শক্তি তিনি আহরণ করিতে লাগিলেন দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযানের জন্য। অতএব নূতন নূতন অস্ত্র যেমন তৈয়ার হইল, নূতন সৈন্যদল যেমন সংগৃহীত হইল, তেমনি দেশের অভ্যন্তর ভাগে জার্মানদের যত কষ্টই হোক না কেন, রণক্ষেত্রের সর্বপ্রকার দাবী মিটাইবার জন্য হিটলারী সামরিক সঙ্ঘের কোন দিক দিয়াই চেষ্টার ত্রুটি রহিল না। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত এই যে, জার্মানীতে যে সমস্ত আধা-সামরিক সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলিকে এবার রণক্ষেত্রে নিয়োগ করা হইল সর্বপ্রকার ইঞ্জিনীয়ারিং কাজের জন্য। বড় বড় কনট্রাক্টরগণ এবং তাঁদের বিখ্যাত ফার্মগুলি রণাঙ্গনের কাজে লাগিয়া গেল তাদের লোকজন ও যন্ত্রপাতি লইয়া। আগে সাধারণতঃ সৈন্যবাহিনীর একটা বিশেষ অংশই এই কার্য করিত এবং তারা অনেক সময় স্থানীয় সাহায্য ও দ্রব্যাদির উপর নির্ভর করিত। এতে অবশ্য অসুবিধাও ছিল অনেক। কিন্তু এবার জার্মানীর সুবিখ্যাত টড সংগঠনের দৃষ্টান্তে বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহ রণক্ষেত্রের সর্বপ্রকার গঠনকর্মের ও মেরামতি কাজের ভার লইল যেমন—রাস্তাঘাট তৈয়ারি, টেলিগ্রাফ বা টেলিফোন লাইন স্থাপন, ছোট

১। 'The Struggle For Europe'—Chestor Wilmot. P. 103,

বড় নানাপ্রকার ব্রীজ তৈয়ারি, টানেল বা সুড়ঙ্গ-পথ খনন ইত্যাদি কাজে এই সমস্ত ফার্ম আগাইয়া আসিল, এরা ছিল দক্ষ, কর্মকুশলী ও বিশেষজ্ঞ। সুতরাং এদের দ্বারা নির্মানকার্য যেমন সহজে সাধিত হইত, তেমনি গুণগত দিক দিয়াও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইল। এই ব্যবস্থার আর-একটা সুফলও জার্মানী পাইয়াছিল। ইচ্ছামত নির্দিষ্ট বিন্দুতে সৈন্য চলাচল ও সমাবেশ ঘটাইতে নাৎসী সংগঠন রুশদের তুলনায় বেশী দ্রুততা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিয়াছিল। এর একটা বড় কারণ ছিল এই যে, দুর্ধর্ষ হিটলারী আক্রমণের ফলে রাশিয়ার অতি গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ ও যোগাযোগের রাস্তাগুলির একটা সর্ববৃহৎ অংশই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছিল। ফলে রাশিয়ার সৈন্য চলাচলে ও যোগাযোগ রক্ষায় বিষম বেগ পাইতে হইয়াছিল। অপর পক্ষে জার্মানীর ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম ও যুদ্ধবন্দীরা রাস্তাঘাট ও রেলপথের দায়িত্ব নিয়াছিল।[১]

নূতন অভিযানের জন্য হিটলারী সমর সংস্থার পক্ষে যতটা আয়োজন করা সম্ভব, তা করা হইয়াছিল। তথাপি গোড়াতেই লক্ষ্য করিবার এই যে ১৯৪১ সালের মত সেই দিগন্তব্যাপী রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল না। বরং এই অভিযান সীমাবদ্ধ রণক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইল। আর লেলিনগ্রাদ, মস্কো ও উক্রাইন—একই সঙ্গে 'দশদিকে' সামরিক শোভাযাত্রার অদ্ভুত সমারোহ নয়, শুধু মাত্র একদিকে—দক্ষিণ দিকে এই অভিযান অনুষ্ঠিত হইবে এবং তারও আশু লক্ষ্য লালফৌজ সংহার নয়, 'অর্থনৈতিক জয়লাভ', কিম্বা রাশিয়ার অর্থনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে চরম আঘাত! রণনীতির লক্ষ্য যেন অর্থনীতির মধ্যে গিয়া রূপান্তরিত হইল। কিন্তু কেন?

মেজর জেনারেল ফুলার বলিতেছেন ঃ

'To grasp the full import or the German second summer campaign in Russia it is necessary to bear in mind the aim of their first summer campaign. It was as we have seen not to conquer all Russia, but instead by advancing in the main vital areas of operations, to compell the Russian armies to protect them and to destroy those armies as and when met. Tactical annihilation was the strategic aim.'

'...this strategy failed because speed was low, space too vast and force (opposition) too great.'

সংক্ষেপে—'জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযানে সমগ্র রাশিয়া দখল করিতে চাহে নাই। কিন্তু রাশিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিতে লালফৌজকে ডাকিয়া আনিয়া সেগুলির আত্মরক্ষায় বাধ্য করা এবং এবং এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র এদেরকে ধ্বংস করা। অর্থাৎ রণনীতির আসল উদ্দেশ্য ছিল রণকৌশলের দ্বারা লালফৌজকে সাবাড় করা।

কিন্তু ১৯৪২ সালের এই রণনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। কারণ, গতিবেগ ছিল অল্প, আয়তন ছিল সুবিশাল এবং প্রতিপক্ষের শক্তি ছিল অনেক বেশী।'

কিন্তু ১৯৪১ সালের অবস্থা যখন হিটলারী জার্মানীর অনুকূলে ছিল, তখন যা সম্ভব ছিল, তা হয় নাই। এখন ১৯৪২ সালের অপেক্ষাকৃত কম অনুকূল অবস্থায় সেই

১। 'রুশ-জার্মান সংগ্রাম'—পৃষ্ঠা ২১৪-১৫।

একই রণনীতির সাফল্যের কোন সম্ভাবনা আছে কি?—হিটলারী মতে—'না'। সুতরাং বিকল্প পন্থার কথা ভাবিতে হইবে। সেই বিকল্প পন্থা কি?

'Therefore the alternative was to substitute a strategy of exhaustion for that of annihilation. To do so by tactical attrition was out of the question, for, even had it been possible, it would have taken too long. To do so morally that is, by formenting a counter-Bolshevik revolution—was also out of the question; therefore, the sole way open was to strike at Russia's economic power—the material basis of her fighting strength.'

অর্থাৎ 'একমাত্র বিকল্প ছিল নিধনের চেয়ে নিঃশেষিত করণের রণনীতি গ্রহণ করা। কিন্তু রক্তক্ষয়কারী রণকৌশল অনুসরণের দ্বারা এটা করার কোন প্রশ্নই উঠে না—যদি এটা সম্ভবও হইত, তবু অনেক দীর্ঘ সময় লাগিয়া যাইত। নৈতিক দিক দিয়া—অর্থাৎ বলসেভিজমের বিরুদ্ধে পালটা প্রতিবিপ্লব ঘটানো, এটা করাও সম্ভব ছিল না। সুতরাং হিটলারের সামনে একমাত্র রাস্তা খোলা ছিল রাশিয়ার অর্থনৈতিক শক্তিকে আঘাত করা—যে বৈষয়িক ভিত্তির উপর রাশিয়ার সামরিক শক্তি দণ্ডায়মান, সেই শক্তিকে চূর্ণ করা।'[1]

'অতএব রাশিয়ার যেখানে অর্থনৈতিক ও শ্রমশিল্পের এবং খাদ্য ইত্যাদি সহ কাঁচামালের ঐশ্বর্য সবচেয়ে বেশী সেই দক্ষিণ দিকেই জার্মান হাইকমাণ্ড মন দিলেন। ১৯৪১ সালেও সেখানে অভূতপূর্ব জয় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—সেখানে ভূমি সমতল, প্রাকৃতিক বাধা কম এবং যান্ত্রিক যুদ্ধের পক্ষে খুব সুবিধাজনক। তারপর উক্রাইনের শস্য, খনিজ সম্পদ এবং ককেসাসের তৈল হস্তগত হইলে রাশিয়া যেমন অর্থনীতি ও রণনীতি উভয় দিক দিয়া বিপদে পড়িবে, জার্মানী সেই অনুসারে লাভবান হইবে। অতএব ১৯৪২ সালের হিটলারী অভিযানকে পুরাপুরি সামরিক বলা যায় না। অর্থাৎ লালফৌজকে সাবাড় করিয়া রাশিয়াকে জয় করাই উহার প্রত্যক্ষ সামরিক লক্ষ্য ছিল না, ছিল ভূমিগত জয়ের দ্বারা অর্থনৈতিক ঐশ্বর্য লাভ এবং উহার প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়াকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেওয়া।

'১৯৪২ সালের নাৎসী রণ-পরিকল্পনা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল প্রথমতঃ রস্টোভ-স্ট্যালিনগ্রাদ-ভরোনেজ—এই ত্রিভুজটিকে দখল করা। পরে এই ত্রিভুজের দুই পার্শ্ব ধরিয়া শক্তিশালী মোটরারূঢ় বাহিনী কর্তৃক ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালানো। এই আক্রমণের বাম পার্শ্ব ভরোনেজ এলাকা ধরিয়া মস্কো, ভল্গা ও উরালের সহিত সমস্ত সংযোগ নষ্ট করিয়া দিবে এবং ভল্গা নদীর পথে স্যারাটোভের সংযোগও বিচ্ছিন্ন করিবে। এর দক্ষিণ পার্শ্ব উত্তর ককেসাসের কিউবান ভূমির শস্যক্ষেত্র ও গ্রোজনীর তৈলখনি দখল করিয়া রাশিয়াকে সমস্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত করিবে। এমন কি ককেশাস ডিঙ্গাইয়া এই অভিযান মধ্যপ্রাচ্যে লিবিয়াজয়ী জেনারল রোমেলের সহিতও হাত মিলাইতে পারে এবং ইরাক, ইরান, মিশর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও ট্রান্স-ককেশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ বপন করিয়া সহযোগিতার হস্তও প্রসারিত করিতে পারে।'[2]

১। 'দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার'—মেজর-জেনারেল ফুলার, পৃষ্ঠা ১৭৮-৭৯।
২। রুশ-জার্মান সংগ্রাম—পৃঃ ২১৬-১৭।

জার্মান হাইকমাণ্ডের এই পরিকল্পনার প্রমাণস্বরূপ একটা দলিলও রুশ কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়িয়াছিল। সোভিয়েট বিপ্লবের ২৫তম বার্ষিক উৎসবে মঃ স্ট্যালিন এই দলিলের উল্লেখ করেন। এতে জার্মান অভিযানের এই 'টাইম টেবিল' এবং নির্দিষ্ট স্থানগুলি দখলের সম্ভাব্য তারিখও উল্লিখিত হইয়াছিল। ১৫ই জুলাই লেনিনগ্রাদ দখলের পর ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে আরজামাস (মস্কো থেকে কাজান ও উরলের সঙ্গে সংযোগকারী প্রধান রেলপথের একটি জংশন) দখলের দ্বারা সমগ্র অভিযান ঘড়ির কাঁটার মত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া ছিল।[১]

১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে এই পরিকল্পনার অন্ততঃ অংশ বিশেষ তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে জানাজানি হইয়াছিল। সেই সময় 'লণ্ডন টাইমসের' স্থানীয় সংবাদদাতা ১৬ই এপ্রিল লিখিয়াছিলেন যে, তুরস্কের বিশেষজ্ঞরা দুইটি সম্ভাব্য জার্মান পরিকল্পনা নিয়া আলোচনা করিতেছেন। একটি হইতেছে ককেশাস প্ল্যান, অপরটি হইতেছে ভল্গা প্ল্যান। প্রথমটির উদ্দেশ্য হইতেছে ককেশাসকে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য হইতেছে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর দক্ষিণ দিকের আর্মিকে মধ্য রণাঙ্গনের বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং পরে পিছন দিক থেকে মস্কো রক্ষাকারী সৈন্যদের আক্রমণ করা।

কাউণ্ট চিয়ানোর ডাইরীতে দেখা যায় যে, রিবেনট্রপ তাঁকে বলিয়াছিলেন যে, আগামী অভিযানে তৈলকূপগুলি হইতেছে রাজনৈতিক-সামরিক লক্ষ্যস্থল। 'যখন রাশিয়ার তেল ফুরিয়ে যাবে, তখন রাশিয়া নতজানু হবে।'[২]

কিন্তু তৈলের জন্য হিটলারের এত পিপাসা কেন? কারণ, যুদ্ধের আগে ১৯৩৯ সালে যেখানে জার্মানীর হাতে ছিল ৭০ লক্ষ টন তৈল, সে-ক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালে জার্মানীর সমগ্র তেলের সরবরাহ ছিল মাত্র ৮৯ লক্ষ ২৯ হাজার টন। এই অবস্থায় সে কোনমতে তার সামান্য মজুত ভাণ্ডার থেকে তেল যোগাড় করিয়াছে। বছরের শেষে হিটলারের হাতে ছিল মাত্র সাত লক্ষ ৯৭ হাজার টন (নৌবিভাগের বরাদ্দ বাদে) সামরিক অ-সামরিক উভয় প্রয়োজনের জন্য। অর্থাৎ এক মাসেরও পুঁজি নয়! সমস্ত তৈলের উৎস ভাঙ্গাইয়াও হিটলারের পক্ষে বছরে এক কোটি বিশ লক্ষ টনের বেশী অপরিশোধিত তৈল সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। কৃত্রিম তৈলের কিছু ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু অপর পক্ষে রুমানিয়ার তৈলকূপের উৎপাদন হ্রাস পাইয়া গিয়াছিল। রুমানিয়ার ডিক্‌টেটর জেনারেল আন্টোনেস্কু রিবেনট্রপকে পরিষ্কার বলিয়াছিলেন—'রুমানিয়ার ক্রুড্‌ অয়েল যতটা সম্ভব দেওয়া হয়েছে, তার বেশী রুমানিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে, তৈলসমৃদ্ধ দেশগুলি দখল করে নেওয়া।'

রুমানিয়ার ডিক্‌টেটরের সঙ্গে এই বিষয়ে জার্মানীর ডিক্‌টেটরও একমত হইলেন। ১৯৪২, জুন মাসে ককেসাসের দিকে গ্রীষ্মাভিযানের আগে হিটলার তাঁর সেনানী-মণ্ডলীকে বলিলেন—

১। 'The Russian Campaigns of 1941-43'—Allen and Paut Muratoff, 1944, P. 72.

২। জে. এফ. সি. ফুলার—পৃঃ ১৭৯, পাদটীকা।

'যদি আমি মৈকোপ এবং গ্রোজনীর তৈল খনিগুলি না পাই, তবে, এই যুদ্ধ আমার বন্ধ করে দিতে হবে!'[১]

বলা বাহুল্য যে, তেল ছাড়া যান্ত্রিক যুদ্ধ অসম্ভব এবং নাৎসী রণদানবের তেলের ক্ষুধাও ছিল অপরিমিত। ১৯৪১-এর শেষভাগে পেট্রোল ও খাদ্য উভয় প্রকার সংকট দেখা দিল নাৎসী জার্মানীর। সুতরাং দক্ষিণ দিকের অভিযানের জন্য একটা বড় রকমের ছুতা পাইলেন হিটলার ও তাঁর সমরসঙ্গীরা। কিন্তু কেবল তেল নয়, সমস্ত প্রকার অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক সুবিধা লাভই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রচার-বিশারদ ডঃ গোয়েবেলস্ একেবারে পরিষ্কার করিয়াই নির্লজ্জ ভাষায় ঘোষণা করিলেন—

'It is not a war for the throne or altar. It is a war for grain and bread for a plenteous dinner-table, for plenteous breakfasts and suppers…a war for raw materials, rubbers, steel and iron ore'—[২]

অর্থাৎ—'এই যুদ্ধ সিংহাসনের বা পূজাবেদীর জন্য নয়। এটা শস্যের দানা ও রুটির জন্য লড়াই—পর্যাপ্ত প্রাতঃরাশ, পর্যাপ্ত নৈশভোজ এবং রবার, লোহা, ইস্পাত ও কাঁচামালের জন্য এই লড়াই!'…সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে—এই যুদ্ধ ডিনার টেবিলের জন্য যুদ্ধ!

নূতন গ্রীষ্মাভিযানের হিটলারী পরিকল্পনা সম্পর্কে সুপণ্ডিত ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট লিখিয়াছেন যে, হিটলার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আগের বছরের মত সমগ্র রণাঙ্গনে অভিযান চালনা বাস্তবতাসম্মত হইবে না। এজন্য দুই পার্শ্ব দেশের—লেনিনগ্রাদ ও ককেশাসের কথা তিনি চিন্তা করিলেন। এই অভিযানের প্রধান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইবে দক্ষিণ পার্শ্বদেশে কৃষ্ণসাগরের নিকটবর্তী এলাকায়। ডন ও ডনেৎস নদীগুলির মধ্যবর্তী 'করিডোর' (বা অন্তর্বর্তী পথ) ধরিয়া আগাইয়া যাওয়া হইবে এবং তারপর ডন নদীর নিম্নভাগে পেঁছিয়া এবং নদীটির দক্ষিণ দিকের বাঁক ও কৃষ্ণসাগরের মুখ যেখানে মিলিয়াছে, সেই জায়গাটা পার হইয়া এই অগ্রাভিযান দক্ষিণে ককেসাসের তৈলভুমির দিকে চলিতে থাকিবে এবং সেই সঙ্গে বামপার্শ্বের পূর্ব দিকে ভল্গা নদীর উপর স্ট্যালিনগ্রাদের দিকেও চলিতে থাকিবে।

সোজা কথায়, এক বাহু ডন নদী পার হইয়া ককেসাসের দিকে, অন্য বাহু ভল্গা নদী তীরবর্তী স্ট্যালিনগ্রাদের দিকে প্রসারিত হইবে।

এই দ্বিমুখী অভিযান ঠিক করিতে গিয়া হিটলার গোড়ায় ভাবিয়াছিলেন যে, স্ট্যালিনগ্রাদ দখল করিতে পারিলে উত্তর দিকের রাস্তা খুলিয়া যাইবে এবং সেই রাস্তা ধরিয়া ঘুরিয়া গিয়া মস্কো রক্ষাকারী সৈন্যবাহিনীকে পিছন থেকে ঘায়েল করা যাইবে! এমন কি তাঁর কোন কোন সেনাপতি উরাল পর্বত পর্যন্ত পূর্ব দিকে ধাওয়া করার পরামর্শও দিয়াছিলেন। কিন্তু জেনারেল হ্যালডার এই অভিযানের বিরোধিতা করিলেন এবং বলিলেন যে, এটা একটা অসম্ভব ব্যাপারের মত। অধিকন্তু তখন প্রতিভাত হইল যে, স্ট্যালিনগ্রাদ দখল করার উদ্দেশ্য হইল ককেসাসের অভিমুখে অগ্রসর হইবার পক্ষে স্ট্র্যাটেজিক ফ্ল্যাংক-কভার বা পার্শ্বদেশ রক্ষার রণনৈতিক আচ্ছাদন সৃষ্টি করা।[৩]

১। 'The Struggle For Europe'—Chestor Wilmot, P. 103 and 105.

২। 'The Second World War'—G. Debdrin, P. 249-50.

৩। হিস্ট্রি অব দি সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার—লীডেল হার্ট, পৃষ্ঠা ২৪৭।

হিটলার বহু তোড়জোড় করিয়া বহু ঢাকঢোল পিটাইয়া যে বার্বাবোসা পরিকল্পনা অনুসারে সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। কাজেই নূতনভাবে চিন্তা ও নূতন পরিকল্পনার দরকার হইল। ১৯৪২ সালের সেই দ্বিতীয় অভিযানের জন্য ১৯৪১, ১৯শে নভেম্বর জার্মান জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে এক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইল (এই সম্মেলন কোন কোন জার্মান সেনাপতি, যেমন জেনারেল রুণ্ডস্টেড নূতন অভিযানের বিরোধিতা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ।) এবং ১৯৪২-এর ৫ই এপ্রিল হিটলারের সদর দপ্তরে আগামী গ্রীষ্মাভিযানের পরিকল্পনা মঞ্জুর হইল। তখন হিটলারের সেই 'বিখ্যাত' ৪১নং নির্দেশনামা ('ডাইরেকটিভ নাম্বার ফরটিওয়ান') প্রচারিত হইল—যে নির্দেশ অনুসারে দক্ষিণ দিকে ও স্ট্যালিনগ্রাদে অভিযান অনুষ্ঠিত হইল।

এই নির্দেশনামায় অবশ্য লেনিনগ্রাদ ও ককেসাসের দুই দিকে অভিযানের কথা বলা হইল। উত্তর দিকে লেনিনগ্রাদ দখল করিয়া ফিনিশদের সঙ্গে হাত মিলাইবার সংকল্প ব্যক্ত হইল। অবশ্য একথাও বলা হইল যে, অবস্থা বিবেচনায় সম্ভব হইলে এবং উপযুক্ত সৈন্যবল পাওয়া গেলে, তবেই লেনিনগ্রাদ অবরোধ সম্পূর্ণ করা ও জয় করা হইবে। কিন্তু দক্ষিণ দিকের রণক্রিয়ার উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইল এবং সেখানেই সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হইল। রাশিয়ার বাকি সৈন্যশক্তি ও সামরিক শক্তি ধ্বংস ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলি দখল করা হইবে। ককেসাসের তৈলখনি ও সমস্ত যোগাযোগের লাইন কাড়িয়া লওয়ার উপরেও নির্দেশনামায় জোর দেওয়া হইল।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২, হিটলার এক বক্তৃতায় বলিলেন, '৪১নং নির্দেশনামায় আমাদের কথা হইতেছে, শত্রুর শেষ শস্য উৎপাদন এলাকাগুলি দখল করা, দ্বিতীয়তঃ তার শেষ কয়লাখনিগুলি, তৃতীয়তঃ তার তৈল কেন্দ্রগুলি কাড়িয়া লওয়া কিম্বা রাশিয়ার বাকি অংশ থেকে সেগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া এবং এই আক্রমণাত্মক অভিযান সম্প্রসারণপূর্বক শত্রুর শেষ প্রধান জলপথের সংযোগ ভল্গা নদী বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া।

সংক্ষেপে, হিটলারের ইচ্ছা ছিল এই গ্রীষ্মাভিযানে রাশিয়ার অর্থনৈতিক শ্বাসরোধপূর্বক তার মৃত্যু ত্বরান্বিত করা।...

১৯৪২ সালে ইউরোপে কোন দ্বিতীয় রণাঙ্গন ছিল না। চার্চিলের কুটিল ও চতুর নীতির ফলে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রস্তাব কার্যতঃ বানচাল হইয়া গেল এবং উহার বদলে 'মধুর অভাবে গুড়' দেওয়ার মত উত্তর আফ্রিকায় ইঙ্গ-মার্কিন অভিযানের পরিকল্পনা গৃহীত হইল (পূর্বেই এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে)। কিন্তু এই পরিকল্পনা কখনও ফ্রান্সে বা পশ্চিম ইউরোপে প্রত্যক্ষ দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার মত সামরিক দিক থেকে চূড়ান্ত রকমের ছিল না। সুতরাং হিটলারী জার্মানী নিশ্চিন্ত ছিল এবং অধিকৃত ইউরোপের সমস্ত সম্পদ ও শক্তি শোষণ করিয়া হিটলার একমাত্র পূর্ব রণাঙ্গনে দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযানে মাতিয়া উঠিলেন।

কিন্তু কী পরিমাণ সৈন্যশক্তি এবার পূর্ব রণাঙ্গনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিযুক্ত হইল? হিটলারের হাতে তখনও ত্রিশ লক্ষ সৈন্য ছিল (ব্রিগেডিয়ার পিটার ইয়ংয়ের মতে)।

এই সংখ্যা সম্পর্কে যদিও কিছু কিছু মতভেদ আছে, তবু কিন্তু ২৫০ ডিভিসনের কম বলিয়া কেহ উল্লেখ করেন নাই। স্বয়ং স্ট্যালিন আগস্ট মাসে মস্কোর ক্রেমলিনে চার্চিলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও আলোচনার সময় দ্বিতীয় রণাঙ্গনের বিতর্ক প্রসঙ্গে মোট ২৮০ ডিভিসনের (জার্মানীর তাঁবেদার ও মিত্ররাষ্ট্রগুলিসহ) কথা বলিয়াছিলেন। মেজর-জেনারেল ফুলার (বৃটিশ) লিখিয়াছেন যে, দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযানে হিটলার ২২৫ জার্মান ডিভিসন ও ৪৩টি তাঁবেদার ডিভিসন—মোট ২৬৮ ডিভিসন নিয়োগ করিয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে প্রায় ৫০ ডিভিসন ছিল মোটরায়িত ও যান্ত্রিক ডিভিসন। আর রাশিয়ার পক্ষে ছিল ৩০০ ডিভিসন কিম্বা তারও বেশী।

রুশ ঐতিহাসিক জি. ডিবোরিন লিখিয়াছেন যে, ১৯৪২ সালের জুনমাসে জার্মানী পূর্ব রণাঙ্গনে ২৩৭ ডিভিসন সৈন্য মোতায়েন করিয়াছিল। ওর মধ্যে ১৮৪টি ছিল জার্মান। কিন্তু শরৎকালের মধ্যেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া মোট ২৬৬ ডিভিসনে দাঁড়াইল। এর মধ্যে জার্মান ডিভিসন ছিল ১৯৩। কিন্তু ১৯৪১ সালের মত সমগ্র পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানী সমাবেশ ঘটাইতে পারিল না, সেই শক্তি তার ছিল না।[১]

কিন্তু দক্ষিণ দিকের এই অভিযানের পিছনে জার্মানীর আর-একটি কূটনৈতিক সামরিক অভিসন্ধিও ছিল। তুরস্ককে জার্মানীর দলে টানিবার ইচ্ছা ছিল হিটলারের। (অবশ্য অপর দিকে চার্চিলও তুরস্ককে মিত্রপক্ষের দলে ভিড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। তুরস্ক কার্যতঃ দোটানায় ছিল)।

হিটলারী জার্মানী তুরস্ককে এই বলিয়া মদৎ দিতে লাগিল যে, দক্ষিণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে নাৎসী অভিযান জয়যুক্ত হইবেই। সুতরাং তুরস্ক যদি জার্মানীর সঙ্গে হাত মেলায়, তবে দক্ষিণ রাশিয়া জার্মানী ও তুরস্ক ভাগ করিয়া নিতে পারিবে। তুর্কি রাজধানী আঙ্কারাতে জার্মান রাষ্ট্রদূত ফ্রাঞ্জ ফন প্যাপেন তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীকে নানাভাবে ভজাইতে লাগিলেন এবং তুর্কি প্রধানমন্ত্রীও হিটলারের পক্ষপাতী ও সোভিয়েট বিরোধী ছিলেন। রাশিয়া ধ্বংস হোক, এমন ইচ্ছা তিনিও মনে মনে পোষণ করিতেন। রাষ্ট্রদূত ফন প্যাপেন তুর্কি প্রেসিডেণ্ট ইসমেৎ ইনোনুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ককেসাসে আসন্ন জার্মান অভিযান সম্পর্কে সংবাদ দিলেন এবং অনুরোধ করিলেন—এই সময় তুরস্কের উচিত তুর্কি-রুশ সীমান্তে তুর্কিসৈন্যের সমাবেশ ঘটানো। তুরস্ক এই অনুরোধে সাড়া দিয়া ২৬ ডিভিসন সৈন্য তুরস্ক-সোভিয়েট সীমান্তে সমাবেশ করিল। কিন্তু ভল্গার দিকে সোভিয়েট বাহিনীর নূতন আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু হওয়ায় তুরস্কের লড়াইয়ের উৎসাহে নিভিয়া গেল।

দক্ষিণ ইউরোপে তুরস্ক যেমন জার্মান উস্কানিতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সুদূর প্রাচ্যে জাপানেও তেমনি এক শ্রেণীর সোভিয়েট-বিদ্বেষী ১৯৪২-এর গ্রীষ্মে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য প্ররোচনা দিতেছিল। জাপানী সংবাদপত্রে এই মর্মে চীৎকার উঠিল যে, সোভিয়েট দূর প্রাচ্য 'নিজস্ব অধিকারবলেই' জাপানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। জাপানী সেনানীমণ্ডলী নূতন আক্রমণের জন্য একটা পরিকল্পনাও স্থির করিলেন এবং ১৯৪১ সালের মত কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াস্থিত জাপানী বাহিনীগুলিকে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে নির্দেশ দিলেন। তাঁরা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন স্ট্যালিনগ্রাদের পতনের জন্য। তাঁদের

১। 'The Second World War'—Deborin. P. 250-51.

দুর্ভাগ্য স্ট্যালিনগ্রাদের পতন হইল না। সুতরাং জাপানী জঙ্গীবাদীরাও নিরস্ত হইলেন।[১]

কিন্তু ককেসাসের বিরাট পেট্রোল সম্পদের প্রতি একমাত্র হিটলারী জার্মানীরই কি লুব্ধ দৃষ্টি ছিল? এই বিষয়ে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের মনোভাব কি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ছিল? অন্ততঃ সোভিয়েট লেখকগণ ইঙ্গ-মার্কিনের বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। রুশ ঐতিহাসিক জি. ডেবোরিন লিখিয়াছেন ঃ

'Hitler Germany was not the only country that coveted Soviet oil. The US and British imperialists had their eyes on it as well: and tried to make the most of the difficulties experienced by the Soviet Union. The Governments of the USA and Britain worked out a programme (known as the Velvet Plan) for deploying their troops from the Middle East to Caucasus, and each wanted to be ahead of the other···'—[২]

ককেসাসে সৈন্য পাঠাইবার এই প্রস্তাব অবশ্য মিঃ চার্চিল স্ট্যালিনের নিকটই উত্থাপন করিয়াছিলেন। বাহ্যতঃ বিপন্ন দক্ষিণ রাশিয়াকে রক্ষা করার 'সাধু উদ্দেশ্য' নিয়াই বৃটিশ সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই বৃটিশ প্রস্তাবের কথা জানিতে পারিয়া ওয়াশিংটনও আমেরিকান সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করিল। এমন কি, ট্রান্সককেশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলভাগ এবং কামচটকায়, এমন কি সাইবেরিয়াতে পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থনৈতিক, রণনৈতিক ও বৈমানিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট সম্মত হইলেন না।···

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে উত্তর প্রান্তিক রাশিয়ায় মরমনস্ক বন্দর পথে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক সাহায্য প্রেরণ (পি. কিউ. ১৯ নামে অভিহিত কনভয়) চার্চিলের নির্দেশে যেভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং বন্ধ করার ব্যাপারটা স্ট্যালিনকে না জানাইবার জন্য যে মনোভাব দেখানো হইয়াছিল, নিঃসন্দেহে সেই কাজ অন্ততঃ রাশিয়ার সেই বিপদের দিনে মিত্রজনোচিত কিম্বা সমীচীন ছিল না। এই ব্যাপারেও রাশিয়া ক্ষুব্ধ ছিল। অর্থাৎ ১৯৪২ সালে মিত্রপক্ষের কাছ থেকে রাশিয়া যথোচিত সহায়তা পায় নাই—অন্ততঃ রাশিয়ার এই অভিযোগ।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ দিকে জার্মানীর এই অভিযানের ও বাহিনীসমূহের প্রধান সেনাপতি ছিলেন ফিল্ড মার্শাল ফন বোক। যদিও ১৯৪১ সালের মত সমগ্র রণাঙ্গনব্যাপী হিটলারী তাণ্ডব অনুষ্ঠিত হয় নাই, তবু সেই সামরিক শক্তির প্রচণ্ডতা ছিল অসাধারণ। আগের বছরের মতই ১৯৪২ সালেও লালফৌজের দুর্ভোগ ও সংকট গিয়াছে অপরিমিত। যদিও ২৮ জুনের আগে নাৎসী জার্মানীর সত্যকার গ্রীষ্মাভিযান শুরু হয় নাই, তবু ওর ভূমিকাস্বরূপ ২৮ মে তারিখ ফিল্ড মার্শাল ম্যানস্টাইন কার্চ ও সেবাস্তোপোলের দিকে আক্রমণ চালাইলেন। মার্শাল টিমোশেঙ্কো এই আক্রমণ বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে ১২ মে খারকোভের দক্ষিণ দিকে এক তীব্র আক্রমণের অনুষ্ঠান করিলেন। কিন্তু এই আক্রমণ শেষ পর্যন্ত জার্মানদের পালটা আক্রমণের ফলে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ২৫৬।
২। ঐ—পৃষ্ঠা ২৬১।

এভাবে ১৯৪২ সালে যে দুর্যোগের শুরু হইয়াছিল, তার অবসানের সূচনা হইল স্ট্যালিনগ্রাদে লালফৌজের ঐতিহাসিক পালটা আক্রমণাত্মক অভিযানের ফলে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে।

* * *

কিন্তু ১৯৪২ সালে যুদ্ধের সংকটের দিনে সোভিয়েট রাশিয়ার আর-একটি যে ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, সে কথা উল্লেখ না করিলে এই সর্বাত্মক সংগ্রামে রাশিয়ার সর্বাত্মক আত্মরক্ষার তাৎপর্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যাইবে না। যুদ্ধের অনেক অথ্যের মত এই তথ্যও আমাদের দেশে জানা নাই যে, সেই সংকটের দিনে লেনিনের প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ধর্ম ও চার্চের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমঝোতা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যদিও কমিউনিজমের সঙ্গে নাস্তিকতা একাত্মভূত এবং সত্যকার কমিউনিস্ট মাত্রই নাস্তিক, তবু হিটলারী আক্রমণে বিপন্ন সোভিয়েট রাশিয়া নাস্তিকতা দূরে রাখিয়া গীর্জার সঙ্গে পরিপূর্ণ সম্ভাব সৃষ্টি করিয়াছিল। হঠাৎ এই কথাগুলি পড়িলে অবিশ্বাস্য মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রামাণিক সূত্রেই উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দুর্ধর্ষ স্ট্যালিন রাশিয়ার 'Orthodox' বা, সনাতন চার্চের' 'সঙ্গে দস্তুরমত মিত্রতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[১]

কিন্তু কেন এই সমঝোতা ও মিত্রতার দরকার হইল ? কারণ, তখন লক্ষ লক্ষ চাষী-কিষাণ-মজুর পরিবারের ছেলে রণাঙ্গণের কাজে, জীবন-মৃত্যুর আহবে যোগ দিয়াছিল, তারা—অন্ততঃ তাদের অভিভাবকেরা ধর্ম ও গীর্জা বিশ্বাস করিত। সুতরাং তাদের খাতিরেই গীর্জার সঙ্গে সম্ভাব স্থাপন করিতে হইল। এতকাল ধর্মের বিরুদ্ধে—ধর্ম আফিং তুল্য এবং কুসংস্কার মাত্র—এই সমস্ত প্রোপাগাণ্ডা যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে 'রাশিয়ায় ধর্ম সম্পর্কে সত্য কথা' নাম দিয়া মুদ্রণ পারিপাট্যে অপূর্ব একটি পুস্তক প্রকাশ করা হইল এবং এই পুস্তকে প্রচার করা হইল যে, রাশিয়ায় ধর্মের কোন বিরোধিতা নাই। ১৯৪১ সালে স্ট্যালিনের এক বক্তৃতা থেকেই 'জাতীয়তা' ও পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি প্রোপাগাণ্ডার বান ডাকিয়াছিল এবং 'মহান স্বদেশাত্মক যুদ্ধ' (the Great Patriotic War এই নাম দিয়া অজস্রভাবে প্রচার শুরু হইয়াছিল। সুতরাং এই অবস্থায় গীর্জাকে, খৃস্টধর্মকে নিশ্চয়ই জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেমের বেদী থেকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখা যায় না। বিশেষতঃ লক্ষ লক্ষ যুবক যখন রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতে উদ্যত, তখন তাঁদের পিতামাতা ও স্ত্রী-পুত্রের মনোভাবও উপেক্ষা করা যায় না এবং তাঁদের নিরাপত্তা বা কল্যাণের জন্য গীর্জায়-গীর্জায় প্রার্থনা করারও দরকার হইত। পরিপূর্ণ জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা সেদিন সোভিয়েট রাশিয়াতে অপরিহার্য ছিল। বিশেষতঃ জার্মানী ও আমেরিকায় একদল বিরোধী ধর্মের ব্যাপার নিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইতেছিল। সুতরাং তাদের মুখ বন্ধ করারও প্রয়োজন হইল। তার চেয়েও গুরুতর ব্যাপার এই ছিল যে, উক্রাইনের জাতীয়তাবাদীরা, যাঁরা ধর্ম ও গীর্জায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা জার্মানদের প্রচারের খপ্পরে পড়িলেন এবং 'নাস্তিক্যবাদী বলশেভিক শাসন' থেকে মুক্তিলাভের জন্য নাৎসী বিজেতাদের শরণ নিলেন। সুতরাং এই অবস্থায় চার্চের পুনর্বাসন না ঘটাইয়া উপায় ছিল না।

১। আলেকজাণ্ডার ভার্থ—পৃঃ ৩৯৪-৪০৩।

স্বয়ং স্ট্যালিন চার্চের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং মনে মনে কিছুটা দরদও অনুভব করিতেন বলিয়া প্রকাশ। এমন কি, তিনি চার্চকে এতদূর সমর্থন ও সহায়তা করিতে লাগিলেন যে, গোঁড়া কমিউনিস্টরা এই নিয়া গুঞ্জন শুরু করিলেন এবং ব্যাপারটা 'Un-Leninst' বা লেনিন-বিরোধী কার্য হইতেছে, এমন সমালোচনাও ধ্বনিত হইল। কিন্তু স্ট্যালিন পিছু হটিলেন না। মস্কোতে দ্বিতীয় ভ্যাটিকান প্রতিষ্ঠিত হোক, এমন ইচ্ছাও তিনি পোষণ করিতেন। বিদেশীরা মনে করিতেন যে, স্ট্যালিন ছোটবেলা ধর্মীয় স্কুলের ছাত্র ছিলেন, এজন্যই ধর্ম ও চার্চ সম্পর্কে তাঁর 'কোমল মনোভাব' ছিল। মস্কোস্থিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার আর্চিবল্ড কেরু বলিয়াছেন যে, ১৯৪৪-এর শেষভাগে তাঁর সঙ্গে স্ট্যালিনের যখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন 'মার্শাল তাঁকে ভরসা দিয়াছিলেন যে, তিনিও তাঁর নিজস্বভাবে ভগবানে বিশ্বাস করেন।' অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে স্ট্যালিন নিশ্চয়ই ভগবানে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু ১৯৪২ সালে যুদ্ধের নিদারুণ সংকটের দিনে এবং 'মহান স্বদেশাত্মক যুদ্ধের' জাতীয় ঐক্যের খাতিরে ধর্ম ও গীর্জার সঙ্গে স্ট্যালিন তথা সোভিয়েট সরকারের পরিপূর্ণ সমঝোতা করিয়া চলিতে হইয়াছিল। কারণ, সর্বাত্মক যুদ্ধ সর্বাত্মক চেষ্টার অপেক্ষা রাখে। এজন্য ধর্ম ও ধর্মযাজকদেরও প্রয়োজন ছিল।

ধর্ম ও যাজকদের সঙ্গে এই আপোষ রফার সুফলও ফলিয়াছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে নাস্তিকতার প্রচার করিয়া আর জনগণকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ রহিল না। এর ফলে চার্চও স্ট্যালিনের প্রতি সুপ্রসন্ন হইল। এমন কি, স্ট্যালিনের দীর্ঘজীবন ও সাফল্য কামনা করিয়া গীর্জায় বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হইত এবং স্ট্যালিনকে 'পরম পিতার প্রতিনিধিরূপে'ও গণ্য করা হইত। দেখা যাইতেছে গভীর সংকটের দিনে জাতীয়তা ও ধর্ম কোনটিকেই উপেক্ষা করা যায় না।

সপ্তম অধ্যায়

ক্রিমিয়ায় জার্মান অভিযান

সেবাস্তোপোলের পতন

১৯৪২ সালের বসন্তকাল আসিল। কিন্তু গোটা এপ্রিল মাস ধরিয়া পূর্ব রণাঙ্গনে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটিল না। কেবল ব্রিয়ানস্ক ও লেনিনগ্রাদ এলাকায় এবং স্মলেনস্কের দিকে কিছু কিছু ছোট-বড় সংঘর্ষ ঘটিল, কিন্তু গুরুতর কোন ফল আনিল না। উক্রাইনেই প্রথম বরফ গলিতে শুরু করিল, এখানকার শীত উত্তর অঞ্চলের মত এত দীর্ঘতর কাল স্থায়ী নহে। কিন্তু বরফ গলিয়া নদী-নালা-পরিখা ভর্তি হইয়া গেল, কাদায় ও জলে সৈন্যদের এবং বিশেষভাবে সাঁজোয়া গাড়ীগুলির চলাফেরা সম্ভব হইল না। জার্মানরা মনে মনে বোধ হয় খুশীই হইল, কেননা—তখনও তারা নূতন অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। বিশেষতঃ রুশ সৈন্যদলের আক্রমণে বিরতি ঘটায় তারা যেন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। কিন্তু সেই সঙ্গে সর্বত্র এই গবেষণা শুরু হইল—হিটলারী রণতাণ্ডব আবার কোথায় আরম্ভ হইবে? মধ্য রণাঙ্গনে কিংবা দক্ষিণে, অথবা ১৯৪১ সালের মতো যুগপৎ সর্বত্র আক্রমণ ঘটিবে? কিন্তু এই গবেষণার দীর্ঘ অবসর রহিল না। ৮ই মে ক্রিমিয়ার কার্চ উপদ্বীপে আক্রমণ শুরু হইল—যে উপদ্বীপটি শীতকালে রুশেরা জার্মানদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল। ক্রিমিয়ায় জার্মানদের এই আক্রমণকে ১৯৪২ সালের প্রাক-গ্রীষ্মাভিযান বলা যাইতে পারে, হিটলারের মতে উহাই ছিল বসন্তকালীন অভিযান। কিন্তু এই আক্রমণের দ্বারা হিটলারের রণনৈতিক উদ্দেশ্যের কিছুটা আভাস পাওয়া গেল—বুঝা গেল, হিটলারের ক্রূর দৃষ্টি দক্ষিণ রাশিয়ার উপরেই নিবদ্ধ। কার্চ দখল করিয়া জার্মানরা কি পূর্বদিকে টামান উপদ্বীপে পৌঁছিতে চাহে এবং সেখান হইতে ককেশাসে অভিযানই কি কার্চ আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য? কিন্তু কার্চ হইতে প্রণালীপথে ককেশাস অভিযান কার্যতঃ সম্ভব নহে। সুতরাং হিটলারের আসল মতলব ছিল প্রথমতঃ দক্ষিণ-পূর্ব উক্রাইন অভিযানের এই পশ্চাদবর্তী শক্তিশালী ঘাঁটিটা শত্রুকবলমুক্ত করা এবং দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণসাগর হইতে রুশ নৌবহরকে বিতাড়ন। এই নৌবহরের প্রধানতম এবং উৎকৃষ্টতম ঘাঁটি ছিল সেবাস্তোপোল, যার দুর্গ ও বন্দর ঐতিহাসিক। এই নৌদুর্গ রুশদের হাতছাড়া হইয়া গেলে কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহরকে সরিয়া যাইতে হইবে একেবারে পূর্বদিকে ককেশাসের নভরোসিস্ক ও তুয়াপ্‌সে ঘাঁটিতে কিংবা দূরবর্তী বাটুমে। কিন্তু এই নৌ-ঘাঁটিগুলির একটিও সেবাস্তোপোলের ক্ষতিপূরণ করিতে পারিবে না। ফলে জার্মানদের মতে কৃষ্ণসাগরে নাৎসী প্রভুত্বের বিস্তার হইবে, ককেশাসের উপর স্থলপথের সংযোগের চাপ হ্রাস পাইবে এবং বেচারা তুরস্ক (যার মন সংশয় দোলায় আন্দোলিত) আরও বেকায়দায় পড়িবে।*

---

* ১৯৪১ সালে জার্মানী বলকান রাজ্যগুলি গ্রাস করায় তুরস্ক ভীত হইল এবং 'নিরপেক্ষতা' বজায় রাখার জন্য জুন মাসে জার্মানীর সহিত বন্ধুতার চুক্তি ও সেপ্টেম্বরে আবার বৃটেনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করিল। ইতিমধ্যে আগস্ট মাসে রাশিয়া ও বৃটেন তুরস্ককে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। কারণ, জার্মানী তুরস্ককে যুদ্ধে নামাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তুরস্ক মনস্থির করিতে পারিল না।—লেখক

মানচিত্রে ক্রিমিয়া উপদ্বীপ যেন বিরাট সোভিয়েট মহীরুহের নিম্নতম শাখায় একটি ফলের মত বোঁটার দ্বারা ঝুলিয়া আছে। এই বোঁটাটি পেরেকোপের সংকীর্ণ যোজক। ভূমিপথের এই একমাত্র সংযোগ ছাড়া উত্তর-পূর্ব দিয়া খারকোভের সহিত রেলপথেরও যোগাযোগ রহিয়াছে। কিন্তু রাজধানী সিম্ফারপোলসহ অধিকাংশ ক্রিমিয়াই ছিল জার্মানদের হাতে—সেবাস্তোপোলও অবরুদ্ধ অবস্থায়। ক্রিমিয়া যেন সংকীর্ণ কার্চ প্রণালী দিয়া পূর্বদিকে ককেশসের প্রতি হাত বাড়াইয়া দিয়াছে—এই হাতের আঙ্গুলের ডগাটাকে কার্চ শহর বলা যাইতে পারে, যেখানে জার্মানরা প্রবল উদ্যমে আক্রমণ শুরু করিল। আত্মরক্ষার পক্ষে কার্চের অবস্থান নিতান্ত মন্দ ছিল না। কেননা, স্থানটি সংকীর্ণ ছিল বলিয়া আত্মরক্ষার উপাদানগুলিকে ঘন ও শক্তিশালী করিয়া তোলা সম্ভব ছিল। ফিয়োডোসিয়ার পূর্ব হইতে উপরের দিকে আজভ সাগর পর্যন্ত সরু গলাটা ১২ মাইলের বেশী চওড়া নহে এবং লম্বায়ও ৪০ মাইলের বেশী হইবে না। এই ধরনের সংকীর্ণ অঞ্চলে প্রকাণ্ড সৈন্যদল সমাবেশ যেমন সম্ভব নয়, তেমনই আয়তনে ছোট বলিয়া ইহাকে আধুনিক কায়দায় কংক্রীট, লৌহ ও ইস্পাতের দ্বারা দৃঢ় দুর্গায়িত অঞ্চলে পরিণত করাও অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছিল। ট্যাঙ্কমারা ফাঁদেরও কোন অভাব ছিল না। সুতরাং আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট উপযোগীই ছিল। কিন্তু কার্চ রণাঙ্গনের একটা গুরুতর অসুবিধা ছিল—এটা প্রণালীপথের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। যদিও এই প্রণালী মাত্র ৪ মাইল চাওড়া, তথাপি ইহার প্রধান সেনাপতির প্রধান শিবির বা হেড কোয়ার্টার ছিল ককেশাসের ক্রাসনোডারে, যেখান থেকে সরবরাহ ও যোগাগোগ রক্ষা এবং প্রয়োজনমত সৈন্যদল বৃদ্ধি করা হইত। জেনারেল কজনোভ ককেশাস-বাহিনীসহ কার্চেরও অধিনায়ক ছিলেন।

মে মাসে ক্রিমিয়ার মাটি শুকাইয়া শক্ত হইয়া উঠিল। সুতরাং যান্ত্রিক অভিযানের সুযোগ আসিল। ফিল্ড মার্শাল ফন বোক ছিলেন দক্ষিণ রণাঙ্গনের সর্বাধিনায়ক এবং কর্নেল জেনারেল ফন ম্যানস্টাইন ছিলেন ক্রিমিয়ার প্রধান সেনাপতি। খাঁটি জার্মান কায়দায় তিনি ব্লিজক্রিগের বাজ হানিলেন কার্চের বিরুদ্ধে—গোলন্দাজী দাপটে ক্ষুদ্র কার্চের বুক যেন ফাটিয়া গেল। উত্তর দিক দিয়া দুই মাইল সংকীর্ণ অংশে জার্মানরা প্রথম আক্রমণ শুরু করিল এবং প্রচুর গোলাগুলি ও বোমার দ্বারা তারা সাঁজোয়াবাহিনীর পথ করিয়া দিল। আক্রমণ বেশ ঘন দৃঢ় এবং সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল সৈন্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল। প্রকাণ্ড মর্টার কামান এবং প্রচুর বিমান (কাহারও কাহারও মতে সংখ্যায় পাঁচ শত) গোলা, অগ্নি ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্গীরণ করিতে লাগিল। তারপর কৃত্রিম কুয়াশায় আড়াল ধরিয়া ট্যাঙ্কগুলি অগ্রসর হইয়া গেল এবং আত্মরক্ষার ব্যূহ ভেদ করিয়া ফেলিল। কার্চরক্ষী রুশ সৈন্যদিগকে আজভ সাগরের দিকে ঠেলিয়া চাপিয়া মারিবার উপক্রম করিল। পিছন হইতেও কার্চ বিপদে পড়িল। জার্মান সৈন্যরা 'বার্জের' সাহায্যে পশ্চাতে অবতরণ করিল এবং কতক রুশ সৈন্যকে বিচ্ছিন্ন ও কামানসহ বন্দী করিল। যদিও আত্মরক্ষাকারী সৈন্যরা ঘোরতর সংগ্রাম করিল এবং দ্রুত পালটা-আক্রমণ চালাইল, তথাপি জার্মান ট্যাঙ্কের গতি রোধ করা গেল না। আত্মরক্ষার সম্মুখসারি বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং ২০শে মে-র মধ্যে বাকি কার্চও হাতছাড়া হইয়া গেল। এই সংকীর্ণ রণক্ষেত্রে তীব্র সংগ্রাম

ও প্রবল বাধাদান সত্ত্বেও জার্মান আক্রমণ হটানো গেল না। প্রবল সংখ্যাশক্তির কাছে কার্চ রক্ষাকারীদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

সদ্য অতিক্রান্ত শীতের লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের পর এই বসন্ত অভিযানের জয়কে জার্মানরা এমন ঢাকঢোল বাজাইয়া ঘোষণা করিল যে, হিসাবের অঙ্ক যেন দৌড় প্রতিযোগিতায় নামিল। জার্মানরা দাবী করিল যে, কার্চের এই যুদ্ধে রাশিয়ার ১৪টি পদাতিক ডিভিসন ও ২টি অশ্বারোহী ডিভিসন (৪টি ট্যাঙ্ক ব্রিগেডসহ) লইয়া গঠিত পুরা ৩টি আর্মি ধ্বংস এবং ১ লক্ষ ৬৯ হাজার রুশ সৈন্য বন্দী হইয়াছে। কামান ও ট্যাঙ্ক সেই অনুপাতে। মস্কো বেতারে ইহার জবাবে বলা হইল যে, এত সৈন্য দূরের কথা, সমগ্র কার্চ অঞ্চলে লোকসংখ্যাও এত ছিল না। বাস্তবিক এত সংকীর্ণ রণক্ষেত্রে এত অধিক সৈন্য সমাবেশ ও মহড়ায় খেলানো সম্ভব ছিল না। তথাপি দীর্ঘকাল পর জার্মানদের ইহা একটি সুনিশ্চিত জয়রূপে প্রতিভাত হইল।

এবার সেবাস্তোপোলের পালা। কার্চ দখলের পর জার্মানরা যে স্বভাবতঃই অবরুদ্ধ সেবাস্তোপোলের দিকে মন দিবে, সেটা বুঝিতে পারা কঠিন ছিল না। কিন্তু এই আক্রমণ অবিলম্বেই ঘটিল না। কারণ দক্ষিণ রণক্ষেত্রের সোভিয়েট সেনাপতি মার্শাল টিমোশেঙ্কো ইতিমধ্যে খারকোভ অঞ্চলে জার্মানদের উপর এক আকস্মিক
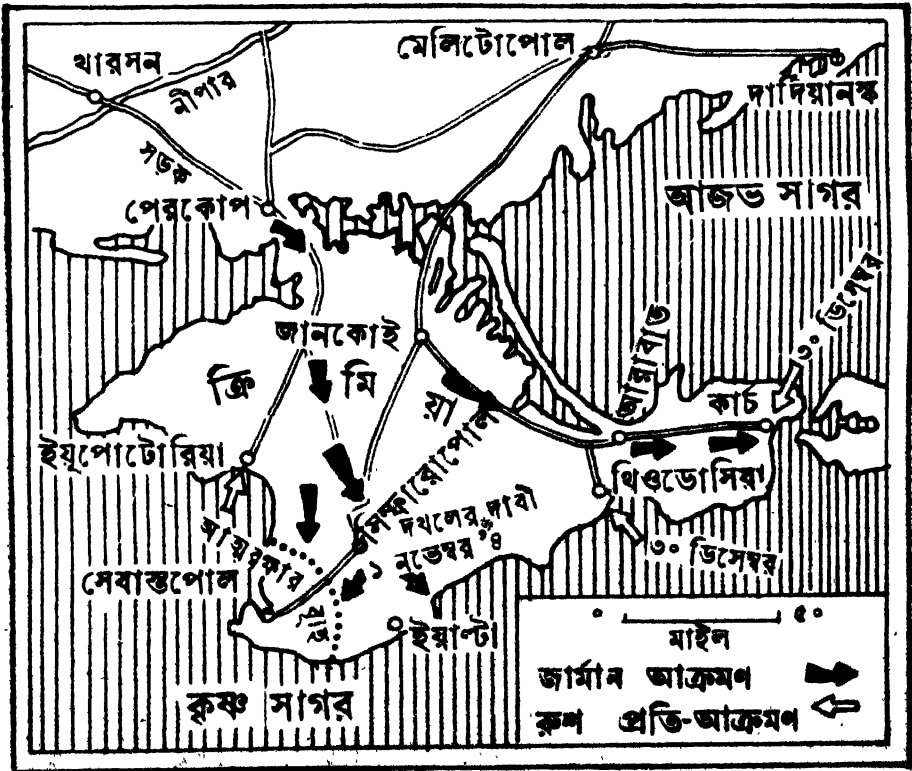
প্রকাণ্ড আক্রমণ চালাইলেন। সেই প্রধান আক্রমণ যতক্ষণ স্তিমিত হইয়া না আসিল, ততক্ষণ সেবাস্তোপোলের নাৎসী অভিযান ক্ষান্ত রহিল। মে মাসের শেষের দিকে

যখন মার্শাল ফন বোকের পালটা-আক্রমণে টিমোশেংকো রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইলেন, তখন ফন ম্যান্স্টাইন সেবাস্তোপোলের দিকে মন দিলেন।

জার্মানদের মতে সেবাস্তোপোল ছিল পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী একক দুর্গ। ইহার ঐতিহাসিক খ্যাতি দীর্ঘকালের। ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে এই দুর্গ ইংরাজ ও ফরাসীদের দ্বারা ১১ মাস অবরুদ্ধ ছিল। অবশ্য সেদিনের সঙ্গে এদিনের কোন তুলনা হয় না, একমাত্র বীরত্বের প্রশ্ন ছাড়া। ১৯ টি বড় কেল্লা লইয়া এই নৌ-দুর্গ গঠিত। এই কেল্লাগুলি ম্যাকসিম গোর্কি, লেনিন, স্ট্যালিন, মোলটোভ, সাইবেরিয়া ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। পাহাড় ও প্রস্তর কাটিয়া এই দুর্গ নির্মিত হইয়াছে, ইহার ভিত্তিভূমি অত্যন্ত কঠিন। খাড়া পাহাড়ের শীর্ষে খাদ ও সুড়ঙ্গ পথ এই দুর্গের আত্মরক্ষার কাজে লাগানো হইয়াছে। খাস শহরটি সেভারনামা উপসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। চেরনায়া নদী এই উপসাগরে পড়িয়াছে এবং এরই মোহনায় ইংকারম্যান—আর ৭ মাইল দক্ষিণে বালাক্লাভা, বিগত শতাব্দীর যুদ্ধে যে রণাঙ্গন খ্যাতিলাভ করিয়াছে। পোতাশ্রয়ের প্রবেশ পথে তিনটি কেল্লা দাঁড়াইয়া আছে। বড় বড় ১১ ইঞ্চি মুখের কামান এখানে বসান, আর প্রচুর 'পিল বক্স' ও হাজার হাজার মাইন ইহার চারিদিকে পোঁতা। ইহা ছাড়া কৃষ্ণসাগরীয় নৌ-বহরের যুদ্ধজাহাজগুলি গোলাবর্ষণের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত হইয়াছিল। অর্থাৎ আত্মরক্ষার যথাসম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। নৌ-বহরের অধিনায়ক ভাইস-এডমিরাল ওক্টিব্রস্কি সম্মিলিত রণক্রিয়ার ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি। স্থলবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন মেজর-জেনারেল পেট্রোভ এবং দুর্গের বিমানবহরের ভার পাইয়াছিলেন মেজর-জেনারেল ওস্টিয়াকোভ ও নৌবহরীয় বিমানের অধিনায়ক ছিলেন জেরমাসেনকোভ।

১৯৪১-এর ডিসেম্বর মাস হইতে সেবাস্তোপোল অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল।* এবার ৩রা জুন পনরায় দুর্ধর্ষ জার্মান আক্রমণ শুরু হইল। ফন ম্যানস্টাইন এই নৌ-দুর্গ চূর্ণ করিবার সংকল্প করিলেন। এজন্য অভুতপূর্ব গোলাগুলির সমাবেশ করা হইল। দুর্গ অবরোধ ভাঙ্গিবার জন্য বৃহত্তম কামান আমদানি হইল। প্রচুর বিমানের সমাবেশ হইল। মাত্র ৩৭ মাইল দূরবর্তী সিম্ফারপোলের বিমানঘাটিগুলি জার্মানদের দখলে ছিল। সুতরাং হাতের কাছে এই ঘাটিগুলি পাইয়া জার্মান বিমানবহর ইচ্ছামত যে-কোন লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা মারিবার প্রচুর সুবিধা পাইল। অপরপক্ষে সেবাস্তোপোলের বিমানঘাটি ছিল নগণ্য এবং বোমারু ও জঙ্গী বিমানের সংখ্যা ছিল সামান্য। সুতরাং গোড়া হইতেই লালফৌজ উপযুক্ত সংখ্যক বিমাঘাটির অভাবে বিষম বেকায়দায় পড়িল। দুর্গরক্ষী স্থল-সৈন্য ও নৌ-সৈন্যের সংখ্যা ছিল ৭০ বা ৮০ হাজার। ৮৫ হাজার অসামরিক অধিবাসীর অধিকাংশকেই পূর্বাহ্ণে সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল।

যুগপৎ স্থল ও শূন্যপথ হইতে ভয়ংকর গোলন্দাজী শক্তির সমাবেশের মধ্যে সেবাস্তোপোলে জার্মান আক্রমণের উদ্বোধন হইল। ৪০, ৬০ বা ৮০ খানা করিয়া বোমারু এক-একবার দল বাঁধিয়া জঙ্গীবিমানের পাহারায় অতি-বিস্ফোরক বোমা বর্ষণ করিতে লাগিল এবং এই বর্ষণের বিশেষ কোন বিরাম ছিল না। আর বড় বড় রাক্ষুসে কামান

* ১৯৪১-এর অক্টোবর মাসে জার্মানরা একমাত্র সেবাস্তোপোল ছাড়া সমগ্র ক্রিমিয়া দখল করিয়া নিয়াছিল।—লেখক

অনবরত গোলা উদ্গীরণ করিতে লাগিল—দিন বা রাত্রি, সকাল বা সন্ধ্যায় কখনও এই অনল প্রবাহের ক্ষান্তি ছিল না। আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতের মত বিশাল কামানের গোলা সেবাস্তোপোলকে যেন গ্রাস করিতে চাহিল।

এভাবে গোলা বর্ষণের আড়াল ধরিয়া জার্মান পদাতিক দল অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু যত সহজে তারা জয়ী হইবে ভাবিয়াছিল তত সহজে হইল না। রুশেরা মর্টার ও অগ্নিক্ষেপকের সাহায্যে পালটা-আক্রমণ চালাইয়া নিজেদের ঘাঁটি বজায় রাখিল। তাদের প্রতিরোধ শক্তিতে জার্মানরা কিছু বিস্মিত হইল। কেননা, সংখ্যাশক্তির এই শ্রেষ্ঠতার সামনে আত্মরক্ষাকারীরা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু উপযুক্ত বিমানের অভাবে রুশ সৈন্যরা বিব্রত হইতে লাগিল। রুশ নৌ-বহরও এজন্য যথেষ্ট অসুবিধায় পড়িল। কারণ জঙ্গী ও বোমারু বিমানের সহযোগিতা ছাড়া নৌ-বহরের পক্ষে অগ্রসর হইয়া আসা কঠিন ছিল। তথাপি শত্রু-বোমারু ও টর্পেডো-বিমানের তাড়না সত্ত্বেও যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি লইয়া জাহাজগুলি আগাইয়া আসিল। জার্মানরা প্রথম আক্রমণ শুরু করিল পাঁচটি পদাতিক ডিভিসনের সাহায্যে। পদাতিকেরা বড় ট্যাংক লইয়া আত্মরক্ষার ব্যূহে ছিদ্র সৃষ্টি করিতে চাহিল। অগ্নিক্ষেপক ও প্রচুর ট্যাংকমারা কামানের দ্বারা তারা অনবরত আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু রুশেরা পালটা-আক্রমণের দ্বারা উহা ঠেকাইতে লাগিল। এভাবে উভয় পক্ষেই প্রচুর সৈন্য হতাহত হইতে লাগিল; তখন নূতন সৈন্য আমদানির প্রয়োজন হইল। অনবরত গোলাগুলি বর্ষণের মধ্য দিয়াই অনেককষ্টে রুশেরা সৈন্যবল বৃদ্ধি করিল। অনবরত অক্রমণে ও পালটা আক্রমণে নাৎসী পদাতিক বাহিনী ক্ষয় পাইয়া যাইতে লাগিল এবং জার্মানরাও সৈন্যবল বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইল। ৭ দিন ধরিয়া এই আত্মক্ষয়কারী সংগ্রামের পর দেখা গেল যে, সেবাস্তোপোল দুর্গ তখন অটুট রহিয়াছে। অবশ্য আত্ম-রক্ষার ব্যূহে একটি কীলক প্রবেশ করানো হইয়াছিল। কিন্তু বার বার ট্যাংক ও ছোঁমারা বিমানের সাহায্যেও সেই কীলক বিস্তারের চেষ্টা সার্থক হইল না। রুশ গোলন্দাজ ও রাইফেলধারিগণ ট্যাংকের বর্শাফলককে ভোঁতা করিয়া দিতে লাগিল। তখন জার্মানরা আক্রমণক্ষেত্র উত্তর-পূর্ব দিক হইতে পরিবর্তন করিয়া পূর্বদিকে স্থানান্তরিত করিল। উভয় পক্ষের এই লড়াই যেন উভয়ের সহনশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হইল। এই যুদ্ধে জার্মানরা দেখাইল সংখ্যাশক্তির প্রাধান্য, আর রুশেরা প্রমাণ করিতেছিল রণকৌশলের প্রাধান্য—কামান ও গোলন্দাজের সংস্থান ও ব্যবহার যথেষ্ট রণকলাসম্মত ছিল।

* *

২৮শে জুন (১৯৪২) যুগান্তরের সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'সেবাস্তোপোলের আত্মরক্ষা' সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছিলাম, এখানে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

'তোব্রুক বন্দর যখন ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বেদখল হইয়া গেল, তখন ছয় মাস অবরুদ্ধ থাকিয়াও সেবাস্তোপোল গত ২২ দিন ধরিয়া জার্মানীর প্রচণ্ডতম আক্রমণ প্রতিহত করিতেছে। খাস বার্লিন রেডিও স্বীকার করিতেছে যে, সম্মিলিত জার্মান ও রুমেনীয় বাহিনীকে সেবাস্তোপোলের প্রতি গজ জমির জন্য নিদারুণ সংগ্রাম করিতে হইতেছে। বার্লিন-এর সংবাদে প্রকাশ যে সেবাস্তোপোলের লড়াইয়ের সহিত কোনও যুদ্ধের, এমন কি সামরিক ইতিহাসের কোন ঘটনার সহিতই তুলনা করা যায় না—

'The fighting for Sobastopol can not be compared to any battle or any event in military history.'

ইহার আগে স্টকহোম হইতে খবর আসিয়াছিল যে, সেবাস্তোপোল আধুনিক যুদ্ধের ইতিহাসে পৃথিবীর দুর্ভেদ্যতম দুর্গ বলিয়া পরিচিত হইতেছে। অবশ্য জার্মানী ধীরে ধীরে সেবাস্তোপোলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু যে মূল্য দিয়া, যে ক্ষতি স্বীকার করিয়া জার্মানরা অগ্রসর হইতেছে তাহা যেমন অপরিমিত, তেমনই উভয় পক্ষের সে আসুরিক সংগ্রাম চলিতেছে, সামরিক ইতিহাসেও তাহা অভূতপূর্ব। সেবাস্তোপোল হইতে ৪০ মাইল ব্যবধানে সিম্ফারপোল, জার্মানবাহিনী এখানেই মূলঘাটি তৈয়ার করিয়া সেবাস্তোপোল দুর্গ অভিমুখে প্রচণ্ডতম অভিযান চালাইয়াছে। এই অংশের উত্তরবর্তী রণক্ষেত্রের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক দিন আগে জার্মানবাহিনী এখানকার আত্মরক্ষার ব্যূহে যে ছিদ্র সৃষ্টি করিয়াছিল, উহা বাড়াইবার জন্য তারা বারম্বার ট্যাঙ্কের আড়াল ধরিয়া হিংস্র আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ এখনও প্রতিহত হইতেছে। তথাপি সেবাস্তোপোলের প্রধান সড়কের দিকে জার্মানী উপস্থিত হইয়াছে। তারা আত্মরক্ষার ব্যূহ ছিদ্র করিতে পারিলেও গভীরতর ব্যূহের (defence in depth) শেষ পর্যন্ত বিদীর্ণ করিতে পারে নাই। এই গভীরতর ব্যূহের আত্মরক্ষাই আধুনিক আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রাণধর্ম—সিঙ্গাপুরে এর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তোব্রুকে এর পাত্তা নাই। গভীরতর ব্যূহকে আশ্রয় করিয়াই আধুনিক যান্ত্রিক আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাকে প্রতিরোধ করিতে হইলে অনুরূপ পালটা-আক্রমণের দরকার। সেবাস্তোপোলের সম্মুখে কতকগুলি উঁচু পাহাড় আছে। এই পাহাড়গুলি আত্মরক্ষায় সাহায্য করিতেছে। সংবাদে দেখা যাইতেছে এই পাহাড়গুলির পথে ও আত্মরক্ষার কেল্লাগুলিতে অবিরাম আক্রমণ চলিতেছে এবং মৃতদেহের স্তূপে এগুলি ভর্তি হইয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শীগণ এই যুদ্ধের যে রোমহর্ষক বর্ণনা দিতেছেন তাহা উল্লেখ করিবার মত। উত্তর-পূর্ব রণক্ষেত্রে জার্মানী অগ্রসর হইবার এবং আত্মরক্ষার ব্যূহে কীলক প্রবেশের জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতেছে। এই আক্রমণের কোন বিরাম নাই, কোন বিশ্রাম নাই। ট্যাঙ্কের-পর-ট্যাঙ্ক এবং বোমারু-পর-বোমারু অবিশ্রান্ত গুলিগোলা ও বোমাবর্ষণ করিতেছে। ইহাদের পিছনের দলে পদাতিক আসিতেছে। আবার পদাতিকের পিছনে ট্যাঙ্ক ও বোমারু আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গোলন্দাজবাহিনী অনবরত কামানের গোলা ছুঁড়িতেছে। বৃহত্তম কামান এই যুদ্ধে ব্যবহৃত হইতেছে। সোভিয়েট সৈন্যদল এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য অবর্ণনীয় বীরত্বের সহিত লড়িতেছে। এই সংগ্রামে কয়েক দিনের মধ্যেই কতকগুলি জার্মান ডিভিসন ধূলায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। বহু দূর পিছনের ঘাটি হইতে মজুদ সৈন্য আনিতে হইতেছে এবং আরও দুই ডিভিসন জার্মান ও এক ডিভিসন রুমেনীয় সৈন্য পৌঁছিয়াছে। প্রচণ্ড ঢেউয়ের মত জার্মানী দিনের-পর-দিন আক্রমণ করিতেছে। পদাতিক সৈন্যের বিশাল বাহিনী তো লড়িতেছেই, শত শত ট্যাঙ্ক এবং অগণিত বোমারু বিমান শহরের উপর বোমাবর্ষণ করিতেছে। সেবাস্তোপোলের উপর প্রত্যক্ষ অভিযান চালাইবার দশ দিন আগে জার্মানরা শহর ও ব্যূহের উপর ভয়ংকরভাবে বোমারু আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ এত প্রচণ্ড ও ব্যাপক হইয়াছে যে, ইহাকে 'বর্বর' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ আক্রমণের পর বোমারুর বর্ষণশক্তি আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

জুন মাসের প্রথম আট দিনের মধ্যে অজস্র কামানের গোলা ও মাইন ছাড়াও জার্মানরা নয় হাজার বোমা শহরের উপর বর্ষণ করিয়াছে। শত্রুর এই গোলাগুলির পরিমাণ প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। মাত্র একদিনে তারা আট শত বোমা ফেলিয়াছে। এক হাজার এরোপ্লেন লইয়া জার্মানরা সেবাস্তোপোল শহরকে আক্রমণ করিতেছে এবং তাহাদের সর্বোৎকৃষ্ট দশ ডিভিসন সৈন্য এই আক্রমণে নিযুক্ত হইয়াছে।

'রুশ পদাতিক, নৌ-সৈন্য ও গোলন্দাজ বাহিনী জার্মানীর শ্রেষ্ঠতর ক্রূর শক্তির সম্মিলিত প্রচণ্ডতার বিরুদ্ধে অভুতপূর্ব বীর্যবত্তার সহিত সংগ্রাম করিতেছে। এই সংগ্রামের তুলনা নাই। সেবাস্তোপোলকে পিষিয়া মারিবার জন্য নাৎসী সমরযন্ত্রের সর্বপ্রকার ক্রূরতা কেন্দ্রীভুত হইয়াছে—অবস্থা গুরুতর, মারাত্মক ও সঙ্কটজনক। তথাপি ইহার মধ্যে চলিতেছে আত্মরক্ষার বিরামহীন চেষ্টা, যাহা আধুনিক কালের পৃথিবীব্যাপ্ত রণাঙ্গনের যে কোন অংশেই কেবল দুর্লভ নহে, ইহা কল্পনাতীত। "রেডস্টার" কাগজের সংবাদদাতা বলিতেছেন, সামান্য একটা পাহাড়ের মাথা দখলের জন্য জার্মানী এক রেজিমেণ্ট পদাতিক, দুই ডজন ট্যাংক এবং একদল গোলন্দাজ ক্রমাগত আট বার আক্রমণ চালায়। সোভিয়েট সৈন্যরা বিন্দুমাত্র পশ্চাতে হঠিল না—হাতাহাতি সংগ্রাম চলিল, ৩০০ জার্মান সৈন্য নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। পরে যখন সেই পাহাড়ের মাথা দখল হইল, দেখা গেল কমপক্ষে দুই হাজার নাৎসী নিহত হইয়াছে। এভাবে প্রতি ইঞ্চির জন্য অকাতরে দলে দলে নাৎসী সৈন্য বলি দেওয়া হইতেছে। তবু সেবাস্তোপোল দখল করা চাই! এই সংগ্রামে সাহায্য করিবার জন্য রুশ নৌ-সৈন্য ক্রিমিয়ার দক্ষিণ উপকুলে অবতরণ করিয়াছে। সম্ভবত দুই রেজিমেণ্ট নৌসৈন্য আসিয়াছে। ককেশাস হইতে কনভয়যোগে অতি সতর্ক পাহারায় তাদেরকে আনা হইয়াছে। উপকূলবর্তী জার্মান কামানের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও নৌ-সৈন্যরা সাফল্যের সঙ্গে তীরে নামিয়াছে। কেবল নামে নাই, তারা জার্মান ব্যূহের পশ্চাদ্দিকের কোন কোন অংশে অগ্রসর হইয়াছে। ২৫শে জুনের সংবাদে প্রকাশ যে, তারা ইয়ালটা পাহাড়ের পাদদেশ ধরিয়া উত্তর দিকে যুদ্ধ চালাইতেছে। ইংকারম্যান অভিমুখে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হইয়াছে, সিম্ফারপোল হইতে জার্মানী সেবাস্তোপোল রণক্ষেত্রের যে যোগাযোগ রাখিয়াছে, সোভিয়েট নৌ-সৈন্য দলের এই আক্রমণে তাহা বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী অভিনব দৃঢ়তার পরিচয় দিতেছে। কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব তাঁরা আদৌ গোপন করিতেছেন না। কয়েক দিন আগে তাঁরা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সেবাস্তোপোল অতি মারাত্মক সংকটে পড়িয়াছে। আত্মরক্ষাকারী সৈন্যদল যেন দেয়ালে পৃষ্ঠ দিয়া লড়িতেছে। গত রবিবার জার্মানী যে কীলক প্রবেশ করাইয়াছে তা আজও শিথিল হয় নাই। বরং অবিরাম আরও মারাত্মক আঘাত হানিয়া আক্রমণের চেষ্টা চলিতেছে। কেবল প্রস্থান ও পশ্চাদপসরণের শিক্ষা সোভিয়েট সৈন্যরা পায় নাই। কেবল সাহসের সহিত রণক্ষেত্র হইতে হটিয়া আসিলেই গৌরব বাড়ে না, কিংবা যুদ্ধজয় হয় না, এটা তারা জানে। সুতরাং সেবাস্তোপোলের রক্ষাকারীরা 'প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার' মন্ত্রে উজ্জীবিত হইয়াছে। ক্রিমিয়ার এই দুর্ভেদ্য দুর্গ হয়তো আর দীর্ঘকাল দুর্ভেদ্য থাকিবে না, কিন্তু সোভিয়েট বাহিনী যে সংগ্রামের পরিচয় দিতেছে তাতে রুশ সামরিক ইতিহাস নিশ্চয়ই গৌরবমণ্ডিত হইবে।'

তথাপি প্রবলতর শক্তির নিকট সেবাস্তোপোল নত হইয়া আসিতে লাগিল। ১৯শে

জুনের মধ্যে জার্মানরা দক্ষিণ দিক দিয়া সেবাস্তোপোলের পাঁচ মাইলের মধ্যে পেঁছিল। উত্তর দিক দিয়া তারা সেভারনায়া উপসাগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বালাক্লাভায় গোলা বর্ষিত হইতেছিল বটে, কিন্তু উহা তখনও রুশদের হাতেই ছিল। এই যুদ্ধে নাৎসীদের প্রচুর ক্ষতি হইতে লাগিল। ১০ই হইতে ১৩ই জুনের মধ্যে খাস জার্মান সৈন্য নষ্ট হইল বিশ হাজার, রুমেনীয় সৈন্যদের ক্ষতি ইহার চেয়েও বেশী হইল। এভাবে ক্ষতি স্বীকার করিয়া জার্মানরা রুশ আত্মরক্ষার বেষ্টনী সংকুচিত করিয়া আনিল। এই সময় রুশেরা রণ-কৌশলের আর-একটা বৈশিষ্ট্য দেখাইল। তারা জার্মান পক্ষকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য ক্রিমিয়ার পশ্চিম উপকূলে ও সেবাস্তোপোলের উত্তরে ইউপ্যাটোরিয়াতে সৈন্য অবতরণ করাইল। কেবল ইউপ্যাটোরিয়াতেই সৈন্য অবতরণ নয়, ইয়ালটার দক্ষিণ-পূর্বে, কার্চে, এমন কি আজব সাগরের উত্তর উপকূলে ম্যারিয়াপোলেও রুশ সৈন্য অবতরণ করিল। অবশ্য সংখ্যায় এই সমস্ত সৈন্য বেশী ছিল না। এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়া থাকিলেও এদেরকে হানাদার সৈন্য বা রেইডার ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। তথাপি চারিদিকে এই সৈন্যাবতরণের দ্বারা, আত্মরক্ষাকারীরা যেন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। যেমন ইয়ালটায় সৈন্য অবতরণের ফলে জার্মানদিগকে ৪নং রুমেনীয় ডিভিসনের কিছু সৈন্য সেখানে পাঠাইতে হইল, এইভাবে ইউপ্যাটোরিয়া এবং কার্চেও সৈন্য পাঠাইতে হইল। ফলে আক্রমণকারীরা কিছুটা দুর্বল হইয়া পড়ায় তাদেরকে আবার সৈন্যবল বৃদ্ধি করিতে হইল। ক্রমে সেভারনায়া উপসাগরের উত্তর তীর জার্মানীর দখলে গেল। কিন্তু ইহার পরেও কয়েকদিন ধরিয়া সেখানে অতি ঘোরতর সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হইল। ২৬শে জুন জার্মানরা স্বীকার করিল যে, রাস্তায় রাস্তায় অতি ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য লড়াই চলিল। ইঙ্কারম্যান উপত্যকা দখল ও চেরনায়া নদী অতিক্রান্ত হইল বটে, কিন্তু বিগত শতাব্দীর মত আবার ইঙ্কারম্যান পাহাড় চূড়ায় হাতাহাতি যুদ্ধ ও বেয়নেট সংগ্রামের বীভৎসতা অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু বেয়নেট চালাইয়াও আত্মরক্ষার আর উপায় ছিল না, শত্রুবিমান সেবাস্তোপোলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছিল। জুন মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে রক্ষা করার মত আর কিছু ছিল না। তবু একতলা বাড়ীর এই ক্ষুদ্র শহরে দুর্গাধিনায়ক শেষ সংগ্রাম চালাইয়া গেলেন বীরের মত। ২৯শে জুন এক ডিভিসন জার্মান সৈন্য উপসাগরের উত্তর দিক হইতে মোহনা (চেরনায়া) অতিক্রম করিল এবং সেবাস্তোপোলের পূর্ব দিকে দুর্গমালার আভ্যন্তরীণ অংশে প্রবেশ করিল। সারাদিন ধরিয়া আত্মরক্ষাকারীদের সঙ্গে তুমুল হাতাহাতি লড়াই চলিল। এই সংগ্রামের কোন তুলনা নাই। জার্মানরা বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে, 'ম্যাক্সিম গোর্কি' দুর্গ তখনও দাঁড়াইয়া আছে। উহার উপরের তলা জার্মানদের হাতে গেল, কিন্তু নিচু অংশ হইতে তখনও সোভিয়েট সৈন্য বাধা দিতে লাগিল—মরিবে তবু আত্মসমর্পণ করিবে না। যুদ্ধক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া মাত্র ১৪ শত গজে পরিণত হইল, তথাপি ভূগর্ভ নিম্নের সোভিয়েট সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করিল না। তের ইঞ্চি মুখের বিশাল জার্মান কামান গোলা উদ্গীরণ করিতে লাগিল এবং ক্রমে লড়াই আটশত গজ, এমন কি পাঁচ শত গজের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এমন অদ্ভুত দুর্গ-অবরোধের যুদ্ধ রাশিয়াতেও ইহার আগে অনুষ্ঠিত হয় নাই। সমগ্র সেবাস্তোপোল বোমা ও গোলার দ্বারা যেন চষিয়া

ফেলা হইল। ১৯৩৯ সাল হইতে জার্মানরা সেবাস্তোপোলের মত আর কোথাও এত অধিক গোলা ও বিস্ফোরক খরচ করে নাই। প্রত্যেকটি বিন্দু গোলা-বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। প্রকাশ যে ৫০ হাজার টন গোলা বর্ষিত হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে ২৫ হাজার টন বোমা যুক্ত ছিল। অর্থাৎ ইহা যেন সমগ্র জার্মানীর উপর বৃটিশ বিমানের মোট বোমাবর্ষণের সমান ছিল (তখনকার দিন পর্যন্ত)। ক্রমে জার্মান ও রুমেনীয় পতাকা দুর্গের ধ্বংসস্তূপের উপর উড়িতে লাগিল এবং ১লা জুলাই হইতে পৃষ্ঠরক্ষী সৈন্যদের লড়াইয়ের পর ৩রা জুলাইয়ের মধ্যে সোভিয়েট সৈন্যেরা সেবাস্তোপোল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। মধ্যরাত্রে সোভিয়েট হাইকম্যাণ্ড সেবাস্তোপোল পতনের কথা ঘোষণা করিলেন। একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে তাঁরা প্রচার করিলেন—

"২৫০ দিন ধরিয়া এই দুঃসাহসিক নগরী অভূতপূর্ব সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে অসংখ্য জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিল। গত ২৫ দিন শত্রুপক্ষ স্থলপথ ও আকাশ হইতে ক্রমাগত আক্রমণ চালাইতেছিল। সেবাস্তোপোল পশ্চাতের দিকের ভূভাগের সহিত সংযোগ হারাইয়াছিল। গোলা-বারুদ ও রসদ সরবরাহের অসংখ্য প্রকার বিঘ্নের মুখে দাঁড়াইয়া এবং বিমানশালা ও বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার যথোপযুক্ত উপায় না পাইয়াও সোভিয়েট পদাতিক, নৌ-সৈন্য, সেনাপতিবৃন্দ ও রাজনৈতিক কর্মিগণ বীর্যবত্তা ও সাহসিকতার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। জুন মাসে জার্মানরা সেবাস্তোপোলের আত্মরক্ষাকারীদের বিরুদ্ধে তিন লক্ষ সৈন্য, চার শতাধিক ট্যাঙ্ক এবং প্রায় নয় শত বিমান নিয়োগ করে। আত্মরক্ষাকারীদের প্রধান কার্য ছিল রণক্ষেত্রের এই অঞ্চলে যথাসম্ভব বেশী নাৎসী সৈন্যদিগকে আটকাইয়া রাখা এবং শত্রুর লোকবল ও সমরসম্ভার যত অধিক পরিমাণে সম্ভব ধ্বংস করা। সেবাস্তোপোল দুর্গ এই লক্ষ্য কিভাবে সাফল্যের সহিত পূরণ করিয়াছে তাহা এই হিসাবের দিকে তাকাইলে বুঝা যাইবে। যথা—গত ২৫ দিনের যুদ্ধে ২২ নং, ২৪ নং, ৫০ নং, ১৩২ নং ও ১৩৭ নং জার্মান পদাতিক ডিভিসন, চারটি স্বতন্ত্র রেজিমেণ্ট, ২২ নং ট্যাঙ্ক ডিভিসন, একটি স্বতন্ত্র যান্ত্রিক ব্রিগেড এবং ১ নং, ৪ নং ও ১৮ নং রুমেনীয় ডিভিসন ও অন্যান্য কতকগুলি ইউনিট সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে জার্মানরা সেবাস্তোপোলে এক লক্ষ ৫০ হাজার জার্মান সৈন্য ও অফিসার হারাইয়াছে। ইহার মধ্যে অন্ততঃ ৬০ হাজারের বেশী নিহত হইয়াছে। ২৫০-এর বেশী ট্যাঙ্ক ও প্রায় ২৫০ কামান ও তিন শত বিমান নষ্ট (আকাশ যুদ্ধে) হইয়াছে। সেবাস্তোপোলের সারা আট মাসের অবরোধ যুদ্ধে প্রায় তিন লক্ষ জার্মান সৈন্য হতাহত হইয়াছে। সাতই জুন হইতে তেসরা জুলাই-এর মধ্যে ১১,৩৮৫ জন সোভিয়েট সৈন্য নিহত, ২১০৯১ জন আহত ও ৮৩০০ জন নিখোঁজ হইয়াছে এবং ৩০০ কামান, ৫০টি ট্যাঙ্ক ও ৭৭টি বিমান নষ্ট হইয়াছে।*

---

* যুদ্ধের সময় প্রকাশিত ঐ সমস্ত সংখ্যা নির্ভরযোগ্য নয়। মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েট সরকারী ইতিহাসে প্রকাশ যে, সেবাস্তোপোলে মোট এক লক্ষ ছয় হাজার রুশ সৈন্য ছিল। এদের মধ্যে বিরাশি হাজার ছিল লড়িয়ে সৈন্য। আর জার্মান ও রুমেনীয়ানদের ছিল মোট দুই লক্ষ তিন হাজার। এদের মধ্যে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ছিল লড়িয়ে সৈন্য।

অস্ত্রের সংখ্যাশক্তিতেও জার্মানরা অনেক বেশী বলশালী ছিল। যেমন—জার্মান-রুমেনীয় পক্ষে কামান ৭৮০, ট্যাঙ্ক ৪৫০, বিমান ৬০০। অপরপক্ষে সোভিয়েটের ছিল কামান ছয়শত ছয়, ট্যাঙ্ক মাত্র আটত্রিশ এবং বিমান ছিল মাত্র ১০৯টি। —লেখক

নরবলি ও ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়া সেবাস্তোপোলের যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। মোটের উপর জার্মানরা অতি দীর্ঘ সময় এবং অত্যন্ত বেশী মূল্য দিয়া যাহা দখল করিল, তাহাও বিশেষ কোন কাজে লাগাইতে পারিল না। কারণ, কৃষ্ণসাগরীয় রুশ নৌবহর তার প্রধানতম ঘাঁটি হারাইয়াও সমুদ্র পথে কর্তৃত্ব বজায় রাখিল। তবে জার্মানরা ইহাকে প্রকান্ড জয় বলিয়া ঘোষণা করিল এবং কর্নেল-জেনারেল ফন ম্যানস্টাইন অবিলম্বে হিটলারের দ্বারা সম্মানিত হইয়া ফিল্ড-মার্শাল পদবীতে উন্নীত হইলেন।*

---

* —লেখক প্রণীত 'রুশ-জার্মান সংগ্রাম' (১৯৪৭) থেকে উদ্ধৃত।

অষ্টম অধ্যায়

দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযান এবং ককেশাসের যুদ্ধ

রাশিয়ায় জার্মানীর প্রথম অভিযান শুরু হইয়াছিল ১৯৪২ সালের ২২শে জুন। আর দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযান শুরু হইল ১৯৪২ সালে ২৮শে জুন। যদিও আলোচ্য বছরে ক্রিমিয়া অভিযান এর সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তথাপি সেটা ছিল আসল আক্রমণের ভূমিকার মত এবং সেই আসল আক্রমণ পিছাইয়া গেল মে মাসে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর খারকোভ এলাকায় আকস্মিক আঘাতের জন্য। (১৯৪১ সালে প্রথম জার্মান অভিযানেও বিলম্ব ঘটিয়াছিল বলকানে জার্মানীরই নিজস্ব আক্রমণের জন্য।) কিন্তু জার্মান সেনাপতি মার্শাল ফন বোকের পালটা আক্রমণের ফলে মে মাসের শেষে টিমোশেঙ্কোর খারকোভ অভিযান ব্যর্থ হইয়া গেল। তবে, খারকোভ অভিযান ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও একটা লাভ এই হইয়াছিল যে, এরই ফলে জার্মানীর দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযান আরম্ভেও বিলম্ব হইয়া গেল। কিন্তু রুশ পক্ষের প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে এই বিলম্ব ঘটিল। দুই লক্ষ পনের হাজার রুশ সৈন্য বন্দী, ১৮১২টি কামান, ১২৭০টি ট্যাংক ও ৫৪২টি বিমান নষ্ট বা ধৃত হইল। মোট বাইশ ডিভিসন রুশ সৈন্য কিংবা পুরা দুইটি সোভিয়েট আর্মি খতম হইল। কিন্তু জার্মান ঐতিহাসিক ভালটার গোরলিৎস (Walter Gorlitz) বলিয়াছেন যে, খারকোভে টিমোশেঙ্কোর আক্রমণের ফলে মে মাসের সংকল্পিত জার্মান গ্রীষ্মাভিযান একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। এর সঙ্গে আবার কাদা, জল ও বৃষ্টির জন্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়ায় আসল অভিযান আরম্ভে খুব বিলম্ব হইয়া গেল।[১]

কিন্তু টিমোশেঙ্কোর খারকোভ অভিযান নিয়া প্রবল বিতর্কের অবসর আছে। স্ট্যালিনের সমালোচকগণ এটাকে স্ট্যালিনের ভুলের খেসারত বলিয়া মনে করেন। কারণ, মহাযুদ্ধের পর ১৯৫৬ সালের বিংশতি সোভিয়েট পার্টি কংগ্রেসে মিঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের যে অবমূল্যায়ন ঘটাইয়াছিলেন, সেই সময় স্ট্যালিনের সামরিক দক্ষতার সমালোচনা প্রসঙ্গে ক্রুশ্চেভ ১৯৪১ সালের কিয়েভের যুদ্ধের মত ১৯৪২-এর খারকোভ যুদ্ধেও স্ট্যালিনের 'ভুল নির্দেশে'র তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন। এই সময়কার সোভিয়েট সরকারী ইতিহাসেও স্ট্যালিন ও সুপ্রীম কমাণ্ডের ভুল-ভ্রান্তির সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ জার্মানীর দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযানের পরিকল্পনা ও রণনৈতিক লক্ষ্য নিয়াই ভুল ধারণা করা হইয়াছিল। কারণ, সুপ্রীম কমাণ্ড মনে করিয়াছিলেন যে, জার্মান অভিযানের আসল লক্ষ্য মধ্য রণাঙ্গন বা মস্কো—যদিও এই লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ রাশিয়ার দিকে। তখন সেদিকে উপযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যূহ প্রস্তুত ছিল না। দ্বিতীয়তঃ খারকোভের দিকে টিমোশেঙ্কোর অগ্রগতিও ভ্রমাত্মক ছিল এবং সেই সময় স্থানীয় সমর পরিষদের সদস্য হিসাবে নিকিতা ক্রুশ্চেভ প্রতিবাদ জানাইয়া বলিয়াছিলেন যে, এই অগ্রগতির অর্থ হইতেছে জার্মানদের ফাঁদে গিয়া ধরা দেওয়া।

কার্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল এবং অনেক সৈন্য যেমন নষ্ট হইয়াছিল, তেমনি কয়েকজন বিশিষ্ট 'সাহসী সেনাপতি' ও সৈনিক ঘেরাও হইয়া মারা পড়িয়াছিলেন। ক্রুশ্চেভের মতে এর জন্য দায়ী ছিল স্ট্যালিনের ভুল নির্দেশ ও একগুঁয়েমী।[১]

এই পর্বের গোড়াতেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ১৯৪২ সালের নূতন গ্রীষ্মাভিযানের জন্য হিটলার কি ভাবে প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং কি ভাবেই বা লোকবল ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতেছিলেন। কিন্তু এবার রণকৌশলের প্রয়োগ ও পদ্ধতিতেও যথেষ্ট নূতনত্বের আমদানি করা হইল। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মাভিযানের প্রথম পর্যায়ে দেখা গিয়াছে যে, প্রথম সাঁজোয়া (আরমার্ড) ডিভিসনগুলি অগ্রসর হইয়া যাইত, এদের অনুসরণ করিত মোটরারূঢ় দল এবং এই সাঁজোয়া ডিভিসনগুলি একক বা জোড়ায় জোড়ায় শত্রুব্যূহের ১০০ থেকে ২০০ মাইল পর্যন্ত ঢুকিয়া যাইত। পরে তারা ভিতরের দিকে ঘুরিয়া শত্রুব্যূহের বিভিন্ন খণ্ড-রণাঙ্গন (সেক্টর) বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত। এবং এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া নিশ্চিহ্ন করিত পদাতিকেরা, কিম্বা অপেক্ষাকৃত মন্দগামী সৈন্যেরা। এর পর দ্বিতীয় পর্যায়ের সাঁজোয়া ডিভিসনগুলিও আক্রমণের ধারা বদল করিল। তারা আর শতাধিক মাইল আগাইয়া গেল না, অধিকতর কাছাকাছি যুঝিতে লাগিল—এমন কি ২৫।৩০ মাইলের বেশী তারা অগ্রসর হইল না। এই সময় রাশিয়ার আত্মরক্ষার ব্যূহ আরও ঘন ও দৃঢ় হইয়াছিল। সুতরাং সাঁজোয়া ডিভিসনগুলি এই ব্যূহের মধ্যে বাঘের থাবার মত নখবিদ্ধ করিতে লাগিল এবং এভাবে ক্রমাগত ছিদ্র সৃষ্টির দ্বারা আত্মরক্ষার ব্যূহগুলিকে ঝাঁঝরা করিবার পর পদাতিকেরা আসিয়া সনাতন পদ্ধতিতে শত্রুব্যূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিত। রণকৌশলের পরিবর্তিত তৃতীয় পর্যায় দেখা গেল মস্কোর যুদ্ধে। কতকটা প্রথম মহাযুদ্ধের ১৯১৭ সালের অনুকরণে প্রধানতঃ পদাতিক বাহিনীর সহযোগিতায় ট্যাঙ্ক বাহিনীগুলি আক্রমণ ও সংগ্রাম চালাইত।

কিন্তু এবারের গ্রীষ্মাভিযানে এক নূতন কায়দা দেখা দিল, যা সম্পূর্ণ অভিনব বলা যাইতে পারে। শুনা যায়, জার্মান সামরিক মহলের নূতন সামরিক প্রতিভা ফিল্ড মার্শাল রোমেলই নাকি এই নূতন প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক। লিবিয়ার (উত্তর আফ্রিকা) মরুভূমির যুদ্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সাঁজোয়া আক্রমণের এই নূতন পদ্ধতির জন্ম সেই অভিজ্ঞতা থেকে। এই কৌশল অনুসারে ট্যাঙ্কগুলিকে আলাদাভাবে ব্যবহার না করিয়া সমস্ত অস্ত্রের একত্র সমাবেশেই প্রয়োগ করা হইল। জার্মান বাহিনীতে এর নাম ছিল 'Mot-Pulk' কিংবা ইংরাজীতে (Box-formation) বা বাক্স-আকৃতির সমাবেশ। বিভিন্ন অস্ত্রসমূহ এমনভাবে বাঁটিয়া দেওয়া হইল যে, বাক্সের বহির্ভাগে রহিল ট্যাংক ও ট্যাংকমারা গোলন্দাজ এবং অন্তর্ভাগে রহিল মোটর-লরী-বাহিত পদাতিক দল, ট্যাংকমারা গোলন্দাজ, মোটরবাহিত মেরামতির 'দোকান' (শপ) এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের প্রয়োজনীয় আধুনিক সাজসরঞ্জাম ও দ্রব্যসামগ্রীর লটবহর। এই সমগ্রটিরই আগে আগে আড়াল দিয়া চলিবে হালকা ট্যাঙ্ক, হালকা ট্যাংকমারা কামান, হালকা বিমানমারা কামান এবং শক্তিশালী ইঞ্জিনীয়ারের দল। এদের গতি ছিল দ্রুত এবং এরা স্বাধীনভাবে গহড়ার কৌশল খাটাইতে পারিত। খুব অল্প সময়ের নির্দেশ পাইয়াও এরা অনায়াসে দক্ষিণে বা বামে ঘুরিতে পারিত। এই

১। আলেকজাণ্ডার ভার্থ—পৃষ্ঠা ৩৬০-৬১।

সংগঠন ছিল একান্তরূপে সংগ্রামশীল, এর গোলাগুলির শক্তি ছিল অসাধারণ এবং এই সাঁজোয়া সংগঠনের গতিবেগও ছিল প্রচুর।[১]

আক্রমণকারী সৈন্য ও অস্ত্র সমাবেশের এই নূতনত্বই শেষ কথা ছিল না, বিমানশক্তি ও গোলন্দাজী শক্তিকেও জার্মানরা নূতনভাবে খাটাইতে চাহিল কয়েকটি উন্নত ধরনের জঙ্গী বিমান, ছোঁ-মারা বিমান ও বোমাবর্ষী বিমান যেমন তারা তৈয়ার করিল, তেমনি এইগুলিকে সৈন্যদলের আরও ঘনিষ্ঠতর ও নিবিড়তর সহযোগিতার মধ্যে প্রয়োগ করিল। এক কথায়, বিমানবাহিনীও যেন পদাতিকদের মত এবার 'আঘাতকারী সৈন্যদলে' পরিণত হইল। আক্রমণকারী সৈন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম যোগ রাখিয়া তারা অগ্রসর হইয়া চলিত এবং যেখানে গোলন্দাজের কাজে লাগিত না, তারা সেই স্থান পূরণ করিত। যে কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে জার্মান বিমানবাহিনী এত দ্রুত কেন্দ্রীভূত হইতে পারিত যে, অনেক সময় রুশেরা সেই কারণেই পারিয়া উঠিত না। বিমানশালা ও বিমান ময়দানও তারা উক্রাইনের সমতল ভূমিতে যেন চক্ষের নিমিষে তৈয়ার করিয়া ফেলিত।[২]

২৮শে জুন নূতন গ্রীষ্মাভিযান শুরু হইল এবং জুলাই মাসের প্রথম তিন সপ্তাহে ডন, ডনেৎস ও উক্রাইন এলাকায় জার্মান জয়লাভ এত দ্রুত নিষ্পন্ন হইল যে, হিটলার মনে করিলেন যে, রাশিয়ার বাধাদান শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তথাপি বিস্ময়ের কথা এই যে, উত্তর পার্শ্বদেশে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভরোনেজ যেমন অজেয় রহিয়া গেল, তেমনি প্রধান সোভিয়েট বাহিনীগুলিকেও সংহার করা গেল না। অথচ ইতিমধ্যে জার্মানবাহিনী আরও দক্ষিণে ককেশাসের দিকে এবং পূর্বদিকের উপত্যকা অভিমুখে আগাইয়া যাওয়ার জন্য মাতিয়া উঠিল।

* * *

২৭শে জুলাই রস্টোভের পতনের পর দেখা গেল যে, ডন নদীর দক্ষিণ দিকের এলাকা 'আলগা' হইয়া গিয়াছে। সুতরাং জার্মানরা লোভ সামলাইতে পারিল না। তারা দক্ষিণগামী ডন নদী 'এক বিস্তৃত এলাকা ধরিয়া' অতিক্রম করিল। তবে, সিমলিয়ানস্কায়া শহর তখনও আত্মরক্ষা করিয়া ছিল। পর দিন ২৮শে তারিখও জার্মানদের অগ্রগতি অব্যাহত রহিল এবং তারা ডনের শাখানদী ম্যানিচ ও সল্ অতিক্রম করিল এবং প্রলেটরস্কায়া দখল হইয়া গেল। প্রলেটরস্কায়া ম্যানিচ নদীর তীরে। স্ট্যালিনগ্রাদ হইতে যে রেলপথ ককেশাসের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের ক্রাসনোডারকে সংযুক্ত করিয়াছে, সেই রেলপথ এখানে নদী পার হইয়া গিয়াছে। সুতরাং জার্মানরা এই রেলপথ নিজেদের মুঠার মধ্যে পাইল এবং রস্টোভের বিপরীত দিকস্থ বাটাইস্কের গুরুত্বপূর্ণ রেল জংশনটি অধিকার করিল। রস্টোভের পতন ও ডন নদীর লাইন ভাঙ্গিবার পর মার্শাল টিমেশেঙ্কো তাঁর সৈন্যদলকে অতি দ্রুত পূর্বদিকে স্ট্যালিনগ্রাদ অভিমুখে এবং দক্ষিণ দিকে ককেশাস পর্বতের এলাকায় অপসারণ করিয়াছিলেন। ককেশাস পর্বতের পাদদেশ এবং আজভ সাগরের তীরস্থ জলাভূমি জার্মান যান্ত্রিক অগ্রগতির পথে সুবিধাজনক হইবে না মনে করিয়াই লালফৌজ এদিকে পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল। ককেশাস যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল এভাবে।...

১। Hutchinson's Quarterly Record of the War—Vol. XII, P. 46-4

২। লেখক প্রণীত—রুশ-জার্মান সংগ্রাম—(১৯৪৭)।

প্রকৃতপক্ষে ককেশিয়া বা ককেশাস একটি পর্বতবহুল যোজক মাত্র এবং এই যোজক একটা কর্কশ চওড়া সেতুর মত ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশকে সংযুক্ত করিয়াছে। ইহার একদিকে পশ্চিমে কৃষ্ণ সাগর এবং অন্যদিকে পূর্বে কাস্পিয়ান সাগর—উত্তরে ইহা ইউরোপীয় সোভিয়েট রাশিয়া, আর দক্ষিণে এশিয়া মাইনর ও উত্তর পারস্যের (ইরানের) সহিত মিশিয়াছে। ককেশাস পর্বত এর উচ্চ শিরদাঁড়ার মত, যার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউণ্ট এলব্রুজ ১৮,৪৫০ ফুট এবং মাউণ্ট কাজবেক ১৬,৫৫০ ফুট উঁচু। এই দেশ দৈর্ঘ্যে সাতশত পঞ্চাশ মাইল, আর পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত চওড়ায় পাঁচ শত মাইল। এর বৃহৎ নদীগুলি, যথা—কিউবান, রিওন বা ফাজ কৃষ্ণ সাগরে এবং টেরেক ও কুর নদী কাসপিয়ান সাগরে পড়িয়াছে। পর্বতগুলি অরণ্যবহুল, নদী-উপত্যকা ও সানুদেশ শস্যবহুল এবং এই দেশের পেট্রোল সম্পদ পৃথিবীতে বিখ্যাত, যার জন্য বাকু ও বাটুম সর্বত্র পরিচিত। ইহার প্রধান নগর টিফ্‌লিস বর্তমানে (টিবলিসি) বহু প্রাচীনকালের শহর। কসাক, তুর্কী, তাতার, জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান, রুশ এবং অন্যান্য বহু প্রকার ছোট বড় জাতির বা অধিজাতির বাস এই অঞ্চলে, যাদের মোট জনসংখ্যা ষাট-সত্তর লক্ষের কম হইবে না। এরা স্বাধীনচেতা, দুঃসাহসিক এবং উৎকৃষ্ট যোদ্ধা, এঁদের মধ্যে বহু মুসলমান ধর্মাবলম্বী রহিয়াছেন। রুশ বিপ্লবের পর এখানে কয়েকটি সোসিয়েলিস্ট সোভিয়েট রিপাবলিক গঠিত হইয়াছে, কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট মস্কোর সঙ্গে যাদের সম্পর্ক গভীর এবং অচ্ছেদ্য। জারের আমলে এই দেশ ও মধ্য এশিয়ার রাজ্যগুলি অত্যন্ত পশ্চাৎপদ ছিল। কিন্তু বর্তমানে কলকারখানা, বিদ্যুৎ ও বাষ্পের শক্তিতে ককেশাসের প্রাচীন জীবনযাত্রা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং আধুনিক শিল্প-সভ্যতা এদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া দিয়াছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে ককেশাসের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এর শস্যসম্ভার, খাদ্য, খনিজ ঐশ্বর্য, পেট্রোল সম্পদ ইত্যাদি জনগণের জীবনযাত্রা ও রণনৈতিক প্রয়োজনের দিক থেকে ছিল অপরিমিত মূল্যবান। সোভিয়েট বিপ্লবের পর এই সমস্ত দেশের একেবারে রূপান্তর ঘটিয়া গিয়াছিল। যেমন বলা যাইতে পারে যে, ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯৪৩ সালে জর্জিয়াতে মোট ভারী শিল্পের উৎপাদন একুশ গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল এবং আর্মেনিয়ায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেইশ গুণ।

ককেশাসের রণনৈতিক গুরুত্ব এত বেশী যে, এজন্য দক্ষিণ দিকে সোভিয়েট গবর্নমেণ্টের সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রহিয়াছে। কেননা, এই অঞ্চল ইরান ও তুরস্কের একান্ত পার্শ্ববর্তী এবং মধ্য প্রাচ্যের প্রধান প্রবেশপথ, যে পথের পূর্ব প্রান্তের ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ প্রান্তে পারস্য উপসাগর—জারের আমল থেকেই এই অঞ্চলটির উপর মস্কোর খরদৃষ্টি। সেই দৃষ্টি ছিল জার্মানীরও। বলা বাহুল্য যে, রাশিয়ার তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। উক্রাইন ও ককেশাসের বিপুল সম্পদের জন্য জার্মানী বরাবরই লোভাতুর ছিল। একা হিটলার নয়, হিটলারের পূর্বগামী জার্মান জঙ্গীবাদীদেরও ওই একই বুলি ছিল—পূর্বদিকে অভিযান বা জার্মান ভাষায় 'Drang Nach Osten' এই তিনটি শব্দই ছিল জার্মান সাম্রাজ্যবাদীগণের পররাষ্ট্র নীতি ও রণ নীতির মূল কথা। ১৯১৫ সালের ৮ই জুলাই তারিখের প্রচারিত একটি মেমোরেণ্ডামে দেখা যায় যে, জার্মান সেনানীমণ্ডলী উক্রাইন, ক্রিমিয়া, ককেশাস ভেদ করিয়া দূরবর্তী ভারতবর্ষের দিকে হাত বাড়াইয়াছে এবং এই সমস্ত ছাড়াও বলকান অঞ্চল, গোটা

মধ্যপ্রাচ্যে, পারস্য উপসাগর, ভারত এবং মিশরসহ আফরিকার এক সুবৃহৎ অংশ দখল করিয়া 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের মর্মকেন্দ্রে' আঘাত হানার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় জার্মানীর বহু বুদ্ধিজীবী, বণিক, ব্যাঙ্কার, ভুস্বামী, আইনবিদ, অধ্যাপক প্রভৃতি স্বাক্ষর দিয়াছিলেন। সুতরাং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়ার ঐশ্বর্যের প্রতি একমাত্র হিটলারী জার্মানীর নয়, ইম্পিরিয়েল জার্মানীরও প্রচণ্ড লোভ ছিল।

এমন কি, ১৯১৫ সালে জার্মানীর অন্যতম রণনায়ক জেনারেল লুডেনডর্ফ উক্রাইন ও ককেশাসের কাঁচা মালের ঐশ্বর্য লুঠ করিতে ওখানকার জনশক্তিকে সৈন্যবাহিনীতে পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন।[১]

জেনারেল (পরবর্তী কালে জার্মানীর প্রেসিডেণ্ট) হিণ্ডেনবুর্গও একই উদ্দেশ্যে ককেশাসের ঐশ্বর্যের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি দিয়াছিলেন। এমন কি জার্মান জঙ্গীবাদীগণ তুরস্কের সহযোগিতায় ককেশাস দখলের কথা ভাবিয়াছিল। সোভিয়েট বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালের গৃহযুদ্ধের সময়েও জার্মান জঙ্গীবাদীরা বাল্টিক অঞ্চল, উক্রাইন ও ককেশাস গ্রাস করিতে চাহিয়াছিলেন।

অতএব ককেশাসে ও উক্রাইনের দিকে অভিযান একমাত্র হিটলারের মত্ততাসঞ্জাত ছিল না, সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীরই ছিল এটা প্রাচীন 'ঐতিহ্যে'র মত। জার্মান জেনারেল স্টাফও এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত ছিলেন—যদিও যুদ্ধে পরাজয়ের পর সেনাপতিরা সমস্ত দোষ ও দায়িত্ব একমাত্র হিটলারের ঘাড়ে চাপাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আসল সত্য এই যে, রাশিয়ার অর্থনৈতিক সম্পদ দখল ও লুঠ করার 'উদ্দেশ্যে'র সঙ্গে জার্মান সেনানীমণ্ডলীও একমত ছিলেন। কিন্তু হিটলারের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটিয়াছিল সেই উদ্দেশ্য পূরণের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নিয়া।[২]

১৯৪১ সালের জুলাই মাসে নাৎসী হাই কমাণ্ড যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, তাতে উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হইয়াছিল ককেশাসের তৈল সম্পদ দখল করা এবং ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ইরান-ইরাক সীমান্ত লঙ্ঘন পূর্বক বাগদাদ পর্যন্ত আগাইয়া যাওয়া।

হিটলার যে ককেশাস ডিঙ্গাইয়া মধ্যপ্রাচ্যের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ পর্যন্ত পেঁাছিতে চাহিয়াছিলেন, সেই সম্পর্কে সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল হ্যালডার ও জেনারেল জিট্‌জিলার (Zeitzler) এবং ফিল্ড মার্শাল ম্যানস্টাইনের লেখাতেও প্রমাণ পাওয়া যায়।…

১৯৪১-৪২ সালের শীতাভিযানে যদিও জার্মানীর ৫০ ডিভিসন সৈন্য চূর্ণ ও [১]·৪ লক্ষেরও বেশী সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল, তথাপি ১৯৪২ সালের মে মাসে জার্মান সমরশক্তি আদৌ কম ছিল না। এই সময় জার্মানীর হাতে ছিল ২৩২ ডিভিসন ও ১০ ব্রিগেড সৈন্য এবং ৬টি বিমানবহর। এগুলির মধ্যে ১৭৭ ডিভিসন ও ৮ ব্রিগেড কিম্বা শতকরা ৮০ ভাগ সৈন্য ও ৪টি বিমানবহর ছিল একমাত্র জার্মান-সোভিয়েট রণাঙ্গনে। এ ছাড়া বিভিন্ন তাঁবেদার গোষ্ঠীর সৈন্য ও সমরশক্তিসহ জার্মানীর শক্তি দাঁড়াইল মোট ৬১ লক্ষ ৯৮ হাজার সৈন্য, ৩২৩০ ট্যাঙ্ক, ৩৩৯৫ রণবিমান, এবং

৫৬,৯৪০টি কামান ও মর্টার। সোজা কথায় ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে জার্মানী পূর্ব রণাঙ্গনে সর্বাধিক সামরিক শক্তির সমাবেশ করিয়াছিল।

অপরপক্ষে ১৯৪১ সালের হিটলারী জার্মানীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পড়িয়া সোভিয়েট সৈন্যেরা যুদ্ধ সম্পর্কে ক্রমশঃ অভিজ্ঞ হইয়া উঠিল এবং ১৯৪২ সালের ১লা মে তারিখের মধ্যে সোভিয়েট বাহিনীর সৈন্য শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়া ৫৫ লক্ষে দাঁড়াইল। আর সমরাস্ত্রের মধ্যে তাদের ছিল ৫ হাজার ট্যাংক, ৪০ হাজার কামান ও মর্টার এবং প্রায় ২৫০০ বিমান।

ইতিমধ্যে সোভিয়েট অর্থনীতি ও শিল্পোৎপাদন নীতি যুদ্ধকালীন পর্যায়ে পৌঁছিল। যে হাজার হাজার কলকারখানা পশ্চিম রাশিয়া থেকে পূর্বদিকে ও মধ্য এশিয়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল, ১৯৪২ সালের মধ্যভাগেই সেগুলি সমরশিল্প ও সমরাস্ত্র উৎপাদন করিতে লাগিল। এমন কি এক বছরে জার্মানীর তুলনায় বেশী অস্ত্র উৎপাদন করিল। নূতন ধরনের অস্ত্রও তৈয়ার হইতে লাগিল—যেমন রকেট মর্টার বা বিখ্যাত কাটিয়ুসা (Katyussa) ১৯৪২ সালে যার সংখ্যা দাঁড়াইল ৩২১৫।[১]

জার্মানীর আসন্ন অভিযানের মুখোমুখি হওয়ার জন্য সোভেয়েট হাইকমাণ্ড বা 'স্টাভ্কা' ফিনল্যাণ্ডের সীমানা থেকে ক্রিমিয়া বা কৃষ্ণসাগরের তীর পর্যন্ত লালফৌজকে ৯টি রণাঙ্গনে বিভক্ত করিল এবং সমগ্র রণাঙ্গন ধরিয়া সমানভাবে সৈন্য বণ্টন করিল। ফলে, জার্মানীর তুলনায় কোথাও রুশ শক্তি শ্রেষ্ঠতা অর্জন করিতে পারিল না। অধিকন্তু সোভিয়েট হাইকমাণ্ড সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট সত্ত্বেও দক্ষিণ দিকে উপযুক্ত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন না। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, হিটলারী দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযানের আসল লক্ষ্য হবে মস্কো বা মধ্য রণাঙ্গন।[২]

এই ভুলের জন্য দক্ষিণ দিকে রাশিয়ার প্রচুর খেসারৎ দিতে হইয়াছিল।

* * *

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকাল রাশিয়ার পক্ষে সত্য সত্যই সঙ্কটজনক ছিল—কার্চ, খারকোভ ও সেবাস্তপোলের নিদারুণ পরাজয়গুলি রাশিয়ার পক্ষে কেবল গভীর বেদনাদায়ক ছিল না, সমগ্র যুদ্ধের ফলাফলের পক্ষেই উদ্বেগজনক ছিল। বিশেষত স্ট্যালিন তথা রাশিয়ার প্রত্যাশা ছিল যে, এই সঙ্কটের সময় ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ থেকে পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হইবে কিম্বা জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আঘাত হানা হইবে। এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রত্যাশা লইয়াই পূর্ব রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনীর বণ্টন ও সমাবেশ ঘটানো হইয়াছিল। অর্থাৎ সেই প্রত্যাশার উপর ভিত্তি করিয়াই সামরিক পরিকল্পনা তৈয়ার হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হইল না। ফলে, স্বাভাবিক কারণেই হিটলারী গ্রীষ্মাভিযানে সোভিয়েট রাশিয়া অনেকদিন পর্যন্ত মার খাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে তুরস্ক, ইরান এবং পূর্বদিকে জাপানের মতিগতিও ভালো ছিল না। এরা সকলেই রাশিয়ার বিপদের সুযোগ নিতে চাহিয়াছিল। সেই

১। মার্শাল আন্দ্রেই গ্রেচকো—পৃঃ ৩৮-৩৯
২। ঐ—পৃঃ ৩৯-৪০।

সময় রাশিয়ার সংকট কত ভয়াবহ ছিল, তা বুঝা যাইবে বিখ্যাত মার্কিন কূটনীতিক এডওয়ার্ড স্টেটিনিয়াসের মন্তব্য থেকে। মিঃ স্টেটিনিয়াস যুদ্ধের পর লিখিয়াছিলেন :

'আমেরিকান জনগণের জানা উচিত যে, ১৯৪২ সালে তাঁরা বিপর্যয়ের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যদি সোভিয়েট ইউনিয়ন রণাঙ্গনে তিষ্ঠিতে না পারিত, তবে, জার্মানরা গ্রেট বৃটেন দখল করিয়া নেওয়ার অবস্থায় পেঁ'ছিত। তারা আফ্রিকা গ্রাস করিয়া ফেলিতে সক্ষম হইত এবং যদি তারা তা' করিত, তবে, তারা ল্যাটিন আমেরিকায় পেঁ'ছিয়া সেখানে ঘাঁটি গাড়িয়া বসিতে পারিত।'[১]

সেদিন সোভিয়েট রাশিয়ার সংকট সম্পর্কে দায়িত্বশীল ইঙ্গ-মার্কিন মহলে যে নৈরাশ্যজনক মনোভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তার প্রমাণ স্বয়ং চার্চিল এবং রুজভেল্টের মন্তব্যেও পাওয়া যাইবে। সেই সময় চার্চিল রুজভেল্ট এবং এ্যাটলিকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—

'আমার ধারণা এই যে, তাদের (রুশদের) টিকে থাকার সম্ভাবনা সমান সমান। কিন্তু ইম্পিরিয়েল জেনারেল স্টাফের অধ্যক্ষ মহোদয় এতদূরও মেনে নিতে রাজী নন!'

আর ওয়েন্ডেল উইলকি যখন 'এক বিশ্ব-পরিবারের' বার্তা নিয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত দূত হিসাবে বিশ্বপরিক্রমার পথে সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৪২) মস্কোতে পেঁ'ছিয়াছিলেন, তখন তিনি বিখ্যাত সমর-ঐতিহাসিক আলেকজান্দার ভার্থের নিকট বলিয়াছিলেন—'আমি একথা আপনাকে জানাতে পারি যে, যখন পাঁচ সপ্তাহ আগে আমি ওয়াশিংটন থেকে যাত্রা করেছিলাম, তখন প্রেসিডেণ্ট আমার নিকট মন্তব্য করেছিলেন—'আপনি কাইরোতে হয়তো এমন সময় পেঁ'ছুবেন, যখন কায়রোর পতন হচ্ছে এবং আপনি রাশিয়াতেও হয়তো এমন সময় যাবেন, যখন রাশিয়া ভেঙ্গে পড়ছে।'

অথচ চার্চিল-রুজভেল্টের মত শীর্ষস্থানীয় বিশ্ব-নেতারা, যাঁরা হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার সঙ্গে মহামৈত্রীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁরা কিন্তু রাশিয়ার এত বড় সংকটের কথা অনুধাবন করা সত্ত্বেও ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির তেমন কোন আন্তরিক ও সর্বাত্মক চেষ্টা করিলেন না। বরং ১৯৪২-এর আগস্টের সেই চরম দুর্দিনে চার্চিল স্বয়ং মস্কোতে গিয়া স্ট্যালিনকে বলিলেন যে, ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি সম্ভব নয়। বিক্ষুব্ধ স্ট্যালিন তার জবাবে বলিয়াছিলেন যে, বৃটিশ সরকার কর্তৃক দ্বিতীয় রণাঙ্গন খেলার এই অস্বীকৃতি সোভিয়েটের জনমতের পক্ষে একটা মারাত্মক আঘাতের মত এবং এর দ্বারা সোভিয়েট হাইকমাণ্ডের রণ-পরিকল্পনার ক্ষতি হইবে, লালফৌজের অবস্থানকে জটিল করিয়া তোলা হইবে।

(চার্চিল-স্ট্যালিন সাক্ষাৎকার সম্পর্কে চতুর্থ পর্বের দশম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।)

কিন্তু দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির মারফৎ মিত্রপক্ষের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ সাহায্য পাওয়া দূরের কথা সেই সময় উত্তর মেরু সমুদ্রের পথ দিয়া আর্চেঞ্জেল বন্দর মারফৎ কনভয়যোগে রাশিয়ার নিকট মিত্রপক্ষের যে সমস্ত সমর-সম্ভার পেঁ'ছিবার কথা, সেই কনভয় পর্যন্ত চার্চিলের নির্দেশে বাতিল হইয়া গিয়াছিল।

শুধু তাই নয়, যখন দক্ষিণ রাশিয়া ও ককেশাসের সামনে বিপদ দেখা দিল, তখন

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৮৪

সোভিয়েট সরকারকে সহায়তা দানের অজুহাতে চার্চিল প্রস্তাব করিলেন যে, রাশিয়া স্ট্যালিনগ্রাদে আত্মরক্ষা করুক, আর বৃটিশ সৈন্যরা ককেশাস রক্ষা করুক। বৃটিশ ও মার্কিন সরকার 'ভেলভেট' নামে এক রণ-পরিকল্পনাও এজন্য স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু রুশ সরকার শেষ পর্যন্ত এতে সম্মত হননি।[১]

সুতরাং দেখা যাইতেছে ১৯৪২ সালের হিটলারী গ্রীষ্মাভিযানের সমগ্র প্রচণ্ডতা সোভিয়েট রাশিয়াকে একক হস্তে সামলাইতে হইয়াছিল এবং তাকে একাই স্ট্যালিনগ্রাদ ও ককেশাসের সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করিতে হইয়াছিল। কেবল প্রতিহত নয়, প্রচণ্ডতর পালটা আক্রমণের দ্বারা জয়ও তাঁরা একাই অর্জন করিয়াছিলেন।…

ককেশাসের যুদ্ধ

ককেশাসের যুদ্ধ সম্পর্কে বাইরের জগতে তেমন বেশী প্রচারিত না হওয়ার অন্যতম কারণ এই যে, সেই সময় স্ট্যালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক সংগ্রামের দিকেই গোটা রাশিয়াসহ সমগ্র জগতের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। ফলে, ১৯৪২ সালের শেষ পাঁচ মাসে যখন স্ট্যালিনগ্রাদ ও ককেশাসের তীব্র যুদ্ধ একসঙ্গে চলিতেছিল, তখন সোভিয়েট পত্র-পত্রিকায় ও প্রচারযন্ত্রে স্ট্যালিনগ্রাদই প্রায় সমস্ত অংশ জুড়িয়াছিল। এমন কি, মহাযুদ্ধের পরেও অনেকদিন পর্যন্ত সামরিক সাহিত্যে ককেশাস অনেকটা উপেক্ষিত ছিল। অথচ ককেশাসের যুদ্ধ নানা দিক দিয়াই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দূরপ্রসারী সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল। জার্মানীর ককেশাস আক্রমণ ৬ মাস স্থায়ী হইয়াছিল। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে জার্মানরা ককেশাসের বিরাট এলাকা ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু যত দ্রুত তারা দখল করিয়া নিয়াছিল, তত দ্রুতই আবার ১৯৪৩-এর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে সেই সমস্ত এলাকা ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইল। তবে ককেশাসে সংগ্রামের অন্যতম সোভিয়েট সেনাপতি মার্শাল আন্দ্রেই গ্রেচকো বলিতেছেন যে, ককেশাসের যুদ্ধ চূড়ান্তরূপে শেষ হইয়া গেল ৯ই অক্টোবর, ১৯৪৩, তখন তামাম উপদ্বীপের মুক্তি ঘটিল এবং কাস্পিয়ান সমুদ্র ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্তী বিশাল ভূখণ্ডের সমস্ত শত্রুসৈন্য নির্মূল হইয়া গেল।

দক্ষিণ রণাঙ্গনের সমগ্র জার্মানবাহিনী (আর্মি গ্রুপ সাউথ)-'এ' এবং 'বি' এই দুই গ্রুপে বিভক্ত ছিল এবং এদের সর্বাধিনায়ক ছিলেন ফিল্ড-মার্শাল ফন বোক। কথা ছিল 'এ' গ্রুপের আগে 'বি' গ্রুপ উত্তর দিকে ডন নদী পার হইয়া গিয়া ডন ও ভল্গার মধ্যবর্তী স্ট্যালিনগ্রাদ দখল করিবে। আর 'এ' গ্রুপ ততক্ষণে আরও দক্ষিণে নিম্ন ডনের অববাহিকা অতিক্রমপূর্বক খাস ককেশাসের অভ্যন্তরে আক্রমণ চালাইবে। ককেশাসে অভিযানের ভার পড়িল 'এ' গ্রুপের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড-মার্শাল লিস্টের উপর। 'এ' গ্রুপের মোট সৈন্যবাহিনী ছিল ১৮ পদাতিক, ৩টি ট্যাঙ্ক ডিভিসন, ৪টি মোটরায়িত, ৬টি পার্বত্য পদাতিক, ৩টি হাল্কা পদাতিক, ৪টি অশ্বারোহী এবং ২টি শিবিররক্ষী ডিভিসন। এদের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬৭ হাজার, ট্যাঙ্ক ১১৩০, কামান ও মর্টার ৪,৫৪০ এবং মোটামুটি ১ হাজার বিমান। আর্মি গ্রুপ 'এ'র উদ্দেশ্য ছিল রস্টোভ ও ডন এলাকার রুশসৈন্যদিগকে বেষ্টন করা।

১। মার্শাল গ্রেচকো—পৃষ্ঠা ৮৪-৮৭।

আর দক্ষিণ রণাঙ্গন প্রতিরক্ষার জন্য যদিও রাশিয়ার পাঁচটি আর্মি ছিল, তথাপি এগুলি সৈন্যশক্তিতে অত্যন্ত হীন ছিল। পাঁচটি আর্মির মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ১ লক্ষ ১২ হাজার। এই পাঁচটি আর্মির সেনাপতি পদে ছিলেন যথাক্রমে লেঃ-জেনারেল ম্যালিনোভস্কি, মেজর-জেনারেল কোজলোভ, মেজর জেনারেল ক্যামকোভ এবং মেজর-জেনারেল বাইকোভ। এঁরা ছাড়া আর্মি-জেনারেল তায়ালেনেভ গোড়ার দিকে ভার পাইয়াছিলেন কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী এলাকা এবং সোভিয়েট-তুর্কি সীমানা রক্ষার জন্য।

ককেশাসের এই যুদ্ধ অনুধাবন করিতে গেলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার ককেশাসের ভৌগোলিক অবস্থান। পাহাড়-পর্বত, অরণ্য, গিরিসংকট ও নদী ইত্যাদির জন্য এর ভৌগোলিক সংস্থান যেমন বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তেমনি মনে রাখা দরকার যে, ককেশাসের দুই পার্শ্বদেশে দুই সমুদ্রের অবস্থান—পূর্ব পার্শ্বে কাস্পিয়ান সাগর এবং পশ্চিম পার্শ্বে কৃষ্ণ সাগর। এরই মাঝখানে ককেশাস যোজক দখলের জন্য জার্মানরা উত্তর দিক থেকে ২৫শে জুলাই ডন নদীর নিম্নভাগের দিকে আক্রমণ শুরু করে এবং যুদ্ধটা ছয় মাস ধরিয়া প্রধানতঃ উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ককেশাস এবং সময় সময় মধ্যভাগে ধরিয়াও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময় নাৎসী বাহিনীর সামরিক শক্তি রুশদের তুলনায় দক্ষিণ দিকে শ্রেষ্ঠতর ছিল এবং রুশবাহিনী গভীর সংকটে পড়িয়া পর্যুদস্ত হইতেছিল। সমগ্র রণাঙ্গনের পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হইতে থাকায় সোভিয়েট হাইকমাণ্ড বা 'স্টাভকা' উদ্বেগ বোধ করিলেন এবং এই পরিস্থিতি রোধ করিবার জন্য সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক (সুপ্রীম কমাণ্ডার-ইন-চীফ) জে. ভি. স্ট্যালিন ২৮শে জুলাই, ১৯৪২, যে হুকুমনামা (অর্ডার নং ২২৭) জারী করিলেন, রাশিয়ার মহান স্বদেশাত্মক যুদ্ধের ইতিহাসে তা আজও স্মরণীয় হইয়া আছে। এই নির্দেশনামায় সামরিক পরিস্থিতির গুরুতর সংকট বিশ্লেষণ করিয়া বলা হইল ঃ

'...battles are in progress in the Voronezh area, on the Don, in the South and on the approaches to the North Caucasus; the German invaders are pressing towards Stalingrad and the Volga and intend at all costs to seize the Kuban area and the North Caucasus with its oil and other resources.

To continue the retreat means to doom ourselves and our country too...Not a step backward without order from the High Command. This is what the country summons you to do'

এই ঘোষণার মর্মবাণী হইল—'সমগ্র দক্ষিণ রণক্ষেত্রে যুদ্ধের অবস্থা ভয়ংকর। আরও পিছু হটিলে দেশ ও জাতি ঘোরতর বিপদে পড়িবে। সুতরাং হাইকমাণ্ডের অনুমতি ছাড়া কোন সৈন্যদলেরই আর এক পা পশ্চাদ্‌পসরণ করা চলিবে না। এই কর্তব্য পালনের জন্য তোমাদের স্বদেশ তোমাদের প্রতি এই জরুরী আদেশ দিতেছে।'

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক স্ট্যালিনের এই জরুরী হুকুমনামা সমস্ত রণক্ষেত্রের সৈন্যদলের নিকট পড়িয়া শুনানো হইল ৩০শে জুলাই তারিখে। এই হুকুমনামার ফলে সর্বত্র সৈন্যদের মধ্যে দেশরক্ষার উদ্দীপনা যেন নূতন করিয়া সঞ্চারিত হইল এবং কঠোরতর নিয়মশৃঙ্খলা ও কঠিন সংকল্পের ওপর জোর দেওয়া হইল। কমিউনিস্ট পার্টির

শত-সহস্র সদস্য (গোটা ককেশিয়াতে মোট ৬০০০-এর বেশী কমিউনিস্ট সদস্য) সৈন্যদের মধ্যে প্রচারের জন্য নামিয়া পড়িলেন। অধিকৃত এলাকায় ও গ্রামগুলিতে জার্মান সৈন্যরা স্ত্রী-পুরুষ এবং শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কী বর্বর এবং অমানুষিক অত্যাচার ও ধর্ষণ চালাইতেছে, তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা (কোন কোন ক্ষেত্রে মায়েদের লেখা চিঠিপত্র থেকে) সৈন্যদের মধ্যে প্রচার করা হইল। আর শত্রুদলের পিছনে গেরিলা ও পার্টিশান যোদ্ধৃদল সংগঠিত হইল। পাহাড়-পর্বতের যুদ্ধে এই সমস্ত গেরিলার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[১]

কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও কিউবান এবং উত্তর ককেশাস দিয়া জার্মান আক্রমণ ও অগ্রগতি দ্রুত হইয়াছিল এবং রুশসৈন্যরা পশ্চাদপসরণ ঘটিল। ফলে, পলায়নপর অজস্র নর-নারী ও শিশু ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পাহাড়-পর্বতের দিকে আশ্রয় সন্ধানের জন্য বিষম ছুটাছুটি শুরু করিয়া দিল। রাস্তাঘাটে ও রেলস্টেশনে এই সমস্ত নর-নারীর
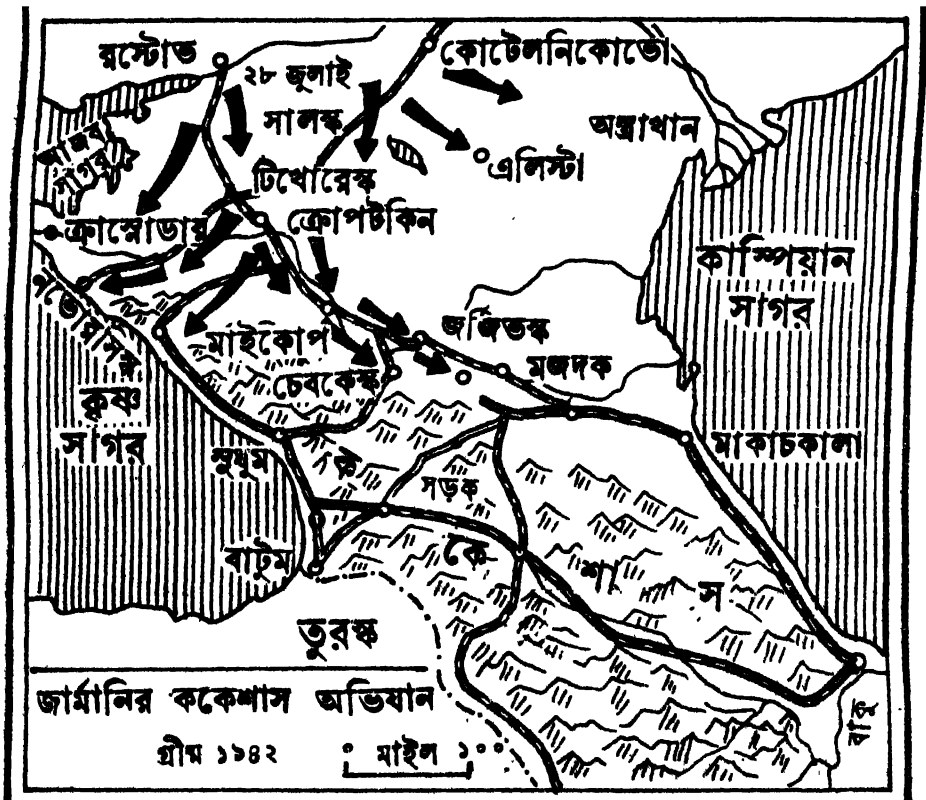
অসম্ভব ভিড়ের সঙ্গে আবার যুক্ত হইল গৃহপালিত গো-মহিষাদির ভিড়। পলায়মান গৃহস্থেরা এই সমস্ত জন্তু সঙ্গে নিয়া যাইতে চাহিল। বিস্ময়ের কথা এই যে, এই নিদারুণ অবস্থার মধ্যেও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা ও প্রশাসনিক সদস্যেরা ক্রাসনাডোর এবং উত্তর ককেশাস অঞ্চল থেকে ৩রা আগস্টের মধ্যে প্রায় ৫৮ হাজার ঘোড়া, ২,০৬,৭০০ গো-মহিষ এবং ৪,১১,৩৩০ ভেড়া ও ছাগল উদ্ধার করিয়াছিলেন।

কেবল সৈন্যেরাই নয়, অ-সামরিক জনগণও ককেশাসকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার

১। 'Battle for the Caucasus'—P. 52-55.

জন্য আপ্রাণ এবং অমানুষিক চেষ্টা চালাইয়াছিলেন। যখন গ্রোজনী ও বাকুর দিকে জার্মান আক্রমণের বিপদ দেখা দিল, তখন সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ সত্য-সত্যই শঙ্কিত হইলেন। সেই ঘোর দুর্দিনে প্রতিরক্ষার ব্যূহগুলিকে দুর্ভেদ্য করিবার উদ্দেশ্যে আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ৯০ হাজার অসামরিক নাগরিক সমবেত হইলেন এবং দিনরাত পরিশ্রম করিয়া গ্রোজনী থেকে বাকু পর্যন্ত সম্ভাব্য আক্রমণের জায়গাগুলিতে বহুপ্রকার প্রতিরক্ষার ঘাঁটি তৈয়ার করা হইল। সুপ্রসিদ্ধ তৈলকেন্দ্র বাকুকে রক্ষা করার জন্য উহার চারিদিকে পরপর ১০টি প্রতিরক্ষার লাইন তৈয়ার হইল। জর্জিয়ান এবং ওমেটিন সামরিক সড়ক (এই দুইটি সামরিক সড়কই ককেশিয়াতে প্রসিদ্ধ ছিল) ধরিয়াও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। কী অমানুষিক চেষ্টা এজন্য জনগণের পক্ষ থেকে করা হইয়াছিল, তার জ্বলন্ত বর্ণনা দিয়াছেন ককেশাসের অন্যতম খ্যাতিমান সেনাপতি আই. ডি. তায়ুলেনেভ তাঁর বইতে :

"কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সমগ্র ককেশাসের যুদ্ধক্ষেত্র প্রতিরক্ষার ব্যূহজালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত অবসন্ন হইয়া মাটিতে পড়িয়া না যাইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত লোকজনেরা ক্ষতবিক্ষত হাতে রক্তসিক্ত ন্যাকড়া জড়াইয়া কাজ করিয়া যাইত। কোন কোন সময় দিনের-পর-দিন তাদের খাওয়া পর্যন্ত জুটিত না, তবু দিনে রাতে তাদের কাজে ক্লান্তি ছিল না, এমন কি শত্রুর বোমাবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়াই তারা কাজ করিয়া যাইত। শরৎকালের আরম্ভে প্রতিরক্ষার এক লক্ষ কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এগুলির মধ্যে ছিল ৭০,০০০ পিলবক্স এবং গোলাগুলি ছুঁড়িবার অন্যান্য ঘাঁটি। ৫০০ মাইলের বেশী ট্যাংকমারা গর্ত খোঁড়া হইয়াছিল, পদাতিক সৈন্যদের প্রতিবন্ধক তৈয়ার হইয়াছিল ২০০ মাইলের বেশী এবং ১০০০ মাইল দীর্ঘ পরিখা খনন করা হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রতিরক্ষার কর্মে মোট ৯১ লক্ষ ৫০ হাজার খাটুনির দিন লাগিয়াছিল।"

এই সমস্ত বর্ণনা থেকে অনায়াসে উপলব্ধি করা যাইবে জনগণ ও সৈন্যবাহিনী একাত্ম হইয়া এবং কী অপূর্ব ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বদেশরক্ষার এই মহান যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন।

* * *

ককেশাসের এই গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামকাহিনীর বাকী অংশ লেখক প্রণীত 'রুশ-জার্মান সংগ্রাম' (১৯৪৭) থেকে নিচে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :

দক্ষিণ-পূর্ব উক্রাইনের রোস্টভ ও ডন নদীর দ্বার খুলিয়া যাওয়ায় আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে জার্মানীর অভিযান কিন্তু শুরু হইল ককেশাস অভিমুখে। এর আশু সামরিক উদ্দেশ্য ছিল : ১. টিমোশেঙ্কোর পলায়মান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করা। এই বাহিনী মস্কো-স্ট্যালিনগ্রাদের সহিত সংযোগ হারাইয়া ককেশাস এলাকায় প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ২. কৃষ্ণসাগরের তীরস্থ বাকি দুইটি উল্লেখযোগ্য বন্দর নভোরোসিস্ক ও তুয়াপসে দখল করা। কেননা রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরীয় নৌ-বহর ওডেসা হইতে শুরু করিয়া সেবাস্তোপোল পর্যন্ত একে একে সমস্ত বড় বন্দর এবং নৌ-ঘাঁটি হারাইয়া ফেলিয়াছিল। এক্ষণে নভোরোসিস্ক হাতছাড়া হইলে বাটুম ও পোটি ইত্যাদির মত অপ্রয়োজনীয় ঘাঁটি মাত্র রাশিয়ার হাতে থাকিবে। ৩. ডন নদীর মোহনাস্থিত রস্টোভ হইতে উত্তর-পূর্ব ককেশাস পর্বতের পার্শ্বদেশ ঘুরিয়া যে দীর্ঘ রেলপথ কাস্পিয়ান সাগরের বাকু বন্দরে পৌঁছিয়াছে এবং যাহা এশিয়া ও

ইউরোপের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছে, সেই পথ ও বন্দর দখল করা। বলা বাহুল্য যে, ইহাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন। কেননা, বাকুর পেট্রোল-ঐশ্বর্য দখল করিতে পারিলে জার্মানী সোভিয়েট রাশিয়াকে তার সৈন্য, সমরশিল্প ও শ্রমশিল্পের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় তৈলসম্পদ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিত। ইহা ছাড়া কাস্পিয়ান সাগরের তীরে পৌঁছিতে পারিলে বাকু ছাড়াও ককেশাস পর্বতের উত্তরবর্তী গ্রোজনীর তৈলখনি দখল করিতে এবং বাকু হইতে কাস্পিয়ান সমুদ্র দিয়া ভল্গা নদীর মোহনার অস্ত্রখান বন্দরগামী তৈলপোতগুলি (oil tanker) ও উরল নদী মোহনা জার্মান বোমারুর নিয়মিত পাল্লার মধ্যে আসিয়া যাইত।

কিন্তু এইগুলি হইল রাশিয়াকে সামরিক দিক হইতে বঞ্চিত করার কথা, যার গুরুত্ব ছিল নিঃসন্দেহে অপরিসীম। ককেশাসের উত্তর-পশ্চিম অংশের মৈকোপ তৈলখনি এবং রস্টোভ বন্দর পর্যন্ত প্রসারিত ইহার পাইপলাইন ও ক্রাসনোডারে অবস্থিত ইহার তৈল নিষ্কাশন যন্ত্রপাতি যদি অক্ষত অবস্থায় জার্মানী দখল করিতে পারিত, তবে উহার মূল্য হইত অপরিমিত। রাশিয়ায় অবস্থিত বিশাল জার্মানবাহিনীর সামরিক ক্ষুধা পরিপোষণের জন্য যেমন তৈল আবশ্যক, তেমনি অধিকৃত অঞ্চলগুলির কৃষিকার্যের জন্য ট্রাক্টরের পক্ষেও এই তেলের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু মুশকিল এই যে, এই ক্ষুধার সীমারেখা টানা কঠিন ছিল। কেননা, সমগ্র পেট্রোলসম্পদ পাইতে গেলে যেমন বাকু পর্যন্ত ধাওয়া করা দরকার, তেমনই কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী বাটুম এবং মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলি দখল করাও প্রয়োজন। এজন্য ১৯৪২ সালের জার্মান অভিযান অর্থনৈতিক মত্ততায় প্রলুব্ধ ছিল। আগের বৎসর পশ্চিম উক্রাইন জয়ের পর এই বৎসর আবার পূর্ব উক্রাইন দখল করিতে হইল এবং ডনেৎস অববাহিকা ও ডন উপত্যকার খনিজ ও কৃষি ঐশ্বর্যের পর আবার উত্তর ককেশাসের দিকে মন দিতে হইল। কিন্তু এখানেও স্থির হইয়া বসিবার উপায় নাই—যেন দক্ষিণ ককেশাস আবার হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। অথচ দূরত্বের বিবেচনায় এই রণনীতি নিতান্ত অবাস্তব বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। কারণ, রস্টোভ হইতে বাকু পর্যন্ত রেলপথের দৈর্ঘ্য ৯০০ মাইলের বেশী এবং রস্টোভ হইতে গ্রোজনী পর্যন্তও ৫০০ মাইলের বেশী। কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের দুই তীর দখল না করিয়া কেবল রস্টোভ-বাকু রেলপথে অগ্রসর হওয়া যেমন বিপজ্জনক ছিল, তেমনই এই ধরনের কোন অভিযানে, এমন কি উত্তর ককেশাসের পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত দেশ দখলেও বহু জার্মান সৈন্যের আটকা পড়ার কথা। ককেশাস অঞ্চলের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যস্থলই একে অপরের কাছ থেকে কয়েক শত মাইল দূরে ছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে রস্টোভ হইতে বাকু ৯০০ মাইল। উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত ককেশাস গিরিশ্রেণী ৮০০ মাইল দীর্ঘ। ইহার মধ্য দিয়া একটি রেলপথও নাই—একমাত্র রেলপথ গিয়াছে রস্টোভ হইতে বাকু পর্যন্ত একদিকে পাহাড় ও অন্যদিকে সমুদ্রের ধার দিয়া, সামরিক প্রশ্নে যাহা আদৌ নিরাপদ নহে। আর দুইটি সড়ক গিয়াছে ৫ হাজার হইতে ৮ হাজার ফুট উচ্চ পর্বতপৃষ্ঠ দিয়া, যে পথে কোন আধুনিক যান্ত্রিক সৈন্যদলের এত অস্ত্র, যন্ত্র ও সমরসম্ভার লইয়া অভিযান প্রায় অসম্ভব। আর ককেশাসের পর্বতপৃষ্ঠগুলির গড়পড়তা উচ্চতা ৯ হাজার হইতে ১২ হাজার ফুট —সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ইউরোপের সেরা। পার্বত্য যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞতা ও সবিশেষ দক্ষতা ছাড়া এইপ্রকার গিরিশৃঙ্গ অভিযান সম্ভব নহে। তারপর নদীগুলির

প্রশ্নও উপেক্ষণীয় নহে। কিউবান, কিউমা এবং টেরেক নদী শীতের দিনে বরফে জমাট বাঁধিয়া যায়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই নদীগুলি যেমন খরস্রোতা, তেমনই গভীর। অতএব এই নদীগুলিও বিঘ্ন হিসাবে দেখা দিবে। তবে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ককেশাসে কিছু রাস্তাঘাট ও রেলপথ রহিয়াছে। কিন্তু যে প্রণালীতে এই রেলপথগুলি চালিত তার আসল চাবিকাঠি রস্টোভে। কোটেলনিকোভ হইতে স্ট্যালিনগ্রাদগামী জার্মান সৈন্যদেরও এই রস্টোভ কেন্দ্রের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। সুতরাং অসুবিধা কম ছিল না।

জার্মান অভিযান প্রথমত দুই বাহুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বাহু বিস্তৃত হয় রস্টোভের সোজা দক্ষিণে বাটাইস্ক হইতে ক্রাসনোডারের দিকে, এর উদ্দেশ্য ছিল সমুদ্রতীরবর্তী এলাকা শত্রুমুক্ত করা এবং নভোরোসিস্ক বন্দর দখল করা। দ্বিতীয় বাহু বিস্তৃত হইল ম্যানিচ নদী উপত্যকা হইতে আরমাভির ও মৈকোপ দখলের জন্য। এখানে সোভিয়েট পৃষ্ঠরক্ষী সৈন্যেরা বেশী বাধা দিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কেননা, প্রধান রুশ সৈন্যদল জার্মান বোমারুর মুখে ডন নদী পার হইতে গিয়া তখনও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। জার্মানরা রেললাইন ধরিয়া টিখোরেটস্ক জংশনের দিকে অগ্রসর হইল। ১লা আগস্ট রস্টোভ হইতে ৫০ মাইল কুশচেভকার পতন হইল এবং ৫ই আগস্ট টিখোরেটস্ক দখল হইয়া গেল। রণকৌশলের দিক হইতে মনে হয় যে জার্মান সাঁজোয়া বাহিনী যদিও অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল, তথাপি পিছনের দিকে তীব্র লড়াই চলিয়াছিল এবং অগ্রবর্তী বাহিনীর সহিত পদাতিক বাহিনীর যোগসাধনে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটিয়াছিল। বিশেষত সমুদ্র তীরবর্তী এলাকাগুলি সাঁজোয়া বাহিনীর রণক্রিয়ার পক্ষে উপযোগী ছিল না। ফলে জার্মান অগ্রগতি কিছুটা বিলম্বিত হইয়াছিল।

কিন্তু ম্যানিচ নদী উপত্যকায় জার্মানদের অগ্রগতি ঘটিয়াছিল অতি দ্রুত এবং এই গতি আশঙ্কাজনক ছিল। প্রথমত ক্রাসনোডার-স্ট্যালিনগ্রাদ রেলপথ ধরিয়া ইহা অনুসৃত হয় এবং পরে বাকুগামী রেলপথে ক্রোপোটকিনে ইহা বিস্তৃত হয়। যান্ত্রিক বাহিনীগুলিই এই আক্রমণ চালাইয়াছিল। ৩রা আগস্ট জার্মানরা সালস্ক দখল করে এবং দুইদিন পরে আরও ৮০ মাইল দক্ষিণে ক্রোপোটকিন অধিকৃত হয়। এখানে বিখ্যাত কস্যাক অশ্বারোহী সৈন্যরা বিশেষভাবে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু তাঁরা যান্ত্রিক সৈন্যদলের গতিরোধ করিতে পারে নাই। তবে, জার্মানদের যানবাহন ও মাল চলাচলের বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল। ৯ই আগস্টের মধ্যে জার্মানরা আরমাভিরে পেঁৗছিল এবং মৈকোপের দিকে অগ্রসর হইল, তথাপি আরমাভির ও ক্রোপোটকিনে যুদ্ধ চলিল। ১২ই আগস্ট রুশেরা আরমাভির ত্যাগ করিল, কিন্তু ততক্ষণে অগ্রবর্তী জার্মান সৈন্যদল মৈকোপে পেঁৗছাইয়াছিল। নভোরোসিস্কের দিকে যে জার্মান বাহু বিস্তৃত হইয়াছিল, সেখানেও প্রায় একই অবস্থার উদ্ভব হইল। যদিও টিখোরেটস্ক এলাকায় ১১ই আগস্ট পর্যন্ত যুদ্ধ চলিয়াছিল, তথাপি জার্মানরা আরো ৭০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ক্রাসনোডারের সীমানায় পেঁৗছাইল। এই সময় রুশ সৈন্যরা আরও প্রবলভাবে বাধা দিতে লাগিল এবং যতক্ষণ না পিছনের সৈন্যরা আসিয়া জার্মান অগ্রবর্তী বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিল, ততক্ষণ তাদেরকে আটকাইয়া রাখা হইল। এই সময়ে সোভিয়েট বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল জার্মান অগ্রগতিতে বিলম্ব ঘটাইয়া কালহরণ করা এবং এই সময়ের মধ্যে মৈকোপ

তৈলখনি ও ক্রাসনোডারের তৈল শোধন যন্ত্রপাতি ধ্বংস করিয়া ফেলা। ১৩ই এবং ১৪ই আগস্ট এই শহর দুইটি রুশদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু যাওয়ার আগে তারা পোড়ামাটির নীতি সাফল্যের সহিত অনুসরণ করিয়াছিল। ১৯০৯ সালের আগস্ট মাসে যে ইঞ্জিনিয়ার এই খনিগুলির ভার লইয়াছিলেন তিনিই স্বহস্তে এইগুলি জ্বালাইয়া দেন ৩৩ বৎসর পর আর এক আগস্ট মাসে শত্রুকে বঞ্চিত করিবার জন্য।

মৈকোপের তৈলখনি হইতে বঞ্চিত হইয়া জার্মানরা আর দীর্ঘকাল দক্ষিণ দিকে পর্বত ডিঙ্গাইয়া তুয়াপসে বন্দরের অভিযানে অগ্রসর হয় নাই। তুয়াপসেগামী গিরিসংকটগুলির প্রবেশপথ আগলাইয়া রহিয়াই তারা সন্তুষ্ট থাকিল। তবে, ক্রাসনোডারের দিকে জার্মানরা নভোরোসিস্ক বন্দর দখলে জন্য দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল এবং সেখানে কিছুকাল রুশদের সহিত তীব্র যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। এই যুদ্ধে সোভিয়েট সৈন্য অন্তত সাময়িকভাবে জার্মানদের কিউবান নদী অতিক্রমে অন্তরায় সৃষ্টি করিল। কিউবান নদী পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত এবং ইহার দক্ষিণ অংশ পর্যন্ত গিরি পাদদেশ পেঁছাইয়াছে, আর এখানে পর্বতশৃঙ্গগুলি ক্রমশ উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং, আত্মরক্ষার পক্ষে এই স্থান অত্যন্ত সুবিধাজনক ছিল। যান্ত্রিক বাহিনীর মহড়ার এখানে আদৌ সুবিধা ছিল না, অতএব সংঘর্ষটা ঘটিল প্রধানত পদাতিক ও গোলন্দাজদের মধ্যে। ৯ই আগস্ট নাগাদ দেখা গেল যে, জার্মানরা আর পশ্চিম ককেশাসের যুদ্ধ সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করিতে ইচ্ছুক নহে। তারা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাকু রেলপথ ধরিয়াই অগ্রসর হইতে চাহে। ঐদিন আরমাভির হইতে ১০০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে কিউমা নদীতটবর্তী উষ্ণ প্রস্রবণের নিকট পিয়াটিগোরস্কের সামান্য কিছু জার্মান টহলদার সৈন্যকে দেখা গেল এবং তিন দিন পর চেরকাস্ক দখল হইল। চেরকাস্কের দক্ষিণে একটি ছোট গিরিসংকট আছে। এই স্থান দখলের দ্বারা জার্মানরা বোধহয় তাদের পূর্বমুখী অভিযানের পার্শ্বদেশ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করিতে চাহিল। এই চেরকাস্ক হইতেই কিছুদিন পর একদল পর্বতারোহী জার্মান সৈন্য এলব্রুজের ১৮,৪৭০ ফুট গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিল এবং একটি স্বস্তিকা চিহ্নিত পতাকা উড়াইয়া দিল। জার্মানরা ইউরোপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে হিটলারী জয়-পতাকা উত্তোলন করিয়া নিজেদের আত্মাভিমান তৃপ্ত করিল।

উত্তর ককেশাসের মধ্য ভাগে এভাবে রুশ-জার্মান সংঘর্ষ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া শুরু হইল এবং এই সংঘর্ষ একটা পৃথক অভিযানে পরিণত হইল। হয়তো এই সংঘর্ষে সাহায্যের জন্য মৈকোপ খনি অঞ্চল হইতে কিছু কিছু জার্মান সৈন্যও সরাইয়া আনিতে হইল। এদিকে মৈকোপ এলাকায় তুয়াপসে পর্যন্ত গিরিসংকটগুলিতে অনেকদিন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিল না। কেবল উভয় পক্ষের সৈন্যেরা মাঝে মাঝে আক্রমণ চালাইতে লাগিল। আগস্ট মাসের শেষ দিকে জার্মানরা কিউবান নদীর নিম্নভাগ অতিক্রম করিয়া একটি শক্তিশালী সেতুমুখ স্থাপন করিল। এখানে নদী পার হইবার পূর্ব ক্রাসনোডার খণ্ডে সোভিয়েট সৈন্যদের সহিত প্রবল যুদ্ধ হইল। নদী পার হওয়ার পর ২১শে আগস্ট জার্মানরা নভোরোসিস্ক অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার প্রথম চিহ্নস্বরূপ দক্ষিণ দিকে ক্রিমস্কায়া দখল করিল। কয়েক দিন পরে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় রুশ প্রতিরোধ ব্যূহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জার্মানরা কিউবান নদীর মোহানায় পেঁাছিল এবং তামান উপদ্বীপ দখল করিল। ইহারই

বিপরীত দিকে সামান্য সঙ্কীর্ণ জলপথের ব্যবধানে কার্চ (ক্রিমিয়া)। কিন্তু এই অভিযানে কার্চ হইতে জার্মানরা কোন সহযোগিতার চেষ্টা করিল না। সমুদ্রতটবর্তী ককেশাসের পশ্চিম পার্শ্বদেশের অপেক্ষাকৃত সহজ গিরিসংকটগুলিতে এবং কিউবান মোহনার দক্ষিণ এলাকায় যে সমস্ত সংঘর্ষ ঘটিল সেগুলি যেমন উল্লেখযোগ্য নহে, তেমনই জার্মান অগ্রগতি খুব দ্রুত ঘটিল না। অবশেষে ৬ই সেপ্টেম্বর জার্মানরা দাবী করিল যে, তারা নভোরোস্কি বন্দরে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু এর পাঁচদিন পর রুশরা এই শহর ত্যাগ করার কথা ঘোষণা করিল। এর পরেও একদল রুশ শহরতলীতে ছিল এবং তারা গোলা দাগিয়া বন্দর নষ্ট করিয়া দিল। সুতরাং নভোরোসিস্কও জার্মানদের কাজে আসিল না। ইহার পর সেপ্টেম্বরের বাকি দিনগুলি এমন কি অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই রণাঙ্গনের কোন পরিবর্তন ঘটিল না। তবে, নভোরোসিস্ক বন্দরের দক্ষিণ দিকে উভয়পক্ষে কিছু কিছু সংঘর্ষ ঘটিল এবং রুশরা মাঝে মাঝে নৌ-সৈন্য অবতরণ করাইয়া যোগাযোগ ব্যবস্থায় কিছু বিঘ্ন ঘটাইতে চাহিল। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে জার্মানরা তুয়াপসে দখলের জন্য দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল। একদিকে নভোরোসিস্ক হইতে সমুদ্রের ধার দিয়া এবং অন্যদিকে মৈকোপ হইতে গিরিসংকট ধরিয়া তারা তুয়াপসে বন্দরের দিকে আক্রমণ চালাইল। সোভিয়েট বাহিনী এভাবে সুদৃঢ় আত্মরক্ষার যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে তখন বরফ পড়িয়া শীতকালীন দুর্যোগ শুরু হইয়াছে। ইহারই মধ্যে জার্মানরা কাঠোর সংগ্রাম করিয়া অক্টোবরের শেষে মৈকোপ গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিল। কিন্তু রুশদের পালটা আক্রমণে জার্মানদের অগ্রগতি রুদ্ধ হইল। তারা তুয়াপসে বন্দরে পেঁছিতে পারিল না। রণাঙ্গনের অবস্থা আবার ঝিমাইয়া পড়িল এবং রুশদের শীতকালীন পালটা আক্রমণে জার্মানরা মৈকোপ ও নভোরোসিস্ক বন্দরের দিকে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

এবার রস্টোভ হইতে বাকুগামী রেলপথের অভিযানের দিকে তাকানো যাউক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জার্মানরা আগস্ট মাসের মাঝামাঝি উত্তর ককেশাসের মধ্যভাগে জর্জয়েভস্ক শহরে পেঁছিয়াছিল। ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত এই অগ্রগতির সীমারেখায় কিউমা নদীর যে লাইন গড়িয়া উঠিয়াছিল, সোভিয়েট বাহিনী সেই লাইন ধরিয়া দৃঢ়ভাবে বাধা দিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ২৬শে আগস্টের মধ্যে জার্মানরা যখন মজদক ও প্রক্লাডনায়া কিংবা টেরেক নদীতীরে পেঁছিল, তখন রুশ প্রতিরোধ প্রবলতর হইল। ইতিমধ্যে রুশ মজুদ সৈন্যদল বা রিজার্ভ আসিয়া পেঁছিল এবং বুঝা গেল টেরেক নদীতীরে জার্মানদের গতিরোধের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইবে। এই টেরেক নদীতীরে দীর্ঘকাল, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষে নিদারুণ শক্তির লড়াই চলিল। ভারী ও মাঝারি ট্যাংকের সাহায্যে জার্মানরা কয়েকবার নদী অতিক্রমণের চেষ্টা করিল। ধূম্রজালের আবরণ সৃষ্টি ও গোলাগুলির আড়াল ধরিয়া তারা কয়েকবার নদী পার হইয়া একটি সেতুমুখেরও সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু রুশদের পালটা আক্রমণে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। এখানে উভয় পক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধের যেন জোয়ার-ভাঁটা চলিতে থাকে এবং জার্মানরা কয়েকবার সাফল্যেরও দাবী করে। যদি এই দাবী সত্যই সফল হইত এবং গ্রোজনী তৈলকেন্দ্র দখল হইয়া গিয়া বাকু অভিযান অগ্রগতিসম্পন্ন হইত, তাহলে নিশ্চয়ই সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষে নিদারুণ বিপদের কারণ ঘটিত। বাস্তবিক এই সময় রণাঙ্গনের অবস্থা লইয়া উদ্বেগের কারণও

ঘটিয়াছিল। একদিকে স্ট্যালিনগ্রাদ ও অন্যদিকে ককেশাস, এই দুইয়ের মধ্যে তাল সামলানো সহজ ছিল না। বিশেষত রাশিয়ার ককেশাস বাহিনী কার্যত ইউরোপীয় রাশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। নূতন সৈন্য পাঠাইয়া বলবৃদ্ধি করা কিংবা গোলাগুলি ও সমরাস্ত্র সরবরাহ করা একান্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ককেশাস বাহিনী দীর্ঘকাল জার্মান অভিযান রোধ করিয়া রাখিতে পারিবে কি না, এমন সন্দেহ সর্বদাই ছিল। কেননা, একমাত্র স্থানীয় সৈন্যদলের উপরেই প্রায় নির্ভর করিতে হইয়াছিল। অবশ্য জার্মান বাহিনীও উক্রাইন হইতে ক্রমশঃ পূর্বদিকে ভলগা নদী এবং দক্ষিণ দিকে ককেশাসের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইয়া দীর্ঘ প্রসারিত যোগাযোগ ও সরবরাহের ব্যবস্থায় বিপদে পড়িয়াছিল। শত্রু-অধ্যুষিত এই অপরিচিত দেশে নির্বিঘ্ন আশ্রয়ের যেমন সম্ভব ছিল না, তেমনই খাদ্যদ্রব্য, জ্বালানী এবং আসন্ন শীতে উপযুক্ত গরম পোশাক সোভিয়েট দেশ হইতে সংগ্রহের উপায় ছিল না। সুতরাং এই অবস্থায় জার্মান বাহিনীকেও আক্রমণ ও বিচ্ছিন্ন করা সহজ ছিল। যদি জার্মান বাহিনীর দুই পার্শ্বদেশ ধরিয়া আক্রমণ চালানো যাইত, তাহা হইলে তারা রাশিয়ার বাকি অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত। কিন্তু ক্রিমিয়া ও রস্টোভের পতন হওয়ায় এই দুই পার্শ্বদেশের আক্রমণ ঘটানো সম্ভব ছিল না। জলপথের বন্দর ও ঘাঁটিগুলিও হাতছাড়া হইয়া গিয়াছিল। অপরপক্ষে জার্মানদেরও আশঙ্কা ছিল যে, ডন ও ভলগার মধ্যবর্তী স্ট্যালিনগ্রাদ এলাকা হইতে ককেশাসের জার্মান বাহিনীর উপর নূতন আক্রমণ সংঘটিত না হয়। সুতরাং সেই পার্শ্বদেশ নির্বিঘ্ন করিতে গিয়া তাদেরও রোস্টভ হইতে পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে হইল। তথাপি একথা সত্য যে, জার্মানরা যদি সেই সময় পূর্ণতর শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিত, তবে হিটলারের দীর্ঘকালের অর্থনৈতিক স্বপ্ন বোধহয় সার্থক এবং গ্রোজনী ও বাকুর তৈল-সম্পদ হস্তগত হইতে পারিত। কিন্তু জার্মানীরও মজুত সৈন্যের সংখ্যা যথোপযুক্ত না থাকায় এবং স্ট্যালিনগ্রাদের দিকে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করায় ককেশাসের সুযোগ হইতে জার্মানরা বঞ্চিত হইল।

তবু অক্টোবরের শেষের দিকে (২৮শে তারিখ) জার্মানরা আর একবার চেষ্টা করিল এবং রস্টোভ হইতে স্ট্যালিনগ্রাদের সরবরাহ কিছুটা স্থগিত রাখিয়া তারা ককেশাসের টেরেক নদী রণাঙ্গনে সাঁজোয়া শক্তিসহ আক্রমণ করিল। এই অতর্কিত আক্রমণে ওরঝনিকিডঝি হইতে ত্রিশ মাইল দূরে ক্ষুদ্র নলচিক শহর দখল হইয়া গেল এবং জার্মানরা বাকু রেলপথ ধরিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতে চাহিল। অতর্কিত আক্রমণের বেগ সামলাইয়া লইতে রুশদের কিছুটা সময় লাগিল, কিন্তু পরে রুশ মজুদ সৈন্য আসিয়া প্রতিরোধ ও পালটা আক্রমণের শক্তি বৃদ্ধি করিল। ওরঝনিকিড্ঝি হইতে যে বিখ্যাত সামরিক সড়ক ককেশাস পর্বতের উপর দিয়া দক্ষিণে তিফ্লিস এবং পশ্চিমে বাটুমের দিকে চলিয়া গিয়াছে, জার্মানরা প্রায় ইহার মুখে আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাদের গতিবেগ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল। শীত ও বরফে ককেশাস একেবারে আচ্ছন্ন হইল এবং রুশেরা পালটা আক্রমণ চালাইতে লাগিল। সুতরাং মজদক বা গ্রোজনীর তৈলখনি কিংবা ওরঝনিকিড্ঝির সামরিক সড়ক—এই গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির কিছুই জার্মানরা দখল করিতে পারিল না। শীত থেকে আত্মরক্ষার সঙ্গে যুক্ত হইল শত্রুর আক্রমণ হইতে ত্রাণ। ফলে, হিটলারী দুঃসাহসিক

অভিযান ককেশাসের দুর্গম গিরিবর্তে এবং অন্ধকার গহ্বরে ব্যর্থতার ইতিহাস রচনা করিয়া তৈলখনির প্রান্তদেশে আসিয়া চাপা পড়িল।

* * *

ককেশাসের যুদ্ধে জার্মানীর ব্যর্থতা সম্পর্কে একথা উল্লেখ করা দরকার যে, গোড়ায় জার্মান পরিকল্পনা ছিল আগে স্ট্যালিনগ্রাদ দখল এবং পরে কাস্পিয়ান সাগরের দিক থেকে ককেশাস কাড়িয়া লওয়া। কিন্তু রস্টোভ বন্দর সহজে দখল হইয়া যাওয়ায় হিটলার মনে করিলেন, বাকীটাও সহজেই জয় করা যাইবে। এজন্য মূল বাহিনীগুলিকে দুই ভাগ করিয়া (গ্রুপ 'এ' এবং 'বি') একটি গ্রুপ স্ট্যালিনগ্রাদের দিকে, অন্যটিকে ককেশাস দখলে পাঠানো হইল। মূল রণ-পরিকল্পনার এই আকস্মিক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত আদৌ বুদ্ধিসম্মত ছিল না। কেননা, স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মানীর বিপদের ফলে এবং ডনবিধৌত অঞ্চলগুলি শেষ পর্যন্ত জার্মান বাহিনীর হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় ককেশাসের 'ইঁদুর কল' থেকে জার্মানীর তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এছাড়া ককেশাসের যুদ্ধে জার্মানী তার সাধ্যের অতিরিক্ত জয় অর্জন করিতে, অর্থাৎ অর্থাৎ একসঙ্গে অনেকগুলি লক্ষ্য ভেদ করিতে চাহিয়াছিল, যেটা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না।

কিন্তু হিটলারী হাই কমাণ্ড ককেশাসের যুদ্ধে এমন একটি রাজনৈতিক অপকৌশল খাটাইতে চাহিয়াছিল, যার সম্ভাবনা অত্যন্ত গুরুতর ছিল। সেটা হইতেছে ককেশাস অঞ্চলের বহু জাতি, অধিজাতি ও পাহাড়িয়াদের মধ্যে মস্কো ও সোভিয়েট সংক্রান্ত মতবিভেদের ও ধর্ম-বৈষম্যের সুযোগ নেওয়া। অবশ্য মার্শাল আন্দ্রেই গ্রেচকো ও অন্যান্য বিশিষ্ট সোভিয়েট নেতা ও লেখকেরা দাবী করিয়াছেন যে, ককেশাসের এই যুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী একত্রে এক পরিবারের এক ভাইয়ের মত পরস্পরের কাঁধে কাধ মিলাইয়া সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির জন্য মরণপণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে জাতিবিদ্বেষে উস্কানি দেওয়ার হিটলারী চক্রান্তকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া সোভিয়েটের সর্বজাতিক বন্ধুত্বকে হাতেকলমে প্রমাণ করিয়াছিলেন।

মার্শাল গ্রেচকো দৃঢ়ভাবে লিখিয়াছেন—

'The battle for the Caucasus was a great test offering further proof of the inviolability of the friendship of the Soviet peoples. This battle once and for all, blasted the nazi plans of inciting the peoples of the Caucasus against the Russians. Rallied around the Communist Party and the Soviet Government the peoples of the Caucasus together with the great Russian and other peoples of the multi-national Soviet Union rose to a man to the defence of their socialist Motherland"[১].

এই সর্বজাতিক বন্ধুত্বের ও ভ্রাতৃত্বের নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ট্রান্স-ককেশীয় রণাঙ্গনে অন্তত বারটি জাতি-গোষ্ঠীর সৈন্যদল—যেমন, আজারবাইজেনিয়ন,

১। মার্শাল গ্রাচকো—পৃষ্ঠা ৩৫৪

জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান এবং ডন ও কিউবান কসাকেরা একত্রে এক পতাকাতলে লড়াই করিয়াছিলেন।

কিন্তু পশ্চিমের বিশিষ্ট সমর-ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, বহু জাতিভিত্তিক সোভিয়েট রাশিয়ার যদিও মেজরিটি সংখ্যক মানুষ স্বদেশ ও স্বীয় গভর্নমেন্টের প্রতি অনুরক্ত ছিল, তবু রাশিয়ার বাল্টিক রাজ্যগুলিতে, নূতন রুশ সীমানার অন্তর্গত পোলিশ অঞ্চলে এবং উক্রাইনে কিছু কিছু লোক জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিল। আলেকজান্দার ড্যালিন, আলেকজান্দার ভার্থ প্রমুখ বিখ্যাত পশ্চিমী লেখকগণ দক্ষিণ রাশিয়ার কিউবান কসাকদের মধ্যে এবং জর্জিয়া, উজবেকিস্তান ও উত্তর ককেশিয়ার বিভিন্ন অধিজাতি ও মুসলমানদের মধ্যে রুশ সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাবের, এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে আক্রমণকারী জার্মানদের প্রতি সহযোগিতার প্রমাণও পাইয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য স্থানের বিখ্যাত কসাক বাহিনী (যাদের সংখ্যা এক লক্ষ হইবে) সম্পূর্ণ অনুগত স্বদেশপ্রেমের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ ছিল। তথাপি কিছু কিছু মুসলিম অধিজাতি জার্মানদের সহিত 'ভ্রাতৃত্ব' করিয়াছিল। ককেশিয়া অঞ্চলের যে সমস্ত মুসলিম অধিজাতি ও উপজাতি জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিল, ১৯৪৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী সুপ্রীম সোভিয়েটের এক ডিক্রি অনুসারে সেই সমস্ত মুসলিম এলাকা একেবারে 'ঝাড়ে বংশে' উচ্ছেদ করা হইয়াছিল। উত্তর ককেশাসের পাঁচটি অধিজাতিকে—চেচেন, ইঙ্গুশি, করাচাই, বলকার এবং কাবারডিনো—এদের সকলকে স্ত্রীপুত্র শিশু বৃদ্ধসহ গরুভেড়ার মত গাড়িতে বন্ধ করিয়া সুদূর পূর্বদিকে চালান দেওয়া হইয়াছিল।

এই প্রকার পাইকারি দণ্ড নিঃসন্দেহে নিষ্ঠুর ও অমানুষিক ছিল। কেননা, কোন সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোকের পাপের জন্য সমগ্র সম্প্রদায়কে স্ত্রীলোক ও শিশুসহ সকলকে উচ্ছেদ করা নির্মমতার পরিচায়ক ছিল। ১৯৫৬ সালের বিংশতি কংগ্রেসে নিকিতা ক্রুশ্চেভ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন এবং স্ট্যালিনের নৃশংসতার কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন।[১]

১। আলেকজান্দার ভার্থ—পৃষ্ঠা ৫৩০-৩১

নবম অধ্যায়

স্ট্যালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক যুদ্ধ

প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধই ছিল সবচেয়ে চূড়ান্ত যুদ্ধ। এত নৃশংস, এত ভয়াবহ, এত প্রচণ্ড যুদ্ধ—এমন কি এত বীভৎস যুদ্ধের সম্মুখীন ইউরোপে, আফ্রিকায় ও এশিয়াতে আর কোন সৈন্যবাহিনীকে হইতে হয় নাই। এই যুদ্ধে লালফৌজ যে রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে, তার কোন তুলনা নাই। স্ট্যালিনগ্রাদেই হিটলারী ফ্যাসিজমের কবরখানা রচিত হইয়াছিল এবং স্ট্যালিনগ্রাদের আঘাতেই 'অপরাজেয়' জার্মানবাহিনীর মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু এই যুদ্ধ ছিল দীর্ঘ ও জটিল এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত। ক্রমাগত ২০০ দিন কিংবা সাড়ে-ছয় মাস ধরিয়া এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং গোটা যুদ্ধে ২০ লক্ষ লোক, ২৬ হাজার কামান ও মর্টার, ২ হাজার-এর অধিক ট্যাংক ও প্রায় ২ হাজার বিমান অংশগ্রহণ করিয়াছিল। আর স্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধ জয়ের জন্য ৭ লক্ষ সোভিয়েট সৈন্যকে নানাভাবে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল এবং ১০০ জনকে 'হীরো অব দি সোভিয়েট ইউনিয়ন' আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছিল।

স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধকে প্রধানত দুইটি কাল-পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্ব আত্মরক্ষামূলক—স্ট্যালিনগ্রাদের দিকে জার্মানবাহিনীর অগ্রগতি ও স্ট্যালিনগ্রাদ শহরের যুদ্ধ। এর স্থায়িত্বকাল ১৭ই জুলাই থেকে ১৮ই নভেম্বর, ১৯৪২। আর দ্বিতীয় কাল পর্ব লালফৌজের পালটা-আক্রমণ—১৯শে নভেম্বর, ১৯৪২ থেকে চূড়ান্ত জয় পর্যন্ত ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩।

এই কাল-পর্বকে আবার বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে। সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধের বিখ্যাত ঐতিহাসিক আলেকজাণ্ডার ভার্থ স্ট্যালিনগ্রাদের সমগ্র যুদ্ধকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করিয়াছেন, যেমন—

ক. ১৭ই জুলাই থেকে ৪ঠা আগস্ট পর্যন্ত ডন নদীর বাঁকে যুদ্ধ। 'আর এক পা পিছু হটা নয়'—সুপ্রীম কমাণ্ডারের এই ঐতিহাসিক নির্দেশ অনুসারে জার্মান-বাহিনীর অগ্রগতিকে অন্ততঃ মন্দীভূত করার চেষ্টা হইয়াছিল।

খ. ৫ই আগস্ট থেকে ১৮ই আগস্ট—দক্ষিণ দিকে সিমালিয়ানস্কায়ার নিকট ডন নদী পার হইয়া জার্মানবাহিনীর স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে প্রবেশের চেষ্টা। পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকেও শহরের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা।

গ. ১৯শে আগস্ট থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর—ডন ও ভল্গা এই দুই বিখ্যাত নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলিতে যুদ্ধের চরম পর্যায়। ২৩শে আগস্ট জার্মানরা স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তরাংশে ভল্গার ধারে পৌঁছিল—পাঁচ মাইল চওড়া রণক্ষেত্রের প্রলম্বিত অংশে। ঐদিন ৬০০ বোমারু (রুশ সেনাপতি জেনারেল চুইকোভের মতানুসারে ২ হাজার)

—স্ট্যালিনগ্রাদে বর্বর বোমাবর্ষণের দ্বারা ৪০ হাজার অসামরিক অধিবাসীকে হত্যা করিল।

ঘ. ৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বর—স্ট্যালিনগ্রাদের শহরতলীতে ঘোরতর যুদ্ধ এবং স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণ দিক দিয়াও জার্মানদের ভল্গার উপস্থিতি।

ঙ. ১৩ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৮ই নভেম্বর—স্ট্যালিনগ্রাদ শহরের অভ্যন্তরে ঐতিহাসিক সংগ্রাম।

উপরের সংক্ষেপে উল্লিখিত এই পাঁচটি পর্যায় ছিল লালফৌজের মূলত প্রতিরক্ষা-মূলক যুদ্ধ। এর প্রত্যেকটি পর্যায়ই ছিল ইতিহাসের এক-একটি নূতন অধ্যায়ের মত। তারপর অনুষ্ঠিত হইল লালফৌজের সেই যুগান্তকারী পালটা-আক্রমণাত্মক অভিযান। এই অভিযানকেও ৩টি পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন—

ক. ১৯শে নভেম্বর থেকে ১১ই ডিসেম্বর—এই সময়টার মধ্যে লালফৌজ স্ট্যালিনগ্রাদের জার্মান ও রুমেনীয় বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিয়া ফেলিল বা বেষ্টনী সৃষ্টি করিল।

খ. ১২ই ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারী—এই সময়টা ক্রিমিয়াজয়ী জার্মান সেনাপতি জেনারেল ফন ম্যানস্টাইন ও জেনারেল হথ এক পালটা-আক্রমণ চালাইয়া স্টালিনগ্রাদের অবরুদ্ধ জার্মানবাহিনীকে উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

গ. ১০ই জানুয়ারী থেকে ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩—এই সময়ের মধ্যে স্ট্যালিনগ্রাদের 'নরককুণ্ডে' অবরুদ্ধ মার্শাল ফন পাউলাসের জার্মান ও রুমানিয়ান সৈন্যরা চূর্ণ হইয়া গেল এবং শত্রুপক্ষ আত্মসমর্পণ করিল।[১]

ডন ও ভল্গার মধ্যবর্তী বিশাল ও বিখ্যাত স্তেপভূমিতে—যেখানে কোন বৃক্ষ নাই, লতা নাই, শুষ্ক মরুভূমির মত যে প্রান্তর নিষ্করুণ এবং স্ট্যালিনগ্রাদের পশ্চিম দিকে যে স্তেপভূমিতে অসংখ্য গহ্বর ও খাদ, সেখানে—সেই 'অস্বাভাবিক' এলাকায় রুশ-সৈন্যেরা অগ্রসরমান জার্মানবাহিনীকে বাধা দিল বটে, কিন্তু পারিয়া উঠিল না। যুদ্ধের গোড়ার দিকে এই সময়কার রুশসৈন্যদের নৈতিক বলও নামিয়া গিয়াছিল, এমন কি অফিসারদের মধ্যেও নানা ত্রুটি ও দুর্বলতা ছিল। তবু জার্মানসৈন্যদের অগ্রগতিতে বাধা দিয়া যে সময়টুকু পাওয়া গিয়াছিল, সেই সময়ের মধ্যে স্ট্যালিনগ্রাদ রক্ষার জন্য কতকগুলি প্রতিরক্ষার ব্যূহ তৈয়ার হইয়াছিল। তিন সারি আত্মরক্ষার লাইন তৈয়ার হইল—বাইরের ভিতরের এবং মধ্য বা কেন্দ্রের। সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর ইঞ্জিনীয়ার এবং স্থানীয় জনগণের ঐকান্তিক চেষ্টা ও সহযোগিতায় এই তিন সারি আত্মরক্ষার লাইন তৈরী হইল। ১ লক্ষ ৯০ হাজার লোক, ১ হাজার ট্রাক্টর ও লরী এবং ৫ হাজার ঠেলাগাড়ি এই সমস্ত লাইন নির্মাণে নিযুক্ত হইয়াছিল। আর স্ট্যালিনগ্রাদের কমিউনিস্ট পার্টি ২ হাজার পার্টি সদস্যকে পাঠাইয়াছিলেন এই অঞ্চলে রাজনৈতিক কর্মের জন্য।[২]

কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধের অন্যতম যশস্বী সেনাপতি জেনারেল জেরোমেঙ্কো তাঁর বইতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, আগস্ট মাসে এই আত্মরক্ষা লাইনের মাত্র এক-চতুর্থাংশ

১। 'Russia At War—1941-45'—Alexander Werth, P. 404-405.

২। মার্শাল ভোসিলেভস্কি—পৃষ্ঠা ১৩।

তৈয়ার হইয়াছিল এবং তাও অস্ত্রসজ্জার দিক থেকে অসম্পূর্ণ ছিল। গোড়ার দিকে নৈতিক শক্তিও আদৌ ভালো ছিল না, কিন্তু যুদ্ধের গতিপথে এবং যতই জার্মান-বাহিনী স্ট্যালিনগ্রাদ ও ভল্গার নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই রুশসৈন্যদের সাহস-দৃঢ়তা, সংঘর্ষের কঠোরতা এবং লড়াইয়ের নৈপুণ্য বাড়িয়া যাইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত লালফৌজ প্রচণ্ডতম যুদ্ধের একেবারে চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়া গেল। এমন কি, ১৮।১৯ বছরের আনকোরা তরুণেরা পর্যন্ত স্ট্যালিনগ্রাদ শহরের যুদ্ধে পাকা সৈন্যের মত আশ্চর্য শক্তির পরিচয় দিয়াছিল।...

১৯৪২ সালের দ্বিতীয় গ্রীষ্মাভিযানেও জার্মানী অমিত শক্তিধর ছিল। ২৮শে জুন এই অভিযান শুরু হইয়াছিল এবং একমাসের মধ্যেই খারকোভ থেকে রস্টোভ পর্যন্ত কিংবা আরও উত্তরে ভরোনেজ থেকে দক্ষিণে আজভ সাগর পর্যন্ত জার্মানরা অগ্রসর হইয়া গেল। কিন্তু ভরোনেজে প্রচণ্ড বাধাদানের ফলে ওই শহর পুরাপুরি জার্মানদের দখলে গেল না কিংবা এখান দিয়া ডন নদী অতিক্রমপূর্বক ভল্গার মধ্যবর্তী অংশে পৌঁছানোও সম্ভব হইল না। তবু দ্রুত অগ্রসরমান জার্মানসৈন্যরা একমাসের মধ্যে ডন ও ডনেৎস নদী অধ্যুষিত দেশগুলি প্রায় ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু বাকী রহিল ডন নদীর বাঁকের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু যে দুটিকে বলা যাইতে পারে স্ট্যালিনগ্রাদের প্রবেশদ্বার। ক্যালাচ ও ক্লেটস্কায়া এই দুইটি শহর স্ট্যালিনগ্রাদের দিকে অভিযানপথে যেমন প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তেমনি স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে কোটেলনিকোভো এবং সিমলিনস্কায়া। খাস স্ট্যালিনগ্রাদের অবরোধ-যুদ্ধের আগে এই অঞ্চলের যুদ্ধও সামরিক মহাকাব্যের বিশিষ্ট পর্ব জুড়িয়া রহিয়াছে। একথা উল্লেখ করা অনাবশ্যক যে, উক্রাইনের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নদী ডন, ইতিহাস ও ভূগোল উভয়ের বিচারে এমন কি সাহিত্যে পর্যন্ত। এই ডন নদী টুলার নিকটবর্তী আইভান হ্রদ থেকে উৎপন্ন হইয়া অজস্র গ্রাম ও জনপদ অতিক্রমপূর্বক ভরোনেজ-স্ট্যালিনগ্রাদ এলাকা হইতে রস্টোভের কাছে আজভ সাগরে পড়িয়াছে। দৈর্ঘ্যে এই নদী ১,১৬০ মাইল এবং উক্রাইনের অন্যতম এই প্রাণপ্রবাহ রেলপথের দ্বারা ভল্গা নদীর সঙ্গে যুক্ত। রস্টোভ বন্দর থেকে ডন ক্রমশ পূর্বদিক হইয়া এবং স্ট্যালিনগ্রাদ এলাকার কাছাকাছি আসিয়া যেন সহসা মোড় ঘুরিয়া উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই মোড় ঘুরিবার পথেই ইহা ধনুকের মত একেবারে বাঁকিয়া গিয়াছে, ইংরাজীতে যাকে বলা হইয়াছে 'elbow' বা 'হাতের কনুই'। ধনুকের মত বক্র ডন নদীর এই বাঁক কেবল ভৌগোলিক কারণে নয়, সামরিক কারণেও প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কেননা, এই বাঁকের দুই প্রান্তে—উত্তরে ক্লেটস্কায়া ও দক্ষিণে ক্যালাচ উভয়ের মধ্যে যার ব্যবধান প্রায় ৫০ মাইল, সেখানে তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। ডন নদীর বাঁক যেখানে স্ট্যালিনগ্রাদের এলাকা ছুঁইয়া গিয়াছে, সেই সংকীর্ণতম অংশ কিংবা ডন ও ভল্গার মধ্যবর্তী অংশ মাত্র ৪০ মাইল চওড়া। ভরোনেজ থেকে রস্টোভ পর্যন্ত সমগ্র দেশ জার্মানরা দ্রুত দখল করিল বটে, কিন্তু ডন নদীর বাঁক অজেয় রহিয়া গেল। ডন নদীর বাঁকের তীরবর্তী, ক্যালাচ ও ক্লেটকায়া দখল কিংবা ডন নদী অতিক্রমের জন্য জার্মানবাহিনীর প্রবল চেষ্টা ইতিহাসে 'ডন বাঁকের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। ১৭ দিন ধরিয়া জার্মানসৈন্যের গতি ডন নদীর উপরে আবদ্ধ রহিল এবং এখানে ভরোনেজ শহরের মতই নিষ্ঠুর ও বেপরোয়া যুদ্ধের অনুষ্ঠান হইল। প্রধান সেনাপতি

ফিল্ড মার্শাল ফন বোক যত অধিক পরিমাণে সম্ভব শক্তি প্রয়োগ করিলেন। ইতিমধ্যে জেনারেল ফন ম্যানস্টাইন ক্রিমিয়ার অভিযান শেষ করিয়া রস্টোভ থেকে সিমলিয়ানস্কায়ার দিকে, জেনারেল ফন ক্লাইস্ট দুইটি আর্মিসহ ককেশাসের দিকে,
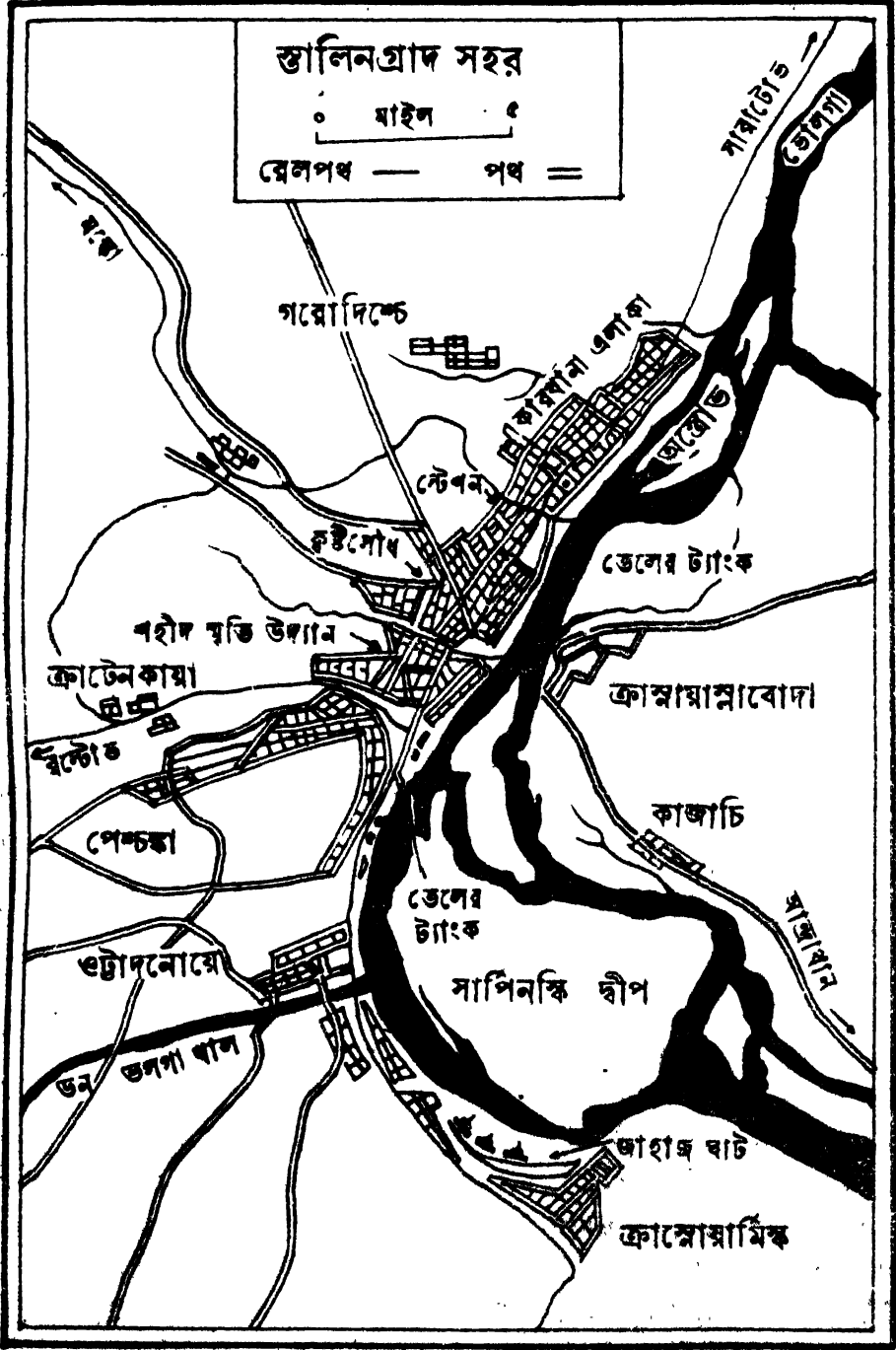
জেনারেল ফন ভিকসের ট্যাংকবাহিনী ভরোনেজ থেকে জেনারেল ম্যানস্টাইনের সহযোগিতায়, আর জেনারেল ফন পাউলাস ও জেনারেল সোয়েডলার উত্তর ও দক্ষিণ

ডনের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এর সঙ্গে ইতালীয় এবং হাঙ্গেরীয়ান ডিভিসনগুলি তো ছিলই, অধিকন্তু ১লা আগস্টের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপ থেকে নূতন সৈন্যদল আসিয়া জার্মানবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিল। এদিকে ডন নদীর বাঁক থেকে স্ট্যালিনগ্রাদ অভিমুখে যুদ্ধ যতই তীব্র ও তীক্ত হইতে লাগিল, হিটলারের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তি কর্তৃক দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিবার দাবীও রাশিয়ার এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র প্রবল হইয়া উঠিল। কেননা তখন রাশিয়ার নিদারুণ সংকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল।…

যদিও লালফৌজের পালটা-আঘাতে জার্মানদের ডন নদী অতিক্রমের চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হইল, তথাপি আক্রমণের বেগ ক্রমশ যেন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে জার্মানরা ১৭ বার ট্যাংক আক্রমণ ও মুহুর্মুহু প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া ক্লেটস্কায়ার দক্ষিণে রুশব্যূহ বিদ্ধ করিল। তখন গ্রীষ্মকালের ভয়ংকর উত্তাপ। রক্তমাংসের দেহে সেই নিদাঘ-সংগ্রামের ভয়াবহতা সহ্য করা যেন অসম্ভব ছিল। তথাপি এরই মধ্যে সেই খণ্ড নরককুণ্ডের মধ্যে আরও নূতন নূতন জার্মানসৈন্য আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। ১২ই আগস্ট তারিখ এক বিশদ ইস্তাহারে জার্মানরা দাবী করিল যে জেনারেল ফন পাউলাসের ট্যাংকবাহিনী জেনারেল ফন রিচথোফেনের বিমানবহরের (সামরিক মহলে এই বিমানবাহিনীর অত্যন্ত নাম ছিল) সহযোগিতায় ক্যালাচের পশ্চিমে ৬২নং রুশ আর্মি ও ১নং ট্যাংক আর্মির অধিকাংশ সাবাড় করিয়াছে। ৫৭ হাজার রুশসৈন্য ধরা পড়িয়াছে এবং ১০০০ ট্যাংক ও ৭৫০টি কামান নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এত বড় দাবীর পরেও দেখা গেল যে, জেনারেল চুইকোভের ৬২নং সৈন্যবাহিনী লড়িতেছে। অবশ্য ১৪ই আগস্ট জার্মানরা রুশব্যূহ ভেদ করিয়া ডনের তীরে পৌঁছিল।

অপর দিকে ক্লেটস্কায়ায় ক্রমাগত ১৪ দিন ধরিয়া গোলাবর্ষণের পর জার্মানরা রুশব্যূহ ভেদ এবং ডন নদীর বাঁক অতিক্রম করিল। কিন্তু তারপরেও ভল্গা নদীর তীর পর্যন্ত পৌঁছিতে যে সংকীর্ণ ভূভাগের দূরত্ব ছিল, তার জন্যও ভয়ংকর যুদ্ধ হইল।…

'জুয়া, স্ত্রীলোক ও মদের নেশার মত সময় সময় যুদ্ধের নেশাও জাগে এবং কোন কোন স্থানকে কেন্দ্র করিয়া সেই নেশা অদ্ভুত মত্ততায় পরিণত হয়। স্ট্যালিনগ্রাদ সম্পর্কেও হিটলারের অনুরূপ নেশা জাগিয়াছিল। জুলাইয়ের শেষে ও আগস্ট মাসের প্রথম দিকে যদিও জার্মানসৈন্যরা ককেশাস পর্বতের দিকে চলিল তেলের সন্ধানে, তথাপি স্ট্যালিনগ্রাদের নেশার নিকট ককেশাস ক্রমেই পিছাইয়া পড়িল এবং ডন নদী ছাড়াইবার পর এই নেশা যেন এক বিচিত্র উন্মাদনায় পরিণত হইল। যে যাদুমন্ত্রে স্ট্যালিনগ্রাদ হিটলারী বাহিনীকে ভল্গার তীরে ডাকিয়া লইয়া গেল, তা কেবল চমকপ্রদ নয়, বিস্ময়করও বটে।'[১]

এই বিস্ময় শুরু হইল ২৩শে আগস্ট থেকে, যখন জার্মানরা ডন অঞ্চলের সমস্ত রুশ বাধা চুরমার করিয়া স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তরে ভল্গার তীরে পৌঁছিল—পাঁচ মাইল চওড়া ফ্রন্টে। আর সেদিনই সহস্রাধিক জার্মান বোমারু আগুন ও বিস্ফোরক বর্ষণ করিল স্ট্যালিনগ্রাদ শহরের উপর। সেই বর্বর বোমাবর্ষণে এক দিনেই ৪০ হাজার অ-সামরিক নরনারী প্রাণ হারাইল। ভল্গার তীর ধরিয়া ৩০ মাইল বিস্তৃত এই বিশাল

১। লেখক প্রণীত 'রুশ-জার্মান সংগ্রাম' ১৯৪৭—পৃষ্ঠা ২৮৫।

শহর যেন প্রকাণ্ড দাবানলের গ্রাসে পড়িল। সমস্ত কিছুই জ্বলিয়া পুড়িয়া ধ্বংস হইয়া গেল। স্ট্যালিনগ্রাদের হাজার হাজার গৃহে মৃত্যুর কালো ছায়া হানা দিল এবং বহু সহস্র নরনারী আতংকে শহর ছাড়িয়া ভল্গা নদী পার হইয়া পালাইয়া গেল।

স্ট্যালিনগ্রাদের শহরের যুদ্ধের এই হইল 'উদ্বোধন' উৎসব !···

৮ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ সৈন্য ৩ হাজার ট্যাংক আর ৩ হাজার বিমান স্ট্যালিনগ্রাদের সংগ্রামে নিয়োজিত হইল। সামরিক অভিযানের এমন মোগলাই শোভাযাত্রা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় নাই। একখানি জার্মান পত্রিকা সগর্বে মন্তব্য করিল—'প্রত্যেকটি সামরিক সূত্র থেকে যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাতে এই ধারণাই দৃঢ় হইতেছে যে, ডন ও ভল্গা নদীর মধ্যবর্তী যে ভূমিখণ্ড নিয়া এত তিক্ত দ্বন্দ্ব হইয়াছে, সেখানে আসন্ন রণক্রিয়ার অভিযানে কোন অপ্রত্যাশিত বিস্ময় সৃষ্টির আর বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেকটি অফিসার ও প্রত্যেকটি সৈন্য এবং প্রত্যেকটি রেজিমেণ্ট যারা লড়াই করিয়া স্ট্যালিনগ্রাদে প্রবেশ করিবে, তাদের প্রতেক্যকে ৬০ দিনের পুরা ছুটি দেওয়া হইবে।' কিন্তু এই সমস্ত বাহবাস্ফোট ও প্রলোভন সত্ত্বেও স্ট্যালিনগ্রাদের দিকে অগ্রগতি আদৌ সহজসাধ্য ছিল না।

যে স্ট্যালিনগ্রাদ সামরিক ইতিহাসের বিস্ময়রূপে চিরদিন পাঠককে আকর্ষণ করিবে, ১৯১৮-১৯ সালের গৃহযুদ্ধের সময় তার নাম ছিল জারিৎসিন, তখন উহার বাসিন্দা ছিল ১ লক্ষ এবং জেনারেল ডেনিকিন প্রতিবিপ্লবীদের অধিনায়করূপে কিউবান কসাক সৈন্যসহ* এই নগরী আক্রমণ করেন। লেনিনের অনুমোদনক্রমে স্ট্যালিন তখন এই নগরী রক্ষায় অগ্রসর হন এবং ক্রমে তাঁর সঙ্গে যোগ দিন টিমোশেংকো ও ভরোশিলোভ (যেন দুইজন মার্শাল এবারের যুদ্ধেও সৈনাপত্য করিতেছেন), জেনারেল ডেনিকিন পরাজিত হন ও পলায়ন করেন। সেই প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় জারিৎসিন 'লাল ভার্দুন' নামে পরিচিত হইয়াছিল এবং পরে স্ট্যালিনের সম্মানার্থ ওর নাম রাখা হইল স্ট্যালিনগ্রাদ।**

এই শহর যদিও অপরিমিত রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে তথাপি ইহা সেবাস্তোপোল বা অন্য স্থানের মত কখনও দুর্গ ছিল না এবং এর ভূমিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য ওকে দুর্ভেদ্য দুর্গে রূপান্তরিত করাও সম্ভব ছিল না—যদিও বহু দুর্গের ইতিহাসকে স্ট্যালিনগ্রাদ ম্লান করিয়া দিয়াছে। তবু এর ভৌগোলিক সংস্থান কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। ভল্গা ও ডন নদীকে যে ভূমিখণ্ড পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তার সংকীর্ণতম অংশ ৪০ মাইলের বেশী চওড়া নয়। এটাকে 'নেড়া মাটির' দেশ বলা যাইতে পারে, রাস্তাঘাটও এখানে ভালো নয়। কিন্তু ভল্গা নদীর দিকে এটা ক্রমশ উঁচু হইয়া আবার সহসা নদীতটের দিকে নীচে নামিয়া গিয়াছে। এই উঁচু অংশটায় কতকগুলি বিচিত্র গহ্বর আছে, উঁচু জায়গাগুলি টিলাজাতীয় এবং সেগুলি ভল্গা পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিম লম্বালম্বি। এখারে যে বিচিত্র গহ্বরগুলি রহিয়াছে, রুশ ভাষায় সেগুলি 'Balkas'

---

* এবারের ককেশাস যুদ্ধেও কিউবান কসাকদের মধ্যে অনেকে জার্মানীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছিল।—লেখক

** ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে নিকিতা ক্রুশ্চেভের আমলে স্ট্যালিনগ্রাদের নাম বদল করিয়া ভল্গোগ্রাদ রাখা হইয়াছে। কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদের অবিস্মরণীয় সামরিক কীর্তির জন্য ভল্গোগ্রাদ নাম জনপ্রিয় হয় নাই।—লেখক

নামে পরিচিত এবং এগুলি যত্রতত্র বিশৃংখলভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ভল্গা নদী এই শহরের উত্তরে-দক্ষিণে লম্বালম্বি প্রবাহিত এবং শহর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। ভল্গা নদীর মধ্যে কতকগুলি ছোট ছোট চর আছে এবং নদীটি চওড়ায় কম নয়—দেড় মাইল থেকে দুই মাইল। সুতরাং প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক হিসাবে উপেক্ষণীয় নয়।
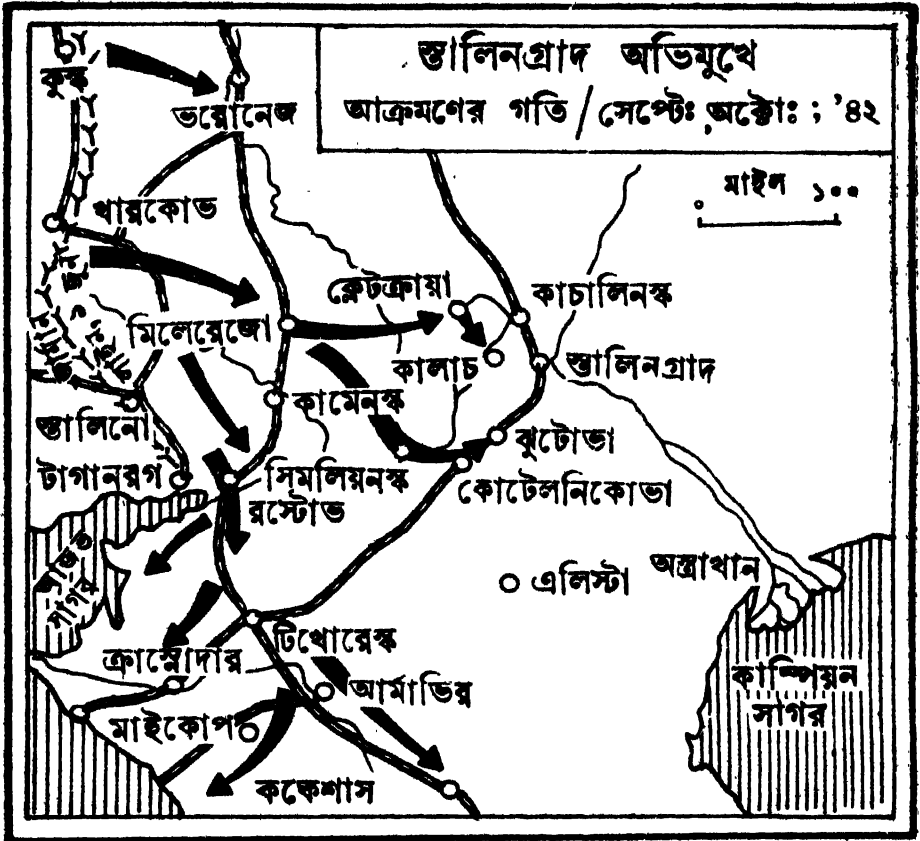
ষ্ট্যালিনগ্রাদ শহর আমেরিকার শিল্পনগরীর মত আধুনিক। হিটলারের আক্রমণের আগে প্রায় ২০ বছর ধরিয়া এই শহর সোভিয়েট রাশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শিল্পনগরী হিসাবে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। লোকসংখ্যা এর ৬ লক্ষ। রাস্তাগুলি চওড়া, দুই ধারে গাছের সারি—শ্রমজীবীদের বসবাস। আরাম ও আশ্রয়ের এটি একটি চমৎকার শহর। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯২৭) আমলে যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মত এই শহর দেখা দিয়াছিল। ট্রাক্টর (পরে ট্যাংক), কৃষি-যন্ত্রপাতি, মোটর লরী ও মোটর গাড়ী উৎপাদনের এটি ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। ১৯৩৫ সালে এখানে ৩৫ হাজার এবং ১৯৩৯ সালে ৬০ হাজার ট্রাক্টর নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রয়োজনমত এগুলিকে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ কারখানায়ও রূপান্তরিত করা যাইত। কার্যত যুদ্ধের সময় এখানকার কারখানা থেকে যে সমস্ত ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ী, কামান ও গোলাগুলি তৈয়ার হইয়াছিল, সেগুলি যথেষ্ট খ্যাতিলাভও করিয়াছিল। এছাড়া তৈলশোধনাগার, কাঠের কারখানা এবং বৃহৎ বন্দর ও শহরের উপযোগী অন্যান্য বহু কলকারখানাও এখানে ছিল। শহরের উত্তরাংশেই বৃহত্তম কারখানাগুলি যেন মৌচাকের মত ঝাঁক

বাঁধিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সেগুলির চারদিকে ছিল শ্রমজীবীদের উপনিবেশ। আর দক্ষিণ অংশে ছিল শহরের বাসিন্দারা। স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণে ভল্গা খাল তৈয়ার হইতেছিল, এই খাল ভল্গা থেকে কৃষ্ণ সাগরকে সংযুক্ত করার কথা ছিল। এর ধার দিয়া 'ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন' গড়িয়া উঠায় সমগ্র অঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সোজা কথায় ভারতবর্ষের পক্ষে লৌহনগরী জামসেদপুর (টাটানগর) যেমন ইস্পাতের শহর, স্ট্যালিনগ্রাদও রাশিয়ার পক্ষে তেমন। হিটলার এই 'স্টীল সিটি'কে যান্ত্রিক যুদ্ধের লৌহ ও ইস্পাত দিয়া চূর্ণ করিতে চাহিলেন। আগস্টের মধ্যভাগ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগ পর্যন্ত ডন নদী হইতে ভল্গার তীরে পৌঁছিবার জন্য প্রাণঘাতী যুদ্ধের অবতারণা হইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিয়া জার্মানীর বজ্রবাহু স্ট্যালিনগ্রাদ শহরকে অবরুদ্ধ করিল এবং একমাত্র ভল্গা নদী ছাড়া অন্য তিন দিকে লৌহ বেষ্টনীর সৃষ্টি হইল।

তারপর ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে যে ঐতিহাসিক অবরোধ যুদ্ধের আরম্ভ হইল, তা এক রক্তাসিক্ত অধ্যায়ের বিভীষিকার মত![1]

ঐতিহাসিক অবরোধ

১৫ই সেপ্টেম্বর স্ট্যালিনগ্রাদ অবরুদ্ধ হইল। জার্মান সেনাপতি ফন পাউলাসের সৈন্যদল স্ট্যালিনগ্রাদ শহরকে কার্যত তিন দিক দিয়া বেষ্টন করিয়া ফেলিল। পূর্বদিকে একমাত্র ভল্গা নদীর বিপজ্জনক জলপথ ছাড়া আর কোন রাস্তাই রুশদের জন্য খোলা রহিল না। তখন হইতে পুরা চারি সপ্তাহকাল ধরিয়া স্ট্যালিনগ্রাদ শহরের উপর ক্রমাগত দিনরাত্রি বিরামহীন আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। দলে দলে নাৎসী সৈন্য যেন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মত স্ট্যালিনগ্রাদের উপর আঘাত হানিতে লাগিল। কিন্তু সেই প্রত্যেকটি আঘাত পর্বতগাত্রে ক্রুদ্ধ সমুদ্রতরঙ্গের মত ব্যাহত হইতে লাগিল। জার্মানসৈন্য ও সোভিয়েট সৈন্যের সেই মৃত্যুদ্বন্দ্ব এক অভাবনীয় সংঘর্ষের ইতিহাস সৃষ্টি করিল, যার তুলনা অন্য কোথাও পাওয়া কঠিন। নূতন নূতন জার্মানসৈন্য আসিয়া রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু এক-একবার তারা ১০০ বা ২০০ গজের বেশী অগ্রসর হইতে পারিল না। যে দিগ্বিজয়ী সৈন্যদল সারা ইউরোপকে বিদ্যুৎগতিতে অতিক্রম করিয়া নগরের-পর-নগর এবং দেশ-দেশান্তর যেন থাবা মারিয়া কাড়িয়া লইয়াছে, তারাই স্ট্যালিনগ্রাদ শহরে আসিয়া দগ্ধ অট্টালিকা ও ধ্বংসপ্রাপ্ত কারখানার শতাধিক গজের বেশী দখল করিতে পারিল না। লালফৌজের এই ঐতিহাসিক আত্মরক্ষা কেবল যুদ্ধমানদের সামরিক শক্তিরই বিস্ময় নহে, অসামরিক জনগণও এখানে স্বদেশরক্ষার উন্মাদনায় অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছিল। কেবল অসামরিক পুরুষরাই নহে, মেয়েরাও স্বেচ্ছাসৈনিকের ব্রত গ্রহণ করিল এবং অবরুদ্ধ দুর্গনগরীকে যথাসাধ্য সাহায্য দিতে লাগিল। প্রত্যেকটি কলকারখানাই আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করা হইল। যে সমস্ত কারখানা যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন করে না, সেগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং প্রত্যেকটি 'ব্লকবাড়ী' কেল্লায় পরিণত হইল। খাস শহরের বাহিরে চারিদিকের এলাকা পিলবক্স, কাঁটাতার, মাইন, ট্যাঙ্কমারা ফাঁদ

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২৮৬-২৮৭।

বিমানমারা কামান ইত্যাদির দ্বারা কণ্টকিত করিয়া রাখা হইল। লোহ, ইস্পাত, কংক্রীট ও অস্ত্রের সমবায়ে স্ট্যালিনগ্রাদের বহির্ভাগ যথাসম্ভব দুর্ভেদ্য করিবার চেষ্টা হইল। এমন কি, অর্ধসমাপ্ত ট্যাঙ্কগুলিকে কারখানা হইতে টানিয়া আনিয়া মাটিতে পোঁতা হইল, কেবল উহার মাথা ও কামান আকাশের দিকে নাসা উঁচু করিয়া রহিল এবং লতাপাতা দিয়া সেগুলিকে শত্রুর দৃষ্টি হইতে আড়াল করা হইল। এই ভূপ্রোথিত ট্যাঙ্কগুলি শক্ত ঘাঁটির (strong point) কাজ করিতে লাগিল। জনসাধারণের মনোবলের কোন সীমা ছিল না। প্রতিটি অট্টালিকায়, প্রতিটি গৃহে যে নিদারুণ গোলা বর্ষিত হইতেছিল, সেই ভয়াবহ বিস্ফোরণের মুখেও জনসাধারণ সৈন্যদলের সঙ্গে অবিচলিত এবং নিষ্কম্প রহিল, যুদ্ধের কোনপ্রকার বিভীষিকাতেই তারা টলিল না। প্রত্যেক স্থানে লাউডস্পীকারযোগে মস্কো হইতে প্রেরিত মর্মস্পর্শী আবেদন প্রচার করা হইতেছিল—

'The whole world is watching Russia will never acknowledge the defenders as her sons and daughters if for one instant they should flinch and show themselves not worthy of what they really are!'

'সমস্ত জগৎ লক্ষ্য করিতেছে। রাশিয়া কখনও আত্মরক্ষাকারীদিগকে তার পুত্র বা কন্যা বলিয়া স্বীকার করিবে না, যদি তারা একটি ক্ষেত্রেও পিছাইয়া পড়ে কিংবা যে মহৎ ব্রতের তারা উপযোগী, উহার যোগ্যতা প্রমাণ না করে।'

কিন্তু এই প্রচারকার্যেরও সম্ভবত দরকার ছিল না। রুশ নরনারী শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য আত্মবিসর্জনের মন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়াছিল। কোন কোন মুহূর্তে জাতির ইতিহাসের যে সংকট জীবন-মৃত্যুর সীমারেখা মুছিয়া দেয়, সেই সন্ধিক্ষণ আসিয়াছিল সোভিয়েট রাষ্ট্রে। সুতরাং স্ট্যালিনগ্রাদের অবরুদ্ধ নরনারী অনুভব করিল যে, তারা স্বীয় জন্মভূমির বৈপ্লবিক ইতিহাস হইতে আলাদা নহে, তাদের জীবনসত্তাও যেন ইতিহাসের মহিমার সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে, যদিও তারা সাধারণ এবং একান্তরূপে জনসাধারণ মাত্র! আত্মরক্ষার এই মর্যাদা, সংগ্রামের এই মহিমদীপ্ত পৌরুষ তারা আপন শিরায় ও শোণিতে অনুভব করিল। তাদের গৃহ নাই, সংসার নাই, শয্যা নাই,—এমন কি স্নেহভাজনের জন্য ক্রন্দন ও বেদনার পর্যন্ত সময় নাই! যে-কোন মূল্যে দিয়াই হউক শত্রুকে, স্বাধীনতাহরণকারীকে রোধ করিতে হইবে—কেবল রোধ নহে, সমূলে সংহার করিতে হইবে। এই ধারণা ও সংকল্প লালফৌজ হইতে সাধারণ নরনারী পর্যন্ত সকলকে অনুপ্রাণিত করিল। সুতরাং স্ট্যালিনগ্রাদের আত্মরক্ষার প্রাচীরে ঠেকিয়া ইউরোপের সমস্ত মহাযুদ্ধের ইতিহাস যেন ম্লান হইয়া গেল। অট্টালিকায় ও কারখানায়, গৃহে ও প্রকোষ্ঠে, অলিন্দে ও আঙ্গিনায়, মাঠে ও শহরতলীতে জীবন-মৃত্যুর আলিঙ্গন এক নূতন মহাকাব্যের অপূর্ব পর্ব রচনা করিল। প্রথম মহাযুদ্ধের শত শত ভার্দুনও যেন স্ট্যালিনগ্রাদে আসিয়া ছায়ালোকে মিলাইয়া গেল! 'হয় হত্যা, নয় মৃত্যু'—এই সংকল্প উগ্র হইয়া উঠিল। সুতরাং আত্মসমর্পণের কোন প্রশ্ন রহিল না। এই সংগ্রাম চলিল দিনের-পর-দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ।…

স্ট্যালিনগ্রাদে পেঁছিবার আগে জেনারেল ফন পাউলাসের সৈন্যেরা ডন নদী পার হইয়া শক্ত হইয়া বসিতে চাহিল, কিন্তু তখন হইতেই রুশ আত্মরক্ষা দৃঢ় হইতে লাগিল। কিরূপ ভয়াবহ সংগ্রাম উভয় পক্ষে ঘটিয়াছে উহার দুই-একটা অভিনব দৃষ্টান্ত জার্মান এবং সোভিয়েট সংবাদপত্র হইতে দেওয়া যাইতেছে ঃ

কোটেলনিকোভো এলাকায় নাৎসী সৈন্য ও লালফৌজ যখন পরস্পরের সহিত পাঞ্জা লড়িতেছিল, তখন অকস্মাৎ একদিন পশ্চিম দিক হইতে ঝড়ো হাওয়া বহিতে লাগিল। জার্মান সৈন্যেরা এই ঝড়ো হাওয়ার সুযোগ লইয়া বিশাল প্রান্তরের শুকনো ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে অগ্নিশিখা চারিদিকে লোলজিহ্বা বিস্তার করিতে লাগিল। রুশ সৈন্যদলের উপর ফুলকি এবং জ্বলন্ত টুকরাগুলি পড়িতে লাগিল। মেঘের মত গভীর ঘন ধূমে আকাশ ছাইয়া গেল। এই আগুনের আড়াল ধরিয়া আক্রমণকারী জার্মান সৈন্যেরা ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়া আগাইয়া আসিতে লাগিল—যতটুকু মাটি ঠাণ্ডা হইয়াছে, ততটুকু তারা অতিক্রম করিল এবং রুশ লাইনের কাছে আসিয়া পড়িল। ধূম্রকুণ্ডলীর আবরণ হাওয়ার বেগে যেমন ক্রমশ পূর্বদিকে সরিতে লাগিল, তেমনই উহা অধিকতর ঘন হইতে লাগিল। গত এক সপ্তাহ ধরিয়া ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য প্রান্তর ভূমি জার্মান, রুমেনীয় এবং রুশ সৈন্যদের মৃতদেহে ভরিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে অগ্নিশিখা এই মৃতদেহগুলিকে অতি দ্রুত গ্রাস ও দগ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমে আগুনের উত্তাপ এত ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, একে একে সমস্ত জলাশয় ও স্রোতস্বতী শুকাইয়া গেল। কদাচিৎ একটি ফোয়ারা বা কূপ যদি কোথাও থাকিয়া থাকে তবে, উহাই আর-একটি মৃত্যুপণ সংঘর্ষের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে—এমন সম্ভাবনা দেখা দিল।[১]

এই রণক্ষেত্রে যখন রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিল, তখন শুরু হইল জলের জন্য লড়াই। উভয় পক্ষই তৃষ্ণায় কাতর। কারণ, এই নির্জন প্রান্তরে কূপের সংখ্যা ছিল নিতান্তই সামান্য। সুতরাং রাত্রিবেলা তৃষ্ণার্ত জার্মান সৈন্যেরা চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—

'Russ, give us water ! Water ! Do not shoot !'

'রুশ জল জল! আমরা জল চাই! আমাদের গুলি করো না।'—উত্তরে রুশ পরিখা হইতে অজস্র মেশিনগানের গুলী বর্ষিত হইল!

রণক্ষেত্রের একাংশে জার্মান ও রুশ লাইনের মাঝখানে একটি কূপ ছিল। মাইলের-পর-মাইলব্যাপী বহু দূরে পর্যন্ত আর কোথাও জল পাওয়ার আশা ছিল না। সুতরাং প্রতি রাত্রেই এই জন্য নূতন করিয়া লড়াই বাধিত এবং বিজয়ী পক্ষ আনন্দে ফ্লাস্ক ও কেটলী ভর্তি করিয়া জল লইয়া যাইত। জার্মানরা সময় সময় ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়ীগুলিতে পর্যন্ত জল ভর্তি করিয়া লইত। তারা কূপের চারিদিকে ঘন সন্নিবিষ্ট প্রাচীরের আকারে ঘিরিয়া দাঁড়াইত এবং যতক্ষণ জলের ট্যাঙ্ক ভর্তি না হইতেছিল ততক্ষণ বিষম গোলাগুলি চালাইত। রুশেরা দুই দিন যাবৎ কোন জল পাইতেছিল না।

তখন রুশ 'স্যাপার'দের (পথপরিষ্কারক সৈন্য) মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেই জার্মানরা যথারীতি তাদের 'আগুন লইয়া খেলা' শুরু করিল—কূপের পথ ও রণক্ষেত্রের সম্মুখ ভাগ আলোকিত করিবার জন্য তারা আলোর গোলক ছুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু অপর পক্ষ হইতে কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। পাঁচজন সোভিয়েট 'স্যাপার' রণক্ষেত্রের বেওয়ারিশ জমি হামাগুড়ি দিয়া নিঃশব্দে অতিক্রম করিল এবং শত্রুর অলক্ষিতে নিজ নিজ কাজ সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসিল। রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর, তখন জার্মান জলবাহী গাড়ীগুলি—সেই ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী—

১। জার্মান পত্রিকা "Newe Zurnicher Zeitung"—২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২।

কূপের নিকট আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু বালতি ভর্তি করিবার শব্দ শীঘ্রই কর্ণপটাহ বিদীর্ণকারী বিস্ফোরণের মধ্যে ডুবিয়া গেল এবং জলের ট্যাংক ও গাড়ীগুলি মুহূর্তের মধ্যে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইল। যে রুশ সৈন্যেরা কূপের চারিদিকে মাইন পুঁতিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল, তারা ছুটিয়া আসিল এবং অতি দ্রুত জার্মান বন্দী ও জলের ভাঁড়সহ ফিরিয়া আসিল।[১]

'অতি নির্মম ক্রূর যুদ্ধ এই রুশ-জার্মান সংগ্রাম। নাৎসীদের মতই অনুরূপ প্রতিহিংসাবৃত্তি লইয়া লালফৌজ পালটা জবাব দিতে লাগিল। তারাও জার্মানদের অনুকরণে অগ্নিবোমার সাহায্যে প্রান্তর-ভূমিতে আগুন দিতে লাগিল। কিন্তু এই আগুন দিল তারা জার্মানদের পশ্চাৎদিকে (in rear)। তখন জার্মান সৈন্যেরা স্ট্যালিনগ্রাদের কমপক্ষে ২৫ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তারা দেখিল যে, তাদের পিছনে অগ্নিশিখা ছড়াইয়া পড়িতেছে, এই আগুন তাদের গ্রাস করিবে। তখন তারা ভয়ে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম ফেলিয়া পালাইতে লাগিল। শহরের উত্তর দিকেও একই অবস্থা। তিনদল রুশ 'প্রহরী সৈন্যকে' আক্রমণের জন্য পাঠান হইয়াছিল। জ্বলন্ত ঘাসগুলি হইতে এত ঘন ধূম্ররাশি উঠিতেছিল যে, রুশ সৈন্যেরা নিজেরাই অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না। তখন তারা গ্যাস মুখোস পরিয়া আগাইতে লাগিল। ধোঁয়ার আড়ালে এই নূতন আক্রমণে জার্মানরা একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল, তাদের অগ্রগামী সমস্ত ট্যাংক (যার সংখ্যা শতাধিক হইবে) নষ্ট হইল। সেই অগ্নিযজ্ঞে সমস্ত কিছু নষ্ট হইয়া গেল, সমস্ত মাঠ যেন পুড়িয়া ছারখার হইল—কোন কিছুই, একটা গাছ কিংবা একগাছি তৃণও সেখানে দাঁড়ানো রহিল না। কিন্তু দূরে, বহু দূরে দেখা গেল কুণ্ডলীকৃত আর-একরাশি কৃষ্ণাভ ধোঁয়া আকাশে উঠিতেছে, আর অগ্নিদেবের ক্রূর স্বর্ণাভ উজ্জ্বলতা মাঝে মাঝে ধোঁয়ার মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে। বুঝা গেল ওখানেও আর একদফা লড়াই চলিতেছে। কিন্তু এখান হইতে ওই দূর সীমানা পর্যন্ত সেখানে আকাশে ধোঁয়া ও আগুন একত্র মিশিয়া গিয়াছে, রণক্ষেত্রের সীমান্ত সেখানে গিয়া পৌঁছিয়াছে ভস্মরাশি ও দগ্ধ শবের অস্থিচিহ্ন বহন করিয়া।···)

'ক্রমে আগুনের উত্তাপ এমন বাড়িয়া গেল যে, সৈনেরা তাদের সমস্ত জামাকাপড় ও ইউনিফর্ম ছিঁড়িয়া ফেলিল। দুই পক্ষই সম্পূর্ণ উলঙ্গ! এবং এভাবেই তারা পরস্পরের সহিত লড়িতেছিল।—মনে হইল যেন আদিম যুগের গিরি-গহ্বর হইতে বুনো মানুষেরা বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং অতি-আধুনিক সমরাস্ত্র লইয়া লড়িতেছে। যে সভ্যতার যুগে তারা বাস করিতেছিল, উহারই মধ্যে নগ্ন মানুষের দল পরস্পরকে মারিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে—সভ্যতা সংস্কৃতি, শিক্ষা ও বিজ্ঞান যেন উন্মাদ হইয়া রণক্ষেত্রে তাণ্ডবনৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে। সেই দুঃসহ উত্তাপের জন্য গায়ের চামড়া ক্রমশ তামাটে হইয়া গেল, তারপর ঝলসাইয়া ও পুড়িয়া কালো হইয়া গেল, অসহ্য ধোঁয়ার জন্য তাদের চোখ নিদারুণ যন্ত্রণায় জ্বালা করিতে লাগিল, ফুলিয়া লাল হইয়া গেল এবং শেষ পর্যন্ত সেই হতভাগ্যের দল অন্ধ হইয়া গেল। অগ্নিকাণ্ডের বীভৎসতা ও আগ্নেয়াস্ত্রের বিভীষিকা—এই উভয়ের পাল্লায় পড়িয়া সৈন্যেরা পাগল হইয়া গেল, ত্রাসে ও আতঙ্কে তারা উন্মাদের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু তখনও জার্মান সৈন্যেরা স্ট্যালিনগ্রাদ হইতে ১৫ মাইল দূরে।'[২]

১। "Soviet War News"—সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪২।
২। 'Hamburger Fremdenblati'—১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২।

তখন মাত্র তিন সপ্তাহের লড়াই চলিতেছে, কিন্তু মনে হইল ইতিমধ্যেই এই সংগ্রাম বীভৎসতার চরম সীমায় পেঁছিয়াছে। রণক্ষেত্রে যে সমস্ত সংবাদপত্রের রিপোর্টার ছিলেন, তাঁদের একজনও কল্পনা করেন নাই যে, এই ভয়াবহ যুদ্ধ আর বেশীক্ষণ চলিতে পারে। যে পক্ষেরই হউক, একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবেই এবং অবিলম্বেই এই সিদ্ধান্ত হইবে। কিন্তু কী আশ্চর্য সেই বহু প্রত্যাশিত চূড়ান্ত ফল আসিল না, রুশেরা হার মানিল না। তখন নাৎসী কর্তারা সংবাদপত্র ও রেডিওযোগে আর-একদফা প্রচারকার্যের দিকে ঝুঁকিলেন, জনসাধারণের আস্থা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর জেনারেল ডিটমার রেডিওযোগে প্রচার করিলেন—

'সোভিয়েট সোসিয়েলিস্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই শত্রুকে আমরা যেমন বলপূর্বক নতজানু করিতে চাই, সেও আমাদের তাহাই চাহিতেছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে ইহা অত্যন্ত কঠিন কাজ। চূড়ান্ত ফলের লড়াইও এজন্যই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবে। সোভিয়েট সৈন্যদের মত আর কেহই চূড়ান্ত ফললাভে এত বিলম্ব ঘটাইতে পারে না। বারংবার ইহাই দেখা গিয়াছে যে, তাদের মত আর কেহই গণসৈন্যের চাপে দুই দিকের পাল্লাকে এমন সমান রাখিতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য সংগ্রামেও যেমন জার্মান পক্ষের শ্রেষ্ঠতর ইচ্ছাশক্তি ও দক্ষতা শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ঘটাইয়াছে, এক্ষেত্রেও যুদ্ধের উপসংহার তেমনভাবেই ঘটিবে।'

কিন্তু ডিটমার বিলম্বের এই কৈফিয়ৎ দিলেন বটে, কিন্তু জার্মান সৈন্যের অদৃষ্টে তখনও বহু বিড়ম্বনা অপেক্ষা করিতেছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ডন নদী পার হইয়া স্ট্যালিনগ্রাদ শহরে পেঁছিবার আগে যে সমতল ভূমি রহিয়াছে, সেখানে প্রকৃতির কতকগুলি বিচিত্র গহ্বর বা খাদ রহিয়াছে। জার্মান সৈন্যেরা বহু কষ্টে বহু মূল্য দিয়া অগ্রসর হইতে গিয়া দেখিল যে, তারা এই সমস্ত খাদের অভিনব ফাঁদের মধ্যে আটকা পড়িতেছে। গোলাবিধ্বস্ত ভূমির এই খাদগুলি এক ভয়াবহ উৎপাতের মত। উৎকৃষ্ট রাস্তাঘাট কিছুই নাই, আছে কেবল গহ্বর-কণ্টকিত উঁচু-নীচু পায়ে-হাঁটা রাস্তা এবং সেগুলিও আবার বালুকাস্তীর্ণ। মানুষ, কামান ও ট্যাঙ্কগুলি গলদঘর্ম হইতে লাগিল সেই বন্ধুর গহ্বরপথের উপর দিয়া একবার উঠিতে এবং নামিতে। আর এইভাবে সেই দুর্গম রাস্তার যেখানে যেখানে রুশেরা উৎসাদিত হইল, সেখানে চলিতে হইল জার্মান সৈন্যদিগকে অপরিসীম লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া। কিন্তু রুশেরা কি সেই দুর্গম রাস্তাও সহজে ছাড়িয়া দিল ? প্রত্যেকটি খাদ ও গহ্বর যেন ছিল রুশ সৈন্যদের ভীমরুলের চাক! ইহার প্রত্যেকটি ছিল এক-একটি ছোটখাট রণক্ষেত্র। সুতরাং প্রত্যেকটির জন্য লড়াই করিতে হইত। এভাবে হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনজন বা চারজন রুশ সৈন্য বাহির হইয়া আসিত গহ্বর হইতে, তারা স্বয়ংক্রিয় পিস্তলের গুলি ছুঁড়িত শত্রুর দিকে এবং অবশেষে সারা দেহে মেশিনগানের গুলিবিদ্ধ হইয়া লুটাইয়া পড়িত মাটিতে। হঠাৎ তখন কোথা হইতে পূবালী ঝড়ের বাতাস নিদারুণ ঝাপ্‌টা মারিয়া গেল, আর জার্মান সৈন্যদের চোখ-মুখ-নাক উৎক্ষিপ্ত বালুকণার আঘাত তীরের মত বিদ্ধ হইতে লাগিল।

জার্মান সংবাদপত্রসমূহ যেন পাগল হইয়া গেল, তারা গর্জন করিতে লাগিল—

'স্ট্যালিনগ্রাদ নিতেই হইবে। স্ট্যালিনগ্রাদের পতন প্রত্যেকটি জার্মান সৈন্যের আত্মসম্মানের সঙ্গে, তার অন্তরাত্মার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত হইয়া গেছে!' সংবাদ-পত্রগুলি গর্জন করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তারা ভুলিয়া গেল কি মূল্য দিয়া জার্মান সৈন্যরা অগ্রসর হইতেছে। এত লোকসান, এত রক্তপাত, এত কষ্ট এবং লাঞ্ছনা ইতিহাসে অভিনব। তথাপি তারা স্ট্যালিনগ্রাদের উপকণ্ঠে পেঁাছিল। কিন্তু সেই শহরতলিতে আর-একটা ভয়াবহ যুদ্ধ অপেক্ষা করিতেছিল, যার সমগ্রতার জন্য নাৎসী বাহিনী প্রস্তুত ছিল না।

প্রত্যেকটি রাস্তা, প্রত্যেকটি গলি, প্রত্যেকটি মোড় যেন এক-একটি মৃত্যুর ফাঁদ—গোপনে মাইন ও বিস্ফোরক সর্বত্র পাতিয়া রাখা হইয়াছে। বাড়ীর যে দেয়ালগুলি নিষ্প্রাণ নিস্তব্ধ, হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া আছে, জার্মান সৈন্য কাছে আসিতেই সেগুলি সহসা সশব্দে ফাটিয়া গেল, বিস্ফোরণে ও আগুনে শত্রুকে সহস্র বাহু দিয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করিল। রুশেরা 'Volunteers of death' বা মৃত্যুর স্বেচ্ছাসৈনিকদল গঠন করিল। এই দলের যুবকেরা জোড়ায় জোড়ায় ট্যাংকমারা রাইফেল লইয়া গলিতে ও রাস্তায় ওঁৎ পাতিয়া থাকিত, যখন বুঝিত ট্যাংক নাগালের মধ্যে আসিয়াছে এবং উহার হালকা বর্মের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, তখন তারা গুলি ছুঁড়িত। কিন্তু এই দুঃসাহসী লোকগুলি জানিত যে, গুলিবিদ্ধ ট্যাংক তাদের দেহ গুঁড়া করিয়া যাইবে, তথাপি স্বেচ্ছায় তারা মৃত্যুবরণ করিয়া শত্রুকে ঘায়েল করিত। এভাবে স্ট্যালিনগ্রাদ শহরের প্রত্যেকটি ইঁট এবং পাথরই হয়তো 'মৃত্যুর স্বেচ্ছাসেবক'কে লুকাইয়া রাখিত।

কেবল রাস্তা বা বাড়ীর দেয়াল ও প্রাচীরই নহে, প্রত্যেকটি গৃহেই এই যুদ্ধ চলিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ীঘর বা কলকারখানার স্তূপে সর্বত্র জঞ্জালের পাহাড় রচিত হইল। এই ধ্বংসলীলা আক্রমণকারীর পক্ষে অধিকতর বিপদ ডাকিয়া আনিল। একটি রাস্তার একটি বৃহৎ চারতলা বাড়ীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। গৃহটি ছিল একটি প্রকাণ্ড গুদাম ঘর। ইহার উপরের তলা হইতে রুশসৈন্যেরা চোরাগোপ্তা গুলি চালাইয়া জার্মানদিগকে নিধন করিতে লাগিল। জার্মান গোলন্দাজেরা টের পাইয়া তোপের মুখে বাড়ীর উপরতলা উড়াইয়া দিল। তখন জার্মানরা অগ্রসর হইল, কিন্তু কিছু দূর না-যাইতেই তাদের গতি আবার থামিয়া গেল। সেই বাড়ীর তিনতলা হইতে গুলি আসিতেছে। আবার জার্মানরা বোমারুর সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল, তখন ঝাঁক বাঁধিয়া বোমারু আসিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সমগ্র গুদামবাড়ীটি এক প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল—ধ্বংসস্তূপগুলি জ্বলিতে লাগিল। উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে করিতে একদল জার্মান সৈন্য সেই জ্বলন্ত স্তূপ দখল করিতে ছুটিয়া গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই স্তূপের ভিতর হইতে মেশিনগানের অজস্র গুলি জার্মানদিগকে ধরাশায়ী করিল! গৃহটির চারতলা ধ্বংস হইয়াছে, তিনতলাও গিয়াছে এবং গোটা বাড়ীটাও ধ্বংস হইয়া গেল, তবু সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত গৃহের সেলারের (মাটির তলার ঘর) মধ্যে যে সমস্ত রুশ বাঁচিয়াছিল তারাই এই 'মরণ কামড়' দিল!

এই রাস্তাটির অন্য ধারে আর একটি বাড়ী রুশেরা রক্ষা করিতেছিল। জার্মানেরা ধূম্রজালের আবরণ সৃষ্টি করিয়া একতলায় কাছে গৃহের প্রাচীরে আসিয়া পেঁাছিল। কিন্তু তাদের অফিসারেরা আগাইবার পথে মেশিনগানের গুলিতে মারা পড়িল।

তথাপি তারা অগ্রসর হইতে চাহিল এই মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়ার জন্য। গোলার আঘাতে বাড়ীর দেয়ালে যে সমস্ত ছিদ্র হইয়াছিল, জার্মানরা সেই ছিদ্র দিয়া এবং দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিল। রুশেরা সংখ্যায় ছিল অনেক কম, জার্মানরা হাতবোমা ও মেশিনগানের গুলি ছুঁড়িয়া তাদেরকে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে তাড়া করিতে লাগিল। তখন রুশেরা দোতলায় উঠিতে চাহিল। কিন্তু উঠিবার পথে দোতলার সিঁড়িতে উভয় পক্ষের ভয়াবহ হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হইল। হাতের কাছে যে সমস্ত আসবাবপত্র পাওয়া গেল, রুশেরা তাহাই নিচে জার্মানদের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল। দরজা-জানালা ভাঙ্গিয়া মেশিনগানগুলি চাপা দেওয়া হইল। তারপর আবার দোতলায় সেই এক ঘর হইতে অন্য ঘরে লড়াই চালাইতে লাগিল। তাদের সংখ্যা আরও হ্রাস পাইল, আবার তারা তাড়া খাইতে খাইতে তিনতলায় আশ্রয় লইল এবং সেখানেও সেই নীচুতলার মত আদিম যুগের বর্বর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল। তারপর চারতলা এবং সর্বশেষে যে কয়েকজন রুশ রক্ষা পাইয়াছিল, তারা ছাদের উপর হইতে লড়িতে লাগিল। ছাদের গবাক্ষ (sky light) এবং গোলায় সৃষ্ট ছিদ্র দিয়া তারা নীচু তলার জার্মানদের উপর গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। জার্মানরাও ক্রমাগত ধূম্র সৃষ্টি করিয়া তাদেরকে কাবু করিতে চাহিল। তখন অকস্মাৎ এক ভয়ঙ্কর আওয়াজ হইল। দেয়ালগুলি ফাটিয়া চৌচির হইল, গোটা বাড়ীটা নড়িয়া উঠিয়া মুহূর্তের মধ্যে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া পড়িয়া গেল! ধূলা, ধূম ও আগুনের মধ্যে সেই বৃহৎ অট্টালিকা এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল এবং আক্রমণকারী সমস্ত জার্মান সৈন্যেরা সমাধিস্থল রচনা করিল। রুশ 'স্যাপার'গণ গোপনে হামাগুড়ি দিয়া আসিয়াছিল এবং অট্টালিকার অনতিদূরে প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক পাতিয়া উহা চার্জ করিল। বাড়ীটা চক্ষুর নিমেষে উড়িয়া গেল এবং সেই সঙ্গে জার্মানদের সহিত ছাদের উপর লড়াইকারী রুশেরাও উৎক্ষিপ্ত হইল।

সেই রাস্তারই আর-একটি গৃহের কাহিনী। জার্মানরা আর-একটা ব্লক বাড়ী দখল করিয়া উহাকে 'দুর্গায়িত' করিয়াছিল। সে বাড়ীর পার্শ্বে আর-একটি অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ পড়িয়াছিল। রুশেরা কোনমতে চুপি চুপি হামাগুড়ি দিয়া ধ্বংসস্তূপ বাহিয়া সেই পাশের বাড়ীর উপরের তলায় উঠিয়া গেল। তখন উপরের তলা ও নিচুতলার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হইল—রুশেরা উপরে ও জার্মানরা নীচে। রুশেরা নীচে শত্রুর গায়ে জ্বলন্ত পেট্রোল ঢালিয়া দিতে লাগিল। আর জার্মানরা ধোঁয়ায় অন্ধ করিয়া রুশদিগকে অবশ করিতে চাহিল। অবশেষে সমগ্র অট্টালিকা জ্বলিয়া উঠিল, রুশেরা সেই দগ্ধ গৃহে আটকা পড়িল। তবু সেই জ্বলন্ত কুণ্ড হইতে পলায়মান জার্মানদের উদ্দেশ্যে বন্দুকের শেষ গুলি নিঃশেষ করিল।—ইহাই ষ্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ!...

'প্রতি গজের জন্য লড়াই' বলিয়া একটি চলতি কথা আছে। এই কথার নির্মম বাস্তব রূপ দেখা গেল ষ্ট্যালিনগ্রাদ শহরে। সুতরাং জার্মান বাহিনীর গতিবেগ বলিয়া কোন বস্তু রহিল না। কেননা, এই গতির প্রাণ ছিল যার মধ্যে, সেই ট্যাঙ্কের 'যাদুবিদ্যা' এখানে অচল হইয়া গেল। জঞ্জালে ও ধ্বংসস্তূপে সারা শহরের রাস্তাঘাট ছাইয়া গেল এবং এই রাবিশের মধ্যে আবার ট্যাঙ্কমারা ফাঁদ লুকানো থাকিত।

ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ীর প্রাচীরগুলিতেও 'মৃত্যুর স্বেচ্ছাসেবকরা' ট্যাঙ্কমারা রাইফেল লইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিত। সুতরাং ট্যাঙ্কের সেই রাজ-সমারোহ আর রহিল না, তাদের পক্ষে অগ্রসর হওয়াই দুঃসাধ্য ছিল। অতএব পদাতিকের অগ্রগামী না হইয়া, তারাই এক্ষণে পদাতিকের পিছু যাইতে লাগিল ভয়ে-ভয়ে মন্দ গতিতে—প্রথম মহাযুদ্ধের ১৯১৭ সালের অনুকরণে। (স্ট্যালিনগ্রাদের রাইফেলধারী সামান্য মজুর ও কৃষকেরা আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের এই মহিমান্বিত রথকে হতমান করিয়া দিল। আর 'স্টুকা' বা বোমারুর দল? ধোঁয়ায়, ধূলিতে ও আগুনে তারাও যেন অন্ধ হইয়া গেল, দূরপাল্লার কামানগুলিও গোলা উদ্গীরণে সংকোচ বোধ করিতে লাগিল। কেননা, এই ভয়াবহ যুদ্ধে শত্রু-মিত্রের সীমারেখা মুছিয়া যাইতে লাগিল। আধুনিকতম যন্ত্রবিজ্ঞানের নূতনতম মারাত্মক অস্ত্র লইয়া মানুষ যেন বহু সহস্র বৎসরের আদিম যুগে ফিরিয়া গেল!···)

(বার্লিন রেডিওর আর উচ্ছ্বাস নাই, তথাপি দৃঢ়তার ভঙ্গী আছে। —'ঘন পরিবেশ, নিতান্তই ঘন পরিবেশের ইহা যুদ্ধ। অতিকষ্টে ভূমি দখল করিতে হয়, মিটারের হিসাবে। শত্রু অনবরতই নূতন নূতন বিন্দু খুঁজিতে থাকে, যে বিন্দু-গুলিতে ধ্বংসস্তূপে এবং সেলারের মধ্যে সে তার নূতন আত্মরক্ষার নীড় তৈয়ার করিতে পারে। সুতরাং লড়াইয়ের সমস্ত গুরুভার দায়িত্ব গিয়া পড়িতেছে পদাতিক সৈন্যের উপর, ভারী অস্ত্রপাতি (যেমন কামান) লইয়া তারা বিব্রত, আর এই দায়িত্ব পড়িতেছে স্যাপারদের উপর—তাদের আছে বিশেষ ধরনের অস্ত্র, অগ্নিক্ষেপক এবং বিস্ফোরক। এবং প্রধানত এই যুদ্ধের অগ্রবর্তী বাহিনী বিমানবহরের গুরুতর কার্যকারিতা বার বার পরীক্ষিত হইয়াছে। যেখানে ভারী অস্ত্র ও কামানের গোলা পৌঁছায় না, সেখানে এই বিমানবহরই শত্রুর আত্মরক্ষার নীড়ে আঘাত হানিবার সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বাহন। তথাপি পদাতিক এবং স্যাপারদের বহু প্রয়োজনীয় কার্য আছে। বিমানবহরের আক্রমণ হইতেও যে শত্রু নিরাপদ, তাকে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আক্রমণ করাই এদের সবচেয়ে বড় কাজ। সুতরাং এক পা এক পা করিয়া আক্রমণ অগ্রসর হইতেছে।' —২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২, জার্মান রেডিওর বক্তব্য।)

অবরুদ্ধ স্ট্যালিনগ্রাদ শহরে একমাত্র ভল্গা নদীই বাহির হইবার এবং যথাসম্ভব যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র পথ ছিল। গানবোট, বর্মাবৃত যান, মোটরযান, ইত্যাদি সৈন্য, খাদ্যদ্রব্য, সরবরাহ, গোলাগুলি ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনিত এবং আহত-দিগকে নদীর অপর পারে লইয়া যাইত। সুতরাং এই নদী ও এর যানগুলি শহরের আত্মরক্ষায় ও আক্রমণে কম সহায়তা করে নাই। রুশরা একটা পন্টুন ব্রীজও এর উপর তৈয়ার করিয়াছিল। সুতরাং এই নদীর উপর অবিলম্বেই জার্মান বোমারুর হানা আরম্ভ হইল। এর সরবরাহ পথে বাধা দেওয়ার জন্য জার্মানরা চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু সেই বাধা কার্যত ফলপ্রসূ হয় নাই, যদিও বহু লোকের রক্ত ও অশ্রু ভল্গার জলে মিশিয়া গিয়াছে এবং বহু দুঃসাহসের কাহিনীও এর সহিত জড়িত রহিয়াছে।

(স্ট্যালিনগ্রাদ শহরের অভ্যন্তরে আত্মরক্ষার অপরিসীম বিস্ময়ের সহিত দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটা ছক কোনওক্রমে অনুসরণ করা হইতেছিল। জঞ্জালে ও ধ্বংসস্তূপে চারিদিকে আচ্ছন্ন ছিল বটে, তবু এরই মধ্যে গহবরের মত ক্ষতবিক্ষত কক্ষের মধ্যে

বসিয়া কমিউনিস্ট পার্টি তাঁদের মিটিং করিতেন। শহর রক্ষার জন্য নবাগত সৈন্যদের মধ্য হইতে সদস্য নির্বাচন এবং চাঁদা সংগ্রহ করা হইত। এদের কার্যকলাপ দেখিলে মনে হইত স্ট্যালিনগ্রাদে অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে নাই! তখনও শহরে সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত, অবশ্য একখানা মাত্র শীট্। কিন্তু যথানির্দিষ্ট সময়ে অত্যন্ত নিয়মিতভাবে এই সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। কাগজটি ছোট্ট একখানা টুকরা মাত্র ছিল, ১৮ ইঞ্চি লম্বা ও ১২ ইঞ্চি চাওড়া এবং ছাপাও ছিল কদর্য। কিন্তু সাংবাদিকতার যে দক্ষতার পরিচয় এতে ছিল তাতে যে-কোন রিপোর্টার বিবরণী পড়িয়া ঈর্ষা বোধ করিতে পারিতেন।)

এভাবে ইস্পাত-নগরী সত্যসত্যই ইস্পাতের মত দৃঢ়তা লইয়া আত্মরক্ষার অভূতপূর্ব কাহিনী রচনা করিতে পারিতেন।

ক্রমে হিটলারের প্রধান শিবিরে সংশয় ও অস্থিরতা দেখা দিল এবং নিজেদের ভুল সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গেল। জেনারেল ডিটমার ২৮শে সেপ্টেম্বর ক্রাক্সেমবুর্গ হইতে রেডিও যোগে এক 'যুক্তিপূর্ণ' কৈফিয়ৎ দিলেন। তিনি বলিলেন, 'সাম্প্রতিক সামরিক ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম সৈন্যেরা এমন একটি বৃহৎ নগরীর মধ্যে যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছে, যাহা একান্ত নিয়মিতরূপে সুরক্ষিত। আগেকার অভিযানগুলিতে বৃহৎ নগরীর শহরগুলিতেই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উভয় পক্ষেই এমন কতকগুলি কারণ বিবেচনা করা হইত, যার জন্য খাস শহরের অভ্যন্তরকে লড়াইয়ের কেন্দ্র করা হইত না। কারণ, আক্রমণকারীর পক্ষে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র এবং সৈন্য-পরিচালনার পদ্ধতি সীমাবদ্ধ থাকিত বলিয়া তাকে স্বভাবতঃই বিচার বিবেচনা করিতে হইত এবং এমনভাবে চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে হইত, যাতে খাস শহরটি পাকা ফলের মত বিজেতার হাতে আসিয়া পড়ে। প্রথম মহাযুদ্ধে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ শহরের কথা উল্লেখ করা যায় না, যেখানে কোন বেপরোয়া চূড়ান্ত লড়াই হইয়াছে। লীজ, নামুর, এন্টোয়ার্প (বেলজিয়াম) ইত্যাদির মত বড় শহরগুলির প্রাণকেন্দ্র রণক্ষেত্রে পরিণত হইবার আগেই হয় পরিত্যক্ত কিংবা পতন হইয়াছে। এমন কি, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে যখন 'ওয়ারশ' নগরী জার্মান বোমারুর মারাত্মক আঘাতের মুখে পড়িল, তখন আর যুদ্ধ চরম মাত্রায় টানিয়া আনা হইল না। ১৯৪০ সালের জুন মাসে প্যারিস নগরীও শেষ মুহূর্তে 'খোলা শহর' বলিয়া ঘোষিত হইল। একমাত্র গৃহ-যুদ্ধের সময় ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। কেননা সেখানে স্বাভাবিক কারণেই গভর্নমেন্টের গদী ও শাসনকেন্দ্র দখলের জন্য উভয়পক্ষ মরিয়া হইয়া উঠে এবং তখন সংস্কৃতি বা মিতব্যয়িতার জন্য কেহ মাথা ঘামায় না—যেমন ১৯৩৬-৩৭ সালের মাদ্রিদের গৃহযুদ্ধ। রক্তাক্ত শ্রেণী-সংগ্রামের দিকে চাহিয়াই সোভিয়েটরা এই সমস্ত যুদ্ধের মহিমা কীর্তন করিয়াছে। ইহারই জন্য স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ এক বিশেষ কাঠিন্য ও তিক্ততার দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। এমন কি কিয়েভ, খারকোভ, রস্টোভ ইত্যাদি বৃহৎ সোভিয়েট নগরীগুলির সহিত তুলনায়ও এই যুদ্ধ অসাধারণ!'

রণক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য

জেনারেল ডিটমার যাকে অসাধারণ বলিয়াছেন, সামরিক ইতিহাসে তা সত্যই অতুলনীয়। কিন্তু এই অতুলনীয় সংগ্রাম কোন নক্সা অনুসারে গোড়া হইতে গড়িয়া

উঠে নাই। ঘটনার অনিবার্য গতি যেন এই অদ্ভুত যুদ্ধকে ডাকিয়া আনিল। জেনারেল পাউলাসের যান্ত্রিকবাহিনী ২৩শে আগস্ট তারিখ যখন ডন নদী অতিক্রম করিল এবং রস্টোভের পতনের আগেই যখন তারা অতি দ্রুত ক্রাসনোডার-স্ট্যালিনগ্রাদ রেলপথের নিকটতম বিন্দুতে উপস্থিত হইল, তখন সিমলিয়ানস্কের উপর অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা আকস্মিক জয়লাভের হয়তো সম্ভাবনা ছিল। জার্মান সামরিক কর্তারা হয়তো এক মহড়ার চালে স্ট্যালিনগ্রাদ কাড়িয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু জার্মানীর সেই চাল ব্যর্থ হইল এবং একমাস ধরিয়া অতি তীব্র ও নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বে জার্মানবাহিনী আটকা পড়িল। এই ব্যর্থতা ও দীর্ঘ-বিলম্বিত অভিযানের আক্রোশ হইতেই স্ট্যালিনগ্রাদের সংগ্রামের বীজ দেখা দিল, যার প্রকৃতি ও পরিণতির জন্য জার্মান, এমন কি রুশ কর্তৃপক্ষও বোধ হয় পূর্বাহ্নে প্রস্তুত ছিলেন না। তথাপি রুশ পক্ষই গোড়ার দিকে ইহার গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ইহাকে মুঠির তলে আনয়ন করিলেন। জার্মানদের নিকট এটা ছিল বিরাট গ্রীষ্মাভিযানের একটা ঘটনা মাত্র, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটাই হইয়া দাঁড়াইল আসল অভিযানের প্রাণবস্তু!

যে বর্বরতা, উন্মত্ততা ও পৈশাচিকতা সহকারে এই যুদ্ধ দিনের-পর-দিন এবং সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নহে। উভয় পক্ষই নৃশংসতার চরম সীমায় নামিয়া গিয়াছিল। সেই অবর্ণনীয় বীভৎসতার মধ্যে মানুষ দূরের কথা, কোন জানোয়ারের পক্ষেও লড়াই করা কঠিন। কিন্তু হিটলার তাঁর সৈন্যদিগকে এই অসম্ভব জানোয়ারী বৃত্তির মধ্যেই ঠেলিয়া দিলেন। এবং বোধহয় মনুষ্য নামক অদ্ভুত জন্তুর পক্ষেই এই নারকীয় অবস্থায় টিকিয়া থাকা এবং অপরিমিত ধৈর্য, সাহস ও নিয়মশৃঙ্খলা সহকারে সংগ্রাম করা সম্ভব ছিল। যাঁরা সেই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ না করিয়াছেন, তাঁদের পক্ষে কল্পনা করাও একান্ত কঠিন।*

ইতিহাসের খুব কম যুদ্ধই স্ট্যালিনগ্রাদের মত রণবিদ্যার শিল্পচাতুর্য এতটা উদ্ঘাটিত করিয়াছে। অজ্ঞাতসারে যে যুদ্ধের নক্সা গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল সোভিয়েট পক্ষের দ্বারা এবং যখন বুঝা গেল যে, জেনারেল পাউলাস স্ট্যালিনগ্রাদ দখল করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন সোভিয়েট হাইকম্যান্ড তাঁকে এমন একটি যুদ্ধের মধ্যে জড়াইয়া ফেলিতে চাহিলেন, যেটা জার্মান সামরিক চিন্তার নিকট কেবল অনভ্যস্ত নয়, অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়ও বটে। 'যে-কোন মূল্যে স্ট্যালিনগ্রাদ দখল করিতেই হইবে'—ইহাই যখন জার্মান সংকল্পরূপে প্রতিভাত হইল, তখন সোভিয়েট সমরকর্তারাও সেই সমরক্ষেত্রের নক্সাকে ধীরে ধীরে নিজেদের রেখাচিত্র দিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। সুতরাং রুশ হাইকমান্ড সমস্ত সৈন্য ও সমরসম্ভার এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করিলেন, যার ফলে ফন পাউলাস ইতিহাসের এক কদর্যতম স্থিতিশীল যুদ্ধের পঙ্কিলতায় এবং রাস্তার লড়াইয়ের জটিলতায় জড়াইয়া পড়িলেন। সুতরাং জার্মানরা এই প্রকার অভিনব যুদ্ধকে মোটেই বাগে আনিতে পারিলেন না এবং

---

* মার্শাল চুইকোভ স্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর স্মৃতি পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন যে, স্ট্যালিনগ্রাদের দগ্ধ নরককুণ্ডে কোন জন্তু-জানোয়ারের পক্ষেও তিষ্ঠানো সম্ভব ছিল না। শহরের কুকুরগুলি পর্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ভল্গানদী পার হইয়া ওপারে চলিয়া গিয়াছিল এবং একমাত্র মানুষের পক্ষেই সেই অবস্থায় যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল।—লেখক

যেসমস্ত এলাকায় রণকৌশলের মহড়া খেলানো সম্ভব ছিল, সেগুলিও ক্রমশঃ সংকুচিত হইয়া গেল। জার্মান সমরতত্ত্ব দীর্ঘকাল সমূলে সংহার নীতির উপর জোর দিয়া আসিয়াছে এবং এই নীতি সফল করিতে হইলে এমন পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট যুদ্ধের নক্সা গড়িয়া তুলিতে হইবে, যা সহজেই চূড়ান্ত ফল আনয়ন করিতে পারে। এই নীতি ও পরিকল্পনার অনিবার্য লক্ষণ হইতেছে একাধিক বেষ্টননীতি, সহজ বাংলায় যাহাকে বলাহয় সাঁড়াশীর চাপ। এমন কি, যেখানে রণকৌশলের খাতিরে রণক্ষেত্রের মধ্যভাগেও ভাঙ্গনের সৃষ্টি করিতে হয়, সেই বিচ্ছিন্ন অংশেরও এক বা দুই পার্শ্বে বেষ্টন কৌশল অনুসরণ করিতে হয়। কিন্তু রাস্তার লড়াইতে এই প্রকার মহড়া কার্যতঃ অসম্ভব। স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, জার্মানপক্ষের পরিকল্পনা ছিল স্ট্যালিনগ্রাদকে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে বেষ্টন ও আচ্ছন্ন করা। কিন্তু মহড়ার এই কৌশলে যখন বাধা পড়িল, ফন পাউলাস কেবলমাত্র তখনই মধ্যভাগে আক্রমণ শুরু করিলেন। সুতরাং সৈন্যাপত্যের আর্টের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া গেল এবং যুদ্ধের দায়িত্ব গিয়া পড়িল লড়াইয়ের কায়দা ও ছোটখাট রণকৌশলের কৃতিত্বের উপর। কেবল তাহাই নহে, জার্মানী এতদিন যে গণ-সৈন্যের বিশাল চাপ দিয়া এবং শ্রেষ্ঠতর সংখ্যার সমাবেশ ঘটাইয়া বহু যুদ্ধে বাজিমাত করিয়া আসিয়াছে, সেই সংখ্যাগত আধিক্যের কৌশলও এখানে অকেজো হইয়া গেল। স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধের ইহাও এক অভিনব তথ্য।

আগস্ট মাসের শেষে অনুমান করা গেল যে, জার্মানরা প্রায় ৮ হইতে ১০ লক্ষ সৈন্য সন্নিবেশ করিয়াছে স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র এলাকায়। কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদ বেষ্টিত হওয়ার পর যখন ফন পাউলাস রাস্তার লড়াইতে জড়াইয়া পড়িলেন, তখন এই বিরাট সংখ্যা কোন কাজে আসিল না—একমাত্র কোন কোন ক্লান্ত বাহিনীর অদল-বদল ছাড়া। রণাঙ্গনের যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেক্টর বা খণ্ড-রণক্ষেত্র দেখা দিল, সেখানে এই সমস্ত বৃহৎ সংখ্যা সমাবেশ করা সম্ভব ছিল না। জার্মান হাইকম্যাণ্ডের নিকটও এই সত্য উদ্ঘাটিত হইল। সুতরাং অক্টোবর মাসে তাঁরা আভাষ দিলেন যে, স্ট্যালিনগ্রাদ দখলের বাকী কাজটা গোলন্দাজরাই সারিতে পারিবে। অর্থাৎ সংখ্যার সাহায্যে আর চূড়ান্ত ফল আনা সম্ভব ছিল না, সুতরাং অস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হইল। কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদ দখল কেবল গোলন্দাজের কার্য ছিল না।

স্ট্যালিনগ্রাদের সংগ্রাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটা চূড়ান্ত পর্বরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইংরাজীতে যাহাকে decisive battle বা চূড়ান্ত যুদ্ধ বলে, ইহা তাহাই। কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়া ইহা তার চেয়েও অনেক বেশী। কেননা স্ট্যালিনগ্রাদ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমগ্র ধারা ও ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে। জার্মান সৈন্যবাহিনী যে অপারেজেয় নহে, এই তথ্য সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত করিয়াছে—এতদিন পর্যন্ত যে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণের অভাব ছিল। যদিও মস্কোর যুদ্ধে এর প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল।

স্ট্যালিনগ্রাদ কিভাবে আত্মরক্ষা করিয়া চলিল? সাধারণ আত্মরক্ষার কৌশলে শত্রুকে কোন মতে ঠেকানো হয়, কোনক্রমে প্রতিরোধ করা হয়। কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদের আত্মরক্ষা এই ধরনের 'নিষ্ক্রিয়' বা 'passive' ছিল না, উহা বেগবান ও সক্রিয় আত্মরক্ষার

কিংবা 'active defence'-এর চরম দৃষ্টান্তস্থল ছিল। অন্যথা স্ট্যালিনগ্রাদের ইতিহাস অন্যরকম হইতে পারিত। কিন্তু এখানে বিরামহীন আত্মরক্ষার লড়াই যেমন চরম পর্যায়ে চলিতে লাগিল, তেমনি অবিলম্বে পালটা-আক্রমণগুলি ঘটিতে লাগিল। লাল-ফৌজ শত্রুকে কোন ঘাঁটিতেই শক্ত হইয়া বসিবার সুযোগ দিল না, যে কোন বিন্দুতে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই এমন মারাত্মক পালটা-আঘাত অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল যে, সত্যসত্যই জার্মান অগ্রগতি গজের মাপে পরিণত হইল। খাস স্ট্যালিনগ্রাদ শহরের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে লালফৌজের পালটা অভিযান পর্যন্ত ৯০ দিন ধরিয়া যে একটানা প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিল তাহাতে খণ্ড-রণক্ষেত্রগুলির কোন কোন অংশে মাত্র নাৎসীবাহিনী ভল্গার তীরে পৌঁছিতে পারিয়াছিল। এই হিসাবে জার্মান সৈন্যদলের দৈনিক গড়পড়তা গতি ছিল মাত্র অর্ধ মাইল! পূর্বে যে গতিবেগ দৈনিক ২৫/৩০ মাইল অতিক্রম করিয়া গিয়াছে তাহা আসিয়া এভাবে আধ মাইলে দাঁড়াইল। কিন্তু এখানেই শেষ নহে। কেননা এই গতিও স্থির বা নির্দিষ্ট ছিল না। সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীতে এমন দিনও গিয়াছে যখন সারাদিন লড়াইয়ের পর মাত্র কয়েক গজ জমি দখলে আসিয়াছে। সময় সময় সেই কয়েকগজ জমি ধরিয়া রাখিতেও বার বার একই ভূমিতে সংঘর্ষ ও হানাহানি চালাইতে হইয়াছে। ইহার সঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বড় বড় শহর অবিলম্বে দখলের জন্য যে ব্যাপক ও ভয়াবহ বোমাবর্ষণ ঘটিয়া থাকে, স্ট্যালিনগ্রাদে তাহা পুরা মাত্রায় গোটা মাস ধরিয়া অব্যাহত ছিল। সুতরাং রক্তস্রাবী যুদ্ধ, ব্যাপক ধ্বংসলীলা ও পাইকারী হত্যাকাণ্ডের নিত্য পরিবেষিত সংবাদে ও বিবরণীতে অভ্যস্ত পাঠকের মন স্ট্যালিনগ্রাদের এই অদ্ভুত যুদ্ধের কোন সঠিক ধারণা করিতে পরিবেন না।

মোটামুটি স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধের তিনটা পর্যায় ধরা যাইতে পারে। প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় জার্মান বাহিনী কর্তৃক স্ট্যালিনগ্রাদ অবরোধ—১৫ই সেপ্টেম্বরের পর হইতে মাসের শেষ অবধি রাস্তার লড়াইতে বিব্রত ও বেকায়দায় পতিত নাৎসী সৈন্যদলের অবস্থা। এই অবস্থা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা দিল জার্মান, গোলন্দাজ, যাহারা বোমারুবাহিনীর সহায়তায় গোলা ও বোমা মারিয়া যান্ত্রিক সৈন্যদের জন্য সংকীর্ণ ও খণ্ড রণক্ষেত্রের পথ মুক্ত-করিতে চাহিল। তৃতীয় পর্যায়ে আসিল লালফৌজের পালটা-আক্রমণাত্মক অভিযান। রাশিয়ার পক্ষে কর্নেল জেনারেল এ. আই. জেরেমেঙ্কো ছিলেন সমগ্র স্ট্যালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি এবং ৬২ নং বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ-জেনারেল ভি. আই. চুইকোভ ছিলেন খাস স্ট্যালিনগ্রাদ শহর রক্ষায়। এঁরা দুইজনেই এবং অন্যান্য সেনানীরা অবিনশ্বর ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন।

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে শত্রুবাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া শহরতলীর কাছে অগ্রসর হইল এবং দুই একদিন পরেই জার্মান ও রুমেনীয় সৈন্যদল উত্তর-পশ্চিম শহরতলীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কামানের বিষম গোলাগুলি বর্ষণের আড়াল ধরিয়া তারা কয়েকটি অট্টালিকা দখল করিল। জার্মানরা তখন দাবী করিল যে, নিশ্চিতরূপেই আক্রমণের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছান গিয়াছে। ভল্গা নদীতে রুশ সরবরাহ লাইন এবং বিমানময়দানগুলি ক্রমবর্ধিত আক্রমণের পাল্লায় পড়িল। ইতিপূর্বেই জার্মান বিমানবহর স্ট্যালিনগ্রাদ শহরকে এক এক খণ্ড হিসাবে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। রাস্তায় হাতাহাতি যুদ্ধ চলিল। ১৫ই সেপ্টেম্বর স্ট্যালিনগ্রাদের

উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত অর্ধবৃত্তাকারে জার্মান বেষ্টনী রচিত হইল এবং ফন পাউলাস ক্রমাগত প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া বাধাদান চূর্ণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু জার্মানরা এতক্ষণ তাদের 'খোলা যুদ্ধের রূপ' বজায় রাখিলেও উহা ক্রমশঃ ভিন্ন প্রকৃতি ধরিতে লাগিল। দুর্দান্ত রাস্তার লড়াই ক্রমে ঘন ঘন আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল এবং স্থানগুলি বারবার হাত বদলাইতে লাগিল। উভয় পক্ষেই নূতন সৈন্যের বলবৃদ্ধি ঘটিল, কিন্তু রুশেরা কতকগুলি আধুনিক অট্টালিকা দখল করিল। এই অট্টালিকার ভিতর ও আড়াল হইতে গোলাগুলি চালাইয়া প্রভূত পরিমাণ শত্রু সেন্য নিধন করিতে লাগিল। ১৭ই সেপ্টেম্বর ভোরবেলা জার্মানরা সর্বপ্রথম স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিম শহরতলীতে প্রবেশ করিল এবং এই সমস্ত অট্টালিকায় ও রাস্তায় এমন এক অদ্ভুত ও ভয়াবহ যুদ্ধের অনুষ্ঠান হইল যে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নহে। 'ডেলী টেলিগ্রাফ' (লণ্ডন) পত্রের মিঃ শোলারটন সেই সময় এই সমস্ত হাতাহাতি যুদ্ধের যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহা যেমন বীভৎস, তেমিনই বিভীষিকাপূর্ণ।

'Bodies of men were locked together in rooms, on staircases, and in corridors so closely that it was impossible to use their weapons. Breast to breast they faught with an almost animal fury throughout the day and though it seemed that almost anything might emerge out of such fighting, the defenders managed to throw the attakers back to their starting point in the trenches where they had taken root.*

'ঘরে, সিঁড়িতে, করিডোরে—সর্বত্র গৃহাভ্যন্তরে উভয়ের দেহ পরস্পরের সঙ্গে এমন জড়াইয়া গেল যে, কাহারও পক্ষে অস্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। সারাদিনব্যাপী বুকে বুকে এই সংগ্রাম চলিল পশুর মত উন্মত্ততা লইয়া এবং যদিও মনে হইতেছিল যে এই ধরনের যুদ্ধশেষে যে-কোন ফলাফলই দেখা দিতে পারে, তথাপি আত্মরক্ষাকারীরা আক্রমণকারীদিগকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল সেই সমস্ত পরিখার মধ্যে, যে আশ্রয়স্থল হইতে তারা লড়াই করিতে আসিয়াছিল।'

এভাবে শহরের একাংশ হইতে অন্য অংশে, এক রাস্তা হইতে অন্য রাস্তায় এবং এক অট্টালিকা হইতে অন্য অট্টালিকায় কিংবা এক ঘর হইতে অন্য ঘরে বা সিঁড়িতে ও ছাদে অতি অভিনব এবং বিহ্বলকর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। জার্মানরা যেমন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নগরীর পতন আশা করিতেছিল, রুশেরা তেমিনই স্ট্যালিনগ্রাদের অবস্থা 'ভয়াবহ' তবে 'হতাশার নয়' বলিয়া বর্ণনা করিতেছিল। এই সময় রুশেরা নূতন সৈন্যবল বৃদ্ধি করিল এবং শক্তিশালী ট্যাঙ্ক ও বিমানবহরের সহায়তায় ডন ও ভল্গা নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় কিছু কিছু পালটা-আক্রমণ চালাইল। স্ট্যালিনগ্রাদ হইতে উত্তর-পশ্চিমে ডনের বাঁকের উত্তর-পূর্ব কোণের ক্যাচালিনস্ক হইতে ডুবোভকা শহরের নিচে ভল্গা নদী পর্যন্ত এই আক্রমণের লাইন ছিল। জার্মানরা প্রথমে এই আক্রমণ উপেক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু পরে তারা এর বিরুদ্ধে পালটা-আঘাত হানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। এদিকে ২১শে ও ২২শে সেপ্টেম্বর রাস্তার লড়াই অবিশ্রান্তভাবে চলিতে লাগিল, শ্রমজীবী মহল হইতে নূতন লোক আসিয়া রণাঙ্গনে যোগ দিল এবং রাত্রির অন্ধকারে ভল্গা নদীর ওপার হইতে সৈন্য ও সরবরাহ আসিতে লাগিল। বলা বাহুল্য

* 'The tide Turns'—by Ttrategicus.

যে, নিদারুণ বাধা বিপত্তি ও অসুবিধার মধ্য দিয়াই এগুলি ঘটিতে লাগিল। শহরের উত্তর-পশ্চিম কারখানা অঞ্চল হইতে শত্রু মধ্যভাগে প্রবেশের চেষ্টা করিল। ২২শে তারিখ ২০০ ট্যাঙ্ক ও পদাতিক সৈন্য লইয়া জার্মনরা এক বিষম 'ধাক্কা' দিল। কিন্তু দুর্ধর্ষ রুশ সৈন্যরা ট্যাঙ্কগুলি রাজপথে অকেজো করিয়া দিল মারাত্মক 'আগুনে বোতল' ছুঁড়িয়া ও গোলাগুলির দ্বারা। তথাপি শত্রু তার চেষ্টায় ক্ষান্ত দিল না, বরং সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে দ্বিগুণ শক্তিতে আক্রমণ চালাইল। এই সময় স্ট্যালিনগ্রাদের 'নাভিশ্বাস' উপস্থিত হইল এবং রুশরা পর্যন্ত মনে করিয়াছিল যে, শহরের পতন হইয়া গিয়াছে! অন্যদিকে জার্মানদের বামপার্শ্বে বা উত্তর-পশ্চিমে জোর প্রত্যাক্রমণ চলিল বটে, কিন্তু নাৎসী বেষ্টনী ভাঙ্গিতে পারিল না। কেননা এখানে জার্মানরা তাদের স্বভাবসিদ্ধ দ্রুততাসহকারে আত্মরক্ষার অত্যন্ত শক্ত প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছিল। তখন রুশরা আবার স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণ-পূর্বে ভল্গা নদীর 'নৌবহরের' সাহায্যে আর-একবার পালটা-আক্রমণ করিল। এখানকার ঘাঁটিগুলি হইতে জার্মানরা ভল্গা নদীর পণ্টুন সেতু, যোগানদার ফেরী-স্টীমারগুলি ও অন্যান্য যানবাহনকে নিরন্তর বিপন্ন করিতেছিল। পালটা-আক্রমণের দ্বারা এই ঘাঁটিগুলির উদ্ধার করা হইল।

কিন্তু সেপ্টেম্বরের শেষ কয়দিনে অবস্থা আরও সাংঘাতিক ও সঙ্কটজনক হইল। উত্তর-পশ্চিম শহরতলীতে জার্মানরা যে কীলক বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহা ক্রমশ চওড়া ও স্ফীত হইল এবং ২৮শে তারিখ জার্মানরা শ্রমজীবীদের কতকগুলি বাসগৃহ এবং বিখ্যাত 'রেড অক্টোবর কারখানা' যাহা স্ট্যালিনগ্রাদের গৌরব, দখল করিয়া লইল। শহরের অভ্যন্তরে সেই হতবুদ্ধিকর রাস্তার লড়াইয়ের কোন ক্ষান্তি ছিল না। ফলে, এই যুদ্ধের চেহারা ও চরিত্র বদলাইয়া গেল—যেখানে সৈন্যের চেয়ে সংগ্রামী এবং বাহিনীর চেয়ে ব্যক্তি বিশেষ শ্রেষ্ঠতা অর্জন করিল।

'The fighting had now developed into the confusion of street-battles in which the fighter was superior to the soldier and the indi vidual to the army. The outlook was critical…'*

তথাপি কী আশ্চর্য, শহর ধ্বংস হইয়া গেল, কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদ আত্মসমর্পণ করিল না! সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে অব্যাহত ধারায় যুদ্ধ চলিল। কিন্তু এই সময় রাশিয়ার অবস্থা সত্য সত্যই নিদারুণ হইল। মিঃ ওয়েণ্ডেল উইলকি, যিনি মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত দূতরূপে পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি মস্কো পরিদর্শনের পর রাশিয়ার অবস্থা সম্পর্কে এক মর্মান্তিক চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিলেন। মিঃ উইলকি রুশ নেতাদের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁর বক্তব্য আন্তর্জাতিক জগতে গভীর রেখাপাত করিল। এই সময় গত ১৫ মাসের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলিলেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সমগ্র জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বা ৮ কোটি লোক জার্মান অধিকৃত এলাকায় দাসজীবন যাপন করিতেছে। লালফৌজের দৈনিক গড়পড়তা ১০ হাজার করিয়া সৈন্য নষ্ট হইতেছে। রাশিয়ার খাদ্যের অভাবও অত্যন্ত গুরুতর, আগামী শীতে উহা আরও মারাত্মক হইবে। জ্বালানীর অবস্থাও অনুরূপ ভয়াবহ। জনসাধারণের বস্ত্র নাই বলিলেই চলে এবং

* পূর্বোক্ত পুস্তক।

কতকগুলি প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রেরও একান্ত অভাব। রাশিয়ার এই সাংঘাতিক অবস্থার বর্ণনায় পৃথিবীর ফ্যাসিস্টবিরোধী মহলে গভীর সহানুভূতির উদ্রেক হইল এবং মিত্র-পক্ষের উপর দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিবার চাপ বৃদ্ধি পাইল এবং ইহা লইয়া প্রকাশ্যে আন্দোলনও হইল। এই প্রসঙ্গে মার্শাল টিমোশেংকোর সেই বিখ্যাত খেদোক্তি (১৯৪২, মে) স্মরণীয়—

'I am fighting not the German Army, but the industrial output of the whole Europe!'

'আমি কেবল জার্মান সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধেই লড়িতেছি না, কিন্তু সমগ্র ইউরোপের সমস্ত কলকারখানার উৎপাদনের বিরুদ্ধেও লড়িতেছি!' সুতরাং সোভিয়েট রাশিয়ার অবস্থা যে নিতান্ত শোচনীয় ছিল তাতে সন্দেহ নাই।

'স্ট্যালিনগ্রাদ দখল হইবেই'

৩০শে সেপ্টেম্বর হিটলার নাৎসী পার্টির 'শীতের সাহায্যাভিযান' উদ্বোধন-সভায় মিত্রপক্ষের দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জল্পনা-কল্পনাকে নিতান্ত বিদ্রূপাত্মক ভাষায় ঠাট্টা করিয়া ঘোষণা করেন,

'Stalingrad will be taken, you may be sure of that.'

'স্ট্যালিনগ্রাদ দখল হইবেই, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারো।' সামরিক ইতিহাসে কথাটা স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, কেননা উহা সফল হয় নাই বলিয়া। রাশিয়া নিদারুণ সংকটে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু আত্মরক্ষার দৃঢ়তা তার কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই। এই অবস্থায় পৃথিবীর অন্য কোন শক্তি পড়িলে, তার কি দশা হইত বলা কঠিন। কিন্তু সাম্যবাদের বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত এবং দেশপ্রেমের অভুতপূর্ব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ রাশিয়ার সৈন্য, জনসাধারণ ও রাষ্ট্র অমানুষিক ধৈর্য, সাহসিকতা এবং রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিতে লাগিল। সেপ্টেম্বরের পরেও যুদ্ধের শক্তি অব্যাহত ধারায় চলিল। তথাপি প্রতি মুহূর্তে যে চূড়ান্ত জয় জার্মানরা আশা করিতেছিল তাহা আসিল না। তখন হিটলার ও সেনানীমণ্ডলীর শিবিরে অসন্তোষ গুঞ্জরিত হইতে লাগিল এবং সম্ভবত এই অসন্তোষের ফলেই দক্ষিণ রাশিয়ার অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল ফন বোক অসুস্থতার অজুহাতে পদচ্যুত হইলেন, কিংবা তিনি পদত্যাগ করিয়া বার্লিনের 'স্বাস্থ্যকর হাওয়ায়' চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্থলে আসিলেন সমগ্র স্ট্যালিনগ্রাদ এলাকার ভারপ্রাপ্তরূপে জেনারেল ফন হথ এবং দক্ষিণ রাশিয়ার বাকি অংশের অধিনায়করূপে ফিল্ড মার্শাল ফন লিস্ট। লিস্টের উপর ককেশাস রণক্ষেত্রেরও ভার পড়িল, কেননা এই দুই রণাঙ্গন অনেকটা যুক্ত ছিল। আরও বিশেষত ফিল্ড মার্শাল লিস্ট ইতিপূর্বে পোল্যাণ্ড অভিযানে কার্পেথিয়ান বাহিনীর অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন, পরে গ্রীসের যুদ্ধেও সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সুতরাং পার্বত্য যুদ্ধবিদ্যায় তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া মনে করা হইতেছিল। অতএব আসন্ন শীতে ককেশাসের দুর্গম পার্বত্য এলাকায়ও তাঁকে উপযুক্ত সেনাপতি বলিয়া বিবেচনা করা হইল।

এভাবে সেনাপতি পরিবর্তনের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ সন্তোষজনকভাবে চলিতেছিল না। জার্মান সামরিক চিন্তাধারা ও পদ্ধতির সহিত এই বিচিত্র যুদ্ধ যেন খাপ খাইতেছে না। কোথায় উন্মুক্ত প্রান্তরে ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়ী,

কামান ও বিমানের মহড়ায় যান্ত্রিক সৈন্যদল সমস্ত ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া অগ্রসর হইবে এবং বেষ্টন কৌশলে সাঁড়াশীর-পর-সাঁড়াশীর চাপ দিয়া শত্রুব্যূহ ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবে! আর কোথায় বা স্ট্যালিনগ্রাদের অলিতে, গলিতে, রাস্তায়, ভাঙ্গা বাড়ীতে, দেয়ালে ও ছাদে 'বুকে-বন্দুকে' ঠোকাঠুকি করিয়া মরিতে হইতেছে! 'অপরাজেয়' নাৎসীবাহিনী এমন 'অভদ্র যুদ্ধে' অভ্যস্ত নহে। তথাপি স্ট্যালিনগ্রাদ জয় করিতেই হইবে, কেননা উহা এক্ষণে 'ফুরারের' এবং জার্মান হাইকম্যাণ্ডের 'প্রেস্টিজের' প্রশ্ন। এই সময় মার্শাল গোয়েরিং তাঁর নিজের সংবাদপত্রে Essener National Zeitung লিখিলেন, "রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ও অধীর আগ্রহে সৈন্যবাহিনী এবং জনসাধারণ দিনের-পর-দিন তাঁদের মুগ্ধদৃষ্টি একটি স্থানের উপর নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—এই স্থানটির নাম স্ট্যালিনগ্রাদ। ডন নদী অধ্যুষিত সমতল ভূমির মধ্য দিয়া ক্যালাচের পশ্চিমদিকে বিখ্যাত ডনের বাঁকে অগ্রগতি, তারপর ব্যূহভেদ, নদী অতিক্রম এবং রস্টোভ বন্দর ঘুরিয়া গিয়া চক্রাকারে বৃহৎ আবর্তন ও বেষ্টনজাল—এই সমস্তেরই একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্ট্যালিনগ্রাদ! জয়মাল্য অর্জন করিতেই হইবে, বাস্তবিক সেই জয় সুনিশ্চিতও হইয়াছে। এই জয়ের জন্য যত অধিক মূল্য আমরা দিব, ততই বেশী হইবে এবং ঘনাইয়া আসিবে সোভিয়েটের সামগ্রিক ধ্বংস। প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা আমরা স্ট্যালিনগ্রাদ সৌধমালার মর্মকেন্দ্রে পৌঁছিয়াছি। এক্ষণে আত্মরক্ষাকারীরা কেবল-মাত্র এই নগরীর বিশালতা ও উহার দীর্ঘায়তনের বৈশিষ্ট্যের জন্য শহরে আঁকড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে পারে। রুশ আত্মরক্ষার এলাকা ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং জার্মান সৈন্যদের শ্রেষ্ঠতা এক্ষণে তাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের উপর ক্রমবর্ধমান শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে পারে। সর্বোপরি আক্রমণের যে অদমনীয় ইচ্ছাশক্তি প্রত্যেকটি জার্মান পদাতিক ও পথপরিষ্কারককে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে, উহার উপরেও তারা সর্বদাই নির্ভর করিতে পারে।"

জার্মান সমর শক্তির এই বাহ্বাস্ফোট সত্ত্বেও সেপ্টেম্বর পার হইয়া অক্টোবর দেখা দিল। আর সেই সঙ্গে দেখা দিল শীতের পূর্বাভাষ—যাহা লালফৌজের মতই নির্মম। ওদিকে উত্তরে ও দক্ষিণে পালটা-আক্রমণের শক্তি ধীরে সঞ্চিত হইতেছিল, যদিও নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের পূর্বে তাহা বিপজ্জনক রূপ ধারণ করে নাই। তথাপি জার্মান জেনারেল স্টাফ বা সেনানীমণ্ডলী উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন এবং ইহার বিশেষ কারণ ছিল দুইটি। প্রথমত আসন্ন শীতপর্বে সৈন্যদলের জন্য উপযুক্ত আশ্রয়স্থানের সন্ধান এবং দ্বিতীয়ত জার্মানী যে বিশাল ভূখণ্ড জয় করিয়াছে, উহার সর্বত্র সৈন্যবলের মিতব্যয়িতা সম্ঘটন। উত্তরে বাল্টিক সমুদ্র হইতে দক্ষিণে ককেশাসের গ্রোজনি তৈলখনি এবং সেখান হইতে আবার কৃষ্ণ সাগরের তীর পর্যন্ত বিরাট এলাকায় সৈন্যবলের সংরক্ষণ—এই রণভূমির সীমা প্রায় ২ হাজার মাইল! সুতরাং সমস্যাটা আদৌ সহজ ছিল না।···

হিটলার ও তাঁর জেনারেলগণ দমিবার পাত্র নহেন। স্ট্যালিনগ্রাদ দখলের নেশায় তাঁরা যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেলেন। সুতরাং অক্টোবর মাস ধরিয়া আবার জার্মান সৈন্যেরা মরণপণ যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু এই আক্রমণগুলি সমতল ভূমির মত ব্যাপক আকারে করা সম্ভব ছিল না, ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের রাস্তায় ও খণ্ডিত অংশগুলিতেই ইহা সীমাবদ্ধ ছিল এবং কখনও দুই ডিভিসন, কখনও এক ডিভিসন বা তারও

কমসংখ্যক পদাতিক ১০০ বা ৫০টি ট্যাংক লইয়া সংকীর্ণ রুশব্যূহ ভেদ করিতে চাহিল। প্রধানত শহরের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের শ্রমজীবীদের বসতি এবং কারখানা এলাকাতেই এই সমস্ত আক্রমণ কেন্দ্রীভূত ছিল। কখনও ১০০ গজ, কিংবা ২।৩ শত গজের জন্য এই তীব্র দ্বন্দ্ব অনুষ্ঠিত হইতেছিল এবং এই সামান্য স্থানগুলিও বারবার হাতবদলের দ্বারা জয়-পরাজয়ের মধ্যে উঠানামা করিতেছিল। ইতিমধ্যে বার্লিন রেডিও ৯ই অক্টোবর তারিখ ঘোষণা করিল—

'—The final reduction of Stalingrad could hence forward be left to the care of the German heavy artillery and that no further infantry would be sacrificed to achieve that end.'

সহজ কথায় স্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধের উপসংহারের দায়িত্ব এখন হইতে জার্মান গোলন্দাজদের উপর অর্পিত হইল, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আর কোন পদাতিক বাহিনীকে বলি দেওয়া হইবে না। যদিও এই ঘোষণা পুরোপুরি পালিত হয় নাই, তথাপি এই কথা সত্য যে, অক্টোবর-নভেম্বরের যুদ্ধে পদাতিক ও যান্ত্রিক বাহিনী অপেক্ষা গোলন্দাজ ও বিমানবাহিনীই প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। শহর-যুদ্ধে রণক্ষেত্রের অভিনব বৈশিষ্ট্যের জন্য সেপ্টেম্বর মাসে রাস্তায় রাস্তায় লড়িয়া জার্মান হাইকম্যান্ড অক্টোবরে রণকৌশলের এই পরিবর্তন সাধন করিলেন এবং ইহাকে স্ট্যালিনগ্রাদ অবরোধ যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় বলা যাইতে পারে। সম্মুখ যুদ্ধে, হাতাহাতিতে ও বুকে-বন্দুকে যাহা সম্ভব হইল না, ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর ও অট্টালিকাকে বৃহৎ কামানের গোলা ও অতি-বিস্ফোরক বোমার সাহায্যে গুঁড়াগুঁড়া করিয়া সফল করিবার চেষ্টা হইল। আধুনিকতম কংক্রীটে তৈরী যে কারখানাগুলি অন্যান্য দেশে ভূমিকম্পের আলোড়নেও নষ্ট হয় নাই, স্ট্যালিনগ্রাদে সেগুলি জার্মান গোলার আঘাতে ভাঙিয়া গেল, যদিও উহার কাঠামোগুলি দাঁড়াইয়া রহিল, বড় বড় জানোয়ারের কঙ্কালের মত। আবার এইগুলির আড়াল ধরিয়া লালফৌজ শত্রুসৈন্যদিগকে নিপাত করিতে লাগিল।

শেষ পর্যন্ত স্ট্যালিনগ্রাদের 'নগররক্ষীরা' তাড়িত হইতে হইতে একেবারে ভল্গা নদীর ধারে নীত হইল। আবর্জনা ও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তারা একটা সংকীর্ণ রেখায় গিয়া দাঁড়াইল। এখানে বহু খাদ, গহ্বর ও ভূগর্ভের কেল্লা হইতে তারা শেষ আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালাইল। ভল্গা নদী হইতে তাদের এই আত্মরক্ষার লাইন মাত্র একশত হইতে এক হাজার গজের মধ্যে ছিল। তিনদিকে বেষ্টিত হইয়া এবং দুই মাইল চওড়া নদীর দিকে পৃষ্ঠ দিয়া এমন বিস্ময়কর সংগ্রাম লালফৌজ ছাড়া আর কে করিতে পারিয়াছে?

১৬ ডিভিসন সৈন্য লইয়া যে ৬২নং রুশবাহিনী গঠিত ছিল, তারাই স্ট্যালিনগ্রাদে আত্মরক্ষার যুদ্ধ চালাইল। যে ১৬ মাইল দীর্ঘ বেষ্টনী রচিত হইয়াছিল উহার প্রত্যেক মাইলে এক ডিভিসন করিয়া রুশ সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছিল এবং ইহার মধ্যে ৬ ডিভিসন ছিল লালফৌজের উৎকৃষ্টতম যোদ্ধা। কিন্তু এই যুদ্ধ কিরূপ ধ্বংসকর হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইবে এই কথা উল্লেখ করিলে যে, ১০ হাজার সৈন্য লইয়া গঠিত ৭০নং ডিভিসনের (অধিনায়ক জেনারেল আইভ্যান লুডিনিকোভ) মাত্র ৮ শত সৈন্য রক্ষা পাইয়াছিল! শহরের উত্তরে ভুবোভ্‌কা এলাকা ধরিয়া জার্মানরা

ভল্গা নদীর ৫ মাইল দীর্ঘ তীর দখল করিয়াছিল। কিন্তু বাকীটা এবং পূর্ব তীরের সম্পূর্ণই ছিল রুশদের দখলে, যেখান হইতে তারা কামান ও বিমানঘাঁটির সাহায্যে এবং নদী-নৌ-বহরের দ্বারা জার্মানদের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখিয়াছিল।

অক্টোবরের পর নভেম্বরেও সেই একই খেলার পুনরাবৃত্তি হইল। এই মাসের গোড়ার দিকে এবং ১২ই নভেম্বর আবার স্ট্যালিনগ্রাদের শ্মশানে নাৎসী জয় পতাকা উড়াইবার চেষ্টা হইল। সেই রাস্তায়, গৃহে গৃহে এবং কয়েক গজ পরিমিত স্থানের জন্য আসুরিক চেষ্টা। একবার একটি নাৎসী দল প্রায় ভল্গা নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু আবার তারা পিছু হটিতে বাধ্য হইল। স্ট্যালিনগ্রাদ দখলের সেই ছিল চরম চেষ্টা, তারপর আর শহরে তেমন গুরুতর আক্রমণ ঘটে নাই। ১২ সপ্তাহের অধিককাল আধুনিক যুদ্ধের সর্বপ্রকার মারণাস্ত্র লইয়াই জার্মান বাহিনী চূড়ান্ত চেষ্টা করিল। তবু এই মায়াবী শহর 'আকাশের চাঁদের মতই' (জনৈক জার্মান অফিসারের মন্তব্য অনুসারে) কাছে থাকিয়াও দূরে রহিয়া গেল!

৮ই নভেম্বর নাৎসী পার্টির বার্ষিক উৎসবে হিটলার তাঁর বক্তৃতায় বলিলেন যে, 'স্ট্যালিনগ্রাদের আর কোন গুরুত্ব নাই। ওখানে জার্মানীরই জয় হইয়াছে এবং ভল্গা নদীর যোগাযোগ ও সরবরাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তবু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, স্ট্যালিনগ্রাদের বাকিটুকু আমরা অবিলম্বেই দখল করি না কেন? তার উত্তরে আমি বলিব যে, ওটা দ্বিতীয় ভার্দুনের উপযোগী নয়। লোকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, কেন স্ট্যালিনগ্রাদ দখলে এত দেরী হইতেছে? আমাদের দেরী হওয়ার কারণ এই যে, আমরা আর পাইকারী নরহত্যা চাই না। অনেক রক্ত বহিয়া গিয়াছে এবং এখনও যাইতেছে।'

'If anybody asks why we do not immediately take the remaining strong points held by the enemy in Stalingard, I reply because they are not worth a second Verdun, People say, why are we taking so long over Stalingrad ¿ We are taking so long because we do not want mass murder. Enough blood is flowing as it is.'

পাইকারী নরহত্যায় হিটলারের অরুচি, কাজেই স্ট্যালিনগ্রাদ দখলে এত বিলম্ব! জার্মান ফুয়ারের এবং দিগ্বিজয়-বিলাসী হিটলারের এই আকস্মিক 'অহিংস' মনোভাবই কি সামরিক ব্যর্থতার পূর্বাভাষ ছিল না?

নরহত্যা পাইকারী হারেই ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। তিনি নিজেই সেই বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন যে, ৩ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। তাঁর নিজের মুখের স্বীকারোক্তি এবং তাহা ১৬ মাসের যুদ্ধের ফলাফল। আর ১৯৪১ সালের ১২ই ডিসেম্বর তিনি বলিয়াছিলেন যে, তখন পর্যন্ত সমগ্র যুদ্ধে মাত্র ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৩১৪ জন জার্মান সৈন্য নিহত হইয়াছে। সুতরাং তফাৎটা লক্ষ্য করিবার মত। অন্যদিকে রুশ পক্ষ অনুমান করিতেছেন যে, একমাত্র স্ট্যালিনগ্রাদ শহরে প্রথম মাসের যুদ্ধে প্রথম দশ দিনে ৪০ হাজার এবং তার পরের দশ দিনে অনুমান ৩০ হাজার —একুনে ৭০ হাজার জার্মান সৈন্য নিহত হইয়াছে। যুদ্ধের গতির সঙ্গে সঙ্গে এই মৃত্যুহার আরও বাড়িতে থাকে এবং ২০শে নভেম্বরের মধ্যে (লালফৌজের পাল্টা-আক্রমণের সন্ধিক্ষণ) বোধ হয় দুই লক্ষ জার্মান সৈন্য সাবাড় হইয়াছে এবং দৈনিক

গড়পড়তা একমাত্র নিহতের সংখ্যা ৪ হইতে ৫ হাজারের মধ্যে ছিল। আর রাশিয়ার নিজেরও হত ও আহত লইয়া দৈনিক বিনষ্ট সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৬ হাজার।

তবু স্ট্যালিনগ্রাদ অজেয় রহিয়া গেল। পুঞ্জীভূত শহরের আবর্জনা, চূর্ণীকৃত অট্টালিকা এবং পর্বতপ্রমাণ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে লেঃ-জেনারেল চুইকোভের ৬২নং বাহিনী এবং মেজর জেনারেল রোডিমস্টেভের ১৩নং গার্ডস ডিভিসন পৃথিবীর ইতিহাসের
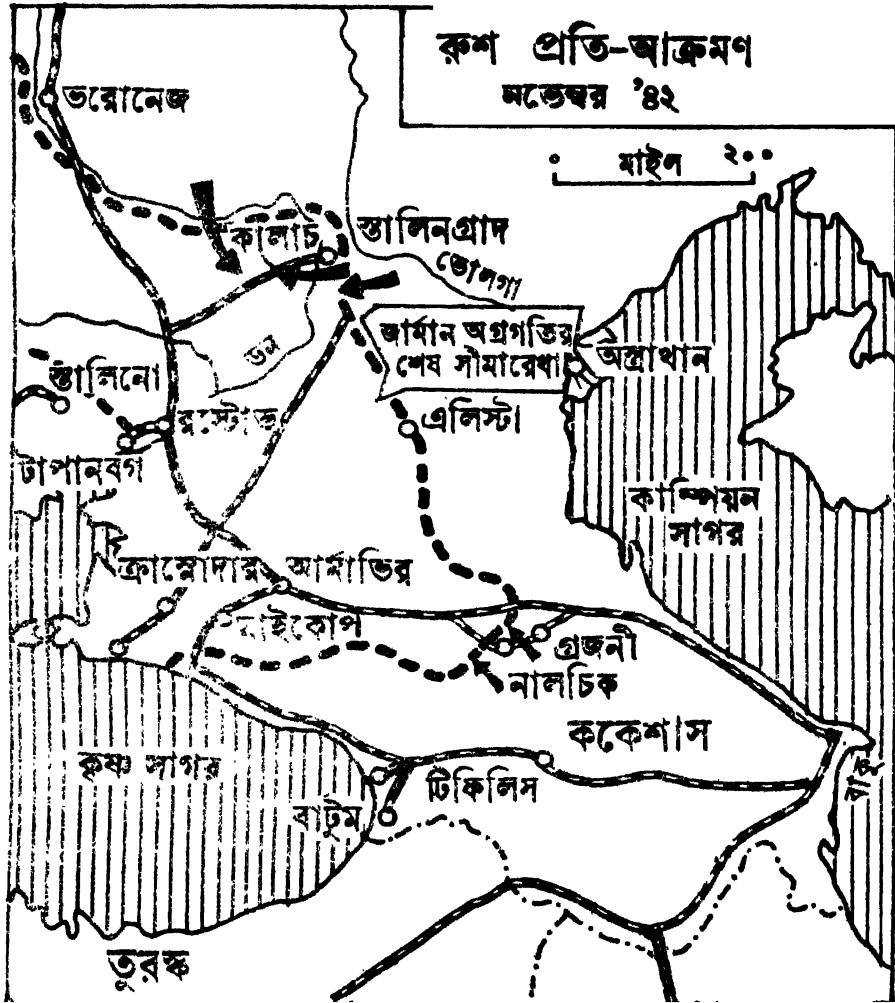
অসাধ্য সাধন করিল। এই অভিনব শহর-যুদ্ধে শত্রু ও মিত্র পরস্পরের প্রায় কণ্ঠলগ্ন ছিল এবং ইচ্ছা করিলে সময় সময় পরস্পরের গলার শব্দও শুনিতে পাইতেন ও সৈন্যদের প্রতি চীৎকার করিয়া আদেশ জারি করিতে পারিতেন। স্ট্যালিনগ্রাদ সামরিক ইতিহাসের ইন্দ্রজাল, তথাপি ইহা গল্প নহে, একান্ত নিষ্ঠুর সত্য।*

* রুশ-জার্মান সংগ্রাম—১৯৪৭।

দশম অধ্যায়

স্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধের আরও কাহিনী

স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ চলিবার সময় পৃথিবীর চারিদিকে সর্বত্র শত্রু-মিত্র মহলে অসাধারণ উত্তেজনা, অপরিমিত কৌতূহল এবং অসম্ভব ঔৎসুক্য জাগ্রত করিয়াছিল। স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও উইনস্টোন চার্চিল কিংবা জেনারেলিজিমো চিয়াং কাইসেক থেকে শুরু করিয়া আমেরিকায়, ইউরোপে, আফ্রিকায়, মধ্যপ্রাচ্যে, মহাচীনে, জাপানে ও ভারতবর্ষের শহরগুলিতে—বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা ইত্যাদিতে—নিদারুণ আগ্রহের সৃষ্টি হইল এবং সর্বত্র সোভিয়েটের প্রতি সহানুভূতিতে ও প্রশংসায় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জনসমাজ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উদ্যোগে বহু জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই সমস্ত সভায় সোভিয়েট রাশিয়ার সমর্থনে মিত্রশক্তিবর্গের নিকট দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার দাবী করা হইয়াছিল।

স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ একটা চূড়ান্ত পর্বের মত এবং স্বভাবতঃই বহু পুস্তক, কাহিনী ও ইতিবৃত্ত এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়াতে স্বদেশরক্ষার এই মহান যুদ্ধ স্বভাবতঃই এক বিরাট সাহিত্যের জন্ম দিয়াছে। অজস্র কবিতা, গান, কাহিনী, গল্প, উপন্যাস, নাটক, চিত্রকলা, রেখাচিত্র ও চলচ্চিত্রে—এই মহাযুদ্ধ অমর হইয়া রহিয়াছে। এর মধ্যে আবার স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ গৌরবে শীর্ষস্থান দখল করিয়াছে। বহু সোভিয়েট সেনাপতি ও সৈন্য এই যুদ্ধে অপরিমিত বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও রণকৌশলের অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য অক্ষয়কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই স্মৃতিকথা ও যুদ্ধের যে সমস্ত কাহিনী রচনা করিয়াছেন, সেগুলি যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান। স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ এত বিপুল, বিরাট ও বিচিত্র যে, যাঁরা এই সমস্ত স্মৃতিকথা রচনা করিয়াছেন,—যেমন, মার্শাল ভ্যাসিলি আইভানোভিচ চুইকোভ, মার্শাল এ. এম. ভাসিলিভস্কি, গোলন্দাজবাহিনীর প্রধান মার্শাল এন. এন. ভরোনোভ, মার্শাল এ. আই. জেরেমেংকো, এয়ার-মার্শাল এস. আই. রুডেংকো, আর্মি-জেনারেল পি. আই. ব্যাটোভ, কর্নেল-জেনারেল এ. আই. রোডিমৎসেভ, কর্নেল-জেনারেল আই. আই. লায়ুডনিকোভ, কর্নেল-জেনারেল এম. এস. সুমিলোভপ্রমুখ বীর নায়কদের মধ্যে মাত্র সামান্য কয়েকজনের লেখাই এখানে প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যাইতে পারে। এঁদের মধ্যে আবার মার্শাল ভি. আই. চুইকোভের রচনাই পৃথিবীর সর্বত্র সর্বাধিক প্রচারিত হইয়াছে এবং জার্মান, আমেরিকান ও বৃটিশ প্রভৃতি সামরিক ঐতিহাসিকগণের অনেকেই চুইকোভের বই থেকে স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধের অপূর্ব বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে যে ৬২নং ও ৬৪নং আর্মি উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন, জেনারেল চুইকোভ ও জেনারেল জেরোমেঙ্কো ছিলেন—যথাক্রমে সেই দুই বাহিনীর প্রধান নায়ক এবং এই দুই বাহিনীর প্রথমটি স্ট্যালিনগ্রাদের অভ্যন্তরে ও দ্বিতীয়টি স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণে সমস্ত অমানুষিক যুদ্ধের ধকল যেন বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জেনারেল চুইকোভ জুলাই মাসের গোড়াতেই ডন-ভলগা রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছিলেন।*

সেই সময় তিনি রণাঙ্গনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, পরিস্থিতি খুব খারাপ এবং সৈন্য ও সেনাপতিদের নৈতিক বলও ভালো নয়। তবে, ক্রমে ক্রমে ডন ও ভলগার মধ্যবর্তী যুদ্ধগুলিতে জনগণের সাহস ও নৈতিক বল বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সৈন্যদের মধ্যে অকাতরে প্রাণ বিসর্জনের দৃষ্টান্তও দেখা দিতে থাকে।

২৮শে জুলাই রস্টোভের পতনের পর সমগ্র রণাঙ্গনে বিপদের সংকেত পাওয়া গেল এবং ৩০শে জুলাই সুপ্রীম কমান্ডার স্ট্যালিন সমস্ত সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে এক নির্দেশ জারী করিয়া হুকুম দিলেন—'Not a step back'—আর এক পা কিছু হটা চলিবে না। রাশিয়ার মহান স্বদেশাত্মক যুদ্ধে এই হুকুমনামা স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। দেশ ও জাতির বিপদের দিকে তাকাইয়া সেদিনই 'প্রাভদা' পত্রিকায় উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় লেখা হইল :

'Iron discipline and a steady nerve are the conditions of our victory, Soviet Soldiers ! Not a step back'—such is the call of your country···

'Every soldier must be ready to die the death of a hero rather than neglect his duty to the country.'

'—যুদ্ধ জয়ের জন্য চাই লোহের মত কঠিন নিয়মশৃংখলা এবং মজবুত স্নায়ুমণ্ডলী, "সোভিয়েট সৈন্যবৃন্দ ! আর এক পা পিছু হটা চলিবে না।"—তোমাদের মাতৃভূমি তোমাদের প্রতি এই আহ্বান জানাইতেছে।'

'দেশের প্রতি দায়িত্বপালনে উপেক্ষা করার চেয়ে প্রত্যেক সৈন্যকেই বীরের মত মৃত্যুবরণে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।'

'প্রাভদা'র সম্পাদকীয়তে লেনিনকে স্মরণ করিয়া লেখা হইল :

গৃহযুদ্ধের সময় লেনিন বলিতেন—যে ব্যক্তি লালফৌজকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে না এবং কঠিন নিয়মশৃংখলা ও হুকুম মানে না, সেই ব্যক্তি হইতেছে বিশ্বাসঘাতক।

'অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে স্ট্যালিন বলিয়াছিলেন—"হয় আমাদের একটি কঠিন নিয়মশৃংখলাপূর্ণ সৈনাবাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে, অন্যথা আমরা মারা পড়িব।" আজ অফিসারের হুকুম হইতেছে কঠিন আইনের মত।'

* জেনারেল চুইকোভ রুশ-জার্মান যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় চুংকিংয়ে সোভিয়েট দূতাবাসের মিলিটারী এ্যাটাশে ও চিয়াং কাইসেকের প্রধান সামরিক উপদেষ্টা ছিলেন। সেখানে তিনি বৃটিশ, মার্কিন ও চীনা মহলে জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার জন্য রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব দেখেন নাই, বরং রাশিয়ার পরাজয়ের সংবাদে চাপা আনন্দ লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি চুংকিং থেকে ১৯৪২-এর মার্চে মস্কোতে ফিরিয়া আসেন। —লেখক।

সৈন্যবাহিনীর মুখপত্র 'রেড স্টার' এর চেয়েও কঠোর ভাষায় লিখিল—

'যে ব্যক্তি নির্দেশ ও, নিয়মশৃংখলা মানে না, সে হইতেছে বিশ্বাসঘাতক এবং তাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে ও নিশ্চিতরূপেই ধ্বংস করিতে হইবে।'

এই সমস্ত নির্দেশ ও হুকুমনামা এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ভাষা থেকে বুঝা যাইতেছে, জুলাই ও আগস্ট মাসে রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি কিরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে যখন জার্মানবাহিনী ভলগা ও শহরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন ৭ই আগস্ট দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রন্টের সদর দপ্তর এক মর্মস্পর্শী আবেদন প্রচার করিলেন। যে সমস্ত রুশ, উক্রাইনীয়, বাইলোরুশীয়ান, জর্জিয়ান, আজারবাইজানীয়ান প্রভৃতি সোভিয়েট রাশিয়ার বহু জাতি অধিজাতির সৈন্যেরা স্ট্যালিনগ্রাদ রক্ষায় সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁদের দেশাত্মবোধের উদ্দেশ্যে আবেদন করিয়া বলা হইল মাতৃভূমির প্রতি ইঞ্চি জমি বুকের রক্ত দিয়া রক্ষা করার জন্য :

'Let the beginning of the end of nazism be initiated right here at Stalingrad by us, so that it should be said that each one of us took part in the great battle of Stalingrad. Not a step back ! that is the order of the Supreme Commander-in-Chief and of our country.'

কিন্তু এই সমস্ত অপূর্ব উদ্দীপনাপূর্ণ নির্দেশ ও আবেদন সত্বেও জার্মানসৈন্যেরা লালফৌজের বাধা অতিক্রম করিয়া আগাইয়া চলিল। ২৩শে আগস্ট তারা উত্তরদিক দিয়া স্ট্যালিনগ্রাদে ভলগার তীরে পৌঁছিল এবং গর্বিত হিটলার জার্মানবাহিনীকে হুকুম দিলেন যে, ২৫শে আগস্ট তারিখ স্ট্যালিনগ্রাদ দখল করিতেই হইবে! সুতরাং জার্মান সৈন্যদের চাপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং রুশসৈন্যদলের প্রবল বাধাদান সত্বেও তাদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করা গেল না। তখন ৬২নং বাহিনী শহরের উত্তর দিকে এবং ৬৪নং বাহিনী দক্ষিণ দিকে হিটলারী সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়িতেছিল।

মার্শাল চুইকোভ লিখিয়াছেন যে, জার্মানদের সেই প্রবল চাপের মুখে ৬২নং ও ৬৪নং বাহিনীদ্বয় স্ট্যালিনগ্রাদের অভ্যন্তরে পিছু হটিয়া তাদের চূড়ান্ত 'পজিশন' নিতেছিল। কিন্তু সমস্ত রাস্তাঘাট আশ্রয়প্রার্থী বা রিফিউজীর দ্বারা ছাইয়া গিয়াছিল। যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার থেকে দলে দলে চাষীরা তাঁদের পরিবার এবং গৃহপালিত জীবজন্তুসহ, অনেকে আবার চাষের যন্ত্রপাতিসহ, স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। ওঁরা সকলেই ভলগা নদীর ধারে ফেরীঘাটে ভিড় করিতেছিলেন।

আর ভলগার পূর্ব তীরে তখন কি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল? চুইকোভ বলিতেছেন—তখন ভলগার জলে মাঝে মাঝে জার্মানদের নিক্ষিপ্ত গোলা বর্ষিত হইতেছিল। তবে, সেটা তেমন বিপজ্জনক ছিল না। কিন্তু জাহাজঘাটায় বহু লোকের ভিড় ছিল। ট্রেঞ্চ ও বোমার খাদ থেকে আহতদিগকে স্ট্রেচারে করিয়া আনা হইতেছিল। যে স্ট্যালিনগ্রাদ শহর নরকে পরিণত হইয়াছিল, ঘরবাড়ী ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, সেখান থেকে অনেকে স্যুটকেস ও জিনিসপত্র নিয়া পলায়ন করিয়া আসিতেছিল। তাদের চোখে মুখে কঠোরতার ছায়া, তাদের শুষ্ক ও ধূলায় অপরিচ্ছন্ন গন্ড দিয়া চোখের জল গড়াইয়া, পড়িতেছিল। তাদের শিশুরা ক্ষুধায়

তৃষ্ণায় কাতর ছিল, কিন্তু তারা কাঁদিতেছিল না, শুধু মুখে অব্যক্ত বেদনা প্রকাশ করিতেছিল, আর ছোট ছোট কচি হাতগুলি ভল্‌গা নদীর জলের দিকে বাড়াইয়া দিতেছিল।

কী মর্মান্তিক বর্ণনা এবং কী করুণ দৃশ্য! স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে এই ধরনের অজস্র করুণ দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল।

এদিকে আগস্টের শেষে এবং সেপ্টেম্বরের প্রথম দশ দিন জার্মানরা সমস্ত দিক দিয়াই স্ট্যালিনগ্রাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছিল। আর আকাশে ছিল শত্রু বিমানের আধিপত্য। এর ফলে সৈন্যদের উপর নৈতিক প্রতিক্রিয়া খারাপ হইল। অনেকেই স্ট্যালিনগ্রাদের নরক থেকে ভল্‌গার ওপারে পলাইয়া যাইতে উন্মুখ হইয়াছিল। তখন ভল্‌গার ওপার থেকে সমর পরিষদ (ওয়ার কাউন্সিল) সেই বিখ্যাত ফরমান জারী করিলেন :

'The enemy must be smashed at Stalingrad.'—

'শত্রুকে স্ট্যালিনগ্রাদে অবশ্যই নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে!'

৬২নং বাহিনীর সৈন্য ও অফিসারদের উপর এই হুকুমনামা যেন বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করিল।

শহরের উত্তর দিকে ছিল বড় বড় কলকারখানা আর দক্ষিণ দিকে বসতবাটীসমূহ—সরকারী প্রশাসনিক দপ্তর, লালফৌজের ভবন, সওদাগরি অফিস ইত্যাদি এবং দুইটি রেলওয়ে স্টেশন। আর মাঝখানে ছিল সেই বিখ্যাত উঁচু টিলা বা পাহাড়—মামাই হিল। উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে অবস্থিত এই মামাই ছিল গোটা শহরের মতই ভয়াবহ যুদ্ধের জন্য অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মামাই হিল দখলের জন্য বার বার যুদ্ধ হইয়াছে, বার বার হাতবদল হইয়াছে। গোড়াতে চুইকোভের কমান্ড পোস্ট মামাই হিলের ঠিক মাথার উপরেই ছিল, কিন্তু ক্রমাগত বোমা ও গোলাবর্ষণের ফলে চুইকোভ এখান থেকে 'বাস্তুচ্যুত' হইলেন।

৬২নং বাহিনী ১২ই সেপ্টেম্বর বাকী রুশবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। এতদিন জেনারেল সোপাটিন ছিলেন এই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং চুইকোভ তাঁর ডেপুটি। কিন্তু সোপাটিন কোন দৃঢ়চিত্তের বলিষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন না। তিনি ক্রমাগত পশ্চাদ্‌পসরণে বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং তিনি অপসারিত হইলেন এবং জেনারেল চুইকোভ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হইলেন। বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ভি. আই. চুইকোভ সমর পরিষদের সদস্য লেঃ জেনারেল জেরেমেঙ্কো এবং নিকিতা ক্রুশ্চেভের প্রশ্নোত্তরে ঘোষণা করিলেন—'শত্রুর নিকট শহর সমর্পণ করিতে পারি না। আমি শপথ করিতেছি আমি শক্ত হইয়া দাঁড়াইব, আমরা শহর রক্ষা করিব কিংবা প্রাণ বিসর্জন দিব।'...

যত বাধাই দেওয়া হোক না কেন সমস্ত বাধা চূর্ণ করিয়া জার্মান সৈন্যেরা স্ট্যালিনগ্রাদের মধ্যবর্তী অংশে প্রবেশ করিল এবং চুইকোভের সদর ঘাঁটির মাত্র ৮০০ গজের মধ্যে যুদ্ধ হইল। এমন সময় ১৪-১৫ই সেপ্টেম্বরের সংকটজনক রাতে স্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধের সেই ইতিহাসবিখ্যাত রোডিমেৎসেভ ডিভিসন কোন মতে ভল্‌গা পার হইয়া স্ট্যালিনগ্রাদে আসিয়া হাজির হইল—সংখ্যায় ১০ হাজার। মামাই হিল পুনর্দখলের জন্য তীব্র যুদ্ধ হইল, বার বার হাতবদলের ফলে বুঝা গেল না যে ওটা

সত্যিকার কার দখলে গেল! কিন্তু সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশনে ক্রমাগত পাঁচদিন ধরিয়া ভয়ংকর হাতাহাতি যুদ্ধের পর ওটা জার্মানদের দখলে গেল।

এই সমস্ত ভয়ংকর যুদ্ধে জেনারেল রোডিমেৎসেভের ১৩ নং গার্ড ডিভিসন 'রক্তশূন্য' হইয়া গেল। এই ডিভিসন ভল্গা পার হইয়া আসার পরমুহূর্ত থেকেই
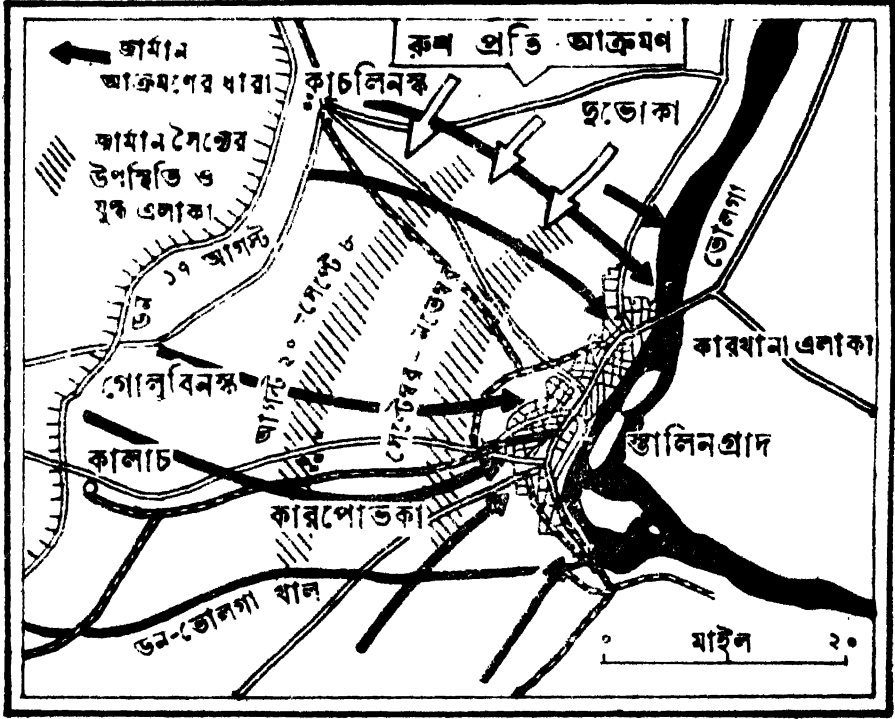
সোজা রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। তবু কতকগুলি ব্লক বাড়ী তাঁদের হাতছাড়া হইয়া গেল। তাঁরা পশ্চাদপসরণ করেন নাই। 'কেননা, পশ্চাদপসরণ করার মত কেহ ছিল না!' নানা অট্টালিকার অভ্যন্তরে, রেল স্টেশনের নানা অংশে, এমন কি রেলের কামরার তলায় পর্যন্ত তারা ঢুকিয়া পড়িয়াছিল এবং সেই সমস্ত স্থান থেকে এক এক গ্রুপে মাত্র ২।৩ জন করিয়া জার্মানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতেছিল। চুইকোভ বলিয়াছেন যে, এ কথা সত্য যে, সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় অর্ধে রোডিমেৎসেভের ডিভিসনের জন্যই স্ট্যালিনগ্রাদ রক্ষা পাইয়া গিয়াছিল। অবশ্য একথাও ঠিক যে, ভল্গার ওপারের সহযোগিতা—রসদ গোলাগুলি ইত্যাদি ছাড়া স্টালিনগ্রাদ রক্ষা করা সম্ভব হইত না। কিন্তু সেইসঙ্গে আরও নিষ্ঠুর সত্য এই যে, ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যভাগ পর্যন্ত, যখন জেনারেল ফন পাউলাসের শেষ আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন প্রত্যেকটি দিনই সংকটজনক ছিল—কেবল তফাৎ এই যে, কোনদিন বেশী সংকট ছিল, কোনদিন বা কম!—

"In fact every day was 'critical' except that some days were even more so than others."

২৬শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্ট্যালিনগ্রাদের মধ্যাংশ জার্মানদের দখলে চলিয়া গেল

এবং তারা উত্তরদিকের কলকারখানা অঞ্চলের দিকে মন দিল। কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদের অভ্যন্তরে যে সমস্ত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল তার তুলনা নাই। জনৈক জার্মান সেনাপতি (জেনারেল হ্যান্স ডোর) নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, 'স্ট্যালিনগ্রাদ আর গতিশীল বৃহৎ রণক্রিয়ার ক্ষেত্র ছিল না, দুর্গের মত স্থিতিশীল যুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল—যেখানে প্রতিটি ঘরবাড়ী, কলকারখানা, প্রতিটি কক্ষ, প্রতিটি দেওয়াল, এমন কি প্রতিটি আবর্জনাস্তূপের জন্য পর্যন্ত লড়াই হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের গোলাগুলির সঙ্গে এর কোন তুলনা হয় না। রুশরা ছদ্মবেশ ধরিতে এবং ব্যারিকেডের যুদ্ধে জার্মানদের চেয়ে অনেক বেশী ওস্তাদ, তাদের আত্মরক্ষার লাইন অত্যন্ত শক্তিশালী। অনেক অজানা জার্মানসৈন্যও এই অবরোধ-যুদ্ধে বহু বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে।'

২৭শে সেপ্টেম্বর স্ট্যালিনগ্রাদের শ্রমশিল্প এলাকার দিকে জার্মানদের আক্রমণ শুরু হইল এবং তখন এমন দিনও গিয়াছে, 'যে দিনের পুনরাবৃত্তি হইলে আমরা ভল্গার জলে নিক্ষিপ্ত হইতাম!'—মন্তব্য করিয়াছেন চুইকোভ।

৬২ নং বাহিনীর সৈন্যেরা বার বার ভাগ্যের অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল এবং অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে তাদের অবস্থা এমন হইয়াছিল যে,

'62 No. Army was very nearly wiped out—'

৬২ নং বাহিনী প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার জো হইয়াছিল।

অক্টোবর মাস ধরিয়াই যেন সংকটের জোয়ার চলিতেছিল। এই সময় আরও দুইটি বিখ্যাত ডিভিসন স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে যোগ দিল। (এখানে বলা দরকার যে, স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে 'ডিভিসন' বলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৈন্যসংখ্যা ২।৩ হাজারের বেশী ছিল না।) মেজর জেনারেল গুরিয়েন এবং কর্নেল গুরিটিয়েভ ভল্গা পার হইয়া স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তরাঞ্চলে কারখানা-রক্ষার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এঁদের সঙ্গে আবার যোগ দিলেন জেনারেল ঝলুদেভের অধীন রণদুর্মদ প্রহরী সৈন্যেরা (গার্ডসমেন), এঁরা ছিলেন চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী, লম্বা-চাওড়া দীর্ঘদেহী যুবক, তাঁদের অনেকের পরিধানে ছিল বিমানছত্রীর ইউনিফর্ম, ছুরি ও ছোরা কোমরবন্ধে ঝোলানো। এঁরা ছিলেন সঙ্গীনচালনায় ওস্তাদ—এঁরা অনায়াসে একটা নিহত নাৎসীর মৃতদেহকে এক গাদা খড়-ভরতি ঝোলার মত পিঠে ফেলিয়া বহন করিতে পারিতেন। গৃহ থেকে গৃহাভ্যন্তরের যুদ্ধে এঁদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হইয়া এঁরা ঘরে ঘরে দরজা ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়া পড়িতেন এবং তাঁদের ছোরা ও ছুরি শত্রুর বুকে চালাইয়া দিতেন। ঘেরাও হইয়াও তাঁরা লড়াই চালাইয়া যাইতেন এবং মৃত্যুর আগে চেঁচাইয়া বলিতেন—'স্বদেশের জন্য, স্ট্যালিনের জন্য। কিন্তু আমরা কখনও আত্মসমর্পণ করিব না!'

১৪ই অক্টোবর থেকে জার্মানদের শেষ ও চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু হইল। দিনরাত্রি বোমা ও গোলাগুলির আঘাতে সব যেন চূর্ণ হইয়া যাওয়ার জো হইল। এমন কি সৈন্যদলের সঙ্গে ও ভল্গার ওপারে সদর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ার জো হইল। অন্ধ, ক্রুদ্ধ ও নৃশংস আক্রমণ চলিতে লাগিল। কোন কোন বিল্ডিং দিনে পাঁচবার হাত বদল হইল। কারখানাগুলির একাংশে রুশ এবং অন্য অংশে জার্মানদের লুকোচুরি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল। প্রচণ্ড, ভয়ঙ্কর ও বেপরোয়া যুদ্ধ নৃশংসতার চরমে পর্যন্ত পেঁছিল এবং ২১ শে অক্টোবর পর্যন্ত দশ দিন ধরিয়া

এই অমানুষিক লড়াই চলিল। এবং স্ট্যালিনগ্রাদ রক্ষাকারীরা একেবারে বিপর্যয়ের কিনারায় পেঁছিয়াছিল। চুইকোভের সদর দপ্তরের মাত্র ৩০০ গজের মধ্যে যুদ্ধ চলিয়াছিল এবং মাত্র আর এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য যদি পাউলাস পাইতেন, তবেই তিনি স্ট্যালিনগ্রাদ দখল করিয়া নিতে পারিতেন।

চুইকোভ বলিতেছেন যে, শেষ পর্যন্ত সৈন্য ক্ষয় পাইতে পাইতে রুশ পক্ষের এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, মুচি, দর্জি, ঘোড়ার সহিস, ভাণ্ডারী প্রভৃতি যাদেরকেই বাহিনীর পিছনের দিকে পাওয়া গেল তাদেরকেই রণক্ষেত্রে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু কী আশ্চর্য ওরা স্ট্যালিনগ্রাদের রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই রাস্তার লড়াইতে 'বিশেষজ্ঞের' পরিচয় দিতে লাগিল।

'These poorly trained or wholly untrained people became "specialists" in street fighting, as soon as they stepped to on the ground of Stalingrad. "It was pretty terrifying" they would say 'to cross over to Stalingrad but once we got there we felt better. We knew that, beyond the Volga there was nothing and that if we were to remain alive we had to destroy the invaders.'

কী মন্ত্রে স্ট্যালিনগ্রাদ রক্ষার জন্য সামান্য মুচি, দর্জি প্রভৃতি যাদের যুদ্ধের কোন ট্রেনিং ছিল না তারা পর্যন্ত উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত শহর রক্ষা করিয়াছিল, সেটা ভাবিবার মত। তারা জানিত যদি স্ট্যালিনগ্রাদ জার্মানদের হাতে চলিয়া যায়, তবে ভল্গার ওপারে গিয়াও কিংবা থাকিয়াও তারা রক্ষা পাইবে না।···

চুইকোভ বলিতেছেন যে, ৩০শে অক্টোবরের পর থেকে মনে হইল 'আমরাই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে যাইতেছি।' কারণ, পাউলাসের আর ১৪ই অক্টোবরের মত সাংঘাতিক ও চূড়ান্ত আক্রমণের সাধ্য ছিল না। তথাপি ১১ই নভেম্বর জার্মানরা তাদের শেষ মরণ-কামড় দিল—৩ মাইল ফ্রণ্টে তারা ৫ ডিভিসন সৈন্য নিয়োগ করিল এবং এক সময় দেখা গেল যে, জার্মান লাইন ও ভল্গার মধ্যে ১০০ গজের ব্যবধান আছে। ভল্গার তখন বরফ জমিতে শুরু করিয়াছিল।

স্ট্যালিনগ্রাদে যখন জীবন-মৃত্যুর ভয়াবহ দ্বন্দ্ব বিরামহীন গতিতে চলিতেছিল, তখন মস্কোতে সোভিয়েট বিপ্লবের ২৫তম বার্ষিকীর সন্ধিক্ষণে কিছুটা আশার আবহাওয়া দেখা দিল। যদিও তখন পর্যন্ত সংকটের তীব্রতা কিছুমাত্র কম নাই, তবু মস্কোবাসীরা যেন হতাশা কাটাইয়া উঠিল এবং তারা অনুভব করিল যে, আগেকার কালো দিনগুলি তারা যেন পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। এই সময় ৬ই নভেম্বর মহান অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকীর পূর্বাহ্নে স্ট্যালিনগ্রাদের রক্ষীদের সেই ঐতিহাসিক শপথ-বাক্য সমস্ত সোভিয়েট সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠায় সবচেয়ে জাঁকালোভাবে প্রচারিত হইল। স্ট্যালিনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সেই ঐতিহাসিক শপথ বাক্য—
নীচে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

'Oath of the Defenders o 'Stalingard'

'We have come to the Volga steppes from every corner of our great homeland : from the boundless Russian expances, the Ukrainian steppes, the By-lorussian forests, the Causasian mountains and distant Siberia···

'The whole Soviet people are aware of moratal danger which threatens their country and are pinning their hopes on the defenders of Staligrad. Thousands of letters reach us from all over the Soviet Union. They entreat us not so surrender.

'We swear that we shall defend Stalingrad to the last drop of blood to the last breath and to the last heart-beat. We shall not let the enemy reach the Volga.

'We swear before our fathers, the veterans of Tsaritsyan before our fellow regiments on other fronts, before our colours and before the whole Soviet Union that we shall not shame the glory of Russian arms and that we shall fight to the last ditch…"

'In sending you this letter from the trenches, we swear to you, dear Joseph Vissarionovich, that to the last drop of blood…we shall defened Stalingrad…under your leadership our fathers won the battle of Tasaritsyn under your leadership we shall win the great battle of Stalingrad.'*

'আমরা আমাদের—অর্থাৎ স্বদেশের প্রত্যেকটি কোণা থেকে, রাশিয়ায় সীমাহীন বিশাল প্রান্তর, থেকে, উক্রাইনের স্তেপভূমি থেকে, বায়েলো-রাশিয়ার অরণ্য থেকে, ককেশাস পর্বতমালা থেকে এবং বহু দূরবর্তী সাইবেরিয়া থেকে ভল্গার এই স্তেপভূমিতে আসিয়াছি…

'সমগ্র সোভিয়েট জনগণ সম্যক অবগত আছে যে, কী ভয়ঙ্কর বিপদ তাদের দেশের সামনে উপস্থিত এবং তারা তাদের সমস্ত আশা নিবদ্ধ রখিয়াছে স্ট্যালিনগ্রাদের প্রতিরক্ষার উপর। সারা সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত দেশ থেকে আমরা হাজার হাজার চিঠি পাইতেছি এবং এই সমস্ত চিঠিতে আমাদের অনুরোধ করা হইয়াছে—আমরা যেন আত্মসমর্পণ না করি!

'আমরা শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, আমরা স্ট্যালিনগ্রাদকে আমদের শেষ রক্তবিন্দু, শেষ নিঃশ্বাস ও শেষ প্রাণস্পন্দন পর্যন্ত রক্ষা করিব। আমরা শত্রুকে ভল্গায় পেঁছিতে দিব না।

'আমাদের পূর্বপুরুষদের সামনে, জারিৎসিন-রক্ষাকারী মহান যোদ্ধাদের সামনে, অন্যান্য রণাঙ্গনে আমাদের সহযোদ্ধা রেজিমেন্টসমূহের সামনে, আমাদের পতাকা এবং আমাদের সমস্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের সামনে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমরা রুশ সমরাস্ত্রের গৌরবকে মসীলিপ্ত করিব না, আমরা শেষ পরিখাস্থল পর্যন্ত যুদ্ধ করিব…

'যুদ্ধক্ষেত্রের পরিখা থেকে তোমাকে এই চিঠি পাঠাইতেছি আমাদের প্রিয় জোসেফ ভিসারিওনোভিচ, আমরা তোমার নিকট এই শপথ করিতেছি যে, আমরা আমাদের শেষ

* এই শপথ বাক্যের উপরাংশ বা চার নং প্যারা পর্যন্ত মার্শাল এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি থেকে উদ্ধৃত। শেষ প্যারাটি আলেকজান্ডার ভার্থের বইয়ের উদ্ধৃতি থেকে গৃহীত। লক্ষ্য করার বিষয়ে এই যে, উপরাংশে স্ট্যালিনের নাম নেই, কিন্তু শেষাংশ একেবারে স্ট্যালিনের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।—লেখক

রক্তবিন্দু দিয়া···স্ট্যালিনগ্রাদ রক্ষা করিব···তোমার নেতৃত্বে আমাদের পূর্বপুরুষেরা জারিৎসিনের যুদ্ধ জয়লাভ করিয়াছিলেন। তোমার নেতৃত্বে আবার আমরা স্ট্যালিনগ্রাদের মহান যুদ্ধে জয়ী হইব।'

এই শপথ বাক্যের মধ্যে স্ট্যালিনগ্রাদ রক্ষার বজ্রকঠোর সংকল্প যেন একেবারে রক্তের অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গৃহযুদ্ধের সময় স্ট্যালিনের নেতৃত্বে যে শহর প্রতিবিপ্লবীদের হাত থেকে হাজার হাজার শহীদের রক্ষা করিয়াছিলেন, এবারও সেই শহীদে প্রেরণা স্ট্যালিনগ্রাদ-রক্ষীদের অনুপ্রাণিত করিল। তাঁরা জীবনপণ সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং স্ট্যালিনের নামেই ঘোষণা করিলেন, 'প্রিয় জোসেফ ভিসারিওনোভিচ, তোমার নেতৃত্বে আমাদের পূর্বপুরুষেরা জারিৎসিনের যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন। এবারও তোমারই প্রত্যক্ষ পরিচালনায় স্ট্যালিনগ্রাদে মহান যুদ্ধে আমরা জয়ী হইবে।'

ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে যে, স্ট্যালিনের উদ্দেশ্য নিবেদিত এই অপূর্ব শপথ-বাক্যের মর্যাদা স্ট্যালিনগ্রাদের অতুলনীয় যোদ্ধারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। সামরিক ইতিহাসে আত্মরক্ষার ও স্বদেশরক্ষার যে সমস্ত আশ্চর্য দৃষ্টান্ত আছে, স্ট্যালিনগ্রাদের আত্মরক্ষা এবং পরে তার মুক্তিবিধান সেই সমস্ত আশ্চর্য কাহিনীর মধ্যেও দুর্লভতম।

'সোভিয়েট ইউনিয়নের বীর' আখ্যায় দুইবার সম্মানিত বিখ্যাত সেনানী কর্নেল-জেনারেল রোডিমৎসেভ লিখিয়াছেন যে, জার্মাননা স্ট্যালিনগ্রাদ জয় করার জন্য সর্ব-প্রকার আয়োজনই করিয়াছিল, কিন্তু তারা একটি প্রধান বিষয়ই উপেক্ষা করিয়াছিল এবং সেটি হইতেছে—সোভিয়েট জনগণের দৃঢ়সংকল্প। রোডিমৎসেভ তাঁর সুবিখ্যাত ডিভিসন নিয়া ভল্গা পার হইয়া যখন স্ট্যালিনগ্রাদের তীরে পৌঁছিলেন, তখন সৈন্য-বাহিনীর মুখপত্রে যে কথা লেখা হইয়াছিল, তাতেই তাঁদের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সেই সামরিক পত্রিকায় ঘোষণা করা হইল :

'For us there is no longer any road back It is closed by the order of our country, the order of our people. Our motherland requires all the defenders to keep the city even if they have to fight to the last man.'

অর্থাৎ 'আমাদের পিছনে ফিরিবার আর রাস্তা নাই। আমাদের দেশের হুকুমে, আমাদের জনগণের আদেশে সেই পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শহর রক্ষার জন্য আমাদের মাতৃভুমি আমাদের সকলকেই চায়, এমন কি আমাদের শেষ মানুষটিকেও লড়াই করিতে হইবে।'

'কেননা, আমানের আর পিছনে ফিরিবার উপায় নাই।'

'For us there is no land beyond the Volga'—

"আমাদের জন্য আর ভল্গার ওপারে জমি নাই!"—লিখিয়াছেন স্ট্যালিনগ্রাদের অন্যতম ইতিহাস সৃষ্টিকারী জেনারেল রোডিমৎসেভ। এই বোধ, এই চেতনা সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে নূতন করিয়া উদ্বুদ্ধ করিল। ক্রমে শত্রুপক্ষও বুঝিতে পারিল যে, শহর জয় করা এত সহজ নয়। অথচ '১৪ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে জেনারেল পাউলাসের সৈন্যদল স্ট্যালিনগ্রাদের মধ্যাংশ ভেদ করিয়া যখন শহরের মধ্যে লরী ও ট্যাঙ্কযোগে প্রবেশ করিল তখন তারা ভাবিল যে, শহর জয় হইয়া গিয়াছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,

তারা শহরের মর্মস্থল ও ভল্গার দিকে ছুটিল এবং নিজেদের জন্য শহর দখলের স্মারকচিহ্নগুলি সংগ্রহ করিতে লাগিল। পানোন্মত্ত জার্মানরা মাউথ-অর্গান বাজাইতে বাজাইতে, পাগলের মত চীৎকার করিতে করিতে এবং ফুটপাথ দিয়া নাচিতে নাচিতে আগাইয়া যাইতে লাগিল'—জেনারেল চুইকোভ প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, সেটাই শেষ পর্যন্ত বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। অর্থাৎ স্ট্যালিনগ্রাদের রাস্তা মৃতদেহে ভরিয়া গেল। 'রাস্তাগুলি'র অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, ওগুলির ব্যবধান আর মিটার বা গজের পরিমাপে করা যেত না, করা হইত মৃতদেহের সংখ্যার দ্বারা!

'The streets were no longer measured by metres but by corpses'—[১]

জার্মান সামরিক ঐতিহাসিক পল ক্যারেল পর্যন্ত স্ট্যালিনগ্রাদ অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্য ও রুশদের অবিশ্বাস্য প্রতিরোধ সঙ্কল্পের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, প্রত্যেকটি সৈন্যদল যখন ভল্গা পার হইয়া স্ট্যালিনগ্রাদের রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিল, তখন তিনটি শ্লোগান তাকে উদ্দীপ্ত করিল:

'Every man a fortress!
There is no ground left behind the Volga!
Fight or die!'
অর্থাৎ 'প্রত্যেকটি সৈনিক এক একটি দুর্গ!
ভল্গার ওপারে কোন জমি নাই!
লড়াই করো কিংবা মরো!'

এই জীবন-মৃত্যুর মন্ত্রে দীক্ষা নিল স্ট্যালিনগ্রাদ-রক্ষাকারী সৈন্য ও অসামরিক জনগণ। আর রক্ত? রক্তের বন্যা বহিয়া গেল।

আমেরিকানরা সময়ের মূল্য নিরূপণ করে টাকার পরিমাণে, সুতরাং সেখানে 'Time is Money' এই চিহ্নিত শ্লোগান প্রচলিত। কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদে এই শ্লোগান সম্পূর্ণরূপে পালটাইয়া গেল এবং নূতন আওয়াজ শোনা গেল—

'Time is Blood!'[২]

'সময় হইতেছে রক্ত।' এত রক্ত স্ট্যালিনগ্রাদের রাস্তাও ও শহরে পড়িয়াছে যে, সময়ের মূল্য রক্তের পরিমাণে। এবং এরই নাম 'টোট্যাল ওয়ার' বা সর্বগ্রাসী যুদ্ধ। এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধের চরমতম বিকাশ ভল্গার তীরবর্তী স্ট্যালিনগ্রাদে।

১। Hanson W. Baldwin—'Battle Lost and Won'—P. 168.
২। 'Hitler's War on Russia'—Paul Caerll—P. 613.

একাদশ অধ্যায়

লালফৌজের পাল্টা আক্রমণ : মৃত্যুর ফাঁদে জার্মানবাহিনী

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মাভিযানে জার্মানী ইউরোপীয় পূর্ব রণাঙ্গনের স্ট্যালিনগ্রাদ শহর এবং ককেশাস পর্বতমালার উত্তর পাদদেশে গিয়া পৌঁছিল। ইহাই ছিল হিটলারের আক্রমণাত্মক অগ্রগতির চরম সীমা। ভূমিগত জয় এবং দূরত্বের হিসাবে ১৯৪১ সালের মতই ইহা কম কৃতিত্বব্যঞ্জক ছিল না এবং জার্মান সৈন্যদলের একটানা আক্রমণপটুতারও ইহা কম প্রশংসনীয় নিদর্শন ছিল না। কিন্তু একমাত্র ভূমিগত জয়ই চরম যুদ্ধজয় নহে এবং মাইলের-পর-মাইল অতিক্রমই শত্রুসৈন্যদলের সংহার নহে। বরং শেষ পর্যন্ত এই অত্যধিক জয় এবং অত্যধিক অগ্রগতিই রণনীতির বিপদ ডাকিয়া আনিল, যে বিপদ সম্পর্কে জার্মান হাইকম্যাণ্ডের তখনও চেতনা ছিল না।

নাৎসীবাহিনী স্ট্যালিনগ্রাদ শহরে এবং ককেশাসের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মাভিযানের আসল লক্ষ্য পূর্ণ হইল না। ডন ও ভল্গা নদীর রুশবাহিনী চূর্ণ হইল না, স্ট্যালিনগ্রাদ শহর দখল হইল না এবং ককেশাস পর্বত ডিঙ্গানোও সম্ভব হইল না—বাকুর তৈল তখনও বহু দূরে রহিয়া গেল। এবং ভল্গা নদীর স্রোতও হিটলারের কর্তৃত্বে আসিল না। সুতরাং ১৯৪১ সালের মতই জার্মানী বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও আসল যুদ্ধ জয় হইতে বঞ্চিত হইল। কেবল বঞ্চিত হইল, এমন নহে। জার্মানী এমনভাবে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং দেশ-দেশান্তরে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত হইল যে, বাহ্যত উহা চমকপ্রদ এবং জনসাধারণের নিকট বিহ্বলকর হইলেও মূল সামরিক শক্তির বিচারে উহা ক্রমশঃ তার ক্ষমতার বাহিরে যাইতেছিল। সমালোচকের দৃষ্টিতে এই সময় জার্মানীর দুইটি প্রধান ত্রুটি চোখে পড়িতেছিল।

প্রথমত যে গুরু সামরিক দায়িত্ব জার্মানীর ঘাড়ে পড়িয়াছিল, সেই অনুযায়ী সৈন্যসংখ্যার প্রাচুর্য তখন ছিল না। দ্বিতীয়ত এই সমস্ত সৈন্যের সমাবেশ এমন ত্রুটিপূর্ণ ছিল যে, তা কেবল গুরুতরই ছিল না, রুশ পক্ষের পালটা-আক্রমণের ক্ষেত্রে তা বিপজ্জনক হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। এই সৈন্যবল বিন্যাসের লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে তাঁরা ধরিয়াই লইয়া ছিলেন যে, স্ট্যালিনগ্রাদে ও ককেশাসে তাঁদের জয়াভিযান সফল ও সম্পূর্ণ হইবে। কিন্তু পূর্ব রণাঙ্গনে এই সময় কত জার্মান সৈন্য ছিল?—৬ই নভেম্বর মার্শাল স্ট্যালিন সোভিয়েট ইউনিয়নের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতায় বলেন যে, রাশিয়ায় তখন জার্মানীর প্রায় ২৪০ ডিভিসন সৈন্য ছিল। জার্মান মিত্রপক্ষের ডিভিসনগুলি বাদ দিয়াই মাঃ স্ট্যালিন এই হিসাব দিয়াছিলেন এবং এই সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ নাই। এই সঙ্গে জার্মান মিত্রপক্ষের হিসাব যোগ দিলে দেখা যায় যে, লেনিনগ্রাদ হইতে উত্তর দিকে মেরু রণাঙ্গণ (মরমনস্ক বন্দর) পর্যন্ত ফিনল্যাণ্ডের অন্ততঃ ১০ ডিভিসন সৈন্য ছিল। তারপর ভরোনেজ এলাকায় প্রায় ১২ ডিভিসন হাঙ্গেরীয় সৈন্য ছিল। স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিম হইতে ভরোনেজ পর্যন্ত ডননদী বরাবর ছিল আরও ১০ ডিভিসন ইতালীয় সৈন্য এবং ২০ ডিভিসন রুমানীয়।

ইহারা ছাড়া আরও কিছু রুমানীয় সৈন্য ছিল স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণ-পূর্বে এরজেনী পাহাড় ও আকসাই এলাকায়। সুতরাং সেই সময় রাশিয়ায় মোট জার্মান সৈন্য সংখ্যা শক্তি ছিল প্রায় ২৪০ ডিভিসন। এই মোট সংখ্যার মধ্যে অন্তত ৬০ ডিভিসন সৈন্য স্ট্যালিনগ্রাদ ও ককেশাস এলাকায় রণলিপ্ত ছিল। আরও ৬০ ডিভিসনের দরকার লেনিনগ্রাদ ও মস্কো এলাকার নানা গুরুত্বপূর্ণ খণ্ড রণাঙ্গনে। তারপর সাময়িক বিশ্রামের জন্য যে সমস্ত জার্মান সৈন্যকে পিছনের দ্বিতীয় সারিতে বা যোগাযোগের লাইনে পাঠাইয়া দেওয়ার দরকার ছিল, তাদের সংখ্যাও ৩০ ডিভিসনের মত হইবে। সুতরাং রণক্রিয়ার ঐই 'বিরাট রঙ্গভূমিতে' আর বাকী রহিল মাত্র ৩০ ডিভিসন, যাদেরকে বলা যাইতে পারে রণনৈতিক মজুত সৈন্য বা স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ।

কেবল মজুত সৈন্যের স্বল্পতাই বড় কথা নহে, রণনৈতিক অবস্থানের গুরুত্বের সঙ্গে জার্মান বাহিনীর দুই পার্শ্বদেশের অবস্থাও অপেক্ষাকৃত কাঁচা ছিল এবং কাঁচা অবস্থার বিশেষ কারণ এই যে, জার্মানী এই দুই পার্শ্বদেশ রক্ষার ভার দিয়াছিল তাঁদের মিত্র সৈন্যদের উপর—হাঙ্গেরীয়, ইতালীয় ও রুমানীয় বাহিনীর উপর। জার্মানী এই দুই গুরুত্বপূর্ণ অংশে নির্ভরশীল ছিল। মানচিত্র পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে দক্ষিণ রাশিয়ার এই অংশে একান্ত পূর্ব দিকের স্ট্যালিনগ্রাদকে মধ্যবিন্দু ধরিয়া ডাইনে ও বামে রেখা টানিলে উত্তর-পশ্চিমে ভরোনেজ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে রস্টোভ বন্দর পাওয়া যাইবে—মোটামুটি ডন নদী এই অংশটায় সম্পূর্ণ ঘুরিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে আরও উত্তরে ভরোনেজ ছাড়াইয়া। এক্ষণে ভরোনেজ, রস্টোভ ও স্ট্যালিনগ্রাদ, এই তিনটি বিন্দুকে রেখাদ্বারা পরস্পর যুক্ত করিলে মানচিত্রের উপর একটি প্রকাণ্ড ত্রিভুজ পাওয়া যাইবে। এই ত্রিভুজের দুই বাহু—স্ট্যালিনগ্রাদ-ভরোনেজ ও স্ট্যালিনগ্রাদ-রস্টোভ দুইটি বৃহৎ পার্শ্বদেশের মত, যদিও দক্ষিণে ককেশাসের অন্যান্য অঞ্চলও ইহার সঙ্গে বিবেচ্য। এই দুই বাহুরই প্রায় সমান্তরাল রেখায় ডন নদী বহিতেছে। অর্থাৎ ভরোনেজ হইতে ডন নদী ধরিয়া স্ট্যালিনগ্রাদের ক্লেটস্কায়া পর্যন্ত এবং তারপর স্ট্যালিনগ্রাদের নীচে দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে রস্টোভগামী ডন নদী ও উহার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত—এই দুই বৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ছিল ৪০ ডিভিসন হাঙ্গেরীয়, ইতালীয় ও রুমানীয় সৈন্য। স্থান ও দূরত্বের হিসাবে বলা যায় যে, মোটামুটি যে ৪০০ মাইল রণাঙ্গন এখানে ছিল, উহার প্রতি ১০ মাইলে এক ডিভিসন করিয়া সৈন্য ছিল। অবশ্য এইগুলির সর্বত্রই শজারুব্যূহের শক্তিশালী প্রতিরোধ কেন্দ্র ছিল। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য ও সমরসম্ভার এবং সেই পরিমাণ দক্ষতা ছিল কি না, সেই প্রশ্ন নিশ্চয়ই করা যাইতে পারে। মনেহয় হিটলারী হাইকম্যাণ্ড নিজেদের শক্তির উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস রাখিতেন এবং স্ট্যালিনগ্রাদ ও ককেশাস সম্পূর্ণ জয় হইবে, এমন ধারণার দ্বারা চালিত হইয়াছিলেন। ফলে গোলাগুলি, সমরসম্ভার এবং সমস্ত প্রকার দ্রব্যসামগ্রী তাঁরা রণাঙ্গনের যতটা সম্ভব সম্মুখভাগেই মজুত রাখিয়াছিলেন। যতক্ষণ রাশিয়া পালটা-আক্রমণ না করিতেছে ততক্ষণ জার্মানীর পক্ষে উহা লাভজনক ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু নিশ্চিন্ততা বিপজ্জনক ছিল। তারপর জার্মানী এতদিন বিহ্বলকারী গোলাগুলির শক্তি ও গতি-শীল যান্ত্রিক বাহিনী নির্দিষ্ট বিন্দুগুলির উপর অধিক মাত্রায় প্রয়োগের দ্বারা যে জয়লাভ করিয়া আসিতেছিল তা রাশিয়ায় ব্যাহত হইতেছিল। স্ট্যালিনগ্রাদ কি

যাদুমন্ত্রে চুম্বকের মত হিটলারকে আকর্ষণ করিতেছিল এবং অন্য সমস্ত রণাঙ্গন যেন উপেক্ষা করিয়া হিটলার এই ইস্পাত নগরী জয়ের জন্য উম্মাদ হইলেন। ফলে, এই শহরের রণক্রিয়া চালু রাখিতে গিয়া হিটলার যথাসর্বস্ব পণ করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য রণক্ষেত্রের অভিযান একেবারে শিথিল হইয়া গেল। ১৯৪১ সালের মত দুই বা ততোধিক সংগ্রামক্ষেত্রে সেই দুর্দান্ত অভিযান আর রহিল না। অথচ স্ট্যালিনগ্রাদও জয় হইল না। এদিকে দূরত্বের ব্যবধান ক্রমে বাড়িয়া গেল, যোগাযোগ ব্যবস্থা জটিল হইয়া পড়িল এবং দ্রুত চলাচল ও সরবরাহ এক সুকঠিন সমস্যায় পরিণত হইল। ১৯১৪-১৮ সালে পশ্চিম রণাঙ্গন হইতে কয়েক দিনের মধ্যেই গোটা ডিভিসন পোল্যান্ডে পাঠানো সম্ভব ছিল। কিন্তু এবার অতলান্তিকের তীর হইতে ডন নদীর বাঁক পর্যন্ত প্রয়োজন মত কোন 'রিলিফ বাহিনী' পাঠাইতে গেলে কয়েক সপ্তাহ সময়ের প্রয়োজন ছিল। অধিকন্তু রুশ রেলওয়েসমূহের মোট বহন-ক্ষমতা জার্মানীর প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম ছিল। সুতরাং আধুনিক যুদ্ধের এক ডিভিসন ভারী যন্ত্রসমন্বিত সৈন্য পাঠাইতে গেলেই গুরুতর বিঘ্নের সম্মুখীন হওয়ার কথা।

এর সঙ্গে আর একটা 'উৎপাত' ছিল, যা জার্মানীকে রাশিয়ায় বিষম বিব্রত করিতেছিল এবং সেটা হইতেছে গেরিলা উৎপাত। এর জন্য যোগাযোগের লাইনগুলি সর্বদাই বিপদের মধ্যে ছিল। ফলে, যে কোন সরবরাহ পাঠাইতে গেলেই একমাত্র রেলপথের উপর নির্ভর করা চলিত না, হাতের কাছে সৈন্যদল তৈয়ার রাখিতে হইত। এই গেরিলাদের আশ্চর্য কাহিনী রাশিয়াতে এক্ষণে গল্প ও উপন্যাসের বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু জার্মানরাও এদেও সম্পর্কে যে সমস্ত স্বীকারোক্তি করিয়া গিয়াছে, তাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রণাঙ্গণের পিছনের সারিতেও নাৎসীরা নিশ্চিন্ত ছিল না। যে সমস্ত সৈন্য বিশ্রাম করিতে আসিত, তারা অবসর পাইত না। কেননা যে কোন মুহূর্তে দিনে বা রাত্রে ঝোপ জঙ্গলের আড়াল বা বরফের গর্ত হইতে তারা সাদা পোশাকে সাদা ভালুকের মত আসিয়া হানা দিত এবং এই সাদা পোশাকের জন্য তারা অদৃশ্যভাবে জার্মানদের আশে-পাশেই বরফাস্তীর্ণ দেশে ঘুরিতে পারিত। সৈন্য-ছাউনি, রাস্তাঘাট, সেতু, মালগাড়ী, রেলপথ—কোন বস্তুই ইহাদের হাতে নিরাপদ ছিল না। কোন কোন সময় দশ মাইল রেলপথ পাহারা দেওয়ার জন্য পুরা এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্যের দরকার হইত। এর সঙ্গে আবার প্যারাসুট বা ছত্রীসৈন্য এবং বিমানবাহিত সৈন্যের অতর্কিত আক্রমণেরও ভয় ছিল। সুতরাং পশ্চাদভাগে বিশ্রাম বা নিশ্চিত সরবরাহের সম্ভাবনাও নির্বিঘ্ন ছিল না।

তারপর জার্মানীর আভ্যন্তরীণ অবস্থাও সুখকর ছিল না। খাদ্য, বস্ত্র, জ্বালানী, পেট্রোল, কয়লা, কাঁচা মাল ইত্যাদির অভাব ছিল। সারা ইউরোপ দখলে ছিল বটে, কিন্তু খাদ্য যোগাইবার দায়িত্ব ছিল জার্মানীর। ৩০শে সেপ্টেম্বরের বক্তৃতায় হিটলার নিজেই বলিয়াছিলেন,

'...the continuance of the war demanded the organization of the gigantic rigions of Eastern Europe for the nourishment of our people, for making our raw material supplies secure, and in a wider sense, for the support of Europe as a whole.'

এই বিরাট দায়িত্ব কতখানি পালিত হইবার সম্ভাবনা ছিল? উক্রাইনের শস্যসম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনা সামান্যই ছিল। এই কৃষির জন্য প্রয়োজন ছিল ট্রাকটরের, সেগুলি চালাইবার জন্য তৈলের এবং সর্বোপরি মজুরের—বীজ বপন ও শস্য সংগ্রহের জন্য। ইহার প্রত্যেকটি প্রশ্নই ছিল সংশয়াচ্ছন্ন। আর বাকুর পেট্রোল?—সে তো নাগালের বাইরে। তারপর কয়লার অভাব এবং কয়লা ছাড়া জ্বালানীর জন্য কৃত্রিম তৈল উৎপাদনও সম্ভব ছিল না। যুদ্ধরত ইউরোপে প্রতি মাসে জ্বালানীর জন্য সাড়ে ১২ লক্ষ টন হইতে সাড়ে ১৭ লক্ষ টনের প্রয়োজন ছিল রণক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে। আর সারা ইউরোপে স্বাভাবিক সময়ে কৃত্রিম ও স্বাভাবিক উভয় প্রকার তৈল উৎপন্ন হইত মাসিক সাড়ে ১২ লক্ষ টন। সুতরাং এই দীর্ঘ বিলম্বিত যুদ্ধের এবং জীবনযাত্রার তাগিদ কিভাবে মিটিবে? এই পটভূমিকার মধ্যে নভেম্বরের (১৯৪২) অর্ধেক পার হইয়া গেল, সামনে নিদারুণ শীতের বিভীষিকা।

আক্রমণের আয়োজন

৭ই নভেম্বর, যখন স্ট্যালিনগ্রাদ শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরতর লড়াই চলিতেছিল এবং বহির্জগৎ স্তব্ধ নিঃশ্বাসে এই শহরের নিশ্চিত পতনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তখন মাঃ স্ট্যালিন মস্কোতে এক নির্দেশনামায় বলিলেন,

'The day is not far distant when the enemy will experience the full weight of a blow by the red Army. One day we shall have our fun too.'

'সেই দিন খুব দূরবর্তী নহে, যেদিন লালফৌজের এক প্রচণ্ড আঘাতের পূর্ণ অভিজ্ঞতা শত্রুর ভাগ্যে জুটিবে। আমরাও একদিন মজার খেলা দেখিব।' ১৯৪২ সালের নভেম্বরে এমন কথা ঘোষণা করা নিশ্চয়ই খুব দুঃসাহসের পরিচায়ক ছিল।

কেবল দুঃসাহসের নহে, সোভিয়েট হাইকম্যাণ্ডের বাহিরে এমন কথা নিশ্চয়ই বিদ্রূপ ও অবিশ্বাসের হাসি উদ্রেক করিয়াছিল। কেননা স্ট্যালিনগ্রাদ শহর সেদিন চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং জার্মান বাহিনী দুর্দমনীয় বলিয়া প্রতিভাত ছিল, আর লালফৌজের পালটা-আক্রমণের আয়োজন ও প্রস্তুতির সংবাদ বাহিরে কাহারও জানা ছিল না। সুতরাং মাঃ স্টালিনের বর্ণিত 'ফান' বা 'মজার খেলা' খেলা হিসাবেই হাসির বস্তু ছিল।*

* মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্ট্যালিনের ৭ই নভেম্বর, ১৯৪২-এর নির্দেশনামায় 'One day we shall have our fun too' কথাটার উল্লেখ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যুদ্ধের শেষে এই বাক্যটির পরিবর্তিত রূপ দেখা যায়। যেমন, ১৯৪৬ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত সোভিয়েট ইউনিয়নের মহান স্বদেশাত্মক যুদ্ধ সংক্রান্ত স্ট্যালিনের নির্দেশ ও বক্তৃতাবলী গ্রন্থ (অর্ডার অব দি ডে নং ৩৫৫) 'fun' শব্দটির কোন উল্লেখ নেই। উহার বদলে শুধু আছে 'Our turn will come.'

অপর পক্ষে আলেকজাণ্ডার ভার্থের বইতে (পৃষ্ঠা ৪৫০) আছে—স্ট্যালিনের নির্দেশনামায়—

'There will be a holiday in our street too—meaning it will soon be our turn to rejoice.'

সুতরাং একই নির্দেশনামায় উপরোক্ত অংশটির তিন রকম বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।—লেখক।

তথাপি স্ট্যালিনের বক্তৃতার এক পক্ষকালের মধ্যেই এক বিস্ময়কর পালটা-আক্রমণ ঘটিল, যে আক্রমণের আয়োজন ছিল অভূতপূর্ব। কেননা বিগত আগস্ট মাসে, কিংবা উহারও আগে এই আক্রমণের কল্পনা করা হইয়াছিল। স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মান দুর্বিপাকের পর ১৯৪৩ সালে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইনস্টোন চার্চিলের এক বক্তৃতায় প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে তিনি যখন মস্কোতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি মার্শাল স্ট্যালিনকে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর দেখিয়াছিলেন। লালফৌজের পালটা আক্রমনাত্মক অভিযানের এক পরিরকল্পনা এবং তার উদ্দেশ্যর কথা তিনি এমন আভাষ দিয়াছিলেন যে, যদি জার্মান বাহিনী দূরবর্তী স্ট্যালিনগ্রাদ পর্যন্ত পেঁছে এবং উহার অগ্রগতি সেখানে রোধ করা যায়, আর ককেশাসের পার্বত্য অঞ্চলে যদি জড়াইয়া পড়ে, তাহলে লালফৌজ কর্তৃক এক মারাত্মক আঘাতের অভাবনীয় সুযোগ আসিবে। অবশ্য উহার আগে দীর্ঘকাল এক তীব্র আত্মরক্ষার লড়াই চলিবে ভরোনেজে, স্ট্যালিনগ্রাদে ও ককেশাসে। মাঃ স্ট্যালিনের বিচক্ষণতা, রণনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং সামরিক ঘটনাবলীর ভাবী পরিণতি সম্পর্কে তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অনুমান কিরূপ গভীর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিতেছে। যে তথ্য তিনি মিঃ চার্চিলকে আগস্ট মাসে প্রকাশ করিয়াছিলেন, নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে তা বাস্তব রূপ লইতে লাগিল।

এই বাস্তব রূপ লইবার কিছু কিছু সুবিধাও রুশ পক্ষে ছিল। যদিও স্ট্যালিনগ্রাদ তিন দিকে বেষ্টিত ছিল, তথাপি ভল্গা নদীর পথ বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ ছিল না এবং উহার পূর্ব তীর অনেকটা মুক্ত ছিল। আগস্ট, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর—বোধ হয় এই তিন মাস কাল সোভিয়েট রাশিয়া পালটা-আক্রমণের জন্য প্রচুর আয়োজন করিতে থাকে। এই সমস্ত আয়োজনের জন্য মাল-পত্র, সমর-সম্ভার, সৈন্য ইত্যাদি বহু উত্তর হইতে ভল্গার ভাঁটি ধরিয়া স্যারাটোভ বা কামিসিন পর্যন্ত (স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তরে) নিরাপদে আনা সম্ভব ছিল। উরল পর্বতের এলাকায় যে সমস্ত কল-কারখানা ছিল এবং নূতন যেগুলি স্থাপিত হইয়াছিল, সেখানকার উৎপন্ন সমর-সম্ভার ও বৃহৎ কামান নদী এবং উহার শাখা নদী বায়েলায়া দিয়া ভল্গা নদীতে আনা সম্ভব ছিল। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ১৯৪১ সালে মধ্য রাশিয়া ও দক্ষিণ রাশিয়া হইতে যে সমস্ত কল-কারখানা স্থানান্তরিত হইয়াছিল, সেগুলির পুনঃ সংস্থাপনে ও পুনর্গঠনে অশেষ রকম বেগ পাইতে হইয়াছিল। বিশেষত উরল অঞ্চলের ভয়াবহ শীত এবং খাদ্য ও জ্বালানীর অভাবে কারখানার কাজ যেমন ব্যাহত হইয়াছিল, মজুরদেরও তেমনই দুর্গতি হইয়াছিল অপরিসীম। এজন্য বিগত শীতাভিযানে এবং বসন্তকালে রাশিয়া গোলাগুলির ও অস্ত্রসম্ভারের অভাবে পড়িয়াছিল। কিন্তু ১৯৪২-এর শেষের দিকে এই অভাব তারা কাটাইয়া উঠিল এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে লোকবল ও অস্ত্রবল মজুত হইতে লাগিল। স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তরে ও দক্ষিণে এজন্য দুইটি সরবরাহ কেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্ব অর্জন করিল—একটি হইতেছে ২০৩ মাইল উত্তরে স্যারাটোভ এবং অপরটি ২৩০ মাইল দক্ষিণে বিখ্যাত অস্ট্রাখান বন্দর। এই দুইটি কেন্দ্রই ভল্গা নদীর তীরে। স্যারাটোভ হইতে লোকজন ও সামরিক মালমশলা ভল্গা নদী দিয়া কামিসিনে কিংবা মধ্য ডন রণাঙ্গনের পশ্চাতে পভোরিণো স্টেশনে নীত হইত, অথবা রেলযোগে অস্ট্রাখানেও সরবরাহ করা হইত।

স্ট্যালিনগ্রাদে আত্মরক্ষায় স্যারাটোভ-অস্ট্রখান রেলপথের গুরুত্ব কম ছিল না। এই রেলপথ স্ট্যালিনগ্রাদের পূর্বদিকে ভল্গা নদীর সমান্তরাল ধরিয়া ১০০ মাইল পর্যন্ত গিয়াছে এবং তারপর অস্ট্রখানে পৌঁছিয়াছে। অস্ট্রখান কেবল ভল্গা নদীর বন্দর এবং রেলপথের সংযোগস্থলই নহে, ইহা ৫০ মাইল দূরবর্তী কাস্পিয়ান সমুদ্রের সঙ্গেও যুক্ত। কাস্পিয়ান সমুদ্রের জলপথ আবার ইরান বা পারস্যের উত্তর সীমান্তবর্তী বন্দর শা বন্দরের সঙ্গে যুক্ত। বন্দর শা জলপথে যেমন বাকুর বিখ্যাত তৈলকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তেমনিই এখান হইতে তেহরান-তাব্রিজ ও বাকু হইয়া এক বৃহৎ রেলপথ ঘুরিয়া গিয়াছে একেবারে ককেশাস ভেদ করিয়া রস্টোভ বন্দর পর্যন্ত। দক্ষিণ দিকের এই বৃহৎ জলপথ ও স্থলপথের সরবরাহ লাইন দিয়া বাকুর তৈল যেমন আসিত, স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর দিকের সহিত যেমন ইহার যোগাযোগ ছিল, তেমনিই বৃটিশ ও আমেরিকান সাহায্যও ইরান-কাসপিয়ান-ককেশাস পথে 'প্রবাহিত' ছিল। যদিও এই যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্য জার্মানীর ছিল, তথাপি কার্যত তা সম্ভব হয় নাই। এমন কি, স্ট্যালিনগ্রাদ অভিযানকারী জার্মান বোমারুর দল এই যোগাযোগ নষ্ট করিবার জন্য কয়েকবার অস্ট্রখানেও হানা দিয়াছিল। কিন্তু এই রেলপথের কোন গুরুতর ক্ষতি তারা করিতে পারে নাই এবং এখান দিয়া উত্তর ও দক্ষিণের সংযোগ অব্যাহত ছিল।

লালফৌজের পালটা আক্রমণের নকশা স্বভাবতই জার্মান সৈন্যদলের সমাবেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। এবং জার্মানীর পার্শ্বদেশ যে দুর্বল ও পালটা-আঘাতের সুযোগ সৃষ্টি করিতেছিল, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে জার্মান বাহিনী ক্রমশ স্ট্যালিনগ্রাদের সংকীর্ণ রণক্ষেত্রে জড়াইয়া পড়িতেছিল এবং সমস্ত শক্তি সেখানেই কেন্দ্রীভূত হইতেছিল। আর স্ট্যালিনগ্রাদের বাম দিকে ভরোনেজ এলাকায় এবং ডান দিকে কালমুক প্রান্তরে (ককেশাসের উত্তর অঞ্চলে) তারা নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিল। অথচ তারাই ছিল পার্শ্বরক্ষী। অন্য কোথাও নূতন সৈন্য সমাবেশ দেখা গেল না। ককেশাসের টেরেক নদীর উপত্যকায় জার্মান বাহিনী প্রচুর অসুবিধার মধ্যে ছিল এবং স্ট্যালিনগ্রাদের মূল রণক্রিয়ার সঙ্গে তাদের কোন যোগ রহিল না। সোভিয়েট হাই কম্যাণ্ডের তীক্ষ্ন দৃষ্টি এটা এড়াইল না। সুতরাং তাঁরা স্বাভাবিক কারণেই এই দুই পার্শ্বদেশে আঘাতের জন্য দুইটি পৃথক বাহিনী গড়িয়া তুলিলেন—স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে মধ্য ডনের ওপার এবং দক্ষিণে ও পূর্বে ভল্গা নদীর নিম্নভাগে। যদি জার্মানী স্ট্যালিনগ্রাদে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করিতে পারিত তাহলে নিশ্চয়ই তারা উত্তরে স্যারাটোভ ও দক্ষিণে অস্টখান পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িত এবং সেই অবস্থায় লালফৌজের পক্ষে পালটা আক্রমণ অধিকতর কঠিন ও দুঃসাধ্য হইয়া পড়িত। কিন্তু জার্মানরা অক্টোবর মাসেও সাফল্য অর্জন করিতে পারিল না এবং তাদের খোলা পার্শ্বদেশ ক্রমশঃ বিপদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই বিপদের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল স্ট্যালিনগ্রাদের দুইটি প্রধান রেলপথ লইয়া—একটি গিয়াছে ডন পার হইয়া লিখায়া জংশন হইতে মধ্যবর্তী এলাকা ধরিয়া খারকোভের দিকে, অন্যটি কোটেলনিকোভো হইয়া রস্টোভের দিকে। এই গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ দুইটি স্ট্যালিনগ্রাদ রণক্ষেত্র হইতে মোটামুটি ৭৫ মাইল দূরবর্তী সীমায় রুমানীয় এবং ইতালীয় ডিভিসনগুলির পাহারায় ছিল। উত্তর-পশ্চিমে ডন

নদী বরাবর ছিল জার্মানীর আত্মরক্ষার লাইন এবং এগুলি মোটামুটি সুরক্ষিত ছিল বলা যায়—অন্ততঃ জার্মানরা তাই মনে করিত। দক্ষিণে নীচু ও অনুর্বর এরজেনী পাহাড়ের রেখা ধরিয়া ছিল আর-একটি লাইন।

জেনারেল ফন হথ যাঁকে স্ট্যালিনগ্রাদ এলাকার প্রধান সেনাপতি করা হইয়াছিল, নভেম্বরের অর্ধভাগে তাঁর আর পাত্তা পাওয়া গেল না। কি রহস্যময় কারণে তিনি সরিয়া গেলেন, তা তখন প্রকাশিত হয় নাই। তাঁর স্থলে আসিলেন জেনারেল ফন পাউলাস, যাঁকে কেন্দ্র করিয়া এক নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি হইল। পাউলাসের সৈন্যদলে ছিল চারিটি প্যানেৎসার, তিনটি মোটরায়িত এবং ১৪টি পদাতিক ডিভিসন এবং সঙ্গে ছিল আরও অনেক শক্তিশালী গোলন্দাজ ও 'টেক্‌নিক্যাল' বিশেষজ্ঞ সৈন্যদলের সমাবেশ। এই বৃহৎ বাহিনী দণ্ডায়মান ছিল ভল্‌গা নদীর পশ্চিম তীর বরাবর—ওরলোভ্‌কা এলাকা হইতে সারেপ্টা পর্যন্ত। এই দুই বিন্দুকে একটি রেখা দ্বারা যুক্ত করিলে উহা তিনটি প্রকাণ্ড কারখানা এলাকার ভিতর দিয়া স্ট্যালিনগ্রাদ শহরকে পূর্বে ও পশ্চিমে দুই ভাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। অপর পক্ষে ডন নদীর উভয় তীরে কয়েক ডিভিসন সৈন্য ছিল আত্মরক্ষার ঘাঁটিগুলি দখল করিয়া—বাম তীরে ইলোভ্‌লা শাখা নদীর মুখ হইতে পূর্বদিকে এবং দক্ষিণতীরে ক্লেটস্কায়ার পূর্বদিকে বিখ্যাত বাঁকের মুখে। অক্টোবরের মধ্যভাগ হইতেই এই অঞ্চলে লালফৌজের একটা 'রিলিফ' বাহিনী ছিল। অর্থাৎ তারা পূর্ব হইতেই কিছু কিছু পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করিতেছিল (যাহা আগের অধ্যায়ে বলা হইয়াছে) কিন্তু সেই চেষ্টা কখনও সার্থক হয় নাই।

ডন ও ভল্‌গা নদীর মধ্যে মাত্র ৪০।৫০ মাইল ব্যবধান ছিল এবং এই সংকীর্ণ স্থানটুকুর মধ্যে অনেকগুলি বিমান ময়দান, রসদখানা এবং গোলাধার (munition dump) জার্মানরা তৈয়ার করিয়াছিল। ডন নদীর পশ্চিম তীর বরাবর লিখায়াগামী রেলপথ ধরিয়া বিমান ও অন্যান্য ঘাঁটিগুলি পর পর ঘন শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্মিত হইয়াছিল। বগুচার ও ক্লেটস্কায়ার মধ্যে ডন নদীর পূর্বে ও পশ্চিমে প্রবাহিত ছিল—জার্মানরা এই মধ্য ডনের নদী-পথ যথেষ্ট সুরক্ষিত বলিয়া মনে করিল। ক্লেটস্কায়া ও চীর নদীর সঙ্গমস্থলের মধ্যবর্তী অংশে ছিল রুমানীয় ডিভিসনগুলি এবং তারা ক্লেটস্কায়া বাঁকের জার্মান সৈন্যদলের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছিল। আরও পশ্চিমে ছিল ইতালীয় ৮নং আর্মি, এদের অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল গ্যারিবল্ডি। ডনের শাখানদী চীরের তীর ধরিয়া রুমানীয়দের আর-একটি দ্বিতীয় সারির আত্মরক্ষার লাইন ছিল। ইহা ছাড়া চীর ও ডনের সঙ্গমস্থলের এলাকাগুলি দুর্গায়িত করা হইয়াছিল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বলা যাইতে পারে যে, স্ট্যালিনগ্রাদে অবস্থিত জার্মান-বাহিনীর বামপার্শ্ব ও পিছনের দিক ততটা মজবুত ছিল না,—আত্মরক্ষার যে সমস্ত ব্যবস্থা ছিল, পরবর্তী কালের ঘটনায় সেগুলি যথেষ্ট পাকাপোক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ডন ও ভল্‌গা নদীর মধ্যবর্তী ফাঁকে অক্টোবর মাসে রুশ সৈন্যেরা যে ধরনের পাল্টা-আক্রমণ করিতেছিল তার সবচেয়ে বৃহত্তর কোন আক্রমণ ঘটিবে বলিয়া জার্মানরা বিশ্বাস করে নাই।

স্ট্যালিনগ্রাদ হইতে কোটেলনিকোভো হইয়া দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিমগামী আর একটি প্রধান রেলপথ (যাহা রস্টোভ ও নভোরোসিস্ক বন্দরের সঙ্গে যুক্ত ছিল) যথেষ্ট

পরিমাণ রুমানীয় সৈন্যদের রক্ষণাধীন ছিল। এখানে অন্ততঃ ৮টি পদাতিক ৪টি অশ্বারোহী এবং একটি ট্যাঙ্ক ডিভিসন ছিল, আর কোটেলনিকোভোতে ছিল জার্মান বিমানবহরের আড্ডা। দক্ষিণ দিকের এই শহরটিকে শক্তিশালী শজারুব্যূহে পরিণত করা হইয়াছিল, আর এরজেনী পাহাড়ের রেখা ধরিয়া রুমানীয়দের যে লাইন ছিল, তাহা উপযুক্ত রাস্তাঘাটে ও যোগাযোগের অভাবে দূর-বিস্তৃত ছিল না। কোটেলনিকোভো রেলপথের সমান্তরাল রেখায় ইহা ৬০ মাইল দূরে ছিল এবং যোগাযোগের জন্য এই রেলপথের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। টেরেক নদী উপত্যকায় যে জার্মানবাহিনী ছিল, তাদের বামপার্শ্ব ছিল এলিস্টাতে। এরজেনী পাহাড় এলাকার রুমানীয়েরা অশ্বারোহী টহলদার সৈন্যের মারফৎ কোনও প্রকারে এলিস্টার সহিত সংযোগ রাখিতেছিল।

এই সময় জার্মান সৈন্যেরা শীতের আশ্রয় ও পুনর্গঠনের জন্য যেমন ব্যস্ত ছিল, তেমনিই অন্যদিকে উত্তর আফ্রিকার আর-একটি নাটক জমিয়া উঠিতেছিল। জেনারেল রোমেল বিস্ময়কর বিদ্যুৎগতি জয়ের পর মিশরের এল আলামিন রণক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সেখানে অক্টোবরের শেষে ও নভেম্বরের প্রথমে অষ্টমবাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল মণ্টগোমারী তাঁকে পরাজিত করেন। ইহার পর শুরু হইল রোমেলের অতি দ্রুত পশ্চিমদিকে পলায়ন লিবিয়া মরুভূমির উপর দিয়া। তারপর ৮ই নভেম্বর বিশাল মিত্রবাহিনী (ইঙ্গ-মার্কিন) উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ক্যাসাব্লাংকা ও আলজিরিয়ায় অবতরণ করিল। ১০ই হইতে ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে জার্মান সেনাপতি-দপ্তরের দৃষ্টি ছিল সেখানে। কারণ, লিবিয়া ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ঘটনাবলী ভূমধ্যসাগর ও দক্ষিণ ইউরোপকে প্রভাবান্বিত করিবার সম্ভাবনা জাগাইল। জার্মান বিমানবহর ভূমধ্যসাগরের তীর রক্ষায় এবং পদাতিক ও ট্যাংকবহর দক্ষিণ ফ্রান্সকে নির্বিঘ্ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সুতরাং রাশিয়ার পালটা-আক্রমণাত্মক অভিযানে সুবর্ণ সুযোগ দেখা দিল।

আক্রমণ আরম্ভ

ক্রমে সেই ঐতিহাসিক তারিখ নিকটবর্তী হইল। 'শূন্য ঘণ্টা' বাজিয়া গেল—১৯শে নভেম্বর ভোর রাত্রে দুই ঘণ্টা অবিরাম গোলাবর্ষণের পর লালফৌজের বিরাট পালটা-আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল স্ট্যালিনগ্রাডের জার্মান বাহিনীর দুই পার্শ্বদেশে। যুগপৎ দুই দিকের তিনস্থান আক্রান্ত হইল—উত্তর-পশ্চিমের দুই অংশে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে। অতর্কিত আঘাতের এই অপ্রত্যাশিত বিস্ময় শত্রুকে যেন বিহ্বল করিয়া ফেলিল এবং ইহার ফলাফল এত দূরপ্রসারী হইল যে, সেই সময় কাহারও পক্ষে ইহা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। ডন নদীর তীরে মেদভেদিৎস্কায়ার নিকট রুমানীয়দের অগ্রবর্তী ঘাটিগুলি প্রথম দিনেই গতিশীল সোভিয়েট বাহিনীর দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং পরদিন ২০শে তারিখ যে ২০ মাইল চওড়া ছিদ্রপথের সৃষ্টি হইল, উহার ভিতর দিয়া হাল্কা ও ভারী সাঁজোয়া সৈন্যেরা যেন বানের জলের মত প্রবেশ করিল। একদল রুশ সৈন্য দক্ষিণ-পশ্চিমে চীর নদী এলাকা, অন্যদল ক্লেট্‌স্কায়া এবং ক্যালাচের ঠিক বিপরীত দিকস্থ ডন নদীর দিকে ধাবিত হইল। ২১শে তারিখ জেনারেল রকোসোভস্কির সৈন্যেরা ক্যালাচ শহরে ডন নদী পার হইয়া গেল, এমন কি স্ট্যালিনগ্রাদ-

লিখায়া রেলপথ এলাকায় পর্যন্ত ঢুকিয়া গেল। পরদিন সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত বিস্ময়ে শ্রবণ করিল যে, ফন পাউলাসের স্ট্যালিনগ্রাদ বাহিনীর পিছনের মাত্র ৪৫ মাইল পশ্চিমে ডন নদীর বাম তীরে অবস্থিত ক্যালাচ শহর লালফৌজ দখল করিয়া লইয়াছে। লণ্ডনের সংবাদপত্র ঘটনাটিকে এমনই অবিশ্বাস্য মনে করিলেন যে, তাঁরা ধরিয়া লইলেন যে কোনও একদল বিচ্ছিন্ন রুশ সৈন্য হয়তো স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত দিয়া হঠাৎ শত্রুর পিছনে আসিয়া পড়িয়াছে এবং এক আচমকা আক্রমণে ক্যালাচ শহর কাড়িয়া লইয়াছে। কিন্তু অসম্ভব ঘটনা বাস্তব সত্যকেও যেন ছাড়াইয়া গেল। কারণ, কার্যতঃ
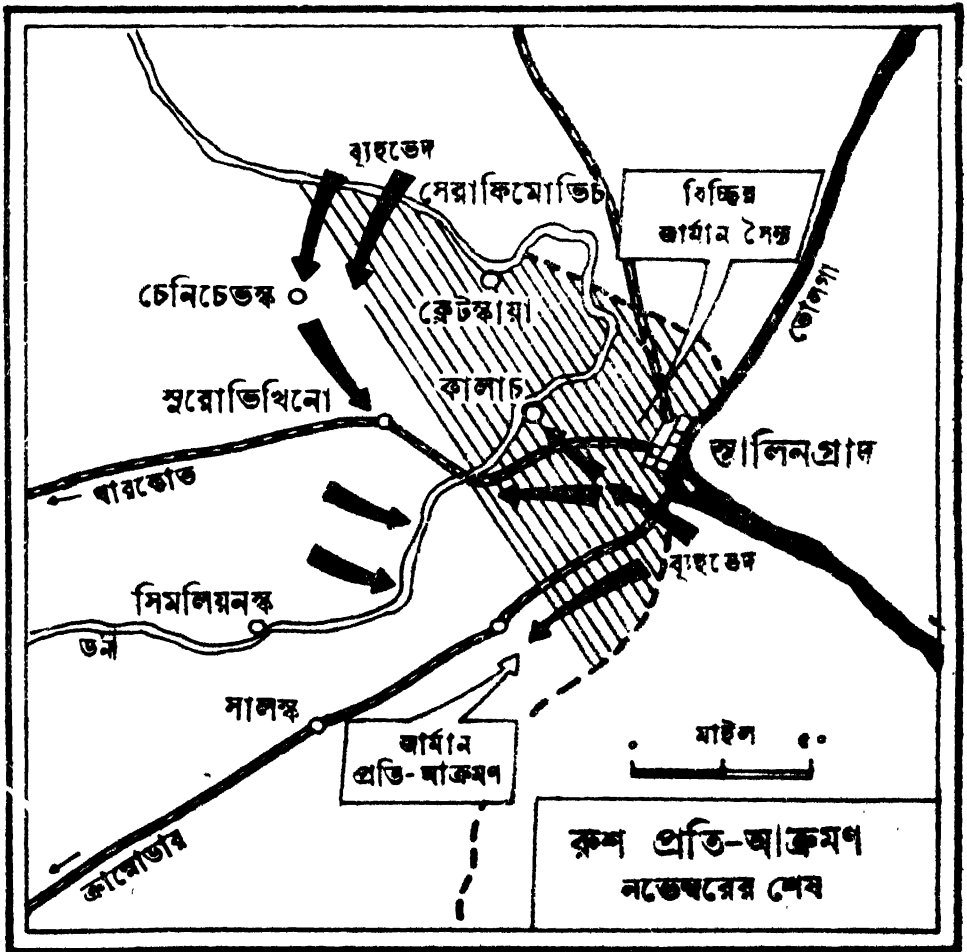
ক্যালাচ-দখলকারী লালফৌজ ডন নদীর বাঁকে ৪০ মাইলেরও বেশী আগাইয়া গেল এবং দুইবার সেই নদী পার হইল। ক্যালাচ অভিমুখে যাইবার পথে রকোনোভস্কির হালকা ও ভারী সাঁজোয়া সৈন্যেরা ক্লেটস্কায়ার পূর্বদিকে ডন নদীর মোড়ে জার্মান ডিভিসনগুলির পার্শ্বদেশ ছিন্ন করিয়া ফেলিল। জেনারেল ভাতুতিনের বাম পার্শ্বের সহযোগিতায় তারা ডন ও চীর নদীর মধ্যে অবস্থিত রুমানীয় সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত এবং অংশতঃ সংহার করিয়া ফেলিল—ফন পাউলাসের বাম পার্শ্বের প্রহরী

সৈন্যেরা এভাবে কুপোকাৎ হইয়া গেল। ভাতুতিন চীর নদীর উজানের দিকে বকোভস্কায়া ও চেরনিসেভাস্কায়ার মধ্যে পৌঁছিলেন এবং ২১শে তারিখ এক চওড়া রণাঙ্গনে লিখায়া স্টেশনের দিকে অগ্রসর হইলেন। ২১-২২শে তারিখ এই এলাকায় প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইল এবং জার্মানরা ১টি ট্যাঙ্ক ৭টি পানেৎসার ও দুটি সাঁজোয়া ডিভিসনের দ্বারা পালটা-আক্রমণ চালাইল। কিন্তু লালফৌজের হাতে প্রচণ্ড মার খাইয়া পরাজিত হইল।

এই আক্রমণের মূল ঘাঁটি ছিল সেরাফিমোভিচ—স্ট্যালিনগ্রাদ হইতে প্রায় ১০০ মাইল উত্তরে এবং শহরটি এই কারণেই খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কিন্তু আক্রমণের গতি ও পরিণতি বর্ণনার আগে রাশিয়ার এই ঐতিহাসিক রণক্রিয়ার প্ল্যান বা নকশা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। এই নকশার পরিকল্পনা এমন কিছু জটিল ছিল না, এমন কি বাহ্যতঃ উহাকে সহজ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু আগে প্রকাশিত হইলে উহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হইত না। কারণ এই রণক্রিয়ার আঙ্গিক বা টেকনিক যত চমৎকারই হউক না কেনা, কার্যক্ষেত্রে উহা প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল কিনা তাহাই ছিল চিন্তার বিষয়। ইহার সাফল্যের আগে পরিকল্পনার সমস্ত কার্য, এমন কি খুঁটিনাটি বিষয়গুলিও সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত করার প্রয়োজন ছিল। সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ, এমন কি কয়েকমাস ধরিয়া ঘড়ির কাঁটার মত সুনির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খলভাবে এই পরিকল্পনা তৈয়ারীর দরকার ছিল। এজন্য সেনানীমণ্ডলীর দপ্তরের কার্য বা স্টাফ ওয়াৰ্ক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। মনে রাখা দরকার যে, ১৯৪২ সালের ১৯শে নভেম্বর লালফৌজের যে পালটা-অভিযান শুরু হইল, তাহা কেবল সারা শীতকালই নহে, বরং আড়াই বৎসর ধরিয়া ১৯৪৫ সালে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসান পর্যন্ত প্রায় একটানা আক্রমণে পরিণত হইয়াছিল। ইহার পর কদাচিৎ লালফৌজ আত্মরক্ষার সমস্যায় পড়িয়াছে এবং তাও ছিল সাময়িক মাত্র। ১৯৪২-৪৩ সালের এই যুগান্তকারী শীতাভিযান সংঘটিত করিয়াছিলেন মার্শাল জুকোভ—১৯৪১ সালের মস্কোরক্ষাকারী বীর সেনানী এবং সমগ্র ইউরোপীয় যুদ্ধের অন্যতম প্রতিভাশালী নায়ক। তিনি মস্কোযুদ্ধের দক্ষ এবং অভিজ্ঞ সহকারীদের লইয়া ভলগা ও ডন রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। পূর্ব বৎসরের খ্যাতিমান সেনাপতিবৃন্দ জেনারেল রকোসোভস্কি, জেরেমেঙ্কো, গলিকোভ এবং ভাতুতিন প্রভৃতি স্ট্যালিনগ্রাদ রণাঙ্গনে দেখা দিলেন। জেনারেল ভ্যাসিলেভস্কি ছিলেন জুকোভের সেনানী মণ্ডলীর কর্মাধ্যক্ষ।

অকটোবর মাস ধরিয়া স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে পভোরিণো রেলপথযোগে এবং দক্ষিণে ভলগা নদীর নিম্নভাগে ক্রাসনোয়ারসিস্কে রুশ সৈন্য ও সমরসম্ভার সমবেত হইতেছিল। উত্তর-পশ্চিমে আগে হইতেই যে রুশ সৈন্যদল সক্রিয় ছিল, তারা এই নূতন সৈন্য সমাবেশকে আড়াল করিয়া রাখিল। সেরাফিমোভিচে কসাকদের যে বৃহৎ জনবসতি ছিল, সেখানে পূর্বাহ্নেই লালফৌজের একটি ক্ষুদ্র সেতুমুখ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৫ই নভেম্বর মধ্যে কর্নেল-জেনারেল রকোসোভস্কির 'ডন বাহিনী' গোপনে সেরাফিমোভিচে হাজির হইল ডন নদী পার হওয়ার জন্য।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, লালফৌজের এই অভিযান যথা সম্ভব অনুষ্ঠানের জন্য সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল এবং অধিকাংশ কাজই রাত্রিবেলার অন্ধকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শীতে ও বরফে অন্ধকার রাত্রে যে

অবর্ণনীয় ক্লেশ ও অবিশ্বাস্য রকমের বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, জার্মানরা এই সম্পর্কে বিশেষ সজাগ ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাদের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ এবং পর্যবেক্ষণকারী বিমানসমূহ লালফৌজের এই গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশের বিশেষ কোন সন্ধান রাখে নাই। অপর পক্ষে রাশিয়ার 'ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস' বা গোয়েন্দা বিভাগ অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে এবং তারা সমস্ত শত্রুঘাঁটির নিখুঁত সন্ধান জানিতে পারিয়াছিল। গৃহীত ফটোগুলি পরবর্তী পরীক্ষা দ্বারা এই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে যে, শত্রুর সন্ধানে তারা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করিয়াছিল।

রকোসোভস্কি সেরাফিমোভিচে উপস্থিত হইয়া এক দুঃসাহসিক মহড়ায় নিযুক্ত হইলেন। ট্যাংক ও গতিশীল বাহিনীগুলিকে লইয়া ডন নদীর বাঁক তিনি পার হইলেন এক দুর্ধর্ষ আঘাতে—ক্লেটস্কায়ার পূর্বে নদীর বাঁকে শত্রু ডিভিসনগুলি ছিন্ন হইয়া গেল। ক্লেটস্কায়ার পাশ কাটাইয়া এই বাহিনীর ক্যালাচের বিপরীত দিকে ডনের তীরে পৌঁছিবার কথা। রকোসোভস্কির দক্ষিণ পার্শ্বের এই 'ছুরিকাঘাতের' পর, তাঁর বাম ও মধ্য ভাগেরও অগ্রসর হইয়া যাওয়ার কথা ক্লেটস্কায়া ও ইলোভ্‌লা নদী মোহনার মধ্যবর্তী ডন নদী ধরিয়া এবং আরও পূর্বদিকে ইলোভ্‌লা ও ভল্গা নদীর মধ্যবর্তী অংশে।

কথা ছিল রকোসোভস্কির দক্ষিণ-পার্শ্ব জেনারেল ভাতুতিনের 'দক্ষিণ-পশ্চিম বাহিনীর' বামপার্শ্বের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিবে। ভাতুতিনের ডিভিসনগুলিও মেদভেদিৎস্কায়া ও বগুচারের মধ্যবর্তী ডন এলাকায় গোপনে সমবেত হইয়াছিল। ডন নদী পার হইবার পর রকোসোভস্কির গতিশীল বাহিনীর সহযোগিতায় ভাতুতিনের বামপার্শ্বের কথা ছিল দক্ষিণ দিকে চীর নদী অভিমুখে চেরনিসেভাস্কায়াতে অগ্রসর হওয়া। ভাতুতিনের উপর ভার ছিল চীর নদী ছাড়াইয়া গিয়া স্ট্যালিনগ্রাদ হইতে লিখিয়া জংশন হইয়া পশ্চিমগামী প্রধান রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া। অর্থাৎ ফন পাউলাসের স্ট্যালিনগ্রাদ বাহিনীর যোগাযোগ নষ্ট করিয়া দেওয়া।

ডন অঞ্চলে যখন লালফৌজের এই পালটা আক্রমণ চলিবে তখন জেনারেল চুইকোভের স্ট্যালিনগ্রাদে আবদ্ধ রুশ সৈন্যরাও নিশ্চয় অলসভাবে বসিয়া থাকিবে না। তাদের কর্মতৎপরতার সঙ্গে যুক্ত হইবে জেনারেল জেরেমেংকোর স্ট্যালিনগ্রাদ-বাহিনী, যারা ইতিমধ্যেই নিম্নবর্তী ভল্গার উভয় তীরে সমবেত হইয়াছিল। তাদের কথা ছিল এরজেনী পাহাড়ের ধারে রুমানীয় ডিভিসনগুলিকে আক্রমণ ও আঘাত করা এবং এক দুর্দমনীয় বর্শাফলকে বিদ্ধ করিয়া ব্যূহ ভেদ পূর্বক স্ট্যালিনগ্রাদ-কোটেলনিকোভো রেলপথে উপস্থিত হওয়া। যদি জেরেমোঙ্কো সাফল্য অর্জন করিতে পারেন, তবে তিনি দ্রুত সেখান হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে ক্যালাচ অভিমুখে অগ্রসর হইবেন এবং এইভাবে স্ট্যালিনগ্রাদ-কোটেলনিকোভোর প্রধান রেলপথটি ছিন্ন করিবেন। মোটামুটি স্ট্যালিনগ্রাদের দুই পার্শ্বদেশে জেনারেল পাউলাসের বিরুদ্ধে মৃত্যুবাণ হানিবার ইহাই ছিল রণনৈতিক পরিকল্পনা এবং ইহার আশু উদ্দেশ্য ছিল জার্মান অধিনায়ককে দুই পাশের প্রধান যোগাযোগ ও সরবরাহের দুইটি প্রধান রেলপথ হইতে বঞ্চিত করা এবং বেষ্টন করা। অর্থাৎ হাতে মারা ও ভাতে মারা—চলিত বাংলায় ইহাই ছিল রুশ রণনীতির আসল মর্ম এবং সাফল্যও হইয়াছিল কল্পনাতীত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ১৯শে নভেম্বর রুশ পালটা-অভিযান আরম্ভ হইল এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী জেনারেল রকোসোভস্কি ও ভাতুতিন ডন ও চীর নদীর ক্লেটস্কায়া ও লিখায়ায় পৌঁছিলেন। ইতিমধ্যে জেনারেল জেরেমেংকো তাঁর আক্রমণ শুরু করিলেন ফন পাউলাসের দক্ষিণ পার্শ্বের প্রহরী রুমানীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে। ডন নদীর চেয়েও এখানে যেন বিস্ময়ের মাত্রা বেশী ছিল। কেননা ভল্গা নদী হইতে এরজেনী পাহাড় পর্যন্ত সমগ্র ভূমি ছিল একেবারে সমতল এবং সম্পূর্ণরূপে খোলা। সুতরাং শত্রুর পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি হইতে আড়াল পাইবার কথা নয়। এখানে প্রথম দিনের সাফল্য বা ব্যর্থতাই চূড়ান্ত হইবার কথা ছিল। ভৌগোলিক অবস্থার এই অসুবিধার জন্য জেনারেল জেরেমেঙ্কো গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর সৈন্যদলের একাংশ মাত্র ভল্গার পশ্চিম তীরে সমবেত করিতে পারিয়াছিলেন। বাকি সৈন্যবলবৃদ্ধি বা সরবরাহের জন্য তাঁকে অপেক্ষা করিতে হইল পূর্ব তীরের উপর এবং তাও আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পর। সেই সময় ভল্গা নদীতে কিছু কিছু বরফ জমিয়াছিল। সুতরাং নদী পার হওয়া কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক ছিল। তবু, এই দুঃসাধ্য সাধন করিতে হইল। ২০শে তারিখ রুমানীয়দের লাইন বিদ্ধ হইল এবং পরদিন স্ট্যালিনগ্রাদ-কোটেলনিকোভো রেলপথের আবগানেরোভো স্টেশন দখল হইল। ২২শে তারিখ আরও দুইটি স্টেশন জেরেমেংকো কাড়িয়া লইলেন—ছিদ্রপথ ১৫ মাইলের অধিক চওড়া হইল এবং রুমানীয় সৈন্যরা দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল—বেশীর ভাগ পরাজিত সৈন্য আবগানেরোভোর দক্ষিণে আটকা পড়িল। রুশ ইস্তাহারে চার দিনের যুদ্ধে ২৪ হাজার রুমানীয় সৈন্য বন্দী হইবার দাবী জানানো হইল। এভাবে জার্মানীর দুই পার্শ্বদেশ অতি দ্রুত ছিন্ন হইয়া গেল এবং প্রধান যোগাযোগের দুইটি পথ বিচ্ছিন্ন হইল। তথাপি জার্মানরা ঘোষণা করিল যে, মাত্র 'স্থানীয় পরাজয়' ঘটিয়াছে। কিন্তু ডন ও ভল্গা নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় লালফৌজ-এর চাপ বাড়িয়াই চলিল। তখন স্ট্যালিনগ্রাদের ধ্বংসস্তূপে জেনারেল ফন পাউলাস বিচলিত হইলেন।

তাঁর প্রথম নজর পড়িল চীর নদীর ও ডনের সঙ্গমস্থলের দিকে। এখানে স্ট্যালিন-গ্রাদ হইতে রেলপথ লিখায়া হইয়া মিলেরোভো অভিমুখে পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে। যদিও ডন ও ভল্গার মধ্যে ফন পাউলাসের হাতে মজুত সৈন্য বেশী ছিল না, তথাপি রেলপথ ও সেতুরক্ষাকারী রুমানীয় ও জার্মান সৈন্যদের সাহায্যের জন্য তিনি যান্ত্রিক বাহিনী পাঠাইলেন। পশ্চিম দিকে তাঁর পিছনে ডন ও ডন-ভল্গা খালের দিকে (যুদ্ধের সময় এই বৃহৎ খাল নির্মাণের অবস্থায় ছিল) মুখ করিয়া তারা দাঁড়াইল। কিন্তু ৪।৫ দিন তীব্র লড়াইয়ের পর জার্মানরা বিষম পরাজিত হইল—ক্লেটস্কায়া হইতে ক্যালাচ পর্যন্ত ডন বাঁকের গোটা পশ্চিমতীর সম্পূর্ণরূপে শত্রুকবলমুক্ত হইল ২৫শে নভেম্বর মধ্যে। আর ২৩শে নভেম্বর তারিখ রুশরা দাবী করিল যে, ফন পাউলাসের সৈন্যরা স্ট্যালিনগ্রাদ এলাকায় বেষ্টিত হইয়াছে।

দক্ষিণে জেরেমেংকোর আক্রমণ আবগানেরোভো ছাড়াইয়া ডনের দিকে অগ্রসর হইল এবং ক্যালাচের ২০ মাইল দূরে উপস্থিত হইল। ক্যালাচ তখন রকোসোভস্কির হাতের মুঠিতে। ফন পাউলাসের চারিদিকে যে আংটি তৈয়ার হইতেছিল, তাহা ক্রমশই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। জেরেমেঙ্কো দক্ষিণ-পশ্চিম আকসাই নদীতীরে পৌঁছিলেন। এরজেনী পাহাড় ও ডন নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় তিনি আর-একবার এক 'মুষ্ট্যাঘাত'

হানিলেন এবং রুমানীয় সৈন্যদের বাকি যে ডিভিসনগুলি ছিল সেগুলিও ধ্বংস হইয়া গেল। এই রণাঙ্গনে ৬৫ হাজার-এর অধিক শত্রুসৈন্য বন্দী হইল, সহস্রাধিক ট্যাংক ধরা পড়িল এবং শতাধিক বৃহৎ রসদখানা ও গোলাধার এবং প্রচুর কামান ও মেসিনগান রুশদের হাতে পড়িল। ডন, ভল্গা নদীর এক সপ্তাহের যুদ্ধের যে গুরুতর ফলাফল দাঁড়াইল, তাতে জার্মান হাইকমাণ্ড আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁরা একটি জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হইলেন।

সেরাফিমোভিচের ঘাঁটি হইতে যে প্রত্যাক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা পাখার মত ছড়াইয়া পড়িল ডন নদীর বাঁকের পূর্বাংশে এবং উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের যুগপৎ আক্রমণে জেনারেল পাউলাসের দুইটি প্রধান যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ডন বাঁকের এলাকায় রকোসোভস্কির আক্রমণই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক হইয়াছিল এবং এই আক্রমণের বেগ সামলাইতে না পারিয়া দলে দলে শত্রুসৈন্য ধরা দিতে লাগিল স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তরে। রুশরা অনবরত গোলা দাগিয়া রাস্তাঘাট ও রেলপথ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছিল। কর্নেল-জেনারেল ভরোনোভের অধীন গোলন্দাজ বাহিনী এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এই যুদ্ধে। যখন জার্মানরা ধরা পড়িল তখন দেখা গেল যে, তারা রাশিয়ার শীতে অত্যন্ত কাতর ছিল। শাল, কম্বল এমন কি স্ত্রীলোকের ফ্লানেল স্কার্ট পর্যন্ত তাদের গায়ে ছিল—যে-কোন রকমের গরম পোশাক তাদের নিকট দুর্লভ বস্তু ছিল। তথাপি তারা প্রাণপণে বাধা দিল এবং একটা সুসংবদ্ধ প্রত্যাক্রমণের চেষ্টা করিল। কিন্তু লালফৌজের 'স্টিম-রোলার' সমস্ত বাধা চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

২৫শে নভেম্বর রুশ-জার্মান যুদ্ধের আর-একটা লাল তারিখ। কারণ, ঐ দিন রকোসোভস্কির সৈন্যরা অবরুদ্ধ স্ট্যালিনগ্রাদ শহরের উত্তর শহরতলীতে পৌঁছিল এবং চুইকোভের ৬২নং বাহিনীর সহিত হাত মিলাইল। চুইকোভ অনন্যসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে স্ট্যালিনগ্রাদ শহরের পূর্বাংশে ভল্গার তীর হইতে ফন পাউলাসের সৈন্যদিগকে প্রতিরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। রকোসোভস্কি তাঁর সাহায্যের জন্যেই এই পালটা-আক্রমণ চালাইয়া ছিলেন এবং এতদিনে অবরুদ্ধ শহরের সেই প্রতিরোধ সার্থক হইল। দুই বাহিনীর মিলন ঘটিল শহরতলীতে। জনৈক সোভিয়েট সংবাদদাতা সেই নাটকীয় দৃশ্যের বর্ণনায় বলিতেছেন—

'২৪শে নভেম্বর বেলা ১টার সময় স্ট্যালিনগ্রাদ রণক্ষেত্রের যে সমস্ত সোভিয়েট রেডিও স্টেশন লালফৌজের সহিত কার্য করিতেছিল, সেগুলি হইতে অকস্মাৎ একটা ধ্বনি উঠিল—'হুররা!' ১০ মিনিট ধরিয়া এই ধ্বনি চলিল। তারপর বিভিন্ন 'ওয়েভলেংথে' একই সঙ্গে বহু কণ্ঠে নির্গত এই ঘোষণাবাণী শুনা গেল যে, উত্তর দিক হইতে ভল্গানদীর তীর ধরিয়া আমাদের যে সমস্ত বাহিনী অগ্রসর হইতেছিল, তারা স্ট্যালিনগ্রাদরক্ষী উত্তর বাহিনীর, (কর্নেল গরোকোভের অধীন) সহিত লটোসাঙ্কা গ্রামে পরস্পরের সহিত হাত মিলাইয়াছে।...

'যখন লালফৌজের পতাকাবাহী সৈন্যদিগকে দূরে প্রথম দেখা গেল, তখন স্ট্যালিন-গ্রাদের উত্তর শহরতলীর সৈন্যেরা আর ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিল না। তারা ছুটিয়া ধাইয়া গেল পলায়মান শত্রুসৈন্যদের পিছনে, বেয়নেট চালাইয়া, রাইফেলের বাঁট দিয়া আঘাত হানিয়া এবং হাতবোমা ছুঁড়িয়া তারা পথ করিয়া লইল এবং টহলদারী

সৈন্যদের সঙ্গে মিশিয়া গেল। তারপর তাদের সঙ্গে লইয়া আগাইয়া গেল উত্তর হইতে আগত কমরেডদিগকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য। তখন তারা লটোসাঙ্কা গ্রাম কাড়িয়া লইয়াছে।...

'তারপর আর একবার রেডিও ধ্বনি হইল এবং সৈন্যদিগকে আক্রমণের জন্য হুকুম দেওয়া হইল। উত্তর ও দক্ষিণের সৈন্যদল একত্রে রণাঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বেলা দুইটার সময় লটোসাঙ্কার পশ্চিমে তারা কয়েকটা উঁচু টিলা দখল করিল। কয়েকদিনের মধ্যেই তারা বৃহৎ ট্রাকটর কারখানার নিকটবর্তী কয়েকটি শ্রমিক উপনিবেশ ও রাস্তা অধিকার করিল।'

স্ট্যালিনগ্রাদে দুইটি রুশবাহিনীর মিলনের দুইদিন পর লালফৌজ আর-একটা আঘাত হানিল—দূরে, অনেক দূরে মধ্য রণাঙ্গনে। রাশিয়া যে সূক্ষ্ম রণনীতি অনুসরণ করিতেছিল এবং যাহা ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মাভিযানে পূর্ণরূপ পাইয়াছিল, তার শুরু এখান হইতে। এই রণনীতিতে দেখা যাইতেছিল যে, রাশিয়া এক দীর্ঘ বিস্তৃত রণাঙ্গনে আঘাত হানিতেছে—আজ এখানে, কাল সেখানে কিংবা পরশু আরও শত শত মাইল দূরে। যদিও আক্রমণগুলি বাহ্যত বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইতেছিল, তথাপি উহা ছিল একটা বৃহৎ নকশারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্তমানে এই আক্রমণ ঘটিল ভেলিকিলুকির পূর্বে ও জেবের পশ্চিম—জার্মান যোগাযোগ কেন্দ্রগুলি লক্ষ্য করিয়া। কিন্তু সংগঠনের দিক দিয়া এই আক্রমণের সঙ্গে স্ট্যালিনগ্রাদ রণক্ষেত্রের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, ইহা ছিল নিতান্তই বিভ্রান্তকারী আক্রমণ। ইহার উদ্দেশ্য ছিল জার্মানদিগকে উত্তর-পশ্চিম আটক করিয়া রাখা যেন দক্ষিণ রণক্ষেত্রে এখান হইতে কোন সাহায্য না পাঠাইতে পারে, অথবা কোন দুর্বলতার সন্ধান পাইলে শত্রুকে ঘায়েল করা। পর পর কতকগুলি আক্রমণের দ্বারা রুশরা এখানে জেভ রণক্ষেত্রের সরবরাহ ব্যবস্থা আরও সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিল। কারণ এখান হইতে ভিয়াজমাগামী রেলপথ এবং ভেলিকিলুকি হইতে নেভেলগামী রেলপথ তারা কাটিয়া দিল। ৪ ডিভিসন পদাতিক ও ১ ডিভিসন যান্ত্রিক সৈন্য পরাজিত এবং ৩০ হাজার জার্মান নিহত ও ৪ হাজার বন্দী হইল। কিন্তু জেভের পতন হইল না কিংবা সমগ্র অবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তনও ঘটিল না।

বেষ্টনীর বিরুদ্ধে বেষ্টনী

সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে জেনারেল ফন পাউলাস স্ট্যালিনগ্রাদের তিন দিকে বেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং বন্ধনীর মধ্যে ফেলিয়া তিনি রুশ সৈন্যদিগকে সংহার করিবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, এক সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন হইলেন তিনি নভেম্বরের শেষ ভাগে। তিনি স্বয়ং লালফৌজের পালটা বেষ্টনীর মধ্যে পড়িলেন। সমগ্র ডন ও ভল্গা এলাকায় মোট ৩ লক্ষ নাৎসী সৈন্য আটকা পড়িয়াছিল। অথচ তখনও যদি তিনি চেষ্টা করিতেন, তাহলে এই বেষ্টনী হইতে তাঁর পক্ষে ত্রাণ লাভ যে একেবারে অসম্ভব ছিল; এমন নহে। কারণ লালফৌজ-এর গতিশীল সৈন্যেরাই এই অবরোধের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তখনও তারা সম্পূর্ণ পাকাপোক্ত বেষ্টনী গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। অবশ্য ফন পাউলাসের বাহিনী নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তথাপি যে শক্তি তাঁর ছিল, তা দিয়া সর্বস্ব পণ করিলে তিনি সম্ভবতঃ দুইদিকের যে-

কোন একদিক দিয়া ব্যূহভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন—অবশ্য পৃষ্ঠরক্ষী সৈন্যদল ও ভারী সমর-সম্ভারের বিসর্জনের বিনিময়ে। তাঁর পক্ষে যে দুই দিক দিয়া পরিত্রাণ লাভের সম্ভাবনা ছিল উহার মধ্যে পশ্চিমদিক বা লিথায়াগামী রেলপথের দিক অত্যন্ত অস্টসাধ্য ছিল। কারণ, তখন যে অবস্থা ছিল, তাতে তিনি ঐ অংশ দিয়া ডন নদী অতিক্রম করিতে গেলে তাঁর দুই পার্শ্বদেশে—অর্থাৎ দক্ষিণে রকোসোভস্কি ও ভাতুতিন এবং বামে জেরেমেংকো তাঁকে আক্রমণের দ্বারা ঘিরিয়া ফেলিতেন। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়া, অর্থাৎ কোটেলনিকোভো ও ডননদী—এই অংশ দিয়া চেষ্টা করিলে পাউলাসের ত্রাণ লাভের চেষ্টা অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক হইত। এই দিক দিয়া পশ্চাদপসরণ করিলে জার্মান সৈন্যেরা সম্ভবতঃ সিমলিয়ানস্ক এলাকায় ডন নদী পার হইয়া যাইতে পারিত। মোটকথা ২৫শে হইতে ২৭শে নভেম্বরের মধ্যে ফন পাউলাস স্ট্যালিনগ্রাদ হইতে কোটেলনিকোভো-সিমলিয়ানস্ক অংশ ধরিয়া পালাইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু হিটলার ও জার্মান হাইকম্যান্ড তাতে সম্মত ছিলেন না। অবশ্য পাউলাসের পশ্চাদপসরণের বিরুদ্ধে তাঁদের অসম্মতি ও সংশয়ের অনেক কারণ ছিল। যদি এই পশ্চাদপসরণ ঘটিত, তাহলে দক্ষিণ-পশ্চিমসহ ডন ও ভল্গা নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র ভূখণ্ডের রণনৈতিক সমাবেশ ভাঙ্গিয়া যাইত এবং উহা বেদখল হইত। অথচ এই দেশগুলি দখল করিতে গিয়া জার্মানী বহু মূল্য দিয়াছে। এই অংশে যে প্রভূত পরিমাণ সমরসম্ভার সংগৃহীত ও সঞ্চিত হইয়াছিল, সেগুলি লালফৌজের হাতে পড়িত। অধিকন্তু এভাবে পালাইয়া গেলে রুশদের নিকট পশ্চিম দিক—রস্টোভ-ভরোনেজ রেলপথ এবং ডন নদী ও কামেনস্কের মধ্যবর্তী ডনেৎসের পারঘাটাগুলি অনাবৃত হইয়া যাইত। সর্বোপরি এই প্রকার পশ্চাদপসরণের মানসিক ও নৈতিক প্রতিক্রিয়াও ভাবিবার মত—ইহাদ্বারা স্ট্যালিনগ্রাদে পরাজয় স্বীকার করিয়া লইতে হইত এবং জার্মানবাহিনী ও জনগণের নিকট ফুরারের মর্যাদা সম্পূর্ণ নস্ট হওয়ার একান্ত সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং নাৎসী হাইকম্যান্ড পাউলাসের পলায়নে সম্মতি দিতে পারিলেন না। তাঁরা তাঁকে সেই রুশ বেষ্টনীর ভিতর স্থির দাঁড়াইয়া থাকার আদেশ দিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁকে উদ্ধারের জন্য এক 'রিলিফবাহিনী' তৈয়ার হইতেছে। সুতরাং সেই বাহিনীর আক্রমণের জন্য তিনি অপেক্ষা করিতে থাকুন। বাহ্যতঃ এই প্ল্যানই অবশ্য স্বাভাবিক ও সম্মানব্যঞ্জক ছিল, কিন্তু কার্যতঃ ছিল ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

নভেম্বরের শেষে পাউলাসের বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত হইল এবং তাদের অবস্থা দিন দিন কাহিল হইয়া উঠিতে লাগিল। এই বেষ্টনীর মধ্যে ২২ ডিভিসন জার্মান সৈন্য ছিল (১ লক্ষ ৩০ হাজার) এবং এদের মধ্যে ২ ডিভিসন ছিল রুমেনীয় সৈন্য, যারা দক্ষিণে আবগানেরোভোতে পরাজিত হইয়া উত্তর দিকে পলাইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত ডিভিসনের সৈন্যসংখ্যা পুরা ছিল না। গত কয়েক মাসের যুদ্ধে এই সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়া গিয়াছিল। যান্ত্রিক ডিভিসনগুলির অবস্থাই সব চেয়ে খারাপ ছিল। চতুর্থ ট্যাঙ্ক আর্মির ২২নং ডিভিসনের প্রকৃতপক্ষে কোন পাত্তা ছিল না। ডন ও চীর নদীর সঙ্গমস্থলের যুদ্ধে তারা খতম হইয়া গিয়াছিল এবং অন্যান্য কয়েকটি ডিভিসন ক্যালাচের নিকট পালটা-আক্রমণে খোঁড়া হইয়া গিয়াছিল। এখন যে নূতন ডিভিসন বা নূতন বলবৃদ্ধি ঘটিবে, এমন আশাও

ছিল না। কেননা, ২৭-২৮শে নভেম্বর হইতে পাউলাস ভূমিপথের সমস্ত যোগাযোগ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁর যাহা-কিছু সাহায্য আসিতেছিল সমস্তই আকাশপথে, প্রত্যহ 'জুংকার ৫২' শ্রেণীর প্রায় ৪।৫ শত বিমান গোলাগুলি, খাদ্য বা জ্বালানী লইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এইগুলি আবার রুশদের হাতে মারা পড়িতেছিল। অপর পক্ষে কাছাকাছি কোথাও তেমন মজুত সৈন্য ফন পাউলাসের ছিল না। ভরোনেজ, রস্টোভ এবং উত্তর ককেশাসের টেরেক নদী বা তুয়াপসে এলাকায় যে সমস্ত জার্মান সৈন্য ছিল, তাদের নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়া পাউলাসকে সাহায্য করা সহজ ছিল না। এই সময় সমগ্র দক্ষিণ রণক্ষেত্রে মোট ৮০।৮৫ ডিভিসন জার্মান সৈন্য ছিল, যেগুলির প্রায় অর্ধেক ছিল জার্মান মিত্রপক্ষের। উত্তর ও মধ্য রণাঙ্গন হইতেও সৈন্য আমদানী কঠিন ছিল। কেননা, সেখানে লালফৌজ প্রবল শক্তিতে দণ্ডায়মান। তারপর সেখানেও তারা পালটা-আক্রমণ ঘটাইল জেভ ও ভেলিকিলুকি এলাকায়। এদিকে উত্তর আফ্রিকায় রোমেলের ভাগ্যবিপর্যয়। সুতরাং ফন পাউলাস সত্যসত্যই নিরুপায় অবস্থার মধ্যে আটকা পড়িলেন।

ফন ম্যানস্টাইনের পালটা-আক্রমণ

তথাপি দক্ষিণ রাশিয়ায় জার্মান রণাঙ্গমের অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, অবিলম্বে কোন জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলেই নয়। ফিল্ড-মার্শাল ফন ম্যানস্টাইন এই সময় গিয়াছিলেন বলকান রাজ্যে—পরিদর্শন কার্যে। তাঁকে প্রত্যাবর্তনের জন্য জরুরী বার্তা পাঠানো হইল এবং স্ট্যালিনগ্রাদে পাউলাসকে উদ্ধারের জন্য রস্টোভ এলাকার সৈন্যদিগকে লইয়া একটি 'রিলিফবাহিনী' গঠনের আদেশ দেওয়া হইল। একটি শক্তিশালী গতিশীল বাহিনী গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি ছুটিয়া আসিলেন। ভরোনেজ হইতে একটি প্যাঞ্জার ডিভিসন (১১ নং) এবং ওরেল হইতে আর-একটি প্যাঞ্জার ডিভিসন (১৭ নং) সংগৃহীত হইল। ৬ষ্ঠ প্যাঞ্জার ডিভিসন আসিল বহু দূর হইতে, মাত্র কয়েক দিন আগে তারা মার্সাই বন্দরে (ফ্রান্স) অবতরণ করিয়াছিল, তাদেরকে অবিলম্বে রস্টোভের ট্রেন ধরিতে হুকুম দেওয়া হইল। ফন ক্লাইস্টের কাছ হইতে আরও দুইটি ডিভিসন যোগাড় করা হইল, যদিও ক্লাইস্ট তখন ককেশাসে রুশদের হাতে সবেমাত্র একটা পরাজয়ের ধাক্কা খাইয়াছিলেন। ফন ম্যানস্টাইন এভাবে বহু কষ্টে যে সৈন্যদল সংগ্রহ করিলেন, সেগুলিকে একটি সুসংবদ্ধ 'রিলিফবাহিনীতে' গড়িয়া তুলিতে তাঁর স্বভাবতই ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় লাগিয়া গেল।

যে পথ ধরিয়া এই প্রত্যাক্রমণ ঘটিবে, তাহা অনুমান করা কঠিন ছিল না। যোগাযোগ ও রাস্তাঘাটের সুবিধাজনক স্থান নির্বাচন করাই সহজ বুদ্ধিসম্মত ছিল। এবং এই উদ্ধারকারী বাহিনীর পিছনের দিকে রেলপথের প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। সুতরাং কোটেলনিকোভোসিমলিযানস্ক এলাকার রেলপথই ম্যানস্টাইন বাছিয়া লইলেন তাঁর সৈন্য-সমাবেশের জন্য। এই লাইনের সহিত রস্টোভ বন্দরেরও যোগ ছিল এবং বাঁধানো সড়কও ছিল। ইহা ছাড়া ককেশাস-এর টেরেক নদী উপত্যকার সহিতও ইহার যোগ ছিল। সুতরাং জরুরী প্রয়োজনে সেখান হইতে অধিকতর সাহায্য আনা যাইতে পারে।

কিন্তু সোভিয়েট হাইকম্যাণ্ড এই পালটা-আক্রমণ সম্ভাবনার প্রতি আদৌ উদাসীন ছিলেন না। কোটেলনিকোভো-সিমলিয়ানস্ক এলাকায় শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রস্তুতির আগেই রাশিয়ার এদিকে নজর ছিল এবং তারা এখানকার অবস্থার গুরুত্ব পূর্ণভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে জেনারেল জেরেমেঙ্কোর অগ্রবর্তী সৈন্যেরা কোটেলনিকোভের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া আকসাই নদী অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বাধার সম্মুখীন হইল। ডন নদীর দক্ষিণ তীরে রকোসোভস্কির একটি গতিশীল বাহিনী সিমলিয়ানস্ক যাইবার পথে চেপুরিনে উপস্থিত হইল। কিন্তু রকোসোভস্কির আসল লক্ষ্য ছিল ফন পাউলাসের বাহিনীর পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গন। বেষ্টিত জার্মান সৈন্যদের তখন অবস্থা শোচনীয়। সারা শীতকাল তাদেরকে এখানেই থাকিতে হইবে বলিয়া তারা ভাবিয়াছিল। অথচ শয্যা, বস্ত্র, জ্বালানী এবং গোলাগুলি ক্রমশঃ ফুরাইয়া যাইতেছিল। প্রচণ্ড শীতে মনুষ্য দেহ যেন অসাড় হইয়া আসিতেছিল, সর্বত্র বরফ এবং মাঝে মাঝে ভয়াবহ বরফ-ঝড় সেই বেষ্টনীর উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল, আর বরফে কামানগুলি পর্যন্ত ঢাকা পড়িয়া গেল। কিন্তু এর মধ্যেও বিশ্রাম নাই, স্ট্যালিনগ্রাদ শহরের পূর্বাংশ ও দক্ষিণ-পূর্বাংশ হইতে রুশরা প্রবল বাধা দিতে লাগিল। তারা ক্রাসনোয়ারমস্কি দখল করিল, পাউলাস তখন তাঁর এই দক্ষিণাংশ আরও উপরের দিকে বেকেটোভকায় সরাইয়া নিলেন। তিনি ক্যালাচের নিকটবর্তী ডন নদীতীর পুনরায় দখলের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল এবং প্রচুর লোকক্ষয় ও শক্তিক্ষয় ঘটিল। পাউলাস তাঁর এই আক্রমণ অত্যন্ত অসময়ে ঘটাইলেন। কেননা তখনও ফন ম্যানস্টাইন তাঁর সেই পালটা অভিযান আরম্ভ করেন নাই। সুতরাং তাঁর চেষ্টা নিতান্তই বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইল এবং যখন ম্যানস্টাইন পালটা-আক্রমণ করিলেন, তখন পাউলাসের শক্তি এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, খুব কম সংখ্যক ডিভিসনই সেই প্রত্যাক্রমণের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে পারিল।

১০ই ডিসেম্বর ফিল্ড মার্শাল ম্যানস্টাইন কোটেলনিকোভো ও সিমলিয়ান্স্ক হইতে উত্তর দিকে তাঁর রিলিফ বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন। ৬নং, ১৭নং ও ২৪নং প্যাঞ্জার ডিভিসন স্ট্যালিনগ্রাদ অভিমুখে রেলপথ ধরিয়া অগ্রসর হইল এবং তাদের দক্ষিণপার্শ্ব ধরিয়া চলিল ১৬নং মোটরারূঢ়, ৪ ও ১৮নং পদাতিক ডিভিসন এবং রুমানীয়ার ২ ডিভিসন অশ্বারোহী সৈন্য। ঐ একই সময়ে আরও দুই ডিভিসন সৈন্য সিমলিয়ানস্ক হইতে ডনের পশ্চিম তীর ধরিয়া অগ্রসর হইল। এই রিলিফ বাহিনীতে মোট দেড় লক্ষাধিক সৈন্য সমবেত হইয়াছিল এবং এর মধ্যে জার্মান সৈন্য-বাহিনীর কয়েকটি সর্বোৎকৃষ্ট দল ছিল। ফলে ১২ই ডিসেম্বর এদের প্রথম আক্রমণের ধাক্কায় রুশ সৈন্যেরা পিছু হটিতে বাধ্য হইল। চার দিনে প্রচণ্ড যুদ্ধে অগ্রবর্তী রুশ সৈন্যেরা ডন নদীর পূর্বতীরে আবগানেরোভো এবং পশ্চিমতীরে চীরনদী অভিমুখে অপসৃত হইল। কিন্তু এই অবস্থা বেশীক্ষণ রহিল না। কেননা, ইতিমধ্যে লালফৌজের পালটা-আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইল এবং সেটা আরম্ভ হইল ১৬ই ডিসেম্বর।

দক্ষিণে জেনারেল জেরেমেঙ্কোর সৈন্যরা আবগানেরোভোর নিকট ডন নদীর উত্তর তীরে কঠিন আত্মরক্ষার সংগ্রামের মধ্যে পড়িল। এখান হইতে ফন পাউলাসের বিরুদ্ধে

রুশ বেষ্টনীর দক্ষিণ প্রান্ত ছিল মাত্র ৩০ মাইল দূরে। সুতরাং জেরেমেঙ্কোর অবস্থা ততটা স্বস্তিকর ছিল না। জার্মানরা ডনের উভয় তীর ধরিয়া তাদের প্রধান আক্রমণ চালাইল এবং বিরুখোভস্কাইয়ের গোলাবাড়ীর চারিদিকে ১৬ই হইতে ১৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে ভয়াবহ ট্যাংক যুদ্ধ ঘটিল। তথাপি ম্যানস্টাইনের যান্ত্রিক সৈন্যেরা পাকাপাকি ভূমি দখল করিতে পারিল না, বরং লালফৌজের অভ্রান্ত গোলন্দাজী আক্রমণে ম্যানস্টাইনের প্রভূত ক্ষতি হইল। দুইদিন পর তার প্রত্যাক্রমণ যেন ঝিমাইয়া পড়িল।

চারি সপ্তাহ হইল মার্শাল জুকোভ তাঁর পালটা-আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলেন স্ট্যালিনগ্রাদে ফন পাউলাসের বিরুদ্ধে। পাউলাসকে উদ্ধারের জন্য ম্যানস্টাইন আবার শুরু করিলেন তাঁর পালটা-আক্রমণ ১২ই ডিসেম্বর এবং ইহা দ্বারা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রুশ অগ্রগতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ হইল, সন্দেহ নাই। তখন আবার ১৬ই ডিসেম্বর শুরু হইল লালফৌজের দ্বিতীয় পর্যায়ের পালটা আক্রমণ—স্ট্যালিনগ্রাদ হইতে ২২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মধ্য ডন এলাকায় এই আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল। স্ট্যালিনগ্রাদের বিরুদ্ধে লালফৌজের অন্তর্বেষ্টনী ও বহির্বেষ্টনী, এই দুই প্রকার অবরোধের সৃষ্টি হইল। অন্তর্বেষ্টনীর উদ্দেশ্য ছিল অবরুদ্ধ জার্মান সৈন্যদিগকে আরও ভিতরের দিকে চাপিয়া ধরা, তাদের মহড়া সঙ্কুচিত করা এবং তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করা। আর বহির্বেষ্টনীর উদ্দেশ্য ছিল বাহিরের দিকে পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে এমন একটি আংটির সৃষ্টি করা যাতে বাহির হইতে কোন জার্মানবাহিনী ফন পাউলাসকে সাহায্য দিতে না পারে। আর নূতন যে অভিযান মধ্য ডন হইতে শুরু হইল, উহার উদ্দেশ্য ছিল ডন বাঁকের এলাকায় শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্দেশ বিপন্ন করা এবং স্ট্যালিনগ্রাদে অবরুদ্ধ ৬নং জার্মান সৈন্যবাহিনীকে সর্বপ্রকার বাহিরের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করা—বিশেষভাবে পশ্চিম দিকের।

তখন ডন নদী জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। মাটিও শক্ত এবং নরম বরফে আচ্ছন্ন ছিল। গোড়াকার যুদ্ধগুলি ঘটিল বরফ-ঝড়ের মধ্যে। ফলে শীতে অভ্যস্ত রুশদেরও দুঃখকষ্টের অবধি রহিল না। কিন্তু জেনারেল ভাতুতিনের দক্ষিণপার্শ্ব চীর নদীর উজানে পশ্চিম অভিমুখে এবং জেনারেল গোলিকোভের (ভরোনেজ রণাঙ্গনের নায়ক) বামপার্শ্ব দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে ক্যালিটভা নদীমুখ ও মনাস্টিরসিনার মধ্যে একযোগে আক্রমণ চালাইল। ১৭ই তারিখ বগুচার দখল হইল, ইতালীয় বাহিনী টুকরা টুকরা হইয়া গেল, ৮ হাজার সৈন্য বন্দী হইল। অতি দ্রুত দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া গোলিকোভের যান্ত্রিক সৈন্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভরোনেজ রস্টোভ রেলপথের কান্টেমিরোভকা স্টেশন দখল করিয়া লইল। গোটা ৮নং ইতালীয় আর্মি হতভম্ব হইয়া গেল এবং শেষে যে দুই-তিন ডিভিসন জার্মান মজুত সৈন্য ডনেৎস নদী এলাকায় ছিল তারা ম্যানস্টাইনকে সাহায্যের বদলে উত্তর দিকে অপসারিত হইল। ম্যানস্টাইন নিজে ভয় পাইয়া গেলেন তাঁর বামপার্শ্ব সম্পর্কে এবং তাঁর সৈন্যদলের একাংশকে পাঠাইয়া দিলেন ডনেৎস অভিমুখে। চার দিনের যুদ্ধে লালফৌজ ৬০ মাইল লম্বা এবং ৩০ হইতে ৫১ মাইল চওড়া রণভূমিতে অগ্রসর হইয়া গেল। রণক্ষেত্রে ২০ হাজার শত্রু সৈন্যের মৃতদেহ পড়িয়া রহিল।

ফন পাউলাস তখনও ক্যালাচের ৩০ মাইল উত্তরে এবং ক্যাচালিনস্কায়ার মধ্যে ডন বাঁকের পূর্ব এলাকায় কয়েকটি ঘাঁটি হাতে রাখিয়াছিলেন। রকোসোভস্কির

প্রধান বাহিনী এখানে আঘাত হানিল এবং কয়েক দিন তীব্র সংঘাতের পর এইগুলি কাড়িয়া লইল। ডন ও ডনেৎস এলাকায় যুদ্ধগুলি তখন চলিতেছিল ডিসেম্বর শেষের প্রবল শীত, বরফবৃষ্টি এবং বরফ-ঝড়ের মধ্য দিয়া। তথাপি দিনরাত্রি যুদ্ধ ও গতিবেগের বিরাম ছিল না। এই বরফ-ঝড়ের মধ্যে কিরূপ অন্ধের মত উভয় পক্ষের সৈন্যকে চলিতে হইত, সেই সম্পর্কে 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের' একজন সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে, একদা একটি রুশ ও জার্মান সৈন্যদল বরফ-ঝড়ে অন্ধ হইয়া একই দিকে মার্চ করিতেছিল—উভয়ের মধ্যে তফাৎ ছিল মাত্র কয়েক শত গজের। কোন পক্ষই কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। অবশেষে রুশেরা জার্মানদের দেখিতে পাইল। কিন্তু নিজেরা সংখ্যায় কম ছিল বলিয়া তাদেরকে আক্রমণ করিল না, বরং সম্মুখের একটা ট্যাঙ্ক-ফাঁদের দিকে অগ্রসর হইতে দিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আর-একদল রুশসৈন্যও সেই একই দিকে মার্চ করিয়া আসিতেছিল। তারা জার্মানদের আক্রমণ করে এবং তারা আত্মসমর্পণ করে। এই প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যেই এই শীতাভিযান অনুষ্ঠিত হইতেছিল।

২৪শে ডিসেম্বরের মধ্যে ফন পাউলাসের স্ট্যালিনগ্রাদ রণক্ষেত্রের এলাকা একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। লালফৌজ তাদের পালটা-আক্রমণের সময় স্ট্যালিনগ্রাদের যে ৫০ বর্গমাইল ভূমি 'হাতুড়ি ও কাস্তের' আকারে (এই বেষ্টনীর রুশ নামকরণ) ঘিরিয়া ধরিয়াছিল, তাহা ফাঁশির দড়ির মত ক্রমশ ফাঁশ আঁটিতেছিল এবং সেই রণক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া যেন একটা ডিম্বাকৃতি ধারণ করিল। রণাঙ্গনের এই রেখা ডন নদীর কোথাও ১০ মাইলের কম নিকটে ছিল না এবং উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে উহা ছিল লম্বায় ৪০ মাইল আর উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে উহা ছিল চওড়ায় ২০ মাইল।

পাউলাসের ত্রাণ পাইবার যখন আর কোন আশা রহিল না, তখন রকোসোভস্কি মন দিলেন ফন ম্যানস্টাইনের রিলিফবাহিনীর ধ্বংস সাধনে এবং সেই জন্য তিনি ট্যাংকবাহিনীর একাংশ পাঠাইয়া দিলেন স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে। সেখানে ২৪শে ডিসেম্বর হইতে আবগানেরোভো ও ডন নদীর মধ্যে এবং ডনের পশ্চিম তীর ধরিয়া লালফৌজ প্রবলবেগে পালটা আঘাত হানিতেছিল। জার্মান সৈন্যরা সেই আঘাত সামলাইতে না পারিয়া পশ্চিম তীর হইতে মিলেরোভের দিকে দ্রুত হটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সেই ঘাঁটির দিকে পূর্বেই ভাতুতিন ও গোলিকোভের সৈন্যরা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। আর ডনের পূর্ব তীর ধরিয়া জেনারেল ম্যালিনোভস্কি ম্যানস্টাইনের যান্ত্রিক ডিভিসনগুলিকে আক্রমণ করিলেন। দুই দিনের যুদ্ধে জার্মানদের পার্শ্বদেশ ছিন্ন হইয়া গেল। জার্মানরা গড়াইয়া পড়িল দক্ষিণে। তবু ম্যানস্টাইন বৃথাই চেষ্টা করিলেন তাঁর পদাতিক ডিভিসনগুলির সাহায্যে আকসাই নদী এলাকায় শেষ রক্ষা করিতে। ২৭শে তারিখ ম্যালিনোভস্কির সাঁজোয়াবাহিনী এই লাইনও ছিন্ন করিয়া ফেলিল এবং দুই দিন পর এক চমৎকার রণকৌশলের মহড়ায় কোটেলনিকোভো দখল করিয়া লইল। ওদিকে ডনের পশ্চিম তীরে সিমলিয়ানস্কায়া অভিমুখে এবং ভাতুতিন ও গোলিকোভমিলেরভোর দিকে অনুরূপ সাফল্য অর্জন

করিলেন এবং ম্যানস্টাইন সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত লইয়া রস্টোভ অভিমুখে ২০০ মাইল পিছনে পলায়ন করিলেন।

অভূতপূর্ব সাফল্য

১৯৪২ সাল শেষ হইয়া গেল। কিন্তু ১৯শে নভেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ৬ সপ্তাহের পালটা অভিযানে লালফৌজ যে সাফল্য অর্জন করিল সামরিক ইতিহাসের বিস্ময়কর যুদ্ধগুলির তুলনায়ও তাহা অদ্ভুত। স্ট্যালিনগ্রাদে অবরুদ্ধ জার্মান সৈন্যদের আর কোন আশা রহিল না—ডন ও ভলগা এলাকার যেমন মুক্তি ঘটিল তেমনিই ডনেৎস অববাহিকা ও পূর্ব উক্রাইনের দ্বার খুলিয়া গেল। একটি স্মরণীয় ব্যাপার এই যে, গত জুলাই মাসে জার্মান গ্রীষ্মাভিযানে রাশিয়ার দক্ষিণ রণক্ষেত্র ডন নদীর যে বিখ্যাত বাঁকে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, এবার লালফৌজের পালটা-অভিযানে দক্ষিণ জার্মান রণক্ষেত্রও সেখানেই ভাঙ্গিয়া গেল। ইহার ফলে ককেশাসের টেরেক কিউবান অঞ্চলেও জার্মানদের উচ্ছেদ ঘটিল।

বৎসরের শেষ দিনে সোভিয়েট প্রচার বিভাগ এই যুদ্ধের ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া একটি চমৎকার ইস্তাহার জারি করিয়াছিলেন। এখানে সংক্ষেপে উহার উল্লেখ করা যাইতেছে—১৯শে নভেম্বর ডন ও স্ট্যালিনগ্রাদ রণাঙ্গনে যে পালটা-আক্রমণ আরম্ভ হইল উহার প্রথম পর্যায়ে শত্রুর পার্শ্বদেশ ছিন্ন হইল এবং স্ট্যালিনগ্রাদের মূল বাহিনী বেষ্টিত হইল। এই যুদ্ধে মোট শত্রুসৈন্য নিহত ৯৫ হাজার, বন্দী ৭২,৪০০ এবং ধৃত ট্যাঙ্ক ১,৭৯২ ও কামান ২,২৩২টি। স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে লালফৌজ ৪৪ মাইল হইতে ৯৫ মাইলের মধ্যে অগ্রসর হইল। ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে ডনে দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণে শত্রুকে বাহিরের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করার এবং তার বহির্গমনের পথ রুদ্ধ করার জন্য যে অভিযান আরম্ভ করা হইল, তাহা ৩০শে ডিসেম্বর শেষ হইল। এই সময়ের মধ্যে সোভিয়েট সৈন্যেরা ৯৫ হইতে ১২৬ মাইলের মধ্যে অগ্রসর হইল। এই যুদ্ধে ৫৯ হাজার নিহত, ৬০,০৫০ জন বন্দী এবং ৩৬৮ বিমান, ১৭৮ ট্যাংক, ১,৯২৭ কামান ও প্রচুর সমরসম্ভার ধৃত হইল। তৃতীয় পর্যায়ের আক্রমণ ঘটিল স্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে কোটেলনিকোভো এলাকায়, যেখান হইতে শত্রুকে উচ্ছেদের জন্য জার্মানরা (ফন ম্যানস্টাইন) শেষ পালটা-আক্রমণ চালাইয়াছিল। এই যুদ্ধে রুশসৈন্যেরা ৬৩ মাইল হইতে ৯৫ মাইল অগ্রসর হইয়া গেল। নিহতের সংখ্যা ২১ হাজার, বন্দী ৫,২০০ এবং ধৃত ট্যাঙ্ক ৯৪ ও কামান ২৯২টি। (দেখা যাইতেছে যে দক্ষিণে হতাহত ও বন্দীর সংখ্যা কম।)

মোট ৬ সপ্তাহের তিন পর্যায়ের রুশ অভিযানে ২২ ডিভিসন জার্মান সৈন্য স্ট্যালিনগ্রাদে বেষ্টিত হইল, অফিসার ও সৈন্যসহ নিহত হইল ১ লক্ষ ৭৫ হাজার, বন্দীর সংখ্যা ১,৩৭,৬৫০ জন। সমগ্র পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানীর মোট সৈন্যসংখ্যা যত ছিল, উহার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ সৈন্য এই যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল।

ধৃত সমর-সম্ভারের মধ্যে ৫৪২ বিমান, ২,০৬৪ ট্যাঙ্ক, ৪,৪৫১ কামান এবং ১৫,৭৮৩টি অশ্ব। আরও বহু প্রকার সামরিক দ্রব্য ও খাদ্যভাণ্ডার ধরা পড়িল এবং নষ্ট হইয়াছিল অগণিত।

এই প্রকার শোচনীয় এবং সর্বনাশকর বিপর্যয়ের পরেও স্ট্যালিনগ্রাদের অবরুদ্ধ ৬নং জার্মান সৈন্যবাহিনীকে আত্মরক্ষার হুকুম দেওয়া হইল। একমাত্র অপঘাত মৃত্যু ছাড়া এর অন্য কোন অর্থ ছিল না। ফন পাউলাস বেষ্টিত ও নিরুপায় হইয়া প্রায় বন্দীশালায় অবস্থানের মতো ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বরকে হিমশীতল অন্ধকার রাত্রির মর্মান্তিক বেদনার মধ্যে বিদায় দিলেন!

দ্বাদশ অধ্যায়

স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মানবাহিনীর আত্মসমর্পণ

স্ট্যালিনগ্রাদ নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া গেল। সোভিয়েট রাশিয়াকে সাবাড় করার হিটলারী দুরাকাঙ্ক্ষা স্ট্যালিনগ্রাদের 'নরক কুণ্ডে' মিলাইয়া গেল! ভল্গার তীরে ফ্যাসিস্ট দিগ্বিজয়ের সমাধি রচিত হইল।

এই সমাধি তৈয়ার হইয়াছিল লালফৌজের অবিস্মরণীয় পালটা-আক্রমণে—১৯শে নভেম্বর, ১৯৪২, থেকে যার শুরু। স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মানবাহিনী যে আংটি বা বেষ্টনী সৃষ্টি করিয়াছিল লালফৌজের বিরুদ্ধে এবং যার ফলে হিটলারী হাইকম্যাণ্ড স্ট্যালিনগ্রাদের মৃত্যু নিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন, এমন কি ২১শে অক্টোবর তাঁরা উক্রাইনের সদর দপ্তর ভিনিৎসা থেকে তাঁদের মূল সদর ঘাঁটি রেস্তেনবুর্গে (পূর্ব প্রুশিয়া) চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই বেষ্টনী লালফৌজের পালটা-বেষ্টনীর মধ্যে আটকা পড়িল। এটা যেন ছিল ইতিহাসের চরম বিদ্রূপ। অর্থাৎ যারা ঘেরাও করিতে আসিয়াছিল তারাই ঘেরাও হইয়া বন্দীদশার মধ্যে আবদ্ধ হইল। সামরিক জগতে এমন ট্র্যাজিক দৃশ্য কদাচিৎ দেখা গিয়াছে।

এত দিন পর্যন্ত গম্ভীর ও বিষণ্ণ মস্কোতে কোন উল্লাসের ধ্বনি শুনা যায় নাই। কিন্তু ১৯শে ও ২০শে নভেম্বর যখন রকসোভস্কির অধীন ডন আর্মি গ্রুপ, ভাতুতিনের অধীন, দক্ষিণ-পশ্চিম আর্মি গ্রুপ, জোরেমেঙ্কোর অধীন স্ট্যালিনগ্রাদ আর্মি গ্রুপ— এই তিনটি সৈন্যবাহিনী পালটা-অভিযান শুরু করিল এবং যখন ২২শে নভেম্বর একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তিযোগে স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে এই প্রচণ্ড পালটা-আক্রমণের কথা ঘোষিত হইল, তখন মস্কোতে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল এবং মস্কোবাসী ধরিয়া লইলেন যে, একটা প্রকাণ্ড কিছু ঘটিতে যাইতেছে।...

স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধের দ্বিতীয় চূড়ান্ত পর্যায়ে উপরোক্ত তিন ফ্রণ্ট মিলিয়া মোট রুশ সৈন্যের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৫০ হাজার। অপর পক্ষে জার্মানীরও অনুরূপ সংখ্যক সৈন্য ছিল এবং ট্যাংক, কামান ও প্লেন উভয় পক্ষে সমান সমান ছিল, যেমন রুশ পক্ষের ছিল ৯০০ ট্যাংক, আর জার্মানদের ৭০০, রুশদের ১৩ হাজার কামান, আর জার্মানদের ১০ হাজার এবং রুশদের ১১ শত প্লেন আর জার্মানদের ১২ শত।

কিন্তু সৈন্য ও অস্ত্রশক্তির এই বাহ্যিক সমতা সত্ত্বেও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, 'আঘাতের মর্মস্থানে' রুশদের ছিল অতুলনীয় শ্রেষ্ঠতা। এই শ্রেষ্ঠতা ইতিপূর্বে রুশ-জার্মান রণাঙ্গনে আর কখনও অর্জিত হয় নাই। সরকারী সোভিয়েট ইতিহাসেই স্বীকার করা হইয়াছে যে, স্ট্যালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের আঘাতের স্থানগুলিতে রুশপক্ষ সৈন্যসংখ্যায় তিন গুণ এবং অস্ত্রসজ্জায়—বিশেষভাবে গোলাগুলি ও মর্টার কামানে চার গুণ শ্রেষ্ঠতা অর্জন করিয়াছিল।[১]

সুতরাং এ শ্রেষ্ঠতা যে যুদ্ধের ফলাফল নিয়ন্ত্রিত করিবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না।

১। Russia At War—P. 453.

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে, পশ্চিমী লেখকবর্গ প্রচার করিয়াছেন যে, স্ট্যালিনগ্রাদে রাশিয়ার এই অভূতপূর্ব জয়লাভে সহায়তা করিয়াছে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের প্রদত্ত সামরিক সাহায্যগুলি। কিন্তু আসল সত্য এই যে, ইঙ্গ-মার্কিন প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হইলেও তখন পর্যন্ত এই সাহায্য রুশ পক্ষের বিশেষ কোন কাজে আসে নাই। আসলে ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে ও শরৎকালে রাশিয়ার নিজস্ব ইণ্ডাস্ট্রি বা কল-কারখানা হইতে যে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও সমরসম্ভার উৎপন্ন হইয়াছিল, সেগুলির সাহায্যেই রাশিয়া স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ জয় করিয়াছিল। পশ্চিমীদের প্রেরিত ট্যাঙ্ক, লরী ও জীপের একটা সামান্য অংশ মাত্র রাশিয়া ব্যবহার করিয়াছিল। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত পশ্চিম থেকে রাশিয়ার নিকট ৭২ হাজার লরী ডেলিভারী নেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু রুশদের স্ট্যালিনগ্রাদ অভিযান আরম্ভ করার সময় এই সাহায্যের বেশীর ভাগই কাজে লাগে নাই।

কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদের এই ঐতিহাসিক পালটা-আক্রমণের পরিকল্পনা রচনার কৃতিত্ব কার? যুদ্ধের গোড়াতে এই সম্পর্কে জেনারেল জুকোভের নামই বেশী প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর এবং নিকিতা ক্রুশ্চেভের আমলে জুকোভের কৃতিত্বকে তেমন কোন মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু আসল সত্য এই যে, এই পশ্চাদ-আক্রমণের নকশা ও পরিকল্পনা রচনায় কার্যকর করার কৃতিত্ব প্রধানত তিনজনের—স্ট্যালিন, জুকোভ ও ভ্যাসিলেভস্কির। হাইকমাণ্ডের এই তিন প্রধান পুরুষ স্ট্যালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের তিন সৈন্যাধ্যক্ষ ভাতুতিন, রকোসোভস্কি এবং জেরেমেঙ্কোর সঙ্গে পরামর্শ ও আলোচনা করিয়াছিলেন। অকটোবর ও নভেম্বর মাসে ভ্যাসিলেস্কি ও জুকোভ সম্ভাব্য রণক্রিয়ার স্থানগুলিও পর্যবেক্ষণ করিয়া গিয়াছিলেন।

রক্ষণশীল ইংরাজ লেখক এ্যালান ক্লার্কও জুকোভের কৃতিত্বের অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, যখন রুশ কর্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিলেন যে দক্ষিণ দিকেই চূড়ান্ত যুদ্ধের অনুষ্ঠান হইবে, তখন ১৯৪১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরের পালটা-আক্রমণে মস্কো যুদ্ধজয়ী সেই বিখ্যাত টীম স্ট্যালিনগ্রাদে আসিয়া হাজির হইলেন।

'...the same than that had evolved the battle winning plan for the Moscow counter-offensive was moved to Stalingrad : Voronov, the artillery specialist, Novikov, chief of the Red Air Force and Zhukov, the one commander in the Soviet Army who had never been defeated'[১]

অর্থাৎ স্ট্যালিনগ্রাদে আসিয়া হাজির হইলেন মস্কোবিজয়ী সেই বিখ্যাত টীম—গোলন্দাজীতে ভরোনোভ, লাল-ফৌজের বিমান বাহিনীর প্রধান নোভিকোভ এবং জেনারেল জুকোভ—সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর এমন একজন কমাণ্ডার, যিনি কখনও পরাজিত হন নাই।

বলা বাহুল্য যে, এই ঐতিহাসিক পালটা-অভিযান সংগঠিত করার জন্য নূতন সৈন্যদলের সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণ হইতে শুরু করিয়া সমগ্র সংগঠন গড়িয়া তোলার জন্য দীর্ঘ সময় এবং অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়াছিল। আর দরকার

১। 'Barbarossa' by Alan Clark. P. 251.

হইয়াছিল সমগ্র অভিযান অত্যন্ত গোপনে সংগঠনের জন্য সর্বপ্রকারের মন্ত্রগুপ্তি ও গোপনীয়তা রক্ষা করার। এই গোপনীয়তার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বব্যঞ্জক ছিল—শত্রুর কাছ থেকে সমস্ত সংবাদ গোপন করিয়া রাখার প্রয়োজন ছিল আকস্মিক দুর্দান্ত পাল্টা-আঘাত হানার উদ্দেশ্য। অতর্কিত প্রচণ্ড আক্রমণে শত্রুকে সম্পূর্ণ বিমূঢ় করিয়া দেওয়াই ছিল এই পাল্টা-আঘাতের আসল লক্ষ্য। এজন্য সোভিয়েট হাইকমাণ্ড কঠোর বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই কঠোরতা এমন ছিল যে পাল্টা-আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব হইতেই তিনটি সৈন্যবাহিনীর সমস্ত সৈন্য ও তাদের পরিবর্গের মধ্যে সর্বপ্রকার চিঠির আদান-প্রদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রধানত রাত্রিবেলা অন্ধকারের মধ্যে সৈন্যদের আনয়ন করা হইতেছে আক্রমণের বিন্দুগুলিতে। বলা বাহুল্য যে, জার্মানদের গোলাগুলি বর্ষণে বিধ্বস্ত রাস্তাঘাট ও রেললাইন ধরিয়া প্রচুর সংখ্যক সৈন্য ও সমরসম্ভার আনয়ন ও সমাবেশ করা অত্যন্ত দুরূহ ছিল। এমন কি কোন সময় জার্মানদের নাকের উপর দিয়াই ভল্গা নদীতে ফেরী পার করিয়া সৈন্যদের আনা হইয়াছিল। সর্বপ্রকার গোপনীয়তা এমনভাবে রক্ষা করা হইয়াছিল যে, জার্মান গোয়েন্দা বিভাগ লালফৌজের পাল্টা-আক্রমণের এত ব্যাপক প্রস্তুতির কিছুই টের পায় নাই। জার্মান পক্ষ এই প্রকার প্রচণ্ড ও ব্যাপক আক্রমণে একেবারে হতবাক ও বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল। জার্মান হাইকমাণ্ডের জেনারেল জডল্ নুরেমবার্গ আদালতের মামলায় স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁরা এই পাল্টা-আক্রমণ সম্পর্কে কোন খবরই রাখিতেন না।[১]

বলা বাহুল্য যে, এভাবে পাল্টা-আক্রমণ সংগঠিত করা রুশ পক্ষের এবং বিশেষভাবে সোভিয়েট হাইকমাণ্ডে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল। এউ সম্পর্কে দুইজন বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছেন—

'First there was very efficient planning and a perfect adjustment of plans to the actual conditions of those sections of the enemy's front which it was intended to attack.

A high degree of secrecy in preparation and perfect timing achieved complete surprise.'[২]

অর্থাৎ জার্মানীর বিভিন্ন রণাঙ্গনের আসল অবস্থার সন্ধান লওয়া এবং সেই অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে খাপ খাওয়াইয়া নিখুঁত পরিকল্পনা ও পূর্ণাঙ্গ নকশা তৈয়ার করিতে হইয়াছিল। প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত গোপনীয়তার আশ্রয় নিতে হইয়াছিল এবং সময়ের প্রশ্নও ঘড়ির কাঁটার মত স্থির করিয়া নিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত কারণেই অতর্কিত আক্রমণের এতখানি বিস্ময় সৃষ্টি হইয়াছিল।

সোভিয়েটপক্ষ শত্রুপক্ষের বিভিন্ন খণ্ড রণাঙ্গনের সমস্ত আত্মরক্ষার ব্যবস্থার অতি বিস্তৃত খবর সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সৈন্য ও সমরসম্ভার সমাবেশ অধিকাংশই রাত্রিযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছিল এবং রণক্ষেত্রের অতি নিখুঁত নকশা তৈয়ার করা হইয়াছিল। ২০ নং রুমেনীয় পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ডিমিট্রিভকে বন্দী করার পর

১। দি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার—জি ডেবোরিন, মস্কো, পৃষ্ঠা ২৬৮।

২। The Russian Campaigns of 1941-1943—by W. C. D. Allen & Paul Muratoff, P. 109.

লালফৌজের একটি আক্রমণের নকশা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, উহার মধ্যে কোন ভুলভ্রান্তি আছে কিনা? রুমেনীয় সেনাপতি মানচিত্রটি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া জবাব দিয়াছিলেন—

'...that the Soviet map was more exact than even the operational map prepared by his own head quarters'[১]

অর্থাৎ রুমেনীয় সেনাপতির নিজের দপ্তর কর্তৃক তৈয়ারী রণক্রিয়ার মানচিত্রের চেয়েও সোভিয়েট ম্যাপ অনেক বেশী নিখুঁত ছিল। এই জবাব থেকেও বুঝা যাইবে যে, পালটা-আক্রমণের পরিকল্পনা রচনায় সোভিয়েট হাইকম্যান্ড খুঁটিনাটি বিষয়েও কিরূপ অসাধারণ দক্ষতা, পরিশ্রম ও সতর্কতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

পালটা-আক্রমণের মাত্র সাড়ে-চার দিনের মধ্যেই জার্মান বাহিনী ষ্ট্যালিনগ্রাদে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিল। রুমেনীয় সৈন্যদের নৈতিক বল আগেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, লালফৌজ কর্তৃক বেষ্টনী সৃষ্টি পর তাদের আর যুদ্ধের পিপাসা ছিল না। বরং দেখা গেল রণাঙ্গণের লাইনের বাইরে বিস্তীর্ণ স্তেপভূমিতে হাজার হাজার রুমেনীয় সৈন্য রুশদের নিকট ধরা দেওয়ার এবং সেই সঙ্গে কিছু খাদ্যের আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্তেপভূমিতে তখন অভাবনীয় দৃশ্য—মানুষের মৃতদেহের সঙ্গে ১০ হাজার ঘোড়ার মৃতদেহ ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ধ্বংস প্রাপ্ত কামান, ট্যাঙ্ক বন্দুক এবং যানবাহন ইত্যাদির দ্বারা সমগ্র স্তেপভূমি যেন পরিকীর্ণ ছিল। আর সেই সঙ্গে জার্মান ও রুমেনীয় সৈন্যদের মৃতদেহ। লালফৌজ কর্তৃক প্রথম ব্যূহভেদের সময় জার্মান রণাঙ্গনে এই ব্যাপক ধ্বংস লীলার বিস্তার হইয়াছিল। কিন্তু তখনও ইচ্ছা করিলে জার্মান বাহিনী বোধহয় লালফৌজের বেষ্টনী থেকে বাহির হইয়া আসিতে পারিত। কারুর কারুর মতে ১৯শে ডিসেম্বর থেকে ২৩শে ডিসেম্বরের মধ্যে যে সময় পাওয়া গিয়াছিল, তাতে অবরুদ্ধ জার্মান বাহিনীর অধিনায়ক পাউলাস বাহির হইয়া আসিতে পারিতেন। এক সময় তিনি হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁর সমস্ত সৈন্যদলকে পুনর্গঠন করিতে এবং খাদ্য ও সরবরাহ ব্যবস্থার যোগাড় করিতে অন্তত কিছু সময় লাগিবে—২ লক্ষ ৭০ হাজার সৈন্যের জন্য ১০ দিনের রেশন তাঁর দরকার। এ ছাড়া পেট্রোলেরও গুরুতর অভাব ছিল, আর ছিল ৮ হাজার আহত সৈন্যের অপসারণের প্রশ্ন। এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়া বিচার-বিবেচনা করিতেই ফন ম্যানস্টাইন (যাঁর উপর ভার দেওয়া হইয়াছিল ষ্ট্যালিনগ্রাদের বেষ্টনী থেকে জার্মানদের উদ্ধারের জন্য) এবং ফন পাউলাস ডিসেম্বরের সেই গুরুত্বপূর্ণ চার দিন সময় কাটাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, ষ্ট্যালিনগ্রান থেকে পশ্চাদপসরণের বিরুদ্ধে হিটলারের কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিল এবং উভয় সেনাপতিই হিটলারের নির্দেশ অমান্য করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, অথবা তাঁদের সেই সাহস ছিল না। অধিকন্তু হিটলার ও গোয়েরিং প্রভৃতি পাউলাসকে খুব আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন যে, বিমানযোগে তাঁর অবরুদ্ধ বাহিনীকে এত সরবরাহ দেওয়া হইবে যে, ১৯৪৩ সালের বসন্ত কাল পর্যন্ত তিনি অনায়াসে অবরুদ্ধ অবস্থায়ও কাটাইয়া দিতে পারিবেন।...

১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী 'ষ্ট্যালিনগ্রাদের নরককুণ্ডে জার্মানরা এক ডিম্বাকৃতি রণাঙ্গনে' অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। এই ডিম্বাকৃতি রণাঙ্গন ছিল পশ্চিম থেকে পূর্বে

১। The Second Great War, Vol. 6. P. 2500

৪৪ মাইল এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে ১৪ মাইল—সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগশূন্য হইয়া (একমাত্র কিছু বিমানের আনাগোনা ছাড়া) জার্মানরা ৬ সপ্তাহের বেশী আটকা পড়িয়াছিল। গোয়েরিং যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রতিদিন ৫০০ টন খাদ্য, জ্বালানী ও গোলাগুলি জেনারেল পাউলাসকে সরবরাহ করা হইবে, তাও একান্ত ভুয়া প্রমাণিত হইল। গোয়েরিংয়ের সরবরাহ বিমানের কোন পাত্তা ছিল না। যে জার্মানরা আগস্ট মাসে মদিরামত্ত অবস্থায় মাউথ অর্গান বাজাইতে বাজাইতে ও নৃত্য করিতে করিতে স্ট্যালিনগ্রাদে প্রবেশ করিয়াছিল, তারা আজ কোথায়? আজ অবরুদ্ধ জার্মানবাহিনী শীতবস্ত্রের অভাবে কাতর, ক্ষুধায় অবসন্ন, তাদের কপালে বরাদ্দ জুটিল মাত্র ৪ আউন্স রুটি আর কিঞ্চিৎ ঘোড়ার মাংস।

বলা বাহুল্য যে, খাদ্য ও শীতবস্ত্রের অভাবে স্ট্যালিনগ্রাদের জার্মান সৈন্যেরা অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থায় ছিল। কিন্তু এমন অবস্থায় বিশ্বাস করা কঠিন যে, প্রচুর গরম পোশাক সরবরাহ সত্ত্বেও সেগুলি জার্মান সৈন্যদের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় নাই। নভেম্বর মাসে ৭৬ রেলওয়ে ওয়াগন ভর্তি প্রচুর গরম জামাকাপড় উক্রাইনের বিভিন্ন স্টেশনে জার্মানী থেকে পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু জার্মান সৈন্যদের নিকট সেগুলি ডেলিভারী দেওয়া হয় নাই। এভাবে গরম পোশাক না দেওয়ার কারণ ছিল এই যে, স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ সারা শীতকাল পর্যন্ত প্রলম্বিত হইতে পারে—এমন ধারণা জার্মান হাইকমাণ্ড জার্মান সৈন্যদের মধ্যে সৃষ্টি করিতে দিতে চাহেন নাই![১]

নিজ সৈন্যদলের প্রতি জার্মান সমর কর্তৃপক্ষের কী অদ্ভুত মনোভাব!

* * *

এদিকে ১৯৪৩-এর নববর্ষে ৬নং জার্মানবাহিনীর অধিনায়ক ফন পাউলাসের অবস্থা করুণ ও মর্মান্তিক হইয়া উঠিল! খাদ্য ও জ্বালানী এবং জীবনযাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে তারা নিদারুণ দুর্দশায় পড়িল, এর সঙ্গে দেখা দিল প্রচণ্ড শীত এবং সেই সঙ্গে বাসস্থানের নিদারুণ অভাব। ফলে, ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর গর্তে, খানায়, গহ্বরে, জঞ্জালের আড়ালে, জলের পাইপে, অর্থাৎ যেভাবে একটু মাথা গুঁজিতে পারা সম্ভব, সেই অদ্ভুত চেষ্টাই তারা করিল। অবশ্য যে সমস্ত রুশ নাগরিক তখনও সেই শহরে ছিল, তাদের অবস্থাও অনুরূপ শোচনীয় হইল। শহরের চারদিকে ইতস্ততঃ বোমার টুকরা, গ্যাসমুখোস, নানা ধাতব দ্রব্যের খোসা, ভাঙ্গা এরোপ্লেন, যন্ত্রপাতি, লোহা ও ইস্পাতের টুকরা, অসংখ্য কাগজপত্র, ভাঙ্গা বন্দুক এবং মৃতদেহ ও যুদ্ধের ধ্বংসপ্রাপ্ত অজস্র অস্ত্রশস্ত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মড়ার মাথা, খুলি, কঙ্কাল এবং হাড়ের টুকরা ও গলিত শবেরও কোন ইয়ত্তা ছিল না। এক ভয়াবহ বীভৎস শ্মশানে শত্রুমিত্র যেন একাকার হইয়া গেল।

কিন্তু এই অবস্থা চলিতে পারে না। সুতরাং রুশ কর্তৃপক্ষ জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে স্ট্যালিনগ্রাদ নাটকের যবনিকাপাত করিতে চাহিলেন। ডন ফ্রণ্টের লেঃ জেনারেল রকোসোভস্কিকে এই দায়িত্ব দেওয়া হইল এবং পরামর্শদাতারূপে কাজ করিলেন সুপ্রীম কমাণ্ডের প্রতিনিধি হিসাবে মার্শাল ভরোনোভ ও জেনারেল ভ্যাসিলেভস্কি। ৮ই জানুয়ারী তারিখ আত্মসমর্পণের দাবী [illegible] তাঁরা কর্নেল জেনারেল পাউলাসের নিকট 'আলটিমেটাম' বা চরমপত্র পাঠাইলেন।

১। 'Russia At War'—P. 502.

সেই ঐতিহাসিক চরমপত্রের সারমর্ম এখানে ইংরাজীতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :

'The German sixth Army, formations of the 4th Panzer Army and units sent to them as reinforcements have been completely surrounded since November 23.

'...The German troops rushed to your assistance have been routed and their remnants are now retreating towards Rostov. The German air transport force which kept you supplied with starvation rations of food, ammunition and fuel is frequently compelled to shift its bases and to fly long distances to reach you... It is suffering tremendous losses in planes and crews and its help is becoming ineffective...

Your troops are suffering from hunger, disease and cold. The severe Russian winter is only beginning...you have no chance of breaking through the ring surrounding you. Your position is hopeless and further resistance is useless.'[১]

অর্থাৎ এই চরমপত্রে রুশ সামরিক কর্তৃপক্ষ ফন পাউলাসকে জানাইয়া দিলেন যে, জার্মান সৈন্যেরা যেভাবে বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে, তাতে তাদের উদ্ধারের আর কোন আশা নাই। বাইরে থেকে কোন সাহায্য আর আসিবে না। অথচ ক্ষুধায়, ব্যাধিতে ও ঠাণ্ডায় দলে দলে সৈন্যরা মারা পড়িতেছে। আর রাশিয়ার নিদারুণ শীত সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। লালফৌজের এই বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া জার্মানদের ত্রাণলাভের আর কোন সম্ভাবনা নাই। এই অবস্থায় অধিকতর বাধাদান নিতান্তই নিরর্থক। অতএব অনর্থক রক্তপাত নিবারণের জন্য জার্মানবাহিনীর উচিত অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করা।

কিন্তু আত্মসমর্পণের দাবীর সঙ্গে এই চরমপত্রে জার্মানবাহিনীকে আশ্বাস দেওয়া হইল যে, তাদের জীবনের ও নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি দেওয়া হইবে। যুদ্ধাবসানে তাঁরা স্বদেশে বা তাঁদের ইচ্ছামত যে-কোন দেশে তাঁরা যাইতে পারিবেন। প্রত্যেক অফিসার ও সৈন্য তাঁর স্ব স্ব পদ-মর্যাদার চিহ্ন, পোশাক এবং ব্যক্তিগত মূল্যবান দ্রব্যাদি রাখিতে পারিবেন। প্রত্যেককে স্বাভাবিক খাদ্য এবং অসুস্থ ও আহতদিগকে সর্বপ্রকার চিকিৎসার ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে। ৯ই জানুয়ারী বেলা ১০টার মধ্যে এই চরমপত্রের জবাব চাই।

লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই চরমপত্রের শর্তগুলি বিধিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত ছিল, এমন কি এগুলি সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনার পরিচায়কও ছিল। দুইজন রুশ অফিসার সাদা নিশান উড়াইয়া এই চরমপত্র জার্মান লাইনে লইয়া গেলেন। কিন্তু কর্নেল-জেনারেল পাউলাস এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করিলেন। বলা বাহুল্য যে, এর পিছনে ছিল হিটলারের নির্দেশ।

তখন পাউলাসের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। তাঁর সৈন্যসংখ্যা যুদ্ধে ও ব্যাধিতে সাবাড় হইয়া ৮০ হাজারে দাঁড়াইয়াছিল এবং আরও হাজার ৮০ ছিল অ-যোদ্ধার দল, অর্থাৎ সৈন্যদলের সঙ্গে যারা কেরানী থেকে কুলিগিরি পর্যন্ত নানা অ-সামরিক কাজ

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪৬৯।

করিয়া থাকে। কি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এমন শোচনীয় অবস্থাতেও জার্মান সৈন্যরা বেশ জোরের সঙ্গে ও পরাক্রমের সঙ্গে লড়াই করিতেছিল।

চরমপত্র অগ্রাহ্য হওয়ার পর ১০ই জানুয়ারী সকালে ৮টা রুশ আক্রমণ শুরু হইল স্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধের উপসংহার টানিবার আশায়। গোলাগুলি দিক থেকে এই আক্রমণ অতি প্রচণ্ড হইয়াছিল। অবরুদ্ধ জার্মাণ পকেটের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ ধরিয়া ৭ হাজার কামান ও মর্টার একযোগে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। এই গোলাবর্ষণ এত ঘন হইয়াছিল যে, কোন কোন অংশে প্রতি কিলোমিটারে ১৭০টি কামান বা মর্টার গোলা উদ্গীরণ করিতেছিল। জার্মানরা সমগ্র এলাকাকে যদিও খুব সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল, তবু এই প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে তাদের প্রতিরক্ষার ব্যূহ ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু এই অবস্থায়ও জার্মান সৈন্যরা আহত নেকড়ের মত বাধা দিতে লাগিল। কেননা, তাদের ভয় ছিল যে, রুশদের হাতে বন্দী হইলে অপরিসীম নির্যাতন ভোগ করিতে হইবে। জার্মানরা রুশ বন্দীদের উপর যে আচরণ করিয়াছিল, সেই থেকেই তাদের এই ভয় জন্মিয়াছিল। এজন্য ধরা দেওয়ার চেয়ে অনেকে মৃত্যুবরণ করিতেছিল।...

স্তালিনগ্রাদে লাল ফৌজের চূড়ান্ত পর্যায়ের আক্রমণ

১৭ই জানুয়ারী জার্মান সৈনাধ্যক্ষ ফন পাউলাসকে দ্বিতীয়বার আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান করা হইল এবং যদিও এবার পাউলাসের দুইজন সহযোগী জেনারেল রুশ প্রস্তাব মানিয়া নিতে সম্মত ছিলেন, তবু পাউলাস হিটলারের বিনা অনুমতিতে এমন

কার্য করিতে সাহস পাইলেন না। ইতিমধ্যে রুশেরা স্ট্যালিনগ্রাদ নরককুণ্ডের প্রায় অর্ধেকটা পুনরায় দখল করিয়া নিল এবং জার্মান রণাঙ্গন ক্রমশঃ বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। কিন্তু তবু জার্মানরা মরিয়া হইয়া বাধা দিতে লাগিল।

অবশেষে ২২শে জানুয়ারী রুশেরা চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু করিল এবং জার্মানরা স্ট্যালিনগ্রাদের ভিতরের দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতে লাগিল। ২৪শে তারিখ রুশেরা স্ট্যালিনগ্রাদের আত্মরক্ষায় বহির্ব্যূহের লাইনে পৌঁছিল, যে বহির্ব্যূহে তারা নিজেরা ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আত্মরক্ষার যুদ্ধ চালাইয়াছিল। তখন জার্মানরাও বুঝিতে পারিল যে, আর লড়াই চালাইয়া লাভ নাই! কিন্তু হিটলার তখনও আত্মসমর্পণের অনুমতি দিতে রাজী ছিলেন না। বরং জেনারেল পাউলাসকে তখনও যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে উৎসাহ দেওয়া হইতেছিল এবং এই উৎসাহের প্রেরণাস্বরূপ হিটলার কর্নেল-জেনারেল পাউলাসকে হঠাৎ ফিল্ড-মার্শালের সর্বোচ্চ পদবীতে উন্নীত করিলেন। পাউলাসের পক্ষে এটাও ছিল ভাগ্যের পরিহাস। কেননা, তিনি নিজেই উপলব্ধি করিতেছিলেন যে, আর যুদ্ধ চালানো নিবুর্দ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এদিকে কিন্তু জার্মান অফিসার মহলও বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, অবস্থা নিতান্তই সঙ্গীণ। তাঁদের নৈতিক বল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল এবং যে সমস্ত বিমান শেষবারের জন্য বিমান-ময়দান ত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, সেই সমস্ত বিমানে সীট পাওয়ার আশায় অফিসাররা বৈমানিকদিগকে মোটা রকমের ঘুষ দিতে লাগিলেন।

২৬শে জানুয়ারী রুশেরা উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে স্ট্যালিনগ্রাদের মধ্যস্থলে সেই বিখ্যাত মামাই হিলে গিয়া উপস্থিত হইল এবং স্ট্যালিনগ্রাদের দুইটি রুশবাহিনীর সৈন্যেরা এখানে পরস্পরের সহিত হাত মিলাইল। জার্মান সৈন্যেরা দলে দলে মারা পড়িতেছিল। ৩১শে জানুয়ারী খুব সামান্য বাধাই আসিতেছিল জার্মানবাহিনীর পক্ষ থেকে। শহরের যে কারখানা এলাকাগুলি জার্মানরা দখল করিয়া নিয়াছিল, সেগুলি আবার শত্রুর কবলমুক্ত হইল। স্ট্যালিনগ্রাদ নাটকের যবনিকা পড়ার আগে রুশ কামান শহরের প্রধান স্টেশন ও নগরী উদ্যানের (সেন্ট্রাল স্কোয়ার) মধ্যবর্তী কতকগুলি ভাঙ্গা অট্টালিকার উপর গোলাবর্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু এখানেই ছিলেন ৬নং জার্মান আর্মির সেই 'বিখ্যাত' নায়কটি—ফন পাউলাস, যিনি সদ্য সদ্য ফিল্ড-মার্শাল পদবীর দ্বারা স্বয়ং হিটলার কর্তৃক সম্মানিত হইয়াছেন। পাউলাস এখানে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু কিভাবে তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন? সেই কাহিনীও নাটকীয়।

এই নাটকীয় কাহিনীর নায়ক একজন তরুণ রুশ লেফটেনান্ট ফিয়োডোর ইয়েলচেঙ্কো।

ইয়েলচেঙ্কোর নিজস্ব বর্ণনায় দেখা যায় যে, ৩১শে জানুয়ারী রুশ সৈন্যরা স্ট্যালিনগ্রাদ শহরের কেন্দ্রস্থলকে চারিদিক থেকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। এখানে বিধ্বস্ত বহু অট্টালিকাশ্রেণীর মধ্যে একটি তখনও খাড়া ছিল—ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং। এই বিল্ডিংয়ের সম্মুখবর্তী স্কোয়ারটি রুশেরা দখল করিয়া নিয়াছিল। এই সময় ইয়েনচেঙ্কো জানিতে পারিলেন যে, এই বিল্ডিংয়ের মধ্যেই রহিয়াছেন ৬নং জার্মান-বাহিনীর অধিনায়ক স্বয়ং পাউলাস। ইউনিভার্সিটি বিল্ডিংয়ের প্রবেশদ্বার উলটো-দিকের রাস্তাটা ইয়েনচেঙ্কোর সৈন্যরা কাড়িয়া নিয়েছিল। পাউলাস ওখানে আছেন

জানিতে পারিয়া তারা প্রবল উৎসাহে সেই অট্টালিকার উপর কামানের গোলা দাগিতে লাগিল। তখন জার্মানবাহিনীর মেজর-জেনারেল র‍্যাস্কির একজন প্রতিনিধি দরজার ফাঁক দিয়া মাথা বাড়াইল এবং ইয়েলচেংকোর পক্ষে তখন রাস্তা পার হইয়া যাওয়া খুব বিপদের কারণ ছিল। তবু ইয়েনচেংকো সাহসে ভর করিয়া রাস্তা পার হইয়া গেলেন এবং সেই ব্যক্তিটির সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। জার্মান অফিসারটি তখন একজন দোভাষীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং দোভাষীর মারফৎ বলিলেন:

'Our big chief wants to talk to your big chief."

'আমাদের বড়কর্তা আপনাদের বড়কর্তার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

ইয়েলচেংকো জবাব দিলেন—'দেখুন, আমাদের বড়কর্তার অন্যান্য অনেক কাজ আছে। তাঁকে পাওয়া যাবে না। যদি কথা বলতে হয়, তবে আমার সঙ্গেই বলতে হবে।'

যখন এই সমস্ত কথাবার্তা চলিতেছিল, তখনও স্কোয়ারের উলটো দিক থেকে গোলাগুলি আসিতেছিল। ইয়েলচেংকো তখন তাঁর ইউনিটের আরও কয়েকজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, ১২ জন সৈন্য এবং ২ জন অফিসার আসিয়া ইয়েলচেংকোর সঙ্গে যোগ দিলেন। বলাই বাহুল্য যে, তাঁরা সকলেই সশস্ত্র ছিলেন। জার্মান অফিসারটি তখন বলিলেন—'না, এত লোক এলে চলবে না।' আমাদের বড়কর্তা মাত্র একজন বা দুজনের সঙ্গে কথা বলতে চান।'

ইয়েলচেংকো জবাব দিলেন—না, তিনি একা যেতে রাজী নন। যা হোক, শেষ পর্যন্ত স্থির হইল যে, তিনজনে মিলিয়া 'বড়কর্তার' সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন।

তখন তাঁরা তিনজনে মাটির নীচের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন—সেই ঘরের দৃশ্য তখন অভাবনীয়। জার্মান সিপাই সৈন্যে ঘর গিজগিজ করিতেছিল, আর কী নোংরা এবং দুর্গন্ধ—জঘন্য পোশাক পরা সব ক্ষুধার্ত সৈন্য। তাদের চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন। বাইরে কামানের গোলাগুলি থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা দলে দলে পালাইয়া মাটির নীচের ঘরে আসিয়া আশ্রয় নিয়াছিল।

ইয়েলচেংকো এবং তাঁর সঙ্গী দুজনকে মেজর-জেনারেল র‍্যাস্কি এবং ৬নং জার্মান বাহিনীর অধ্যক্ষ লেঃ জেনারেল স্মিডট-এর সামনে আনা হইল। তাঁরা ইয়েলচেংকোকে বলিলেন যে, তাঁরা পাউলাসের পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণের আলোচনা চালাইতে চান। 'কেননা, কাল থেকে পাউলাস কোন বিষয়েই কোন কথাবার্তার জবাব দিচ্ছেন না।'

ইয়েলচেংকোর কাছে ব্যাপারটা রহস্যজনক বলিয়া মনে হইল। কেননা, কে যে ভারপ্রাপ্ত অফিসার তা বুঝা গেল না। পাউলাস কি তাঁর ক্ষমতা ও দায়িত্ব রাস্কির উপর অর্পণ করিয়াছেন? অথবা পাউলাস ব্যক্তিগতভাবে আত্মসমর্পণের দায়িত্ব এড়াইতে চান? অথবা একজন জার্মান ফিল্ডমার্শাল সামান্য একজন রুশ লেফটেনান্টের নিকট সরাসরি আত্মসমর্পণে অনিচ্ছুক? অবশ্য ইতিমধ্যে র‍্যাস্কি ও স্মিডট পাউলাসের ঘরে যাতায়াত করিতেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ইয়েলচেংকোকে পাউলাসের রুমে নিয়ে যাওয়া হইল।

পাউলাস তখন লোহার খাটে শয্যাশায়ী ছিলেন, তাঁর পরনে তাঁর ইউনিফর্ম ছিল। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া বুঝা গেল তিনি দাড়ি কামান নাই, তিনি বিমর্ষ ছিলেন।

ইয়েরেমেঙ্কো পাউলাসের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তাহলে খতম ?'

পাউলাসের চোখে-মুখে একটা হতভাগ্য আর্ত মানুষের দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল এবং তিনি বিষন্নভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—'হাঁ'।

তখন করিডোরে ও অন্য ঘরে জার্মান সৈন্যে ভর্তি ছিল। র‍্যাস্কি ইয়েলচেঙ্কোর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—

'আপনাকে একটা অনুরোধ আছে। আপনারা তাঁকে (পাউলাসকে) একটা সুন্দর পরিচ্ছন্ন মোটরগাড়ীতে এবং উপযুক্ত পাহারায় নিয়ে যাবেন—যেন লালফৌজের সৈন্যেরা ওঁকে একটা ভ্যাগাবণ্ড (ভবঘুরে) মনে করে খুন করে না ফেলে।'

ইয়েলচেঙ্কো একথায় হাসিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—'আচ্ছা, তাই হবে।'

পাউলাসের জন্য একটা ভালো মোটরগাড়ী আনানো হইল এবং সেই গাড়ীতে করিয়া তাঁকে জেনারেল রকোসোভস্কির দপ্তরের লইয়া যাওয়া হইল।

তখনও কিছু কিছু জার্মান সৈন্য রণাঙ্গনে বাধা দিতেছিল। কিন্তু যখন তারা জানিতে পারিল যে, পাউলাস আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তখন দলে দলে জার্মান সৈন্যেরা ধরা দিতে লাগিল। শেষ সৈন্যদলের আত্মসমর্পণের তারিখ ছিল ২রা ফেব্রুয়ারী।

২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ একটি রুশ সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইল—নভেম্বর মাসে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার জার্মান সৈন্য বেষ্টিত হইয়াছিল। কিন্তু ২৩শে নভেম্বর ও ১০ই জানুয়ারীর মধ্যে, যখন স্ট্যালিনগ্রাদের পকেট নিশ্চিহ্ন করার চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু হইল, সেই সময়ের মধ্যে ১ লক্ষ ৪০ হাজার সৈন্য লড়াইতে, ক্ষুধায় কিংবা ব্যাধিতে প্রাণ হারাইয়াছে। জার্মান পক্ষের শিবিরাধিপতির (কোয়ার্টার-মাস্টার জেনারেল) রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায় পুলিশ ও ইঞ্জিনীয়ারিং বাহিনীর লোকজনসহ ১ লক্ষ ৯৫ হাজার লোককে সরবরাহ দিতে হইত। একজন ফিল্ড-মার্শালসহ ২৪ জন জেনারেল ও ২ হাজার ৫ শত অফিসারকে বন্দী করা হইয়াছে। এক্ষণে চূড়ান্ত বন্দীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৯১ হাজার। এর অর্থ এই যে, ১০ই জানুয়ারী থেকে ২রা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ সৈন্য মারা পড়িয়াছে এবং যখন নভেম্বর মাসে প্রথম ঘেরাও বা বেষ্টন করা হইয়াছিল, তখন থেকে ২ লক্ষের অধিক সৈন্য মারা পড়িয়াছে। ১০ জানুয়ারী থেকে ধৃত সমর-সম্ভারের পরিমাণও অজস্র—৭৫০ বিমান, ৪৮০ বর্মাবৃত গাড়ী, ১৫৫০ ট্যাঙ্ক, ৮ হাজার কামান ও মর্টার, ৬১০০ ট্রাক ও ২৩৫টি গোলাধার এবং অন্যান্য বহু প্রকারের দ্রব্যাদি।

স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। রাশিয়াতে দেখা দিল আনন্দের হাওয়া, কিন্তু উল্লাসের নয়। কারণ, রুশরা উপলব্ধি করিলেন যে, যে অবর্ণনীয় আত্মত্যাগ, যে অপরিসীম দুঃখ ও দুর্দশার পর জয় সুনিশ্চিত হইয়াছে, তার জন্য মুহূর্তের বেশী উল্লাস করা উচিত নয়।

আর জার্মানীতে নামিয়া আসিল শোক-গম্ভীর হতাশার অন্ধকার। হিটলার তিন দিন ধরিয়া 'জাতীয় শোক' পালনের সরকারী নির্দেশ দিলেন। নাৎসী গভর্নমেন্ট এবং জার্মান জাতির পক্ষে এই অপমান, এই পরাজয়ের গ্লানি নিশ্চিতরূপেই প্রাপ্য ছিল।

হিটলারের নিকট এই শোক বিশেষভাবে মর্মান্তিক ছিল এই কারণ যে, স্ট্যালিনগ্রাদ দখল হইয়া গিয়াছে বলিয়াই তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তার বদলে ঘটিল

অত্যন্ত কলঙ্কজনক আত্মসমর্পণ এবং একজন ফিল্ড-মার্শালের আত্মসমর্পণ !—জার্মান বাহিনীর সমগ্র ইতিহাসে যা ছিল অভাবনীয়। এজন্য জার্মানী থেকে প্রচার করা হইয়াছিল যে, পাউলাস আত্মহত্যা করিয়াছেন !

হিটলারের শোকের দ্বিতীয় বিশেষ কারণ এই যে, জার্মানীতে ৬নং আর্মি খুব নামকরা সৈন্যবাহিনী ছিল, বিজয়কীর্তিতে এই বাহিনীর রেকর্ড উজ্জ্বল ছিল। জেনারেল ফন রাইখনাউয়ের অধীনে এই বাহিনী বেলজিয়াম আক্রমণ ও প্যারিস দখল করিয়াছিল। যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস আক্রমণে এই বাহিনী অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯৪২ সালে এই ৬নং আর্মি খারকোভ থেকে ব্যূহ ভেদ করিয়া স্ট্যালিনগ্রাদ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। হিটলার বিশেষভাবে এই আর্মির জন্য গর্ব বোধ করিতেন। এর আঘাত হানার শক্তি ছিল অত্যন্ত উঁচু দরের। সেই আর্মি একেবারে খতম হইয়া গেল।

আর অধিনায়ক পাউলাস ?—তিনি নিশ্চয়ই মন্দ সেনাপতি ছিলেন না, পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে স্ট্যালিনগ্রাদ পর্যন্ত সমস্ত যুদ্ধেই তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি একজন উৎকৃষ্ট সেনানী ছিলেন। কিন্তু রুশ পক্ষ থেকে যে প্রচারই করা হইয়া থাকুক না কেন (পরবর্তীকালে তিনি রুশ পক্ষে যোগ দিয়া জার্মানীর মুক্তির জন্য সৈন্যদিগকে হিটলারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন) আসলে তিনি ছিলেন হিটলার ভক্ত—জার্মান সেনাপতিরাই একথা লিখিয়াছেন। এজন্যই হিটলারের অনুমতি ছাড়া তিনি স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতে চান নাই। হিটলারী রণ-পরিকল্পনাগুলি তিনি একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন এবং পোল্যান্ড থেকে রাশিয়া আক্রমণ পর্যন্ত সমস্ত যুদ্ধের পরিকল্পনাগুলিতেই তিনি একজন প্রচন্ড উৎসাহী সমর্থক ও অংশীদার ছিলেন। কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদের পরাজয়ের পর এহেন হিটলার ভক্তেরও মতি বিগড়াইয়া গেল এবং তিনি সোভিয়েট পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধের পর প্রত্যক্ষদর্শী পশ্চিমের সামরিক সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে, অবরুদ্ধ স্ট্যালিনগ্রাদে যদিও জার্মান সৈন্যেরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ছিল, কিন্তু জার্মান অফিসার বা সেনাপতিরা বেশ বহাল তবিয়তেই ছিলেন। তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য পাইয়াছেন এবং বেশ স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলেন ফন পাউলাস। বেচারা পরাজয়ের গ্লানিতে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি বিমর্ষ ও স্নায়বিক দৌর্বল্যগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু সোভিয়েট পক্ষ তাঁর সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ উদার ব্যবহার করিয়াছিলেন।

* * *

স্ট্যালিনগ্রাদে হিটলারী বাহিনীর আত্মসমর্পণের সংবাদে সারা পৃথিবীতে, এমন কি স্ট্যালিনগ্রাদ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী কলিকাতা শহরে পর্যন্ত প্রভূত আলোড়নের সৃষ্টি হইল। সেই সময় পরাধীন ভারতে জার্মান-ভক্তের সংখ্যাও কম ছিল না, তারা অবশ্যই স্ট্যালিনগ্রাদের পরাজয়ের খবরে মুষড়াইয়া পড়িল। কিন্তু ফ্যাসিবিরোধী রাজনৈতিক মহল ও জনগণের প্রগতিশীল অংশ আনন্দিত হইলেন। আর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং প্রধানমন্ত্রী চার্চিল প্রমুখ বিশ্বসামরিক নেতাগণ রাশিয়ার এই জয়লাভে স্ট্যালিনের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন জানাইলেন।

পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে এই পর্যন্ত বহু ভয়াবহ পরাজয় ঘটিয়াছে, বহু

দিগ্বিজয়ী অনন্যসাধারণ কীর্তি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদ আপন মহিমায় স্বতন্ত্র এবং অনন্যসাধারণ ও অতুলনীয়। এই ভল্গার তীর থেকে সাম্যবাদী রাশিয়ার জয়যাত্রা শুরু হইল এবং সেটা গিয়া শেষ হইল দুই হাজার মাইল দূরবর্তী খাস বার্লিনে।

স্ট্যালিনগ্রাদের রক্ষী রুশ সেনাপতিরা এবং সাধারণ সৈন্যেরা, এমন কি জনসাধারণ পর্যন্ত যে বীরত্ব দেখাইয়াছেন, যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, যে বিপদের মধ্যে দিয়া তাঁরা দিন কাটাইয়াছেন এবং যেভাবে তাঁরা দিনের-পর-দিন লড়াই করিয়াছেন, তার কোন তুলনা নাই। রণনীতিতে ও রণকৌশলে এবং ভূমিপথের যুদ্ধে লালফৌজের ও সোভিয়েট সেনাপতিবৃন্দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল স্ট্যালিনগ্রাদে। স্ট্যালিনের সামরিক প্রতিভারও নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ মিলিল স্ট্যালিনগ্রাদে। কারণ, প্রধানত তাঁরই নির্দেশে এই যুদ্ধ পরিচালিত হইয়াছিল—যদিও জেনারেল জুকোভ ও জেনারেল ভ্যাসিলিভস্কি ছিলেন সমান কৃতিত্বের অংশীদার। এক কথায় সৈন্য, সেনাপতি ও সুপ্রীম কমাণ্ডারসহ সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত স্ট্যালিনগ্রাদে আশ্চর্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। সামরিক জগতের পীঠস্থান স্ট্যালিনগ্রাদ! কেননা, স্ট্যালিনগ্রাদ কেবল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরাইয়া দেয় নাই, 'পৃথিবীর ইতিহাসেরও মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছে!'[১]

১। 'দি ওয়ার'—স্নাইডার, পৃষ্ঠা ৩৯২।

প্রথম খণ্ড শেষ